ভারতী

সংখ্যা ৫৫৬/৮৭
কলিকাতা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(১৩২০ বৈশাখ হইতে আশ্বিন).

ভারতী কার্য্যালয়,

১ সানি পার্ক (Sunny Park) ওল্ড বালিগঞ্জ রোড—কলিকাতা।

১৩২০ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন.)

বিষয়			পৃষ্ঠা
অন্তিমে (নাটিকা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	৪২২
আমার বোম্বাই-প্রবাস (সচিত্র)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০, ১৪৮, ২৩৭, ৩০৬, ৫১১, ৫৯৫
আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ (সচিত্র)		শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৭
আইনের প্যাঁচ (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	১৮৮
আসন্ন বর্ষা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	২২৫
আগে আগে (কবিতা)	...	শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল	২৮৬
'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	৪৬৭
আজ (কবিতা)	...	শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪৭২
আর্য্যনারীর প্রাচীন অবস্থা	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল	৬২৪
আসন্ন সন্ধ্যা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	৫২৫
ইংরাজ রমণীর গৃহস্থালী	...	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি	২৪৯
কাল-বৈশাখী (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	১৫
কালিদাসের নাটক্	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮১, ১৬৬, ২৫৭
কত কাল (কবিতা)	...	শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার	৮৪
কুণাল (বৌদ্ধ গল্প)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	২১৯
কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সচিত্র)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৩৩৯
কৈফিয়ৎ (কবিতা)	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল	৬৩৭
গোরিয়াঁ (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	৬৫০
গিলগিটদিগের আমোদ-প্রমোদ	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা	১১৫
চা প্রসঙ্গ (সচিত্র)	...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ	৫৩
চীনের শিল্প	...	শ্রীআশুতোষ রায়	১২২
চিঠি কই (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	৪৪১

বিষয়			পৃষ্ঠা
জাপানে নববর্ষ (সচিত্র)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
জাতি-বিরোধ	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	১৩৭
জাতীয় কাল-বৈশাখ (সচিত্র)	...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী প্রভৃতি	২০৬
জলছবি (গল্পগুচ্ছ)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২২৬
জাহ্নবী-তীরে (গল্প)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	২৭০
জাপানের ঝরণা (সচিত্র)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪১৭
তিব্বতীয় স্বরলিপি (সচিত্র)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৯
তুমি আমার (কবিতা)	...	রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী	২৪৮
ত্রিমূর্ত্তি (কবিতা)	...	শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ	৫০১
তুকারাম	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮১
তন্দ্রাপথে (কবিতা)	...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮০
তামাকু-তত্ত্ব (সচিত্র)	...	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ	৭১৬
দুপুরে ও নিশীথে (কবিতা)	...	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	৬৫
দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার-কাহিনী (সচিত্র)		শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার	১৯৩
দেবদাসী (গল্প)	...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	২৭৩
দিবা-স্বপ্ন (কবিতা)	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র বি, এ	৩০৬
দৈত্যের স্বর্গ (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪৪
নববর্ষ (কবিতা)	...	শ্রীজগদীশচন্দ্র তরফদার	১
নববর্ষে (কবিতা)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৮১
নবজীবন	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	১১৩
নবাবিষ্কৃত কবি ভাসের গ্রন্থাবলী	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫৩
নিরুদ্দেশ (কবিতা)	...	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	৫৪৩
প্রাক্ ঐতিহাসিক অতিকায় জন্তু (সচিত্র)		শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	২৯৯
প্রোষিত-ভর্তৃকা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	৫৩২
প্রাণের কথা (কবিতা)	...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৫৪০
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (সচিত্র)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	৫৮৮
প্রতিহত (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	৬২৮
পুরী (সচিত্র)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৬৪১
পত্র-পরিচয় (কবিতা)	...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি, এ	৭০৬
পাট ও পাত	...	শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়	৫৭১

বিষয়		পৃষ্ঠা
ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সৌন্দর্য্য-আবিষ্কার		
বৃন্দাবন (সচিত্র)	...	
বাগ্‌দত্তা (উপন্যাস)	...	
বৈজ্ঞানিক জীবনী (সচিত্র)	...	
বাস্তুভিটা (গল্প)	...	
বাল্মীকির মৃত্যু (কবিতা)	...	
বরপণ	...	
বিরহে (কবিতা)	...	
বিরহ-তপের শেষে (কবিতা)	...	
বাঙ্গলা ব্যাকরণ	...	
বিক্রমোর্ব্বশী	...	
বিন্দু (গল্প, সচিত্র)	...	
বিলাতের বিদ্যালয়	...	
ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুম (গল্প)	...	
বুধ-গ্রহের নূতন তথ্য	...	
বাস্তুকাহিনী (গল্প)	...	
বন্যাদায় (কবিতা)	...	
বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ	...	
ভুক্ত-ভোগীর পত্র	...	
ভ্রম-সংশোধন	...	
মহাসরস্বতী (কবিতা)	...	
মূলোচ্ছেদ (নাটিকা)	...	
মানবের ভবিষ্যৎ	...	
মিলন (কবিতা)	...	
মক্কার তীর্থযাত্রী (সচিত্র)	...	
মিলনে (কবিতা)	...	
মায়ের ডাক (গল্প)	...	
মশক-সমস্যা (সচিত্র)	...	
মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায় (সচিত্র)		
মুসলমানকোর্টে বাঙ্গালী সেনাপতি	...	
মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি ?	...	

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী	...	৫০২
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৬
	... ২৫, ১২৬, ২৩০, ৩৭৯, ৪৯০, ৭০২	
শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম, এ	... ৬৬, ৩৬৬	
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৭৬
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৯৮
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত	...	৯৯
শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী	...	১৬৯
শ্রীকালিদাস রায় বি, এ	...	৪৩১
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম, এ, বার-য়্যাট-ল		৪৪২
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫৫৬
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৬৩১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬৫২
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬৫৩
শ্রীজগদানন্দ রায়	...	৬৬০
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৬৭
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৭২৬
বীরবল	...	৬৭৩
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪৪৯
	... ৩৫২, ৭৩৪	
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৫৯২
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৬১২
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	...	৯৬
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১২৩
শ্রীগুরুদাস আদক	...	১২৪
শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী	...	১৬৯
বিজনকুমারী	...	২০০
শ্রীদীনবন্ধু সেন বি, এল	...	২৬১
	...	৩৫১
শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	...	৩৫৬
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল, এম, এস		৪৩৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
মিরজা ইটেসাম উদ্দিনের ইংলণ্ড ভ্রমণ		
মরীচিকা (সচিত্র)	...	
যুগ্মতারা (গল্প)	...	
যোগীবেশ (কবিতা)	...	
রাজহংসের আবাস-ভূমি (সচিত্র)	...	
রঙ্গমল্লী (সমালোচনা)	...	
রাবণের চিতা (গল্প)	...	
রাজা ও রাখাল (নাটিকা, সচিত্র)	...	
রেলযাত্রী (গল্প)	...	
রাজকুমার (নাটিকা)	...	
লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী (সচিত্র)	...	
শারদোদয় (কবিতা)	...	
শোক সংবাদ	...	
শারীর স্বাস্থ্য-বিধান	...	
সৌধ-রহস্য (উপন্যাস)	...	
সমালোচনা	...	
স্বর্গ-সুখ (কবিতা)	...	
সূর্য্যের তাপ	...	
সুরার সৃষ্টি (নাটিকা)	...	
সভাপতির অভিভাষণ (সচিত্র)	...	
স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সচিত্র)		
সুজার মৃত্যু	...	
সিন্ধু-তাণ্ডব (কবিতা)	...	
সতী-স্মৃতি (কবিতা, সচিত্র)	...	
সনেট-পঞ্চাশৎ (সমালোচনা)	...	
সনেট কেন চতুর্দ্দশ-পদী ?	...	
সনেট-সপ্তক	...	
সনেট-সুন্দরী (কবিতা)	...	
সাময়িক প্রসঙ্গ (সচিত্র)	...	

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী	...	৪৮৬
শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়	...	৫৫১
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	...	৩
শ্রীমতী হেমলতা দেবী	...	৪৪৬
শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১৭০
শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়	...	২০৩
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪০৯
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৬৮২
শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম, এ, কাব্যতীর্থ		৪৭৭
শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ	...	৫২৬
শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত	...	৪৮২
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	...	৫৮৭
	...	৭৩৪
রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস		
	৫, ১৬৩, ২৬৬, ৩৬১, ৫৩৫	
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৮৫,	
	১৭৬, ২৮৯, ৪৩২, ৫৬০, ৬৯৭	
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	১১১, ২২২, ৩৪৯, ৪৬২, ৫৮২	
শ্রীমতী বেলা দেবী	...	১২১
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	...	১৪৩
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৩০৭
জষ্টিশ আশুতোষ চৌধুরী এম,এ,এল,এল, বি		৩২৪
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৫৫
শ্রীতারানাথ রায়	...	৫০৬
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৫৭০
শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...	৫৭৭
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৪৬৫
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল		৫৭৮
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম, এ, বার-য়্যাট-ল		৩৪৬
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল		৫৮২
	...	৭২৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
হিন্দোলা	...	৯১
হাসি (কবিতা)	...	৪৭২
হোলকা বা হোলির প্রকৃত তত্ত্ব	...	৪৭৩
হকের ধন (গল্প)	...	৭০৭
শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ	...	৯১
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৪৭২
শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ	...	৪৭৩
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৭০৭

চিত্র সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
অজন্তা গুহার নারী	...	৫০
আমীরদিগের সমাধি-মন্দির	...	১৫২
আমতামিরু রেলগাড়ি	...	৩৭
"আঁধারেতে ভয় করি না!" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		২৭৯
আপ্পা সাহেব বারদ	...	৩৮৭
আশুতোষ চৌধুরী (বিচারপতি)	...	৩৩১
আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ	...	১০৭
আকাশে জাহাজের প্রতিবিম্ব	...	৫৫৫
আয়েষা শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	...	৬৬৬
আঠারো নালা	...	৬৪৬
ইণ্ডয়েনোডন্	...	৩০৪
ইন্দিরা—রাজকুমারী	...	৭৩১
ইব্রাহিম রোজা	...	৪০২
উটকর্ত্তৃক জল তোলা	...	২৪০
এলিফাণ্টা গুহা	...	৪৬
ওশিমা	...	৪২১
করসন্‌দাস মূলজি	...	৬০৯
কণারকের ভগ্ন-মন্দির	...	৬৪৫
কুচবিহারাধিপতি মহারাজ রাজেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ (স্বর্গীয়)	...	৭৩৫
কল্যাণী (বহুবর্ণ) শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত		১
কাপ্তেন স্কট	...	১৯৪
কাপ্তেন ওটস্	...	১৯৭
করুণাময়ী (বহুবর্ণ) শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত		২২৩
"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!" শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত		২৭১
কমলমনোহরী (বহুবর্ণ) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র অঙ্কিত		৩৫৩
কাল বৈশাখী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৪০৭
কেগোন	...	৪১৯
"কূলে একা বসে আছি!" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৫৩৩
কিরিফুরি	...	৪১৯
খুঁজিলাম কত, না পেলাম দেখা তার		৬৯১
গণেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক্তার)	...	৩৫২
গুম্বজ চিত্র	...	৫৯০
গুজোবাড়ী	...	৬৪৯
গুহার ভিতরের স্তূপ	...	৪৯
গোবিন্দদেবের মন্দির	...	১৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
গৌরীশঙ্কর দে (গণিতবিৎ)	...	২০৭
গোল গুম্বজ	...	৪০০
চিনুভাই রণছোড়লাল	...	৬০২
"চুম্বন দাও—অধরের চুম্বন"	...	৬৮৩
"চিরসাথী আজি কর মোরে"	...	৬৯৫
চা বাগান	...	৫৮
চিত্র-সাধনা (ফটো হইতে) শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত		৫০৪
চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম	...	৫৮৩
জগন্নাথের মন্দির	...	৬৪৪
জানকীনাথ ঘোষাল (স্বর্গীয়)	...	২১৪
জুম্মা মসজিদ	...	৫৯৬
ঐ এক অংশ	...	৬০০
জৈন মন্দির—আহমদাবাদ	...	৬০৫
জৈন মন্দির—আবু	...	৪৩
ঝড়ে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত	...	৬৪০
ট্রিসেরেটপ্স	...	৩০৬
ডাক্তার উইল্‌সন্	...	১৯৫
ডিনোসোর	...	৩০৪
ডিপ্লোডকাস্	...	৩০৫
"তুষার অমল বক্ষ যেথা কমল নীরবে খোলে" শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত		৫০০
তিব্বতীয় স্বরলিপির ছবি	...	২২৯
তিন দরজা	...	৫৯৭
"দেখ প্রিয়ে, দেখ তুমি কত সুন্দর"		৬৮৮
দেবেন্দ্রনাথ সেন (কবিরাজ)	...	২১২
"দেবদাসী" শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		২৭৫
"দিন যে যায় না কি করি!" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৪২৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কবিবর)	...	৩৪০
"দৈত্যের স্বর্গ" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৫৪৯
ধূমপানাসক্ত বৃদ্ধ	...	৭২২
"ন যযৌ ন তস্থৌ" শ্রীদুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত		৩১৫
নববর্ষের অভিনন্দন কার্ড	...	৩৫
নিউটন	...	৩৬৯
নাচীর ঝরণা	...	৪১৭
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বর্গীয়)	...	৪৫৬
নিউটন আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ	...	৩৭৬
পার্ব্বতীর তপস্যা (বহুবর্ণ)	...	১১৩
পুরলক্ষ্মী	...	১৩৬
পুরীর পুরন্ধ্রী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৬৩১
পুরীর নুড়িয়া	...	৬৪৩
পক্ষযুক্ত সর্প	...	৩০১
প্রাচীন বাদুড়	...	৩০২
প্রাণী-ভবনের সরোবর	...	৩০৩
পুণ্ডলীক মন্দির	...	৩৯৭
ফলাফল—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৫৭৫
বল্লভপন্থী মহারাজ	...	৬০৮
"বিন্দি, এখনো জল আনতে যাসনি?" শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত		৬৩০
বন্যাপীড়িত পল্লিবাসীর ভিক্ষা	...	৭২৭
বিজাপুরের অষ্ট বাদশা	...	৫১২
ব্যাটলডোর শ্যাটল্ কক্ খেলা	...	৩৮
"বর্ষার দিনে" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		২৮৭
"বাজাও রে মোহন বাঁশী!" শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত		৪৪৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
বেলিগার্ড গেট	...	৪৮৫
বারদ ভবন	...	৩৮৮
বিঠোবা মন্দির	...	৩৯৫
বিঠোবা মূর্ত্তি	...	৩৯৫
বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (অধ্যাপক)	...	২০৯
ভোলানাথ সারাভাই	...	৬০১
ভঙ্গ তরঙ্গে রণে ভঙ্গ		
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত		৬৪০
মরুভূমিতে খেজুর গাছের প্রতিবিম্ব		৫৫৩
মশকের জন্ম	...	২৬৪
মদনমোহনজীর মন্দির	...	২১
মানজাই নাচ	...	৩৯
মহম্মদের কবর	...	১২৫
মিয়ানির রণক্ষেত্র	...	১৬১
"মা যশোদা"		
শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত		৫৪১
মালা গাঁথা (ফটো হইতে)		
শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত		৫০৭
"মুক্তি হবেনা দেব দর্শনে"		
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৬৪৭
মেরি কার্পেণ্টার	...	৬০৩
মোহাফেজ খাঁ মসজিদ	...	৫৯৯
রাণী রূপাবতীর মসজিদ	...	৫৯৮
রঙ্গজীর মন্দির	...	১৭
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ	...	৪১
রাজহংসের আবাস ভূমি	...	১৭২
রাজহংসের বাসা	...	১৭৩
রাসবিহারী ঘোষ, সি, এস, আই (ডাক্তার)	...	৭৩৩
লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সি	...	৪৮৩
লেপ্টানাণ্ট বাউয়ার্স	...	১৯৯
লালসাবাজের দরগা	...	২৪৬
শিরাইস্তো ঝরণা-পরিষার	...	৪৯৮
শোনাই	...	৪২১
শুক-শূদ্রক-সংবাদ (বহুবর্ণ)		
শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত		৫৮৭
ষ্টেণ্ডসেযুরাস	...	৩০০
সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রের চিত্র	...	৭১
" শস্ত্রের "	...	৭৩
" বন্ধন "		৭৪, ৭৫
সীতা ও সরমা (রঙিন)	...	৯৮
সেওয়ান দুর্গ	...	১৫৪
সিটি কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক		
বিপন্ন গণের উদ্ধার চেষ্টা		৭২৯
সমুদ্র স্নান	...	৬৪২
সহস্রাধিক রাজহংসের বিচরণ	...	১৭১
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	২০৫
সিন্ধু নদীর উপরে কোত্রীর পুল	...	২৩৮
সিন্ধুবাসী দেওয়ান গোপালদাস	...	২৪৭
"সচকিতা"		
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৪৩৯
সাতটি রঙে চিত্রিত কার্ডবোর্ড	...	৩৭৫
সোলাপুর দুর্গ	...	৩৮৯
সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য (বহুবর্ণ)		
শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত		৪৭৭
সিদ্ধেশ্বর মন্দির	...	৫৯০
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজদরবার	...	৫২২
সতীস্মৃতি	...	৫৭৭
হরিনাথ রায় (বিচারপতি)	...	৩৫১
হাইদ্রাবাদ	...	১৫১



কল্যাণী

শ্রীযুক্ত অমিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য সংখ্যা কলিকাতা

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২০ [১ম সংখ্যা

নববর্ষ

১

এস হে অতিথি নব ! নব সাধ, নব আশা রাশি
লয়ে এস অনন্ত হরষ ;
সুপ্তি-মুক্ত আঁখি পাতে ফুটাইয়া প্রভাতের হাসি
এস তুমি নবীন বরষ।
এ হৃদয় পায়ে দলি, পুরাতন যায় চলি,
অতীতের অন্ধগর্ভে লভিবারে অনন্ত বিশ্রাম ;
এস তুমি, নব সাজে, নব হর্ষে বাজুক পরাণ।

২

বিদায়-আসরে ওই থেমে গেল গাজনের ঢাক,
সন্ন্যাসীর উন্মাদ চীৎকার ;
ঢলে পড়ে পুরাতন,— জীবনের এই শেষ ডাক
কা'র সাধ্য আছে লঙ্ঘিবার।
কাল সমুদ্রের বুকে, একটি বুদ্বুদ সুখে,
ভেসে উঠে মানবেরে খেলাইল কত শত রঙ্গে ;
আজি সেই মিশে যায় অন্তহীন তিমির তরঙ্গে।

৩

স্বাগত আহ্বান গীতি কোকিলের কলকণ্ঠে বাজি
করিতেছে মুখরিত ধরা ;
নবীনে বরিতে মরি ! প্রকৃতির মঞ্জু কুঞ্জ আজি
স্নিগ্ধ নব পল্লবেতে ভরা।

পুরাতন যায় মিশি, উজলিয়া দশদিশি,
কালের নবীন ঢেউ লীলাভরে আসিতেছে ছুটি ;
জানিনা জীবন-কাব্যে কিবা চিত্র উঠিবে গো ফুটি।

৪

সীমাহীন নভোনীলে ভে'সে গে'ছে পুরাতন গান,
কত শত আশা গেছে ঝরি ;
তবু এ বিশ্বের বুকে,—কার যেন সাধিতে কল্যাণ
ভাসিতেছে জীবনের তরী।
দারিদ্র্যের কশাঘাত, পীড়নের অশ্রুপাত,
তাই লয়ে হে নবীন ! তব সনে করি আলিঙ্গন ;
হয় যদি হোক্ তাহে জগতের উদ্দেশ্য সাধন।

৫

কালপ্রবাহের মাঝে আমি ক্ষুদ্র ক্রীড়নকখানি,
ডুবে' ভেসে করিতেছি খেলা ;
কোন্‌দিনে কোন্‌খানে চির অন্ধ যবনিকা টানি ;
ডুবে যাবে জীবনের ভেলা।
খেলাইতে অভাগারে, হে নবীন এলে দ্বারে,
ধন্য মানি আপনারে ; নমি পদে ভাগ্য-বিধাতার ;
হেরিলাম নব বর্ষ, নব হর্ষে প্রসাদে যাঁহার।

৬

ক্লান্তি, অবসাদ রাশি, হিংসা, দ্বেষ, গ্লানি, পরমাদ
যাক্ চলি অতীতের সনে ;
তুমি লয়ে এস বহি শান্তিমাখা পুণ্য আশীর্ব্বাদ ;
পূর্ণ কর নবীন উদ্যমে।
জীবনের যত আশা, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা,
অসম্পূর্ণ আছে যাহা ; বিশাল এ বিশ্বখানি মাঝে ;
দাও শক্তি পূর্ণ করি আনি সবে জগতের কাজে।

যুগ্মতারা

অসিধার নখাঘাতে দিল্লীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া শ্যেনপক্ষীর মত নাদির শাহ যেদিন হিন্দুস্থানের তখ্‌তেতাউস ছিনাইয়া লইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন সেদিন অক্ষম বাদসাহ রঙ্গীলে মহম্মদশাহকে দিল্লীর জগৎ-বিখ্যাত দেওয়ানি আমে শূন্য রত্নবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছিল অনেকেই—

"—সামতে আমালে মা, ই সুরতেনাদির গ্রিফ্‌ত্"

কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আমারই কর্ম্মফল নাদির মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের ন্যায় হতভাগ্য সেই মহম্মদ শাহের কপালের দোষ দিয়াছিল অনেকেই এবং তাঁহারই কর্ম্মফল যে ফলিতেছে তাহাও বারবার বলিতে বাকি রাখিল না অনেকেই,—সালেবেগ ছাড়া। সালেবেগ ছিল বাদশাহের মুহুরী এবং চিত্রকর। গীতানুরাগী বাদশাহ সারাদিন ধরিয়া যে সকল গান রচনা করিতেন সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজাইয়া বিচিত্র চিত্রে ফুটাইয়া বাদশাহের কুতুবখানায় ধরিয়া দেওয়াই তাহার কায ছিল। সে ছিল রঙ্গীলে মহম্মদ-শাহের 'জর্‌রী কলম'—সুবর্ণ লেখনী।

আমদরবারের মণি ভিত্তি আলোকিত করিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে "ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এইখানে এইখানে"। ঠিক তাহারই নিম্নে হৃতসর্ব্বস্ব মহম্মদ শাহ এই ছবিটা সালেবেগের প্রাণে তীরের মত আসিয়া বিঁধিতে বিলম্ব ঘটে নাই সুতরাং যে সময়ে আর সকলে অদৃষ্টের ফের লইয়া ব্যস্ত সেই সময়ে কথামাত্র না বলিয়া নির্ব্বাক বাদশাহকে যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দরবার হইতে চলিয়া আসিল ও বাড়ী আসিয়া একটুকরা কাগজে সেইদিনের ছবিটা আর সেই ছবির নীচে মহম্মদ শাহের কাতর অর্দ্ধোক্তিটুকুও লিখিয়া নিজের রং তুলি একখানি রুটী এক ছুরি গুছাইয়া লইয়া অবিলম্বে সালেবেগ দিল্লী ছাড়িয়া কাবুলের পথ ধরিল। সালেবেগের ঘরে এমন কেহ ছিল না যে মহম্মদ শাহের সুবর্ণ লেখনীর খবরদারি করে,—না বিবি না বেটী। সঙ্গীর মধ্যে ছিল এক পোষা বুল্‌বুল্ ; খাঁচা খুলিয়া দিতেই একদিকে সে উড়িয়া পালাইল। পরদিন কলমের সন্ধানে লোকের উপর লোক আসিয়া যখন বাদশাহকে গিয়া শূন্য খাঁচা ও খালি ঘরের সংবাদ দিল ; কলমের কোন সন্ধানই দিল না, তখন মহম্মদ শাহ বড় দুঃখেই বলিয়া উঠিলেন—

"হায় ব্যথিতের আর্জ্জি দুঃখের নিবেদন লিখিয়া প্রচার করিবার উপায় পর্য্যন্ত রহিল না আজ অবধি মনের দুঃখ মনেই থাক প্রকাশে কায নাই।"

* * *

চতুরঙ্গ বাহিনী চলিয়াছে, জয়দুন্দুভি বাজাইয়া নাদির চলিয়াছে, মসুদের মরুভূমির উপর দিয়া খর রৌদ্রের ভিতর দিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীর মত মোগল বাদশাহের রমণীয় সুখশয্যা ময়ূর সিংহাসন চলিয়াছে ; আর চলিয়াছে সেই সিংহাসন স্কন্ধে বহিয়া জর্‌রী কলম সালেবেগ সিপাহীর ছদ্মবেশে। অদূরে খর্জ্জুর বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় রোজা ইমাম

মুসিরেজা ; আরো দূরে মসুদের সুদৃঢ় কেল্লা। নাদিরি ফৌজ শাহার হুকুমে তখ্‌তে তাউস ইমাম রৌজায় উপঢৌকন দিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিল। বহু অশ্রুপাত বহু রক্তপাতে কলঙ্কিত ময়ূর সিংহাসন পবিত্র মোকবারায় উপহার দিয়া আপনাকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী জানিয়া নাদির পরম সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন কিন্তু এবার নাদিরি হুকুম তামিল হইল না, মোক্‌বারা হইতে ময়ূর সিংহাসন কে জানে কে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি টানিয়া ফেলিতে লাগিল। চতুর্থ দিনে ক্রোধান্ধ নাদির তলোয়ার খুলিয়া ইমামের রৌজার সম্মুখে সদর্পে দাঁড়াইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন "রজা অজমন্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্" যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি! প্রতিবারেই ইমাম মুসিরেজর শূন্য রৌজা হইতে প্রতিধ্বনি আসিল "অজমন্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্"। সত্য সত্যই সেই রাত্রে সুখসুপ্ত নাদিরের নিকট যুদ্ধের আহ্বান পৌঁছিল এবং তাহার জীবনযবনিকা শোণিতাক্ত করিয়া ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাহার জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে ভীষণ অঙ্কপাত করিয়া গেল।

* * * *

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। যমুনার উপর দিয়া দক্ষিণবায়ু বহিতেছে—রঙ্গমহালের সুপ্রশস্ত খোলা ছাদের উপরে সুন্দরী কাহারিয়াগণের স্কন্ধে সোনার তামদানে মহম্মদ শা সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশে দুইটি মাত্র তারা দুইখণ্ড কোহিনুরের মত জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। ঘরে ঘরে তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই। এই সময় তাতারী প্রহরিণী আসিয়া বাদশাহের হস্তে একখানি তসবীর দিয়া জানাইল—নাদির আর নাই ; সালেবেগ এইমাত্র মসুদ হইতে সে সংবাদ লইয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাদশাহের জন্য এই সামান্য উপহার হুজুর দরবারে দাখিল করিয়াছে। মহম্মদশা তসবীরখানি যত্নের সহিত উঠাইয়া লইলেন। তসবীরের এক পৃষ্ঠায় দেওয়ানী আমের দৃশ্য,—শূন্য সভায় হৃতসর্ব্বস্ব মোগল বাদশা! এই করুণ দৃশ্য ঘিরিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে—

'সামতে আমালে মা ঈ সুরতে নাদির গ্রীফ্‌ত'।

তসবীরের অন্য পৃষ্ঠায় নাদিরের রক্তাক্ত দেহের উপরে ছুরিকাহস্তে সালেবেগ আর সেই ছবি ঘিরিয়া রক্তের অক্ষর মাণিক্যের মত জ্বলিতেছে—

বয়েক্ গর্দ্দিসে চরখ্ নীলোক্ষরি
না নাদির বজা মুন্দ নে নাদরী।

সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় নীলাকাশ একটিবার মাত্র আবর্ত্তিত হইয়াছে কি না ইহারি মধ্যে নাদিরের সঙ্গে নাদিরি হুকুম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

বাদশাহ যখন তসবির হইতে মুখ তুলিলেন তখন আকাশে কেবলমাত্র একটি তারা যমুনার জলে ছায়া ফেলিয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

বাসগৃহ

আমরা এই প্রবন্ধে বাসগৃহ মধ্যে আলোক-প্রবেশ, বায়ু-সঞ্চালন প্রভৃতি অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাসগৃহ-নির্ম্মাণের সময়ে যাহাতে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। নিম্ন বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, এজন্য এপ্রদেশে বাসগৃহগুলি উত্তর-দক্ষিণমুখী হইলে ভাল হয় এবং যাহাতে বাটীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খানিকটা খোলা জায়গা থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। এইজন্য প্রতিবাসীর বাটীর দেওয়াল চাপিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। ইহাতে উভয়ের বাটীতেই বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সাধিত হয়।

আমরা বাটীর মধ্যে সচরাচর দুইটী অঙ্গনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। বাটীর চতুর্দ্দিকে মুক্তস্থান থাকিলে অঙ্গন দুইটী বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু বাটীর চতুঃপার্শ্বে খোলা জায়গা না থাকিলে অঙ্গনের বায়ু বাহিরে পরিবাহিত হইবার, অথবা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত যথোচিত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পরিষ্কৃত হইবার, সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ যদি অঙ্গন অল্পপরিসর হয় এবং চতুর্দ্দিকের গৃহগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল উচ্চ হয়, তাহা হইলে অঙ্গনগুলি এক একটী গভীর কূপের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে সহজে সঞ্চালিত হইয়া পরিষ্কৃত হইতে দেয় না। এরূপ চক্‌বন্দি বাটী কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। কলিকাতার জমী অতিশয় দুর্ম্মূল্য ; এখানে বাটীর মধ্যে দুইটী অঙ্গন এবং বাটীর চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা অনেকেরই পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বাটীর মধ্যে অঙ্গনের বন্দোবস্ত না করিয়া যদি বাটীর চতুঃপার্শ্বে খানিকটা খোলা জায়গা রাখা যায় এবং একহারা অথবা দোহারা দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া গৃহগুলির বায়ু-পথ সমূহ খোলা জায়গার উপর অবস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন গৃহেই বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে না। অল্প পরিসর স্থানের উপর যাঁহাদিগকে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাঁহারা যদি পূর্ব্বাহ্নে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা যে অনেক অসুবিধার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করি, সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল দিবাভাগে আমাদিগের বাস-গৃহের দরজা জানালা সমস্তই উন্মুক্ত রাখিতে হয়; এজন্য শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গৃহ মধ্যে বায়ু-সঞ্চালনের নিমিত্ত এদেশে কোনরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের সংস্কার ও বাসগৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীর দোষে আমরা প্রকৃতিদত্ত অনায়াস-লভ্য আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সুখ ভোগ হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত থাকি। বাস্তবিক কত লোক যে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাবে স্বাস্থ্যহীন ও কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা "ঠাণ্ডা" লাগিবার অমূলক আশঙ্কায় রাত্রিকালে অনেক সময়ে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকি। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে শীতল বায়ু সেবন করিলে উৎকট কাশ-রোগ উৎপন্ন হয়। এ বিশ্বাসটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও প্রভূত অনিষ্টের কারণ। অবশ্য "ঠাণ্ডা" লাগাইলে সর্দ্দি কাশি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শয়ন গৃহে কেন, শীত বা বর্ষাকালে খোলা জায়গায় থাকিলেও "ঠাণ্ডা" লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকাংশ কাশরোগই কোন না কোনরূপ বীজাণু (Baciilus) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুজনসমাকীর্ণ স্থানের, অথবা যে গৃহে কোন সংক্রামক শ্বাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি বাস করে, সেই গৃহের, বায়ুর মধ্যে ঐ সকল রোগোৎপাদক বীজাণুর প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় এবং ঐ বীজাণুমিশ্রিত দূষিত বায়ু নিশ্বাসের সহিত আমাদের ফুসফুসের (Lungs) অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ উৎকট কাশরোগ উৎপাদন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ু সেবনের দ্বারাই ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঘর খোলা থাকিলে "ঠাণ্ডা" লাগিয়া কখনই ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয় না। সূর্য্যালোক এবং বায়ুস্থিত অক্সিজেন্ এই সকল বীজাণুর পরম শত্রু; গৃহমধ্যে রৌদ্র ও বায়ুপ্রবেশের যথেষ্ট সুবিধা থাকিলে বায়ুস্থিত রোগোৎপাদক বীজাণু শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং দূষিত বায়ুর রোগজননশক্তি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ষ্টর্ণবর্গ বলিয়া গিয়াছেন যে রোগোৎপাদক বীজাণু নাশের জন্য রৌদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং সহজ-লভ্য পদার্থ আর নাই—"One of the most potent and one of the cheapest agents for the destruction of pathogenic bacteria"। একটা সাধারণ ইংরাজী কথা প্রচলিত আছে যে, যে বাটীতে সূর্য্য প্রবেশ করে না, তাহার দ্বার চিকিৎসকের প্রবেশের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত থাকে—"Where the sun does not enter, the Doctor does"—ইহা অতি সত্য কথা। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গৃহমধ্যে আলোক-প্রবেশ ও বায়ু-সঞ্চালনের যথোচিত বন্দোবস্ত থাকিলে শুশ্রূষাকারী সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে ভীষণ প্লেগ্ রোগ আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও বীজাণু বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক সংস্পর্শে শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ ভীষণ রোগের বীজ যে এত সহজে ও

বিনাখরচে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা বড় অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমরা দেখিতে পাই যে সাধারণ চিকিৎসালয়ে অনেক প্লেগ্ রোগী একত্রে থাকিলেও যাহারা তাহাদিগকে দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহারা ঐ রোগে কদাচ আক্রান্ত হইয়া থাকে। অথচ ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে অপরিচ্ছন্ন বহুজনতাপূর্ণ পল্লীর মধ্যে কোন বাটীতে একটীমাত্র লোক প্লেগ্‌রোগে আক্রান্ত হইলে উহা দাবানলের ন্যায় সত্বর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আধুনিক চিকিৎসকদিগের মত এই যে পিতামাতা বা তদূর্দ্ধ পুরুষের মধ্যে যক্ষ্মারোগ থাকিলেই যে সন্তানসন্ততির মধ্যে যক্ষ্মারোগের সঞ্চার হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু অনেক স্থলে শুদ্ধ শ্বাসক্রিয়া দ্বারা কলুষিত বায়ু সেবন করিলেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে যক্ষ্মারোগের বীজাণুর অভাবে ঐ রোগ উৎপন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বহুজনপূর্ণ সহরের প্রায় সর্ব্বস্থানের বায়ুমধ্যে এই রোগের বীজাণু অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। মুক্তস্থানের বায়ুতে ইহারা সূর্য্যালোক ও বায়ুস্থিত প্রচুর অক্সিজেন্ সংযোগে শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু রুদ্ধ গৃহের প্রশ্বাস-কলুষিত বায়ুমধ্যে থাকিলে উহারা বিনষ্ট না হইয়া সত্বর সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহাদিগের সংক্রামকতাধর্ম্মও প্রবল হয়। এইজন্য প্রশ্বাসকলুষিত বায়ুসেবনে এই রোগের বিস্তৃতি সংসাধিত হইতে থাকে। ডাক্তার কার্‌মাইকেল্ ইংলণ্ডের অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রতুল না থাকিলেও শুদ্ধ প্রশ্বাস কলুষিত বায়ু সেবন করিয়া এবং খোলা জায়গায় ব্যায়াম চর্চ্চা না করিয়া বালকেরা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপক এলিসন্, সর্ জেম্‌স্ ক্লার্ক্, নীল্ আনট্ উইন্‌বি গাই, ম্যাক্‌কর্মক্, গ্রীণ্‌হাউ, কার্ণেলি, হালডেন্, এণ্ডার্সন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া কার্‌মাইকেলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নানাবিধ উন্নতি সাধিত হওয়ায় যক্ষ্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে দেখা যাইতেছে এবং ইহার মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সূর্য্যালোক ও মুক্ত বায়ু সংস্পর্শে রোগোৎপাদক বীজাণু সকল শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যদি সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক গৃহে বাস করিতে হয় (যাহা সাধারণ লোকের বাটীতে সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে), তাহা হইলে সেই গৃহের বায়ুপথ সকল সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি কাশরোগে ফুসফুসের অল্পাধিক স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সুতরাং রক্ত-শোধনের জন্য যে পরিমাণ

বিশুদ্ধ বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করা উচিত, রোগগ্রস্ত ফুস্‌ফুস্ তাহা গ্রহণ করিতে পারায় রোগীর শরীরস্থিত রক্ত যথারীতি পরিষ্কৃত হইতে পায় না, সুতরাং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ সময়ে যদি আবার আমরা রোগীকে "ঠাণ্ডা" লাগিবে, এই অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া গৃহের তাবৎ বায়ুপথ রুদ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে রোগীর সাধ্যমত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার যথেষ্ট অসুবিধা উপস্থিত হয়, সুতরাং এরূপ স্থলে আমরা তাহার আরোগ্যের অন্তরায় ও অনেক সময়ে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই যে বহুদর্শী চিকিৎসকগণ উচিত পরামর্শ দিলেও আমরা ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ তদনুরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হই না। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ রোগী রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ু সেবন করিতে থাকিবে, ততক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার রোগের প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা বৃথা। যে যক্ষ্মারোগে আমরা রোগীকে রুদ্ধ গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে নিরাপদ বিবেচনা করি, সেই দুঃসাধ্য রোগ এক্ষণে, যথায় সর্ব্বদা বরফ পড়িতেছে, এরূপ অত্যধিক শীতল স্থানে উন্মুক্ত বায়ুমধ্যে থাকিয়া, প্রশমিত ও আরোগ্য হইতেছে। সাধারণ হস্পিটালের দরজা জানালা, কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল ঋতুতেই, দিবারাত্র মুক্ত রাখা হয়, অথচ তাহাতে রোগীদিগের কোন অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না।

নানাবিধ সামাজিক কারণ ও আর্থিক অভাব নিবন্ধন আমরা বহু পরিবার লইয়া ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য হই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা "হিম" লাগিবার ভয়ে রাত্রিকালে শয়ন-গৃহের প্রায় সমস্ত বায়ু-পথই রুদ্ধ করিয়া দিই। রোগ আমাদের নিত্য সহচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং গৃহবাসীদিগের মধ্যে দুই একটী রোগী থাকাও অসম্ভব নহে। এস্থলে বলা উচিত যে পীড়িতাবস্থায় আমাদিগের প্রশ্বাস ও ত্বক্ দ্বারা অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ ও নানাবিধ দূষিত অর্গানিক্ (organic) পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। শিশুসন্তানগণ অনেক সময়ে শয্যার উপরেই রাত্রিকালে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে এবং গৃহিণীদিগের আলস্যবশতঃ তাহা সমস্ত রাত্রি সেই রুদ্ধ গৃহের এক পার্শ্বে সঞ্চিত থাকে। এইরূপে গৃহবাসীদিগের শ্বাসক্রিয়া, রোগীর শরীর হইতে পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ এবং গৃহমধ্যে সঞ্চিত মলমূত্র দ্বারা শয়নগৃহের বায়ু শীঘ্র অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত রোগী বা শিশুর পরিচর্য্যা নিবন্ধন অনেক সময়ে গৃহমধ্যে একটী আলোক রাখিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ুস্থিত অক্সিজেনের অংশ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং বায়ুমধ্যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ প্রভৃতি দূষিত পদার্থের অংশ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গৃহরুদ্ধ থাকে বলিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু তন্মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবেশ করিয়া দূষিত বায়ুকে পরিষ্কৃত ও স্থানান্তরিত করিতে পারে না, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ু যে কিরূপ বিষাক্ত হয়, তাহা বর্ণনার অতীত। এই দূষিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কিন্তু যাহারা গৃহ মধ্যে বাস করে, তাহারা বার বার উহা নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়, সুতরাং গৃহবাসীরা উক্ত দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু বাহির হইতে অন্য ব্যক্তি রুদ্ধ গৃহমধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেই উক্ত দুর্গন্ধ সবিশেষ অনুভব করিয়া থাকে। আমরা বার মাস ত্রিশ দিন এইরূপ অবস্থাপন্ন শয়নগৃহের মধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য যে ভঙ্গ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

আমরা যে নির্ম্মল বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, তাহাতে শতকরা ০৪ ভাগ মাত্র কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করি, তাহার প্রতি ১০০ ভাগে ৪ ভাগ কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ থাকে, সুতরাং গৃহরুদ্ধ থাকিলে উহার বায়ু শ্বাসক্রিয়া দ্বারা যে কত শীঘ্র দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। অক্সিজেন্ গ্যাস্ আমাদের জীবন ধারণের সহায়ক। রুদ্ধ গৃহের বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন্ থাকে, তাহা ক্রমশঃ আমরা নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে প্রশ্বাসত্যক্ত বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইতে থাকে। গৃহের বায়ুপথ মুক্ত থাকিলে বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুর সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বনিক্ এসিডের পরিমাণ কমাইয়া এবং উহার কতকাংশ গৃহ হইতে দূরকরিয়া দিয়া, উহাকে পুনরায় শ্বাসোপযোগী করে। এজন্য কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, কি দিবা, কি রাত্রি, যে গৃহে বাস করা যায়, তাহার বায়ুপথসমূহ রুদ্ধ করা নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নিম্ন বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে দক্ষিণ-দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, এজন্য এদেশের বাসগৃহের দরজা ও জানালাগুলি উত্তর-দক্ষিণ-মুখী ও ঋজু হওয়া উচিত। বায়ু-পথগুলি ঋজু না হইলে গৃহমধ্যে কখনই অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না। কোনও গৃহের একটী মাত্র ঋজু বায়ু-পথ মুক্ত থাকিলে বায়ু সঞ্চালনের যেরূপ সুবিধা হয়, এক দিকে দুই তিনটী বায়ু পথ উন্মুক্ত থাকিলেও সেরূপ সুবিধা হয় না। গৃহের চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা থাকিলে গৃহ মধ্যে আলোক-প্রবেশের ও বায়ু সঞ্চালনের সবিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। দরজা ও জানালাগুলি দৈর্ঘ্যে ৬½ ফিট্ এবং প্রস্থে ৩½ ফিটের কম হওয়া উচিত নহে। জানালা অপেক্ষা খড়্‌খড়ি গৃহের বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে অধিক উপযোগী। খড়্‌খড়ির "পাখি" ফেলা থাকিলেও তাহাদিগের ফাঁক দিয়া গৃহে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু খড়্‌খড়ির সহিত আমরা যে "সাসি" প্রস্তুত করিয়া থাকি, তাহা প্রভূত অনিষ্টের কারণ। গৃহের শোভার জন্য "সাসি" নির্ম্মিত হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু "সাসি" কখন রুদ্ধ করা উচিত নহে।

প্রত্যেক গৃহের বায়ু-নির্গমনের স্বতন্ত্র পথ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ যাহাতে এক গৃহের দূষিত বায়ু অপর গৃহে প্রবেশ না করে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। গৃহের দেওয়ালের উপরিভাগে কতকগুলি ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য। প্রশ্বাসত্যক্ত বায়ু ও দীপালোক-সন্তূত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ উষ্ণতা হেতু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, সুতরাং দেওয়ালের উপরিভাগে ছাদের নিম্নে কতকগুলি ছিদ্র

থাকিলে তদ্দ্বারা ঐ দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং মুক্ত দরজা ও জানালা দিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বিশেষতঃ বিদ্যালয়, কারখানা, সভাগৃহ, নাট্যশালা, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি যে সকল স্থানে একত্রে বহুলোক সমাগত হয়, তথাকার দেওয়ালের উপরিভাগে বহুসংখ্যক ছিদ্র এবং ঐ সকল গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। অবশ্য গ্রীষ্মকালে রুদ্ধ গৃহে থাকিতে যে রূপ কষ্ট হয়, শীত কালে সেরূপ হয় না; কিন্তু গৃহ রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিলে তথাকার বায়ু কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, সকল সময়েই সমভাবে দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শীতকালেও শয়ন গৃহের কয়েকটী বায়ু পথ উন্মুক্ত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। এদেশে সাহেবেরা শীতকালেও শয়ন গৃহের বায়ু-পথ এককালে বন্ধ করিয়া রাখেন না; তাঁহারা দিবারাত্র নির্ম্মল বায়ু সেবন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকিতে দেখা যায়। পৌষ মাঘ মাসে কলিকাতার বাঙ্গালী-টোলায় সন্ধ্যার পর যে বাটীর প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহারই দরজা জানালা রুদ্ধ থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং বাটীটী যেন পরিত্যক্ত জনশূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ সময়ে চৌরঙ্গী মহলে যাইলে দেখা যায় যে সকল বাটীরই দরজা জানালা খোলা রহিয়াছে এবং উহাদিগকে আলোকমালায় সজ্জিত দেখিয়া মনে হয় যেন প্রত্যেক বাটীতে কোন রূপ উৎসবের আয়োজন হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে এদেশে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে রোগের প্রভাব অধিক এবং মৃত্যু সংখ্যার আতিশয্য হইয়া থাকে। শীতকালে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ গৃহে বাস করিয়া বিষাক্ত বায়ু সেবন করা যে ইহার একটী প্রধান কারণ নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

গৃহের মধ্যে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের শ্বাসক্রিয়া দ্বারা গৃহমধ্যস্থ বায়ু এত শীঘ্র এবং এত অধিক পরিমাণে দূষিত হয় যে বায়ুপথ সমূহ উন্মুক্ত থাকিলেও বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে শীঘ্র পরিষ্কৃত করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য প্রত্যেক গৃহের মধ্যে (বিশেষতঃ শয়ন-গৃহে) কতগুলি লোক বায়ুকে অতিরিক্ত ভাবে দূষিত না করিয়া একত্রে অবস্থান করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার একটী সহজ উপায় আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকের উক্ত গৃহে বাস করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শয়ন-গৃহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত, তাহা প্রথমতঃ নির্ণয় করিতে হইবে। মনে কর কোন একটী গৃহের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট এবং উচ্চতা ১২ ফুট। এক্ষণে এই সংখ্যা গুলি গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার দ্বারাই গৃহের মধ্যে কত বায়ু-স্থান (Air-space) আছে, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। আমাদের গৃহটীর আয়তন (Volume) ২৫ × ১২ × ১২ = ৩৬০০ ঘন ফুট (Cubic feet)। ইংলণ্ডে সৈন্যাবাস ও সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ বা রোগীর জন্য ৬০০ ঘন ফুট পরিমিত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু

ইংলণ্ডের ভাড়াটিয়া বাটী গুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থানের জন্য ৩০০ ঘন ফুট পরিমিত স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে আমাদিগের বিচারাধীন গৃহটীর মধ্যে ১২ জন লোক শয়ন করিতে পারে। কিন্তু শয়ন-গৃহের পক্ষে ৩০০ ঘন ফুট পরিমিত স্থান এক জন মনুষ্যের পক্ষে একেবারেই পর্য্যাপ্ত নহে; শয়ন গৃহে এরূপ অল্প পরিমাণ স্থান হইলে গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহারা দুর্ব্বল হয় এবং রক্তহীনতা (Anæmia) রোগ জন্মে। আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীও ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ন্যূনসংখ্যা এই পরিমাণ স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। সার্জ্জন্-জেলেরাল্ সর্ সি পি লিউকিস্ তাঁহার ট্রপিকাল্ হাইজিন্ নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শয়নগৃহে ১০০০ ঘন ফুট, (অর্থাৎ ১০ × ১০ × ১০) পরিমিত স্থানের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সকল অবস্থায় যদি ১০০০ ঘন ফুটের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ৬০০ ঘন ফুট স্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে সাধারণ লোকের বাটীর গৃহগুলির উচ্চতা প্রায় ১০ হইতে ১২ ফুট্ হইয়া থাকে। সুতরাং গৃহের উচ্চতা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা গৃহের শুদ্ধ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গণনা করি, তাহা হইলে আইন অনুসারে যে ৩০০ ঘন ফুট্ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে একজনের ২৭ বর্গ ফুটের (Square feet) অধিক পরিমাণ স্থান অধিকার করিবার সুবিধা হয় না অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট্ এবং প্রস্থে ৪½ ফুটের অধিক স্থান তাহার অংশে পড়ে না (৬ × ৪½ = ২৭ × ১১ ফুট (উচ্চতা) = ২৯৭ ঘন ফুট্)। ২৭ বর্গ ফুট্ পরিমিত স্থান এক জনের পক্ষে যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শয়নগৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ ৪৮ বর্গ ফুট্ (৮ ফুট্ দৈর্ঘ্য × ৬ ফুট্ প্রস্থ) পরিমিত স্থানের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ডাক্তার লিউকিস্ শয়নগৃহে প্রত্যেক লোকের জন্য ১০ বর্গ ফুট্ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ১০ ফুট্ × প্রস্থ ১০ ফুট্) পরিমিত স্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। গৃহের মধ্যে গৃহশয্যা (Furniture) যত অধিক থাকিবে, ঐ গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে। এজন্য শয়নগৃহে গৃহশয্যার পরিমাণ যত অল্প হয়, উহা ততই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। শয়নগৃহের মধ্যে আলমারি, বাক্স, সিন্দুক, টেবিল্, চেয়ার্ প্রভৃতি আসবাব যত অল্প থাকে, ততই ভাল।

আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে রাত্রিকালে গৃহমধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলে গৃহের বায়ু দূষিত হয়। অনেক সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া গৃহে দীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং শয়নগৃহের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে পরিমাণ স্থানের (৪৮ বর্গ ফুট্) উল্লেখ করা গিয়াছে, যাহাতে কোনক্রমে তাহার কম না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে গৃহের মধ্যে যে কোন আলোকই জ্বলুক না কেন, তাহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে; কেবল

ইলেক্‌ট্রিক্ আলোক দ্বারা বায়ু দূষিত হয় না।

গৃহমধ্যে "টানা পাখা" অথবা ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা চালাইলে বায়ু সঞ্চালনের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহরুদ্ধ থাকিলে বায়ু-প্রবাহের অভাবে পাখা দ্বারা কেবল ঘরের বায়ুরই নাড়াচাড়া হইয়া থাকে, তাহা পরিষ্কৃত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। তবে তদ্দ্বারা দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম্ম শীঘ্র শুকাইয়া যায় বলিয়া শরীর শীতল হয় এবং এই জন্য "টানা পাখা" গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক হইয়া থাকে।

আমরা সচরাচর বাটীর নিম্নতলে সুবিধা-মত কোন একটী গৃহে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। ইহাতে বাটীর মধ্যে সকালে ও বৈকালে উনানে আগুন দিবার সময় এত অধিক ধূঁয়া হয় যে সে সময়ে বাটীতে থাকা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত এই ধূমের জন্য বস্ত্রাদি অতি সত্বর মলিন হইয়া যায়। রন্ধনশালা বসতবাটী হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং তন্মধ্য হইতে ধূম নির্গমনের জন্য সুবন্দোবস্ত করা উচিত। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে গৃহস্থ লোকের বাটীতেও রন্ধনশালা বাসগৃহ হইতে অল্প দূরে নির্ম্মিত হইত। ইহাতে ধূঁয়া, ছাই ইত্যাদি দ্বারা বাস-গৃহ ও বস্ত্রাদি মলিন হয় না এবং আমাদিগের রন্ধনশালাধিষ্ঠাত্রী "অন্নপূর্ণা"দিগেরও দিবসে দুইবেলা "ধূঁয়ার ছলন" করিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে হয় না। কলিকাতায় স্থানাভাব বশতঃ স্বতন্ত্র স্থানে পাকশালা প্রস্তুত করিবার সর্ব্বদা সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে বাটীর উপরতলে (ছাদের উপর) পাকশালা নির্ম্মাণ করিলে ধূঁয়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহারা নূতন বাটী প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা যেন উনানের সহিত একটী চিম্‌নির বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে নীচের তলে রান্নাঘর হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, চিম্‌নি দিয়া সমস্ত ধূঁয়া উপর দিকে উঠিয়া যাইবে। ধূম নির্গমনের জন্য রান্নাঘরের মধ্যে ছাদের নিম্নে দেওয়ালের উপর ছিদ্র রাখা হইয়া থাকে; অভাবপক্ষে এগুলি ভাল, তবে চিম্‌নি দ্বারা ধূঁয়া যেরূপ সহজে বাহির হইয়া যায় এবং রান্না ঘরের মধ্যে ও বাটীর অন্যান্য স্থানে জমিয়া থাকে না, এই ছিদ্রগুলি দ্বারা সেরূপ হয় না।

রান্নাঘরটী গোশালা, অশ্বশালা বা পাইখানার নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বায়ু রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত এরূপ স্থানে রান্নাঘর অবস্থিত হইলে তন্মধ্যে মাছির উপদ্রব হইতে দেখা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মাছি দ্বারা রোগোৎপাদক বীজাণু একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়; ঐ সকল মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে উহা বীজাণুদুষ্ট হয় এবং উহার ব্যবহারে নানারূপ সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়। মাছি তাড়াইবার জন্য রান্নাঘরের জানালা গুলি সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত হওয়া উচিত এবং দরজায় একখানি চিক্ ফেলিয়া রাখা আবশ্যক। রান্নাঘরের নিকট তরকারির খোসা, মাছের আঁইস, ভাতের ফেন এবং অন্য কোন আবর্জ্জনা সঞ্চিত করিয়া রাখা

উচিত নহে; ইহাতে রান্নাঘরের মধ্যে মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে।

গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী রাখিবার স্থান বাটী হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। কলিকাতায় অনেক বাটীতে নিম্নতলে গোশালা বা অশ্বশালা অবস্থিত আছে এবং উপরতলে অধিবাসীগণ বাস করিয়া থাকেন; ইহা যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর প্রথা, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এরূপ ব্যবস্থায় গৃহবাসীগণকে সতত গোশালা বা অশ্বশালা হইতে উদ্ভূত দূষিত বাষ্প-মিশ্রিত বায়ু সেবন করিতে হয়। গোশালা বা অশ্বশালার মেঝে "পাকা" হওয়া উচিত এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর না রাখিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। গৃহের "চাল" দুধারে একটু বেশী গড়ানে হইলে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে পশুগণ সুন্দর-ভাবে রক্ষিত হইতে পারে অথচ চতুর্দ্দিক্ খোলা থাকিবার জন্য বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় না। এক্ষণে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী সহরের স্থানে স্থানে কতকগুলি আদর্শ গো-শালা (Model Cowshed) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে; আমাদের ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অশ্বশালা ও গো-শালা নির্ম্মাণ করা উচিত। গৃহের মেঝে একদিকে একটু ঢালু থাকিবে এবং গৃহের বাহিরে "পাকা" নর্দ্দামা প্রস্তুত করিয়া যাহাতে মল মূত্রাদি দূরে চলিয়া যাইতে পারে (অর্থাৎ নিকটস্থ জমিতে না শোষিত হয়), তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। পল্লীগ্রামে বাসগৃহ হইতে বহুদূরে ভূমি খনন করিয়া মল, মূত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনা তন্মধ্যে প্রোথিত করা উচিত। কালে এই সকল পদার্থ উৎকৃষ্ট "সাঙ্গর" পরিণত হয়, তখন উহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

"পাইখানা" বাসগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। "পাইখানার" উপরের ও নীচের মেঝে সিমেণ্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লওয়া উচিত এবং বায়ু ও আলোক প্রবেশের জন্য তন্মধ্যে ২টী জানালা রাখা উচিত। যে "পাইখানা"য় একটী দরজা ব্যতীত অন্য কোন বায়ুপথ থাকে না, তাহা সর্ব্বদা ভিজা ও দুর্গন্ধময় হইতে দেখা যায়। যদি ড্রেনের "পাইখানা" না হয়, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে মেথর যাহাতে মল সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। নীচের স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে মেথর উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভালরূপে পরিষ্কার করিতে পারে না, সুতরাং চিরদিন পাইখানার নিম্নদেশ নিতান্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় রহিয়া যায়। এইজন্য "পাইখানার" নিম্নতলে মেথরের "খাটিবার" দরজা ব্যতীত আর একটী ছোট বায়ুপথ রাখা উচিত; তাহা হইলে উহার মধ্যে সর্ব্বদা আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাকে শুষ্ক রাখিবে এবং উহার দুর্গন্ধও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে। "পাইখানার" জল "পাকা" নর্দ্দামা দিয়া বাটী হইতে দূরে যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। "পাইখানার" গাম্‌লা বা বাল্‌তিগুলি আল্‌কাতরা মাখান হইলে উহা সহজেই পরিষ্কৃত হয় এবং মাটীর গাম্‌লার মধ্যে মলমূত্রাদি শোষিত হইতেপারে না।

প্রতি বৎসর একবার করিয়া বাটী চূণকাম (Lime-washing) করা উচিত। যদি বাটীতে কোন সংক্রামক রোগ হয়, তাহা হইলে রোগ মুক্তির পর সমস্ত বাটী (দেওয়াল ও ছাদের নিম্নতল পর্য্যন্ত) ফেনিল্ (Phenyle) দ্বারা ধৌত করিয়া চুণকাম করিয়া লওয়া উচিত।

বাটীর নিকটে দুই চারিটী ছোট গাছ এবং ফুল গাছ থাকিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই—কিন্তু বেশী গাছপালা বা কোন বৃহৎ বৃক্ষ বাটীর নিকটে থাকিলে বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় এবং অনেক সময়ে ছোট গাছপালার জন্য মশকের উপদ্রব হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাটীর ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রত্যেক গৃহে অধিক সংখ্যক বায়ুপথ রাখা এবং সেগুলি পরস্পর ঋজু হওয়া উচিত। জানালাগুলি উচ্চতায় ও প্রস্থে তিন ফিটের কম হওয়া উচিত নহে। মাটীর গৃহে অধিক সংখ্যক বায়ুপথ না থাকিলে প্রচুর পরিমাণ আলোক ও বায়ুর অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মেঝে চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে যথেষ্ট উচ্চ হওয়া উচিত এবং সিমেণ্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লইলেই ভাল হয়। যদি মাটীর মেঝে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে উহা হইতে কয়েক ইঞ্চি মাটী তুলিয়া লইয়া নূতন মাটী দিয়া পিটিয়া তদুপরি "লেপ্" দেওয়া উচিত। অধিকাংশ স্থলে "গোবর মাটীর" লেপ্ দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে কোন ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। তবে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ গোবরের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা বলেন যে মেঝেয় গোবর দিলে মেঝে ভিজা থাকে এবং গৃহে কীটাদির উপদ্রব হয়। আমি পল্লীগ্রামবাসী অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে মেঝেয় গোবর মাটীর লেপ দিলে জমী ভিজা থাকেনা এবং কীটাদিরও উপদ্রব হয় না। তাঁহারা আরো বলেন যে গোবরের লেপ্ দ্বারা "লোণা" নিবারিত হইয়া থাকে। গৃহের "চাল" একটু উচ্চ হওয়া উচিত, নহিলে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ গৃহের ছাদ বা "চাল" নীচু হইলে গ্রীষ্মকালে বেশী গরম এবং শীত কালে বেশী শীতল হয়। গৃহের দেওয়ালগুলি চুণকাম করা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে চুণকাম বদলান কর্ত্তব্য। গৃহের "চাল" উচ্চ হইলে এবং চতুঃপার্শ্বে প্রশস্ত "দাওয়া" রাখিলে গৃহগুলি বেশ সুশীতল থাকে। বাটীর চতুঃপার্শ্বের জমীতে যাহাতে আবর্জ্জনা ও মলিন জল সঞ্চিত না হইতে পারে (কারণ যে কোন স্থানে জল বদ্ধ থাকিলেই গৃহ আর্দ্র হইবে এবং সেই স্থানে মশকের প্রাদুর্ভাব হইবে), এবং বৃষ্টির জল ভূমির মধ্যে শোষিত না হইয়া যাহাতে সহজে বাটী হইতে দূরে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা উচিত। মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান বাটী হইতে দূরে নির্ম্মাণ করিবে এবং যাহাতে ঐ সকল পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ শীঘ্র দূরে স্থানান্তরিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। মল মূত্রাদি মাঠের মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করা উচিত এবং যথেষ্ট পরিমাণ শুষ্ক মাটি দ্বারা উহা চাপা দেওয়া উচিত।

ভূমি নিতান্ত আর্দ্র হইলে কাষ্ঠ বা বাঁশের "মাচান" করিয়া তাহার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা উচিত।

কলিকাতায় বাঙ্গালীটোলায় প্রায় সকল বাটীর মধ্যে ড্রেণের পিট্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। বাটীর মধ্যে সর্ব্বত্র "পাকা" নর্দ্দামা (Surface drain) করিয়া সেগুলিকে বাটীর বাহিরে ড্রেণের সহিত সংযুক্ত করা উচিত। বাটীর মধ্যে ড্রেণের পিট্ থাকিলে উহা হইতে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হইয়া গৃহস্থিত বায়ুকে সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত করে এবং উহা হইতে নানাবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সুবৃহৎ অট্টালিকাই হউক আর ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরই হউক, উহার অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রদেশ সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে গৃহগুলি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, সেগুলিও প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা কাল খুলিয়া রাখিবে। গৃহের কোন স্থানে বা কোন আস্‌বাবের উপর ধূলা জমিতে দিবে না, অনাবশ্যক কাঠ কুটরা, ভাঙ্গা বোতল, টিন্ বা মাটীর বাসন, পুরাতন বালিস, বিছানা বা কাগজ পত্রাদি বাটীর কোন স্থানে সঞ্চিত হইতে দিবে না; ইহাতে ইঁদুর, বিছা, মাকড়সা ও মশার বাসগৃহের মধ্যে আশ্রয় লইবার বড় সুবিধা হয়। আবশ্যক না থাকিলে ঐ সকল অব্যবহার্য্য পদার্থ পোড়াইয়া ফেলিবে। সর্ব্বদা জল ঢালিয়া বাড়ী ধুইলে বাড়ী বড় স্যাঁৎসেতে হয়, ইহাতে বাটীর ছেলেপুলের সর্দ্দি কাশী সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। ভিজা কাপড় দিয়া গৃহের মেঝে মুছিয়া ফেলিলে উহা শুকাইতে দেরী হয় না। বাটীর চতুঃপার্শ্বে "আগাছা" জন্মিলে তাহা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে, এবং বাটীর আবর্জ্জনা সমূহ এক স্থানে জমা করিয়া "ময়লা"র গাড়ী আসিবামাত্র তাহা স্থানান্তরিত করিবে। বাটীর মধ্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবে না; থুথু ফেলিবার জন্য দুই এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট পাত্র রাখিয়া দিবে। এক কথায় বাটীখানিকে ছবিখানির মত করিয়া রাখিবে; ইহাতে নিজের চিত্ত এবং যাঁহারা বাটীতে শুভাগমন করিবেন, তাঁহাদেরও চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু

কাল বৈশাখী

নটরাজ, সাজিলে কি তাণ্ডব নর্ত্তনে ?
আন্দোলিয়া দ্রুমদল, গম্ভীর গর্জ্জনে
বাজাইয়া প্রলয় পিণাক ঝটিকার ?
ওড়ে ধূলি, ঘোরে পত্র ; ছিন্ন লতিকার
প্রাণপণ আগ্রহের একান্ত বন্ধন ;
জ্বালামুখী বিদ্যুতের অসহ্য দহন,
পাংশু পুঞ্জীভূত মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর !

ভয়ার্ত্ত বসুধা-বক্ষে কাঁপিছে ভূধর ;
উঠিতেছে পড়িতেছে উত্তাল স্পন্দনে
সিন্ধু বক্ষে লক্ষ ঊর্ম্মি ব্যাকুল ক্রন্দনে
তোমার চরণ বেষ্টি ভুজঙ্গের মত ;
উদ্যত অশ্বত্থশাখা জটা সমুদ্ধত,
জাগিছে ঈশান কোণে রক্ত ভয়ঙ্কর
তোমার ললাট দীপ্তি ওগো দিগম্বর !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বৃন্দাবন

দিল্লী হইতে ট্রেণ ছাড়িল। কামরায় অনেক লোক—সব পাগড়ীবাহী। বাঙ্গালী কেবল আমরা চারিজন। একধারে বেঞ্চে বসিয়া দুইজন পেশোয়ারী মাংস ভক্ষণ করিতেছে—বোধ হয় পবিত্র মাংস! এবং তাহাদের বুকঢাকা দাড়ী বহিয়া বনমধ্যগত স্রোতস্বতীর মত অনবরত ঝোলের স্রোতঃ গড়াইতেছে। আমাদের একজন সঙ্গী সামনের আসনে বসিয়া অবাক্ হইয়া তাহাদের "রাক্ষুসে" আহার দেখিতেছিলেন। মিয়া সাহেবেরা ঠাহরাইয়া বসিলেন "এ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত—; ক্ষুধাতুরকে আহার দেওয়া ধর্ম্ম-সঙ্গত।" এখন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গীর মুখে দাড়ী ছিল। অতএব স্বজাতি ঠিক করিয়া সাদরে মিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন "আইয়ে"।

সঙ্গী ছিলেন পরম হিন্দু; "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া কোঁচার আগা নাকে চাপিয়া ধরিয়া তিনি দশহাত তফাতে গিয়া বসিলেন।

আমিও মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। গাড়ী তখন ইন্দ্রপ্রস্থের শ্মশানের মধ্য দিয়া ছুটিয়াছে; শ্মশানই বটে—মহা শ্মশান! যে শ্মশানে সভ্যতার পরে সভ্যতা, পুরাতনের পরে নূতন, রাজ্যের পরে রাজ্য, সম্রাটের পরে সম্রাট পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! ঐ যমুনাস্তম্ভ—ঐ ভাঙ্গা প্রাসাদ—ঐ ধ্বংসধ্বস্ত প্রাচীন দুর্গ—এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক-স্তূপ, ছাদশূন্য স্তম্ভশ্রেণী, জনশূন্য রাজপথ! ধূ-ধূ-ধূ-ধূ—যে দিকে চাও—সব ধূ-ধূ-ধূ-ধূ করিতেছে—শুধু উপর দিয়া হু-হু করিয়া ধূলা উড়াইয়া ঝোড়ো হাওয়া রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে—যেন বলিতেছে,—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, কোথায় ভীষ্ম, কোথায় যুধিষ্ঠির, কোথায় দিলীপ, কোথায় পৃথ্বী—কোথায় কুন্তী, কোথায় গান্ধারী, কোথায় দ্রৌপদী, কোথায় সংযুক্তা? কে আছে? কে উত্তর দিবে? শ্মশানই বটে! এ দৃশ্যে তোমার চোখে কি জল আসে না? আমার ত' আসে।

মথুরায় নামিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বৃন্দাবনের দিকে চলিলাম। পথের দুধারে খোলা মাঠ—দূরে বন। আশে পাশে হরিণেরা খেলা করিতেছে। গাছের ডালে ময়ূর। মাঝে মাঝে ধনীদের বাগান বাড়ী।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন ৬ মাইল উত্তরে। জনসংখ্যা ২৫০০০ হাজারের কিছু কম বেশী হইবে। সহরটি ছোটখাটো। বাড়ীঘর প্রায় পাথরের। রাস্তাগুলি ধূলাভরা। এখানে ধূলাকে ধূলা বলিবার যো নাই। বলিয়াছ কি বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে ধমক খাইয়াছ। "পাষণ্ড! এ কি ধূলা—রজঃ রজঃ—চরণরজঃ!" তথাস্তু! কলিকাতার এক বৈষ্ণবকে জানি। তাঁদের কেহ ছানা খান না। তাহা হইলে জীবহিংসা হইবে। কারণ, ছানা মানে পাখীর ছানা, বিড়াল ছানা, কুকুর ছানা! অত্যুক্তি করিতেছি না—সত্য কথা।

বাঙ্গালার প্রিয় দেবতা নন্দদুলালের লীলা-নিকেতন বলিয়া এবং ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য দেবের স্মৃতিপূত বলিয়া, বৃন্দাবন, প্রতি

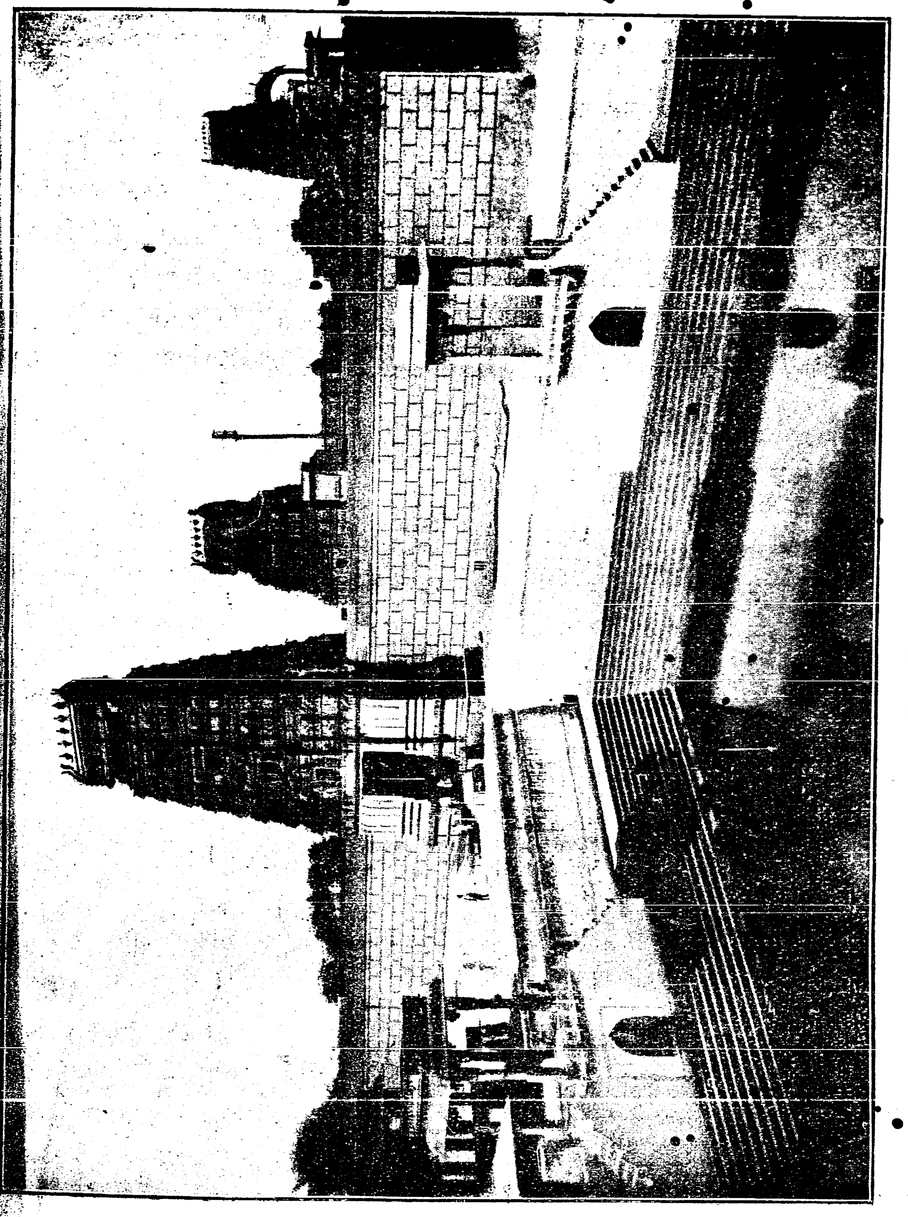

রঙ্গজীর মন্দির (শেঠের বাড়ী)

বঙ্গবাসীর হৃদয়কে প্রেমের বাঁধনে আকর্ষণ করে। তাই এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প নয়। এমন কি অনেক সময়ে মনে হয়, আমরা বুঝি বাঙ্গালার শ্যামল কোলেই বসিয়া আছি।

মন্দির এখানে পাড়ায় পাড়ায়—গুণিয়া ওঠা ভার। প্রাচীন ও প্রধান মন্দির চারিটি। গোবিন্দদেব, মদনমোহন, গোপীনাথ ও যুগলকিশোর। আধুনিক মন্দিরও অনেক আছে। যেমন, শেঠেদের মন্দির, মদনমোহনের নূতন মন্দির ও ছাতুবাবুর মন্দির প্রভৃতি।

শেঠেদের মন্দিরটি আজকাল খুব প্রসিদ্ধ। ইহা ১৮৪৫—৫১ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। অপর নাম, রণজীর মন্দির। নির্ম্মাণব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা।

মন্দিরের চারিপাশ খুব উঁচু করিয়া প্রাচীর দিয়া ঘেরা—সিংহদ্বারও বেশ জাঁকালো। ভিতরে প্রথমে বাঁধানো প্রাঙ্গণ—মূলমন্দিরের চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে। তারপর আবার প্রাচীর। এমনি তিনটি প্রাচীর। প্রধান দেবালয়ের সম্মুখে একটি বাঁধানো জলাশয়। তার বাম পার্শ্বে প্রবেশদ্বার। বাহিরের প্রাচীর ২১ ফুট উচ্চ। বাহিরের বেষ্টন কিঞ্চিদধিক ২৬১৮ ফুট। মন্দিরের নির্ম্মাতার নাম, শেঠ লক্ষ্মীচন্দ।

দ্বারের সামনে জুতা খুলিয়া ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেছি—এমন সময়ে দ্বারবান আসিয়া আক্রমণ করিল; বলিল, "পকেটে দেশলাই কি সিগারেট আছে? থাকিলে, বাহিরে রাখিয়া যান।"

পকেটে দেশলাই কি সিগারেট থাকিলে ঠাকুর যে অপবিত্র হইয়া যান, তা এই প্রথম শুনিলাম।

যা হোক,—ভিতরে ত ঢুকিয়া পড়া গেল। ঢুকিয়াই একটি উঠান—তাহার উপরে এক স্বর্ণমণ্ডিত সু-উচ্চ বরুণস্তম্ভ। লোকে ইহাকে "সোনার তালগাছ" বলে। প্রধান মন্দিরের সামনেই দালান—মর্ম্মরবিচিত্র। চারিদিকে চকমিলানো ঘর। ছাদতলে ভাল ভাল ঝাড় লণ্ঠন। আদত কথা, মন্দিরে বড়মানুষী আছে খুব। শিল্পীর নির্ম্মাণকৌশল দেখিলাম, সিংহদ্বারগুলিতে। মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য, সুগঠিত ও সুন্দর সিংহদ্বার।

হঠাৎ গোলমাল শুনিয়া দেখি, মন্দিরের দেবতা বাহকস্কন্ধে সিংহাসনে বসিয়া মন্দির পরিক্রমণ করিতেছেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে একজন বলিল "ঠাকুর হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন!" হায়! মূর্খ মানুষের হাতে পড়িয়া সর্ব্বভূতব্যাপী ভগবানের একি শোচনীয় পরিণাম! আমি পৌত্তলিকতার নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু পৌত্তলিকতারও যে গৌরব আছে, স্বেচ্ছাচার মানুষের খেয়ালে পড়িয়া তাহা যদি লুপ্ত হয়, তাহা হইলে দুঃখ না করিয়া উপায় নাই।

বৃন্দাবনের প্রধান দর্শনীয় গোবিন্দদেবের মন্দির।

প্রাচীন হিন্দুশিল্পীর হাতে তৈয়ারী এ শ্রেণীর এমন মন্দির, ভারতের আর কোথাও নাই। মন্দিরটি গ্রীক cross এর আকারে এবং রক্ত প্রস্তরবিরচিত। ইহার গঠন ও পরিমাপপ্রণালী এমন সুন্দর ও নিখুঁত যে, দর্শনমাত্র চিত্তহরণ করে। মিঃ ফার্গুসান, তাঁহার Indian Architectureএ বলিয়াছেন

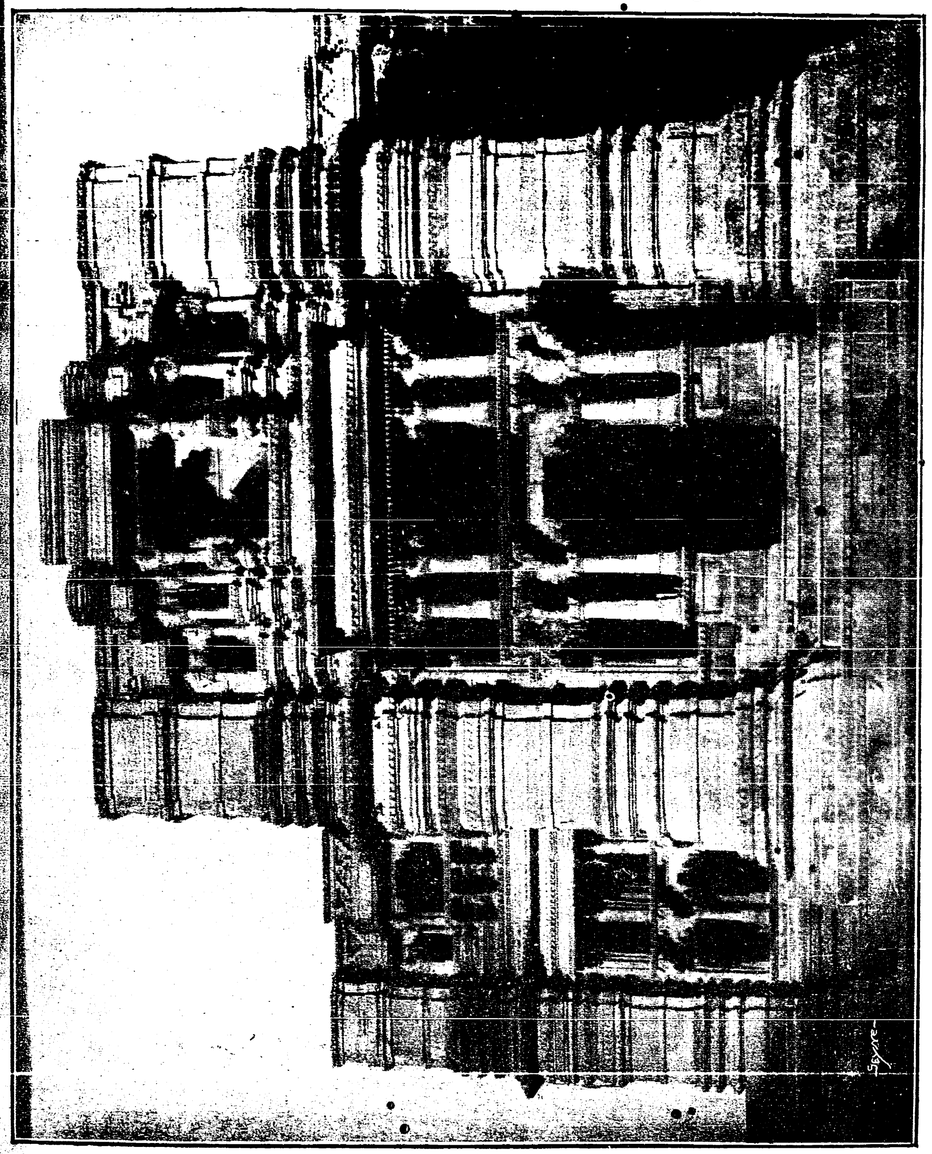

গোবিন্দ দেবের মন্দির

"ইহা ভারতের একটী প্রাণরঞ্জক মন্দির। এ দেশে এই একটী মাত্র সুচারু মন্দির দেখিলাম, যাহা হইতে আমাদের দেশের স্থপতিগণ কোন কোন সংকেত ধার করিতে পারে।"

মন্দিরটী দেখিলেই মনে হয়, ইহা অসম্পূর্ণ। শুনিলাম, আগে মন্দিরচূড়া এত উচ্চ ছিল যে, তাহার আলোক আগ্রার বাদশাহের প্রাসাদ হইতেও দেখা যাইত। আওরঙ্গজেব সেই আলোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন কোথা হইতে আলো আসিতেছে?" উত্তরে শুনিলেন, আলোক গোবিন্দদেবের মন্দিরের। আওরঙ্গজেব, ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "কি! আমার প্রাসাদে পৌত্তলিকের আলো আসে?" সিংহাসনে বসিয়া গোবিন্দজী প্রমাদ গণিলেন। এবং দুদিন পরে তাঁর মন্দিরের উচ্চতাগৌরব বিধর্ম্মীর হস্তে খর্ব্বীকৃত হইল। গল্পটি কতটা সত্য, তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য।

মন্দিরের দেওয়াল চওড়ায় দশ ফুট করিয়া। ভিতরের দৃশ্য বিলাতের সেণ্টপল ক্যাথাড্রেলের মত। ইহার চক্রমধ্য (nave) দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০০ ফুট। মন্দির, চতুর্বাহু—সকল দিক সূক্ষ্মাগ্র খিলান-করা ছাদ দিয়া আচ্ছাদিত। মধ্যস্থ গৃহের উপরি ভাগে একটী সুনির্ম্মিত ও সুদর্শন গম্বুজ।

মন্দিরের ভিতরে যাইবার জন্য তিনদিকেই দীর্ঘ সোপান শ্রেণী আছে। পশ্চিম দিকে, দুটি তাকের মাঝে একটী দ্বারপথ। দ্বারের উপরে সমচতুরস্র ক্ষেত্র। শিলারচিত চাঁদোয়ার উপরে নেত্রশোভন ভাস্করকরনৈপুণ্য আছে। এই দ্বারপথ দিয়া সঙ্গীতগৃহে (Choir) যাওয়া যায়। এ গৃহের পরিমাপ ২০ ফুট হইবে। সামনেই গর্ভগৃহ—ইহার দুপাশে দুটি ছোট ঘর—এ ঘরগুলিও ২০ ফুট করিয়া। উপরে খিলানকরা গম্বুজ।

এই মন্দিরের পরিকল্পনা দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে পাঁচটি Tower ছিল। একটী মধ্যস্থ গম্বুজের উপরে এবং অপর চারিটি যথাক্রমে সঙ্গীতগৃহ, গর্ভ-গৃহ এবং পার্শ্বস্থ ভজনাগৃহ দুটির উপরে।

মন্দির-গাত্রে চারিদিকেই হিন্দুশিল্পসুলভ ব্রাকেট। এখানকার সুডৌল ও সুশ্রী ব্রাকেট গুলি যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। আমাদের ধনী বাঙ্গালীরা যদি তাঁহাদের প্রাসাদোপম সৌধনির্ম্মাণকালে যথাস্থানে এমনি দুচারিটি ব্রাকেট বসাইয়া দেন, তাহা হইলে সে সকল অট্টালিকার শোভা যে খুবই চমৎকার হইবে, তা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমি পশ্চিম ভারতের বড় বড় সহরে দেখিয়াছি—সেখানকার নেহাৎ সাদাসিধা বাড়ীগুলিতেও এই ধরণের ব্রাকেট দেওয়া হইয়াছে। ফলে, সেগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গোবিন্দদেবের মন্দির এখন বড়ই অযত্নে আছে। সকলে ঠাকুর আর পয়সা লইয়া এত ব্যস্ত যে, বাড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিবার সময় পায় না। এদিকে ধূপ-ধূনা দিয়া দেবতার দিল্‌খোষ করা হইতেছে, ওদিকে চামচিকা ও বাদুড়েরা যে চব্বিশ ঘণ্টাই গৃহতলে অনধিকার-প্রবেশপূর্ব্বক মলমূত্রাদির দুর্গন্ধে—ঠাকুর ত দূরের কথা—মানুষকেই বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে—সেদিকে কাহারও চোখ নাই!

মাঝে হইয়াছিল কি,—এক ব্যক্তি



মদনমোহনজীর মন্দির

উৎসবের জন্য মনের মতন ঠাঁই না পাইয়া, এই মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং আপনার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিবার ও উৎসবটীকে জম্‌কালো করিয়া তুলিবার জন্য, আচ্ছা করিয়া কলিচুণের প্রলেপ দিয়া এখানকার প্রাচীন রক্তপ্রস্তরের স্বাভাবিক সুষমা ঢাকিয়া দিয়াছিল। তার কাজে কেহই বাধা দেয় নাই! একটী গল্প মনে পড়িতেছে। কলিকাতার কোন ধনী মাড়োয়ারীর নবনির্ম্মিত বৈঠকখানার দেওয়ালে এক বিখ্যাত শিল্পী বসিয়া বসিয়া শিল্পসঙ্গত লতাপাতা অঙ্কন করে। কাজ শেষ হইলে গৃহকর্ত্তা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হাঁ—সব ঠিক হয়েছে—কেবল একটী চিজ্ ছাড়া।" "কি হুজুর?" গৃহকর্ত্তা বলিলেন "হনুমানজী। ঐ লতাপাতার মাঝখানে তুমি হনুমানজীকে এঁকে দাও নি কেন?"

মন্দিরে, সেবায়েৎগণের অত্যাচার বিষম। তারা চাঁদার খাতা খুলিয়া বসিয়া আছে—পয়সা না দিলে প্রবেশ নিষেধ।

লজ্জার কথা! দূর হইতে গোবিন্দদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলাম "আমার প্রাণের কথা তুমি জান প্রভু! আমি ভাবের ঘরে চুরি করিতেছি না; যদি তুমি যথার্থ ভক্ততারণ হও, তবে হে ঠাকুর! হে ব্রজদুলাল! আমার মানসপূজা গ্রহণ কর।" আমি জানি, পয়সা দিই নাই বলিয়া প্রেমের দেবতা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া যান নাই।

তারপর, মদনমোহনের প্রাচীন মন্দির। চক্রমধ্য ৫৭ ফুট। পশ্চিমদিকে সঙ্গীত-গৃহ—সমচতুরস্র—পরিমাপ, ২০ ফুট। সামনের দেবালয়ের পরিমাপও ঐ। পূর্ব্বদিকে দ্বারপথ। মন্দিরের উচ্চতা বড় জোর ২১ ফুট হইবে। ইহার খিলানকরা ছাদ আজ কালমহিমায় বিগত। সঙ্গীতগৃহেরও ঐ দশা। গর্ভগৃহগাত্রে একটী বক্ররেখাবিশিষ্ট সাদাসিধে অষ্টকৌণিক ক্ষেত্রের ক্রমসূক্ষ্ম বহিঃরেখা (Out line) চূড়ার দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ডানদিকে আর একটী ঘর—তাহার শিল্পসৌভাগ্যের অভাব নাই। ইহার বহিঃভিত্তির সর্ব্বস্থলেই সালঙ্কৃত প্যানেল।

প্রকৃত মদনমোহন বিগ্রহ এখন কারাউলিতে। রাজা গোপাল সিংহ (১৭২৫—১৭৫৭) একটী নূতন দেবাগারও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বুড়নিবাসী নন্দকুমার মদনমোহনের বিদ্যমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (১৮২১ খৃঃ অব্দ), গোপীনাথের মন্দিরে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। ইহার পরিমাপ ও আকৃতি মদনমোহনেরই মত। ইহাও ধ্বংসদশাগ্রস্ত। নির্ম্মাণাব্দ ১৫৪০।

কেশীঘাটের নিকটে যুগলকিশোরের মন্দির। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। জাহাঙ্গীর তখন ভারত সম্রাট। উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

ব্রহ্মকুণ্ড ও গোবিন্দকুণ্ড সকল তীর্থযাত্রীই দর্শন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এই কুণ্ডদ্বয় পবিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ।

যমুনার পথে যাইতে আর একটী মন্দির দেখিলাম।

নীচের দেওয়ালে এবং উপরের বারান্দায় চমৎকার কারুকার্য্য—চোখ যেন জুড়াইয়া যায়। উপরের বারান্দায় থামের যায়গায়

কতগুলি পাষাণরচিত রমণী মূর্ত্তি—তনুকটি, উচ্চউরসা, ভূষণসুষমা! কেহ বাহুলতাদুটি ভঙ্গীভরে লীলায়িত করিয়া, চরণে চরণ দিয়া, কেহ বাদ্যবাদননিযুক্তা হইয়া এবং কেহ বা পীবরবক্ষপার্শ্বে সুকুমার শিশু লইয়া দাঁড়াইয়া। ছাদভার তাহাদের শিরঃপরে সমর্পিত। মূর্ত্তিগুলি শিল্পীর হাতে সুপরিকল্পিত সুগঠন না পাইলেও, নয়নরঞ্জক বটে। বারান্দার শিলাপ্রাচীর এবং ত্রিতলস্থ নহবৎখানায়, সুবিচিত্র জালিকাটা সূক্ষ্ম কার্য্য,—অতি শ্রীধর, অতি সুকুমার এবং পদ্মবৎ পেলব। মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে ও দুপাশেও পাথর ভেদিয়া লতাপাতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন মাল্যচ্যুত এক রাশি মুক্তা কে এখানে ছড়াইয়া দিয়াছে! এই মন্দিরের নাম, শাহজাহাপুরের মন্দির। নির্ম্মাতা, লালা ব্রজকিশোর ক্ষত্রী। নির্ম্মাণাব্দ,—১৮৭০।

নিম্নতলের যে কারুকার্য্যের কথা আগে বলিয়াছি, তাহার দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব। সেই কারুকার্য্য বেমালুম ঢাকিয়া, ময়লা করিয়া ব্যাপারীরা নোংরা দোকান সাজাইয়াছে—অধিকাংশ কাজ দেখিবার যো নাই;—ঠিক যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা—পাঁকের ভিতরে গোলাপের তোড়া! দু' এক টাকা ভাড়ার লোভে যাদ মন্দিরের বর্ত্তমান অধিকারী এমন কাজ করিয়া থাকেন, তবে তিনি মন্দিরনির্ম্মাতা পূর্ব্বপুরুষের অভিশাপভাগী ত হইবেনই; পরন্তু, তাঁহার আরাধ্য রাধাবল্লভজীও তাঁকে ক্ষমা করিবেন না। আর বাস্তবিক, শিল্পের যুগ চলিয়া গিয়াছে—সৌন্দর্য্যের জন্য সে ব্যগ্র আগ্রহ আর নাই—পয়সার জন্য যত! পয়সা আর পয়সা আর পয়সা! তাজমহলের মত করিয়া দুনিয়ার কে আর কঠিন পাষাণে কোমল কবিতা লিখিবে? কেহ না—কেহ না!

যমুনার ধারে একটা বাঁধানো ছোট গাছ দেখিলাম—তার ডালে ডালে কতকগুলা ন্যাকড়া জড়ানো। সামনেই ঘাট। নাম, 'বস্ত্রহরণ ঘাট।' কুৎসিত (তা ভিন্ন আর কি বলিব?) কবিকল্পনাকে বাস্তব আকার দিয়া, মূর্খ ঠকাইয়া পাণ্ডারা বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে। হা কৃষ্ণ! মানুষ তোমার কৃষ্ণ ললাটে কি কলঙ্কের কালি দিতে বাকি রাখিয়াছে? তোমার ক্রোধ কি ঝটিকারূপে আসিয়া এ তুচ্ছ তরু সমূলে উপাড়িয়া ফেলিতে পারে না?

যমুনার ধার এখানে প্রায় আগাগোড়া বাঁধানো। এত দীর্ঘ ঘাটের শ্রেণী ভারতে বোধ হয় আর কোথাও নাই। অনেক ঘাটের ভগ্নদশা—দেখিলেই বোঝা যায়, সেগুলি অনেককালের পুরাতন।

যমুনাও দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার জলশূন্য গর্ভ ভরিয়া বড় বড় গাছ জন্মিয়াছে—দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত ধূ ধূ প্রান্তর। কিন্তু যমুনা বৃন্দাবনকে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই—একদিকে এখনও সে প্রাচীন স্মৃতির তটে আসিয়া পুলকে উছলিয়া পড়িতেছে।

তখন চাঁদ উঠিয়াছে—সারা আকাশ ঝল্‌মলে। যমুনার কালো জলে আলো জ্বালিয়া ঢেউয়ের তালে তালে জ্যোৎস্না নাচিতেছে। ঘাটের উপরে বসিয়া কতকালের কথা মনে জাগিল! সেই কৃষ্ণ—সেই রাধা—সেই বাঁশী—যে বাঁশীতে যমুনায় উজান বহিত! সেযে কত

কথা! আমার এ বোবার স্বপ্ন কি করিয়া প্রকাশ করি বল! বাঙ্গলার কত কবিকে অমর করিয়াছে এই বাঁশী, আর ঐ যমুনা! সে বাঁশী আর নাই, সে যমুনা আর আছে কি?

কিন্তু সত্যই বাঁশী বাজিতেছিল—দূরে দূরে—বহু দূরে! বাতাস তার মৃদু সুরটিকে ভাসাইয়া আনিতেছিল।

"বাজিছে শ্যামের বাঁশী, আবার আবার লো!
চললো রূপসী!
তুলে রাখ্ ব্রজবালা, তোর এ ফুলের ডালা,
রতন-আরসী!
বাঁশী কি বাজিছে হায়? বহিছে মলয়া বায়,
হিল্লোলিয়া কেঁপে উঠে এ হিয়া-সরসী।"

মুরলীগুঞ্জনে কবির গান স্মরণে আনিল।

ফিরিবার পথে, বৃন্দাবনের বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। বাজারে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। তবে খাবারের দোকানে দুধ-ঘি'র জিনিস বেশ শস্তা। দুধের নামে পুকুরের জল খাইয়া অথচ দ্বিগুণ অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতার বাবুরা যখন এখানে আসেন, তখন আশ্চর্য্য হইয়া যান। আমার এক বন্ধু বৃন্দাবনের খাবারের কথা পাড়িলে, আকাশের দিকে তাকাইয়া ফোঁশ্ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন। এবং দীর্ঘশ্বাসটা অবিলম্বে যখন হ্রস্ব হইয়া আসিত, তখন হতাশভাবে গল্প শুনাইতেন, প্রাণ ভর্ত্তি ও উদর 'পূর্ত্তি' করিয়া 'বৃন্দাবনী' রাবড়ী খাইয়া তাঁর কি ভয়ানক পেটের ব্যামো হইয়াছিল! গল্পের উপসংহার—"হোক্ ব্যামো! যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব—সেকি যেমন-তেমন রাব্ড়ী? চারটি গণ্ডায় একটী সের! ওরে বাস্রে! ভাব্লে আর জ্ঞান থাকে না"—ইত্যাদি।

পথে আরও দেখিলাম, জানুচুম্বিত ডাগর ভুঁড়ি নাচাইয়া, খোলকরতাল বাজাইয়া চির-পরিচিত হৃষ্টপুষ্ট বৈষ্ণব বাবাজীরা গান ধরিয়াছেন

"আমার গৌর নাচে—
নদীয়ার মাঝে আমার গৌর নাচে—"

সে গানে ভক্তিরস আদৌ নাই। বীভৎসরস যথেষ্ট। পাশেই গৌরের নৃত্য-কাহিনীর প্রতি কিছুমাত্র মনঃসংযোগ না করিয়া এক বিধবা বাঙ্গালিনী, একটী পশ্চিমা রমণীর সঙ্গে আকাশভেদী সাধা গলায় ঝগ্ড়া বাধাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবনের মশা এক উল্লেখযোগ্য জীব। রাত্রে বিছানা হইতে টানিয়া শূন্যমার্গে উড়াইয়া লইয়া যাইবার যোগাড় আর কি! সর্ব্বাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। নাসিকাটি দম্ আটকাইবার ভয়ে খোলা ছিল। সকালে উঠিয়া আরসি লইয়া দেখি—বাপ্! নাকের ডগা বিষম ফুলিয়া ফুট্বলের একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়াছে।

সেদিন শাহজীর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বেশ বাড়ী। টাকা খরচও তেমনি হইয়াছে। আগাগোড়া মর্ম্মরমণ্ডিত। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এবং নির্ম্মাণচাতুর্য্য দেখিলাম, বারান্দার স্তম্ভশ্রেণীতে। খুব বড় বড় আস্ত মার্ব্বেল পাথর ইস্ক্রুর প্যাঁচের মত করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটিয়া এই বহুব্যয়সম্ভব স্তম্ভগুলি তৈয়ারি হইয়াছে—দেখিলে দৃষ্টি আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। আর একটী নূতনত্ব, দেওয়ালের ছবিতে। সাদা পাথরের জমিতে নানা স্বাভাবিক রংয়ের ছোট ছোট পাথরের টুক্রা বসাইয়া এই ছবির মূর্ত্তিগুলি ফুটাইয়া

তোলা হইয়াছে। আগ্রার তাজের গায়ে যেরূপ কৌশলে পাথরের চমৎকার ফল ও পাতা বসানো আছে—সেইরূপ। প্রভেদ এই, তাজমহলে সুধু পুষ্প-পরিকল্পনা আর এখানে মানব মূর্ত্তির রচনা।

এই বাড়ীতে প্রস্তর মূর্ত্তিও আছে—কিন্তু সেগুলি শিল্পের অবমাননা মাত্র; তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী।

শাহজীর গৃহদেবতার সমুখে বসিয়া এক বৃদ্ধ গায়ক সেতার বাজাইয়া গান গায়িতেছিলেন—বৃদ্ধ-কণ্ঠে তেমন সুর সহজে শোনা যায় না। গায়ক ভৈরবীতে রাধিকার ঘুম ভাঙ্গাইতেছিলেন। "ওগো রাধা!—ওগো প্যারী! বেলা হ'ল—রোদ উঠিল, তোমার পথপানে চাহিয়া যমুনা যে বিয়াকুল! উঠ, রাজনন্দিনী! জাগ! জাগ!—জল্কে চল!" গানের এমনি ভাব। এবং রাগিনীর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়,—প্রক্ষেপে, বিক্ষেপে,—অনুলোমে, বিলোমে,—তানে লয়ে গায়কের ভক্তিসরস প্রার্থনা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

যমুনায় স্নান করিতে গেলাম। কিন্তু জলে—ঘাটের তলাতেই হাজার হাজার কূর্ম্মাবতার,—পা বাড়াইতেই ভরসা হয় না। জলে যেমন কচ্ছপ—ডাঙ্গায় তেমনি বানর!

আসিবার সময়ে ঘাটের পাশে একটী গাছ দেখিলাম। তার ডালে একটী পাখী বসিয়া আছে। আমি কাছে গেলাম। সে নড়িল না উড়িল না। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আরও কাছে গেলাম! আপনার নরম ছোট বুকে চঞ্চুস্থাপন করিয়া সে তেমনি ভাবে ঠায় বসিয়া রহিল। ভাবিলাম, পাখীটি বুঝি অন্ধ। তার পরেই গাছের তলায় দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, সেখানে আর একটী পাখী, দুই ডানা বিস্তার করিয়া, মরিয়া, পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, জীবিত পাখীটির প্রণয়ী কিংবা প্রণয়িনী। তখন তার স্থিরতার—উদাসীনতার কারণ বুঝিলাম। আর একবার তার দিকে চাহিলাম। আধ্-মোদা চোখে, মৌন ভাষায় সে যেন আমাকে বলিল "মারিবে? আমায় মারিয়া ফেল না! এ শূন্য জীবনে কাজ কি?" হা রে অজ্ঞান জীব! আমার চোখ ভরিয়া জল আসিল। তার পবিত্র শোকে বাধা দিলাম না; আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমাররায়।

বাগ্দত্তা *

গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত সার

[উমাকান্ত সার্ব্বভৌম সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভক্তিনাথ পিতৃপদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন; কনিষ্ঠ শচীকান্ত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া স্বতন্ত্রমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক। ইহা ভিন্ন সে কবি, এবং আধুনিক অনেকেরই মত আস্তিক্যবুদ্ধিহীন। চাকদহগ্রামের শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মনীশ শচীকান্তের আবাল্যবন্ধু। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে শচী আসিয়া জানাইল তাহাদের মেসের অল্পদূরে

* শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর প্রস্তাব মত গত বৎসরে প্রকাশিত বাগ্দত্তার এইরূপ সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল।

নিখিলনাথ নামে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পরমাসুন্দরী ভগিনী দান করিতে চাহেন। নিখিলনাথ রাঢ়ীশ্রেণী শচীকান্ত বারেন্দ্র, মনীশ ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে শচী হাসিয়া বলিল, সে এ বিবাহ দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে চাহে। মনীশ ধর্ম্মভীরু, গুরুজনবৎসল, সে বলিল প্রতারণাদ্বারা স্থায়ী ভাল কাজ হওয়া সম্ভব নয়, একথা পিতাকে জানাও। শচী রাজি হয় না,—সে পিতার প্রতি উপযুক্ত ভক্তি-প্রীতিসম্পন্ন ছিল না ভয়ের চক্ষেই কেবল তাঁহাকে দেখিত। কিন্তু কন্যা দেখিবার কালে সহসা এই গুপ্ত বিষয়টি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন নিখিলনাথ বলেন, যদি শচীকান্তের পিতা এ বিবাহে সম্মতি দান করেন তবেই তিনি তাহাকে ভগিনী দান করিবেন। শচী বাড়ী ফিরিয়া মনীশের সাহায্যে পিতার নিকট হইতে রাঢ়ীবারেন্দ্রবিবাহের অনুমতি পত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতায় গিয়া শুনিল, কয়দিন পূর্ব্বেই আকস্মিক বসন্ত রোগে নিখিলনাথের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা ও ভগিনী কমল একজন আগন্তুক বৃদ্ধের সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহই জানে না। সেই অবধি সে তাহার সন্ধান পায় নাই কিন্তু নিজেকে সে তাহার সহিত বাক্‌দত্ত বলিয়া মনে করিয়া রাখিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার বিধবা মাসী একা থাকিতে না পারিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হইতে বোনপোটিকে নিজের কাছে আনিতে চাহিলেন। মাসী বড় লোক, জমাজমি ও টাকাকড়ি অনেক আছে, একমাত্র কন্যা কল্যাণী ধনীগৃহের একটিমাত্র বধূ, তাই শ্বশুর শ্বাশুড়ি তাহাকে পিত্রালয়ে সর্ব্বদা পাঠাইতে অনিচ্ছুক। মাসী গিরিজাসুন্দরীর আর একটী অভিপ্রায় ছিল তাঁহার স্বামীর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী পিতৃমাতৃহীনা দেবরকন্যার সহিত শচীকান্তের বিবাহ দেওয়া।

মনীশ স্বধর্ম্মে দৃঢ় নিষ্ঠাবান ও স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সে সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া খুল্লতাতের অনুমতি গ্রহণান্তর শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত উমাকান্তের নিকট সংস্কৃত দর্শনাদি শিক্ষা ও কনিষ্ঠ চপলমতি অনাবিষ্টচিত্ত সত্যেন্দ্রের অধ্যাপনা করিতে লাগিল। এই সঙ্গে দেশের দরিদ্র সন্তানগণকে শিক্ষা দানব্রতও সে গ্রহণ করিয়াছিল। সত্যেন্দ্রের জননী মনীশের খুড়িমা করুণাময়ী পুত্রকে মনীশের হস্তে দিয়াই নিশ্চিন্ত। মনীশও প্রাণপণে এ বিশ্বাস রক্ষায় সচেষ্ট। কিন্তু সত্যর পড়াশুনায় মন নাই। সে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অতি চঞ্চলা মাতৃহীনা পিতৃত্যক্তা দৌহিত্রী গৌরীর সহিত মাছ ধরিয়া ও ঘুড়ি উড়াইয়াই সময় কাটায়। এই সময়ে শচীকান্তের মাতা গঙ্গামণির আসন্নকাল আগত বুঝিয়া তাঁহাকে কাশীধামে আনয়ন করা হইল। শিবনারায়ণও সস্ত্রীক দীক্ষাগুরু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। এই সময় একদিন অসিঘাটের নিকটে কমলা ও তাহার পিতামহীর সহিত করুণাময়ীর সাক্ষাৎ ঘটে, তিনি অনাথাদের প্রতি বিশেষ দয়াপরবশ হইয়া পরদিন আবার তাহাদের সন্ধান লইতে যান। ক্রমে জানা যায় কমলা তাঁহার বাল্যসখী নারায়ণীর কন্যা; উভয়ের পিত্রালয়ই ত্রিবেণীতে। করুণাময়ী উভয়কে গৃহে লইয়া আসেন। ক্রমশ আশ্রিতা কমলার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া শিবনারায়ণ ও করুণাময়ী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণান্তে তাহাকে মনীশের ভাবীবধূ রূপে অঙ্গীকার করিলেন, শোকতাপজীর্ণ কমলার পিতামহী এই শুভ সংবাদ লাভের অল্পদিন পরেই পরলোক গমন করিলেন। মণিকর্ণিকায় তাঁহার দেহ নীত হইলে শেষ মুহূর্ত্তে বিশ্বনাথ জাহ্নবী ও সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সাক্ষী রাখিয়া তিনি মনীশের হস্তে কমলার হস্ত প্রদান করিলেন। মনীশও গ্রহণ করিলাম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইল।

শিবনারায়ণ সপরিবারে দেশে ফিরিলে এত বড় অনূঢ়া কন্যা দেখিয়া গ্রামের লোকে বিস্মিত হইল। বিবাহের পূর্ব্বে বরকনে একসঙ্গে বাস করা লইয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। মনীশ একথা শুনিতে পাইয়া সত্যকে সঙ্গে লইয়া তাহার পড়ার অছিলায় কলিকাতা চলিয়া গেল।

গৌরী বড় হইয়াছে এই বলিয়া তাহার বড়মামী স্বামীর প্রতি ঝঙ্কার ঝাড়িতেছিলেন, ভক্তিনাথ একদিন

বাহির হইয়া পড়িয়া বরের সন্ধান করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বর গ্রামান্তরের; নবন্যায় পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে, পিতার চতুষ্পাঠী আছে, অবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু গৌরীর মাসী ও পালয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর এ সম্বন্ধ ঠিক মনঃপূতঃ হইল না। তিনি মুখে কিছু না বলিলেও গোপনে রোদন করিয়া মনের ব্যথা প্রশমিত করিতেন। সহসা একদিন পথের মধ্যে অতর্কিতভাবে অপরিচিত পিতাপুত্রীতে সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। পিতা ডাক্তার নন্দকিশোর দৈববিড়ম্বনায় নিজ সন্তানের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া এযাবৎ নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিদেশেই সুখহীন নির্ব্বান্ধব জীবন কাটিয়াছে এখন পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিয়াছেন। বলাবাহুল্য এ বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল, কন্যাকে লইয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু গৌরী চির পরিচিতগণকে ছাড়িয়া সহসা চির অপরিচিতকে আপন করিতে পারিল না। পিতার অসীম স্নেহসমুদ্রের পরিমাপ করিবার মত বুদ্ধিশুদ্ধিও তাহার ছিল না।

এদিকে গিরিজাসুন্দরীর দেবরকন্যা বাসন্তীর সহিত শচীকান্তের বিবাহের কথা পাকা করিবার জন্য কন্যার মাতামহ গৃহে আসিলেন, সে কথা কল্যাণীর মুখে শুনিয়া শচীকান্ত বলিয়া বসিল সে বাসন্তীকে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না। মাসীমা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিরস্কার করিলেন কিন্তু সে অটল হইয়া রহিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল বহুদিন হইতেই সে অন্যত্র বাক্‌দত্ত। ইহা শুনিয়া খাঁটি মানুষ গিরিজাসুন্দরী পিছাইয়া গেলেন। বলিলেন তা'হলে সে বাক্‌দান রক্ষা করিতে হইবে বৈ কি। বাসন্তীর মাতামহকে ছলে বিদায় দিলেন। শচী বুঝিল সে যখন বাসন্তীকে ত্যাগ করিল তখন এখানকার আশ্রয় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় সে কলিকাতায় আসিল এবং ফিরতিমুখে প্লাটফরমে সহসা বন্ধু মনীশের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার অনুরোধে গৃহে আসিতে বাধ্য হইল। ট্রেণে মনীশ তাহাকে নিজের বাক্‌দানের কথা জানাইল। শচী প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে মনীশের বাগ্‌দত্তার নামও কমলা। বাড়ী আসিয়া কমলাকে সহসা দেখিয়া তাহার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। মনীশের কমলাই যে তাহারি কমলা ইহা সে বুঝিল।]

(২৬)

পরদিন যখন নন্দকিশোরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চোখ চাহিয়া প্রথমেই তাঁহার বিছানার নিকটে অপর শয্যার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। গৌরী তখনও ঘুমাইতেছে। হেমন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তপনের দুএকটি রশ্মি সার্সির কাচের উপর পড়িয়া নাচিতেছে, গৃহের মাঝখানে গৌরীর ঘুমন্তমুখ স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মত মোহবিস্তার করিতেছিল। নন্দকিশোর নিঃশব্দে উঠিয়া বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে বোধহয় নিশ্বাসও লইতেছিলেন না।

একটি উড়ন্ত পক্ষী বাতাসে ডানা মেলিয়া নদী পার হইতে হইতে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল, সেই শব্দে চমকিয়া বালিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল। যেন সেই মুদ্রিত নেত্রের ছায়াতলে বিশ্বের সমুদয় পুঞ্জীভূত আলোক এতদিন ঘুমাইয়াছিল, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহিত রাত্রি শেষে তপনোদয়ের মত এখনি তাহা পুলকের স্পন্দনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। কি একটা অননুভূত আবেগে তাঁহার বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল। গৌরী তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই সে ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া আপনা আপনি কহিয়া উঠিল "মাসিমা ডেকে দেয়নি এতবেলা হয়ে গ্যাছে, এক্ষুণি বড় মামী বকবেন, কখন ফুল তুলব ঝাঁটপাটই বা দেব কখন! সহসা নন্দকিশোরের সহাস্য মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্থির হইয়া বসিল "ও হরি! সব ভুলে গেছলুম!" নন্দকিশোর তাহার মুখের ব্যস্তভাব সহসা অবসাদে পরিবর্ত্তিত প্রায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি অন্যকথা পাড়িলেন "তুমি পড়তে জানো?" গৌরী মুখ না তুলিয়া ঘাড় নাড়িল "জানি"।

"কি পড়ো ?" "দ্বিতীয় ভাগ"।

"তুমি ফুল ভালবাস ?" এবার নত মুখ একটুখানি উঁচু হইল—"বাসি"।

"আমার বাড়ী অনেক ফুল গাছ আছে।"

"তোমার বাড়ী খুব বড় ?"

"খুব বড়, তাতে সন্ধ্যাবেলা কল টিপ্‌লেই আলো জ্বলে উঠে, তাকে গ্যাসের আলো বলে। কল খুললে বৃষ্টির জলের মত জল পড়ে তাকে বলে জলের কল।"

গৌরীর ভগ্নমনে ক্রমে একটু উৎসাহ জন্মিতেছিল, "সেখানে তাহলে নদী নেই ?" "আছে, সে অনেক দূরে, সেখানে আমরা বিকালে ব্যাড়াতে যাবো, সেখানে গঙ্গা অনেক বড় বড় জাহাজ ষ্টীমার, নৌকায় ভর্ত্তি থাকে, তীরে কত আলো জ্বলে।"

এবার কৌতূহলের জয় হইল। "কলকাতাটা চাকদার চাইতে অনেক বড় ?" তারপর পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অধিক স্থলেই প্রৌঢ় শ্রোতা ও বালিকা বক্তা। কোথাও বা তিনি উত্তরদাতা ও গৌরী প্রশ্নকারিণী, সে প্রশ্নের সীমা ছিল না, সকল প্রশ্ন উত্তরেরও অপেক্ষা করিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে অপরিচিত পিতাপুত্রীতে অনেক খানি কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন।

নন্দকিশোর তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আজ সম্পূর্ণ নূতনতর আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন! চিরশুষ্ক শীর্ণ নদীতে অকস্মাৎ পাষাণ বক্ষবিদারী তীব্র জলস্রোত ছুটিয়া আসিতে থাকিলে তাহা যেমন নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠে তেমনি করিয়া তাঁহার এই নবভাবের বন্যা তাঁহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মাতৃ-হৃদয়ের গভীর উন্মাদনাপূর্ণ স্নেহে তাঁহার সারাচিত্ত ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে, অথচ এই অনাস্বাদিত সুখ কাঙ্গালের মত তাঁহাকে সঙ্কোচে পীড়িত করিতেও ছাড়িতেছিল না, ব্যাকুল আগ্রহ স্নেহপাত্রীকে বুকে টানিয়া লইতে মুহুর্মুহু বাহু প্রসারিত করিয়া ছুটিতে চাহিতেছিল, কিন্তু দারুণ সন্দেহ মনকে টানিয়া রাখিতেছে। প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে যে অবলম্বনটি মিলিল সে শিশু প্রকৃতি তথাপি শিশু নহে। তাহাকে বাহুতে দোলাইয়া বুকে চাপিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া রাখা যায় না। এদিকে দুরন্ত ক্ষুধা যেন সর্ব্বগ্রাসী ভাবে জাগিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ-জাগ্রত কুম্ভ-কর্ণের মত চিরদিনের পাওনা খোরাক দাবী করিতেছিল।

নন্দকিশোর ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এমন করিয়া কাহাকেও ভালবাসিবার অবসর লাভ করেন নাই। মধ্যের এই দ্বাদশ বর্ষাধিককাল হৃদয়ের বৃত্তিগুলা অনাহারেই একরূপ জীর্ণ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নন্দকিশোর একমাত্র পত্নী কাদম্বিনীকেই তাঁহার সমুদয় হৃদয় ভাণ্ডারের অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই বা কতদিন! কঠোর অধ্যয়ন কালে বালিকাপত্নীর সহিত ভাল করিয়া দেখা শুনারই অবসর ঘটিয়া উঠে না; শেষ বৎসরের স্মৃতিটুকুই তাঁহার পক্ষে একমাত্র সুখের স্বপ্ন ও জীবনের অবলম্বন, কিন্তু তাহাই বা কতটুকু?

গৌরীও তাহার অজ্ঞাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। প্রথমকার গভীর দুঃখপূর্ণ বিদ্রোহের ভাবটা মন হইতে অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছিল। পিতার প্রতি সূক্ষ্ম

অভিমান নিজে স্পষ্ট না বুঝিলেও মনের মধ্য অনেকখানি স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, সেখানে একটা সহানুভূতির ক্ষীণছায়া ক্রমেই জলে পতিত তৈলবিন্দুর মত বিস্তৃত হইতেছিল। মাসিমা ও সত্যদাদা এই দুইটি প্রাণী ব্যতীত তৃতীয় আর একব্যক্তি তাহার হৃদয় মধ্যে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল, সে কমলা। কিন্তু তাহার অপেক্ষা যেন সেই ধীরভাষী, সজলনেত্র বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি তাহার পিতা, তাঁহার আসন আর একটু বিস্তৃত করিতেছিলেন। প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় বিচ্ছেদের বেদনায় বাধা প্রাপ্ত না হইলে হয়ত আরও পূর্ব্বে সে ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারিত। নন্দকিশোর নৌকা যাত্রা দীর্ঘ করিয়া দিলেন, খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে বৃহৎ তরণী মৃদুমন্দ গতিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কিছু দূর আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটা জায়গায় নোঙ্গর ফেলে। পিতাপুত্রী নৌকা হইতে নামিয়া তীরে তীরে কিছুদূর ঘুরিয়া আসেন, গৌরীর মনে তখন কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকে না। বনের ফল ছিঁড়িয়া ফুল তুলিয়া হাজার হাজার প্রশ্নবর্ষণ করিয়া সে যখন নির্জ্জন বনে বনচারিণী পরী বালিকার মত হাসির লহর তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নন্দকিশোরের সারাচিত্ত তখন সেই আনন্দের তালে তালে নাচিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে আনন্দাতিশয্যে তিনি গভীর চিন্তামগ্নের মত স্তব্ধ হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, গভীর বেদনার মতই অধিক সুখ যেন বক্ষে বহিতে পারা যায় না।

এমনই করিয়া জলযাত্রা ফুরাইয়া আসিল। একদিন শেষ বেলায় প্রকাণ্ড মাস্তুলওয়ালা কত জাহাজ ষ্টীমার নৌকা ও তীরের পিপীলিকা শ্রেণীবৎ ব্যতিব্যস্ত লোকজন সমেত একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য চোখে পড়িয়া মুগ্ধা গৌরীকে যেন স্তম্ভিত করিয়া দিল। জানালার নিকটেই দ্বিতীয় বেঞ্চাসনে অর্দ্ধ শয়ান নন্দকিশোর নীরবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া আছেন, সে বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কি হয়েচে বাবা ?"

এই প্রথম সে তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, পিতা যে আনন্দে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন. তাঁহার জীবন সার্থক ও বাঁচিয়া থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল, ভবিষ্যৎ অতীতের সহিত তুলনায় অকস্মাৎ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কহিলেন 'ওই কল্‌কাতা 'ও—ই খানে আমরা থাক্‌ব ?"

গৌরীর দুইনেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে আর কিছুই বলিল না। দুই ধারের উজ্জ্বল দীপমালা অকস্মাৎ গৌরীর চোক ধাঁধিয়া দিল, সুন্দর অশ্বযানে পিতার পাশে বসিয়া সে নীরব নিস্পন্দভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সারি সারি দোকানে, কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। অশন, বসন, ক্রীড়নক, পুস্তক কত আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় রাশি রাশি পরিচিত অপরিচিত দ্রব্য সম্ভার একসঙ্গে জমা করা। গাড়ি ঘোড়া লোকজন অস্বাভাবিক রূপসম্পন্ন নূতন ধরণের স্ত্রী-পুরুষ, শিশু বালক প্রকাণ্ড প্রশস্ত খোলা গাড়ী চড়িয়া সদর্পে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল একটার পর একটা এমনি করিয়া যেন একটা

বিরাট প্রাচীরের শ্রেণীর মত কোন সীমাহীন পথের দুটি ধারকে ঘেরিয়া আছে। ইহার মধ্যে একবার পড়িলে বুঝি আর কখনও নিজেকে খুঁজিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় না যখন বহুপথ বহুদৃশ্য অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা একটা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে থামিল, তখন সে পিতার সহিত তেমনই নিস্পন্দভাবে নামিয়া আসিল, কোথা আসিল কি বৃত্তান্ত কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না সমস্ত কলিকাতা যেন যাদুকরের যাদুটির মত তাহার মনকে স্পর্শ করিয়া রহিল। দ্বারবান ভৃত্যবর্গ সকলেই সসম্ভ্রমে দুজনকে নমস্কার করিতে লাগিল। সম্মুখের ফুল গাছের টবসজ্জিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া নন্দকিশোর একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, দ্বারের নিকট গৌরী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিলেন "এসো মা।" সে নড়িল না। "এসো মা, এই তোমার বাড়ী।" গৌরী আড়ষ্ট হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল "এখানে রাজা থাকেন না?"

নন্দকিশোর মৃদু হাসিলেন "না, তোমার গরীব বাবা থাকেন।"

সে ধীরে ধীরে বক্ষরোধকারী নিশ্বাসটা ছাড়িয়া দিল, "কিন্তু পায়ে কাদাধূলো লিছানা নষ্ট হয়ে যাবে যে।"

"যে ঘরের বুকে তোদের পায়ের চিহ্ন পড়েনি, তার মত অভাগা কি আর আছে, কোন দ্বিধা করোনা, এ সবই তো তোমার।"

বিস্ময়ের উল্লাসে গৌরী প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এই সব তাহার! বড়মামীর বকুনি বাঁচাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান ও গৃহে ফিরিয়া ভৎর্সনালাভ যাহার নিত্য পাওনা ছিল—সেই-সে-ই আজ এই বাড়ীর মালিক! এর চেয়ে আশ্চর্য্য কাণ্ড আর জগতে কিছু ঘটিতে পারে না!

প্রভাতে যাদুকরী নগরী, আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। অশ্ববাহন ট্রামের প্রকাণ্ডবপু অদূরে দেখা যাইতেই গৌরী নিশ্বাসরোধ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, কত রকম শব্দ, কতপ্রকার গাড়ী কতই মানুষ! রাস্তায় ফেরিওয়ালা কত সুরে বেসুরে 'চাই মটর ভাজা' 'ভালো ভালো জরির সাড়ি, 'সরপুরিয়া' জামাই ভুলান "লেডিক্যানী!" হাঁকিতেছিল। জানালা ছাড়িয়া গৌরী নড়িতে পারিতেছিল না, যেমন সে সরিয়া আসিবে মনে করে অমনি একটা না একটা আশ্চর্য্য-দর্শন কোন একটা কিছু ঘটিয়া বসে, সে বদ্ধদৃষ্টি বদ্ধপদে দাঁড়াইয়া থাকে। নন্দকিশোর আড়াল হইতে দেখিয়া অনেক সময় পা টিপিয়া ফিরিয়া যান। যে সময়টা অবসর করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিতেন সেই অবকাশে সে এই বাড়ীর অদ্ভুত রহস্য সকল উদ্‌ঘাটন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। "পাখা, আলো, জলের কল, আহ্বান ঘণ্টা, ঔষধের আলমারি, পুস্তকের সেল্‌ফ হইতে ছোটখাট খুঁটনাটি শত বস্তুই তাহার অপরিচিত। কোথায় সেই পল্লিগ্রামের আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরকন্না, আর কোথা এই কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ডাক্তারের সুসজ্জিত ভবন! সবই তাহার নিকট নূতন ও আশ্চর্য্য, যেটা দেখে

তাহাতেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকে, কোন সময় মুগ্ধস্বরে বলিয়া উঠে কি চমৎকার! নন্দকিশোরের সকল আয়োজন এতদিনের পর সার্থক মনে হইতে থাকে। কিন্তু এমনই করিয়া নূতনত্বের বিস্ময় খুব বেশিদিন তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। একদিন সে সন্ধ্যায় চাঁদে উঠিয়া দীপান্বিতার উৎসব রজনীবৎ আলোকমালামণ্ডিতা নগরীর দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া যখন কি একটা বিষয় জানিবার চেষ্টায় পিতাকে খুঁজিতে নীচে নামিয়া গেল দেখিল তিনি বাড়ী নাই। কৌতূহল রোধ করা তাহার স্বভাব নয়, অল্প উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল, সেদিন নন্দকিশোরবাবুর বাড়ী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গ্যাসের আলোকে সে মুখ অতৃপ্তনেত্রে দেখিতে দেখিতে কতবারই পিতৃহৃদয় সেই ক্ষুদ্র জুই ফুলটির মত ছোট্ট মুখখানি বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পাছে সে জাগিয়া উঠে সেই ভয়ে তাহাকে স্পর্শ করিতেও সাহসী হইলেন না। মায়ের কাছে তাঁহার নবজাত শিশুটি যেমন অসহায় যতটুকু ক্ষুদ্র তাঁহার চোখে তাঁহার এই সর্ব্বস্বধনটুকুও তেমনই শিশুবৎ প্রতীয়মান হইত। পরদিন গৌরী দাসীর হাত হইতে ঝাঁটা টানিয়া মার্ব্বেলমণ্ডিত দালান ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, দাসী নিবারণ করিলে গ্রাহ্য করিল না। বলিল "আমার খুসী আমি ঝাঁট দোব, তুমি অন্য কাজ করোগে না।" "এমন আশ্চর্য্যি মেয়ে কক্ষণো দেখিনি বারা-যা ধরবে তাই।" দাসী রাগ করিয়া বাবুকে খবর দিতে চলিয়া গেল, ক্ষণপরে নন্দকিশোর আসিয়া শশব্যস্তে কহিলেন "একি হচ্চে মা?"

গৌরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া একমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল, কামাই না দিয়া উত্তর করিল "কেন সেখানে তো করতুম।" পিতা আসিয়া হাত ধরিলেন "তাহোক, ওসব ঝিয়েরা করবে। ঝাঁটা ফেলে দাও চলে এসো।"

গৌরী এবার সম্মার্জ্জনী ত্যাগ করিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিল "তবে আমায় কেন নিয়ে এলে, আমি কি করে থাকবো একলাটি দিনরাত্তির?"

সত্য, একথা সে বলিতে পারে! তাঁহার সারাজীবনটা নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে তাই বলিয়া এই পল্লীবালিকা সে দুর্ব্বিসহ জীবনের অংশ কেমন করিয়া বহন করিবে!

ঈষৎ আহত, ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিলেন "একা তোমার বড্ড কষ্ট হচ্চে, আচ্ছা আমি তোমার একজন সঙ্গীর চেষ্টা করচি।"

গৌরী সন্ত্রাসে মুখ তুলিল "সত্যদাতাতো কল্‌কাতায় থাকে!"

"সে কে?" "সত্যদাদা, গো গাঙ্গুলী বাড়ীর সত্যদাদা, ভুলে গ্যাছ কতদিনতো বলেচি!" নন্দকিশোর এই দাদাটির সংবাদ অনেকবারই পাইয়াছেন বড় একটা মনোযোগ করেন নাই, তাই প্রথমটা স্মরণ ছিল না, সামলাইয়া লইয়া কহিলেন "সে এখানে আসবে কেন?" গৌরী আগ্রহাতিশয্যে পিতার হাতটা জোরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে তাহা আন্দোলিত করিতে করিতে

কহিয়া উঠিল "আসবে না আবার, খুব আসবে, খুব আসবে।"

অপরাহ্ণে সেদিন নন্দকিশোর কোনমতে সময় করিয়া তাহাকে ইডেন উদ্যানে বেড়াইয়া আনিলেন। সেই মনোরম দৃশ্যাবলী, পরীশিশুবৎ ইংরেজ বালকবালিকাগণের স্বাধীন বিচরণ, নূতন নূতন বিবিধবস্তু তাহার মনকে মোহিত করিয়া ফেলিল। দুচারটি স্বদেশীয় বালকবালিকা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাছে কাছে ঘুরিল, তাহাদের বেশভূষা চলন বলন সবই যেন স্বতন্ত্র। সে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিল, মন চাহিলেও তাই তাহাদের সহিত আলাপ করিতে পারিল না।

ফিরিবার সময় তাহার পিতা গাড়িতে বলিলেন "তোমার একজন জ্যেঠাইমা হন, তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্চি তিনি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে এসে থাকতে পারবেন। "সত্যদাদা?" নন্দকিশোর কি করিয়া ইহাকে এ আবেদনের অযৌক্তিক প্রদর্শন করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া কেবল গম্ভীরমুখে কহিলেন "আচ্ছা চলো দেখি"। যে গৃহে গৌরীকে তিনি লইয়া আসিলেন সে গৃহও তাঁহার নিজগৃহবৎ সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। গৌরী দেখিল মস্তকার্দ্ধে টাক সমন্বিত তামাকপোড়া রঞ্জিতাধরা বৃদ্ধাগৃহিণীর পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বেশভূষাসজ্জিতা এক হাস্যমুখী প্রৌঢ়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "এসো!" দু চারিপদ অগ্রসর না হইতেই তিনি প্রথমেই তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিলেন "মাগো কি বিশ্রী করে চুলবাঁধা! দাসীরা দিয়েছে বুঝি, তুমি নিজে পারোনা? না? পাড়াগাঁয় মেয়েরা অনেক বয়স অবধি নিজের গায়ের যত্ন করতেও শেখে না, আমাদের কল্‌কাতায় নবছরের মেয়েটিও নিজে নিজে চুল বান্‌তে শেখে। এ কাপড় পরাতো ঠিক হয়নি, জামার নীচে দিয়ে কি সাড়ি পরে!"

নন্দকিশোর এই ভ্রাতৃজায়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন ফিরিবার সময় লইয়া যাইবেন।

এখানকার সঙ্গ গৌরীর পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হইল না। জ্যেঠাইমার একটি বিশেষ বন্ধু এখনি আসিয়া পড়িবেন, ইতিমধ্যে এই পাড়াগাঁয়ে মেয়েটির সংশোধন আবশ্যক। দাসীকে চিরুণি আনিতে আদেশ দিয়া তাহার চুল খুলিতে বসিলেন, সে একবার আপত্তি করিয়া নিরুপায়ে ক্ষুব্ধচিত্তে মাথাটা ছাড়িয়া দিল, মনে মনে বলিল "বেশ ছিলুম সেখানে। বাবা আমায় কেন আন্‌লেন!"

দামিনী ঝি কেশবন্ধনের পর সাবান মেখে মুখহাত ধোয়াইয়া দিলে কতকগুলা মৃদু গন্ধ, তীব্র গন্ধ লাল, সাদা হরিদ্র বর্ণের তরল পদার্থ দ্বারা জ্যেঠাইমা দেবর কন্যার প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া পছন্দমত ফ্যাসানে সাড়ি পরাইয়া কহিলেন "দেখতো কেমন দেখালো! দিব্যি মুখখানি, গড়নটা একটু কাঠ কাঠ আছে, গায়ে তো মাংস নেই ও দুদিনে সেরে যাবে, এসো একটু জলটল খেয়ে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করগে।"

হাত ধরিয়া ভোজন স্থানে লইয়া যাইতে যাইতে কহিলেন "এই বয়সে হাত এমন শক্ত

গ্যাচ্ছে কেন গা? খুব কাজ করতে বুঝি?" গৌরী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। "তাই জন্যে এমন ঝান্ খেয়ে গিয়েছে, আহা মা নেই বলেই তো এত কষ্ট!" আহারে বসিয়াও সে দু একবার জেঠাইমার নিকট অনুযোগ প্রাপ্ত হইল, "মেয়ে মানুষ এত তাড়াতাড়ি খাওয়া কি, জলের গ্লাসটা নামাবার সময় সাবধান হবে, হাত থেকে পড়ে গ্যাল দেখদেখি, যদি পাশে অন্য লোকের পাত থাকত!" আহারান্তে বাড়ীর মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলেই মিতভাষিণী, হাস্যে বাক্যে পদবিন্যাসে কৌতুক ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রাণের ভিতরে একটা অবক্তব্য ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িতে চাহিল! হায় তাহার চাকদা!

বাড়ীর মেজ মেয়েটি একটু প্রগল্‌ভা, সে এই নূতন আলাপীর সহিত একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল "সেখানে তোমার কে বন্ধু ছিলেন?" "বন্ধু কেউ না"।

কারুর সঙ্গে খেলতে টেলতে না?"

গৌরী ঢোক গিলিয়া বলিল "খেলতুম বই কি, চুনি, নালু, কালী, আর সব চেয়ে বেশি সত্য দাদার সঙ্গে খেলতুম।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল "সবাই পুরুষ মানুষ?"

"উঁহুঃ, কালী শুধু মেয়ে, সে তেমন দৌড়তে পারতো না, কেবল চোর হতো। সত্য দাদা কখন চোর হত না, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হোত,—সে-ও আমাকে রাগাবে বলে—"

"তুমিও দৌড়দৌড়ি খেলতে!"

"হ্যাঁতো, তোমরা খেল না?"

মেজ মেয়েটি ঘাড় নাড়িল, সকলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। একজন কহিল "সত্য দাদা কে?" গৌরী এবার প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্যের সহিত উত্তর করিল "সে আমার বন্ধু"। তাহার নূতন বন্ধু কহিল "সে কি ভাই! মেয়ে মানুষের বুঝি আবার ধ্যাটা ছেলে বন্ধু হয়।" এই আশ্চর্য্য যুক্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ গৌরীর পক্ষে অসম্ভব হইল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"কেন হবে না ভাই, সত্যি সত্যি সে আমার বন্ধু!"

জাপানে নববর্ষ

জাপানে উৎসব অনেক। তার মধ্যে যেটি নববর্ষকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও রমণীয়।

বৎসরের প্রথম দিন উৎসব-আনন্দে অতিবাহিত করবার প্রথা সকল দেশেই অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসচে। বিভিন্ন দেশে এই উৎসব সম্পন্ন করবার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন সে গুলির মধ্যেও কতক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন রোমীয়েরা নববর্ষের দিন বাড়ীর দ্বারে একটি সবুজ বৃক্ষ স্থাপন করত। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে, নববর্ষের দিন প্রজারা রাজভক্তি ও শুভ ইচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ রাজাকে নানারকম উপহার দিতেন।

রাজা যখন ঘোষণা করলেন যে অতঃপর এরূপ উপহার আর গ্রহণ করবেন না, তখন থেকে রোমীয় জনসাধারণ রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করে বাড়ীর দ্বারে সবুজ গাছ রোপন করতে আরম্ভ করলে। রোমীয়দের নিকট হতেই বোধ হয় য়ুরোপীয়েরা বড়দিনের উৎসবে চিরহরিৎ বৃক্ষপত্রে বাটী সজ্জিত করা শিক্ষা করেচে।

প্রাচীন রোমীয়দের মত জাপানের নববর্ষও, কিছুকাল পূর্ব্বে, ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় আরম্ভ হ'ত। এবং সেই সময়ই শীতের অবসান ও বসন্তের আরম্ভ বলে ধরা হ'ত। তখন বাহিরে পথঘাটমাঠ বরফে সাদা হয়ে থাকলেও তারা গ্রাহ্য করত না, বসন্ত এসেচে ব'লে তুলাভরা পোশাক ছেড়ে ফেলে হাল্কা পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ত। বাহ্য প্রকৃতি হিমজর্জ্জর ম্লান বিষণ্ণ হ'লই বা, তাদের অন্তরের মাঝে যে বসন্ত—সে তার মলয় বাতাস, ফুলের সুবাস, পাখীর গান ও নবীন তৃণবল্লরী নিয়ে হাজির!

বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে ১৮৭৩ সাল থেকে ১লা জানুয়ারিই জাপানী নববর্ষের আরম্ভ ব'লে বিবেচিত হয়ে আসচে।

বৎসরের শেষ কয়দিন দেনা-পাওনা চুকিয়ে নববর্ষের উৎসবের আয়োজন করতে কেটে যায়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীর প্রধান ফটকের দুইধারে সরলবাঁশের সহিত দেবদারু শাখা অতি পরিপাটিরূপে স্থাপিত হয়। অবস্থা যাদের হীন তারা ফটকের কাছে অন্তত দুইগাছা পত্রসম্বলিত বাঁশের কঞ্চি স্থাপন করে। ফটকের একটি থাম থেকে অন্য থাম পর্য্যন্ত একগাছি খড়ের দড়ি বিলম্বিত, তার মাঝে একটি বড় চিংড়ি বা কমলালেবু বাঁধা। খড়ের দড়িটি ধর্ম্মের নিদর্শন, কমলা-লেবু কমলার বর ও চিংড়িমাছ নববর্ষের শুভইচ্ছার নিদর্শন—তুমি দীর্ঘায়ু হও, যতদিন না তোমার পৃষ্ঠ চিংড়ির পৃষ্ঠদেশের মত বঙ্কিম হয়ে যায় ততদিন বেঁচে থাক!

পথের উভয়পার্শ্বে দ্বারে দ্বারে চিরহরিৎ বাঁশ ও দেবদারুশাখা বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে উঠচে, বাড়ীর সামনে উৎসববেশে সজ্জিত রমণীর দল নববর্ষের খেলায় মত্ত, বন্ধুবান্ধব আসচে যাচ্চে, অভিবাদন শুভইচ্ছা জ্ঞাপন চলচে, তরুণীরা বিশেষ কোনো কারণ না থাকলেও হাসচে, বাড়ীর মধ্যেকার সুখাদ্যের গন্ধে ছেলেদের রসনায় জল আসচে, কাষ্ঠ-পাদুকার খট্‌খট্ ও মানুষটানা গাড়ীর চাকার শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত, কোথাও বা সামিসেন বাজিয়ে নর্ত্তকী গান গাইচে—এই হ'ল নববর্ষ উৎসবের একটি ছোট্ট ছবি। এ সময়ে সহরে পথ চলতে চলতে মনে হয় যেন কার সুসজ্জিত বাড়ীর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে চলেচি।

উৎসব সাত দিন চলে, তবে প্রথম তিন দিনই উল্লেখযোগ্য। যারা দূরে থাকে তারা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে কার্ড পাঠায়। প্রত্যেক বৎসরের একটি একটি বিশেষ চিহ্ন থাকে যেমন কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি। শূকরবর্ষে কার্ডের উপর বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। নিকটে যারা থাকে তারা পদব্রজে বা মানুষ-টানা গাড়িতে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়ে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে আসে। উপহার দেওয়ারও রীতি আছে। সাধারণত ডিম, ফল, কেক

প্রভৃতি মুখরোচক পদার্থই দেওয়া হয়। নববর্ষের সময় সকলেই অভ্যাগতকে এক-প্রকার সুবাসিত মিষ্ট মদ্য প্রদান করে। তিনটি ছোট ছোট চ্যাপ্টা কাঠের বাটি উপরি উপরি সাজান, উপরের বাটি হতে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক বাটিতে তিনবার ক'রে পান করা নিয়ম। একজন পান ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের হাতে বাটিটি তুলে দিয়ে মদ ঢেলে দ্যান, তিনি পান ক'রে আবার তাঁর পাশের লোকটিকে দ্যান, এই প্রকার! নববর্ষের সময় একই দিনে অনেক বাড়ীতে যেতে হলে কিঞ্চিত 'মাত্রাধিক্য' হওয়া বিচিত্র নয়।



নববর্ষের অভিনন্দন কার্ড

আহার্য্যের মধ্যে 'মোচি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একপ্রকার চটচটে চাউল থেকে তৈরি করা হয়। চাউলের গুঁড়া ময়দার মত মাখা হয়, অনেকক্ষণ মাখার পর রবারের মত হয়ে যায়। তখন ছোট ছোট রুটি বা লুচির 'নেচি'র মত ক'রে বিভক্ত করা হয় ও আগুনের উপর সেঁকে নেওয়া হয়। পরিশেষে সেগুলি সুপের মধ্যে সিদ্ধ করা হয়, খেতে অনেকটা আমাদের 'সিদ্ধপুলি'র মত। পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে যে সব মন্দির স্থাপিত নববর্ষের সময় তথায় তাদের আত্মার প্রীতির জন্যে 'মোচি' নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়।

নববর্ষের আর একটি আহার্য্যের নাম "নানাকুস"। 'নানা' অর্থে সাত এবং 'কুসা' অর্থে ঘাস। সাতরকম ঘাস বা শাক। ভাতের সঙ্গে সাত রকম শাক মিশিয়ে এই আহার্য্য তৈরি হয়। ৭ই জানুয়ারি এটি খাবার রীতি। আমাদেরও শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন 'চৌদ্দশাক' খাবার রীতি আছে।

বর্ষারম্ভের দিন জাপান-সম্রাট রাজকীয় মন্দিরে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের যাবতীয় দেবতার উদ্দেশে পূজা করেন।

পূর্ব্বদিন জাপানীরা ঘরদ্বার ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে! নববর্ষের দিন ঘর ঝাঁট দেবার নিয়ম নেই, পাছে ভাগ্যদেবতা সম্মার্জ্জনী দর্শনে ভীত হয়ে বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করেন!

পূর্ব্বদিন মধ্যরাত্রে মন্দিরে মন্দিরে একশ আটবার ঘণ্টা বাজিয়ে নববর্ষের আগমন সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

এ সব ব্যাপার ত সর্ব্বত্রই ঘ'টে থাকে, এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। জাপানের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কিওতো সহরে গিওন্ মন্দির একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নববর্ষের প্রারম্ভ-কালে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরোহিত পাল্কী চ'ড়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। তাঁর আগে আগে মশালধারীরা পথ দেখিয়ে যায়। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে একটি বড় ঘরে তিনি কিছুকাল প্রার্থনা করেন। ঘরের উভয় পার্শ্বে বারান্দায় ছয়খানি ক'রে বারো খানি কাষ্ঠখণ্ড রাখা হয়। কাষ্ঠখণ্ড গুলি বৎসরের বারো মাসের নিদর্শন স্বরূপ। প্রার্থনার পরে এগুলিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ধূম যদি পূর্ব্বদিকে উড়ে যায় তবে বুঝতে হবে পূর্ব্বদিককার স্থানগুলিতে সে বৎসর ধান্য জন্মিবে না; ধূম যদি পশ্চিমে হেলে তবে পশ্চিম দেশ-সমূহ অজন্মা। জ্বলন্ত কাঠগুলি তারপর মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিলম্বিত প্রকাণ্ড লৌহকটাহে রেখে মস্ত এক আগুন তৈরি করা হয়। অতঃপর পুরোহিত মন্দিরমধ্যস্থ কূপ হতে স্বহস্তে জল তুলে সেই আগুনের উপর অন্ন পাক করেন, পরদিন প্রাতে উহা দেবতাকে নিবেদন করা হয়।

এই আগুনে 'নিনাওয়া' নামক রজ্জু প্রজ্জ্বলিত ক'রে ও উহা নির্ব্বাপিত না হতে দিয়ে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে ঐ আগুনে চুল্লি ধরিয়ে যে নববর্ষের প্রভাতে অন্ন পাক ক'রে খায় তার নাকি সে বৎসর সুখ সমৃদ্ধির অবধি থাকে না!

সে রাত্রে পথিপার্শ্বে শত শত দোকানে এই রজ্জু বিক্রীত হয়। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক গজ, ও আধ ইঞ্চি মোটা। শত শত লোক এক এক গাছি রজ্জু নিয়ে পাহাড়ের উপর হাজির হয়। পুরোহিত এক এক বারে দশ বারো গাছি রজ্জু নিয়ে মন্ত্র আউড়ে কটাহে এক প্রান্ত প্রজ্জ্বলিত ক'রে সকলের হাতে হাতে দান। সহস্র সহস্র লোক যখন রজ্জু প্রজ্জ্বলিত রাখবার জন্য সেগুলি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ী ফেরে তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। মন্দিরে ঘণ্টা ও ঢকানিনাদ, পূজার্থীর হাততালি ও সমবেত জনগণের চীৎকার এক বিপুল কোলাহলের সৃষ্টি করে ও সহস্র সহস্র ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত রজ্জুর আলোকে নিশীথআকাশ রাঙা হয়ে ওঠে।

ওসাকা সহরের নিকটে এবিসু মন্দির। এ মন্দিরে পাঁচজন দেবতা বাস করেন। তন্মধ্যে যিনি প্রধান তিনি না কি কানে একটু কম শোনেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও; তাঁর মন্দিরে যারা পূজা করে তাদের তিনি অশেষপ্রকারে সুখী করেন।

১০ই জানুয়ারি এখানে একটি উৎসব হয়। ঐ দিন ওসাকার ব্যবসায়ীগণ হাতে কাঠের মুগুর নিয়ে মন্দিরে যান ও বধির দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে দেওয়ালে মুগুরের ঘা দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন—আমি আপনাকে পূজো করতে এসেচি।

১৫ই জানুয়ারি "দোনো"-উৎসব। উৎসবটি আর কিছু নয়—নববর্ষে বাড়ীর কটক যে সব দ্রব্যে সজ্জিত হয়, দেবদারু-শাখা, বংশখণ্ড, খড়ের দড়ি প্রভৃতি একস্থানে জমা ক'রে পোড়ানো এবং সেই আগুনের উপর চাল ও লাল মটর এক সঙ্গে সিদ্ধ করা হয়। এরূপ করলে দেশে ব্যাধি বিস্তার লাভ করতে পায় না, জাপানীরা তাই বিশ্বাস করে।

একবার আমরা দুই বাঙালী বন্ধু এক জাপানী বন্ধুর সহিত নববর্ষের সময় আতামি নামক স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শীতকালে

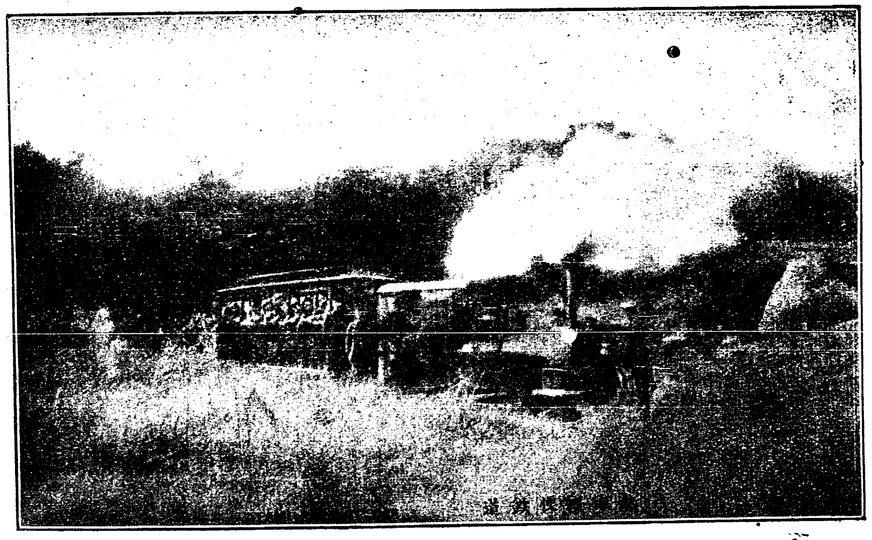

আতামির রেলগাড়ি

অনেকে সেখানে বেড়াতে যান কারণ স্থানটি কিওতোর মত ঠাণ্ডা নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম, পাহাড় ও সমুদ্র দুইই আছে। আর আছে উষ্ণ প্রস্রবণ। দিনে তিনবার একটা স্থান থেকে প্রভূত বাষ্পের সহিত ঈষদুষ্ণ জল নির্গত হয় ও সেই জল বাঁশের নলে হোটেলগুলির স্নানের ঘরের চৌবাচ্চায় নেওয়া হয়। এই স্থানটি তোকিও থেকে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, পথের শেষাংশ খেলাঘরের গাড়ীর মত ছোট একখানা রেলগাড়ীতে বস্তার মত গাদাগাদি ক'রে পার হতে হয়। তাই নিজের দেহটি সামলাতে সামলাতে পথের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার অভিরুচি বা অবসর থাকে না।

বিকালবেলায় সেখানে পৌঁছলুম। নিকটেই হোটেল। সেখানে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন

ক'রে হোটেলের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি বাগানে কয়েকটি তরুণী 'হানে' বা Battledoor and Shuttlecock খেলায় মত্ত। বাগানটি ছোটখাট পরিপাটি নিখুঁত, জাপানী বাগান যেমন হয়ে থাকে। দিনান্তের ছায়াপাতের মধ্যে তরুণীসমাগম উদ্যানটিকে আরো মনোরম করে তুলেছিল।

খেলাটা বোধ হয় অনেকেই জানেন। দুজনে খেলে, এক একখানি ছোট কাঠের ব্যাট নিয়ে একটা হাল্কা পালকবসানো বল শূন্য পেটাপিটি করাই হল খেলা। যার দিকে বল মাটিতে প'ড়ে যায় তারই হার।

আমার বাঙালী বন্ধুটি একটি মেয়ের



ব্যাটলডোর এবং শ্যাট্‌লকক্ খেলা

সঙ্গে আলাপ ক'রে নিয়ে বল্লেন তিনি খেলায় যোগ দিতে চান। তারা তৎক্ষণাৎ সম্মত। বন্ধু দেশে থাকতে ব্যাডমিন্টন্ খেলতেন তাই এ খেলাটাও তাঁর কাছে নতুন ঠেক্‌ল না। খেলা জ'মে উঠল, হোটেলের অন্যান্য আগন্তুক রমণীরাও অনেকে এসে খেলায় যোগ দিলেন, অনেকে খেলা দেখতে লাগলেন। রীতিমত সুন্দরীর মেলা!

কথা কইতে পারলে ও নিতান্ত কুণো প্রকৃতির না হলে রমণীদের সঙ্গে সে দেশে সহজেই আলাপ হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল সকলকে আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ করা গেল। সান্ধ্য আহারের পর আমাদের ঘরে একটি ছোট খাট সভা ব'সে গেল। হোটেলের পরিচারিকারাও এসে যোগদান করলে। পরিচারিকারা আমাদের আনন্দসভায় যোগদান করলে শুনে চম্‌কে উঠবেন না, ভাল জাপানী হোটেল বা অবস্থাপন্ন জাপানী বাড়ীর পরিচারিকারা আকৃতিপ্রকৃতি বেশভূষা ও শিক্ষাসহবতে কোনো ক্রমেই হেয় নয় বরং সমাদরের যোগ্য।

চা কমলালেবু কেক প্রভৃতি মধ্য স্থলে রেখে আমরা সকলে মেঝের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে মণ্ডলাকারে বসলুম। খেলা আরম্ভ হল। সকলে সামনে দুই হাত মাদুরের ওপর রেখে

সল। একজন বলতে লাগলো—পাখী ড়লো, কাক উড়লো, চিল উড়লো ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলতে লাগলো। তার ঙ্গে আমরাও হাত তুলতে লাগলুম। যাদের ওড়বার ক্ষমতা আছে এমন নামের বলাই হাত তুলতে হবে, ওড়বার াদের ক্ষমতা নেই সে সব জিনিস উড়লো



মানজাই নাচ

'শিলনোড়া উড়লো' বা 'চটি জুতো উড়লো', তখন কি আর সামলানো যায় হাত যে উঠে পড়েচে!

তারপর আর একটা খেলা হল, একজন বলতে লাগলো 'বড় লণ্ঠন' 'ছোট লণ্ঠন'। যখন 'বড় লণ্ঠন' বলবে তখন সকলকে ছোট জিনিস বোঝাবার মত হাত দুখানি কাছাকাছি করতে হবে ও যখন 'ছোট লণ্ঠন' বলবে তখন তার বিপরীত বড় জিনিস দেখাবার মত হাত করতে হবে। তা না বললেও হাত মাদুরের উপরে ঠিক রাখতে হবে, অসাবধানিতাবশত হাত তুললেই হার হবে ও শাস্তিস্বরূপ তার মুখে তুলি দিয়ে এক পোঁচ সাদা রং লাগিয়ে দেওয়া হবে। 'পাখী উড়লো' 'চিল উড়লো' শুনতে শুনতে নিঃশঙ্কচিত্তে হাত ওঠাচ্চি এমন সময় হয়ত ব'লে বসলো করলেই মুখে শ্বেত রং লেপন ও সমবেত সকলের হো হো হাস্য।

শেষের খেলাটাই জমেছিল ভাল। একজন মুখ নীচু করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। শব্দটা যতক্ষণ হয় ততক্ষণ একটা কমলালেবু হস্ত হতে হস্তান্তরে ঘুরতে থাকে। একজন হাতে পাবামাত্র সেট পার্শ্ববর্ত্তী লোকের হাতে চালিয়ে দ্যায়। হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ থেমে যায় তখন লেবুট যার হাতে সেই 'চোর' হয়। আমার পাশেই এক

সুন্দরী বসেছিলেন. তাঁর সুন্দর নিটোল গণ্ডে এক পোঁচ সাদা রং লাগাবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে দু তিনবার 'চোর' হয়ে গোঁ গোঁ কর্ত্তে কর্ত্তে আড় চোখে দেখছিলুম, লেবু যেই সুন্দরীর হাতে আসে অমনি থেমে যাই। বারম্বার এমনি ক'রে শেষকালে ধরা পড়ে গেলুম। সুন্দরী তখন অসাধ্য সাধন করলেন, আমা হেন লোকের মুখ প্রায় সাদা করে তুললেন!!

অনেক রাত্রে খেলা ভাঙলে আমরা পরস্পর 'শুভরাত্রি' জ্ঞাপন ক'রে গরম জলের চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে মুখের রং তুলতে লেগে গেলুম।

সে রাত্রের পর অনেক দিন কেটে গেছে। জীবনের খাতায় অনেক নতুন দুঃখসুখের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানসপটে অনেক স্মৃতি অস্পষ্ট, কতক বা একেবারেই মুছে গেছে; কিন্তু সুদূর দেশের সেই একটি নববর্ষ-সন্ধ্যার মধুর স্মৃতি এখনো ভুলতে পারি নি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৪)

সার্ব্বিসে প্রবেশ

আমার হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় পরীক্ষা শেষ হইলে আমি আহমদাবাদে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর রূপে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। Sir Bartle Frere তখন বোম্বায়ের গবর্ণর ছিলেন। তিনি বিনয় সৌজন্য গুণে, ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্টালাপে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। যাহাতে আমার সেই প্রথম কর্ম্মভূমির পথ পরিষ্কৃত ও সুগম হয় সর্ব্বথোভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রথম দুই এক বৎসর কলেক্টরি কর্ম্মে আমার ডিষ্ট্রীক্টের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইত—পরে যথা সময়ে ঐ প্রদেশের আসিষ্টণ্ট্ জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। জজীয়তী কর্ম্মের সুবিধা এই যে কলেক্টরি কাজে গ্রামস্থ রায়তের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও রেবেন্যু কর্ম্মচারীদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ব্যাড়াইবার প্রয়োজন হয়, জজের সেরূপ করিতে হয় না। যাঁহারা গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ও আরাম ভালবাসেন, তাঁহারা এই কারণে রেবেন্যু ছাড়িয়া জুড়ি-স্থাল ক্ষেত্র বাছিয়া লন। আর যাঁদের চলা ফেরা, শিকার করিয়া ব্যাড়ানো এই সবে আমোদ তাঁহারা অনেক অর্থের প্রলোভন ভিন্ন কলেক্টর-মাজিষ্ট্রেটের কাজ ছাড়িতে চাহেন না। আমার এই জজীয়তী সর্ব্বিস সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমি যখন ধূলিয়ায় আসিষ্টণ্ট্ জজ হইয়া কর্ম্ম করি, তখন সেখানকার মাজিষ্ট্রেট প্রিচার্ড্ সাহেব আমার কোর্টে চারিজন আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্যের মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। সেই মকদ্দমায় তিনি

নিজে ফরিয়াদী, নিজেই সাক্ষী, তাঁহার করিয়া খালাস দিয়াছিলাম। এই বিচারে একতরফা সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে প্রিচার্ড সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই বলিয়া আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল



রাংচাঁদ প্রেমচাঁদ

আনিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ভাগ্যে হাইকোর্ট আমার পক্ষ লইয়া আমার রায় বাহাল করিলেন, তাই আমাকে আর বিশেষ কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইল না, কেবল ঐস্থান হইতে স্থানান্তরিত হওয়াই আমার শাস্তি,

সেও আবার অনেক লেখালেখির পর অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানেই হইল। খানদেশ হইতে পুণা, আমার শাপে বর হইল। আমার বিদায় উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা আমাকে এক মানপত্র, সহজ ভাষায় address দেয়—ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা আরো চটিয়া উঠিলেন। গোদের উপর আবার বিস্ফোটক! গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন কেন এইরূপ অ্যাড্রেস লওয়া হইল—অমনি তার কৈফিয়ৎ তলব। সেই অবধি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন সরকারী কর্ম্মচারী অ্যাড্রেস গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই কড়াকড় নিয়ম জারী হইল। আমার সমুদয় সর্ব্বিসের মধ্যে আমার উপরিওয়ালাদের সঙ্গে এই যা একটু গোলযোগ বাধিয়াছিল, তা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মতান্তর ঘটে নাই। আমার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে আমার বিশেষ কিছু দোষ ধরিবার নাই। পুণায় বদলী হইয়া অবধি জঙ্গীয়তী কার্য্যে আমার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। মাঝে মহারাজা হোলকর ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোচারণের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে আমাকে উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিতে হয়—এইটি ছাড়া উত্তরে সিন্ধুদেশ হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জজের কর্ম্মেই আমার সর্ব্বিসের সমুদায় কাল অতিবাহিত হয়। পুণার জজের হাতে সেখানকার সর্দ্দারদের সম্বন্ধে একটু Political কাজ আছে—তিনি দক্ষিণ সর্দ্দারের Politictal agent, আমিও এই কাজে দুই বৎসর জজের সহকারী ছিলাম। এই উপরি কাজ অতি সামান্য, সর্দ্দারদের খোঁজ খবর নেওয়া আর বৎসর অন্তর একবার দরবারের আয়োজন করা, এই বৈ নয়। এইরূপে ৩০ বৎসরেরও উপর জুডিস্যাল খাতায় নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিয়া অবশেষে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বোম্বাই সহরের কথা অনেক বলা হইয়াছে, সে কথাগুলি ভূমিকা মাত্র। যতদিন মানকজীদের সঙ্গে বোম্বায়ে ছিলাম ততদিন আমার হাতে কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না—আমার একমাত্র কাজ ভাষাশিক্ষা। পরে ভাষার পরীক্ষা দিয়া আমার নিয়মিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

তখন হইতে আমার রীতিমত সর্ব্বিস আরম্ভ। আমি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া ও সেই সঙ্গে আমার আত্মকাহিনী যাহা কিছু মনে পড়ে তাহা যোগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে।

ফর্লো

আমার সর্ব্বিসের মধ্যে দুইবার ফর্লোর ছুটী পাওয়া যায়। প্রথমবার সপরিবারে ইংলণ্ডে যাত্রা করি। দ্বিতীয়বার ১৮৯৩ সালে এদেশেই অবকাশ কাল যাপন করি। দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গিয়া দেখি সে যেন এক নূতন দেশ, দুএকজন ছাড়া আমার পূর্ব্ব পরিচিত বাল্যবন্ধু কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, লোকদের সঙ্গে নূতন করিয়া আলাপ পরিচয় করিতে হইল। বৈলাতিক মোহ আর আমাকে আচ্ছন্ন করে না,

ইংলণ্ড আর "হোম" বলিয়া বোধ হইল না। আমরা ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডন সহরে প্রথমে কিছুকাল বাস করি, পরে Brighton Torquay ও ফ্রান্সের প্যারী নিস্ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ছুটির সময়টা কাটাইয়া দিলাম।

সিমলার পাহাড়

পরের বার যে ফর্লো পাই তাহাতে সিমলা প্রয়াণ। রাজপুতানা লাইন দিয়া বোম্বাই ছাড়িয়া আগ্রায় আমাদের দলবলের সহিত মিলিত হইলাম। পথে আবু ও জয়পুর দেখিয়া লইলাম। আবু পাহাড় অতি সুন্দর রমণীয় স্থান, পাহাড়ের ক্রোড়ে একটি সরোবর শোভা পাইতেছে। দৃশ্য মনোরম, বায়ু স্বচ্ছ স্বাস্থ্যকর। দেলওয়ারা নামে সুবিখ্যাত জৈনমন্দির সেখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিস। মন্দিরগুলি শ্বেতপাষাণ নির্ম্মিত—জৈন নির্ম্মাণকৌশলের উৎকৃষ্ট নমুনা। দুর্ভাগ্যক্রমে তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি সকল বিধর্ম্মীদের

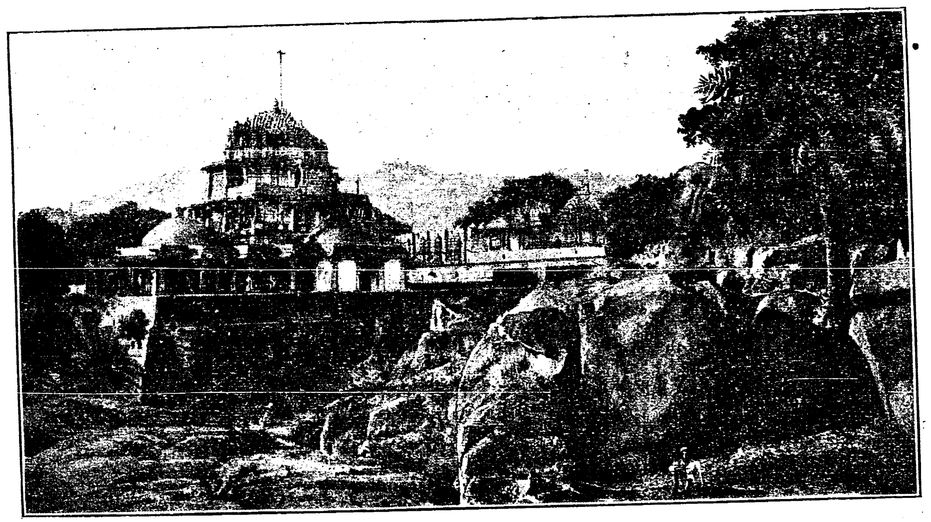

জৈন মন্দির—আবু

হস্তে পড়িয়া ছিন্ননাসা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের একস্থানে এক অদ্ভুত নিলাম চলিতেছিল। নিলামে পৌরোহিত্যের অধিকার মারওয়াড়ী ধরণে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। নিলামে যার ডাক সবচেয়ে বেশী দেবার্চ্চনায় তার সর্ব্বোচ্চ অধিকার—পুরোহিতের প্রাপ্য দানসামগ্রী তাহারই।

জয়পুর

জয়পুর রাজপুতানার রাজধানীমধ্যে নব্যধরণে গঠিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী, পথ ঘাট প্রশস্ত, গোলাপী রঙের বাড়িঘরগুলি সূর্য্যকিরণে সুনীল আকাশতলে ঝক ঝক করিতেছে। বিপনী নানাবিধ সৌখীন দ্রব্যভারে সুসজ্জিত। জয়পুরে

হরিমোহন সেনের আমল হইতে বাঙালীদের আধিপত্য অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। দেওয়ান কান্তিবাবু আমাদের অশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহ পরিদর্শনে লইয়া গেলেন। নগরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে, তার মাঝখানে একটি যাদুঘর, তাহার ভিতর নানা কলকৌশলময় দেশী বিলাতী সামগ্রী সংগৃহীত। উদ্যানের উত্তর সীমায় ব্যাঘ্রাদি জন্তুর একটি পশুশালা আছে।

তাজমহল

জয়পুর হইতে আগ্রা। বলা বাহুল্য যে তাজ দর্শন না করিয়া আগ্রা ছাড়ি নাই। সৌন্দর্য্যের আকর হৃদয়ানন্দকর পৃথিবীর তাজ। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন রাণীর ভাগ্যে এরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিমন্ত রচিত হয় নাই। ইহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে হৃদয় মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

সিমলা

১৮৯৩ এপ্রিল মাসে সিমলা গিয়া পৌঁছান যায়; ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে আমাদের অধিবাস। সেখানকার গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা শীত সকল ঋতুই আমাদের উপর দিয়া একে একে চলিয়া গেল। এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুলের বাহার। কর্পূরতলার কুমাররাণীসাহেবের আতিথ্য সৎকারে আমাদের প্রবাস যাপন সুখের হইল। শেষ দিকে তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়া এক সপ্তাহ কাটানো গেল। সিমলা পর্ব্বত যাহা দেখিলাম তাহা আমার কল্পনার হিমালয় নহে। কল্পনার সিমলা ও বাস্তবিক সিমলায় অনেক তফাৎ। দার্জিলিং হইতে তবুও দূর হইতে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টি গোচর হয় সিমলায় তাহাও হয় না। সিমলার দৃশ্য অন্যরূপ। সেই দেবতাত্মা হিমালয় যাহা—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ

পূর্ব্ব পশ্চিম সাগর-ধৌত পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে দণ্ডায়মান, এই স্বর্গীয় ভাব পার্থিব ধূলির আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। বাড়ীঘর দুয়ার—মানুষের কারিগরিতে তাহার দেবত্ব ডুবিয়া গিয়াছে। সিমলা বড়লাটের আরাম নিকেতন। বড়লাট আর জঙ্গী ও পঞ্জাবী দুই ছোট লাট একত্র হইয়া ঐ স্বাস্থ্য নিবাসের যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন। 'জাকো' যক্ষপতির বাসগৃহ বলিয়া মনে হইল না। সেখানে একজন সন্ন্যাসী এক দল বানর সৈন্যের সেনাপতি হইয়া বাস করিতেছেন। সিমলায় একজন ফিরিঙ্গি সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিন্দু যোগীর ন্যায় জীবন যাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

নাসিক

নাসিক দাক্ষিণাত্যের বারাণসী, গোদাবরীতীরে অবস্থিত। ইহাও একটি বহুযাত্রী সমাকীর্ণ ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। রাম সীতার বনবাস সম্বন্ধে রামায়ণে যে সকল ঘটনা বর্ণিত আছে ইহা তাহার রঙ্গভূমি। নদীর এ পারে পঞ্চবটী, পরপারে ত্রিম্বক তীর্থ। পঞ্চবটী দণ্ডকারণ্যের সেই প্রদেশ রামচন্দ্র সীতাদেবীর সঙ্গে বনবাসে গিয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাহা সীতা অযোধ্যা

হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বিতীয়বার দর্শন করেন। এই দ্বিতীয় বনবাসের কথা লইয়া ভবভূতির "উত্তর চরিত" নাটক বিরচিত। পঞ্চবটীতে সীতারামের বনবাসের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে—রামকুণ্ড যেখানে রামচন্দ্র স্নান করিতেন, সীতাগুম্ফ যেখান হইতে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ হয়, যেখানে সূর্পনখা লক্ষ্মণের মন ভুলাইতে গিয়া নাককাণ হারাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, পাণ্ডারা এই সকল মনঃ কল্পিত স্থান দেখাইয়া যাত্রীদের কৌতূহল উদ্দীপন করে। কেহ কেহ বলে, সূর্পনখার নাসিকা ছেদের প্রবাদ হইতে 'নাসিক' নামের ব্যুৎপত্তি। এই কি সত্যই সেই রামায়ণের পঞ্চবটী? ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা যায় না। পাণ্ডারা নিজেদের লাভ হিসাবে যাহা বলে তাহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না; কিন্তু তাদের কথায় সন্দেহ যাই থাক্ এটা ত নিশ্চয় যে কবিকীর্ত্তিত পুরাণো গোদাবরী এখনো যেমন তেমনিই রহিয়াছে। সেই নদী তাহার প্রাচীন স্মৃতি লইয়া এখনো পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গগুণে নাসিকের যে পদগৌরব তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

নাসিকে একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, তাহার নাম আবদুল হক। লোকটা খুব মিশুক, চতুর ও উদ্যমশীল, নিজগুণে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে দাসীরূপে বশ করিয়া লয়। আমাদের সঙ্গে তিনি ভাই বোন পাতাইয়াছিলেন—আমি তাঁর ভাইসাহেব, আমার স্ত্রী ভানসাহেব। আমাদের বাড়ী সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেন ও আপনার জীবনের সমস্ত ভাবি সঙ্কল্প লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। সে সময়ে তিনি পুলিশের এক সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে হাইদ্রাবাদে গিয়া নিজামের চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমে নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রমে উচ্চপদে আরোহণ করিলেন ও যিনি সামান্য আবদুল হক নামে পরিচিত ছিলেন তিনি সর্দ্দার দিলার-উদ্দৌলা উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবী উপার্জ্জন করিলেন। হাইদ্রাবাদে তিনি নিজামের ষ্টেট রেলওয়েতে নিযুক্ত হইয়া সেই সংক্রান্ত কার্য্যে ইংলণ্ডে গিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বোম্বায়ে তিনি বিস্তর বিষয় সম্পত্তি করিলেন এবং সেখানকার এক নামাঙ্কিত বড় হোটেল (Watson's Hotel) ক্রয় করিয়া তাহার অধিস্বামী হন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তিনি তাঁহার গরীব ভাইবোনকে ভোলেন নাই। আমরা যখনি বোম্বায়ে যাইতাম, নিজ হোটেলে আমাদের আতিথ্য করিতেন, আমাদের খাইখরচার বিল পাঠাইতেন না। ভান সাহেবের খাতিরে আমরা তাঁর হোটেলে গিয়া দিব্য আরামে কাল কাটাইতাম। অনেক বৎসর হইল, তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। মহম্মদী আইন অনুসারে আমরা তাঁর বিষয়ের অংশীদার। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার এক বন্ধু আমাকে রঙ্গ করিয়া বলেন "আমি ভেবেছিলাম মৃত্যুর সময় ভাইসাহেব তাঁর উইলে তোমাদের স্মরণ করবেন, কৈ তা ত কিছু করলেন না?" করেন নাই সত্য, আমরাও তাঁর বিষয়ের অংশ দাবী করিয়া কোর্টে গিয়া মকর্দ্দমা করি নাই।

লেনা

লেনার গুহামন্দির সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরস্থিত একটি বৌদ্ধ মন্দির। ভিতরে অনেকগুলি প্রস্তরখোদিত বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্য দেখা যায়। ইহার কোন কোন অংশের নির্ম্মাণকাল খৃষ্টাব্দ ১৫০, কতক বা আরো প্রাচীনতর বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরগুলি এখনো একপ্রকার অক্ষত রহিয়াছে এবং গুহার অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিগুলির অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে।

পশ্চিম ভারতে গৃহনির্ম্মাণ কৌশলের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকানেক গুহামন্দির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ইহাদের কতক হিন্দু, কতক বা বৌদ্ধ-মন্দির। ইহাদের মধ্যে এলিফাণ্টা গুহামন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এলিফাণ্টা

যিনি বোম্বায়ে ব্যাড়াইতে আসিয়াছেন তিনি যেন এলিফাণ্টা না দেখিয়া বাড়ী না ফেরেন। এই এলিফাণ্টা দ্বীপে যে সমস্ত গুহামন্দির আছে তাহা পাহাড় খুদিয়া নির্ম্মিত।

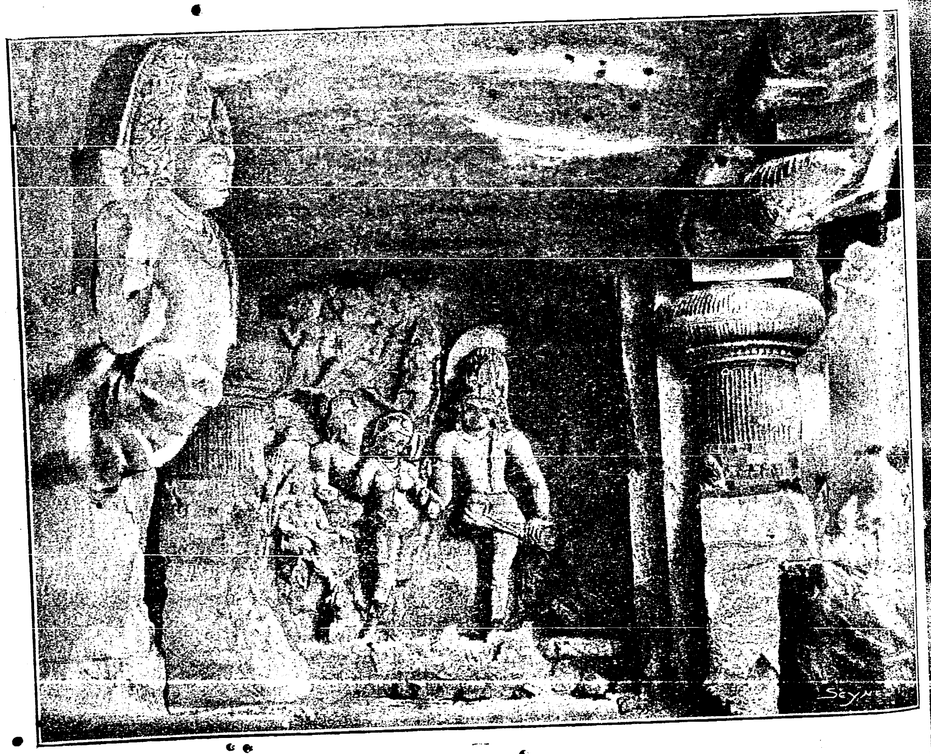

এলিফাণ্টা গুহা

আপলো বন্দর হইতে ষ্টীমারে করিয়া এই দ্বীপে এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়, বন্দর বোটে করিয়া গেলে আর একটু বেশী সময় লাগে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বড় বড় পাথর ফেলিয়া সমুদ্রতীর হইতে গুহামুখ পর্য্যন্ত এক সোপানপথ প্রস্তুত, কিন্তু ভাটার সময়

নৌকা কাছে ঘেঁসিতে পারে না, তীর হইতে অনেক দূরে রাখিতে হয়। নামিবার স্থানে পূর্ব্বকালে একটি হস্তীর বিশাল পাষাণমূর্ত্তি ছিল, তাহা হইতে পোর্ত্তুগীজ লোকেরা এই দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। দ্বীপে এইক্ষণে এই হস্তীমূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট পিণ্ড বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। গুহার প্রবেশদ্বারটি বেশ বড়, ও সারি সারি চারি স্তম্ভের মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদভার বহন করিতেছে। স্তম্ভের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া ৪১, তাহার কয়েকটি ভগ্নদশাপন্ন। মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩০ ফীট দীর্ঘ ও পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত ততটা প্রস্থ।

এই মন্দির এইক্ষণে নিত্যনিয়মিত পূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি কোন কোন শিব উৎসবে তথায় হিন্দুযাত্রীর সমাগম হয় ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এক হিন্দু মেলা জমে। এলিফাণ্টা যে শৈবমন্দির এই মেলার প্রচলনই তাহার প্রমাণ কিন্তু তাহার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্দিরের অভ্যন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ মূর্ত্তিই শৈবমূর্ত্তি। উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার বামে বিষ্ণু দক্ষিণহস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ধরিয়া আছেন; দক্ষিণে মহাদেব—তাঁহার হাস্যদৃষ্ট করস্থিত ফণিফণার উপর নিপতিত! নরকপাল ও বিল্বপত্র তাঁহার শিরোভূষণ।

ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণে অর্দ্ধ নারীশ্বর। বামার্দ্ধ গৌরী ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্ত্তি। মহাদেবের চারি হস্তের এক হস্ত নন্দী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এই মূর্ত্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও বামে গরুড়বাহন বিষ্ণু। উপরিভাগে ও পশ্চাতে অন্যান্য দেবদেবর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্রদেব ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীন।

ত্রিমূর্ত্তির বামে হরপার্ব্বতীর বিশাল মূর্ত্তিদ্বয়। হরশির হইতে গঙ্গাযমুনা সরস্বতী নিস্যন্দিত। শিবের দক্ষিণে তাঁহার অন্যান্য অনুচরগণ। পার্ব্বতী শিবের দিকে ঝুঁকিয়া এক পিশাচীর উপর বামহস্তে ভর দিয়া আছেন, তদুপরি গরুড়াসন বিষ্ণু। সর্ব্বোপরি ছয়টি মূর্ত্তি, তাহার দুইটি নারী অন্যগুলি নরমূর্ত্তি।

ত্রিমূর্ত্তির আরো একটু বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হরপার্ব্বতীর বিবাহসভা। একজন পুরোহিত লজ্জাশীলা বধূকে আগু বাড়াইয়া দিতেছেন।

অপর দিকের প্রকোষ্ঠে গণেশের জন্ম-অভিনয়। হরপার্ব্বতী কৈলাসপর্ব্বতে একাসনে উপবিষ্ট—আকাশ হইতে দেবগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পার্ব্বতীর পশ্চাতে একটি ধাত্রী শিশু কোলে করিয়া আছে।

দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে ফিরিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে-দেখিবে রাবণ কৈলাসপর্ব্বত সরাইয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এদিকে পর্ব্বত কম্পমান দেখিয়া পার্ব্বতী ভয়ে জড়সড়। মহাদেব তাঁহার পদাঙ্গুলি দ্বারা রাবণের শিরোপরি পর্ব্বত এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে তাহার তলে দশানন

দশসহস্র বৎসর চাপা পড়িয়া থাকেন, অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

ইহা হইতে পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত খোদিত দেখা যায়। অষ্টভুজ কপালমাল রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দক্ষবধে নিযুক্ত—তাঁহার উপরিস্থিত একলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট দেবগণ হত্যাকাণ্ড সভয়ে দর্শন করিতেছেন।

আরো কতক পা চলিয়া গেলে প্রবেশ-দ্বারের কাছাকাছি মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরবমূর্ত্তি ও যোগাসনস্থিত মহাযোগী এই মূর্ত্তিদ্বয় দৃষ্ট হইবে।

এই সকল দেবমূর্ত্তি কল্পনাযানে আমাদিগকে দেবসভায় লইয়া যায়। কোথাও দ্বারপালগণ পিশাচসঙ্গে যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান, কোথাও হরপার্ব্বতীর বিবাহোৎসব, কোথাও কৈলাসে তাহাদের ঘরকন্না, কোথাও মহাদেব ভূতগণসাথে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্ত, কোথাও তিনি কপালধারী রুদ্রমূর্ত্তি, কোথাও ধ্যানমগ্ন মহাযোগী। কোন স্থানে দেখিবে কমলাসন ব্রহ্মা, কোথাও শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু, কোথাও ঐরাবতবাহন ইন্দ্রদেব, গণেশ ঠাকুর, কামদেব, তিলকধারী জটায়ু, কৈলাসতলে রাবণ, কোথাও গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্ত্তিমতী। দুঃখের বিষয় যে খোদিত মূর্ত্তি সকল বিকলাঙ্গ, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাদিগকে পূর্ব্বকালে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এক ত কালের দুর্ব্বার হস্ত, তাহার উপর মুসলমান ও খৃষ্টানের অত্যাচার। এই মন্দির তাহার পূর্ণযৌবনে যে কি সুন্দর ছিল তাহার চিত্র কল্পনাতেই রহিয়া যায়।

অজন্তা

এতদ্ভিন্ন কার্লী কান্হেরী সালসেট প্রভৃতি গুহামন্দির আরো অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে অজন্তা ও ইলোরা এই দুইটি সবিশেষ বর্ণনীয়। এই দুইটি ক্ষেত্রই নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভূত। অজন্তার মন্দির পশ্চিম ঘাটের এক পাহাড়ে খোদিত, খানদেশে থাকিতে একবার ইহা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের গা দিয়া একটি ঝরণা পড়িতেছে, ৩০ ফীট উচ্চ হইতে পড়িয়া নীচে কতকগুলি জলকুণ্ড সৃজন করিয়াছে, এই নিম্নভূমি একটি সুন্দর বনভোজনের স্থান। গুহার পথে ঝরণাটি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। গুহাগুলি একটী নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত, পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খোদিত। দূর হইতে সেগুলি সারি সারি ছোট ছোট পায়রার খোপের মত দেখায়। গুহাগুলি দুই শ্রেণীর, বিহার ও চৈত্য। চৈত্য ভিক্ষুদের ভজন পূজনের স্থান, বিহার তাহাদের বাসগৃহ। খানিকদূর গিয়া সারি সারি বিহারের বারাণ্ডার থাম আর গোল গোল চৈত্য গুহার খিলানের আকৃতি চোখে পড়ে। এই পার্ব্বত্য আশ্রমটী অতি মনোহর নির্জ্জন স্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে।

গুহাচিত্রেতেই অজন্তার বিশেষত্ব। তাহার সকল গুহাই যে চিত্রিত তাহা নহে। সব শুদ্ধ প্রায় ২৮টা গুহা আছে তাহার ৭।৮টির গায়ে ছবি আঁকা দেখা যায়। প্রথম নম্বর গুহা হইতে বুদ্ধদেবের বাল্য কাহিনী আরম্ভ করিয়া ২৬ নম্বর গুহায় তাঁহার পরিনির্ব্বাণের

চিত্র দেওয়া আছে। এবং প্রসঙ্গ ক্রমে জাতকাদি গল্পের ছবি আছে। অজন্তার স্থানে স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও চিত্রাবলীর অনেকগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

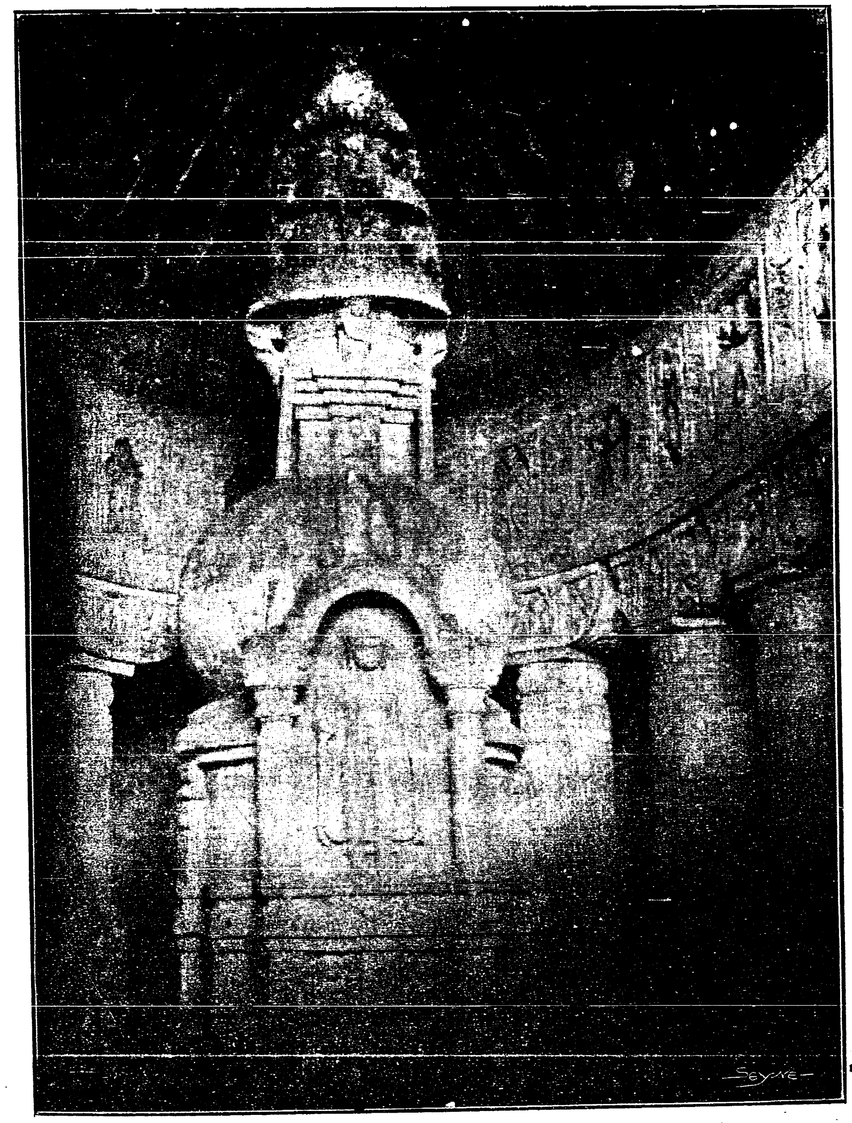

১৯নং গুহার ভিতরের স্তূপ ও বুদ্ধমূর্ত্তি

অবশিষ্ট গুলি চিত্রকরেরা যতদূর সাধ্য সংস্করণ চেষ্টা করিতেছেন এবং আবশ্যক মত প্রতিলিপি তুলিয়া লইতেছেন। আমাদের একটি আত্মীয়, অসিতকুমার হালদার, আর্ট স্কুলের ছাত্র,

অজন্তার শিল্প দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন "অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো তাঁকে অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনো বর্ত্তমান আছে আমরা যদি কেউ আজীবন ধরে সেগুলির প্রতিলিপি করি, তবে এ



অজন্তা গুহার একটি নারী চিত্র

জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কি না সন্দেহ।" মোগল চিত্রের তুলনায় এই সকল চিত্রের কথায় তিনি বলিতেছেন "মোগল ছবি সাধারণতঃ ছোটই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মত্ব হিসাবে সে সকল চিত্র অতুলনীয় কিন্তু প্রশান্ত ভাবপূর্ণ বড় বড় চিত্র দেখতে গেলে অজন্তাকেই প্রাধান্য দিতে হয়।"

Mrs. Herringham নামে একটি চিত্র-শিল্পী মহিলা অজন্তার চিত্রোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সেই সকল চিত্রের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা তাঁহার মুখে আর ধরে না। অসিত কুমারকে তিনি বলিতেন "আমাদের দেশে এত প্রাচীন কালের আঁকা এ রকম নিখুঁত ছবি থাকলে আমাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও তাদের বেশী যত্ন করতুম। বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।" এই বিদুষী মহিলার কার্য্য শেষ হইলে এই সকল অপূর্ব্ব গুহাচিত্রের অনেক তথ্য জানা যাইবে, আশা করা যায়।

এই সকল প্রাচীন চিত্র যেমন অজন্তার গৌরব, তাহার খোদিত মূর্ত্তিগুলিও তেমনি প্রশংসনীয়। ভিন্ন ভিন্ন গুহা বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত। যৌবনে তথাগত, মাতৃক্রোড়ে শিশু, ষড়রিপু প্রলোভনে বিজয়ী ধ্যানীবুদ্ধ, পরিনির্ব্বাণশায়ী বুদ্ধ—বুদ্ধদেবের এই ছোট বড় নানান্ মূর্ত্তি শিল্প কৌশলে অদ্বিতীয়। বুদ্ধমূর্ত্তি ভিন্ন অনেকানেক নরনারী ও হস্তী মূর্ত্তি এবং ভিক্ষুদের শয্যাগৃহ প্রভৃতি খোদিত জিনিষ আছে সকলি চমৎকার। অসিতকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে খোদিত চিত্রের গঠন ও সজ্জার সহিত লিখিত চিত্রের গঠনাদির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

এই সমস্ত বৌদ্ধ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল ৮০০ বৎসর ব্যাপী—অশোকের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ যুগের শেষভাগ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। শেষ ভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন ব্রাহ্মণ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে, মন্দির নির্ম্মাণেও সেই মিলনের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

৩ কারওয়ার

কারওয়ার কর্ণাটকের প্রধান নগর। আমি বোম্বায়ে যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি, তন্মধ্যে কারওয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে সর্ব্বাগ্রগণ্য, ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি সুন্দর বন্দর, গিরি নদী উপবনে সুশোভিত। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউ গাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে। জজের বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্ম্মিত। সমুদ্র-তীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন প্রথমে অসহ্য বোধ হয়, ক্রমে অভ্যাস-বশতঃ তাহার কঠোরতা মন্দীভূত হইয়া যায়। সমুদ্রের দৃশ্য সকল সময়েই মনোরম আর সমুদ্র স্নানে বড়ই আরাম। সমুদ্রে সাঁতার দিবার আরাম, এমন অন্য কোথাও ভোগ করা যায় না। বন্দরের এই শৃঙ্খলবদ্ধ সমুদ্র পুরীর সমুদ্র অপেক্ষা অনেক শান্ত, সাঁতার দিয়া অনেক দূর যাওয়া যায়। বাঙ্গলার ক্রোশভর দূরে গুটেলী নামে একটি ছোট্ট পাহাড় আছে, উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, সেখানে গিয়া আমাদের অনেক সময় বন ভোজন হইত। সমুদ্রের নানা জাতীয় সুস্বাদু মৎস্য আমাদের ভাগে আসিত; মৎস্যজীবির ভাগ্যে এমন স্থান সহজে মেলে না। বন্দরে আঞ্জদীপ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়, পোর্ত্তুগীস নাবিকগণ ইউরোপ হইতে ভারতে

আসিয়া যেখানে প্রথম পদার্পণ করে সে এই দ্বীপ। কালানদীতে অনেক সময় আমরা নৌকা করিয়া বেড়াইতাম তাহার পরপারে হাইদার আলির গিরিদুর্গ একটি দেখিবার স্থান। কানাড়া জেলায় আরো কত কত দর্শনীয় জিনিস আছে তন্মধ্যে গেরসপ্পা জলপ্রপাত ভুবনবিখ্যাত। তীর্থস্থানের মধ্যে গোকর্ণ তীর্থ উল্লেখ যোগ্য, যাহা রঘুবংশে 'গোকর্ণ নিকেতমীশ্বরং' বলিয়া বর্ণিত—আমরা কারওয়ারে থাকিতে সেই তীর্থে গিয়া মহাদেবের মন্দির দর্শন করিলাম।

নারেল পুণম

বোম্বাই, কারওয়ার এই সকল সমুদ্র তীরের জায়গায় একটা পরব হয় যা অন্যত্রে নাই—তার নাম "নারেল পুণম," শ্রাবণী পূর্ণিমা তার সময়। এই সময় বর্ষা ঋতুর অবসান বলিয়া ধার্য্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক, পি এণ্ড ও কোম্পানির জন্য নয়) সমুদ্র পথ উন্মুক্ত, শুভযাত্রা উদ্দেশে ফলফুল নারিকেল উপহার দিয়া সমুদ্রের আরাধনা করিতে হয়। হিন্দুগণ ছোট বড় সকলে সাজসজ্জা করিয়া নারিকেল ও পুষ্পহস্তে সমুদ্রাভিমুখে বাহির হয়। লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগর অর্চ্চনায় সম্মিলিত—পুরোহিতের মন্ত্রপূত চাউল দুধ নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবের ভোগে আইসে তাহা নয়। নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একদল কুলী তাহা সাঁতার দিয়া ধরিতে যায় ও কাড়াকাড়ি করিয়া যে পারে বরুণের ধন লুট করিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না, বরং উদার হস্তে তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করেন। বোম্বায়ে এই উৎসবে লোকের বিশেষ উৎসাহ। ময়দানে মেলা বসিয়া যায়। কোথাও খ্যালনা বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পালওয়ানের মল্লযুদ্ধ চলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জেতার প্রতি দর্শকমণ্ডলীর করতালি সাবাসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও একদল নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের জন্য কতপ্রকার ফন্দী করিয়া ব্যাড়াইতেছে। ওদিকে একজন গণকঠাকুর হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণিয়া দিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই তাঁহাতে দৈবশক্তি মূর্ত্তিমতী। অন্যত্রে নাগর দোলায় বালকেরা ঘূরপাক দিতেছে। নানা দিক হইতে লোকজনের যাতায়াত, সকলেই দুদণ্ডের জন্য আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তৎপর।

কানাড়ায় চন্দন বৃক্ষ জন্মে, সেখানকার চন্দন কাঠের উপর নক্সাকাটা বাক্স টেবিল পরদা প্রভৃতি অনেক জিনিস তয়ের হয়। তাহাদের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। অনেকানেক কারিগর এই কাজ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কারওয়ারের কথায় কর্ণাটী নর্ত্তকীদের লোভনীয় নৃত্যগীতের উল্লেখ না করিলে এ প্রসঙ্গ অঙ্গহীন হইয়া পড়ে কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহার সবিস্তার বিবরণ হইতে বিরত হইলাম। একটি কথা মনে হইতেছে বলি, আমরা কারওয়ারে একবার একটি নর্ত্তকীর মুখে জয়দেবের কাব্যগীত শুনিয়াছিলাম। গান অতি চমৎকার, আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের বড় বড় পণ্ডিতের

মুখেও শুনা যায় না। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকদের প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিবার রীতি আছে কিন্তু সংস্কৃত যে তাহাদের মুখে কত ভাল শুনায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। কর্ণাট সম্বন্ধীয় আরো অনেক বলিবার আছে—নূতন জিনিস নূতন নূতন লোক কিন্তু সে সব অনেক কালের কথা, লিখিবার মত তেমন স্পষ্ট মনে হইতেছে না। জায়গাটার কেবল এক দোষ যে যাতায়াতের অসুবিধা। সপ্তাহে সপ্তাহে একটা মেলষ্টীমার আমাদের ডাক বহন করিয়া আনিত; কিছুকাল পর তার আসা বন্ধ হইল, তখন বর্ষাকালে কারওয়ার যেন বন্দীশালার মত বোধ হইত। কিন্তু

একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ!

বহুগুণে একটি দোষ জানা নাহি যায়,
চাঁদের কলঙ্ক যথা কিরণে লুকায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চা প্রসঙ্গ

বহুদিন অবধি এদেশে চায়ের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেরূপ লাভ জনক দাঁড়াইয়াছে এবং জন সাধারণের যেরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় চা সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করিলে তাহা নিতান্ত অসাময়িক এবং অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আসামের সর্ব্বত্র ও বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায়—প্রধানত দারজিলিং ও জলপাইগুড়ীতে যথেষ্ট চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমীতে চা আবাদ হইতেছে এবং চা ব্যবসায়ের দ্বারা এই সকল স্থানের যেরূপ উন্নতি এবং পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। যে সকল স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে বন্য শ্বাপদসঙ্কুল অনুৎপাদিকা বন্ধুর ভূমিরূপে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত ছিল সেই সকল স্থানে অরণ্যাণী এখন বিরলপাদপ ও হিংস্র জন্তু শূন্য হইয়া পরম রমণীয় চা বাগানে পরিণত হইয়াছে এবং জনকোলাহলমুখরিত হইয়া কোটি কোটি মুদ্রার সংস্থান করিতেছে।

জলপাইগুড়ী জেলার একদুয়ার প্রদেশেই প্রায় দুই শতের অধিক বাগান রহিয়াছে; তন্মধ্যে প্রায় ৩০টি বাগান দেশীয় লোকের দ্বারা যৌথকারবারে চালিত। এই ৩০টি বাগানের মোট ভূমির পরিমাণ ৩০,০০০ একর। দুয়ার প্রদেশস্থ সমস্ত বাগানের ভূমির পরিমাণ প্রায় ২,৪৬,০৬৩ একর। তন্মধ্যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৯০,৮৫৭ একরে চা আবাদ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ১,৫৫,২০৪ একর ব্যবসায়ীদের অধীনে আছে; ঐ অবশিষ্ট অংশ ক্রমে আবাদ হইবে। গত বৎসর ৮৩,৪২১ একর জমী হইতে "পাতিতোলা" হইয়াছে! মোট উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৪৮,৮২০,৬৩৭ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রতি একরে গড়ে ৫১৪ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর যেরূপ বাজার দর গিয়াছে তাহাতে ঐ মূল্য প্রায় ২,১৩,৫৯,০২৭ টাকা। এই সকল বাগানে গড়ে দৈনিক ৭৫,৩১৫ কুলি কাজ করিয়াছে; ইহার মধ্যে ৫৬,৩৯৩ স্থায়ী ও অবশিষ্ট অস্থায়ী কুলি।

জলপাইগুড়ীর দেশীয় সমিতি চালিত চাবাগানসমূহের বিশেষত্ব।—জলপাইগুড়ীতে দেশীয় চালিত চা-বাগান সকলের সংখ্যা ইউরোপীয় বাগান অপেক্ষা অত্যন্ত কম হইলেও, লাভের হার দেশীয় বাগানে অত্যন্ত বেশী। দেশীয় বাগান ইউরোপীয় বাগান অপেক্ষা পাঁচগুণ, সাতগুণ, এমন কি দশগুণ অধিক লাভও দিয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটি দেশীয় চা বাগানের নাম ও লাভের শতকরা বার্ষিক হার প্রদর্শিত

হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবসায়ের ইতিহাসে চা কিরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে :—

যে বৎসর শতকরা যত টাকা লাভ দিয়াছে				
১৯০৬	'০৭	'০৮	'০৯	'১০
গুর্জ্জন ঝোরা বাগিচা				
৮০	১২৫	১১০	১৫০	১১০
চা মুর্চি বাগিচা				
১০০	১২০	৫০	১২০	১৫০
বর্ণারপুর (আসাম)				
৪০	৬০	৩২	৪৮	৪৮

জলপাইগুড়ীর প্রত্যেক বাগিচাই আশাতীত লাভ দিয়া আসিতেছে। উপরিউক্ত প্রথম দুইটি বাগানের প্রতি ৫০৲ টাকার এক এক অংশ আজ কাল ৯০০।১০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রামঝোরা প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বাগান যাহা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে এবং যাহা এখনও লাভ দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহার ৫০৲ টাকার অংশের বর্ত্তমান বাজার দর ৩০০।৩৫০ টাকা।

আসামই ভারতীয় চা ব্যবসায়ের আদি লাট। আবার চায়ের উপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী শ্রীহট্টস্থ করিমগঞ্জেই অধিক; সুতরাং শ্রীহট্ট সম্বন্ধেও ২।১টি কথা বলা সঙ্গত। এই জেলাতে প্রায় ৮০, ০০০ একর জমিতে চা আবাদ হইতেছে; এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ীদের হস্তগত অনাবাদি জমীর পরিমাণও অল্প নহে। বিগত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ৮০,০০০ একর জমিতে প্রায় ৩, ৮৭, ৯২, ৯৫১ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রচলিত বাজার দর অনুসারে ঐ চা-র মূল্য প্রায় ১, ৫০, ০০,০০০ টাকা। তন্মধ্যে দেশীয় চালিত বাগানে প্রায় ১৫, ০০, ০০০ পাউণ্ড জন্মিয়াছিল। উহার মূল্যও ৫, ৫০, ০০০ টাকার ন্যূন নহে। ঐ জেলায় বিশেষত করিমগঞ্জ মহকুমায়—চায়ের উপযোগী যথেষ্ট জমী রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন সমগ্র আসাম ও বঙ্গদেশ মধ্যে করিমগঞ্জস্থ ভূমির ন্যায় উৎপাদিকা শক্তি অন্য কোন ভূমিরই নাই।

চায়ের দ্বারা দারজিলিংএর যে কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্ন লিখিত বিবরণ হইতে বেশ প্রণিধান করা যাইবে। যদিও বহু পূর্ব্ব অবধিই ঐ জেলায় চা আবাদ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী ১৮৭৪-০৫ সাল হইতে তথায় রীতিমত চাষ আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মোট ১৩টি মাত্র বাগান খোলা হয়। ঐ সমস্ত বাগানের ভূমি পরিমাণ মাত্র ৮১৪ একর ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে কার্য্যক্ষেত্র এরূপ বর্দ্ধিতায়ন হইয়াছে যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এক মাত্র রাঁচি জেলা হইতেই ৮০, ০০০ কুলি বাগানে কাজ করিবার জন্য আনয়ন করা হইয়াছিল। আদমসুমারিতে প্রকাশ যে বিগত ১৭।১৫ বৎসরে দারজিলিংএর লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চা-বাগান সমূহে কুলির আমদানিই ইহার এক মাত্র কারণ। অধুনা ৩৬৮ বর্গ মাইল ভূমি ব্যাপিয়া বাগান খোলা হইয়াছে ১২৭ বর্গ মাইলে রীতিমত চা উৎপন্ন হইতেছে।

জলপাইগুড়ীস্থ জনসাধারণের মনের উপর চার প্রভাব।—এই ক্ষুদ্র সহরের অধিবাসীবর্গের মনের উপর চা যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা যিনি অন্তত কিছু দিনের জন্যও এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। এখানে চায়ের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই বলিলেই হয়। এমন লোক অতি অল্প যাঁহারা সমস্ত দিনে অন্তত এক বারও চা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না কিম্বা শোনেন না। উকীল মোক্তারগণ বারলাইব্রেরিতে গিয়া চায়ের গল্প করিতেছেন, স্বল্পবিত্ত মসিজীবি কেরাণীগণের আফিসে গিয়া চায়ের গল্প করা তাঁহাদের জীবনের একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

রমণীগণ তাঁহাদের মধ্যাহ্ন অবসর চায়ের গল্পে কাটাইতেছেন ও কাহার স্বামীর কোন্ বাগানের কত অংশ আছে তাহা প্রকাশ করিবার গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। বালক পুত্র বিধবা মাতার চায়ের অংশ তাহার নিজ নামে লেখাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। দুবেলা মাকে তাগিদ দিতেছে। মোট কথা, আবালবৃদ্ধবনিতা—

ধনী, নির্ধন, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, হাকিম, কেরাণী পেয়াদা, দোকানদার কেহই চায়ের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। এমন কি, অন্যান্য স্থানে বর নির্ব্বাচনে, বরের বাড়ী ঘর দ্বোর আছে কি না, জমি জারাত আছে কি না ইত্যাদি বিষয় খোঁজ করিয়া থাকে; কিন্তু এখানকার লোকের অবস্থার মাপ কাঠি চা-বাগানের অংশ। অমুকের চা বাগানের কতটা অংশ আছে জানিতে পারিলেই আর অন্য খোঁজের দরকার হয় না, তাহার অবস্থার সচ্ছলতা প্রতিপাদিত হইয়া যায় ও তাহার সহিত মেয়ের বিবাহের আর কোন বাধা থাকে না।

চা বাগানের অংশ লইবার জন্য মারামারি কাড়াকাড়ি আরও আমোদজনক। কোন একটি বাগান খোলা হইতেছে খবর পাইবামাত্র দলে দলে লোক সেই ভাবী অধ্যক্ষের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে এবং অংশের জন্য সহস্র সহস্র আবেদন পত্র পড়িতে থাকে। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই সেই বাগানের মোট অংশসংখ্যার পাঁচগুণ, সাতগুণ আবেদন ভাবী অধ্যক্ষের হস্তগত হয়। লোকে টাকা লইয়া অধ্যক্ষের খোসামোদ করিতে থাকে এবং ভিন্ন স্থান হইতেও রাশি রাশি অর্থ ডাকযোগে আসিতে থাকে। এইরূপে ভাবী অধ্যক্ষের এমনি দশা হয় যে তিনি সকলকেই অংশ দিতে সমর্থ হন না, এবং এই অসামর্থ্য হেতু অনেক মনোমালিন্য ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় সহরের মাতব্বর লোকদিগের মধ্যেও অংশ লইয়া বিশেষ গোলযোগ বাধিতে দেখা যায়। বস্তুত এখানে চা বাগান খুলিতে টাকার অভাব মোটেই হয় না।

কিন্তু আসামের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। সেখানে চা বাগানের অংশ বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়! এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। আসামে অংশ ক্রয়করণ-সমর্থ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ও সেখানকার বাগান সমূহের মূলধন সাধারণতঃ এখানকার কোম্পানি সকলের মূলধন অপেক্ষা বেশী; আমাদের বোধ হয় সেই কারণেই আসামের ব্যবসায়ীদের এই অসুবিধাটুকু ভোগ করিতে হয়। যাহা হোক, জলপাইগুড়ীতে চা-র উপযোগী ভূমি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এখানকার ব্যবসায়ীগণ আসামে গিয়া বাগান খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসামক্ষেত্রে চায়ের উপযোগী যেরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি রহিয়াছে ও সেখানকার রাজস্ব আদি যেরূপ সুবিধাজনক, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর কৃপায়, সেখানেও চা ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীগণ জলপাইগুড়ীর ন্যায় সফলতা লাভ করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিবেন।

চা-দ্বারা জলপাইগুড়ীর উন্নতি।—চায়ের কল্যাণে সমগ্র দুয়ার প্রদেশ যেন একটি বিস্তীর্ণ কারখানায় পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বাগানের প্রকাণ্ড চিম্‌নি সকল অনবরত ধূম উদ্গীরণ করিয়া সগর্ব্বে তাহাদের কার্য্যশীলতার পরিচয় দিতেছে। ইউরোপীয়গণের রমণীয় বাঙ্গলা সকল কখন বা পর্ব্বত গাত্রে কখন বা সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। বাগানের লাল রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়া ছুটিতেছে ও ট্রলি লাইনের উপর দিয়া "পাতি" পূর্ণ ট্রলি সকল সশব্দে দৌড় দিতেছে। বিদ্যুতালোক প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; অর্থাৎ সমৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ সমস্তই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বেঙ্গল দুয়ার রেলপথ শুদ্ধ এই চা বাগান সমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেলপথ, বাগান সকলের দ্বারে দ্বারে উহার সেবা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বত্রই ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ-আফিস স্থাপিত হওয়ায় সংবাদ প্রেরণের কিম্বা গ্রহণের অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে। এ প্রদেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা জলপাইগুড়ীতে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই প্রদেশ লোকপূর্ণ করিবার জন্য সরকারবাহাদুর পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ণের দ্বারা ঔপনিবেশিক আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু এ সমস্ত উপায় তেমন ফলদায়ক হইতে পারে নাই। প্রবল পরাক্রান্ত সরকার বাহাদুর যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, চা-ব্যবসায় উহার যাদুদণ্ড বুলাইয়া সে কার্য্য

অনায়াসে সাধন করিয়াছে; বিগত দশ বৎসরে আলিপুর দুয়ার প্রদেশের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

এই ব্যবসায় উপলক্ষে প্রায় ৩০০ শত ইউরোপীয় দুয়ারে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের আমোদ আহ্লাদের জন্য কোথায় বা ঘোড়দৌড়, কোথায় বা পোলো, রাগ্‌বি, হকি প্রভৃতির বন্দোবস্ত দুয়ার প্রদেশ সজীব করিয়া রাখিয়াছে; চাকরী ব্যবসায়ী অসংখ্য বাঙ্গালী বাবু, ডাক্তার ইত্যাদিও তাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন; আর সহস্র সহস্র কুলি প্রত্যেক বৎসর ভিন্ন জেলা হইতে আমদানি হইতেছে, কতক কার্য্যান্তে ফিরিয়া যাইতেছে কতক তথায় বসবাস করিতেছে।

এই চা-করদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "ক্লাব" গৃহই জলপাইগুড়ীর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। ইহার সংস্থান সংরক্ষণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় বাগান সকলের সম্পাদকের কার্য্যালয় প্রায়শ জলপাইগুড়ী সহরে স্থাপিত। এই সমস্ত আফিসেই বাগান সকলের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাগান চালাইবার জন্য সময় সময় অর্থের অভাব হয় ও সে অর্থ ঋণ করিয়া চালাইতে হয়; ঋণ গ্রহণ করিতে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য এ সহরে ৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্ক বেশ চলিতেছে এবং আশানুরূপ লাভ দিতেছে। বস্তুত জলপাইগুড়ী ক্ষুদ্র সহর হইলেও ইহা একটি সুন্দর বাণিজ্য কেন্দ্র।

যে চা সভ্য জগতের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, যাহার জন্য বহু গবেষণা, পরীক্ষা, অর্থ ব্যয় প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রাথমিক ইতিহাস, ক্রমোন্নতি, প্রসার, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি একবার আলোচনা করা যাউক।

প্রাথমিক ইতিহাস *।—বহু প্রাচীন চীন অভিধানে কিয়া (kia) এবং কু-টু (k'u-tu) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। (k'u) শব্দের অর্থ তিক্ত ও টু (tu) শব্দ, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, উহার বিশেষ অর্থ চা। চীন শব্দ চা (ch'a) অপেক্ষা কৃত আধুনিক, এবং উহা খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে টু শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে যদিও চা শব্দ চীনের অতি প্রাচীন গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে, তথাপি উহা ৭ম কিম্বা ৮ম শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতে চীন দেশে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে নাই। চা-র প্রচলন চীনদেশে বহু পুরাতন হইলেও, বোধহয়, চীনবাসীরা পূর্ব্বে উহা পানীয়রূপে ব্যবহার করিত না। ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাটের শ্বশুর ওয়াং মেং প্রথমত চা পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ঐ পানীয় অত্যন্ত তিক্ত হইত বলিয়া তাঁহার বন্ধুগণের অধিকাংশই অসুস্থতার ভাণ করত উহা পান করিতেন না। চা-পু (ch'a-pu) নামক চা সম্বন্ধীয় চীনগ্রন্থ ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় প্রকাশিত হয়; সেই গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে একজন পুরোহিত সম্রাট ওয়েন্‌টিকে (৫৮৯ ৬০৫ খ্রীঃ অঃ) শিরঃপীড়া নিবারণের জন্য চা পাতা সিদ্ধ করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ধর্ম্ম নামক কোন ভারতীয় রাজপুত্র জাপানে চায়ের গাছ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, জাপানের জনশ্রুতি হইতে এইরূপ জানা যায়। যাহা হৌক, চীন জাপান প্রভৃতি দেশের লোক বহু পূর্ব্ব হইতে চা গাছের পরিচয় পাইলেও, চা পান যে ঐ দুই দেশেরও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অভ্যাস, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চীনে উহা ৮ম শতাব্দী হইতে রীতিমত বাণিজ্য দ্রব্যে পরিণত হয় ও ঐ সময় ট্যাং বংশের রাজত্বকালে চার উপর প্রথম রাজকর স্থাপিত হয়। কিন্তু জাপানে ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে উহার রীতিমত আবাদ আরম্ভ হয় নাই। ঐ দুই দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশে চা-পান রীতি অত্যন্ত আধুনিক; যেহেতু, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, পারসিক, আরবিক প্রভৃতি ভাষার প্রামাণিক গ্রন্থে চা গাছের, অথবা প্রস্তুতীকৃত চার কোন নাম পাওয়া যায় না।

T'u ch'a, spe, thsh প্রভৃতি চীন শব্দ এবং tsja cha ts-cha প্রভৃতি জাপ শব্দ প্রস্তুতীকৃত

* Sir George Watt's Commercial Products of India.

চায়ের সঙ্গে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং ঐ সকল শব্দ te, tay, the, cha, chai, cha প্রভৃতিরূপ পরিগ্রহ করিয়া ইউরোপের এবং এসিয়ার অধিকাংশ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রথম আমলের উচ্চারণ ও বর্ত্তমান উচ্চারণে প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে; যেমন, tea শব্দ; ইংরাজী ভাষায় আদৌ উহা te, tayএর ন্যায় উচ্চারিত হইত এবং সেই কারণেই কবিবর পোপ obey শব্দের সহিত উহার মিল দিয়াছেন, কিন্তু তার কিছুদিন পরই একজন ইংরাজ কবি উহার মিল করিয়াছেন MrsP-র সহিত। বোধ হয় সেই সময় হইতেই টে, টি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা cha, ch'a chai, ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া cha শব্দই গ্রহণ করিয়াছে।

যাহা হৌক, চীন ও জাপানে চাপান প্রথা বহু পূর্ব্ব অবধি চলিয়া আসিলেও, ভারতে বোধহয় উহার প্রচলন ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। চীন জাপান দেশে চাপানের বিষয় বহু ভ্রমণকারী বহুগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা চীনামাটির পাত্রে চা পান করিত এবং ঐ সমস্ত সরঞ্জাম বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত, ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন সময়ের ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে চা পানের উল্লেখ Albert de Mandelslo র গ্রন্থে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ঐ সময়েই ওলন্দাজগণ এই অভ্যাস ইউরোপে লইয়া যায় ও বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লর্ড আরলিংটন ইংলণ্ডে উহার প্রথম প্রবর্ত্তক। সে সময় লণ্ডন সহরে এক এক পাউণ্ড চা ১০০।১৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। ১৬৮৯ অব্দে বিলাতে আমদানি চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ শিলিং হিসাবে কর দিতে হইত। তখন চীনা চা মান্দ্রাজ ও সুরাট হইয়া বিলাতে আমদানি হইত। তখনও আসামে বন্য চা আবিষ্কৃত হয় নাই সুতরাং চীন হইতে চায়ের চারা এদেশে আনয়ন করা হয় এবং পরীক্ষা করিবার জন্য মালাবার উপকূলের কোন স্থানে উহার আবাদ করা হয়। বোধহয়, ইহাই ভারতে প্রথম চায়ের আবাদ।

চীন হইতে আনীত চারা এদেশে সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। বরং ঐ বিদেশী আমদানী এদেশে চায়ের চাষকে অনেকদিন পর্য্যন্ত বাধা প্রধান করিয়াছে। যদি প্রথম অবস্থাতেই আসামজাত চা লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইত, তাহা হইলে এই ব্যবসা আরও বহুবর্ষ পূর্ব্বে সমৃদ্ধিযুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম ব্যবসায়ীগণ বিদেশী চায়ের মোহে ভুলিয়া, আসাম-চা আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, বিদেশী চায়ের আবাদ আরম্ভ করেন, এবং সেজন্য পরে তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুশোচনা করিতে হয়; যেহেতু এই ভ্রমের জন্য তাঁহাদের বহু অর্থ, বহু শ্রম ও সময় বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আসামের অরণ্যে স্বচ্ছন্দ বনজাত চা-গাছের আবিষ্কার ভারতীয় চায়ের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেইদিন হইতেই চা-ব্যবসায়ীদের অদৃষ্টে শুভ সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাত আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই স্বর্ণকিরণমণ্ডিত ললাট আজ সমস্ত জগতে বিস্ময়চমক আনয়ন করিয়াছে।

প্রথমত চীন হইতে সর্ব্বস্থানে চা প্রেরিত হইত। কিন্তু তথায় গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, ভারতে চা উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন বিবেচিত হয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯৮৮ অব্দে বিশেষজ্ঞগণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে জ্ঞাপন করেন যে বিহার, রংপুর এবং কুচবিহার চা আবাদের উপযুক্ত স্থান। এসময় মেজর ব্রুস আসামে চা গাছ আবিষ্কার করেন। তারপর লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এক সমিতি গঠিত হয় ও চায়ের আবাদ শিক্ষা করিবার জন্য চীনে লোক প্রেরিত হয়। এই সময়ে জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব আসামে পুনরায় চা গাছ আবিষ্কার করেন; কিন্তু ঐ গাছ লইয়া সমিতির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতে থাকেন উহা টি নহে, ক্যামেলিয়া নামক একপ্রকার গাছ। যাহা হৌক, কিছুদিন পরে স্থির হয় যে ঐ গাছই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তখন প্রশ্ন উঠিল উহা কোথায় আবাদ করা যায়। আবার দুই মত;

কেহ বলিলেন হিমালয়ে, কেহ বলিলেন আসামই উপযুক্ত স্থান। অবশেষে স্থির হইল যে ঐ দুই স্থানেই চাষকার্য্য পরীক্ষিত হইবে। সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ইহাও প্রকাশ করিলেন যে বাগান যখন সরকারের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারিবে তখনই উহা ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা কোম্পানি বিশেষের হস্তে অর্পিত হইবে। তারপর আবাদ চলিতে লাগিল, এবং আসামের বাগান অবিলম্বে সরকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া উঠিল; কিন্তু হিমালয়স্থিত বাগান বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আসামজাত চা ১৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলাতে প্রেরিত হয়। সেই সময় হইতে দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম সরকারী বাগান।—শিবসাগর জেলায় জয়পুর নামক স্থানে প্রথম সরকারী বাগান খোলা হয় ও ১৮৪০ অব্দে এই বাগান আসাম কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হয়। ঐ আসাম কোম্পানিই ভারতীয় কোম্পানি সমূহের মধ্যে বৃহত্তম। প্রথম অবস্থায় প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানি বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার উন্নতি আরম্ভ হয়। উহার উন্নতি সাধারণের এরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে "রাতারাতি বড় মানুষ" হইবার প্রয়াসে বহু ব্যক্তি বাগান খুলিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে শ্রীহট্টে এবং কাছাড়ে চা গাছ আবিষ্কৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই এত বহুসংখ্যক বাগান খোলা হয় যে সমগ্র



চা বাগান

উত্তর আসাম প্রকাণ্ড একটি চা বাগানে পরিণত হয়। প্রায় এই সময়েই দারজিলিংএ চায়ের চাষ আরম্ভ হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই তাহা চাটগাঁ, ছোটনাগপুর ও দুয়ারে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৭ পর্য্যন্ত প্রায় ২ বৎসর চায়ের অবস্থা বড় মন্দা পড়িয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধুতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার কারণ। ঐ সমস্ত অনিষ্টমূলক কারণ তিরোহিত হইবার পর চা ব্যবসায় এরূপ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে এখন সমস্ত ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে চা উৎপন্ন হইতেছে ও এতদ্ব্যতীত লক্ষ লক্ষ একর জমী ব্যবসায়ীদের হস্তে আছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৪৮ পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল; কিন্তু এখন প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিলাতে যাইতেছে, অর্থাৎ প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে ১ পাউণ্ড চা তথায় পাইতেছে। ঐ পরিমাণ চায়ের মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

চার আবাদ।—অন্যান্য আবাদে ফলই চরম

লক্ষ্য, কিন্তু পাতাই চায়ের ফসল। প্রচুর পরিমাণ পাতা উৎপন্ন করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল। কিন্তু সেই পাতা কচি হওয়া চাই। বুড়া পাতায় চা হয় না; অতএব যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ কচি পাতা অনবরত গজাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং কচি অবস্থাতেই ঐ সকল পাতা তুলিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। পাতা কোন্ অবস্থায় কি প্রণালীতে উঠাইতে হয় তাহা না জানায় প্রথমত চা তেমন লাভজনক হইতে পারে নাই; কালসহকারে অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে।

স্থান ও আবহাওয়া।—চা আবাদের স্থান নির্ব্বাচন লইয়া প্রথমত মতদ্বৈধ চলিয়াছিল। কেহ বলিলেন, উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ স্থানই উপযুক্ত, কেহ বলিলেন, আসামে স্বচ্ছন্দ বনজাত চা রহিয়াছে অতএব আসামই চা আবাদের পক্ষে অনুকূল, আবার কেহ কেহ নীলগিরির পরিবর্ত্তনবিহীন আবহাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন। ফলে দেখা যাইতেছে যে উপরিউক্ত প্রত্যেক স্থানেই চা উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসকল বর্ত্তমান। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে উত্তর আসাম ও কাছাড়ই আদর্শ চা-ক্ষেত্র। দারজিলিং কুমায়ুন, নীলগিরি ও কাংগ্রা উপত্যকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য স্থানসমূহের বাগানও বেশ সুফলপ্রসূ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল স্থানের উৎপন্ন "পাতি"র পরিমাণ উত্তর আসাম ও দুয়ার অপেক্ষা অনেক কম। অপর পক্ষে আবার ঐ সমস্ত পার্ব্বত্য জেলার চা, শেষোক্ত স্থান সমূহের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উহার মূল্যও অনেক বেশী। নিম্ন আসামের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও গরম স্থান সমূহেও—যথা শ্রীহট্ট প্রভৃতিতে সন্তোষ জনক ফল লাভ হইতেছে। মোটের উপর গ্রীষ্মপ্রধান স্থান অপেক্ষা ঈষৎ শীতল (sub tropical) স্থান চায়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট। বায়ুমণ্ডল আর্দ্র হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। তাপের দৈনিক পরিবর্ত্তনও "পাতি" গজানর পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই পরিবর্ত্তন তাপ যন্ত্রের ৭৫ ডিগ্রী হইতে ৮৫ ডিগ্রী হইলেই বেশ ভাল হয়। যদ্যপি তাপ ৮৫ ডিগ্রির অনেক উপরে উঠে এবং বায়ুমণ্ডল অনার্দ্র হয়, তাহা হইলে চা উৎপন্নের পক্ষে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপর আসামের তাপ, সাধারণত বর্ষা কালে, ৯৫০ হইতে ৯৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তাপ যখন ৭০০ ডিগ্রির অনেক কম হয়, তখন একবার "পাতি" তুলিবার পর পুনরায় "পাতি" গজাইতে অনেক অধিক সময় লাগে; কিন্তু "পাতি" তোলা তখনও একেবারে বন্ধ হয় না। যখন তাপ একেবারে কমিয়া প্রায় জল জমিবার অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন কতক দিনের জন্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই "পাতি" তোলা হয়। সাধারণ তুষার পাতে "পাতি" কালো হইয়া যায়। কিন্তু অত্যধিক তুষারপাত হইলে কচি পাতার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বারিপাত অধিক না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অল্প কয়েক দিন পর পর বৃষ্টি হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অল্পদিন পর পর বৃষ্টি হইয়া সমস্ত বৎসরে ষাট ইঞ্চি জল হইলেই চলিতে পারে। ভারতীয় বাগান সমূহে সাধারণত প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বারিপাত হইতেও দেখা যায়। যতদূর সম্ভব সমস্ত বৎসরই বৃষ্টি হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কেন না, যে কোন ঋতুতেই অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়া চায়ের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। চাটগাঁ ও ছোট নাগপুরের চাক্ষেত্রসকল এই একমাত্র কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পলাভজনক।

ভূমির সংস্থান এবং মৃত্তিকা।—মৃত্তিকার অবস্থা এবং ক্ষেত্রের অনুকূল অবস্থানও, আবহাওয়া ইত্যাদির ন্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথম যুগের ব্যবসায়ীগণের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল যে পার্ব্বত্য উচ্চ ঢালু জমীই চায়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট। কিন্তু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে পার্ব্বত্য ক্ষেত্রের বিশেষ সুবিধা কিছুই নাই। ঢালু ক্ষেত্র অপেক্ষা বরং সমতল ক্ষেত্রই ভাল, বিশেষত ঢালু ক্ষেত্র দক্ষিণ কিম্বা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হইলে তাহা সর্ব্বদা পরিহার্য্য। আজ কাল সকলেরই অভিমত যে

সমতল জমীই চা ক্ষেত্রের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। জমী সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমত জমী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে; দ্বিতীয়তঃ, চায়ের শিকড় যেন উহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে। যে জমী শক্ত এবং যাহাতে জল দাঁড়ান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না তাহা চায়ের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। জমী শক্ত হইলে তাহাতে চারা জন্মে না, এবং সামান্য যাহা কিছু জন্মে তাহাতেও নানারূপ পীড়া দেখা দিয়া থাকে। যে জমীতে জল দাঁড়ায় তাহাতে চারা মরিয়া যায়। কিন্তু জল নিকাশের ভালরূপ বন্দবস্ত করিতে পারিলে প্রায় সকল জমীতেই চা উৎপন্ন হইতে পারে ইহা অনায়াসে বলা যায়। যে জমীতে জান্তব এবং উদ্ভিদার যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা যদি বালুকাবিমিশ্র কর্দ্দমযুক্ত হয়, তবে তাহা চায়ের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উহা কর্দ্দমাক্ত, সচ্ছিদ্র এবং নরম হইলেও প্রথম শ্রেণীর জমী বলিয়া ধরা যায়। দাক্ষিণাত্যের এবং দুয়ারের জমী প্রায়শ এইরূপ। যে মৃত্তিকা শুষ্ক কর্দ্দমময়,—তাহা যে কোন রঙ্গের হৌক না—কেন,—যাহাতে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না ও যাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া তাল পাকাইয়া ওঠে এবং শক্ত হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। আবার যে জমী ঢিলে ও যাহার উপরিভাগ কঙ্করযুক্ত, তাহাতেও সর্ব্বদা বৃষ্টি না হইলে চারা বাড়িতে পারে না এবং "পাতিও" খুব সামান্য হইয়া থাকে। মোটের উপর যে জমী বিস্তীর্ণ, আর্দ্র, সচ্ছিদ্র এবং যাহা হইতে বৎসরের সকল ঋতুতেই সুন্দররূপে জল নিকাশ হইয়া থাকে ও যাহাতে গাছের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

চায়ের জন্য অত্যন্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এবং যে জমী কখনও আবাদ হয় নাই ও যাহা অরণ্যরূপে কিম্বা ঘাসাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাই চায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে এবং সিংহলে, পূর্ব্বে যে জমীতে কাফির চাষ হইত, তাহাও চাক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যে জমীতে পূর্ব্বে তুলা কিম্বা ইক্ষুর চাষ হইত, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সে সমস্ত জমী চায়ের নিতান্ত অনুপযোগী। যে সকল স্থানে বাড়ী ছিল, সে সকল স্থানের মৃত্তিকা যথেষ্ট পরিমাণে উর্ব্বর হইলেও উহাতে ভাল রূপ চা উৎপন্ন হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। বোধ হয়, মাটী জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়া যাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। মৃত্তিকায় জান্তব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের তারতম্যানুসারে চা গাছের সতেজ বর্দ্ধনের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের পরিমাণ বেশী তাহাতে প্রচুর পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ চা মৃদু, জলীয় এবং সুতার-শূন্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যে জমিতে ঐ সকল পদার্থের ভাগ অল্প তাহাতে ফসল ত কম হয়ই অধিকন্তু অল্প দিনের মধ্যেই চারাগুলি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়ে ও শুকাইয়া যায়। দারজিলিংএর চা অত্যন্ত সুতারযুক্ত। এই সুতারের হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভিন্ন প্রকার বহু জটিল মতের অবতারণা হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, ফস্‌ফরিক এসিড এবং পটাশই ইহার কারণ। অন্যান্য হেতু যাহাই হৌক, ইহা প্রায় নিঃসংশয়ে স্থির হইয়াছে যে মৃত্তিকার ধাতব খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সহিত এই সুতারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান।

ভারতীয় চায়ের জমীর রাসায়নিক গঠন।

—নিম্ন লিখিত পদার্থগুলি ভারতীয় চায়ের মৃত্তিকার প্রধান উপাদান:—জান্তব পদার্থ ইত্যাদি, অকসাইড অব আইরন, এলিউমিনা, চূণ, ম্যাগনেসিয়া, পটাশ, সোড়া, ফস্‌ফরিক এসিড, সিলিকেট, ও নাইট্রোজেন। মাটীতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ চূণ থাকিলে আর রক্ষা নাই। সেরূপ চূণযুক্ত ক্ষেত্রে চা উৎপন্নের আশা দুরাশা মাত্র। ভারতীয় চাক্ষেত্র সমূহে চূণের ভাগ গড়ে শতকরা ০২ ভাগ মাত্র।

বপন রোপণাদি।

—চা গাছ বীজ হইতে জন্মিয়া থাকে। ডালের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে গাছ উৎপাদনের চেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই

অন্যান্য উপায় অপেক্ষা, বীজ হইতে গাছ শীঘ্র জন্মে এবং বংশ বৃদ্ধিও খুব দ্রুত হইয়া থাকে। বীজ সংগ্রহের জন্য কতকগুলি গাছ, এমন কি অনেক সময় কতকগুলি বিশেষ বাগান স্বতন্ত্র রক্ষিত হয়।

বীজ।—বীজের জন্য যে সকল গাছ রাখা হয় সে গুলির মাথা ছাটা হয় না। সহজ ভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল গাছ ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত বাড়ে। কিন্তু চীনা গাছ ৭।৮ হাতের বেশী উচ্চ হয় না। ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতে ঐ সকল গাছে ফুল হইতে আরম্ভ হয় ও ফল পরিপক্ক হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে আর একবার ফুল হয়, কিন্তু উহার পরিমাণ খুব অল্প হইয়া থাকে। যাহা হৌক, কার্ত্তিক মাসে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। সংগৃহীত হইবার পর অধিক দিন থাকিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং সংগ্রহের পর যত সত্বর সম্ভব বপন করা বিধেয়।

বীজ বপন ক্ষেত্র (Nursery)।

—একখণ্ড উৎকৃষ্ট জমী বাছিয়া লইয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। এই স্থানে বেশ ভালরূপ জল সেচন করা আবশ্যক। জমী "তৈয়ারীর" প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। পূর্ব্বে চা আবাদ হইয়াছে এরূপ জমী, বপনক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইলে, উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সার দেওয়া কর্ত্তব্য। আবহাওয়া ও স্থান গরম এবং শুষ্ক হইলে, বপনের অনতিবিলম্বে ঐ ক্ষেত্র ঘাসখড় ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয় ও জলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। আধ মণ বীজে সাধারণত প্রায় ১০,০০০ চারা জন্মিয়া থাকে এবং উহা দ্বারা প্রায় ৭।৮ বিঘা জমিতে রোপণ কার্য্য চলিতে পারে। চারাগুলি গজাইবা মাত্রই ছায়ার জন্য মাচা বাঁধিয়া দিতে হয়। তারপর মাঝে মাঝে নিড়াইয়া দিতে হয়, ও আবহাওয়া শুষ্ক হইলে, সন্ধ্যাবেলা জল সেচনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছমাস ও এক বৎসরের, এই দুই প্রকারের চারা রোপণ করিতে দেখা যায়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের চারা, ছমাস পরে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে, অথবা এক বৎসর পর, পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে রোপণ করা যাইতে পারে।

ক্ষেত্র প্রস্তুতীকরণ।—সুফল লাভ করিতে হইলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। বন কাটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে হয় ও কর্ত্তিত বৃক্ষের মৃত্তিকানিম্নস্থ কাণ্ড ও মূল সকল যতদূর সম্ভব তুলিয়া ফেলিতে হয়, যেহেতু, ঐ কাণ্ড সকল চায়ের শিকড়ের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষেত্র দীর্ঘ ঘাসাচ্ছাদিত হইলে ঘাসের মূল সকলও উত্তমরূপে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক এবং জমী পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ হইলে, আবাদের পূর্ব্বে উহাতে আলি বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। জমীতে পাথর থাকিলে, সমস্ত পাথর একত্র জড়ো করিয়া আলি বাঁধার কার্য্যে লাগান সুবিধাজনক।

রোপণ।—ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, পূর্ব্বকথিত বপন স্থান হইতে চারা তুলিয়া লওয়া হয় ও সার বন্দী করিয়া সমব্যবধানে রোপণ করা হইয়া থাকে। ব্যবধান সর্ব্বত্র সমান হয় না, উহা গাছের প্রকার ভেদে, মাটির গুণানুসারে এবং রোপণের প্রণালী ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। তবে সাধারণত বলা যাইতে পারে যে ঐ ব্যবধান কোন দিকেই চার ফুট অপেক্ষা ঘন ও পাঁচ ফুট অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। চতুর্ভুজাকার ও ত্রিভুজাকার এই দুই প্রকার পংক্তিতে চারা সকল রোপিত হইতে দেখা যায়। পংক্তি সকল পরস্পর সমকোণ হইলে, ও এক একটি চারা চার ফুট অন্তর রোপণ করিলে, এক একর জমীতে ২৭২২টি ও ঐ ব্যবধান পাঁচ ফুট হইতে ১৭৪২টি চারা রোপণ করা চলে। কিন্তু বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর অবধি ৬০ ডিগ্রি কোণ-বিশিষ্ট ত্রিভুজাকারের রোপণ প্রণালীই চলিতেছে। এইরূপে রোপণ করিলে, চতুর্ভুজ রোপণ অপেক্ষা চারা সকলের পরস্পর ব্যবধানও বেশী হয়, আবার গাছের সংখ্যাও প্রায় সমান দাঁড়ায়; সুতরাং ত্রিভুজাকার রোপণই প্রশস্ত। রোপণ প্রণালী স্থির হইলে, প্রায় এক ফুট গভীর ও দশ ইঞ্চি চওড়া গর্ত্ত করিয়া চারাগুলি রোপিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ছ'মাসের ও এক বৎসরের, এই দুই প্রকার চারা রোপণ করা হয়। আজকাল ব্যবসায়ীদের ঝোঁক ছ'মাসের চারার উপরই বেশী। ছ'মাসের চারাগুলি ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। চারাগুলি জন্মক্ষেত্র হইতে তুলিবার সময় ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ মাটির ডেলা তাহাদের মূলের সহিত সংলগ্ন রাখিতে হয়। মূলশিকড় অনেক সময় অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া থাকে, আবার কখনও বা বাঁকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায়, চারা রোপণের পূর্ব্বে লম্বা অথবা বক্র শিকড় কাটিয়া ছোট করিয়া অথবা সোজা করিয়া দিতে হয়। রোপণের পরেই যদি বেশ বৃষ্টি হইয়া যায়, তবে আর জল সেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যাহাতে চারার চারিদিকে আগাছা জঙ্গলাদি না জন্মায় ও মাটির উপরিভাগ যাহাতে বেশ আল্‌গা থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তু এক বৎসরের চারা রোপণ করিতে হইলে, রোপণ কার্য্য অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে সম্পন্ন করিতে হয়; সে সময় কদাচিৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং জল সেচনের বিশেষ বন্দবস্ত করিতে হয়।

রোপণকার্য্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক :—

(ক) মূলশিকড় উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত, এবং উহা যেন বাঁকিয়া কিম্বা জড়াইয়া না থাকে।

(খ) বেশী উঁচু কিম্বা নীচু করিয়া চারা লাগান ভাল নহে। যদি বেশী উঁচু হয়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া পড়ে; আবার বেশী নীচু হইলে চারার কাণ্ড মাটিতে ঢাকা পড়ে ও তাহাতে চারার অনিষ্ট হইয়া থাকে। জন্মক্ষেত্রে চারার যে অংশ মাটির নীচে ছিল, রোপণের সময়ও ঠিক সেই অংশই প্রোথিত করিতে হয়।

(গ) ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিকড়গুলি মূলশিকড়ের সঙ্গে জড়াইয়া না থাকিয়া যেন বেশ বিস্তৃতভাবে পড়ে। চারা গর্ত্তে ফেলিবার পর গর্ত্তের এক তৃতীয়াংশ মাটিদ্বারা পূর্ণ করিয়া আস্তে আস্তে হস্তদ্বারা ঠাসিয়া দিতে হয়। তারপর অন্য এক তৃতীয়াংশ বেশ একটু জোরে পিটাইয়া পূর্ণ করিতে হয় ও শেষ এক তৃতীয় মাটির দ্বারা পূর্ণ করা হয় তাহা যেন অত্যন্ত আল্‌গা থাকে, তাহাতে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই।

পয়ঃ প্রণালী।—সমতল অথবা প্রায় সমতল জমীতে পয়ঃপ্রণালী অন্তত তিন ফুট গভীর হওয়া আবশ্যক। যেন উহার মাথার উপর দিয়া জল না গড়াইয়া, ঠিক প্রণালীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে। প্রণালী সকলের পরস্পর ব্যবধান অবস্থাভেদে ৩০ ফুট হইতে ৬০ ফুট হইলেই চলিতে পারে। ঢালু জমীতে প্রণালীর মধ্য দিয়া জল বেশ গড়াইয়া যায়, সুতরাং ক্ষেত্রের মাটি, সার ইত্যাদি ধুইয়া যাইতে পারে না।

কোদ্‌লান। মাটির উপরিভাগ আল্‌গা রাখিতে ও আগাছা ইত্যাদি নষ্ট করিতে কোদালের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন মাটির উপরকার তিন ইঞ্চি মাঝে মাঝেই আল্‌গা করিয়া দিতে হয়, এবং চারাগুলির বয়স দুই বৎসর হইবার পর, ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া কোদালি দিতে হয়। প্রত্যেক বৎসর শুষ্ক ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই কার্য্য করা উচিত। ইহাতে পরবর্ত্তী অনাবৃষ্টির সময় মাটির নিম্নস্তর আর্দ্র থাকে, সুতরাং মাটি বেশ নরম থাকে। বৎসরে ৫।৬ বার কোদালি দিলেই চলিতে পারে এবং ঐ কার্য্য দেড় মাস অন্তর এক এক বার হওয়া উচিত।

সার। আবাদের কয়েক বৎসর পরে সারের প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত সারই উৎকৃষ্ট। জান্তবসার দ্বারা এই উদ্দেশ্য উৎকৃষ্টরূপে সাধিত হয়। কিন্তু যোগাড় করিতে পারিলে গোময় সারের তুল্য আর কোন সারই নহে। গোময় সার প্রতি একরে ২০ টন দিলেই চলিতে পারে। আর অন্য যে সকল জন্তুকে আস্তাবলে বাঁধিয়া যত্ন করিয়া খাওয়ান হয়, তাহাদের সার প্রায় ৭।৮ টন হইলেই চলে। গোময়াদির সঙ্গে কাঠের ছাই, খড় কুটো

আবর্জ্জনা ইত্যাদি মিশাইয়া সার ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয় ও কিছুদিন পরে তাহা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসরের প্রথমে কোদালি দিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার দিতে হয়। গোময়াদি যোগাড় করিতে না পারিলে রেড়ীর খইল ইত্যাদির দ্বারা কাজ চালাইতে হয়। খইল সার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয় ও প্রতি একরে প্রায় অর্দ্ধ টন দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে উদ্ভিদ সারও ব্যবহৃত হইতেছে। ফোসিওলাস মাঙ্গো (Phoseolus Mungo) নামক একপ্রকার উদ্ভিদের বীজ এপ্রিল অথবা মে মাসে প্রতি একরে ৪০ পাউণ্ড হিসাবে ছিটাইয়া দেওয়া হয় ও চারা গজাইলে ৬ কিম্বা ৮ সপ্তাহ পর কোদ্‌লাইয়া উহাদিগকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বেশ সারের কাজ করে। আরও কয়েক প্রকার উদ্ভিদ এইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ছাঁটা (Pruning)।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চা গাছ না ছাঁটিয়া বাড়িতে দিলে ২০।২৫ হাত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু বাগানের গাছগুলিকে এরূপ বাড়িতে দেওয়া হয় না। ছাঁটিয়া দিলে গাছগুলি ছত্রাকার হইয়া ওঠে সুতরাং কচি পাতার পরিমাণও অধিক হইয়া থাকে। যে সকল চারা জন্মক্ষেত্রে এক বৎসর থাকিবার পর রোপিত হইয়াছে, সেগুলি রোপণের ২।১ মাস পরেই ছাঁটিয়া দিতে হয় ও যেগুলি ছ'মাস থাকিবার পর রোপিত হয়, সেগুলিতে রোপণের ৫।৬ মাস পরে কাঁচি চালাইতে হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস ছাঁটার উপযুক্ত সময়। প্রথমবার চারার ৬।৭ ইঞ্চি মাত্র রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়, তারপর, জন্মক্ষেত্রে চারাগুলি যখন প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিন বৎসর ধরিয়া, আর একবার ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। এবারে চারার ষোল কি আঠার ইঞ্চি রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহার পর প্রত্যেক বৎসরই ছাঁটা প্রয়োজন, ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যেস্থানে ছাঁটা হইয়াছিল, ক্রমে তাহার ২।১ ইঞ্চি উপরে যাইতে হয়। কিন্তু যদি উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় বেশী নীচে ছাঁটা হইয়া থাকে; কিন্তু দশ বৎসরের পূর্ব্বে "অধিক ছাঁটার" কোন প্রয়োজন হয় না। "অধিক ছাঁটার" পরও ভাল ফসল না হইলে, একেবারে মাটি সমান করিয়া ছাঁটিয়া দিতে দেখা যায়।

পাতি তোলা। (Plucking)।—ছাঁটার ২।৩ মাস পরে নূতন ফেক্‌ড়ি বাহির হইয়া সেগুলি ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হইলে, পাতিতোলা আরম্ভ হয়। পাতা টানিয়া না ছিঁড়িয়া বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ভাঙ্গিয়া তুলিতে হয়। গাছের মাথার উপরে সমান উচ্চে অবস্থিত পাতাগুলিই তোলা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত পাতাগুলি সংগ্রহ করা নিষেধ। প্রথমবার "পাতি টিপিবার" প্রায় তিন মাস পরে পুনরায় "পাতি পিটিবার" সময় আসে ও তখন পুনরায় সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রত্যেক ফেক্‌ড়ি হইতে যে সকল পাতা সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে মাত্র ৩।৪টি পাতায় চা তৈয়ারি হইয়া থাকে। যাহা হোক, রোপণের পর দ্বিতীয় বৎসরে সামান্য মাত্র পাতি পাওয়া যায়, তৃতীয় বৎসরে প্রতি একরে প্রায় দেড় শত পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপে ষষ্ঠ বৎসরে পূর্ণ ফসল পাওয়া যায়। তখন প্রতি একরে ৪০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পাতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অবশ্য সচরাচর ৭০০।৮০০ পাউণ্ডই উত্তম উৎপন্নরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

চায়ের আপদ ও প্রতিকার।—চায়ের বিঘ্ন যথেষ্ট; তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কয়েকটির সামান্য বিবরণ ও প্রতিকার প্রদত্ত হইল :—

(ক) চা-র সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম শত্রু এক প্রকার লাল মাকড়শা। গ্রীষ্মকালে ইহারা চা-র পাতার রস শোষণ করিতে থাকে; ফলে পাতা বাড়িতে পারে না এবং গাছের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

চারার উপর জল ছিটাইয়া, গন্ধকের গুঁড়া প্রক্ষেপ করিলে ইহার প্রতিকার হয়।

(খ) এক প্রকার মশক চা-র অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহাদের দৌরাত্ম্যে পাতা শুকাইয়া যায় ও ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

কাঁচি চালাবার পর কেরোসিন প্রক্ষেপই ইহার এক মাত্র ঔষধ।

(গ) এক প্রকার সবুজ পতঙ্গ।

বিশেষ প্রতিকার এখনও অনাবিষ্কৃত।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি

ইহাদিগকে ধরিবার জন্য কুলি বালকবালিকাগণ নিযুক্ত হইয়া থাকে। অন্য কোন প্রতিবিধান উদ্ভাবিত হয় নাই।

(ঙ) গাছের গায়ে এক প্রকার হল্‌দে হল্‌দে দাগ পড়ে।

দুর্ব্বল চারাগুলিই এই পীড়ায় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং সার ইত্যাদির দ্বারা গাছের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ইহার প্রভাব লুপ্ত হয়। তাহাতেও ফল না হইলে বোরডো মিক্‌শ্চার (Bordeaux mixture) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চা প্রস্তুত প্রণালী।—পূর্ব্বে চা প্রস্তুত কার্য্য হস্ত দ্বারা সাধিত হইত; কিন্তু ঐ প্রণালীতে বিশেষ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন প্রায় প্রত্যেক প্রক্রিয়াই বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে। বাজারে বহু প্রকারের চা বিক্রয় হয়। প্রস্তুতপ্রণালীর প্রকারভেদেই এই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। ভারতে কৃষ্ণ চা-ই (Black tea) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণ চা-র মূল্য অল্প বলিয়া, কয়েক বৎসর অবধি সবুজ চা ও (Green tea) প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উলং (Oolong) নামক এক প্রকার চা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। ব্রিক চা (Brick tea), "লেট্‌পেট্" প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার চা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণ চা-র তুলনায় ইহার পরিমাণ অতি সামান্য।

যাহা হৌক পাতি সংগৃহীত হইবামাত্র তাহা কলগৃহে (Factory) আনীত হইয়া থাকে ও পাতাগুলি যতদূর সম্ভব পাতলা করিয়া শীতল গৃহে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। অধিক সময় এরূপ ভাবে ছড়ান থাকিলে চা খারাপ হইবার সম্ভাবনা। ৮০ ডিগ্রি তাপে ২০ ঘণ্টা কাল এইরূপভাবে রাখিলেই চলে। তদপেক্ষা অধিক সময় ছড়াইয়া রাখা অনুচিত। এই সময়ের মধ্যে পাতাগুলি বেশ মুসড়িয়া যায় (wither) তখন পেষণকার্য্য (rolling) চলিয়া থাকে। পেষণকার্য্যের উদ্দেশ্য, পাতা হইতে কতক রস বাহির করা ও সেই রস বায়ু সংস্পর্শে আনিয়া পাতাতে শুকাইয়া দেওয়া। পেষণ কার্য্য যত মৃদু ভাবে হয় ততই ভাল। পেষণের দ্বারা পাতা হইতে যে রস বাহির হয় তাহা অপেক্ষাকৃত কচি ও সাদা পাতার কুড়িগুলিতে সংপৃক্ত হইয়া সে গুলিকে স্বর্ণ বর্ণে অনুরঞ্জিত করে। কিন্তু পেষণ কার্য্যে অধিক বল প্রয়োগ করিলে, কাল রংএর রস বাহির হইয়া চা-র রং খারাপ করিয়া দেয় এবং তাহাতে চা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। পেষণ কার্য্য সাধারণত প্রায় ১৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টায় শেষ হয়; তখন চালুনি সাহায্যে ছোট পাতাগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হয় ও অপেক্ষাকৃত মোটা পাতাগুলি পুনরায় পেষিত হইয়া থাকে। পাতা হইতে যে রস বাহির হয় বায়ু সংস্পর্শে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (fermentation) ঘটিয়া থাকে; তখন পাতা গুলি এক অথবা দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া, আর্দ্র, শীতল, অন্ধকারময় গৃহে ছড়াইয়া রাখা হয়। এই গৃহ বিশেষরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। রসের পরিবর্ত্তন কার্য্য দুই হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিতে দেওয়া হয়। তারপর পাতা শুষ্ক করার পালা, ও ইহাই চা প্রস্তুতের শেষ কার্য্য। কতক্ষণ পর্য্যন্ত fermentation চলিতে দেওয়া উচিত, তাহা কেবল পাতার রং দেখিয়া ও গন্ধ দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, কাজেই এ কার্য্য বিশেষ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। শুষ্ককরণ কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন করা আবশ্যক, এবং সেই জন্যই ঐ কার্য্য অন্য কোন উপায়ে না করিয়া অগ্নির সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমত ২২০ হইতে ২৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যখন পাতাগুলি প্রায় বারো আনা শুকাইয়া ওঠে, তখন ১৮০ হইতে ২০০ ডিগ্রি তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই কার্য্য দক্ষতার সহিত সত্বর সম্পন্ন করিতে না পারিলে চা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

চা-র প্রাথমিক এবং আধুনিক ইতিহাস, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী মোটামুটি এইরূপ। এখন আর সামান্য দুই একটী কথা বলিয়া পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় লইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমীতে আজকাল চা-আবাদ চলিতেছে। কিন্তু ঐ জমীর শতকরা ৬৪ ভাগ আসামে ও ২৫·৯ ভাগ বঙ্গদেশে, আর অবশিষ্ট, প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। দিনদিনই আবাদি জমীর পরিমাণ বাড়িতেছে:—আরও আনন্দের বিষয় এই যে জমী বৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন চা-র অনুপাত ক্রমেই অসাধারণ রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮৮৫ অব্দের পর হইতে জমী বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ৮৬, কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ২০০। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে চা-র চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী কত উন্নত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৪১০, সুরমা উপত্যকায় ৫০৮, দুয়ারে ৪৮০, ও দারজিলিংএ ২৬৮ পাউণ্ড গড়ে প্রতি একরে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে। চা-ব্যবসায়ে আজ কাল প্রায় ২৫ কোটী টাকা খাটিতেছে।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী জমী রহিয়াছে। ধনশালী ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়া ধনাগমের উপায় করা। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলপাইগুড়ীই চা-আবাদের উপযুক্ত স্থান; কিন্তু জলপাইগুড়ীর জমী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আসামে কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসীগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালীগণ কোম্পানী করিয়া আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য্য করিলে ভাল হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ

দুপুরে ও নিশীথে

গগন থেকে থর-বিথরে
পদ্মদলের মতই ঝরে
হাঁসের শ্রেণী নদীর চরে
দ্বিপ্রহরে;
শুন্‌ছি যে গান আকাশভরা
দিক্ হ'তে দিক্ উদাস-করা,
আতুর যেন কাঁদছে ধরা
আর্ত্তস্বরে;—
হাঁসের ডাকে ডাকৃছি কা'কে?
ওরে, আমার পরাণটাকে
এমনি করেই ভুলিয়ে রাখে
হৃদয় চোরে!
ধরা তবু দেয় না গো হায়,
সকল হরে'
আকুল করে'!

আমি আপ্‌না-হারা হ'য়েই আছি
তাঁহার তরে,
ধ'র্‌ব তাঁরে কখন, গো সেই
আশার ভরে!
জোনাক-জ্বলা ঝোপের ফাঁকে
তাই ভোলা মন খুঁজছে তাঁকে;
নিঝুম নিশায় ডাহুক্-ডাকে
নয়ন ঝরে।
ধরা কখন্ পড়্‌বে নিঠুর,—
সেই বেদনায় হৃদয় বিধুর;
মান্‌তে না চায় বারণ কিছুর,
কেবল মরে—
মুহুর্মুহু আছাড় খেয়েই
এ পিঞ্জরে
আশার ভরে!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুশ্রুত

সে বহুশতাব্দীর কথা যখন ভারতে স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহত ভাবে বহিয়া যাইতেছিল, যখন আপ্তবাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও প্রত্যক্ষের অমর্য্যাদা কখনই হইত না, যখন অনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য কারাগারের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর ন্যায় নিশ্চলভাবে মৃতবৎ অবস্থান করিত না—সেই হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার যুগে মহর্ষি সুশ্রুত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যে যুগে অস্ত্রচিকিৎসা নরসুন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি হইবার কল্পনাও অসম্ভব ছিল, যে যুগে মৃতশরীর স্পর্শ ও শবব্যবচ্ছেদ একটা গুরুতর পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত না, যে যুগে প্রবচন অপেক্ষা বাস্তবের সমাদর অধিক ছিল, সেই যুগে ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হায়! মহর্ষি বড় আশা করিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন "কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্রকোহতি"- তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। ভারতের অদৃষ্ট দেবতার বৈগুণ্যে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরিত না হইয়াই অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পরে যখন হিন্দুসন্তান আবার মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদের জন্য অস্ত্রধারণ করাতে ইংরাজের বিজয়দুর্গ হইতে মহানন্দসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য সেই ভাগ্যবান যুবক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা ভ্রমে পূজিত হইয়াছিল—জানি না হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে মহর্ষি সুশ্রুতের হৃদয় ক্ষোভে ও অপমানে ফাটিয়া যাইত কি না।

শারীরবিদ্যার উৎপত্তি

সুশ্রুত সংহিতায় যে উন্নত শারীরবিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার পরিচয় পাই তাহার উৎপত্তি বৈদিক সাহিত্যে। যেমন অথর্ব্ববেদ কায়চিকিৎসার আদিগ্রন্থ, সেইরূপ সামবেদ অস্ত্রচিকিৎসার উৎপত্তিস্থল। বৈদিক কালে বিবিধ পশুযাগযজ্ঞে নিহত পশুর বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইত। "নিহত পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাম নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত তাহার নাম শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি।" (১) এইরূপে পশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে পরবর্ত্তীকালের শারীরবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও শ্রৌতসূত্র রচনাকালে এই সকল যজ্ঞের যেমন বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে, নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আসিয়াছে। বেদোক্ত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে এবং বেদোক্ত অনেক পরিভাষিক শব্দ আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হইয়াছে।

(১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত "শরীর বিজ্ঞান পরিভাষা" প্রবন্ধ—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮,২০৫। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি সংহিতা, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র হইতে পশুযজ্ঞে নিহত পশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈদিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন।

সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল

সুশ্রুত স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার কাশীরাজ দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। সুশ্রুত, উপধেনব, বৈতরণ, ওরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব—এই দ্বাদশ জন কাশীরাজের শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই নিজ নিজ নামে ভিন্ন ভিন্ন শল্যতন্ত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল সুশ্রুত সংহিতাই প্রচলিত আছে। কিন্তু এককালে যে এই সকল শল্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। টীকাকার শিবদাস চক্রদত্তসংগ্রহের টীকায় গোপুররক্ষিত ও বৈতরণ কর্ত্তৃক লিখিত শল্যতন্ত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি সুশ্রুতসংহিতার টীকায় পৌষ্কলাবততন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি একাদশ খ্রীষ্টাব্দের আয়ুর্ব্বেদকার, শিবদাস তাঁহারও পরে, এতএব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই সকল তন্ত্র প্রচলিত ছিল।

সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল সঠিক নির্ণীত হয় নাই। "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং" এই বার্ত্তিকসূত্র অনুযায়ী সুশ্রুত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নবাবিষ্কৃত বাউয়ার পাণ্ডুলিপি পাঠে জানা যায় যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুশ্রুত অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সুশ্রুতসংহিতা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতা। টীকাকার ডল্লনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা। সুশ্রুতের পর কয়েক শতাব্দী শল্যবিদ্যা সজীব ছিল। বাগভটের (তৃতীয় শতাব্দীর) সময় শল্যবিদ্যা যে বিদ্যমান ছিল তাহা তাঁহার অষ্টাঙ্গ পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু বাগভটের পর হইতে ক্রমশঃ অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যা ও শল্যবিদ্যার অবনতি ঘটিতে থাকে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি বলিয়া মনে হয়ঃ—

প্রথম। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত ভারতে স্বাধীন চিন্তার উন্নতি বহুলপরিমাণে সাধিত হইলেও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই নৈতিক বাক্য শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জন্য কায়চিকিৎসা বিশেষতঃ তান্ত্রিকচিকিৎসা পদ্ধতির বহুল উন্নতি সাধিত হইলে বৌদ্ধযুগে অস্ত্রচিকিৎসা বড়ই অনাদৃত হইতে চলিয়াছিল।

দ্বিতীয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই অন্য অন্য বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যার পঠনপাঠন করিতেন। মনুর অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া শবদেহ স্পর্শ ক্রমশঃ একটা পাপের কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছিল, তাহার

জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শবদেহ স্পর্শ ও ব্যবচ্ছেদ ব্যতিরেকে অঙ্গবিনিশ্চয় ও অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা কখনই সজীব থাকিতে পারে না। সেইজন্য এই "শুচি" শাসনের পরিণাম এই হইয়াছে যে ক্রমশঃ ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই মহাত্মা এলিফিনষ্টোন সাহেব এখনকার স্বদেশীয় অস্ত্রচিকিৎসার অবনতি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "bleeding has been left to the barber, bone-setting to the herdsman and the application of blisters to every man."

সুশ্রুতোক্ত শারীরবিদ্যা

সুশ্রুতোক্ত অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যার সম্যক পরিচয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদান করা অসম্ভব। সুশ্রুতের শারীরস্থান পাঠ করিলে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন একেবারে অসম্ভব ছিল। সুশ্রুত সপ্ত ত্বক (skin, epidermis), সপ্ত কলা (cellular tissues and fascia of the body) সপ্ত আশয় (organs বা receptacles), অন্ত্র (intestines) নয়টি দ্বার, ষোলটি কণ্ডরা (রজ্জুবৎ শিরা) বারটি জাল (membranes), ছয়টি কূর্চ্চ, চারটি রজ্জু (tendons), সাতটি সেবনী (sutures), তিন শত অস্থি (bones), দুই শত দশটি অস্থিসন্ধি (bonejoints), নয় শত স্নায়ু (nerves), পাঁচ শত পেশী (muscles), সাত শত শিরা ও এক শত সাত মর্ম্মস্থানের (vital parts) সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শরীরের কোন স্থানে কয়টি স্নায়ু, অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে তাহাও সঠিক নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনশত অস্থির বিবরণ দেখুন—

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া	১৫টি
পা বা গোড়ালিতে	১০টি
জঙ্ঘায়	১টি
জানুতে	২টি
উরুদেশে	১টি
এইরূপ অপর পায়ে	৩০টি
দুই হাতে ৩০ করিয়া	৬০টি
কটিদেশে	১টি
মলদ্বারে	১টি
যোনিদেশে	১টি
দুই নিতম্বে	২টি
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২টি
পৃষ্ঠে	৩০টি
বক্ষে	৮টি
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	২টি
গ্রীবাদেশে	২টি
কণ্ঠদেশে	৯টি
দুই হনুতে	৪টি
দন্ত সর্ব্বসমেত	৩২টি
নাসিকায়	৩টি
তালুতে	১টি
কর্ণ গণ্ড ও শঙ্খদেশে ২টি করিয়া	৬টি
মস্তকে	৬টি
সর্ব্বসমেত	৩০০ অস্থি

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভে দেহের মধ্যে রক্তের গতি (circulation of the blood) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

হার্ভের বহুশতাব্দীর পূর্ব্বে সুশ্রুত যে রক্তের গতি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—এ সংবাদ ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের কর্ণে ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। রক্তের গতি সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়া গিয়াছেন যে "১৭টি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে (circulates) ততক্ষণ ধাতুসমুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে, রক্তজন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী বলিয়া হার্ভের নাম গৌরবান্বিত হইতে পারে, কিন্তু রক্তের গতির আবিষ্কার প্রথমে ভারতে হইয়াছিল এ গৌরব ভারতবাসী নিঃসন্দেহে করিতে পারেন।

ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসার প্রাধান্য

দুই এক পৃষ্ঠার মধ্যে সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসার সম্যক বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে, তবে সুশ্রুতের সময় অস্ত্রচিকিৎসা কিরূপ উন্নত ছিল তাহার আভাষ মাত্র পাঠককে প্রদান করাই লেখকের উদ্দেশ্য। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই যে উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণ সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের সৈন্যবর্গের অস্ত্রচিকিৎসকরূপে সুষেন রামের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বে দেখিতে পাই যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েই অস্ত্রচিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (bandage), ঔষধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম নকুল অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাষা ও ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত অনেক বিষয়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু। ওয়েবার লিখিয়া গিয়াছেন "ইউরোপের আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ হিন্দুদের নিকট হইতে একস্থান হইতে চর্ম্ম লইয়া অন্যস্থানে চর্ম্ম সংযোগ করিবার উপায়, যথা কর্ত্তিত নাসিকা জোড়া দেওয়া, (rhinoplasty) শিক্ষা করিয়াছেন।" প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ডাক্তার হির্সবার্গ (Dr. Hirschsberg) ওয়েবার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে "চক্ষের ছানিতোলা প্রক্রিয়া ইউরোপ ভারতবাসীর নিকট শিখিয়াছে, এবং প্রাচীন গ্রীক, মিশরবাসী বা অন্য কোন জাতি উহা জ্ঞাত ছিলেন না।" আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ অসাধ্যসাধন করিতেছেন, কিন্তু অধুনা যে সকল অস্ত্রচিকিৎসা অতি কঠিন বলিয়া স্বীকৃত হয় (major operation) তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যথা ছানিতোলা, অঙ্গছেদন (amputation), উদর বিদারণ (abdominal section), প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্য অস্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া সকলেরই

চমৎকৃত হইবার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসার গৌরবের যে আমরা উত্তরাধিকারী তাহা যেন কদাচ ভুলিয়া না যাই।

সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা

(১) শিক্ষা

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ছেদ্যক্রিয়া (কোন অঙ্গ-ছেদন করা), (২) ভেদ্যক্রিয়া (কোন স্থান ভেদ করা), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা), (৪) বেধ্যক্রিয়া (দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা), (৫) এষ্যক্রিয়া (নালীঘা, বাবী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা), (৬) আহার্য্যক্রিয়া (অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা), (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া (স্রাব উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন (সেলাই করা)। চিকিৎসককে অস্ত্র-ক্রিয়াদি কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা প্রকৃতরূপে ছেদনাদি অস্ত্রক্রিয়া বহুদিবস ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপ কৌতূহলদীপক উপায়ে গুরু শিষ্যকে বিবিধ অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার অভ্যাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। ছেদ্যক্রিয়া (incision)—কুমড়া, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়া অঙ্গচ্ছেদনাদির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ভেদ্যক্রিয়া (puncturing)—চামড়ার থলি, মৃত পশুর প্রস্রাবের থলি বা চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দ্দম পুরিয়া তাহা ভেদ করিয়া ভেদ্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। লেখ্যক্রিয়া (scratching)—মৃত পশুর লোম-যুক্ত চর্ম্ম আঁচড়াইয়া শিক্ষা করিবে।

৪। এষ্যক্রিয়া (probing)—ঘুণধরা বাঁশ বা কাষ্ঠ, অথবা শুষ্ক লাউর মুখে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া এষ্যক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৫। আহার্য্য (extraction)—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং মৃত পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া (evacuating flinds)—মোমের দ্বারা পূর্ণ একখানি সিমূলকাষ্ঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া রক্তপূঁজাদি স্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবে।

৭। সীব্যক্রিয়া (sewing)—বস্ত্র বা নরম চর্ম্ম সূচীদ্বারা সেলাই করিয়া সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। বেধ্যক্রিয়া (boring)—মৃত পশুর শিরা বা পদ্মের ডাঁটা বিঁধিয়া বেধ্যক্রিয়া শিক্ষণীয়।

৯। বন্ধনকার্য্য (bandage)—বস্ত্রাদির দ্বারা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে। কোমল মাংসপেশী বা পদ্মের ডাঁটা বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে।

১০। ক্ষার ও অগ্নিকার্য্য (Cautery by caustics and fire)—মৃত পশুর কোমল মাংসখণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

১১। বস্তিকার্য্য (catheterisation)—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগ ছিদ্র করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে বা সেইরূপ অপর দ্রব্যে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়া শিক্ষণীয়।

এইরূপে অস্ত্রক্রিয়া সম্যকরূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসাকার্য্যে অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র, অস্ত্র, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পাখা, শীতল ও উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ

করিবেন। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর আহারের পূর্ব্বে অস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, যেন সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া না যায়। অস্ত্র করিবার পর

যন্ত্রের চিত্র



১। বস্তী যন্ত্র।



২। অর্শো যন্ত্র।

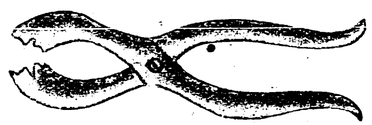

৩। সিংহ মুখ যন্ত্র।

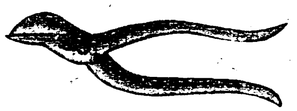

৪। ভৃঙ্গমুখ যন্ত্র।

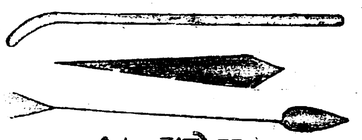

৫। নাড়ী যন্ত্র।

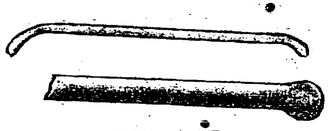

৬। শলাকা যন্ত্র।

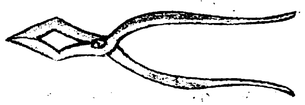

৭। শনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র



৮। অনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র।



৯। শঙ্খ যন্ত্র।

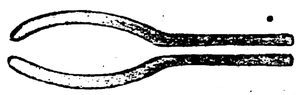

১০। ঘুন্মশঙ্খ যন্ত্র।

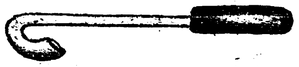

১১। মৃতগর্ভশঙ্খ যন্ত্র



১২। যোন্যাবেক্ষন যন্ত্র।

অঙ্গুলির দ্বারা পূয়রক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিমপাতাদি কষায় দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে পুরিয়া দিবেন ও তদুপরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়া তিন চারি পর্দ্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তিন দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাদির কষায়জলে ধৌত করিয়া ঔষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন। এইরূপ যতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়া না যায় ততদিবস ধৌত করিয়া ঔষধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন।

(২) যন্ত্র

অস্ত্র প্রয়োগ কল্পে সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্ব্বসমেত ১০১টি, ও শস্ত্র ২৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র, কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায় না। যন্ত্রগুলি আবার ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) স্বস্তিক যন্ত্র (চব্বিশ প্রকার), (২) সন্দংশ যন্ত্র (দুই প্রকার), (৩) তাল যন্ত্র (দুই প্রকার), (৪) নাড়ীযন্ত্র (বিংশতি প্রকার), (৫) শলাকাযন্ত্র (আটাইশ প্রকার) ও (৬) উপযন্ত্র (পঁচিশ প্রকার)। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আবশ্যকমত অন্যপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন।

১। স্বস্তিকযন্ত্র—অষ্টাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং দুই খণ্ড লৌহ একটি খিল দ্বারা আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর সর্ব্ব সমেত চব্বিশ প্রকার জন্তুর মুখের সাদৃশ্যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিকযন্ত্র নির্ম্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে উহা বাহির করিবার জন্য স্বস্তিকযন্ত্রই ব্যবহৃত হইত।

২। সন্দংশ যন্ত্র—ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত ও অপরটি ক্ষৌরকারের সন্নার মত। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

৩। তাল যন্ত্র—বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৪। নাড়ীযন্ত্র—নানা আকারে নির্ম্মিত ও নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অর্শোযন্ত্র, অঙ্গুলিত্রাণ যন্ত্র প্রভৃতি নাড়ীযন্ত্রের রূপান্তর।

৫। শলাকাযন্ত্র—আটাইস প্রকার—শলাকাযন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া নানা আকারে নির্ম্মিত হইত।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।

(৩) শস্ত্র বা অস্ত্র

সুশ্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতিপ্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—(১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নখশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্দ্ধধার, (৮) সূচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) শারীরমুখ, (১২) অন্তর্মুখ, (১৩) ত্রিকূর্চক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) আরা, (১৭) বেতসপত্রক, (১৮) বড়িশ, (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

এই সকল অস্ত্র ছেদ্যক্রিয়া, ভেদ্যক্রিয়া, এষণক্রিয়া, সীবন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগক্রিয়ায় প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইত। এই সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, উত্তম রূপে ধরিবার

উপায় বিশিষ্ট ও দন্তবিহীন হওয়া আবশ্যক। অস্ত্র সকলের ধার যন্ত্রভেদে মসূরকলায়ের ন্যায় স্থূল হইতে অর্দ্ধচুল প্রমাণ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সমান রাখিবার জন্য অস্ত্র শিমূলকাষ্ঠের খাপে রক্ষিত হইত। এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্য মাষকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কয়েক প্রকার অস্ত্রের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শস্ত্রের চিত্র



১। কর্ত্তরিকা শস্ত্র।

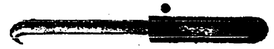

২। মণ্ডলাগ্র শস্ত্র।

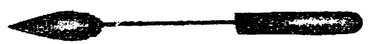

৩। কুশপত্র শস্ত্র।



৪। শরারিমুখ শস্ত্র।



৫। সূচি শস্ত্র।

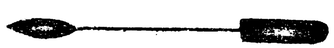

৬। ঈশানী শস্ত্র।



৭। অন্তর্মুখ শস্ত্র।



৮। নখ শস্ত্র।



৯। করপত্র শস্ত্র।

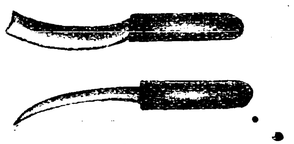

১৪। বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র।

কিরূপ দুরুহ অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ গর্ভস্থিত মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থলে আমরা করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া

দিলাম। "গর্ভস্থ মৃতসন্তান হস্ত সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু (আকর্ষণী) অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পরগুলি বাহির করিয়া পরে বক্ষঃ ও কক্ষ-দেশ ধরিয়া নিষ্কাসিত করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে অক্ষিপুট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্যপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হয়। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিস্তীর ন্যায় বায়ু পূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে পারা যায়। জঘনদেশ দ্বারা অপত্যপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অস্থিখণ্ডসকল ছেদন করিয়া নিষ্কাসিত করিবে। ..... মৃতগর্ভ ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রই প্রয়োগ করা উচিত; উহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।" হায়! অধুনা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীগণের নিকট গর্ভস্থ মৃতসন্তানের ছেদনের কল্পনাও আকাশকুসুমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি তাঁহারা মণ্ডলাগ্র বা অন্য প্রকার অস্ত্র কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই! এমন দিন কি আসিবে না যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আবার উন্নত অস্ত্রচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

(৪) বন্ধন

সুশ্রুতে অনেকপ্রকার বন্ধনের (Bandage) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পতন বা কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ ভগ্ন হইলে বা অস্ত্রপ্রয়োগের পর আহত বা ক্ষতস্থানে স্থানবিশেষে বিবিধ প্রকার বন্ধনের প্রয়োগ ছিল। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকার—(১) কোশ, (২) দাম, (৩) স্বস্তিক, (৪) তনুবেল্লিত, (৫) ছতোলী,



গোফণা বন্ধন



পঞ্চাঙ্গী বন্ধন

(৬) মণ্ডল, (৭) সুগিকা, (৮) যজক, (৯) খট্টা (১০) চীন, (১১) বিবন্ধ, (১২) বিতান, (১৩) গোফণা ও (১৪) পঞ্চাঙ্গী। এই প্রবন্ধে তিন প্রকার বন্ধনের চিত্র প্রদত্ত

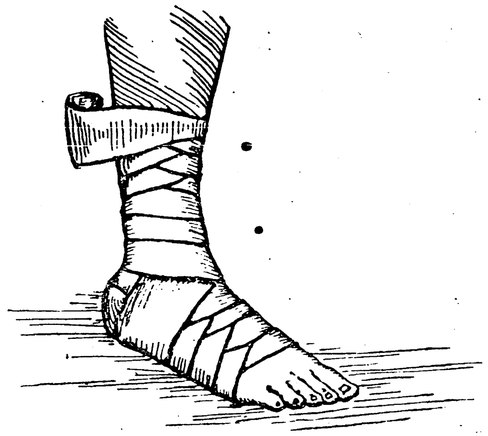

স্বস্তিক বন্ধন

হইল। বন্ধনকার্য্যে সূতার কাপড়, মেষ-লোমনির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী কাপড়, চর্ম্ম, বংশাদির চটা, সূতা, লৌহ, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ ব্যবহৃত হইত। যে প্রকার বন্ধন শরীরের স্থানবিশেষে সুনিবিষ্ট হয় সেই স্থানে সেই প্রকার বন্ধন প্রযোজ্য। স্থান-বিশেষে বন্ধন তিন প্রকার—গাঢ়বন্ধন, সমবন্ধন ও শিথিলবন্ধন। যে বন্ধন বেশ শক্ত অথচ যাহাতে বেদনা বোধ হয় না তাহা গাঢ়বন্ধন; যে বন্ধন ভিতরে ফাঁপা তাহা শিথিলবন্ধন ও যাহা খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে তাহাই সমবন্ধন।

ক্ষার

রাসায়নিকের পক্ষেও সুশ্রুত পরম আদরের সামগ্রী। সুশ্রুতের মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুতপ্রণালী রসায়নের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরক ও সুশ্রুত উভয়েই সজ্জীকাক্ষার (Carbonate of Soda) এবং যবক্ষার (Carbonate of Potash) দুইটি পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে এই দুইটি ক্ষার বহুদিবস পর্য্যন্ত একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল।

সুশ্রুত ক্ষারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মৃদু (mild), মধ্য (caustic) ও তীক্ষ্ণ। সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে, তাহা মৃদুক্ষারে দন্তী, দ্রবন্তী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমরা মধ্য ক্ষারকেই তীক্ষ্ণক্ষার অর্থাৎ caustic alkali বলিয়া ধরিয়া লইলাম, কারণ "মধ্য" শব্দ ঠিক (caustic) শব্দের দ্যোতক নহে।

তীক্ষ্ণধার—তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্মক ভস্ম জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ভস্মশর্করা, ঝিনুক, শঙ্খনাভি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া যে চূণ (caustic lime) পাওয়া যায় তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে পাক করিবে। মৃদুক্ষার ও চূণ একত্র জ্বাল দিয়া এখনও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণক্ষার লৌহকলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। তীক্ষ্ণক্ষার হীনবীর্য্য (carbonated) হইয়া যাইলে পুনরায় চূণের সহিত জ্বাল দিবার ব্যবস্থা আছে।

সুশ্রুত ক্ষারের গুণ সঠিক ভাবেই দিয়াছেন —ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল।

তেজপ্রশমন। (neutralisation) —অম্লরসের (acids) দ্বারা তীক্ষ্ণ ক্ষারের যে তেজপ্রশমন হয়, তাহাও সুশ্রুতের সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহার কারণ বলিয়াছেন যে ক্ষার দ্রব্যে লবণরস আছে, সেইজন্য অম্লরসের সহিত লবণ রস সংযুক্ত হওয়াতে মাধুর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণতাবিহীন হইয়া থাকে। আধুনিক রসায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে যে অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া এক-প্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে লবণ (Salt) বলে। এই লবণজাতীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকাতে অম্ল ও ক্ষার সংযোগে তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হয়।

কায়চিকিৎসা

সুশ্রুতে অস্ত্রচিকিৎসা ছাড়া কায়চিকিৎসারও অনেক উপদেশ আছে। চরক পাঁচ শত ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুত সাঁইত্রিশ গণে প্রায় ৭৬০টি ভেষজের গুণবর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিবিধ লবণ, ছয় ধাতু ও বিবিধ খনিজ পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মরজগতে চিরকালই অমর হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। আশীর্ব্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞান-গরিমার, অতীত স্বাধীনচিন্তার নিদর্শনস্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বাস্তুভিটা

(গল্প)

গঙ্গার ধারে পল্লীর ক্রোড়ে একখানি বাড়ী খুঁজিতেছিলাম। ছুটির দিনে কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহলের হাত এড়াইয়া, যেখানে গিয়া দুই দণ্ড হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি, এমন একখানি পরিচ্ছন্ন, খোলা, ঝরঝরে বাড়ী।

দালাল আসিয়া খপর দিল, নিকটেই বালিতে একখানি বাড়ী আছে,—বিক্রয়ের জন্য— ঠিক আমি যেমনটি চাই!

পথের উপর এক-তলা বাড়ী, পাশে বাগান,—রাংচিত্রের বেড়ায় ঘেরা। সম্মুখে জীর্ণ দ্বারের গায় একখানা কাগজ আঁটা, তাহাতে লেখা আছে, "বাটী বিক্রয়। ভিতরে সন্ধান করুন।" জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, অক্ষরগুলা অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিয়াছে! দ্বারের সম্মুখে নোড় ও নিমের দুইটা জীর্ণ গাছ। কালকাসুন্দার ঝোপেরও অসদ্ভাব নাই! বাড়ীখানি নিতান্তই পোড়ো!

না। ভিতরে ঐ যে কে কাশে! জীবনের চিহ্ন ত তবে লুপ্ত নহে! দ্বারের ফাটল দিয়া আমি ভিতর-পানে চাহিলাম। সম্মুখেই উঠান। উঠানে আগাছার মধ্যে দুই চারিটা কৃষ্ণকলি ও করবীর গাছ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। রোয়াকে শ্যাওলা জমিয়াছে—ঠিক যেন কে সূক্ষ্ম সবুজ ভেলভেট দিয়া রোয়াকের গাটুকু মুড়িয়া দিয়াছে। একটা ভাঙ্গা জানালার মধ্য দিয়া ধূম বাহির হইতেছিল—সে যেন দৈন্যপীড়িত ক্লিষ্ট জীবনেরই ঈষৎ ধূম্র-কৃষ্ণ আভাষ!

বাগানে আম-কাঁঠালের গাছ, শীর্ণ দেহে দাঁড়াইয়া—প্রকাণ্ড মাকড়সার জালে, তাহাদের মাথাগুলা ঘিরিয়া রাখিয়াছে!

দ্বারের কড়া নাড়িলাম। এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল, "কি চাই?" আমি কহিলাম, "কেহ আছে কি?" সে বলিল, "কর্ত্তাবাবু বাগানে আছেন। আসিবেন কি?"

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। নির্জ্জন পুরী। গা যেন ছম ছম করিয়া উঠিল। দুই চারিটা পায়রা ঝট্‌পট করিয়া ছাদের দিকে উড়িয়া গেল।

বাড়ীর পিছনেই বাগান। বাগানের মধ্যে একটা জায়গায় খানিকটা মাটি কোপাইয়া এক বৃদ্ধ নিবিষ্ট চিত্তে কিসের বীজ বুনিতে ছিল। হাত পাঁচ সাত দূরে বাগানের ঠিক নীচ দিয়াই গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। শুভ্র জলের স্রোত, হাসির রেখার মতই তাহা স্নিগ্ধ, নির্ম্মল

পদশব্দে বৃদ্ধ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "আপনারা কি চান?"

আমি কহিলাম, "এই বাড়ীটা কি বিক্রয় হইবে?"

একটা ঢোক গিলিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ!" বলিয়াই তাহার স্বর কেমন রুদ্ধ হইয়া গেল। সেটুকু আমি লক্ষ্য করিলাম; কহিলাম, "তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল,—অত্যন্ত মৃদু স্বরে কহিল, "এ বাড়ী আপনাদের পোষাইবে না। তা ছাড়া ইহারা বড় বেশী দাম চায়। একে ত পুরানো ভাঙ্গা বাড়ী,—কি-ই বা আছে! ইট-কাঠগুলা অবধি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কেন, মিথ্যা খরচ করিয়া কিনিবেন? অন্যত্র ভাল বাড়ীর সন্ধান করুন; বিস্তর মিলিতে পারে।"

কথাটা শেষ করিয়াই বৃদ্ধ আপনার মনে কি বকিতে বকিতে সরিয়া গেল। আমি বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ব্যাপার কি?

২

মোড়ে একখানা মুদির দোকান ছিল। তথা হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—বৃদ্ধের দুই পুত্র; দুই জনেই কৃতী,—কলিকাতায় বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাড়ী কিনিয়া তাহারা বাস করিতে চাহে। আপাততঃ ভাড়া বাড়ীতে থাকে। বধূ দুইটি সহুরে মেয়ে, কাজেই পাড়াগাঁয় থাকিতে চাহে না—তাই পুত্রদ্বয়কেও দেশের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ তাহাতে রাজী হয় না,—হাজার হোক, সাত পুরুষের বাস্তুভিটার মায়া ত্যাগ করা

ত সহজ নহে। এখানেই তাহার জগদ্ধাত্রী-সমা গৃহিণীকে বৃদ্ধ গঙ্গা দিয়াছে, এই গৃহেই তাহার এক পুত্র, তিন কন্যার মৃত্যু হইয়াছে—আবার এই গৃহেই তাহার পিতৃ-পিতামহ কত সমারোহে একদিন দোল-দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন,—কত কাঙ্গাল অতিথি পাত পাতিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে উদর পূর্ত্তি করিয়া দুই হাত তুলিয়া জয় গান গাহিয়া গিয়াছে! সুখ-দুঃখের অজস্র স্মৃতিতে মণ্ডিত, ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে সুরভিত, এই গৃহ, সপ্ত পুরুষের লীলাস্বর্গ—ইহার মায়া বৃদ্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। কুলাঙ্গার পুত্র দুইটা দালাল লাগাইয়া বিক্রয়ের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাপের সহিত কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বাপ এ ভিটা ছাড়িয়া কোথাও নড়িবে না! ছেলেরা দেখা করে না, খোঁজ লয় না, তবু না! এমনই তাহার ধনুর্ভঙ্গ পণ! এতই তাহার বাস্তুভিটার প্রতি মায়া! যে লোক কিনিতে আসে, তাহাকেই বৃদ্ধ নানা ভাংচি দিয়া সরাইয়া দেয়! ছেলেরা বোধ হয় এতটা সংবাদ রাখে না! রাখিলে সহজে বৃদ্ধকে নিষ্কৃতি দিত না।

এই বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া, দুই ছিলিম তামাকু পুড়াইয়া, সেদিনকার মত উঠিলাম। আশাভঙ্গে এতটুকু ক্ষোভ হইল না। বৃদ্ধের প্রতি কেমন-একটা অনুরাগ জন্মিল। গৃহে ফিরিবার জন্য যখন কলিকাতা-মুখী ষ্টীমারে চড়িলাম, তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই ম্লানিমার মধ্যে, বৃদ্ধের হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব ভাব-রহস্যটুকু দীপ্ত ছটার মতই আমার অন্তরে জ্বল্‌জ্বল করিয়া উঠিল।

৩

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে এক বন্ধুর কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে আর একবার বালি গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার তীর ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই মুদির দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মুদি তখন দোকানে ছিল না।

দোকানের সম্মুখে পথের উপর বসিয়া মুদির স্ত্রী ফুলুরী ভাজিতেছিল। পথের ধূলি উড়িয়া আসিয়া ফুলুরীর দেহ ভূষিত করিতেছিল; কিন্তু মুদিনীর সে দিকে লক্ষ্যও ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুদি কোথায়?"

মুখ না তুলিয়াই মুদিনী কহিল, "গঙ্গে গিয়াছে।"

একটি ছোকরা আসিয়া টুল পাতিয়া দিল। আমি বসিলাম; ছোকরাকে কহিলাম, "এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি।"

নিবিষ্ট চিত্তে তামাকু টানিতেছিলাম। তামাকুর ধূমের সহিত অজস্র চিন্তার জাল মাথার মধ্যে জোট পাকাইতেছিল। মুদিনীর খোলা সমানে চলিয়াছিল। এমন সময় বাজরা মাথায় মুদি দোকানে ফিরিল; আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "খপর ভাল? তা এদিকে আগমন—"

আমি কহিলাম, "এখানে একটি পাত্র দেখিতে আসিয়াছিলাম। তা তোমাদের সে বাড়ীর খপর কি?"

"কোন্ বাড়ী?"

"ঐ, যে বাড়ী বিক্রয় হইবার কথা ছিল। বাড়ীখানি আমার বড় পছন্দমত—যদি পাওয়া যায়——"

"সে বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, "বিক্রয় হইয়া গিয়াছে? কি রকম? তবে সে বুড়া—"

মুদি কহিল, "বুড়ার দুঃখের কথা আর কি বলিব, বাবু? কলিকাতার এত কাছে, গঙ্গার ধারে বাড়ী—উহা কি পড়িয়া থাকে? তাহার জন্য খরিদদার আসিয়া নিত্যই ফিরিয়া যাইত। ছেলেরা খবর পাইয়া একদিন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত। বুড়া বলে, আম-কাঁঠালের সময়টা কাটিয়া যাক্, তখন বিক্রয় করিয়ো—হাতের গাছ—তাহার ফলটা মুখে দিব না? এমনই করিয়া তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। ছেলেরা বলিল, আমরা আপনার কাছে থাকিতে পারি না, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা হয় না! কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে এখানে আসিবার সুবিধাও ঘটে না, ইহাতে লোকে যে আমাদেরই নিন্দা করে। আমাদের সঙ্গে আপনিও কলিকাতায় থাকিবেন, চলুন! তাহাতেও বুড়ার মন গলিল না। তাহার শুধু সেই এক কথা, পিতৃ-পুরুষের ভিটা ছাড়া যায় না। যেখানে জন্ম লইয়াছি, আজন্ম যেখানে কাটিয়া গেল, মৃত্যুটা যদি সেইখানেই ঘটে, তাহার চেয়ে ভাগ্যের কথা আর কি আছে? বুড়ার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। নিজের হাতে কোপাইয়া, কত শাক সব্জীর গাছ বুনিয়াছে, উঠানের আগাছা সাফ করিয়াছে—ব্রাহ্মণ বা দেবতা কাহারও খাতির বুড়া ইদানীং রক্ষা করে নাই—সমস্ত প্রাণ এই বাস্তু-ভিটাটির উপর ঢালিয়া দিয়াছিল—ছেলের অধিক মায়া, নাতির অধিক স্নেহ, দেবতার অধিক শ্রদ্ধা! বাস্তুভিটাটি বুড়ার কাছে তাহার ইষ্টদেবতারও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

আমি কহিলাম, "তার পর?"

মুদি কহিল, "কিন্তু সবই বৃথা হইল। ছেলেরা একদিন জোর করিয়া বাপকে নৌকায় তুলিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। তখন সবে ভোর হইয়াছে। বুড়ার সে কান্নার সুরে এখানে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘাটে গিয়া দেখি, নৌকা তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃদ্ধকে ধরিয়া ছেলেরা নৌকায় বসিয়া, আর দুই হাত তুলিয়া বুড়ার সে কি আছাড়ি পিছাড়ি! আঃ, বাড়ীর উপর এমন মায়া, বাবু, আমার ত মাথার চুল পাকিয়া গেল, এমনটি কখনও দেখি নাই!"

"তার পর বাড়ীর কি হইল?"

"তার এক সপ্তাহ পরেই বাড়ীখানা বিক্রয় হইয়া গেল। কলিকাতার কে-এক উকিলবাবু বাড়ীখানা কিনিয়াছেন—মেরামত করাইয়া বাড়ীর যে সজ্জা বাহির করিয়াছেন, যেন ছবি-খানি! তিনি ওখানে বাগানবাড়ী করিয়াছেন, আর কি!"

আমি উঠিলাম। সেই পোড়ো বাড়ীর দিকে চলিলাম। এ কি! এ যে মোটেই চেনা যায় না! কাঙ্গালিনীকে কে যেন রাজার রাণী সাজাইয়া তুলিয়াছে! সে ভাঙ্গা দ্বার-জানালা, সে জীর্ণ, বালি-খসা, লোনা-ধরা দেওয়াল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে রাঙচিত্রের বেড়ার স্থানে তারের রেলিঙ খাড়া হইয়াছে,—তাহার পশ্চাতে বিচিত্র ক্রোটনের সারি। আলাদিনের প্রদীপ ঘষিয়া কে যেন এই বনের মধ্যে কোথা হইতে, এক মায়াপুরী উপড়াইয়া আনিয়া রাখিয়াছে! কোথায়

গিয়াছে, সম্মুখের সে নোড়-নিমের গুল্ফ গাছ, কোথায় বা সে কদলকাসুন্দার ঘন ঝোপ!

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল—তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ। তাহারই অস্পষ্ট আলোকরশ্মি নিম্নে মর্ত্ত্য-তলে ঝরিয়া পড়িয়াছিল! সেই অস্পষ্ট আলোকে আমি দেখিলাম, সম্মুখে জীর্ণ দ্বারের জায়গায় প্রকাণ্ড গেট বসিয়াছে! গেটের পথে লাল কাঁকর ফেলা হইয়াছে। সেই পথের দুই ধারে হাস্নুহানা ও বেল-জুঁইয়ের অসংখ্য গাছ। তাহাতে অজস্র ফুল্ ফুটিয়া গন্ধে চারিধার মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমি কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। বাহ্য চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া গেল।

সহসা সাড় হইল। ভাল করিয়া গৃহের পানে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। অদূরে কক্ষে তখন আলো জ্বালা হইয়াছে! খোলা জানালার মধ্য দিয়া পশ্চাতে মুক্ত প্রান্তরের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল! গঙ্গাবক্ষও অস্পষ্ট চোখে পড়ে। চাঁদের আলো পড়ায় গঙ্গার মৃদু তরঙ্গে যেন রূপালি বিদ্যুৎ খেলিতেছিল! ক্রমে ভিতরে পিয়ানো-ক্লারিয়োনেটেও সুর উঠিল —সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশীল নূপুরের মিষ্ট মধুর ঝঙ্কার ও নারী কণ্ঠের সঙ্গীত-ধারা ঝরিয়া পড়িল!

আমার প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। একটু সরিয়া আসিয়া একটা ইষ্টক-স্তূপের উপর আমি বসিয়া পড়িলাম! সেখানেও সেই নূপুর-গীত-বাদ্যের মিশ্র নিক্কণ ভাসিয়া আসিতেছিল! সে সুরে যেন উগ্র বিষ উগারিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষস্থ বাতির ঝাড়ের আলোক-রশ্মি গাছের ফাঁক দিয়া পথে দুই-চারি টুকরা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল, আমার মনে হইল, সে যেন প্রলয় দাহেরই বহ্নিশিখা! মাথা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল! এই সে বুড়ার বাস্তুভিটা,—বুড়ার বুক-ফাটা অশ্রু আজও তথায় সঞ্চিত রহিয়াছে! উৎসব-ব্যসনের হর্ষ-ব্যথা যথায় শত চরণ-চিহ্ন পাত করিয়া গিয়াছে, সপ্ত পুরুষের হৃদয় হইতে যথায় স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রেম ও আতিথেয়তার সহস্র সুবর্ণ ধারা ঝরিয়া মরিয়াছে, আজও যাহার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—এই সেই বাগান, সেই উঠান, সেই ঘর! আজ তথায় বিলাস-লীলার দিব্য অভিনয় জমিয়া উঠিয়াছে! সেই সুখ দুঃখের স্মৃতির উপর লালসা আজ তাহার চপল চরণে বিকট নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

আমার চেতনা যেন লুপ্ত হইল। সহসা তখনই মানস-নয়নের সম্মুখে কলিকাতার অন্ধকার গলির মধ্যকার একটা ঘ্যাঁৎসেঁতে বাড়ীর শোচনীয় দৃশ্য নিমেষে যেন জাগিয়া উঠিল। যেন স্পষ্ট দেখিলাম, সেই গৃহে ছোট একটি টুলে এই পোড়ো বাড়ীর অধিকারী, সেই বেচারা বৃদ্ধ যেন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে —নীরব বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চোখের জলে শীর্ণ হাত দুইটি ভিজিয়া উঠিয়াছে!

দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিলাম। মাথার উপর বিরাট নীল স্তব্ধ আকাশ। সেই আকাশে বসিয়া নক্ষত্রগুলা নীরবে শুধু অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিল।

সহসা পার্শ্বে সজিনা গাছের ডাল হইতে একটা পাখী ফুকারিয়া গাহিয়া উঠিল, "চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নববর্ষে

ঐ বাজে মঙ্গল আরতি, যাত্রী যত উল্লাসে মগন,
"দীর্ঘ পথ অবসান এবে, দেখা যায় তীর্থ নিকেতন!"
আশার উচ্ছ্বাসে আকুলিয়া, সচকিতে চারিদিকে চাই—
কোথায় গো দেবতা নূতন, তোমার ত দেখা নাহি পাই!
চোখে পড়ে নীল নভস্তল, রবি শশী গ্রহতারাগণ,
তরুলতা সমুদ্র অচল, সেই সবই চির পুরাতন!
বিরাট এ পুরাতন মাঝে, শুনিয়াছি তুমি আদিভূপ!
বিশ্বব্যাপী মূরতি তোমার—অতুল সুন্দর মহারূপ!
কেন তবে করিছ ছলনা, প্রকাশ হে প্রচ্ছন্ন মহিমা,
পুণ্যমঙ্গল-নবালোকে ভরি দাও স্বর্গমর্ত্ত্যসীমা।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কালিদাসের নাটক

(চয়ন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কালিদাস তিনটি নাটক রচনা করেন:—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র।

অবশ্য, মালবিকাই কবির প্রথম রচনা; কেননা, প্রস্তাবনায় সূত্রধার, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগকে উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞাতনামা এক গ্রন্থকারের নাটক অভিনয় করিতে কেন উদ্যত হইয়াছেন তাহার হেতু সমর্থন করিয়াছেন। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকখানি উজ্জয়িনী নগরে বসন্তোৎসব-উপলক্ষে অভিনীত হয়। ইহার আখ্যানবস্তু, রাজান্তঃপুরের গুপ্ত প্রেমলীলা। ইহার পাত্রগণ নাট্যশাস্ত্রের উপদেশানুরূপ। ইহার নায়ক, উদারপ্রকৃতি আমোদপ্রিয় রাজা, কিন্তু রাজ্যশাসন অপেক্ষা প্রেমের ব্যাপার লইয়াই ইনি অধিক ব্যাপৃত। ইহার সহকারী, বিদূষক গৌতম ব্রাহ্মণ, প্রিয়ভাষী ও প্রভুভক্ত, কিন্তু অসংযত-বাক্ ও ভীরু; কঞ্চুকী মদ্গল্য, আদব-কায়দা-দুরস্ত ও পরিণামদর্শী; নাট্যাচার্য্য-দ্বয়—গণদাস ও হরদত্ত, সঙ্গীতকলানুরাগী ও রাজানুগ্রহ-লাভাকাঙ্ক্ষায় ঈর্ষ্যান্বিত; এবং বামন "সারস";—ইহারাই অন্তঃপুরস্থ পুরুষবর্গ। মন্ত্রি বার্হতক বহিঃ-রাষ্ট্রনীতির পরিচালক।

নায়িকা, রাজকুমারী মালবিকা—একজন মুগ্ধারমণী; তাঁহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী—মহিষী ধারিণী। ধারিণী—রাজার প্রতি একান্ত অনুরক্ত; রাজা অন্যাসক্ত বলিয়া ধারিণীর বিষম কষ্ট; কিন্তু ধারিণী উদার-

প্রকৃতি এবং অপমানেও গর্ব্বিতা; রাণী ইরাবতী উদ্ধতপ্রকৃতি ও কোপনস্বভাব, এমন কি, কোপের আবেগে তিনি প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা কৌশিকী, নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়া সংসারত্যাগী হইয়াছেন; উচ্চতর উপদেশ ও আখ্যানাদির দ্বারা তিনি পরিত্যক্তা ধারিণীকে সান্ত্বনা দেন ও তাঁহার চিত্তবিনোদন করেন। পরিব্রাজিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সকল অবস্থাতেই ধারিণীকে সাহায্য করে। তিনি যেমন নর্ত্তকীর গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ, তেমনি সর্প দংশনের ঔষধনির্দ্দেশ করিতেও সুদক্ষ। রমণীদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করেন। প্রতীহারী জয়সেনা সকল সময়েই রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পরিচারিকাদিগের স্বভাবচরিত্রে স্ব স্ব ঠাকুরাণীর স্বভাবচরিত্র প্রতিফলিত।

ইতিহাস হইতে কবি তাঁহার নায়ক নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অগ্নিমিত্র শুঙ্গ রাজবংশের প্রথম রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য-সিংহাসন অধিকার করেন। এই নাটকে, অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্পমিত্রের এবং তাঁহার পুত্র বসুমিত্রের উল্লেখ আছে। বিদর্ভের সহিত যুদ্ধ ও যবনদিগের পরাজয় —ইহাও বোধ হয় ঐতিহ্য হইতে গৃহীত; অবশিষ্ট ভাগ কবির কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনার জন্যও তাঁহাকে সমধিক প্রয়াস পাইতে হয় নাই। ভাষ-প্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তার ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককারদিগের গ্রন্থে এইরূপ রচনার আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তঃপুরের গুপ্ত-প্রেম-ঘটিত এই ধরণের নাটক পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার "গড়া-পেটা" হইয়া রহিয়াছে। কোন এক রাজার ভাবী পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট কোন এক রাজকুমারীর দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় সেই সঙ্কল্পিত বিবাহ যেন চিরতরে ভাঙ্গিয়া গেল এইরূপ মনে হইল। পরে, যে রাজার সহিত ঐ রাজকুমারীর পরিণয় হইবার কথা ঐ রাজকুমারী ঘটনাক্রমে সেই রাজার মহিষীর পরিচারিকা হইল। রাজকুমারীকে কেহ চিনিতে পারিল না। রাজা তাহার রূপলাবণ্যে ও উচ্চকুলসুলভ শিষ্টব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন। কোন সংকেতস্থানে নায়কনায়িকার দেখা সাক্ষাৎ হইল। বিদূষকের নির্ব্বুদ্ধিতায়, মহিষী, উভয়ের প্রথম মিলনে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন। মহিষী যারপরনাই কুপিতা হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা আবার একটা অপরাধে ধরা পড়িলেন। দৈবযোগে মহিষীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল! তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল; তিনি নিজ হস্তে স্বীয় সপত্নীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনেক স্থলেই, রাজারা এইরূপ বিবাহ করিয়া, কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বলে, চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মালবিকার, রত্নাবলীর, প্রিয়দর্শিকার, কর্পূরমঞ্জরীর, কর্ণসুন্দরী প্রভৃতির মোটামুটি নক্‌সা।

যে সকল ঘটনার দ্বারা নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎকার ঘটে, মহিষী সংকেতস্থলে আসিয়া পড়েন, তাঁর কোপ প্রশমিত হয়,—সেই সকল ঘটনার মধ্যেই যাহা কিছু বৈচিত্র্য। তাছাড়া, প্রধান জিনিস উহা নহে। নায়ক নায়িকার মনের অবস্থা মনোজ্ঞ শ্লোকে চিত্রিত করা

এবং এই চিত্রের সহিত কতকগুলি নিসর্গবর্ণনা মিশ্রিত করা—ইহাই আসল জিনিস।

রাজা মালবিকার চিত্র দেখিয়া, আসল লোকটিকে দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। মহিষী তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। মালবিকা নৃত্য শিক্ষা করিতেছিল, নৃত্যবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, নাট্যাচার্য্য এইরূপ ঘোষণা করিলেন। অন্তঃপুরের নাট্যাচার্য্য-দ্বয়ের মধ্যে বিদূষক ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা বিচার করিবার জন্য উভয়েই রাজার শরণাপন্ন হইলেন। রাজা অগ্নিমিত্র, পরিব্রাজিকার উপর বিচারের ভার দিলেন। পরিব্রাজিকা, উভয় নাট্যাচার্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের নৃত্য দেখাইবার জন্য আদেশ করিলেন। গণদাস মালবিকাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মালবিকার নৃত্যগীত ও অভিনয়ে সকলেই আত্মহারা হইল। রাজা তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইলেন। মধ্যাহ্নে নৃত্য থামিল। এই সময়ে, কবির কতকগুলি স্বভাববর্ণনাত্মক শ্লোক রচনার অবসর হইল। তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্য—প্রমোদ-বন। এই উপলক্ষে, একটু নূতনভাবে উদ্যান ও বসন্ত বর্ণনা করা কবির পক্ষে সহজসাধ্য। এ অবসর তিনি ছাড়েন নাই।

ধারিণীর কোন কার্য্যোপলক্ষে, ধারিণীর আদেশে, সখী বকুলাবলিকাকে সঙ্গে লইয়া মালবিকা প্রমোদবনে প্রবেশ করিয়াছেন। বিদূষকের সহিত রাজা বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া মুগ্ধ নয়নে মালবিকাকে দেখিতেছেন। ওদিকে পরিচারিকার সহিত রাণী ইরাবতী রাজার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রাজার মনের আবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া, বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া, মালবিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে রাণী ইরাবতীও আসিয়া পড়িলেন। তিনি বিষম কুপিত হইয়া রাজাকে স্বীয় রশনার দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন এবং রাজাকে এইরূপ অবমানিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মালবিকাকে কারারুদ্ধ করিলেন। রাজা স্বীয় প্রণয়িনীকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার মানসে বিদূষকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গৌতম সর্পদষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভাণ করিল, আরোগ্য লাভের জন্য রাণীর অঙ্গুরীটি চাহিল; এবং সেই অঙ্গুরী লইয়া মালবিকাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিল। নায়কনায়িকার আবার সাক্ষাৎকার ঘটিল; এবারও রাজা, ইরাবতীর নিকট ধরা পড়িলেন। রাজা নিরুপায় হইলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী একটা বানরের ভয়ে মূর্চ্ছিত হওয়ায়, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য রাজা আহূত হইলেন। পঞ্চম অঙ্কে, জয়ের সংবাদ লইয়া একজন দূত বিদর্ভ হইতে আগমন করিল। তাহার সঙ্গে একদল বন্দী। সেই দেশের দুই জন সঙ্গীতনিপুণা পরিচারিকা মহিষীর সম্মুখে আনীত হইল। উঁহারা পরিব্রাজিকা কৌশিকীকে চিনিতে পারিল। এবং তাহাদের যে রাজকুমারী মৃত বলিয়া এযাবৎ তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সেই রাজকুমারী মালবিকাকে তাহারা পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রাজার পিতা পুষ্পমিত্রেরও একজন দূত এই সময়ে সুসংবাদ লইয়া আসিল। ধারিনীর পুত্র রাজকুমার বসুমিত্র যুদ্ধে কিরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, ঐ দূত তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। মহিষী আনন্দের নিদর্শন-স্বরূপ

মালবিকাকে রাণী উপাধি প্রদান করিলেন। ইরাবতী ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে য়ুরোপের সমক্ষে প্রকাশিত করেন সেই প্রবীণ সাহিত্য-বিচারক Wilson, পাণ্ডুলিপি ও কিংবদন্তি—এই দুয়ের সমবেত সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে, এই নাটকখানির প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রতিবাদের মূলে অনুভূতিমূলক যুক্তি ছাড়া তাঁহার আর কোন যুক্তি নাই। তিনি বলেন, "ইহা যে শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশীর গ্রন্থকারের রচনা ইহা কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহার আখ্যানে না-আছে কল্পনা, ইহার পদ্যরচনায় না-আছে স্বরমাধুর্য্য।" নিকৃষ্টতার প্রথম কারণটি সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়—ইহা তাঁহার প্রথম রচনা। দ্বিতীয় কারণটি ত ভারতীয় কাব্যবিচারকদিগের নজরে পড়ে নাই; এইরূপ দোষ থাকিলে, তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইত না। এই সকল ত্রুটি ধরিতে তাঁহারা বিশেষরূপে পটু। কিন্তু Wilsonএর নিকটেও এই দুটি দোষ প্রামাণিকতা খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কেননা, একটু পরেই তিনি আবার বলিতেছেন,—"ইহা প্রাচীন কবি কালিদাসের রচনা বলিয়া অনুমান করিবার কিছু হেতু থাকিতে পারে; কিন্তু উহাতে যেরূপ রীতিনীতি বর্ণিত হইয়াছে, উহা ভারত-সমাজের অধঃপতন সময়ের রীতিনীতি বলিয়া বোধ হয় এবং উহা দশম কিম্বা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব।" আমরা এই নাটকের যে বিশ্লেষণ দিয়াছি,—তাহাতেই এই যুক্তি ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এই যুক্তির অসারতা সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। মালবিকার রীতিনীতির সহিত বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নাই। সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত কালিদাসের পূর্ব্বেই নিয়মবদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত তিন নাটকের মধ্যে, লিখনরীতি, ভাব, চিন্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে একটা সমতা আছে এবং ঐ তিন নাটকের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে, তাহা Weber ও শঙ্কর পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব ও-সম্বন্ধে তর্কের মুখ এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেও হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কতকাল

ঊর্দ্ধে মহাব্যোম ওই অসীম-প্রসার!
সীমাহীনা, সুবিপুলা মেদিনী অধসে!
তাহার উপরে অদ্রি গগন পরশে!
বক্ষে প্রধাবিত সিন্ধু অতল, অপার!
এ অসীম মাঝে রবে কতকাল নর
সঙ্কীর্ণ আমিত্ব অন্ধগুহার ভিতর!!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

সৌধ-রহস্য

(চয়ন— ধারাবাহিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার নাম, জন ফদারজিল ওয়েষ্ট। আমি সেণ্ট আণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র। নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্রে আমি যে ঘটনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা সরল সত্যের অভিব্যক্তি মাত্র। সাহিত্য জগতে যশোলাভের দুরাশা আমার কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। বর্ণনার মাধুর্য্যে বা ঘটনা-সমাবেশের চাতুর্য্যে বর্ণনীয় বিষয়টিকে লোক চক্ষে সমধিক চিত্তাকর্ষক বা রমণীয় করিয়া তুলিবারও বিন্দুমাত্র প্রয়াস পাই নাই। এই ঘটনার বিষয় যাঁহারা একটুও অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, যে কোথাও আমি এতটুকু সত্যের অপলাপ করিয়া কল্পনার তুলি বুলাই নাই। সম্ভবতঃ সাহিত্য-জগতের সহিত ইহাই আমার প্রথম ও শেষ পরিচয়। অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত ত আমার মনের ভাব এইরূপ।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম প্রমাণ-প্রয়োগ সমেত যেমন যাহা ঘটিয়া ছিল তেমনি ভাবেই সব প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার শুভার্থী বন্ধু-বান্ধবগণের পরামর্শে সে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল। আমার নিকট যে সমস্ত কাগজ-পত্র আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিলে জেনারল হিমারষ্টণের সম্বন্ধে সকল কথাই সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সুতরাং নানা কারণে তাহা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এই ভূমিকার সহিত আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। নামটা প্রথমেই বলা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্টটুকু বলিতেছি।

আমার পিতা জন হাণ্টার ওয়েষ্ট সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম আমাদের দেশের বিদ্বৎ-সমাজে গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। হাফেজ ও ফেরিদোদ্দিন আতরের তর্জ্জমায় তাঁহার নামে সাহিত্য জগতে বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল। মক্কেলের দল, মকদ্দমা বুঝাইবার জন্য যখন তাঁহাকে খুঁজিতে আসিত, তিনি তখন প্রধান প্রধান লাইব্রেরি কিম্বা কোন সাহিত্যসেবী বন্ধুর গৃহে খৃষ্টজন্মের ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মনু কি আইন-কানুন করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই গভীর তথ্য-আবিষ্কারে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। কাজেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে তাঁহার অন্তর-দেশ যতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে ছিল, আর্থিক অবস্থা ও গৃহের সচ্ছলতা ঠিক সেই পরিমাণেই শোচনীয় হইতেছিল।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সংস্কৃত অধ্যাপকের কোন পদ ছিল না। কাজেই বাবারও তখন ফরদুসি, ওমরখৈয়ম, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কবিতা ছাড়া আর কোন মূল্যবান বহিও ভাণ্ডারে মজুত ছিল না।

নিকটতম আত্মীয়ের মতই দারিদ্র্য

তাহার নিবিড় বন্ধনে যখন আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল সে সময় আমার বৈমাত্রেয় খুল্লতাত উইলিয়ম ফ্যারিমটস্ যদি আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দিন কাটানো দায় হইয়া উঠিত। উইগটাউন-সায়ারে কাকার কিছু সম্পত্তি আছে। জমিদারী খুব বৃহৎ হইলেও জমীর আয় নিতান্তই অল্প। কারণ তাঁহার জমিদারীটা অত্যন্ত অনুর্ব্বর প্রদেশে অবস্থিত। তেমন শস্যহীন ভূমি সমস্ত স্কট্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ!

কাকা অবিবাহিত। নিজেও তিনি মিতব্যয়ী, বাজেই জমীর খাজনা-পত্র যাহা কিছু পাওয়া যাইত, খরচ-বাদেও তাহা হইতে তাঁহার কিছু কিছু সঞ্চয় হইত। এই জমিদারী ভিন্ন পিতৃব্যের একটি ঘোড়ার ব্যবসায়ও ছিল। আমাদের যখন সময় ভাল ছিল, কাকা তখন মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতেন। কিন্তু অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্নেহেরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আমাদের অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল, ঠিক সেই সময় একদিন সহসা ভগবানের করুণার মতই অপ্রত্যাশিত রূপে আমরা তাঁহার এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন যে তিনি দেশ-ভ্রমণে যাইতেছেন; তাঁহার সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য বাবাকে তাঁহার বাটীতে গিয়া থাকিতে হইবে, অবশ্য সেজন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের যে ব্যবস্থা হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমার মা নাই। সংসারে বাবা ও আমি ছাড়া তৃতীয় প্রাণী ছিল, আমার ছোট বোন। কাকার নিমন্ত্রণ অত্যন্ত আনন্দের সহিতই আমরা গ্রহণ করিলাম। আমাদের সামান্য দ্রব্যাদি ও বাবার বহু যত্নের পুস্তকগুলি বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া যথাসময়ে আমরা নূতন স্থানে নূতন সংসার পাতিবার আশায় উৎসাহপূর্ণ চিত্তে যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাকার বাড়ীখানি ঠিক "জমিদার বাড়ী"র মত যথেষ্ট প্রকাণ্ড নহে। তবে আমাদের সহরের আলোক ও-বায়ু-হীন ক্ষুদ্র বাস-গৃহের তুলনায় যে পরম রমণীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাড়ীখানি যদিও একটু নীচু জমীর উপর অবস্থিত, তবুও তেমন স্যাঁতানে নয়! লাল টালির ছাদ দেওয়া, ভিতরে অনেকগুলি ঘর, সম্মুখে বিস্তৃত বারাণ্ডা, বাড়ীর তিন পাশে মাঝারি রকম ফুলের বাগান। বাগানে গাছ-পালা খুব বেশী নাই কারণ সমুদ্রের লোণা বাতাসে সকল প্রকার পুষ্পবৃক্ষ জন্মিতে, অথবা জন্মিলেও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না। যে দুই চারিটি জন্মায় ও কোন মতে বাঁচিয়া যায়,সেগুলিও তেমন সতেজ হইয়া উঠে না। রুগ্ন দেহের মতই কেমন একটা সকরুণ শ্রী তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে।

পশ্চাতে দূর সীমায় একখানি গ্রাম। খুব বেশী হইলেও এই গ্রামে দশ বারো ঘরের অধিক বাসিন্দা নাই। তাহারা প্রায় সকলেই গরীব,—ব্যবসায় বৃত্তিতে অধিকাংশই ধীবর। পশ্চিমে পীত বর্ণের সমুদ্র-বেলা, তাহার অনতি-দূরে আইরিস্ সমুদ্র। এতদ্ভিন্ন চারিদিকেই শস্যহীন অনুর্ব্বর উষর জলাভূমি একেবারে সীমাহীন দিগন্ত রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে।

উইগ্‌টাউনের তীরটি একান্তই নির্জ্জন, নিরানন্দময়। আমাদের বাটী হইতে বাহির হইলে, কোন খানে মনুষ্য বাসের চিহ্ন অবধি দেখা যায় না। কেবল কিছু দূরে উচ্চ জমীর উপর অধিষ্ঠিত ক্লুমবার হল নামক সৌধের প্রাচীন অত্যুচ্চ চূড়াটি শুধু দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলেই মনে হয়, একটা প্রকাণ্ড গোরের উপর যেন একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া রহিয়াছে। আমাদের গৃহ হইতে এই নূতন ধরণের বাড়ীটির ব্যবধান মাইল-খানেকের অধিক হইবে না। গ্লাশগোর এক অপূর্ব্ব রুচিসম্পন্ন ধনী ব্যক্তি ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

আমরা যখন কাকার বাড়ীতে বাস করিবার জন্য আসিলাম, সে বাড়ীটি তখন সম্পূর্ণ খালি পড়িয়াছিল। কতকগুলা বাদুড়, পেঁচা ও পারাবতে বাড়ীটাকে যেন পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। বাড়ীর শ্রী দেখিলে মনে হয়, তাহারা সহজে তাহাদের দখলীস্বত্ব ছাড়িতে নারাজ। শেওলা-ঢাকা ময়লা দেওয়ালগুলা তাহাকে অধিকতর বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। এই পরিত্যক্ত পুরীটি কিন্তু স্থানীয় ধীবরদের পক্ষে একটি প্রয়োজনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমুদ্রে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে ক্লুম্‌বার হলের উচ্চ চূড়াটি দ্বারা তাহারা দিক ঠিক করিয়া লইত।

আমাদের ভাগ্য-দেবতা এই নিরানন্দ নির্জ্জন দুর্গম প্রদেশে আমাদের তিনটি প্রাণীকে তাঁহার অলঙ্ঘ্য তর্জ্জনী-হেলনে আহ্বান করিয়া আনিলেন। নির্জ্জনতাটুকু অবশ্য আমাদের মন্দ লাগিত না, বরং সহরের গোলমালের বাহিরে জন-সঙ্গহীন এই শান্ত, তপোবন তুল্য স্থানে আসিয়া আমরা পরিপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম। ইহা ছাড়া কম পয়সায় 'বড় মানুষী চাল' বজায় রাখিবার যে নিদারুণ লাঞ্ছনা, তাহাও এখানে ভোগ করিতে হইত না। ইহা যে একটা অল্প লাভ নয়, তাহা বোধ হয় আমাদের মত অবস্থাপন্ন ভুক্ত-ভোগীর দল মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

কাকার একখানি গাড়ী আর ছোট দুটি কালো ঘোড়া ছিল। আমরা পিতা-পুত্রে প্রত্যহ গাড়ী চড়িয়া কাকার জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসিতাম। আর আনন্দ-প্রতিমা এস্থার তাহার স্নেহপূর্ণ মনটি দিয়া, হাসি-মুখের আলো জ্বালাইয়া আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিত। আমাদের নিরানন্দ বিদেশ-বাস সুখময় করিতেই যেন সে আমাদের নির্জ্জন গৃহখানি তাহার সুমধুর কলহাস্যে মুখরিত রাখিত। এমনি অনাবিল শান্তি-সুখে আমাদের দিনগুলি জল-স্রোতের মত অবাধে কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময় একদিন গ্রীষ্মরাত্রে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাদের একটানা জীবনস্রোত সহসা ভিন্ন পথে বাঁকিয়া পড়িল। সেই কথাই এখন বলিতে বসিয়াছি।

প্রতি সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিত; নক্ষত্র-বধূরা ঘোমটা খুলিয়া আকাশে নীল আসন বিছাইয়া বসিয়া যাইত; সমুদ্রের কালো জলে চাঁদের ছায়া হাজার বাতি জ্বালাইয়া ধরিত; এবং বেলা-ভূমে হীরকোজ্জ্বল বালুকা-চূর্ণ ছড়াইয়া পড়িত; নীল আকাশে চঞ্চল মেঘ-মালার কোল ঘেঁসিয়া পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া নীড়ে ফিরিত; সেই সময় ছিপ-

গাছটি হাতে লইয়া কাকার ছোট বোট খানিতে চড়িয়া আমি সমুদ্রে মাছ ধরিতে বাহির হইতাম। ছিপে কখনো দুই-একটা মাছ পড়িতও, কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করি, সেটা প্রায় ঘটিত না।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন সন্ধ্যায় এস্‌থারও আমার সহিত নৌকাভ্রমণে বাহির হইয়া ছিল। বাবার চোখ্ এড়াইয়া যে নূতন নভেলখানা সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছিল, একান্ত মনে সেইখানা লইয়াই সে নৌকার এক কোণে বসিয়া গিয়াছিল। আমি জলে ছিপ ফেলিয়া ফাৎনার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম। মেঘের স্তর ভেদ করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্য-কিরণ দূরে তখন বড় বড় বৃক্ষ চূড়ায় কনক-রশ্মি ঢালিয়া দিয়াছে, তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধুই রজত-ধবল ধূ ধূ বালুকার রাশি; সূর্য্যালোকে সিকতা শয্যা চক্‌চক্ করিতেছিল একখানা খণ্ড মেঘ অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো মাখিয়া সমুদ্রের একাংশ লাল রঙে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছে। সমুদ্র যেন লাল আলোর ঢেউ তুলিয়া নাচিতেছিল। সে দৃশ্য-সৌন্দর্য্য চোখেই শুধু দেখিবার, লেখনীর সাহায্যে তাহা বুঝানো যায় না। বিশেষত আমি কবি বা ভাবুক নহি হইলে কতকটা হয়ত বুঝাইতে পারিতাম।

ছিপ রাখিয়া নৌকার উপর দাঁড়াইয়া আমি সমুদ্রের সেই মহামহিম ভাব দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম; বাহ্যজ্ঞান-শূন্যের মত চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা চারিদিকে আঁধার যবনিকা বিছাইবার উপক্রম করিল। নাতি-শীতোষ্ণ বায়ু শীতল হইয়া আসিল, এমন সময় এস্‌থার সহসা আমার কোটের প্রান্তটা ত্রস্তে আকর্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিল, "দাদা, দেখেচ কি, ক্লুমবার হলের চূড়ায় একটা আলো জ্বলচে!"

স্বপ্ন-জগৎ হইতে জাগিয়া চকিত দৃষ্টিতে ক্লুমবারের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সত্যই ত! সেই উচ্চ চূড়ায় একটা আলো জ্বলিতেছিল! সে আলোক সঞ্চরমান। কখন উপরে, কখনও নীচে, কখনও আবার জানালার ধারে ধারে ঘুরিয়া ফিরিতে ছিল। গতি দেখিয়া বেশ মনে হয় যে আলোক-ধারী ক্লুমবার হলের টাওয়ারে উঠিয়াছিল, এখন নামিয়া যাইতেছে।

বিস্ময়ের সহিত আমি কহিলাম, "তাই ত! এমন সময় কে ওখানে যেতে পারে? বোধ করি, গ্রামের লোক কেউ দেখ্‌তে এসেছিল, এখন নেমে যাচ্চে।" কিন্তু আমার এ উক্তি এস্‌থারের মনঃপূত হইল না। সে মাথা নাড়িল, "না, তা নয়—গ্রামে এমন কেউ সাহসী লোক নেই যে, এ সময় ক্লুমবার হলের ফটক পর্য্যন্তও যেতে পারে। কারণ ওটাকে সবাই ভূতের বাড়ীই নাম দিয়েচে! তা ছাড়া এ বাড়ীর চাবি শুনেছি উইগটাউনেই থাকে না?"

কথা গুলার যাথার্থ্য ভাবিয়া দেখিলাম। বাড়ীর দরজা-জানালাগুলা এমনি মজবুত, আর ভারী, যে ভাঙ্গিয়া কেহ ভিতরে প্রবেশ করিবে এমন সাধ্য নাই। তবে এক, কেহ সহর হইতে চাবি আনাইয়া বাড়ী দেখিতেছে? মনে কৌতূহল হইল। দেখিতে হইবে—ব্যাপারটা কি?

এস্‌থারকে গৃহে পৌঁছাইয়া জেমিসন্ নামে

এক রণতরীর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ নাবিককে সঙ্গে লইয়া ক্লুমবার হলের দিকে চলিলাম। রণতরীর সাহসী নাবিকের মৃত আত্মাকে ভয় করিবার পক্ষে কোনই অন্তরায় ছিল না; কিন্তু সে আমার উদ্দেশ্য শুনিয়াই ধীরে ধীরে পিছু হঠিতে সুরু করিল; বলিল, "ও জায়গাটার মশায় ভারী বদনাম আছে, রাতে ভিতে ওখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। এ গ্রামে এমন কোন সাহসী লোক নেই যে সন্ধ্যের পর ঐ ভুতুড়ে বাড়ীর ফটক পার হয়! তা মশায়, আপনি যদি হাজার টাকাও দাও, তবুও কেউ ওখানে যেতে রাজি হবে না।"

"কিন্তু তবু তোমাদের ভিতরই এমন কেউ একজন আছে যে রাত্রে ওখানে যেতে ভয় পায়নি!" বলিয়াই আমি ক্লুমবার হলের আলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলাম। যে আলোটা পূর্ব্বে আমরা হলের চূড়ায় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা নীচে নামিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল, এবং উহার অদূরে আর একটা ক্ষীণরশ্মি আলোকবিন্দু থাকিয়া-থাকিয়া মৃদু নড়িতেছিল। দেখিয়া মনে হইল, দুইজন লোক দুইটা আলো হাতে লইয়া বাড়ীটার আগাগোড়া যেন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতেছে।

জেমিসন্ সেইখানেই অচলবদ্ধ জলস্রোতের মত সহসা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। আমি অনুসরণ করিতে বলিবামাত্র সবেগে তীব্র কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "না মশাই কাজ্ঞাবাজ্ঞা নিয়ে ঘর করি, শেষকালে ভূতের হাতে কি প্রাণটা দেব? যে এসেচে সে এসেচে—সে খবর নেবার আমার সখ্ নেই। আমরা গরীব লোক খেটে খাই—মানুষকে ডরাই না। আ'বলে ভূতের সঙ্গে তামাসা? ওরে বাস্‌রে।"

বৃদ্ধের কম্পিত হস্তে হাত রাখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, ভূতেরা কি গাড়ী চড়ে আসে? ঐ যে ফটকের সাম্‌নে দুটো আলোর গোলা দেখা যাচ্ছে, ওটা ত গাড়ীর আলো!"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জেমিসন্ উত্তর দিল, "সত্যি তবে—আচ্ছা চলুন, আরও একটু এগিয়ে না হয় দেখা যাক্, এমন সময় গাড়ী চড়ে এল কে! আমরা মশায়, মুরুখ্যু লোক, আমাদের কি অত বুদ্ধি আছে—না বোধ আছে?"

অন্ধকার ক্রমে চারিদিকে ঘন হইয়া নামিতেছিল। আমরা কোনরূপে হুঁচুট বাঁচাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ফটকের সম্মুখেই একখানা টমটম দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ঘোড়াটা রাস্তায় চরিয়া ঘাস খাইতেছিল। জেমিসন্ উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিল, "ঠিক্ হয়েচে! এ গাড়ী যে আমি চিনি। মিষ্টার ম্যাকলীনের গাড়ী এ। আর বাড়ীর চাবিও যে তার কাছে থাকে।"

"তা হলে ত বেশ সুবিধাই হয়েছে। এই সুযোগে আমরাও কেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে নিই না? ঐ বুঝি তিনি আসছেন?"

আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বৃহৎ ভারী দরজা বন্ধ হইবার শব্দ শুনা গেল। এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, দুইজন লোক—একজন খুব বেঁটে ও মোটা, আর একজন ঠিক তাহার বিপরীত, অর্থাৎ

অত্যন্ত কৃশ ও দীর্ঘাকার,—আমাদের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এমন মনোযোগ দিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন যে সেখানে আমাদের উপস্থিতির বিষয় মে টেই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা ফটকের নিকটবর্ত্তী হইলে আমি একটু অগ্রসর হইয়া বেঁটে ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, "শুভ সন্ধ্যা, মিষ্টার ম্যাকলীন।" ম্যাকলীনের সহিত ইতিপূর্ব্বে আরো দুই একবার আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।

আমার কথা শুনিয়া ম্যাকলীনের সঙ্গীটি অকস্মাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। হাঁফাইতে হাঁফাইতে রুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "একি ম্যাক্‌লীন্? এ সব কি? কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা—অ্যাঁ?—এ সবের মানে কি?"

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার ভাবে ম্যাকলীন অত্যন্ত সংযত কোমল স্বরে উত্তর দিল, "ভয় করবেন না জেনারেল! ইনি মিঃ জিল ওয়েষ্ট—ওয়েষ্টসায়ারে এঁরা থাকেন, কিন্তু এখন এই অসময়ে অন্ধকারে এঁর আস্‌বার তাৎপর্য্য ত আমিও কিছু বুঝ্‌তে পারচি না। যাই হোক, আপনারা যখন প্রতিবাসী হতে চল্লেন, তখন পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেওয়া আমার উচিত। মিঃ ওয়েষ্ট, ইনি জেনারেল হিথারষ্টন ক্লুম্‌বার হল ভাড়া নিলেন!"

দীর্ঘাকার কৃশ লোকটির করমর্দ্দনের অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলে অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবে, সঙ্কুচিত হইয়াই তিনি যেন আমার হস্ত গ্রহণ করিলেন। লোকটির এই অকারণ ভয় দেখিয়া আমি আপনা হইতেই বলিলাম, "ক্লুম্‌বার হলে হঠাৎ আলো দেখে আমি একটু কৌতূহলী হয়ে দেখ্‌তে এসেছিলাম। যাই হোক, আমার সৌভাগ্যক্রমে তাতে শুভ ফলই ফলে গেল। জেনারেলের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি কৃতার্থ হলেম।" আমি যখন কথা কহিতেছিলাম, তখন বেশ বুঝিতেছিলাম, ক্লুম্‌বার হলের নূতন স্বামীটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের মধ্যেও আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইতেছেন।

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি গাড়ীর আলোটা এমনভাবে ঘুরাইয়া ধরিলেন যে, লণ্ঠনের কাচাবরণ ভেদ করিয়া সমস্ত আলোটুকু আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সহসা পূর্ব্বের মতই কম্পিত ভীতিজড়িত স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ম্যাকলীন, মানুষটার রং কি ময়লা—হা ভগবান্! ও তাহলে কখনই ইংরাজ নয়!" তার পর আমার মুখের উপর আলো সমভাবে রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় কি ইংরাজ?"

লোকটার অভদ্রতা দেখিয়া আমার মুখে যে উত্তর আসিল, তাহার আতঙ্কযুক্ত বিপন্ন মুখচ্ছবি ও অহেতুকী ভয় দেখিয়া আমার সে উচ্ছ্বসিত মন-ভাব সহজেই দমন করিলাম। অত্যন্ত উদাসীনভাবে উত্তর দিলাম, "না মশায়, আমি একজন স্কচ্। স্কট্‌ল্যাণ্ডে আমার জন্ম—আর সেখানেই আমার বাস।"

এই কথায় একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ! স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ড আজ-

কালকার দিনে সবই এক হয়ে গ্যাছে। আমায় মাপ করো, মিঃ ওয়েষ্ট, আমি বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত অদ্ভুত রকমের দুর্ব্বলচিত্ত। এস ম্যাকলীন্, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের উইগটাউনে আবার ফিরে যেতে হবে। আসি মশায়—"

তাঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন। চলন্ত গাড়ীর আলো সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে যেন স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া দিয়া গেল। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়া আমার সঙ্গীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের নতুন প্রতিবাসীটিকে দেখ্‌লে জেমিসন্?"

"সত্যি কথা বল্‌তে কি—লোকটা মিথ্যেবাদী নয়—সে ঠিকই বলেচে, অদ্ভুত রকমের দুর্ব্বল চিত্ত সে। কিম্বা এও হতে পারে যে তার ভিতরে কিছু গোল আছে!"

"কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য রূপ,—আমার মনে হয়, তার লিবারে কোনরকম গোল আছে! দেখ্‌লে না, তাকে দেখেই মনে হচ্ছিল,—সে যেন ভারী দুর্ব্বল? শরীরটাকে বয়ে বেড়ানোও যেন ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না? কিন্তু বাতাসটা ভারী ঠাণ্ডা হয়ে উঠ্‌ল—আমাদের এখন বাড়ী ফেরাই কর্ত্তব্য।"

জেমিসন্‌কে বিদায় দিয়া জলা পার হইয়া আমাদের সেই সুদৃশ্য শান্তি-নিকেতনের উদ্দেশে দ্রুত পদে আমি অগ্রসর হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

হিন্দোলা

আমরা থাকি সহরের বাহিরে, ঠাণ্ডি সড়কে। সহরের সঙ্গে আর এ অঞ্চলের সঙ্গে যেন দেশান্তরের প্রভেদ। কলিকাতার বড়বাজারের দুর্ভেদ্য অন্তরঙ্গ প্রদেশ, যেখানে দিনে দুপুরেও আমরা যাইতে ভয় পাই, যাহা গুণ্ডার আবাস, চোর জালিয়াতের নিকেতন বলিয়াই আমাদের ধারণা—লাহোরের সুবৃহৎ সহরাংশ বড়বাজারের সেই মর্ম্মস্থানের একটা বিকট অন্তহীন প্রতিমূর্ত্তি। এই সংখ্যাহীন অলিগলির গোলকধাঁধার মধ্যে আছে একএকটা বড় বড় প্রকাণ্ড পুরাতন হাবেলী অর্থাৎ ধনীদের প্রাসাদ, মধ্যবিত্তের সংখ্যাহীন কষ্টগম্য গৃহ, এবং মানবজাতির সর্ব্ববিধ প্রয়োজনপ্রবল দোকান ও হাট। দোকানে রসনারোচক ফুলুড়ি পাঁপড়, দইবড়া, এমন কি ভাজা মাছ, ভাজা মাংস, ভাজা ডিম পর্য্যন্ত এবং সময়ে সময়ে ও স্থানে স্থানে সহনাতীত বর্ণনাতীত দুর্গন্ধ ও দুর্দ্দৃশ্য মক্ষিকাকুল।

যখন সহরের শেষ সীমান্ত ছাড়াইয়া ইংরেজ পল্লীতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যখন সৌধের পর সৌধাবলীর অবচ্ছেদে স্বল্পমাত্র আকাশের পরিবর্ত্তে অখণ্ড, অনন্তবিস্তৃত নভস্তলের সুনির্ম্মল ক্রোড়ে আবার নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তখন হঠাৎ সন্দেহ হয় কোথায় গিয়াছিলাম—কোথা হইতে আসিলাম, সে কি এই একই লাহোর নামবাচ্য? যেন কত দূর—কত দূরের

কথা সে! যেখানকার জীবনের স্পন্দন এস্থানকে স্পর্শ করে না। সহরের প্রায় সমস্ত পুরুষাংশ সন্ধ্যাবেলায় বায়ু সেবনার্থ এখানে নির্গত হইয়া আসে, স্বল্পাংশ স্ত্রীও চাদর জড়াইয়া গাড়ীতে বা পাদচারে দেখা দিয়া থাকে—কিন্তু এখানকার কোন স্থায়ী ছাপ—না তাহারা সহরে লইয়া যায়—না সহরের কিছু এখানে রাখিয়া যায়। সহর ও বাহিরের ভেদ চিরবর্ত্তমান থাকে।

আমরা বাহিরের লোক, বাহিরের খোলা হাওয়া, আরাম ও আয়েসের পাশে জড়িত—তবু সহরে এমন একটা কিছু আছে—যার আকর্ষণ অনিবার্য্য। সে মানবলীলা, সৃষ্টিলহরী, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ হাসিকান্নার ফের। মানবসমাজ মাত্রের অন্তর্নিহিত সাম্যের মধ্যে দেশভেদে কালভেদে যে রহস্য, যে বৈচিত্র্য যে নূতনত্ব আছে তাহারই মোহ বাহিরের লোককে সহরের দুর্গন্ধি ও কলুষিত হাওয়ার মধ্যেও টানিয়া লইয়া যায়।

এমন একটা মোহের টানে এই লোকালয়ের অগণিত নরনারী কোন্ ঢেউয়ে কখন কি ভাবে তরঙ্গায়িত হয় তাহা উপলব্ধ করিবার লোভে একদিন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের তালে তালে উঠিবার পড়িবার সখে তাহাদের সঙ্গ লইলাম।

দুইটি পরিচিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিধবা ব্রাহ্মণী মা ও মেয়ে পূর্ব্বদিন আমার কাছে গাড়ী চাহিয়াছিলেন—"ঠাকুরদ্বারায় যাইবেন সেখানে কিছু আছে।"

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব।' তাঁহারা ত মহা খুসী। বর্ষীয়সী আমার সঙ্গে শ্বাশুড়ী সম্পর্ক পাতাইয়াছেন। আমার স্বামী তাঁহার 'পুত্তর্'। তাঁহার নাম মুখে লইতেই বৃদ্ধা গৌরবে ও স্নেহে গলিয়া যান। এ হেন পুত্রের বধূ যখন নিজে হইতে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঠাকুরদ্বারায় যাইতে চাহিল শ্বাশুড়ী ও ননদ ত আহ্লাদে আটখানা হইলেন।

গলিমহল্লার সব প্রতিবেশিনীদের নিকট খবর পৌঁছিয়া গেল—"কাল আমার পুত্রবধূ আসিয়া আমাদের মন্দিরে লইয়া যাইবে!"

পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। কন্যা বাড়ীর বাহিরে রোয়াকে বসিয়া আছেন—মাতা অন্দরে পাককার্য্য সারিতেছেন। যে সময় বাবুরা বাহিরে যান সেই সময় পঞ্জাবের গলি গলিতে বহির্বাটীর রোয়াক পুররমণীদের সেব্য হয়। গায়ে গায়ে ঘেঁসা প্রত্যেক বাড়ীর রোয়াকে পুরস্ত্রীগণ সমাসীন, কেহ বসিয়া চরকা কাটিতেছেন, কেহ সূতোর নুটি করিতেছেন, কেহ কুর্ত্তা সেলাই করিতেছেন, কেহ শুধুই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রি সমাগমে ইঁহারা ছাদের আশ্রয় লইবেন শীতকালে ঘরের ভিতরে যাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাদে চড়ার বা ভিতরে যাইবার সময় না হইবে রোয়াকে কাটাইবেন। আশপাশের বাড়ীর পুরুষদের আনাগোনায় কোন স্ত্রী বিব্রতা হন না—গলির মধ্যে গরু বাছুর মহিষের আনাগোনার মত পুরুষের আনাগোনাও ভ্রূক্ষেপেরই যোগ্য নহে।

কন্যা আমার জন্য রঙিন সূতার রঙ্গিন পায়ার নীচু চৌকি একখানি বাহির করিয়া আনিলেন। বলিলেন দীপজ্বালার সময়

না হইলে মন্দিরে যাইয়া লাভ নাই। সুতরাং আমাকেও রোয়াকে বসাইয়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করাইতে লাগিলেন। এই রোয়াকই তাঁহাদের ড্রইংরুম—অতিকষ্টে দুখানি ছোট চৌকির স্থান সেখানে হয়। কিন্তু আমার আগমন সংবাদে রাজ্যের ছোট ছোট মেয়ের সমাগম হইল, আর অন্ততঃ চার পাঁচ-জন সেই রোয়াকের উপর গুটি মারিয়া বসিবার চেষ্টায় আমাদের চৌকি দুখানিকে আসন্ন পতনশঙ্কান্বিত করিয়া তুলিল। গৃহস্বামিনী তাহাদের বকিয়া ঝকিয়া রোয়াকের নীচে বা সিঁড়ির ধাপে নামাইয়া দিলেন। সূর্য্যাস্তের পর আমরা মূলচাঁদের ঠাকুর দ্বারার অভিমুখে নির্গত হইলাম। আজ সেখানে জন্মাষ্টমীর হিন্দোলা। সমস্ত শ্রাবণ মাস ঝুলনের উৎসবে দেশ আনন্দিত থাকে। শ্রাবণমাসের প্রতি শনি ও রবিবারে কুমারী ও সধবারা সুন্দর সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নদীর ধারে বা কোন বাগানে আমোদপ্রমোদ করিতে যায়। আমোদ আর কিছু না, দোলনায় দোলা ও ঝুলনের গান গাওয়া। এই সময় ঘরে ঘরেও দোলনা টাঙ্গায়, যে কেহ আগন্তুক আসে একবার দোলনায় বসিয়া দোল খায়।

জন্মাষ্টমীর দিন সব চেয়ে বেশী ধুম। যে বার জন্মাষ্টমী ভাদ্রমাসে পড়ে সেবার ঝুলনের আমোদ ভাদ্র পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

জন্মাষ্টমীতে মন্দিরে মন্দিরে সমারোহের প্রতিদ্বন্দিতা চলে। এখানকার দুটী মন্দিরে সব চেয়ে বেশী ভিড় হয়, আনারকলির বংশীধারীলালের মন্দিরে, আর রেলের ধরে মূলচাঁদের ঠাকুরদ্বারায়। আমার সঙ্গিনীরা আনারকলির মন্দিরে যাইতে অনিচ্ছুক—কেননা মন্দিরপতি তাঁহাদের জ্ঞাতিগোত্র, তাঁহাদের সঙ্গে মকর্দ্দমা চলিতেছে, তাহাদের সামনে পড়িতে চান না, সুতরাং আমরা সহরের বাহিরে মূলচাঁদের ঠাকুরদ্বারায় চলিলাম। পথে সুন্দর বীথীর দুই পার্শ্বে গোধূলির সময় রমণীর সারি পদব্রজে উক্ত ঠাকুরদ্বারার অভিমুখে চলিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এরকম দৃশ্য একেবারেই দুর্লভ। হয়ত পল্লীগ্রামে দেখা যাইতে পারে কিন্তু আমরা সহুরে লোক সহরের রীতিনীতিরই সাক্ষ্য দিতে পারি। ভদ্রলোকের সুসজ্জিতা কন্যা ও বধূগণকে রাজপথে সঞ্চরণ করিতে দেখা আমাদের পক্ষে একেবারে আকাশকুসুম সন্দর্শনের তুল্য। হিন্দু ভারতবর্ষে যেখানে মুসলমানী প্রভাব বা অত্যাচার মাত্রাতীত হইয়াছে সেইখানেই রমণীদের পরদার মাত্রাও বাড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই অত্যধিক মুসলমান নিপীড়িত দেশ হইয়াও পঞ্জাবের প্রাচীন আর্য্যগণের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ স্ত্রী-জাতির অনবরোধ বিষয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মজা এই, ঠিক যেমনটি চলিয়া আসিয়াছে তেমনিই চলিতে পারে রঙ বদলাইলেই বিপদ। খোলামুখে পদব্রজে যাইতে এখানে লজ্জা নাই, কিম্বা ঠিকা এক্কা বা টমটমে চড়িয়া (যাহাকে এখানে ব্যাম্বু কার্ট বলে) অপরিচিত অন্য ভাড়াটের সঙ্গে 'শেয়ারের' গাড়ীতে একত্র যাইতেও হানি নাই—কিন্তু ঘরের খোলা ল্যাণ্ডো ফিটনে চড়িয়া গেলেই যত গোল। আমার সঙ্গিনীরা আমার সঙ্গে খোলা ল্যাণ্ডোয় বসিয়া স্বগলির পথিক নারীগণের সঙ্গে চোখে চোখি হইতেই লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইতে লাগিলেন।

ঠাকুরদ্বারার দ্বারে পৌঁছিতেই দ্বার-রক্ষকেরা আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। লালা মূলচাঁদ লাহোরের একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর, তাঁহার আজিকার কার্য্যের সহায়তায় লাহোরের ছোট বড় অনেকগুলি হিন্দু সওদাগর উপস্থিত। তাঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা। শুনিলাম কাল এত ভিড় হইয়াছিল যে একটি ছেলে লোকের পায়ের তলায় পড়িয়া আহত হইয়াছিল, তাই আজিকার প্রবেশ ও নির্গমের বন্দোবস্ত অপেক্ষাকৃত ভাল করা হইয়াছে। কাল নাকি স্ত্রীপুরুষের যাতায়াতের একই রাস্তা ছিল—আজ স্বতন্ত্র বন্দবস্ত। আমি কিন্তু বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য দেখিলাম না। মন্দির ঢুকিতেই সামনে প্রশস্ত অঙ্গন, তার বাম পাশে ঢাকা বারান্দা। মেয়েরা সেই পাশ দিয়া ঠাকুরদালানে যাইতেছে, পুরুষেরা অঙ্গনের উপর দিয়াই যাইতেছে—এইমাত্র প্রভেদ। বারান্দায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে খানিকটা অঙ্গন মাড়াইতেই হয়। অঙ্গন গ্যাসের আলোকে ঝকমক করিতেছে, সেখানে পুরুষের প্রাচুর্য্যও যথেষ্ট কিন্তু মেয়েরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না, অনায়াসে পুরুষের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতেছে।

বোধ হয় অপ্রত্যাশিত বলিয়া আমার মন্দিরাগমনের সম্বাদ কার্য্যকর্ত্তাগণের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল—আর সকলেই আমাকে সভার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল স্থানে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের নিরাশ করিয়া বারান্দার অন্ধকারে দুইটা থামের কাছে বসাই পছন্দ করিলাম। একজন পাখাওয়ালা বিশেষ করিয়া আমাকে বীজন করিতে নিযুক্ত হইল। নানা পরিচিতা ও অপরিচিতা রমণীরা আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। কেহ আত্ম পরিচয় দিলেন—'আমি অমুকের মেয়ে' কেহ বলিলেন "আমি অমুক স্থানের রায়সাহেবের পুত্রবধূ", কেহ বলিলেন, আমায় দিল্লীতে দেখিয়াছেন, কেহ বলিলেন, মীরটের স্ত্রীসমাজের উৎসবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইয়াছিল, কেহ বলিলেন অম্বালায় আমার গান শুনিয়াছেন, কেহ বলিলেন, মূলতানে আমার লেকচার শুনিয়াছেন ইত্যাদি।

প্রাঙ্গণে ফরাসের উপর আগন্তুক পুরুষদের অভ্যর্থনা করিয়া বসান হইতেছে। একজন রাগী রাগ আলাপ করিতেছে—কিন্তু কার সাধ্য যে কিছু শুনে। একে ত মেয়েদের ও শিষ্যদের কলরব পরস্পরকে ডাক হাঁক—"নী সরস্বতীয়ে—" "নী লীলো—" "রে সুন্দরা" "ভাই মুন্তেনু পাণি পিলা"—"কুড়িনু ফাড়্" ইত্যাদি;—তার উপর ব্যাণ্ডের বাদ্যি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ে নির্গত হইয়া আর কোথাও এত সস্তায় কিস্তিমাৎ করে নাই যেমন এই ব্যাণ্ডের বাদ্যিতে। ইংরেজের ব্যাণ্ডের সঙ্গীতকলাও বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে—প্রতিভা ও পরিশ্রম সমন্বয়ে কত পুরুষের সাধনার ফল। আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা প্রতিভার উদ্বোধনে, বিনা বিজ্ঞানের অনুশীলনে টপ করিয়া এই পাকা ফলটি যেখানে সেখানে মুখে পুরিয়া দিই। ফলে কলা চর্চ্চা হয় না, কলা ভক্ষণ হয় বটে। যখন তখন, যেখানে সেখানে ব্যাণ্ডের বাজনা বাজানর মত বাঁদরামি আর কিছু নাই। কোথায় ঠাকুরদ্বারায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা;

কোথায় গোপীজনমোহনের বাঁশীর স্বর আর কোথায় ব্যাণ্ডের বাদ্যি। একে ব্যাণ্ড তায় বেসুরা, তায় একেবারে দুহাত মাত্র তফাতে! একটা খুব গোলমাল হৈ চৈয়ের সমারোহ তাণ্ডব ভাবে চলিতে লাগিল—কিন্তু এই শত লক্ষ ভক্তের পূজায় মন্দিরে না পাইলাম ভক্তির গাম্ভীর্য্য না শোভনতা।

আমাদের বাড়ীর ১১ই মাঘের উৎসব মনে পড়িল। কতকটা মিল ও অনেকটা তফাৎ। সেই রকম দরাজ উঠানের সামনে দালান—কিন্তু আমাদের উঠান প্রায় এর তিন গুণ আর তাহার সাজসজ্জাতেও বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু আসল তফাৎ সেখানে সমাগতগণের নিঃশব্দতায় এবং উপাসক ও গায়কগণের বেদমন্ত্রঘোষ ও সঙ্গীতে একটা অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রস সঞ্চারে।

আমাদের উপাসনার দালান, এখানকার ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরে কৃষ্ণরাধার মূর্ত্তি বহু অলঙ্কারে ও পুষ্পহারে ভূষিত। আশেপাশে অন্যান্য মূর্ত্তি। ভিড় ঠেলিয়া মারামারি করিয়া সকল মূর্ত্তি দর্শনের উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতে পারিলাম না। দূর হইতে প্রধান মূর্ত্তি দুইটি উঁকি মারিয়া দেখিয়াই ক্ষান্ত দিলাম। আমার সঙ্গীরা ভিতরে যাইয়া ভেট দিয়া আসিলেন। একজন পুরোহিত ভিড় ঠেলিয়া আমার নিকট আসিয়া হাত পাতিল, নিরাশ করিলাম না।

আমি ঠাকুর দেখিয়া চুপটি করিয়া পূর্ব্বকথিত স্থানে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। আলাপাভিলাষী রমণীদের বাক্যালাপের অবসরে সম্মুখে বিস্তৃত সমারোহের নীরটুকু ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণে মনন করিলাম। প্রথমতঃ এই সুসজ্জিত, আলোকদীপ্ত অঙ্গন আমাকে কলিকাতার স্বজন ও স্বগৃহ স্মরণ করাইয়া দিল—সেই স্মৃতিরসে কিছু ক্ষণ সিক্ত রহিলাম। তার পরে পুরাতন ও নূতনের বৈলক্ষণ্য যখন পরিস্ফুট হইতে লাগিল তখন নূতনের বৈচিত্র্যরসে অভিভূত হইলাম।

বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। এখানে নবাগতা রমণীরা একেবারে সিধা অঙ্গন দিয়াই ঠাকুরঘরে চলিয়া আসিতেছেন। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই; ন্যাকামি নাই, হাব ভাব নাই। নিতান্ত সরল সহজভাবে রূপসীর তরঙ্গ ধাইয়া আসিতেছে। কোন নববধূ ঝিক্‌মিকে ওড়নায় ঝল্‌মান গ্যাস-ল্যাম্পের সহস্র রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া চলিয়া আসিতেছে—কোন বিধবা রমণী মলিন অঙ্গাবরণের একটা মস্ত ছিদ্র পর্য্যন্ত ঢাকিতে চেষ্টা করে নাই, সহজ ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে—কেহ তরুণী, কেহ বৃদ্ধা, কেহ সুভূষিতা, কেহ অত্যল্পভূষণা—কিন্তু সকলেই সুন্দর। কুৎসিৎ মুখ দৈবাৎ একটা আধটা—বাকী সবই সৌন্দর্য্যে, সুষমায়, লাবণ্যে ভরা। কিন্তু সুন্দরী বঙ্গললনার মত আনতা লতার শ্রী নহে—তেজোদীপ্তা খড়্গধারিণী সিংহবাহিনীর প্রতিমূর্ত্তি যেন।

এ মন্দিরে ঝুলন দেখিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু ঠাকুরের সুমধুর হিন্দোলের স্থলে দেখিলাম ঠাকুরাণীদের মধুময় রূপের হিল্লোল। হিন্দু সমাজে পুরুষদের মধ্যে মেয়েদের এমন অবাধ গতিবিধি কল্পনার অতীত ছিল, নিজের চোখে না দেখিয়া, শুধু শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। যদি কোন য়ুরোপীয় পর্য্যটক এই দৃশ্য দেখিয়া বর্ণনা করিত ত ভাবিতাম

বোধ হয় কতকটা স্বকল্পনাপ্রসূত, অতিরঞ্জিত। কিন্তু আজ যখন সুন্দরী রমণীর প্রবাহ সম্মুখ দিয়া বায়োস্কোপের চলৎচিত্রের ন্যায় চলিয়া যাইতে লাগিল—তখন মুগ্ধচিত্ত হইয়া গেলাম।

বেশ ভূষাই বা কি! ঠিক থিয়েটারের সাজের মত। ঘাগড়া কুর্ত্তা ওড়নায় জড়ি জড়াও, গোটা কিনারি, সল্‌মা চুমকি—একেবারে ঝক্‌মক ঝক্‌মক করিতেছে। কত নভেলের, কত নাটকের কত নবন্যাসের সরঞ্জাম এখানে পুঞ্জীভূত। এত খোলাখুলির মধ্যে, এত ছাড়াছাড়ির মধ্যে নানা অঘটন যে ঘটিয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে সব ঘটনাকে কুৎসার পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া মানবিকতার পবিত্র রঙে রাঙাইয়া তুলিবার জন্য পঞ্চনদ কোন বঙ্কিমের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু যে হতভাগ্য দেশে মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা নাই, সে দেশে বঙ্কিমের সম্ভাবনা কোথায়? নানাভাবের লহরীতে তরঙ্গায়িত হইয়া উৎসবভঙ্গের অনেক পূর্ব্বেই সঙ্গিনী-গণকে ডাকিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীসরলা দেবী।

মানবের ভবিষ্যৎ

(চয়ন)

আজ কাল আর জীব-জগতে ক্রম-বিকাশের সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। সুতরাং মানব যে আদিতে কোন নিম্ন জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু জীব-জগৎ কি মনুষ্যে তাহার চরম সীমায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে; না মানব হইতে উন্নত কোন জীব পরে আসিবে? এ প্রশ্নেরউত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

এ সম্বন্ধে একজন জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকের একটি সুন্দর প্রবন্ধের সার সঙ্কলন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* * *

কোথা হইতে সেই শক্তি আসিল যাহা মানবকে নিম্ন প্রাণী হইতে উদ্ভূত করিয়াছে? কেন জীব-জগতের কোন অংশ সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইল, আর অন্য অংশে তাহা কোন কার্য্য করিল না? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই! মানবের দেহের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার তুলনায় মনের পরিণতি অল্পদিনে হইয়াছে।

মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন অজ্ঞাত শক্তি, কোন নিম্ন শ্রেণীর জীবে প্রকাশ পাইয়া তাহাকে 'মানুষ করিয়া' তবে ক্ষান্ত হইয়াছে।

সেই জীবের এক অংশ প্রথমে শম্বুকে পরিণত হইল, শম্বুক রহিয়া গেল, কিন্তু সেই শক্তি কতক শম্বুককে মৎস্যে পরিণত করিল, মৎস্য রহিয়া গেল, সেই শক্তি কোন মৎস্যকে সরীসৃপে পরিণত করিল, সরীসৃপ রহিয়া গেল, সেই শক্তি তাহা হইতে পশু

উৎপন্ন করিল, এইরূপে সেই শক্তির চরম প্রকাশ মানবের আবির্ভাবে।

মানবের জন্ম কত যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কত প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কত জীব, কত প্রাণী, কত জাতি লোপ পাইয়াছে। মানবের জীবন সূত্র সেই সব প্রলয়ের মধ্যে কোথাও ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু মানবই কি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট? অথবা কোন শ্রেষ্ঠতর জীব সেই প্রলয়ে লোপ পাইয়াছে যাহা হইতে মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণী জন্মিতে পারিত? অথবা মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষ জীব নহে, মানব হইতে আরও কোন শ্রেষ্ঠতর জীব জন্মিবে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর কোথায়? দেহ হিসাবে মানব সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহার পক্ষ আর উঠিবে না, পদ আর সংখ্যায় বাড়িবে না, বাহু আর বিস্তৃত হইবে না, বুঝি মস্তিষ্কও আর উন্নত হইবে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আতিশয্যের আর সম্ভাবনা নাই। এবার তাহার বিকাশ হইবে, মনে ও জ্ঞানে। প্রকৃতির উপর আরো সে আধিপত্য করিবে। পূর্ব্বে তাহার শক্তির অপব্যয় ছিল এখন সে শক্তি রক্ষায় মনোযোগী হইবে,—স্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার শিখিবে, রোগ তাড়াইবে। জ্ঞানের দ্বারা সে আয়ু অনেক বর্দ্ধিত করিবে। কিন্তু তাহার কোমল বৃত্তি কমিবে। পূর্ব্বের মত সে ভক্তি করিতে পারিবে না। সে আর অন্ধভাবে কিছু বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

তাহার পাশব বৃত্তি কমিতেছে। রক্তপাতে কষ্ট দিতে সে নিবৃত্ত হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাসের যুগই প্রকৃতপক্ষে রক্তপাতের যুগ গিয়াছে। ক্রমশ তাহার দেবত্বে বিশ্বাস কমিবে ও মানুষের প্রতি অনুরাগ বাড়িবে। মানবের সৌন্দর্য্য-বোধ বুঝি কমিতেছে ললিতকলা ক্রমে বিদায় লইবে। কিন্তু ন্যায় অন্যায় বিচার বাড়িবে। বিজ্ঞান যদিও ধর্ম্মবিশ্বাস কমাইবে কিন্তু পরের কষ্টে হৃদয় দ্রব করিবে। আর স্বর্গের দিকে সে চাহিবে না, মর্ত্ত্যই তাহার সর্ব্বস্ব হইবে। পরজন্মের ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ইহজন্মের জন্য অধিক সাধনা করিবে। দেব দানব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না, পুত্র কন্যা তাহাদের স্থল অধিকার করিবে।

দয়ার পূর্ব্বে গর্ব্ব ছিল, সভ্যতার পূর্ব্বে বীরত্ব ছিল। পরিচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে লোকে রং মাখিত, আতিথ্য সৎকারের পূর্ব্বে সে অতিথি বলি দিত। গৃহস্থাপনের পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মিত হইত।

আমরা এই সব বৃত্তি হারাইতেছি, কিন্তু বিশ্বপ্রেম শিখিতেছি। পরে কি এই ধরা প্রেম রাজ্য হইবে?

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

বাল্মীকির মৃত্যু

(Leconte de Lisle)

অমর কবি বাল্মীকি সে বৃদ্ধ আজি,—
ভাতিছে চোখে জগৎ—মায়া-হরিণ সাজি'!
বর্ষ শত অতিক্রমি' ক্লান্ত ঋষি,—
শ্যেনের মত চাহে সে যেতে আকাশে মিশি';
পক্ষ মেলি' অজানা কোন্ নীড়ের পানে
উড়িতে চাহে; নীলের তৃষা জেগেছে প্রাণে।
জগৎ-জালে জড়ায়ে মনে শান্তি নাহি,
রেশম-গুটি কাটিতে মুহু জপিছে 'ত্রাহি'।
তাই সে 'বীর-চরিত-গাথা'-গায়ক মুনি
মৌন ধ্যানে কাটায় দিবা স্বপন বুনি'।
নির্ব্বাণেরি শান্ত নীরে ডুবাতে হিয়া—
কামনা সাথে শোচনা যত বিসর্জ্জিয়া—
রয়েছে মহাঘুমের লাগি' প্রতীক্ষাতে,—
দৈব মণি 'বিস্মরণী' যাহাতে ভাতে।

পূর্ণ হ'য়ে আসিছে কাল, পূর্ণ ব্রত,
একদা ঋষি বুকের বলে বীরের মত—
চলিলা মহাযাত্রা করি' নগ্ন পায়ে
রক্ত রেখা রাখিয়া গিরি-বর্ত্ম-গায়ে।
বিমান-বায়ু বিঁধিতে চাহে মৃত্যুবাণে,—
বৃদ্ধ ঋষি চলেছে তবু লক্ষ্য পানে।
হেলে না বুড়া টলে না চলে অবাধ গতি,—
তুষারে হিমবন্ত সাজে ভীম মূরতি,—
তবুও চলে দণ্ডভরে ঊর্দ্ধদেশে,
পুণ্য-পূত মূরতি শোভে শুভ্রকেশে!
চড়িয়া চূড়ে, জনম-শোধ দেখিল চেয়ে,—
নগরী, নগ, কানন, নদী চলেছে ধেয়ে—
মন্দ্রভাষী সাগর পানে,—যেথায় ঊষা
রচে গো নিতি কমল-বীথী কনক-ভূষা।

অবাক!...মূক মানব শুধু চাহিয়া থাকে;
বিভাত-বিভা গগন ছাপি' ভুবন ঢাকে,—
স্পন্দিয়া সে সাঁতারি' আসে সহজে ধীরে
বুলায়ে নিরমাল্য যেন নিখিল শিরে;
কুকুরে চুমি' ঠাকুরে চুমে পুলক মনে—
পাখীরে নীড়ে, হাতীরে ঘন বাঁশের বনে;
আশিসে হিমবন্ত সাথে ক্ষুদ্র কীটে,
বুদ্ধ দিয়া ফোয়ারা ওঠে ধরণী-পিঠে।
শূদ্র, দ্বিজ, ভিখারী, রাজা ভেদ না মানে,
দুনিয়া খুসী করে গো শুধু আশিস্‌দানে!
অসীম অফুরন্ত চির জীবন-ধারা
আভাসে কাছে আসে গো টুটি' আঁধার-কারা;
ধাতার গূঢ় সৃজনী ধ্যানে নিহিত রহি'
অনাদি জ্যোতি উছসি' নিতি ভরে গো মহী।

সেই জ্যোতিতে মগন আজি বাল্মীকি সে।
হঠাৎ কি এ! তপের ধূনী মলিন কিসে?
হায়, অতীত দিনের স্মৃতি! কেমন ক'রে
তোদের পুনর্জন্ম হ'ল? বল্ তা মোরে।
জাগে রে গাথা গরিমা-গাঁথা ছটায় ঘিরে
সৌম্য দশরথাত্মজে মৈথিলীরে!
ধরিয়া বুকে বীরের ছবি ঋষির স্মৃতি,—
বহিয়া কোটি-কল্প-কথা সৃজন-রীতি,—
হে রামায়ণ! আবার কেন মন মোহিতে
জাগিছ তব জন্মদাতা মুনির চিতে?
মোক্ষকামী কবি সে চাহে ব্যাকুল চোখে
গানের পাখা মেলিয়া যেতে অমর-লোকে,—
পরাণ-মন-পাবন সুরে ভরিয়া দিশি
অযুত পূত আত্মা মাঝে রবে সে মিশি'।

প্রৌঢ় রবি ঊর্দ্ধদেশে নীরবে দহে,
বাষ্পরসে নিয়ত শোষে কী আগ্রহে!
বরণ, গান, গন্ধ টানে নিজের পানে,—
মর্ত্ত্য-জন-নিশাস-বায়ে,—সিন্ধুতানে;
তন্দ্রা আসে আকাশ জুড়ি', মৌন সবই,
বিশ্ব যেন মুরছি' পড়ে মৃতের ছবি!
আচম্বিতে বাতাসে বুনি' জরির বুঁটি
নবোদ্গত পক্ষভরে শূন্যে উঠি'
পিপীলী আসে পিল্‌পিলিয়ে সংখ্যাতীত
ধেয়ানী মুনি বাল্মীকিরে করি' আবৃত;
আবার আসে, আবার আসে, কেবলি আসে,—
গাছের গুঁড়ি ফুঁড়িয়া উড়ি' শূন্যে ভাসে।
বল্মীকেতে লুপ্ত পুন! বাল্মীকি সে,
ধেয়ান-গূঢ় মরণ মাঝে গিয়েছে মিশে।

দংশে ঘন পিপীলী,—দেহে দংশে মুহু,
আত্মা তাহা জানে না, মুখ না বলে 'উহু'।
নৃত্য করে পুত্তিকারা পক্ষভরে
ঘুরিয়া পুনঃ উড়িয়া বসে মুরৎ 'পরে;
উছলি' যেন পিছলি' পড়ে সাগর-ফেণা,
মরণ-হত মুনিরে আর না যায় চেনা!
দংশে নীল ওষ্ঠাধরে চেতন-হারা,
দংশে জানু, দংশে হনু হস্তে পারা;
দংশি' চলে মাংসলোভী নয়ন দুঁড়ি,'—
সুড়ঙ্গেতে সদলে,—মহাশঙ্খ জুড়ি'!
আসীন হিমবন্ত-চূড়ে অমরকবি
অভ্রভেদী বেদীর 'পরে দেবচ্ছবি!
পুলক-গাথা মূর্ত্তি ধরে সে কঙ্কালে,—
মর্ত্ত্যলোকে মৃত্যুহারা ছন্দে তালে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরপণ

(প্রতিবাদ.)

বরপণের বহু প্রতিবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভারতীতে সমস্ত গুলির স্থান হওয়া অসম্ভব। তাহার প্রয়োজনও দেখি না। প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশ যুক্তি প্রায় একই প্রকার—তাই আমরা সেই ভূরি ভূরি প্রতিবাদের মধ্য হইতে বাছিয়া পুরুষের লিখিত একটি প্রতিবাদ এ সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। মহিলালিখিত একটি প্রতিবাদ আগামী জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

ভাঃ সম্পাদিতা।

ফাল্গুনের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় বরপণ গ্রহণ সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা কতটুকু তাহা সামাজিক মহোদয়গণ বিচার করিবেন।

ভাল তার্কিক যিনি, আমার মনে হয়, তিনি অতি সহজেই তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, যে ডাকাতি দ্বারা "জাতীয় মঙ্গল" সাধিত হয়, এবং যে ধনরাশি একই স্থানে রাশীকৃত হইয়া ছিল, তাহা সাধারণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করে!

ইংলণ্ডে আভিজাত্য হিসাবে যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্বন্ধে খোঁজ লইলে দেখা যাইবে, যে, প্রায় স্থলেই দস্যুতা দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমান আভিজাত্য ও সম্পদের পত্তনী হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের অনেক বনিয়াদি জমীদারবংশ কি ভাবে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

ধনবৃদ্ধি করাই যদি মূলমন্ত্র হয়, অনেক উপায়ে ধনবৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

বরপণ গ্রহণ দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধিত

হইয়াছে, এ প্রকার উদাহরণ কচিৎ দেখা যায়! কন্যার পিতার নিকট হইতে বরের পিতা পেষণ করিয়া যে টাকা গুলি গ্রহণ করেন, তাহা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে, সে সংবাদ এই অপব্যয়প্লাবিত বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

ছেলের বিবাহে পণ গ্রহণ করিয়া সেই পণের প্রায়াংশই কি বাজি পুড়াইয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া, ছাইভস্ম করিয়া অপব্যয়িত হয় না? একথা কি বরপণগ্রহীতা অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিবাহান্তে যে দিন টাকাকড়ির হিসাব করা হয়, সে দিন দেখা যায়, কন্যার পিতার নিকট হইতে যে টাকাগুলি পেষণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ছিপি খোলা শিশিস্থ কর্পূরের মত, তাহার প্রায়াংশই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। পণ গ্রহণ করিলেই, কতকগুলি অনাবশ্যক আড়ম্বর বাধ্য হইয়া করিতে হয়। স্কুলের চাঁদা, বারোয়ারীর চাঁদা, দেবালয়ে প্রণামী, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি ক্লাবের চাঁদা এবং সহস্র প্রকারের খুঁটিনাটি খরচ কুলাইতেই গৃহীত পণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। যিনিই কিছু আদায় করিতে আসেন, তাঁহারই দৃষ্টি থাকে সেই বরপণের তহবিলের দিকে। "মহাশয়, এতগুলি টাকা পাইলেন, আমাদের সামান্য প্রাপ্যটা দিতে কেন ইতস্ততঃ করিতেছেন। "এতগুলি টাকা" পাইয়াছেন একথা অস্বীকার করিবার 'যো' নাই—আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পণগ্রহীতার মানসিক বল কম হইয়া দাঁড়ায়। তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে "বাপুরে, আমার অবস্থার উন্নতির জন্য আমি এতগুলা টাকা লইয়াছি, তাহাতে তোমাদের কি? আমি কিছু দিব না! সরিয়া পড়!" পুরোহিত, বাজন্দার ঝাড়দার, ধোপা নাপিত, "দাই ধরণী" পাটনী, চাকর, ক্লাবের "ক্যাপ্তান্" স্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি সকলের মুখেই এক কথা—এতগুলি টাকা পাইলেন ইত্যাদি"—আর "নজর" তাহাদের সেই বরপণ তহবিলটীর দিকে! পণে প্রাপ্ত টাকার হিসাবেই তাহারা তাহাদের পাওনাটার হিসাব করে। আশানুরূপ না পাইলেই বলিয়া যায় "ব্যাটা কি "চশঙ্কর" রে!—যেন বাবার ঘরের টাকা দিতেছেন!" কথাটা এমন ভাবেই বলিয়া যায় যে বরকর্ত্তার শ্রবণযুগল লাল হইয়া উঠে—এবং কর্ণকুহর একেবারে তৃপ্ত হইয়া যায়! যাঁহারা ছেলের বিবাহ দিয়া "বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার" মারিয়া আরও ধন বৃদ্ধি করিতে চাহেন আমি তাঁহাদের কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না!

আমি বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকদিগের কথাই বলিব। বরপণ দিতে যাইয়া অনেক কন্যাকর্ত্তা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, একথাটা আজি বাঙ্গালা দেশের কাছে একটা কঠোর সত্য। কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই গৃহে একটা নিরানন্দের ভাব ফুটিয়া উঠে! এই নিরানন্দের ভাবটী নারীজাতির প্রতি অসম্মান বা অশ্রদ্ধার ভাব হইতে জাত নহে! ইহার প্রকৃত কারণ এই সর্ব্বনাশকর "বরপণ", একথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজ আইনের কঠোর অনুশাসন ব্যর্থ করা সম্ভব থাকিলে, হয় ত রাজপুতানার ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও সূতিকাগৃহে "কন্যাহত্যাপ্রথা" প্রচলিত হইয়া

উঠিত। জীবনকে যাঁহারা বিলাসরঙ্গের মধ্য দিয়াই দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা "বরপণের" অপকারিতা উপলব্ধি না করিতেও পারেন, কিন্তু বয়ঃস্থা কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বরপণ সংগ্রহের অভাব কোনস্থলে পুত্রবধূর মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়িয়াছে, এপ্রকার ঘটনাও যে খুঁজিলে পাওয়া যায় না, এমন নহে। পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রাপ্ত পণ হইতেই কন্যার জন্য বরপণ সংগ্রহ করাই যদি এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার মূল কারণ হয় তবে সেজন্য আসলে দায়ী কে? এই শোচনীয় সমাজবিধ্বংসী বরপণ প্রথাই কি নহে? বাহিরে দেশটা কতখানি বিস্তৃত এবং তথায় কত শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণ লইয়া সমাজ সংগঠিত, সহরের সংস্কারকগণ সে খোঁজ রাখেন কি?

বিবাহের অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে আর একটা ব্যয় আসিয়া পড়ে—সেটী হইতেছে "ভোজের ব্যয়"। প্রাপ্ত টাকাগুলি বরকর্ত্তার "গায়ের রক্ত জল করা টাকা নহে", এটা অতি সত্য কথা! কাজেই উপার্জ্জিত টাকা অপেক্ষা, এই পণস্বরূপ প্রাপ্ত টাকায় বোধ হয় স্বভাবতঃই মায়া একটু কম থাকে। আর আজকালকার একটা "ভোজে" ব্যয়ও হয় যথেষ্ট—সুতরাং বিবাহান্তে প্রাপ্ত টাকাটার হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, হয় ত আরও কিছু "ফাজিল" কর্জ্জ দাঁড়াইয়াছে! অথবা যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা "ধনবৃদ্ধির" বিশেষ সহায়ক নহে।

তারপর পণপ্রথার আর একটা বিষম অপকারিতা আছে। ধরুন্ কোনও গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে। কিন্তু তাঁহার দু'একটি ছেলে আছে। যে সংসার তিনি মিতব্যয়িতার সহিত চালাইয়া নিতে পারিতেন, ভবিষ্যতে ছেলের বিবাহ দিয়া টাকা পাইবার ভরসা আছে বলিয়া, তিনি ছেলে দেখাইয়া টাকা কর্জ্জ করা সুরু করিলেন! সকলেই জানেন, যাঁহার একবার ধারকর্জ্জ করা অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়, তিনি সে অভ্যাস আর সহজে ত্যাগ করিতে পারেন না। এদিকে ধারকর্জ্জের মাত্রা যখন নিতান্তই বাড়িয়া চলিল - কোনও "বে-অকুফ্" কন্যার পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া কিছু টাকা পাওয়া গেল! বিবাহের অপব্যয় গুলি করা চাই-ই—তারপর কর্জ্জ শোধ! প্রকৃত পক্ষে কর্জ্জ শোধ হইল না, বা আংশিক ভাবে হইল! এই প্রকারে অনেক ভদ্রলোক অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িতেছেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান লেখক সম্ভ্রান্ত-গ্রামবাসী, এবং তাঁহার একগ্রাম হইতেই এপ্রকার অন্যূন একশত উদাহরণ দিতে সক্ষম। নিশ্চয়ই এটা "জাতীয় মঙ্গলের বিষয়" নহে।

সেন মহাশয় লিখিতেছেন "এখন দেশ মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে (!) জীবন যাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে" ইত্যাদি।

জীবন যাত্রার উচ্চতর আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মন্দটুকু আমরা বড় সহজে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি—এবং বিলাসলালসার মধ্য দিয়াই জীবনকে টানিয়া লইয়া যাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছি! শান্ত, সরল তৃপ্ত জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে আর আমরা মাধুর্য্য পাই না। গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে যে তপোবনো-

স্থিত নিষ্ঠা, সারল্য, শ্রদ্ধা, তৃপ্তি, ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হইত, আজি আর তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। আর লেখকের মতে "শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া তাঁহার মনে বিবাহিত জীবন যাত্রার যে আদর্শ আছে তদনুরূপ অর্থ নাই বলিয়া তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন।"

জিজ্ঞাসা করি, পণ তো অনেক বরকর্ত্তাই গ্রহণ করিয়া আসিতেছে—'জীবন যাত্রার উচ্চ আদর্শ (!) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া' কয়জনে গ্রহণ করিতেছেন?

পাঠক মনে রাখিবেন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগের কথাই বলিতেছি। বাঙ্গালার অধিকাংশ পরিবারই মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন—এবং আর্থিক চিন্তায় কাতর।

"লেখক বলিতেছেন, শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার স্ত্রী দাস দাসীর (।) মত খাটিয়া কষ্ট পায়!"

শিক্ষিত পুরুষ নিজে কি করিতেছেন? সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের মধ্যে রমণীর সাহায্যকে এমন করিয়া অস্বীকার করিলে চলিবে কেন! অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষই তো সাহেবের 'বুটাস্বাদগ্রাহী, চাকর বা দাস! পুরুষ নিজের দাসত্ব ঘুচাইয়া তার পর পত্নীর দাসীত্ব ঘুচাইবেন! স্বামী পুত্র শ্বশুর শাশুড়ি প্রভৃতি পরিজনের অন্ন ব্যঞ্জনের বন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করার মধ্যে 'দাসীত্ব' কোথায়, তাহা আমরা হীন বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না! পল্লীসমাজের দিকে চক্ষু রাখিয়া বোধ হয় প্রত্যেক সমস্যার বিচার করা শ্রেয়ঃ। পল্লী-সমাজে যেখানে ধন বল এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—সেই দীন, রিক্ত, পরিত্যক্ত, কাঙ্গাল পল্লীসমাজে 'জন বলের' আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। সেখানে পরস্পর পরস্পরের জন্য না খাটিলে চলে না! ধনশালী সহর বন্দর লইয়াই কিছু সমগ্র বাঙ্গালা দেশটা নহে, এ কথা আমরা উৎসাহে ভুলিয়া যাইব না।

আর-একটা যুক্তির 'বহর' দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি! 'বরপণ' লেখক বলিতেছেন বরের পিতা ধনশালী হইয়াও বর পণ লাভের দ্বারা আরও ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে যদি দোষ হয়, তাহা হইলে যে সকল ধনকুবের ধন বৃদ্ধির জন্য এখনও বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেছেন তাঁহারা ত বড়ই পাপী!

বটে! বলিহারি যুক্তি! এ যুক্তি তো ফুৎকারে উড়ানো চলেই না!

তার পর লেখক বলিতেছেন—যাঁহারা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত বরপণ গ্রহণপ্রথারও বিরোধী, তাঁহারা যেন যাহাতে দেশ হইতে সুশিক্ষা ও নারীর প্রতি সম্মান দূর করিয়া দেওয়া যায় এমন আন্দোলন করেন। একেবারে মথি লিখিত সুসমাচার!

তবে কি সেন মহাশয় বলিতে চাহেন যে সুশিক্ষার বিস্তার ও নারীর প্রতি সম্মানের ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বরপণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? নারীর প্রতি সম্মানের ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়াই কি পণের জন্য আমরা নারীর পিতার "বুকে হাটু দিয়া' জিহ্বা টানিয়া বাহির করিব? বর্ত্তমান যুগের নীতি শাস্ত্রের ও

'শিক্ষাবিজ্ঞানের' ভূমিকায় কি এমন কথাই লেখে?

যে নারীকে আমরা সম্মান করিয়া সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতেছি, তাহাকে মিলনের প্রথম দিনেই কি দৃশ্য দেখাইলাম? তাহার পিতা বেচারা তাহার সম্মানের মূল্য প্রদান করিতেই চক্ষে সরিষাফুল দেখিতেছেন!

'বরপণ' প্রবন্ধ লেখকের কন্যার সহিত 'পনের বৎসর পূর্ব্বে যে ভদ্রলোকের পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল—সে সম্বন্ধটা একেবারে বিনা পণে সাব্যস্ত হইতেছিল কেন? বরের পিতার কি নারীর প্রতি সম্মানজ্ঞান ছিল না; যে তিনি বিনা পণে পুত্রের বিবাহ স্থির করিতে গিয়াছিলেন? পরে যদি বরের পিতা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া "ধন বৃদ্ধির জন্য ও পুত্রের বিবাহিত জীবনের আদর্শ (!) অক্ষত রাখিবার ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য" নগদ টাকা, ও বধূরূপী—'হীরকখণ্ড'কে স্বর্ণারূঢ় করিবার জন্য অলঙ্কারাদি চাহিয়াই থাকেন, আমার তো মনে হয় ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের সুশিক্ষা ও নারীর প্রতি সম্মানজ্ঞানের চরম বিকাশ দেখিয়া সেনমহাশয়ের একেবারে চমৎকৃত হইয়া যাওয়াই উচিত ছিল!

"কন্যা হীরক সদৃশ—হীরকখণ্ডকে মাজিয়া ঘষিয়া স্বর্ণারূঢ় করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগ ও অন্যান্য মণি সাজাইয়া দিলেই হীরক দান শোভা পায়।" মনে পড়িতেছে, কবির সেই গানটি "তোমার মেয়ে তোমার জামাই"—বরকর্ত্তার কাছে এ যুক্তিটী বড় মধুর—বড় লোভনীয়! কন্যাকে সালঙ্কারা করিয়া সম্প্রদান করিলে একথাটা কতকটা খাটিতে পারে—কিন্তু বরকর্ত্তার হাতবাক্সটী টাকা দিয়া সাজাইয়া দিলে 'কন্যা স্বর্ণারূঢ়া' হইবেন কি?

তৃষ্ট লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেন মহাশয়ের একটী কন্যার ত পনের বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে—বর্ত্তমানে 'স্বর্ণারূঢ় হীরকখণ্ড' আনিবার উপযুক্ত কয়টী শ্রীমান্ তাঁহার ঘরে "আইবুড়" করিয়া রাখিয়াছেন?

তারপর "ভাবুকতা ছাড়িয়া দিয়া" সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও হৃদয়গ্রাহী! আমরা তাহা একটু তুলিয়া দিব, নতুবা রসভঙ্গ হইতে পারে! "দেবদত্ত বিবাহ করা জীবনের 'কর্ত্তব্য' মনে করেন না এবং স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন। কিন্তু কন্যার পিতা যজ্ঞদত্ত কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন—কন্যা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক গুরুভার বস্তু! তিনি যাহা কষ্টদায়ক গুরুভার মনে করেন তাহা স্বীয় স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেবদত্তের স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহেন। এরূপস্থলে যজ্ঞদত্ত টাকা দিতে বাধ্য কিনা তাহা সকলেই বলুন··· গাঁঠরি অপেক্ষা অনন্তগুণ ভারী বস্তু চিরকাল আর একজনকে দিয়া বিনামূল্যে বহাইবেন এরূপ ইচ্ছা করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে।"...একেবারে অকাট্য যুক্তি!

'কন্যা কষ্টদায়ক গুরুভার বস্তু' হইতেছে কাহার দোষে? বরপণগ্রহীতার দোষে নয় কি? যাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখ—তাহাকে 'বহন' (!) করিবার খরচটা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইতে চাও তাহার পিতার নিকট হইতে?

"ইউরোপ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া যে সকল যুবক দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বিবাহে অধিক পণ চাহেন বলিয়া তাঁহাদের বড় নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়;" লেখকের মতে "ইহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষিতজীবনের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন।—অতএব কন্যার পিতাকেই কৃতার্থ করিতে হইবে।" ধিক্ এই শিক্ষাভিমান ও 'সম্মান জ্ঞানকে'! "নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন' তাহার প্রমাণ কি 'কষিয়া' বরপণ গ্রহণ করার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল! টাকার পরিমাণের তারতম্যে কি নারীদিগের প্রতি সম্মান জ্ঞানের তারতম্য হইবে? যে দ্রব্য আমরা খুব মূল্যবান জ্ঞান করি, তাহাও আমরা ঘরের কড়ি খরচ করিয়াই ক্রয় করিয়া থাকি! লেখকের মতানুযায়ী যদি কেবল পণের দ্বারাই 'সম্মানজ্ঞানের' পরিমাপ স্থির করিতে হয় তাহা হইলে বং তিনি 'কন্যাপণ'কেই সমর্থন করিতে পারেন। ধরুন, একজনের একটী মূল্যবান 'রত্ন' আছে—আপনি 'জহুরী', সেই রত্নের মূল্য ও সম্মান বুঝেন, আপনি কি আশা করিতে পারেন যে রত্নাধিকারী আপনাকে সেই রত্নটী বিনামূল্যে দিবেন, কেবল বিনামূল্যে নহে—অধিকন্তু তাহা 'স্বর্ণারূঢ়' করাইয়া অর্থাৎ রত্নরক্ষার উপযুক্ত কতকগুলি অর্থের সহিত আপনাকে প্রদান করিবেন? এ আশা করা তো সঙ্গত নহে!

নারীকে পুরুষ সম্মানের চক্ষে দেখিবে কেন? প্রাকৃতিক আকর্ষণ তো আছেই, তাহা ছাড়া নারী এমন কতকগুলি কমনীয় গুণের অধিকারিণী, যাহা পুরুষকে পরিতৃপ্ত করে। যে নারীতে এই গুণগুলি যত অধিক বিকশিত হইবে, পুরুষ তাহাকে তত অধিক শ্রদ্ধা করিবে, সম্মান করিবে।

'বরপণ' গ্রহণের মধ্য দিয়া সম্মানজ্ঞানের পরিচয় না দিয়া, বাস্তবিক গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিলেই, নারীজাতি অধিকতর সম্মানিত হইবেন! বরপণ নারীর পক্ষে অপমান! আজিকার অধিকতর শিক্ষিতা নারীসমাজ যদি সংকল্প করেন যে তাঁহারা এই নারীজাতির প্রতি অপমানকারী বরপণ-গ্রহীতার পাণিগ্রহণ করিবেন না, তবেই শিক্ষিতাভিমানী যুবক সম্প্রদায় সম্ভবতঃ বরপণকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিবেন। হিন্দুসমাজে নারীর এতটা স্বাধীনতা নাই, সুতরাং এই সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করা হিন্দুসমাজে নারীর পক্ষে প্রথমেই সুবিধা না হইলেও, তাঁহাদের অভিভাবকগণের এইরূপ করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত যুবক বিবাহের পূর্ব্বে এত টাকা, এত অলঙ্কার না হইলে বিবাহ করিব না, এপ্রকার সঙ্কল্প না করিয়া, যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে এই প্রকার গুণসম্পন্না কন্যা না হইলে বিবাহ করিব না, তাহা হইলে বাস্তবিকই গুণগ্রাহিতা ও সম্মানজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হয় না কি? 'স্বদেশী'র দিনে বিবাহার্থী যুবকগণের মধ্যে এইপ্রকার আদর্শগ্রহণের একটা ভাব উঠিয়াছিল! অনেক যুবক প্রতিজ্ঞা করিতেন, যে মেয়ে সূতা না কাটিতে পারিবে, গৃহস্থালীর নানাকর্ম্মে নিপুণা না হইবে তাহাকে বিবাহ

করিবেন না। আদর্শানুযায়ী গুণসম্পন্না ক'নে চাহিতে গেলেই পণগ্রহণের স্রোত 'মন্দা' পড়িয়া আসিবেই।

নারীজাতির গুণগুলিকেই যদি বিবাহার্থী পণ বলিয়া মনে করেন, তবেই বিবাহ সার্থক হয়, শিক্ষা সার্থক হয়, সম্মানজ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়!

"কন্যা হীরকখণ্ডস্বরূপ"—কন্যাকর্ত্তা যদি এই অমূল্য 'হীরকখণ্ড'কে নানা গুণসম্পদারূঢ় করিয়া গুণগ্রাহী জামাতার করে অর্পণ করিতে পারেন—'হীরকখণ্ড' বাস্তবিকই 'স্বর্ণারূঢ়' হইল! বাঙ্গালার যুবকগণ নারীর গুণরাশিকে সম্মান করিতে শিক্ষা করুন। বরপণের চাপ দিয়া ভাবী অর্দ্ধাঙ্গিনীর পিতা বেচারাকে 'কাহিল' করিলে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় না।

যে কন্যাকর্ত্তা 'আহ্লাদসহকারে, স্বেচ্ছায়' বরকে টাকা দিতে চাহেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁহার কন্যাজামাতাকে যাহা ইচ্ছা প্রদান করিতে পারেন। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে আপত্তি করিবেন না!

'সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য' কেবল টাকার দিকেই যাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাঁহারা অনেকস্থলেই ঠকিয়া থাকেন। টাকার জোরে অনেক কন্যার পিতা 'অচল' কন্যা চালাইয়া দিয়াছেন এপ্রকার উদাহরণ বিরল নহে। যেদেশে পূর্ব্বানুরাগ প্রথা প্রচলিত নাই অথচ অর্থলিপ্সা আছে, সেখানে এপ্রকার ঠকিলে কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবারও 'যো' থাকে না! এপ্রকার স্থলে বিবাহান্তে দেখা যায়, টাকাও অপব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, এবং আনীত 'রত্নটী' টাকার উজ্জ্বলতা শূন্য হইয়া অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রুচির আদর্শ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে'—বরপণ তাহার অন্যতম দূর কারণ হইতে পারে; কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধির প্রধান কারণ আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শকেই মনে করি।

যুগধর্ম্ম শিক্ষানুসারী পাশ্চাত্য সমাজকে অনুকরণ করিয়া চলিবার জন্য আজিকার ভারত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতি কার্য্য ও প্রতি অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই পাশ্চাত্য ভাব ও ধারণা আদর্শরূপে পরিগৃহীত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই "প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে বহুসংখ্যক শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে—সেই শ্রেণীবিভাগের বলবত্তা" কমাইয়া দিতেছে, এবং কৌলীন্য প্রথাকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। 'বরপণ দ্বারাই এই সকল সংস্কার সাধিত হইতেছে' ইহা শুনিলে সেই বহুপুরাতন প্রবাদবাক্যটী মনে হয়—"ঝড়ে ঘর পড়ে, ফকিরের কেরামৎ বাড়ে।"

বৈদেশিক রাজশক্তি আমাদিগের সমাজগত পার্থক্যকে স্মরণ রাখিয়া তাহার শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত করে নাই। রাজদ্বারে বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির জন্য একই শাসন, একই শৃঙ্খল রক্ষিত হইয়াছে। এক শাসন, এক আইন, এক অধিকারসমূহ সমগ্র ভারতীয়গণকে একই রাজনৈতিকক্ষেত্রের উপর আনিয়া উপস্থিত করিতেছে, সেখানে তাহাদের স্বার্থ অভিন্ন, সুতরাং পরস্পর বিরোধী জাতিসমূহের মধ্যে সামাজিক একীকরণ না হইলেও মিলন অসম্ভব হইবে না।

মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে পতিত ভারতের পতিত জাতিসমূহও একদিন এই রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগের স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারিবে।

জাতিভেদ ঘুচাইবার পক্ষে বরপণের কোনও কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। এতদ্‌পক্ষে 'রেলষ্টীমার' প্রচলনকেও বরপণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে প্রস্তুত আছি!

কৌলীন্য প্রথাও বরপণের জন্য উঠিতেছে না—পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাই কৌলীন্য-প্রথাকে শিথিল করিয়া দিতেছে।

"অনেকস্থলে কুলীন অকুলীনকে টাকা দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেছেনও বটে, কিন্তু তাহা ক্বচিৎ।

কিন্তু সেনমহাশয় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন কি? হিসাব করিলে দেখা যাইবে কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বরপণের জন্যই একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমান ঘরেই যথেষ্ট "বরপণ" পাওয়া যায় বলিয়া কুলীনগণ এখন আর বড় একটা 'অকুলক্রিয়া' করিতে চাহেন না।

বর্ত্তমান লেখক বৈদ্য সমাজের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কুলীন স্থানের অধিবাসী। গত দশ বার বৎসরের মধ্যে লেখকের গ্রামে যতগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার পনের আনাই বোধ হয় 'সমান ঘরে"। কুলীনগণ পরস্পরের জন্য বাধ্য হইয়া কন্যার বিবাহ মধ্যে মধ্যে অকুলীনের সহিত দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। অকুলীনদিগের সহিত কাজ করায় টাকা কিছু বেশী মিলে বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মানুযায়ী কতকগুলি ব্যয় বাহুল্যও করিতে হয়, এজন্য কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন আর কেহ বড় একটা অকুলে ক্রিয়া করিতে চাহেন না। এইরূপে কুলীন ও অকুলীন বৈদ্যগণ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন! সেন মহাশয় যদি অস্বীকার করিতে চাহেন, বর্ত্তমান লেখক স্বীয় গ্রামের দশ বার বৎসরের হিসাব দিতে প্রস্তুত আছেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, তবে মনে হয়,- না আসিয়া থাকিলেও শীঘ্রই আসিবে।

"বরপণ দ্বারা বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দোলে দুর্গোৎসবে আরও নানাকার্য্যে অপব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে!" সেন মহাশয়ের একথা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বের তুলনায় ব্যয় ও অপব্যয় প্রত্যেক কার্য্যেই অন্ততঃ পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, একথা বলিতে আমরা একটুও দ্বিধা করি না। যাঁহারা ব্যয় করিয়া থাকেন, আমার আশা আছে, তাঁহারাই এ কথার সমর্থন করিবেন।

বিবাহে ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক সভাসমিতিও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া মহোৎসবও সমাধা হইতে পারিত। এখন "আসিটীলাইন্" দীপমালা প্রজ্জ্বলিত না করিয়া ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের 'হরির লুট দেওয়া' ও "সত্য নারায়ণের সিন্নি" দেওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! নিশ্চয়ই এ গুলি ব্যয় সংক্ষেপের চিহ্ন নহে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ

(১)

সিকাগো, ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

বস্তুত বাইরে যখন সমস্তই অনুকূল হয় তখনই নিজেকে সত্য রাখা শক্ত হয়ে উঠে—কারণ, সত্যের তখন কোনো পরীক্ষা হয় না—তখন মনে হয় সত্যকে না হলেও যেন চলে, আসবাব থাকলেই যথেষ্ট; এই জন্যই ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যের অধিকার দুর্লভ। টাকার প্রতি আমাদের যে অন্ধ বিশ্বাস কোনোমতেই আমাদের ছাড়তে চায় না, তার জাল আমি ছিন্ন করে ফেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌তে চাই—"চাইনে কিছু"র দেশে পরমানন্দ মনে বাসা বাঁধতে চাই। এ দেশের লোকে মনের এই ভাবটাকে fatalism বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এ fatalism নয়। যারা জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলে fatalism তাদেরই ধর্ম্ম—তারাই অদৃষ্টকে স্পর্শ করবার জন্য অন্ধকারে ঢেলা মারে—এ দেশে তাদের অভাব নেই। কিন্তু আমি ত অদৃষ্টকে হাৎড়ে খুঁজে বের্ করতে

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁহার আমেরিকা প্রবাস কালে সেখানকার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি প্রীতিভোজ প্রদান করেন। এই ছবি সেদিনের সম্মিলনচিত্র।



বি, সি, রায়, কে বসু, হরিচাঁদ, বি দাস, এস্ রায়, জে শর্ম্মা, বি; এন, চ্যাটার্জি, রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

চাইনে—যে পূর্ণতা আমাকে ঘিরে আছেন ভরে আছেন তাঁকেই আমি উপলব্ধি করতে চাই—বাইরের অভাবেই যে তাঁকে বেশী করে পাওয়া যায়—রাণীর সাজসজ্জা যতই দামী হোক্ স্বামীর ঘরে গিয়ে সে সমস্ত খুলে ফেল্‌তে হয়—অন্যত্র যেমনি হোক্ কিন্তু স্বামীর কাছে এই সাজ খুলে ফেলা ত দারিদ্র্য নয়। আমাদের আশ্রমে সেই স্বামীর সঙ্গেই আমাদের কারবার—এইজন্যে সেখানে দারিদ্র্যে আমাদের লজ্জা নেই—আমরা রিক্ত একেবারে রিক্ত হয়েও পূর্ণ হব। আমাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, কিচ্ছু নেই—তোমরা নিরুদ্বিগ্ন হও, আনন্দিত হও এই আমি দেখতে চাই—অন্ধভাবে নয়—সমস্ত জেনে শুনে বুঝে পড়ে—চক্ষু মেলে, দুই হাত আকাশে তুলে, বক্ষ প্রসারিত করে। অভাব জিনিষটা পিছনে থাকবার জিনিষ কিন্তু আমরা যখন তাকে সামনের দিকে ধরে তাকাই তখন তার কোনো মানে বুঝতেই পারিনে, সমস্তই ফাঁকা দেখ্‌তে থাকি—এ ঠিক যেন ছবির পিছন দিকটাকে সামনে করে দেয়ালের উপর টাঙ্গিয়ে রাখা। কেবল দেখি ফ্যাঁকা ক্যান-ভাস—চিত্রকরের উপর বিশ্বাস একেবারে চলে যায় এবং নিজে যে এই ফাঁকা কেমন করে ভর্ত্তি করব তা ভেবে পাইনে—তখন আর কোনো উপায় দেখিনে এর উপরে পর্দ্দা ফেলে কোনমতে এই শ্রীহীনতা ঢাক্‌তে চাই—সেও যে শূন্যকে দিয়ে শূন্য ঢাকা—যতই পর্দ্দা বাড়াই না কেন সে শূন্যতা ত কোনোমতেই যাবার নয়—কিন্তু একবার কেবল ছবির দিকটাকে পাল্‌টে ধরলেই সমস্ত ধাঁদা এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায়। ছোট ছেলে অন্ধকারটাকে সত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করে বলেই তাকে ভূতের ভয় দিয়ে ভরিয়ে তোলে —আমরাও অভাবটাকে তেমনি করেই নিয়েছি, তাকে এমন ভয় দিয়ে ভরিয়েছি যে, সে ভয় বাইরের দিক থেকে ঘোচানো অত্যন্ত শক্ত,—সে ভয় বস্তুত নেই এ কথা জানলেও মন সান্ত্বনা মানে না, এবং বাইরের দিক থেকে সে ভয় ঘোচাতে চেষ্টা করি—কিন্তু ঘুচবে কেন? অন্ধকারের সীমা কোথায়? তাকে ভেঙেচুরে ধুয়েমুছে ফেল্‌ব কোন্‌খানে? অথচ ভাবের দিকে কতই সহজ—একটুমাত্র ছোট আলোর শিখা। অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন দেখি তখন সমস্ত ডালপালাসমেত একটা বটগাছকে এমন প্রকাণ্ড যাদু বলে বোধ হয় কিন্তু ভাবের দিকে একটি মাত্র ছোট বীজ। এইটেই বিধাতার কৌতুক হাস্য—তিনি অভাবটাকেই প্রকাণ্ড দৈত্যদানবের মত গড়েন, কিন্তু কার হাতে তার পরাভব ঘটান? ভীমসেনকে দিয়ে নয়—ছোট শিশু তার তূণ নিয়েই তাকে জয় করে। তাঁর না-সরোবর অতলস্পর্শ, তার কূল দেখা যায় না, তার জল মৃত্যুর মত কালো—কিন্তু তাঁর হাঁ-পদ্মটি এরই ভিতর থেকে মাথা তুলে জেগে ওঠে। সে ত প্রকাণ্ড ব্যাপার নয়, সে ত পর্ব্বত পাহাড় নয়; সে একটি ফুল, সে আপনার ছোটর মধ্যেই সব চেয়ে বড়—তার কোনো হাঁকডাক নেই, সে হাসিমুখেই সমস্ত জয় করেছে—সে বার বার মুদে যায়, ঝ'রে পড়ে কিন্তু আবার ফুটে ওঠে, তার অমরতা মৃত্যুহীন অমরতা নয়, সে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই অমর, তার পূর্ণতা অভাবের ভিতর দিয়েই পূর্ণতা—সে যে প্রবল সে ত বল দিয়ে নয়, বলকে

বিসর্জ্জন দিয়েই প্রবল। পৃথিবীতে এই অভাবের দিকেই যারা চোখ মেলে আছে তারা অহরহ ভয়েতে চিন্তাতে জর্জ্জর হয়ে রয়েছে, তারা বিষয়ের বস্তা বয়ে বয়ে এনে এই মায়া-গর্ত্ত ভরাবার জন্যে ইহজীবন গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে খেটে মরচে—পৃথিবীতে ভাবের দিকে যাঁদের চোখ পড়েছে তাঁরাই মানুষকে চির সম্পদ চির সান্ত্বনার পথ দেখিয়েছেন—তাঁরা দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে যে দুঃখ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তা নয়—তাঁরা দুঃখকে মৃত্যুকে গ্রহণ করেই মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন। তাঁরা ছবির উল্টো পিঠটাকে মেরে খেদিয়ে দেন নাই ছবি শুদ্ধ তাকে সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরাই মানুষকে অসঙ্কোচে অসাধ্য সাধন করবার উপদেশ দেন—তাঁরাই বলেন বিশ্বাসের জোরে পর্ব্বত টলানো যায়—তাঁরা সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন—তাঁরা কলসীর বাইরের তলায় জল খুঁজে খুঁজে বেড়ান না—তাঁরা নিশ্চয় জেনেছেন কলসীর ভিতরটা জলে ভরা। যারা তাঁদের সে কথা বিশ্বাস করে না, তারা কলসীর নীচেকার বিড়ে নিংড়ে জল বের করবার চেষ্টা করছে—সেইটেকেই তারা সহজ প্রণালী মনে করে—কেন না বিড়েটাকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়, কলসীর ভিতরটা যে ঢাকা।

(২)

সিকাগো, ৩রা মার্চ্চ।

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই—কতক-গুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয় কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কত বড় জিনিষ তা এদেশে এসে আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্ত্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্ত্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্যে উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগলাভ করার কোনো সাধনা নেই। এ রকম জাতিভেদের উপযোগিতা কিছু দিনের জন্যে ভাল। যেমন কোনো কোনো সবজির বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল করে আজ্জিয়ে নিতে হয়, তার পরে তাকে ক্ষেতের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেই রকম। শক্তিকে তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথা সময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই দেখি নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে সে বেশি ভাল বাসতে শেখে—এই জন্যে টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেকবারে মহা দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই

যুগসাধনার প্রবর্ত্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এদেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে—সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাৎড়ে বেড়াচ্ছে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্চে এই যে, এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে—যা কিছু আবশ্যক সমস্তকে এরা কলে তৈরি করে নিতে চায়—সেটি হবার জো নেই। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত উৎস আছে এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না—এইজন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলি কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চ্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিষটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে—কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠচে—অথচ তার ফল নেই এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্য্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত, সেটি আকাশের ও আলোকের অনির্ব্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি বিরাট প্রাণসমুদ্রের লহরীলীলার কলস্বর—সে কারখানাঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হয়েও সে বড়, কোমল হয়েও সে প্রবল—সে কেবলমাত্র চোখ মেলা কেবল মাত্র জাগরণ, সে কুস্তি নয়, মারামারি নয়, সে চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মত সেই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলো—কেননা সবই যখন তৈরি হয়ে সারা হয়ে যাবে—মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ করে উঠবে, তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হতে পারবে না, মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে, পূজা যখন সমাধা হবে তখনি সংসার-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে—কেবল অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জয় হবে না এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আমাদের কাজ আমরা যেন নিঃশব্দে করে যেতে পারি।

(৩)

আর্ব্বনা, ইলিনয় ১০ মার্চ্চ।

এখানে বিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সকলেই এর বিবরণ বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। কাল Atlantic monthlyর Editorএর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—তিনি লিখ্‌চেন—"I want to ask you whether it would not be possible for you at your leisure to write for us a general description of your school, but more especially of the philosophy of Education which underlies it. To the Atlantic's Oudience a discussion of this kind wou'd be exceedingly interesting." এই পত্রিকা এদেশে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাশালী, সুতরাং এখানে যদি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হয় তা হলে সেটা শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটার দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কিছু হবে কি না হবে সে কথা নিশ্চয় জানিনে কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় লাভের কথা আছে। আমাদের কাজের ক্ষেত্রকে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে পারলে আপনিই তার সমস্ত কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়কে যদি দেশে কালে সঙ্কীর্ণ করে জানি তাহলে আমাদের শক্তি ম্লান হয়ে থাকে আমাদের নৈবেদ্যের পরিমাণ কমে যায়। কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণভাবে মানুষ করে তোলা যেতে পারে এই ভাবনা আজ সমস্ত সভ্যজগতে জেগে উঠেছে—নানা জায়গায় নানা রকম পরীক্ষা হচ্ছে—সমস্ত পৃথিবীর সেই ভাবনা যে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবিত হচ্চে এবং সমস্ত পৃথিবীর সভায় এর হিসাব আমাদের দাখিল করতে হবে এই কথা মনে রাখতে পারলে চেষ্টার দীনতা ঘুচে যাবে। তা হলেই এ জিনিষটাকে আমরা একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল মাত্র করে তুলতে লজ্জা পাব। পৃথিবীতে এণ্ট্রেন্স স্কুলের অভাব অতি অল্প—মানুষের শক্তির প্রতি সে

অভাবের দাবীও অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু ছেলেরা আশ্রম জননীর কোলের উপর শুয়ে বিশ্ব-জীবনের বিগলিত অমৃত স্তন্য ধারা পান করে পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে উঠবে এ অভাব সমস্ত পৃথিবীর অভাব—আমাদের সমস্ত জীবন দিতে না পারলে এ অভাব মোচনের আমরা আয়োজন করতে পারবো না। কিন্তু কোণের মধ্যে বসে বসে কাজ করতে করতে এ কথা আমরা বেবলি ভুলে ভুলে যাই—আমাদের সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ধূলায় আবৃত হয়ে যায় এবং আমাদের শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সেই জন্যে আমাদের সেই প্রান্তর-প্রান্তে বিদ্যালয়কে বিশ্বদৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে পারলে আমরা নিজেকে নিজে সত্য-ভাবে দেখতে পাব—সেই দেখতে পাওয়াই আমাদের সকল ধনের চেয়ে বড় ধন। সকলের কাছে এই আমাদের প্রকাশ আমাদের গর্ব্বের বিষয় নয়, আমাদের লজ্জার বিষয়ও হতে পারে। কেবল মাত্র সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার উপায় মাত্র বলে একে গণ্য করতে হবে—সত্যের দ্বারা সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগের পথ উদ্ঘাটন করতে হবে—ইস্কুল মাষ্টারি করে সে কাজ হবে না। আমাদের প্রত্যেককে সাধক হতে হবে, তপস্বী হতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা

এই বৎসর হইতে আমরা উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরই বিশদ ভাবে সমালোচনা করিব। ভারতী সম্পাদিকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য চারি আনা। বীরভূম, শিউড়ি, রতন লাইব্রেরীতে সঙ্কলয়িতার নিকট প্রাপ্তব্য। এই গ্রন্থে 'বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান'

খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আরও নয়খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে। ইহা দশের কাজ, একের নহে। এ গ্রন্থের সংস্করণ যখন এক মাসের মধ্যে ফুরায় না, তখন বেশ বুঝিতেছি, দশের এদিকে আগ্রহই মেটে নাই। ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা! নিজের দেশ ও নিজের সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমাদিগের এতটুকু আয়াস বা অনুরাগ নাই, এ কলঙ্কের কথা কিছুতেই চাপা দেওয়া যায় না। কিন্তু সহস্র বাধা-বিপত্তি, স্বদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বীতরাগ প্রভৃতি সত্ত্বেও শিবরতন বাবু একাই এই বিপুল গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও নিপুণ পর্য্যালোচনা-শক্তির পরিচয় আমরা এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রচুরভাবেই পাইয়াছি। যে সকল সাহিত্যসেবীর নাম কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই, তাঁহাদিগেরও পরিচয় যতদূর সম্ভব উদ্ধার ও আবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, হইতেছে। গ্রন্থখানিতে কোথাও আত্মমত খাড়া করিবার বা কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলাভিনয়ের এতটুকু প্রয়াস নাই। দুই-চারিজন লেখকের নাম আমাদিগের জ্ঞাতমতে বাদ পড়িয়াছে। পড়িবার আশঙ্কাও আছে। সঙ্কলয়িতা তজ্জন্য পাঠকবর্গ ও সাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন—এ ত্রুটি সহজেই সারিয়া লওয়া যাইবে। সারিয়া লইলে চরিতাভিধানখানি যে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। সঙ্কলয়িতাকে শুধু মুখের কথায় ধন্যবাদ দিলেই, বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সঙ্কলয়িতা 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন, "এইরূপ গ্রন্থে যতদূর সম্ভব অধুনা-খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবকগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের হস্তলিপির আদর্শ, তাঁহাদের বাসস্থান প্রভৃতির ছবি সংগৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। আমি দুর্ব্বল ও দরিদ্র; সাধারণের উৎসাহ ও সহায়তা পাইলেই এই বহু ব্যয় সাধ্য ও দুরূহ কার্য্যেও আংশিক কৃতকার্য্য হইতে পারি।" একাদশ খণ্ড প্রকাশে বীরভূমির কয়েকজন জমিদার ও হেতমপুরের রাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট ঋণী।

শুক্তি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকালিচরণ ত্রিবেদী, পুরুলিয়া। কলিকাতা, ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। শতাধিক খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতাই ভাব-সম্পদে উজ্জ্বল কিন্তু সর্ব্বস্থলে ছন্দের বেশ একটি মোহন স্বাভাবিক প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধনায় তাঁহার সুন্দর ভাবগুলি সুন্দর ছন্দে গ্রথিত হইয়া অধিকতর মনোহারী হইবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস।

আদর্শ মহিলা। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। মূল্য এক টাকা চারি আনা। এই বৃহৎ গ্রন্থখানিতে সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা ও চিন্তা—এই কয়টি প্রখ্যাত সতী-চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি মূল সংস্কৃত হইতে গৃহীত। গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, ছবিগুলিও মন্দ নহে।

শিখের কথা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ক্ষীরতলা হাওড়া। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। পড়িয়া নিরাশ হইলাম। এখানি নাটক। নাটকীয় পাত্রপাত্রী নিতান্তই আচম্‌কা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহাদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তিও হেঁয়ালির আবরণে কতকটা ঢাকা থাকে। তাহাদিগের বক্তব্য ও কর্ত্তব্য স্পষ্ট বুঝা যায় না! গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক বালিগঞ্জ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ভারতী

৩৭শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ [২য় সংখ্যা

নবজীবন

১। তুলসীদাস

তরুণ কবি তুলসীদাস। কবির সৌন্দর্য্য-পিপাসা গণ্ডী ছাড়িয়া নিখিল ছাড়িয়া ছাপিয়া উঠিতে চায়! সে কখনই ক্ষুদ্রের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি সাধনায়। অন্তরের জাগ্রৎ ব্যাকুল ইচ্ছার তাড়নায় কবি সে পথে দ্রুত চালিত।

তরুণ জীবনের ক্ষুধিত কুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন সুন্দরী স্নেহশীলা প্রীতিময়ী এক নারী—তুলসীর নবীন জীবনের সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নী। সকল অর্ঘ্য কবি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিল।

ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব নিখিলের সাথে যুক্ত হইয়াই বড় হইয়া উঠে। যদি না উঠে, তবে তা'তে আর সুখ কোথায়, আনন্দ কোথায়! তুলসী সে স্পর্শমণির স্পর্শ ত পায় নাই—কি করিয়াই বা পাইবে সে সাধনা এখনও ত তাহার হয় নাই!

বিচ্ছেদের ব্যথা—সে যে কত মনোরম, বাসনার আবেশ সে কথা বুঝিতেই দেয় না। সে কেবল ব্যথাটাকে বড় করিয়া দেখে। পত্নীর মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদেও দারুণ বেদনা। এক একটি মুহূর্ত্ত তুলসীর কাছে অনন্ত দুঃখ বেলার এক একটি উপলখণ্ড। সে উপলখণ্ড যে পরশপাথর, তরুণ তুলসী কি করিয়া বুঝিবে?

গৃহে আসিয়া যখন দেখিল, পত্নী পিতৃ-ভবনে চলিয়া গেছেন; তুলসী অধীর হইয়া উঠিল, নিখিল সংসার শূন্য দেখিল।

"মা, মা, সে কোথায় গেল?"

"দু'দিন বইত নয়, তুমি উতলা হইও না।"

"না মা, এখনি আমি যাব, খাবার তুলিয়া রাখ। আমি চলিলাম।"

সমস্ত পথ তুলসী হাওয়ার মত উড়িয়া চলিল। কত ভয় কত আশঙ্কা, কত বেদনা—

"যদি না দেখিতে পাই"।

তুলসী ঝড়ের বেগে ছুটিল। পথে শুক্‌না তৃণগাছিও যেন পাহাড় হইয়া তাকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

দুরু দুরু বুক, ছল ছল নয়ন. তুলসী প্রিয়তমার একেবারে বক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আমি আসিয়াছি।"

"এত ব্যাকুলতা, এত বেদনা বহিয়া, প্রিয়তম, তুমি আমারই কাছে আসিয়াছ! হায়! আমি কত ক্ষুদ্র

আমার মধ্যে এর প্রতিদান কোথায়? আমার এ সৌন্দর্য্য, আমার এ হৃদয়, হরি, হরি, কতটুকু, কত ক্ষুদ্র! প্রিয়তম, তুমি যদি সেই সুন্দরের সুন্দর, মহানের মহান্—তাঁহার কাছে এমনি ব্যাকুল হইয়া দাঁড়াইতে, তবে আর এমন বিমুখ হইতে না। সে যে অনন্ত অমৃত-নিকেতন আমার মধ্যে সে অমৃত কোথায়? এ যে বিন্দুমাত্র, আমি কি দিব? এত ব্যাকুলতা, এত পিয়াসা সে যে সেই অমৃত সাগরের তরেই সাজে, পরিতৃপ্তি কেবল তাহাতেই।"

স্তিমিত তুলসী ক্ষণকাল আপনাকে ভুলিয়া গেল। জীবনের গতি ফিরিল। তুলসী মহানের জন্য প্রিয়তমের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। ভক্তের জীবন এমনি করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, ভক্ত এমনি করিয়া নব-জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

২। হাফেজ *

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। গোধূলির আকাশে সন্ধ্যা তারাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর উপর একখানি কাল যবনিকা আস্তে আস্তে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। নীড়ে পাখীরা ফিরিয়া আসিয়াছে। ধেনুরা গোঠে ফিরিতেছে। বাটে রাখালের শ্রমক্লান্ত কণ্ঠ সন্ধ্যার রাগিণী গাহিয়া উঠিল। গৃহবধূ কুটীরে কুটীরে সান্ধ্যদীপ জ্বালিয়াছেন।

এমনই এক সন্ধ্যায় হাফেজ সমাধি মন্দিরে প্রদীপহস্তে আস্তে আস্তে চলিয়াছেন। এই কাজ করিয়া হাফেজের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার হাতের দীপশিখাটি ধ্রুবতারার মত তাঁহাকে কোন এক স্তব্ধ শান্ত মন্দিরের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।

ধীরে সোপান পার হইয়া হাফেজ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীপ যথাস্থানে স্থাপিত হইল। দেখিলেন,

শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, পবিত্রতার মূর্ত্তি দুইজন আরেফ্ † মুদ্রিতনেত্র, ধ্যানস্থ। কি এক পবিত্র অপূর্ব্ব আভায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত। কি এক স্বর্গীয় গদ্‌গদ্ ভাব তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে বিকীরিত হইয়া সমস্ত মন্দিরকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। হাফেজের হৃদয়মন একটা অপরিচিত অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশে ভরিয়া গেল। মণির জ্যোতির মত স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্যধরা, একটা আনন্দের ফোয়ারায় ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বটাকে সিক্ত করিয়া দিল। হাফেজ সকল ভুলিয়া এই নবাগত ভাবের আবেশে ভোর হইয়া আরেফ্‌দের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান মগ্ন হইলেন। এক অজানা অনাগত তাঁহাকে আপনার দুইটি শুভ্রবাহুতে বাধিয়া কোন্ এক নূতন রাজ্যে আনন্দ রাজ্যে লইয়া গেল, হাফেজ বুঝিলেন, দেখিলেন, চিনিলেন। চিনিলেন এই তাঁহার প্রকৃত জীবন, প্রকৃত ঘর—প্রকৃত রাজ্য।

"সুরশিক্ষাদাতা গুরুর দাসত্ব স্পর্শমণি সদৃশ। আমি তাঁহার আশ্রিত হইয়াই এই উচ্চপদ লাভ করিলাম।" ‡

নূতন জীবনের নূতন রাগিণী ইনি গাহিয়া উঠিলেন। আপনার ঘর চিনিলেন, প্রিয়তমের জন্য পাগল হইলেন। পাগল হাফেজ সে ঘরে আপনাকে আহ্বান করিলেন।

* জনশ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া একথা লিখিত।

† আরেফ্—যোগী।

‡ একটি গজলের প্রথমাংশের অনুবাদ।

"ঘরের বাহিরে ফুলের বাগান,
নীরস সে ফুলরাশি,
তাহার মাঝারে ব্যর্থ খুঁজিছ,
প্রেমের মধুর হাসি।

বিলাপ করগো, ওগো বুলবুল্
বিলাপের এ যে ঠাঁই,
ফিরে এস তুমি আপনার ঘরে
বাহিরে সে জন নাই। *

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

গিলগিটদিগের আমোদপ্রমোদ

তালিনো ও নিছালো উৎসব

বৌদ্ধরাজা শ্রীবাদতের শাসনকালে স্কারডুর রা (রাজা) আঞ্জুরের—খিস্‌রো, জামসেদ, এবং সামসের নামক তিন পুত্র একদা গিলগিটের চারি মাইল পূর্ব্বে গিলগিট ও হুনজা নদীর সঙ্গম স্থলে—"দানিওর" গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম স্কুরডু হইতে যাত্রা করিয়া হুন্‌জা ও 'নগর' অধিকার করেন এবং গিলগিট অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহাদের আগমন ও গিলগিট অধিকার সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীগণ একটী কৌতূহলপূর্ণ গল্প বলিয়া থাকে। তাহারা বলে যে এই রাজপুত্রগণ পরী-বংশজাত। পরীরা খুব একটা উচ্চ পর্ব্বতে বাস করিত। সেখান হইতে রাজপুত্রগণ পক্ষের সাহায্যে উড়িয়া "দানিওরে" আসেন। একদিন তাহাদের বিশ্রামস্থান হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী "দানিওর খো" পর্ব্বতে একটী বন্য গাভী দেখিয়া খিস্‌রো ও জামসেদ ছোট ভাই সাম্‌সেরকে তাঁহার তীর দ্বারা গাভীটীকে বিদ্ধ করিতে বলিলেন। বড় ভাই দুইটীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ছোট ভাই প্রথমত শর নিক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইল না—কিন্তু অবশেষে তাহাদের আদেশ ও অনুরোধে তীর সংযোগ করিয়া অতি কৌশলের সহিত গাভীটীর বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। দানিওরের অধিবাসীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গাভীটিকে আনিবার জন্য সেই পর্ব্বতে গেল এবং দেখিল যে বক্ষঃস্থলে তীর বিদ্ধ হইয়া গাভীটী অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহারা গাভীটীকে আনিয়া রাজপুত্রদের নিকটে রাখিল। রাজপুত্রগণ গরুটীর যকৃৎ বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাজিতে আদেশ করিলেন। যকৃৎ ভাজিয়া আনিলে পর বড় দুই ভাই ছোট ভাইটীকে সেই খাদ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। ছোট ভাই কিছুতেই একা খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বড় দুই ভাই বলিলেন—"সামসের! তোমার শর নিক্ষেপের কৌশল দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। তোমাকে একাই ইহা খাইতে হইবে।"

ছোট ভাই আর কি করিবেন তিনি একাই সেই যকৃৎভাজা খাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুই এক টুক্‌রা খাইবামাত্রই তাহার বড় দুই ভাই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

* একটি গজলের শেষ অংশের ভাব লইয়া।

আর তাহাদিগকে দেখা গেল না। সামসের তখন ভাইদের অনুসরণের প্রয়াস করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। সেই ভাজা মাংস খাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মাটী হইতে একটুকুও উড়িতে পারিলেন না। প্রাণপ্রিয় ভাইদের জন্য কতই কান্নাকাটি করিলেন কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সারাজীবন তাঁহাকে গিলগিটেই কাটাইতে হইল, গিলগিটবাসীগণ তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া এবং তাঁহাকে পরীবংশসম্ভূত বলিয়া নিজেদের অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

কয়েকমাস পরে একদিন তিনি গ্রামের সকলকে বলিলেন—"একটা প্রকাণ্ড মার্কহোর পশু হাপুকোর পর্ব্বতে এদিকওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আমি তাহাকে এস্থান হইতেই দেখিতে পাইতেছি এবং এখনই তীর নিক্ষেপ করিয়া সেটাকে বধ করিব।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। চার মাইল দূরে হাপুকোর পর্ব্বত। সেখানে মার্কহোর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—রাজপুত্র কিপ্রকারে এতদূর হইতে তাহা জানিতে পারিলেন!

রাজপুত্র ধনুকে শর সন্ধান করিয়া অতিশয় বলের সহিত তীর নিক্ষেপ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন মার্কহোর মরিয়াছে। গ্রামবাসীগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা সকলেই তখন সামসেরকে বহন করিয়া সেই পর্ব্বতে লইয়া চলিল, নাপুর নদী পার হইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়া দেখিল যে সত্যই মার্কহোর প্রাণ হারাইয়া পড়িয়া আছে এবং রাজপুত্র যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শরত্যাগ করিয়াছিলেন ঠিক সেইস্থানে তীরটীও লাগিয়া আছে। রাজপুত্রের এই অলৌকিক কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। এদিকে অসহ্য গ্রীষ্ম—সূর্য্যদেব প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন—বিশ্রামলাভার্থ সকলেই তখন একটী ছায়াবহুল নির্ঝরের ধারে ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীবাদতরাজার কন্যা "মিইও-খাইশোনি" গ্রীষ্মকালে সেই ঝরণার ধারে বাস করিতেন, রাজকন্যার দাসী ঝরণাতে জল লইতে আসিয়া দেখে অনেক অপরিচিত লোক ঝরণার ধারে দিব্য আরামে শুইয়া ঘুমাইতেছে। এই সংবাদে রাজকন্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ লোকগুলিকে বন্দী করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। দাসীরাও তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার হুকুম তামিল করিল।

সামসেরের যৌবনসুলভ কমনীয় রূপ দেখিয়া রাজকুমারী আপনহারা হইলেন। রাগ কোথায় চলিয়া গেল—স্বীয় ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া অতি বিনয়ের সহিত রাজপুত্রকে আসনে বসাইয়া কুশলবার্ত্তা এবং আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্রের মিষ্ট কথায়—মার্জ্জিত ব্যবহারে রাজকন্যা মুগ্ধ হইলেন, আনন্দের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিলেন—

স্বরগের তুমি—তুমি স্বরগের—
মরতের তুমি নহগো
তোমা সম নাহি ভুবনে

সামসের রাজকন্যার নিকট বিদায় চাহিলেন। কিন্তু রাজকন্যার মন ছাড়িতে চাহে না—মুখে কহিলেন—

আজিকার নিশি রহ বধূ হেথা
প্রভাতে যেও চলিয়া।

কি করেন—রাজপুত্র রাজকন্যার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। রজনীর অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল। দুজনার গল্প আর ফুরায় না, রাজকন্যা রাজপুত্রের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, লজ্জা ভাঙ্গিয়া সামসেরকে মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"আমি তোমারি—আমাকে ছাড়িয়া যাইওনা।"

রাজপুত্র কত বুঝাইলেন—বলিলেন—আমি অজ্ঞাতকুলশীল, তোমার উপযুক্ত নই; তোমার পিতা শুনিলে শঙ্কট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু চিত্ত হারাইলে কি আর সে সকল কথা মনে থাকে! রাজকন্যা সে কথা কানে তুলিলেন না—কাঁদিয়া রাজপুত্রের পায়ে পড়িলেন। রাজপুত্রের হৃদয় গলিয়া গেল, শ্রীবাদতের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার চিন্তা আর মনে স্থান পাইল না। অশ্রু ফেলিয়া রাজকন্যাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, রাজকুমারীর বেদনা আপন হৃদয়ে অনুভব করিলেন। সকল দুঃখ দূর হইল, রাজকুমারীর মুখে হাসি দেখা দিল।

রাজকন্যা দাসীদিগকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বলিলেন—"যে আমার এই মিলনবার্ত্তা পিতার নিকট জানাইবে তাহাকে সেই দিনই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিতে হইবে সুতরাং খুব সাবধান যেন একথা রাষ্ট্র না হয়।"

সেই রাত্রেই অতি গোপনে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। মিলনের রাতে রাজপুত্র—রাজকন্যার নাম রাখিলেন—সাকিনা। আবার কেহ বলে রাজকুমারীর নাম হইয়াছিল "নুরবক্ত।"

পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র তাহার সঙ্গীদিগকে তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বারম্বার বলিয়া দিলেন—"সাবধান, আমাদের মিলনবার্ত্তা প্রকাশ করিও না।'

সামসের এক্ষণে গিলগিটের রাজা হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আপন প্রণয়িনীকে তাহার পিতা শ্রীবাদতের প্রাণসংহারের নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং গিলগিটবাসীগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। সামসেরের রূপমুগ্ধ রাজকন্যা অজ্ঞাতকুলশীল প্রিয়তম পতির কুমন্ত্রণায় কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইলেন এবং স্বামীর উপদেশ মত পিতার প্রাণসংহারে প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীবাদত রাক্ষসের বংশধর ছিল—সুতরাং তীর ও তরবারির আক্রমণ তাহাকে কিছুই করিতে পারিত না। তাহার শরীর ও আত্মা কি কি উপাদানে গঠিত তাহাও কেহ জানিত না, সুতরাং সামসের শ্রীবাদতের জীবনের গুপ্তরহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ ও প্রণয়িনীর চিত্ত পরীক্ষা করিবার জন্য সাকিনাকে কহিলেন—"এ বৎসরে গাছের পাতা ঝরিয়া পুনরায় তাহার নব কিসলয় উদ্গত না হইতেই তুমি আর তোমার পিতাকে দেখিতে পাইবে না।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সে বৎসর গাছের পাতা ঝরিয়া গেল। সাকিনা পিতার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন কিন্তু

পিত্রালয়ে গিয়া দেখিলেন যে পিতার কোন প্রকার অমঙ্গল হয় নাই। রাজকন্যা পিতার নিকট গিয়া বলিলেন যে কয়েক দিন হইল, পাহাড়ের উপর একজন ফকির এই দৈববাণী করিয়াছেন যে এবৎসরে গাছের পাতা পড়িতে না পড়িতেই আমি তোমাকে হারাইব। পিতঃ আমি তোমার হতভাগিনী কন্যা, নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ফকিরের কথা মিথ্যা হইয়াছে।

শ্রীবাদত কহিলেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার জীবন লইতে পারে এমন কেহই পৃথিবীতে জন্মে নাই। আমার জীবনের গূঢ় রহস্য যা জানিতে পারিলে মানুষের সাধ্য নাই যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

রাজকন্যা ছাড়িলেন না—তিনি বলিলেন —"তাহা বটে, কিন্তু তবু আমার মন মানে না। তুমি মরিয়া গেলে আমি কি প্রকারে বাঁচিব! কে আমায় আর তোমার মত আদর করিয়া ডাকিবে! আমার নিকট তোমার জীবনের গুপ্ত রহস্য বলিতে বাধা কি! যখন দেখিব যে তোমার বিরুদ্ধে কেহ ষড়যন্ত্র করিতেছে, অমনি ত সাবধান হইতে পারিব। বল পিতঃ বল তোমার প্রাণ কিসের মধ্যে!"

শ্রীবাদত সকল শুনিলেন—কন্যাকে নানা কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সাকিনা ভুলিবার মেয়ে নয়, বারম্বার আব্দার করিতে লাগিলেন। পিতা আর কি করেন—স্নেহ বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"আমার জীবন "ঘি"এর মধ্যে। সেই ঘৃত খুব বেশী উত্তাপ ভিন্ন গলিবার নয়। যখন দেখিবে যে এই দুর্গের চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখনই জানিবে যে শ্রীবাদতের মৃত্যু নিশ্চয়। সেদিন আর তোমার পিতাকে কেহ রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু হায়! শ্রীবাদত তাঁহার কন্যার চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, সাকিনা তাহার জীবনের কাল হইয়া তাহার নিকট হইতে জীবনের গুপ্তরহস্য জানিবার জন্য গিয়াছিল —স্নেহমুগ্ধ পিতা তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

পিতার জীবনের সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়া কন্যা কিছু দিন পিতার নিকটেই বাস করিলেন, তারপর সুযোগ ক্রমে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আসিয়া দেখিলেন, সামসের তাহার আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে কালযাপন করিতেছেন।

রাজকন্যা রাজপুত্রের নিকট সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন, আনন্দে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সমস্ত ষড়যন্ত্র অনতিবিলম্বে সমাধা করিবার জন্য সামসের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিলেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি দানিওরে সংবাদ পাঠাইলেন, সংবাদ পাইবামাত্র তাহার অনুচরগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সামসের পরী-বংশসম্ভূত এই বিশ্বাসে তাহারা রাজপুত্রকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

এদিকে শ্রীবাদত মানুষের মাংস খাইত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই জন্য গ্রাম-বাসীগণ সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কথা বলে এমন সাহস কাহারও ছিল না। সুতরাং এই সুযোগে শ্রীবাদতকে শিক্ষা দিতে সকলেই উৎসাহিত হইল, তাহা না হইলে যে তাহাদের ছোট

ছোট শিশু গুলি একে একে শ্রীবাদতের ভোগেই লাগিয়া যায়।

সকলেই শ্রীবাদতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল। সামসের সাকিনাকে পিতার নিকট যাইয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপদেশ দিল। রাত্রি তিনটার সময় সকলে কাঠ ও চর্ব্বি সংগ্রহ করিয়া শ্রীবাদতের দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল।

বর্ত্তমান পলো (Pologround) খেলিবার স্থান হইতে প্রায় ২০০ শত গজ দূরে শ্রীবাদত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুগণ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই শ্রীবাদতের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া তিনি কন্যাকে—কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা—দেখিবার জন্য দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

সাকিনা পূর্ব্ব হইতেই সকল জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং—কোনই আশঙ্কা নাই—বলিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শত্রুগণ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, শ্রীবাদতের প্রাণেও ততই অশান্তি ও যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শ্রীবাদত দুর্গের বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কিন্তু তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না। প্রিয়তমা কন্যার ঘৃণিত ব্যবহার তাহার বুকে শেলসম বাজিতে লাগিল। শত্রুগণ দুর্গের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নি সংযোগ করিতেছিল। শ্রীবাদত উন্মত্তবৎ বাতাসে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উড়িতে উড়িতে "ইস্‌কোমান" উপত্যকায় তুষারাবৃত "যাস্‌পুর" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (এই গ্রামটী গিলগিট হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এক্ষণে ইহা জনশূন্য।) সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হইত এবং গ্রামবাসীগণ সেই ফলে মদ্য প্রস্তুত করিত। তৃষার্ত্ত শ্রীবাদত জল চাহিলে পর একজন এক পেয়ালা মদ আনিয়া দিল। তদ্দর্শনে শ্রীবাদত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"আমি মদ চাহি না—আমি শীতল জল চাই।" কিন্তু কেহই তাহাকে জল আনিয়া দিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ শ্রীবাদত এই অভিশাপ দিলেন যে গ্রামে আজ হইতে আর যেন আঙ্গুর উৎপন্ন না হয়।

পর বৎসর তুষারমিশ্রিত শীতলজলে গ্রাম ডুবিয়া গেল এবং জমীর উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইল। যাস্‌পুর হইতে শ্রীবাদত "চতুর-খাস" নামক স্থানে বরফের নদীগর্ভে লুকাইয়া রহিলেন। গিলগিলটবাসীরা বলে যে, আজও পর্য্যন্ত নাকি শ্রীবাদত সেই নদীগর্ভেই বাস করিতেছেন। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আবার কোনদিন আসিয়া তিনি দ্বিগুণ অত্যাচারের সহিত গিলগিট শাসন করিবেন।

গিলগিট হইতে শ্রীবাদত যে দিন পলায়ন করেন সেই দিনটী স্মরণ রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর সেই দিনে উৎসব হয়। উৎসবের রাত্রে কেহই ঘুমায় না—সকলেরই ভয় যে শ্রীবাদত পুনরায় আসিয়া গিলগিটে রাজত্ব করিবে। তাহার আত্মা ভূত হইয়া কখন কাহার স্কন্ধে ভর করে এই ভয়ে তাহারা সে রাত্রে গ্রামের চতুর্দ্দিকে বড় বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখে এবং কুণ্ডটী ঘেরিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করে। এই প্রকার নৃত্যগীতে বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যায়।

ইহাকে "তালিনো" উৎসব বলে। কুলচিন বংশের কেহই এই উৎসবে যোগদান করে না—কারণ তাহারা সকলেই পূর্ব্বাপর শ্রীবাদতের অনুগ্রহে প্রতিপালিত এবং তাহার কর্ম্মচারী ছিল, ঐ জন্য তাহারা উৎসবে যোগদান না করিয়া প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। একমাত্র এই বংশের লোক ব্যতীত আর কেহই শ্রীবাদতের শুভাকাঙ্ক্ষী গিলগিটে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহারা সমস্ত গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও আজও পর্য্যন্ত কোনপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া গিলগিটে বাস করিতেছে।

উৎসবের পরদিন প্রত্যেক বাড়ীতে পাঁচটী ছাগবলি হয়। এই বৎসর যে তাহারা নিষ্ঠুর শ্রীবাদতের পুনরাগমন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এই আনন্দজ্ঞাপন উদ্দেশ্যেই এই ছাগহত্যা হইয়া থাকে। মাংস তাহারা রৌদ্র-তাপে শুষ্ক করিয়া রাখে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার সদ্ব্যবহার করে। তাহারা বলে যে এই শুষ্ক মাংস এক বৎসর রাখিলেও নষ্ট হইবার নহে। ইহাকে "নিছালো" উৎসব কহে।

পর্ব্বতগাত্রে বৌদ্ধমান

'বটুথ্‌নালার' প্রবেশপথের পার্শ্বে নৌকাবাহীদিগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে সিন্ধুনদীর তীরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। প্রস্তরগাত্রে ৩।৪ হাত দীর্ঘ একটী বৌদ্ধমান (Man) অর্থাৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ছবিটী অস্পষ্টভাবে খোদিত হইলেও তাহার উপর এমন সুন্দর সাদা রঙ দেওয়া আছে যে শত শত বৎসরের রৌদ্রবৃষ্টির প্রভাবেও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয় নাই, এবং বহুদূর হইতে পর্ব্বতগাত্রে শ্বেতবর্ণের এই বৌদ্ধমান সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এই প্রকারের ছবি সেই পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরও অনেক দেখা যায় কিন্তু সেগুলি এইটীর ন্যায় বৃহৎ নহে। এই স্থান হইতে নিম্নে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে নদীতীরে বিভিন্ন আকৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর যথেষ্ট আছে—পাথরগুলির পৃষ্ঠে কোনটীতে ছাগলের মূর্ত্তি, কোনটীতে বা হরিণ, কুঠার, মার্কহোর পশুর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই প্রকার খোদিত মূর্ত্তি বাগরাট উপত্যকার 'সানিকর' ও বুলচি গ্রামের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতগাত্রেও দেখা যায়।

বারমাস পরগণার "ডাম্‌টের" নিকটবর্ত্তী "সাই" উপত্যকার পর্ব্বতপৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের দুইটী প্রতিকৃতি আছে,—একটী খোদিত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব, অপরটী বর্ণ সম্পাতে তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত, শিষ্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত সেই মহাপুরুষেরই ছবি।

চিলাসের সন্নিকটে নদীতীরে একস্থানে ইহাপেক্ষাও একটী বৃহৎ পর্ব্বত গাত্রে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি এবং ২৩টী মন্দিরে ছবিসহ মানুষ, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতির মূর্ত্তি নিপুণভাবে খোদিত রহিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে পুরাতন অক্ষরে লিখিত ফলকও আছে। এরূপ প্রস্তরফলক নদীতীরে আরও অনেক দেখা যায়।

এই সকল শিলালিপি ও খোদিত মূর্ত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে চিলাসের এই অংশে এক সময় বৌদ্ধগণ বসবাস করিত। চিলাসবাসীগণের ধারণা যে এই সকল

প্রতিকৃতি জিন, বা পরীগণ অঙ্কিত করিয়াছেন।* তাহারা বলে যে পূর্ব্বকালে চিলাসে প্রায়ই পরীগণ স্বর্গ হইতে আসিতেন এবং তাঁহারাই এই সকল প্রতিমূর্ত্তি পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সকলেই নাকি সেই পরীদিগকে দেখিতে পাইত কিন্তু এখন একজন প্রধান মোল্লা (ফকীর) তাহার মন্ত্রবলে পরীদিগকে দেখিতে পায় মাত্র—আর কেহই দেখিতে পায় না।

আবার বাগরাট উপত্যকাবাসীগণ বলে যে—"সিনোবাজ্‌নো" উৎসবের রাত্রিতে পরীগণ এই সকল প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়া-ছিলেন—এবং আজও পর্য্যন্ত এই উৎসবের রাত্রে পরীরা এক পাহাড়ের ছবি মুছিয়া দিয়া অন্য পাহাড়ের পৃষ্ঠে ছবি খুদিয়া রাখেন। তাহাদের বিশ্বাস যে এরূপ ছবি অঙ্কন করা মনুষ্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

রাসু-আই-যুদাইনি

বাগরট উপত্যকায় বুলচি গ্রামের ডোমদিগের নিকট আজও পর্য্যন্ত একটী ঢাক্ আছে। ঢাকটীর পরিধি ৩ ফুট এবং ব্যাস ১ ফুট হইবে। ইহাকে "রাসু-আই-যুদাইনি" বলে। এক সময় নাকি এই ঢাকটী বহুমূল্য আবরণে শোভিত হইয়া গিলগিটের উজির রাসুর গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত। কল্পিত আছে যে কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে রাসু ঢাকটী আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিতেন এবং ঢাকটি বিনা আঘাতে আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিলে শুভলক্ষণ মনে করিয়া রাসু যুদ্ধযাত্রা করিতেন; ঢাকটি না বাজিলে অশুভ মনে করিয়া যুদ্ধোদ্যম স্থগিত রাখিতেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্বর্গ-সুখ

স্বর্গ সুখ নিয়ে নাথ কি করিব আমি,
ক্ষুদ্র প্রাণে সবারি কি অত সুখ সয়!
দীনহীনা সে সুকৃতি কোথা পাবে, স্বামি!
বহু তপস্যার নিধি, মোর প্রাপ্য নয়।
সাধনা কামনা মোর শুধু নাথ তুমি,
তুমি ছাড়া কিছু আমি চাহিনাক আর।
রহ তুমি স্নিগ্ধ করি মন-মরু ভূমি
চির আকাঙ্ক্ষিত নাথ তুমিই আমার!
লভুক সে স্বর্গসুখ বাঞ্ছিত যাহার,
আমি শুধু হবো সুখী লভিলে তোমায়।
সাধনা কামনা নাথ যা কিছু আমার,
মিশাইয়ে আছে তব চরণের ছায়!!

শ্রী বেলা দেবী।

---

* A similar belief is held by the Malays (Mahammadan's) of Lower Siam and Pahang regarding the "Orang Parai" (Peris) and certain clay tablets of Buddhistic origin found in Caves. See "Steffen, Man, 1902. No.1125, Ed."

চীনের শিল্প

চীনদেশে ভাস্কর্য্যসম্পন্ন বিশেষ কোন পুরাতন কীর্ত্তি না থাকিলেও ইহা যে এক দিন শিল্পকলায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন অধুনা কারুকার্য্যে খচিত চীনের দ্রব্য সামগ্রী দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি সুশোভিত স্থান অতি অল্পই দেখা যায়। চীনসম্রাটগণ কীর্ত্তিস্থাপনের সমধিক প্রয়াসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ বৌদ্ধমন্দির ব্যতীত পুরাকালের অপর কোন মন্দির বা স্মৃতিসৌধ বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গেই যে ভারতীয় শিল্প চীনদেশে শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। চীনদের গৃহের ছাত ঢালু। আমাদের দেশের খড়ের চালের মত পূর্ব্বে আদিম চীনেরা তাম্বুতে বাস করিত। সেই ধারণা হইতেই ঘরের ছাত ঢালু করিবার প্রথা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বরফ পতনের জন্যও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। চীনেরা সকলেই অল্প বিস্তর পরিমাণে শিল্পী এবং চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। ধনী-গৃহের মহিলাদিগকে ললিতকলা রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। পট্টবস্ত্রের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, রেশমের সুন্দর সুন্দর ফুল তৈয়ারি, চিত্রাঙ্কন এই সকল তাহাদের প্রিয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। চীনবাসীদের চিত্র-কলায় বিলক্ষণ অনুরাগ দেখা যায়। সকলেই যেন স্বভাবচিত্রকর। চীনের লিপিরচনা চিত্রাঙ্কনের অপর পরিণতি। তাহাদের লিখিবার সরঞ্জামের মধ্যে লেখনী নাই। অঙ্কনের তুলিকাদ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয়; লিখিবার কালীও চিত্রাঙ্কনের কালীদ্বারা সম্পাদিত হয়। ঐ কালীগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র এক খণ্ড পিষ্টকের মত, তাহার উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা, উহাকে চীনে কালী বলে। ভারতবর্ষে চিত্রাঙ্কনের নিমিত্ত ঐ কালী প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। চীনে কৃষকেরা এমন সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বীজবপন করে যে হরিদ্বর্ণ শষ্পদ্বারা ভূমিভাগ আচ্ছাদিত হইলে অতীব নয়নানন্দদায়ক হয়! সবগুলি যেন কেয়ারী করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অপর তৃণগুল্মাদি ক্ষেত্রমধ্যে আদৌ স্থান পায় না। চীনে মালী এমন সুন্দর ও সুদৃশ্যভাবে উদ্যান বৃক্ষগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করে যে সেগুলি এক একখানি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। কোন বৃক্ষ একটি মানুষের মত, কোনটি বা একটি জানোয়ারের প্রতিকৃতি, কোনটি বা পক্ষীর আকৃতি, আবার কোনটি বা একটি প্রজাপতি! চীনের পুষ্পোদ্যানগুলি দেখিতে এমন সুন্দর এমন মনোহর যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে কিয়ৎকালের জন্য সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ, সমুদায় অশান্তি তিরোহিত হয়, মনোপ্রাণ উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। চীনেদের গৃহের আসবাব পত্রগুলি এমন সুন্দর কারুকার্য্য-সম্পন্ন সে সবগুলিই নয়নমনোহর; এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যেন শিল্পী নিজহস্তে সে-গুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

গৃহের দেওয়াল মনোরম রঙিন কাগজ দ্বারা মণ্ডিত, তাহাতে কত প্রকারের লতাপাতা, পশুপক্ষী ফলমূল অঙ্কিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। গৃহ যেন একখানি ছবি। গৃহের কার্ণিশ প্রভৃতি সুচারু ভাস্কর কার্য্যে সুশোভিত; সেগুলি আবার নানারঙে সুরঞ্জিত। সমস্ত বস্তুই সুন্দররূপে চিত্রিত। তাহারা যেন স্বভাব কবি ও শিল্পী! কবিতা চীনেদের অত্যন্ত প্রিয়। শিল্পের ত কথাই নাই, শিল্পই তাঁহাদের জীবন অথবা তাহাদের জীবন শিল্পময়। চীনের পুষ্পাধার যেমন সুদৃশ্য তেমনি মনোহর, যে দেখিবে সেই মোহিত হইবে। পোর্সিলেন বা চীনা মাটির বাসনগুলি অতীব সুন্দর। বাসনগুলি কাচের মত অনেকটা স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও চক্‌চকে। উপরি ভাগ নানাপ্রকারে চিত্রিত। চীনে 'কৌলিং' নামে এক প্রকার সাদামাটি পাওয়া যায় ইহাদ্বারা চীনাবাসন প্রস্তুত হয়। এই মাটি 'উচ্চচূড়' নামে চীনের এক পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়! ঐ মাটির সঙ্গে আর এক প্রকার সাদাপাথর চুর্ণ করিয়া মিশাইতে হয়। এই পাথরের চূর্ণ ও কাদামাটি মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া নানা আকারের বাসন তৈয়ার হইয়া থাকে। একবার পোড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করে, পরে তদুপরি এক প্রকার আরক দিয়া আবার পোড়াইলে উত্তম বাসন তৈয়ার হয়। উপরি ভাগ কাচের মত মসৃণ হয়। চীনদেশের প্রাচীন কালের বাসনগুলি দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য। চীনে খেলনাতেও শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘুড়িগুলি সুন্দর সুন্দর পক্ষী প্রজাপতি, মানুষ, সর্প, কচ্ছপ ইত্যাদির আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঁশ এবং বেতে সুন্দর সুন্দর চেয়ার, টেবিল, বাক্স এবং গৃহের অন্যান্য আসবাব পত্র তৈয়ারী হয়। কাগজ, কাচ ও অভ্রের লণ্ঠন-গুলি এমন সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত, এরূপ সুদৃশ্য চিত্রশোভিত যে মন বিমোহিত হইয়া যায়। ঐগুলি চীনেলণ্ঠন নামে খ্যাত। চীনেদের মত পরিশ্রমী শিল্পী আসিয়াখণ্ডের কুত্রাপি দেখা যায় না।

শ্রীআশুতোষ রায়।

মিলন

যা' কিছু ভুবনে নিরখি সকলি
মিলনের কথা প্রকাশে—
কুসুম গন্ধ মিশিছে সমীরে
পবন মিশিছে আকাশে।

তটিনী ছুটিয়া লুটিছে সাগরে
ভক্তি হরির চরণে,
আলোক ফুটিয়া মিশিছে আঁধারে
জীবন মিশিছে মরণে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মক্কায় তীর্থযাত্রী

আরবদেশে মক্কা একটী সুপ্রসিদ্ধ সহর। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের নিকট যে ইহা এক মহা পবিত্র স্থান তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। হিন্দুদিগের নিকট কাশী, গয়া প্রভৃতি যেমন তীর্থস্থান—মক্কাও সেইরূপ মুসলমানদিগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ। জীবনের মধ্যে অন্তত একটী বারও এই তীর্থ দর্শন মুসলমানের নিকট সকল পাপ হইতে মুক্তির এবং স্বর্গ লাভের প্রধান সোপান। এই জন্যই বহু দূর দেশ হইতেও যাত্রীগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। পথে মৃত্যু বরং শ্রেয় তথাপি মক্কা যাওয়া চাই, কারণ সে মৃত্যুও স্বর্গ দ্বারের সন্নিকটে পৌছাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমানগণেরই এ বিষয়ে সমধিক উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রাকালে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা প্রায়ই রাখে না।

জেড্ডা আরবসমুদ্রের একটী বন্দর। যাত্রীগণ প্রথমতঃ এই স্থানে আসিয়া মিলিত হয়। এই স্থান হইতে পরে সকলে একযোগে, উৎসব স্থলে যাত্রা করে। এখানকার উৎসবের নাম 'হাজ'। যে সকল যাত্রী উৎসবের দুই চারি দিবস পরে আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহারা আগামী বৎসরের 'হাজে'র জন্য সম্পূর্ণ একটী বৎসর এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

এই সকল তীর্থযাত্রীগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সম্পূর্ণ নিরীহ আবার কতগুলি নিষ্ঠুর অত্যাচারী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষ, পারস্য, মালয় প্রদেশ, আরব প্রদেশ, তুরস্ক প্রদেশ, ঈজিপ্ট, রুষ সাম্রাজ্য, টিউনিস্, ত্রিপলী, মরক্কো, য়্যালজিরীয়া প্রভৃতি প্রদেশ হইতে সমাগত। প্রায় সকল প্রদেশের যাত্রীগণই আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসে কিন্তু নিরীহ ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণই সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, কারণ আইনঅনুসারে তাহারা সম্পূর্ণ উপায়হীন।

জেড্ডা হইতেই যাত্রীগণের কষ্টের প্রারম্ভ। প্রথমতঃ ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় বোটবাহীগণ অসম্ভব ভাড়া চাহিয়া থাকে—উপায় নাই দিতেই হইবে, তাহারা আবার অনেক সময়ে সুবিধা পাইলে লুণ্ঠনাদি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও আবার মহাজন, বেদৌন (অনেকটা আমাদের দেশের পাণ্ডাদিগের ন্যায়) প্রভৃতিও আছে। এই বেদৌনগণ উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি সহযোগে যাত্রীগণকে মক্কায় লইয়া যায়।

'হাজ' আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে প্রায় দ্বিসহস্র উষ্ট্র জেড্ডা হইতে মক্কা পর্য্যন্ত প্রত্যহ যাতায়াত করে। প্রায় সন্ধ্যার প্রারম্ভেই যাত্রা আরম্ভ হইয়া থাকে। এবং রজনীর অন্ধকারে উক্ত বেদৌনগণ নিরীহ যাত্রীগণকে আক্রমণ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়—প্রয়োজন হইলে প্রাণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই হয় ত মনে হইতে পারে এমন প্রসিদ্ধ স্থানে রেলওয়ের বন্দবস্ত নাই কেন?

এ কথার উত্তর—আরবগণ এ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। এক সময়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে একবার চেষ্টা করাও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই—উপরন্তু কয়েকজন বিদেশীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। এখানকার বেদৌনগণই ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক।

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ধর্ম্মযাজকগণ যে দিন চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করিবেন সেই দিন হইতেই 'হাজে'র আরম্ভ। এই জন্য কোন কোন বৎসর 'হাজ' এপ্রিল মাসেও হইয়া থাকে কোন কোন বৎসর মার্চ্চ মাসেও হইয়া থাকে।

মক্কার হারামের মস্‌জিদ এবং কাব্বা প্রাসাদ প্রসিদ্ধ। প্রায় সমুদয় মুসলমান প্রার্থনাকালে এই প্রাসাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রাসাদটী কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং মাঝে মাঝে স্বর্ণের কারুকার্য্য খচিত। ইহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক খানি কার্পেট পাতা। প্রতি বৎসরই এক-খানি করিয়া নূতন কার্পেট ঈজিপ্ট হইতে আনীত হয় এবং মেলাশেষে এই খানি বহু সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যাত্রীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া বিধি। 'হাজে'র পূর্ব্বে যাত্রীগণকে একখানি শুভ্র বস্ত্র খণ্ড পরিধান পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। পাদুকা ব্যবহারেরও নিয়ম নাই।

মক্কা সহরটী বেশ মনোরম। জেড্ডা হইতে প্রায় পঞ্চাশ (৫০) মাইল ব্যবধান। অনেকগুলি বৃহৎ অট্টালিকাও আছে। কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নহে। জল কষ্টই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ এই মেলার সময় নানা প্রকার রোগেরও সূত্রপাত হইয়া থাকে।

'হাজে'র প্রথম দিবস মস্‌জিদ এবং কাব্বা

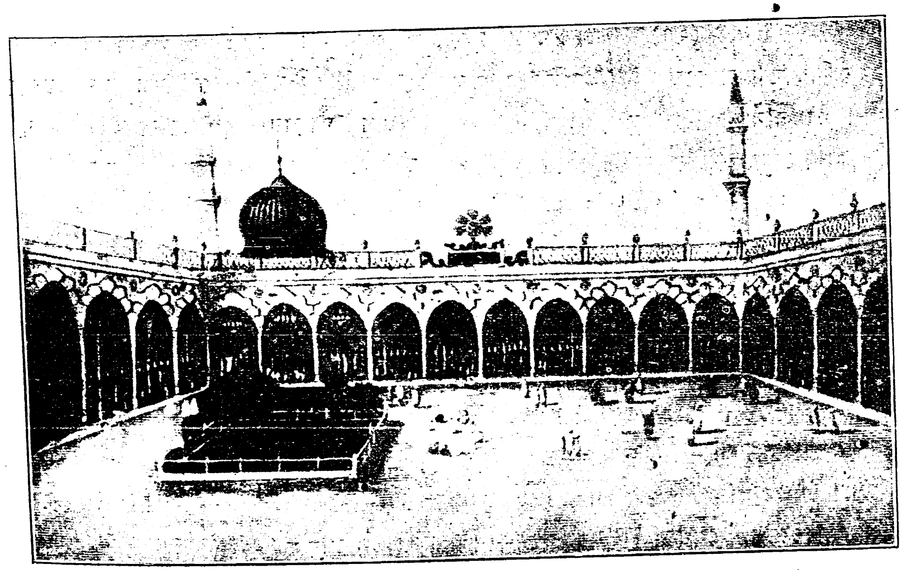

মহম্মদের কবর—মদিনা

প্রাস'দ দর্শন ও ভগবানের প্রার্থনায় অতিবাহিত হইয়া থাকে। তৎপরে যাত্রিগণ হজর-এল-ইসাত দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা পবিত্র হন। পরে পুনরায় মস্‌জিদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সে দিনের রজনীও প্রার্থনায় অতিবাহিত হয়। পর দিবস সমুদয় যাত্রিগণ একযোগে মুনা উপত্যকা অভিমুখে যাত্রা করেন। আরাফত (Arafat) পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ইহারা দেবতার উদ্দেশে মেষ বা ছাগ হত্যা করিয়া এই স্থান হইতে মুনা উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। এই ভোজের নাম—কোর্বাণ বৈরাম। এখানে একটী গৃহ আছে। তাহারা বলে এটি সয়তানের আবাস। প্রত্যেক যাত্রী কতকগুলি নুড়ি পাথর প্রভৃতি 'সয়তানের গৃহে নিক্ষেপ করিতে থাকেন,—উদ্দেশ্য সয়তানকে ভয় দেখান—এমন ভোজের মাঝখানে সে যেন আসিয়া সকল পণ্ড না করে। এই স্থানেই উৎসবের শেষ। ইহার পর যাত্রিগণ জেড্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে যার গৃহাভিমুখে গমন করেন।

মক্কার সন্নিকটেই মেদিনা সহর। মেদিনায় মহম্মদের সমাধিক্ষেত্র আছে অনেক যাত্রী এই সমাধিক্ষেত্র দেখিতে যান। আমরা এস্থলে ইহার একখানি চিত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীগুরুদাস আদক।

বাগ্‌দত্তা

(২৭)

কলিকাতায় সত্যকে লইয়া থাকিবার জন্য মনীশ যে বাসাবাড়ীটা ভাড়া করিয়াছিল তাহার নীচের তলার ঘর কয়টা দিনে পাড়ার দরিদ্র বালকগণের পাঠশালা ও রাত্রে নৈশ বিদ্যালয় রূপে ব্যবহৃত হইত। পাঠ্য পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং সংস্কৃত নীতিশ্লোক হইতে সরল বঙ্গানুবাদ—হস্তলিখিত একখানি চটি বই। এ শিক্ষালয়ে বালির কাগজ ও খাকের কলমের সর্ব্বদা প্রয়োজন। একখানি ছুরি হাতে মনীশ হাসিমুখে মুখভাঙ্গা কলম কাটিয়া ছাত্রদলকে যোগান দিতেছে, লেখার ঘটায় ক্ষণেক্ষণে লেখনী সমরক্ষেত্রে ব্যবহৃত তরবারিবৎ বিগতশীর্ষ হইয়া পুনশ্চ তাহার হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। পাঠকলরব পাশের কামারের দোকানে লোহা পেটানর শব্দ ছাড়াইয়া উঠিয়া পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, কিন্তু এই অশুদ্ধ অস্পষ্টউচ্চারিত শব্দলহরী শিক্ষক মনীশের চিত্তে বিশুদ্ধ আনন্দরসের সঞ্চার করিত। দেশের শ্রমজীবীদলই দেশের আশা,—কৃষিকার্য্যে, শিল্পোৎপাদনে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়ে তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি; ইহাই মনীশের ধারণা।—মনীশ যেখানেই থাকুক, একথা সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু দেশকে যতই সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল তাহার অন্তরের মধ্যে ততই একটা গভীর বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল,

একটা যন্ত্রণার নিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া কেবলই চলিতেছিল "হায়, হায় এ কি হইয়াছে! আরও কি হইবে?"

কিন্তু তাই বলিয়াই কি মনীশ পৃথিবীর অপর কোন ছোট বড় চিন্তা বা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল? কিছু না। জগতের বড় বড় মনীষীরা বিশ্বরহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্যে যে মস্তিষ্ক চালনা করেন ক্ষুদ্র শিশুর চিত্ত-হর ক্রীড়া কৌশল আবিষ্কারেও সে মস্তক বাধা প্রাপ্ত হয় না। মনীশ চিন্তা ও কল্পনায় অনেক বড় বিষয়ে চিত্ত নিযুক্ত রাখিলেও সেখানে আর কিছুর প্রবেশাধিকার না ছিল এমন নয়। স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রীতি, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা, আত্মীয় জনের প্রতি প্রত্যাকর্ষণ প্রভৃতি কর্ত্তব্যে দৃঢ়তার সহিত মানব চরিত্রে আর একটা যে মানবীয় ভাবের স্ফুরণ স্বাভাবিক মনীশের মধ্যে সেই শক্তিটাও ক্রমে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী জড় চেতন সমুদয়ের উপরেই সে যখন একটা প্রীতি একটা প্রেম অনুভব করিতেছিল তখন তাহাদের মাঝখানে যে নিতান্তই তাহার আপন—"জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যাহার জীবন তাহার সহিত সংযুক্ত"—সেই কমলাকে বাদ দিলেই বা চলিবে কেন? দেশকে, কাকাকে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সে তাহার জীবনের আদর্শ করিয়াছিল, কিন্তু কমলা ও সত্য তাহার জীবনের কেন্দ্র। দিবসে কর্ম্মের কলরোলে যদি বা সে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকে কিন্তু রজনীর বিশ্রামমুহূর্ত্তে জলন্ত চিতাবহ্নির লোহিত আলোকে সৈকতশয়ানা কমলার সকরুণ মুখচ্ছবি তাহার জাগরিত নেত্রে এবং সুপ্ত চিত্তে অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠিতে কোন বাধা পাইত না।

আবার এক দিনের কথা! সেই অস্তগামী তপনের সম্মোহন গোধূলি আলোকে স্নাত কুমারীমূর্ত্তি! মনীশের সারাপ্রাণ পুলকে শিহরিয়া উঠে, সেই কমলা, সেই সন্ধ্যাতারকা আজ তাহার জীবনের ধ্রুবতারা—সে তাহার।

মনীশ কবি নয়, তাহার আশাস্বপ্নে মরক্কোমণ্ডিত খাতার পৃষ্ঠা পূর্ণ হয় না, তাই তাহার সবটুকুভাব তাহারই শান্তহৃদয়ের নিভৃত নিরালয়ে গোপনে অথচ তাহাদের পরিপূর্ণ শোভাগৌরবে নীরবে মধ্য রজনীর সুগন্ধ কুসুমের মত বিকশিত হইয়া থাকে। একটু অবকাশ পাইলেই সে একা বসিয়া নিজেই তাহার গন্ধাঘ্রাণ করে, চয়ন করিয়া মালা গাঁথে, তোড়া বাঁধে, এ গোপন আনন্দে তাহার অংশীদার কেহই ছিল না, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার আশ, তাহার কল্পনা সোনার জলের অক্ষরে ছাপাইয়া সে যেন তাহার বুক সেল্‌ফে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; অপরের হস্তস্পর্শে সে খাতার নূতন মলাট মলিন করিতে দেয় নাই।

মনীশ কল্পনা করিত একটা গ্রহের চারি দিকে যেমন কয়েকটা উপগ্রহ অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায় তেমনি তাহার খুড়া ও খুড়িমাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সুখে দুঃখে লাভে লোকসানে বিশ্রামে উদ্দীপনায় কর্ম্মে অবসরে সে ও কমলা নিজেদের উৎসর্গ করিয়া রাখিবে এবং দিবস ও রজনীর মাঝখানে মধুর সন্ধ্যার ন্যায় তাহাদের মাঝখানে তাহার লক্ষ্মণ ভাইটি চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এ সুখ বাধাহীন বিঘ্নবিরোধবিহীন এবং বিচ্ছেদশূন্য,

এ জীবন নিশার স্বপন নয়, সত্য ও উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সফল।

মনীশ এখানে একজন সহকর্ম্মী ও সঙ্গী পাইয়াছিল সেই ছেলেটির নাম ইন্দুভূষণ। ইন্দু গরীবের ছেলে কষ্টেসৃষ্টে একটি মেসের একতালা ঘরে বাসা লইয়া পড়িতেছে; বয়সে মনীশের অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও দুজনে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সকালে নিজের পড়া শুনা থাকে, রাত্রে নৈশ-শিক্ষায় ইন্দুভূষণ মনীশের সহকারী হয়। এক একটা ছুটির দিনে সে আসিয়া মনীশকে তাহার গৃহকোটর হইতে টানিয়া বাহির করিত, সত্য এই একমাত্র কারণেই শুধু ইন্দুদা'র উপর অসাধারণ সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন শিবপুর বটানিকেল গার্ডেনে ছেলেদের চড়িভাতি উপলক্ষে ইন্দুর মারফতে মনীশের পুরাতন সহাধ্যায়ীর দল হইতে নিমন্ত্রণ আসিল।

স্বভাবের অনুকরণে মানবহস্ত গঠিত সুবৃহৎ উদ্যান তখন প্রসন্ন সূর্য্যকিরণে অতুল শ্রী ধারণ করিয়াছে। ডেলি-পেসেঞ্জারির হাত এড়াইয়া পাখীগুলা কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দ কলরবে ঘুরিতেছিল, তালকুঞ্জের শান্তিভঙ্গ করিয়া একসঙ্গে কতকগুলি তরুণ কণ্ঠের তরলহাস্য নিশ্চিন্ত কাননদেবতাকে চকিত করিয়া তুলিল এবং সেই শব্দে কমলদাম কাঁপাইয়া সন্তরণশীল রাজহংস দুইটি ত্রস্তে গভীর জলে পলাইয়া গেল।

শ্যামল শষ্পাসনে বসিয়া পড়িয়া দুচারিটী বন্ধুতে একটি অজানিত গাছের পরিচয় লইয়া তুমুল তর্ক পাকাইয়া তুলিল, একটি দল রন্ধনের জন্য সহস্র শাখা প্রসারিত প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষতলে সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ইহাদের মধ্যে ভাবপ্রিয় বন্ধু কয়টি মিলিয়া না তর্কে না কর্ম্মে যোগ দিয়া কেহ নির্জ্জন প্রকৃতির অতুলনীয় শোভা সম্পদ উপভোগ করিতে লাগিলেন কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"মলয় বাতে সুপ্রভাতে তারেই পড়ে মনে
সে যে মিশে আছে ফুলের বাসে
জেগে আছে পাখির গানে!"

নলিনাক্ষ নীরব মনীশকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি শচীর "ক্ষণিকের দেখা" পেয়েছ?" "আমি, না আমি তো পাইনি, ছাপা শেষ হয়ে গ্যাছে না কি?"

"সে কি তুমি জানো না! কাগজে কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে দেখ নি?" চমৎকার বই হয়েচে, কবি ত আমাদের কবি!"

মনীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল "আমি কোন মাসিক নিইনে তাই দেখিনি।

"মাসিক নাওনা! মাসিকপত্রগুলো পড়া ভাল অনেক বিষয় জানা শোনা যায়, নিও দুএকখানা। মোর্দ্দা বাজে কাগজগুলো নিয়ে বসো না, বেছে গ্রাহক হয়ো। যাক্,—এখন শচী যে তোমায় বই পাঠালে না এর মানে কি? চিঠি পত্র লেখে তো?" এবার নৈহাটী ষ্টেশনে বিদায়ের পর শচীকান্ত তাহাকে একখানাও পত্র লেখে নাই, মনীশ ক্রমান্বয়ে তাহাকে তিনখানা পত্র লিখিয়া এখন পর্য্যন্ত উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে। সে বন্ধুর ব্যবহারে একটু আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু এভাব প্রকাশ না করিয়া কথাটা

ঘুরাইয়া লইল "বইখানা বেশ ভাল হয়েচে, না?"

"চমৎকার!"

দেখিতে দেখিতে আরও দুএকটি দল আসিয়া সংযুক্ত হইল। অমল লৌহবেঞ্চ অধিকার করিয়া বেহালা বাজাইয়া গান ধরিল।

বেহালাবাদকের সঙ্গীত মাধুর্য্যভাবে কম্পিত বিকম্পিত হইয়া উঠিল, মনীশ তন্ময়-চিত্তে শুনিতে শুনিতে মুখ নত করিয়া জলের উপর রাজহংসের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। বেহালাটার তালে তালে পুলকের এক টানা স্রোত তাহার হৃদয় তটের উপরে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া ব্রীড়াবনতমুখী নববধূর মত তাহাকে রাঙ্গাইয়া তুলিতে লাগিল, তাহার মানসনেত্রে তখন অপরাহ্নের স্বর্ণরেণুমণ্ডিত নম্রমুখী তরুণীর মধুর মূর্ত্তি সলিলোত্থিতা কমলার মত অতর্কিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভাগ্যে আজ বন্ধু শচীকান্ত এখানে উপস্থিত নাই, সে এখনই হয়ত তাহাকে ধরিয়া ফেলিত!

* * *

সেদিনের হাস্যামোদঅবসানে সুখ-স্বপ্নাভিভূত শিশুর মত মৃদু হাসি অধরে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই সত্য কহিল, "এই যে একটা চিঠি এসেছে দেখচি, তোমার চিঠি বাবার লেখা,—দেখতো আমাদের বড়দিনের ছুটীতে যেতে বলেছেন কি না?" মনীশ খামটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাসিয়া ফেলিল "তোর কেবল বাড়ী যাবার ভাবনা, তবু তো দলের সেরা সঙ্গীটি সেখানে নেই।" দলের সেরাটি হইতেছেন গৌরী, তাহার আকস্মিক প্রস্থানে সত্য বিশেষ খুসী হয় নাই, বরং ইহা যে তাহার পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে এই যুক্তির উপরে সে তাহার প্রতি মনের মধ্যে দুর্জ্জয় একটা অভিমান পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভ্রূভঙ্গে তাই তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়া কহিল, "ওঃ, সে না থাকলেই বা, আমার তো তাতে ভারি বয়েই গেল! বৌদি তো আছে।"

মনীশ চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া সস্নেহনেত্রে ভাইএর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসিটুকু হাসিল "এখানে আমিওতো আছি, আমার চেয়ে বুঝি তোর—যে সে একজন বেশি হলো?"

"ওকি দাদা! বৌদি বুঝি যে সে?" সত্যর স্বর তিরস্কারপূর্ণ। দাদা যেন এই গঞ্জনাটুকুই শুনিতে চাহিতেছিলেন, তৃপ্তচিত্তে সকৌতুকে হাসিয়া তিনি পত্রপাঠে মন দিলেন।

এ কি সংবাদ! কাকা লিখিয়াছেন "ছুটী হইলেই দুজনে চলিয়া আসিও! ভ্রাতৃবিয়োগে তোমার খুড়িমা একেই অত্যন্ত কাতর, তাহার উপরে সম্পূর্ণ একা,—বিশেষতঃ কমলার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন এসময় তোমাদের কাছে পাইলে আমরা একটু শান্তি পাই।—" "কমলার জন্য ব্যাকুল! সম্পূর্ণ একা!" কি অর্থ ইহার,—অর্থ কি? অপঠিত অংশে হয়ত এ ঘোর সমস্যার পূরণ হইতে পারে, কিন্তু পড়িতে যে আর সাহস হয় না, কমলা কি তবে ঋষিশাপ-ভ্রষ্টা কমলার মত অতল সমুদ্রের তলদেশে অকস্মাৎ লুকাইয়াছে! সে কি নাই!

(২৮)

শচীকান্ত যখন রত্নপুকুরে ফিরিয়া আসিল গিরিজাসুন্দরী ও কল্যাণী উভয়েই অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিলেন। কয়লার চুল্লী হইতে সদ্য উঠিয়া আসিলে মানুষের যেমন ঝলসান চেহারা হওয়া সম্ভব তাহাকে ঠিক তেমনই দেখাইতেছিল তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গম্ভীর মুখে কহিল "অসুখ করেছিল"।

মাসি কহিলেন "মরে যাইরে, শরীরটা একেবারে কিছু না! একটু অনিয়ম হলেই রাংয়ের মত গলে যায়! যেন ডাইনে চুষে খেয়েছে!" বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও গ্রামের কবিরাজ আসিয়া শিরঃপীড়ার জন্য "ভৃঙ্গরাজ" তৈল ব্যবস্থা করিয়া গেল, "পোষ্টাই" হইবে বলিয়া গৃহিণী দুমোড়া "রসসিন্দূর মকরধ্বজ" কাঁচা দুগ্ধের সহিত প্রাতে সন্ধ্যায় সহস্তে মাড়িয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। শচীকান্ত বিশেষ জোর আপত্তি তুলিল না, অকস্মাৎ একটা ভয়ানক আঘাত লাগিলে মানুষ অনেক সময় যেন কি এক প্রকার উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায় সে যেন সেইরূপ বিহ্বলপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। এ আকস্মিক আঘাত স্বপ্নেরও অগোচর।

গিরিজাসুন্দরী কয়দিন ছেলের অসুখ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন রোগ সারিলেও তাহার মুখের উপর একটা আরোগ্যবিহীন ক্লান্তির ঘনছায়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা লইয়া বিস্তৃতই হইতে থাকিল তখন হঠাৎ একদিন খপ্ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে এ অসুখটার মূল শরীরের মধ্যে হয়ত না-ও থাকিতে পারে। এক দিন সুযোগ মত তাহার হতাশার কালিমাব্যাপ্ত ললাটে হস্ত বুলাইয়া গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন "এমন হয়ে যাচ্চিস্ কেন বল্‌তো শচী? কি ভাবিস? মনে একটু সুখ নেই কেন?"

মানুষের মন যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে নূতন আর কোন সুখ দুঃখ বা সহানুভূতির ভর সহিতে সক্ষম হয় না, মাসিমার আদরে তাই অকস্মাৎ তাহার ব্যথিতচিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়া দুই চোখের কোলে জল দেখা দিল, দৃষ্টি নত করিয়া গাঢ় স্বরে সে কহিল "কি ভাববো মাসিমা?"

"তাইত বলচি তোর ভাবনা কি? আমি যতদিন আছি তুই নিশ্চিন্ত থাক্ আমার যা কিছু আছে ভোগ করে দেবো।" শচীকান্ত গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এ আশ্বাস আজ আর তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, সাংসারিক লাভ লোকসান আজ তাহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর একদিন অসময়ে গিরিজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ছোট বউএর বাপ ব'লে পাঠিয়েছেন যে পাত্রটি বসীর জন্য ঠিক করে-ছিলেন সেটি বে-হাত হয়ে গ্যাছে। তোর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর ইচ্ছা, কি বলিস্?" শচীকান্ত কোন কথা বলিল না, সে কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, যে আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে তাহারই স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া কাঁদা ভাল, কিম্বা হাহাকার রুদ্ধ করিয়া নবীন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত? একজন তাহার কর-তলগত এবং অপরজন অতল জলতলে স্খলিত। কিন্তু মন তথাপি সেই প্রার্থিত দুর্ল্লভেরই জন্য ব্যাকুল! আজ বাসন্তী বালিকার নির্ম্মল জীবনকে বিষদিগ্ধ করিবার কোন অধিকার তাহার আছে? তাহাকে নীরব দেখিয়া গিরিজা প্রসন্নমুখে গিয়া কন্যাকে কহিলেন "তোরই কথা সত্যরে! বসীকে বিয়ে করতে শচীর অমত নেই।"

শচীকান্ত মাসিমার মনের কথা বুঝিতে পারিল না, সে গভীর চিন্তায় আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তেমনই অর্থহীন, আশাহীন, নিরানন্দ চিন্তাস্রোতে ভাসিতে লাগিল অকূলের তীরে পারের যাত্রীর মত হতাশ্বাসে তাহার প্রাণটা ক্রমাগত লুটাইয়া পড়িতেছিল, কেবলই মর্ম্মভেদী স্বরে বলিতে ছিল, তাহাকে আর না দেখিতাম সে সহ্য হইত এ অসহ্য, অসহ্য! আজ এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ কি বজ্রাঘাত! সেদিন সেই তরুণী তাহার এই অলস চিত্তবীণার তারে তারে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল আজও তাহার ললিত সুর স্তব্ধ হয় নাই! প্রাণ সেই যে একদিন অকস্মাৎ পূর্ণ হইবার জন্য তাহার সমুদয় আশা তৃষ্ণাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল আজও সে তৃষ্ণা তেমনি প্রবল, কবি কুঞ্জে সঙ্গীতের সুরে, পুষ্পবাসে, পত্রমর্ম্মরে, এবং জীবন নিকুঞ্জে একমাত্র সুখ শান্তিরূপে সে যে সদা জাগিয়া আছে। কিন্তু মৃত্যু আসন্ন হইলে হাত পায়ের তলাগুলা যেমন প্রথম ঠাণ্ডা হইয়া আসে, কিন্তু শরীরের মধ্য ভাগটাতে তখনও নাড়ীর সঞ্চারে প্রাণের স্পন্দন বুঝিতে পারা যায়, এই সুগভীর হতাশার মধ্যেও তেমনি বিন্দুমাত্র সংশয়পূর্ণ আশা শচীকান্তের বক্ষকে ঘনঘন স্পন্দিত করিতে-ছিল। মনীশ সহর্ষ লজ্জায় অস্ফুটকণ্ঠে যাহাকে তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ বলিয়া উল্লেখ করিল বহু পূর্ব্বেই যে শচীকান্তের সহিত তাহার বাক্‌দান হইয়া গিয়াছে একথা তাহারা কেহ জানে না, তাহার ধর্ম্মভীরু পিতা নিশ্চয় এ খবর পাইলে কমলাকে মনীশের পরিবর্ত্তে শচীকান্তের ভাবীবধূরূপেই অঙ্গীকার করিবেন। এই আশার উপরে নির্ভর করিয়া সে বারম্বার দ্বিধা সরাইয়া অবশেষে সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিল।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

বহুদিবস আপনার সংবাদাদি প্রাপ্ত না হইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি, এখানের সমস্ত মঙ্গল। আপনার নিকট একটি বিশেষ নিবেদন আছে; এই পত্রখানি পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ হইবে যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহা আপনি শিবুকাকার মারফৎ আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। যে অনাথা বালিকা শিবুকাকার বাড়ীতে আশ্রিতারূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং এক মাত্র অভিভাবক নিখিলনাথ বাবু তাহার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আপনার আদেশ আনিতে আমাকে অনুরোধ করেন, আপনার আদেশ পাইলে তিনি ঐ কন্যাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেন না আমার সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়। আপনার লিখিত আদেশ লইয়া ফিরিয়া দেখিলাম আকস্মিক বসন্ত রোগে নিখিলনাথ মারা গিয়াছেন—কমলা ও তাহার পিতামহী কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে না।

সে পর্য্যন্ত বহুস্থানে তাহাদের সন্ধান করিয়াছি সন্ধান পাই নাই। শাস্ত্রানুসারে

প্রাপ্তবয়স্কা বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিণীতা রূপেই গণ্যা হয়, যাহাকে মনীশের বাক্‌দত্তা বলা হইতেছে সে পূর্ব্ব হইতেই উৎসর্গিতা, আশা করি আপনি এ বিষয়ে অনুধাবন করিয়া যথোচিত মীমাংসা করিবেন। মনীশ আমার আবাল্যবন্ধু কিন্তু ধর্ম্ম তাহাপেক্ষাও বড়। আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।

বশম্বদ শচী।

পত্রখানা সহস্তে রেজিষ্ট্রী করিয়া আসিয়া সে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল, মন যখন নানা ছুতায় খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠে সে তাহাকে ধমক দিয়া বলে এতই কি ভয়! লোকে বলে তিনি ন্যায়বান, ন্যায় বিচার করিবেন না? মনীশ হয় ত দুঃখিত হইবে, কিন্তু সেই মনীশ সেই নারীদ্বেষী শঙ্করাচার্য্য, তাহার ইহাতে সুখ দুঃখ কি? হয় ত এ বোঝা নামাইতে পাইলে সে তাহাকে আশীর্ব্বাদই করিবে।

গিরিজা ও কল্যাণী দেখিল এতদিন পরে শচীকান্তের মুখের ক্লিষ্টভাবটা যেন অনেক খানি কমিয়া গিয়াছে। উভয়েই প্রসন্নচিত্তে ভাবিল, খেয়াল বাস্তবের নিকট চির পরাস্ত হইয়া থাকে, বাসন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শচীকান্ত গভীর অনুশোচনা ভোগ করিতেছিল, এতদিনে তাহা দূর হইল।

সেদিন চন্দ্রগ্রহণ। গোযানপূর্ণ ভোজ্যাদি নদীতীরে চালান দিয়া গৃহিণী বাড়ীর প্রাচীনা আত্মীয়ার সঙ্গে ছপ্পর ঘেরা দ্বিতীয় যানে স্নান দানাদি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যাত্রাকালে কল্যাণীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন "ওরে তোরা এই বেলা খেয়ে দেয়ে নে না, কখন গ্রহণ লেগে যাবে খাওয়া হবে না শেষে।" শচীকান্ত নিজের ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, কল্যাণী গিয়া ডাকিল "ছোড়্‌দা"

"কিরে?" "খাবে এসো গ্রহণ লাগবে কোন সময়।" শচী মুখ তুলিল "লাগবে লাগবেই তারজন্য এখনি খেতে গেলাম কেন।" কল্যাণী বিস্মিত স্বরে কহিয়া উঠিল "ওমা গ্রহণের সময় বুঝি খেতে আছে! গ্রহণী রোগ হয় যে!" "কারু হতে দেখেছিস্?" কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল "কেউ খায় যে হবে! খেলে তবেনা হতো, এসো এসো গ্রহণ পাওয়া খাবারে পাপ স্পর্শ করবে। সব ফেলা যাবে আবার"। শচীকান্ত আজ কয়দিন পরে একটু লঘুচিত্ত হইয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের লোভ ছাড়িতে পারিল না, হাসিয়া কহিল "পাপ লাগবে! আকাশের চাঁদে লাগবে গ্রহণ আর মর্ত্ত্যবাসী বেচারা আমাদের খাবার গুলিতে লাগবে পাপ, কোন অপরাধে?"

কল্যাণী এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মুখ চুণ করিয়া বলিল "কি জানি ভাই সবাই এই কথা বলে তো, রাহু চাঁদকে খেয়ে ফেলে কিনা, সেই জন্যে"।

"খেয়ে ফেলে না তোর মুণ্ডু করে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লেই চন্দ্রগ্রহণ হয়।" এই সময় গিরিজাসুন্দরী তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া ডাকিতে আসিতেছিলেন, শচীকান্তের কথা গুলা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, অবিশ্বাসে মৃদু হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন "তোদের যত গাঁজাখুরি কথা, চিরকাল ধরে রাহু চাঁদকে গিলে ফেলে শুনে এলুম, চোখে দেখে এলুম—এখন হলো "পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ে"! অবাক্ করলি! যা

যা এখন খেতে যা, দেরি হয়ে যাচ্চে আমি চল্লুম।"

আহারে বসিয়া কল্যাণী বলিল "গ্রহণের সাতদিন কেটে গেলে পাকা দেখা করে এই বার বিয়ের দিন ঠিক হবে। ২৮শে অঘ্রাণেই আমার ইচ্ছে বিয়েটা হয়ে যায়, সে বেশ হবে এদিকে পৌষমাস পড়ে যাবে আমাকেও আর শীঘ্র যেতে হবে না।"

শচীকান্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল "কার বিয়ে?"

"কিছু যেন জাননা? তোমার।"

"আমার বিয়ে?" কার সঙ্গে বিয়ে, সে কি?" শচীকান্ত হস্তস্থিত অন্নগ্রাস পাত্রে নামাইয়া রাখিল। কল্যাণী ঈষৎ রাগ করিয়া বলিল "কি যে বলো! কার সঙ্গে? বাসন্তীর সঙ্গে। তোমার বিয়ের মত আছে মাকে বলনি?"

"আমি! না, কোনদিন না, কে বল্লে আমি বলেছি?"

কল্যাণী ভ্রাতার উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত ধীরে ধীরে উত্তর করিল "তবে বোধ হয় মার বুঝবার ভুল, বাসন্তীকে বিয়ে করবে না তা হলে?"

শচীকান্ত পরিত্যক্ত আহার্য্য পুনঃগ্রহণ করিয়া কহিল "না কোন মতে না, অসম্ভব।" ক্ষুণ্ণা কল্যাণী কিছু না বলিয়া যথাকার্য্য সম্পন্ন করণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইল। শচীকান্ত একটু ভাবিয়া পুনশ্চ কহিল "কেন জানিস? আমি তার সন্ধান পেয়েছি।" সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কল্যাণী কহিয়া উঠিল "সত্যি!"

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না, যথা সময়ে কাশীধাম হইতে পত্র আসিল; তাহাতে অন্যান্য কথাবার্ত্তার সহিত এইরূপ লিখিত ছিল—

"তোমার বুঝিবার ভুল! কমলা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মনীশেরই বাক্‌দত্তা বধূ। নিখিলনাথ তোমায় যথাশাস্ত্র বাক্‌দান করেন নাই, অতএব বন্ধুপত্নী বোধে তাহার সহিত স্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক চিত্ত হইতে ভিন্ন ভাব বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিবে। মনীশ তোমায় চিন্তার বিষয় জানিতে পারিলে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব, সে তোমার প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুর সুখে ঈর্ষা করিও না, শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মহা মুচ্যতে লোকে মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।"

হায় শাস্ত্র! হায় নীতি! হৃদয় লইয়া কোথাও বিচার নাই? পাষাণস্তূপবৎ দুর্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রবিধি সর্ব্বস্থানেই মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! যাহাকে সে শয়নে স্বপ্নে এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া ধ্যান করিয়া আসিল, মরণ মুহূর্ত্তে কে তাহাকে কাহার হাতে সঁপিয়া গিয়াছে সেই জন্য তাহার সে কেহই নয়? কি নিষ্ঠুর বিধান!

(২৯)

যেদিন গৌরী চাকদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল সেদিন দ্বিপ্রহরে সে যখন কমলার কাছে বিদায় লইতে গিয়া নির্ব্বাক বিষাদে দাঁড়াইল তখন কমলা সত্যসত্যই তাহার বিচ্ছেদের চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই মেয়েটি ভিন্ন তাহার এখানে সঙ্গিনী বলিতে কেহ ছিল না, সে যখন হাসিবার চেষ্টা করিয়া সজলনেত্রে কহিল "তোমার কিন্তু আহ্লাদ হচ্চে—না গৌরী?" তখন বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ

করিলে তাহা অকস্মাৎ যেমন জ্বলিয়া যায় তেমনই করিয়া তাহারও চিত্তাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া সে কহিল "মোটে না, একটুও না, সত্যদার সঙ্গে একবার দেখাও হলোনা, আর বোধহয় হবে না।"

গৌরী চলিয়া গেলে কমলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খিড়কি দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া আসিল। ভ্রাতৃশোকাতুরা করুণাময়ী পাশের ঘরে মাদুরের উপর শয়ন করিয়া শৈশবের স্মৃতি স্মরণে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, কমলা তাঁহাকে নিদ্রিতাবোধে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল! আজ মধ্যাহ্নে চারিদিক মধ্যরজনীর মত নিস্তব্ধ, সে ভিজাচুলের রাশি এলাইয়া দিয়া সূচিকার্য্য লইয়া সেলাই করিতে বসিল। কিন্তু আজ তেমন ভাল লাগিতেছিল না, বহুক্ষণ চেষ্টার পর একটি ছোট ফুল সমাপ্ত করিয়া সূঁচসুতা কাপড় জড় করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। আজকাল এবাড়ীর ছোটখাট কাজগুলি আপনা হইতে তাহারই হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘরটা গুছাইয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া পুনশ্চ সে সেই আমবাগানের দিকের জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, গৌরী গা ধুইতে আসিয়া এই জানালাটার নীচে হইতে তাহার সহিত কথা কহিত। সহসা তাহার বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া একটি নিশ্বাস পতিত হইল। গৌরী বাপ পেলে সব পেলে, আমার দাদা যদি এম্‌নি কোনদেশে থাকতেন!"

সে রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে চাহিল "আমার কেউ নেই, এতবড় দুর্ভাগ্য নিয়ে মানুষ জন্মায়!"

কমলার বুকখানা একটা অতর্কিত বিষাদের ভারে ভারী হইয়া উঠিল, স্নিগ্ধ কালো চোখের দৃষ্টি অশ্রুবাষ্পে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, পরাশ্রিত পরপ্রত্যাশী জীবন, সংসারের সে একটা ভারমাত্র!

কিন্তু জলে আর্দ্র জলছবির অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া যেমন তাহার মধ্য হইতে সমুজ্জ্বল বর্ণ সকল বাহির হইতে থাকে, তেমনই তাহার অশ্রুকম্পিত দুই নেত্রের দৃষ্টি রুদ্ধ করিবামাত্র পরক্ষণেই মনের মধ্যের তৃতীয় নেত্রে মনীশের তরুণমূর্ত্তি সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। কে বলে সে দুর্ভাগিনী! এই স্নেহ, এই সান্ত্বনা একি তাহার পক্ষে বিধাতার অল্প দান! দূরগত মনীশের উদ্দেশে সে তাহার কুমারী-চিত্তের সমস্ত ভক্তিভার নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসন্ন প্রীতচিত্তে করুণাময়ীর নিকট উঠিয়া গেল।

করুণাময়ী পায়ের উপর কোমলহস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, "গৌরী চলে গেল? আহা বাছা আমার সত্যদা' সত্যদা' করে খুন!"

"ওদের দুজনে বিয়ে হলে বেশ হতোনা মা? তাই দিন না!"

ক্ষীণ হাস্যের সহিত করুণাময়ী উত্তর করিলেন "তাকি হয় পাগলি, ওরা যে বারেন্দ্র।"

কমলা রাঢ়ীবারেন্দ্রের প্রভেদ বিশেষ বুঝিল না। সে কহিল "ওঁরাওতো ব্রাহ্মণ!"

"ব্রাহ্মণ হলেই কি হয়? ব্রাহ্মণেও কত ভেদ আছে, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, তার মধ্যে আবার কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয়, মেল, ওসব ঢের দেখতে হয়। এখন লোকে তত

অনেকটা কম দেখে, এই যে তোমার মামারাই দেখ না বংশজ, তোমার মাকে ওঁরা দানে দিয়েছিলেন তাই তোমাকে কুলীন ঘরে নিতে পারা গেল, যদি বেচাকেনার ঘরেই দিতেন"—কথাটা এইখানে উল্টাইয়া কহিলেন "আমাদের বিয়ের সময় দেখেছি কুলটাই আগে দেখা হত, কুলীনের ছেলের অনেকগুলো বিয়েওতো এই করে দাঁড়িয়ে গেছল, সবাই কুলীনে মেয়ে দিতে চাইত, তা মেয়ের তাতে যেমনই দশা হোক্।"

কমলা কিছু বলিল না ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিল। যাহার যেখানে ব্যথা তাহার সেইখানেই সব সময় আঘাত লাগে, করুণাময়ীর অসাবধান কথাটায় তাহার বক্ষবেদনায় একটু চাড় পড়িল, ইহারা তাহাকে কোথা হইতে তুলিয়া লইতেছেন! সে প্রতিবেশী পাঁচজনের মুখে শুনিয়াছিল কুলীনসন্তান মনীশ সুন্দরী পাত্রীর সহিত অর্থমুদ্রা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম।

কমলাকে বহুক্ষণ অবধি নীরব দেখিয়া করুণাময়ী মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাহার স্থির বিষণ্ণতা সহসা তাঁহাকে ব্যথিত করিল, উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "কদিন ভাল করে দেখতে শুনতে পারিনি মুখখানি যেন শুখিয়ে গেছে, চিরুণিখান নিয়ে আয় বাছা, মাথাটা বেঁধে দিই। ভাগ্যে তোকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম কমল, ছেলেরা তো ঘরে থাকে না, এই দুঃখকষ্ট তোকে দেখে আমার অনেকখানি নিবারণ হয়।"

পুলকিতচিত্তে কমলা আদেশপালনের জন্য উঠিয়া গেল। সে যে ইহাদের কোনকাজে লাগিতেছে ইহা শুনিলেও তাহার কুণ্ঠা কমিয়া আসে।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া কমলা তাহার অভ্যাসানুযায়ী স্নান সমাপনান্তে ভিজাচুলের প্রান্তে গ্রন্থি বাঁধিয়া হলুদরঙের চেলির সাড়িখানি পরিয়া গৃহদেবতার পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইল। পল্লীগ্রামে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ নিয়ম, কিন্তু কমলা তাহার দুই বৎসরের অভ্যাসে তাহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়াছিল, সে যখন সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া চন্দনপিঁড়ি পাড়িয়াছে এমন সময় করুণাময়ী স্নান সারিয়া ভাণ্ডার-ঘরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "কমল!" চন্দনলিপ্তহস্তে কমলা দ্বারের বাহির হইয়াছে সহসা সে শুনিতে পাইল শিবনারায়ণ বহির্বাটির দিক হইতে আসিয়া ডাকিলেন "শুনে যাও।" গৃহিণী মাথার কাপড় একটু বর্দ্ধিত করিয়া সরিয়া আসিলেন, কমলা আর অগ্রসর না হইয়া পূর্ব্বস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, শিবনারায়ণের সাক্ষাতে অপ্রয়োজনে বাহির হইতে সে একটু সঙ্কোচ অনুভব করে; শ্বশুর হইবেন তো। শিবনারায়ণ ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে কহিলেন "কি করা যায় বল দেখি? করালীচরণ বড়ই ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। সে এই ভোরে এসে উপস্থিত—বলে কমলাকে এখনি নিয়ে যাব,—না দাও তো পুলিষ এনে মেয়ে আদায় করবো।"

করুণাময়ী অকস্মাৎ বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন "বল কি?"

অন্তরালে আর একজন বিদ্যুদাঘাত প্রাপ্ত হইল। শিবনারায়ণ চিন্তিত মুখে কেশবিরল

মস্তকে অঙ্গুলী চালনা করিয়া কহিলেন, "আর বল কি? অতি ভয়ানক লোক! ত্রিবেণীতে সেদিন প্রথম যখন তাকে আমি কমলার কথা বলেছিলুম তখন সে কি রকম তাচ্ছিল্য দেখালে! কিন্তু তার পর যখন আমি তাকে কন্যা সম্প্রদানের ভার নিতে অনুরোধ করি এবং তার কোন প্রকার খরচ পত্র হবে না, শুধু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী থেকে সম্প্রদানটা করে যাবে এই কথা বুঝিয়ে দিই তখনই ও কি মতলব এঁটেছিল! একথায় বলে উঠ্‌ল 'কিন্তু জানেন তো আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ের আমরা কিছু প্রণামী পাই তা সেটা অবশ্য বিবেচনা করেছেন?' তার মানে উনি মেয়েটির অভিভাবকত্ব নিয়ে তাকে আমার কাছে বেচতে চান! স্পর্দ্ধা দেখ! আমার ভারি রাগ হয়ে গেল; বলে ফেল্লুম 'প্রণামী মনীশ তার মামাশ্বশুরকে যেমন পারবে তু দশ টাকা দেবে বই কি, কিন্তু মশায় আপনি যে প্রকার প্রণামীর প্রস্তাব করলেন কুলীন সন্তান এতে অপমানিত জ্ঞান করে'। তোমার সেই বিপদ আপদের মধ্যে আর এ সব কথা বলিনি। কথায় কথায় বেশ একটু বচসা হয়ে গেল। উনি বলেন 'তবে আমি এ বিবাহে পায়ের ধূলোও দেব না'। আমিও এতে উত্তর করি "আমরা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি বোধ করব না, ভক্তিনাথ কন্যা সম্প্রদান কর্ব্বেন, আপনাকে একবার জানান আমার কর্ত্তব্য ছিল, চুকেছে।" কিন্তু এখন দেখচি আমাদের এ কর্ত্তব্যটা নিতান্ত অপাত্রেই পালন করতে যাওয়া হয়েছিল। আজ হঠাৎ মতলব এঁটে এসে সে উপস্থিত,—বলে আইন মতে আমার ভাগিনেয়ী আমার অধীন আমি তাকে এখনি নিয়ে যাব। সে পরের বাড়ী পড়ে থাকে এতে আমার অপমান হয়।"

"এত যদি তোর সম্মান জ্ঞান—এত দিন ঘুমুচ্ছিলি না মরেছিলি।"

"এখন উপায়?" করুণাময়ীর গলা বুজিয়া গিয়াছিল।

"উপায় ভগবানের দয়া, করালীচরণের সুমতি।"

শিবনারায়ণের হৃদয়ে সহানুভূতি-করুণার কিছুই অভাব ছিল না কিন্তু ইহার সহিত তাঁহার মধ্যে আরও একটা জিনিষ ছিল তাহা বিচারকের ন্যায় কঠোরতা। অত্যাচারীর প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণায় তাঁহাকে সহজেই বিচলিত করিয়া তুলিত এবং এরূপ স্থলে তাহা ঘৃণা ক্রোধের মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আত্ম প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না। এ তেজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ইহা প্রকৃত ব্রহ্মতেজ—ভীরু অপরাধী ইহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না। যাহার প্রকৃতিতে যাহা নাই সে সেই বস্তু সহিতে অক্ষম, তাই জগতে এত ভেদ সংসারে এত দলাদলি! সে দিন কালীচরণের নির্লজ্জ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ শিবনারায়ণ ঘৃণার সহিত যখন তাহাকে প্রত্যাখান করেন তখন তাহার মধ্যে যে কতখানি তীব্রবিষ লোভের আকারে লুপ্ত রহিয়াছে তাহা তিনি ধারণাও করিতে পারেন নাই। নিজের মেয়েটিকে চল্লিশ বৎসর বয়সের একটি বাজার সরকারের হস্তে দিয়া সে চারি শত টাকামাত্র পাইয়াছে, শিবনারায়ণের মত লোকের কাছে সে সহস্রাধিক মুদ্রা আদায় না করিয়া কখনও ছাড়িতে পারে? গঞ্জিকা সেবনের আড্ডায় উপদেশকের অভাব নাই.



পুরলক্ষ্মী

মতলব ঠিক করিয়া আইন আদালত বুঝিয়া সে আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শিবনারায়ণের প্রথমকার পণ এখন অবশ্য বুঝিয়া আপনই শিথিল হইয়া আসিয়াছিল তথাপি যখন করুণাময়ী প্রস্তাব করিলেন "না হয় ও যা চায় তাই ওকে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, কি আর হবে?"

তখনও তিনি সহসা এই বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে স্বীকার পাইতে পারিতেছিলেন না, "কিছুতে না, ছোট লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি মেয়ে বিক্রির সাহায্য করবো,বলো কি?" প্রথমটা উত্তেজিত কণ্ঠে এইরূপ বলিয়াই সহসা কমলার কথা স্মরণ করিয়া স্বর নামাইয়া লইলেন। "দেখা যাক্, ভক্তির সঙ্গে পরামর্শ করি, সকল অপমানই স্বীকার করতে হবে দেখচি।" বলিতে বলিতে চিন্তাযুক্তভাবে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কমলা সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া উঠিয়াছে,স্খলিত পদে সে দ্বারের কবাটে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল সেই একটা সম্ভাবনার কথায় তাহার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল--একি তাহার কাম্য ফল? কালু সে পরের সুখে ঈর্ষা করিয়া নিজেকে যে পরাশ্রিতা বোধ করিয়াছিল, আত্মীয় খুঁজিয়াছিল, তাই কি এখানকার আশ্রয় তাহার ফুরাইল? কিন্তু তুমি তো জানো অন্তর্য্যামি! তুমি তো সবারই প্রাণের লেখা গোপনে পাঠ করিতেছ, সে লেখার অক্ষর পড়িতে তোমার তো ভ্রম হওয়া সম্ভব নয়! সামান্য মুহূর্ত্তের সেই পাপ—তাহারই এত বড় কঠোর দণ্ড বিধান তুমি কি করিতে পার? সেই জ্বলন্ত চিতালোকে মনীশের মোহন মূর্ত্তি মুগ্ধা কমলার মানস পটে উজ্জ্বল আভায় ফুটিয়া উঠিল, সে নিজেকে সে মূর্ত্তির পদপ্রান্তে সঁপিয়া দিয়া অবরুদ্ধ-বাক্ হইয়া মনে মনে বলিল "আমি তোমার পায়ে স্থান চাই, কিছুই আর চাই না।"

করুণাময়ী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই এবার সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল, করুণাময়ী নিজে কাঁদিতে ছিলেন, তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জাতি-বিরোধ

আমেরিকায় নিউইয়র্কের রচেষ্টার নগরে উদার ধর্ম্মমতবাদীদিগের কন্‌গ্রেসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঠিত প্রবন্ধের—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কৃত অনুবাদ।

জাতি-বিরোধের সমস্যা ইতিহাসে চিরদিনই বর্ত্তমান, প্রত্যেক মহা সভ্যতার মূল ভিত্তি। প্রাকৃতিক জগতে পঞ্চভূতের সংঘর্ষের ন্যায় ইহা জটিল সংমিশ্রন এবং উন্নতির ক্রমবিকাশের কারণ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আদর্শে পরিবর্দ্ধিত মানবজীবনের আঘাতে যে আদিম গতিবেগ জন্মলাভ করে তাহাই বিচিত্র মানবসমাজে পরিণত হয়।

বঙ্গীয়-সা।

প্রত্যেক সভ্যতাই বহুতরের জটিল সমাবেশ, বর্ব্বরতাই কেবলমাত্র আড়ম্বরবিহীন, পথপ্রান্তরচারী এবং অবিকৃত।

বিভিন্নতা মানিয়া লইতে হয় বলিয়াই তাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়াই, এই বিচিত্র শক্তিসমূহের মধ্য হইতে মানব এক কেন্দ্রীভূত বন্ধন আবিষ্কার করিতে বাধ্য হয়। ইহাই যথার্থ সত্যের অনুসন্ধান, বহুর মধ্যে একের, ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়া চিরন্তন এবং সনাতনের অন্বেষণ।

আরম্ভে এই চেষ্টার আকার স্বভাবতই সহজ এবং অপরিণত। এক সমাজবাসীদিগের সাধারণ ভক্তির নিদর্শন কোনও দৃশ্যবস্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়—এই মূর্ত্তি অধিকাংশ সময়ই ভয়ানক এবং কুৎসিত। মানুষ যখন বহির্বস্তুর উপর জীবনআদর্শ নির্ভর করিতে দেয় তখন তাহা যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট এবং প্রচণ্ড হওয়া আবশ্যক। আদিম মানববুদ্ধি ভয়ের সম্মুখে সর্ব্বদা স্বতই অবনত।

কিন্তু সমাজ যেমন ক্রমশঃ যুদ্ধ বিগ্রহের কিম্বা অন্য উপায়ের দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করে, যখন বিভিন্ন আদর্শের সংমিশ্রন ঘটে তখন একের পরিবর্ত্তে বহুদেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। সে অবস্থায় পূর্ব্বতন চিহ্নমূর্ত্তি সকলের প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থান এমন সকল ভাবপ্রধান প্রতিমার দ্বারা অধিকৃত হয়, যাহা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নয় যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত যোগযুক্ত।

এইরূপে সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর, ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তৃত এবং গভীরতর হইয়া পড়ে এবং মানবের স্থায়ীত্ব-বুদ্ধি তাহার স্থাপনার জন্য দৃঢ়তর এবং সুস্পষ্ট বোধগম্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে থাকে। ইহাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য—বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অভিবর্দ্ধিত বিশাল জীবন প্রসারের প্রবল প্রেরণায় বাধ্য হইয়া মানবের সত্য অন্বেষণ। এক সময় গিয়াছে যখন পরস্পরের সহিত পরিচয়ের পথ নিতান্ত সীমাবদ্ধ থাকায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানবজাতি আপনাদিগের মধ্যেই আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তখন তাহাদের সামাজিক বিধি বিধান সকল বিশেষরূপে স্থানীয় ছিল। জাতীয়তা সাতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং বিদেশীর প্রতি আক্রোশ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সদাসর্ব্বদা মেলামেশার অভাবে ভিন্ন দেশবাসীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্যক, তাহা শিক্ষা করিবার উপায় ছিল না। তাহাদিগের সহিত সংঘর্ষমাত্রেই প্রচণ্ড বিরোধের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। সুবিবেচিত কোন কাজই হইত না—হয় বিদেশীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কিম্বা তাহাকে আপনজাতির মধ্যে একান্ত অভিন্নভাবে মিলিত করিয়া লওয়া হইত। মানুষ এখনও এই জাতীয় এবং জাতিগত আত্মম্ভরিতার শিক্ষা অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহারা এখনও বহু যুগান্তের সেই বিদেশী বিরোধবুদ্ধি এবং তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা আরণ্য জীবের আদিম সংস্কারের ন্যায় দৃঢ়। আপন সমাজগণ্ডীর বাহিরে সামান্য কোনরূপ বিরক্তির কারণ হইবামাত্র এই গুপ্ত ভীষণ ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভিন্ন জাতীয়কে বিচার করিবার মত কিম্বা তাহাদিগের সহিত

শোভন ব্যবহার করিবার মতপক্ষপাতশূন্য মনোভাব এখনও অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যাহারা দূরে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে ভালমত দেখিতে হইলে মনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেভাবে ঠিক্ করিয়া লইতে হয় সে শিক্ষা এখনও হয় নাই। আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং দর্শনের শ্রেষ্ঠতা ও মৌলিকতা প্রমাণ করিতে সকলেই ব্যগ্র, এবং সত্য যে সত্যরূপেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিচ্ছদে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে সেকথা স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। আন্তরিক ঐক্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া বাহিরের অনৈক্যের কথাই তাঁহারা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে ভালবাসেন।

এই মনোভাব গৃহসীমায় আবদ্ধ বহিঃসংস্পর্শহীন সঙ্কীর্ণ শিক্ষার ফল, ইহাদ্বারা আমরা বিশ্বে প্রজাসম্মানের অযোগ্য হই। কিন্তু এমন মনোভাব লইয়া অধিক দিন সংসার চলে না, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা ভিন্ন জাতীর মানবমণ্ডলী ক্রমশ সন্নিকট হইতেছে, তাহাদিগকে জীবনইতিহাসের প্রধানতম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সেই সমস্যা জাতিগত বিরোধ ভাব।

অভিজ্ঞতার দ্বারা, মানবইতিহাসের বিস্তারের মধ্যদিয়া মীমাংসিত হইবার জন্য এই সমস্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ইহা কেবলমাত্র বুদ্ধি বিচার কিম্বা অনুভূতির বস্তু নয়। ইহার পূর্ব্বে ত ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকগণ মানবের সমানসম্মান পদবী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন—দর্শন ও সাহিত্য ত জাতিগত পুরাণ কথা এবং অভ্যাসের সীমা অতিক্রম করিয়া এই সত্যের উদার অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এই জাতি-বিরোধ সমস্যা এমন দুরূহ জটিলতার সহিত আমাদের সম্মুখে আর কখনো প্রত্যক্ষ হয় নাই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আমরা আর কখনো বসবাস করি নাই। বিশ্বমানবসমাজ এতদিন শিশু বালিকার পুতুলখেলার মত এই বিশ্ব মৈত্রীর ভাবটি লইয়া খেলা করিয়াছে মাত্র। মানবহৃদয়নিহিত সত্য অনুভূতির আভাষ দিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই। খেলার সময় আর নাই—ভাবে যাহা অপরিণত অবস্থায় ছিল, আজ তাহা জীবনের অসংখ্য অনন্ত দায়ীত্ব বহন করিয়া সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বহুকাল এই জাতিসমস্যা সুগভীররূপে পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া জাতীয় বিভিন্নতার দুরূহ জটিলতাজাল ভেদ করিয়া তাহাকে সরল করিয়া আনিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ভাগ্যবশতঃ ইউরোপকে এই জাতি বিরোধের বেগ তেমন সহ্য করিতে হয় নাই, কেন না তাহার প্রতিবাসীগণ প্রায়শই এক বংশসম্ভূত, যদিও জ্ঞাতি শত্রুতার হাত এড়াইতে পারে নাই তবু আকার ও বর্ণগত বৈসাদৃশ্যের জন্য যে বিরূপ মনোভাবের স্বতঃই সৃষ্টি হয়, তাহাকে সে সহজ বিপত্তি ভোগ করিতে হয় নাই। ইংলণ্ডে নর্ম্মাণ ও সাক্সনদিগের সম্মিলন সাধন হইতে অধিক কাল লাগে নাই। কেবল বর্ণ ও আকৃতি গত সৌসাদৃশ্য কেন বলি, ভাবের ও জীবনের আদর্শেও পাশ্চাত্য বিভিন্ন জাতির এমন ঐক্য

আছে যে, তাহারা সকলে একত্রে মিলিয়াই যেন তাহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবই দেখা গিয়াছে। গৌরবর্ণ আর্য্যগণ যখন প্রথম এ দেশে পদার্পণ করেন তখন হইতেই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ হীনবুদ্ধি আদিম বর্ব্বর জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ইহার পরে দ্রাবিড়দিগের বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম্ম,পূজা প্রণালী ও সামাজিক আচার ব্যবহার অসভ্য জাতির নিরঙ্কুশ বর্ব্বরতা অপেক্ষা একীকরণের পথে অধিকতর অন্তরায় হইয়াছিল।

শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবন যাত্রা তেমন কঠিন ও আয়াসসাধ্য নয়। জীবন রক্ষার জন্য বহুল আয়োজনের প্রয়োজন নাই:—প্রকৃতি মুক্তহস্ত, অন্নসত্র অবারিত, কাজেই বিরূপ পক্ষের শত্রুতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাই কিছু কালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহের পর ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন-ধর্ম্ম বিভিন্ন আকার বিভিন্ন-মনা জাতি সকল ভারতবর্ষে নির্ব্বিরোধে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। তবে মানুষ তো আর জড় পদার্থ নয়, জীবন্ত প্রাণবন্ত তাই এই ভিন্ন শক্তি সমূহের ঐকান্তিক নৈকট্য এখানে একাল পর্য্যন্ত কেবলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এ অবস্থার যতই অসুবিধা থাকুক না তবুও ইহা ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষীয়দিগের মন বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবলি ঐক্য অন্বেষণ করিয়াছে। মূর্ত্তি, প্রতিমা, নিদর্শন আচার অনুষ্ঠান যতই বিভিন্ন হইকনা কেন এই সকল যে, একমাত্র একের পরিকল্পনা, যিনি অদ্বিতীয় তুলনা রহিত তাঁহাকে যথার্থ ধারণা করিতে হইলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুর, প্রতি প্রাণশক্তি মধ্যে তাঁহার অখণ্ড ঐক্য সুস্পষ্ট অনুভব করিতেই হইবে।

ভিন্নতা যখন বড়ই পীড়াদায়ক মানুষ তখন তাহাকেই চরম মীমাংসা বলিয়া মানিয়া লইতে চায় না—তাই কখনো রক্ত প্রবাহে তাহা লুপ্ত, বলের দ্বারা তাহাতে এক প্রকার অগভীর বাহিরের সাম্য বিস্তার কিম্বা বহু সাধনায় অন্তরের সুগভীর ঐক্য আবিষ্কার করিয়া লয়—কেন না তাহার মন জানে তাহাই একমাত্র পরম সত্য।

ভারতবর্ষ চির দিন শেষ চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে—যুগযুগান্তের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে আন্দোলিত বিক্ষিপ্ত হইয়া গ্রীস এবং রোম যখন তাহার প্রাণশক্তি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল তখনও ভারতবর্ষ আপন আধ্যাত্মিক জীবন বল, আত্মার আত্মসম্মান ভ্রষ্ট হয় নাই। বরং নূতন শক্তি যোগে, নবীন জটিলতার তাড়নায়, পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই ভারতবর্ষের বক্ষভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিপুল অসামঞ্জস্য মধ্যে সাম্য বিধান করিবার নিয়ত চেষ্টা বর্ত্তমান থাকায় কালে কালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রসার এবং সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। বিরোধ-আঘাত এবং প্রলয়ের হাত বাঁচাইবার জন্যই সর্ব্বশেষে জাতিভেদ প্রথার দৃঢ় কঠোর প্রাচীর নির্ম্মিত হয়।

কিন্তু এমন পরিবর্জ্জন কিম্বা অস্বীকারের ভাব বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না, যন্ত্রের দ্বারা মানবসমাজের জীবন্ত মানব প্রাণ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। ঘটনাচক্রে যদি সকল মানব একত্র সম্মিলিত হয় যাহাদের জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন, বংশের আদর্শ এক নয় তবে

যতকাল পর্য্যন্ত তাহারা মিলনের এক উদার ভিত্তি আবিষ্কার করিতে না পারে যতদিন তাহাদের বন্ধনের মূলে প্রেমের রস সঞ্চার অনুভব করিতে না পারে ততদিন শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমি নিশ্চয় জানি ভারতবর্ষে আজিও সেই আধ্যাত্মিক আদর্শ এখনও বর্ত্তমান—তাহার অস্তিত্ব সুপ্ত প্রায় সন্দেহ নাই, তবুও এই আদর্শ বাহ্য বিভিন্নতা সহ্য করিয়াও অন্তরের ঐক্যের পরিচয় লইতে জানে। আমি একান্তভাবে অনুভব করিতেছি বহু প্রাচীন জ্ঞান ও প্রেমে নির্ম্মিত সেই সোনার চাবি ভারতবর্ষের অধিকারেই আছে একদিন তাহারি সাহায্যে বহু যুগান্তের অবরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইবে, আনন্দের অবারিত প্রাঙ্গণে বিচ্ছিন্ন দূরান্তরবাসী মানবভ্রাতাগণ সম্মিলিত হইয়া প্রীতির মহোৎসবে যোগদান করিবেন।

সে কোন সুদূর যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক মহাপ্রাণ ইহারি জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বুদ্ধ অমিতাভ যে মহা বিশ্বপ্রেমের অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মূলমন্ত্র তাঁহার পূর্ব্বতন যুগের ধারণা, বিচিত্র চিহ্ন সকল, বিবিধ অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য দূরীকৃত করিয়া সকলের অন্তর নিহিত একান্ত ঐক্যের আবিষ্কার চেষ্টা।

মুসলমান শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কেবল নূতন রাজনৈতিক অস্তিত্বের অবতারণা হইল না, নূতন ধর্ম্ম চিন্তা নূতন সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রবল আঘাতে দেশবাসীকে একান্ত কাতর ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। তবুও ইহার বলে হিন্দুদিগের মধ্যে কোন বিরোধী ধর্ম্মোন্মত্ততার সৃষ্টি হয় নাই বরং এই সময়ে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেই পুরাতনের সহিত নূতনের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। বহুযুগের সঞ্চিত জ্ঞান ও উদার প্রাণতার জন্যই এমন চেষ্টা সম্ভব হইয়াছিল। প্রত্যেক নব ধর্ম্মই জাতিভেদ, ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিভিন্নতা ভুলিয়া প্রত্যেক কৃত্রিম বাধা অপসারিত করিয়া দেশবাসীকে ঈশ্বরের প্রেমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য বারম্বার আহ্বান করিয়াছিল। ভারতবর্ষ আবার যখন ইংরাজ আগমনের ফলে খৃষ্টীয় সভ্যতার নিকটবর্ত্তী হইল তখনও এই ঐক্য-চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলনসাধন করাই ব্রাহ্মসমাজজীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য এবং গতিবেগ। এই সম্মিলন উপনিষদের উদার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, জাতিভেদের প্রত্যেক কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া আবার ঈশ্বরের নামে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সম্বদ্ধ হইবার আহ্বান আসিয়াছে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে ভারতবর্ষের মত এমন বহুবিধ জাতি এমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন নিয়ম অনুষ্ঠানের সমাবেশ আর দেখা যায় না। কাজেই তাহার পক্ষে জাতীয় ঐক্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া লওয়া সহজ কিম্বা সম্ভব হয় নাই। জাতীয়ত্বের দোহাই দিয়া এতগুলি বিরোধী ভাবকে শান্ত ও সম্মিলিত করিবার শক্তি তাহার নাই, মানবের শ্রেষ্ঠতম শক্তি ধর্ম্মবলের সাহায্যে, ঈশ্বরের চরণে প্রণতি করিয়াই তাহাকে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে!

ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া সমাজে জাতিভেদের কঠোর নির্ব্বাসন প্রথার বিরুদ্ধে মানবের আধ্যাত্মিক বুদ্ধির সাম্য প্রচার করিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত এখানেও

যখন সামাজিক নিয়ম জাতি-গর্ব্বিতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে তেমনি মহৎ-প্রাণ সকল শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধি এবং গভীরতর জ্ঞানের সহায়ে চিরদিনই মানব ভ্রাতার সমান ন্যায্য অধিকার এবং প্রেমের দাবী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, একদিকে যেমন বিভিন্ন জাতির একত্র পান-ভোজনের নিষেধ প্রচারিত হইয়াছে অন্য-দিকে তেমনি ঋষিদিগের পুণ্য কণ্ঠ যুগযুগান্তর ধরিয়া আদেশ করিয়া আসিয়াছেন, আপনাকে সম্যক্ জানিতে হইলে, সকলের মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই তাহা সম্ভব হইবে। এই আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমে প্রবল প্রেরণার আগ্রহে সকল বাধা অপসারিত করিয়া জয়ী হইবে, ইহাই সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিবে যে আজ যাহা বাধা স্বরূপ তাহাই একদিন সাক্ষাৎ সহায় হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখীন করিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্যা যেমনই হউক না কেন তাহা যতক্ষণ জীবন্ত জাজ্বল্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ না হয় ততদিন তাহা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমান যুগে এই জাতি-বিরোধসমস্যা সেই জীবনের আবেগে অনুপ্রাণিত! দেশের দ্বারা ইতিহাসের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন বিবিধ জাতি, যাহাদের চিন্তায় গতি এক নয়, যাহাদের প্রকাশের উপায় স্বতন্ত্র ঘটনা চক্রে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে বসবাস করিতে বাধ্য হইতেছে। প্রত্যেক মানবের নিকট বিশ্বমানবের অস্তিত্ব আজ যে বিশালতা ধারণ করিয়াছে পূর্ব্বে তাহা কেহ কখনো স্বপ্নেও ধারণ করিতে পারিত না। তবে আমরা যে এখনও এই অভিনব অবস্থার জন্য প্রস্তুত নহি প্রতিদিনই নানা দুঃখজনক ব্যাপারে তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে। জাতিগত অহমিকা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে! প্রতীচ্যবাসীগণ সগর্ব্বে পৃথিবীর অন্য সকল জাতিকে, নির্ব্বাসিত করিবার জন্য উৎসুক। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের আক্রমণ করিতে ব্যগ্র, কিন্তু আপনাদিগের গৃহদ্বারে অপরের প্রবেশ-অধিকার রোধ করিবার জন্য নিয়ত বর্ব্বর এবং নিষ্ঠুরভাবে সচেষ্ট। এমন কি বিশ্ববিখ্যাত কাব্যকারগণও দয়াধর্ম্মের সাধনা তুচ্ছ ও হীন বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পাশববলের মহিমা প্রচার করিতে ব্যস্ত। যুগান্তের জড়তা হইতে জাগরিত জাতিগণ যখন সাহসে নির্ভর করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য দণ্ডায়মান তখন তাহাদের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্যগণ আপনাদিগের স্বার্থ সাধন করিতেই উৎসাহযুক্ত। পুরাতনের ধ্বংস এবং নূতনের জন্মকালে বিশৃঙ্খলার সুযোগে আপন আপন ক্ষুদ্র লাভের চেষ্টায় প্রমত্ত! যদিও বাধা বহু এবং সুকঠিন তবুও দ্বিধাহীনচিত্তে বলিব সমস্যা-পূরণের সময় সমুপস্থিত। সভ্য জগত আজ যে এই জাতি-বিরোধ সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত তাহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। মানব যে মানবের হৃদয়ে সহানুভূতির ক্ষেত্রে নূতন জন্মলাভ করিয়াছে ইহাই বর্ত্তমানযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

আজিও তাহার বিশ্রামের জন্য সুকোমল শৈশবশয্যা রচিত হয় নাই, দারিদ্র্যের পীড়নেই

তাহার তরুণ বাল্য বাধাপ্রাপ্ত—ঐশ্বর্য্য ও পদগর্ব্বিতের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া পথপ্রান্তে আবর্জ্জনার মধ্যে তাহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাহার গৌরবের দিন, তাহার শুভ অভিষেকের কাল সুদূর নয়। এই উপেক্ষিত রাজতনয় তাঁহার কবি তাঁহার প্রচারক এবং দীন উপাসকবর্গের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাদের আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই। যখন বিশ্বমানবের কাতর আহ্বান বারম্বার ধ্বনিত হইবে তখন মানবের শ্রেষ্ঠপ্রকৃতি কখনই বধির হইয়া থাকিতে পারিবে না। ক্ষমতার উন্মাদ-তাণ্ডবে মত্ত হইয়া জাতীয় গর্ব্বের অন্ধপ্ররোচনায় যে প্রলাপই ধ্বনিত হউক না কেন, তবুও সহসা একদিন চমকিত হইয়া বুঝিতেই হইবে, আপনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবুদ্ধি ধ্বংস করার মত ভয়ানক আত্মহত্যা আর কিছুই নাই। যখন বিধিবদ্ধ জাতীয় স্বার্থ, বিজাতি-বিরোধ, বাণিজ্যলোভের হীনতা, তাহাদের নগ্ন কদর্য্যতা অবারিত করিয়া দিবে তখনি মানব বুঝিতে পারিবে বাণিজ্য-বিস্তারে রাজনৈতিক দৃঢ়তায়, সামাজিক কোন যন্ত্রবৎ সংস্কারের দ্বারা মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয় না; জীবনের গভীরতর সৌন্দর্য্য বিকাশে, প্রেমে, আত্মার স্বাধীনতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে জাগ্রৎ অনুভূতিলাভের দ্বারাই সেই পরম সৌভাগ্যলাভ হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সূর্য্যের তাপ

সূর্য্য হইতে যে তাপ চতুর্দ্দিকে বাহির হইতেছে তাহার অতি অল্পমাত্রই আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পৌছায় ও তাহারই জোরে আমাদের পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। উহারই জোরে আমি আজ বসিয়া লিখিতেছি, আপনি আফিস যাইতেছেন, সমুদ্রে জাহাজ চলিতেছে ও আমার সামনে ঐ গাছের উপর বসিয়া পাখী ডাকিতেছে। ইহারই জন্য কলিকাতায়—

"বনেদি বাবুর বাড়ী টোটাবাতী জ্বলে
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে"

অবশ্য আজকাল গ্যাস লাইটের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক আলো হইয়াছে, তাহাও ঐ তাপ টুকুর জোরে। কথাটা কতকটা হেঁয়ালীর মত শুনায়। কিন্তু তা হইলেও খুব সত্য। মনে করুন ঐ বৈদ্যুতিক আলো, উহার ঐ যে আলোরূপ শক্তিটুকু আসিতেছে কোথা হইতে? কেন! এঞ্জিন ঘরে ডায়নামো (Dynomo) ঘুরিতেছে, সেইখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। বেশ, ডায়নামো ঘুরাইতেছে কে? ষ্টীম এঞ্জিন। ষ্টীম এঞ্জিন চলিতেছে কিসের জোরে? বাষ্পের জোরে। জল হইতে বাষ্প কিরূপে হইতেছে? কেন কয়লা পোড়াইয়া তাহা হইতে যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে তাহা দ্বারা। বেশ, তা হইলে ফলে দাঁড়াইল, কয়লার জোরেই আমার বৈদ্যুতিক আলো জলিতেছে। কয়লার মধ্যে যে দাহিকা শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল সেইটাকে আমি নানা উপায়ে পরিবর্ত্তন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি করিয়া কাজে লাগাইতেছি—শক্তির

ক্ষয় নাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে, কয়লার ঐ যে দাহিকা শক্তি উহা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। কয়লা কাঠেরই রূপান্তর মাত্র। অনেক পূর্ব্বে পৃথিবীর বড় বড় অরণ্য কোনও রূপে মাটি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। মাটি চাপা পড়িবার পর কাঠগুলা ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গাছগাছড়া, তরু বৃক্ষ, অরণ্য যাহাই বলুন সূর্য্যালোক ভিন্ন কিছুই জন্মিতে পারে না। গাছের পাতায় ক্লোরোফিল (Chlorophyll) বলিয়া একটা জিনিষ সূর্য্যালোকের সাহায্যে চতুর্দ্দিকের অঙ্গারাম্ল বায়ু হইতে অঙ্গারকে ভিন্ন করিয়া গাছের খোরাক যোগায়। সূর্য্যালোক না থাকিলে একা ক্লোরোফিল কিছু করিতে পারে না। সুতরাং সূর্য্য না থাকিলে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইত না।

এ হেন যে সূর্য্য যাহার তাপ হইতে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, তাহার তাপের ভাণ্ডার যে অ-ফুরন্ত তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সূর্য্য অপব্যয়ী সন্তানের মত অনবরত নিজের তাপ চতুর্দ্দিকে বিলাইয়া দিতেছে অথচ দৃশ্যতঃ তাহার তাপের কোন হ্রাস হইতেছে না—ইহা একটা সমস্যা বটে। একটা বড় লোহায় গোলা ও একটা ছোট লোহার গোলা, দুইটাকে যদি সমান উত্তপ্ত করা যায় তা হইলে বড় গোলকটা ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্বেই ছোটটা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। গোলকটা যত বড় হইবে তাহার ঠাণ্ডা হইতে তত দেরী লাগিবে। গ্রহগণের উৎপত্তি সূর্য্য হইতে, সূর্য্য গ্রহগণ অপেক্ষা অনেক বড়, সুতরাং এরূপ হওয়া সম্ভব যে গ্রহগণ শীতল হইয়া পড়িয়াছে অথচ সূর্য্যটা এতদপেক্ষা অনেক বৃহৎ বলিয়া এত আস্তে আস্তে শীতল হইতেছে যে আমরা তাহার কোনও সন্ধান পাইতেছি না। কিন্তু সন্ধান পাইতেছি না দুই এক বৎসরের মধ্যে। সূর্য্যের মত অত বড় বস্তুটাও যদি অনবরত তাপ বিকিরণ করিতে থাকে তা হইলে ৫০ বৎসর কি ১০০ বৎসরে যতটা শীতল হইবে তাহা মানবের চক্ষু এড়াইতে পারিবে না ও তাহার প্রভাব পৃথিবীতে লক্ষিত হইবে।

তবে এরূপ হইতে পারে যে সূর্য্যেতে এমন কোনও ইন্ধন আছে যাহা অনবরত পুড়িতেছে বলিয়া তাপ হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমস্ত সূর্য্যটার কলেবর যদি কয়লার হয় এবং সেই কয়লা যদি শুদ্ধ অক্সিজেনে জ্বলিতে থাকে তা হইলে সূর্য্য ৬০০০ বৎসর তাপ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু চারি সহস্র পূর্ব্বে মিসরের পিরামিড প্রস্তুতকারকেরা এখনকার চেয়ে সূর্য্যের নিকট হইতে যে বেশী তাপ পাইত তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাহির হইতে সূর্য্যের তাপ পাওয়ার আর একটি উপায় আছে। সেটি উল্কাপাত। আকাশে একঝাঁক ছোট বড় দু'দশ সের হইতে দু'দশ মন পর্য্যন্ত নানা আকারের জড়পিণ্ড সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ঝাঁকটা অতি প্রকাণ্ড। পৃথিবী প্রতি বৎসরেই এই ঝাঁকের মধ্যে একবার করিয়া প্রবেশ করে। সে সময়ে আমরা পৃথিবীতে তারাখসা ব্যাপার দেখি। এই উল্কাগুলা পৃথিবীর আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে ও সেই সময়ে বায়ুস্তরের সহিত ঘর্ষণে উত্তপ্ত

হইয়া জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবীতে যেরূপ হয় সূর্য্যেও সেইরূপ অনবরত উল্কাপাত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যের বায়ুস্তরের সহিত ঘর্ষণে এই উল্কাগুলা এত উত্তপ্ত হয় যে সেই উত্তাপই সূর্য্যের জীবনী শক্তি। সূক্ষ্ম গণিতের হিসাবে বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যে সম্বৎসরে কি পরিণাম উল্কাপাত হইলে তাহার তাপ অক্ষুণ্ণ থাকে। মনে করুন আমাদের চাঁদকে (ইহার ব্যাস ২০০০ মাইল) গুঁড়া করিয়া, সেই চন্দ্রচূর্ণ দ্বারা অসংখ্য উল্কাপিণ্ড প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উল্কাগুলাকে যদি এক সঙ্গে সূর্য্যের পৃষ্ঠে পড়িতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহারা সূর্য্যকে এক বৎসরের তাপ যোগাইতে পারে। আমাদের পৃথিবীচূর্ণ দ্বারা ১০০ বৎসরের কাজ চলিবে। বৃহস্পতি যদি এইরূপে গুঁড়া হইয়া সূর্য্যের ঘাড়ে পড়ে তা হইলে এত তাপ উৎপন্ন হইবে যে তাহাতে সমস্ত সৌরজগৎ পুড়িয়া যাইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত সৌরজগতের গ্রহগুলা ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যে পড়িলে, ৪৫০০ বৎসর সূর্য্যের আজকালকার ন্যায় তাপ যোগাইবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

যাহা হউক এরূপে সূর্য্যের তাপ যোগান সম্ভব নহে কারণ তাহা হইলে এই উল্কাগুলিতে সূর্য্যের ওজন এত বাড়িয় যাইবে যে, তাহার টানাটানিতে সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ বুধের গতি বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেরূপ ধরণের গতিবিপর্য্যয়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক গণিত সূর্য্যের তাপের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ হইবার আর একটা কারণ দেখায়। একটা টেলিস্কোপ লইয়া আকাশের দিকে দেখিলে দেখা যায় যে, আকাশের খানিক খানিক স্থান জুড়িয়া বিশাল বাষ্পরাশি রহিয়াছে! এই বাষ্পরাশি ধীরে ধীরে চারিদিকে তাপ বিকিরণ করিতেছে ও সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু তাপ বিকিরণ করিতেছে বলিয়াই যে শীতল হইবে, ইহার উত্তাপ কমিয়া যাইবে, তাহা নহে। কমিবে ত নাই বরং সময়ে সময়ে ইহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কথাটা হেঁয়ালীর মত শুনাইল, কিন্তু হেঁয়ালী হইলেও ইহা সত্য। গণিত ইহার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়—যে এরূপ বাষ্পরাশি তাপ বিকিরণ করিতে থাকিলে ইহার উত্তাপ বাড়িতে থাকিবে।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা কিরূপে হয় তাহা একটু আলোচনা করা যাউক। গণিতের সাহায্য ভিন্ন এ সমস্ত বিষয় বোঝান যদিও কঠিন, তথাপি চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ জড়ের স্বধর্ম্ম মাধ্যাকর্ষণ ঐ বাষ্প গোলকের উপরিভাগের কিয়দংশ বাষ্পটুকুকে গোলকের কেন্দ্রের দিকে টানিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন ঐ বাষ্পটুকু তাহার স্থানচ্যুত হইতেছে না তখন বুঝিতে হইবে যে আর একটা কোনও শক্তি মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া বাষ্পটুকুকে তাহার স্বস্থানে রাখিয়াছে। এই শক্তিটি হইতেছে বাষ্পের সম্প্রসারণী শক্তি বা Expansibility। বাষ্পের তাপের দরুণ ইহার অণুগুলা ছুটাছুটি করিতেছে পরস্পরের সহিত ধাক্কা খাইতেছে ও লাফাইয়া আসিতেছে। যদি মাধ্যাকর্ষণ কিম্বা বাষ্পকে ধরিয়া রাখিবার কোনও পাত্র না থাকে তা হইলে বাষ্পের অণুগুলি ছুটাছুটি

করিতে করিতে সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যদি বাষ্পে বেশী তাপ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে অণুগুলির ছুটাছুটি আরও বাড়িয়া যায়—কাজে কাজেই ইহার সম্প্রসারণী শক্তি বা ফুলিয়া উঠিবার চেষ্টা আরও বাড়িয়া যায় এবং বাষ্পটুকুর আয়তন বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে শৈত্য প্রয়োগ করিলে অণুগুলার ছুটাছুটি কমিবে ও আয়তনও কমিয়া যাইবে। বেশ, তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—খানিকটা বাষ্পের মধ্যে দুইটা শক্তি কাজ করিতেছে—একটা জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম মাধ্যাকর্ষণ, আর একটা অত্যধিক তাপের ফল, বাষ্পের স্বধর্ম্ম সম্প্রসারণী শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ—না থাকিলে বাষ্পটা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত আর সম্প্রসারণী শক্তি না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণের জন্য অণুগুলা পরস্পরের ঘাড়ে গিয়া পড়িত এবং বাষ্পটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কঠিন আকার ধারণ করিত। দুইটা শক্তি মিলিয়া আপোষে নিযুক্ত হইয়া বাষ্পটাকে একটা মাঝামাঝি রকম আয়তন প্রদান করিয়াছে।

এখন যদি বাষ্পটা তাপ বিকিরণ করিতে থাকে তা হইলে তাহার তাপরূপ খানিকটা শক্তি চলিয়া যাইবে। বাষ্পটা সঙ্কুচিত হইবে, বাষ্পের অণুগুলা কাছাকাছি আসিবে, ঠোকাঠুকি বৃদ্ধি পাইবে—অণুগুলা মাধ্যাকর্ষণ ঠেলিয়া যে পরস্পর হইতে কতকটা দূরে ছিল তাহাদের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পাইবে। সুতরাং বাষ্পটা গরম হইয়া উঠিবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে করুন দুইটা ছোট, গরম ধাতু-গোলক আছে। গোলক দুটার মধ্যে তাপরূপ একটা শক্তি আছে। আবার মনে করুন ঐ গরম গোলকদুটা একটা রবারের সূতা দিয়া বেশ টান ভাবে পরস্পরের সহিত বাঁধা আছে। এখানে গোলকদুইটার দুই রকম শক্তি আছে। একটা তাপ আর একটা—রবারে সুতা দিয়া টান ভাবে বাঁধার দরুণ তাহাদের অবস্থা। এই ভাবে থাকিলে গোলক দুইটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি গোলকদুটাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তা হইলে দুইটা পরস্পরের দিকে ছুটিয়া আসিয়া ঠোকাঠুকি করিয়া গরম হইয়া উঠিবে। সূতার টান যদি বেশী থাকে তা হইলে, চাই কি যেটুকু তাপ বিকিরিত হইয়াছিল সেটুকু যোগাইয়া পূর্ব্বের চাইতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। তা হইলে দেখা যাইতেছে যে গোলকদুইটা যদিও তাপ বিকিরণ করিতেছে তথাপি পরস্পরের কাছে আশার দরুণ গরম হইয়া উঠিতেছে।

বাষ্পের বেলাও ঠিক এইরূপ হয়। বাষ্পের অণুগুলার মধ্যে রবারের সূতার বদলে মাধ্যাকর্ষণ আছে। সূতা বাঁধা গোলকদুইটাকে টানিয়া পৃথক করিবার সময় কতকটা শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেটা গোলকেই বলুন, আর সূতাতেই বলুন, এক জায়গায় সঞ্চিত ছিল। ছাড়িয়া দিবামাত্র সেই শক্তিটুকু তাপরূপে প্রকাশ পাইল। এখানেও বাষ্পের অণুগুলাকে মাধ্যাকর্ষণ ঠেলিয়া পৃথক করিবার জন্য যে শক্তি—কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং কিরূপে হইয়াছিল কেহ জানে না—সেই শক্তি উহার মধ্যে সঞ্চিত ছিল।

সঙ্কুচিত হইবামাত্র অর্থাৎ অণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব কমিবামাত্র সেই শক্তিটা তাপরূপে প্রকাশ পাইল। সুতরাং বাষ্পের শক্তিভাণ্ডারের একটা দিক হইতে তাপ বিকিরিত হইতেছে বটে কিন্তু আর একটা দিক তাপ যোগাইতেছে। ফলে বাষ্পগোলকটা শীতল না হইয়া অনবরত গরম হইতে থাকে।

অবশ্য তা বলিয়া এরূপ হইবে না যে ঐ বাষ্পের গোলকটা চিরকাল ধরিয়া তাপ-বিকিরণ করিবে, সঙ্কুচিত হইবে ও উত্তপ্ত হইতে থাকিবে। উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইল, তাহা কেবল বাষ্পের বা গ্যাসের পক্ষেই খাটে। বাষ্পটা সঙ্কুচিত হইতে হইতে তরল বা কঠিন আকার প্রাপ্ত হইলে আর ঐ নিয়ম খাটিবে না। তখন যেমন তাপ বিকিরণ করিবে সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গেই শীতল হইতে থাকিবে।

আমাদের সূর্য্য যে এখনও সম্পূর্ণ বাষ্পের আকারে আছে এরূপ বলা যায় না। সম্ভবতঃ বাষ্প ও তরল এই দুইএর মাঝামাঝি অবস্থায় আসিয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক যে এখনও সঙ্কুচিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প গরম হইতেছে। তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হওয়া ও সঙ্কোচনের জন্য উত্তপ্ত হওয়া এই দুইটাতে মিলিয়া ইহার উষ্ণতা সমান রাখিয়াছে। গণিতের হিসাবে বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যের আয়তন বৎসরে কতটুকু কমিলে এমন উত্তাপ হইবে যে তাহাতে তাহার সম্বৎসরের তাপের ব্যয় পোষাইয়া যাইবে। সূর্য্যের আয়তনের তুলনায় এই হ্রাস এত অল্প এবং সূক্ষ্ম জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ প্রচলিত হইবার পর সূর্য্যের আয়তন এত অল্প কমিয়াছে যে তাহা না ধরা পড়াই সম্ভব। আজকাল সূর্য্যের ব্যাস ৮৬০,০০০ মাইল। হিসাবে দাঁড়ায় যে, বৎসরে এই ব্যাস যদি ৫০০ ফুট করিয়া কমে তাহইলে তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অবশ্য তা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় সূর্য্যের ব্যাস ইহার পূর্ব্বে আরও বড় ছিল। উক্ত হিসাবে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের ব্যাস ১০ মাইল, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ১০০ মাইল, দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা ১০০০ মাইল বড় ছিল। এখনও সূর্য্যের আকার এত বড় যে আজ যদি সূর্য্যের ব্যাস ১০০০০ মাইল কমিয়া যায় তা হইলে খালি চ'খে এই পরিবর্ত্তনের কিছুই ধরা পড়ে না। অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায়।

সূর্য্যের আয়তনবৃদ্ধি যে এইখানেই শেষ হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের আয়তন এখনকার অপেক্ষা ১০০০০ মাইল বড় ছিল। কোটি বৎসর পূর্ব্বে আরও বড় ছিল। তার পূর্ব্বে আরও বড়, তার পূর্ব্বে আরও বড়, তার পূর্ব্বে আরও। দূর অতীতের দিকে যতই দৃষ্টি ফিরাই ততই দেখিতে পাই যে এইরূপে সৃষ্টির আদিতে, সৌরজগতের প্রারম্ভে, সূর্য্য আমাদের সমস্ত সৌরজগতের স্থান ছাড়িয়া একটা বিশাল বাষ্পরাশিরূপে বিরাজ করিতেছে। লাপ্লাসের মতে জগৎ উৎপত্তি এইরূপে বাষ্পরাশি বা নীহারিকা হইতেই হইয়াছে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৫)

সিন্ধুদেশ

ভূগোল।—কর্ণাটক আমার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দক্ষিণসীমা, উত্তরসীমা সিন্ধুদেশ। সিন্ধুদেশ (গ্রীকদের সিন্দমানা) প্রাচীনকাল হইতে তিন ভাগে বিভক্ত; দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যসিন্ধু। লার অথবা দক্ষিণসিন্ধু, হাইদ্রাবাদের দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। করাচী ও টাট্টা এই অঞ্চলের দুই প্রধান সহর।

করাচী বন্দর।—পূর্ব্বকালে করাচী মক্রাণ প্রদেশের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ বন্দর খেলাত সর্দ্দারের নিকট হইতে তালপুর আমীরেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা ইংরাজ সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী। সাগর সান্নিধ্য, উত্তম আবহাওয়া, ও বাণিজ্য ব্যবসার সৌকর্য্যবশতঃ করাচীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় সেখানে কতকগুলি শাকসব্জী ফলের বাগান দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চল সাধারণতঃ লবণাক্ত মরুভূমি। করাচীর ৩ ক্রোশ উত্তরে মগর (কুম্ভীর) পীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐ স্থানে কুঞ্জবনপরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগ্ন বড় বড় কুম্ভীর ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। খর্জ্জুরবননিঃসৃত গন্ধকাক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি ও উহাতে স্নান মহোপকারী বলিয়া গণিত। আমি ঐ জলে স্নান করিলাম, এমন গরম যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহারো কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগরপীরে ছাগাদি উপহার দিয়া কুম্ভীররাজের পরিতোষ সাধন করে।

হিঙ্গুলাজ

এ অঞ্চলে অপর একটি তীর্থস্থান হিঙ্গুলাজ, ইহা হিন্দুতীর্থ। করাচীর পশ্চিম সোন-মিয়ানী বন্দরের অনতিদূরে এই তীর্থ অবস্থিত। হিঙ্গুলা কালীর নাম বিশেষ। হালা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ইহার রাস্তা গিয়াছে ও অঘোর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূর্ণ। নদীর ক্রোড়ে কতকগুলি তরল কর্দ্দমকুণ্ড আছে তাহা 'রামকুণ্ড' বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিঙ্গুলাজ তীর্থযাত্রায় বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈন্যে গমনোদ্যোগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, পরে সন্ন্যাসীবেশে তথায় প্রবেশলাভ করেন। ভারতের উত্তর সীমায় হিঙ্গুলাজ ও দক্ষিণে রামেশ্বর—এই তীর্থদ্বয় প্রহরীর ন্যায় দুই দিক্ আগুলিয়া

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দ্বারকা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হিঙ্গুলাজ, হিঙ্গুলাজ হইতে লাহোরের জ্বালামুখী, জ্বালামুখীর পর কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র হইতে হরিদ্বার, হরিদ্বার হইতে গয়া কাশী, পরে মহানদী (জগন্নাথক্ষেত্র) গোদাবরী (নাসিক পঞ্চবটী) প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছিতে পারিলে ভারতের তীর্থমণ্ডল একপ্রকার প্রদক্ষিণ করা হইল।

পুরাকালে আলোর সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীক্‌গ্রন্থে রূপ কোন নাম পাওয়া যায় না। "মূষিকানুস্" নামক এক রাজার সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বর্ণনা আছে, সম্ভবতঃ আলোর তাঁহার রাজধানী।

ব্রাহ্মণাবাদ

আর একটি প্রাচীন সহরের নাম ব্রাহ্মণাবাদ। কনিংহাম সাহেব ইহা "মূষিক" রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দুনগর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ইহার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড দুর্গের চিহ্নসকল অদ্যাপি বিদ্যমান। এই স্থান গ্রীক্ ইতিহাসে হর্ম্মতেলিয়া (ব্রাহ্মণস্থল) বলিয়া অভিহিত। এখানে সেকন্দরের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হয়। আরব ইতিহাসেও ব্রাহ্মণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রোথিত নগর

হাইদ্রাবাদের কিয়ৎ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে একটি প্রোথিত নগরের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা বেলাসিস্ সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবৃত্তের চিরপরিচিত ব্রাহ্মণাবাদের ভগ্নাবশেষ। প্রবাদ এই যে এই নগর দুষ্ট রাজা দলুরায়ের পাপাচারে বিধ্বংস হয়। সিন্ধী ইতিহাসে তার বিবরণ এই :—

আলোর রাজধানী বিলুপ্ত হইলে পর দলুরায় ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া বাস করেন। ছোটা আমরাণী নামক তাঁহার এক ভ্রাতা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। এই ছোটা সাহেব তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া মক্কা হইতে একজন মুসলমানী বিবাহ করিয়া আনেন। ফাতিমা সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি দলুরায়ের হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ছোটা এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইলেন। এমন সময় দৈববাণী উঠিল "ব্রাহ্মণপুরী যায় যায়—সাবধান।" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম রাত্রে একজন বুড়ী চরকা কাটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহাতেই নগর রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় রাত্রে একজন কলুর সতর্কতায় নগর রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন সুযোগ পাইয়া পুরী একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন—তাহার একটি মাত্র দুর্গস্তম্ভ চিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট রহিল।

বেলাসিস্ সাহেব এই ভগ্নস্তূপ খনন ও বিস্তর অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে নগরী ভূকম্পন প্রভৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহসা এইরূপ প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেলাসিস্ সাহেবের খননে

ভূমিকম্পই ব্রাহ্মণাবাদের প্রলয়ের কারণ বলিয়া সপ্রমাণ হয়। তিনি যে সকল নরকঙ্কাল দেখিতে পান তাহা প্রধানতঃ দ্বারপথে—কতকগুলি ঘরের কোণে;—যেন লোকেরা কেহ প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত—কেহ বা ভয়ে জড়সড় হইয়া এককোণে বসিয়া মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ভগ্নস্তূপে চরখায় উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে যেন স্ত্রীলোকটি চরখা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত। অগ্ন্যুৎপাতের কোন চিহ্ন নাই।

এই সকল ভগ্নরাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের বাসন, গজদন্ত, পিতল ও কাচের আভরণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা, ধান্যের জালা, সতরঞ্চী ও পাশা খেলার সামগ্রী, অশ্ব গো উষ্ট্র কুকুর কুক্কুট মানব-অস্থি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অস্থিসকল জীর্ণদশা প্রাপ্ত, অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত দৃষ্টে ব্রাহ্মণাবাদ এককালে ধনধান্যপূর্ণ জনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়।

এই শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন্ত নগর এক্ষণে কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহার প্রবল দুর্গের একটি মাত্র বুরুজ অবশিষ্ট। নদী তীরে এককালে যে সকল সুরম্য উদ্যান কানন নগরের শোভা সম্পাদন করিত তাহা কণ্টকাবৃত বনজঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে স্রোতস্বতী আর নাই তাহার প্রবাহ অন্যত্রে বিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিক শুষ্ক নীরস মরুভূমি। (১)

টাট্টা

টাট্টা মুসলমান আমলে দক্ষিণসিন্ধুর প্রধান সহর ছিল। এক সময় সিন্ধুনদী ইহার প্রাচীর দিয়া বহিয়া যাইত ও যে বাণিজ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে সিন্ধু তাহা ইহারই দ্বারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী প্রায় ৩ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ১৫২২ সালে এই নগর নির্ম্মিত হয় ও ১৭৪২ সালে যখন নাদির সা তথায় পদার্পণ করেন তখন সেখানে ৪০,০০০ ঘর বাড়ী, ৬০০০০ বণিক সৌদাগর ও ২০০০ অপর শিল্পী বাস করে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাইদ্রাবাদ

হাইদ্রাবাদ টাট্টার উত্তরাধিকারী মধ্য-সিন্ধুর রাজধানী। ইহা প্রাচীন হিন্দুনগর নীরণকোটের স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ১৭৫৮ অব্দে গোলাম সা কাহ্লোরা ইহার পত্তন করেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আমীরদের সাধের আবাস ছিল, নদী হইতে তাহাদের শিকারবনে যাতায়াতের সুবিধা তাহার এক কারণ। দুর্গের মধ্যে তাহাদের যে সমস্ত সুসজ্জিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে, মীর নসীর খাঁর প্রাসাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। নিজ সহরে কতকগুলি মাটীর ঘর বাড়ী, দেখিবার মত

(১) Cunningham's Ancient Geography of India
The Buried City of Brahmanabad by H. M. Birdwood, I, C. S.

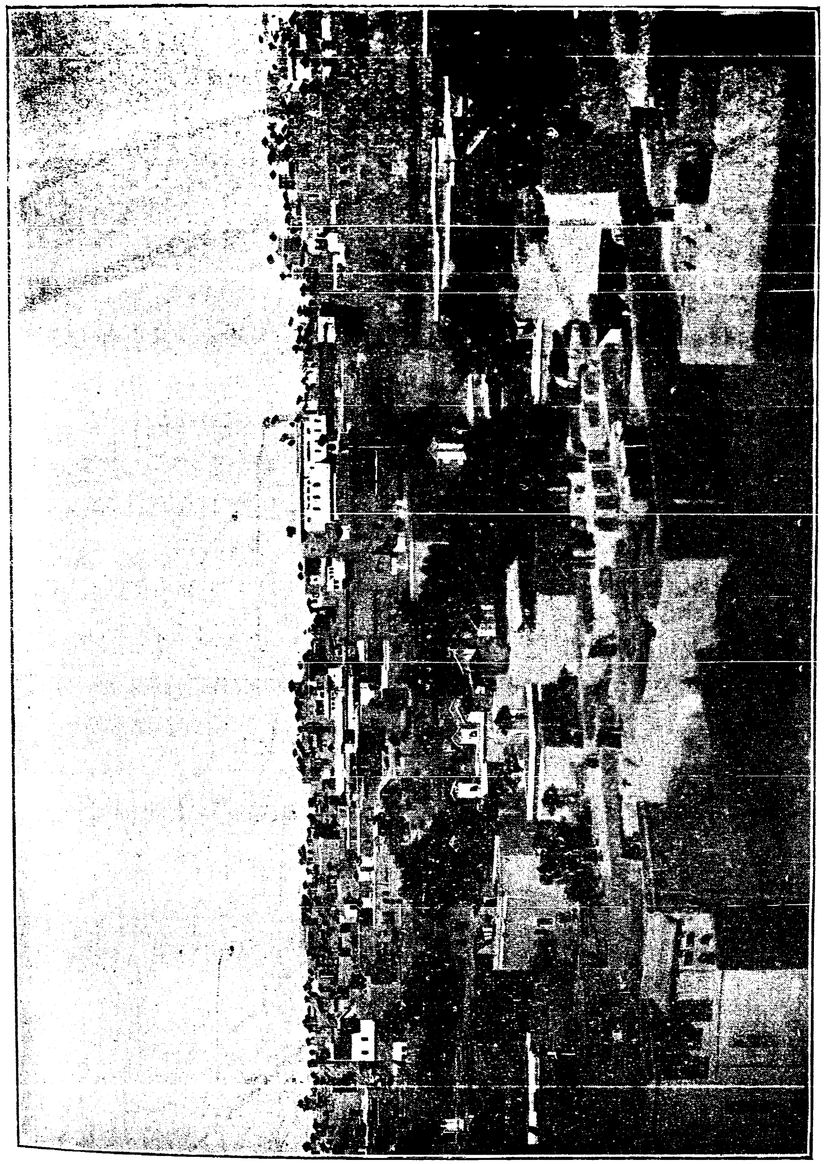

হাইদ্রাবাদ

ইমারত অট্টালিকা কিছুই নাই। দুর্গই ইহার শোভন দৃশ্য, সিন্ধুশাখা ফুলেলী তাহার প্রাচীরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সহরের প্রান্তে কাহ্লোরা ও তালপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধি মন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর। নদী সহর হইতে কয়েক মাইল দূর। সিন্ধুতীরে গিধুবন্দর, বন্দর পর্য্যন্ত একসুন্দর প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ। এই সহর রেশম ও জরির কাপড়, সূক্ষ্ম মিনার কাজ ও অন্যপ্রকার কারুকার্য্যের জন্য সুবিখ্যাত।

উত্তরসিন্ধু

উত্তর সিন্ধু দক্ষিণভাগ হইতে অনেক তফাৎ। হাইদ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্র বায়ু সেবন করা যায় না; গ্রীষ্মকালে বায়ু বন্ধ হইয়া ঐ অঞ্চল উত্তাপকুণ্ডে পরিণত হয়। ৮।৯ মাস ব্যাপী গ্রীষ্মকাল—বর্ষা নাই বলিলেই হয়—কখন একটু মেঘ কিম্বা দুচার ফোঁটা বৃষ্টি এইমাত্র। শীতকাল আবার তেমনি ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মের যে প্রচণ্ড উত্তাপ সেই ঠাণ্ডায় তার ক্ষতিপূরণ হয়। মাঝে মাঝে মরুদেশের প্রবল বালুময় ঝড় উঠিয়া প্রকৃতিরাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলে। সিন্ধু নদী যেখান দিয়া গিয়াছে তাহার আশপাশের ভূমি ফলবতী; নদী হইতে যতদূরে যাওয়া যায় ততই বালুময় মরুভূমি স্বীয় উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে।

উত্তর সিন্ধুতে কতকগুলি নব্য ও প্রাচীন প্রখ্যাত সহর আছে। নদীর পশ্চিমে সেওয়ান, আরবদিগের সেউইস্থান। নগরের মধ্যে লালসাবাজ নামক মুসলমান পীরের একটি সুন্দর মসজিদ আছে। লালসাবাজ খোরাসান

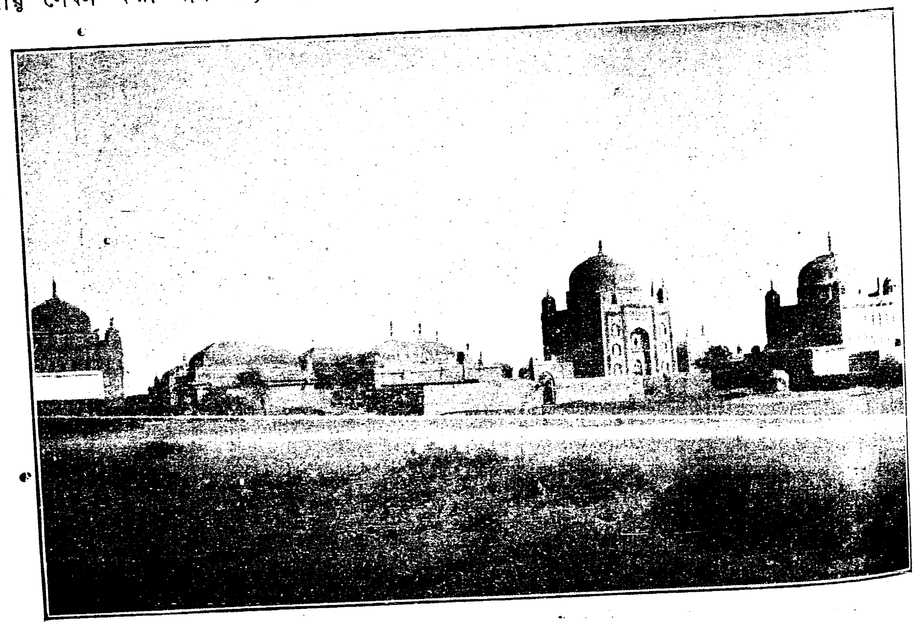

আমীরদিগের সমাধি মন্দির

হইতে সমাগত সিন্ধুর একজন লোকমান্য পীর, ১২৭৪ সালে সেওয়ানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিমন্দির মুসলমানদের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র, বহুদূর হইতে যাত্রীরা সেখানে আসিয়া মিলিত হয়। অনেক ফকীর লালসার অনুচরবর্গের মধ্যে পরিগণিত। সেওয়ানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাহা সেকন্দরনির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সেওয়ান ছাড়াইয়া লাড়খানা—ইহা জলাময় শ্রীসম্পন্ন উর্ব্বরা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধুর পরপারে খয়েরপুর তালপুর রাজ্যের রাজধানী। খয়েরপুরের উত্তরে সক্কর, বক্কর ও রোহ্রী মুসলমান আমলের তিন প্রখ্যাত সহর। বক্কর সিন্ধুর ক্রোড়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ—পূর্ব্বে তাহা দেশের প্রবেশদ্বার বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশে মুসলমানদের বিদ্যালয় ও পীরপয়গম্বরদের বসতি ছিল, তাই অনেকানেক গোরমসজিদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সক্কর এইক্ষণকার ইংরাজ সেনালয়, এক বড় ষ্টেশন।

শিকারপুর

সক্করের উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর, ইহা জজ মাজিষ্ট্রেটের প্রধান মহল, আমার সুপরিচিত কর্ম্ম স্থান। এখানকার সৌদাগরেরা বাণিজ্য কার্য্যে পরিপক্ক, সমরকন্দ প্রভৃতি দূর দূর দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

সিন্ধুনদী

সিন্ধুনদীই সিন্ধু দেশের সর্ব্বস্ব। ইহা স্বীয় জন্মভূমি তিব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রধান প্রধান নগরের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ প্রায় ১৭০০ মাইল বহিয়া গিয়া সহস্র ধারে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। ইহা বসুন্ধরার ফলশস্য-প্রসবিনী, চলাচলের মার্গ-পরিরক্ষণী, বাণিজ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারিণী অশেষ গুণশালিনী সিন্ধু জননী। উত্তরের বর্ষাবারিধারা প্রবাহে ও হিমাচলের তুষারগলিত যে পূর সঞ্চিত হয় তাহা মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ, আগষ্টে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সপ্তম্বর হইতে হ্রাসোন্মুখ হয়। এই কয়েক মাসের মধ্যে নদী কোন কোন সময় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাপূরে ফুলিয়া উঠে ও স্রোতের বেগে বালুচর ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জল-প্লাবন কতকটা বর্ষার অভাব পূরণ করে। সিন্ধুনদী না থাকিলে সমুদায় দেশ লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হইত।

সিন্ধুকাহিনী

সিন্ধুদেশের কি দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষের মোহাড়ায় তার অধিষ্ঠান সুতরাং আততায়ী-দের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপর গিয়াই পড়ে। প্রাচীনকাল হইতে পূর্ব্বাপর তাহার উপর দিয়া কত উৎপাত, কত ধাক্কাই গিয়াছে। প্রথম সেকন্দর বাদসার সিন্ধু আক্রমণ। পারস্যাধিপতি দরায়ুসকে ধনপ্রাণে বিনাশ করিয়া সেকন্দরসা সৈন্যসামন্ত সমভি-ব্যাহারে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া হিন্দুকুট পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও খাইবরের দুর্গমপথ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অবশেষে তাঁহার রণমত্ত সৈন্যগণ সিন্ধুতীরস্থিত আটকে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আটকের আটক না মানিয়া মাসিডন্‌বীর সিন্ধুপার হইয়া



সেকন্দর দুর্গ

পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবে তক্ষশীলের প্ররোচনায় বীরশ্রেষ্ঠ পুরুরাজের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এ স্থলে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আশ্চর্য্য এই যে, যে রণক্ষেত্রে গ্রীক ও হিন্দু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদলের সম্মিলন হইয়াছিল সেই স্থলেই দুই সহস্র বৎসরান্তে ইংরাজ ও শিখেদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হয়। দুবারই পঞ্জাবীদের পরাজয় কিন্তু সে পরাজয়ে শত্রুরাও তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। বন্দীকৃত পুরুরাজের সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার করিয়া সেকন্দর তাঁহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন। বিজয়ী গ্রীকরাজ জয়স্থলে নগরদ্বয় পত্তন করিয়া চেনাব ও রাবী নদী পার হইলেন। এই সময়ে মগধরাজের বিপুল কীর্ত্তি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ৬লক্ষ পদাতিক ও সহস্র সহস্র অশ্বগজারোহী সেনা যে রাজার সৈন্যবল তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্রে জয়স্তম্ভ নিখাত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার লোভের অন্ত নাই কিন্তু বিধাতা বাম হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাংশুলভ্য ফলে উদ্বাহু বামনের ন্যায় তাঁর দশা হইল। বেয়াস (বিপাশা) নদী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদল কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চায় না। সম্রাট তাহাদের বশ করিতে কত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সকল সাধ্য সাধনা নিষ্ফল,—ভৎর্সনা গঞ্জনা কাকুতি মিনতি কিছুতেই কিছু হইল না, সুতরাং এখানে রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে অগত্যা ফিরিতে হইল।

পুরুরাজের হস্তে সপ্তরাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দর তাঁর সৈন্যসামন্ত লইয়া ঝীলমে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রণতরী সজ্জিত হইল। অনন্তর তিনি সৈন্যদের দুইদলে বিভক্ত করিলেন সেনাপতির অধীনে একদল পৃথক্ পাঠাইলেন আর আপনি একদল সৈন্যসহ পঞ্জাবের নদী বাহিয়া সিন্ধুনদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। এই যাত্রার কতিপয় মাস সিন্ধুদেশ সেকন্দরের বীরদর্পে কম্পিত ও রাজ্যে তুমুল বিপ্লব সমুত্থিত হয়। সিন্ধুপ্রবেশপূর্ব্বে মালীদের যুদ্ধে হারাইয়া মুলতান অধিকার করেন এবং আরো দক্ষিণে পঞ্চনদীর সঙ্গমে এক নগর পত্তন করিয়া যান।

সেকন্দর বাদসাহের সিন্ধু আক্রমণ কথা কোন হিন্দুলেখ্যে নাই—যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। গ্রীকরাজ যে যে স্থানে যুদ্ধে জলয়াভ করেন সেখানে নগর দুর্গ প্রভৃতি কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়া যান, গ্রীক্ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা। কিন্তু এক্ষণে এদেশে সেই কীর্ত্তিকলাপের কোন নামগন্ধ নাই—কোথাও যদি তাহার চিহ্ন থাকে তাহা কেবলি অনুমান ও কল্পনা।

সেকন্দর বাদসার পর মুসলমানদের সিন্ধুআক্রমণ পালা। সেকন্দর চলিয়া যাইবার পর সিন্ধুদেশ অনেককাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন রাজপুতবংশীয় পঞ্চরাহী সিন্ধুদেশে ১৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। আলোর তাঁহাদের রাজধানী ও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাসকল সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে রাহী সাহসীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্র-

সন্ততি ছিল না। রাজ্ঞীর এক ব্রাহ্মণ উপপতি ছিল। তাহার নাম কছ। কথিত আছে যে ন্যায্য অধিকারীদিগকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাণী স্বীয় প্রণয়ী কচ্ছের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। অবশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলে বলে কৌশলে পরাজয় করিয়া কচ্ছরাজ অন্যায়লব্ধ সিংহাসনে সুস্থির হইয়া বসিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ডাহীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ডাহীরের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ ধর্ম্মান্ধ যবনদল কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হয়। আরবেরা প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদের একটি জাহাজ দেওয়াল বন্দরে (২) ধৃত হওয়াতে রাজা ডাহীরেব নিকট তাহা প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করা হয়। রাজা সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এই সামান্য কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত।

মহম্মদ কাসিম

৭১১ খৃষ্টাব্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের বালক মাত্র) একদল সৈন্য লইয়া দেওয়াল বন্দরে উপনীত হন। বন্দরের প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত একটি বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় ছিল, অন্তরে ব্রাহ্মণ বসতি ও রাজপুত সৈন্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। মন্দিরের একটি স্তম্ভের উপর এক নিশান উড়িতেছিল। কাশিম তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণে তাহা ধরাশায়ী করিলেন। পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মনে এমনি ভয়ের সঞ্চার হইল যে তাহাদেরও যবনহস্তে পতনের আর বিলম্ব রহিল না। মন্দির অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বলপূর্ব্বক মুসলমান করা, কাশিমের এই প্রথম কাজ। তাহাদের অসম্মতি দেখিয়া কাশিম এমনি ক্রুদ্ধ হইলেন যে বয়স্ক পুরুষদের সমূলে নিপাত, বালক ও স্ত্রীলোকদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধনের আদেশ জারী হইল।

মন্দির পতনের পর বন্দর শীঘ্রই যবনদের হস্তগত হইল ও তদনন্তর কাশিম নিরণকোট (হাইদ্রাবাদ) দেওয়াল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

অনন্তর ডাহিরের রাজধানী আলোরের নিকট এক মহা যুদ্ধ হয়। রাজা স্বয়ং ৫০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানী সংরক্ষণার্থে অগ্রসর হইলেন। কাশিম পারস্য হইতে নবাগত ২০০০ দুই হাজার অশ্বারোহী ও পূর্ব্বকার অবশিষ্ট বল লইয়া হিন্দুসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা যে গজপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন দৈবঘটনায় এক অগ্নিগোলা তাহার উপর পড়িয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিল, অবাধ্য হস্তী রাজাকে লইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। এই ঘটনায় যুদ্ধের পরিণাম সূচিত হইল। রাজা ও আরব সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

বীরাঙ্গনা রাজমহিষী

এই যুদ্ধে রাজ্ঞীর অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্রিত করিয়া সেই বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণাবাদ রক্ষার একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, যতক্ষণ পারিলেন শত্রু আক্রমণ প্রতিবোধ করিলেন, পরিশেষে অন্যাভাবে তাঁহার সৈন্যদের প্রাণরক্ষা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। পরে তাহারা রাজপুত বীরোচিত 'জোহর'ব্রতে ব্রতী হইয়া স্ত্রীপুত্রদিগকে জ্বলন্ত চিতানলে আহুতি প্রদান করিল—পুরুষেরা নগরদ্বার খুলিয়া তরবারহস্তে অরিদলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ডাহিরের রাজ্য মুসলমানদের পদতলন্যস্ত হইল। মুলতানে যবনপতাকা উড্ডীন হইল।

ক্রমে হিন্দু ও আরবদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সূত্রপাত হইল। হিন্দুশ্রেষ্ঠীরা যবনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু এই সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। এই যে হিন্দু দেবালয়সকল অধিকৃত ও নষ্ট হইয়াছে, ব্রাহ্মণদের দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, করদ রাজ্যে কি এই সকল নষ্টাধিকার প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে? তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? কাশিমের মনে এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রভু সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সেখান হইতে হিন্দুদের প্রীতিজনক উত্তর পাওয়া গেল। তাহা এই যে, যে সকল হিন্দু করদানে প্রতিশ্রুত তাহারা করদ রাজ্যের প্রজার ন্যায় সমস্ত অধিকার পাইবার যোগ্য, তাহারা দেবালয় পুনঃস্থাপন করিয়া পূজার্চ্চনা করুক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, অপহৃত ভূমিসম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যর্পণ করা হউক—হিন্দুরাজার আমলে তাহাদের যাহা ন্যায্য পাওনা তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা বিধেয় নহে।

এ পর্য্যন্ত কাশিমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি জয়লাভে স্ফীত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মাথায় বজ্রপাত হইল। ডাহিরের পরাজয় ও পতনের পর তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাদ্বয় যবনদের হস্তে পতিত হয়। কাশিম রাজকুমারীদিগকে দামাস্কাসের কালিফের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। কালিফের সম্মুখে আনীত হইলে জ্যেষ্ঠা যিনি তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিবেদন করিলেন "আমি মহারাজের যোগ্য নই—কাশিম আমাকে বিদায় করিবার পূর্ব্বে আমার প্রতি ব্যভিচার করিয়াছে।" কালিফ রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় আদেশ দিয়া পাঠাইলেন "কাশিমকে কাঁচা চর্ম্মথলিতে পুরিয়া মুখ সেলাই করিয়া এখনি আমার সম্মুখে হাজির কর।" কালিফের আদেশ সম্পন্ন হইলে পর রাজকুমারীকে ডাকিয়া আনিয়া কাশিমের মৃতদেহ দেখাইলেন। রাজকুমারী আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! কাশিম বাস্তবিক নিরপরাধ—আমার পিতৃহত্যা ও কুলকলঙ্কের এই প্রতিশোধ!"

কাশিমের সিন্ধু আক্রমণ হইতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব, অনেকানেক রাজবংশের উত্থান পতন হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে এ পর্য্যন্ত যত শতাব্দী গত হইয়াছে প্রায় ততগুলি রাজবংশ সিন্ধুরাজ্যে অবতীর্ণ। ৬৭১ খৃষ্টাব্দের

(২) Burton's Sindh.

পর ঐ দেশ মুলতান ও মনসুরা এই দুই মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। মুলতান উত্তর হইতে আলোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মনসুরা সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণাবাদের নাম ধাম অধিকার করিয়া সমুত্থিত হয়, আলোর হইতে দক্ষিণ সাগর পর্য্যন্ত তাহার সীমা। কালিফপ্রতিনিধিগণ প্রায় ৩০০ বৎসর সিন্ধুদেশ শাসন করেন, তদনন্তর যবনাধিপত্য ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে সুমরা ও সুম্মারাজপুতগণ কয়েক শত বৎসর উত্তরোত্তর রাজ্য করেন, তন্মধ্যে সুম্মাবংশীয় রাজগণ অনেকে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত। সম্রাট আকবরের সময় সিন্ধুদেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৪০ অব্দে পারস্যরাজ নাদির সা হিন্দুস্থান আক্রমণানন্তর সিন্ধুনদীর পশ্চিমে কতক প্রদেশ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে আত্মসাৎ করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে পাণিপত-যুদ্ধবিজেতা আহমদ খাঁ দুরাণী সিন্ধুদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে কতককাল আফগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিশ্রিত দেখা যায়। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে ব্রিটিষ ধূমকেতু অকস্মাৎ উদয় হইয়া সকলি উলট্ পালট্ করিয়া দিল।

ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে দুই রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন তাহা কহ্লোরা ও তালপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলহোরা রাজবংশের পত্তন ও প্রায় অশীতি বৎসর ঐ বংশের রাজত্বকাল। ১৭৮০ কিম্বা তার দুই এক বৎসর পরে তালপুরবংশীয় বলোচ আমীরগণ কলহোরাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইংরাজদের দেশাধিকার কালে এই আমীরদের আধিপত্য ছিল। তালপুর বংশের মূলপুরুষ ফতে আলি খাঁ, তিনি বংশের গৌরববর্দ্ধন ও কলহবিদ্রোহ নিবারণ আশয়ে স্বীয় ভ্রাতৃগণসহ একত্রে রাজ্যশাসনের সূত্রপাত করেন, তাঁহারা চার ভাইয়ে মিলিয়া একমতে এক চিত্তে এমনি সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতেন যে 'চার ইয়ার' বলিয়া তাঁহাদের নাম রাষ্ট্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতন্ত্র তিন শাখার সৃষ্টি হইল—হাইদ্রাবাদ, মীরপুর, খয়েরপুর তিন আমীরের তিন রাজ্য-বিভাগ।

আসিয়ার শান্তি

আফগান যুদ্ধাবসানের পর লর্ড এলেনবরা সিমলা হইতে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন যে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট রাজ্যসীমায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এইক্ষণ অবধি শান্তিস্থাপন ও রাজ্যরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইবেন। এই অভিপ্রায়ে "আসিয়ার শান্তি" চিহ্নিত এক মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত বলিয়া দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে সিন্ধুদেশ তখন তিন রাজ্যে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণ ও মধ্যসিন্ধু; প্রত্যেক রাজ্যের এক এক জন আমীর অধিস্বামী।

১৮৩৯ সালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও আমীরদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা সিন্ধুদেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি যদিও আমীরদের মনঃপূত হয় নাই কিন্তু কি করেন, দায়ে পড়িয়া ব্রিটিষ যূপেশ্বরী অবনত করিতে হইল। আফগান যুদ্ধের ৩

বৎসর আমীরদের আচরণে দোষ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের মধ্য হইতে ব্রিটিষ সৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা—জাহাজে খোরাক যোগান কিছুতেই তাঁহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। General Nott কাবুল প্রয়াণ কালে সিন্ধু হইতে তিন সহস্র উটের সাহায্য লাভ করেন। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের পরাজয় দেখিয়া দাঁত দেখাইতে সাহস করিয়াছিলেন; এই ছুতা ধরিয়া তখনকার এজেণ্ট Major Outram আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। গবর্ণর জেনারাল আদেশ করিলেন যদি কোন আমীর ব্রিটিষরাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তাহার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক।

Sir Charles Napier

৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৪২এ সর চার্লস্ নেপিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতারূপে সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন। রাজদ্রোহ অভিযোগবিচারের ভার তাঁহার হস্তে ও তাঁহার প্রতি আদেশ এই যে, দোষের স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমীরদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা হয়। সে যাহা হউক, তিনি বিচারে তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন ও বলিলেন ১৮৩৯এর সন্ধি অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই। আমীরগণ সন্ধিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী।

পূর্ব্বকার সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে এক নূতন সন্ধিলেখ্য প্রস্তুত হইবার কথা। মেজর্ আউটরাম্ তাহার এক নমুনা তৈয়ার করিয়া লার্ড এলেন্বরার কাছে পাঠান। তাহা গবর্ণর জেনেরলের নিকট হইতে ১২ই নবেম্বরে নেপিয়রের হস্তে ফিরিয়া আসে। এই সন্ধি স্বাক্ষর করাইবার অভিপ্রায়ে বিটিষ সেনাপতি আমীরদিগকে খয়েরপুরে ব্রিলিত হইতে আদেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ আদেশ মতে উপস্থিত না হওয়াতে হাইদ্রাবাদ সমিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইতিমধ্যে সেনাপতি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। যখন নূতন সন্ধিপত্রের নমুনা গবর্ণর জেনেরালের নিকট হইতে নেপিয়রের হস্তে আইসে, তখন আউট্রাম দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক হয় নাই—তাহার কতক গুলি কঠোর অনুশাসন সংশোধন করা আবশ্যক নতুবা বেচারা আমীরদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। সেনাপতি এই নমুনা আপনার কাছে প্রায় দেড় মাস কাল রাখিয়া দেন ও পরিশেষে যখন ভ্রম সংশোধনের অনুজ্ঞা আইসে তখন যতদূর অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন ফল হইল না। সন্ধিপত্রে আমীরদের নিকট হইতে যে সকল ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লইবার কথা ছিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত কবলীকৃত হইল—আর বিলম্ব সহিল না। ওদিকে যে বলোচ সর্দ্দারগণ ঐ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী, তাহাদের মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দুর্ঘটনার মূল আমীরদের গৃহবিচ্ছেদ। আমীরদের রাইস তখন ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ মীর রোস্তম। রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ আলি মোরাদ ইংরাজদের আগমনে নিজের কাজ গোছাইবার অবসর পাইলেন ও স্বার্থসাধন মানসে ব্রিটিস সেনাপতির তোষা-

মোদ আরম্ভ করিলেন। সেনাপতিকে রোস্তমের উপর চটাইবার মতলবে দাদার নামে নানা মিথ্যা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। আলি মোরাদের প্ররোচনায় সেনাপতি মীর রোস্তমকে এক কটুকাটব্যপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে আলি তাঁহার ভ্রাতার স্বাক্ষরিত এক পত্র সেনাপতিকে দেখান, তাহাতে জানানো হয় যেন রোস্তম স্বেচ্ছায় তাঁহার পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া তাঁহার দেশদুর্গ সৈন্যসামন্ত সকলি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত। নেপিয়র বলিয়া পাঠাইলেন, মীর রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেন। এইরূপ হইলে আলি মোরাদের সব জুয়াচ্চুরি ধরা পড়ে,—এই সাক্ষাৎকার নিবারণ উদ্দেশে তিনি মধ্যরাত্রে তাঁহার ভ্রাতাকে উঠাইয়া বলিলেন "এই বেলা পালাও নহিলে জেনেরাল সাহেব সকালে তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসিবেন।" বৃদ্ধ মীর শশব্যস্ত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করেন। অমনি নেপিয়র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মীর রোস্তম ব্রিটিসরাজের অপমান করিয়াছেন। আলি মোরাদকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মীর রোস্তমের সমূহ বিপদ উপস্থিত। তিনি সেনাপতির নিকট আপন মন্ত্রীকে দিয়া বলিয়া পাঠান যে, আলি মোরাদ তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া পত্র স্বাক্ষর করিয়া লন—তাঁহারই প্ররোচনায় তিনি পলায়ন করিয়াছেন। নেপিয়র ইহার এক তীব্র ভৎর্সনাপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন এবং অরণ্যে গিয়াও ব্রিটিষ হস্ত এড়াইবার উপায় নাই ইহা জানাইয়া দিবার জন্য একদল সৈন্যকে পলাতক মীরের পশ্চাৎ ইমামগড়ের কেল্লার উপর হল্লা করিতে পাঠান। ইমাম গড়ের কেল্লা নেপিয়রের মতে সিক্কুর Gibralter তাহা দখল করিতে পারিলে ব্রিটিষ গৌরবের সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদে উড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। এই অসম সাহসিক কার্য্যের জন্য Duke of Wellington পর্য্যন্ত তাঁহার যুদ্ধকৌশল প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু রণকৌশল যাহাই থাকুক এই কার্য্যে তাঁহার ন্যায়পরতা প্রকাশ পায় না, কেননা মীর মহম্মদ যিনি দুর্গের অধিপতি তিনি যখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন অপরাধ করেন নাই তখন তাঁহার উপর এ অত্যাচার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পলায়নে যদি মীর রোস্তমের দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁর রাজ্য-ত্যাগ কি সে দোষের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নহে?

যাহা হউক, মীর রোস্তমকে রাজ্যচ্যুত ও আমীরদের ভূমিসম্পত্তি হস্তগত করিয়া ব্রিটিষ সেনাপতি আমীরদিগকে প্রথমে খয়েরপুর, পরে হাইদ্রাবাদে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন।

হাইদ্রাবাদ সমিতি

হাইদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত তাঁহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—যে সকল পত্রে তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা দেখিতে চাহিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁহারা নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন কিন্তু মেজর আউটরামকে স্পষ্ট বলিলেন যে, ব্রিটিষদের আচরণে, বিশেষত



মিয়ানির ব্রিটিষ রাক্ষেত্রের স্মৃতিচিহ্ন

মীরদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে, বলোচ সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তাহারা হঠাৎ যদি কোন বিদ্রোহাচরণ করে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নন। এই অবসরে সেনাপতি নেপিয়র স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বাধিবার উপক্রম হইল। সন্ধি স্বাক্ষরের পর আউটরাম যখন কেল্লা হইতে বাহির হয়েন তখন লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রিটিষদের উপর ধিক্কার ও গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল। আমীরেরা অনেক কষ্টে মেজরকে বাটী পৌঁছিয়া না দিলে তাঁহার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইত। ইহার তিনদিন পরে একদল বলোচ সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করে—মেজর অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রবল শত্রু বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করত নদীতে সেনা-রক্ষিত ষ্টিমারে উঠিয়া নিস্তার পান।

মিয়ানির যুদ্ধ

এখন যুদ্ধের সমূহ কারণ উপস্থিত—ইস্‌পাব কি উস্‌পার যুদ্ধে যাহা হয় স্থির হইবে। নেপিয়র রাজধানীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া বলোচ সৈন্য দলে বলে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাহারা মেয়ানি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের সংখ্যা ২০,০০০। নেপিয়র ২৭০০ সেনা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। বলোচেরা বীরোচিত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ইউরোপীয়দের শিক্ষিত বল ও মারাত্মক শস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের বলবিক্রম কতক্ষণ চলিবে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল—বলোচেরা তাহাদের তাম্বু অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিষদের হস্তে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। চার্লস্ নেপিয়র সৈন্যদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া হাইদ্রাবাদ-দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক আমীরদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পর ডব্বায় আর এক যুদ্ধ হয়—স্বাধীনতা রক্ষার সেই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়া কষ্টশ্রষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন—সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজ্যের লোহিত রেখাপাতের অন্তর্ভূত হইল। (৩)

এই ত ইংরাজদের সিন্ধুবিজয় কাহিনী। স্পষ্ট দেখা যায় যে সর চার্লস্ নেপিয়র পূর্ব্ব হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কার্য্যারম্ভ করেন—আমীরদের সঙ্গে তাঁহার যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাঘ্রের বিবাদের অনুরূপ। তাঁহার নিজ হস্তাক্ষর হইতেই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমীরদের দমন করিবার জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য দুর্ব্বল সে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে, তাহার উপায়ান্তর নাই।"

তাঁহার নীতিশাস্ত্রে সৎকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে অসৎ উপায় যোজনা দোষের নহে। কথিত আছে যে সিন্ধুবিজয়ের পর তিনি দেশে তারযোগে দ্ব্যর্থভাবে সংবাদ পাঠান "I have Sind" (Sinned) এই তিনটি বাক্যে সিন্ধুবিজয়-কাহিনী অভিব্যক্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩) Marshman's History of India.

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১১)

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করিলেও কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময়ে আমরা অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই না। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যে সকল কারণে ঘটিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদিগের এই অসহায়তা ও দুরবস্থার প্রধান কারণ, সুতরাং লোক-সমাজে যাহাতে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই যে পরিবারের মধ্যে একজনের কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে একটীর পর আর একটী করিয়া বাটীর সমস্ত লোককেই ক্রমে ক্রমে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ক্রমে পল্লীর মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে উহা মহামারীর আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হইলে এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে আমরা আত্ম-রক্ষা করিতে এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যেও উহাদিগের পরিব্যাপ্তি কতকাংশে নিবারণ করিতে সমর্থ হই। প্রত্যেক গৃহস্থ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে পল্লীর মধ্যেও এই রোগের বিস্তৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এইরূপ কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ যে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নহে, প্রতিবেশী সমাজকেও নানারূপ অসুবিধা, ক্লেশ ও বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এইরূপ বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

প্রথমতঃ সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে ও কি রূপে উহার উৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের ভালরূপে জানা উচিত। রোগের প্রকৃত কারণ জানা না থাকিলে উহার নিবারণের চেষ্টা করা বৃথা হইয়া থাকে এবং এই জন্য আমরা অনেক সময়ে অর্থনাশ, অসুবিধা ও মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি।

কতকগুলি চক্ষুর অগোচর বিশেষ বিশেষ নিম্নশ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ্ জাতীয় পদার্থ আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতক-গুলি স্পর্শ দ্বারা, অপরগুলি স্পর্শ ব্যতীত অন্য উপায়ে, রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চুলকনা, খোসপাঁচড়া, দাদ, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সমূহ রোগীর বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদির স্পর্শ দ্বারা,

অথবা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মা রোগের বীজ রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে; উহা শুষ্ক হইলে পর উহার সূক্ষ্মাংশ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয় এবং নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ মনুষ্যের শরীর হইতে বমন বা মলের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া যদি পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় এবং উক্ত জল বা খাদ্য কোন প্রকারে আমাদের উদরস্থ হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ডিপ্থিরিয়া রোগের বীজ বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া রোগীর গলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের বীজ (এক প্রকার কীটাণু) স্পর্শ দ্বারা অথবা বায়ু, পানীয় জল বা দূষিত খাদ্য দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহাদিগের বীজ কোনরূপে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহাদিগের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রোগীর রক্তের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক জাতীয় মশকী দংশন কালে রোগীর শরীর হইতে শোষিত রক্তের সহিত উহা উঠাইয়া লয়। পরে উক্ত কীটাণু ঐ মশকীর দেহাভ্যন্তরে পুষ্টিলাভ করে এবং ঐ মশকী যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever), ফাইলেরিয়েসিস্ (Filariasis), কাল-নিদ্রা (Sleeping sickness) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ বিভিন্ন জাতীয় মশক, মক্ষিকা বা পোকার দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লেগ্ রোগ ইন্দুরের দেহে অবস্থিত। এক প্রকার পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা মনুষ্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। সম্প্রতি গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আসামের সংঘাতিক কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) বীজ ক্ষিপ্ত কুকুরের লালার (Saliva) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন ঐ কুকুর মনুষ্য বা অপর প্রাণীকে দংশন করে, তখন উক্ত রোগের বীজ লালার সহিত তাহার ক্ষতস্থানের রক্তের সহিত একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায়।

বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্, যক্ষ্মা, প্লেগ্, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি অনেকানেক সংক্রামক রোগের বীজের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকলগুলি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জাতীয়। ইহারা চক্ষুর অগোচর, অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিবার পর অনুকূল অবস্থা পাইলে ইহাদিগের এক একটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য উদ্ভিদাণুতে পরিণত হয় এবং সেই সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) উৎপাদন করে। ইহাই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ কিরূপ, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ঐ সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই ছালের মধ্যে ঐ সকল রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং বায়ু, বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে রোগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যে উক্তরোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যে কোন রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটী স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে; নানা কারণে এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিলে এই শক্তি যথোচিত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; এরূপ অবস্থায় কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে উহা অবাধে বিষ-ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যাহারা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে অথবা যাহারা যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না, তাহারাই অধিক সংখ্যায় উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এই শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয়, সুতরাং রোগ-বিস্তৃতির মধ্যে বাস করিয়াও লোকে অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পুনশ্চ বসন্ত প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, যাহা একবার হইলে আর পুনরায় হইতে দেখা যায় না। যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কলেরা, টাইফয়েড ফিভার্, প্লেগ প্রভৃতি রোগে এই রক্ষণশীল অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

উপরোক্ত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজ আমাদের পরীক্ষাগারে অথবা অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিবার পর বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া "টিকা" (Vaccine) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্বারা ঐ সকল রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে স্বল্প বা দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বসন্ত রোগের "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিকাংশ স্থলেই আজীবন বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়; এইজন্য যাহাদের একবার বসন্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। প্লেগ, টাইফয়েড ফিভার্, কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য এইরূপ "টিকার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল রোগে "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিক দিন বিদ্যমান না থাকিলেও যে সময়ে উহারা মহামারীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন "টিকা" লইলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু।

কালিদাসের নাটক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শকুন্তলা

শকুন্তলার বিষয়টি ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং মহাভারত হইতে গৃহীত। রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমলীলা এই মহাকাব্যের আরম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং বলিতে গেলে এই প্রেম-কাহিনীর মূল মহাভারতেই নিহিত। এই প্রেম-মিলন হইতেই ভরতের জন্ম। ব্যাসবর্ণিত মহা-সংগ্রামের যাঁহারা প্রধান নায়ক, ভরত তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। নাটকের উপযোগী করিবার জন্য এই পরম্পরাগত প্রাচীন কাহিনীটিকে কালিদাস যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার নাটকীয় রচনাপ্রণালীর ধরণটা চট্ করিয়া ধরিতে পারি। মহাভারতের বর্ণিত কাহিনীটি এইখানে সংক্ষেপে বলা যাক্। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। তিনি মালিনী নদীর তীরে কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া তপোবনে একাকী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাপূর্ব্বক তপোবনবাসীদিগকে আহ্বান করা হইল। একটি নবযুবতী আসিয়া আতিথ্যসৎকারে প্রবৃত্ত হইল। তাহার রূপলাবণ্যে রাজা মুগ্ধ হইয়া তাহার জন্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কণ্বমুনির মুখে সে যাহা শুনিয়াছিল, রাজার নিকট তাহাই বলিল। বিশ্বামিত্রঋষির সহিত কিরূপে মেনকা অপ্সরার মিলন ঘটিয়াছিল, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিল। রাজা তাহার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন। সে লজ্জাবশতঃ তাহাতে বাধা দিল। দুষ্মন্ত তাহাকে বুঝাইলেন, তিনি যে বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন তাহা বৈধ বিবাহ। যুবতী শুধু এই সর্ত্তে সম্মত হইল যে, তাহাদের মিলন হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। রাজা শপথ গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় শুধু এই কথা বলিয়া গেলেন, তাঁহার নববধূকে ঘটা করিয়া আনিবার জন্য রাজধানী হইতে লোকজন পাঠাইবেন। ইত্যবসরে কণ্বমুনি তীর্থভ্রমণ করিয়া তপোবনে প্রত্যাগত হইলেন। যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সমস্তই তিনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন, এবং যে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে সে বড়ই সৌভাগ্যবান হইবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তিনি শকুন্তলাকে অভিনন্দন করিলেন। শকুন্তলার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, তাহার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বয়স পর্য্যন্ত হইল, তথাপি তাহাকে আনিবার জন্য রাজা লোক পাঠাইলেন না। তখন কণ্ব তাপসরক্ষক সঙ্গে দিয়া, মাতার সহিত পুত্রকে দুষ্মন্তের সমীপে পাঠাইলেন। তাপস-রক্ষকেরা উহাদিগকে প্রাসাদ-দ্বারে ছাড়িয়া আসিল। শকুন্তলা রাজার সম্মুখে আনীত

হইলেন, রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এমন কি, বিশ্বামিত্র ও মেনকাকে পর্য্যন্ত অবমাননা করিলেন। শকুন্তলা এই বিপদে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া শুধু পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলজনিত স্বকীয় অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে লাগিল। হঠাৎ এই সময়ে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য একটা আকাশবাণী হইল! তখন দুষ্মন্ত, তাহার পুত্রের সুজাতত্ব সম্বন্ধে এই আকাশবাণীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া, যুবককে ও যুবকের জননীকে যথাযোগ্য পদমর্য্যাদা প্রদান করিলেন।

এই কাহিনীটির যে একটি নাটকীয় উপযোগিতা আছে তাহা কালিদাসের পূর্ব্বেও অনেক কবি হয়ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মহাভারতে এই কাহিনীর বর্ণনায় যে সকল উক্তি আছে সেই সকল উক্তি, শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, কণ্ব প্রভৃতি কতকগুলি পাত্রের মুখে বসাইয়া দিলেই যথেষ্ট হয়, আর বড় কিছু করিতে হয় না। এই উৎকৃষ্ট নাট্যরচনাটির পূর্ব্বে আর যে সকল রচনা হইয়াছিল তাহার কিছুই এখন বিদ্যমান নাই; কিন্তু একটি তামুল-নাটকে উহার একটি সঠিক প্রতিরূপ আমরা পাইয়াছি। নাটকটির রচনা-কাল অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ আধুনিকও হইতে পারে, উহার স্থানিক লক্ষণ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। এই শকুন্তলার গ্রন্থকার—রাজনল্লুরের রামচন্দ্র; তিনি কালিদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু সে দাবী কোন কাজের নহে। স্পষ্টই দেখা যায়, সরল পৌরাণিক কাহিনীটির তিনি অবিকল নকল করিয়াছেন। নাটকের আরম্ভেই অনেকগুলি দেবদেবীকে আবাহন করা হইয়াছে; তাঁহার পর, গণেশ আসিয়া বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিলেন; একজন গায়ক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। তারপর বিশ্বামিত্রের প্রবেশ; সূত্রধর অবস্থাটা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন। শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া মুনিবর, তাঁহার কঠোর তপশ্চর্য্যার উপযোগী একটি আশ্রমের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর সূত্রধর, ইন্দ্র ও তাঁহার সভার কথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়া দিল। দেবতারা গ্রীষ্মের প্রখর তাপে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যাই তাহার হেতু। ইন্দ্র পরামর্শের জন্য দেবতাদিগকে সভায় আহ্বান করিলেন। বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন, মুনিবরকে প্রলোভিত করিবার জন্য একজন অপ্সরাকে তাঁহার নিকট পাঠান হউক্। অপ্সরা রম্ভাকে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু রম্ভা ভয়ে একটা ওজর করিয়া কাটাইয়া দিল। মেনকা স্বীকৃত হইল। সূত্রধর সকলকে জানাইয়া দিল, এখন পৃথিবীতে নাটকীয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

মেনকা বিশ্বামিত্রের সমীপে আগমন করিল। ঋষি নারী-গন্ধে প্রমত্ত হইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে অপ্সরাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অপ্সরা প্রথমে একটু উপেক্ষার ভাণ করিয়া, পরে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ঋষি প্রলোভনের বশীভূত হইলেন, কিন্তু একটু পরেই চৈতন্যোদয় হইলে, ইন্দ্রকে অভিসম্পাৎ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সূত্রধর উপস্থিত অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করিল। শকুন্তলার জননী শকুন্তলাকে বনে পরিত্যাগ করিল। কণ্ব

শিষ্যকে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতে দিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য শিষ্যকে পাঠাইলেন। তাপস-যুবক শকুন্ত-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র কন্যাকে দেখিতে পাইল। কণ্ব তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া, তাহার নাম দিলেন—শকুন্তলা। সূত্রধর কর্ত্তৃক আর একটি কালব্যবধান বিজ্ঞাপিত হইল:—শকুন্তলা বিবাহ-যোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে। সদানন্দ ঋষি তাঁহার অনুষ্ঠিত একটি যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য কণ্বকে অনুরোধ করিলেন। শকুন্তলাকে আশ্রমে রাখিয়া কণ্ব প্রস্থান করিলেন। সখীর সহিত একাকী থাকিয়া শকুন্তলা পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। সূত্রধর কর্ত্তৃক দুষ্মন্তের প্রবেশ বিজ্ঞাপিত হইল। রাজা অনুচর ও অমাত্যদিগের সহিত সবৈভবে রাজসভায় উপবিষ্ট। মৃগেরা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিতেছে বলিয়া প্রজারা রাজার নিকট অভিযোগ করিল। শ্রমজীবিরা ঐ একই সুরে কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। রাজা শিকারীদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। মৃগয়ার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে উহারা রাজার নিকটে আসিল।

এই সময়ে রঙ্গভূমি হঠাৎ তপোবনে পরিণত হইল।

একটি মৃগকে অনুসরণ করিতে করিতে রাজা পথ হারাইয়াছেন। সরোবরের তীরে একটি কুঞ্জকানন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উহাই তিনি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং হঠাৎ শকুন্তলাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইলেন। রাজা শকুন্তলার নিকটে গেলেন। শকুন্তলাও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিতে লাগিল। শকুন্তলা তাঁহার রাণী হইবে, শকুন্তলার পুত্র তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা তাহার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইলেন। শকুন্তলা স্বীকৃত হইল। পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উভয়ে লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রস্থান করিলেন। আবার তাঁহারা পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলার নিকট বিদায় লইলেন এবং পরদিন তাহাকে রাজধানীতে ঘটা করিয়া আনিবার জন্য লোক লস্কর পাঠাইবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। রাজা তপোবন হইতে দূরে চলিয়া গেলেন এবং রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

আবার দুই বৎসরের কাল-ব্যবধান সূত্রধর কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল। একজন শিষ্যের রক্ষণাধীনে, ভরতকে লইয়া দুষ্মন্তের প্রাসাদে যাইবার জন্য কণ্ব শকুন্তলাকে আদেশ করিলেন। তিনজনে যাত্রা করিলেন। শিশু ভরত পথশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অশেষে তাঁহারা হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন।

সূত্রধর কর্ত্তৃক মগধরাজের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইল। মগধরাজ দুষ্মন্তকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছেন। পরে কেকয়-রাজার আগমন সূচিত হইল। নৃপতিদ্বয় প্রবেশ করিয়া দুষ্মন্তকে অভিবাদন করিলেন। এই সময়ে ভরতকে লইয়া শকুন্তলাও রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। রাজা শকুন্তলাকে উপহাস করিলেন। শকুন্তলা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ রাজার আচরণে অনুমোদন করিলেন এবং উহাদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। অবমানিতা পত্নী আকাশবাণীকে আহ্বান করিল। আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিল। রাজা ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন, আদর করিলেন, গুরুগম্ভীরভাবে সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। উপস্থিত নৃপতিগণ ও অমাত্যবর্গ উহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন। মহাভারতের বর্ণিত কাহিনীর ঐকান্তিক অনুসরণ ইহা অপেক্ষা আর কিছুই হইতে পারে না। সমস্ত আখ্যানটি নাট্যে পরিণত হইয়াছে। কবি, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা আপন ইচ্ছামত দৃশ্য পরিবর্ত্তন করেন নাই। নাট্যকার্য্যের প্রণালীতে বালকোচিত সরলতা প্রকাশ পায়। নাটকীয় কালব্যবধান, ঘটনাস্থান, বিবিধপাত্রের অবস্থা সূত্রধরের দ্বারা জানাইয়া দিয়া কবি নাট্যশাস্ত্রকে একটু অব্যাহতি দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরহে

১

লাল টকটকে
ব্যথার শোণিত লেখা,
ছিটায়ে পরাণে
চলে গেছে হৃদি সখা ;

২

দূর ব্যবধান
সুদূর প্রবাস পারে,
কঠিন নিয়তি
টেনে নিয়ে গেছে তারে,

৩

সেথা সে গুমরি
চাপিছে মরম ব্যথা,
এখানে ফুকারি
কাঁদিছে বেদনাহতা।

শ্রীপ্রতিভাকুমারী দেবী

মিলনে

১

রয়েছি বসিয়া
প্রাণে লয়ে প্রীতিডোর,
আসিবে আজিকে
হৃদয়ে হৃদয়চোর ;

২

প্রাণে এঁকে দেবে
মিলনের আলপনা,
চমকি উঠিব
সে পরশে আনমনা ;

৩

বিরহে তাহার
পেয়েছিল যাহা ক্ষয়,
মিলনে সেটুকু
হইবে নিখিলময়।

শ্রীপ্রতিভাকুমারী দেবী

রাজহংসের আবাসভূমি

ইংলণ্ডের এবট্‌সবারী গ্রাম একটি ছোটখাট পৃথিবী বিশেষ। এমন বিচিত্র, সুন্দর ও প্রাচীন গ্রাম ইংলণ্ডের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ইহার চতুর্দ্দিকে জনমানবশূন্য তৃণশ্যামল পতিতভূমি সকল বিস্তীর্ণ; সবুজ পর্ব্বতশ্রেণী কত যুগ যুগান্তরের রহস্যময় কাহিনী লুক্কায়িত রাখিয়া ইহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এবট্‌স্‌বারী একটি অতি পুরাতন সুরম্য স্থান। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রস্তরনির্ম্মিত কুটীরসমূহ গ্রামের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। গ্রাম্য মঠের জন্য এই স্থানটী প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। ইহার ভূতপূর্ব্ব মালিকগণ মঠধারী ছিলেন; এবং তাহা হইতেই এই গ্রামের নামোৎপত্তি। এখানকার জলবায়ু এত মৃদু যে, জলপাই বৃক্ষগুলি অনায়াসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফলভারাবনত হইয়া পড়ে; এবং ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত নেত্রমুগ্ধকর কেমেলিয়া গুল্মে সুন্দর কুসুমকলিকানিচয় উন্মুক্ত বাতাসে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বিবিধপ্রকার পক্ষীর আবাসস্থল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ চেসিল বীচ নামক সমুদ্র-তট এখানকার একটি দর্শনযোগ্য মনোরম স্থান! এখন এবট্‌স্‌বারী গ্রাম—ইহার প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, পুরাতত্ত্ব ও কিম্বদন্তীর জন্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা অসংখ্য নয়নবিমোহন রাজহংসের আবাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবট্‌স্‌বারী হইতে পোর্টল্যাণ্ড পর্য্যন্ত দীর্ঘ নয় মাইলব্যাপী এক সরল, সঙ্কীর্ণ, ঈষৎ লবণরসাক্ত জলাভূমি আছে। পূর্ব্বোক্ত চেসিল বীচ প্রাচীরস্বরূপ হইয়া ইহাকে সমুদ্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছে। বিগত শরৎকালে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, এই বিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৪৩টি রাজহংস বিচরণ করে, তন্মধ্যে ৯২১টি বয়ঃপ্রাপ্ত ও অবশিষ্ট ১২২টি হংসশিশু।

মিঃ গ্রিগরী গিল আজ ৩৩ বৎসর ধরিয়া এই রাজহংসগণের প্রধান রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত আছেন। তিনি একজন সুশ্রী, সবল ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি। হংসদিগের স্বভাব, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।

বহুকাল পূর্ব্বে একটি অত্যুন্নত পর্ব্বতের চূড়ায় Saint Catharineএর সম্মানার্থে এক ক্ষুদ্রায়তন প্রস্তরনির্ম্মিত উপাসনামন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এই দেবালয়টি যেন বজ্রনির্ম্মিত; বিগত চার পাঁচ শত বৎসর যাবৎ কালের করাল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আসিতেছে। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলে এবট্‌স্‌বারীগ্রামের একটি চমৎকার দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। বিশেষতঃ মধুর বসন্তের সূর্য্যাস্তের সময় সমস্ত গ্রামটি যেন স্বর্ণরেণুমণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হয়। পদতলে তৃণবিশেষে পরিপূর্ণ প্রশান্ত সলিল—খাল বিল ও ক্ষুদ্র দ্বীপ-সমূহ প্রসারিত রহিয়াছে। সেইখানে সহস্রাধিক রাজহংস বাস করে। পশ্চাতে এক সঙ্কীর্ণ সুনীল জলাশয়ে রাজহংসগণ বিচরণ করিতেছে; এই জলাভূমির

অপর পার্শ্বে চেসিল বীচ। এই উপকূলটি পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং পক্ষাদিগের আহারস্থল ও ক্রীড়াভূমি হইতে সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্ণিমা রজনীতে, অনন্তবিস্তৃত সুনীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতে থাকে, এবং জলাশয়ের নীলজলে রাজহংস বিচরণ করিয়া বেড়ায়। রজতধবল জ্যোৎস্নাধারায় সিক্ত হইয়া হংসগুলি এক অভিনব দিব্য শ্বেত কলেবর ধারণ করে। যথার্থই এ দৃশ্য বড়ই মধুর, বড়ই উজ্জ্বল!

মিঃ গিল নিজ সন্তানের ন্যায় এই রাজ-হংসদিগকে ভালবাসেন এবং অপর কেহ ইহাদের প্রশংসা করিলে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি ইহাদের প্রত্যেকের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত; এবং ইহারাও তাঁহাকে খুব ভালবাসে। তিনি একদিন তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"ইহা-দের মধ্যে এমন একটিও হংস নাই, যাহাকে ধরিয়া তাহার গলার ভিতর আমি নির্ব্বিঘ্নে আমার জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারি।



সহস্রাধিক রাজহংস বিচরণ করিতেছে

আমি কত শতবার এইরূপ করিয়াছি!" কিন্তু দর্শকগণ ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহার পার্শ্বস্থ তৃণশ্যামল পথের উপর দিয়া গমনাগমন করিলে, ইহারা ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, ডানা নাড়া দেয় এবং মস্তক পশ্চাতে হেলাইয়া দিয়া সহস্র সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে থাকে।

মুক্ত হংসগণ বন্য পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন জীবনযাপন করিয়া থাকে। বোধহয় ইহারাও এই আবাসভূমিকে একটি পবিত্র আশ্রম বলিয়া মনে করে; কারণ এতগুলি হংস একস্থানে এত পাশাপাশি বাসা করিয়া থাকা ইহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। রক্ষক ইহাদের নিকটে যাইয়া শীস দিলে, ইহারা তাহার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হয়। তখন ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যেন কোন গোলাঘরের প্রাঙ্গণে পাতিহংসগণ আহারের সময়

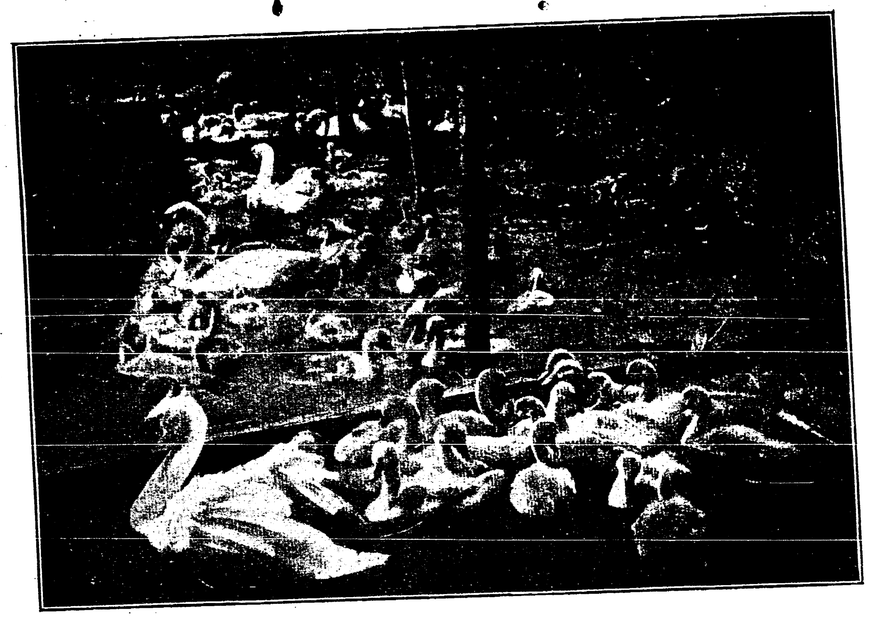

রাজহংসের আবাসভূমি

উপস্থিত হইয়াছে! ইহারা সকলেই পালিত হংস, কর্কশশব্দকারী বন্যহংস নহে। গৃহপালিত হংসদিগকে তাহাদের চঞ্চুতে ঝুঁটির ন্যায় কোন পদার্থ ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের দ্বারা বন্য পক্ষী হইতে প্রভেদ করা হইয়া থাকে। তাহাদের কণ্ঠধ্বনি তুরীনিনাদের ন্যায় সুললিত আর বন্য হংসগণের স্বর কর্কশ ঘংঘনে। সেইজন্য ইংরাজীতে ইহাদিগকে (whoopers বা whistlers বলে) গত বৎসর বসন্তকালে একটি বন্যহংস এই সুখপালিত রাজহংসদিগের শান্তিময় আবাসস্থল ও স্বাধীন জীবন দেখিয়া এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সে চিড়িয়াখানা হইতে অতিকষ্টে এইখানে পালাইয়া আসিয়াছিল। রক্ষক তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার সেইখানে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু অবশেষে করুণাপরবশ হইয়া হংসটিকে জলাভূমিতে স্বাধীনভাবে বাস করিতে দিল। অদ্যাবধি সে এখানে কর্কশ শব্দ করিতে করিতে বিচরণ করে, এবং পালিত হংসগণের মধ্য হইতে আপনার জীবনসঙ্গিনী মনোনীত করিয়া লইয়াছে।

আদিকাল হইতে ইহারা রাজহংস বা রাজকীয় পক্ষী (Royal Bird) নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। এবং অতি প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, সাধারণ জলাশয়ে যে সকল রাজহংস সন্তরণ করিবে, তাহারা রাজার অধিকারভুক্ত। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে এবট্‌স্‌বারীর মঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি বর্ত্তমান মালিক লর্ড ইল্‌চেস্‌টারের পূর্ব্বপুরুষ গাইল্‌স্ ষ্ট্রাঙ্গওয়েস্‌কে এই হংসপূর্ণ জলাভূমিটি পুরস্কারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। লর্ড ইল্‌চেস্‌টার চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে হংসের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

প্রত্যেক ঋতুতে হংসশিশুগুলি চিহ্নিত হয়। এবং মধ্যে মধ্যে অপহৃত বা দলভ্রষ্ট হংসদিগকে দাবী করিয়া ফিরাইয়া আনিতে রক্ষককে দশ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে হয়। একবার একজন এই রাজহংসগণের মধ্যে একটিকে গুলি করিয়া মারায় বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল। যদিও সে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়াছিল যে, ইহাকে একটি সামুদ্রিক পক্ষীবিশেষ বা গাং চিল বোধেই সে হত্যা করে; তথাপি তাহার সম্পূর্ণ দোষ ক্ষালন হইল না। এবং জরিমানাস্বরূপ তাহাকে এক সভরেন অর্থদণ্ড দিতে হইল। সম্বৎসর ধরিয়া প্রধান রক্ষক ও তাঁহার দুইজন সহকারী এই দীর্ঘ নয় মাইলব্যাপী জলাভূমিটিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

ইহাদের বাসনির্ম্মাণ ও ডিমপ্রসবের বিষয় মিঃ গিল তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট নিম্নলিখিত গল্প করিয়াছেন।

মার্চ্চমাসের মধ্যভাগে হংসগণ জলাভূমির কোন নিভৃত অংশে বাসা নির্ম্মাণ করিবার জন্য সমবেত হয়। একই জোড় প্রতি বৎসর প্রায় একই স্থানে বা তাহার এক গজের মধ্যেই বাসা প্রস্তুত করিতে আসে। নল শর খাগড়া প্রভৃতি তৃণদলের কোন অভাব নাই; জলমধ্যে এই সব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুরুষ হংসগণই এই সব সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং তাহাদের সাহায্যে হংসীগণ তৃণগুলি যথাযথ স্থানে স্থাপন

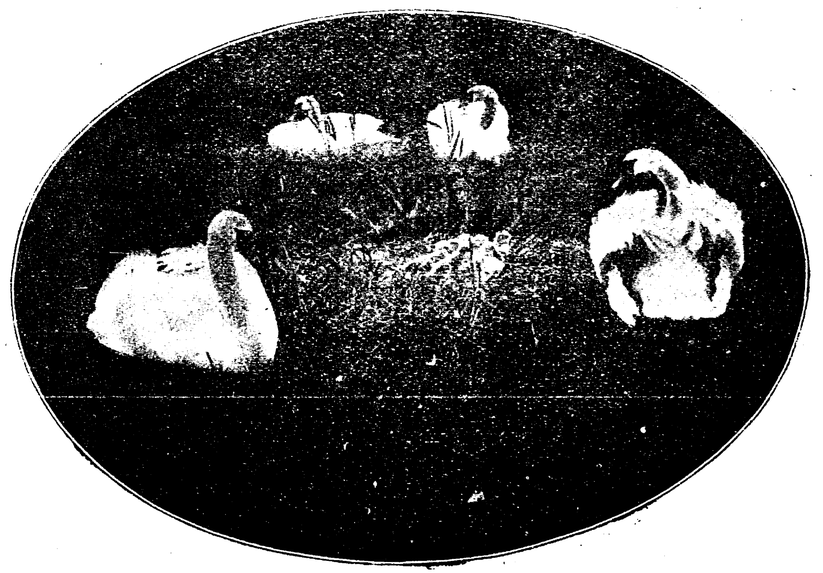

রাজহংসের বাসা

করে। বাসা প্রস্তুত হইয়া গেলে, ইহারা তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দিতে আরম্ভ করে। এবং বন্যায় সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে এইরূপ কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, ইহারা সমস্ত বাসাটি তুলিয়া লইয়া যায়। হংসী নিজ চঞ্চুর দ্বারা ডিম গুলি উচ্চে উঠাইয়া লইয়া যায়। ইহাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ। ইহাদের দাম্পত্য প্রেম প্রসিদ্ধ ও স্থায়ী। একই জোড়া পাখী আজীবন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ও প্রেমাসক্ত থাকে।

প্রায় এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ হইতেই ইহারা ডিম প্রসব করিতে আরম্ভ করে। কিম্বা যেদিন বাসা নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক পক্ষের মধ্যে ইহাদের ডিম পাড়া শেষ হইয়া যায়। সাধারণতঃ ছয়টি করিয়া ডিম্ব প্রত্যেকে প্রসব করে, এবং তন্মধ্যে পাঁচটিকে ফুটাইয়া তোলা হয়। কিন্তু মিঃ গিল তিনবার এক বাসায় ১১টি ডিমও দেখিতে পাইয়াছিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ দুইজনে পর্য্যায়ক্রমে ডিম গুলিতে তা দিয়া থাকে। হংসী দিনের মধ্যে একবার আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। তখন হংসগণ ডিমের উপর বসিয়া থাকে। নব-প্রসূতা হংসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক ঘণ্টা, কেহ বা পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল বাহিরে থাকে। এবং কাহারও সন্তানের প্রতি মায়া এত বেশী যে, ডিম ফুটাইবার সময় সে কিছুতেই তাহার অমূল্য ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া যায় না, এবং অবশেষে অনাহারে ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া অস্থিপঞ্জর সার হইয়া পড়ে। মে মাসের ১৭ই তারিখের কাছাকাছি ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ হয়। এবং সাধারণ নিয়মানুসারে একই বাসার সমস্ত ডিম একই দিনে ফুটিয়া উঠে। হংসশিশু ডিম হইতে বাহির হইয়া অসিলেই তাহার পায়ের বাহিরকার যুক্তাঙ্গুলিতে একটি খাঁজ কাটিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিবস শাবক গুলি প্রথম সন্তরণ দিবার জন্য জল ভ্রমণে বাহির হয়। ইহারা ধীরে ধীরে সোজা সাঁতার কাটিয়া যায়। এবং প্রথম প্রথম ইহাদিগকে একটু একটু হেলিতে দুলিতে দেখা যায়। হংসী শাবকদিগকে নিজের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া লইয়া আসে। কিন্তু ইহারা সহজে ইহাদের কঠোর-প্রকৃতি জনক জননীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে চায় না।

অনেক ঈর্ষান্বিত জনক শিশুহংসদিগকে হত্যা করিয়া ফেলে। কিন্তু জননীগণ—ইহাদের যতগুলি-ই শাবক থাকুক না কেন, আরও পাইবার জন্য লালায়িত হয়। প্রসূতপর হইলে ইহারা অপর দম্পতির সন্তানগণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে কিম্বা বিদ্বেষ পরবশ হইয়া তাহাদের মস্তক ধরিয়া নাড়া দেয়। কখন কখন জলের নীচে তৃণগুল্মের মধ্যে ছোট হংস-শাবকের মস্তক আবদ্ধ হওয়ায়, জলমগ্ন হইয়া যায়। ইঁদুরে অনেকগুলিকে বধ করে; এবং প্রতি ঋতুতে শৃগালের অত্যাচারেও অনেক গুলি প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের যথাসম্ভব রক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত কৃত্রিম উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন আবদ্ধ সীমার ভিতর পাঁচটি বয়ঃপ্রাপ্ত হংসকে রাখা হয়; এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে ৩০।৪০টি করিয়া হংসশিশু বাস করে।

সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহারা এই প্রশস্ত জল-পূর্ণ খোঁয়াড় বিশেষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ৪০টি হংসশাবককে ভোজের নিমিত্ত হত্যা করা হয়। এবং অবশিষ্ট গুলিকে মুক্ত করিয়া বিক্রয় করা হয়। মধ্যে মধ্যে জলাশয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়ন-রঞ্জক দুই একটি রাজহংস শিশুকে রাখিয়াও দেওয়া হয়। চারমাস বয়স্ক এক জোড়া হংসশিশুর মূল্য এক গিনি, এবং এক বৎসর বয়স্ক জোড়ের মূল্য দুই গিনি।

অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইহারা ইহাদের জননী বা পালিতা মাতার সহিত একত্রে বাস করে; তারপর নিজেদের পথ নিজেরা দেখিয়া লয়। এক বৎসর পূর্ণ হইলে ইহারা শৈশবাবস্থা ত্যাগ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে। এবং অষ্টাদশ মাস অতীত হইলে ইহাদের কলেবর সম্পূর্ণ পালক যুক্ত হয় এবং গায়ের রং নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। ইহার পর হইতে বৎসরে একবার জুন বা আগষ্ট মাসের মধ্যে ইহারা পালক ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। কতকগুলি হংসকে পালক ত্যাগ করিবার সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়; এবং এই যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার সময় ইহারা উড়িতে পারে না বলিয়া অনায়াসেই শৃগালের করাল কবলে পতিত হয়। রক্ষকগণ লেখনী প্রস্তুত করিবার জন্য পালক গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রতি বৎসর তাহারা প্রায় তিন চার হাজার পালক সংগ্রহ করে। প্রত্যেক হংস কলমের উপযোগী ৮টি পালক দান করে; এবং কলমের অনুপযুক্ত পালক গুলি সংগৃহীত হয় না। প্রত্যেক পক্ষ হইতে তিনটি করিয়া বৃহৎ পালকযুক্ত কলম বাহির হয়।

একদিন একজন দূরদেশ হইতে আগত দর্শক রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আপনি কি কখন বাসা নির্ম্মাণের সময় এই হংসদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন?" তাহাতে মিঃ গিল ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, —"আমার এই এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি কখন কোন মানুষের হাত বা পা হংস দ্বারা আহত হইতে শুনি নাই।" কিন্তু তিনি একটি গল্প বলিলেন যে পিটম্যান নামক একজন বৃদ্ধ রক্ষকের তিনটি পঞ্জর পশ্চাৎ হইতে অপত্যাশিত আক্রমণের ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পিটম্যান এবং তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দুইশত বৎসর যাবৎ এই হংসগণের রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে মিঃ গিল কি উপায় অবলম্বন করিয়া হংসের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। কেবল একটি বড় পক্ষের অগ্রভাগ ধরিলেই হংসের বলবিক্রম সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সৌধ-রহস্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের ছোট গ্রামখানিতে ক্লুমবার হলের অধিবাসীগণকে লইয়া খুবই জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। তাহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? এমন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন বাস, এরূপ আত্ম-গোপনের অর্থ কি? ইহাই ছিল সাধারণের কৌতূহল-প্রশ্ন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা গেল, যে ক্লুমবার হলের নূতন অধিকারী বড় অল্পদিনের জন্যই এখানে আসিতেছেন না। কারণ উইগটাউন হইতে রাজ-মজুর-মিস্ত্রী প্রভৃতি আসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি বিপুল উদ্যমে বাড়ী মেরামতির কাজ চালাইতে লাগিল। বাড়ীটার অস্বাভাবিক দ্রুত পরিবর্ত্তনে জেনারল হিথারষ্টনের ধনশালিতা সম্বন্ধে খেয়ালি লোকগুলার সন্দেহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। কেহ বলিল, তিনি আমেরিকার একজন ক্রোরপতি। কেহ বলিল, আরও কিছু।

বাবা বলিলেন, "লোকটির বোধ হয় পড়াশুনায় খুব অনুরাগ আছে, না হলে বেছে বেছে এমন নির্জ্জন স্থান পছন্দ করবেন কেন? আমার বোধ হয় কোন নূতন বিষয়ে কোন গভীর তত্ত্ব রচনা করবার জন্যই তিনি স্বেচ্ছায় এই বনবাসে আস্‌চেন,—তা যদি হয়, আমি মহানন্দে আমার লাইব্রেরীর সমস্ত বইগুলি তাঁকে পড়্‌তে দেব।"

এস্‌থার ও আমি বাবার মুখের সে গম্ভীর ভাব দেখিয়া কষ্টে উচ্ছ্বসিত হাস্য সম্বরণ করিলাম। লাইব্রেরীর খবর ত আর আমাদের অগোচর নাই। দুই থলি মাত্র বই লইয়া আমাদের লাইব্রেরী! আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান সত্য হতে পারে কিন্তু আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি, তাতে তিনি যে বিশেষ সাহিত্যানুরাগী, এমন ত আমার একবারও মনে হয় নি। আমার মনে হয় ডাক্তারের উপদেশে তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য আর দুর্ব্বল চিত্তকে তাজা করে নেবার জন্যই তিনি এই নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানটুকু পছন্দ করে নিয়েছেন। ব্যাধ ভয়ে ভীত হরিণের মত তীক্ষ্ণ সশঙ্ক চোখে তিনি যখন আমার দিকে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, আপনি যদি তখন তাঁর সে চাহনি দেখ্‌তেন বাবা, তাহলে বুঝ্‌তে পার্‌তেন বেচারার স্বাস্থ্য কতটা খারাপ হয়ে গেছে।"

হাতের সেলাইয়ের উপর হইতে চোখ উঠাইয়া বাবার মুখের পানে চাহিয়া এস্‌থার বলিল, "আমার ভারী জান্‌তে ইচ্ছে করচে বাবা, তাঁর স্ত্রী পুত্র কেউ আছে কি না? আহা, বেচারাদের বড্ডই ফাঁকা ঠেক্‌বে—সাত মাইলের মধ্যে আমরা ছাড়া ত আর কথা বলবার মত একটি প্রাণী নেই।"

ঈষৎ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বাবা বলিলেন, "জেনারেল হিথারষ্টন বড় কুপার পাত্র যে-সে লোক নয় জেনো,—তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিক।"

"কি করে জান্‌লেন আপনি বাবা? বলুন না, কি করে জান্‌লেন?" সবিস্ময়ে একসঙ্গে আমরা দুইজনেই এই প্রশ্ন করিলাম।

হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বাবা বলিলেন, "এই না, তোমরা আমার লাইব্রেরীর ক্ষুদ্রতায় মনে মনে হাস্‌ছিলে—আমি বুঝি তা বুঝিনি?" কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সেল্‌ফের উপর হইতে একখানা লাল রঙের ছোট বাঁধান বই লইয়া আসিলেন। বইখানা ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিভাগের তালিকা।

"এই দেখ, এতে তাঁর নাম রয়েচে, জে, বি, হিথারষ্টন, কমাণ্ডার অফ্‌ দি বাথ্‌। ইনি আবার একজন "ভি-সি"। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বঙ্গীয় ৪১নং পদাতিক সৈন্যের কর্ণেল ছিলেন। তার পর দেখ, আর এক জায়গায় তাঁর জীবনের কার্য্যাবলীর উল্লেখ রয়েচে, "গজনী-অবরোধ", "জেলালাবাদ-রক্ষা" "সিপাহী-বিদ্রোহে অযোধ্যাপ্রদেশ শাসন" সরকারী কাগজ-পত্রে পাঁচবার তাঁর নাম তোলা আছে। আমার মনে হয় এমন প্রতিবাসীর জন্য আমাদের গর্ব্ব করা উচিত!"

এস্‌থার তাহার হস্তস্থিত সেলাইটার উপর হইতে চোখ তুলিয়া সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবা, তাঁর বিয়ে হয়েছিল কি না, ও বইখানাতে কিছু লেখা নেই, বোধ হয়?"

বাবা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "না মা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনার মধ্যে ও ঘটনাটার কোন উল্লেখ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, যদিচ সেটা থাক্‌লে ভালই হত!—তা যাই হোক, খুব সম্ভবত দু-একদিনের মধ্যেই তোমরা এই অদ্ভুত প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেল্‌তে পার্‌বে।"

সত্যই আমাদের সন্দেহ শীঘ্র একদিন মিটিয়া গেল। বাড়ী মেরামতির কার্য্য যেদিন শেষ হইয়া গেল, সেইদিনই কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমায় উইগটাউনে যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় মধ্য পথে অতর্কিতভাবে সহসা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। একখানা নূতন গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহারা ক্লুমবারের অভিমুখেই যাইতেছিলেন। জেনারেলের পার্শ্বে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি একজন অর্দ্ধবয়স্কা রমণী, তাঁহারই মত শীর্ণ দেহ, চিন্তা-মলিন মুখ। সম্ভবত ইনিই মিসেস্‌ হিথারষ্টন্‌! গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে আমার সমবয়সী একটি যুবক ও তাঁহার চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট একটি সুন্দরী বালিকা। আমি টুপিটা একটু উঁচু করিয়া সম্মান দেখাইয়া গমনোদ্যত হইলে, কি জানি, কি মনে করিয়া, জেনারেল সহসা সহিসকে গাড়ী থামাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পালিত হইলে বন্ধুভাবে আমার করমর্দ্দনের জন্য তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। দিনের আলোয় তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। যদিও সে মুখে একটা কঠোর কর্কশ ভাব সুপরিস্ফুট, তথাপি তাহার ভিতর হইতে কোমলতার ঈষৎ আভাষ, যেন, খুঁজিলে মিলে। জেনারেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তারপর মিঃ ওয়েষ্ট, আছ কেমন তুমি? আমি আজ আবার আমার সেদিনকার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইচি। বয়স হয়েচে, আর যুদ্ধের কাজেই চিরটা কাল কেটে গেল, সমাজের আদব-কায়দা আমাদের ততটা জানাশোনাও নেই। তা হলেও এটা তোমায় স্বীকার কর্‌তেই হবে

যে, স্কচ্‌ম্যানের পক্ষে তোমার রংটা কিছু বেশী ময়লা।”

আবার সেই অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণায় একটু বিস্ময় বোধ করিয়া আমি উত্তর দিলাম, “আমাদের শরীরে স্পেনিস্ রক্ত মিশ্রিত থাকায় আমাদের রঙ একটু আলাদা রকম হয়েচে। এ ছাড়া বর্ণের বিভিন্নতার আর কোন কারণ নেই।”

আমার কথার উত্তরস্বরূপ শুধু একটি ছোট ‘ওঃ’ বলিয়াই তিনি আবার কহিলেন, “মিঃ ওয়েষ্ট, ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী—এইটি আমার ছেলে মরডণ্ট, আর এটি মেয়ে গেব্রিয়েল। সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে আমরা শুধু একটু শান্তির আশায় এখানে এসেচি।” জেনারেলের কথার শেষদিককার সুরে ও ভাষায় এক মুহূর্ত্তে আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়া গেল। তাই ঠিক! বেচারা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াই সমাজের উপর চটিয়া গিয়াছে। আহা, শান্তিহীন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী!

একটু সাগ্রহ সহানুভূতি দেখাইয়া আমি বলিলাম, “তা হলে আপনাকে ঠক্‌তে হবে না। এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথাও পাবেন না। প্রকৃতি দেবী এখানে দুহাতে শান্তি ছড়াচ্ছেন!”

“আঃ! তুমিও তা হলে তাই মনে কর? আমারও মনে হয়েছিল, স্থানটি বেশ নির্জ্জন, শান্তিপূর্ণ। তা হলে দেখছি আমি প্রতারিত হই নি! আমার বোধ হয় রাত্রে কেউ যদি পথে বেড়িয়ে বেড়ায়—তা হলে কোন মানুষের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না,—না?”

“না, তা হয় না। তার কারণ সন্ধ্যার পর পথে কেউ বেরোয় না এখানে। অর্থাৎ বেরুবার মত লোকও কেউ নেই।”

জেনারেলের মেঘাবৃত মুখের উপর হইতে যেন ভাবনার একখানা গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ সরিয়া গিয়া মুখে একটা প্রসন্নতার স্বচ্ছতা ফুটিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত কোমল সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, এখানে কি বেদে নাগা ফকির সন্ন্যাসীর কোন উৎপাত আছে? আমার বোধ হয়, নেই—নয়?”

মিসেস হিথারষ্টন গায়ের শীত-নিবারক সীল্-স্কিনটা একটু টানিয়া গায়ে ঢাকা দিয়া ত্বরিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমার ভারী শীত লাগচে—আর মিঃ ওয়েষ্টকেও আমরা অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেচি।” চকিত দৃষ্টিতে একবার পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা বিচলিতভাবে জেনারেল বলিয়া উঠিলেন, “সত্যি! কোচম্যান্ গাড়ী হাঁকাও—বিদায় মিঃ ওয়েষ্ট—আপাততঃ তা হলে বিদায়।”

গাড়ী দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেলে ধীরে ধীরে আমি আমার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ ম্যাকলীনের সহিত দেখা হইয়া গেল। ম্যাকলীন আমায় পথে দাঁড় করাইয়া খবর দিলেন যে ক্লুমবার হলের নূতন অধিকারী আজ হইতে বাস করিতে সুরু করিলেন। আমি বলিলাম, “রাস্তায় তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।” কথাটা বলিয়াই আমি ম্যাকলীনের মুখের পানে চাহিলাম। পাঁওরুটীর মত তাহার ফুলা গাল দুইটা মদ্যপানে আরক্ত! মুখে-চোখে আনন্দের একটা উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার কথায় হাসিমুখে সে ক্ষুদ্র চক্ষু যথাসম্ভব

বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “শুভ সংবাদ, মিঃ ওয়েষ্ট! তা হলে আপনার প্রতিবাসীকে আপনি চিনে নিয়েচেন—কেমন দেখলেন, বলুন দেখি?”

বক্র কটাক্ষে ম্যাকলীনের মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিলাম, “মন্দ কি? আমার বোধ হয় লোকটীর স্বাস্থ্য ভাল নয়। এ জায়গাটায় তাঁর লিবারের action ভাল হবে!”

ম্যাকলীন তাহার হাতের বেতের সরু ছড়ি গাছটি মাটিতে ঠুকিয়া হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে ক্ষুদ্র মিট মিটে চোখের রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপিত রাখিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে সে বলিল, “না মিঃ ওয়েষ্ট, তা নয়, এর চেয়ে তিনি যদি উইগটাউনের প্রাচীর-বেষ্টিত কোন অট্টালিকায় বাস করতেন, তা হলেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা হত—তা তিনি নিজের বাড়ীটিকেও অনেকটা সেই ধরণে তৈরি করিয়েছেন।”

বাধা দিয়া বিস্ময়ের সহিত আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কি তা হলে তাঁকে উন্মাদ বল?”

“তা ছাড়া আর কি, বলুন! সহর ছেড়ে, ভাল ভাল দেশ ছেড়ে, এই একটা অগাপড়া দেশে—ক্লুমবারের মত একটা পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ীতে জেলখানার মত পাঁচিল গাঁথিয়ে যে বড়লোক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গোপন বাস করতে আসে, তাকে পাগল ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যেতে পারে, তা ত আমি জানি না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “এই মাত্র,—তা বড় লোকদের এ রকম অদ্ভুত খেয়াল হয়, শুনেচি। তাই বলে—”

আমার কথায় বাধা দিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ম্যাকলীন বলিল, “হাঁ, বড়লোক যদি বল্‌তে হয় তা হলে এই রকম! তাঁদের সঙ্গে কারবার করে সুখও আছে—এই দেখুন না—আজ সকালেই জেনারেল একখানা চেক্ দিয়ে আমায় জিজ্ঞেশ কল্লেন, “কত টাকা ফেলব?” আমি বল্লেম, “দু’শ পাউণ্ড লিখুন।” অবশ্য তাতে আমার নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রেখে ছিলেম, তা জেনারেল চেক্‌খানা লিখে এম্‌নি তাচ্ছল্য করে আমার দিকে সেটা ফেলে দিলেন যে, একখানা ছেঁড়া দু পয়সার ডাক্-টিকিটও মানুষ ততটা অগ্রাহ্য করে না।”

আমি বলিলাম, “আমার বিশ্বাস ছিল, এ সবের জন্যে বাড়ীওলা আপনাকে মাহিনা দেন?”

“তা দেবে না কেন! তবে দু পয়সা যদি উপরি আসে, গরীব মানুষ, কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, পেলে ছাড়ি কেন? আমি ত আর জোর করে আদায় করিনি, তিনি ভদ্রলোক, দরাজ হাত। আসুন না, মিঃ ওয়েষ্ট, ঘরের মধ্যে আসুন না, এক গেলাস খেয়ে যাবেন—বেশ ভাল জিনিষ আছে।”

“না, ধন্যবাদ! আমার দরকারী কাজ আছে, তা ছাড়া সকাল বেলা কখনো আমি মদ খাই না, খাওয়াটা ভালও নয়!”

“আমারও মশায়, সব বাঁধা নিয়ম। প্রাত রাশের সময় দু গেলাস, তারপর হজম করবার জন্যে এক কিম্বা দু গ্লাস—দুপুর বেলার আগে আর আমি মদ ছুঁইও না। সে যাই হোক—

বলছিলেম কি ? জেনারেলের কথা—লোকটা পাগল—একেবারে বদ্ধ পাগল। পাগলের লক্ষণ কি, মিঃ ওয়েষ্ট ?”

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম, “কেন, উইগটাউনের বাড়ীওলার লোককে বিনাবাক্যে দুশো পাউণ্ডের চেক্ কেটে দেওয়া !”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বুঝতে পারচি, আপনি আমায় ঠাট্টা কচ্চেন ! আচ্ছা, আপনি বলুন দেখি, যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, এ জায়গাটা সব চেয়ে নিকটের বন্দর থেকে ক মাইল তফাতে ? ভারতবর্ষের দিক থেকে কোন জাহাজ এখানে আসে কি না ? রাস্তায় নাগা ফকির বেদে সন্নিসি ঘুরে বেড়ায় কি না ? বাড়ীর এগ্রিমেণ্টে বাড়ীওলা ভাড়াটেকে তাঁর ইচ্ছামত উঁচু পাঁচালি তুলে নিতে দেবেন কি না ? এই রকম যদি সব প্রশ্ন হয়, তা হলে আপনি তাকে কি মনে করেন ? পাগল বলেন না কি ?” একটু গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হাস্য গোপন করিয়া আমি বলিলাম, “অবশ্য এ রকম হলে তাঁকে অদ্ভুত প্রকৃতির লোক বলেই মনে করতে হয় বই কি !”

“আমার পরামর্শ যদি নিতেন, তা হলে আমাদের বন্ধু সহজেই উঁচু পাঁচালি-ঘেরা বাড়ীও পেতে পারতেন, আর তাতে এক পয়সা খরচা ছিল না।” আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তেমন পছন্দসই বাড়ীটি কোথায় ?”

“কেন, আমাদের উইগটাউনের পাগলা গারদ !”

ম্যাকলীনের উচ্চ হাস্যধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাই শুনিতে শুনিতে আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মনের মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ “পাগলা গারদ” কথাটা বহুক্ষণ ধরিয়াই তোলাপাড়া করিতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল, বাস্তবিকই কি তাই ? সত্যই কি লোকটা পাগল ? এত বড় জেনারেল—!

ক্লুমবার হলের অধিবাসীরা আসা সত্ত্বেও আমাদের একঘেয়ে জীবন-যাত্রায় পরিবর্ত্তনের কোন আভাষ দেখা গেল না। সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের নিত্য কার্য্য, অপরাহ্নে সমুদ্রে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া, এসথারের সহিত একত্রে দিগন্ত-প্রবাহিত নীলাম্বুর সহিত অনন্ত-প্রসারিত নীলাকাশের মিলন-ক্ষেত্রে অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের অননুভূতপূর্ব্ব মহামহিম সৌন্দর্য্য দর্শন করা,—রাত্রে বাবার সহিত আহারান্তে সাহিত্যালোচনা করিয়া নিদ্রা যাওয়া—ইহা ছাড়া অন্য নূতন কার্য্যও আর কিছু ছিল না। আমাদের নূতন প্রতিবাসিরা বাহিরে বেড়ানো বা লোকের সঙ্গে মেলামেশা এ সব কিছুই করিতেন না। এমন কি তাঁহাদের শরীরের ছায়াটি পর্য্যন্ত কোনদিন ফটকের বাহিরে পড়িতে দেখা যায় নাই। মুসলমান মহিলার মতই তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সকলেই পর্দ্দানশীন্। তাহার পর ম্যাকলীনের সেই পরিহাস-বাক্যকে সত্যে পরিণত করিতে অল্পদিনের মধ্যেই একদিন দেখা গেল, কতক গুলি মিস্ত্রী আসিয়া জেনারেলের বাড়ীর চারিধারের কম্পাউণ্ড ঘিরিয়া কাঠের উচ্চ

দেওয়াল তুলিতে সুরু করিয়াছে। বেড়াটা এত উচ্চ যে, তাহা টপ্‌কাইয়া কেহ ভিতরে প্রবেশ করিবে, এমন সম্ভাবনা রহিল না। বেড়ার মাথায় তীক্ষ্ণ-মুখ লোহার বড় বড় গজাল লাগাইয়া দেওয়া হইল। আমাদের মনে হইল, রণস্থলে থাকিয়া থাকিয়া জেনারেল এই সবগুলায় এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে দুর্গ-রক্ষার মত আপনার গৃহ রক্ষা করাও তাঁহার চক্ষে একটা সঙ্গীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও একটু বৈচিত্র্য ছিল, দুর্গ-অবরোধের সম্ভাবনায় যেমন দুর্গ-মধ্যে সৈনিকদের রসদ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, তেমনি ভাবেই তিনি তাঁহার সুদূর ভবিষ্যতের কোন কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ছিলেন। এক-দিন কথা-প্রসঙ্গে সহরের একজন বড় দোকানীর কাছে জানিলাম, প্রায় এক বৎসরের খরচের মত জিনিষ-পত্র তিনি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এরূপ ঘটনায় সাধারণতঃ যেমন ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ সরল ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহারা ক্রমশই সাধারণের কৌতূহল দৃষ্টির লক্ষ্য ও আলোচ্য হইয়া উঠিতেছিলেন। সকলেই নিজ বিশ্বাস-অনুযায়ী তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচিত্র মত প্রকাশ করিতে লাগিল। তবে অনেকেই বলিত, লোকটা পাগল। তাঁহার পরিবারবর্গও যে তাঁহার অনুরূপ, এ বিষয়ে মত-দ্বৈধ রহিল না। আর যদি নিতান্তই তাহা না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা কোন ভীষণ অপরাধে অপরাধী। এবং রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি-লাভের আশায় এই সুদূর নির্জ্জন বাসে আত্মগোপন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁহারা কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও এ দুইটী হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তথাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ! প্রথম যেদিন জেনারেলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি-ক্লিষ্ট অদ্ভুত প্রকৃতির মানব বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে তাঁহাকে একজন জ্ঞানী ভদ্রলোক বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিল। তদ্ভিন্ন স্ত্রী-পুত্র লইয়া তিনি বাস করেন। শুধুই যে নিজের জন্য নির্জ্জন বাস, তাহাও নহে। কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া শাস্তির ভয়ে আত্মগোপন করা—তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উইগটাউন নির্জ্জন স্থান হইলেও এখানে পুলিশ বা টেলিগ্রাফের অভাব নাই। আর যে পলাতক আসামী আত্মগোপনের ইচ্ছা করে, সে কি আপনার অনন্য সাধারণ কার্য্যা বলী দ্বারা লোক-চক্ষে আপনাকে অধিকতর প্রকাশ করিয়া বেড়াব ! নাম গোপন করিয়া সাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাহাকেও সন্দেহের ছায়াটুকু না দেওয়াই ত তাহার পক্ষে নিরাপদের একমাত্র উপায়।

আমার বোধ হয়, জেনারেলের নিজের কথাই ঠিক ! সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সমর-কোলাহল শুনিয়া শুনিয়া শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন এখন শান্তি চাহিতেছে, তাই স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসন-দণ্ড তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আর কিছু না হউক, লোক-সঙ্গের সম্ভাবনা এখানে খুবই অল্প।

সে যাহা হৌক—তাঁহার নির্জ্জন প্রিয়তার সীমা যে কতখানি, তাহা আমরা শীঘ্রই একদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

সে দিন সকালে চা-পানের পর বাবা আদেশ দিলেন, "জন, তুমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও, আর এস এস্থার, তুমি তোমার গোলাপী পোষকটা পর, সেইটেতে তোমায় খুব ভাল দেখায়—আমি মনে কচ্চি, আজ একবার হিথারষ্টনদের সঙ্গে আলাপ করে আসব।" চায়ের পেয়ালায় অত্যধিক পরিমাণে চিনি ঢালিয়া, লজ্জিত আরক্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ না তুলিয়াই এসথার জিজ্ঞাসা করিল, "ক্লুমবার হলে যাবে বাবা?"

বাবা অকালোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলেন, "যদিও আমি এখানকার জমিদারের কর্ম্মচারী, তবুও জমিদার, কারণ আমি তাঁর ভাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের নবাগত প্রতিবাসীদের কোন উপকারে লাগা, তাঁদের খবরাখবর নেওয়া আমার কর্ত্তব্য। সে যাই হোক, তাঁরা এখানে নিজেদের খুবই সঙ্গী-হীন মনে কচ্ছেন! কবি ফারদুসি বলেছেন, 'এ জগতে বন্ধুসম রত্ন কিছু নাহি আর! বন্ধু মানবের দেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার!' কিন্তু এসথার, তুমি আজ চা-টাকে একেবারে সরবৎ বানিয়ে ছেড়েছ!"

বাবা যখন কোন প্রাচ্য কবির কবিতার কোটেশন দিয়া কথা কহেন, তখন যে ঈপ্সিত কার্য্যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল, এ সম্বন্ধে আমাদের ভাইবোনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। নূতন প্রতিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও বড় অল্প ছিল না। আমরা আনন্দের সহিত বাবার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।

সেইদিন অপরাহ্ণে কাকার ছোট ফিটেন-খানিতে চড়িয়া আমরা ক্লুমবার হলের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তখন নীল আকাশের গা বহিয়া সারি বাঁধিয়া লঘু মেঘখণ্ডের মত সমুদ্র পক্ষীর দল উড়িয়া চলিয়াছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। শরতের অকাল সন্ধ্যা তখনও ঘনাইয়া আসে নাই। কৃষকেরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর গুণ-গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিতেছিল। দূরে মাঠের ধারে লাল টালির ছাদ দেওয়া তাহাদের ছোট ছোট কুটিরগুলিই এখন তাহাদের একমাত্র আকর্ষণের সামগ্রী। কাহারও বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি কলহাস্য তুলিয়া দূর হইতে তাহাদের অভিমুখেই ছুটিয়া আসিতেছিল।

বাবার ইচ্ছা ছিল, আমাদের প্রতিবাসীরা আমাদের দেখিয়া এমন না মনে করেন যে, আমরা তাঁহাদের প্রতিবাসী হইবার একেবারেই যোগ্য নহি! সেইজন্যই বেশভূষায় আমার বিশেষ অনুরাগ না থাকিলেও সেদিন একটু চেষ্টা করিয়াই যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন হইয়াছিলাম! আর স্বভাব-সুন্দরী এস্থার উজ্জ্বল বস্ত্রে, কাকার দেওয়া সুদৃশ্য মুক্তার মালা ছড়াটি ও তাহার প্রথম বৎসরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাবার দেওয়া মুক্তাখচিত ছোট সুবর্ণময় ব্রোচটিতেও তাহার মধুর সৌন্দর্য্যটিকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল! আর আমাদের কালো ছোট ছোট ঘোড়াদুটি—এ দুটিও সৌখীন লোকের নিকট অল্প আদরের জিনিষ নয়!

কিন্তু মানবের গর্ব্ব বুঝি ভগবানের

সহ্য হয় না,—আমরা ক্লুমবার হলের ফটকের সম্মুখে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। একখানা প্রকাণ্ড কালো কাঠের সাইন্‌বোর্ডে বড় বড় সাদা রঙের অক্ষরে লেখা আছে,—"জেনারেল এবং মিসেস্ হিথারষ্টন তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাবর্দ্ধনে একান্ত অক্ষম।"

স্তম্ভিত হইয়া সেই অভাবনীয় অদ্ভুত অক্ষরগুলার প্রতি বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া এস্থার ও আমি আমাদের উচ্ছ্বসিত অদম্য হাস্যস্রোত চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু নিমেষের মধ্যে আমাদিগকে আত্মদমন করিয়া যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে হইল। কারণ বাবা তখনই বাড়ীর দিকে গাড়ী ফিরাইলেন। তাঁহার চিরপ্রসন্ন সহাস্য মুখমণ্ডল সহসা গ্রীষ্মের আকাশের মতই যেন গুমট মেঘে সজল গম্ভীর দেখাইতেছিল। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে কুঞ্চিত ললাটে পরিষ্কার অক্ষরে যেন লেখা ফুটিল, "নিতান্ত অসভ্য অভদ্র আচরণ।" কোন সাধারণ ঘটনায় কোনদিন তাঁহাকে এতাদৃশ বিচলিত হইতে, বোধ হয়,আর কখনও আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। তাঁহার নিজের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিয়াছে, ইহাই যে একমাত্র কারণ তাহা নয়—তাঁহার ক্রোধের প্রধান কারণ বোধ হয় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে দেশের জমিদারকে অপমান করা! তিনি নিজে অন্যায় করেন না, তাই পরকৃত এতটুকু অন্যায়ও তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকেরা হয় ত আমায় নিতান্ত নির্লজ্জ মনে করিবেন। কিন্তু বাস্তবিকই সেদিনকার সেই শিশুসুলভ অপমানটা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পরদিন বৈকালের দিকে লাইব্রেরী হইতে একখানা নবাবিষ্কৃত আইনের পুস্তক আনিবার জন্য আমি ক্লুমবার হলের সম্মুখের রাস্তা দিয়াই সহরের দিকে যাইতেছিলাম। হঠাৎ পূর্ব্বদিনের হাস্যকর অভিনয়টা মনে পড়িয়া গেল। কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া সাইন্‌বোর্ডটা দেখিতে দেখিতে সকৌতুকে ভাবিতেছিলাম, "এমন অপূর্ব্ব খেয়ালের অর্থ কি?" এমন সময় সহসা দেখিলাম, ফটকের মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মুখ ও একখানি শুভ্র সুগোল ক্ষীণ হস্ত আমাকে নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। একটু নিকটে অগ্রসর হইতেই চিনিতে পারিলাম, সে আমাদের অপমানকারী জেনারেল হিথারষ্টনের কন্যা! তেমন মুখের, বিশেষতঃ, হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ সেই নীল নির্ম্মল দুইটি মনোহর নেত্রের কোমল দৃষ্টির আবাহন উপেক্ষা করা কোন হৃদয়বান মানবের পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি একটু ইতস্ততঃ না করিয়াই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। বালিকা চকিত ভীত কটাক্ষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু গুঞ্জন স্বরে বলিল; "মিঃ ওয়েষ্ট, কালকের ব্যবহারের জন্য আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন কি? কাল আপনারা যখন ফিরে যান—দাদা তখন ফটকের কাছেই ছিলেন,—কিন্তু তিনি আর কি করবেন বলুন—তাঁর ত

কোন হাত নেই। বিশ্বাস করুন, মিঃ ওয়েষ্ট, ঐ অপমানজনক সাইন্‌বোর্ডখানা আপনাদের মনে যত কষ্ট দিয়েছে, তার লক্ষগুণ কষ্ট আমাদের—দাদার আর আমার মনে দিতে বাদ রাখে নি। ঐ সাদা অক্ষরগুলার প্রত্যেকটি কশাঘাতের মতই আমাদের অন্তরে আঘাত করেচে।"

আমি বিস্মিতভাবে বালিকার মুখের প্রতি চাহিলাম। তাহার পর কোমল স্বরে একটু হাসিয়া উত্তর দিলাম, "কুমারী হিথারষ্টন্, এই স্বাধীন দেশে যদি কোন ব্যক্তি অপরকে তাঁর বাড়ীতে আস্‌তে দিতে অনিচ্ছুক হন, তা হলে তা না পারবেন কেন?"

অসহিষ্ণুভাবে বালিকা বলিয়া উঠিল, "ভাব্‌তেও আমরা লজ্জায় মরে যাচ্চি যে আপনার বোন্‌কেও এই লজ্জাকর অপমানের অংশ গ্রহণ কর্‌তে হয়েচে।"

মেয়েটিকে ব্যথিত দেখিয়া ঈষৎ সহানুভূতির সহিত বলিলাম, "এর জন্যে আপনাদের এতটা দুঃখিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। হয় ত আপনার বাবার এমন কোন বিশেষ কারণ ছিল, যাতে বাধ্য হয়ে তাঁকে এই রকম ব্যবহার কর্‌তে হয়েচে।"

সুগভীর বিষাদের ছায়া সুন্দরীর ম্লান নেত্রে প্রতিভাত হইল। অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বালিকা উত্তর দিল, "সত্যই তাই! ঈশ্বর জানেন—বাবা কত নিরুপায়। কিন্তু আমার মনে হয় বিপদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার লাঞ্ছনার চেয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়ান ঢের ভাল। অবশ্য তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন, এ সম্বন্ধে এই,—কে আস্‌চে না?"

বালিকা ভীত নেত্রে বাগানের পথের দিকে চাহিয়া রহিল। "ওঃ দাদা,—তুমি! দেখ দাদা, কালকের ঘটনার জন্য আমি মিঃ ওয়েষ্টের কাছে মাপ চাইছিলেম।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আগন্তুক বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিজে এসে আপনার কাছে মাপ চাইতে পারায় সত্যই ভারী খুসী হয়েচি। আমি ভেবেছিলাম, আপনার বাড়ীতে গিয়ে আপনাদের তিন জনের কাছেই মাপ চাইব। গেব্রিয়েল, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও, এখনি তোমার খোঁজ পড়্‌বে, খাবার সময় হয়ে এল। মিঃ ওয়েষ্ট, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

গেব্রিয়েল—বালিকাকে এখন হইতে এই নামেই আমি অভিহিত করিব—আমার দিকে সহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃক্ষান্তরাল দিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলে মরডণ্ট গেটের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল, পরে সন্তর্পণে গেট বন্ধ করিয়া কহিল, "মিঃ ওয়েষ্ট, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সঙ্গে একটু বেড়াতে ইচ্ছা করি। কোন বাধা আছে কি?"

আমি সানন্দ চিত্তে উত্তর দিলাম "না, কিছু না, মিঃ মরডণ্ট। আমি আনন্দে সহিত আপনার ভ্রমণের সঙ্গী হব।"

মরডণ্ট কহিল, "আমি আপনাকে একটা গোপনীয় কথা জানাব—আমরা এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত আজ এই প্রথম গেটের বাইরে পা দিয়েচি।"

"আর আপনার বোন্? তিনি বোধ হয় এখনও সে সুযোগ পাননি!"

"না, সে কখনও বাইরে বেরুতে পায় না, আমিও আজ লুকিয়ে এলেম বৈ ত নয়। বাবা যদি জানতে পারেন, তা হলে যে মোটে খুসী হবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর খেয়াল, আমরা ফটকের বাইরে বেরুব না। কৃপণের স্বর্ণমুদ্রার মত লোকচক্ষুর অগোচরে গোপনে বাস কর্‌ব। লোকে বলে, তাঁর "খেয়াল", কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। এ রকম করবার বিশেষ কারণও আছে। তবে আমার বিশ্বাস, তিনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি কচ্চেন,—এতটার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

এ কথার তাৎপর্য্য কি? আমি বিস্মিত হইলেও আলোচনা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে বোধ করি আপনার খুবই ফাঁকা ফাঁকা লাগে? আপনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী যাবেন? ঐ—ঐ—যে, আমাদের বাড়ীর ছাদ দেখা যাচ্চে!"

"ভারী খুসী হলেম—আপনার নিমন্ত্রণ নেবার চেষ্টা কর্‌ব। বাড়ী থেকে বেরুবার এমন সুযোগ পেলে আমি খুসীই হব, তার কারণও আছে। এখানে আমাদের কোচম্যান ইজরেল ষ্টেক, আর বাগানের মালী ছাড়া কথা বলবার লোক ত আর কেউ নেই!"

"আর আপনার ভগ্নী—তাঁর কষ্ট বোধ হয় আপনার চেয়েও বেশী?"

আমার নবীন বন্ধুটি যে নিজের দুঃখকেই এতটা বড় করিয়া দেখিতেছেন, আত্মীয়দের কথা মনেও আনিতেছেন না, ইহা আমার কেমন বিসদৃশ মনে হইতেছিল। অনেকটা তাচ্ছিল্য-ভাব দেখাইয়া উদাসীনভাবে মরডণ্ট উত্তর দিল, "হাঁ, গেব্রিয়েলেরও কষ্ট হয় বই কি! তবে আমার বয়সী পুরুষ মানুষের পক্ষে এ রকম বন্দীভাবে থাকা যতটা কষ্টকর, স্ত্রীলোকের পক্ষে অবশ্য ততটা হতে পারে না। মিঃ ওয়েষ্ট, আমার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি, আমার বয়স এখন তেইশ পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট মাড়াইনি। সাধারণ জেলে বা ঘেষেড়াদের মতই আমি মূর্খ। কথাটা হয়ত আপনার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই তাই! ভেবে দেখুন দেখি, আমার অদৃষ্ট এর চেয়ে অনেক বেশী ভাল হওয়া উচিত ছিল না কি?"

আমার উত্তরের আশায় মরডণ্ট আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আমার মনে হইল, "সত্য! এমন করিয়া শৃঙ্খলিত-পদ খাঁচায়-বদ্ধ পাখীর মত জীবন কাটাইবার জন্য—দুর্ল্লভ মানব জীবনের সৃষ্টি হয় নাই। দীর্ঘাকার স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখ, যেন "সেমিডরিলো" কিম্বা ভিলাকিউয়ের অঙ্কিত চিত্রেরই মত। তাহার সেই উচ্চ মনোবৃত্তির ছায়া-সন্নিপাতে দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, সূক্ষ্ম চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগ আর সুসম্বদ্ধ দেহের সরল সুন্দর ভাব তাহার মানসিক তেজ ও ক্ষমতাই যেন অভিব্যক্ত করিতেছিল। একটু চিন্তিতভাবে উত্তর দিলাম, "শিক্ষা দু রকম। এক, বাহিরের, আর এক

অন্তরের অভিজ্ঞতার। পুঁথিগত বিদ্যা যদিও আপনার না থাকে, তবু শেষোক্ত শিক্ষা, বোধ হয়, যথেষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস চিরদিন আলস্যে বা আমোদ-আহ্লাদে আপনার দিন বৃথা কাটেনি!"

"আমোদ-আহ্লাদে?" বলিয়াই যুবক মাথা হইতে ত্রস্ত হস্তে টুপিটা খুলিয়া ফেলিলে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত আমি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার তরঙ্গায়িত কোমল কেশ রাশির অধিকাংশই শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি চমকিয়া উঠিলাম। কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। একটু করুণ বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "আপনি কি মনে করেন, আমোদ-আহ্লাদে মানুষের অল্প বয়সে কালো চুল সাদা হয়ে যায়?"

কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ কিছু একটা বলাও উচিত মনে হইল। অগত্যা যেমন মনে আসিল, সেই মতই বলিলাম, "বোধ হয়, ছেলেবেলায় আপনার কোন রকম কঠিন পীড়া হয়ে থাকবে?"

"পীড়া? না, জীবনে শারীরিক পীড়া আমার বিশেষ কিছু হয় নি।"

"তা হলে বোধ হয় কোন রকম বড় আঘাত পেয়ে থাকবেন! না হয় ত কোন গভীর মানসিক চিন্তাই আপনার চুলগুলিকে সাদা করে তুলেচে। আপনার বয়সী আর দু জনকে আমি জানি, ঐ রকম ঘটনায় তাঁদেরও কালো চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েচে।"

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মরডণ্ট উত্তর দিলেন, "আহা বেচারারা—তাদের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এইখান হইতেই আমাদের বাড়ী ফিরিবার দিকে একটা শাখা পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। মরডণ্ট কহিল, "মিঃ ওয়েষ্ট, আপনি হাসচেন? কিন্তু আমি সত্যি বলচি, আপনার নিমন্ত্রণের কথা শুনে গেব্রিয়েলও খুব খুসী হবে। বাবার সেই লজ্জাকর সাইনবোর্ড-ঘটিত ব্যাপারের পর আপনাদের এই অযাচিত অনুগ্রহ,—এ আমরা কখনই ভুলতে পারব না।

সাগ্রহে অভিবাদন করিয়া মরডণ্ট বাড়ীর পথে ফিরিয়া গেল। কিন্তু তখনই দুই চারি হাত দূরে গিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া আমিও দাঁড়াইলাম। মরডণ্ট বলিল, "আমার মনে হল আপনারা হয় ত ক্লুমবার হলের ব্যাপারটাকে একটা জটিল রহস্য বলে মনে করচেন। আর আমরা সত্য সত্যই পাগলা গারদের পাগল কি না, সেইটে পরীক্ষা করতে এসেছিলেম!—অবশ্য সে জন্য আমি আপনাকে অনুযোগ করচি না। এ অবস্থায় সকলেই এমন করে থাকে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ না হলে সব কথাই আমি আপনাকে জানাতেম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আপনাকে যদি সব কথা বলি, তাতেও যে আপনি বিশেষ কিছু বুঝতে পারবেন, এমন নয়,—তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, যেমন আপনি ও আমি, আমার বাবাও ঠিক তেমনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান সুস্থ মানুষ। তাঁর এই রকম গোপন অজ্ঞাতবাসের যথেষ্ট হেতুও আছে! মনে করবেন না, এর ভিতর কোন অসৎ উদ্দেশ্য লুকানো আছে। এ শুধু আত্মরক্ষার উপায় মাত্র।"

আমি সহসা বলিয়া ফেলিলাম, "তা হলে তিনি কোন বিপদে পড়েচেন?"

"না, বিপদ-পাতের সম্ভাবনা তাঁর সর্ব্বদাই রয়েচে।"

"তবে কেন, তিনি এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আত্মরক্ষার জন্যে সাহায্য চেয়ে একখানা দরখাস্ত করুন না! যে লোকের দ্বারা ওঁর অনিষ্টের সম্ভাবনা, তার নাম জানিয়ে দিলে পুলিস তাকে শান্তি-রক্ষার জন্য সহজেই বাধ্য করবে।"

বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অত্যন্ত দুঃখের স্বরে মরডণ্ট উত্তর দিলেন "না বন্ধু, তা হয় না, বাবা যে বিপদকে ভয় কচ্চেন, তা থেকে তাঁকে রক্ষা করা মানব-সাধ্যের অতীত। কিন্তু এ নিশ্চয় যে বিপদটি সত্য, আর তা অদূরবর্ত্তী।"

এ হেঁয়ালির রহস্য-ভেদে অসমর্থ হইয়া অবিশ্বাসের সহিত আমি কহিলাম, "তা হলে আপনি কি বলতে চান, বিপদটা অনৈসর্গিক?"

"না, তাই বা কি করে বলব? কিন্তু আমি বোধ হয়, আমার যা বলা উচিত, তার চেয়ে আপনাকে বেশী বলে ফেলেচি। তবু আমার বিশ্বাস আছে, আমি অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিনি। বিদায়, মিঃ ওয়েষ্ট, বিদায়।"

মরডণ্ট দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেও আমি চুপ করিয়া তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এ প্রহেলিকার অর্থ কি? একটা বাস্তব বিপদ অদূরবর্ত্তী? আর সে বিপদ হইতে উদ্ধার করাও মানবের সাধ্যাতীত! অথচ বিপদটি অনৈসর্গিকও নহে,—তবে কি? ব্যাপারটা ঠিক যেন ধাঁধার মতই ঠেকিতে লাগিল। প্রথম যখন ক্লুমবার হলের নব অধিকারীদের সহিত আলাপ হয়, তখন তাঁহাদিগকে "অদ্ভুত খেয়ালি" বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু আজ আর তাহা মনে হয় না। আমার মনে হইল, তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর একটা অন্তর্নিহিত গাঢ় সংশয়ের আবরণ বিছানো রহিয়াছে।

কথাটা যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই যেন তাহা অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। তবুও এই কষ্টকর চিন্তাটাকে মন হইতে সরাইয়া ফেলিতেও পারিলাম না। জানি না, কেন সেই নিভৃত, নির্জ্জন, রহস্য প্রাচীরাবৃত ক্লুমবার হলের অধিবাসিদের "আসন্ন বিপদ-সম্ভাবনা" আমায় এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ না চিন্তা-হারিণী নিদ্রার আশ্রয় পাইলাম, ঐ একই প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। আর এই গোপন ব্যাপারের মূল সূত্র কোথায়? কোথায়? এই জটিল চিন্তাই ফিরিয়া ফিরিয়া মনের তন্ত্রীতে পাক খাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

আইনের প্যাঁচ

(গল্প)

বি, এল পাশ করিয়া আলপাকার নূতন চোগা-চাপকান গায় আঁটিয়া মাথায় শামলা চড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় এক সতীর্থ সুহৃদ্ আসিয়া আশ্বাস দিলেন, "ওহে, ক্রিমিনালে ঢুকে পড়। কাঁচা পয়সা—সিভিলের মত বিরাট ধৈর্য্য নিয়ে বসে থাকতে হয় না, চট্ করেই পশার জমে যায়।"

সতীর্থ হাসিয়া আরও কহিলেন, এ দুই বৎসর ক্রিমিনালে বাহির হইয়া তাঁহার দিনগুলা নিতান্ত বিফলে কাটে নাই! বিশেষ, যদি ভাল একটি দালাল জুটাইতে পারি ত দুই বৎসরে গাড়ী ঘোড়া করিবারও সামর্থ্য-সম্ভাবনা আছে!

ক্রিমিন্যালে ঢুকিলাম। বাহিরের ঘর হইতে প্রাচীন তক্তাপোষখানিকে বিদায় দিয়া টেবিল-চেয়ারে স্থান জুড়িলাম। খেলা-ধূলা ও গল্প-গুজবের পাট উঠিল। শেষে অদৃষ্টক্রমে একদিন বরাত খুলিবারও সূচনা দেখা দিল।

সকালে চায়ের পিয়ালা নিঃশেষ করিয়া খপরের কাগজখানা খুলিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী বালিকার হাত ধরিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনা এক প্রৌঢ়া আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আপনি কি ফৌজদারীর উকিল?

খপরের কাগজখানাকে ঠেলিয়া রাখিয়া হেণ্ডারসনের বিরাট-বপু 'ফৌজদারী কার্য্য-বিধির' পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গম্ভীর-ভাবে কহিলাম, "হুঁ।"

প্রৌঢ়া কহিল, "জজ কাছারির বিশ্বম্ভরবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন—আমার একটা নালিশ আছে—তিনি বললেন, সেখানে হবে না, ফৌজদারিতে দরখাস্ত দিতে হবে।"

আনন্দে মন নাচিয়া উঠিল! আসিয়াছে! আমার মক্কেল বঁধু অচিরেই আসিয়াছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি তোমার নালিশ?"

"এই মেয়েটি নিয়ে বাবা এক বিপদে পড়েছি—মেয়েটিই সম্বল—বিয়ে দিয়েছি—তা জামাইয়ের সঙ্গে মোটে বনিবনাও নেই—আমি গরীব, অবীরে, কোথা থেকে খাওয়াই? তাই হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিয়ে একটা খোরাকির বন্দোবস্ত যদি করে দেন!"

নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে ৪৮৮ ধারা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার উপর দিয়া চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "কেন? জামাই নেয় না?"

"সে বাবু অনেক কথা। যখন নালিশ করতেই এসেছি, তখন আপনাকে সব কথা খুলে বলব বই কি! এইখানে সরে আয় মালতী—বস্।"

মেয়েটির নাম বুঝিলাম, মালতী।

তাহার পর প্রৌঢ়া বকিয়া গেল—কেমন করিয়া কত দেবতার দ্বারে হত্যা দিয়া, কত সাধুর পদধূলি শিরে ধরিয়া, কত মন্দিরে মানত করিয়া এই কন্যা হয়! কন্যা হইলে কি হয়, পুত্রের মতই তাহার শত আব্দার অত্যাচার নীরবে মাথায় বহিয়া প্রৌঢ়া মেয়ে মানুষ করিয়াছে। বরাত মন্দ, তাই কর্ত্তা

একদিন ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। তখন কাটনা কাটিয়া লোকের বাড়ী রাঁধিয়া বাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে। জামাইয়ের অর্থও কিছু আছে, তবে কেমন যে তাহার স্বভাব, মেয়েকে মায়ের কাছে পাঠাইতে চাহে না। পেট ভরিয়া মেয়েকে খাইতে দেয় না, উঠিতে বসিতে জামাইয়ের মা-বোনের বাক্য-যন্ত্রণাও কি কম সহিতে হয়! মায়ের এই একটি সন্তান, তাহাকে না দেখিলে মায়ের প্রাণ কেমন করিয়াই বা সুস্থির থাকে? আর মেয়েও এক মা বই আর কিছু জানে না—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তের বৎসরে পা দিলে কি হয়, মাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। তা উহারা দুইদিনের জন্য, তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না! আসিবার জন্য বায়না ধরিলে মারধোর অবধি করে! মেয়ে কান্নাকাটি করে—তাহারা বিরক্ত হয়। একবার অসুখের সময় বেহুঁস মেয়ে রাঁধিতে গিয়া ভাতটা একটু ধরাইয়া ফেলিয়াছিল—তা শ্বাশুড়ী মাগী হাতে গরম ফেন ঢালিয়া দেয়! মেয়ের খুব ব্যামো হয়। মা মেয়েকে একবার দেখিতে গিয়াছিল, মেয়ে মার সঙ্গে চলিয়া আসিবে বলিয়াছিল। মা বুঝাইয়া ছিল, না, তাহা হইবে না। সেই ঘরেই কোনমতে বনাইয়া থাকিতে হইবে! ঐ ঘরই আপনার ঘর!

মেয়ে কিন্তু বুঝিল না। তারপর অসুখ সারিলে কান্নাকাটি ধরে, মার কাছে যাইবে! তাহারা বিরক্ত হইয়া মায়ের কাছে একদিন মালতীকে ফেলিয়া গিয়াছে। মেয়ে সেখানে যাইতে চাহে না—এই বয়সে বাছাকে রাঁধিতে হয়, বাড়িতে হয়, এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জল আনিতে হয়! দেইজী জাতিও দুই-চারিজন আছে, তাহারা দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খায়! কুটাটি নাড়িয়া কেহ কখনও সাহায্য করে না—কিন্তু এ সকলই সহ্য হয়, তবে এই যে পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, উঠিতে বসিতে গালি দেয়, মারধোর করে,—এমন করিলে মায়ের প্রাণ কি করিয়া স্থির থাকে! কাজেই মেয়েকে সে-ও আর পাঠাইবে না। এইটিই তাহার সম্বল! এত বড় পৃথিবীতে আর কে-ই বা তাহার আছে! মেয়েকে নিজের কাছে রাখিবে। কিন্তু সে গরীব, অন্নের সংস্থান নাই—জামাই খোরাকী না দিলে কি করিয়াই বা সে মেয়েকে খাওয়ায়! নিজের যেমন করিয়া হৌক, চলিয়া যাইবে, তাহার জন্য ভাবনা নাই। কিন্তু মেয়ে—

কথাটা সংক্ষেপে রিপোর্টে সারিলাম। এইটুকু বলিতে তাহার কিন্তু অনেকখানি সময় লাগিয়াছিল। বিস্তর অশ্রু, হা-হুতাশে বক্তব্য টুকুও সে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, তোমার মেয়েকে মার-ধোর করে যে, তার কোন চিহ্ন আছে?"

প্রৌঢ়া কহিল, "সরে আয় ত মা, মালতী।" বলিয়া মেয়ের করপুট টানিয়া প্রৌঢ়া আমাকে তাহা দেখাইল। ছোট হাত দুইটিতে কড়া পড়িয়াছে। কড়ার মাঝে মাঝে সাদা দাগ! গরম ফেন ঢালার চিহ্ন! আমি ঈষৎ বিচলিত হইলাম,—কহিলাম,—"এ যে বড্ড পুরোনো দাগ—একে চলবে কি?

মা তখন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর

কোথাও দাগ আছে রে?" মেয়ে কোন সাড়া দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বহিখানা বন্ধ করিয়া আমি কহিলাম, "মার-ধোর কি কোন অত্যাচারের চিহ্ন না দেখাতে পারলে খোরাকী দিতে সে বাধ্য হবে না ত বাপু। যদি সে বলে, আমার স্ত্রী, আমার কাছে আসুক। হাকিম তখন জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেন যাবে না? তখন—"

প্রৌঢ়া বলিল, "কেন, তখন বলবে, আমি মার কাছে থাকব। ওখানে বড় জ্বালা যন্ত্রণা। সে সব সয়ে থাকতে পারি না। আমার বাবা, এই মেয়েটি ছাড়া আর কে আছে, বল—ঐটিই হলগে আমার চোখের তারা! তাদের বৌ গেলে আবার বৌ হতে কতক্ষণ? কিন্তু আমার এ মেয়ে গেলে আর ত তাকে ফিরে পাব না।"

আমি বিরক্ত হইলাম। নাঃ—এখন এ সেন্টিমেণ্টালিটি থামাই কি করিয়া! আইনের কূট-রহস্য ইহাকে বুঝানো অসম্ভব। তথাপি কহিলাম, "আসল কথা কি হচ্ছে জান বাপু, স্ত্রীর উপর স্বামীরই পূরা অধিকার। বাপ-মার কোন অধিকার থাকে না। স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে এলে মাসহরার দাবী করতে পারে না। তবে যদি স্বামী মারধোর করে, কিম্বা হিন্দু হয়ে মুসলমানী বিয়ে ক'রে তাকে নিয়ে এক বাড়ীতে এসে বাস করে, যাতে গিয়ে স্ত্রীর হিন্দুত্বে আঘাত লাগতে পারে, তখন শুধু স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকতে পারে, আর স্বামীও তখন মাসহারা দিতে বাধ্য হয়!"

প্রৌঢ়া কহিল, "তবে উপায়?"

"এক উপায় হয়, যদি তোমার জামাই মেয়ের গায় হাত তোলে, কিম্বা এমন কোন অত্যাচার করে, যাতে মেয়ের প্রাণের আশঙ্কা জন্মাতে পারে—আর আদালতে সে মারধোরের চিহ্ন কি অত্যাচারের কোন প্রমাণ দেখাতে পার।"

প্রৌঢ়া একবার কন্যার পানে চাহিয়া পরে কহিল, "তা হলে টাটকা মারধোর না হলে—"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "সে মার-ধোরের আবার সাক্ষী চাই।"

"সাক্ষী! স্বামী আবার স্ত্রীকে পথে নিয়ে গিয়ে কবে মারধোর করে থাকে, বাবা! যদিই বা হাত তোলে ত সে ঘরেই তোলে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি পাড়ার পাঁচ জনের সামনে হয়, না, পাড়ার পাঁচজনেই তা দেখতে ছোটে! তার উপর যারা তাদের পাড়াপড়শী, তারা ওদের দিক না নিয়ে কি আর আমাদের হয়ে বলবে!"

দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। লেখা শেষ হইলে তাহাতে মালতীর ঢেরা সহি লইলাম। প্রৌঢ়াকেই সাক্ষ্য করিলাম, আর প্রমাণ সেই হাতের পোড়া দাগ! অঞ্চল হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া প্রৌঢ়া আমার হাতে দিল। আমি ঈষৎ অপ্রসন্ন ভাবে কহিলাম, "দু টাকা মোটে!"

প্রৌঢ়া একেবারে আমার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "গরিব মানুষ বাবা, পেটে খেতে পাই না, তা আপনার পরিশ্রমের দাম দেব কি? সন্তুষ্ট হয়ে এই নাও বাবা। গরিবকে রাখ, ভগবান তোমায় রাখবেন!"

একটি কথাও আর বলিতে পারিলাম না। টাকা দুইটা যেন তপ্ত লৌহের মতই হাতে বাজিতেছিল। তখন সবে ওকালতিতে হাতে খড়ি,—এখন হইলে কি করিতাম, জানি না, তবে—কিন্তু সে কথা থাক্! টাকা দুইটা ফিরাইয়া দিলাম, কহিলাম, "তবে এ তুমি রেখে দাও। অমনিই আমি তোমার কাজ করে দেব।"

প্রৌঢ়া বিষণ্ণ চিত্তে অপ্রতিভভাবে কহিল, "রাগ করো না, বাবা।"

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "না, না, রাগ নয়—তুমি গরিব মানুষ, আমার টাকার পীড়াপীড়ি কিছু নেই। যদি জেতা যায়, তখন না হয় দু'টাকার সন্দেশ খাইয়ে যেয়ো।"

প্রৌঢ়া কহিল, "সে কথা মন্দ নয় বাবা। আমার মাকেও সেদিন প্রণাম করে যাব।"

"তা হলে তুমি এখন এস। বেলা ঠিক এগারটার সময় আদালতের সামনে থেকো, আমি দরখাস্ত দিয়ে দেব।"

প্রৌঢ়া আবার আমায় প্রণাম করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপরে আসিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, বাইরে ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?"

আমি কহিলাম, "একটা মক্কেল এসেছিল।"

এক মুখ হাসিয়া স্ত্রী কহিলেন, "মক্কেল! ইস্! বরাত তবে খুলল, বল। কি মকদ্দমা?"

আমি আমূল বর্ণনা করিলাম। আরও কহিলাম, মকদ্দমা টেঁকে কি না, সন্দেহ! মার-ধোরের কোন চিহ্ন নাই! স্ত্রী কহিলেন, "আচ্ছা আইন বাপু। গায়ে দাগ না দেখালে বুঝি মারটা সাব্যস্তই হবে না! আবার সে মারধোরেরও সাক্ষী চাই! মুণ্ডুটা ছিঁড়ে তা হলে আদালতে যেতে হবে, দেখছি! এই যে খেতে দেয় না, বাক্য-যন্ত্রণা দেয়, এই কি যথেষ্ট নয়? কি সর্ব্বনাশ!"

একটা রসিকতার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "যাও যাও, আমায় আর আইন শেখাতে হবে না—" বলিয়া ডিমের বড়া পুড়িয়া যাইবে, ভয় দেখাইয়া, স্ত্রী রন্ধন-শালার দিকে ছুটিলেন।

২

দরখাস্ত দিলাম। শমন বাহির হইল। দিনও পড়িল। মকর্দ্দমার দিন স্বামী হলপ করিয়া ও চারি-পাঁচজনের সাক্ষ্য-সমর্থনে আদালতকে বুঝাইল যে, আসল কথা, মার কাছে তাহার স্ত্রীকে পাঠাইতে সে একান্ত নারাজ! কন্যা-সম্বন্ধে মাতার অত্যন্ত কুৎসিত অভিপ্রায়ের অপবাদও সে স্বচ্ছন্দে দিয়া গেল। হাকিম সে পোড়া দাগের ততটা মূল্য ধরিলেন না। অপর পক্ষের উকিলও তাঁহাকে গলার জোরে বুঝাইয়া দিলেন, যদি এটা দাহের চিহ্ন বলিয়াই তর্কচ্ছলে ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি এ চিহ্ন অত্যন্ত পুরাতন। দাগ যখন সদ্য ছিল, তখন কেন আদালতে আসা হয় নাই! আমি বুঝাইলাম, বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে চট্ করিয়া আদালতে আসা নানা কারণে ঘটে না। প্রথমতঃ, স্বামীর পক্ষের কড়া তদারক-পাহারায় সে সুযোগ মিলে না, দ্বিতীয়তঃ অত্যধিক লজ্জা, সঙ্কোচ ইত্যাদি।

হাকিম শুধু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন খোরাকি দিবে না?

দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া স্বামী কহিল, "হুজুর, স্ত্রীকে আমি ঘরে রাখিতে চাই। উহার

মার কাছে থাকিলে মালতী বিগড়াইয়া যাইতে পারে।”

আইনের কড়া প্যাঁচ,—হাকিমের সাধ্য কি, তাহা খুলিয়া ফেলেন! তিনি রায় দিলেন, যেহেতু বাদিনী স্বামীর কোন অত্যাচার প্রমাণ করিতে পারিল না, অতএব সে স্বামীর ঘরে যাইবে। কারণ স্বামীই তাহার মাতা অপেক্ষা যোগ্যতর অভিভাবক! যদি স্বামী ভবিষ্যতে কোন অত্যাচার করে, তখন সে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আসিলে খোরাকীর দাবী রক্ষিত হইতে পারে।

প্রৌঢ়ার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিজয়-দৃপ্ত স্বামীর দল মালতীকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার উকিলের গর্জ্জন-আস্ফালনে আদালতের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। বেচারী প্রৌঢ়ার কাতর ক্রন্দন সে আস্ফালনের মধ্যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লাইব্রেরির দিকে চলিলাম। প্রৌঢ়া কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু একবার বলিল, “কি হল বাবা? এ কি বিচার হল! গরীবের কি ভগবানও নেই? ও মেয়েকে কি আর আমি ফিরে পাব।”

৩

তিন চারিদিন পরে, একটা আবকারী মকর্দ্দমা পাইয়াছিলাম; লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া সঞ্জীব রাওয়ের ডাইজেষ্ট খুলিয়া নির্ঘণ্ট বাহির করিয়া ল-রিপোর্টে নজীরের সন্ধানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি,—এমন সময় আমার মুহুরি আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একটি স্ত্রীলোক আমায় খুঁজিতেছে! বই ফেলিয়া চট্ করিয়া বাহিরে আসিলাম। আশার উল্লাসে মনটাও ধ্বক্ করিয়া উঠিল।

বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই প্রৌঢ়া নারী, মালতীর মা। তাহাকে ঘিরিয়া চারি ধারে নিষ্কর্ম্মার দল কৌতূহলে ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়ার চোখে জল, মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, কেশপাশ মুক্ত, রুক্ষ। আমাকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, “বাবা, এ কি করলে আমার—এ কি বিচার হল!”

আমি স্তম্ভিতভাবে কহিলাম, “কি হয়েছে?”

সে কহিল, “আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা। আমার সর্ব্বস্ব লুঠে নেছে। আমার মালতী আর নেই।”

“সে কি? কেন? কি হয়েছিল?”

“আর কি হবে, বাবা? সর্ব্বনেশে বিচারে আমার বাছাকে তারা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার পর কি যে করলে, কি খাওয়ালে—আমার সোনার প্রতিমা ভেসে গেল, বাবা—আমার মা দুর্গার বিসর্জ্জন হয়ে গেল। এই দেখ চিঠি, আজ সকালে এসেছে।”

প্রৌঢ়া একখানি পোষ্টকার্ড আমার হাতে দিল। পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল, “পরশ্ব শেষ রাত্রে আপনার কন্যার হঠাৎ কলেরা রোগ হয়। ভোর বেলায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।”

আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। এ কি—! প্রৌঢ়া কহিল, “কলেরা নয় বাবা, ও সব মিছে কথা। তারা আমার মেয়েকে খুন করে কলেরা বলে রটিয়ে দিয়েছে।

হাকিমের বিচারে সে একেবারে শূন্যের মত বিদায় হয়ে গেল—এখন হাকিমকে বলে আমারও একটা ব্যবস্থা করে দাও, বাবা।”

উন্মাদের মত কাঁদিয়া প্রৌঢ়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চারিধারে উকিল, মুহুরি ও পিয়াদার ভিড় জমিয়া গেল। আমার বুকটা অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। এমন সময় মক্কেল আসিয়া সংবাদ দিল, বেঞ্চ-ঘরে মকর্দ্দমার ডাক পড়িয়াছে। কাজেই দাঁড়াইতে পারিলাম না। শামলা ও কাগজপত্র লইয়া তখনই এজলাসে ছুটিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া প্রৌঢ়াকে আর দেখিতে পাইলাম না। সংবাদ লইয়া জানিলাম, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে সে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার কাহিনী

মেরু প্রদেশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা প্রায় চারি শত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে চিরতুষারাবৃত এক বিরাট ক্ষেত্র—তথায় জীব জন্তু বৃক্ষলতার চিহ্ন মাত্রও নাই; আছে কেবল বিভীষিকাময়ী তুষার ঝটিকা আর অন্তহীন গলিত তুষার স্রোত। এইরূপ এক জনমানবহীন প্রদেশ আবিষ্কারের চেষ্টা কতবার নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে, কত বার মানুষ এই রহস্যউদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া আপনার অমূল্য জীবনকে সেই চিরতুষারের মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছে কিন্তু তবুও চেষ্টার অন্ত হয় নাই! বারবার বিফল চেষ্টার পর এই এতকাল পরে সে দিন কাপ্তেন আমণ্ডসেন আসন্ন মৃত্যু-বিভীষিকাকে তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ মেরু-প্রান্তে মানবপদ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার পর, আর একজন বীর-হৃদয় সেই মেরু প্রান্তে ব্রিটিস-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে গিয়া আপনার শেষ জীবন সর্ব্বগ্রাসী তুষারের মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছেন। তাঁহার মেরু-প্রদেশ যাত্রা ও মৃত্যু কাহিনী উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহলোদ্দীপক। সে কাহিনী একদিকে যেমন মহিমাপ্রদীপ্ত অন্য দিকে সেইরূপ অশ্রুসিক্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কথার উল্লেখ আর নাই বলিলেও হয়। এই দুর্ঘটনা ইংলণ্ডের চারিদিকে প্রচারিত হইলে যে সহানুভূতি ও দুঃখের স্রোত বহিয়াছিল তাহা ইংলণ্ডের বিচিত্র ও ঘটনাবহুল ইতিহাসেও সম্পূর্ণ অভিনব।

কাপ্তেন স্কট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একবার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করেন কিন্তু সেবার মেরু প্রদেশস্থ “রাজা সপ্তম এডবার্ডের দেশ”টুকু আবিষ্কার করিয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, এবং জেদও বাড়িয়া উঠে। সেই জন্য তিনি পুনরায় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আবার দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে কাপ্তেন স্কটের জাহাজ “টেরানোভা” (Terra Nova) লণ্ডন ত্যাগ করে এবং ২৯শে নভেম্বরে নিউজিলণ্ডের একান্ত দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী চামার্স পোতাশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পোতাশ্রয় হইতে ৫৮জন কর্ম্মচারী, ৩৫টী কুকুর, ১৯টী টাট্টুঘোড়া, ২টী খরগোস ও ২টী বিড়াল লইয়া স্কট দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। পথে “রস” সমুদ্র ও ক্রাজিয়ার অন্তরীপ পার হইয়া তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারীতে ম্যাকমার্ডো-সাউণ্ডে উপস্থিত হন ও এই “সাউণ্ডের” অদূরবর্ত্তী কেপ ইভানসে আপনার শীত-নিবাস স্থাপন করেন। কেপ ইভানসে আসিয়া কাপ্তেন স্কট স্থির করিলেন যে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬জন

লোক লইয়া মেরুপ্রান্তে যাত্রা করিতে হইবে এবং যাত্রাপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীত-নিবাস স্থাপন করিয়া যাইতে হইবে। আরও স্থির হইল যে প্রত্যেক অক্ষাংশে উপস্থিত হইয়া তিনি চারিজন করিয়া লোক বিদায় দিবেন এবং সর্ব্বশেষে যে অবশিষ্ট চারিজন লোক থাকিবে কেবল সেই চারিজনকে লইয়াই তিনি মেরুপ্রান্তে উপস্থিত হইবেন।



কাপ্তেন স্কট

ভীষণ ঝটিকা ও অন্যান্য কারণে স্কট ২রা নভেম্বরের পূর্ব্বে কেপ ইভান্‌স ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি ১০ই তারিখে Beardmore glacierএ উপস্থিত হন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারীতে তিনি 'কেন্দ্র' হইতে ৭০ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়েন। এইস্থানে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কথামত শেষ চারজনকে বিদায় দিয়া অবশিষ্ট চারজনকে লইয়া মেরুপ্রান্তে যাত্রা করিলেন। এই চারি জনের নাম:—ডাক্তার উইল্‌সন, কাপ্তেন ওটস্, বাউয়ার্স্, এবং ইভান্‌স্। তাঁহারা কঠিন তুষারমণ্ডিত একটি বিরাট ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিক অন্ধকার—নিস্তব্ধ—কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে তুষার-ঝটিকা উন্মত্তভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঘণ্টায় ১২ মাইল করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া ১৭ই জানুয়ারীতে কাপ্তেন স্কট দক্ষিণ মেরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং এখানে কাপ্তেন আমণ্ডসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত একটী ক্ষুদ্র তাঁবু ও অন্যান্য কিছু জিনিষ দেখিতে পাইলেন। এদিকে দিনের পর দিন তাপ কমিয়া আসিতেছিল! কেন্দ্রে আসিয়া দেখা গেল ফারেন হিটের সাধারণ তাপমান যন্ত্রের পারার রেখা শূন্যেরও ২০ ডিগ্রি নীচে নামিয়াছে। অত্যন্ত ঝড়ের জন্য প্রথম দিন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিক



ডাক্তার উইলসন্

ভীষণ অন্ধকার ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দিন সমস্ত কুয়াসা ভেদ করিয়া সূর্য্য উঠিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! দশ পনেরো হাজার ফুট উচ্চ শ্বেতগিরিসমূহ মেঘমুক্ত আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের গা বহিয়া রজতশুভ্র তুষার স্রোত নামিয়া আসিতেছে। আবার কোথাও শুভ্র আলোকসম্পাতে তুষারখণ্ডগুলি মুক্তাবিন্দুর মত ঝলমল করিতেছে। এইস্থানে তিনি ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা "Union Jack" স্থাপন করিয়া তাহার পানে নমস্কার করিলেন। কিন্তু বেশীদিন মেরুপ্রান্তে থাকা একেবারেই অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তুষার দংষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তুষারহত হইলে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার আশঙ্কা খুব বেশী। দেহের কোন স্থান তুষার দংষ্ট হইলে তথায় বারংবার আঘাত করিতে হয়, তবে পুনরায় রক্তের চলাচল আরম্ভ হইয়া থাকে। দুই এক মিনিট হাত খোলা থাকিলেই তুষারাহত হইতে হয়। বিপদের নানাপ্রকার সম্ভাবনা দেখিয়া কাপ্তেন স্কট মেরু-প্রান্ত হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ঘণ্টায় ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। পথিমধ্যে স্কটের সহচর ডাক্তার উইলসন নানাপ্রকার ভৌগলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

চক্রহীন শ্লেজগাড়ীর সাহায্যে কাপ্তেন স্কট ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। এই ঝড় এমন ভয়ানক যে পূর্ব্বাবধি সতর্ক না থাকিলে আরোহীসহ শ্লেজগাড়ী অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তুষারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে স্কটের সহচর ইভান্স বিপদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ক্রমেই ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছিলেন। চারিদিকের তুষার-ঝটিকা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল। পথিমধ্যে তিনি হঠাৎ পিচ্ছিল বরফের উপর পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হইলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে "মস্তিষ্ক-স্তম্ভন" রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মৃতদেহ বরফের মধ্যে পাওয়া গেল। এই আসন্ন বিপদকে উপেক্ষা করিয়াও কাপ্তেন স্কট আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দিনের পর দিন তাপ কমিয়া আসিতেছিল। চারিদিকে কেবল তুষার-ঝটিকা! ক্রমে তাঁহাদের খাদ্য ও কয়লা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং দেখা গেল যে তাঁহারা দিনে নয় মাইলের বেশী মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

ইতিমধ্যে তাঁহার অন্য সহচর কাপ্তেন ওটস্‌ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেবা করিতে গিয়া ক্রমেই দেরী পড়িয়া যাইতে লাগিল। ওটস্ দেখিলেন, যদি তিনি সমস্ত পথ এইভাবে চলেন তাহা হইলে তাঁহার ত বাঁচিবার আশা নাই-ই, উপরন্তু বাকি লোকগুলিকেও তাঁহার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। তাই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সঙ্গীগণকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। রাত্রির অন্ধকার তখন চারিদিক্ ঘেরিয়া আছে, তুষার ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জন আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে; এমন সময় মরণোন্মুখ ওটস্ স্কটের নিকট আসিয়া বলিলেন "স্কট, আমায় একটু ছুটি দাও, বাহিরে আমার কাজ আছে, এখনি ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া ওটস্ সেই অনন্ত তুষার সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন—চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানিনা।*

এই সকল বিপদ মাথায় লইয়া কাপ্তেন স্কট পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯এ মার্চ্চ

* কাপ্তেন ওটস্ সম্বন্ধে স্কট লিখিতেছেন "He was a brave soul. He slept through the night hoping not to wake, but he woke in the morning. It was blowing a blizzard. Oates said 'I am just going outside and I may be sometime'. He went out into the blizzard and we have not seen him since."



কাপ্তেন ওটস

তারিখে তাঁহার স্থাপিত "ওয়ানটন্ ক্যাম্প" নামক এক শীত-নিবাসের ১১ মাইল দূরে আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন এবং একটী ক্ষুদ্র তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তখন ভয়ানক ক্লান্ত—একেবারে চলৎশক্তি রহিত। এদিকেও ঝড়ের বিরাম নাই; আর এক পা অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন কাপ্তেন স্কট, ডাক্তার উইলসন, ও বাউয়ার্স নিরুপায়ভাবে তাঁবুর মধ্যে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। পলে পলে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। তাঁবুর উপর ক্রমেই বরফ জমিয়া উঠিতেছিল—সেই বরফই তাঁহাদিগকে শেষে সমাধিস্থ করিয়া ফেলিল।

এদিকে তাঁহাদিকে খুঁজিবার জন্য একটী দল সেই দিকে যাত্রা করিয়া নানাকারণে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল ইহার পর আবার দ্বিতীয় দল প্রেরিত হয়; তাহারা অনেক কষ্টের পর ২০ নভেম্বর তারিখে কাপ্তেন স্কট ও তাঁহার সঙ্গীগণের মৃত দেহ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

কাপ্তেন স্কটের মৃত দেহ হইতে যে ডায়ারী পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ২৪এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিনি ডায়ারী লিখিয়াছিলেন এবং ২৫এ মার্চ্চ তিনি ইংরাজ জাতির নিকট তাঁহার শেষবাণী লিখিতে নিযুক্ত থাকেন। এবং সকলের বিশ্বাস যে ২৭শে মার্চ্চই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাপ্তেন স্কটের মৃত-দেহ উদ্ধারকারীগণ ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার মৃত্যু স্থানে স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া দিয়া আসিয়াছেন:—

"Hereabout died a very gallant gentleman."

কাপ্তেন স্কটের শেষবাণী পড়িতে পড়িতে এক দিকে চক্ষু যেমন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে অন্য দিকে তেমনি তাঁহাদের সাহস ও সহিষ্ণুতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি লিখিতেছেন:—

"আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আর লিখিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমার পক্ষ হইতে আমি বলিতেছি যে এই আবিষ্কার-চেষ্টার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ইহা জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়া দিবে যে ইংরাজ জাতি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বিপদে একজন অন্য জনকে সাহায্য করিতে পারে এবং অতীতের ন্যায় এখনও সহিষ্ণুতার সহিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে।

"বাঁচিয়া থাকিলে আমি যে আমার সঙ্গীদের সাহস সহিষ্ণুতা ও দুঃখের কাহিনী বলিতে পারিতাম তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত ইংরাজ জাতির অন্তঃকরণকে মথিত করিয়া তুলিত।"

তিনি অবশেষে লিখিতেছেন—

These rough notes and our dead bodies must tell the tale, but surely, surely a great rich country like ours will see that those who are dependent upon us are properly cared for.

(Signed) R. Scott.

25th March, 1912.

সুখের বিষয় কাপ্তেন স্কটের শেষপ্রার্থনা বিফল হইয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই বিলাতের Antarctic Exploration Fund, Daily Chronicle, Daily Telegraph এবং Mansion House Fund প্রভৃতি সমিতি অজস্র অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সে সমস্ত অর্থ আশ্রয়হীন পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্যই ব্যয় করা হইবে।

সেই চিরতুষার প্রদেশে কাপ্তেন স্কট ও তাহার সহচরগণের অমূল্য জীবন দীপান্বিতার আলোক-মালার মত নিঃশব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যে সত্যের ও স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া গেলেন তাহা তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের জাতিকে চিরদিনের জন্য জগতের সম্মুখে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার



লেপ্টেনাণ্ট বাউয়ার্স

মায়ের ডাক

(গল্প)

তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ছাতিটা খুলিয়া ও কাপড়ের ছোট একটা বাক্স লইয়া জেটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সেই দুর্য্যোগে একখানাও গাড়ী দেখিতে পাইলাম না। কিছু দূরে দুই একখানা রিক্স দাঁড়াইয়াছিল তাহাই একটা ডাকিয়া উঠিয়া বসিলাম। রিক্সওয়ালা গাড়িখানার আগাগোড়া বেশ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল; আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী লইয়া ছুটিল। আমি যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

যদিও প্রথম হইতে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে এখানে নাবিয়া সেং-চুর মার বাড়ীতেই উঠিব কিন্তু যতবারই সে কথা মনে হইতেছিল মনটা কেমন খারাপ হইয়া যাইতেছিল। এখন আর উপায় নাই; তাহারই নিকট যাইতে হইবে। একে আমি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক; তাহার উপর এই ঘোর দুর্দ্দিন। অপরিচিত দেশে যে অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে এই দেশবাসী কোন লোকের সাহায্য বিনা যে কার্য্য-উদ্ধার করিতে পারিব তাহা তো মনে হয় না।

ইহাই আমার জন্মভূমি সত্য। কিন্তু এখন আমার নিকট এই স্থান স্বদেশ হইয়াও বিদেশ। আমার যখন এগার বৎসর বয়স সেই সময় জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে নির্ব্বাসিত হই। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা। এখন এদেশ আমি এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছি;—এখানে আমার না আছে আত্মীয়, না আছে বন্ধু। কে আমায় সাহায্য করিবে? এখন সেং-চুর মার দেখা পাইলে হয়।

প্রায় দশ দিন হইল সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছে কিন্তু অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য ঠিক সময় জাহাজ বন্দরে পৌঁছিতে পারে নাই; সে জন্য যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সে ভাবনা এখন নিষ্ফল। উপস্থিত কিরূপে উদ্ধার পাইব তাহাই ভাবিতেছি।

(২)

অনেক দুঃখ কষ্টের পর লিম-তাই লিকে পাইয়াছিলাম। তখন তাহার বয়স সবে দুই বৎসর। সেং-চু আমার ছেলেবেলাকার খেলার সঙ্গী ছিল, সে তাহার এই শিশুটিকে লইয়া তাহার স্বামীর সহিত নৌকা করিয়া চীন হইতে সিঙ্গাপুর আসিতেছিল। প্রায় সিঙ্গাপুর দ্বীপের কাছাকাছি আসিয়াছে এমন সময় একদল জলদস্যু তাহাদের নৌকা আক্রমণ করে এবং সকলকে নিষ্ঠুর রূপে হত্যা করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে। যখন সেই নৌকা আসিয়া সিঙ্গাপুর পৌঁছিল তখন সেং-চু ও তাহার শিশু পুত্র

লিমতাই-লি ভিন্ন কেহ জীবিত ছিল না। সেং-চুরও তখন অন্তিম কাল। সে অতি কষ্টে শিশুটিকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। দেখিলাম, ছেলেটির একটি কাণ কাটা—শুকনো রক্তের দাগ তখনো জমিয়া আছে। আমি "বাছারে!" বলিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই সে "মা! মা!" বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই অবধি সে আমার! তাহাকে আর কোল ছাড়া করি নাই। এই বিশ বৎসর কাল, এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেই তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছি;—বুকের উপর দিয়া এত যে ঝড়-ঝাপটা গিয়াছে সে কেবল তাহার মুখ চাহিয়াই বহন করিতে পারিয়াছি। সেও আমাকে এক দণ্ডের জন্যেও মা ভিন্ন অন্য ভাবে নাই। ছেলের কর্ত্তব্য সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এ কি! একেবারে নিরুদ্দেশ! না বলিয়া না কহিয়া বাছা আমার গেল কোথায়! এ সংসারে আমি ছাড়া তার কে আছে—কে তাহার মুখ চাহিবে! কিসের জন্য সে আমায় ছাড়িয়া গেল!

(৩)

যেদিন সে প্রথম তাহার অত দিনের মাথার ঝুঁটি কাটিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই আমার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল! সেই অবধি ছেলেটা যেন উন্মত্ত। কোথায় যায়, কি করে কিছু বুঝি না। এক একবার সে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিত—"চীনে যাইয়া যুদ্ধ করিব।" আমি বলিতাম—"ক্ষ্যাপা ছেলে! তুই যুদ্ধ করিবি কি!" সে কিছু না বলিয়া লুকাইয়া পড়িত।

কে তাহার মাথায় এ বুদ্ধি দিল! কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করিল! যাহার দুটা ছেলে আছে তাহার একটা ছেলে যুদ্ধে যাক—কিন্তু যাহার একটি—সে কেন?

চীন তোর কে? তার সহিত তোর কিসের সম্বন্ধ? দুমাসের পরিচয় বই তো নয়!—তাও তোর শৈশবের অজ্ঞান অবস্থায়! আর আমি যে তোর চিরদিনের আপনার। আমার চেয়েও তোর চীন বড় হইল! ধিক তোকে! দেখ দেখি তোরই জন্য তো আমাকে আবার এই চীন মুলুকে আসিতে হইল—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এদেশের মাটি আর ইহজন্মে মাড়াইব না!

(৪)

রিক্সটা খুব দৌড়িয়া আসিতেছিল। হঠাৎ এক স্থানে দাঁড়াইয়া পড়াতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এতক্ষণ আমার চতুর্দ্দিক কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল, তাই বাহিরের কিছুই দেখিতে পাই নাই; এখন একটু কাপড় খুলিয়া দেখিলাম একটা মাঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।—অগণন সৈন্য পিপিলীকার সারির ন্যায় চলিয়াছে! উৎসাহে, উদ্যমে, চাঞ্চল্যে তাহাদের সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর ভিতর দিয়া একটা উন্মত্ততার ঢেউ যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। কোথাও কোনো শব্দ নাই—চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল সৈনিকদের তালে তালে পায়ের শব্দে মনে হইতেছে যেন একটা প্রকাণ্ড বজ্র পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—যেখানে গিয়া ঠেকিবে সেখানটাকে একেবারে রসাতলে ডুবাইয়া দিবে।

আমি রিক্স থামাইয়া দেখিতে লাগিলাম। শ্রেণীর পর শ্রেণী চলিয়াছে—যেন তাহার শেষ নাই—মনে হইতেছিল একটা প্রকাণ্ড চুলন্ত সমুদ্র যেন কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে!

সৈন্য-স্রোতের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া আমি কেমন নিঝুম হইয়া আসিতেছিলাম। হঠাৎ বুকের রক্তটা চনচন করিয়া উঠিল। ঐ যে! ঐ! তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে! আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"তাই-লি! তাই-লি!"

সে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। নিষ্ঠুর কোথাকার! মায়ের ডাকে সাড়া দিস না! দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল—একটা ঢেউয়ের মুখে আসিয়া আবার ঢেউয়ের মধ্যেই মিলাইয়া গেল।

* * *

কয়দিন অবিশ্রান্ত পাগলের মতো ঘুরিতেছি—কোথায় সেংচুর মা! কোথায় তাই-লি! কে সম্বাদ দিবে! সবাই আমারই মতো উদ্ভ্রান্ত;—ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি, মারামারি চতুর্দ্দিকে। কে কার কথা শোনে! দেশটা যেন শ্মশান—দিকে দিকে মৃত দেহ ছড়াইয়া আছে—সহস্র সহস্র নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে;—শোণিতশিক্ত পথে পা ফেলিতে বুক কাঁপিয়া উঠে। হত্যা! হত্যা! চতুর্দ্দিকে কেবল হত্যা চলিতেছে। মৃত্যুর আর্ত্তনাদে আকাশ ছাপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে যেন প্রলয় উপস্থিত। হায়, কোথায় তাই-লি! কোথায় তাই-লি!

* * *

এই তো রণক্ষেত্র। যুদ্ধের বীভৎস অবসান-স্মৃতি বুকে লইয়া পড়িয়া আছে। অনাথিনীরা পাগলিনীর মতো ঐ তো কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আয়! আমিও তোদের সঙ্গে ছুটি। তাই-লি! তাই-লি!—শব্দ দূরে—আকাশের গায়ে মিলাইয়া গেল। কই কোনো উত্তর তো ফিরিয়া আসিল না।

আমি ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিলাম—পায়ে পায়ে মৃতদেহ বাধিয়া বাধিয়া পড়িতেছিল—আমি নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছিলাম, কিন্তু কৈ তাই লি!

* * *

গাছের তলায় ঐ যে, ও কে! দেহ রক্তাক্ত; কিন্তু সুন্দর মুখে একটি প্রসন্ন হাসির উজ্জ্বল রেখা ঘুমাইয়া আছে! কোথা হইতে তুই এমন হাসি পাইলি যাহা মৃত্যুও মলিন করিতে পারে নাই। মরণের মূল্য দিয়া এ হাসি তুই কোথা হইতে কিনিয়া আনিলি!

"বাছারে!" বলিয়া আমি তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িলাম। বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। আর কিছু মনে আসিতেছিল না—মনে আসিতেছিল কেবল সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের শিশু-কণ্ঠের "মা! মা!" ধ্বনি;—আর সেই কোমল দুটি বাহুর দ্বারা আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন!

এ কি হইল! চারিদিকে এ কি শুনি! আকাশ বাতাস মাতাইয়া এমন মধুর "মা! মা!" ধ্বনি কেন?

* * *

মূর্চ্ছা-ভঙ্গে উঠিয়া দেখি প্রভাত সূর্য্যের আলোর হাসিতে পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে; দুঃখ শোকের কালিমা গত রজনীর অন্ধকারের মধ্যেই যেন বিলীন হইয়া গেছে—তাই-লির মুখে যে হাসি দেখিয়াছিলাম সেই হাসির স্রোত যেন দিকে দিকে ছুটিয়াছে—আর আমার শোকার্ত্ত মাতৃ-হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ উঠিতেছে "মা! মা!"

বিজন কুমারী

রঙ্গমল্লী*

'রঙ্গমল্লী'—সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম-করণে গ্রন্থকার কবি-হৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। রঙ্গমল্লী, রঙ্গনাথ নটেশের বীণা!

"বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তালে সুরে মুহু পল্লবি' উঠে
রাগিণী বিম্বলীনা।
জীবন রঙ্গ! শত তরঙ্গ
চির ভঙ্গিমাময়,
স্ফুরি নীহারিকা ফুটায় তারকা
অপরূপ অভিনয়!"

* * *

রঙ্গমল্লী বিদেশী শিল্পী-লেখকগণের কয়েকখানি নাটকের বঙ্গানুবাদ। মৌলিক রচনা না হইলেও বঙ্গবাণীর কাব্য-সভায় এই রচনা উপহার পাঠাইতে কবিকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হইয়াছে; প্রথমতঃ, বিষয়-নির্ব্বাচনে; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীকে স্বদেশী-করণে, তৃতীয়তঃ সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে।

বিষয়-নির্ব্বাচনে কৃতিত্ব সেইখানে, যেখানে কবি সাহিত্যে একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, সুমধুর বৈচিত্র্যের আমদানি করেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে কয়খানি নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন—তাহার প্রত্যেকটির বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষণ করে। এবং সেগুলির পাঠ সমাপ্ত করিয়া মনে হয়, যথার্থই "কাব্যামৃতরসাস্বাদ" করিলাম।

বিদেশীকে স্বদেশী-করণ লেখকের শক্তি-সাপেক্ষ। বিষয়টিকে শুধু যথেষ্ট আয়ত্ত করিলেই চলে না—সেটিকে কবির হৃদয় এবং স্বদেশের প্রাণ দিয়া দেখিতে হয়। নতুবা বিদেশী সুর—সহজে মনোজ্ঞ হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের বিশেষত্বই তাহাই। তিনি ছেলেদের জন্য কথার কথার অর্থ করিয়া 'মানের বই' লেখেন না—তাঁহার অনুবাদে কলের মধ্য দিয়া বাহির হয় না;—তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়:—

"আয়ুষ্মতী"। বল
মোরে, প্রিয়, যেই ক্ষণে মনে মনে মনটি তোমার
ফেলিল স্বীকার করে ভাল সে বেসেছে একজনে,—
সেই ক্ষণ,—সে কি রাত্রি?—সে কি দিন?

আর্য্যধন।

কেমনে বর্ণিব?
দিন সে—কিবা সে রাত্রি; মনে হয়, যেন সেইক্ষণে
অরুণ উদয় হ'ল—সেইক্ষণে শূন্যতার মাঝে
নক্ষত্রেরও হ'ল আবির্ভাব; উজ্জ্বল-জাজ্বল, শুভ্র।
মাতৃ-গর্ভ শয্যা-তলে হল যবে জীবন সঞ্চার
অস্ফুট দু'-আঁখি দিয়ে তোমারেই খুঁজেছি সেদিন;
ভূমিষ্ঠ হইয়া, হায়, কেঁদেছিনু তোমারি লাগিয়া;,
তোমারি লাগিয়া বুঝি, বাঁচিবার ছিল প্রয়োজন;
তারপর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল,
শিয়রে-সোনার-কাঠি গল্পের সে রাজকন্যাটিরে,

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০।

আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন,
তোমারি দু-আঁখি দিয়ে সেই কন্যা দেখিছে আমায়!"

জিনসটি বিদেশী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অনুবাদের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন বহিতেছে তাহা আমাদের দেশেরই নাড়ির স্পন্দন বলিয়া মনে হইতে কোনো বাধা ঠেকে না।

রঙ্গমল্লীতে কবি চারিটি সুরের আলাপ করিয়াছেন। প্রথমটি ভৈরবীর মত করুণ, অথচ পূত-সংযমের মত, পবিত্র; সাগরের মত গম্ভীর। তাহার পরিচয়ঃ—

দুর্জ্জয় শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছে, বিদেশী সৈন্যের মুহুর্মুহু হুঙ্কারে দেশবাসী হতবুদ্ধি, আতঙ্কে জীবন্মৃত। দেশ-রক্ষার্থ সকল প্রবীণ যোদ্ধা পুরঞ্জয়ের দ্বারে উপস্থিত! দেশভক্ত যোদ্ধা দেবমন্দিরে দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন! যাত্রার পূর্ব্বে দেবাদেশ হইলঃ—

"শোন পুরঞ্জয়!
যুদ্ধে যাত্রা কর যদি, অবশ্য তোমার হবে জয়;
বৈশালীর রক্ষা, বীর! করিবে তোমারি তরবার;—
কিন্তু...যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার,
তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে,
হোক্ পশু, হোক্ নর, বলি দিতে হবে জেন' তারে।"

রণশেষে, জয়োল্লাসে প্রত্যাগত বীর পুরঞ্জয় দ্বারে আসিয়া, এ কি দেখিলেন! মাতৃহারা, "মায়ের-আভাষে-ভরা," তাঁহার একমাত্র পৃথিবীর বন্ধন, নব-যৌবনা, বাগ্দত্তা কন্যা আয়ুষ্মতী স্মিতমুখে অভিবাদন করিতেছে!

বীরের হৃদয় কাঁপিল, কাঁদিল; বুঝি টলিল! কিন্তু আসন্ন শোকেও বীর-হৃদয় বীরহৃদয়ের মতই অটুট রহিল। বীর ও পিতা, দেবসকাশে কঠিনতম প্রতিশ্রুতি কঠিন হস্তে পালন করিলেন!

এই নাটকের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে, কন্যার জীবন উষায়, সদ্যঃ-জাগ্রত যৌবন-স্বপ্ন-হিল্লোল, বাক্যদত্ত-প্রণয়ী আর্য্যধনের অতৃপ্ত প্রেমের বেদনাভরা কাতর হৃদয়স্পন্দন, দেশ ও দেবতার অনুরোধে স্বহস্তে একমাত্র-কন্যাহন্তা পিতার উদ্বেল হৃদয়-তরঙ্গের ছবি এমন মনোজ্ঞভাবে, প্রাণস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত, যে পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। উচ্চাঙ্গ নাটকোচিত সংযম এই করুণ আখ্যায়িকাটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে! কন্যা-হন্তা পিতা, মৃতা কন্যার ছিন্ন শির লইয়া বজ্রনিনাদী কণ্ঠে দীর্ঘ বক্তৃতা করিল না! ছোরা লইয়া রঙ্গমঞ্চে হিংস্র মূর্ত্তিতে কেহ রক্তের হোরি খেলিল না! ইহাতে বঙ্গীয় পাঠক হয়ত বিস্মিত হইবেন।

যাঁহারা নাটকীয় আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে রঙ্গমল্লীর "আয়ুষ্মতী" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয় সুরটি মূলতান। করুণ, অথচ ভৈরবীর মতই জমাট নয়, হাল্কা। তাহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অপেক্ষা শ্রীর স্বল্পতাই প্রাণস্পর্শী। ঘাষের সবুজ রঙের মত সহজ ও সরল, চীন দেশের একটি করুণ প্রেম-কাহিনী। দুর্ব্বল নারী-হৃদয়ের সবল প্রেম; শক্তিহীন রাজার অলস অসাড় প্রেম-প্রবণতা বা সৌন্দর্য্যলিপ্সা; স্বার্থ-কুটিল, চক্রী বিশ্বাসঘাতকের দৈব শাস্তি অত্যন্ত সরলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে!

চীন নাটকের সহিত, ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের একটা ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ সম্ভ্রান্ত পাত্র, মধ্যে মধ্যে শ্লোকে কথা কহিয়া থাকে। এ বিষয়টী সাহিত্যের ঐতিহাসিক-গণের অনুধাবন যোগ্য।

তৃতীয় সুরটি, হাম্বির-কেদারার মত গম্ভীর, উদার, ব্যাপক! মানব ও মানব হৃদয়-বাসী দেবতার উদ্বোধন; পার্থিব ও অপার্থিবের জাগরণ। এটি সুবিখ্যাত নাট্যকার মেটারলিঙ্কের একখানি নাটকের অনুবাদ। যাঁহারা উক্ত লেখকের রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে মেটারলিঙ্ক, মানব-হৃদয়ের গভীর ও সূক্ষ্ম বৃত্তি লইয়া নাটকের জমি প্রস্তুত করেন—এবং তাহারি উপর খুব সরু কাজ করিয়া যান—যাহা গভীরতর, সূক্ষ্মতর অনুভূতির উদ্বোধক!

নাটকখানি রূপকের মত। ইহার মূল সূত্রটি না ধরাইয়া দিলে সাধারণ পাঠক ইহার রসটুকু পূর্ণমাত্রায় বোধ হয় উপভোগ করিতে পারিবেন না! অনুবাদ প্রকাশকালে লেখক ভূমিকাচ্ছলে একটু ইঙ্গিত করিলে ভাল হইত। আমাদের মনে হয়, নাটকটি ইউরোপের

(খৃষ্টান জগতের) বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক জীবনের গত-ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পাত্রপাত্রী গুলি কোন্ এক অনাদি কালের অরণ্যগর্ভস্থ মঠের অধিবাসী। মঠাধ্যক্ষ স্থবির; তাঁহার দেহ মৃতবৎ নিশ্চল। সেবক-সেবিকাগুলির কেহ জন্মান্ধ, কেহ দৃষ্টিহারা, কেহ উন্মাদ, কেহ তরুণী, কেহ স্থবির! দৃষ্টিহারা অর্থে—আত্ম-জ্ঞান-মূঢ়। বোধ হয় পোপ-ঘটিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য লিখিত এই নাটকের বিশেষত্ব, ইহার suggestiveness.

শেষ সুরটি একেবারে হালকা কাফি-সিন্ধু বলিলে



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভুল হয় না। হাম্বির-কেদারার ধাক্কা কাটাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যায়! করুণ নয়, গম্ভীর নয়—একেবারে রহস্যচটুল ব্যঙ্গ! ইহাতে হাসি—এবং মুচকি হাসির চেয়ে হো-হো-হাসিই বেশী। কার্লাইল যাহাকে "hearty laugh" বলিয়াছেন, ইহাতে সে হাসি পর্য্যাপ্ত! এটি একটী জাপানী ব্যঙ্গ নাট্যের অনুবাদ!

পাঠক ইহার পরিচয় লইবেন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, আজ-কালকার "ইস্‌মে পাপ, উস্‌মে পুণ্যের" যুগে সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান কবি যখন এরূপ বিশ্রী সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তখন মনে হয়, আমাদের রহস্য বোধ এবং সাহিত্যের গণ্ডীবোধ একেবারে উবিয়া যায় নাই। "শুচিবেয়ে" সাহিত্যিকগণ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন, তাহা কৌতূহলের বিষয়।

আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি, আশা করি, বঙ্গীয় কাব্যামোদী মাত্রেই সে আনন্দ হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখিবেন না।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় কাল-বৈশাখ

বৈশাখ মাত্রই কাল বৈশাখ নহে। প্রতি নব বৎসরই দৃশ্যপটে কাল-বৈশাখের মূর্ত্তি চিত্রিত দেখায় না। কিন্তু যে বর্ষ তাহাকে চৈত্র হইতেই অগ্রদূত করিয়া পাঠায় বা সঙ্গের সাথী করিয়া আনে, তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"।

কাল-বৈশাখের ঝড়ে বড় বড় মহীরুহই ভূমিসাৎ হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে এই বৎসর সেই কাল-বৈশাখের লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। মহাকাল মালী কাঁচা পাকা অনেকগুলি ফল উৎপাটিত করিয়া মহাকাল গর্ভে লীন করিয়া দিয়াছেন। গণিতবিৎ গৌরীশঙ্কর দে, বৈদ্যরত্ন দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুচিকিৎসক গণেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এবং—লেখনী অগ্রে লিখিতে হাত সরিতেছে না—দেশসেবক পূজনীয় জানকীনাথ ঘোষাল বঙ্গের জাতীয় জীবনে আর নাই। ভারতীর পাঠকবর্গ বিদিত আছেন এই শেষোক্ত লোকমান্য মহাশয়ের দেহান্তের সঙ্গে ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাগ্যলিপি বিপর্য্যয়ের কি সম্বন্ধ। ইহার অন্তর্ধানে তিনি আজ ব্যক্তিগত বিয়োগশোকবিধুরা। যাঁহার নেপথ্য সাহায্য, উৎসাহ ও সহানুভূতিতে বলপ্রাপ্ত হইয়া ভারতী সম্পাদিকা তাঁহার লোককর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতেন তাঁহার অন্তর্ধানে যদি সে কর্ত্তব্যনির্ব্বাহে ক্ষণকালের জন্য তিলমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় আশা করা যায় তাহা পাঠকগণের মার্জ্জনা যোগ্য হইবে।

২৯শে বৈশাখ, ১৩২০। শ্রীসরলা দেবী।

গণিতবিৎ গৌরীশঙ্কর দে

গত ৪ঠা এপ্রিল স্কটিশ চর্চ্চ কালেজের প্রবীণ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এম, এ, পরীক্ষায় উপাধি লাভ করেন, এবং সেই হইতেই গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনাব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন

করিয়াছেন। কালেজে অধ্যাপনা ব্যতিরেকে বহু ছাত্র তাঁহার গৃহে আসিয়া পাঠ বুঝাইয়া লইত ও অনেকের বাড়ীতে গিয়াও তিনি তাহাদিগকে পড়াইয়া আসিতেন। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র ব্যতীত ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত প্রভৃতির চর্চ্চাতেও তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। এমন শৃঙ্খলার সহিত নিয়মমত সমস্ত কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন যে, কোন নৈমিত্তিক কাজই তাঁহার অননুষ্ঠিত রহিত না। প্রাত্যহিক উপাসনা ও পদব্রজে বহুবাজারের ধর্ম্মসভায় যোগদান, সান্ধ্য-ভ্রমণ প্রভৃতি কোন কাজই কোনোদিন বাদ পড়িত



গণিতবিৎ গৌরীশঙ্কর দে

না। এক কথায় তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালীটি যেমন পরিশুদ্ধ তেমনই ব্যবস্থানুযায়ী ছিল।

ধর্ম্মনিষ্ঠা স্মৃতি ও মেধা প্রভৃতি লইয়াই যে গৌরীশঙ্কর সম্পূর্ণ তাহা নহে! তাঁহার হৃদয় ও চরিত্রের আদর্শেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। ছাত্রদিগের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চেষ্টা অসাধারণ ছিল। এই চেষ্টা তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহারে ও বাক্যে যেন স্ফূরিত হইত। তিনি এমন সরলভাবে আঁক কসাইতেন যেন ছেলেদের বুঝিতে একটুও কষ্ট না পাইতে হয়। অনাথ ছাত্রদিগকে তিনি পুস্তক ও বেতন প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতেন। ইহা ব্যতীত আর্ত্ত ও দুস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত। কিন্তু এ সংবাদ কেবল দাতা ও গ্রহীতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত অপরে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত না। মৃত্যুর দিন একটী ঘটনায় সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকের জনমণ্ডলী হইতে শ্মশানপথে রমণী-কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শোকের নীরবতার মধ্যে ফুকারিয়া উঠিল—"হায় তুমি চলিলে, গরীব দুঃখীর কি উপায় হইবে বাবা? তুমি যে গরীবের মা বাপ ছিলে, আজ তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে।" বলা বাহুল্য গৌরীশঙ্কর গুপ্তভাবে অনেক পরিবারকে সাহায্য করিতেন, উহা তাহাদেরই একজনের রোদন। কতবার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চ বেতনে উচ্চ সম্মানের পদ দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু তিনি আপনার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত নির্ব্বিকার চিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; বলিয়াছিলেন, যেখানে জীবনের ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন সেখানেই তাহা শেষ করিবেন। নির্লোভ, নির্ব্বিকার পুরুষ-পুঙ্গবের রাগদ্বেষহিংসাহীন সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শে আসিয়া কত যুবকের চরিত্র গঠিত হইয়াছে। তাঁহার সেই প্রশান্ত প্রসন্ন প্রতিভোজ্জ্বল গম্ভীর মুখমণ্ডল যে একবার দেখিয়াছে তাহারই মাথা ভক্তিতে নত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শিক্ষা-মন্দিরে তিনি যে স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রায় এক বৎসর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিগত ৩০শে চৈত্র শনিবার অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। গত বৎসর ঠিক এমনই সময় হইতে তিনি দারুণ 'ক্যান্‌সার' রোগে আক্রান্ত হ'ন এবং সেই ভীষণ রোগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

বিনয়েন্দ্রনাথের জীবন শুধু পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার অ্যালবার্ট স্কুলে তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, এবং এই স্থানেই তিনি সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া অল্পদিন পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ ইতিহাসে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও তৎপর বৎসর দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং বহরমপুর কালেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বহরমপুর

হইতে ভাগলপুর কলেজে ও তথা হইতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

কলিকাতাই বিনয়েন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থান। সকল সৎকার্য্যেই তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট ও সিণ্ডিকেট প্রভৃতির সকল কার্য্যেই তিনি অদম্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেন। বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় অদম্য উৎসাহী, অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্ম্মবীর অতি কম দেখা যায়। সমস্ত দিন



অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন

নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি শ্রান্তদেহে যখন ঘরে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সেই চিরপ্রশান্ত হাসিমুখ দেখিলে মনে হইত সমস্ত দিনের মধ্যে তিনি যত কাজ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে আনন্দই দিয়াছে—কাতর করিতে পারে নাই।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর উদার ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশনে 'জেনেভায়' গমন করেন। সেখানে তিনি আপনার বক্তৃতা-শক্তিতে ও পাণ্ডিত্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পবিত্র সরল চরিত্র ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখাতেই অল্পবিস্তর কার্য্য করিয়াছে। বিনয়েন্দ্রনাথের ন্যায় কর্ম্মবীর হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

দেশের সাধারণের নিকট বিনয়েন্দ্রনাথ তেমন পরিচিত না হইলেও—বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিনয়েন্দ্র যখন আপনার ধর্ম্ম ও কর্ম্মদ্বারা সমস্ত বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক তেমনি সময়েই তিনি ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শুভ্র-সুন্দর পবিত্র অনাড়ম্বর জীবনের সংস্পর্শে যিনি একবার আসিয়া

ছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিনয়-নম্র চরিত্র তাঁহার নামকে সার্থক করিয়াছিল।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

গণেন্দ্রনাথ কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হইতে সম্মানের সহিত এম, ডি উপাধি লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৩৪ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই ইহার জীবনের ব্রত ছিল না। দরিদ্র রোগী যন্ত্রণায় কাতর হইয়া যখনই গণেন্দ্রনাথের নিকট সাহায্যকল্পে আসিয়াছে, তখনই সে সাহায্য-লাভ করিয়াছে। তিনি আপনার বসিবার ঘরে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিখ্যাত ছত্র ফ্রেমে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—

দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

ইহা হইতেই তাঁহার চিত্তসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়।

গণেন্দ্রনাথ লোকমুখে একটা কথা শুনিয়া মনে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন। কথাটা এই যে, ডাক্তারে রোগী বাঁচিল কি মরিল তাহাতে বড় বিচলিত হয় না—পয়সাটা পকেটে আসিলেই হইল। তিনি তাঁহার উদার সহৃদয়তার গুণে চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ কলঙ্ক দূর করিতে পারিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে গণেন্দ্রনাথ বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত হন। সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে না হইতে কর্ত্তব্যের আহ্বানে বিশ্রাম করিবার অবসর মিলিল না। কলিকাতার অপর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ গত জানুয়ারি মাসে তাঁহাকে একরূপ ধরিয়া বাঁধিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য শিমুলতলায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাঁহার রোগীর দল চিঠি লিখিতে লাগিল, "আপনি চলিয়া যাওয়ায় আমাদের বড় অসুবিধা হইতেছে। কে দেখে? কে ব্যবস্থা দেয়? আমরা মরিতে বসিয়াছি।" গণেন্দ্রনাথ একজনকে উত্তর দেন, "আমার জীবন তোমাদের জন্য। তোমরা ভাবিও না বা ভয় পাইও না। যেমন করিয়া পারি আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইব।" কাজেও তাই হইল, ফেব্রুয়ারি মাসে গণেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন।

এই সকল নানা কারণেই গণেন্দ্রনাথকে হারাইয়া আজ মনে হয় যে, তাঁহার মৃত্যুতে এক নিপুণ চিকিৎসকের বিরাট বিচক্ষণতাই যে শুধু চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে, উদার বিপুল একটি হৃদয়ও ঝরিয়া গিয়াছে। এই দুর্লভ হৃদয়টির শোকেই বাঙ্গালী আজ আত্মহারা। তিনি বলিতেন, ডাক্তারের ব্যবসায় বিশ্বজনীন, পীড়িতের সেবাই জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তিনি বলিতেন,—

I feel no care of coin;
Well-doing is my wealth:
My mind to me an Empire is
While Grace affordeth health.

তাঁহার তেজস্বিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বজ্ঞান ও শ্রমশীলতার সীমা ছিল না। কোনদিন উচ্চ পদ বা সম্মানের জন্য তিনি কাহারও তোষামোদ করিতে ছুটেন নাই। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে

Pathologyর অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তিনিও জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর কাল নিতান্তই অকালে তাঁহার জীবনসূত্র ছিন্ন করিয়া দিল।

শ্রী.সী



ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা কলুটোলার প্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনমহাশয়ের বিয়োগে ভারতবর্ষের বৈদ্যসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। নানাদিক হইতে তিনি বৈদ্যশাস্ত্র ও বৈদ্যসমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে এবং অর্থে বাংলায় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থ এতকাল দুর্লভ ছিল তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় সেই সকল গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদপন্থী চিকিৎসকদিগের সহজলভ্য হইয়াছে। এই সকল কার্য্যই দেবেন্দ্রনাথের জীবনের গৌরব। এই সকল কার্য্যের দ্বারা তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন হয় ত তাহার দ্বারাই কালে কবিরাজী চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি হইবে। আয়ুর্ব্বেদের যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যাহাতে অতীত গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত



কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন

হইতে পারে তাহার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। ইহার জন্য তিনি তাঁহার সাধ্য মত যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার ফল হয় ত অতিদূর ভবিষ্যতে কিন্তু তজ্জন্য তিনি যে দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীম

জানকীনাথ ঘোষাল *

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

সংসারের মাঝে, সকলের কাজে,
দেহ প্রাণ মন, করিয়ে অর্পণ
দিয়েছিলে তুমি।
পর আপনার, ছিল না তোমার,
হয়ে একচিত্ত সেবিয়াছ নিত্য
মাতা জন্মভূমি॥
গুণমুগ্ধ তব, বান্ধবেরা সব,
বিদায় সম্মান, করিবারে দান
এসেছে সকলে।
পূজার তরেতে, অর্ঘ্য করেতে,
অনাথ আমরা, আসিয়াছি ত্বরা
নয়নের জলে॥
কে লইবে তাহা শূন্য গৃহ আহা,
তব স্মৃতি বক্ষে, কহে কক্ষে কক্ষে,
নাই কেহ নাই।
অন্তর সে কহে, নহে তাহা নহে,
জানি তুমি আছ, শান্তি লভিয়াছ
অমৃতের ঠাঁই॥

আজ আমরা যাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত হইয়াছি তিনি আমাদের পিতা। আমরা সন্তান হইয়া এই শোকসভায় পিতার কথা যে বলিতে আসিয়াছি তাহা শুধু সম্পর্কের দাবীতে নহে। তিনি আমাদের পিতা—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ—সত্য, কিন্তু তিনি শুধু একলা আমাদের ছিলেন না। শুধু নিজের পরিবার প্রতিপালন করিয়া, নিজের সন্তানদের স্নেহ করিয়াই পিতৃদেব জীবন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি তাঁহার উদার মনঃপ্রাণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই—বন্ধুবান্ধব ও মাতৃভূমির সেবায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন, যে দিন তাঁহার আত্মজ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নানাথ বহুদূরে ইংলণ্ড প্রবাসে সেদিন ভক্তবৎসলা বঙ্গজননীর প্রেরিত বহু পুত্রগণের সহায়তায় আত্মীয়গণের হৃদয়ে জ্যোৎস্নানাথের অনিবার্য্য অনুপস্থিতিজনিত সন্তাপের তীব্রতা কতকটা প্রশমিত হইয়াছিল।

নদীয়ার জয়রামপুরের ঘোষালবংশে প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেবের জন্ম হয়। আমাদের পিতামহ ৺জয়চন্দ্র ঘোষালের দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে পিতামহাগয় কনিষ্ঠ। এই ঘোষালবংশ অসাধারণ বলবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের জয়রামপুরের পৈত্রিক জমিদারী সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, ঘোষালদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষ উহা বীর্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। প্রবাদ এই যে—রাজার এলাকায় এক বন্য মহিষ প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করে, কেহ তাহাকে দমন করিতে না পারায় রাজা ঘোষালদের দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা রাজাহ্বানের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন

* শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী কর্ত্তৃক পঠিত।

এই একটা বুনো মোষের জন্য দুটো লোকের কি দরকার? একজনই যথেষ্ট। এই বলিয়া কোন এক ভ্রাতা একখানা কাঠের মোটা চেলা লইয়া যুদ্ধার্থে যাইলেন। সঙ্গে রাজা, অনুচর, গ্রামবাসী সকলে দর্শকভাবে চলিলেন। মহিষ যেমন আসিয়া আক্রমণ করে, অমনি তিনি শিং ধরিয়া তাহাকে হটাইয়া দেন। এইরূপে খানিক ক্ষণ যুদ্ধের পর একবার এমন জোরে তাহার মুখ মাটীতে গুঁজিয়া ধরিলেন যে তাহার উঠিবার সাধ্য রহিল না। তখন



জানকীনাথ ঘোষাল

তাহার মাথা কাটিয়া রাজাকে উপহার দিলেন ও প্রতিদানে এই ব্রহ্মত্র লাভ করিলেন।

কথিত আছে, আমাদের প্রপিতামহ একদিন ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে গ্রামে একটা ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া অনর্থ করিতেছে। তিনি অমনি ব্যাঘ্রাভিমুখে গমন করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া স্কন্ধে লইয়া গৃহে আগমন করেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের প্রহারে তাঁহার শরীর এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল যে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব্বে ডাকাতের দৌরাত্ম্য প্রবল ছিল কিন্তু শুনা যায় ঘোষালদের এমনিই ডাক নাম ছিল যে জয়রামপুরে তাহারা আসিতে সাহস করিত না। আর নিকটের গ্রামে ডাকাত পড়িলে যখনই তাঁহারা বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থে পহুঁছিতেন ডাকাতেরা সভয়ে প্রস্থান করিত। এখনও দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ঘোষালদের ভয়ে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায়।"

এই প্রবাদ গুলি অতিরঞ্জিত হইলেও ইহা যে, বংশবিশেষের চরিত্রের গতি নির্দ্দেশ করে তাহা নিঃসন্দেহ; এই বংশে জন্মিয়া পিতার বাল্য-শিক্ষাও বংশানুকূল হইয়াছিল। তাঁহাদের লাঠিখেলা বর্ষাখেলা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মধ্যে মধ্যে দুই দল হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ চলিত। জ্যেঠামহাশয় ও পিতামহাশয় দুই বিরোধী দলের অধ্যক্ষ হইতেন—তাঁহাদের মধ্যে অসামান্য ভ্রাতৃস্নেহ ছিল কিন্তু যুদ্ধের সময় কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না।

এই শান্তিপূর্ণ সময়ে ডাকাত বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক না হইলেও পিতৃদেবের এই অসাধারণ বল ও সাহসের পরিচয় অনেক কার্য্যেই পাওয়া যাইত।

পূজ্যপাদ মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুড়াতে যখন রোগশয্যায় শয়ান তখন একদিন রাত্রিকালে তাঁহার মশারীতে আগুন লাগে। পিতৃদেব তাঁহাকে একলাই কোলে করিয়া উঠাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যান। পিতামহাশয়ের বিবাহের পূর্ব্বে দাদামহাশয় যখন একবার সপরিবারে শিঁথির বাগানে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় পিতা একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেজ-মাতুলমহাশয় ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অত্যন্ত দুরন্ত ঘোড়া ছিল, কেহই তাহাতে চড়িতে সাহস করিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন দ্বারবান সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফিরিবার সময় ষ্টেশনে যাইবার জন্য ভাড়াটে গাড়ী না পাওয়ায় সেজমামা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যাইবার একমাত্র এই উপায় আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন পিতামহাশয় তাহাতে সম্মত হইবেন না; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতেই আরোহণ করিয়া ষ্টেশনে গমন করেন। ঘোড়া সওয়ার চিনিতে পারে; তাঁহার হস্তে চালিত হইয়া সুবাধ্য সন্তানের ন্যায় হৃষ্ট ও প্রফুল্লভাবে সে গমন করিল—কোন দুষ্টামির চিহ্নও প্রকাশ করিল না।

যোড়াসাঁকোর বাটীতে তেতলার ছাদে বাগানের দিকে ত্রিকোণচূড়া এক আলিসা আছে। একদিন মামাদের সহিত বাজী রাখিয়া তিনি ইহার উপর দিয়া দৌড়িয়া যান। সামান্য পদস্খলন হইলেই তৎক্ষণাৎ তেতলা

হইতে নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। তাঁহার সাহসিকতার এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে অধিক উল্লেখ করিলাম না।

তাঁহার নিজ ইচ্ছামতই পিতামহমহাশয় তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠান। তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এইখানেই তিনি ৺রামতনু লাহিড়ী, ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺কালী চরণ ঘোষ, ৺রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর রাজার দৌহিত্র) প্রভৃতি বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসেন। রামতনু লাহিড়ীপ্রমুখ মনীষীগণের উপদেশ ও উত্তেজনায় পিতা মহাশয় ও আরও কতিপয় ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন, এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। আমাদের পিসেমহাশয় ৺পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়ও ইঁহাদের মধ্যে একজন। উপবীত-ত্যাগবার্ত্তা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করেন, কিন্তু শুনিতে পাই পিতামহী ইহাতে মোটেই রাগ করেন নাই; বলিয়াছিলেন ছেলের যাহা সত্য মনে হয় তাহাই করিয়াছে, তা করুক। কিন্তু ঠাকুরদাদা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এমন কি জ্যেঠামহাশয়ের মৃত্যু হইলে পিতাকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনেক বিষয় সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলেন; তথাপি পিতৃদেব স্বার্থের জন্য নিজের মত ও বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই; পিতার ক্রোধবজ্র মাথায় লইয়া এই সময় তিনি নানা সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পুলিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় লোকের পুলিসের সব কার্য্য অনুমোদন করিয়া সদ্ভাবে চলা অধিক দিন সম্ভব নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময় মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে যান ও এই সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবককে দেখিয়া প্রীত ও আকৃষ্ট হয়েন এবং কয়েক বৎসর পরে মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পিতা বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুরদাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং এই সময় হইতে আবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা বধূর মুখ-দর্শন করেন এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন ও আমাদের লইয়া আহারাদি করিতেন। সেকালের হিসাবে তাঁহারও প্রকৃতি উদার ছিল। ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তাঁহার মনে আঘাত লাগিয়াছিল কিন্তু অনেকগুলি ছোট খাট কুসংস্কার তিনি নিজেই মানিতেন না।

বিবাহকালে পিতৃদেব মাতামহ-পরিবারের ২টী রীতি গ্রহণ করেন নাই ঃ— ১। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা। এই সময় তিনি ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। মাতৃদেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১২বৎসর মাত্র। মাতামহ কন্যার যে শিক্ষা পত্তন করেন, স্বামীর যত্নে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পিতা তাঁহার কন্যাদ্বয়কেও পুত্র-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, ইহা

সকলেই জানেন। মাতৃদেবী ও আমরা যে কোনো সৎকার্য্যের বা দেশ-হিতকর কার্য্যের প্রয়াস পাইয়াছি তাহার তিনি প্রধান সহায় ও উদ্যোগী ছিলেন। পূজনীয় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ-সংস্কার-প্রযত্নে তিনিই সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য যে কি গভীর ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ফললাভদ্বারা তাঁহার অনেক বন্ধুই বিশেষভাবে অবগত আছেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, তথাপি পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিবার সমস্ত ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদের বিশেষ নিষেধে ক্ষান্ত হন। তাঁহার একজন সহপাঠী বন্ধুকে তিনি একবার কয়েক সহস্র টাকা ধার দেন। বন্ধু তাহার কিয়দংশ শোধ করিয়া একদিন বলিলেন "বাকী হাজার কতক আর আমি দিতে পারছিনে, আমায় মাপ করে দেও।" পিতৃদেব হাস্যমুখে বন্ধুর এ আবদার মানিয়া লইলেন।

বিবাহের পরেই পিতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ডেপুটী কালেক্টরীর পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা অভাবিত কারণে সেই সময় বিলাত যাওয়ায় বাধা পড়ায় তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে বেরিণী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক দোকান তিনি ক্রয় করেন। তাহা খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করিবার অল্পদিন পরে—তাহার পূর্ব্ব মালিক তাহা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পিতা গভীর স্বার্থত্যাগ করিয়া দোকান ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার ত্যাগস্বীকার ও দয়া প্রভৃতি কিরূপ প্রবল ছিল, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। লাটের নিলামে অল্প মূল্যে তিনি অনেকগুলি বিষয় খরিদ করেন; তাহা রাখিলে তিনি লক্ষাধিপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন পূর্ব্ব মালিকগণ গললগ্নবাসে আসিয়া জমি ফিরাইয়া দিবার অনুরোধ করেন, তখন তাহার অধিকাংশই তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

রোগীর সেবা তাঁহার একটি প্রধান ব্রত ছিল! পরিবারের সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। দেশে, বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যতদূর সেবা করিয়াছেন, আর কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। দাসদাসীর রোগেও তিনি সেবা করিতেন। পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোর নবাবী প্রথায় চাকর দাসীদের অসুখের সময় তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ ও বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পিতা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না; অসুখের সময় নিজে পুনঃ পুনঃ তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন; আবশ্যক হইলে নিজেও সেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে এজন্য উপহাসাস্পদ হইতে হইত। গরীব দুঃখীর সেবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় ডাক্তারী করিতেন। কাশিয়াবাগান বাগান-বাড়ীতে আমরা যখন ছিলাম—তখন দেখিয়াছি, রোজ সকালে পাড়ার আর্ত্ত লোকে বাড়ী ভরিয়া যাইত! ভোর হইতে রোগী দেখিয়া ঔষধ

রিতরণ করিতে করিতে বেলা দশটা এগারটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর তিনি স্নান আহার করিতেন।

কাহারও বিপদ বা কষ্ট দেখিলে তিনি প্রাণপণ সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মাতামহমহাশয় এক সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির সহিত বৈষয়িক মকদ্দমায় জড়িত হয়েন। তখন পিতা আইনের সূক্ষ্ম জাল ভেদ করিয়া যে নীতি বাহির করেন তাহার দ্বারাই তাঁহার বিষয় রক্ষার বিশেষ সহায়তা হয়। সেই সময় আইনে তাঁহার বিশেষরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিলাত যাইয়া বারিষ্টার হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি আমাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু সংবাদে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয়। ইচ্ছা ছিল, আবার যাইয়া শেষ পরীক্ষা দিবেন এবং তজ্জন্য বরাবর ফি দিয়া নাম বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই।

তিনি পরের কষ্টে এতদূর ব্যস্ত থাকিতেন যে নিজের বৈষয়িক কার্য্য অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত। সান্ত্বনা-পত্রে সকলেই তাঁহার মধুর নম্রতা ও বিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখনও তিনি সমাগত বন্ধু বান্ধবগণকে যথারীতি অভিবাদন করিয়াছেন, নিজে যাইয়া গাড়ীতে পৌঁছাইতে না পারায় দুঃখ জানাইয়াছেন।

কলিকাতার প্রায় সব সাধারণ হিতকর কার্য্যেই তাঁহার যোগ ছিল। অনেক বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিসনার ছিলেন। ম্যেকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে যে ২৮ জন কমিসনার পদত্যাগ করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বৎসরাবধি তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল; মধ্যে মধ্যে এক এক বার শয্যাগত থাকিতেন, কিন্তু একটু সুস্থ বোধ করিলেই কোর্টে ও অন্যান্য কার্য্যে যাইতেন; আমাদের নিষেধ মানিতেন না। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিরল।

ইহাঁর সঙ্কলিত "Celebrated Trials in India" নামক পুস্তক সাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে।

পবলিক কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় কার্য্য ছিল—ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস। হিউমের উদ্বোধনে এটি জানকীনাথের স্বহস্তে রোপা, স্বহস্তে জল সেচন করা ও স্বহস্তে বাড়ান জাতীয় মহীরুহ। কংগ্রেসের জীবন আজ ২৮ বৎসর; আজ অনেকেই ইহার বন্ধু, সহায় ও মুরুব্বি, কিন্তু যতদিন এ নাবালক ছিল, ততদিন জানকীনাথই ইহার প্রধান অভিভাবক ছিলেন।

যে সময়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাদাম ব্লাভাট্স্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফি প্রচার করেন সে সময় জানকীনাথ থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিঃ হিউমও থিয়সফিষ্ট ছিলেন। সেকালে বৎসরান্তে মান্দ্রাজে একটি থিয়সফিক্যাল কন্‌ফারেন্স হইত; ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে থিয়সফিষ্টগণ সেখানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এইরূপ সম্মিলনী হইতেই হিউম সাহেবের মনে একটি ভাবের স্ফুরণ হইল যে, সমগ্র ভারতবাসীর

এইরূপ একটি পলিটক্যাল সম্মিলনী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল হইবে। এই ভাব হইতেই কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং সেই ভাবটিকে কাজে পরিণত করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি তখন কিছুকালের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া "Indian Union" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে তিনি যে কিরূপ ভাবে ইহার জন্য কার্য্য করিয়াছেন, ধন প্রাণ মন দিয়া সকলের তিরস্কার নিগ্রহ সহ্য করিয়া অম্লানচিত্তে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি আরম্ভ হয়, তখন কংগ্রেসে যাইবার উদ্যোগ কতদূর অগ্রসর হইল ক্রমাগত তাহার খোঁজ লইতেন। কংগ্রেস-সঙ্গী ভৃত্য গোপালকে পুনঃপুনঃ শীঘ্র প্যাক্ করিতে আদেশ করিতেন। জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আসিলে তাগিদ দিতেন।

পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এখন শেষ করিব। "দুঃখীর দুঃখ নিবারণ, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, স্বদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি যে দিকে যে কোনও কার্য্যে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত, সর্ব্বদাই তিনি তাহাতে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতেন। কোনও ভাল কাজের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিলে কাহাকেও কখনও নিরাশ হইতে হয় নাই। সেই সকল প্রসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, তাঁহার যেন আহার নিদ্রা মনে থাকিত না, কতই যুক্তি আঁটিতেছেন, কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, কতই সাহায্যের পথ আবিষ্কার করিতেছেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকাও একটি আনন্দ।"

আজ ভ্রাতা শ্রীমান জ্যোৎস্নানাথ সুদূর প্রবাসে। তাঁহার অনুপস্থিতিবশতঃ যে পুণ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে তাহার ত্রুটি ভক্তির দ্বারা পূর্ণ হইবে এই আশা। এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন আর যাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতি মাতৃদেবীর শোকার্ত্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি বর্ষণ করিয়াছে তাঁহারা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

কুণাল *

(বৌদ্ধ গল্প)

পিয়দাস ধর্ম্মাশোক। যুবরাজ কুণাল। সুন্দর দু'টি চোখ—রাজহংসের মতো। তাই তাঁর নাম কুণাল। † যে দেখে সেই কুণালকে ভালবাসে। রাজা এই মুকুলটির সাথে আর একটি মুকুল মিলিত করিলেন। বধূ কাঞ্চন ছোট স্বামিটির খেলাধূলায় হাসিকান্নায় নবীন

* অবদান কল্পলতা, ৫৯ পল্লব।

† হিমালয়ের হংসের নাম কুণাল।

জীবনের মধুর দিনগুলি ফুলের পাপড়ীর মতন ফুটাইয়া তুলিয়া চলিল। এমনি করিয়া তাহারা ফুটিয়া উঠিল। সুন্দর কুণাল আরো সুন্দর হইল।

সুযশো বিহার। মহাস্থবির কুণালকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—"বৎস, ভবিষ্যতে তোমার এই সুন্দর আঁখি দু'টি নষ্ট হইবে। চক্ষু চঞ্চল, চাঞ্চল্যের বশীভূত হইও না, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিও না। অনাস্থাই সুখের কারণ।"

* * *

বসন্ত আসিয়াছে;—মলয়ানিল গৃহে গৃহে আগমনী গাহিয়া বেড়াইতেছে। দিকে দিকে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। তরু মঞ্জুরিয়া উঠিল, কুসুম বিকশিত হইল, পিক পঞ্চমে গাহিল।

বসন্তোৎসব। সমস্ত পুরী সে উৎসবে মাতোয়ারা। উৎসবকুঞ্জে বসন্তোৎসব অভিনয়। নায়কের ভূমিকায় কুণাল।

উৎসবান্তে মুগ্ধ নরনারী গৃহে ফিরিল। রঙ্গালয়ে যবনিকা পড়িল। কুঞ্জের দীপ নিভ নিভ হইল।

রাজার অন্তঃপুরচারিণী, যে যত সবাই মুগ্ধ।—কেহ মুগ্ধ উৎসব মধুরিমায়, কেহ মুগ্ধ অভিনয় মরিদায়। কিন্তু একজন আরো কিছুতে মুগ্ধ—কুণালের সুন্দর মুখে। সে তিষ্যরক্ষা—রাজমহিষী—যৌবনময়ী।*

সকলেই ঘরে ফিরিয়াছে। কিন্তু মুগ্ধা ফিরিল না। সে বসন্তের হিল্লোলে গা ভাসাইয়া দিয়া—পুষ্প সৌরভে, চন্দ্র জ্যোৎস্নায় পাগল হইয়া প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুণাল ঘরে ফিরিতেছিলেন, রাণী পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। কুণাল রাণীর সেই আবেশ মাখা চোখের পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি নয়ন নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখ আর তুলিলেন না।

তিষ্যরক্ষা ক্ষুণ্ণমনে কক্ষে ফিরিল।

(২)

তক্ষশীলার রাজা কুঞ্জর কর্ণ। তিনি অশোককে সংগ্রামে আহ্বান করিলেন।

কুণাল সেনাপতি বরিত হইল।

সেনাপতি কুণাল, রাজা কুঞ্জর সকাশে উপস্থিত হইলেন। কুঞ্জর আপন প্রাসাদে অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন। কুণাল রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

* * *

অশোক রুগ্নশয্যায়। ভীষণ ব্যাধি! ভিষক নিরাশ হইয়াছেন। রাজা মনে করিলেন, কুণালকেই রাজা করিবেন।

কুণাল রাজা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে! কুণালকে কিছুতেই রাজা হইতে দিব না। রাণী তিষ্যরক্ষা রাজাকে কহিলেন—

"না কুমারের আসিয়া কাজ নাই। শীঘ্রই রোগের উপশম হইবে। আমিই উপশম করিব।"

রাজা মহিষীর বাক্যে প্রফুল্ল হইলেন।

রাণী স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন; সেই

* তিষ্যরক্ষা নৃপতি অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী, কুণালের বিমাতা, কুণালের সমবয়সী।

ঔষধে রাজা বাঁচিলেন। রাজা কুটজ্ঞনেত্রে মহিষীর মুখের পানে চাহিলেন।

নারীর কুটিল নয়নে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"মহারাজ, আমি আপনার রোগ সারিয়া দিয়াছি, এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

"পূর্ণ করিব। তোমার প্রার্থনা বল।"

"আমি সাত দিন রাজত্ব করিতে চাই।"

"বেশ!"

রাজসিংহাসনে বসিয়া নারী আদেশ করিলেন,—

"তক্ষশীলায় এখনি দূত প্রেরিত হউক। কুণাল মহাদোষে দোষী। নৃপতি কুঞ্জর সমীপে পত্র প্রেরিত হউক। অনুরোধ—মহাদোষে দোষী কুণালের চক্ষু উৎপাটন ও অন্ধ কুণালের নির্ব্বাসন!

পত্রে রাজার নাম—রাজার শাসনাঙ্ক মুদ্রিত হইল।

(৩)

কুঞ্জর, লিপি পাঠ করিলেন। কুণালও লিপির মর্ম্ম অবগত হইলেন। পিতার আদেশ—রাজার আদেশ! কুণাল কহিলেন—"আমি রাজার আদেশ পালন করিব। কিন্তু পালনের পূর্ব্বে দেবী যেন না জানেন।"

দেবীর অগোচরে অশ্রুভরা দুইটি চোখ মণিহারা হইল।

কি যেন বলিতে দেবী কক্ষে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। সোনার নূপুর সোপানগায় খসিয়া পড়িল। চঞ্চল বাতাসে গোলাপী অঞ্চলখানি উড়িয়া গেল! শিথিল কবরী হইতে ফুলের মালা ঝরিয়া পড়িল।

"স্বামিন্ স্বামিন্, দেখ দেখ—"

"দেবী!"

দেবী তখন মূর্চ্ছিতা।

"দেবীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হউক, তারপর রাজার শেষ আজ্ঞা প্রতিপালন করিব"—কুণাল কুঞ্জর সমীপে এই আবেদন প্রেরণ করিলেন।

কুঞ্জর কুণালকে দেখিতে আসিয়া ছিলেন, তিনি সজলনয়নে কক্ষত্যাগ করিলেন। সারা দিনমান, সারা রজনী অমনিই কাটিল।

প্রভাতে দেবী জাগিলেন।

"স্বামিন্, চল আমরা এখনই চলিয়া যাই, মহারাজের শেষ আজ্ঞা প্রতিপালিত হউক।"

"দেবী, আমার পিতৃভবনে ফিরিয়া যাও।"

"স্বামী, এই আমি তোমার হাত ধরিলাম, পার যদি ঠেলিয়া চলিয়া যাও, আমি বারণ করিব না।"

দম্পতীযুগল নির্ব্বাসিত হইলেন। বীণা বাজাইয়া, আনন্দের—অমৃতের করুণগাথা গাহিয়া দুইজন পথে পথে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু বৎসর গত হইল।

* * *

বীণা বাজাইতে বাজাইতে একদিন এক ভিখারী ও ভিখারিণী পাটলীপুত্রে আসিয়া উপনীত হইল।

কুঞ্জতোরণে দাঁড়াইয়া রক্ষী ধমক দিল,—"ভিখারী তোরা! তোরণ পার হইতে চাস্! দূর হ।"

বিতাড়িত ভিখারীদ্বয় হস্তীশালায় আশ্রয় লইল। রাত্রি আসিয়াছে। অন্য আশ্রয় খুঁজিবার সময় নাই।

নগরী দীপমালায় সজ্জিত। গৃহে গৃহে

আনন্দস্রোত বহিতেছে। কুঞ্জে কুঞ্জে নিশার ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে নগরীর দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। নগরী স্তব্ধ।

নিস্তব্ধ নগরীর বিরাট শিয়রে শুভ্র চন্দ্র উদিত হইয়াছে। নিবিড় শ্যামল কুঞ্জের মাঝে মাঝে কৌমুদীস্নাত ধবল সৌধাবলী নীরব —নিস্তব্ধ। আলোছায়ার সুষুপ্তি।

প্রহরীর নয়ন ঢুলিয়া আসিল। কিন্তু তবু তাহাকে জাগিতে হইবে।

নিদ্রাতুর প্রহরী ভিখারীকে অনুরোধ করিল—"ভাই! তোর বীণাটা এইবার বাজা।"

ভিখারীর বীণার সুর রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল— অন্ধকারের মধ্যে করুণ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

সুপ্ত নরপতি সুখশয্যায়। বীণার সেই করুণসুরে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। এ কার বীণার স্বর! এ যে চিরপরিচিত।

তিনি পাগলের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন।

* * *

পুত্র পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন;— পিতা পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"এমন সুন্দর চক্ষু যে নষ্ট করিয়াছে, সে অক্ষত চক্ষু লইয়া থাকিবে!" নৃপতির কণ্ঠ ক্রোধে কম্পিত হইল।

কুণাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

"আমার চক্ষু লইয়া যদি মাতার মন প্রসন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার সেই প্রসন্নতার বলেই আমি আবার নেত্র লাভ করিব।"

তৎক্ষণাৎ কুণালের চোখ ফুটিয়া উঠিল।

তারপর যুবরাজ কুণালের রাজ্যাভিষেক মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

মিডিয়া। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি নাটক। গ্রীক রাজকন্যা মিডিয়ার জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

খাঁজাহান। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। এখানিও নাটক। ঐতিহাসিক। মহাবৎ খাঁর কন্যা সোফিয়া ও হিন্দু সেনাপতি নারায়ণ রাওয়ের প্রেমের ছায়াপাতে রোমান্সটুকু বেশ ফুটিয়াছে।

পদার্থ-পরিচয়। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত। কলিকাতা ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও সান্যাল কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। বস্তু সাহায্যে শিক্ষাদানকল্পে এই গ্রন্থখানি রচিত। পাশ্চাত্য দেশে পণ্ডিতসমাজ একদিন ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিলেন, যে, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা ছেলেদিগকে মুখস্থ বিদ্যাই শুধু শিখানো হয়—তাহারা কেবল শব্দই শিখে, বিষয় শিখে না। তাহাতে শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ধানের কথা কেতাবে পড়িয়া ধানগাছ সম্বন্ধে মফস্বলের বাঙ্গালীর হাস্যকর প্রস্তাবাদির কথা এ দেশে প্রবাদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বাস্তবিক, বস্তু বা পদার্থের সাহায্যে শিক্ষা না পাইলে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেই পারে না। কাব্যে "সপ্তপর্ণী" বৃক্ষের কথা পড়িয়া ভাবিলাম, না জানি, সে কেমন গাছ! কিন্তু সেই সপ্তপর্ণীই যে আমাদের চিরপরিচিত 'ছাতিম' গাছ, ইহা জানিলাম না। ইহার ফল এই হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যা মগজের মধ্যেই জমা থাকিয়া যায়, জীবনে সে বিদ্যা খাটাইতে পারি না। এইরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থই কিণ্ডেরগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এ প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সেই কিণ্ডেরগার্টেন প্রণালীর উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছি। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধু এবং তাহা সিদ্ধ হইবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থে ছয়টি প্রকরণ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪।৫ বৎসরের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ১২।১৩ বৎসরের বালকগণের অবধি উপযোগী বিবিধ বিষয়ের পাঠ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠগুলি বিশদ ও তথ্যপরিপূর্ণ—কোথাও ফাঁকি বা গোঁজামিল নাই। গ্রন্থকার নিজে শিক্ষাবিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যক্ষ। বিষয়গুলির সুসন্নিবেশেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইলাম। এ গ্রন্থপাঠে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিভাগ এবং দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলির সহিত ছাত্রগণের যে সহজ পরিচয় হইবে, তাহা তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের বহু আয়াসশ্রম লঘু করিয়া তুলিবে। গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। বহিখানির ছাপা বাঁধাই কাগজও পরিপাটি হইয়াছে।

পুষ্পরেণু। শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ সেন প্রণীত। হবিগঞ্জ হইতে শ্রীরামকমল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এখানি কবিতাপুস্তক। ভূমিকাপাঠে জানিলাম, রচয়িতা বালক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। অথচ অতিথির উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিতেছেন, 'গালিচা পেতে রেখেছি ঘরে, বস গো এসে! হৃদয়-রাজ্যে করিব রাণী এস গো হেসে।" ছোট ছেলের মুখে এরূপ 'চিচড়ে-পাকামি' এ দেশেই সম্ভব, আর এই ভাবকে প্রশ্রয় দিবার জন্য স্কুলসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ও ভূমিকা লিখিয়া দেন, ইহার চেয়ে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে! দেশের শ্রেষ্ঠ কবিগণের lyricএর অংশ চুরি করিয়া বহি ছাপাইয়া কি লাভ হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। হরনারায়ণ কবিতার চর্চ্চা ছাড়িয়া স্কুলের পড়ায় মন দিন। "কালে হেম-নবীনে পরিণত হইবার" পক্ষে তাঁহার কোনই আশা নাই।

বাঙ্গলার বেগম। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। বহু প্রাচীন ইতিহাস ও চিঠিপত্রের ধূলিজঞ্জাল হইতে লেখক 'লুৎফুন্নিসা,' 'আমিনা' 'মণি বেগম' প্রভৃতি বাঙ্গালার ছয়জন বেগমের জীবন-ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল। বর্ণনার গুণে কাহিনীগুলিও বেশ ফুটিয়াছে। রচনাটি আগাগোড়া সরস ও সুপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থে কয়েকটি বেগমের চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ঘসিটির চিত্রখানি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। গ্রন্থের ছাপা কাগজও সুন্দর।

পারিজাত। সেখ হবিবর রহমান প্রণীত। যশোহর খুলনা, সিদ্দিকিয়া হইতে মৌলবী আলতাফ হোসেন সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। কোন মুসলমানকে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লিখিতে দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। এখানি কবিতা-পুস্তক। ছন্দে লেখকের বেশ একটু অধিকার আছে, নূতন ভাব না থাকিলেও কবিতাগুলি পড়িতে ভাল লাগে।

থেরীগাথা। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, উয়ারী, ঢাকা। ভারত মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকারের 'অনুক্রমণিকা'টি মূল্যবান,—প্রাচীন ভারতের নারী-মহিমার সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "থেরীগাথা গ্রন্থে ৭৩ জন পূতশীলা নারীর পদ্যরচনা সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত রমণীগণ কর্ত্তৃক যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কত, সে কথা সুধী পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ভগবান বুদ্ধদেব যখন মুক্তির নব সংবাদ প্রচার করিলেন, তখন সহস্র সহস্র

নরনারী মুক্তি-কামনায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে রমণীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৩ জন রমণীর রচনা এই থেরীগাথায় পাওয়া যায়। থেরী শব্দের অর্থ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা। * * থেরীগাথা রোমান অক্ষরে যাহা মুদ্রিত আছে, সেই মূল টীকা ও কাব্যানুবাদসহ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং নানা দিক দিয়া এই গ্রন্থের বিশেষত্ব উপভোগ্য হইয়াছে।" বিজয়বাবুর অনুবাদগুলি যেমন মিষ্ট, তেমনই মূলের অনুসারী। মূলের কোথাও এতটুকু ব্যভিচার হয় নাই। পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রতি থেরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বিজয়বাবু সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনুবাদ শ্লোকগুলিতে মূলের রস পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে! কোথাও সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে; গ্রন্থকারের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি, "প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে আবার এই ভারত-গৌরব রমণী-গণের জীবনী এবং গাথা গৃহে গৃহে পঠিত এবং আলোচিত হউক।"

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, উয়ারী, ঢাকা। ভারতমহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। এই গ্রন্থে মিশর, বাবিলন, আসিরিয়া, প্রভৃতি এবং ইহুদী, পারসীক ও ফিনিকজাতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখক বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র। তাঁহার এ সাধু উদ্যম প্রশংসার্হ। গ্রন্থের ভাষা সহজ, বর্ণনার ভঙ্গীটিও সরল, অনাড়ম্বর। কাজেই বর্ণনীয় বিষয়টুকুও প্রাণে আসিয়া আঘাত করে।

আদ্যার গম্ভীরা। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি হইতে প্রকাশিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। "রাঢ়াদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে 'আদ্যের গম্ভীরা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 'গম্ভীরা' শব্দের অর্থ দেবগৃহ। পূর্ব্বকালে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে "মালদহ অঞ্চলে" গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। * * গম্ভীরা বলিলে আরাধনা বা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন গৃহকেই বুঝায়। গৃহীলোক আপন বাসভবনস্থ গম্ভীরাগৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্ম্মপাদুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আদ্যাদেবী (চণ্ডিকাদেবী) তথায় পূজা পাইলেন। চণ্ডিকারূপে পূজা পাইবার সময় আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরায় থাকিত। ক্রমে চণ্ডিকা শিবপত্নী হইলে 'হরগৌরীরূপে' গম্ভীরা-মণ্ডপে স্থান পাইলেন। এই গম্ভীরাতেই ধর্ম্মোৎসব হইত। সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাবকালে হরগৌরীর পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।" গম্ভীরা-উৎসবের অপূর্ব্ব ভাবে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থকার প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া মালদহের নদী জঙ্গল, দীঘিদুর্গে পরিভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লীসমাজের কাহিনী শুনিয়া গম্ভীরার ইতিহাস ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অনন্যসাধারণ। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। বিষয়গুলির সন্নিবেশও সুশৃঙ্খল। ইতিহাসের জীর্ণ ধূলিকে লেখক এমন উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে নাটক-নভেলও এতটা চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সকলই চমৎকার হইয়াছে।

মানস প্রসূন বা মায়াবতী। 'সাধনা'-রচয়িত্রী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়, কালী-ঘাট, ওলিম্পিওন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি; মধ্যে মধ্যে ভাব বেশ উচ্চ এবং কবিত্বও মন্দ ফুটে নাই। লেখিকার ভাষা সরল ও শুদ্ধ, ছন্দের সুরটিও মধুর, শান্ত। তবে একঘেয়ে প্রকৃতি-বর্ণনার আতিশয্যে বহু স্থলে রসভঙ্গ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক বালিগঞ্জ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



"করুণাময়ী"

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত "রাজকন্যা" নাটিকার চিত্র)

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২০ [৩য় সংখ্যা

আসন্ন বর্ষা

কৃশকায়া, যেন ছায়া ভূতলে শয়ান।
রুক্ষ কেশ, শুষ্ক বেশ তৃষিত নয়ান॥
অঙ্গরাগ অনুরাগ, চিতে নাহি আর।
সঙ্গোপনে তপ্তবনে ঝরে পুষ্প ভার॥
সুপ্তি হীন নেত্রে দীন নাহিক কজ্জল।
অগ্নি ঢালা দীপ্তি জ্বালা আকাশ পিঙ্গল॥
কেশ-ভার বদ্ধ তার এক বেণী ধরা।
লুপ্ত ছায়া মেঘ মায়া উচ্চ বসুন্ধরা॥
ঊর্দ্ধ নেত্র, অহোরাত্র ব্যগ্র দরশন।
চাতকের, পথিকের, ভিক্ষা বরিষণ॥
শূন্যে হায় অসহায়, মনোরথ চলে'।
কোথা তারা পথহারা বায়ুবেগ বলে॥
প্রিয় আশে, স্বীয় পাশে নাহি রহে মন।
ধরণীর সিন্ধুনীর পরশে গগন॥

বাতায়ন ছাড়ি মন, সিংহদ্বারে ধায়।
অনিবার দূত কার আসে পূর্ব্ব বায়॥
ধূসরিত বিলম্বিত উত্তরীয় তার।
ছায়া দান করি মান রাখে বসুধার॥
দিগন্তে অনন্তে বাজে সুদূর দুন্দুভি।
আকস্মিক মাঙ্গলিক ঊষীর সুরভি॥
প্রতীক্ষায় তিতিক্ষায় কাটিল বিরহ।
জীবনের মিলনের এল সমারোহ॥
ঝর ঝর মর মর কল কল তান।
উল্লসিত উচ্ছ্বসিত জলধি বিমান॥
পুলকিত চমকিত প্রফুল্ল বল্লরী।
তৃণ শ্যাম অবিরাম চুম্বনে শিহরি॥
গিরিমূলে, নদীকূলে প্রান্তরে কান্তারে।
প্রিয়জন-সম্মিলন বারতা বিস্তারে॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

জলছবি *

ভিখারিণীর দান

আমি পথ চলিতেছিলাম···এক জরাজীর্ণ ভিখারিণী আমায় দাঁড় করাইল।

কঙ্কালসার দেহ—বার্দ্ধক্যে নুইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুধায় কাঁপিতেছে; কোটরগত চক্ষু—মৃত, নিষ্প্রভ—তারা দুটির উপরে কে যেন মাটির প্রলেপ টানিয়া দিয়াছে; শত-ছিদ্র বসন ধূলায় কাদায় ভরা—লজ্জা তাহাতে সম্পূর্ণ রক্ষা হইতেছেনা...লাঠিতে ভর দিয়া সে আমার কাছে ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া দাঁড়াইল... চোখের সম্মুখে জীবন্ত দারিদ্র্য!

অনেক কষ্টে ঘাড়টি কাঁপাইতে কাঁপাইতে তুলিয়া সে তাহার সেই আড়ষ্ট চোখে আমার দিকে তাকাইল...শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া মর্ম্মান্তিক কাতর কণ্ঠে বলিল—"কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!"

তাহার সেই কণ্ঠস্বর যেন আমার বুকের পাঁজরে গিয়া বিঁধিতে লাগিল।

আমি ব্যস্ত হইয়া পকেট হাতড়াইলাম ...একটি কাণা কড়িও নাই। গায়ের চাদর খানা পর্য্যন্ত সে দিন লওয়া হয় নাই। কি করি?

আমি আর-কিছু করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সেই হাতখানা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম... ব্যাকুলভাবে বলিলাম —"আজ আমার কিছু নেই যে মা!"

—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"...

বৃদ্ধার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল; সেই নিষ্প্রভ চোখে একটু জীবনের আলো ক্ষণেকের জন্য যেন হাসিয়া উঠিল...সে তাহার হাতখানা আমার কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাছা! ঐ মা ডাকেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে; আর কিছু চাইনে বাবা!" .....

আমি বাড়ি বসিয়া বৃদ্ধার কথা ভাবিতেছি; —তাহাকে আমি কিছুই দিতে পারিলাম না, কিন্তু সে আমায় যথেষ্ট দিয়া গেল।

স্নেহের জয়

শীকারের পর বনের মধ্য দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। সঙ্গে কুকুরটা ছিল।

হঠাৎ দেখি সে গতি মন্থর করিয়াছে, গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছে, চক্ষু দুইটা বাহির করিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে একটা ঝোপের দিকে চাহিতেছে।

আমি সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম।

একটি চড়ুই পাখীর ছানা বাসা হইতে ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে.....তখনও সে উড়িতে শিখে নাই···মাটিতে উল্টাইয়া পড়িয়া হলুদবর্ণ কচি ডানা দুটি কেবল নাড়িতেছে।

কুকুরটা বকের মতো পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ শব্দ করিয়া একটা ধাড়ি চড়ুই গাছের উপর হইতে ঝপ করিয়া মাটিতে পড়িল—একেবারে কুকুরটার সামনে! কী তার আর্ত্তনাদ! অতটুকু কণ্ঠ কিন্তু তাহাতেই মনে হইতেছিল যেন সমস্ত বনটা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

"রক্ষা কর! রক্ষা কর!"—আমি ঠিক শুনিলাম পাখীটার আর্ত্তনাদ হইতে যেন একটা কাতর প্রার্থনা বাহির হইতেছে—"রক্ষা কর! রক্ষা কর।".....কিন্তু কে রক্ষা করে?

কুকুরটা তখন ছানাটার প্রায় সামনে গিয়া পড়িয়াছে;—যেন যমদূত!

ধাড়ি পাখীটা দুইবার ডানা তুলিয়া কুকুরটার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল।... কুকুরটার সাদা সাদা তীক্ষ্ণ দাঁতগুলা তার চোখের সামনে অমনি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। সে ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল কিন্তু নিজের প্রাণ-ভয়ে উড়িয়া পালাইল না ...ডানা দুটি মেলিয়া ছানাটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

এতটুকু চড়ুই পাখীর সামনে কুকুরটাকে মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড দানব!

কুকুরটা একবার ফোঁস করিয়া উঠিল। চড়ুই পাখীর সমস্ত দেহটা তাহাতে শিহরিয়া উঠিল বটে কিন্তু তবুও সে ছানাটিকে ছাড়িল না—বুকে করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিল—এতটুকু নড়িলও না। প্রাণের মায়া তাহার আর নাই;...কি একটা শক্তি যেন সে মায়াকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে!

কুকুরটা একবার আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু চড়ুইটার অটলতার পানে চাহিয়া পিছু হঠিয়া আসিল...সেই শক্তির নিকট তাহার হিংস্রতা হার মানিয়া গেল।

আমি তখন সেই হতভম্ব কুকুরটার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। সে ধীরে ধীরে আমার দিকে চলিয়া আসিল। আমি সসম্ভ্রমে চড়ুইটার পানে একবার চাহিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

সম্ভ্রমের কথা শুনিয়া হাসিও না। সত্যই সেই ছোট পাখীটার উপর আমার সম্ভ্রম আসিয়াছিল।

আমি ভাবিতেছি, ভালোবাসা কেমন সহজে মরণ-ভয়কে হেলায় অতিক্রম করে—প্রত্যক্ষ মরণকেও গ্রাহ্য করে না!

এই ভালোবাসার জন্যই তো জীবন জীবন্ত হইয়া আছে!

প্রকৃতির মন্দির

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন মাটির ভিতরে অনেক নীচে এক মন্দিরে আমি আসিয়াছি—অন্ধকারের আবছায়া-আলোয় সেখানটি আলোকিত।

* টুর্গেনিভের ইংরাজি হইতে।

মন্দিরের ঠিক মাঝখানটিতে বেদীর উপরে বসিয়া এক রমণী!—তাঁহার দীর্ঘ সবুজ অঞ্চল-খানি লুটাইয়া পড়িয়াছে—হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘোর চিন্তায় তিনি নিমগ্ন।

বুঝিতে আমার এতটুকু বিলম্ব লাগিল না যে ইনিই প্রকৃতিরাণী স্বয়ং! সম্ভ্রম ও আতঙ্কের একটা চঞ্চল প্রবাহ অন্তরের অন্তর দেশ পর্য্যন্ত বহিয়া গেল।

আমি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। ভক্তির সহিত মাথা নত করিয়া বলিলাম—"জগৎ জননী! আপনার এত ভাবনা কিসের? মানুষের ভবিষ্যৎ? কিসে তারা জগতে চরম উন্নতি পরম শান্তি লাভ করবে তাই?"

ক্রুদ্ধ কালো আঁখি আমার দিকে ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন—"না!"

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি ভাবছি উনকি পোকার পাগুলো কি করে আরো একটু সবল করতে পারি—যাতে তারা সহজে আত্ম রক্ষা করতে পারে—আক্রমণ ও আত্মরক্ষার মাপকাঠি ভেঙে গেছে—সেইটে ঠিক করে নিতে হবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া আমি চলিলাম—"সামান্য উনকি পোকা তার জন্যে এত ব্যাকুল! আমি জানতুম মানুষই আপনার সব চেয়ে প্রিয়—"

—"প্রিয় আমার সবাই!" তিনি স্পষ্টকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"সবাই আমার সমান—এই হাতে তাদের পালন করি—আবার এই হাতেই তাদের ধ্বংস করি—মানুষের প্রাণ, ক্ষুদে পোকার প্রাণ—আমার কাছে কোনো তফাৎ নেই!"

—"কিন্তু!" আমি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু উচ্চ নীচ...ন্যায় অন্যায়...বিচার বিবেচনা—"

বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"ও সব মানুষের তৈরি কথা! উচ্চ নীচ আবার কি! ন্যায় অন্যায় আমি মানিনে...বিচার বিবেচনা আমার রাজত্বে নেই...আমি প্রাণ দিয়েছি সেই প্রাণ নিয়ে আবার যাকে খুসী আমি দেব—তা সে পোকামাকড়ই হোক্, বাঘভালুকই হোক আর মানুষই হোক্! তা আমি গ্রাহ্য করিনে। যাও তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে—আমায় বিরক্ত কোরোনা!"

আমি উত্তর করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ পৃথিবী এক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—সমস্ত মেদিনী প্রলয়ের মতো কম্পান্বিত হইয়া উঠিল—তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

তিব্বতীয় স্বরলিপি

লামাদিগের পূজা অনুষ্ঠানের সময় গীত বাদ্য হইয়া থাকে। ঢাক ঢোল, তূরী ভেরী, জয়শিঙ্গা, কাংস্য কর্ত্তাল উহাদের প্রধান বাদ্যভাণ্ড। গানের সময় গায়ক দলপতিদিগের নিকট এক প্রকার স্বর-লিপি থাকে, সেই স্বরলিপিতে, স্বরের পরিস্ফীতি, উত্থান, পতন প্রভৃতি বক্ররেখার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং গানের যে যে স্থলে একসঙ্গে সমস্ত বাজনা বাজিয়া উঠে, সেই সেই স্থলও পরিচিহ্নিত হয়। বিরাম স্থলগুলি, ঘণ্টা ও কর্ত্তালের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। এক এক সময়, গগনভেদী বাদ্যের ঘোরতর কোলাহল হঠাৎ থামিয়া যায়, তখন এই নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্য্য শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে যার-পরনাই মুগ্ধ করে।

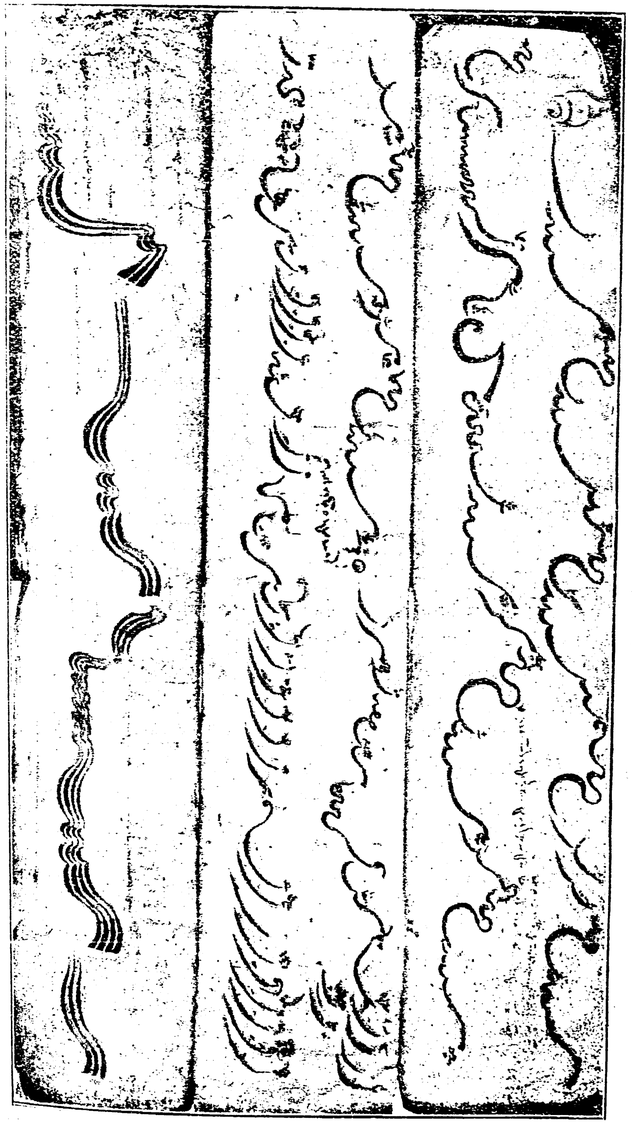

স্বরলিপির ছবি

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগ্‌দত্তা

(৩০)

জীব জগতে মানুষের স্থান সর্ব্ব ঊর্দ্ধে কেন না তাহারা আহার নিদ্রা প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যাদি সম্পাদনে সক্ষম। কিন্তু এই মানুষের বুদ্ধি যখন কেবল মাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় তখন মনে হয় সে পশু অপেক্ষাও হিংস্রাধম। করালীচরণ যে দিন প্রথম তাহার স্ত্রীকে গিয়া বলিয়াছিল "কেল্লা ফতে, আর দেখ্‌চিস্ কি বড়লোকের স্ত্রী হলি বলে" তখন রোগ শয্যায় পতিতা দারিদ্র ও অত্যাচার পীড়িতা সত্যকালী তাহার কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু স্থির করিয়া ভাবিল "পাগল হলো নাকি!" করালীচরণ সতেজে গৃহ মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে অনেকটা আত্মগতই কহিল "কেন আমি এমন সুযোগ ছাড়বো? আমার ভাগ্‌নি, শুন্‌চি আর কেউ ওর নেই, তখন আমিই ওর অভিভাবক, কেন দাঁও মারবোনা? নেই নেই, কেবলই নেই! এখানে কচি খুকি বিছানায় পড়ে হাঁপাচ্চেন, ওষুধ খেলাও, পথ্যি জোগাও কোথা থেকে সব আসে! আমায় কি কেউ ছেড়ে দেয় যে আমিই লোককে ছেড়ে দোব, কখন না, হাজার টাকার কম তো নয়ই।" সত্যকালী মুখ ফিরাইয়া বিকৃত-মুখে কহিল "মদ গিলেচে খুব, এদিকে ঘরে একটু মিছরি নেই যে কাশির সময় মুখে দিই, মরণ হলেই হাড় জুড়োয়।" কথাগুলা করালীর কানে গেল, সে তীক্ষ্ণ স্বরে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "মরলেতো আমিও বাঁচতাম, মরিস্ কই?"

শিবনারায়ণ ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার দ্বারাই করালীচরণকে জানাইলেন "বাগ্‌দত্তা কন্যা লইয়া তিনি কি করিবেন, তাহাপেক্ষা তাঁহারা তাঁহাকে পনের শত টাকা দিচ্ছেন, সব দাওয়া ছাড়িয়া যান।" করালীচরণের চক্ষু ফুটিল। হাজারের স্থলে আপনা হইতে পনের শত হইয়া দাঁড়াইল, জল নাড়া না দিতেই এই, দিলে নাজানি আরও কি হয়! সে মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া বলিল "তা তা, উনি বড় ভাইএর মত যা আজ্ঞা করবেন, না তো বলতে পারিনে, বড়ই অভাব, যা দিচ্চেন দয়া করে আর পাঁচটি শো"। শিব নারায়ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "আর কিছুই নয় যা বলেছি সেই পর্য্যন্ত"। করালীচরণ তাঁহার স্বরের দৃঢ়তায় একটু থতমত খাইয়া গেল, তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না "নিদান আর একশত"। "শাক মাছের মত ঘরের মেয়েকে দর করিতে লজ্জা হয় না? আর একপয়সাও নয়।"

অধিক নিঙড়াইলে লেবুর অম্লরস তিক্ত হইয়া উঠে, করালী চুপ করিয়া গেল। যখন প্রকারান্তরে কথাটা কমলার কর্ণে প্রবেশ করিল ধিক্কারে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ছি ছি, কি ঘৃণ্য জীবন! অর্থ মূল্যে এই দেহখানা বিক্রীত হইবে! ইহাপেক্ষাও কাশীর সেই অসহায় অনাশ্রিত ভয়ানক অবস্থাও যে তাহার ভাল ছিল। সে করুণাময়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল "মা!" "কি মা? "সস্নেহে করুণাময়ী তাহার প্রতি চাহিয়া স্নেহ দৃষ্টিদ্বারা তাহার তাপদাহ প্রশমিত

করিতে চাহিলেন। "মা তোমরা আমায় মামার কাছে টাকা দিয়ে কিন্‌বে! তা হবে না।" স্থির প্রতিজ্ঞার অবিচলিত দৃঢ়তায় তাহার নম্রদৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। করুণাময়ী চমকিত হইলেন "না না সে কি কথা, কেনা আবার কি? উনি যদি দুটো টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যান, বেশতো, তুমি আমাদের থাকবে, আমাদের সেই ঢের।"

একথা সম্পূর্ণ সত্য, তথাপি মন কিছুতে মানিতে চাহে না, দাম দিয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে? কমলার নিজের অস্তিত্বটা শুদ্ধ আজ হইতে নিজের বলিতে থাকিবে না? দৃঢ়স্বরে সে কহিল "লোকে কি বলবে? এ হতে পারে না, না মা।" এ লজ্জা করুণাময়ীর মনেও না ছিল এমন নয়, তিনি ইহার যুক্তিও খুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "কে-জান্‌বে? কেন মা এটাকে বড় করচো? আমাদের ছেড়ে যেতে চাও?" কমলার দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল সে সলজ্জ অনুতাপে মনে করিল, এ স্নেহের নিকট আত্মবিক্রয় করা এত কি কঠিন? কিন্তু না, সে তো তাঁহাদের নিকট এই স্নেহ মূল্যে নিজের মন প্রাণ সবই দিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ক্রীতদাসীর মত এ দেহ বিক্রয়! তথাপি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় বুঝিয়া মুখে আর কিছুই বলিল না, মনে মনে বলিল "অসম্ভব।"

করালীচরণ বিদায়কালে একবার ভাগিনেয়ীকে দেখিয়া যাইতে চাহিল। স্বাভাবিক মমতা না থাকিলেও দেড় হাজার টাকায় অকস্মাৎ মমতা জন্মিয়া যায়। শিবনারায়ণের এ দেখা সাক্ষাৎ সেরূপ মনঃপুত ছিল না কিন্তু করুণাময়ীর করুণা এ বাধা মানিতে চাহিল না "আহা হাজার হোক্ তবু মামা একবার দেখবে না।" কমলা নিজেও একটু জিদ করিয়া বলিল "দেখা করায় দোষ কি?" সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল হয়ত তাহাকে দেখিলে তাহার মাতুলের মন একটু কোমল হইলেও হইতে পারে, আর তা যদি হয় তাহা হইলে সে একবার তাহার মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া দেখিবে। মানুষের ত প্রাণ, গলিবে না কি? কিন্তু মানুষ জগতে যাহা কিছু ভ্রম করে অন্য লোকের প্রকৃতি বুঝিতে যাওয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভ্রম। অপাত্রে করুণা এবং অযোগ্য বিশ্বাস স্থাপন দুই-ই ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কমলা সন্দেহ মন্থরগতিতে গিয়া মাতুলকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে তাহার দিকে নেত্রপাত করিয়াই করালীচরণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রহিল, এই কমলা! তাহার ভাগিনেয়ী!

কমলার মুখ ফুটিতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া দৃষ্টি উঠাইল, কিন্তু মাতুলের দিকে চাহিয়া সে আর কিছুই বলিবার চেষ্টা করিল না, মূর্ত্তিমান নিরাশাকেই যেন সে সেই কুব্জাকৃতি, রক্তনেত্র, শীর্ণদেহে প্রত্যক্ষ করিল। মাতুল বহুক্ষণ পরে সম্ভাষণ করিলেন "তুমি কমলা! নারাণীর মেয়ে?" তাহার বিস্মিতনেত্র হইতে প্রশংসার রুদ্র ক্ষুধা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, শিকারী শিকারের দিকে চাহিয়া যে দৃষ্টিতে বলে তোমার গায়ে এতখানি রক্ত আছে তা জান্‌তাম না।"

এই দৃষ্টির প্রশংসায় ইহাপেক্ষা কোন

উচ্চভাব বর্ত্তমান নাই। কমলা মৃদুস্বরে উত্তর করিল "হ্যাঁ"।

"তাহলে দুহাজার টাকার এক পয়সা কমেও আমি রাজি হচ্চিনে।"

ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া গিয়া সে দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। হায়! পৃথিবী যদি তাহাকে গ্রাস করিত!

কিন্তু এই সুস্পষ্ট ঘৃণা ঘৃণার্হের মনকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, বসন্তের নবপুষ্প-সম্পদভূষিত কাননশ্রী উদ্যানপালকের চিত্তে লাভের চিন্তামাত্রই উদ্রেক করে, হস্ত কণ্টকে ক্ষত হইলেও সে ফুটন্ত গোলাপটিকে লাভের খতিয়ানে চয়ন করিতে ছাড়ে না, বাজারের চড়া-দরে সব ক্ষতি পূরিয়া যাইবে এই আশা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বার্থপর মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হিংস্র, পিশাচ হইতেও ভয়ানক! বিশেষতঃ দারিদ্র্যগ্রস্ত চরিত্রহীন লোকের মত 'মরিয়া' সংসারে অল্পই আছে। ইহারা ইহাদের নেশার জন্য এমন পাপ, এমন কোন অপরাধ নাই যাহা সম্পন্ন করিতে দ্বিধাবোধ করে। সাধুচরিত্র নিঃস্বার্থ লোকের সহিত তুলনা করিলে মনে হয় তাহারা ইহাদের সহিত একই সৌরজগতের জীব নয়। করালীচরণ অনায়াসে দন্ত করিয়া শিবনারায়ণকে জানাইল "এমন মেয়ের দর দুই হাজারের কম হইতে পারে না।"

শুনিয়া শিবনারায়ণের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও তিনি ঈষৎ আত্মসংযমের চেষ্টা করিয়া কহিলেন "ভদ্রলোকের কথা বদল হয় না, যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে তাহা বদল হইবে না, টাকা আমি আনাইয়া রাখিয়াছি গণনা করে নিন।" ঘৃণার সহিত নোটে ও টাকায় পূর্ণ থলিটা সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।

লোভেই লোভ বাড়ায়, করালীর বুভুক্ষা বৃদ্ধি পাইল, এক কথায় কতটা হইল, নিশ্চয় এ মাছকে খেলাইতে হইবে! মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল "দু হাজার না পেলে আমি আমার ভাগ্নীকে এখনই নিয়ে যাবো।"

"তবে উৎসন্ন যাও, যা খুসী কর আমি আর এক পয়সাও দোবো না, কোথাকার একটা ছোট লোক এসে জুটেচে!"

"দাও আমার ভাগ্নীকে এনে দাও, জোচ্চোর! মেয়ে আটক রাখবে ভেবেচ? লোক আছ তুমিই আছ আমায় কিসের চোক রাঙ্গাও? আমি তোমায় কেয়ারও করিনে, মিনি পয়সায় বংশজের ঘরের মেয়ে আনবেন, মজা পেয়েছেন!"

সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবনারায়ণ কহিলেন "আর না ঢের হয়েছে যার ভাগ্যে যা আছে কেউ খণ্ডন করতে পারে না, নিয়ে যাও তোমার ভাগ্নীকে। এক পয়সাও আমি দোব না, পাপের সাহায্য করলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।"

কমলা শুনিল তাহাকে যাইতে হইবে, জন্মের মতই হয়ত এ যাত্রা, ইহাও সে বুঝিল। একবার সে তাহার চারিদিকে হতাশনেত্রে চাহিয়া দেখিল এই ঘর দ্বার সবই যথাযথ বর্ত্তমান থাকিবে শুধু ইহার আশ্রয়তলে আশাপূর্ণ চিত্ত লইয়া এতদিন যে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল সেই দিনই বুঝি আর আসিবে না। এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী আবার ফিরিয়া আসিবেন কিন্তু যে অভাগিনী সূর্য্যমুখী গোপনধ্যানে রজনী যাপন করিতে

চলিল সে আর তাঁহার দেখা পাইবে কি? এই কি তাহার চিরবিদায়?

করুণাময়ী করালীচরণের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল "আর পাঁচশত টাকা আমি তোমায় দিব তুমি কমলাকে রেখে যাও, সই থাকলে কি এমন করতে?" উত্তর পাইলেন "টাকা এখনই চাই।" করুণাময়ী এত টাকা এই মুহূর্ত্তে কোথা পাইবেন? সময় দিতে করালীচরণ সম্মত নহে, সে গরজ বুঝিয়াছিল, দর কমাইলে পাছে সব ব্যর্থ হয় তাই এতটুকু ত্যাগস্বীকারে সম্মত নহে। করুণাময়ী আর কি করিবেন, কাজেই অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে কমলার চুল বাঁধিয়া কাপড়চোপড় গুছাইয়া দিলেন। কমলা কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিল না, আসন্নবর্ষণোন্মুখ মেঘের মত স্তব্ধ রহিল।

শিবনারায়ণ যখন দেখিলেন সত্যই করালীচরণ কমলাকে লইয়া চলিয়া যায় তখন অগত্যা মান খোয়াইয়া ভক্তিনাথকে দিয়া বলাইলেন "আচ্ছা পাঁচশত টাকা আরও পাইবে, কিন্তু লেখাপড়া করিয়া দিক্ যে আর কিছু দাবী করিবে না।" মাতুল উত্তর করিলেন "দুশো টাকা আরও ফাউ পেলেই লিখে দিই।" কমলা শিবনারায়ণের সজল গম্ভীর মুখের উপরে তাহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া জীবনে এই প্রথম দিন কথা কহিল, বলিল "কেন আপনারা আমার জন্য বারে বারে অপমানিত হচ্চেন? টাকা দিয়ে আপনারা আমায় পাবেন না।" নিজের জীবনের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল।

(৩১)

শচীকান্ত কল্পনাকুশল কবি না হইলে 'ক্ষণিকের-দেখা' কাব্যে পরিণত হইত না, আর তাহার জীবন-কাব্যেও এ বিষাদের সুর এক ঘেয়ে তানে বাজিত না। কমলাকে কতটুকুই বা সে জানে? দ্বিতীয়বারই বা কত সামান্যক্ষণের জন্যই সে তাহাকে দেখিয়াছে! কিন্তু এ কল্পনা কোনমতেই সে ছাড়িতে পারিল না যে, বাগ্‌দত্তা কমলাকে তাহারই পাওয়া উচিত, এ যুক্তি তাহার মনে যেমনি প্রবল, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণও সেই সঙ্গে যেন তেমনি প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পিতা যে তাহার প্রতি অবিচার করিয়া মনীশের পক্ষ লইয়াছেন ইহাও সে ভুলিতে পারিল না।

বাসন্তীকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যানের সময় মাসিমার সহিত একটু মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছে, কোনরূপ খেয়ালের পশ্চাতে ছোটা গিরিজাসুন্দরীর অসহ্য! বাগ্‌দত্তা মেয়েটি নিরুদ্দিষ্টা এ অবস্থায় তাহার প্রতীক্ষা কেন? কিন্তু খেয়ালী যুবকের খেয়ালের ঝোঁক এইটুকু তিরস্কার লাঞ্ছনা, বা ক্ষতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে অটল রহিল। মনে মনে বলিল 'তাকে না পাই তার স্মৃতি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তো'। স্বপ্নমুগ্ধ হৃদয় প্রেমপাত্রের উদ্দেশে, ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহে। এই সময়ে সহসা একদিন কলিকাতায় পুরাতন বন্ধুমহলে জোর তলব পড়িল, একবার মনে করিল সেখানে মনীশের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, সেখানে যাওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ উপরোধ কাটাইতে না পারিয়া বাহির হইয়া

পড়িল। ইতিমধ্যে অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইয়া গিয়া প্রথম পৌষে বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে। পথে শিশিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে নৈহাটি ষ্টেশনে গঙ্গা পার হইয়া ট্রেণ ধরিবে। "ছোটবাবু খুব রোমান্টিক রকম বিয়ে করচো নাকি ?

"কে বল্লে তোমায় ?" শচীকান্ত বিস্মিত হইল। "সব খবর পাই। চাদরে যে এসেন্স মেখেছ তাতে কমলা সুলভ হবে।' সে সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। শচীকান্ত তাহাকে অঙ্গুলিপীড়িত করিয়া সলজ্জ আস্ফালনে কহিল "জ্বালিও না আর, এসেন্স যদি দুর্ল্লভ বস্তু সুলভ করতে পারত তাহ'লে দেশে বিদেশে ও জিনিষ থাকতে পেত না।"

"ভদ্রা সিঁথায় সিন্দূর আর নয়নে কজ্জল দিয়ে ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের ব্রত ভঙ্গ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ভদ্র! তুমি এটুকু পারবে না ?" আবার সে তাড়না ভেগ করিল।

মনীশ কলিকাতায় নাই ; ছুটীতে দুই ভাই বাড়ী গিয়াছে ; তাহাতে সে যেন বাঁচিল। ফিরিবার সময় আবার যখন নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে গাড়ি বদলের জন্য প্লাটফরমে নামিয়া বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। পৌষের সন্ধ্যা বেশ একটু ঘোরঘোর হইয়া উঠিয়াছিল, শীতকাতর গাছপালা হিমবায়ুর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সরিয়া সরিয়া একপ্রকার মিনতিপূর্ণ মৃদু বিলাপ করিতেছিল। ষ্টেশনের নিকটেই একটা বিস্তৃতশাখ প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আকাশের কোল ছাড়িয়া সদ্য সমাগত পক্ষীকলরবে মুখরিত হইয়া রহিয়াছে আর এইখানে এই মানব কুলায়ে বিবিধ পথের যাত্রীগণ নানারূপ শব্দে সান্ধ্যপ্রকৃতির শান্তিনাশ করিতেছিল। সর্ব্বজনীন্ শান্তির শান্ত মুহূর্ত্তেও মানবচিত্তেই বুঝি শুধু শান্তি নাই! শচীকান্ত সহসা একটা কর্কশ কণ্ঠের মন্তব্যে চিন্তাস্রোতের মধ্য হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। "ধেত্তোর, হরিদুর্গা, হরিদুর্গা! হরিদুর্গা কি আছে, তারা কোনকালে অক্কা পেয়েচে।" সে শব্দানুসরণে ফিরিল। প্লাটফরমের একধারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীস্থানে কতকগুলা পোঁটলাপুঁটুলীর মধ্যে একটি রুগ্না স্ত্রীলোক হাঁফানির টানের "সহিত হে হরি, হে মা, দুর্গা ভাল করে দাও, নয় নাও মা" ইত্যাদি অর্দ্ধস্ফুট কাতরোক্তি করিতেছে। আর অর্দ্ধবয়স্ক শীর্ণাকৃতি একটি লোক তাহাকে ধমক দিয়া এই কথা বলিতেছিল।

এ দৃশ্য সংসারে বিরল নয়, শচীকান্ত দৃষ্টি ফিরাইতে গেল, কিন্তু নিকটে কতকগুলা পোঁটলাপুঁটুলি ও রুগ্ন শিশুর সঙ্গে পাখাহস্তে বসিয়া আর একজন ও কে? এই হীনাবস্থ হীনচক্ত সহচর বেষ্টিত হইয়া আজ কে তাহাকে আবার দেখা দিল! তাহার বক্ষের উন্মত্ত আলোড়নে যদিও তাহার দৃষ্টি রোধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, বিস্ময়, হর্ষ ভয় যুগপৎ এক সঙ্গে তাহাকে বীতসংজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল তথাপি তাহার মুখ চিনিবার পক্ষে বাধিল না,—নিশ্চয়ই এ' সে! কিন্তু কেন সে এখানে? কেন এই অবস্থায়? শচীকান্ত নিস্পন্দ লোচনে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল, চন্দ্রের দিকে চাহিয়া সমুদ্র বক্ষের মত তাহারও বুকখানা কখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, কখন আবেগের অশ্রু হুহু করিয়া দুই চোখ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। কিছুই যেন সে জানিতে পারিল না। শুধু এইটুক মাত্র মনে রহিল—ধ্যানের দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, যাহাকে এক দিন বসন্ত প্রভাতে দেখিয়াছিল, শীত সায়াহ্নে সে আজ আবার তাহার সম্মুখীন।

রুগ্না নারী যন্ত্রণাদিগ্ধ কলহের স্বরে কহিয়া উঠিল "আমার ভাগ্যে সবাই মরে, শুধু আমারই অখণ্ড প্রমাই, ঘরে যে হায় হায় করে পড়ে থাকব তাও কপালে নেই, টেনে পথে বার করলে! কোথাও হোঁচুটে পড়ে অপঘাতে মরাই কপালে আছে।" রমণী কাশির ধমকে আড়ষ্ট হইয়া গেল, অভিভাবকটি দন্তে দন্ত চাপিয়া "মরেও না" বলিয়া পুঁটুলির মধ্য হইতে থোলো হুকাটি বাহির করিয়া টিনের কৌটা হইতে তামাক টিকা লইয়া কলিকা সজ্জিত করিতে মন দিল। শচীকান্ত এই সমস্তই দেখিতে শুনিতে ছিল তথাপি সে কিছুই দেখে নাই, কিছুই শুনেও নাই। সে নির্নিমেষে সেই মলিন-বসনা তরুণী মূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিল। আকাশ হইতে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটা যদি নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখীন হইত তাহাতেও হয়ত সে এমন বিহ্বল হইত না। তরুণী ভূমে পাখা রাখিয়া রুগ্নার কঙ্কালবৎ শরীরটিকে তাহার চারু বাহুলতার মধ্যে বেষ্টন করিয়া তাহার বক্ষে কোমল হস্ত-মর্ষণে যন্ত্রণা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মৃদু মৃদু সান্ত্বনার স্নিগ্ধ বাণী তাহার মুখ হইতে দেবাশীর্ব্বাদের মত ক্লিষ্ট হৃদয়ের উদ্দেশ্যে উৎসারিত হইতেছিল, নিরুদ্ধশ্বাস শচীকান্তের

কর্ণেও যেন তাহার দু একটা গুঞ্জন প্রবেশ করিয়া তাহার শিরাসমূহে পুলক-তড়িৎ সঞ্চালিত করিয়া দিল। এতক্ষণ ধরিয়া এত কাছে সে তাহাকে আর কখনও পায় নাই।

হুঁকাটি লইয়া ইহাদের সমভিব্যাহারী পুরুষটি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে ছিল। তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। যাহার সহিত সে অপর স্থলে দৃষ্টি বিনিময় করিতেও অপমান বোধ করিত এখন তাহার আগমন দেবদূতের আগমনের মত মঙ্গল-প্রদ বলিয়া অনুভব করিল। সেই মূহূর্ত্তে একটা রুক্ষ কণ্ঠ তাহাকে সম্বোধন করিয়া ভগ্নকাংস্য পাত্রের মত অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল, "মশায় বলতে পারেন ট্রেনটা কখন আসবে।" কৃতার্থ বোধ করিয়া শচীকান্ত ক্ষীণালোকে টাইম টেবেল খানা খুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কোন দিকের গাড়ি ?" "মূলোজোড়ের। মশাই কোথায় যাচ্চেন ?"

"রতনপুকুর জেলা যশোহর। বসুন না এইখানে। ট্রেণ আসতে এখনও দেরী আছে। মূলোযোড়ে আপনার বাড়ী ?"

"কর্ম্মস্থান। বাড়ী ত্রিবেণী।" তাম্রকূট সেবনকারী মুখ-সঞ্চিত ধূমরাশি বাহিরের দিকে ছাড়িয়া দিতে দিতে শচীকান্তের পার্শ্বে খুব নিকটেই আসন গ্রহণ করিল। একটা উৎকট গন্ধ যুবকের বস্ত্রনিঃসৃত মৃদু সৌরভ চাপা দিয়া আপনার অস্তিত্ব প্রচার করিতেছিল। এক, বারের জন্য সে কুঞ্চিত চাদরের প্রান্তে নাসিকা আবৃত করিতে গিয়াছিল কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইল। "উনি আপনার কে ?" "আমার মেয়ে"—বলিয়া

আগন্তুক হুঁকাটি তুলিয়া চুম্বনাদ্যন্ত করিল। "মেয়ে! আপনার মেয়ে!" শ্রোতা সচমকে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। "হ্যাঁ মশাই।"

হুক্কাধারী গম্ভীর মুখে যথাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শচীকান্ত অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল, চাহিয়া দেখিল তরুণী রুগ্নার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া তাহার মাথায় মৃদু মৃদু বাতাস দিতেছে, মুখ একটুখানি আনত;—করুণাদেবী সশরীরে যেন আর্ত্ত-ত্রাণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্যথিতের জন্য ব্যথাবোধ যে এমন মধুর শচীকান্ত তাহা জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি এই সুস্থ সবল দেহশালী না হইয়া অমনই রোগক্লিষ্ট শরীরে এই খানে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারিত!

প্লাটফরমের আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; ঘণ্টা বাজাইয়া পয়েণ্টস্ ম্যান 'গাড়ি হালি সহর ছোড়া হ্যায়' সংবাদ প্রচার করিয়া গেল। লাইনের আলো অস্পষ্ট দৃশ্যপট উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। অসম্ভব! এ নিশ্চয়ই সে! সে সংশয়াকুল কণ্ঠে প্রবীণ সহযাত্রীকে প্রশ্ন করিল "মেয়েটির নাম কি জান্‌তে পারি?" "স্বচ্ছন্দে! ওর নাম মালতী।" প্রশ্নকারীর মুখে ঘোর নিরাশার ছায়া পতিত হইল। মানুষের সহিত মানুষের মিল থাকে কিন্তু দেবীর সহিত মানবীর এত সাদৃশ্য!

"এটা কি রকম ভদ্রতা মশায়, ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা? হলেনই বা আপনি বড়লোক!"

শচী অপ্রভিত হইল, লজ্জিত মৃদু স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে কহিল "মাপ করবেন। আমার মন্দ অভিপ্রায় নয়; এই মেয়েটির সহিত আমার একটি পরিচিতার অভেদমূর্ত্তি, তাই আশ্চর্য্য হইতেছি। মানুষে মানুষে এত মিল সম্ভব! মেয়েটি বিবাহিতা বোধ হয়?" "বিধবা! আপনার সে পরিচিতা আপনার ঘরেই আছেন?"

বিধবা শব্দটা একটা তীক্ষ্ণ তীরের মত শচীকান্তকে বিঁধিল। এই হৃদয়ৈশ্বর্য্য লইয়া সে অভাগিনী বিধবা, আহা! সে কহিল "না তিনি আমার নিকট আত্মীয় নহেন।"

"কোথায় তিনি থাকেন?"

"চাকদায়"।

"বটে, তাঁর নামটি?" শচীকান্ত এই গঞ্চিকাসেবী অপরিচ্ছন্ন সঙ্গীর প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এ প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। হাজার হোক মালতী তো তাহারই জলন্ত প্রতিবিম্ব! স্নেহস্বরে উচ্চারণ করিল "কমলা।"

অদূরে তরুণী চমকিয়া দুই আনতনেত্র উঠাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি, তথাপি তাহাতে সেই বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ বিস্ময়ের ছায়া নীরবে যেন কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

আগন্তুক ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে দিতে পার্শ্বস্থ যুবকের পরিপাটি কেশ-কলাপ হইতে মূল্যবান জুতা জোড়া অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল, মুখের ভাবে আনন্দ ব্যক্ত হইল। "সে মেয়েটিকে আপনার কি কিছু দরকার আছে? চাকদায় শিবনারায়ণের বাড়ী থাকত, কমলা নামে একটি মেয়েকে আমি জানি।"

"থাকত! নেই নাকি?"

"না মশাই"।

"সত্যি? কেন, কেন! কোথা গেল?" আগন্তুক ধূর্ত্ততার সহিত মিটি মিটি চাহিয়া উত্তর করিল "তার মামা নিয়ে গেছে।" মৃদুস্বরে কহিল "সেখানে বিয়ে হবে না যখন, তখন শুধু শুধু সেখানে রাখবে কেন?"

শচীকান্তের শরীরের রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া গিয়া তাহাকে যেন সেখানে জমাইয়া জড়ে পরিণত করিয়া দিল। করালীচরণ অনুমানে ব্যাপারটা যেন বুঝিয়া লইয়াছিল, তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তেমনই মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল। "বংশজের মেয়ে কেন টাকা নেবে না বলুন তো মশাই! তোরা কুলীনরা যদি বেটার বিয়েতে টাকার ছালা ঘরে পুরতে পারিস্ তবে আমরাই বা ছাড়ি কেন? অমন মেয়ের জন্য আড়াই হাজার কিছু বেশী নয়, কিন্তু এমনই কিপ্‌টে কিছুতে দিলে না, উল্টে গাল মন্দ। দেখা যাক্ করালী চক্রবর্ত্তী আড়াই হাজার ঘর আন্‌তে পারে কি না।"

"তাহলে মামার কাছে কমলা আছে? কোথায় করালী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী?" শচীকান্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল কিন্তু জিহ্বার জড়তা কণ্ঠের সঘন কম্পন রোধ করিতে পারে নাই। "মশাই কি এখনও বুঝতে পারচেন না আমিই করালী চক্রবর্ত্তী!"

শচীকান্তর সর্ব্বশরীরে বিপুল বেগে পুলক-তড়িৎ ছুটিয়া গেল, "আর উনিই কমলা!" করালীচরণ নির্লজ্জ ভাবে হাসিয়া হাসিয়া কহিল "ঠিক বলেচেন মাল্লতী নয় কমলা"।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৬)

সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ পরিবারের নবোঢ়া বধূ, এদেশ ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত হবার পর এখনো শতাব্দী অতিবাহিত হয়নি। ম্যাপে দেখলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মনে হয় না, মনে হয় যেন পঞ্জাবেরই অঙ্গ। মধ্যে মধ্যে সিন্ধুদেশ পঞ্জাবে যোগ করবারও প্রস্তাব শোনা যায় কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদের তা ইচ্ছা নয়—তারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে আছে। এদেশের ভাষা সিন্ধি; গুজরাটীর সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। সংস্কৃতই এ সকল ভাষার আদ্য জননী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সিন্ধি লিখনপদ্ধতি উর্দ্দু, সংস্কৃতমূলক নয়। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হতে পারত। সিন্ধিভাষায় যতগুলি বর্ণ আছে তা নাগরীতে সহজে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। যে দুএকটা বর্ণের একটু আলাদা উচ্চারণ তার মাথায় কোনরূপ রেখা বা বিন্দু দেওয়া; আমরা বাঙ্গলায় যেমন বিন্দু দিয়ে 'ড' ও 'ড়'র প্রভেদ নির্দ্দেশ করি সেইরূপ কোন রকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করলেই হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তবে কেন নাগরীর বদলে উর্দ্দু বর্ণমালা চলিত হল? তার উত্তর এই—সরকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করেন তখন সেখানে লেখাপড়ার চর্চ্চা

ছিল না। বণিকদের হিসাবপত্রে একপ্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত হত, তাছাড়া বর্ণাক্ষরের প্রচার ছিল না। যখন ব্রিটিষ আদালতসকল স্থাপিত হল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা আর তার সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। এ সঙ্কটে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপুরুষেরা পারস্য বর্ণমালা গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন। তাঁদের আদেশক্রমে আদালতে উর্দ্দু লিপির ব্যবহার আরম্ভ হয়, ক্রমে তাই আদালত হতে অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হল। সিন্ধি গ্রন্থাবলী এক্ষণে উর্দ্দু অক্ষরেই লিখিত হয়ে থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যত দেশ দেখেছি তার মধ্যে সিন্ধুদেশ আমার চক্ষে বিশেষ নূতন ঠেকেছিল। অন্যান্য প্রদেশ হতে

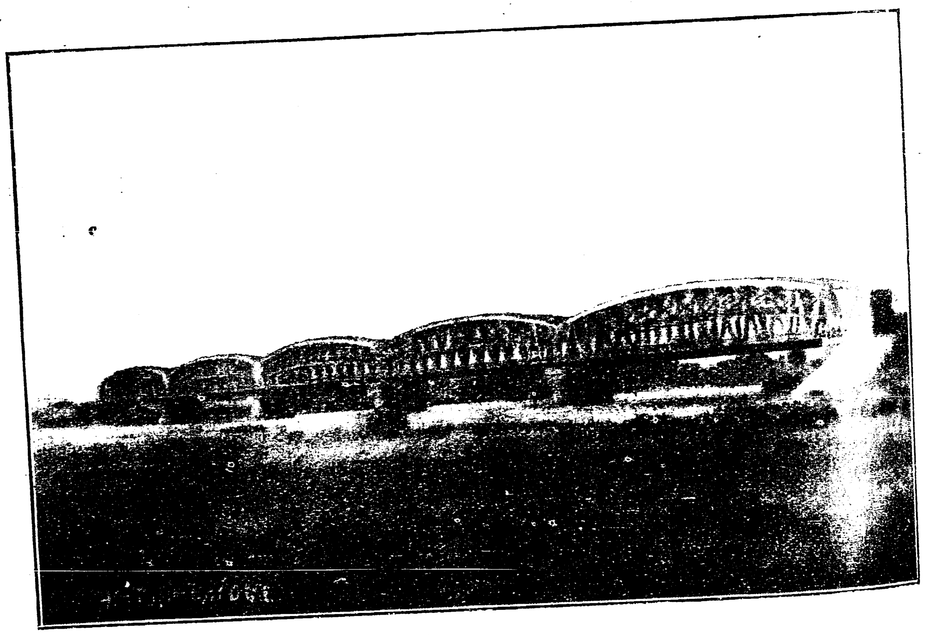

সিন্ধু নদীর উপর কোত্রীর পুল

এখানে প্রকৃতির মুখচ্ছবি, লোকের রীতি চরিত্র অনেক তফাৎ। প্রথমত বর্ষার অভাব। এই খটখটে শুষ্কভাবের দরুণ সিন্ধের বহির্দৃশ্য নূতন প্রকার, ওরূপ সুবিস্তীর্ণ বালুময় মরুপ্রদেশ বোম্বায়ের অন্যত্র দেখা যায় না। নদী নালা খালের জল হতেই সিন্ধের প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইন্দ্রদেব বারিবর্ষণ করেন না, পৃথিবীই আপনার স্তন্যনীর দিয়ে জলের অভাব পূরণ করেন।

সিন্ধুদেশের আবহাওয়ায় শীতোষ্ণের আতিশয্য ভোগ করা যায়, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে রাত্রে ছাতের উপর কিম্বা বাইরে খোলা জায়গায় শয়ন ভিন্ন গতি নেই। জল ছিটিয়ে

বিছানায় প্রবেশ করতে হয়। শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা—ঘরের ভিতরেও অগ্নিসেবন ভিন্ন চলে না। সিন্ধুদেশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধুনদী আছে তাই রক্ষা, নইলে ও দেশ মানুষের বাসযোগ্য হত কিনা সন্দেহ। আমরা যখন হাইদ্রাবাদে ছিলাম তখন সিন্ধুনদীর তীর আমাদের একমাত্র বেড়াবার স্থান ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একটি আরামের স্থান। সন্ধ্যাবেলা নদীতীরে গিয়া বায়ুসেবন আমাদের নিত্য নিয়মিত কাজের মধ্যে ছিল। নদীতীর পর্য্যন্ত বেশ একটি প্রশস্ত ছায়াপথ—দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করে ব্যাড়ান যেত। সিন্ধুনদী অনেকটা গঙ্গার মত প্রশস্ত, দেখলে আমার দেশ মনে পড়ত, মনে হত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভেসে ব্যাড়াচ্ছি। সিন্ধুনদীতে পাল্লা বলে একরকম মাছ পাওয়া যায়—আমাদের যা ইলিষ। জেলেরা কলসী ভাসিয়ে দিয়ে মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলে প্রসিদ্ধ। আমাদের এক সিন্ধি চাকর ছিল তার মুখে এক ছড়া শুনতেম মনে আছে—

পল্লা মচ্ছী খানা,
সিন্ধ্ মুলুক ছোড়কে নহী যানা।

নদীর ও খালের উপকূল ভিন্ন অন্যত্রে গাছপালা প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দ্দিকে বালুময় ক্ষেত্র ধূ ধূ করছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়েই গতিবিধি। এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। কলের জল, তেলের ঘানি উট দিয়েই চালিত হয়। উটে গাড়ীটানার কাজও করে—অনের দূর পাল্লা যেতে হলে আমরা কখন কখন আমাদের বয়েল গাড়ীতে উট জুড়ে দিতাম। উটই মরুসাগরের জাহাজ। সমুদ্রপথে যেমন Sea-sickness, যার অনভ্যাস উষ্ট্রবাহনের ঝাঁকানিতেও তার তেমনি দুর্দ্দশা—দুধের রক্ত দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুৎ, অভ্যস্ত সোওয়ার, এই তিন একত্র হলে উটে চড়বার আরাম আছে, নইলে নয়। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিতা সহজে মনে হয় না। তা এই যে বালির উপর যেমন সহজে পায়ের দাগ বসে তেমনি চোর ধরবার এ এক সহজ উপায়। আমি যখন শিকারপুরে কাজ করতাম তখন গরুচুরি মকর্দ্দমা রাশি রাশি আমার কাছে আসত। পশুহরণ সিন্ধিদের এক রোগ। এমন দিন যেত না যে ঘোড়া গরু উঠ মেষ মহিষ প্রভৃতি লুটের মকদ্দমা উপস্থিত না হত। কিন্তু তাও বলি 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর'। গ্রামে গ্রামে যে সকল চৌকিদার আছে তাদের নাম 'পগী', নাম থেকেই তাদের পরিচয়, পদচিহ্ন ধরে চোরামাল বার করা তাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রামে একটা উট চুরি গিয়াছে। অমনি সেই গাঁয়ের পগী অপহৃত উটের পদচিহ্ন দেখতে দেখতে চোরের সন্ধানে বেরলো। সেই পদচিহ্ন সে যদি তার সমীপবর্ত্তী গ্রামে দেখিয়ে দিতে পারে তাহলেই সে তার দায়িত্ব হতে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি পড়ল। এই গ্রামের লোকেরা আপনাদের পগী সঙ্গে ক'রে সেই চিহ্ন ধরে বাহির হয়। এইরূপে চোরের আড্ডায় গিয়ে চোরামাল ধরতে

পারলে তাদের পরিশ্রম সার্থক। অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে। পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে প্রায় তারা শূন্য হাতে ফিরে আসে না। তাদের দক্ষতার প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া। মাল ধরা না পড়লে শুধু তাদের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। অনেক সময় মিথ্যা পদচিহ্ন দেখিয়ে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের উপর অপরাধ চাপাবার প্রয়াস পায় কিন্তু বিজ্ঞ বিচারপতির কাছে ওরূপ প্রযত্ন সফল হয় না।

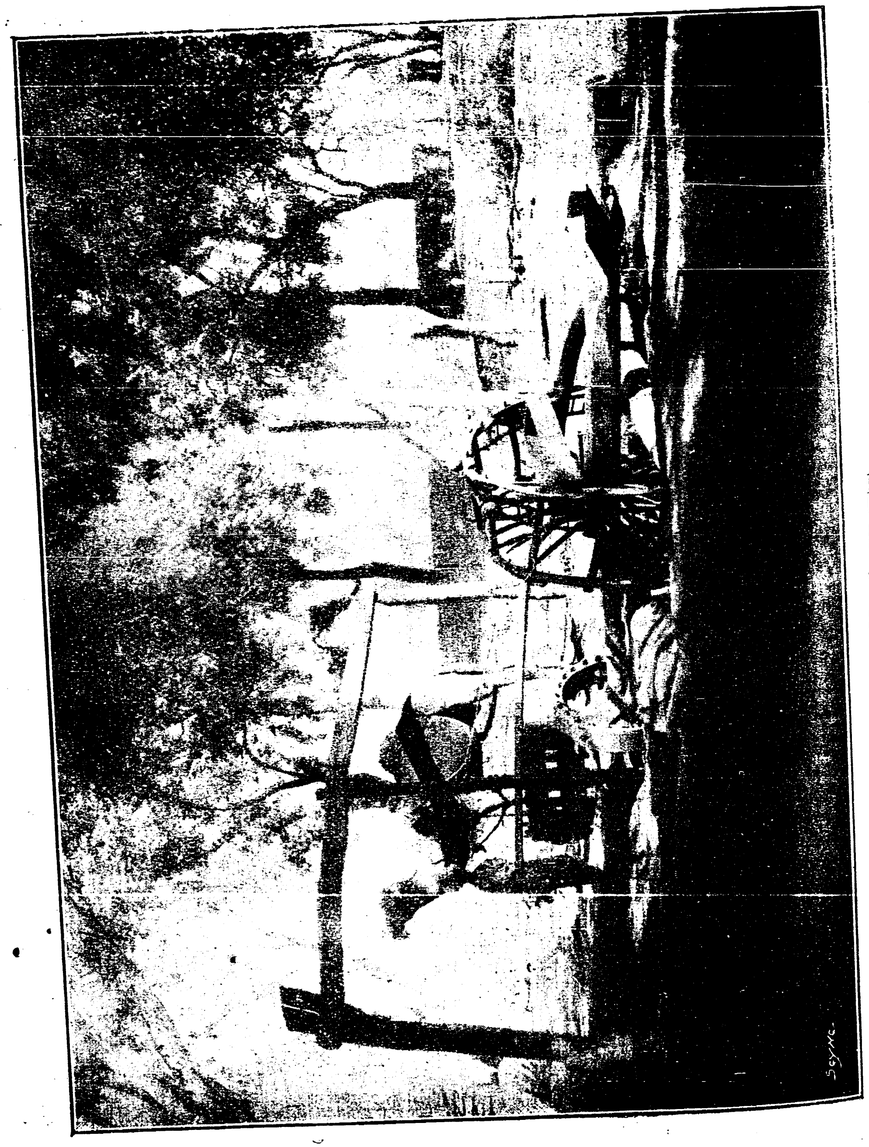

উট কর্ত্তৃক জল তোলা

শিকার

সিন্ধিরা অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। শিকারপুরে থাকতে মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার শিকারের সঙ্গী জুটত। একবার আমরা দলবলে সঙ্কর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শিকার করতে গিয়েছিলেম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাখালী পাওয়া যেত, আমরা বোটের উপর হতে পাখী শিকার করতেম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চকাচকির ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়ি। সংস্কৃত কাব্যে চক্রবাক্ চক্রবাকীর কথা পড়ে তাদের সঙ্গে এমনি সখ্যবন্ধন হয়ে গেছে যে সেই বাকের মধ্যে গুলি চালাতে আমার হাত উঠল না। সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাতে গিয়ে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করতে লাগল, আমিও শিকারে ক্ষান্ত দিলাম। সে যা হোক্, আমার ভারি দেখতে ইচ্ছা করে সংস্কৃত কাব্যের চকাচকির বিচ্ছেদ বর্ণনা কতদূর সত্য; তা বাস্তবিক ঘটনা কিম্বা কবির কল্পনামাত্র। সত্যিই কি বিধাতায় এমনি কঠোর নির্ব্বন্ধ যে সন্ধ্যা হলেই চকাচকির ছাড়াছাড়ি হবে। এই পাখীদের সম্বন্ধে হিন্দিতে একটি কথা আছে মনে পড়ল। সমস্ত দিন তারা দুটিতে এক সঙ্গে চরে বেড়ায়—অন্ধকার হলেই বিযুক্ত হয়ে পড়ে! এ পারে চখা ওপারে চখী গিয়ে বসে। ওরা পরস্পর ডাকাডাকি করে তবু এ ওর কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না।

চকা—চকী মই আঁউ?

চকী—নহি নহি চকা

চকী—চকা মই আঁউ?

চকা—নহি নহি চকী

এইরূপ বিরহ বেদনায় রাত্রি ভোর হয়।

ইংরাজ-রাজের পূর্ব্বাধিকারী আমীরেরা বড়ই শিকারভক্ত ছিলেন। তাঁদের হাতে রাজ্য থাকলে এতদিনে সিন্ধুর সমস্ত প্রদেশ শিকারগাঁএ পরিণত হত। কথিত আছে তাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে কেহ রক্ষিত বনের একটা বরাহ বধ করলে তার প্রাণদণ্ড হত। এখন আর সেকাল নাই। আমীরদের হাতে সে ক্ষমতা নেই। আমীরদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টে কাজ করছেন, কেহ বা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করছেন। একজন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন—আমি তাঁর সঙ্গে কখন কখন শিকারে যেতাম। তিনি শিকারে বিলক্ষণ মজবুত, উড়ন্ত পাখী তাঁর গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হত। এই মীর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমায় একবার তিনি এক কাণ্ড করে বসেছিলেন। মকদ্দমা সেসনে কমিট হলে যে সকল জিনিষ নথির সঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ পাঠাতে হয়, যা চলিত ভাষায় 'মুদ্দামাল' বলে, তার মধ্যে বুদ্ধিমান ম্যাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে কাটা মুণ্ডটা সেসন কোর্টে পাঠিয়ে দেন। তা দেখে সেসন জজ ক্রোধান্ধ হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতিবুদ্ধির কাজ ক'রে মীরসাহেব ভারি বিপদে পড়েছিলেন।

জাতি বৃত্তান্ত

সিন্ধুবাসী অধিকাংশ লোক মুসলমান।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণে গঠিত। তাহারা আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপানে পরাঙ্মুখ নহে। মুসলমানদের মধ্যে কতক আদিম নিবাসী আসল সিন্ধী, কতক বা আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। আফগান বা পাঠান হাইদ্রাবাদ ও উত্তরসিন্ধে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকে বংশাদি-ক্রমে সিন্ধুতে এখন বাস করছে ও অগাধ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী। দেখতে ইহারা বলিষ্ঠ, সুগঠন ও সুশ্রী, আসল সিন্ধী হতে ইহাদের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে।

হিন্দুরা সামান্যত ব্রাহ্মণ, বণিক ও শূদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের পোকর্ণ ও সারস্বত দুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ-ভক্ত বৈষ্ণব-পন্থী। ইহারা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

সারস্বত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎসর হতে সিন্ধুদেশে এসে বাস করছে। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহারা বোম্বায়ের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য। মৎস্য মাংস ভক্ষণ ইহাদের নিষিদ্ধ নহে।

বণিক জাতির মধ্যে লোহানা ও ভাটিয়া, এই দুই শাখা অগ্রগণ্য। মূলতানের লোহান-পুর লোহানা বণিকদের মূলনিবাস। ঐ স্থান হইতেই তারা জাতীয় নাম গ্রহণ করেছে। তারা বলোচিস্থান আফগান স্থান প্রভৃতি দূরদেশে ব্যবসা-সূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্লেচ্ছদেশে গমন করলে লোহানা হিন্দুরা জাতিভ্রষ্ট হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় লোহানা বণিয়াদের উদার বুদ্ধি প্রশংসনীয়।

লোহানাগণ ব্যবসা অনুসারে আমিল ও বণিক (বণিয়া) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা শ্মশ্রুমুণ্ডন, শিখারক্ষণ ও হিন্দুদের মত পাগড়ী পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমিলদের চালচলন কতকটা ভিন্ন।

আমিল

আমিলেরা সিন্ধী হিন্দুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজত্বকালে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাজকার্য্যে, বিশেষতঃ হিসাবপত্রের কাজে মুসলমান রাজাদের হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত চলিত না। আমিলেরা আমীরদের মন যুগিয়ে চাকরী আরম্ভ করে ও ক্রমে নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির চাতুর্য্য প্রভাবে জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লয়। অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় আমিলেরা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী। মুসলমানদের সংসর্গে ও মুসলমান প্রভুদের অনুরোধে তাহারা মুসলমানদের মত বেশভূষা পাগড়ী ও শ্মশ্রু-ধারণ করে—কপালে তিলক এইমাত্র প্রভেদ। পান আহারে তাহারা অনেকটা শাক্ত ধরণের লোক, মদ্যমাংসে অরুচি নাই। আমি যখন সিন্ধুদেশে কর্ম্ম করতেম, গবর্ণমেণ্ট আফিস ও বিদ্যালয়ে আমিলদেরই প্রাধান্য দেখা যেত। ইংরাজরাজ্যে কি উপায়ে উন্নতিসাধন করতে হয় তাহারা যেমন ভাল বোঝে অন্য জাতিরা তেমন বোঝে না, সুতরাং তাহারা আর সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে, অন্যেরা পিছিয়ে পড়ে আছে।

এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাইদ্রাবাদ সেওয়ান ও অন্যান্য স্থানে অনেক শিখের বসতি প্রত্যক্ষ হয়। খালসা ও নানকসাহী, তাহার



সিন্ধুবাসী দেওয়ান গোপালদাস—কাশ্মীর ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—(পূরা দস্তর সিন্ধি পরিচ্ছদে)

দুই শাখা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই শিখধর্ম্ম গ্রহণের অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে স্নান করাইয়া শিখ মঠে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় তিনি গুরু নানককে উপঢৌকন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ ক'রে দীক্ষা গ্রহণ করেন—

সৎনাম কর্ত্তা পুরুষ।
নির্ভউ, নির্বৈর, অকাল মূরত,
অযোনি সম্ভব, গুরুপ্রসাদ।
জপ—আদ সচ্, যুগাদ সচ্।
হৈ ভি সচ্—নানক হোসি ভি সচ্।

শিখ মঠে উদাসী (আচার্য্য) শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হয়ে আধিপত্য করেন।

অন্দর মহল

যেখানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ-প্রথা পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হয়। সিন্ধুদেশেও তাই দেখলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে রুদ্ধ—সূর্য্য চন্দ্রও তাদের রূপ দেখতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হল কি না জানি না—চাঁদের অধিকার চাঁদের হাটে নেই এমন হতেই পারে না, তবে সিন্ধু রমণী যে অসূর্য্যম্পশ্যা এ কথা সাহস ক'রে বলা যেতে পারে। আমি যতদিন ও দেশে ছিলাম কোন ভদ্র সিন্ধুমহিলার সহিত আলাপ পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটে নি। সিন্ধি বালিকা-বিদ্যালয়ে ও দেশের মেয়েদের যে কয়না দেখেছি তা বড় তৃপ্তিজনক নয়। তাদের সাজসজ্জায় একটি জিনিস চিরদিন মনে থাকবে—সে হচ্ছে কর্ণাভরণ। কাণের যত রকম গহনা থাকা সম্ভব তা তাদের কাণে ঝুলছে। সে এক মারাত্মক ব্যাপার, দেখলে কষ্ট হয়! ছেলেব্যালায় কৈলাশ মুখুয্যে নামে আমাদের খ্যালার সঙ্গী একটি সুরসিক আমুদে লোক ছিলেন ঐ দৃশ্যে তাঁর মেয়েদের গয়না বর্ণনা মনে পড়ে। ঘরে নতুন বৌ আসছে তাকে কি কি গয়না পরিয়ে সাজাতে হবে তার এক ছড়া তাঁর মুখে শুনতেম। তিনি কাণের গয়নার যে ছড়া আওড়াতেন—কাণবালা কাণময়ূর এয়ারিং বোঁলা—সে সকলি সিন্ধীবালাদের কাণে ঝুলছে, গয়নার ভারে কাণ ছিঁড়ে পড়েনা এই আশ্চর্য্য!

খ্যাতনামা মিস্ মেরি কার্পেণ্টর যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন তখন আমরা সিন্ধুদেশে ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে কতকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। সিন্ধিরা তাঁর আতিথ্যসৎকার সেবা যত্ন অনেক করেছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলে এক নাটক অভিনয় করে, তাতে একটি কবিতা পড়া হয়, তার ধূয়া 'মিস্ মেরি কার্পেণ্টার'—তা যেন এখনো আমার কাণে এসে বাজছে। তাঁকে নিয়ে অন্দরমহল পর্য্যন্ত তোলপাড় হয়েছিল, তা দেখে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল কেননা তখনকার কালে সিন্ধী অন্তঃপুরে মেমদেরও প্রবেশ নিষেধ ছিল! তখনও পর্দ্দাপাটির সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু Miss Carpenterএর খাতিরে সেদিনের দরজাও খোলা হয়েছিল। যে অন্তঃপুরে আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত প্রবেশ অধিকার পান নি তারু মধ্যে একজন ইংরাজমহিলাকে ডেকে নিয়ে অভ্যর্থনা করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নয়। আমাদের একটি বিশেষ বন্ধু ন—রায় যদিও তিনি আমাদের বাড়ীতে

ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন, আমাদের সঙ্গে একত্রে বসে আহারাদি করতেন কিন্তু তাঁর পরিবার মধ্যে আমাদের কখন নিমন্ত্রণ করেন নি, মিস কার্পেণ্টরের ব্যালায় তাঁর ঘরেরও 'চার দরজা খোলা'—ধন্য মিস্ মেরি কার্পেণ্টর!

সুফী ধর্ম্ম

সিন্ধুদেশের বহুসংখ্যক মুসলমান সুফী পন্থী। মহম্মদীয়ধর্ম্মের সহিত সুফীধর্ম্মের অনেক প্রভেদ; এমন কি, গোঁড়া মুসলমানেরা সুফীকে স্বধর্ম্মী ব'লে স্বীকার করতে চায় না। সরস মধুর কবিতাযোগে, কতক বা হিন্দুধর্ম্মের সংস্রবে বা অন্য কারণে কঠোর মহম্মদীধর্ম্ম স্থানে স্থানে ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। সুফীধর্ম্ম তার দৃষ্টান্তস্থল। এ ধর্ম্মের আকরস্থান হিন্দুস্থান ব'লে অনেকের বিশ্বাস। তাহারা বলে মুসলমানদের ভারতবর্ষ আক্রমণকালে কোন এক হিন্দুঋষি কর্ত্তৃক এ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃও সুফীধর্ম্মের সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। সুফীদের ঋজায়ৎপ্রণালী হিন্দু যোগশাস্ত্রের প্রকারান্তর! এই যোগবলে জীবাত্মার এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ হয় যে সে স্বৈরভাবে যথাইচ্ছা গমন করিতে পারে—শত্রুদমন, রোগনাশন, প্রেমপ্রজনন, ব্যোম সঞ্চরণ প্রভৃতি বিচিত্রশক্তি উপার্জ্জন করে, ভূতপ্রেতাদি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকল তাহার প্রত্যক্ষগোচর হয়। সুফীমতে জীবাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই, জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি, পরমাত্মাই উহার চরমগতি। সাদি হাফেজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি এই ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন, এ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম, কবি ইহার পুরোহিত, আধ্যাত্মিক মদিরা নৃত্যগীত ইহার পূজোপচার, সুমন্দ বায়ুসেবিত, পুষ্পসুবাসিত, বিহঙ্গকলনাদিত সুরম্য উদ্যান-কানন ইহার ভজনালয়। সুফী কবি সা ভেতাই সিন্ধুদেশের হাফেজ। হাফেজের কবিতার ন্যায় সা ভেতাইএর কবিতা সেখানকার লোকদের হৃদয়গ্রাহী। ভাবুক তার প্রত্যেক বাক্যে গূঢ় অর্থ দেখতে পান, ইন্দ্রিয়সুখকর সামান্য পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্ব্বরাগে রঞ্জিত হয়।

সিন্ধুদেশে সুফী সম্প্রদায়ের দুই শাখা জলালী ও জমালী। জলালীরা কতকটা শাক্ত ধরণের লোক—তারা অভক্ষ্যভক্ষণ অপেয়পান ইত্যাদি দুর্ব্যসনপরবশ, বল্লভী বৈষ্ণবদের মত পুষ্টিমার্গবিহারী। জমালীদের অন্য ভাব। গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপোষণ ভজনপূজন ধ্যানধারণা ইত্যাদি সাধনে তারা অনুরত। তাদের যোগশিক্ষার নাম সুগল, তার নানাপ্রকরণ আছে। সুগলযোগে পরিপক্ক হলে সাধক উচ্চতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন। এইরূপ সাধনাকে 'হজুর' বলে, কারণ উহাতে সর্ব্বদাই হাজির অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত থাকতে হয়। হজুর ধ্যানের অনেকগুলি সোপান। গুরু পীর মহাপুরুষ-দের ধ্যান প্রথম সোপান। দ্বিতীয় সোপান মহম্মদের সহিত জ্ঞান ভাব কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হওয়া। এই সোপানপরম্পরা হতে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হওয়া—'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'। সে অবস্থায় সুফী ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় সোঽহং (আনা'ল হক) জ্ঞানের অধিকারী হন।



লালসাবাজের দরগা

পীর পূজা

পূর্ব্বে বলা হয়েছে সিন্ধুবাসী হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানীধরণে গঠিত। হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও অনেক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। আগেকার মত একালে জোর জবরদস্তী নেই, তবুও অনেকানেক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্ম আশ্রয় করে, মুসলমানও প্রায়শ্চিত্তের পর অনেকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরে আসে। ওদিকে আবার হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সকল মুসলমানসমাজে প্রবেশলাভ করেছে। পৌত্তলিকতার সংস্রবে ইসলামের একেশ্বরবাদও কলুষিত হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় হিন্দু যেমন মুসলমান মুল্লার শিষ্য, তেমনি আবার কখন কখন মুসলমানও হিন্দু আচার্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। মুসলমান পীরদের মধ্যে অনেকের হিন্দুনাম ও কোন কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি প্রতীকও রক্ষিত হয়েছে। পীরপূজা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত, ইহা হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামের যোগসূত্র। এই সকল পীর ঈশ্বর ও মানবের মধ্যস্থরূপে জীবের সদ্গতি সাধনে তৎপর, এই বিশ্বাসে লোকেরা পীর বিশেষের শরণাপন্ন হয়। পীরেরা ঐশীশক্তি সম্পন্ন, কত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাদের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, লোকদের পীরমাহাত্ম্যে অগাধ বিশ্বাস। এমন অনেকগুলি পীর আছেন যাঁদের উপর হিন্দুমুসলমানদের সমান ভক্তি, তন্মধ্যে সেওয়ানের লালসাবাজ একজন গণ্য। লালসার স্তুতিবাদ পীরভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

* লালসা'র জন্মভূমি।

পীর মহাপীর তুমি রাজরাজেশ্বর,
সঙ্কট সহায় ভবে সর্ব্বদুঃখহর।
তব ধন্য পুণ্য নাম নিখিল প্রচার,
তাপিত জনের তুমি হর দুঃখভার।
পাথর সুবর্ণ হয় তব কৃপাগুণে,
চরণে শরণ লাগি তব নাম শুনে।
করুণা অপার স্মরি লয়েছি শরণ,
অন্নদানে বঁধু মোরে করহ পোষণ।
মহারাজ বিতর তোমার কৃপাবারি,
তরাও ভকতে ওহে বিপদ-কাণ্ডারী।
আমার যে দশা প্রভু জানিছ সকল,
জীবন শরণ তুমি, সহায় সম্বল।
আশালতা নবীনপল্লবে প্রভু ছাও,
কৃপার দুয়ার তব দাও, খুলে দাও।
ভুবন বিদিত নামে ধরেছি আশ্বাস,
অভাগারে করোনা হে নিরাশে নিরাশ।
দুঃখশোক পাপতাপ করহ মোচন
*মেরবন্দ পীর তুমি, ঈশ্বরের জন,
অগতির পরে কর কৃপা বরিষণ।

জেন্দাপীর নামে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন তাঁকে স্মরণ ক'রে এই সিন্ধুকাহিনী সমাপন করি। পীর জেন্দা হিন্দুমুসলমান উভয়জাতির পূজার পাত্র। হিন্দুরা এঁকে সিন্ধুনদীর অবতার বলে বিশ্বাস করে। ইহার নামে ভক্তেরা যে স্তুতিমালা পাঠ করেন তার কিয়দংশ ভাষান্তরে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম :—

সরিৎ সুহৃদ সম কল্যাণ নিলয়,
মহারাজ মহিমা অপার,
ঢালিছ অজস্র স্রোত বল বেগময়—
সেবকেরে সুখে কর পার।

অগণ্য অগণ্য পাপে তাপিত অন্তর,
দূর কর প্রভু পাপভার,
তোমার দুয়ারে যাচে কতশত নর,
মনোরথ পূরহ আমার।
অন্নদাতা তুমি সদা কর অন্নদান,
হৃদি দেহ সত্য পুণ্যসার
চৌদিকে ঘিরেছে মোরে সঙ্কট মহান্—
দয়াময় করহে নিস্তার।
বিত্তায় তুমি হে মহামতি,
অপার প্রভুতা, অপার শকতি,
মায়াজাল রচয়িতা অগতির গতি,
পূর আজি ভক্ত মনস্কাম।

শরণ পরমগতি, বহুশক্তিধারী,
কর পার ভগ্নতরি কত নরনারী,
বিপদ তরঙ্গ মাঝে তুমিই কাণ্ডারী;
পূর ওহে ভক্ত-মনস্কাম।
থাক মোর সাথে সর্ব্বকাল,
লোক মাঝে দেহ ধৈর্য্যবল,
সম্পদ বিপদে তুমি একই সম্বল,
অভাগার ঘুচাও অকাল।
সতত তোমায় সখা করিহে স্মরণ,
কাঙ্গালের তুমিই আধার,
সেবকের স্তব স্তুতি করহ গ্রহণ—
দয়াময় দেও হে নিস্তার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি আমার

তুমি আমার! একলা তুমি! এস মোরে ঘিরে ফেল আজি।
আমি তোমার,—একলা আমি, তোমার মাঝেই লুকিয়ে যেন বাঁচি।
হাসি কান্নার কোলাহলের খেলায়,
ভবসিন্ধুর উন্মাদনার বেলায়,
ছুটে ছুটে শ্রান্ত, ক্ষিপ্ত! কর তৃপ্ত শুধু তোমায় দিয়ে।
পঙ্গু হব, বোবা হব, মরে যাব তোমায় বুকে নিয়ে।

নিবিয়ে দিয়ে আমার জ্বালা বাতি,
নিবিয়ে ভবের দিবা এবং রাতি,
তোমার দিপ্তি প্রকাশিয়ে থাক আমার দৃষ্টিটুকু ছেয়ে;
আলোকিত প্রীত মুখে থাকি সদা তোমার পানে চেয়ে।

অঙ্গ ভরি তোমার পরশ লাগাও,
মর্ম্ম ভরি তোমার প্রীতি জাগাও;
আলোর মত, ছায়ার মত, ছড়িয়ে পড়ি তোমার তলায় আমি।
তুমি আমার, একলা তুমি! আমি তোমার, একলা আমি, স্বামী।

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

ইংরাজ রমণীর গৃহস্থালী

ভারতীতে বহুপূর্ব্বে "বিলাতী রমণী" সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেগুলি আলাদা আলাদা লেখা হইয়াছিল—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রমণী সম্বন্ধে বর্ণনা। ইংরাজ রমণীর গৃহস্থালীর কথা আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধে ইহাই দেখান আমার এখন উদ্দেশ্য যে সকল দেশের রমণী জাতিই দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ। রমণী জাতি স্বাধীন ও সুশিক্ষিতা না হইলে কোন দেশ, জাতি বা সমাজ কখনই উন্নতিশীল ও ক্ষমতাবান হয় না।

যে দেশে রমণী জাতির অবস্থা উন্নত, সেই দেশই সভ্য, শক্তিশালী ও উন্নত;—এ নিয়মটি শুধু মানব-সমাজে নহে, অভিব্যক্তিবাদে জীব-জগতেও সমান মাত্রায় প্রযুজ্য। উচ্চতম জীবশ্রেণীর যে নাম করণ হইয়াছে—"ম্যামেলিয়া" ("Mammalia") অর্থাৎ "স্তন্য-পায়ী", তাহার মানে আর কিছুই নয়, জীবজগতে জাতি বিভাগ বা শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে "মায়ের নামে",—পিতার নামে নহে।

ইহাতেই বেশ বুঝা যায়, মনুষ্য জাতির ক্রম-অভিব্যক্তির কেন্দ্রস্থলে আছেন—রমণী। তাঁহাদেরই সহিত শিশু ও পরবর্ত্তী মানব-জাতির সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠ। সন্তান দশ মাস গর্ভে ধরিয়া তাঁহাদের দেহের মধ্যেই বর্দ্ধিত হয় এবং তার পর ভূমিষ্ঠ হইয়াও প্রায় দুই বৎসরকাল তাঁহাদেরই স্তন্যে ও তাঁহাদেরই যত্নে লালিতপালিত হয়। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ এ "টমসন্" বলেন—

"The success of Mammals, as we may find it in the name *Mammalia*, which Lenneas first applied to the class, is a *hint of the idea that in the evolution of this class at least the mothers led the way.*"

A. Thomson's "Zoology."

অর্থাৎ লিনিয়স্ নামক এক জার্ম্মান জীববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত যখন উচ্চশ্রেণীর জীবের যথা পশু ও মানুষের নামকরণ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া একটিও তেমন মনের মত "জাতিবাচক মৌলিক" নাম পাইলেন না। শেষে—সন্তানকে স্তন্য পান করানর কথা তাঁহার মনে পড়ে, এবং উচ্চশ্রেণীর জন্তুদের সেইটিই যে বিশেষত্ব ও মানুষের সেইটিই যে উচ্চ অভিব্যক্তির কারণ—অর্থাৎ যে সকল জীব-জন্তুর মধ্যে সন্তানকে স্তন্যপান করানর প্রথা আছে তাহারাই সেই কারণে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে উঠিতে পারিয়াছে—এই মনে করিয়া তিনি সেই নামটই নির্ব্বাচন করিলেন।

টমসন বলেন এই "ম্যামেলিয়া" নামটি দেওয়া লিনিয়সের বড়ই ঠিক হইয়াছে; কারণ স্তন্যপায়ী জন্তুমাত্রই যে এত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত তাহার আর কিছুই বিশেষত্ব নাই—বিশেষত্ব এই যে তাহারা সন্তানকে স্তন্য পান করায়; এবং সেই জন্য মাতার সহিতই সন্তানের সব চেয়ে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়াতেই মানব জাতির ও উচ্চ জীবের এত অভিব্যক্তি!

রমণী জাতির "উন্নতি" একথাটির ঠিক অর্থ কি ?

প্রথম, ব্যক্তিগত ও সমাজিক স্বাধীনতা ; দ্বিতীয়, তাঁহাদের উপর সমাজের যত্ন ও সুশিক্ষা।

এই ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা যখন এক সঙ্গে মিলে—তখনই মনিকাঞ্চণের যোগ হয়। তখন তাঁহাদের অন্তরে লুক্কায়িত যে শক্তি সংসারে কার্য্যকরী হয় সেইটি তাঁহাদের—উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থালী।

এই গৃহস্থালীতে অনেক কাজ বুঝিতে হইবে ; তবে প্রধানত এই দুইটি—

১। সংসারের সাধারণ গৃহিণীপনা।

২। ছেলে মানুষ করা ও উপযুক্ত শিশু-শিক্ষা দেওয়া।

তা ছাড়া নিজের ও সংসারে ভরণ-পোষণ উপার্জ্জন করিবার নানারূপ কাজও আছে।

এইরূপ উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থালীর দ্বারা বিলাতের রমণীগণ দেশ, জাতি ও সমাজকে কিরূপ উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, এ প্রবন্ধে আমি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহাদের গৃহস্থালীর এই আদর্শ, এই প্রথা ভূমণ্ডলের সকল জাতির পক্ষেই একান্ত অনুকরণীয়।

এদেশে বিলাতী রমণীদের দেখিয়া আমরা মনে করি যে তাঁহারা বড়ই অলস ও একান্ত খোষপোষাকী,—সংসারের কাজ তাঁহারা অনুমাত্রও করেন না—সে সব কাজ কেবল তাঁহাদের বাবুরুচি, আয়া ও বেহারারা করে। তাঁহাদের সারাদিনের কাজ—বেশভূষা করিয়া থাকা, ও সাজসজ্জা করিয়া হাওয়া খাইতে যাওয়া। এরূপ ধারণার কারণ এখানে তাঁহাদের আমরা দূরে দূরে দেখি বলিয়া ! বস্তুতঃ তাঁহারা এখানেও সংসারের অনেক কাজ করেন ; এবং কাজের সময় কাজ ও আমোদ আহ্লাদের সময় আমোদ আহ্লাদ করিয়া—স্বাস্থ্য মন ভাল রাখিয়া সুখে দিনযাপন করেন।

তাঁহাদের নিজের দেশে যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাদের অন্তর্জীবন আরও ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় সে জীবন কি চমৎকার ! কি সুশৃঙ্খল ! কি উৎসাহপূর্ণ ও মহান !

সাধারণতঃ সে দেশে ছেলেমেয়েরা সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর অবধি বিদ্যালয়ে পড়িতে বাধ্য। এই সময়ে তাহাদের লেখা পড়া ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা—কলাবিদ্যা, সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা; ব্যায়াম ইত্যাদি। তাছাড়া—আজকালকার মেয়েদের শিক্ষায়—ঘরের কাজকর্ম্ম শেখানো হয়। সেখানে তাহারা—অল্পস্বল্প রাঁধিতে শিখে ; ঘর ঝাড়িতে, কাপড় কাচিতে শিখে এবং শিশু পালন ও রোগীর পরিচর্য্যা করিবার উপযোগী শিক্ষাও পায়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সেই সব বিষয়ে অধ্যয়ন ছাড়িয়া কেহ কেহ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে যায়। সেখানে টাইপরাইটিং, ফটোগ্রাফী, সেলাই, টেলিফোনের বা পোষ্টাপিসের কাজ কিম্বা আপিসের কেরাণীগিরির কাজ শিক্ষা করে। সকলেই সেখানে এই বয়স হইতেই স্বাধীন হইতে চায় ও স্বোপার্জ্জিত অর্থে ভরণপোষণ চালাইতে চায়। এইরূপ

অল্প বয়সে স্বাধীন হইবার চেষ্টা অনেকের কাছে আপত্তিজনক হইলেও স্বাধীনদেশে ছেলেমেয়ে সবাইকারই ভিতর এই ভাবটা খুব তীব্র। মেয়েরা ঠিক নিয়মিত কাজের সময় কাজ করিয়া—সংসারের কাজে বাপ মাকে সাহায্য করিয়া—তার পর সুন্দর পোষাক করিয়া প্রায় কোনও সঙ্গীসহ নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিতে বাহির হয়। এই সময়ে প্রায়ই তাহাদের সঙ্গী থাকে একজন যুবা পুরুষ। "Two is company but three is none." একটি রমণীর সঙ্গে একটি মাত্র পুরুষ—ইহাই বেড়াইতে যাইবার প্রথা ! এক সঙ্গে বহু-লোকে হট্টগোল করিয়া যায় না। এইরূপে তাহারা বেড়াইতে বা কোনও দর্শনীয় স্থান দেখিতে বা থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদিতে যায়। অনেকের আবার এই থেকেই ভালবাসার সূত্রপাত হয়—ও অনেক সময়ে বিবাহও হইয়া যায়।

পিতৃগৃহে থাকিবার সময় ছেলেমেয়েরা সংসারের অনেক কাজে সাহায্য করে ; কিন্তু বিবাহ হওয়ার পরই তাহাদের নিজের রীতিমত ঘরকন্না আরম্ভ হয়। প্রথমে স্বামী, স্ত্রী ও তারপর হয়ত গুটি কতক ছেলেপুলে এই লইয়াই তাঁহাদের সংসার। যেমন সংসারের পরিশ্রম, তেমনি সময়ান্তরে একত্র বসিয়া দাঁড়াইয়া সপরিবারে আমোদপ্রমোদ করা। তাঁহাদের শীতপ্রধান দেশে অবসরের সময় বড়-কেহ বাড়ির বা ঘরের ভিতর বসিয়া থাকেন না ; নিকটবর্ত্তী কোনও বাগানে বেড়ান বা কোন খোলা বা আমোদের জায়গায় বেড়াইতে যান। সেখানকার মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণীর গৃহকার্য্যের কথাই আমি এখানে বিশেষ করিয়া বলিব।

প্রায়ই স্বামী কোনও কাজ করেন আর স্ত্রী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম দেখেন ও ছেলেপুলে মানুষ করেন ; কোনও চাকর চাকরাণীর আবশ্যক হয় না। ঘরঝাড়া, রাঁধা প্রভৃতি উচু নীচু সকল কাজই গৃহিণী নিজের হাতে করেন। ঘড়ির মত নিয়মে সংসারের সব কাজগুলি চলে। তাঁহারা বাল্যজীবন হইতে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিবার যে শিক্ষা লাভ করেন কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। তাই এত কাজের পরেও দেহমনের স্বাস্থ্যপ্রদ আমোদপ্রমোদ করিবার অবসর থাকে। এমন কি কাপড় সেলাই, কাপড় কাচা প্রভৃতি কাজগুলিরও নির্দ্দিষ্ট সময় বা দিন আছে। এই সব সামান্য কাজে ঘরের পয়সা সহজে বাহির হইয়া যায় না।

রান্না ও আহারের ব্যবস্থা সে দেশে বড়ই সুবিধাজনক। জিনিষে ভেজাল নাই ; যেখানে সেখানে পথে ঘাটে তৈয়ারী আহার পাইবার স্থান আছে। সে সব স্থানে অল্প পয়সায় ঠিক সময়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্য পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ সংসারী লোকেই সেখানে ঘরে রান্না করেন। সে রান্না-ঘরগুলির ব্যবস্থা এমন স্বাস্থ্যকর ও সুনিয়ন্ত্রিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বাজার করা, রাঁধা বাড়া সবই অতি সহজে সমাধা হয়। তাঁহাদের দেশে খাওয়াদাওয়া অতি সংক্ষেপে সারা হয় ; কিন্তু খাদ্য দ্রব্যগুলি খুব সারবান ও পুষ্টিকর থাকে। দিনরাতের সমস্ত খাওয়াগুলি যেন একেবারে ঘড়ি ধরিয়া চলে। প্রাতে উঠিয়াই এক পেয়ালা

চা, দুধ ও দুই এক খানি পাঁউরুটি টোষ্ট ও দুটি একটি ডিম সিদ্ধ বা পোচ মাখন জ্যাম জেলী দিয়া সেব্য। তারপর যাকে ব্রেক্‌ফাষ্ট বলে সে আহারে প্রায় খানিকটা মাংস মাছ বা বেকন সিদ্ধ ও পাঁউরুটি মাখন ইত্যাদির ব্যবস্থা। তারপর আবার প্রায় একটার সময়ে লঞ্চ হয়। যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা কর্ম্ম-স্থানের নিকটে কোনো Restaurant বা আহারের স্থানেই এই সময়কার আহারটা সারিয়া লন; আর বাড়িতে ফিরিয়া আসেন না। সেখানে গলিতে গলিতে এইরূপ আহারের স্থান আছে। নানা রকম উপাদেয়, সারবান ও ভেজালহীন খাদ্য এইস্থানে সর্ব্বদাই তৈয়ারী থাকে। "মেনুকার্ড" একএকটি টেবিলে দেওয়া থাকে, তাহাতে প্রত্যেক খাদ্যের দাম আলাদা আলাদা লেখা। যাহা ইচ্ছা আহার করিয়া যাইবার সময়, যে সকল লোক খাদ্য সরবরাহ করে তাহারাই একটু কাগজে দাম লিখিয়া হাতে দেয়; দরজার কাছে এক রমণী হিসাব রাখেন তাঁহারই কাছে মূল্য দিতে হয়। কোনও দরদস্তুর বা সময়ের অপচয় নাই। এইরূপে আমি দেখিয়াছি অনেকের এই সময়কার আহার ছয় পেনী বা এক শিলিংএ সম্পন্ন হয়। আর সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাওয়ারই বা পারিপাট্য কি। একখানি পেনি বা হাফপেনি খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে পড়িতে ধীরভাবে আহার হয়। হাজার কাজের লোক হউন-না-কেন আহারে কাহারো তাড়াতাড়ি নাই।

এইরূপ আহারের ঠাঁই অনেক আছে। অধিকাংশ গুলিতেই রমণীরা তত্ত্বাবধানে রত। অনেক ইটালি ও ফরাসী দেশের মেয়ে পুরুষেরা আসিয়া এখানে এইরূপ Restaurant বা আহারের স্থান খুলিয়াছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল—জে লয়নস্, (J. Lyons) ইরেটেড ব্রেড কোং; (Æiated Bread Co.) ব্রিটিশ টী টেবল (B. T. T.) ইত্যাদি। তাহাদের যেমন সস্তা খাবার তেমনি সেগুলি ভেজালহীন ও পুষ্টকর।

এই গেল বিলাতী রমণীদের ঘরে বাহিরে গৃহস্থালী। এইবার তাঁহাদের আর একটি মহত্তর কার্য্যের কথা বলিব। সেটি আর কিছু নয়, শিশু পালন—যা সকল সুশিক্ষিত সভ্য দেশেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া মা হওয়ার যে সুফল এবং তাহার যে মহিমা ও গরিমা তাহা আমাদের এদেশের কোথাও দেখা যায় না। সুধু ছেলের উপর স্নেহ মমতা নয়—কি করিয়া শিশুকে সুস্থ রাখিয়া লালন পালন করিতে হয়, শিশুদের সুশিক্ষা দিতে হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা সে দেশে সব মায়েরই অত্যন্ত প্রবল; এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা আছে তাহা তাঁহাদের বাল্যশিক্ষারই অন্তর্গত।

সব রমণীই নিজের হাতে নিজের ও নিজেদের ছেলেমেয়ের অনেক সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরি করেন, মেরামত করেন ও কাচেন। বাড়িতে দাসী থাকিলে তাহাদের জন্য আলাহিদা ঘর—বিশ্রাম ও ভোজনাগারের বন্দোবস্ত আছে। আমাদের দাসদাসীর মত হীন অবস্থায় তাহাদের রাখা হয় না। কাজ করিতে করিতে তাহাদের অসুখবিসুখ হইলে

তাহাদের প্রভুই তাহাদের চিকিৎসা করান। সে দেশের রমণীদের 'এপ্রণ' পরা, বুকে ফুল গোঁজা, একটু লাল ফিঁতে পিন দিয়ে আঁটা, ছোট ছোট ফুলকাটা রুমাল,—ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে হাবভাব সহকারে তাহার ব্যবহার—ইহা দেখিলেই মনে হয় যে সংসারে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য ও শান্তি জাজ্বল্য হইয়া রহিয়াছে। নিজের দেহের পরীর মত সুন্দর পোষাকগুলি সব নিজের হাতেই সেলাই করা। তাই এত সস্তায় এত সমৃদ্ধি! সব কাপড়গুলি কত যত্ন করিয়া রাখা;—নিজের হাতে ধোয়া, পরিষ্কার করা।

যখন পুত্রসম্ভবা হন, পাখী যেমন আপনার বাসা তৈয়ারী করে, তুজনে সেইরূপে উদ্যোগী হইয়া নিজ হাতে নিজ পরিশ্রমে ভবিষ্যতের আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির সংস্থান করেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই এই সকল গৃহিণীপনা শিখান আছে কিনা—রাঁধাবাড়া, নৃত্য গীত, সেলাই, পিশুপালন রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি সবই—তাই দরকারের সময় আর কোনো গোলমাল হয় না।

রাজাই রাজ্যের খরচে দেশের মেয়েদের এই সব শিক্ষা বিন'মূল্যে দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সেদেশের সকল পিতামাতাই মেয়েদের বাল্যাবস্থায় ঐরূপ ইস্কুলে পাঠাইতে বাধ্য।

আমি যখন প্রবাস হইতে ফিরি, জাহাজে সারা পথ এই বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছি এবং দেশে ফিরিয়াই এই বিষয়ে একটি ইংরাজীতে লেখা প্রবন্ধ একখানি খবরের কাগজের ম্যানেজারকে দিয়াছিলাম; —ইচ্ছা ছিল যে তখনই সেটি ছাপান হোক কিন্তু ম্যানেজার মহাশয় কংগ্রেসে যাইবার সময় আমার সেই তত যত্নের লেখা প্রবন্ধটি হারাইয়া ফেলিলেন। আমার আর নকল ছিল না, কাজেই আর তার উদ্ধার হয় নাই। সেরূপ স্বতঃ উৎসাহপূর্ণ ভাবে আর তাহা লিখিতে পারি নাই বলিয়া আমার ঐ অতি প্রিয় বিষয়ে আর এতাবৎকাল লেখা হয় নাই। বিষয়টি ছিল—"Evening fire-side in an English home" "ইংরাজ সংসারে সন্ধ্যামিলন!" সেটি তাঁহাদের শান্তিমাখা স্বর্গের মত স্থান। সেখানে তখন যেন স্বর্গীয় ছবি দেখা যায়। আগন্তুক—বিশেষ বিদেশী লোকদের সেথা কতই আদর অভ্যর্থনা!

এইরূপে নানা কর্ম্মে, নানা শিক্ষায়, আনন্দে এবং স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তিতে সেদেশের ছেলেমেয়েগুলি মানুষ হয়। তাহাদের বাল্য জীবন, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থাও সেইভাবে কাটে। তার পরে স্থবির বয়সেও কাজ করিবার ক্ষমতা একেবারে যায় না। এই শেষ বয়সেও নানারূপ সংসারের হিতকর কার্য্য করিয়া অনেকে সময় কাটান। তাহার মধ্যে দেশের শিশুপালন একটি। চিকাগো একজিবিসনে—যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সকল নূতন রক্তমিশ্রিত জাতিরা নূতন উদ্যমে নিজদের নূতন সভ্যতা নূতন ভাবে গড়িতে বিপুল আয়োজন করিয়াছিল—সেই সময় হইতেই কয়েকটি নূতন চেষ্টার আরম্ভ হয়—তার মধ্যে একটি Child Study Societyর প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ ছেলেদের শারীরমনের সব তত্ত্ব বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়া সেইমত তাহাদের শিক্ষা ও শরীরমনের যত্ন লইবার ব্যবস্থা। এই কাজে সে দেশের

সুস্থ শরীর সুস্থ মন কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা যৌবনের মত সমান উৎসাহে যোগ দিয়াছেন। এই কাজের জন্য কত সভা সমিতি, কত আলোচনা —তাহাতে দেশের কত উপকার!

ঐরূপ আর একটি অনুষ্ঠান আছে। তার নাম Polytechnic. ইহার প্রবর্ত্তক Quinton Hog. যে সমস্ত গরীব লোকেরা সমস্ত দিন কাজের চেষ্টায় ঘোরে তাহাদিগকে দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যার অবসরে নানা রূপ জ্ঞানও অর্থ উপায়ের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য এই পলিটেকনিক। আধা পথে যে সকল ছেলেরা লেখাপড়া ছাড়িয়াছে তাহাদেরও নানা আবশ্যকীয় বিষয় সন্ধ্যাবেলা শিখাইয়া তাহাদের ভবিষ্যতের পথ খুলিয়া দিবার উপায় এই পলিটেকনিক করিয়া দেয়। এখানে সকল আবশ্যকীয় বিষয় হাতেকলমে শিখান হয়, যথা—চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফী, টেলিগ্রাফের কাজ, ছাপা, লিথো ইত্যাদি। আমাদের এদেশে রাশি রাশি ছেলে পরীক্ষা পাশ করিতে না পারিয়া আধাপথে সহায়হীন, অপদার্থ হইয়া মারা যায়।— সেখানকার ছেলেদের সেই সব দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য এই প্রয়াস।

এখন এই Child Study বা শিশুদের স্বাস্থ্য মনের বিজ্ঞান আলোচনা ও সেই ভাবে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা—এই সব কাজে অনেক বর্ষীয়সী রমণী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় নিযুক্ত। সত্তর আশি বছরেও তাঁহারা সমান উদ্যমে এই সকল কাজে ব্যস্ত। শিশু সম্বন্ধে এত কে বোঝে—পুরুষেরা তাহা পারে না—তাই রমণীর এত সাহায্য দরকার। "Hall of Hygiene and Health" অর্থাৎ সুস্থ ও নিরোগিতা প্রচারের সমিতিতে কত রাত্রের অধিবেশনে তাঁহাদের বক্তৃতা ও কার্য্যকলাপ শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে মুগ্ধ হইতাম। সেখানকার বৃহৎ হলে স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার অনুরূপ যত দ্রব্যাদি পাশাপাশি সাজান আছে; সেইগুলি দেখিয়া সহজেই লোকশিক্ষা হইবে এই অভিপ্রায়ে— বেচিবার জন্য নহে।

আমি উদাহরণচ্ছলে একটি মধ্যাবস্থার ইংরাজ সংসারের দৈনিক কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিব। তাঁহারা মধ্যবিত্ত রকমের লোক। একটি বিধবা প্রৌঢ়ারমণী—দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে লইয়া একটি ছোট সংসার। দুঃখে কষ্টে সংসার চালাইবার জন্য বাড়ীতে দুই তিনটি পয়সা-দিয়া-থাকার অতিথি— Paying guest রাখেন। ছেলেগুলি সব অল্প বিস্তর কাজ করে কিন্তু কাহারও আয় বেশী নয়। লণ্ডনে বাড়ী তৈরি করিবার এই নিয়ম যে এক-তৃতীয়াংশ জমি ছাড়িয়া বাড়ী করিতে হইবে। তাই সবাই প্রায় একই রকম দেখিতে বাড়ী করে—তাহাতে সহরটি কত সুন্দর দেখায়। বাড়ীর সামনে বাগান ও যেখানে সম্ভব কারুকার্য্য-করা কাচকড়ার টবে ফুল সাজান—ফুলে ভরা। সবাইকারই একএকটি আলাদা শুইবার ঘর আছে— তাহাতে সব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, যথা—খাট, বিছানা, মুখ-ধুইবার জল, কাপড় রাখিবার আলমারী ইত্যাদি দিয়া সুন্দর সাজান। আহারের ঘণ্টা বাজিলে সকলে একত্র আসিয়া আহার করেন। জমীর নীচেতেও যে একতালা ঘর আছে সেই স্থানে এই আহারের ঘর। এর পাশে ছোট

পরিষ্কার রান্না-ঘর—এই মাটির নীচের তলায়ই থাকে। আর একটি ঘর একতলায় প্রবেশের পথেই আছে, সেটি Common Sitting room Drawing room বা সাধারণ বৈঠকখানা। সকলেই এইখানে অবসর মত একত্রে বসেন ও কথাবার্ত্তা কন এবং বন্ধু-বান্ধব বা আগন্তুক আসিলে তাহাদের সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করেন। সে ঘরটি অতি-পরিপাটিরূপে সাজান—সব সরঞ্জামগুলিই ভাড়া নেওয়া। একটি পিয়ানো আছে; গদিমোড়া সোফা ও চেয়ার আছে। এইখানে অবসরের সময় একত্র মিলিয়া নাচগানও হয়। সে অতি মধুর আনন্দ। তাছাড়া অন্যান্য সময় সবাই আপনার আপনার ঘরে থাকেন বা বাগানে কিম্বা বাহিরে বেড়ান। কাহারও শুইবার ঘরে কেহ দরজায় ঘণ্টা না বাজাইয়া ঢুকিতে পারে না। আমাদের একত্র একান্নবাসের সংসারে— এমন একটি আব্রুর স্থান নাই।

ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যেক দিন ঠিক সময়ে আহারের ঘণ্টা বাজে ও আহার সরবরাহ হয়। গৃহিনী মেয়েটির সাহায্য লইয়া সংসারের সব কাজকর্ম্ম করেন ও অতিথিদের পরিচর্য্যা করেন—মায় জুতা ঝাড়া, ঘর পরিষ্কার করা, এমন কি পাইখানা পরিষ্কার করা অবধি। রাঁধিবার ঘরটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আমাদের দেশের রান্নাঘরের মত অমন ভীষণ স্থান নহে। সেখানে উনানের চারি ধারে চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যায় একত্র বসিবার বেশ ঠাঁই। কত সাশ্রয়! আর আলাহিদা আগুন পোহাইবার ঠাঁই দরকার হয় না।

সে দেশে রাঁধা খাদ্য বাকি থাকিলে ফেলিয়া দেওয়া রীতি নয়; পরের দিনে তাহা ব্যবহার করা হয়। বহুদর্শী বিচক্ষণ গৃহিণী সে গুলিকে তার পর দিন সুন্দররূপে পরি-বর্ত্তন করিয়া পরিবেষণ করেন। খাবারগুলি একটি বড় পাত্রে করিয়া টেবিলের মাঝে থাকে, সবাই আবশ্যক মত ভিন্ন চামচে করিয়া উঠাইয়া লইয়া খায়। সুতরাং কেহই পাতে কিছু ফেলে না। আহারান্তে হাড়গুলি সব জমা হয়; ও যে হাড়গুলির মজ্জায় কিছু সার আছে সে গুলি দিয়া সুপ চড়ান থাকে। রান্না হইয়া গেলে, সেই আঁচে কাচা কাপড়গুলি রাত্রে শুকায়। পরদিন প্রাতে দগ্ধ অঙ্গারের মধ্যে যে কয়লা থাকে সেগুলি, ও সে ছাইটুকুও তুলিয়া রাখা হয়। সেই ছাই ও অঙ্গার দিয়া বাসনগুলি মাজা হয়। রাত্রের উনানে বসানো গরম জলের সাহায্যে বাসনকোষন কাপড়চোপড় পরিষ্কার হয়। টেবিলে বসিয়া একত্রে চুরট খাইতে খাইতে যে ছাইগুলি পড়ে সে গুলিও একটি পাত্রে রক্ষিত হয় এবং তাহার দ্বারা সুন্দর দন্তমর্জ্জন প্রস্তুত হয়। একজন মালি থাকে সপ্তাহে সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া সে বাগানের গাছগুলির তলা খুঁড়িয়া ঘাস উপড়াইয়া দিয়া যায়; তার বিনিময়ে সেই বাকি হাড়গুলি লইয়া যায়। তারও সে দেশে বাজারে বেচিলে মূল্য আছে। আর ছাইগুলি গাছের গোড়ায় সাররূপে ফেলা হয়। এই রূপে সে দেশের কোনও জিনি-ষেরই অপচয় হয় না। সময়ের অপচয়, শক্তির অপচয়—কোনও কিছুরই অপচয় নাই। যখন বসিয়া গল্প করিতেছেন তখনও হাতে একটা সেলাই চলিতেছে।

নিজেদের পোষাকের মত শিশুদের সব

পোষাক নিজের হাতেই সেলাই করা হয়; তার জন্য আলাহিদা পয়সা খরচ করিয়া কিনিতে হয় না। পোষাকগুলি নিত্য নিত্য আপনারাই সাবান জলে কাচেন। এই সকল কাজের মাঝেও ছেলে মানুষ করার প্রথা এমন পরিপাটি যে দুই কাজই একত্রে সুশৃঙ্খলায় চলে। ছেলেগুলিও সেখানে সব সুশিক্ষিত ও সুস্থ। বাল্য-শিক্ষার স্কুলে তাহারা সকলে বেশ নিয়মবদ্ধরূপে পড়ে, খেলে ও কাজ করে। শিশুকে বড় একটা কাঁদিতে দেখা যায় না। তাহাদের এমন অভ্যাস করান হয় যে যথাসময়ে মল মূত্র ত্যাগ করিবে;—কোন বিষয়েই অনিয়ম নাই; সব কাজে ধরা বাঁধা। এই সকল অত্যাশ্চর্য্য অভ্যাস কেবল শিশুকে শেখানর গুণে হইয়াছে। আমাদের এই অনবরত "ছেলে-কাঁদার দেশের" শিক্ষিতা জননীদের সামান্য চেষ্টায় এইরূপ ছেলের অভ্যাস হওয়া সহজেই সম্ভব। সেখানকার শিশু এমন সুবাধ্য বলিয়াই সংসারের সকল কাজে এমন শৃঙ্খলা। তাই সেখানে দেখা যায় কার্য্যের অবসরে ঠেলাগাড়ী করিয়া খোকা খুকী লইয়া মা বেড়াইতে চলিয়াছেন আর তাঁর পাশে পাশে আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে পুতুল হাতে করিয়া প্রসন্ন মনে বেড়াইতে চলিয়াছে; —কেহ কোনো গোলমাল করিতেছে না। সংসারের এ সব কাজ পিতাকে কিছুই দেখিতে হয় না। তিনি সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে খাটিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেন। অনেক সময় তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁহার স্ত্রী শিশুগুলিকে লইয়া পথে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। দেখা হইলেই সবাইকার মুখে মুখে চুমু দিয়া সম্ভাষণ। এমন যে সকল পরিবারে হয় তাহা নয়; তবে এ সুমধুর দৃশ্য অহরহই দেখা যায়। শিক্ষিত দেশে তাহারা এমনি করিয়াই স্বাধীন, কর্ম্মঠ ও আনন্দপূর্ণ ভাবে তাহাদের সংসার গড়িয়াছে।

আর দুই একটি কথা বলিলেই আমার এই প্রবন্ধ শেষ হয়। সে দেশের ছেলেদের এত রোগ হয় না; আমাদের গরম ও অস্বাস্থ্যকর এদেশের মত সেখানে এত অকাল মৃত্যু ও চিররোগ নাই। সে দেশের স্বাস্থ্য বড়ই ভাল। আর রাজ্যের কর্ম্মচারীরা এমন ঘুসখোর নয়। সুতীক্ষ্ণ নয়নে সব বিষয় পর্য্যালোচনা করেন। ভেজাল দেওয়া খাবার সে তল্লাটে পৌঁছিতে পারে না। কোন রূপ সংক্রামক রোগ হইলে তাহা প্রকাশ্য স্থানে লিখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লোকে ঘরে ঘরেই পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে।

আমাদের দেশে ও তাঁহাদের দেশে স্ত্রী-জাতির অবস্থায় এই যে অসীম প্রভেদ তাহা কেন হইল? তাঁহাদের দেশের জাতিগত বিশেষত্ব এই যে, সে দেশের লোকেরা জ্ঞানের ও উদ্যমের পক্ষপাতী—সকল বিষয়ে চোখ চাহিয়া পথ চলেন। আমাদের এদেশের মত কল্পনা ও ভাবে বিভোর হইয়া পথ হারান না। আমাদের মত তাঁহারা এত হানিকর কুসংস্কারের দাস নহেন। দেশের রাজার চেষ্টা দেশে সমতা, একতা ও সাধারণ-লোক-শিক্ষা-প্রচার। সেই মহৎ চেষ্টার ফলেই এই বর্ত্তমান সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি।

ইউরোপের সকল দেশের লোক-সংখ্যার তালিকায় দেখা যায়—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী এবং আমুষ্ঠ

তাঁহাদের বেশী। কিন্তু আমাদের দেশের তালিকায় ঠিক ইহার উল্টা। দেশের নানারূপ কঠোর নিয়মানুসারে আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতিকে কতই না কষ্ট সহ্য করিতে হয়;—এই জন্যই আমাদের দেশের রমণীদের মৃত্যু এত বেশী এবং তাঁহাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় এত স্বল্প।

"The hand that rocks the cradle rules the world."

—তাঁদের দেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এই মূল মন্ত্রকে কার্য্য-ক্ষেত্রে কখনো অমান্য করা হয় না; কিন্তু আমাদের দেশের তদপেক্ষা সুললিত ভাষায় লেখাগুলি সব ব্যর্থ হইয়া আছে:—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র সম্পদা।"

শেষ কথা, পৃথিবীর অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাসে দেখা যায় যে, উন্নতিশীল ও সমৃদ্ধি-বিশিষ্ট জাতিদের সুপ্রথাগুলি অনুকরণ করিয়াই অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতির অভিব্যক্তি হয়। আমাদের দেশেও সেইরূপ না করিলে এ দেশের আর নিস্তার নাই।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কালিদাসের নাটক

শকুন্তলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কালিদাস তাঁহার বিষয়টিকে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছেনঃ আশ্রমে দুষ্মন্তের আগমন লইয়া প্রথম অঙ্কের আরম্ভ এবং রাজা যখন তাঁহার শিশুপুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখনই নাটকের শেষ। কবির একটি গুণপনা এই-খানে লক্ষ্য করা আবশ্যক,—কালব্যবধান স্পষ্টরূপে কোথাও তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই;—সর্ব্বত্রই ঐ কথাটা এড়াইয়া গিয়াছেন। দেখা যায়, অঙ্কগুলি পরস্পরের সহিত অনুস্যূত, —ধারাবাহিকতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। এবং যে দর্শক, তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে দেখিয়াছে, পঞ্চম অঙ্কে তাহাকে গর্ভবতী হইতে দেখিয়াছে, সেই দর্শক যখন আবার সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলার দ্রষ্টিষ্ট বলিষ্ঠ পুত্রকে সিংহের সহিত লড়াই করিতে দেখে, তখন সে কিছুমাত্র বিস্মিত হয় না।

একথা সত্য, কালিদাস নৈপুণ্যসহকারে প্রত্যাখ্যাতা পত্নীকে একটা সমস্ত অঙ্ক হইতে অন্তর্হিত করিয়া দিয়াছেন; সপ্তম অঙ্কে, একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট কালের জন্য শকুন্তলাকে যেন তরল তরঙ্গের উপর ভাসাইয়া রাখিয়াছেন; ঐ অঙ্কের শেষভাগে, বিস্ময়রসের একটু পূর্ব্বাস্বাদ দিয়া দর্শককে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত রাখিয়াছেন, এবং সপ্তম অঙ্কের দৃশ্যটিকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন,—এমন একটি রহস্যময় পুণ্য-লোকে লইয়া গিয়াছেন, যাহা পৃথিবী হইতে বহুদূরে, এবং যেখানে আর কাল গণনা হয় না। কবি পৌরাণিক কাহিনীর ঘটনাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতিভার প্রেরণাবলে তাঁহার কল-কাঠিটি বদলাইয়া দিয়াছেন। মহাভারতের আখ্যানে অনেকগুলি ঘটনা আছে যাহার কোন

হেতুনির্দ্দেশ বা ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু শ্রোতা অপেক্ষা দর্শকের কৈফিয়তের দাবী একটু বেশী। দর্শকেরা জিজ্ঞাসা করে, শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত কেন ভুলিলেন?—কোন উত্তর পায় না। শকুন্তলা তাহার শিশুটিকে লইয়া উপস্থিত হইলে দুষ্মন্ত যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন কোন প্রকার রাজনৈতিক হেতু দেখাইয়া রাজার এই জঘন্য আচরণের দোষক্ষালন করা যায় না। উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য কালিদাস উভয়কেই শাপগ্রস্ত করিয়াছেন। শাপগ্রস্ত না হইলে, তাঁহাদের প্রেমপথে কোন বাধা পড়িত না; এবং এই অভিশাপও একটা ঘটনাচক্র হইতে উৎপন্ন,—ইহা একটা সামান্য আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে। শকুন্তলা যখন প্রেমে বিভোর হইয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় প্রেমাস্পদের ধ্যান করিতেছিল, সেই সময় একজন তাপসের আহ্বান সে শুনিতে পায় নাই। সুতরাং অজ্ঞাতসারে আতিথ্যধর্ম্মপালনে তাহার ত্রুটি হয়। তাপস তাহাকে এই অভিশাপ দিলেন—সেও তাহার পতিকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইবে। ভারতবর্ষে মুনিঋষির এইরূপ প্রচণ্ড ক্রোধ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা মুনির পক্ষে ইহা ত খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু কালিদাস দুর্ব্বাসাকে রঙ্গভূমিতে আনেন নাই, দুর্ব্বাসার বাক্য কেবল নেপথ্য হইতে শ্রুত হইয়াছিল। তা ছাড়া, এই কষ্টকর ব্যাপারের তীব্রতা কমাইবার জন্য মুনিবর তাঁহার অভিশাপজনিত ফলভোগের কাললাঘব করিতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ রাজা শকুন্তলাকে যে অঙ্গুরীটি দিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীটি রাজাকে দেখাইবামাত্র শাপের অবসান হইবে। কিন্তু শকুন্তলা, অঙ্গুরীটি স্নান করিবার সময় হারাইয়া ফেলে। দুষ্মন্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শকুন্তলা অনেক তর্কবিতর্কের পর শেষে প্রত্যক্ষ ভৌতিক প্রমাণের দ্বারা রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে যখন ইচ্ছা করিল, তখন অঙ্গুরীটি খুঁজিয়া পাইল না। কাজেই রাজা, স্ত্রীস্বভাব সুলভ শঠতার উল্লেখ করিয়া শকুন্তলাকে উপহাস করিবার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। পরে এক ধীবর ঐ অঙ্গুরীটি এক মৎস্যের উদরে প্রাপ্ত হইয়া রাজার নিকট আনিল, তখন রাজা তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিলেন। ঐ ভ্রমের জন্য রাজার কোন দায়িত্ব ছিল না। অবশ্য এই অভিজ্ঞান-চিহ্নের কথা এই সর্ব্বপ্রথম দুষ্মন্ত-কাহিনীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহা কালিদাসের রচনাবলীর একটি বিশেষ-লক্ষণ। কেননা, কবি এই নাটকের নামকরণেই ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। আমরা এই নাটকীয় কৌশলের প্রয়োগ বিক্রমোর্ব্বশীতে ("সংগমন-মণি") আবার দেখিতে পাই। রত্নাবলী প্রভৃতি উত্তরবর্ত্তী নাটককারদিগের নাটকেও এইরূপ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

সাত অঙ্কের পুষ্টিসাধনার্থ অথবা দর্শকের ঔৎসুক্যবৃদ্ধির নিমিত্ত, প্রচলিত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, কালিদাস একদিকে এই পাত্র-গুলির অবতারণা করিয়াছেন:—যথা, বিদূষক মাধব্য, বৃদ্ধ কঞ্চুকী, রাজপুরোহিত সোমরত, নগরপাল ও তাহার দুই সহকারী, দূত করভক,

দৌবারিক রৈবতক, দুইজন বৈতালিক। অন্য দিকে—নায়িকার সখিদ্বয় অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, প্রতিহারী বেত্রবতী, অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণ:—চতুরিকা, মধুকরিকা, পরভৃতিকা; বৃদ্ধা তাপসী গৌতমী, কণ্বমুনি, কণ্বমুনির চার শিষ্য শারঙ্গরব শারদ্বত হারীত গৌতম। কবি, নিম্নশ্রেণী লোকদিগের মধ্য হইতে ধীবরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং দিব্যধামবাসী দেবযোনি দিগকে রঙ্গভূমে অবতারণা করিয়াছেন:—ইন্দ্রের সারথি মাতলি; মারিচ ও তাঁহার পত্নী অদিতি;—জগতের পূজনীয় জনকজননী; অপ্সরা মিশ্রকেশী, মেনকার সখী। এই পাত্রগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, একটা পার্থক্য আছে। অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দুইজনই শকুন্তলার একান্ত অনুগতা সখী হইলেও উহাদের সখ্যের মধ্যেও একটু সুকুমার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়; অনুসূয়া গম্ভীর-প্রকৃতি ও চিন্তাশীলা; প্রিয়ম্বদা "বড় দুষ্টু," রঙ্গময়ী ও পরিহাসপ্রিয়। ঐরূপ, শারদ্বত ও শারঙ্গরব—যাহারা শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া যায়, উহাদের মধ্যে একজন শান্তপ্রকৃতি ও অল্প কথায় অর্থগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করে এবং আর একজন উদ্ধত ও কোপনস্বভাব। মারীচ ও অদিতির চরিত্রে একটা প্রশান্ত উন্নতভাব, একটা পবিত্র গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়। শিশুর বীরত্ব ভরতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভয়ে কম্পমান দীনপ্রকৃতি দরিদ্র ধীবরের সামনাসামনি নগর-রক্ষীদের নিষ্ঠুর ধরণধারণ, স্থূল আমোদ প্রমোদ এবং উহাদের রূঢ় অহঙ্কারও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

সমস্ত বিষয়টির মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়রস অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় পাছে মানবসুলভ হৃদয়-আবেগের তরঙ্গ লীলার ব্যাঘাত ও মানবীয় ঔৎসুক্যের লাঘব হয় এই আশঙ্কা সহজেই হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস এই বিস্ময়-রসকে গৌণভাবে কাজে লাগাইয়াছেন; কেবল যেস্থলে জটিল ঘটনাজালের গ্রন্থিউন্মোচনের জন্য আবশ্যক হইয়াছে, যে স্থলে রুচি ও শাস্ত্র উভয়ই অনুমোদন করিয়াছে, সেই স্থলেই কবি এই বিস্ময়রসের আশ্রয় লইয়াছেন। সর্ব্বত্রই অস্থায়ীভাবে দৈবের অবতারণা করা হইয়াছে; যে জগতে নাটকীয় কার্য্যটি ঘটিতেছে, দর্শককে উহা শুধু সেই জগৎকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ, প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার বিবাহ সম্বন্ধে কণ্বের ভবিষ্যদ্বাণী; দ্বিতীয় অঙ্কে আশ্রমের বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের উল্লেখ; যে অশরীরী বাণী শকুন্তলার বিবাহ-ঘটনা কণ্বকে জানাইয়া দেয় সেই অশরীরী বাণী; যজ্ঞানুষ্ঠানকালের শুভ সূচনা; শকুন্তলার প্রতি বনদেবীগণের বিদায়-সম্ভাষণ; কোন অদৃশ্য দৈব শক্তির দ্বারা শকুন্তলার অন্তর্ধান; দুষ্মন্তের সাহায্যের জন্য ইন্দ্রকর্ত্তৃক মাতলীকে প্রেরণ। ঘটনাগ্রন্থি উন্মোচন করিবার জন্যই দেবতারা কখন কখন মধ্যস্থ হইয়া মানবকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ষষ্ঠ অঙ্কে যাহার প্রবেশ দেখা যায় সেই অপ্সরা মিশ্রকেশী সাক্ষীরূপে সমস্ত কার্য্য দর্শন করিতেছেন মাত্র, তাহাতে লিপ্ত হইতেছেন না। তা ছাড়া, ইহাও তিনি দর্শকবৃন্দকে জানাইতে ত্রুটি করেন নাই যে, মেনকার অনুরোধে চর্ম্মচক্ষে সমস্ত দেখিবার জন্যই তিনি তাঁহার দিব্য-দৃষ্টিশক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে নাট্য-

কৌশল আমাদের অতিমার্জ্জিত রুচির নিকট নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহা ভারতবাসীর চোখে আদৌ বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না; পৌরাণিক কাহিনীতে,—সামান্য মানুষের সহিত মিশিবার জন্য; দেবতারা অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই স্বকীয় অতিপ্রাকৃত শক্তি হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। এই নাটকে যে মুহূর্ত্তে নায়ক নায়িকাদের মধ্যে দৈবক্রমে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে নায়ক নায়িকারা আপনারাই আপনাদের কার্য্য-পরিচালক এইরূপ মনে হয়। রাজা স্বেচ্ছাক্রমেই আশ্রমে রহিয়া গেলেন, শকুন্তলা স্বেচ্ছাক্রমেই আত্মসমর্পণ করিল। দুর্ব্বাসার শাপে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে ভারতবাসী বিস্মিত হইতে পারে। নিজের দোষেই শকুন্তলা শাপগ্রস্তা হয়। তাছাড়া এই শাপে দুষ্মন্তের চিত্ত একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, উহা যেন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল মাত্র। পঞ্চম অঙ্কে যখন রাজা, মহিষীর বিলাপ-গীতি শুনিতে পাইলেন, তখন একটা অস্পষ্ট বিষাদের ভাবে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল; তিনি তাহার প্রকৃত হেতু উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; কেবল একটা গভীর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এইটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক—ঘটনার উপর মানুষের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই; ঘটনার উপর মানুষ ক্রমাগত জয়লাভ করিতেছে ইহা যদি নাটকে প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে নাটক মিথ্যা হইয়া পড়ে। মানুষের উপর বাহ্যঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত প্রদর্শন করা,—বাহ্যঘটনার দ্বারা মানবচিত্তে যে সকল প্রচণ্ড আবেগ উৎপন্ন হয়, যে সকল উচ্চভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই নাট্যকলার উদ্দেশ্য।

শকুন্তলা নাটকের প্রধান রস—আদিরস; আলঙ্কারিকেরা প্রেমের যতগুলি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস স্বকীয় নায়ক নায়িকাদের সেই সকল অবস্থায় বেশ নিপুণ-ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই এই শকুন্তলা-নাটকে একাধারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্য্যের অবস্থাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিবার জন্য সম্ভবতঃ কালিদাসকে বড় একটা কৌশল উদ্‌ভাবন করিতে হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ প্রস্তুত থাকায় তাঁহার পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল;—তিনি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। যেস্থলে রাজা লতাগুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তিনটি তাপসকুমারীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই প্রথম অঙ্কের সুন্দর দৃশ্যটি (তৃতীয় অঙ্কেও এইরূপ একটি দৃশ্য আছে), "মালবিকার" তৃতীয় অঙ্কে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "মালবিকায়" অগ্নিমিত্র লতাকুঞ্জে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নায়িকার বিশ্রম্ভপ্রেমালাপের প্রতি কর্ণপাত করিতেছেন; এবং সেই প্রথম রচনার পরেও পুনর্ব্বার কবি শকুন্তলা-নাটকে যেরূপ দক্ষতাসহকারে ও সহজভাবে এইরূপ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে উহা যে উভয় নাটকের সাধারণ সম্পত্তি তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

যে সকল বিষয় প্রেমশাস্ত্রে সচরাচর বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত কালিদাস আরও এমন কতকগুলি বিষয় সংযুক্ত করিয়াছেন, যাহার দ্বারা তাঁহার গুণপনার

ও রচনাশক্তির বৈচিত্র্য বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। রথ-গতির বর্ণনা, সায়াহ্নের বর্ণনা, পার্থিব তপোবন ও স্বর্গীয় তপোবনের বর্ণনা,—এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাটকীয় উপাদান তেমন কিছু নাই। এইগুলি যেন নাটকের অতিরিক্ত রচনা। উহা নাটকীয় পাত্রের উক্তি নহে, উহা স্বয়ং কবিরই উক্তি। কালিদাসের উত্তরবর্ত্তী নাটককারদিগের গ্রন্থে, এই সকল অতিরিক্ত রচনা, পর-গাছার ন্যায়, উদ্দাম উদ্ভিজ্জের ন্যায় নাটককে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কালিদাস এই আতিশয্য হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচিকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, অথচ দাসবৎ তাহার অনুসরণ করেন নাই। যে অঙ্কটি সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, সেই পঞ্চম অঙ্কে ওরূপ চিত্তরঞ্জক অলঙ্কার একটিও নাই। ঐ একই প্রকার দক্ষতা ও চতুরতার সহিত তিনি নটদিগের বিশেষত নটীদিগের সমস্ত প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিয়াছেন। ভ্রমর-অনুসৃতা শকুন্তলার ভীতি নাট্যনর্ত্তকীকে স্বভাবতই নাচিবার একটা ছুতা দিয়া থাকে। বনদেবী-দের গানে, রাণী হংসবতীর গানে, নাট্যাভি-নয়ের সহিত কণ্ঠসংগীতের মোহিনীশক্তি সংযোজিত হইয়াছে। "শকুন্তলা" পরিণত বয়সের রচনা। কালিদাসের প্রতিভা, আলঙ্কারিকদিগের প্রাণহীন সূক্ষ্মতত্ত্বগুলিকে এক অমোঘ মন্ত্রের বলে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে, এই সকল পাণ্ডুবর্ণ ও জড়বৎ অচল মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রভূতপরিমাণে শোণিত সঞ্চালন করিয়াছে, জীবন উদ্যমের চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-গণের বাঁধা-বাঁধি মামুলী আদর্শপাত্রদিগের স্থানে অস্থিমাংসময়, মনোময়, প্রাণময় জীবন্ত বাস্তব পাত্রদিগকে সংস্থাপন করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মশক-সমস্যা

আরামের ব্যাঘাত এবং রোগের বিস্তার করিতে মশা মাছির ন্যায় আর দুইটি প্রাণী জীব জগতে আছে কিনা সন্দেহ। উভয়ে মিলিয়া মানুষের অনিষ্ট-সাধনের জন্য কি বিরাট অভিযানেই না ব্যাপৃত রহিয়াছে! উভয়ের মধ্যে শ্রমবিভাগের কি সুন্দর ব্যবস্থা! সমস্ত দিন মানুষকে আক্রমণের পর রাত্রে মাছি যখন ক্ষান্ত হয়, তখন মশা অমনি তাহার স্থান অধিকার করে।

মশকের ক্রিয়াকলাপ যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—সাধারণত স্ত্রী-মশকের দংশনেই আমরা বিব্রত হইয়া থাকি। পুং-মশকেরা অনেকটা শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া সরস উদ্ভিদের রসাল রসেই সন্তুষ্ট; কিন্তু স্ত্রীমশকগণ সর্ব্বদা রক্তের অনু-সন্ধানেই ঘুরিতেছে। সত্য বটে, লক্ষ লক্ষ মশক-নারী জীবনে শোণিতবিন্দুর আস্বাদ মাত্র না পাইয়াই মশকলীলা সম্বরণ করে,—কিন্তু যাহারা একবার রক্তের আস্বাদ পায়

তাহাদিগের হাত হইতে আর রক্ষা নাই। মশক-নারীদিগের শোণিতলোলুপতা পুং-মশকগণের মধ্যেও সংক্রামিত হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মাঝে মাঝে শঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু তথাপি বিকৃতধর্ম্মী পুরুষ মশকের সংখ্যা এখনও এতই অল্প যে ইহাদের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা আপাতত বড় অধিক নাই।

মশক কুলের সংখ্যাধিক্যে বিরক্ত হইয়া, ইহাদের উৎপত্তি-রহস্য চিন্তায় যাঁহারা আকুল তাঁহারা অনাবৃত পয়ঃপ্রণালী এবং আবর্জ্জনাময় জলকুণ্ডগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। কেবল স্থির, অচঞ্চল জলেই মশকের উৎপত্তি সম্ভব। একটা মুখ-ভাঙ্গা বোতলের কয়েক-ইঞ্চি পরিমিত জলে যে মশক জন্মে, তাহাতে এক সপ্তাহ ধরিয়া একটা গৃহস্থ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে; এবং একটা কেরোসন টিনের আধ টিন ময়লা জলে এত মশক জন্মিতে পারে যে, তাহারা বংশ পরম্পরায় একটা বিস্তীর্ণ পল্লীকে সমস্ত গ্রীষ্ম কাল মধুর গুঞ্জনে গুঞ্জরিত করিয়া রাখিতে পারে।

শুধু দংশক বলিয়া নহে, রোগ সংক্রামক বলিয়াও মশকের একটা অপবাদ আছে। এ অপবাদ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রধান তিন জাতীয় মশকের মধ্যে আনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশক ম্যালেরিয়া বিস্তারক এবং ষ্টিগোমিয়া (Stegomia) জাতীয় মশক পীতজ্বর সংক্রামক। কুলেক্স (Culex) জাতীয় মশকের দ্বারা ডেঙ্গুজ্বরের বিস্তার হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আপাতত সন্দেহ করিতেছেন। ক্রমে পর্য্যবেক্ষণের ফলে আরও বহু প্রকারের ব্যাধি, মশকের দ্বারা সংগৃহিত ও সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়া যে পরে প্রকাশ পাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মশক-কর্ত্তৃক রোগ বিস্তারের কথা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত এই তথ্যের দ্বারা সভ্য জগতে বহু মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া এবং পীতজ্বরে দলে দলে লোক মরিতেছে বলিয়া যে পানামা-খাল খনন কার্য্য ফরাসীরা বহু অর্থব্যয়ের পর অবশেষে হতাশ ভাবে ছাড়িয়া দিলেন, আমেরিকাবাসীরা কেবল মশক-ধ্বংসের উপায় অবলম্বন করিয়া সেই বিরাট্ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। আমেরিকান্‌দের এই যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইল, ইহাতে বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারগণের যে অত্যদ্ভুত কৃতিত্ব, তাহা অপেক্ষা মশক-ধ্বংস-কার্য্যে ব্যাপৃত ডাক্তারগণের কৃতিত্ব যে কোন অংশে কম তাহা নহে। কার্য্যক্ষেত্রের দশ মাইলের মধ্যে যদি একটি মশক দেখা দিয়াছে বলিয়া রব উঠিয়াছে তো অমনি স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারী মোটরে করিয়া বায়ুবেগে তথায় গিয়া উপস্থিত। এরূপ করিয়াই না মনুষ্য-জীবন রক্ষা করিয়া পানামা খাল খনন সম্ভবপর হইয়াছে!

আমেরিকার হাভানা, নিউ অর্লিয়েন্স প্রভৃতি নগর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; মিউনিসিপ্যালিটি এবং চিকিৎসকগণের প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বাবধানের ফলে আজ ঐ সকল স্থান মশকশূন্য হইয়া স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে।

এমন কি, পূর্ব্ব-আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র সহরে সম্প্রতি মশক-ধ্বংসের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে; এবং সেখানকার অধিবাসীরা মশক-নিবারণ-কার্য্যে মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য করিতে আইন অনুসারে বাধ্য।

মশক স্বয়ং রোগের উৎপাদন করে না সত্য কিন্তু মশক না থাকিলে জ্বররোগ কখনই এত সংক্রামক ও প্রবল হইতে পারিত না। ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে যে স্থানে মশকবংশ ধ্বংশ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে জ্বররোগের সংখ্যা অত্যাশ্চর্য্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে। মশকের জীবন-যাত্রাপ্রণালী একবার জানা হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করা বড় কঠিন নহে। এই হেতু মশকসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি সাধারণের জ্ঞানগোচর করা সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য।

মশক-জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিস্ময় উদ্দীপক। পূর্ণাঙ্গ মশক একেবারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। পরিণত কলেবর লাভ করিবার পূর্ব্বে মশকের কয়েকটি অবস্থান্তর ঘটিতে দেখা যায়;—মশক-ভ্রূণকে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। প্রবন্ধনিবিষ্ট চিত্র দুইটি অনুধাবন করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ মশকের ডিম্বাবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি-কালের অবস্থান্তর-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

মশক-স্ত্রী জলের উপরিভাগে গুচ্ছ গুচ্ছ ডিম্ব প্রসব করে। অনন্যসাধারণ উৎপাদিকা-শক্তির গুণে প্রতি প্রসবে ঐ সকল ডিম্বের সংখ্যা তিন শত পর্য্যন্ত হয় এরূপ দেখা গিয়াছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বগুলি ফুটিয়া উঠে, এবং উহাদের মধ্য হইতে ক্রুর ন্যায় মোচড়ান দেহ-বিশিষ্ট এক প্রকার কীট বিনির্গত হয়। ড্রেনে, আবদ্ধ-সরোবরে, জলপূর্ণ টিন বা অন্যান্য পাত্রে এইরূপ শত শত কীট অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা নিশ্বাস গ্রহণের জন্য থাকিয়া থাকিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। লেজে ক্ষুদ্র নলের ন্যায় যে পদার্থ জুড়িয়া থাকে, উহাই উহাদের নাসিকা। মাথা নীচু করিয়া এবং লেজ উপরে তুলিয়া ঐ নলের সাহায্যে ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। জল মধ্যে গলিত উদ্ভিদাদির রস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু খাইয়া ইহারা বাড়িতে থাকে। এই-রূপে, মাঝে মাঝে খোলস ছাড়িয়া, প্রায় দশ দিনের পর ঐ সকল অণ্ডনির্ম্মুক্ত কীট গোল মস্তকবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গুটিবিশেষে পরিণত হয়। এই গুটির শ্বাসনালী মস্তকের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। এইরূপে ক্রমে ডিম্ব হইতে কীটে এবং কীট হইতে গুটিবিশেষে পরিণত হইবার দুই দিবস পরে মশক-ভ্রূণের শেষ রূপান্তর পরিদৃষ্ট হয়। তখন গুটিটি জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং পূর্ণাঙ্গ মশকশিশু গুটির আবরণ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়।

মশক-জীবনের এই সকল বিকাশ ও পরিণতি খুবই কৌতুকজনক। কেহ ইচ্ছা করিলে একটা বিস্তৃত-মুখ জলপাত্রে কতক-গুলি মশক ডিম্ব ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গুটি ভেদ করিয়া মশক যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য জলপাত্রের মুখ জাল দিয়া আবৃত করা আবশ্যক। পুং-মশক হইতে স্ত্রী-মশক বাছিয়া লওয়া কঠিন নহে। রেফ দেখিয়া উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। পুরুষের রেফ

পালকযুক্ত—হংসপুচ্ছের ন্যায়; স্ত্রীমশকের রেফ পালকবিহীন।

উপরি উক্ত জন্মবৃত্তান্ত হইতে আমরা যখন দেখা যাইতেছে যে, মশক ফুটিয়া বাহির হইতে ডিম্বের অন্ততঃ দশ দিন স্থির

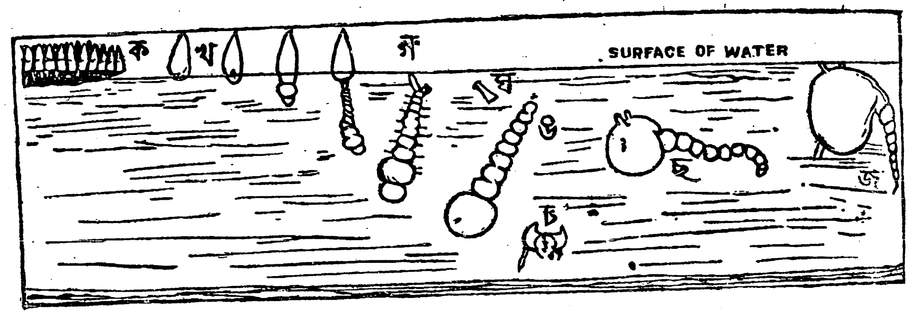

(ক) নৌকাকৃতি, ভাসমান, মশক-ডিম্ব-গুচ্ছ।

(খ) জলের উপর ভাসমান ঐরূপ একটি মশক-ডিম্ব।

(গ) মশকের পোকা-অবস্থা; ডিম্বনির্ম্মুক্ত মশক-কীট। লেজসন্নিবিষ্ট নাসিকা দ্বারা বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিতেছে।

(ঘ) মশক-কীটের শ্বাস-নালী বা নাসিকা (মশকের কীটাবস্থা হইতে গুটিপোকার অবস্থায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে এই শ্বাসনালী খসিয়া পড়ে)।

(ঙ) মশক-কীটের অন্যবিধ রূপান্তর।

(চ) মশক-কীটের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড।

(ছ) মশকের গুটি-পোকা অবস্থা (এই গুটির শ্বাসনালী মস্তকে সন্নিবিষ্ট থাকে)।

(জ) পূর্ব্বোক্তরূপ একটি শিশু গুটি নিশ্বাস লইতেছে।

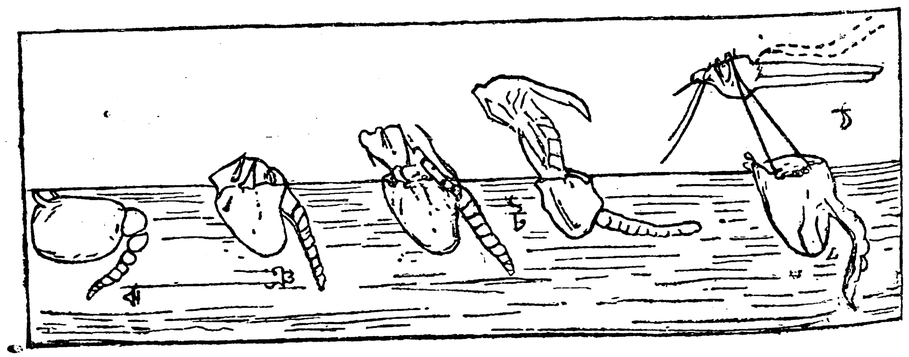

(ঝ) পরিণত-কলেবর মশক-গুটি।

(ঞ) গুটি হইতে পূর্ণাঙ্গ মশক ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে।

(ট) মশক সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া জল হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে।

(ঠ) মশক ফুটিয়া উড়িয়া যাইতেছে; ভাসমান গুটির খোলস জলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

জলে থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তখন সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করিয়া আবর্জ্জনাপূর্ণ আবদ্ধ জলরাশি পরিষ্কার করিয়া দিলে, মশক-কুলের ধ্বংসের পথ নিশ্চয়ই অনেকটা সুপ্রশস্ত হয়। বৃষ্টির পর যে-যে স্থানে জল দাঁড়ায়, সেই স্থান গুলি মাটি দিয়া ভরিয়া দেওয়া কিংবা তাহাদের জল সেচিয়া দেওয়া আবশ্যক; যে সমস্ত পাত্রের জল কোন ব্যবহারে আসে না, তাহা শূন্য করিয়া ফেলিতে হইবে; বাসনাদি ধৌত করিবার জন্য যে চৌবাচ্ছা ব্যবহৃত হয়, তাহা পুনরায় জল পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে, অবশিষ্ট জল নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে;—এইরূপ ব্যবস্থা করিলে, মশক-কুল তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাইবে না। কেরোসিন তৈল মশক-বীজ বিনাশের এক অব্যর্থ মহৌষধ। বাড়ীতে যাঁহাদের লোহার চৌবাচ্ছা (Iron-tank) আছে, তাঁহারা এক চামচ কেরোসিন তৈল জলের উপর ফেলিয়া দিবেন; তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকিবে, সুতরাং নীচের নল দিয়া জল বাহির করিয়া লইলে, জলের কোন ক্ষতি হইবে না; অথচ অণ্ডনির্ম্মুক্ত মশক কীটগুলি যখন শ্বাসগ্রহণ করিতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, তখন কেরোসিন তৈলের সংস্পর্শমাত্রই স্নায়বিক বিক্ষেপ হেতু সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যাইবে। মশক অধিক দূর উড়িয়া যাইতে অক্ষম; সুতরাং কতকটা স্থান ব্যাপিয়া এই সকল প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলেই সেই স্থান একেবারে মশক শূন্য হইবে।

যাঁহারা মনে করেন গায়ে কোনরূপ ঔষধ বা প্রলেপ মাখাইলে মশক-বিষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাঁহারা ভ্রান্ত। মশকের হুল ১/৬ ইঞ্চি লম্বা। মশক ইহার সমস্তটাই রক্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। রক্ত তরলতর হইলে শোষণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়; এজন্য মশকের হুলে বিষ থাকে। সুতরাং বিষ একবার রক্তের সহিত মিশিয়া যাইলে, চর্ম্মের উপর প্রলেপ লাগাইয়া বিশেষ কোন ফল নাই। কর্পূর, মেনথল, লবঙ্গ-নির্য্যাস প্রভৃতি সামগ্রী মশকের দংশন-জ্বালা উপশম করে, কিন্তু বিষ নষ্ট করে না।

যাহা হউক, রোগের প্রশমন অপেক্ষা প্রতিষেধই ভাল। এবং যখন মশক নিবারণ সমস্যা তত গুরুতর নহে, তখন এবিষয়ে অনতিবিলম্বে সুব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত চেষ্টায় মশকধ্বংসের প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল;—কেবল নিজের ঘরে মশক নিবারণের চেষ্টা করা অনর্থক পণ্ডশ্রমমাত্র। স্বগৃহ মশকনির্ম্মুক্ত হইলেও, প্রতিবেশীদিগের অযত্নে যে সহস্র সহস্র মশক প্রতিদিন জন্মলাভ করিতেছে, তাহাদের দংশন জ্বালা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? সুতরাং অন্যান্য সর্ব্ববিধ কার্য্যের ন্যায় মশকধ্বংস ব্যাপারেও সমবেত চেষ্টাই দরকার। পক্ষান্তরে, বাধ্য না হইলে অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বাস্থ্যবিষয়ক কোনপ্রকার প্রচেষ্টাতেই যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ; এই হেতু মশকধ্বংসের অভিযান কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডসমূহ আবশ্যকীয় উপবিধি প্রণয়ন এবং উপদেশসম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করিয়া মশকধ্বংসকার্য্যে ব্রতী হয়েন

এবং উপদেশসমূহ কার্য্যে পরিণত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য তাঁহাদের নিযুক্ত পরিদর্শকগণের সতর্ক দৃষ্টির অভাব না হয়, তাহা হইলে মশক সমস্যা নিরাকৃত হইয়া আমাদের এই ব্যাধিপীড়িত মাতৃভূমি যে বহুবিধ কষ্টকর জ্বররোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৪)

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

মশা, মাছি প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্যে সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হয়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষভাবে, অপরগুলি পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে। মশক প্রভৃতি কতকগুলি কীট দংশন দ্বারা রক্তের সহিত রোগের বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয়। সাধারণ মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীসমূহ প্রত্যক্ষভাবে শরীরের মধ্যে রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না; তাহারা পদ, শুঁয়া বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা রোগের বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এই অবস্থায় উহারা আমাদিগের খাদ্যাদির সংস্রবে আসিলে তন্মধ্যে রোগের বীজ সংলগ্ন হইয়া যায়। ঐ খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি।

১। মশক (Mosquitoes)—ইহাদিগের মধ্যে বিস্তর জাতিবিভাগ আছে। অবশ্য সকল জাতি মশকই রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না। এনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর, কিউলেক্স (Culex) জাতীয় মশকের দ্বারা কাউলিউরিয়া (Chyluria, গোদ প্রভৃতি রোগ, এবং ষ্টেগোমিয়া (Stegomia) জাতীয় মশকের দ্বারা ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever) একব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দূষিত জলপান, দূষিত বায়ুসেবন প্রভৃতি যে সকল কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইত, এক্ষণে অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে একটিও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণ নহে। যেখানে মশা নাই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নাই, ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে স্ত্রী মশকদিগেরই জিঘাংসাবৃত্তি অতিশয় প্রবল। মশকীরাই রক্ত শোষণ করে এবং ইহাদিগের দংশন দ্বারাই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার

ঘটিয়া থাকে। মশক বেচারিরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

২। মিজেস্ (Midges)—ইহারাও মশক জাতীয় কিন্তু মশক অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। ইহাদের খাদ্য গলিত উদ্ভিদ্। ইহাদিগের মধ্যে জাতি-বিভাগ আছে; প্রায় সকলগুলিই জলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা দংশন দ্বারা পেলাগ্রা (Pellagra—আমবাতের ন্যায় রোগবিশেষ) নামক রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে।

৩। সাণ্ড্ফ্লাই (Sand fly)—ইহারা আকৃতিতে মশকের ন্যায় কিন্তু আয়তনে তদপেক্ষা এত ছোট যে "নেটের" মশারির ছিদ্র দ্বারাও ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। মশকীর ন্যায় ইহাদিগের স্ত্রীজাতিই দংশনপটু এবং দংশন দ্বারা তিন হইতে পাঁচ দিন স্থায়ী এক প্রকার জ্বর-রোগের বীজ রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অন্ধকারময় শীতল আর্দ্রস্থানে ইহারা দিবাভাগে থাকিতে ভালবাসে। তরকারীর খোসা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আবর্জ্জনা ইহাদিগের প্রধান আহার; যে সকল স্থানে এইরূপ আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় ইহারা অবস্থিতি করে এবং ডিম পাড়ে। অতএব এই জাতীয় আবর্জ্জনা যাহাতে বাটীর সন্নিকটে সঞ্চিত না থাকে, তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। ফ্লী (Flea)—ইহারা একজাতীয় পোকা; ইহাদিগের ডানা নাই। ইহাদিগের মধ্যে নানা জাতিবিভাগ আছে। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি গৃহপালিত পশুর শরীরে এই জাতীয় পোকা বাস করিতে দেখা যায় কিন্তু উহাদিগের দ্বারা মানুষের কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। যে জাতীয় পোকা ইন্দুরের শরীরে বাস করে (Rat flea), তাহারাই দংশন দ্বারা প্লেগগ্রস্ত ইন্দুরের শরীর হইতে মনুষ্য শরীরে প্লেগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশে সাণ্ড্ফ্লী (Sand flea) বা চিগর্ (Chigger) নামক এই জাতীয় পোকাকে বালুকাময় ভূমির মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়; ইহাদিগের দংশনে একপ্রকার ক্ষত রোগ ও জ্বর উৎপন্ন হয়।

৫। ছারপোকা (Bed-bug)—কোন কোন ডাক্তারের মতে আসামের বিষম কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকার দংশন দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তবে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে কুষ্ঠ রোগও ছারপোকা দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, বিছানা মাদুরে অথবা বসিবার আসনাদিতে ছারপোকা যাহাতে কোন মতে থাকিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ছারপোকা একবার জন্মিলে তাহার নির্ম্মূল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া (অর্থাৎ রক্ত পান না করিয়াও) বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

৬। টিক্স্ (Ticks)—ইহারা মাকড়সা জাতীয় অতিক্ষুদ্র পোকাবিশেষ; ইহারাও ছার পোকার ন্যায় বহুদিন উপবাসী থাকিতে পারে। ইহারা মেঝের চিড়ের বা দেওয়ালের

ফাটলের মধ্যে দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকে এবং ছারপোকার ন্যায় রাত্রিকালে বাহির হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে। ইহাদিগের দংশনে রিলাপ্সিং ফিভার (Relapsing fever), মিয়ানা (Miana) প্রভৃতি কতকগুলি রোগ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৭। টেট্-সী ফ্লাই (Tse-Tse fly)—আফ্রিকা মহাদেশের স্থানবিশেষে ইহারা বাস করে। ইহারা মক্ষিকা জাতীয়। ইহারা দিবাভাগেই উপদ্রব করে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই দংশন দ্বারা রক্ত শোষণ করিয়া লয়। ইহাদিগের দংশনে সাংঘাতিক "কালনিদ্রা" (Sleeping sickness) নামক রোগের বীজ (Trypanosomes) এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডা (Uganda) প্রদেশে বহু সংখ্যক লোক এই মক্ষিকার দংশন দ্বারা "কালনিদ্রায়" অভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে।

৮। সাধারণ মক্ষিকা (House-fly)—আমাদিগের বাটীর মধ্যে সচরাচর ফেকাসে রংএর ছোট মাছি ও নীল রংএর বড় মাছি দেখিতে পাই। ইহাদের কোনটীই দংশন করে না। সুতরাং ইহারা প্রত্যক্ষ ভাবে রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না। তবে ইহারা রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পদ বা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করে। টাইফয়েড্ জ্বর বা কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মলাদির উপর এই সকল মক্ষিকা বসিলে উহাদিগের পদদেশে ঐ সকল রোগের বীজ বহুল পরিমাণে সংলগ্ন হইয়া যায়; অতঃপর ঐ সকল মাছি তদবস্থায় আমাদিগের খাদ্য-দ্রব্যে উপবেশন করিলে উহাদিগের পদসংলগ্ন রোগের বীজ খাদ্যের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায় এবং ঐ দূষিত খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। যক্ষ্মা রোগের বীজও মক্ষিকা সাহায্যে এইরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যে মাছি বসিলে উহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে পেট হইতে একপ্রকার পদার্থ খাদ্যদ্রব্যের উপর উদ্গার করিয়া দেয়; এই উদ্গীর্ণ পদার্থের মধ্যে বিবিধ সংক্রামক রোগের বীজ অবস্থিতি করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বাটীর মধ্যে, বিশেষতঃ রান্না ঘরে, যাহাতে মাছির উপদ্রব না হয় এবং উহারা যাহাতে কোন মতে কোন খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথোচিত সাবধান হওয়া উচিত। অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে বাটীর নিকটে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব না থাকিলেও পরিবারের মধ্যে কাহারও সহসা সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে যথোচিত সাবধান সত্ত্বেও আমাদিগের অজ্ঞাতসারে মক্ষিকা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি হওয়া অসম্ভব নহে। অনেক সময়ে শুনা যায় যে দোকানের খাবার খাইয়া "কলেরা" হইয়াছে। দোকানে যেরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখা হয় এবং তজ্জন্য তাহার উপর যেরূপ মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে, তাহাতে যাঁহারা বাজারের খাবার

ব্যবহার করেন, সেই সকল পরিবারের মধ্যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বাজারের খাবার কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। মনুষ্যের ও গৃহপালিত পশুদিগের বিষ্ঠাই মাছির প্রধান খাদ্য, সুতরাং ইহারা যে তন্মধ্যস্থিত রোগের বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে অথবা আপনাদের উদরের মধ্যে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই কথাটি সর্ব্বদা আমাদিগের মনে থাকিলে বোধ হয় আমরা মাছির উপদ্রব নিবারণ করিতে কখনই অমনোযোগী হইব না।

৯। পিপীলিকা (Ants)—ইহারাও প্রত্যক্ষ ভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না, তবে সাধারণ মক্ষিকার ন্যায় রোগের বীজ বহন করিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ইহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদিগের গৃহিণীরা খাবারে "পিঁপড়া ধরা" বড় একটা দোষের কথা মনে করেন না, পিঁপড়া ঝাড়িয়া সেই খাবার বালকবালিকা-দিগের হাতে দিতে কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করেন না। অবশ্য অনেক স্থলে ইহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হইলেও স্থলবিশেষে ইহা অনর্থপাত হইতে পারে; সেই জন্য খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে পিপীলিকা সংলগ্ন না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হইলে এরূপ বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা থাকে না। খাদ্যদ্রব্যের পাত্র জল-পূর্ণ অন্য পাত্রের উপর বসাইয়া রাখিলে পিপীলিকার উপদ্রব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। পুনশ্চ তদুপরি সূক্ষ্ম জালের ঢাকা চাপা দিলে মাছির উপদ্রবেরও আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেক বাটীতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের এইরূপ সুব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১০। খোসের পোকা (Itch insect)—খোস পাঁচড়া এক জাতীয় পোকার আক্রমণে উৎপন্ন হয়; ইহারা মাকড়সা জাতীয়। ইহারা রক্ত শোষণ করে না, তবে স্পর্শ দ্বারা অথবা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী বা শয্যা দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করে। কেহ কেহ বলেন যে এই জাতীয় পোকা দ্বারা কুষ্ঠ রোগও বিস্তৃতি লাভ করে।

১১। উকুণ (Pediculidae)—ইহাদিগকে মস্তকের কেশের মধ্যে এবং গায়ের চুলের গোড়ায় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। রক্তবীজের ন্যায় ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী স্ত্রী-উকুণকে ২ মাসের মধ্যে ১০০০০ হাজার উকুণ-শাবক উৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে। গায়ের উকুণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সহজেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহারা দংশন দ্বারা রিলাপ্সিং ফিভার (Relapsing Fever) নামক একপ্রকার জ্বর রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। উকুণ মাথায় বা গায়ে জন্মিলে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তি নিতান্ত অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে—ইহা যে নিতান্ত লজ্জা ও নিন্দার বিষয়, সেবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত অপর কয়েক জাতীয় কীট রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করিয়া থাকে; বাহুল্য ভয়ে তাহাদিগের বিষয় এ স্থলে বর্ণিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

জাহ্নবী-তীরে

(বৌদ্ধ-গল্প)

—"বৎস! ফাল্গুনের বাসন্তী পূর্ণিমা আসিতেছে। সেই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় জহ্নবীতীরে বসিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

এই বলিয়া মহামুনি গৌতম শিষ্যের আনত শিরে আপনার কল্যাণময় হাতখানি রাখিলেন। শিষ্য গুরুর পবিত্র চরণরেণু মাথায় তুলিয়া লইল।

জাহ্নবী-তীরে ফাল্গুনের পুলকিত যামিনীর ভবিষ্য চিত্রখানি শিষ্য কল্পনার কত বিচিত্র রঙ্গে আঁকিয়া তুলিতে লাগিল। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি গিয়া শেষে বসন্তের পূর্ণিমা সমাগত হইল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া রজত-শুভ্র জ্যোৎস্না! পবিত্র বারাণসী নগরীর সৌধমালার পাদমূল চুম্বন করিয়া গলিত হীরার মত জাহ্নবীর জল উছলিয়া উছলিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সবে মাত্র রাত্রির প্রথম যাম। এখনও নহবৎ বাজিতেছে। মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর ধ্বনি।

শিষ্য গুরুর চরণ বন্দনা করিল।

"গুরুদেব! আজ বাসন্তী পূর্ণিমা!"

গৌতম মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বৎস! এখনও সময় হয় নাই। রাত্রি নিশীথ হইলে, সমস্ত নগরী সুপ্তিমগ্ন হইলে আমরা জাহ্নবী-তীরে গমন করিব।"

নগরীর কোলাহল আর নাই। একে একে গৃহদীপগুলি নিবিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহামুনি বুদ্ধ শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবী-তীরে উপস্থিত হইলেন।

বুদ্ধ অনিমেষ নয়নে জাহ্নবীর উজ্জ্বল শুভ্র স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"বৎস! তোমার প্রশ্ন কি? আবার বল।"

"ভগবন্! এই যে নিখিলবিশ্ব নিয়ত নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান্ হইতেছে এর পরিণতি কোথায়? অনন্ত কাল ইহাকে কোথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে?"

"বৎস! ঐ জাহ্নবী বক্ষে চাহিয়া দেখ।"

শিষ্য চাহিল।

"কি দেখিতেছ?"

"একখানা সপল্লব বৃক্ষশাখা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।"

"কোথায় যাইতেছে?"

"স্রোত যে দিকে যাইতেছে।"

"স্রোত কোথায় যাইবে?"

"সাগর সঙ্গমে গিয়া মিলিবে।"

"শাখা তবে কোথায় যাইবে?"

"সেও স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া সাগরে গিয়া পড়িবে।"

বুদ্ধ বলিলেন—"এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে ত?"

শিষ্য প্রণাম করিয়া বলিল—"হাঁ, গুরুদেব!"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।



"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।"

—"গীতাঞ্জলি" রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত চিত্র হইতে।

দেবদাসী

(১)

ত্রিনাবেলীর সুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত আপ্পে চিদম্বরম্ যখন শিশু বিশোকার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাহার মুমূর্ষু জননীকে নিশ্চিন্ত চিত্তে মরিবার অবসর দিলেন, তখন হইতেই সকলে বুঝিল, এ মন্দিরে একজন দেবদাসীর সংখ্যা বাড়িল।

মন্দিরে পাঁচজন দেবদাসী বাস করিত। বয়োজ্যেষ্ঠা চম্পা শিশু বিশোকার লালন-ভার গ্রহণ করিলেন। শিশুর মুখে যখন প্রথম কথা ফুটিল, তখন সে চম্পার ক্রোড়ে বসিয়া ডাকিল, "মাম্-মা।" চমকিয়া দ্বিতীয়া দেবদাসী অবলা শিশুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "চুপ্! চুপ! মা তোর আবার কে?"

দেবদাসী দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিতা। এ পৃথিবীর সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক পাতানো চলে না। সে কাহারও কন্যা নয়, বনিতা বা মাতা,—কিছুই সে নয়, শুধু দেবদাসী! ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়।

ইহার পর হইতে যখনই শিশু না বুঝিয়া পালন-কর্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে গিয়াছে, তখনই সে বাধা পাইয়াছে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা বুলি সে ভুলিয়া গেল। সকলের কাছে শুনিয়া শিখিয়া সে-ও চম্পাকে 'বড় ঠাকুরাইন্' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচজন দেবদাসী। দেব-মন্দির-সংশ্লিষ্ট উদ্যানের প্রান্তে তাহারা বাস করে। লম্বা টানা দালানের ধারে ধারে পাঁচ জনের জন্য অনতি-বৃহৎ পাচটি কুঠ্‌রি। সে ধরণের আরও দুই-চারিটা ঘর খালি পড়িয়া ছিল।

বিশোকার বয়স তখন আট বৎসর। একদিন চম্পা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তুমিও আমাদের মত নিজের একটি ঘর পাবে। এস, তোমায় তোমার ঘর দেখিয়ে আনি।" বালিকা কিছু না বলিয়া চম্পার অনুসরণ করিল।

অল্প বয়সে স্বাধীনতার প্রতি অন্তরের কেমন একটা টান থাকে। নিজের একটি ঘর পাইবে শুনিয়া বিশোকা যথেষ্ট আনন্দ বোধ করিল। প্রথমে সে ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। প্রথম দর্শনেই নবজাত সন্তানের প্রতি জননীর যেমন বাৎসল্য সঞ্চারিত হয়, এই আপনার জিনিষ গৃহটির প্রতিও তেমনি এক অভিনব আকর্ষণ সে অনুভব করিল। ভিতরে ঢুকিয়া চারি ধারে সে খানিক নড়িয়া ফিরিয়া বেড়াইল, আপনার ক্ষুদ্র শয্যাটির উপর একবার বসিল, জানালা দিয়া চিরপরিচিত উদ্যান-সীমানায় দৃঢ় প্রাচীরটিও একবার নূতন করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর ফিরিয়া দড়ির আলনায় ঝুলান ঘাঘরি-আঙ্গিয়া-কয়টি নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া এমনই মনে হইতেছিল, যেন এক বৃহৎ সংসারের কর্ত্রীরূপে সে আজ তাহার নূতন গৃহস্থালীর মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণিক! যখন সে শুনিল, এই ঘরে রাত্রে তাহাকে একা শয়ন করিতে হইবে, তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। চম্পার ওড়না চাপিয়া সে কহিল, "আমি তোমার কাছে শোব।"

"না, ছিঃ, আব্দার করো না। তোমায় আব্দার করতে নেই।"

"কেন ঠাকুরাইন?"

"আস্‌ছে পূর্ণিমায় তুমি দেবদাসী হবে যে।"

এ কিছু নূতন কথা নয়। চিরদিনই উঠিতে বসিতে এ কথা বিশোকা শুনিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যৎ দেবদাসীকে অনর্থক হাসিতে নাই, দৌড়িয়া চলিতে নাই, আব্দার করিতে নাই, এক কথায় তাহার কিছুই করিতে নাই, শুধু দুইটি খাইতে হয়, আর দেহ মাজিয়া ঘষিয়া, চোখে কাজল টানিয়া, নৃত্য গীত শিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি এ কথা সে অন্ততঃ সহস্র বার শুনিয়া আসিয়াছে;—শুনিয়া সেই ভাবেই কাজ করিয়া আসিতেছে,—তবুও এ বিস্মৃতি! তবে এই আগামী পূর্ণিমার কথাটাই সে এবার এই নূতন শুনিল। কিন্তু আজিকার এ উপদেশ গ্রহণ করা বালিকার পক্ষে বড় সুবিধার নহে। বাহিরে কৃষ্ণ-পক্ষের গাঢ় অন্ধকারে চারি ধার তখন ভরিয়া গিয়াছে,—সকলের শেষের ঘরটায় সে একা থাকিবে,—মনে করিতেই তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। একা থাকিবে? না, না। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "ভয় করবে যে, ঠাকুরাইন? আমার বড় ভয় করবে!" বলিতে বলিতে সে তাঁহার কাছে আরও ঘেঁষিয়া আসিল। ভয়! সে কথাটা মনে পড়িলেই যে মানুষের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

দেবদাসী চম্পার মনে যে কোমলতা ছিল না, এমন কথা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু চিত্ত নির্ব্বিকার রাখাই দেবদাসীর কর্ত্তব্য! সেই কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ তো আর করিতে পারেন না! কাজেই জোর করিয়া বালিকার ভয়-কাতর মিনতির পানে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি গম্ভীর মুখে কহিলেন, "ভয় কি! দেবদাসীর প্রাণে ভয় থাকতে দিতে নেই। যাও, কোন-দিকে না চেয়ে নিজের ঘরে যাও, দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়। এ ক'দিন অভ্যাস করে নাও। পূর্ণিমার আর দেরী নেই।" অনিচ্ছুক বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তিনি ভিতরে লইয়া গেলেন,—ভিতরে রাখিয়া ফিরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মন তাঁহার কাঁদিতে চাহিল, বিশোকাকে ফিরাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—আহা, ভয়-চকিতা বালিকা!—কিন্তু না,—ব্রতভঙ্গ-পাপ হইবে! সে পাপ কে বহন করিবে?

সংসার-জীবের প্রতি দেবদাসীর মায়া শোভা পায় না! বাহিরের দিক হইতে একটা ভয়ার্ত্ত কাতরোক্তি, পরক্ষণে দ্রুত পদধ্বনি, নীরব রজনীর ঘন অন্ধকার চিরিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে শয্যায় পড়িয়া বিনিদ্রা চম্পা ছটফট করিয়া শুধু প্রহর গণিল, তথাপি নিয়ম ভঙ্গ হইতে দিল না।

ওখানে নির্জ্জন গৃহে আড়ষ্ট বালিকা পেচকের কর্কশ শব্দে শিহরিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিল। অলক্ষ্যে তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ ফাটিয়া সভয় কাতরোক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "মাগো!"



দেবদাসী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

হায়, কোথায় কে! কোথায় তাহার মা! মা বলিয়া ডাকিয়া, কোন অনির্দ্দেশ্য সুদূর লোকে তাহার শরীরিণী অথবা অশরীরিণী মাতার বক্ষে সে কোন অজ্ঞাত আকুলতা জাগাইয়া তুলিতে পারিল কি না, কে জানে! কিন্তু এ জগতের কাহাকেও সে টানিতে পারিল না। ভাষাহীন ক্রন্দনে তাহার সারা প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি কেহ আসিল না। উৎকণ্ঠিত বক্ষে কোনমতে সে রজনী যাপন করিল।

ভোরের আকাশ তখনও বেশ নির্ম্মল হয় নাই, দীপ্ত শুকতারা ঈষৎ ম্লান চোখে চাহিয়াছিল; পূর্ব্বদিক একটা ভাবী সৌভাগ্যের সূচনায় অরুণ-রক্ত বর্ণে রাঙ্গিয়া উঠিতেছে—সহসা বাহিরে মনুষ্য-পদধ্বনি শ্রুত হইল, এতক্ষণে সেই পরিচিত ধ্বনিটুকু শুনিয়া যেন মৃত দেহে জীবন-লাভের মতই তাহার অর্দ্ধলুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তবে আবার সে মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে! তবে সে বাঁচিয়া আছে,—মরে নাই!

বাহিরে আসিতেই সে বুঝিল, সতর্ক দ্রুত ত্রস্ত পদে কে যেন চলিয়া গেল। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতি! কে ও? বিশোকা চিনিল, ডাকিল, "মা,—বড় ঠাকুরাইন!" ঠাকুরাইন ফিরিলেন না।

পরীক্ষার কয়টা দিন কাটিয়া গেলে যথা-সময়ে সাড়ম্বর সমারোহে অষ্টমবর্ষীয়া বিশোকা শ্রেষ্ঠ দেবদাসীর স্থান অধিকার করিল। সে দিন, সে কি আনন্দ! নূতন অলঙ্কার-বস্ত্র, ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা বালিকা বিগ্রহ-কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া আপনাকে দেব-চরণে উৎসর্গিতা করিল। পার্থিব জগতের সকল সুখ-দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার্থিব জীবনে সে আপনাকে বিকাইয়া দিল। ক্ষুদ্রা মানবী আপনাকে দেবীত্বে অভিষিক্তা করিয়া এক বিপুল গৌরবে আপনার জন্ম সার্থক ভাবিল।

(২)

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত চিদম্বরম্ আপ্পে গতিশীল জগতের চক্রনেমির আবর্ত্তনে নূতন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে মহশিব দেশপান্তে এখন প্রধান আচার্য্য। চতুর্থা দেবদাসী রঙ্গিলা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা, অবলা অপসৃতা এবং বালিকা বিশোকা এখন পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসরে অতুল শ্রী-বিভূষিতা নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী।

এখন আর একা থাকিতে তাহার ভয় ছিল না। শয্যাতলে সুন্দর তনু এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম-সুখ-ভোগে যামিনী-যাপন এবং সেই চারু দেহ মার্জ্জিত-শোভিত করিয়া তুলিতেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় যখন সে হরিদ্রা, গোলাপী বা নীল বর্ণের পেশোয়াজ, আঙ্গিয়া ও ফিরোজী ওড়না পরিয়া নাট-মন্দিরে নাচিতে যায়, তখন দর্শকের দল বিপুল বিস্ময়ে, প্রশংসমান নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকে! তাহারা যেন বিহ্বল উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহার সঙ্গীত, এস্‌রাজ-বীণায় তাহার আলাপ,—সে অপূর্ব্ব! নৃত্যশীলা তটিনীর ন্যায়ই তাহার গতিটুকু লঘু, লীলা-চঞ্চল! দর্শকের মনে হয়, এ যেন বাস্তবিকই সেই দেব-সভার অপ্সরীর নৃত্য! সারা ত্রিনাবেলী জুড়িয়া দেবদাসী কিশোরী

বিশোকার লাবণ্য ও কৃতিত্বের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

প্রতিদিনই মন্দিরের নাট্যশালায় দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। বহু ধনী, এমন কি স্বয়ং রাজাধিরাজও একদিন তাহার দর্শনে আসিয়া, প্রত্যহই প্রায় দর্শকরূপে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

বিশোকা কিন্তু এ সবের কোনই খোঁজ রাখিত না। সারাদিন বিবিধ বেশে নিজেকে সে সাজাইত, বিবিধ ছাঁদে কবরী রচনা করিত, নবীন সুরে তন্ত্রী আঁটিয়া নব-নব সঙ্গীত সাধনা করিত! তার পর সেই সারা দিনের সমস্ত শ্রম এতটুকু সুখাবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখিত না! কাহারও প্রশংসা-বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না! সকল প্রাণ-মন, যাঁহার পরিতোষের জন্য সে উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহারি পানে অনিমেষে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিত!

অবশেষে যখন চারি দিকে দর্শকের দল হইতে বাহবার করতালি, পুষ্পমাল্য ও স্বর্ণরজত-বর্ষণের ঘটা পড়িয়া যাইত এবং অপর দেবদাসীগণ সেই সকল সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত, বেহালাবাদক সঘন বেগে ছড়ি টানিয়া বাদ্য-শেষের সূচনা প্রকাশ করিত, তখন স্পন্দিত বক্ষে সে যুক্তপাণি হইয়া বিগ্রহের পানে চাহিয়া থাকিত। আন্তরিক ব্যাকুলতায় তাহার সারা চিত্ত বিগ্রহ-চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত,—যেন সে বলিত, "প্রসন্ন হইলে ত! ওগো আমার জীবন-দেবতা! দাসী তোমায় মুহূর্ত্তের জন্যও তৃপ্তি দিয়াছে কি?" তারপর কোলাহল-হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কোনদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া যথার্থ দেবলোক-চারিণীর মতই সে নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইত। কৃপাপ্রার্থীর দল অশেষ-বিশেষ চেষ্টাতেও তাহার দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ না হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। রোষে ক্ষোভে তাহাদিগের চিত্ত গর্জ্জিয়া বলিত, কি অহঙ্কার! কাহাকেও দৃক্‌পাত নাই!

বাস্তবিকই যে বিশোকার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে। মর্ত্ত্যচারী মানবের তুলনায় আপনাকে সে কোন সুদূর ঊর্দ্ধ লোকের জীব বলিয়া মনে করিত। সে জানিত, ইহারা মানুষ, কিন্তু সে দেবী। দেবতা ভিন্ন কাহারও সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এ সংসারের কোন্‌খানে কি ভাবে কে চাহিয়া আছে, সে সংবাদে তাহার কোন প্রয়োজন নাই!

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর আসিয়া ক্রমে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ক্রীড়াশীল নদী-তরঙ্গের মতই কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সে অবিরাম স্রোত-ধারা কাহারও পানে চাহিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায় না! তট ভাঙিয়া, গ্রাম ভাসাইয়া, নিজের গতিপথকে সে যেমন ঠিক রাখে, সমস্তও তেমনি শিশুকে বালকত্ব, কিশোরকে যৌবন ও প্রৌঢ়কে বৃদ্ধত্ব দান করিয়া সম তালে নিজের পথ ধরিয়া বহিয়া যায়। তাহার স্পর্শে কোথায় কোন্ তরুণ লতায় ফুল ধরিল, কোন্ জীর্ণ শাখী শুকাইল, এ সংবাদ লইবার জন্য তাহার গতি ফেরে না।

বসন্তের নবমুঞ্জরিত মাধবীর ন্যায় নূতন শোভা-সম্পদের মধ্যে বিশোকার দেহ



"আঁধারেতে ভয় করিনা, আঁধার আমি বাসি ভাল,
আঁধার দেখলে মনে পড়ে, শ্যামা মা মোর এমনি কাল।
ভয়ের আকার দেখলে পরে ডাকি আমার শ্যামা মারে,
ছায়া-পথে দেখতে পাই সে মায়ের রাঙা পায়ের আলো।"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

অভিনব নিটোল মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। নীল রঙের বসনে সাজিয়া সে দিন বসন্ত-সায়াহ্নে দেবারতির পর যখন সে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহার প্রাণের মধ্যে বসন্তের উতলা হাওয়ার মতই একটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবের বাতাস গুঞ্জরিয়া উঠিল। চারিদিকে তখন চাঁদের আলোর ঢেউ লাগিয়াছে; যতদূর দেখা যায়, আকাশে কেবল আলোর মালা গাঁথা; দেব-মন্দিরের সুরভিজলে সিঞ্চিত পুষ্প-পরাগের স্নিগ্ধ গন্ধ বায়ুর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; বিশোকার প্রাণের মধ্যে তখনও সে দিনকার সন্ধ্যার সুরের হাওয়া একটি মিষ্ট আবেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। কিন্তু তাহার মাঝখানে আবার এ কি? গান যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এক মুগ্ধ চিত্তের অর্দ্ধস্ফুট বাণী,—"সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হইল না?" অতি-মৃদু-উচ্চারিত এ স্তুতিটুকু, তাহার উদ্দেশ্যে,—কে পাঠাইল? সেই এক তরুণ নেত্রের সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সে কত মুগ্ধ ভাবেই না তাহার পানে নিবদ্ধ ছিল! ভাষা যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সে দৃষ্টিতে বুঝি তাহাই প্রকাশ পাইতেছিল।

বিশোকার সর্ব্ব শরীর সে নেত্রপাতে শিহরিয়া উঠিয়াছিল! সকল শিরার শোণিত-প্রবাহ সেই দৃষ্টির তাড়িৎ আকর্ষণে ছুটিয়া উভয় গণ্ড বাহিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছিল! সে তাহার সরল দৃষ্টি আজ দর্শকের মুখে তাই তেমনভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, শুধু সলজ্জ-সঙ্কোচে নত নেত্রে চাহিয়াছিল।

ঘরে ফিরিয়া সে বসন ত্যাগ করিল না, শয্যা-প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া নীরবে কত কথা ভাবিতে লাগিল। দেশের অধিপতি কেন আজ এমন করিয়া তাহার পানে চাহিতে-ছিলেন,—কণ্ঠে তাঁহার আজ কেন সে সুর!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। গাছের আড়ালে জ্যোৎস্না জাল ক্রমে ক্ষীণ হইল। চাঁদ ম্লান হইয়া আসিল। নিরালা পথে গ্রামের কুকুর ডাকিয়া থামিয়া গেল। এই অভিনব সংশয় হইতে আপনার অনভিজ্ঞ হৃদয়কে মুক্ত করিতে না পারিয়া বিশোকা আস্তরণতলে শ্রান্ত দেহ বিছাইয়া দিল। চক্ষে তাহার ঘুম আসিল। স্বপ্নে আবার সেই সুর ফুটিয়া উঠিয়া কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে কুহরিয়া গেল, "সুন্দরি, এ সুর কেন অনন্ত হইল না!"

প্রভাতে চক্ষু মেলিতে সে দেখিল, এ কি দৃশ্য! এ আলো, এ কিরণ, এ কি কোন নূতন লোকের? নূতন সূর্য্যের? বাহিরে মধুর বাতাস কত পাখীর গানে ভরিয়া উঠিয়াছে! ফুলের বর্ণে-গন্ধে এ কি নব মাধুর্য্য! ধরণী-বক্ষ কি মনোমোহন শ্যামলতায় আজ ভরিয়া উঠি-য়াছে! এ কি নূতন—? না, এতদিন সে অন্ধ ছিল,—আজ প্রথম তাহার দৃষ্টি খুলিয়াছে?

আজ সবার মাঝে, সকল কাজে, সেই একটি চাহনি, একটি সুর, অখণ্ড বিচিত্র তালে-ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছিল,—তাহা সুন্দরীকে স্মৃতির সরমে রাঙাইয়া তুলিতেছিল।

প্রধান পুরোহিত এতদিন শুধু লক্ষ্য করিয়াছেন, আজ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ সার্থক হইয়াছে। আজ তিনি দেখিয়াছেন, তরুণ নৃপের পিপাসু লোচনের মুগ্ধ দৃষ্টি কিশোরীর প্রতি তেমনি আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিকে কিশোরী আজ অবহেলা করিতে পারিতেছে না, সে দৃষ্টির সম্মোহনে সে আজ মুগ্ধ! রাজ-নেত্রে সরলতার সে স্বচ্ছতা নাই, সে নেত্র ক্ষণ-কম্পিত! কিশো-

রীরও কণ্ঠে আজ বিহঙ্গীর আত্ম-নিবেদনের সে সুর নাই, আপনাকে ঢাকিবার একটা প্রবল চেষ্টা সে সুরে বিদ্যমান ছিল। মৃদু হাসিয়া সদাশিব ভাবিলেন, দেবপ্রসাধনের স্থান মানবচিত্তের দুরাকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই কি এই কৃত্রিমতার সৃষ্টি?

সেদিন সভা ভাঙিবামাত্র বিশোকা নাট-মন্দির ত্যাগ করিল, দেবতার দিকেও আজ ভাল করিয়া সে চাহিতে পারিল না, কি যেন এক গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল,—অননুভূত-পূর্ব্ব কি এক গভীর স্পন্দনে তাহার বুকখানা মুহুর্মুহু আজ কাঁপিয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে, জীবনে তাহার কি একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছিল, আজ প্রথম সেই ভুলটুকু ধরা পড়িয়াছে। এত দিনে সে যেন একটা পথ পাইয়াছে, কিন্তু আবার ভিতর হইতেও একটা অস্পষ্ট অন্ধকার, একটা আতঙ্কের ছায়াও এই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সেদিনও সেই জ্যোৎস্না-স্বর্ণখচিত ওঢ়নায় অঙ্গ ঢাকিয়া রজতাম্বরা নিশীথিনী বাসক-শয়নে চলিয়াছে, আকাশপথে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত দীপ হস্তে পূর্ণিমার চন্দ্র মর্ত্ত্য-পানে চাহিয়া-ছিল,—এমন সময়, অতি নিকটে মৃদু স্বরে কে ডাকিল, "সুন্দরি!"

চমকিয়া বিশোকা ফিরিল। তাহার সর্ব্বশরীর বেতসের মত কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখে স্বয়ং রাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য!

রাজা এক পদ অগ্রসর হইলেন, কহিলেন, "ভয় নাই। তোমাকে আমি বলিয়াছি, তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল! তাই ভয় হয়, পৃথিবীর পাপ পঙ্কে পাছে কোন দিন মলিন, কলুষিত হও! যদি অভয় পাই ত একটি কথা নিবেদন করি—"

বিশোকা যেন তড়িতাহত হইয়া পড়িয়া-ছিল, তাহার চেতনা ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন বুঝিল না, উত্তরও সে খুঁজিল না। শুধু একটা তীব্র আনন্দে সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল! কিসের এ আনন্দ,—তাহাও সে বুঝিল না।

নৃপতি আর একপদ অগ্রসর হইলেন,—কহিলেন, "এ দেবমন্দির পুণ্যভূমি, সন্দেহ নাই,—কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে জীবনটাকে পবিত্র রাখা সুকঠিন। দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে তাহারা মন্দিরেরই পুরোহিত-যাজকগণের সেবিকা। শিহরিতেছ? তুমি নিতান্ত সরলা, তাই আজও যে জীবনের মাঝখানে তুমি বর্দ্ধিত, সে জীবন চিনিতে পার নাই, নিজের অবস্থাও অনুভব করিতে পারিতেছ না! কিন্তু এ কথা সত্য, তোমার দুঃখের দিন আগতপ্রায়! যদি এমনি পবিত্র, নির্ম্মল থাকিতে চাও, তবে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর।"

বিশোকা এখনও কিছু বুঝিল না, কিন্তু একটা আশঙ্কায় তাহার শরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বিপদের দিন আসন্ন, —কি বিপদ! দেবদাসীর বিপদ! মহারাজ আজ এ কি কথা বলিতেছেন। পুরোহিতের সেবিকা! নামে শুধু দেবদাসী! কম্পিত দৃষ্টি তুলিয়া সে যেন কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অস্ফুট মর্ম্মরে তাহার নিবেদনটুকু ভাষা হারাইয়া থামিয়া গেল। কি বলা যাইতে পারে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না!

রাজা তাহার অন্তরের ভাব বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিকে চাহিয়া আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন, "বিশোকা, এ বুকের মধ্যে যাহা আছে, তাহা এখন অব্যক্তই থাক! দেব-নির্ম্মাল্য মানুষ শুধু মস্তকে ধারণেরই অধিকারী, আর কিছুর নয়। সেই অধিকার আমায় দাও। এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে—এমন কি, আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখিতে পাই। আমার মা কাশীবাসিনী, সেখানে তাঁহার কাছে যাইবে?" বিশোকা নীরবে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। রাজা আবার কহিলেন, "সময় নাও, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হইবে। নিজের উপরও আমার তেমন বিশ্বাস নাই। কি জানি, কি ভাব আসিয়া পড়ে—দেবতার ধনে মানুষের লোভ হয় কেন! তাহা শুধু ধ্বংশই আনে। কিন্তু হায়, দেবতা কোথায়? তুমি পুরোহিতের,—সে তোমায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। তাহার হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই, কাহারও নাই! তাই অনেক ভাবিয়া এই উপায় আমি স্থির করিয়াছি,—তোমায় নিরাপদ করিয়া তোমার সহিত পার্থিব জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিব, নহিলে বুঝিতে পারিব না—"

কে যেন সরিয়া গেল! একটা ছায়া!

"বিদায় বিশোকা—" চকিতে উৎপলা-দিত্যের দীর্ঘ মূর্ত্তি অন্ধকার স্তম্ভান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকল শরীরে তাড়িতা ঘাত, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ-ভয়ের মিশ্রনে একটা বিপুল আলোড়নের বেগ বালিকাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন আকাশে পূর্ণগ্রাসী-সূর্য্য-গ্রহণের মতই,—বিপুল তীব্র আলোর মাঝখানে,—অকস্মাৎ আজ এ কি বিরাট অন্ধকার!

(৩)

শয্যায় পড়িয়া বিশোকা রাজার কথাই ভাবিতেছিল। কি মুগ্ধ চাহনি, কি মিষ্ট সুর, কি সরল প্রাণ! কিন্তু এ কি,—এ কি হেঁয়ালির কথা! সে দেবতার নয়, পুরোহিতের? না, সে দেবী—সে দেবী!—দেবতার চরণে বিক্রীত এ দেহ,—ইহাতে কাহারও অধিকার নাই। নৃপতি হয় ভ্রান্ত, না হয়—না, তাহা অসম্ভব! সে কণ্ঠে ত ছলনার আভাষ নাই! তবে—কি তবে? এ কথা তবে কেন তিনি বলিলেন? ভ্রান্তি—? বোধ হয়, ভ্রান্তিই!

গৃহ-দ্বার মুক্ত ছিল, আহার্য্য সে স্পর্শও করে নাই! শয্যার আস্তরণ স্থান-চ্যুত হয় নাই! তাহারি উপর বালিকা আপনার সজ্জিত তনুখানি ঢালিয়া দিয়াছিল। সদাশিব দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বিশোকা!"

কে ও! ও কে ডাকে?, ধড়মড়িয়া কিশোরী উঠিয়া বসিল। না, ভয় নাই! প্রধান পুরোহিত স্বয়ং আসিয়াছেন!

সদাশিব অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজা তোমায় কি পরামর্শ দিতেছিলেন, দেবদাসী? নিশ্চয়ই এমন কোন গূঢ় কথা নয়, যাহা আমার কাছে গোপন রাখিবে! কি কথা?"

বিশোকার মনে নিমেষে সেই কণ্ঠ সেই সুর বাজিয়া উঠিল,—"দেবদাসী! যথার্থ তাহারা··" অন্তরে সে শিহরিল। হয় ত

এ কথা মিথ্যা না হইতেও পারে। রঙ্গিলা, অবলা—এমন কি চম্পা——! সদাশিব তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি দেবদাসী, চুপ করিয়া রহিলে যে! রাজার কথাটা বড় গোপন না কি?"

এ ব্যঙ্গোক্তিতে বিশোকা জ্বলিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সগর্ব্বে সে কহিল, "কাহারও সহিত আমার কোন গোপন-কথা নাই। তিনি আমাকে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমার বিপদের দিন আগতপ্রায়, যদি পবিত্র থাকিতে চাই, তবে যেন এ মন্দির ছাড়িয়া যাই।"

"মন্দিরের চেয়ে রাজোদ্যানটা বেশী পবিত্র বুঝি?" পুরোহিত বক্র হাসি হাসিলেন। সে হাসির ইঙ্গিত না বুঝিলেও বিশোকার কানে তাহার সুরটা ভাল লাগিল না। সে কহিল, "না, রাজোদ্যানে তিনি আমায় ডাকেন নাই, তাঁহার মায়ের কাছে কাশীধামে পাঠাইতে চাহেন। তিনি বলেন, দেবদাসী শুধু নামে দেবদাসী, প্রকৃত পক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা—এ কথা—"

"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন,—ও কি!—অমন করিতেছ কেন? যেদিন বিগ্রহের কণ্ঠে তুমি মাল্যদান করিয়াছ, সেইদিনই কি বুঝ নাই, সে মালা কাহার কণ্ঠে পড়িয়াছে! পুরোহিত দেব-প্রতিনিধি, সমুদয় দেব-সম্পত্তিতে তাহারই অধিকার। ইহাতে রাজার কোন হাত নাই! রাজার সাধ্য কি, এখান হইতে তোমায় লইয়া যায়! তুমি আমার।"

নিমেষে তখন সমস্ত ব্যাপার বিশোকার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে সব বুঝিল। সে তবে তাহার, দেবতার নয়! এই মানবের,—সদাশিব দেশপান্তের—! অনেক কথাই আজ তাহার মনে পড়িল! স্বপ্ন টুটিয়া সত্য আজ ভীষণ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল!

পুরোহিত শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি নিতান্তই বালিকা, নির্ব্বোধ! তাই ইহাতে এত চঞ্চল হইয়াছ। আসল কথা, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ, রাজাও নিজে তাই,—কিন্তু মন্দির-সেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা ত্যাগ কর, রাজরাণী হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়! সে পদ পাইবে, তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদেই আছ। রাজার সহস্র চেষ্টাও তোমায় এই গণ্ডীর এক চুল বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না, স্থির জানিয়ো। বরং প্রয়োজন বুঝিলে এখানে তাঁহার আগমন আমি বন্ধ করিতে পারি। তুমি দেবদাসী,—ধরিতে গেলে, আমার স্ত্রী। আমি সে অধিকার গ্রহণ করিলাম। তুমি আমারই।"

বিশোকার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। ঘৃণায় সে দূরে সরিয়া আসিল, বলিল, "না, আমি দেবতার। পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী! তুমি আমায় অমন কথা বলিয়ো না।"

"বটে! আমি বলিব না,—আর রাজা যখন বলিতেছিলেন, তখন ত শুনিতে দিব্য লাগিতেছিল।"

"তিনি অমন লোক নহেন, তিনি আমায় ও সব কথা কিছুই বলেন নাই। তুমি যাও, নহিলে আমি বড় ঠাকুরাইনকে সব কথা বলিয়া দিব।"

পুরোহিত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কি বলিবে? চিরকালই এই প্রথা,—দেবদাসীমাত্রেই পুরোহিতের সম্পত্তি—এ কথা কে না জানে? তোমার বড়-ঠাকুরাইন কি দেবদাসী ছাড়া? পুরোহিতের পত্নীপদ বড় নগণ্য নয়। বেশ, আজ চলিলাম। রাজার আশা ছাড়িয়া এখন তুমি নিদ্রা যাও। কাল যেন তোমায় এ সব দুশ্চিন্তার মাথা ঘামাইতে না দেখি। তুমি আর কাহারও নও, তুমি আমার।"

ইন্দ্রজালে সব যেন কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বর্গযাত্রী চাহিয়া দেখিল, কোথায় স্বর্গ! সে রসাতলে! সে দেবতার দাসী ছিল, তাহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না,—দেবতাই তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু এখন কোথায় দেবতা? তিনি তাঁহার মন্দিরে পূজা গ্রহণে ব্যাপৃত, আর সে—নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়! কাতর অবসাদে তাহার শরীর মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

এক গৃহস্থ রমণী কোলের সন্তান লইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। নিত্যই সে আসে,—কোনদিনই আসিবার ভুল হয় না, সেদিন আসিয়া হাস্য-রহস্যময়ী সুবেশ-ভূষিতা এই চঞ্চলা হরিণীকে মন্দিরে একাকিনী স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তোমার কি হয়েচে?"

শিশু কলহাস্যে ডাকিল, "মা-ম্-মা!"

বিশোকা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। আহা, কি সুন্দর,—নধর-কান্তি, এই সহাস শিশু! সাগ্রহে দুই বাহু বাড়াইয়া সে শিশুকে মুহূর্ত্তে ছিনাইয়া লইল। শিশু ডাকিল, "মা!" আহা, কি মধুর! কি মধুর এ সম্বোধন রে! প্রাণ যে ইহার তালে তালে নাচিয়া উঠে, বুক যে জুড়াইয়া যায়! চুম্বনের পর চুম্বনে শিশুকে সে বিব্রত করিয়া তুলিল

নারী কহিল, "তুমি খুব ছেলে ভালবাস, বুঝি? আচ্ছা, এখন ওকে দাও! কেউ আবার দেখবে,—লোকে এতে আমাদের নিন্দা করতে পারে।"

এ কথার কূট অর্থ বিশোকা বুঝিল না। শিশুকে সে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা করবে না! তোমরা হচ্ছ নাচওয়ালী, তোমাদের সঙ্গে কি ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের মিশতে আছে! তবে তুমি কি না নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর দেখতে বড় সুন্দর, কাজেই তোমায় ভাল না বেসে থাকা যায় না। আহা, এ ব্যবসা না করে যদি বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে ত, কেমন হত! দেখ দেখি, কপাল! তোমাদের বুঝি বিয়ে হয় না?"

"পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী।"

"ওমা, মানুষের আবার কখনো ঠাকুর স্বামী হয় বুঝি?" বলিয়া বিশোকার শিথিল বাহুমধ্য হইতে শিশুকে টানিয়া লইয়া জননী চলিয়া গেল।

পিঙ্গলেশ্বর! এই তাহার পদ? ইহা লইয়াই সে এতদিন নিজেকে দেবীত্ব দান করিয়া আপনাকে এত ঊর্দ্ধে রাখিয়াছিল! সে নর্ত্তকী! গৃহস্থ-বধূ ঘৃণায় তাহার ছায়া

স্পর্শ করিতে চাহে না! পবিত্রতম শিশুদেহও তাহার পিপাসাতপ্ত রক্ষস্পর্শে কলঙ্কিত হয়! কি দুর্ব্বিসহ, এ জীবন! পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী—না, কোথায় স্বামী? তুমি দেবতা! দেবতার সহিত মানুষের কিসের সম্পর্ক? স্বামী নাই,—সন্তানও থাকিবে না! গৃহ, বান্ধব, আরামস্নিগ্ধ, সেবা-শীতল একটি মৃত্যুশয্যাও তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না! তবে হায়, কিসের আশা আছে? কিছুরই না! সে দেবতার নহে, মানবেরও নহে, শুধু দেবনামে উৎসর্গিতা, মানবের ক্রীড়াদাসী-মাত্র। হায়, মহারাজ! হায়, ক্ষুদ্র শিশু! এ অনভিজ্ঞ শূন্যতার মধ্যে এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আজ তোমরা জাগাইয়া দিয়াছ! এমন শূন্য জীবন লইয়া কি মানুষ কখনও বাঁচিতে পারে?

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে লতা-মণ্ডপের অন্তরালে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে রাজা ডাকিলেন, "বিশোকা—"। কেহ সাড়া দিল না। রাজার প্রাণ কি-এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া তিনি আবার ডাকিলেন, "বিশোকা—"

সহসা দূর হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসিল। কোলাহল লক্ষ্য করিয়া সতর্ক ধীর পদে রাজা অগ্রসর হইলেন। মন্দিরের নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, দ্বারে অত্যন্ত ভিড় জমিয়াছে! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি আরতির শঙ্খঘণ্টা এখনও বাজিয়া উঠিল না, কেন? ভক্তবৃন্দের সে বন্দনা-গুঞ্জনও শুনা যায় না! ব্যাপার কি? প্রশ্ন করিয়া রাজা জানিলেন, আরতি-পূজায় দারুণ বাধা পড়িয়াছে—!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবকগণ মন্দির-সংস্কারে আসিয়া দেখে, পূজার আসনে বসিয়া কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা মহাধ্যানে নিমগ্না। সে ধ্যান এখনও কেহ ভাঙ্গাইতে পারে নাই।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আগে আগে

পরিহরি অতিদূর পর্ব্বত কন্দর,
অতিক্রমি শৈল নদী কানন প্রান্তর,
চলিয়াছি পদ-ব্রজে কি জানি কোথায়
মুদি' আঁখি।
আগে আগে কে গো ওই যায়
অদৃশ্য মূরতি? তার চরণ-চুম্বিত
রুণু রুণু রুণু রুণু নূপুর-শিঞ্জিত
নিরন্তর পশে কানে। মৃদু বেণু রব
সুরের শিকলি রচি' প্রাণ মন সব
কাড়ি' লয়, পদ মম করে আকর্ষণ
অজ্ঞাত শকতি-বশে!
সিন্ধু-গরজন
শ্রবণে পশিল যেই, থামিল অমনি
মুখর মঞ্জীর সহ মুরলীর ধ্বনি
অকস্মাৎ। চেয়ে দেখি—নাহি কিছু আর,
কানে শুধু বাজে দূরে চাপা হাসি কা'র!

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।



বর্ষার দিনে
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ক্ষ্যানিয়মে চলিয়া গেলেও জেনোরল হিথারষ্টনের চিন্তা আমার মন হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অপসৃত হইল না। বৃথা আমি জমিদারীর কাজে অত্যধিক মনঃ-সংযোগের চেষ্টা দেখিতেছিলাম। হস্ত, পদ ও চক্ষু সে কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে—মন কিন্তু সেই পুরাতন চিন্তা সূত্রেরই গ্রন্থি-মোচনে লাগিয়া থাকে। কৌতূহল মুহুর্মুহু ভিতর হইতে প্রশ্ন তুলে,—ব্যাপারখানা কি? ইহার শেষই বা কোথায়?

যখনই কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃঢ় লৌহ কবাট-যুক্ত ক্লুমবারের পাশ দিয়া যাতায়াত করিতাম, তখনই আমার মনের ভিতর সেই চিন্তা কেবলই ওতঃপ্রোত হইয়া বহিতে থাকিত। এই যে সুদৃঢ় আবরণের অন্তরালে একটি সসঙ্কোচ কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,—সেটি কি? কল্পনায় যত রকম উদ্ভট, অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপারের সৃষ্টি করা যাইতে পারে—সে সকলের সাহায্যেই আমি বহু বিপদের চিত্র মনে মনে গড়িতে ভাঙ্গিতে লাগিলাম—কিন্তু আসলে তাহার কোন্‌টির সহিত যে বাস্তবের মিল আছে,—তাহা কে বলিয়া দিবে? এই সামান্য "কিন্তু" কথাটাই আমার চিন্তার সকল সূত্র ছিন্ন করিয়া দিত! মনটা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িত।

রাত্রে এসথার আমাদের দরিদ্র প্রতিবেশিনী লুথার মার পীড়িত সন্তানটিকে দেখিতে গিয়াছিল। এ সকল কাযে কোন দিনই তাহার সময়-জ্ঞান থাকিত না। দরিদ্রের প্রতি তাহার করুণার যেন কোন সীমা ছিল না। সে জন্য সে অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় সকলের কাছেই অত্যধিক ভক্তি ও স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্গন্ধ ফুলের মত মমতাহীনা নারীর চিত্তকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। আমার স্নেহ-প্রতিমা বোনটি আপনার নির্ম্মল চিত্ত ও অসীম পর-দুঃখ-কাতরতায়, সুবাসিত কুসুমসৌরভের মতই, আমাদের গৃহ-ভূমিটিকে চির-প্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল।

রাত্রে বাটি ফিরিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তুমি কোনদিন রাত্রে কি ক্লুমবারের দিকে দেখেচ কখনো?"

আমি একটা ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে তখন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি এসথারের মুখে ক্লুমবারের কথা শুনিয়া বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া উত্তর দিলাম, "যেদিন জেনারেল আর ম্যাকলীন প্রথম বাড়ী দেখ্‌তে এসছিলেন, সেই রাত্রি ছাড়া আর কোন রাত্রে আমি ও দিকে চেয়ে দেখিনি। কেন বল দেখি?"

এসথার আমার টুপিটা আগাইয়া দিয়া হাতটা একটু আকর্ষণ করিয়া বলিল, "তবে একবার এস দেখি, দেখবে। একটু বেড়ানও যাবে।"

বাতির ছায়ায় তাহার মুখের ভাব ভাল বুঝা না যাইলেও, কথার ধরণে ও গলার স্বরে একটা কেমন সংবাদের যেন সূচনা পাওয়া গেল। কে জানে, কি এক অজ্ঞাতের নেশায় আমি

যেন কেমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তবু পরিহাসের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? কি হয়েচে, এসথার? হলে আগুন লাগেনি ত? তোমার গলার সুরটা এমন গম্ভীর হয়েচে যে আমার ভয় হচ্চে, সমস্ত উইগটাউন সহরটাতেই বুঝি আগুন লেগেছে!" ঈষৎ হাসিয়া এসথার উত্তর দিল, "রক্ষা কর! সে রকম সর্ব্বনাশ কিছু হয়নি অবশ্য! তবু একবার ওঠই না—কিই বা তোমার তাতে ক্ষতি হবে!" এ কথার পর এসথার মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "আচ্ছা দাদা, তুমি যে তামাসা করছিলে,—সমস্ত সহরটায় বুঝি আগুন ধরে গেছে—আহা, তোমার দুঃখ হয় না—? মা গো, দেশ-শুদ্ধ লোক পুড়ে মরবে—"

"দূর পাগলী! মুখে বল্লেই কি আর সত্যি সত্যি সহরে আগুন ধরে যায়!"

আমি বই রাখিয়া টুপিটা উঠাইয়া লইলাম, তাহার পর অন্ধকারে দুই জনে বাহিরে আসিলাম।

চারিধার তখন নীরব, জনহীন। অন্ধকারে জোনাকিগুলা গাছের মাথায় তাল পাকাইয়া দীপালীর দীপাবলীর মত মৃদু আলো বিকীর্ণ করিতেছিল,—আকাশ ভরা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একরাশি নক্ষত্রও ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। সেই অল্প-আলোয় সাবধানে মাঠের ভিতরকার সরু রাস্তা ধরিয়া এসথার অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল,—এ সব পথ তাহার নিত্যকার পরিচিত। খানিকটা পথ চলিয়া একটা উঁচু উই ঢিবির মত জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেখান হইতে হলটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এসথার বলিয়া উঠিল, "দাদা, দেখ্‌চ?"

চাহিয়া দেখিলাম, একটা তীব্র উজ্জ্বল আলোকে হল যেন জ্বলিতেছে! নীচেকার জানালাগুলা ক্ষুদ্রাকৃতি, সে জন্য সেখানে আলোটুকু অস্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতল হইতে সমুচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহের সুবৃহৎ জানালা দিয়া উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। সে আলোক এত তীব্র যে প্রথম দৃষ্টিতে আমার ভ্রম হইয়াছিল, বুঝি টাওয়ারে সত্যই আগুন লাগিয়াছে! কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম ভাল ভাল লণ্ঠন ও বড় বড় ল্যাম্প প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক জানালায় যে লণ্ঠন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ তীব্র উজ্জ্বল আলোক তাহারই। তবে আশ্চর্য্য এই যে, যদিও বাড়ীটাকে আলোর মালা পরাইয়া দিবালোকের মত করিয়া তোলা হইয়াছে, তথাপি তাহার অধিকাংশ কক্ষই জনহীন, এমন কি বহুসংখ্যক কক্ষই নিরাভরণা নারীর মত একেবারে সজ্জাহীনা। অত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটায় মনুষ্য-বাসের কোন চিহ্ন আছে বলিয়াও বাহির হইতে মনে হয় না। কেবল সেই নিবাত-নিষ্কম্প দীপমালা বক্ষে ধরিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী উন্নত শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিশাচর কৌতূহলী পথিকের মনে কেবল অজ্ঞাত রহস্যের নূতন আভাষ জাগাইয়া তুলিতেছিল। আমি অবাক হইয়া শুধু সেই আলোক-মালার পানে চাহিয়া রহিলাম। "এ কি রহস্য! বিপদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিতে এ কি উৎসবের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া তোলা!"

অতি নিকটে ব্যথিত নিশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। "এসথার, ভয় পেয়েচ?"

"চল দাদা, আমরা বাড়ী ফিরে যাই। কে জানে, কেন, আমার বড় ভয় হচ্চে।"

এ পর্য্যন্ত এসথারকে ক্রুমবার হল সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলি নাই। কি জানি, ছেলেমানুষ! হয়ত সে ভয় পাইতে পারে! তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য আমি হাসিয়া বলিলাম, "কিসের ভয়! ভয়ের কি পেলে, শুনি? এমন আলো,—আনন্দ করবারই ত কথা।"

"আমি কিছুই বল্‌তে পারচি না, দাদা! কিন্তু জেনারেলের জন্য সত্যই আমার বড় কষ্ট হচ্চে। কেন, তিনি এমন করে বাড়ীর চারিদিকে আলো জেলে দিনের মত করে রাখেন? রাত্রিকে তাঁর কিসের এত ভয়? আমাদের পাড়াতেও সবার কাছে শুনেচি, এঁরা নিত্যই শুধু-শুধু এম্‌নি আলো জেলে রাখেন। কোন লোক দেখা কর্‌তে গেলে ভয়ে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করেন। নিশ্চয়ই তাঁর জীবনের সঙ্গে এমন কোন ভয়ানক ঘটনা জড়িত আছে, যার জন্যে তাঁকে এমনি ভাবে থাক্‌তে হয়েচে। কত বড় বড় যুদ্ধের যোদ্ধা,—তাঁর এই দশা! দাদা—এ কি কম দুঃখের কথা! সত্যই আমার তাঁর জন্যে কান্না পাচ্চে।"

করুণাময়ী নারী! কঠিন-চিত্ত পুরুষ আমরা, তাই তোমাদিগকে তুচ্ছ ভাবিয়া নিজের জ্ঞানের বড়াই করিয়া বেড়াই! সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না, নীরবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহের পথে ফিরিলাম। জেনারেলের সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ আমি জানি, ইচ্ছা করিয়াই তাহা ভাঙ্গলাম না। সে-ও নিজে হইতে আর কোন কথা তুলিল না। আমার মনে হইল, শুধু আলো দেখিয়াই হয়ত সে ভয় পায় নাই! তাহার ভক্তবৃন্দ দরিদ্র চাষাভুষাদের নিকট হইতে হয়ত সে আরও কোন নূতন তথ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে তাহার কোমল হৃদয় একটা বেদনাতুর হইয়াছে! অবশ্য পরে জানিয়াছিলাম, আমার সে অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে।

প্রথমতঃ আমাদের এই নূতন প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহলই তাঁহাদের প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী করিয়া তুলিলেও পরে তাঁহাদের সহিত আমাদের এমন ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, যে আমরা আর শুধু কৌতুকাবহ রহস্যের দর্শকমাত্র না থাকিয়া তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সম্পূর্ণভাবেই জড়াইয়া পড়িলাম। মরডণ্ট আমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নাই। সুবিধা পাইলেই সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসিত। অনেক সময় তাহার সুন্দরী ভগিনীটিকে সে সঙ্গে আনিতে ভুলিত না। আমরা চারি জনে মাঠে-বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মেঘ-নির্ম্মুক্ত দিনে সমুদ্র-বক্ষে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইয়া আসিতাম। কখনও বা জলে ছিপ ফেলিয়া মরডণ্ট ও আমি মাছ ধরিতাম; আর গেব্রিয়েল, এষ্থারের নিকট তাহার নূতন নূতন পাঠের পরীক্ষা দিয়া প্রতিদানে করুণাময়ী এসথারের নিকট হইতে প্রচুর আদর পাইয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিত। ক্বচিৎ আমার প্রসংশমান

দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইলে বালিকার ললাট হইতে গণ্ড অবধি যেন রক্ত উছলিয়া পড়িত। বাস্তবিকই তাহাদের মেধা অসাধারণ ছিল। যে শিক্ষা লাভ করিতে সাধারণের এক মাস সময় লাগে, ইহারা তাহা এক সপ্তাহের অনধিক কালেই আয়ত্ত করিয়া ফেলে! এমন মণিকে খনির তিমির গর্ভে জেনারেল প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন! কস্তরী-মৃগ যেমন আপনার সৌরভ-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, শিশুর মতই সংসার-জ্ঞান-অনভিজ্ঞ এই দুইটি ভাই-বোনও তেমনি আপনাদের সৌন্দর্য্য-সদ্‌গুণের সীমা-নির্দ্ধারণে অনভিজ্ঞ। বিলাসিতা বা কৃত্রিমতা-হীন নির্ম্মল দুইটি মানব প্রাণ সংসারের বাহিরে অত্যন্ত গোপনে বর্দ্ধিত হইয়া সংসারের পাপ কুটিলতার অন্তরালে বাস করিতেছিল! অনেক সময় সেই দুইখানি সরল মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইত, তাহারা সেই আদি কালের আদম ও ইভের মতই যেন অন্য জগতে বাস করিতেছিল, বুঝি, জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া আমরাই তাহাদিগকে সংসারের উত্তপ্ত মরু-বাতাসের মধ্যে টানিয়া আনিতেছি।

কিন্তু আমার কল্পনা আমাকে পীড়িত করিলেও বাস্তবিক আমাদের সঙ্গ তাহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হয় নাই। মুক্ত আকাশের তলে, সীমাহীন নক্ষত্র-চন্দ্রাতপ-খচিত প্রান্তরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে, তরঙ্গ তাড়িত সমুদ্র-বক্ষে সায়াহ্ন-সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে নৌকা-ভ্রমণে,—কখনও সোনালী রৌদ্র-রঞ্জিত, বিহঙ্গকুল-কাকলিত, মৃদু পবন-সঞ্চালিত, চেরি ফুলের সুগন্ধ-পূরিত সুমধুর প্রভাতে আমাদের ছোট বাগানটিতে পরস্পরের সহিত হাত-ধরা ধরি করিয়া গল্প করিতে, তাহাদের বাধাহীন সরল আনন্দ, পুষ্পগন্ধের মতই উচ্ছ্বসিত আবেগে ঝরিয়া পড়িত। বন্দী-শালার প্রহরী-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া চির-কারাবাসীর যে আনন্দ, খোলা মাঠের খোলা বাতাসে মুক্ত আকাশের নীচে উড়িয়া বেড়াইতে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের যে সুখ, স্বাধীন জগতের স্বাধীন জীব আমরা, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। আমাদের বন্ধুত্ব এমনই ভাবে ক্রমে গভীর ভালবাসায় পরিণত হইয়া আসিল।

নিজেদের কথা অন্তর-মধ্যে গোপনে রাখিতে হইলেও সাধারণকে এইটুকু জানাইয়া রাখা প্রয়োজন যে, ইতিমধ্যে গেব্রিয়েলের সহিত আমার এবং মরডন্টের সহিত এস্‌থারের ভবিষ্যৎ জীবনের বন্ধন বেশই দৃঢ় সূত্রে জড়িত হইয়া গিয়াছিল, আর এ বন্ধনে চির কালের মত আবদ্ধ থাকিবার জন্য আমরা পরস্পরের ভগবানের নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলাম।

জেনারেলের সহিত আমাদের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল, ইহা হইতেই বোধ হয় সকলে তাহার পরিচয় পাইবেন।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে মরডণ্ট ও গেব্রিয়েল সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। আমরাও সুবিধামত তাঁহাদের বাটীর বাহিরে সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করিতাম। জেনারেলের বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ইদানীং আর এ সকল সংবাদ রাখিবার অবসর পাইতেন না।

প্রথম দিন আলাপের পর হইতেই বাবা তাহাদিগকে ঠিক আমাদের মতই স্নেহ

করিতেন। তাঁহার নিকট আমাদের কোন কথাই গোপন ছিল না। আজকাল আবার তিনি প্রাচ্য কবিদের দুই একটি সময়োচিত কবিতা দ্বারা আমাদের নবীন মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া স্নেহ-মিশ্র দুই চারিটা মিষ্ট পরিহাসও করিতেন; সময় সময় যখন জেনারেলের খেয়াল সজাগ হইয়া উঠিত, তখন মরডণ্ট বা গেব্রিয়েল কেহই গৃহের বাহির হইতে সাহস করিত না। কোন কোন দিন তিনি ফটকে চাবী দিয়া নিজেই বাড়ীর চারি দিকে প্রহরীর কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন। কোন দিন বা রাস্তার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ সন্দেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বাড়ীর পানে চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহার তখনকার ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইত যে তিনি তাঁহার বাড়ীর লোকগুলিকেও ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন! তাহারা হয়ত গোপনে বাহিরের লোকদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক এক দিন হলের পাশ দিয়া কোথাও কোন কাজে যাইবার সময় দেখিতাম, জেনারেলের শীর্ণ মুখ, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক ভেদ করিয়া আমারই প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে! কখনও বা তিনি অন্ধকারে গাছের তলায়-তলায় সতর্ক লঘু গতিতে বেড়াইতেছেন! তাঁহাকে দেখিলে একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার সারাচিত্ত ভরিয়া উঠিত। তাঁহার সেই ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, ব্যাকুল দৃষ্টি, চিন্তা-কাতর বিবর্ণ মুখশ্রী, ও কুঞ্চিত ললাটে মানসিক চিন্তার সুগভীর রেখা—সে সব দেখিলে কে বলিবে যে এই সদা-শঙ্কিত দুর্ব্বল-চিত্ত মানবই একদিন রণ-ক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইত—হায়,—হতভাগ্য, অসুখী জীব!

সন্দিগ্ধচেতা বৃদ্ধের সহস্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের মিলনে এতটুকু বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নাই। হলের চারিধারে যে কাষ্ঠ প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই দুইখানা তক্তার জোড় একটু শিথিল ছিল, বহু চেষ্টায় তক্তা দুইখানা খুলিয়া আমরা সেই দ্বারপথে যাতায়াত করিতাম, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তক্তা দুইখানা সাবধানে যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া রাখিতাম। বাড়ীর চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ানোতে জেনারেলের কোন আলস্য ছিল না, তাই সর্ব্বদাই আমাদের মনে একটা ভয় ছিল, কখন কোথায় তিনি আসিয়া পড়িবেন! তাহার কোন স্থিরতা ছিল না! কাজেই আমাদের গোপন সাক্ষাৎটুকু তাঁহার বাতের বেদনা কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল।

সে সব দিন এখনও কেমন স্পষ্ট আমার মনে জাগিয়া আছে! যে ভয়ানক ঘটনা আমাদের মাথার উপর দিয়া অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর ন্যায় আকস্মিক মহাপ্রলয়ের ভীষণ বজ্রসংঘাত আনিয়া দিয়া জীবনের অনেকখানি অংশকে একেবারে বিদগ্ধ করিয়া গিয়াছে, সেই ভয়ানক ঘটনার অস্পষ্ট ছায়ায় দাঁড়াইয়াও আমাদের তখনকার সেই ছোটখাট মিলনের দিনগুলি কত সুখ-স্বপ্নই না বহন করিয়া আনিত! কঠিন মাটির উপর ঘর বাঁধিয়া মানুষ বেশ সুখে নিশ্চিন্ত মনে ঘরকন্না করে, সহসা কোথা হইতে অভাবনীয়ভাবে

ঝড় আসিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার সে ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত সমভূমি করিয়া দিয়া যায়। বাহ্য প্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয়, তাহা নহে—মানব-জীবনেও সন্ধান করিলে এমন কত শত দৃষ্টান্ত মিলে। যে অতীত সরসী-সলিলে আমরা পূর্ব্বস্মৃতি নিমজ্জিত রাখি, তাহার জলরাশি বড় অল্প আলোড়নেই আবিল হইয়া উঠে;—তখন কেবল একটা বুকভাঙ্গা বেদনার হাহাকার, একটা অস্পষ্ট আকুলতাই অবশেষ রহিয়া যায়। যদিও আমাদের তখনকার অতীত জীবনে দুঃখের ভীষণ ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, যদিও প্রলয়নিশির গভীর অন্ধকারে আমরা তলাইয়া গিয়া ভাবিয়াছি, বুঝি, ইহাই শেষ, তথাপি যে করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মে দিনের পর রাত্রি, আলোর পর অন্ধকার, সেই পরমেশ্বরই দুঃখের মধ্যে সুখের স্মৃতি আমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার মনে পড়ে, যখন আমি মাঠের মধ্যে আলের উপর দিয়া ব্যগ্র আগ্রহ বক্ষে বহিয়া ধীরে ধীরে ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হইতাম, নলকর্ষিত ভূমির একটা সলিলসিক্ত আর্দ্র গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিত; ভিজা ঘাসের মধ্য হইতে কোন্ এক চারাগাছের সদ্য-ফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিত। জেনারলের বাগানে সায়াহ্নে বৃষ্টির জলে-ধোয়া সবুজ গাছপালার মধ্যে সাদারাঙ্গা মণিগাঁথা ফুলের শোভা দূর হইতে চোখে পড়িত। আর দেখিতাম, বেড়ার উপর হাত রাখিয়া গেব্রিয়েল তাহার নীল চোখের কোমল দৃষ্টি লইয়া পথের দিকে চাহিয়া নীরবে আমার প্রতীক্ষা করিত। পালে বাতাস লাগিলে তরণীর গতি যেমন ক্ষিপ্র, চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার সমস্ত অন্তরাত্মাও তেমনি চঞ্চলভাবে তাহার অভিমুখে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাইতে চাহিত।

কতদিন আমরা একত্রে মুগ্ধ নেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতাম। দিগন্তব্যাপী নীলাম্বুরাশি, ফেনশীর্ষ, শুভ্র তরঙ্গে সে নীল বক্ষ খচিত। জ্বালাহীন রক্ত গোলকাকার সায়াহ্ন-সূর্য্য সেই নীলাম্বুরাশির নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। দিগ্বলয়ের মধ্যস্থলে কেবল এই একটি মাত্র বিন্দু,—মহান্ বিশ্ব-রাজ্যের এক ক্ষুদ্রতর অণুকণা চতুর্দ্দিকের নীলিমার মধ্যে কৃষ্ণ-তারকার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। শ্বেত ফেনরাশির মুখে গোধূলির গোলাপী আলোক ক্রমে ধূসর বর্ণে পরিণত হইয়া আসিত। এবং উত্তর-পশ্চিমে অতিদূরে থাষ্টন পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তরেখা মিলাইয়া যাইত। সমুদ্র-বক্ষে বেলফাষ্টগামী অর্ণবযান বিস্তারিত পক্ষ চঞ্চল পক্ষী-শিশুটির মতই কৃষ্ণ ধূম উড়াইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যাইত। এই সকল শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে দুইজনে আত্মহারা হইয়া থাকিতাম! দেখিতে দেখিতে গেব্রিয়েল্ কখনও বলিয়া উঠিত, "জন, কি সুন্দর—কি মধুর, এই প্রকৃতির রাজ্য! আমরা যদি সব বিপদ-আপদ টেনে ফেলে দিয়ে এমনি আনন্দে এমনি স্বাধীনভাবে সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মত খেলা করতে পেতেম!"

একদিন আমি এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিপদ্-আপদ তুমি

ঝেড়ে ফেল্‌তে চাইচ, বেলা? আমি কি তোমায় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার অধিকার, এখনও পাইনি? তোমার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করবার কি আমার কোন অধিকার নেই?" সুগভীর বিষাদের ছায়া বালিকার ম্লান নেত্রে প্রতিভাত হইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে কহিল, "তুমি ত জান, তোমার কাছে আমার কোন কথাই গোপন নেই—বাবার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্যই আমাদের কত কষ্ট! ভেবে দেখ দেখি, এ কি কম দুঃখ,—যিনি একদিন মহাবীর নাম গ্রহণ করে জগতের মধ্যে সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই আজ যেন কোন ভীষণ অপরাধে অপরাধীর মত সংসারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করে, প্রাচীর-বেষ্টনের সংকীর্ণ সীমানায় আপনাকে রুদ্ধ রাখবার চেষ্টা করচেন, পৃথিবীটা যেন তাঁর চোখ থেকে মুছে গিয়ে একটুখানি সীমাবদ্ধ ভূমিখণ্ডে পরিণত হয়েছে!"

বালিকার কম্পিত রুদ্ধ স্বরে এবং অশ্রুগোপনের অভিপ্রায়ে সহসা মুখ ফিরাইয়া লওয়ায়, আমার মনের বেদনাহত স্থানটায় আরো আঘাত লাগিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আমি জিজ্ঞাসা লাম, "আচ্ছা, গেব্রিয়েল, তুমি কি মনে কর, তোমাদের বিপদটা সত্য!"

"তা আমি জানি না।"

আমি বিস্ময় গোপন করিতে না পারিয়া সহসা বলিলাম, "কিন্তু তোমার দাদা ত সবই জানেন?"

বালিকা শান্তভাবে উত্তর দিল, "তা জানেন,—মাও জানেন,—আমার কাছে তাঁরা বরাবরই সব গোপন করে থাকেন। আজকাল বাবার চাঞ্চল্যটা এত বেশী হয়েছে—যে তিনি যেন দিনরাত ভয়ে একবারে অজ্ঞান হয়ে রয়েচেন। সামনেই ৫ই অক্টোবর। সে তারিখটা চলে গেলে তবে তিনি আবার অনেকটা শান্ত হবেন!"

সমস্যা ক্রমেই যেন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া আসিতেছিল। এও এক নূতন তথ্য! বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বল্লে, গেব্রিয়েল—৫ই অক্টোবর?"

ম্লান মুখের নত দৃষ্টি ধীরে ধীরে উন্নমিত করিয়া গেব্রিয়েল উত্তর দিল, "তাই যে আমি বরাবর দেখে আসচি। ৫ই অক্টোবর এলেই বাবার ভয় যেন চরমে এসে দাঁড়ায়। আমার বেশ মনে আছে, এই ৫ই অক্টোবর দাদাকে আর আমাকে বাবা চাবি বন্ধ করে রেখে দেন, সে জন্যে সেদিন যে কি ঘটনা ঘটে, আমরা তা কিছুই জান্‌তে পারি না। কিন্তু জন্, এটা আমরা বেশ লক্ষ্য করেচি যে, ঐ দিনটার পর থেকে ফিরে ঐ তারিখ না আসা পর্য্যন্ত বাবা অনেকটা ভাল থাকেন। এখন ত সেপ্টেম্বরের শেষ! অক্টোবরের আর বড় বেশী দেরি নেই।"

গেব্রিয়েলের কথায় আমার চিত্তে বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। আমি কহিলাম, "৫ই অক্টোবরের ত আর মোটে দশ দিন বাকী,—আচ্ছা গেব্রিয়েল, তোমাদের সমস্ত অনাবশ্যক ঘর গুলোতে পর্য্যন্ত রাত্রে অত আলো জ্বালা থাকে, কেন, বল দেখি?"

বিষাদের ক্ষীণ হাসি গেব্রিয়েলের সূক্ষ্ম ওষ্ঠ-পুটে ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল। "তাহলে সেটাও তুমি লক্ষ্য করেচ জন। এও বাবার একটা ভয়ের চিহ্ন। সমস্ত বাড়ীতে কোথাও তিনি এতটুকু অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না; চাকরদের উপর কড়া হুকুম, সন্ধ্যার আগেই উপরে-নীচে সমস্ত ঘর-বারাণ্ডা-জানলা চারদিকে আলো দিয়ে একেবারে দিনের বেলার মত করে তুলতে হবে। বাবা নিজেই রোজ চারদিকে তদ্বির করেন,—হুকুম ঠিক্-ঠিক্ তামিল হচ্চে কি না!"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তোমরা যে চাকর-বাকর টিকিয়ে রাখ্‌তে পার— এই-টুকুই সব চেয়ে আশ্চর্য্য! ছোটলোকেরা একেই ত কুসংস্কারে ভয়ানক আচ্ছন্ন, তার উপর এ সব জিনিষ তাদের জ্ঞানের বাইরে, তারা যা বুঝ্‌তে পারে না—তা আবার একেবারেই তারা সহ্য করতে পারে না।"

আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ম্লানিমা বালিকার ম্লান মুখের উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল,—একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে উত্তর দিল, "আমাদের ঝি রাঁধুনী —তারা অনেক দিনকার পুরোনো লোক। আমাদের ধরণধারণের সঙ্গে তারা একেবারেই মিশে গেছে। তা ছাড়া নূতন যারা থাকে, বেশী মাইনে দিলে এক রকম করে চলে যায়। এখানকার লোকের মধ্যে—এক ঐ ইজরেল্‌টেক কোচ্‌ম্যান,—ও লোকটা ত বেশ সাহসী, সৎ; তবে একটু বোকাটে ধরণের বলেই মনে হয়।"

আমি আমার পার্শ্বস্থিতা সুন্দরী তরুণীর পানে চাহিয়া দেখিলাম। নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ছবি! সংসারানভিজ্ঞ অকৃত্রিম সরলতার স্বচ্ছতা তাহার সেই মুখখানিকে যেন চিত্তের দর্পণ-স্বরূপই করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি পিঞ্জরের পাখীর মতই একটা উদ্বেগ কাতর ব্যাকুলতা তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন দুই ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া আমারই পানে ছুটিয়া আসিতেছিল! যেন তাহার সারা চিত্ত ব্যথিত বেদনায় বলিতে চাহিতেছিল, "ওগো! আমায় স্বাধীনতা দাও, আলো দাও, মুক্তি দাও—আমি বুঝি হাঁফাইয়া মরি!"

কতকটা আত্ম-বিস্মৃতভাবেই আমি বলিলাম, "গেব্রিয়েল, এ তবে তোমার থাক্‌বার মত স্থান নয়। তোমার এ অবস্থা থেকে তোমায় উদ্ধার করবার অধিকার কেনই বা তুমি আমায় দিচ্চ না? আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমায় ভিক্ষা করে চেয়ে নি—!"

শরাহত মৃগ-শিশুর ন্যায় সে চমকিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, তাহার বিবর্ণ নীল ঠোঁট দুইখানি অব্যক্ত বেদনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কম্পিত স্বরে ব্যথিত বালিকা কহিল, "ক্ষমা কর, জন, এমন কাজও তুমি করো না, কখনো;—তা হলে কি হবে জান? সেই রাত্রেই, বাব আমাদের নিয়ে চলে যাবেন,— কোথায়—ঈশ্বর জানেন, কোথায়! কতকাল ধরে কত দেশ ঘুরে তিনি আমাদের নিয়ে এমন কোন বন্ধুহীন নির্জ্জন পুরীতে কঠোর শাসনে বন্দী করে রাখবেন, যেখানে একটা পাখীর মুখেও তোমাদের কোন সংবাদ পাব না। চোখের

দেখা,—সে-ত একেবারেই অসম্ভব! মনে ভেবে দেখ দেখি—সে আমাদের কি জীবন্মৃত হয়ে থাকত হবে!—কি ভয়ানক! আমি ত কল্পনা করতেও পারি না। তা ছাড়া এই যে তাঁর বিনানুমতিতে বাড়ীর বাইরে যাতায়াত—বাইরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করি,—এ অপরাধ জানতে পারলে তিনি ক্ষমা করবেন না, কখনই না।"

আমি একটু অবিশ্বাসের সহিত উত্তর দিলাম,—"কৈ, তাঁকে দেখে ত তেমন নিষ্ঠুর বলে মনে হয় না। আমি দেখেচি, বাইরে থেকে তাঁর মুখের ভাব যতই কঠোর দেখাক, ভিতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত একটি কোমলতার ক্ষীণ নির্ঝর-ধারা যে বয়ে চলেছে, তার বেশ আভাষ পাওয়া যায়।"

দুই হাত অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া যেন আপনার উদ্বেলিত অন্তরের উচ্ছ্বাস রোধ করিতে করিতে বালিকা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না, না, জন্! বাবাকে তুমি ভুল বুঝ না, সত্যই তিনি নিষ্ঠুর নন,—তাঁর স্নেহ অগাধ! কিন্তু তবুও যদি কেউ তাঁর অমতে কোন কাজ করে বা তাঁর কাজে বাধা দেয় তা হলে তিনি তা কোন মতেই সহ্য করতে পারেন না; তখন তিনি এত ভয়ানক রেগে ওঠেন যে সে বলা যায় না। সে রকম রাগ তুমি তাঁর কখনও দেখনি! ঈশ্বর করুন, যেন কখনও তা দেখ্‌তেও না হয়! তিনি নিজে কখনও কোন অন্যায় করেন নি তাই অপরের অন্যায়ও কখনও সহ্য করতে পারেন না। এই দৃঢ়তাই তাঁকে কঠোর দায়িত্বপূর্ণ সৈনিক জীবনে উন্নতির শীর্ষ সীমায় তুলে দেবার সহায় হয়েছিল। গল্প মনে করো না, আমি যথার্থই বলচি, ভারতবর্ষে সকলেই তাঁকে খুব মহৎ লোক জেনে সম্মান করত। সৈন্যরা তাঁর আদেশে হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে এতটুকু ইতস্তত করত না।"

"আচ্ছা! বল দেখি, তখনও কি তাঁর এই রকম উদ্বেগ, ভয়, কি চাঞ্চল্য ছিল;"

"কখনও কখনও হত বৈ কি,—কিন্তু এতটা নয়; তাঁর বিশ্বাস বিপদটা এবার ক্রমেই এগিয়ে আস্‌চে। মাথার উপর খোলা তলোয়ার যেন ঝোলান রয়েছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তার পতন-সম্ভাবনা! কি ভয়ানক, বল দেখি! আমার পক্ষে সব চেয়ে কষ্টকর এই যে, বিপদটা কোন্ দিক থেকে আস্‌বে, তা জানা দূরে থাক,—তার ছায়াটুকু অবধি আমি ধরতে পারচিনে।"

প্রিয়তমার হৃদয়-বেদনা আত্ম হৃদয়ে অনুভব করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। বালিকার ব্যথা-কাতর অন্তরে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে একটু নিকটে টানিয়া সস্নেহে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "গেব্রিয়েল,—আমাদের মাথার উপর ঐ যে নীল নির্ম্মল আকাশ, সম্মুখে তরঙ্গোচ্ছ্বাসময় ফেনপুঞ্জকিরীট দিগন্ত-বিস্তৃত বারিবিশাল মহাসমুদ্র, আর পদতলে এই যে সবুজ মখমলের আস্তরণ-বিছানো হাস্যময়ী ধরণী, এ সব কি সুন্দর! কি শান্তিময়! এই আনন্দ-পূর্ণ জগতে এই অকারণ উদ্বেগ কেন, গেব্রিয়েল? ঐ ধূসর মাঠের মাঝখানে লাল টালিতে-ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলির পানে চেয়ে দেখ,—ওখানে যত সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের বাস। দেশে

ওদের কেউই শত্রু নেই, নিজের পরিশ্রমে ওরা খায়। আমাদের এখান থেকে সাত মাইলের মধ্যে একটি বড় সহর আছে,—শান্তি-রক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সমস্তই সেখানে মজুত,—সেখান থেকে দশ মাইল তফাতে একটা ছাউনি। একটি টেলিগ্রাফের অপেক্ষা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে একদল সৈনিক এখানে এসে হাজির হতে পারে। এখন বেশ করে ভেবে বল দেখি, এই যে নির্জ্জন প্রদেশ, এখানে তোমাদের বিপদের কী সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে? তুমি কি জোর করে বল্‌তে পার এই যে বিপদ-সম্ভাবনা,—এটা তোমার বাবার একটা মনের খেয়াল মাত্র নয়?"

"আমি তোমায় নিশ্চয় বল্‌তে পারি, জন্, এটা একেবারে যে কল্পিত বিপদ তা নয়। যদিও ডাক্তার ডেয়ারি বাবাকে দু-একবার দেখতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সেটা সাধারণ অসুখের জন্যে।"

আমার অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহারই বলে একটু হাসিয়া আমি বলিলাম, "তা হলেও আমি তোমায় শপথ করে বল্‌তে পারি, তোমাদের কোন বিপদ ঘট্‌বে না;—এটা নিশ্চয়ই কোন মানসিক ব্যাধির ফল। সত্য যদি এতে কিছুমাত্র থাকত, তা হলে এতদিনে তুমি কোন-রকমে না-কোন-রকমে তা জান্‌তে পার্‌তেই।"

আমার এ সান্ত্বনার ভাষায় গেব্রিয়েলের মুখ হইতে বিষণ্ণতার ছায়া অপসারিত হইল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে সে উত্তর দিল, "যদি এটা বাবার মনের বিকারই শুধু হয়, সত্যি এতে কিছু না থাকে, তা হলে দাদা এই অল্প বয়সে কেন অমন বুড়ো হয়ে গেলেন? আর মা? তাঁর অমন সুন্দর চেহারা ভয়ে-ভাবনায় শুকিয়ে যেন কি হয়ে গেছে!—এ সবই কি তুমি খেয়াল বল্‌বে?"

"অসম্ভব মনে কোরো না, গেব্রিয়েল! তোমার বাবার দীর্ঘকাল-ব্যাপী মানসিক ব্যাধি দেখে-দেখে, আর তাঁর এই কোপন স্বভাব সহ্য করে করে—তাঁদেরও মনের ভাব এই রকম হয়ে পড়েচে। সর্ব্বদা সাপ সাপ শুনতে শুনতে, রজ্জুতেও মানুষের সর্প-ভ্রম হয়, জান ত। সেই রকম সর্ব্বদা বিপদের সম্ভাবনার কথা শুনে শুনে এখন ওঁরাও সেটাকে প্রকৃত বলে মেনে নিয়েচেন।"

সজল চক্ষে, মৃদু-নিক্ষিপ্ত শ্বাসে বালিকা উত্তর দিল, "না জন্—তা নয়। বাবার ভয় আর রাগ, দুই-ই ত আমি বরাবর দেখে আস্‌চি; তবে আমি কেন মার মত বা দাদার মত বুড়ো হয়ে যাইনি? তার কারণ, ওঁরা যা জানেন, সেই ভয়ানক কথা,—আমি তা জানি না।"

বালিকার যুক্তিপূর্ণ কথার উপযুক্ত উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া, শুধু তাহাকে শান্ত করিবার ইচ্ছায় আমি একটু হাসিয়া উত্তর দিলাম, "তোমাদের এই 'বিপদ'টা যেন একটা ভৌতিক ব্যাপারের মত বলেই আমার মনে হয়, তবে সুখের বিষয়, আজকালকার দিনে ভূতে আর বড় মানুষের পেছু নেয় না। সভ্য সমাজের ভূতেরাও ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠচে কি না! ভারী লজ্জার কথা গেব্রিয়েল, যে, তোমরাও এ সব কুসংস্কার মেনে চল। আমায় বিশ্বাস কর বেলা! আমি বল্‌চি, তোমাদের

বিপদ বলে কোন জিনিষ পৃথিবীতে নেই, ভারতবর্ষের তপ্ত আগুন হাওয়াতেই তোমার বাবার এই মস্তিষ্ক বিভ্রাট ঘটেছে।"

আমার কথার সে কি উত্তর দিত, জানি না; সহসা চমকিয়া সে একদিকে তাহার শঙ্কিত স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি দেখিলাম, তাহার মুখ পাংশু, নীল হইয়া গিয়াছে—চোখের দৃষ্টি দারুণ ভয়ে স্থির হইয়া পড়িয়াছে—সবিস্ময়ে তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম,—কি সর্ব্বনাশ! ভয়ে আমার অন্তরাত্মা অবধি কাঁপিয়া উঠিল।

বেড়ার ভিতরকার ফাঁক দিয়া আমি দেখিলাম, আমাদের অদূরে একটা ঝাউগাছের তলায় কে-একজন দাঁড়াইয়া আছে। লোকটির মুখের যতটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা হইতেই বেশ বুঝিলাম, একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার মুখখানা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা তাঁহাকে দেখতে পাইয়াছি বুঝিতে পারিয়া তিনি বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঠিক আমাদের সম্মুখেই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্দেহ ভীষণ সত্যে পরিণত হইয়া উঠিল। তিনি আর অপর কেহই নহেন, স্বয়ং গৃহস্বামী জেনারেল হিথারষ্টন। ক্রোধে তাঁহার মাথার চুলগুলা অবধি খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বকালে প্রাচ্য দেশের সাধুদের চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নাকি মনুষ্য-দেহ দগ্ধ হইয়া যাইত। তখন তাহা গল্প-কথাই মনে করিয়াছিলাম। আজ সহসা সেই কথা আমার স্মরণ হইল। দৃষ্টির যদি দাহিকা-শক্তি একালেও থাকিত, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি—তাঁহার সেই প্রখর দৃষ্টির অনলে আমি তখনই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতাম! ভয়ে আমার দেহের রক্ত-স্রোত সহসা যেন নিশ্চল হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

প্রাক্ ঐতিহাসিক অতিকায় জন্তু

হেম্বার্গের সন্নিকটে ষ্টেলিঞ্জেন নামক স্থানের প্রাণি-বাটিকায় পুরাকালের পৃথিবীর যাবতীয় ভয়াবহ ও বিস্ময়কর জীবজন্তুর কল্পিতমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মাত্র তিন বৎসর হইল এই বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ইহার নাম ভুবনখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির কুসুমরাগধূসরিত শ্যামল শোভাময় হেম্বার্গের উপবনে এই প্রাণীভবন অবস্থিত। কোথাও বা ফোয়ারা-উদ্বেলিত মায়াসমুদ্রে পুরাপ্রাণীর দন্ত, কোথাও বা তাহার স্কন্ধাগ্রভাগ কথঞ্চিৎ ভাসিয়া উঠিয়াছে, আবার মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলিত তরঙ্গভঙ্গে কোথাও লুকাইয়া যাইতেছে! কোথাও কুমুদকহ্লারকুঞ্জের আশে পাশে কোনও প্রাচীন সর্প ধীরে ধীরে লতামণ্ডপ পরিবেষ্টনের প্রয়াস পাইতেছে, ব্যর্থকাম হইয়া ফণা বাহিয়া নিম্নে ঝুঁকিয়া যাইতেছে, আবার কোথাও শ্যামলবল্লরীশোভিত কুঞ্জতোরণের ফাঁক দিয়া কোন অতিকায় জন্তুর অতি বিশাল মস্তকের বিরাট ছায়া যেন চক্রবাল রেখায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই কৃত্রিম প্রাণীদিগকে দেখিলে মানুষের ভাস্কর্য্য বা

খোদিত শিল্প কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহা ভাবিয়া মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়।

এই প্রাণী-ভবনের শ্যামশষ্পাস্তৃত সরোবর-তীরে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় কত অপরিচিত তৃণভোজী জন্তু যেন কোমল কচি ঘাসের সন্ধান পাইয়া অনেক দূর হইতে —যুগযুগান্তরের বিস্মৃতির গর্ভ হইতে—উঠিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কাহারও দৃষ্টি বিস্ময়বিস্ফারিত—কেহ বা নয়ন ভরিয়া আহারীয় সামগ্রীর শোভা দেখিয়া লইতেছে, আবার কেহ কেহ অতি তৎপরভাবে উদর পরিতৃপ্তি করিতে ব্যস্ত।

হেম্বার্গের এই যাদুঘরের যিনি যাদুকর তাঁহার নাম পলেনবার্গ;—ইঁহার সুনিপুণ ভাস্কর্য্যখ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত। ইঁহার কৃতিত্বে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অতিকায় জন্তু—যাহারা ধ্বংস ও বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার দর্শকের চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই যাদুঘরে বহুবর্ণ ও বিচিত্র ডিনোসোর নানা অবস্থায় কুঞ্জকুটীরের বৃক্ষপার্শ্বে সবুজ ঘাসের উপরে স্থাপিত রহিয়াছে—তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইগুয়েনোডোন্ যেন নিতান্ত সরলভাবে একত্র বিচরণে প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ফুট হইবে; সেই জন্য তুলনায় পার্শ্বের বৃক্ষ গুলিকে নেহাৎ খর্ব্বাকৃতি ও ছোট বলিয়া অনুমিত হয়। অপর পার্শ্বে অধিকতর স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে ডিপ্লোডকাস্; দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট ও উচ্চতায় ১৮ ফুট বলিয়া বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিকায় প্রাণী হস্তীকে ইহার নিকট হার মানিতে হয়; আধুনিক বৃহৎকায় হস্তীকে ডিপ্লোডকাসের তুলনায় একটি বামন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ষ্টেগুসেয়ুরাস্ নামধেয় প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিনবত্ব স্বতঃই মন আকৃষ্ট করে;—ইহার পৃষ্ঠদেশ হাড়ের পাটীদ্বারা আবৃত এবং পুষ্পমঞ্জরী পরিশোভিত। ট্রিসেরেউপস্ আর এক প্রকারের অদ্ভুত জন্তু। ইহার মুখের উপরিভাগে তিনটি শিং খুব খাড়া ভাবে গজাইয়াছে; কণ্ঠের শোভা আরও অদ্ভুত, যেন পুষ্পমঞ্জরীবেষ্টিত হাঁসুলি পরিয়াছে! এতদ্ভিন্ন ইহাদের পার্শ্বে সুথ, ভোডো এবং ম্যামথ্ প্রভৃতি বিচিত্র জন্তুর সমাবেশ দেখিয়া মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এইখানে অদ্ভুত ডানা-



ষ্টেগুসেয়ুরাস্

সংযুক্ত অতিকায় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীর আরও সুন্দর। কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত পাখী যে শাখে শাখে বসিয়া আছে তাহার ঠিক নাই। সেকালের টিকটিকি যেন দৈত্যবিশেষ! কচ্ছপ, অথবা ভেকের আকৃতির পরিচয় বিশেষভাবে না দিয়া কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আধুনিক পশুসমাজে তাহা অদ্ভুত ও প্রকাণ্ড দর্শন;—এখনকার ভেক বা কচ্ছপের সম্মুখে তাহাদের ধরিলে তাহারা নিশ্চয় তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে অস্বীকার করিবে।

বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর আদি জীব-বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। মিঃ পলেনবার্গ, শেকুঠোন্ হাচিন্সন্ প্রভৃতি ধীমানদিগের গবেষণায় অনেক লুপ্ত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে বলেন, পৃথিবীর আদি-বাসিন্দা সম্বন্ধে বেদে পুরাণে যে সকল জীবজন্তুর উল্লেখ আছে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার ও মত কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রাচীন নরকঙ্কালের সহিত এইরূপ নব-আবিষ্কৃত পশুকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে পশুকঙ্কালটি অযুত বৎসর পূর্ব্বে বিচরণ করিত। তাহার মৃত্যু বা জন্মের তারিখ অনুমান করিবার লক্ষণ তিনি পান নাই; তবে শারীরিক যন্ত্রাবলীর সুঠাম দেখিয়া মনে করেন যে, এইরূপ কঙ্কালসমন্বিত দেহ অন্যূন দশ হাজার বৎসর বাঁচিতে পারে। প্রস্তরীভূত অস্থিরূপে প্রাপ্ত লুপ্তকঙ্কাল

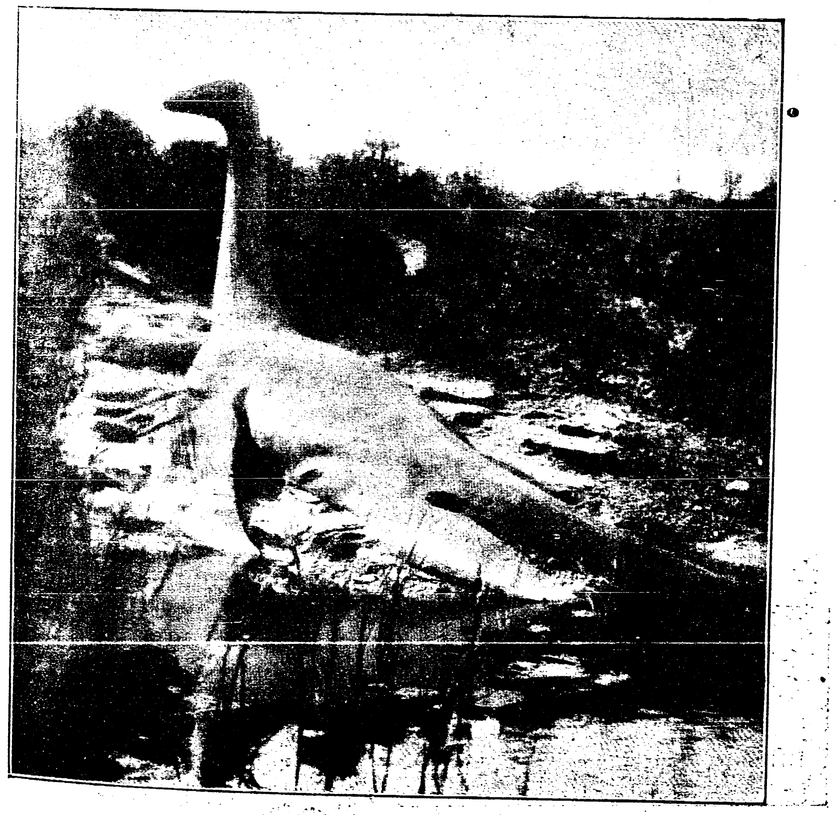

পক্ষযুক্ত সর্প

ইউরোপে নব জ্ঞান জাগাইয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনত্বের নিদর্শনে উহাদের সঠিক রূপ কল্পনা করিতে গিয়া এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—ডিপ্লোডকাসের কঙ্কাল পাইয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহার কঙ্কাল মাংসপুষ্ট হইলে অন্যূন দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট হইতে পারিত, আবার কেহ বলেন—না, ৩০ ফুট হইত; অপর ব্যক্তির মতে ৮০ ফুট! এইরূপ বাদপ্রতিবাদের পর মিঃ পলেনবার্গ মানসী প্রতিমা সাকারগঠনে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। হেম্বার্গে যাদুঘর স্থাপনের অন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তিনি একবার পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল ইউরোপ, এসিয়া প্রভৃতি প্রাচ্যপ্রতীচ্য দেশে দিন যাপন করিয়া তিনি যে দূরদর্শিতা ও প্রাণীতত্ত্বে অপূর্ব্ব অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার আংশিক নিদর্শন উক্ত প্রাণিবাটিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের সমুদয় যাদুঘর তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে বিরত হন নাই, যেখানে কণিকামাত্রও শিক্ষণীয় সামগ্রী দেখিয়াছেন তৎক্ষণাৎ অতি আদরে সেই উপাদেয় বস্তুর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে এইজন্য তাঁহার দুই বৎসর কাটিয়াছিল; তথাকার বৈজ্ঞানিক আগারে অতিকায় পুরাপ্রাণীর স্তূপীকৃত বহুতর কঙ্কালের ড্রয়িং ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ভ্রমণের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি আমেরিকার নিউইয়র্কে স্থাপিত বিখ্যাত ইতিহাস-ভবন হইতেও প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলেন; এইখানে জীবজন্তুর কঙ্কালের প্রতিকৃতি লইয়া উহাদের পরিধি পরিমাণেরও সুবিধা ঘটিয়াছিল। নানা দিগ্দেশ হইতে এবম্বিধ তথ্য সংগৃহীত হইলে আপন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বল্কলধারী দাশরথির ন্যায় একান্ত কর্ম্মনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিয়া মিঃ পলেনবার্গ স্বদেশে ফিরিয়া যান। সেখানে প্রথমে কর্দ্দম দ্বারা জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন; পরে সেই মৃত্তিকা-প্রস্তুত জন্তু সম্বন্ধে মতামত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরের ম্যানেজার ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্‌দের নিকট উহাদের নমুনা প্রেরণ করেন। উচ্চ প্রশংসার সহিত মিঃ পলেনবর্গের মূর্ত্তিগুলি ঠিক বলিয়া গৃহীত হইবার পর ইনি প্রাগ্ ঐতিহাসিক জন্তুর ভবন প্রস্তুত আরম্ভ করেন।



প্রাচীন বাদুড়

পলেনবার্গ প্রতিষ্ঠিত সরোবরের কথা একটু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; মিঃ পলেনবার্গ জন্তুগুলিকে এইরূপ কৌশলে পাতার ফাঁকে ফাঁকে অথবা সলিল অবগুণ্ঠনে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে নিকটবর্ত্তী না হইলে তাহাদের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই যাদুঘরে কোথাও বা আরামকুঞ্জে ক্ষুদ্রকায় পক্ষীকুল নিঃশব্দ রাগিণীতে তানের ভান করিতেছে, কোথাও লতামণ্ডপে বিশালকায় ডিপ্লোডকাস্ অসহ্য গুমটে যেন নাসিকার অগ্রভাগ ফুলাইয়া করিয়া আছে। ডালে—টিসেরেটপ্সদের ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে, অদূরে শূন্যবিহারী পক্ষধারী সর্প বাতাস খাইতে ঊর্দ্ধমুখে প্রয়াস করিবার উদ্যোগ করিতেছে, বজ্রনাসী

গোধিকাগণের উল্লাস-বিলোড়নে যেন প্রাচীন শাল বৃক্ষ ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই সব অতিকায় ও অভিনব জন্তুর লীলাস্থলে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন আমরা এ কালের মানুষ নহি, যেন কোন্ সত্য যুগে গিয়া পাঁছিয়াছি! এই সব অ-দৃষ্ট জন্তু যেন সহস্র সহস্র বৎসরের বাধা ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া পুরাতনকে নূতন করিয়া দিতেছে।

গুলভোজী ইগুয়েনোডনের মস্তক ভূভাগ হইতে পঁচিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আকৃতি দৈর্ঘ্যে ৩০ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪।৫ ফুট।

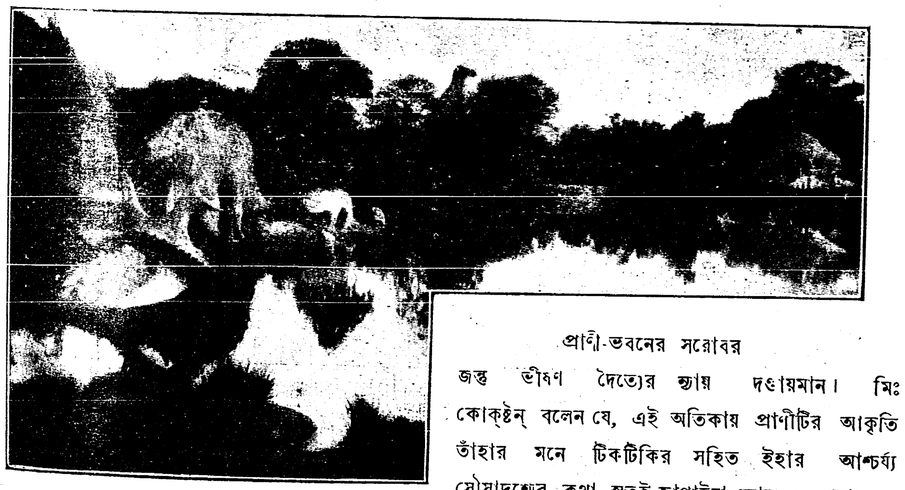

প্রাণী-ভবনের সরোবর

মিটিয়া যায়। এই অদ্ভুত জন্তুটির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার অঙ্গুলিগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় ধারাল ও ভীষণাকার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যখন মৃত্তিকানিম্নে ইহার অঙ্গুলি প্রথম পাওয়া যায় তখন অনেকেই সেগুলিকে ইগুয়েনোডনের শিং বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। তারপর পরীক্ষা দ্বারা সেই শিং আঙ্গুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তীক্ষ্ণ ছুরিকাবৎ ধারাল অঙ্গুলি লম্বায় প্রায় ১৮ ইঞ্চি করিয়া।

সরোবরের অপর পার্শ্বে ডিনোসোর জাতীয় সাসেক্সের বনভূমে কিছুকাল পূর্ব্বে এই জন্তুর পদচিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ ও প্রাণীতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে এই প্রাণীটী পক্ষীবৎ পশ্চাৎপদে ভর করিয়া চলাফেলা করিত। ১৮৯৮ অব্দে প্রায় পঁয়ত্রিশটী পশুকঙ্কাল বেলজিয়ামের কয়লার খনিতে পাওয়া যায়। মিঃ পলেনবার্গ প্রভৃতি পশুকঙ্কাল অনুসন্ধান সমিতির সদস্যবর্গ পরীক্ষায় ঠিক করেন যে ইহারা সকলেই ইগুয়েনোডনের বংশধর। প্যারীর সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-মন্দিরে এই কঙ্কাল প্রেরিত হওয়ার পর ইহার স্বাভাবিক রূপ কল্পনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ জন্তু ভীষণ দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। মিঃ কোক্‌ষ্টন্ বলেন যে, এই অতিকায় প্রাণীটির আকৃতি তাঁহার মনে টিকটিকির সহিত ইহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা স্বতই জাগাইয়া তোলে। পুরাকালে ইহা যে গোধিকারূপেই প্রাণী-জগতে পরিচিত ছিল তাহারও সুন্দর প্রমাণ ইনি দিয়া থাকেন। তখন এই টিকটিকি জাতীয় জন্তুটি হস্তপদের সমন্বয়ে চলাফেরা করিত।

ডিপ্লোডকাস্ জাতীয় জন্তুরা যখন গমনাগমন করিত সম্ভবতঃ তাহাদের পদনিষ্পেষণে এক বর্গফুট পরিমিত ভূমি প্রকম্পিত হইত ও ভারবহনের ফলস্বরূপ সেই স্থান অনেকটা বসিয়া যাইত। ডিপ্লোডকাস্ মহাত্মাদের অনুকম্পায় বসুমতী তখন 'থর হরি' কম্পিত হইত কিনা কে জানে! রাত্রে নিদ্রার স্থান বাছিয়া লইতে তাহাদের কিরূপ বেগ পাইতে হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে

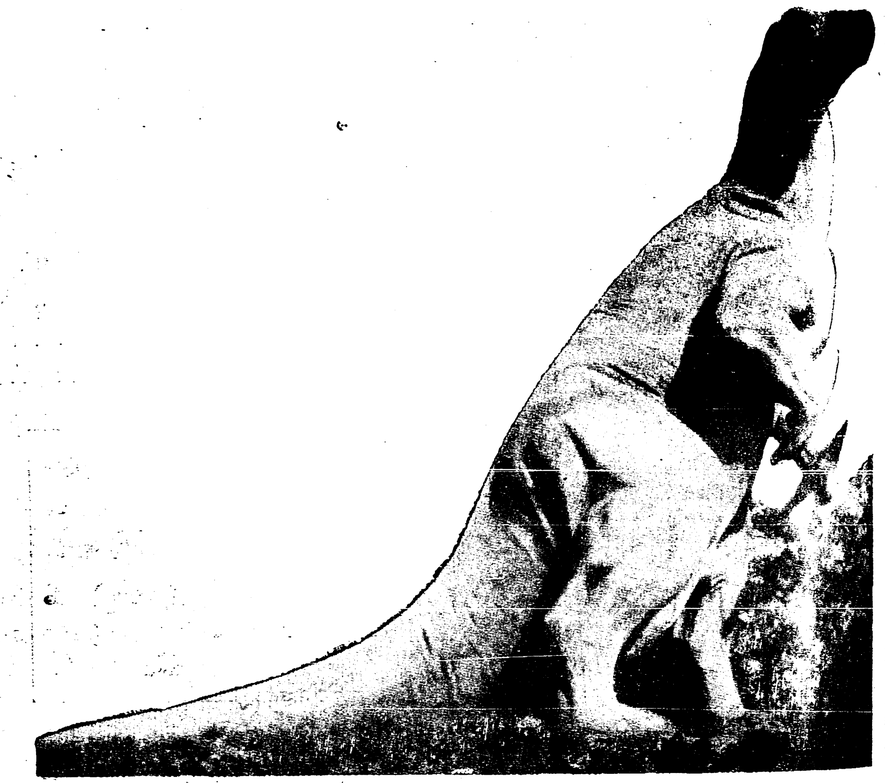

ইগুয়েনোডন্

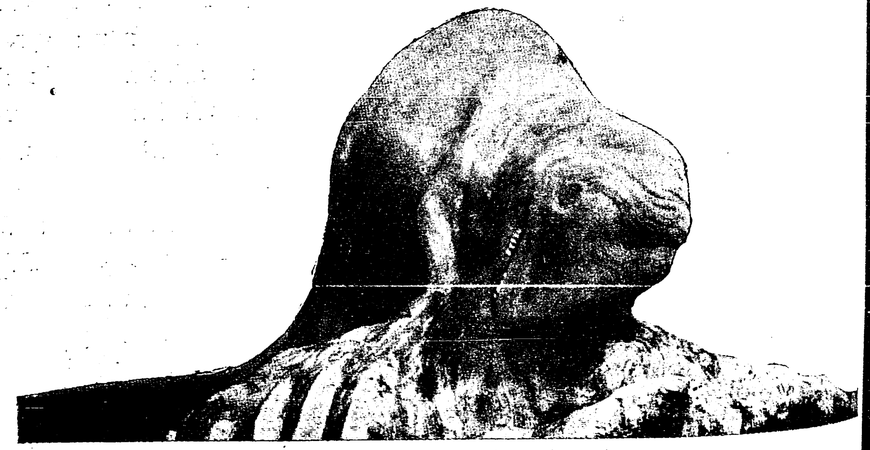

ডিনোসোর

হয়। ষ্টেনিলনের যাদুঘরে যে ডিপ্লোডকাস্ রক্ষিত আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৬ ফুট; কিন্তু দক্ষিণ-কেন্‌সিংটন যাদুঘরের ডিপ্লোডকাসটি দৈর্ঘ্যে, স্কন্ধ হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ধরিয়া, ৮৪ ফুট ও উচ্চে ৫৪ ফুট। এই অতি বৃহৎ কঙ্কালটী ১৮৯৯ অব্দে সেণ্ট্রাল আরমিং কঙ্কালভবনে একটী প্রাচীন কবরে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ পলেনবার্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত ডিপ্লোডকাসের চেহারাটি বেশ খুব সুরৎ। টিকটিকির ন্যায় লম্বা লেজ, উটপাখীর ন্যায় কোমল সরু ঘাড়, মর্ম্মর বিনির্ম্মিত দেহ, পুরু থামের ন্যায় হস্তীবৎ পদচতুষ্টয়! জীবিতাবস্থায় বোধ হয় এই প্রাণীর ওজন ৩০ টনের উপরে (১ টন=২৭ মণ) ছিল। ডিপ্লোডকাস জীবটী ছিল উভচর, খুব স্বচ্ছ অথচ অতলস্পর্শী স্থানে জলক্রীড়া করিত এবং উপরে উঠিয়া শাকশবজীও ভোজন করিত।

পুরাকালে এই সমুদয় অতিকায় জন্তুর গর্জ্জনে যখন গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিত, তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যখন ঝড় বহিতে থাকিত, পদক্ষেপে যখন ভূমিকম্প হইয়া উঠিত তখনকার চিত্র পাঠকবর্গ একবার কল্পনায় আনিয়া দেখুন। শুনা যায়, এই সকল অতিকায় জন্তু অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতি ছিল; পরস্পরে দিনরাত কামড়াকামড়ি মারামারি করিত। খুব সম্ভবত এই কারণেই—ইহাদের অমন প্রভূত শক্তিশালী বংশ লোপ পাইয়াছে।

ভূভাগে বিচরণশীল সর্পজাতীয় ট্রিসেরেটপ্সের মাথাটী অবিকল গণ্ডারসদৃশ কিন্তু বর্ত্তমান গণ্ডারের প্রতিকূলে ইহাকে সুবৃহৎ শিং ও গলায় পুষ্পমঞ্জরীর হাঁসুলি এই দুইটী বিশেষ ভারবাহী দ্রব্য বহন করিয়া চলিতে হইত। ইহার মাথার খুলি সাতফুট অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অধিক হইবে।

সত্যকথা বলিতে হইলে, ক্রমবাদে বজ্রনাদী গোধিকা প্রথম স্থান পাইতে পারে না—কারণ ইহার আগমনের বহু পূর্ব্বেই প্লেসিয় সেয়ুরিয়া এবং ইক্থিয় সেয়ুরিয়া নামধেয় দুই মহান্ বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। ইহাদের পরে পক্ষবাহী অতিকায় সর্প জাতির কাল নির্ণীত হইয়াছে। বৃহদায়তনের জন্য ডিনেসোরজাতিই পুরাপ্রাণী মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্লেসিয় সেয়ুরিয়ার মাহাত্ম্য এই যে ডিপ্লোডকাসের ন্যায় ইহাদেরও সমস্ত শরীরের উপাদান যোগাইতে বহুবিধ



ডিপ্লোডকাস্

অপরাপর জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছাঁচ লইতে হইয়াছে। ইহার মাথাটা টিব্‌টিকির মস্তকের সহিত অবিকল একরূপ; ঘাড়টি ঠিক যেন লম্বা সাপের কাঁধের মত, দাঁতগুলি কুমীরের বটকটে দাঁতের মত, পঞ্জর ও দাঁতের পাটি তিমি মৎস্যের হুবহু অনুকরণে অনুপ্রাণিত! ইহারা দৈর্ঘ্যে ২২ ফুট। জলে সাঁতার কাটিতে এ জন্তুটি বড় মজবুত, আবার ডাঙ্গাতেও চলাফেরা করে! বড় সুবিধা। জলে মাছগুল্মাদি এবং ডাঙ্গায় টিকটিকি ও পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের উদর পরিপুষ্টি হয়।

এ প্রাণীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের অর্দ্ধাংশ শুন্যপায়ীর ন্যায় ও অপরার্দ্ধ মৎস্যাকৃতির ন্যায়।

প্রাণীভক্ষনে খেচর সর্পও বহুবিধ আছে। কোন কোন সাপ ঠিক চড়ুইয়ের ন্যায় আবার কোনটি পুচ্ছসমেত ১৮ ফুট। হ্রদে পুরাকালের কুম্ভীর, মৎস্য ও ডানাসংযুক্ত টিক্‌টিকির সঙ্করণ দেখা যায়। 'টিক্‌টিকির পাখা' কথাটা নিতান্ত 'গাঁজাখুরি'; কিন্তু কোনদিন যে ইহার অস্তিত্ব ছিল তাহা আর অস্বীকার করিবার পথ নাই।

যে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল আজ পুরাতনের পরিকল্পনার



ট্রিসেরেটপ্স

অবকাশ ঘটাইয়া দিয়াছে, উহাদের অস্তিত্ব যদি বায়ুতেই মিশিয়া যাইত, তবে প্রাণীতত্ত্বের একদিক্ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের অতি সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তখন এই সমুদয় অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালবাহী পর্ব্বতমালা এখনকার মত এত কঠিন ছিল না। সুকোমল ভূমিতে উহাদের কঙ্কাল সংরক্ষিত হওয়ায় আজও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মধ্যযুগে ইহারা কিছু শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর হইতে কঠিন পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আবিষ্কৃত কঙ্কালের অনেকগুলিকেই ভূমিসংলগ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গ্যাসের চাপে ও আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতে খণ্ডিত ও চূর্ণীকৃত হয়; এবং এই হেতু কঠিন আবরণটী বিপর্য্যস্ত-ভাবে ওতঃপ্রোত হওয়ায় নিম্নপর্ব্বতের মৃত্তিকা-স্তবক, বর্ত্তমানে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থান পাইয়াছে। এই নিম্নস্তরের মৃত্তিকার অধোগতি হইতে সুউচ্চে স্থানলাভের আনুমানিক কাল স্থির করিতে পারিলেই প্রাণীগণের বয়স সম্বন্ধীয় অনুমান অভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

দিবা-স্বপ্ন

বসন্ত আসিয়াছিল, গোলাপ ফুটিয়াছিল,
তুলেছিল ভ্রমর ঝঙ্কার,
সব ছিল—সব গেছে; নিদাঘের দিনে
বিশ্বব্যাপী একি হাহাকার!

বসন্ত আসিবে ফিরে, গোলাপ ফুটিবে ধীরে,
দোয়েল কোয়েল গাবে গান;
যে জন চলিয়া গেল, সে কেন আসে না ফিরে,
জীবন কি স্বপন সমান?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র।

সুরার সৃষ্টি

(নাটিকা)

(টলষ্টয় রচিত একখানি নাটিকা-অবলম্বনে)

প্রথম অঙ্ক

মাঠ।

কৃষক। (চষিতে চষিতে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিল) ওঃ, ভারী রোদ্দুর হয়েছে। একেবারে চড়চড়ে রোদ! গরুটাকে খুলে একটু ঠাণ্ডায় ছেড়ে দি—একটু ও চরে নিক। আহা, ঘেমে নেয়ে উঠেছে! (বলদের স্কন্ধ হইতে লাঙ্গল খুলিয়া)—চ'। গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আমিও দুটি খেয়ে নি। পান্তা কটি এনে ভালই হয়েছে—খাবার জন্যে আর এ রোদে বাড়ী যেতে হবে না—অথচ কিছু না খেলেও চলে না—পেরে উঠব কেন? তেষ্টায় ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে!... খেয়ে একটু জিরিয়ে নিলে আবার সন্ধ্যা অবদ্দি এক টানে খাটতে পারব! যে রোদ, মাথাটা একেবারে যেন আগুন হয়ে উঠেছে! গরুটাকে,—ঐ যে ওখানটায় ছায়া আছে, ঘাসও মন্দ দেখছি না, ছায়ায় ছেড়ে দি—একটু চরেও নিক। (বলদ লইয়া ক্ষেত্র-প্রান্তে বৃক্ষতলাভিমুখে চলিয়া গেল।)

পাপের দূত প্রবেশ করিল—একটা ঝোপের পার্শ্বে সে লুকাইল।

দূত। লোকটা ত আচ্ছা! সমানে খাটছে! এত কষ্টেও ভগবানকে দুটো গাল পাড়ছে না! অবাক করলে!... আচ্ছা, দাঁড়াও সোণার চাঁদ—ভগবানকে গাল পাড় কি না, একবার দেখে নিচ্ছি! এই ত, মুখে দেবে বলে খোরায় করে দুট পান্তা ভাত এনেছ—তোমার সেই সাধের পান্তা লোপাট কচ্ছি, এবার। ক্ষিদের চোটে ফিরে এসে পান্তার দেখা না পেলে প্রাণটা একেবারে টগবগিয়ে উঠবে'খন। এই গরম!—ভগবানকেও কোন্ না দু-চারটে গরম কথা শোনাবে!

খোরা হইতে পান্তা ভাত লইয়া ঝোপের পার্শ্বে আসিয়া লুকাইয়া বসিল।)

কৃষক। (বলদ রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনান্তে) হরিবোল, হরিবোল!...আঃ, ভারী ক্ষিদে লেগেছে—ভাত খাই, তার পর পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিয়ে গাছতলাটায় একটু হাত-পা মেলিয়ে দেওয়া যাবে! এখন—(গামছা তুলিয়া) এ কি—বাঃ, ভাত কোথা গেল? যেমন খোরা তেমনি রয়েছে,—ভাত খেয়ে গেল কে? ভারী মজা ত! বাঃ—এই গামছার নীচে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছি—

দূত। (ঝোপের অন্তরালে বসিয়া স্বগত) হ্যাঁ, হ্যাঁ—এইবার চাঁদ—আর একটু হরিবোল চালাও না!

কৃষক। (চারিধারে চাহিয়া) নাঃ, ভারী আশ্চর্য্য ত! পাখীতে খেয়ে গেল না কি? তাই বা কি করে হবে?—পাখীতে খেলে এমন চেঁচে-পুঁচে ত আর খেতে পারত না—দুচার টুকরোও অন্ততঃ খোরায় পড়ে থাকত! এ

একেবারে খোরা চেটে খেয়ে গেছে দেখছি! কুকুরে—? নাঃ, তাই বা কি করে হবে—কুকুর এল কখন? এলে আর আমি দেখতে পেতুম না! তা ছাড়া খোরা যেমন গামছায় ঢাকা, তেমনি ঢাকা রয়েছে—কুকুর হলে ত আর খেয়ে খোরার উপর আবার গামছা চাপিয়ে চলে যেতে পারে না।... তবে হল, কি—? এঁ্যা—

দূত। (স্বগত) এবার গান সুরু কর!

কৃষক। যাক্, যখন নেই, তখন ত আর খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কেউ চুপি চুপি এসে খেয়ে গেছে, বোধ হয়! কোন ভিখিরি টিখিরি হবে আর কি! আহা, থাক্ বেচারা—খেয়ে যদি আরাম পেয়ে থাকে ত পাক্—তার পেটটা যদি ভরে থাকে ত সে ভালই হয়েছে! আমার অবিশ্যি এমন কিছু খিদে পায় নি যে, এখুনি না খেলে একেবারে মরে যাব! যাক্, যা হয়েছে, ভালই হয়েছে—হরি বল, মন! হরি বল!

দূত। (স্বগত) কোথাকার হতভাগা গো! এঁ্যা! একটা গাল পাড়লে না—ভাত চুরি গেল, তা কাউকে নির্ব্বংশ করে, জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা নয়! নাঃ, একে পারা ভার হল, দেখছি!

সন্নিহিত বৃক্ষ-তলে গিয়া কৃষক বসিল; গামছায় কপালের ঘাম মুছিয়া মাটির উপর শয়ন করিল—পরে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

দূত। (ঝোপের অন্তরাল হইতে উঠিয়া আসিয়া) নাঃ—মহারাজের হুকুম হলে কি হবে—তামিল করা যে বড় মুস্কিল দেখছি! তিনি ত স্রেফ হুকুম দিয়ে বল্লেন, "যেমন করে পার, চাষা-লোক ধরে আনো,—ভদ্দর লোকে নরক গুলজার হয়ে গেল! চাষা কই?" এখন চাষা ধরি, কি করে? কোনো বেটা যে জালে পড়তে চায় না। এক বেটাকেও আঁকড়াতে পাচ্ছি না। এরা না জানে ঝগড়া, না জানে মারামারি, না জানে গালিগালাজ! ভগবানের উপর তোফা নির্ভর রেখে দিন কাটাচ্ছে! এই যে বেটার পান্তা লোপাট করে দিলুম, তা লোকটা কাউকে গাল দিলে না, জাহান্নমে পাঠালে না—তার ভালই হয়েছে, ভাল হোক বলে, সটান্ 'হরি বল মন' করে শুয়ে পড়ল! আরে ছ্যাঃ, এ বেটা কি মানুষ? যাই, এখন মহারাজকে খবর দিই গে—আমি ত ভেবে কোন কূল-কিনারা ঠাওরাতে পারছি না!

(ভূ-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

নরকের রাজ-সভা।

সিংহাসনোপরি মহারাজ পাপ উপবিষ্ট। মন্ত্রী নিকটস্থ বেদীর উপর খাতা খুলিয়া বসিয়া,—পার্শ্বে দোয়াত-কলম। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র শান্ত্রী-প্রহরী। দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচজন দূত সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান। বাম পার্শ্বে প্রবেশদ্বার—তথায় দৌবারিক; মহারাজের সম্মুখে খাতাঞ্জি দাঁড়াইয়া আছে।

খাতাঞ্জি। এই যে মহারাজ—খাতা খুলে হিসেব দিচ্ছি—তিন বছরের সব হিসেব ঠিক আছে। শুধু দু'লাখ বিশ হাজার পাঁচজন মানুষের যে চালানখানা—তার পাকা ফর্দ্দ এখনও পাইনি।

পাপ। আচ্ছা—যা আছে, তার হিসেবটা ফর্দ্দ-মাফিক পড় দেখি! মন্ত্রী, শুনে যাও—পাকা খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নাও। আজ আবার বড় গরম—মাথা দিয়ে যেন ঝাঁজ বেরুচ্ছে।

বেশী ক্ষণ আমি বসতে পারব না। জমা-খরচের সমস্ত খাতা তলব করে শেষ জমাগুলো মিলিয়ে নাও।

মন্ত্রী। মহারাজের কথামত সব খাতাই তলব করেছি! সব দূতই হাজির—

পাপ। আচ্ছা—পড় শুনি।

খাতাঞ্জি। ওহে ভদ্দর দূত! খাতা ধর। (খাতাঞ্জি যখন যাহ'কে ডাকিতে লাগিল, তখনই সেই দূত আসিয়া আপনার জাব্‌দা খতিয়ান সম্মুখে ধরিতে লাগিল—খাতাঞ্জি দেখিয়া পাকা খাতার সহিত মিলাইবার জন্য মন্ত্রীর হাতে তাহা তুলিয়া দিতে লাগিল) ভদ্দর লোক এসেছে—এক হাজার আট শ ছত্রিশ জন! ব্যবসা দূত! ব্যবসাদার ছোট-বড় মিলিয়ে ন'হাজার ছ'শ তেতাল্লিশ! উকিল-মোক্তার-ব্যারিষ্টার তিন হাজার চার শ' তেইশ জন! মেয়ে মানুষের ফর্দ্দটা এইমাত্র পেয়েছি—পাকা-খাতায় জমা এখনো তোলা হয়নি মেয়েমানুষ, সধবা-বিধবা মিলিয়ে—এক লাখ ছিয়াশি হাজার তিন শ' পনেরো, কুমারী সতের হাজার চার শ' আটত্রিশ। পাড়া-কুঁদুলী, হিংসুকী, ঘরভাঙ্গানি, কুচরিত্রা—সব একসঙ্গে জমা রয়েছে—এইগুলো ভাগ হয়ে আলাদা-আলাদা ঘরে হিসেব পড়বে! দু-তিন জনের খাতা এখনো আসেনি—চাকুরে,—এর মধ্যে হাকিম, কেরাণী, পেয়াদা, সব আছে—তবে গে, ডাক্তার-বদ্যি আছে, আর চাষাভুষো আছে—সেটার মধ্যে দু'লাখ বিশ হাজার পাঁচজনের হিসেব পাচ্ছি। সেটা পেলে চার লাখ আটত্রিশ হাজার ছ'শ ষাটজনের পাকা হিসেব জমা হয়ে যায়।

পাপ। আজ ওটা শেষ করে ফেল। যারা পাকা হিসেব দেয়নি, তাদের সব তলব কর। হিসেব খতিয়ে দিতে না পারলে, সব জরিমানা হবে। হিসেব দিতে এত দেরি কিসের? মানুষ গুলে কে চুরি করেনি ত! এই যে কে আসে—

(চাকুরে-দূতের প্রবেশ)

দূত আসিয়া পাপকে অভিবাদন করিল।

পাপ। তোমার খবর কি?

দূত। (অভিবাদনান্তে) আজ্ঞে, মহারাজ—চালানি-কাজ খুব বেড়ে গেছে। একা আর পেরে উঠি না। হাকিমদের মধ্যে এমন জন কতককে পেয়েছি—যাদের গুণের কথা শুনলে আপনি অবধি লজ্জায় লাল হয়ে উঠবেন—আমরা কোন্ ছার! আমাদেরও তারা ছাড়িয়ে চলেছে!

পাপ। কি রকম?

দূত। আজ্ঞে হুজুর—আগে শুধু ঘুষখোর হাকিমই চালান দিতুম—এখন শুধু ঘুষ-খোর নয়! বাদী-প্রতিবাদীর বাগান-মজলিসে আমোদ মেরে অনেক হাকিম তাদের সুবিধামত রায় দিতে সুরু করেছে—তার উপর আত্মীয়-বন্ধু উকিলের দিকে সায় দেওয়া—সে-ত আছেই। উপরিওলার রাঙা চোখের ভয়েও রায়ের এদিক ওদিক হচ্ছে! তা ছাড়া নিজেদের ফাইল সাবাড় করবার জন্যেও বাদী-প্রতিবাদীর কথা কানে না তুলেই অনেক সময় হাকিমের মর্জ্জিমত রায় হয়—তা ছাড়া ঘুষখোর পেস্কারের কথাতেও রায় বিগড়ুচ্ছে,—এমন লোক বিস্তর পাচ্ছি আজকাল।

পাপ। খুব ভাল খবর বটে! মন্ত্রী, নরকের এ জায়গায় আর কুলোবে না, দেখছি—

একটা কমিটি বসানো যাক্—কতটা জমি, কোনখানে নেওয়া যাবে, তারা তা ঠিক করে রিপোর্ট দিক্।...ও কে ?

দৌবারিক। (অভিবাদনান্তে) চাষা-দূত।

(চাষা-দূতের প্রবেশ)

পাপ। খবর কি ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে মহারাজ, আর ত চাকরি রাখতে পারি বলে মনে হয় না। (পান্তা ভাতের পুঁটুলি খুলিতে লাগিল)

পাপ। ও কি ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, পান্তা ভাত!

পাপ। ওতে কি হবে ? তোর লোক কই ? চাষা ধরলি কটা ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে একটিও নয়। পারিই নি!

পাপ। পারিস নি ? তার মানে ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, মানে আর কি—চাকরি রাখা দুষ্কর দেখছি। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, হুজুর—তবু একটারও চুলের মুঠি ধরতে পারছি না। আজ মাঠ থেকে একটা চাষার খাবার পান্তা ভাত চুরি করলুম, তা, জেনেও সে কাউকে গাল দিলে না, জাহান্নমেও পাঠাতে চাইলে না—হরি ঠাকুরকে ডেকে সটান শুয়ে পড়ল! এত চেষ্টা করছি, ফিকির করচি, তা একটাকেও বাগাতে পারছি না।

পাপ। বাগাতে পারছিস্ না ? বটে! চালাকি পেয়েছিস—আমার কাছে ? এক ঘুসিতে তোর নাক উড়িয়ে দেব, তা জানিস্! মাইনে খাবে, আর বসে ঝিমিয়ে আরাম করবে—বেটা পাজী—

চাষা-দূত। হুজুর, চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না, আমি—

পাপ। ত্রুটি করচিস্ না! ত্রুটি আর কাকে বলে! এত ভদ্দর লোক এল, উকিল ডাক্তার এল, হাকিম এল, আর তোর বেটাদের এমন ক্ষমতা, এত বুদ্ধি যে, একটাও ধরা পড়ল না—চাষার ফর্দ্দা একেবারে খালি! কাকে তুই বোঝাতে চাস্ ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে হুজুর—আমি সত্য কথাই বলছি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তা কাকেও স্পেশাল এন্‌কোয়ারিতে পাঠান; —সাক্ষী-তলবে বিরুদ্ধ প্রমাণ পান ত যে শাস্তি হুজুর দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি! হুজুর, তারা সারা দিন খাটে-খোটে, বাড়ী ফিরে ছেলে-পিলেদের আদর করে, খায় দায়, ঘুমোয়—ব্যস্! কারো কোন ঝঞ্ঝাটে যায় না—অল্পেই সন্তুষ্ট—পরের জন্য মাথা দিতে ছোটে,—নিজের স্বার্থ নিজেরা বোঝে না! এই যে হুজুর, তাদের দিন-রাত্রের পরিশ্রমে ধান-চাল জন্মাচ্ছে —ধান-চাল না হলে ভদ্দর লোকের দল ত কোনকালে শুকিয়ে মারা যেত—তা সেই ধান-চাল কত শস্তায় তারা বিকিয়ে দিচ্ছে। কোন মতে তাদের দিনটা গেলেই হল—মোটা ভাত, মোটা কাপড়,—এর উর্দ্ধে তারা উঠবে না, এর বেশীও কেউ চাইবে না—না আছে সখ, না জানে ফূর্ত্তি—এ রকম হলে কি করে আর তাদের বাগে পাই, বলুন! এই যে দুপুর রোদে খেটে ঘেমে চাষাটা খিদে-তেষ্টায় চার ধার অন্ধকার দেখছিল, তার সেই মুখের গ্রাস কেড়ে নিলুম, তা তাতে একটু রাগলে না—গাল দিলে না—বিরক্ত হল না—তারা কি মানুষ, হুজুর যে, ধরব—গাছ-পালার মতই ধর অসাড় অজ্ঞান!

পাপ। ও সব বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না। ছেঁদো কথায় আমি ভুলছি না। যেমন করে হোক, চাষা আনা চাইই! চাষা না পেলে আমার মান থাকে না,—রাজ্য টেঁকে না! তুই বেটা পান্তা ভাত দেখিয়ে ভোলাবি আমাকে ? তা ভুলছি না!

চাষা-দূত। আজ্ঞে মহারাজ—যে শাস্তি বলেন, আমি তা ঘাড় পেতে নিতে রাজী আছি; —কিছু মিথ্যা বলিনি। ভদ্দর লোক-টোককে ধরা ঢের সহজ! এই সব যত রাজা-মহারাজা—তাদের এক টুক্‌রো হীরে কি মাণিক দেখান, কিম্বা কিছু বিষয়-সম্পত্তি দেখান্—কি একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক, অমনি তারা হাত বাড়িয়ে আপনার গণ্ডীতে ছুটে আসবে, তখন তাদের যে দিকে ফেরাবেন, সেই দিকেই তারা ফিরবে যত বড় শক্ত কাজ তাদের করতে বলুন তাও তারা তখনই করবে! আর অন্য যে-সব লোক,—তারাও টাকায় ভোলে—দুটো টাকা ছড়িয়ে রাখুন, চুম্বকের মত সেই দিক মহারাজ, আপনার গণ্ডীর মধ্যে তাদের টেনে আনবে! কিন্তু এই চাষাগুলো টাকার নাম জানে না—নারীর রূপে ভোলে না—কিছুতে তাদের একটা আকাঙ্ক্ষা নেই! পেট খাটিয়ে খেটে মোটা ভাত-কাপড় পেলেই তাদের সব অভাব মিটে যায়! হুজুর, আমাকে অবিশ্বাস হয় ত আর কাউকে পাঠিয়ে যদি হয় খবর নিন!

পাপ। আর কাকেও পাঠাব না—আমি। তাকেই চাষা ধরে আনতে হবে! চাষা মাথায় তার ঠিক নেই, বেটা কাপড়ে বেঁধে পান্তা ভাত নিয়ে হাজির হল! মাথা খাটা, নতুন ফন্দী-ফিকির বার কর্—কেমন করে চাষার দল এড়িয়ে থাকে, একবার দেখি!

চাষা-দূত। আমার দ্বারা হবে না, এ কাজ, হুজুর। আমায় বরখাস্ত করুন—হুজুরের মাইনে খেয়ে যে হুজুরকে কাজ দেখাতে পাচ্ছি না—

পাপ। দাঁড়া, তোকে শায়েস্তা করছি। এই,—কে আছিস্ ?

প্রহরী। (করযোড়ে) হুজুর—মহারাজ!

পাপ। এই নিরেট বেটার পিঠের কাপড় তুলে পঁচিশ কোড়া লাগা!

প্রহরী। (চাষা-দূতের পৃষ্ঠে কোড়া প্রহার করিতে লাগিল; চাষা-দূত প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

পাপ। কেমন এবার পারবি ত ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে—

পাপ। আবার আজ্ঞে—লাগা, ফের্ দশ কোড়া—

চাষা-দূত। (প্রহার খাইতে খাইতে) পারব, হুজুর, পারব। দোহাই মহারাজের—

পাপ। আচ্ছা—মাথা খাটিয়ে মতলব বার কর্! আমার দূতের অসাধ্য কাজ ত্রিভুবনে আছে! তাতে আমার অপমান হয় না ?

চাষা-দূত। এবার এক মতলব বার করব, হুজুর। আমায় শুধু তিনটি বছর সময় দিন। এর মধ্যে যেমন করে পারি, উপায় করবই। তবে দরবারে যেন এ তিন বছরের মধ্যে আর হাজ্‌রে দিতে না হয়।

পাপ। আচ্ছা, যা,—তিন বছর সময় দিলুম। এর যদি মধ্যে না পারিস ত তোর গা থেকে আস্ত ছাল ছাড়িয়ে ফেলাব।...তোর

যে যেখানে আছে, সকলের মাথা সরকারে জামিন রেখে তুই এখন যা!

তৃতীয় অঙ্ক

কৃষকের গোলাবাড়ী।

চাষা-দূত 'জন' খাটিতে ব্যস্ত। গাড়ী-গাড়ী ধান বোঝাই আসিতেছে—চাষা-দূত 'জন'-বেশে তাহা তুলিতে ব্যস্ত।

(কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। কি রে?

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা, গোলা ত সব ভরে গেছে, কোন্ খানে আর রাখি!

কৃষক। তাইত! জায়গাও ত আর কোথাও দেখছি না। আচ্ছা, ওদিককার চালাগুলোর মধ্যে কিছু জায়গা হয় কি না, একবার দেখে আসি। (প্রস্থান)

চাষা-দূত। (মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিল—ললাটের শৃঙ্গ দেখা গেল।) আঃ—একটু জিরিয়ে নি! কি বিপদেই পড়েছি। মাথা আর চাকরি এ দুটি বজায় রাখতে, এই চাষা বেটার চাকর হয়ে কম খাটুনিটা খাটতে হচ্ছে! একটু হাঁফ্ ফেলবার অবসর নেই।.....মোদ্দা এবার মতলব যা বার করেছি, তাতে আমার চাষার পো এড়ান পান কি করে, একবার দেখে নিচ্ছি! ওর জন্যেই ত এত খোয়ার...তিন বছরও এদিকে শেষ হয়ে এল—আর একটা দিন মোটে বাকী আছে।...এই যে এত ধান বাকী পড়েছে, এ আর রাখবার জায়গা নেই! এই ধানেতেই কাম্ ফতে করব। কত্ত ধানে কত চাল, বাছাধনও এবার হাড়ে হাড়ে বুঝবেন! একবার মহারাজ আসতেন ত আমার খাটুনির বহরখানা দেখে তাঁর তাক লেগে যেত! আমি কি না বসে ঝিমুই! বটে!...এই যে, কে আবার আসে এ দিকে—মাথার পাগড়ী, তবে মাথায় ওঠ ধন! (মাথায় পাগড়ী উঠাইল।)

(কৃষকের প্রতিবেশী প্রবেশ করিল।)

প্রতিবেশী। কি রে মাধা—তোর নাম মাধা, না?

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা।

প্রতিবেশী। তোর মনিবের যে বেজায় এবার ধান হয়েছে রে! এ বছর তল্লাটে কোথাও ধানের নিশেনা নেই, বাণের জলে যত মাঠ, সব ভেসে গেছে। পাহাড়ের কোলে চাষ করে তোর মনিবই একা শুধু দেঁগে উঠেছে, দেখছি!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা!

প্রতিবেশী। তার উপর তোর মত জন পেয়ে সে একেবারে বর্ত্তে গেছে! কি খাটুনিই তুই খাটছিস্—একটু জিরেন নেই, হাত কামাই নেই—তোর গতরও ত খুব!

চাষা-দূত। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে এই গতরের জোরেই টিঁকে আছি।

প্রতিবেশী। তোর মনিবের খুবই বরাত জোর। আর-বছর ঐ জলাটার কোলে চাষ করতে গেল—ও জলা তার পূর্ব্বে কেউ নিতে চাইত না—তোর মনিব ত কপাল ঠুকে নিয়ে ফেললে! তার পর পড়বি ত পড়্, সেবার এমন গরম পড়ল, যে বৃষ্টির ফোঁটাটি দেখা দিলে না—আমাদের ধান সে চড়চড়ে রোদে শুকিয়ে ঝরে গেল, একটু জল পেলে না,—আর জলায় তোর মনিবের ধান পড়পড়িয়ে মাথা ঠেলে দাঁড়াল। যেন জলা ভরে' সোনা ছিটিয়ে দিলে!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা!

প্রতিবেশী। তা তোর মনিব এখন কোথায় গেল রে? আমার যে একটু কাজ আছে—

চাষা-দূত। আজ্ঞে, ঐ যে—

(কৃষকের প্রবেশ)

প্রতিবেশী। কিহে পরাণ,—তোমার খুব জোর বরাত বলতে হবে। আমাদের সব ধান, বাণের জলে হেজে-মজে গেল—আর তোমার বরাতে পাহাড়ের কোলে মা অন্নপূর্ণার আঁচল ছিঁড়ে যত ধান কি-না ঝরে পড়ল! বেশ দাদা, বেশ—

কৃষক। (মৃদু হাসিয়া) আমার বরাতে নয়, দাদা, এ সব মাধার হাতের গুণে!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা, আমাকে ব্যাভ্রম করছেন!

প্রতিবেশী। যাই হোক, তোমার হিংসে করছি না, দাদা—তবে বলতে এসেছি, কি যে, কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি—তোমার গোলা এমন ভরা থাকতে যেন শুকিয়ে না মরি,—এই আর কি!

কৃষক। আমার গোলায় ধান থাকলে কি আর—তোমরা জাত-ভাই হচ্ছ—তোমরা শুকিয়ে মরবে!

প্রতিবেশী। না, এই আর কি, এই আর কি! তোমার মাধা কিন্তু খুব—ওর ভারী গতর!...তা,... কি জান, আমাকে আজ দুটি ধান দিতে পার দাদা? এই ধার—ধার—পারি যদি ত আর বছর শোধ করব।

কৃষক। এ আর বেশী কথা কি? মাধা—

চাষা-দূত। (কৃষকের কানে-কানে) দেবেন না কত্তা, দেবেন না—

কৃষক। যা রে পাগলা—একটা থলে চেয়ে আন গে, যা—থলেই বা আর কোথায়—তা—

প্রতিবেশী। আচ্ছা, আমিই একটা থলে নিয়ে আসছি, বাড়ী থেকে— তার আর কি!

(প্রস্থান)

চাষা-দূত। (স্বগত) নাঃ, এত ধান হল, এত এ-তা এখনো সেই মামুলি চাল ছাড়লে না! বোকারাম—আর কাকে বলে! আচ্ছা দাঁড়াও, আমিও তোমায় দেখে নিচ্ছি!

কৃষক। হ্যাঁ রে মাধা,—তুই বারণ করছিলি কেন? এত ধান হয়েছে, দিলুমই বা—ও ত ধার নিচ্ছে, আবার শোধ দেবে।

চাষা-দূত। হ্যাঁ, শোধ আর দিয়েছে! বলে, কথাই আছে,—

নেবার বেলাই আপন-আপন—
ওগো আমার আপনি—
দেবার বেলায় হাত নড়ে না
শিরে ধরেন কাঁপুনি।

কৃষক। না রে মাধা, না। লোকের কথা যা, কাজও তাই!

চাষা দূত। এত ধান—নিয়ে করবে কি, বলছ?

কৃষক। তা না ত কি, তুইই বল্!

চাষা-দূত। এই ধান থেকে আমি এমন খাসা মিঠে পানি বেনিয়ে দিতে পারি—কত্তা, যে তা খেলে আর মুয়ে রা পড়বে, না।

কৃষক। কি মিঠে পানি রে?

চাষা-দূত। ভারী মিঠে পানি! সে পানি মুয়ে দিলে, হাঁ—দুব্লার বল হয়,—ক্ষিদে-তেষ্টা

থাকে না—মনে ভাবনা হলে সে ভাবনা চলে যায়—ফূর্ত্তি হয়, সাহস হয়—চার ধারে সে আলো দেখে! তিতকুটে দুনিয়াটা একদম্ মিঠে লাগে!

কৃষক। দূর পাগলা!

চাষা-দূত। আজ্ঞে—পাগলা ত বটেই! যেথন—ঐ পাহাড়-তলিটায় চাষ করবার লেগে বলেছিনু, তখনও কত্তা পাগলা বলে আমায় হুড়িয়ে দিছলেন—তার পর সেই পাগলার কথা খাটল ত।

কৃষক। তা বটে—তা কি দিয়ে তুই এ মিঠে পানি তৈরি করবি, শুনি!

চাষা-দূত। এই ধান দিয়ে।

কৃষক। ধান দিয়ে!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা—

কৃষক। তা খেলে কোন দোষ হবে না ত রে?

চাষা-দূত। হুঁঃ, দোষ কিসের?

কৃষক। তুই এত সব শিখলি কোত্থেকে রে মাধা?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, পেটের দায়ে চাকরির জন্যে কত দেশ-ভুঁই ঘুরতে হয়েছে—তাই এক বাবু আমার শিখিয়েছিল।

কৃষক। এ খেলে গায়ে বল পাব! বলিস কি, মাধা?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, বল বলে বল! একেবারে সিঙ্গীর বল!

কৃষক। শুধু ধান দিয়ে তৈরি করবি—আর কিছু মেশাবি নে? কিছু চাস্‌নে?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, শুধু একটা তামার আর দুটো লোহার পাত্তর চাই।

কৃষক। আমার কাছে লোহার একটা পাত্তর আছে—আর, একটা—আচ্ছা, ঐ ছিদামের কাছে পাব! তামার পাত্তর? দেখি, রাইমণিদের বাড়ী যেন একটা তামার বড় গামলা দেখেছি বলে মনে পড়ছে—সেইটে চেয়ে এনে দিচ্ছি!

চতুর্থ অঙ্ক

গোলা-বাড়ীর প্রাঙ্গণ।

প্রজ্বলিত সুবৃহৎ উনানের উপর প্রকাণ্ড তাম্র-কটাহ; তন্মধ্যে তরল পদার্থ জ্বাল হইতেছে।

'জন'-বেশী চাষা-দূত ও কৃষক।

চাষা-দূত। এই যে—এবার তৈরি হয়েছে!

কৃষক। তাই ত রে, গন্ধ ত মন্দ লাগছে না। এত জল এল কোত্থেকে? এঁ্যা—?

চাষা-দূত। জল নয়, কত্তা—রস। এইটেই হল গে, আসল জিনিস—এই সে মিঠে পানি!

কৃষক। রংটাও ত চমৎকার! বেশ সোনালি-সোনালি ধরণের—খাসা! বাঃ! স্বাদ কেমন?

চাষা-দূত। দেখুন না, একটু মুখে দিয়ে! (এক পাত্র তুলিয়া দিল)

কৃষক। (পান করিয়া) হুঁ—মন্দ লাগল না। তবে এটুকুতে ঠিক আঁচ পাওয়া গেল না। আর একটু দে দেখি!

চাষা-দূত। এই যে, নিন্ না! (আবার পাত্র ভরিয়া দিল)

কৃষক। (পানান্তে) চমৎকার! খাসা—এমন জিনিস জন্মে কখনো খাইনি—এর কাছে কোথায় লাগে, খেজুর রস! বাঃ!

চাষা-দূত। আর একটু নিন—তা হলে (পাত্র দান) শরীরটেয় জুৎ লাগছে কেমন?

কৃষক। জুৎ বলে জুৎ! একেবারে



"ন যযৌ ন তস্থৌ"

শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত চিত্র হইতে

মজবুৎ হয়ে উঠেছি যেন! বাঃ, বাঃ—গিন্নিকেও ডাকি—দু-এক পাত্র খেয়ে নিক্—ওঃ—চমৎকার! বলি, গিন্নি—ওগো গিন্নি, একবার এদিকে এস—চট্ করে এস! তা মাধা—এ মিঠে পানির নাম কি—?

কৃষক। ধান থেকে তৈরি—ধানের গে হল আসল খাঁটি রসটুকু—তাই একে বলে, ধান্যেশ্বরী!

কৃষক। বাঃ—বেঁচে থাক ধান্যেশ্বরী! প্রাণেশ্বরীও এর কাছে হার মানে, বাবা! তর্ হয়ে গেছি!...এই যে গিন্নি—আরে এস, এস।

বালিকা কন্যা-সহ কৃষক-পত্নীর প্রবেশ।

পত্নী। কি গো, ডাকছ কেন? ব্যাপার কি?

কৃষক। আর, ব্যাপার কি? নাও, নাও, এক পাত্তর নিয়ে মুখে দাও—কাঁচা বয়স ফিরে পাবে আবার—শরীর তর্ হয়ে যাবে!

পত্নী। বলি, কি ও—হ্যাঁ গা—তুমি যে মেতে উঠেছ একেবারে!

কৃষক। মাতবে না? এ যে কি চিজ্ গিন্নি, তা আর কি বলব! এক পাত্তর মুখে দিয়ে দেখ—মাধা—

চাষা-দূত। আজ্ঞে—

কৃষক। দে না বেটা, তোর মা ঠাকরুণকে এক পাত্তর্ দে'না!

চাষা-দূত। এই যে নিন, মা-ঠাকরুণ! (পাত্র দান)

পত্নী। এ কি গন্ধ গো—এ্যাঁ, কি এ? হ্যাঁ গা, বল না গো, কি?

কৃষক। খাও, খাও, জন্ম সার্থক হয়ে যাবে গিন্নি—তোমার কোন পুরুষে এমন জিনিস মুখে দেয়নি!

পত্নী। বটে! দেখি—(পান) বাঃ—বাঃ—দিব্যি ত!

কৃষক। হুঁ-হুঁ—বুড়ো-হচ্ছ, গায়ে জোর নেই—হাতে পায়ে বাত ধরেছে, বলে, দুঃখ কর না—? এখন প্রাণ চাঙ্গা হয়ে উঠল কেমন—? মাধা রে, কি ক্ষণেই তোকে পেয়েছি যে বাবা, তা আর কি বল্‌ব! কেমন, গিন্নি—লাগল কেমন—প্রাণের মধ্যে যেন হরেক রঙের ফুল ফুটে উঠছে! নয় কি? আবার সেই যোয়ান রক্ত ফিরে বইছে যেন! আঃ—(তৃপ্তিসূচক হাই তুলিল।)

পত্নী। এ কি বাবু হ্যাঁঃ!—এ কি খাওয়ালে? আমার যে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে—এ্যাঁ—আমি বুড়ো মাগী—ওগো,—

কৃষক। আবার বলে, বুড়ো মাগী!—আরে, পাকা মাথা কাঁচা হয়ে উঠেছে যে—

পত্নী। ওগো, মেয়েটাকেও একটু দাও—আহা! আমি গান গাই—(গান ধরিল) তুমি নাচবে?—হ্যাঁ গা, একটু নাচ না—

কৃষক (কন্যার প্রতি) নে বেটী খা—(কন্যাকে পান করাইল)—কি রে বেটী, কেমন লাগল?

কন্যা। বেশ—বাবা—আর একটু আমায় দে না!

কৃষক। আবার? নে বেটী, নে, খা! (কন্যাকে পাত্র প্রদান) এক কাজ কর্ দেখি, এখন একবার আমার বুড়ো দাদা,—তোর কত্তা মশাই রে—একলাটি আঁধার কোণে বসে আছে—তাকে ডেকে আন্। তোর মামা,

কাকা, পিসে—সব মাঠে আছে, সকলকে ডাক্—বল্‌গে এক নতুন জিনিস পেয়েছি—সব্ খেয়ে যাক্! যা—যা—ছোট্—ছোট্—উড়ে যা রে বেটী—(কন্যা ছুটিয়া প্রস্থান করিল; পরে স্ত্রীর প্রতি) কি গো, আর এক পাত্তর নেবে?

পত্নী। আবার—? তা, দাও—

কৃষক। প্রথমে জিভ্‌টা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়—তারপর মাথা—তার পর সারা গা! পা দুটো ভারের মত মনে হত, এখন যেন লতার মত লগ্‌বগে বোধ হচ্ছে! লতার মতই শরীরটে দুলতে চাইছে!

পত্নী। মাধা—আর একটু আমায় দে—

চাষা-দূত। এই যে মা-ঠাক্‌রুণ। (স্বগত) আর কি—এবার বাগে পেয়েছি! কেমন! আজ হল গে, সেই তিনটি বছরের শেষ দিন! এখন আসুন মহারাজ—আমি ত কাম ফতে করে দিয়েছি!

(কৃষকের বৃদ্ধ পিতামহ ও কয়েকজন আত্মীয় প্রবেশ করিল)

পত্নী। এস সব—আমোদ কর—হাওয়ায় যেন কোথায় উড়ে চলেছি!

(গীত)

হাওয়াতে উড়িয়ে দে রে সব—
কোণে বসে কিসের কলরব!
ভয় কি রে—পাপ যদিই বা সে হয়—
পাপের ভরা শিরে কে না বয়!

ঠাকুর্দ্দা। এ কি—সেঁউতির মেয়ের মাথা বিগড়ে গেছে না কি! ছি, ছি—হায়া নেই, ঘেন্না নেই! কি, এ?

কৃষক। ঠাকুর্দ্দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এক ঢোক খেয়ে ফেল—গায়ে বল পাবে, মনে তেজ হবে, প্রাণে ফূর্ত্তি পাবে,—এক কথায় হারানো বয়স ফিরে পাবে, ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুর্দ্দা। নাঃ!—সব বিগড়েছে, দেখছি—কাণ্ড কি এ? বলি, অ নাতবৌ—এ—করছ কি? এত লোকের মাঝখানে—তোমায় ভূতে পেয়েছে না কি!

কৃষক। বুঝবে না—বুঝবে না। আগে একটু এই মিঠে পানি পেটে ঢাল দেখি—তখন সব বুঝবে! দুনিয়ায় কেন এসে খেটে মরছ—চারধারে আলোর ঝাড় দুলছে—দেওয়ালির আমোদ চলেছে! খালি ফুর্ত্তি কর—খালি ফুর্ত্তি! কাজ-কর্ম্ম সব দূর করে টেনে ফেলে দাও! কেন খাটা? মিছে সে সব! আয়েস কর, আমোদ কর। হারু, ভুবন, নাও ভাই, সব এক-এক পাত্তর খেয়ে নাও। বুড়োর কথা শুনো না! মাধা, দে সকলকে—

চাষা-দূত। এই ন্যান্ কত্তারা সব। (বৃদ্ধ ব্যতীত সকলে পাত্র লইল - সকলের পান।)

কৃষক। কেমন লাগল? আবার খাও—মাধা, দে, আবার আমায় আর এক পাত্তর দে।

পত্নী। আমাকেও আর এক পাত্তর! যত খাই, ততই যেন প্রাণ উতলে ওঠে—

(গীত)

ওরে আমার নয়ন-মণি—

ঠাকুর্দ্দা। থাম্ বলছি! নাঃ,—সব গেল! (মাথা নাড়িয়া বসিয়া পড়িল)

চাষা-দূত। খেয়ে যান, কত্তারা—কত খাবেন! বুড়ো দাদা—আপুনি একটু খাও—

ঠাকুর্দ্দা। চোপ্—!

কৃষকগণ। দে, আমাদের দে, মাধা—আবার দে!

চাষা-দূত। এই যে—এই যে—(সকলের পান)

কৃষকগণ। এস্ ভাই—মজলিস লাগিয়ে দি, সব! খালি নাচ গান,—কাজ-কর্ম্ম সব শিকেয় তোল—একটু আমোদ করে নি! চিরদিনই কি খাটব? কেন—? বয়ে গেছে, খাট্‌তে!

(সকলে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিয়া দিল)

কৃষক। ঠাকুর্দ্দা—একটু খেলে হত না—?

ঠাকুর্দ্দা। (উঠিয়া কটাহস্থ তরল পদার্থ উনানের মধ্যে ঢালিয়া দিল)

কৃষক। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—ঠাকুর্দ্দা বলে এ আব্দার মানছি না—এত বড় বেয়াদপি! (ঠাকুর্দ্দাকে ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল) বেরসিক বুড়ো,—সবটুকু আগুনে ঢেলে দিয়েছে! এ্যাঁ! এমন মিঠে পানি—ঠাণ্ডা সরবৎ—আহা হা হা—

ঠাকুর্দ্দা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছিস, সব,—এখন আর মানা মানবি কেন? ওরে, সকলের মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে, তোদের—! মাঠের এমন ফসল—চেষ্টা-বেষ্টা করলে সব ঘরে ঘরে সোনার খনি বানিয়ে ফেলতে পারতিস্! ভাত-কাপড়ের কোন দুঃখু থাকত না! মেয়েগুলোর গায়েও পৈঁছে-খাড়ু দিতে পারতিস! যেমন তোদের বরাত! এ ত সব বিষ গিলছিস্—বেহুঁস হয়ে গিলছিস! এর পর, শতেক খোয়ার হবে, দেখে নিস্! এ তোদের ঠাণ্ডা সরবৎ? হারে হতভাগা—এ সরবৎ নয়—এ আগুন গিলছিস! খেয়ে ঠাণ্ডা হবি, ভেবেছিস্—? এ খেয়ে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবি সব!

(একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া কটাহের উপর রাখিল; কটাহের অভ্যন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কৃষকের দল সন্ত্রস্তভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।)

পঞ্চম অঙ্ক

কুটীরাভ্যন্তর।

'জন'-বেশী চাষা দূত।

চাষা-দূত। এখনো যা ধান পড়ে আছে—তা অঢেল! রাখবে কোথা, এমন জায়গা নেই! তবে ধান্যেশ্বরীর স্বাদ যখন একবার পেয়েছে, তখন আর দেখতে হবে না! আবার কড়া চড়িয়ে এসেছি—খুব চড়া জাল লাগিয়েছি! গাঁয়ে এখনও অনেক চাষা আছে, যারা এখনো এ ধান্যেশ্বরীর স্বাদ পায়নি! পরাণকে দিয়ে সকলকে ডাকাই। সকলকে খাইয়ে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেওয়া যাক্। এ জিনিসও এমন নয় বাবা!—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ! এই গলাগলি—একটু পরেই, অমনি হাতাহাতি বাধিয়ে দিতে এমন মন্তর আর দুটি নেই! তার পর দলশুদ্ধ একেবারে মহারাজের দরবারে চালান করে দোব। কিন্তু—ঐ বুড়োটা ত আচ্ছা জোর বাঁধুনিতে মনটাকে বেঁধেছে—সে বাঁধ একটু টস্‌কালো না!... এ কি—মহারাজ—

(পাপের প্রবেশ)

চাষা-দূত। (অভিবাদন করিল)

পাপ। তোমার খবর কি? বাগাতে পারলে? পান্তা-ভাতের প্রায়শ্চিত্ত হল?

চাষা-দূত। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! কাজ এবার বাগিয়েছি, চমৎকার! আপনি একটু আড়ালে থাকুন—দলশুদ্ধ এখনি ধরা প'ড়বে। সবাই এখানে এসে জুট্‌বে'খন! ঐ ও ধারে ধোঁয়া দেখছেন—? মস্ত উনোন কেটে তার উপর প্রকাণ্ড কড়া চাপিয়েছি ধান্যেশ্বরী বিপুলা হয়ে বিরাজ করবেন—আপনারও কাজ হবে।...চাষাকে পরামর্শ দিয়েছি,—তার ঠাকুর্দ্দা তার জমি-জমা কেড়ে নেবে—তাই সে এখানে আজ গাঁয়ের লোক ডেকে পঞ্চায়েৎ বসাচ্ছে—তারা ধান্যেশ্বরীর মহিমায় হাঁ-কে না বলে যাবে—মিথ্যের নামতা আওড়াবে—অমনি আমাদের শেকলে বাঁধা পড়বে! ব্যস্—

পাপ। বেশ—বেশ—আমি একটু আড়ালে যাই। ঐ বুঝি সব আসছে?

(অন্তরালে গমন)

(পরাণ ও তৎসহিত একদল কৃষকের প্রবেশ)

১। হ্যাঁরে পরাণে, আজ আর বুঝি মিঠে পানি-টানি তৈরি করাস্ নি?

২। তোমার মিঠে পানির সুখ্যাতিতে ত দাদা, গাঁয়ে একেবারে ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে! কি রকম জিনিসটা হে—আমরা ত কখনো এমন জিনিস মুখেও দিইনি—

৩। শুন্‌লুম না কি—কাঁচা বয়স ফিরে আসে—তোমার ঐ মিঠে পানি খেলে?

৪। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, বল কি!—এ্যা?

১। তাই ত—এমন জিনিসও পাওয়া যায়—যা খেলে আর দুঃখু-কষ্ট থাকে না—

৫। প্রাণ না কি তর্ হয়ে যায়?

কৃষক। মাধা—

চাষা দূত। এই যে কত্তা, এনে দিচ্ছি।

(পাত্র ভরিয়া মিঠা পানি আনিয়া দিল। সকলের পান।)

১। না! খাসা বটে!

কৃষক। খাও সকলে!

(কৃষক-পত্নীর প্রবেশ)

এই যে, গিন্নি এসেছ—তুমি তা হলে সকলকে খাওয়াও দেখি।

চাষা-দূত। (জনান্তিকে, পাপের প্রতি) এবার আমি একটু মজা করি, দেখুন, মহারাজ! এরই পান্তা কেড়ে নিছলুম, এই পরাণের। তখন ও এতটুকু রাগ করে নি! আর এখন দেখুন—ওর বৌয়ের পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দি—চমকে উঠে অমনি ও পাত্র ফেলে দেবে! এই ধান্য-রস, ধান্যেশ্বরীর জন্যে ও কেমন রেগে ওঠে, দেখুন।

পত্নী। বেশ, বেশ—আমি দিচ্ছি।

(চলিতে গিয়া তাহার পা লাগিয়া একটি পাত্র উল্টিয়া পড়িয়া গেল)

কৃষক। কি! ভারী নবাবী চালে চলেছিস যে, দেখছি! এমন জিনিস ফেলে দিলি, মাগী—(স্ত্রীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল)

পত্নী। তবে রে মিন্সে, আমার গায়ে হাত তুললি! আজ তোর একদিন, কি আমারই একদিন—(প্রহারোদ্যতা)

সকলে। আহা হা—কর কি—কর কি! যেতে দাও, যেতে দাও—

চাষা-দূত। (জনান্তিকে, পাপের প্রতি) দেখলেন মহারাজ—ধান্যেশ্বরীর প্রভাবটা একবার দেখলেন? এরাই আগে কত ভাল মানুষ ছিল—কারুকে কড়া কথাটি বলত না—

আজ ধান্যেশ্বরী পেটে ঢুকেছেন অমনি দাঙ্গা অবধি বাধিয়ে দিতে পেছ-পাও নয়!

পাপ। (জনান্তিকে) বেশ—বেশ—তোমার বখশিস্ মিলবে!

চাষা-দূত। (জনান্তিকে) আরও দেখবেন 'খন—আগে কড়ার ঐ রসটুকু ফুরিয়ে যাক না, একবার। আমি কড়ার তলায় ছোট একটা ফুটো করে দিয়েছি—তা দিয়ে সব রস আগুনে পড়ে যাচ্ছে। ও ত এখনি ফুরিয়ে যাবে—তখন একবার কাণ্ডখানা দেখবেন। এখন এর মাহাত্ম্যে এই পরাণে ব্যাটার সব খোসামোদ করে কি রকম, দেখুন—ঠিক শেয়ালের মত সব ল্যাজ নাড়তে থাকবে'খন! একেই বলে, শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি!

কৃষক। দেখ, ভাই সব—আজ আমি তোমাদের পঞ্চায়েৎ ডেকেছি—একটা মীমাংসার জন্যে। আমার ঠাকুর্দ্দা—সেই বুড়ো—আমার সঙ্গে ঝগড়া করে এখান থেকে ত চলে গেছে—ভিন্ গাঁয়ে আমার এক জ্ঞাতি খুড়ো আছে, তার বাড়ীতে গিয়ে সে উঠেছে। সে বলে পাঠিয়েছে, আমি কাজ-কর্ম্ম করছি না, চাষ-বাসে গাফিলি করার দরুণ তার জমিগুলো বরবাদ যেতে বসেছে! তা শোন ভাই সব—আগে সাব্যস্ত হোক ত, জমি কার,—তারপর তার কৈফিয়ৎ—কি বল?

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

কৃষক তা তোমরা পাঁচ জনে যা বলবে, আমি তা মাথা পেতে নিতে রাজী আছি—ওরে মাধা—পাত্তর দে না—সবাইকে দে।

(চাষা-দূত-কর্ত্তৃক সকলকে পাত্র প্রদান—সকলের পান)

সকলে। হ্যাঁ, তারপর?

কৃষক। তার পর, হাঁ, যা বলছিলুম,—আমারও কথা এই, আমি আজ বিশ বছর এই জমি চাষ করছি;—মানি বটে, এ জমি ঠাকুর্দ্দার। কিন্তু বিশ বচ্ছর ব্যবহার না করে তার স্বত্ব এতে লোপ পায়নি কি? বুড়ো বলে, তা কেন? তোমায় দিয়ে আমি জমির চাষ করাচ্ছিলুম—তুমি লাভের কড়ি খেয়েছ—আমার স্বত্ব যাবে কেন? তা—তোমরা কি বলতে চাও, এটা আমার জমি নয়—? আমার এতে কোন অধিকার জন্মায় নি? ওরে মাধা—পাত্তর দে—পাত্তর দে! (কথাবৎ কার্য্য)

১। নিশ্চয়, এ জমি তোমার—(পান)

২। খবরদার ছেড়ো না—(পান)

৩। বুড়ো এবার চাইতে এলে, তার মাথায় এক লাঠি বসিয়ে দিয়ো—গোল চুকে যাবে। (পান)

৪। ব্যস্, ব্যস্, বুড়োর মাথা, ঘুন ধরা মাথা—একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—(পান)

৫। তার পর কে তোমার দখল কাড়ে? (পান)

১। ওহে পরাণ, আর এক পাত্তর দিতে বল—মোদ্দা, ও জমি তোমার—কে তোমার ঠাকুর্দ্দা? তাকে আমরা চিনি না—

২। বটেই ত, জমি তোমার—

৩। একশ' বার তোমার—

৪। পাঁচ শ বার—

৫। হাজার বার। ডাক হে—ঠাণ্ডা পানি ডাক—বিস্তর মাথা ঘামানো গেছে!

কৃষক। মাধা—

চাষা-দূত। (করযোড়ে) আজ্ঞে কত্তা —অবধান হয় - বড় ব্যাভ্রম হয়েছে। মিঠে পানি আজ আর নেই। সব সাবাড় হয়ে গেছে!

সকলে। কি! সাবাড়? অপমান—! বটে!

কৃষক! (শশব্যস্তে) আর একবার দেখ্ না, মাধা—দেখ্, দেখ্—

চাষা-দূত। আর ছাখ্‌ব কি! কড়ায় কি আর রস ছাখতে পাব—এখন চড়ক গাছ ছাখতে হবে!

সকলে। কি! ডেকে এনে অপমান করা! পরাণে, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! বেটা—ঠকিয়ে তুমি জমি গাপ্ করতে চাও—

২। আমরা চল্লুম তোর ঠাকুর্দ্দার কাছে—

২। এত তারই জমি—তোর জমি কোথা থেকে হল রে, বেটা?

কৃষক। আজ্ঞে—

৩। আবার, আজ্ঞে!—সরে যা, নইলে মার খাবি।

৪। ওহে, অত চট কেন! বলি, পরাণ ত আর বলছে না যে, আর পানি দেবে না—

১। কি—খোসামুদি! এমন বাপের বেটা নই আমি যে, কারো খোসামোদে ভুলব! আমি হলুম গে, পাঁচ পুরুষ ধরে গাঁয়ের মোড়ল! আমার কাছে চালাকি?

৪। বলি, শোনই না—

১। আবার—কথার উপর কথা!—(বিরাট ঘুসি প্রহার)

৪। কি? মার্—? দেখবি তবে? পরাণে—

৫। মাঝেরপাড়ার দল আমরা—ন' পাড়ার কাছে হঠে যাব? কিছুতে না—এক ঘুসি দিয়েছ—তবে এই নাও, দু ঘুসি! একটা শোধ, একটা সুদ! (প্রথমকে প্রহার করিল)

২। বটে! জমাতে চাও? তবে, এস। রণং দেহি, রণং দেহি, রণং দেহি দেহি যে (দুই দলে দাঙ্গা বাধিয়া গেল)

চাষা-দূত। (জনান্তিকে পাপের প্রতি) এবার সেই সিঙ্গীর বল দেখা দিয়েছে! সিঙ্গীর মত সবার রক্ত ঝেঁজে উঠেছে! আর এক পাত্র দেওয়া যাক্—মজা দেখবেন'খন।

কৃষক। চুপ—চুপ, মারামারি কেন?

চাষা-দূত। (দৌড়িয়া গিয়া পাত্র আনিয়া দিল) কত্তা, এই যে পাত্তর পাওয়া গেছে—

সকলে। দাও, দাও—(সকলের পান) এস ভাই, ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যাও—আবার সব ভাই-ভাই! ওহো, ভাইরে—(পরস্পর আলিঙ্গন) এস একটা গান করা যাক্—(সমস্বরে গীত)

কিসের এত ঝগড়া-ঝাঁটি, গণ্ডগোল বা কেনই হায়?
শরণ সবাই নিইছি যখন, ধান্যেশ্বরীর কোমল পায়—
(মরি হায় রে!)

ষষ্ঠ অঙ্ক

গ্রাম্য পথ।

দক্ষিণ পার্শ্বে ভূপতিত একটা বৃক্ষ-কাণ্ডে ঠাকুর্দ্দা বসিয়াছিল। মধ্যে বালক-বালিকারা খেলিতেছিল। কিশোরীর দল টুকরি বুনিতেছিল। বাম পার্শ্বে কুটীর হইতে সুরাপায়ীগণের জড়িত কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল। একজন কৃষক টলিতে টলিতে কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া পথের উপর পড়িয়া গেল। পরাণ কৃষকের প্রবেশ।

ঠাকুর্দ্দা। কি, এ সব? হল কি এ! আগে ত এমন ছিল না। দিন ভোর মাঠে-ঘাটে খেটে, রাত্রে যে যার কুঁড়েয় ফিরে, ছেলে-পিলেদের নিয়ে আদর-গল্প করে তোফা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে জিরিয়ে নিত! আবার ভোর হতে না হতেই কাজ করতে মাঠে ছুটত! কোন অভাব ছিল না, বালাই ছিল না! যেমন শান্তি, তেমনি তৃপ্তি! দ্বেষ-হিংসে কেউ জানত না! আর আজ? (কুটীরাভ্যন্তরে ভীষণ কোলাহল শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিল) নাঃ, এ অসহ্য! মানুষ অধঃপাতে চলেছে—পাপের রাজ্য পূর্ণ হচ্ছে! শুধুই খাওয়া, শুধুই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি—পশুর মত কি এ ব্যাপার! ছি!

(কুটীরাভ্যন্তর হইতে সুরাপানোন্মত্ত কয়েকজন লোক বাহিরে আসিল। একজন এক কর্ম্ম-নিরতা কিশোরীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।)

কিশোরী। এ—কি—ও বাবারে, অ ঠাকুর্দ্দা—হীরু দা, হীরু দা,—আমি, আমি মেনকা—

ঠাকুর্দ্দা। (উঠিয়া কিশোরীকে মুক্ত করিয়া) বদমায়েস, পাষণ্ড, কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে বসেছ! এত দূর অধঃপাতে গেছ!

কিশোরী। এখান থেকে আমরা পালাই, ঠাকুর্দ্দা—

(কিশোরী ও বালক-বালিকাগণের প্রস্থান)

পরাণ। কি,—ঠাকুর্দ্দা যে! আছ, কেমন? আমি পঞ্চায়েতের সালিসি ডেকে ছিলুম। তারা বলেছে, ও জমি আমার! জমি নেবে না? বাহাদুরে বুড়ো—আজ বাদে কাল চোখ কপালে উঠবে, এখনও জমির লোভ! জমি নেবে? এই নাও—(দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সবলে বৃদ্ধের মুখে গুঁজিয়া দিল। বৃদ্ধ সরিয়া গেল। টাল রাখিতে না পারিয়া পরাণ বৃক্ষ-কাণ্ডের উপর পড়িয়া গেল)

ঠাকুর্দ্দা। চমৎকার জানোয়ার সব তৈরি হয়েছিস, দেখছি! (গমনোদ্যত)

কোলাহল করিতে করিতে কুটীর-মধ্য হইতে কৃষকগণের প্রবেশ।

সকলে। ঠাকুর্দ্দা, যাচ্ছ কোথায়—বলি, অ ঠাকুরর্দ্দা, একটা গান শুনে যাও—

(গীত)

মনে হা হা—মনে আহা, বেজায় এ কি ফুর্ত্তি!
দিবা-নিশি করি পূজা ধান্যেশ্বরীর মূর্ত্তি!

(নৃত্য ও সকলের পতন)

ঠাকুর্দ্দা। (ঘৃণার সহিত তাহাদিগের পানে চাহিয়া বিরক্তভাবে স্থান-ত্যাগ করিল)

চাষা-দূত। দেখলেন, মহারাজ! এই ধানই ছিল, এদের লক্ষ্মী—এই ধানের জোরেই এরা মানুষ ছিল—আপনাকেও মানত না! আর এই ধান দিয়েই আজ তাদের বন্দী করলুম! এই ধান থেকে ধান্যেশ্বরীর সৃষ্টি! এখন কেমন শূয়রের মত সব মুখ গুঁজে পড়েছে, দেখুন! সে সিংহ-বিক্রম, সে শেয়ালের মত ল্যাজ নেড়ে ধূর্ত্তামি—সে সব কোথায় গেছে! এখন সব শূয়রের মত হয়ে গেছে। এই যে পরাণ—মাটিতে পড়ে, মুখে কাদা মাখা,—দেখতে কেমন হয়েছে, দেখুন—ঠিক শূয়রের মতই না?

পাপ। তাই ত—এ কি? শেয়াল, সিঙ্গী আর শূয়র কেটে ধানের সঙ্গে বুঝি তাদের রক্ত

মিশিয়ে ধান্যেশ্বরী করেছিস? খেয়ে এরা ত দেখলুম, শেয়ালের মত খানিক ল্যাজ নাড়লে; সিঙ্গীর মত গর্জ্জন আস্ফালনও দেখলুম, আবার এখন শূয়রের মতই মাটিতে মুখ গুঁজে সব ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করচে!

চাষা-দূত। এই পরাণ—আগে যতদিন তার ধান-চাল ঠিক সমানভাবে জন্মাচ্ছিল, তত দিন নিজেও বেশ ছিল। তারপর আমি নিজে জন' খেটে ওর দরকারের চেয়েও ঢের বেশী ধান জন্মে দেওয়ালুম। প্রচুরের সঙ্গে সঙ্গে ওর আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেল, বিলাস এল—ব্যস্—তার পর ফরমায়েস, ফুর্ত্তি চাই! আয়েস চাই! তারই ফলে সেই পরাণকে এখন মহারাজের পায়ের নফর করে দিতে পেরেছি! এক ধান্যেশ্বরীর প্রভাবেই আমার কাজ কত সোজা হয়ে গেছে!

পাপ। খাসা জিনিস, তোর এই ধান্যেশ্বরী ত! তোকে রীতিমত বক্‌সিস দেব। এমন জিনিষ মাথা খাটিয়ে তুই বের করেছিস, এর জোরে দুনিয়া লুটে নেব। এত লোকজন, পাইক-বরকন্দাজ, এত তোড়-জোড়, ফাঁদ-ফন্দী কিছুরই দরকার থাকবে না, নরকের খরচও ঢের কমে যাবে। শুধু এই ধান্যেশ্বরীকে পাঠালেই চল্‌বে। এ একাই সকলের কায করতে পারবে। আজই রাজ্যে ফিরে ঘোষণা দেব, ধান্যেশ্বরীকে আমি পাটরাণী করব! সে আমার সহায় থাকলে, আমি আর কারো সাহায্য চাই না, পলকে দুনিয়া জয় করে ফেলব!

যবনিকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সভাপতির অভিভাষণ

[উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত]

প্রাচীন ঋষিরা সভা ও সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতিছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
যেনাসংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর
সঙ্গতেষু॥

বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নাম বৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃনু॥
যদ্বো মনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহ বা।
তদ্বাঃ আবর্ত্ত্যায়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন।

আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসদের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারো মন পরাগত হইয়া থাকে, কিম্বা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আদিকবিদিগের হৃদয়ের ভাষা; সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকার ভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি; উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি; ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি; প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনার্য্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনার্য্য ভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা। আমাদের কিসে অধিকার আছে? নির্ম্মম হৃদয় নির্ব্বাক অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ত্তিনী, পঙ্কিল পদে সে পথে চলা যায় না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বে, আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

ইদং ঋতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন পুরুহূতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরশীমহি॥

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

সচন্দ্রজ্যোতিঃপ্রকাশিতা নেত্রী ঊষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন; দীপ্তিমতী আলোক বিকাশিতাঙ্গী দেবী ঊষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা, আমরা নিদ্রাতুর কখনো তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা, তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

ঊষা জ্বলন্ত বলিয়া, "ভাস্বতী"।

আলোকের উৎস বলিয়া "ওদতী"।

অন্যকে আলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা"।

রক্তিম বলিয়া "অরুষী"।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী"।

শুদ্ধ বলিয়া "রিতাবরী"।

জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী" যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি।

সঞ্চারিণী বলিয়া "সুনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে, তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া কেহ ডাকিতে পারে না। বৈদিক কবি ঊষাকে অনাবৃতাবক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী ও রিতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও সূর্য্যপত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিতা করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। দ্বিধাশূন্য সংশয়শূন্য, অপরের অবলম্বন রহিত বীর্য্য-শালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয় তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন ঃ—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমা
পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরং॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নঃ পরং কিং চনাস॥

Nor aught nor naught existed; yon bright sky
Was not, nor heaven's broad woof outstreched above.
What covered all? what sheltered? what concealed?
Was it the water's fathomless abyss?
There was not death—hence was there naught immortal.
Maxmuller.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহি না।

নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নূতন আলোক আপনার হৃদয়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম; বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি

আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। ভাগ্যের দোষ দেই না। বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা; শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শিক্ষক; মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়-তার অবতারণা রাজসূয় যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য, অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা বারবণিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে সক্ষম, আহুতি ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদি কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু ও শিক্ষক ছিলেন। সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিম্বা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম্ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎ কারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি? তুমি আপনি অবলম্বন রহিত, কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার কোণে বসিয়া জগতের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ু বিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা; অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টির গোচর নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a kingdom is তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব হৃদয়ের সাহস। ধর্ম্মবল, কাব্যবল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকাচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, কিন্তু পরের কোষ্ঠী কাটিতেও অনুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি Beranger, নেপোলিয়নের সমসাময়িক ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন—"আর লিখিব না বলিতে পারি না, কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর দেখিতে চাহি না। জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে মনে হইলে, অকাতরে ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না, সে কথা যদি বেচা কেনা চলে চলুক—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া আছে তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই।" অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন। আমি বলিলাম বলিয়া যদি আমাকে মাপ করা প্রয়োজন মনে করেন মাপ করিবেন। আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবস্থাক্রমে আমরা অনেকেই হাটের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, কিন্তু উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য তাহার অন্য প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্যজগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানসজাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহার আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে কবি কঙ্কালে পুনর্জ্জীবন দেন। তাঁহার রচনা মধ্যে দেবদেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটক সামাজিক চিত্র; যাহা আছে কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি তাহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণীসকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয় সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানবহৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা, মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে ততদিন

আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খল কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতি সাধনা করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর কুৎসিত, সত্য মিথ্যা, অনুরাগ বিরাগ সকলেরি নাট্যরাজ্যে স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ, মনুষ্য হৃদয়ের জলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহাকে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না; তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিম্বা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর অস্পষ্ট আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন রাগের মূর্ত্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই অনুরাগ, সেই আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপান আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জগতের রাজ্য অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গলা লেখাপড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই সময়ের পূর্ব্বে ঠিক তাহাই ছিল। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গলা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, আর আমাদের ইংরাজী ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন। Roger Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন—"...although to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter in English tongue for Englishmen..." তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনারীতি সৃজন করেন যখন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an *inistar cotes* to stir up some other of meet ability to bestow travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, নবজলধর-পটলসংযোগে প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা ভাষার হাতে গোণার

হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী পড়িয়াছিল। পুস্তকের নাম Hecatompathia ও প্রত্নকমতত্ত্বনন্দিনী প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই; more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লেখা হইয়াছে। রাজা সতী অসতী, শনি ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা এইরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। লাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাধারণ মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। ইংলণ্ডে Morality plays, Interludes, Senecan tragedies, Chronical plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্য পূরাণ মানিক চাঁদের গান, রাম যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলেমেয়ের উপর যখন চোখ পড়ে তখন নিজের কর্ত্তব্যও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয় বলিয়া সেই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রতিভা নূতন ছন্দে প্রতিভাত হয়। Sackville ও Shirleyর মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্ষপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। পূর্ব্ব সময়ের নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা ও জঘন্য ভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপপুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত; তাই তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং-এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব হৃদয়ের দরদ দিয়া মাখা;—এই সত্য-মিথ্যা-জড়িত মানবসমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না; Renan এক স্থানে বলিয়াছেন "জগদীশ্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি সে রহস্য আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ। সত্য যদি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।"

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানবসমাজের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাঁহার পরেও জনকতক কবি, সেস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করে। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নব-জীবনের স্রোত বহিয়াছিল ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আবেগ মন্দীভূত হয়, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরব হ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ

তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বিশেষত্ব গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে, যাহা আছে তাহা বজায় রাখিতে যত্নবান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী সবই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা, মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচ-কচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর

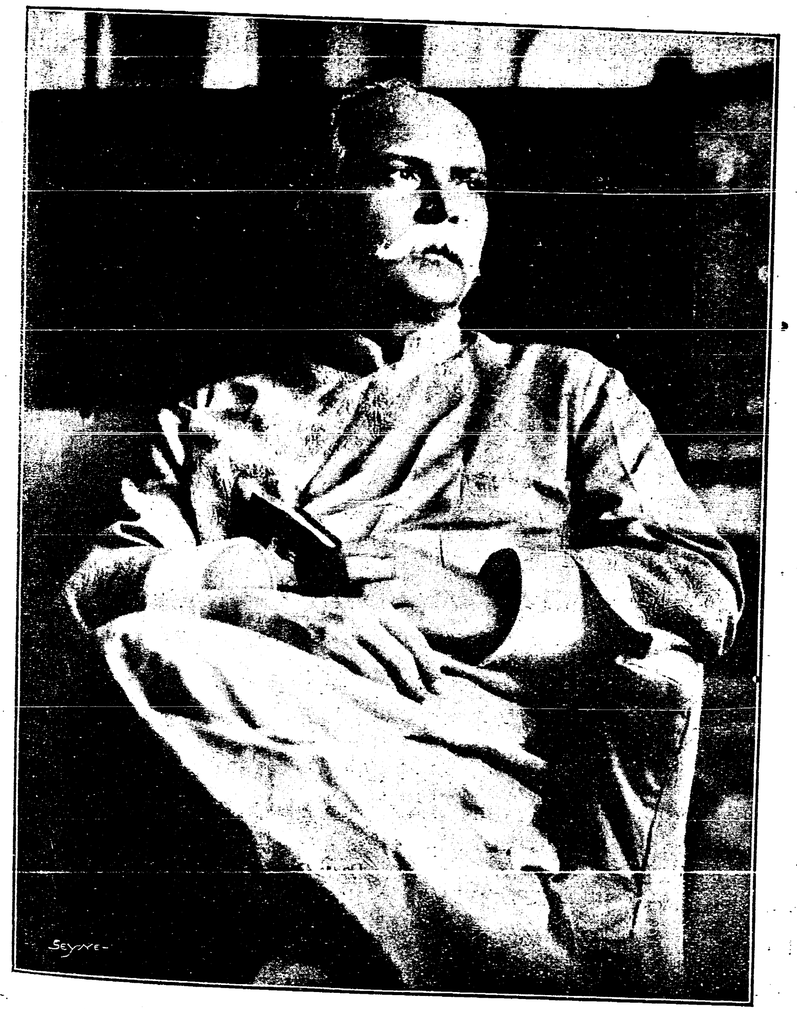

মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, এল্, এল্, বি
[দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি]

কোথায়? যেমন ইংরাজী সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্য দেশ, কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বের কেল্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। Conquering Frankরাও সেই ভাষার মধ্যে নূতন ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil War গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন,—বহু দিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাঁহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া কোনরূপে পরিত্রাণ পান, কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্য শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon. সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং এক নূতন তেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন এবং ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া এক-জন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্য জগতে Cornneille, Racine পরে Moliere এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারি পথবর্ত্তী; ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদৃত। Pleiad: দিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল, ধনী নির্ধন ছিল না; সকলেরি সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে তাহার সাহিত্য-সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। French Revolution-এর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটী চিত্র আপনা-দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভি-জাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্যে, বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Bas, মহৎ ও নীচজাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপি কিম্বা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল, mouchoir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনাখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার

মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতি দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য জগৎ Victor Hugor র কিছু পূর্ব্বে হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক-দল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত, সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের Classic School এর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যাহারা আধুনিক, তাহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাহারা উন্মাদের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন; এমন কি অনেকে নিজের পারি বারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন; তাহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তাহারা ভদ্র-সমাজের কালো Hat, Coat ছাড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন না;—বিবিধ বর্ণের বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন; পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী, অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইহারা প্রায় সকলেই সাহিত্যসেবক। অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune, Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugoর কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাহার প্রথম নাটক Cromwell এর উপক্রমণিকার কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gautier এই উপক্রমণিকাকে সাহিত্যের Mount Sinai এর Ten Command-ments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ বিসম্বাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 25th Feb. 1830, যে দিন Hernani অভিনীত হয়, 14th July এর মত পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য জগতকে নূতন আলোকে আলোকিত করিল। Hugo পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক Hugo-সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন; পৌরাণিকের দলও স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবক-বৃন্দ সারাদিনের খাদ্য দ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ভিতরে পুলিশ, বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তলন মাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িলেন না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলী) উচ্চারিত হইবামাত্র

বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল - derobe নূতন রকমের বিশেষণ, আবার তাহার উপর এক ছত্রের শেষ ভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ derobe. ভাষার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিকেরা গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাঁহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। একজন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugoর নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্বের জন্য ৬ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, বলিলেন প্রথম অঙ্ক শেষ হইতেই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ কর, না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০০০০ ফ্র্যাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না', তিনি ৬০০০ হাজার ফ্র্যাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন, অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্য পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না, এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিশে ও সৈনিকে শান্তিরক্ষা করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল—পরে সকলেই নত মস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন; ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়া লইলেন। Hernani নাটক-কল্পে উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত নহে কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত। আমি তাই বলি মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্যসেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয় এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গলার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খল ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব দেবীর প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দেই; আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়ামের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে, আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলা ভাষায় তেজ হয় না। তাই আজ কাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গলা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরাজী

পদ দিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গলা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরাজী ভাবটি (চৌর্য্য-বৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরাজী কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই ইংরাজী এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থবোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরাজী ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটী যেন ভুলিয়া না যাই যে শব্দ মাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে যেমন geological periods আছে শব্দেরও সেইরূপ। মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব; শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিম্বা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্রজ্ঞ ঋষি পুরুষ, তিনি দেবতুল্য। তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গা মৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয় কি গড়িতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ি পেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গলা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজী না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী ভাষা জারজ, Froude বলেন mongreal, তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে; অনেক সময় একবারেই নিজের ঘরের হয় না; হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে সে এক-প্রাণা হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন শাস্ত্রকে কিমিতিনির্নিতি বলাতে পাগলামী আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙায় গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবী "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie স্কচ কুকুরের নাম আনন্দ বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা কেনা করে, তাহাদের পক্ষে নাম ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্য-জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, ইউরোপীয় সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গলার অভিধান

ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না আধ আধ ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলা, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব? তরুলতা জাতিযুথি, সোনার আলা, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি, সবই অতি সুন্দর; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনো হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়; বাঙ্গলা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য জগতে নাই; বাঙ্গালীর পক্ষে মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয় বলি, 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?' রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাসই করিলেন তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না; আমরা এই অবসরে গঙ্গা স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড় জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী ঢাল তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী কবি মাতৃদুগ্ধপিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ, কিন্তু সেই মোহমুগ্ধ হইয়া কত দিন যাপন করিবে? তোমাকে মদনমনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না, সে বেশে তুমি অতি সুন্দর স্বীকার করি, আমার বিশ্বাস যে তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝরপ্রসূত মন্দাকিনীবারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে।

আমি এক স্থানে বলিয়াছি সত্য জগতে "অহং"-এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্য কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নহে। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু আবিষ্কার হইবামাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়; সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম; বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই জন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যে তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যথার্থ যাহাকে বলে তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সের

ইতিহাসে এই কথার সত্যতা প্রমাণ হয়। এবং এই দুই দেশের সাহিত্য দেখিলে, দেখিতে পাইবেন যে জাতীয়-ইতিহাস কতটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্য, যে "সাধনার" কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্ভাসের জন্য রৌদ্র তেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখনো গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে, নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষারই স্থান সংকীর্ণ। সাহিত্য বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেইরূপ বিভিন্ন ভাব-মিশ্রণে ভাবেও বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burnsএর নাম আপনারা সকলেই জানেন; স্কটলাণ্ডের মহাকবি; তিনি ইংরাজীতেও অল্প স্বল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। ফ্রেঞ্চ কবি Musset ইটালিয়নে, Heine ফ্রেঞ্চে কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। একথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার একটু উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গলায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়। আমি ইংরাজনবিশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর ডাকিয়াছিলেন' অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, ইংরাজীতে called on me এর অনুবাদ করিয়া বলেন। এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের "ডাকিয়াছেন" বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ they have asked me. এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধপালিত শিশু ও মেলিন্স ফুড-প্রভৃতি বিদেশী দুগ্ধপালিত শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয়। আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যতদিন পর্য্যন্ত রহিবে ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বপ্নমাত্র। নিজের দেশের ভাষায় অর্থ যতখানি বোঝায় পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারে না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই। তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না।

কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক উপলব্ধি না হইলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়াও কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদের সাহিত্যও তাহার বলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যও ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা প্রাচ্য বলিয়া

ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবের মধ্যে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের ভাষা ও ভাবের আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। একজন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন 'মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই।' এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ এক পক্ষে যেমন উন্নতির কারণ হইতে পারে, তেমনি অপর পক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা, তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমি সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংলণ্ডে Russian কিংবা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য হেতু এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে; দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রায়োজন হইয়া পড়িয়াছে;—সাধারণ সাদা সিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনে উত্তেজনা পায় না বলিয়া, বাহিরের উত্তেজনার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাসের সময় —Les chansons de geste এবং পরে Chante Fableএর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতি-কবিতার বলে সাধারণ-মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেরও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি, গাম্ভীরা চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন?

বাঙ্গলার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেইজন্য আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্ন এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দুই একটি বলিতে চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্র ছিলাম। চিরকাল তাঁহাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি এবং তিনিও আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি। তাহাও আজ মনে পড়িতেছে। তিনি যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গান মাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিনের মত অক্ষয় রহিত। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখনো হইবে না; আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পার্শ্বে বসিবার যোগ্য নহি। কিন্তু তোমার স্মৃতি চিরদিনই হৃদয়ে আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, তুমি যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিলে, আমাদের ছেলে মেয়েরা যেন সেই চক্ষে এই দেশকে সুন্দর দেখে এবং এই দেশের সন্তান বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সত্যই এবার বাঙ্গলার আকাশে ভীষণ কাল-বৈশাখী দেখা দিয়াছে। একে একে অনেকগুলি মহীরুহ উৎপাটিত হইল। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর, বিনয়েন্দ্রনাথ, কর্ম্মবীর জানকীনাথ প্রভৃতির চিতা নিবিতে না নিবিতে বঙ্গবাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রলালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল! 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানে'র কবি, 'বঙ্গ জননী'র গৌরব-মুগ্ধ সন্তান, 'দুর্গাদাস,' "রাণা প্রতাপ' 'ভীষ্ম' প্রভৃতির নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাকালের দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

কবি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্য আছে; নাট্যকার গিয়াছেন, নাটক যায় নাই; গায়ক গিয়াছেন, গানের সুর এখনও বাঙ্গলার আকাশে-বাতাসে ভরিয়া রহিয়াছে! কবির দেহ নশ্বর, চিতার অনল তাহা গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর—প্রলয়-দাহেরও সাধ্য নাই, তাহা ভস্মসাৎ করে!

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে প্রকৃতই যেন বঙ্গ-সাহিত্যের একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে—বাঙ্গলার এক কোণ খসিয়া গিয়াছে—চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে।

মৃত্যু আজ নিতান্ত অতর্কিতভাবে আসিয়াছিল, পূর্ব্বাহ্নে তাহার এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় নাই—তাই আমাদের বেদনা কোনরূপ সান্ত্বনা মানিতে চাহে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল আপনার রচনা-পরিমার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, সহসা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হওয়ায়, তিনি পুত্রকে ডাকিয়া টেবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া চেয়ারেই উপবিষ্ট রহিলেন। তখন সন্ধ্যা। পুত্র আসিয়া দেখিল, তাঁহার এতটুকু চৈতন্য নাই! বন্ধুবান্ধবও ডাক্তারে ঘর ভরিয়া গেল—সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল! দ্বিজেন্দ্রলালের সে লুপ্ত চেতনা আর ফিরিল না। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সহরময় রটিয়া গেল!

সাহিত্য-সেবীর পক্ষে এ মৃত্যু শ্লাঘ্য—বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিবার যোগ্য।

সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, আলোচনা করিয়া তাহার সীমা-নির্দ্দেশের এ সময় নহে! আজ শুধু সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা দুই-চারিটা মাত্র কথা বলিব।

১২৭০ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বাল্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর-রাজের দেওয়ান ছিলেন;—সাহিত্য-সমাজেও তাঁহার নাম অপরিচিত নহে। তাঁহার রচিত কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস ও আত্ম-চরিত গ্রন্থে নব্য বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু উপাদান সঞ্চিত আছে।



কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ঐতিহাসিকের নিকট সে গ্রন্থদ্বয়ের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। এখান হইতে এম, এ পাশ করিয়া কৃষিবিদ্যাশিক্ষার্থ তিনি বিলাত যাত্রা করেন;—তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন্। সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চাতেই সকল অবসর ঢালিয়া দিলেন, স্থির করিয়াছিলেন; অবসর-গ্রহণের অনুমতিও মিলিয়াছিল, কিন্তু কালের নির্ম্মম তর্জ্জনী হেলনে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্য গাথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাল্যাবধি কবিতা ও নাটকপাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল, যে বিদ্যাভ্যাসকালে বায়রণের Manfred ও Childe Haroldএর দুই Canto এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম।...১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে আর্য্যগাথা নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম! কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'দেবঘরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যর্ এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।" (নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।)

ইহাই তাঁহার কাব্য-রচনার প্রথম ইতিহাস।

তাহার পর 'হাসির গান' এবং 'আষাঢ়ে'র ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্য-রসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legendsএর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া "আষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি। * * * কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি।" Ingoldsby Legendsয়ের অনুকরণে লিখিত হইলেও 'আষাঢ়ে'র রহস্য-কবিতাগুলি কবির নিজস্ব ভাবে ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ-সুন্দর। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব সৃষ্টি। পূর্ব্বে এমন রচনা বাঙ্গলায় ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বতন কবিগণের রহস্যে ব্যঙ্গে একটা ব্যক্তিগত শ্লেষ প্রায়ই থাকিত—তাহাতে খাঁটি সাহিত্যরসের আনন্দ-টুকু সাধারণের উপভোগ্য ছিল না, তদ্ভিন্ন অশ্লীলতার মলামাটিও তাহা হইতে একেবারে বাদ পড়িত না।

সকল রচনায় একটা ধারাবাহিক স্তর দেখা যায়—কোন একটি বিশেষ রস ধীরে ধীরে ফুটিয়া একেবারে তাহার চরম বিকাশে

সার্থকতা লাভ করে,—যেমন ধরা যাক্, একটা গল্প, বা সনেট, বা নাটক। সূত্রপাতেই একটি বিশেষ রস অল্প ফুটিয়া থাকে, ক্রমে তাহাই climaxএ উঠিলে রসের পূর্ণ বিকাশ হয়। সকল সার্থক রচনাতেই প্রায় এই স্তর বিভাগটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য হয়—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা বা গান এই স্তর-বিভাগের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানে নাই। তাহা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্তই একেবারে হাস্য-রসে ভরপূর—সে হাস্য-রস কোথাও এতটুকু ম্লান নহে, তাহার পরিমাণেও কোথাও এতটুকু ইতর-বিশেষ নাই। তাহা যেন, একটা flood of laughter—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই তাহা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে যে গোড়ার লাইনটি বাদ দিয়া শেষের সেই climax অংশটুকু পড়িয়াই এক আঁচড়ে সব রসটুকু উপভোগ করিব, তাহা চলিবে না। তাহার প্রতি ছত্রই যেন এক একটি পরিপূর্ণ রস-কোষ! তাহার উপর এই কবিতাগুলির রচনায় এমন একটি বৈচিত্র্য আছে, বর্ণনাভঙ্গীতে এমন একটি কায়দা আছে, যাহা বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও বড় দেখা যায় না। কবিতার মিলগুলিতে কোন চেষ্টা নাই, তাহা যেমন সহজ, তেমনই নূতন। অধিক নহে, দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে।

"* * * তুই কি একটা মানুষ ?
তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য, লাটিম কিম্বা ফানুষ।"
"এও কি দাদা হয়—বাপ—এ কি ছেলের হাতে মোয়া ?
এমনি মার্ব্ব রগে চড় যে দেখবে সবই ধোঁয়া!"
(আষাঢ়ে। অদল-বদল।)

এই যে মানুষের সঙ্গে ফানুষ এবং মোয়ার সহিত ধোঁয়ার মিল—ইহা যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনই অভিনব। তাহার উপর এ রচনার আর দুইটি গুণ অনুপ্রাস ও antithesis যেমন,—

অনুপ্রাশ,—

"নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিসন হয়।"
"আরও অভ্যাস দু বেলা, বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,
সকল সময় জ্ঞান থাকে না, তবলা কি অবলা—
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে,—অতি পরিপাটী
সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাঁটি।"

এই 'তবলা কি অবলা'য়—কেমন সুন্দর antithesisটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে! এরূপ ছবি অন্য সাহিত্যে বড় বেশী পাইয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না!

হাসির গানে ও কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষাটাকে লইয়া যথেচ্ছভাবে মুচ্ড়াইয়াছেন, ভাঙ্গিয়াছেন—কিন্তু ভাষা তাহাতে এতটুকু আঘাত বা বেদনা পায় নাই, জর্জ্জরিত বা ক্ষত বিক্ষত হয় নাই। ভাষা সে আদরের আঘাতে তীব্র আনন্দেই যেন নাচিয়া ছুটিয়াছে!

যাহা হউক, আজ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর আলোচনা করিতে বসি নাই—এখন তাহা সমীচীন বলিয়াও মনে হয় না। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

সহসা তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন কেন, তাহার কারণ অনেকে হয়ত না জানিতেও পারেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ সমূহে প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত

হইতাম বটে, কিন্তু অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ……বাঙ্গালা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু-গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্য-শক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

শুধু রঙ্গ-রহস্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় যথেষ্টই ভাবপ্রবণ ছিল;—শৈশব হইতেই এ গভীর ভাবাধিক্যের পরিচয় প্রস্ফুট হইয়াছিল;—তাঁহার বাল্য-রচনা "আর্য্য গাথায়" মধুর রসাশ্রিত বহু কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইদানীংকার সদ্ভাবোদ্দীপক, মধুর ও করুণ রসাশ্রিত কবিতাগুলি তাঁহার "মন্দ্র" ও "আলেখ্য" গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ খণ্ড-কাব্য-হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের রত্নস্বরূপ।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি সমাজে উঠিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন সমাজ তাঁহাকে বিনা-প্রায়শ্চিত্তে পুন-র্গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। ইহার ফলে, গদ্যে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন—পুস্তকখানির নাম, "একঘ'রে"; ইহাতে, তিনি মনে আঘাত পাইয়া সমাজের একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা যেমন তীব্র, তেমনই যুক্তিপূর্ণ! যাহা হউক, এই ভাবাধিক্য তাঁহার পরজীবনে রচিত নাটকাবলীর বহু চরিত্রে আকার পাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তাঁহার প্রথম নাটক "তারাবাই"; দ্বিতীয়, "সীতা।" "সীতায়" তিনি গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করেন নাই। আধুনিক নীতির মাপ-কাটিতে মাপিয়া চরিত্রগুলি আধুনিক, Stand-point হইতে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—তাহাতে সর্ব্বত্র সেই পুণ্য-রামায়ণ-চিত্রিত চরিত্রগুলির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু নাটক হিসাবে তাহার মূল্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার 'সীতা' আদর্শ নারী। তাঁহার "পাষাণী" নাটক গৌতম-পত্নী অহল্যার পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তির উপর গঠিত, কিন্তু কবির নিজস্ব ভাবে, নিজস্ব উপাদানে তাহা অনুপ্রাণিত! গৌতম আদর্শ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ, ক্ষমাপরায়ণতা। এই গুণ গৌতম-চরিত্রে রীতিমত দক্ষতার সহিতই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার "রাণা প্রতাপ" দেশ-প্রাণ রাজপুত-মহাত্মার গৌরব সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার "দুর্গাদাস" প্রভু-পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যপালনের দীপ্ত চিত্র! "মেবার পতন" নাটকে তিনি এক উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছেন, মনুষ্যত্বের ভিত্তি কি, তাহা বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি এক 'মহানীতি'-প্রচারের চেষ্টা পাইয়াছেন। সে নীতি, "বিশ্বপ্রেম।" এ সম্বন্ধে "মেবার পতনের" ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বা-পেক্ষা গরীয়সী। 'আমি' হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায়, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়।" এই নাটকে তিনি আরও দেখাইয়াছেন, যে আমাদের সঙ্কীর্ণ দেশাচারই আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

মানসী। মা সত্যবতী! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল! না মা; তার পতন আজ হয়নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্ব হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পতন পরম্পরার একটি গ্রন্থি মাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে' চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা, যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বদ্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ. ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা. বিজাতি বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার, অতি উদার, হিন্দু ধর্ম্ম আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে ক্রন্দন কল্লে কি হবে, মা!

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "অচলায়তনে" এই ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এ পতন হইতে উদ্ধারের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইল:—

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে মেবার গিয়েছে যাক্, তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক! আমি চাই, যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক; যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝায়, অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।* * * এ জাতি আবার মানুষ হোক্!

কি করিয়া মানুষ হইবে, ভাহাও তিনি বলিয়াছেন:—

"যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজে আবার ভাবতে শিখবে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে; * * * যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুথি ফেলে দিয়ে নব ধর্ম্মকে বরণ করবে।***

সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মানুষকে, মনুষ্যত্বকে ভাল বাসতে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হয়ে রাণা প্রতাপ-সিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে ভুত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে করে, চিরজীবন হাহাকার করলেও কিছু হবে না!"

নাটক মানুষকে উন্নত করে, তাহার হৃদয়কে আদর্শ-পথে চালিত করে। ইহাই নাটকের কর্ত্তব্য। বাঙ্গলায় নাটক এই প্রথম দেখা দিয়াছে; এখনও সে সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভের অবসর পায় নাই, তথাপি এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে এমনই সময়ে এবং উচ্চ মনোবৃত্তির ব্যঞ্জনামূলক নাটকেই দেশের উপকার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়!

দ্বিজেন্দ্রলালের "নুরজাহান" মনস্তত্ত্বের সুগভীর আলোচনায় পরিপূর্ণ! মানব-চিত্তের সূক্ষ্ম সুনিপুণ বিশ্লেষণ—'নুরজাহান' চরিত্রটিকে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলার আর কোন নাটকে এ ভাবের চরিত্র-বিকাশ দেখি নাই! নুরজাহানে কাব্য এবং রোমান্সেরও বেশ একটি মিষ্ট রেখাপাত ঘটিয়াছে। "সাজাহানে"র ঔরঙ্গজেব, সাজাহান, জাহানারা, সিপার, দারা প্রভৃতি চরিত্র উজ্জ্বল, অভিনব। তাঁহার 'পরপারে' সামাজিক নাটক। আধুনিক সমাজে নীতির ধারা কোন্ পথে ছুটিয়াছে, এই নাটকে তাহাই দেখাইবার তিনি চেষ্টা

পাইয়াছেন। 'পরপারে' নাটকের idealটি সুন্দর, কিন্তু তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে! মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "ভীষ্ম" নামে একখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন; "সিংহল বিজয়" নামে আর একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেখানি শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা এরূপ অল্প সময় ও অল্প পরিসরে সম্ভব নহে। আমরা সংক্ষেপে দুই-চারিটি মাত্র কথা বলিলাম। ভবিষ্যতে বিশদভাবে সকল কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

তাঁহার নাটকগুলি পাঠ করিয়া মোটামুটি যে কথাটা মনে উদয় হয়, তাহা এই,—মানব-হৃদয়ের বিবিধ ভাব, সেন্টিমেণ্ট, প্রবৃত্তি যেন আকার পাইয়া তাঁহার নাটকে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে! বাঙ্গলা নাটকে সেন্টিমেণ্টের এমন লীলা, দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে কোন নাট্যকারই স্বীয় নাটকে দেখাইতে পারেন নাই! তাহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার নাটক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চ-সমূহের নাট্যরচনার প্রণালীতে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—থিয়েটারি ঢং হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চের নাটক চেষ্টা পাইতেছে;—নাট্যকারের শক্তি-অনুযায়ী কোথাও সে চেষ্টা সফল, কোথাও বা বিফল হইতেছে! পূর্ব্বকার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট নাটকও এই থিয়েটারি ঢংয়ের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

থিয়েটারি সাহিত্যে একটা intellectual আব-হাওয়াও যে সম্প্রতি প্রবেশ-লাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-সংসর্গের ফল। তাঁহার নাটকের সকলগুলিই রচনা-হিসাবে উৎকৃষ্ট না হইতে পারে, আর এমন কোন্ লেখক আছেন, যাঁহার সকল রচনাই উৎকৃষ্ট? তবে সেগুলি যে উচ্চ ভাব, কবিত্ব এবং স্বদেশ-প্রেমের স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে উজ্জ্বল—এ কথা অসঙ্কোচভাবে বলা যাইতে পারে।

তাহার পর আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল মনে-প্রাণে খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। আচারে, বা ব্যবহারে, কখনও তিনি তাঁহার দেশকে ভুলেন নাই। নিজে বিলাত-ফেরত হইয়াও কোন দিন তিনি বিলাতী ভাবের বশ্যতা করেন নাই। সে ভাবের প্রশ্রয়-দানে সমাজে কি পাপ সঞ্চারিত হয়, তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক প্রহসনে তাহা তিনি ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন। দেশে যখনই তিনি কোন বিষয়ে ভণ্ডামি বা ধূর্ত্তামি বা কোনরূপ দোষ-দুর্ব্বলতা দেখিয়াছেন, অমনই তাঁহার লেখনী-মুখে তখনই শ্লেষের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'নন্দলাল' 'বিলাত ফের্ত্তা' 'Reformed Hindoos' 'হতে পার্ত্তাম' 'বেশ করেছো' প্রভৃতি হাসির গানগুলি উচ্চ অঙ্গের Satire;—এই ব্যঙ্গরসে তিনি তাঁহার তপ্ত হৃদয়ের সমস্ত দাহ যেন ঢালিয়া দিয়াছেন —কোথাও এতটুকু রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই। তপ্ত সূর্য্য-কিরণের মতই তাহা সমাজের সমস্ত আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া দিবার

জন্য ঝরিয়া পড়িয়াছে! আরও এই হাসির কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন, সাহিত্যে ব্যক্তিগত কটাক্ষ ও হাস্যরস দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। সাহিত্য একটিকে আমোল দেয় না, দিবেও না—অপরটি তাহার পঞ্চ-প্রাণেরই অন্যতম! দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্তি-গত কটাক্ষপাত না করিয়াও শক্তিশালী লেখক সাহিত্যে এমন বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহার তুলনা নাই, উপভোগেও যাহা ক্ষয় হয় না!

কিন্তু শুধু এই হাসির গান ও কবিতা নাটকেই তাঁহার পরিচয় নহে। তিনি মাতৃ-ভূমির উদ্দেশ্যে যে গানগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন—দেশের আকাশ বাতাস যে গানের তান বুকে পূরিয়া ধন্য হইয়াছে। সেই গান, —"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"—কবির গর্ব্বভরা উল্লাস, মুগ্ধ অন্তরের আত্মনিবেদন-উচ্ছ্বাস! এ গানের তুলনা নাই। এ গানের তানে প্রাসাদবাসী হইতে অন্নহীন ভিখারী বাঙ্গালীর প্রাণ অবধি সাড়া দিয়া উঠে, আশা ও আশ্বাসের মন্দাকিনী ধারা বাঙ্গালীর শুষ্ক মরু প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলে! তাহার পর সেই গান—"আমার এই দেশেতে জনম, যেন এই দেশেতে মরি!" এমন সরল ভক্তির সহজ উচ্ছ্বাস—সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আর একটী গানও বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে—সেটি দেশবাসীর উদ্বোধন-সঙ্গীত :—

"কিসের শোক, করিস ভাই!—আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ।
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।
শত্রু হয় হোক্ না যদি সেথায় পাস মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে;—
সবার বাড়া শত্রু সে;—আবার তোরা মানুষ হ।
জগৎ জুড়ে দুইটা সেনা পরস্পর রাঙায় চোখ;—
পুণ্যসেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক্;
ধর্ম্ম যেথা সেথায় থাক্; ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ।

বাঙ্গালার নবযুগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র-লালের বীণা এমনই করিয়া স্বদেশবাসীর চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে শুভ অবসরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাঁহাদের মধ্যে একজনের বীণা নীরব—এবং তাহারই শোক আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সনেট-সপ্তক

[ইংলণ্ডে, কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হৃদয় এবং মন, সহসা যুগপৎ প্রণয় এবং কবিত্ব-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পকেট-বুকে পূর্ব্বোক্ত বাহ্যিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় নোট করিয়া রাখেন। তৎপরে সেই নোট অবলম্বনে স্বীয় মনোভাবের বর্ণনা করিয়া ইংরাজি ভাষায় ছয়টি সনেট রচনা করেন। আমি তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই সনেট কয়েকটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। সনেটগুলির প্রধান গুণ এই যে তাহার ভাব কিম্বা ভাষায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত, Ideality এবং Realityর এরূপ অপূর্ব্ব মিশ্রণ—কাল্পনিক এবং বাস্তব জগতের এরূপ ওতপ্রোত ভাবে একত্র সমাবেশ, আমি

পূর্ব্বে কখনও অন্য কোন বঙ্গকবির রচনায় দেখি নাই। অথচ কবির হৃদয় যে খাঁটি বাঙ্গালী হৃদয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে বাঙ্গালী কবি যেরূপ জানে পৃথিবীর অন্য কোন কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু হইতে নির্গত হওয়াতেই যদি বাঙ্গালী কবির কবিত্ব নির্ভর করে তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি। এই সনেটগুলি পাঠ করিবার সময় রসগ্রাহী পাঠক অন্ততঃ দুচার ফোঁটাও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অনুবাদে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না, এবং সেই কারণে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কোনরূপ বৃথাচেষ্টা করি নাই। যদি মাছি-মারা তরজমা নামক কোনরূপ পদার্থ থাকে তাহা হইলে আমার এ তরজমা তাই, অর্থাৎ আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। প্রথম সনেটটি আমি কবির পকেট-বুকের নোট অবলম্বনে রচনা করিয়াছি, যাহা গদ্য আকারে ছিল তাহা পদ্য আকারে পরিণত করিয়াছি। আমি সেই নোট নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তদ্দৃষ্টে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে অনুবাদ স্থলে আমি নিজের কলম চালাই নাই।

Note :—

(1) Winding rivulet (2) Brook vocal (3) Rustic bridge (4) Railing (5) Beautiful lady leaning against (6) Playing violin (7) Lawn (8) Rabbit running about (9) Clear stream (10) Feeling heavenly bliss.

অনুবাদক]

প্রথম

নীচেতে চলেছে জল আঁকিয়া বাঁকিয়া,
তরল আবেগ-ভরে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া;
কানে শুনি তারি গান শুধু কুলুকুলু,
রসাবেশে হয়ে আসে চক্ষু ঢুলু ঢুলু।

উপরেতে ভাঙ্গা সাঁকো, হেরিনু যুবতী
রেলিঙেতে ভর দিয়ে আছে রূপবতী;
আপন ভাবেতে ভোর বাজায় বেয়ালা;
রূপে মোর ভরে গেল নয়ন পেয়ালা।

নির্ম্মল নির্ঝর নীর নাহি তাহে পঙ্ক,
রূপসি চাঁদের পারা শশ-হীন অঙ্ক,
শশক বেড়ায় ছুটে পেয়ে সমভূমি;
চাঁদ যদি হাতে পাই একবার চুমি।

সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে।
না মরিয়া চলে গেনু একদম স্বর্গে॥

দ্বিতীয়

তব হস্তে যন্ত্র করে ভ্রমর গুঞ্জন;
কভু ধ্বনি শুনি কাছে, কভু বহু দূরে,
কভু লম্ফে ঊর্দ্ধে ওঠে, কভু পড়ে ঘুরে;
জানিনে সে সুর আমি স্বর কি ব্যঞ্জন,
হৃদিতন্ত্রী কিন্তু মম করে ঝন্‌ঝন্!
লেগেছে ভাবের নেশা বেয়াল্লার সুরে;
সঙ্গীতের মদ্যে হয়ে অতি চুরচুরে,
তালে তালে নাচে মোর নয়ন খঞ্জন।

সেই সঙ্গে নাচে মোর পরাণ পুঁতুল
পাগলের পারা হয়ে আনন্দে অতুল;
চোখের সুমুখে ভাসে দিবসের চাঁদ,
চাঁদির কিরণ দেয় চৌদিকে ছড়িয়ে;
ভেঙ্গে চুরে সব মোর হৃদয়ের বাঁধ,
কবিতার রস মনে পড়িছে গড়িয়ে।

তৃতীয়

আমার বুকের কূপে একি তোলপাড় !
এতদিনে বুঝি মনে জাগে ভালবাসা !
এক বৃন্তে ফুটে ওঠে ভয় আর আশা,
এ জীবনে এল বুঝি প্রথম আষাঢ় !

কখনো আশার জ্বলে বেলোয়ারি ঝাড়,
কভু ঘিরে আসে মনে ভয়ের কুয়াশা ;
ও রূপ-মদিরা পিয়ে বাড়িছে পিপাসা,
হৃদয় মাতাল খায় বুকেতে আছাড় ।

কি রস ঢালিলে প্রাণে হৃদয়ের রাজ্ঞী !
বর্ণনা করিতে নারি নহি আমি বাগ্মী ।

প্রেমসিন্ধু পানে এবে চলি ভরাপালে,
দোলা খায় অন্তরাত্মা মুখে নাহি বাণী ;
কি করি বুদ্ধির হালে পায়নাকো পানি,
দুর্গা বলে ভেসে পড়ি যা থাকে কপালে !

চতুর্থ

ভাল তোমা বাসিবারে নাহিকো সাহস,
ভয়, পাছে লোকে বলে মোর আছে ছিট্ !
গগনের তারা তুমি আমি ক্ষুদ্র কীট্ !
তোমারে হেরিয়ে শুধু হয়েছি বেহোঁস ।
কিন্তু যদি হইতাম আমি খরগোস্,
এ দেহে পড়িত তব নয়নের দিঠ ;
নিশ্চয় ছুটিতে তুমি মোর পিঠ পিঠ,
ধরা দিয়ে মানিতাম বিনাবাক্যে পোষ ।

দূরে বসি এবে দেখি তব খোলা চুল,
তোমার আমার মাঝে আছে ভাঙা পুল ;
মিলন আশায় তাই হইয়ে হতাশ,
তোমার রূপের ঢেউ বসে বসে গুনি ;
কানে কানে বলে মোরে নিষ্ঠুর বাতাস
কভু তুমি ও নারীর হবেনাকো "উনি" !

পঞ্চম

পড়িতেছে আজ শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে
আমার মনের পাখী বুকের বাসায় ;
কোথা হতে জল এসে নয়নে নাসায়
ফোয়ারার মত পড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে ।

মনের দুঃখের কালি ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে
কবিতা আজিকে লিখি ইংরাজি ভাষায় ;
পড়িবে তোমার চোখে ধরি এ আশায়
কথায় ব্যথার ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে ।

কবি আমি হইয়াছি অবস্থায় পড়ে' ।
তরণী ছন্দেতে দোলে পড়িলেক ঝড়ে ॥

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মনের বাঁধন
কবিতায় তাই আজি করি আপশোষ ।
এখন আমার কাজ শুধুই কাঁদন,—
কোথা সেই বাহু লীন কোথা খরগোস্!

ষষ্ঠ

আশা ছিল একদিন আমি হেসে হেসে,
বলিব মনের কথা তব কানে কানে,
তোমার দেহের শাদা চুম্বকের টানে
বসিব তোমার আমি অতি কাছে ঘেঁসে ।

সে সব প্রাণের সাধ আজ গেছে ভেসে
কোন দূর গগনেতে কেবা তাহা জানে !
গা ঢেলে বিরহে চলি অকূলের পানে,
—আশার ডিঙার মোর গেছে তলা ফেঁসে!

মন আজ বলে শুধু "কোথা প্রাণ সই,
ফোটে যার বেয়ালাতে সঙ্গীতের খই ?"

এ বুকে লেগেছে তার বেয়ালার ছড়ি,
তারি টানে অবিরল চোখে আসে জল ।
ভালবেসে পরদেশে এই হল ফল,
—রহিল বুকেতে চেন—চলে গেল ঘড়ি !

সপ্তম

খুলে যদি দেখ মোর হৃদয়-ফলক,
দেখিবে সেথায় প্রিয়া, ঈষৎ হেলিয়ে,
চিত্রাপিতা হয়ে আছে, কুন্তল এলিয়ে,
সুনীল কাঁচের চোখে না পড়ে পলক ;

প্রতি অঙ্গ হতে ছুটে রঙের ঝলক,
মনের আঁধারে দেয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে ;
বুকের মাঝারে তাই উঠিছে ঠেলিয়ে
প্রাণের মধুর রসে প্রবল বলক ।

যদিচ প্রিয়ার ছবি মনে আছে আঁকা,
প্রিয়া বিনে সব মোর লাগে ফাঁকা ফাঁকা ।

কতকাল র'ব বল শুধু স্মৃতি নিয়ে ?
অশ্রুজলে যাক বুকে ছবি ধুয়ে মুছে !
অলীক সাদার মোহ যাক মনে ঘুচে !
করিব স্বদেশে ফিরে কালো মেয়ে বিয়ে !

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।

সমালোচনা

ইউরোপ ভ্রমণ । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ বি, এল প্রণীত । ভাবরাজ্যে যে বীজ উৎপন্ন হয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবশেষে তাহাতেই ফল ধরে ; সেই জন্যই ভাবের আদানপ্রদানে নব-যুগের উপযুক্ত নব-ভাবের যে সৃষ্টি হয় তাহার এত মূল্য । উন্নতিশীল জাতি মাত্রেরই জাতীয় জীবনের লীলা-ভূমিতে একটি ভাবের আব্‌হাওয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়, যাহা উন্নতির লক্ষণও বটে কারণও বটে । আমাদের দেশে নানা ক্ষেত্রে নানাবিধ চেষ্টার ক্রমশঃ যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা আশাজনক সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের জাতীয় কোন বিশেষ কেন্দ্রস্থানে সেই ভাবের আব্‌হাওয়া লক্ষিত না হওয়ায়, ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ বা ইচ্ছার চিহ্ন না পাওয়ায়, এই সকল চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বড়ই শঙ্কিত হইতে হয় ।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর "য়ুরোপ ভ্রমণ" পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে উদয় হইল । অনেকেই অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন ; অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার, শিক্ষা করিবার কত প্রকার নূতন নূতন ভাব, তথ্য ও বৃত্তান্তের সংঘর্ষে আসেন ; কিন্তু সেগুলি আত্মীয়স্বজন' বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশের উপভোগ বা উপকারার্থে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার পরিশ্রমটুকু কয়জন স্বীকার করেন ? আমরা নরেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহার বিদেশ ভ্রমণকালেও স্বজনের প্রতি সজাগ অনুরাগের পরিচয় পাইয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি ।

কল্পনা-রাজ্যে বিহার করা অপেক্ষা খাঁটি বাস্তব জগতে বসবাস করাটাই যে নরেন্দ্র বাবু পছন্দ করেন, তাঁহার পুস্তকে সে কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সেটা ষোল আনা সুখের বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি না। নরেন্দ্রবাবুর মনে কোন্ কোন্ অবস্থায় উচ্চ বা গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তিনি আমাদের জানাইতে ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু সে ভাবের চেহারাটা আমাদের প্রদর্শন করিতে বা তদনুরূপ ভাব আমাদের মনে সঞ্চারিত করিতে তিনি চেষ্টামাত্র করেন নাই। এই ভাব-রসভোগের ভাগ পাওয়া সম্বন্ধে বঞ্চিত হওয়ায় গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের অভিযোগ রহিয়া গেল। অপর পক্ষে এ কথা নিশ্চিত যে নরেন্দ্রবাবু বহুযত্ন সহকারে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য স্থান সম্বন্ধে কাজে লাগিবার মত যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীগণের বিশেষ উপকারে লাগিবার সম্ভাবনা। শ্রীসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতা। শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার সঙ্কলিত। তত্ত্বমঞ্জরী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। নানা সময়ে উপদেশ ও শিক্ষা প্রভৃতির ছলে তিনি যে সকল কথা বলিতেন, তাহা গুচ্ছাকারে বহু পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপুরুষগণের এই সকল মহাবাণী জীবন-যজ্ঞে মন্ত্রের কাজ করে, সুতরাং সেগুলির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। তাহাতে জাতীয়তা গঠন ও তাহার বর্দ্ধনে সুবিধা হয়। বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব, রামকৃষ্ণ দেবের মহাবাণীর সহিত ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, ও বাইবেল প্রভৃতি হইতে তদনুরূপ বাণীসমূহও পাশাপাশি সংগৃহীত হইয়াছে। একটি ত্রুটি শুধু লক্ষ্য করিলাম—পরমহংস দেবের অনন্য-সাধারণ সহজ সরল ভাষার উপর সঙ্কলয়িতা মহাশয় তাঁহার মোটা কলম চালাইয়া পরিচিত মিষ্ট সুরটুকু মাঝে মাঝে কাটিয়া দিয়াছেন! এ ত্রুটির মার্জ্জনা নাই। বহিখানির ছাপা কাগজেরও সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। অতুল লাইব্রেরী, ৫৪।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী আজ বিশ্বে কাহারও একেবারে অবিদিত নাই; তবে সেগুলির সহিত বিশদ পরিচয় বোধ হয় অনেকেরই নাই। তাহার কারণ, যাঁহারা অবিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক বিশিষ্টতার জন্য যে বিষয়গুলি তাঁহাদিগের পক্ষে সম্যক আয়ত্ত করা দুরূহ। বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইলেও সহজ সরলতার অভাবে সেগুলি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আচার্য্য প্রবরের আবিষ্কারের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে নিতান্ত অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ হইবে। ইহার ভাষা অত্যন্ত সহজ, বর্ণনা প্রণালীটি সরল, মনোজ্ঞ। বক্তব্যগুলি চিত্রমালায় পরিস্ফুট করায় বুঝিবার পক্ষে এতটুকু বাধা থাকে না। সহজ ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে গ্রন্থকারের শক্তি অসাধারণ। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গ সাহিত্যের একটি দারুণ অভাব মোচন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। শিলচর, বৈদিক সাহিত্যপ্রকাশ অফিস হইতে প্রকাশিত। শিলচর এরিয়েন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, দুই টাকা চারি আনা। প্রথম খণ্ড। সায়ণ-ভাষ্য অবলম্বনে এই অনুবাদ সম্পাদিত হইয়াছে। অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কোনরূপ জটিলতা নাই। এই বিপুল অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার জন্য সাহিত্যসরস্বতী মহাশয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই। আশ্বাস ও উৎসাহ পাইলে চতুর্ব্বেদের এইরূপ সরল প্রাঞ্জল অনুবাদ সাহিত্যসরস্বতী মহাশয় প্রকাশ করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। আমাদিগের বিলক্ষণ আশা আছে, এ আশার উৎসাহ-দানে বাঙ্গালী কার্পণ্য করিবেন না। ভারতের মহাগ্রন্থ—ঘরে ঘরে তাহার প্রচার একান্ত আকাঙ্ক্ষনীয় ও শুভপ্রসূ, সে বিষয়ে কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায়

কয়েক মাস হইল কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের জজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয় হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হইয়াছেন। এই আনন্দ-সংবাদ গত মাসে প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দুই বৎসর পরে বি, এল পরীক্ষা পাশ করেন; কিছুদিন হুগলি আদালতে ওকালতি করিবার পর মুন্সেফি পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সবজজ এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হন।



মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায়

ভ্রম সংশোধন

(১)

গত মাসে ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ছবির স্থানে ভুলক্রমে জষ্টিশ হরিনাথ রায় মহাশয়ের ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছিল। সে ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য এমাসে আমরা ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম। আশা করি,



ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

(২)

গত মাসের সমালোচনায় প্রাচীন ইতিহাসের গল্পের লেখককে আমরা বোলপুর আশ্রমের ছাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি ছাত্র নহেন, অধ্যাপক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



কমলমনোহরী

(রাগিণী)

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্র অঙ্কিত চিত্র হইতে

কান্তিক প্রেস]

[২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২০ [৪র্থ সংখ্যা

নবাবিষ্কৃত কবি-ভাসের গ্রন্থাবলী

ত্রিবন্দ্রমের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী সংস্কৃত পুঁথির অন্বেষণে যখন দক্ষিণ-ত্রিবঙ্কুরে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন পদ্মনাভ-পুরের নিকটবর্ত্তী মনলিক্কর-মঠে ১০ খানা নাটকের হাতে-লেখা পুঁথি প্রাপ্ত হন। ৩০০ বৎসর পুরাতন হইলেও, প্রথম ১২ পৃষ্ঠা ছাড়া, তাহার অন্য কোন অংশে অক্ষর-বিলোপ ঘটে নাই। নাটকগুলির নাম :—

১। স্বপ্নবাসবদত্ত।
২। প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ।
৩। পঞ্চরাত্র।
৪। চারুদত্ত।
৫। দূত-ঘটোৎকচ।
৬। অভিমারক।
৭। বালচরিত।
৮। মধ্যম ব্যায়োগ।
৯। কর্ণভার।
১০। উরুভঙ্গ।

এইগুলি ছাড়া আর একটি নাটকের হস্তলিপি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু প্রথম পত্রের উল্টা দিকের মাঝামাঝি এক স্থানে অসম্পূর্ণভাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, আর একবার যখন তিনি ভ্রমণে বাহির হন, তখন কডুথুরুত্তির নিকটবর্ত্তী কলসপুরের গ্রহাচার্য্য গোবিন্দ-পিশরোদির নিকট পূর্ব্বোক্ত ধরণের আরও ২ খানা নাটক প্রাপ্ত হন ;—তাহার নাম, অভিষেক-নাটক ও প্রতিমা-নাটক। তাহার পর তিনি জানিতে পারিলেন, উক্ত দুই গ্রন্থ প্রাসাদ-লাই-ব্রেরীতেও আছে। এই সকল পুঁথি মলয়লম্ অক্ষরে তালপাতায় লেখা ; সম্ভবত ৩০০।৪০০ বৎসরের পুরাতন। এইরূপে, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ১২ খানা সংস্কৃত নাটক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই নাটকগুলির একটি বিশেষ লক্ষণ এই দেখা যায়,—অন্যান্য নাটকে যেরূপ নান্দীতে আরম্ভ হয়, তাহার পর "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" এইরূপ লেখা থাকে,—এই নাটক গুলির গোড়াতেই "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এইরূপ লিখিত হইয়াছে, পরে নান্দীর মঙ্গলশ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তা ছাড়া "প্রস্তাবনা"র স্থানে এই নাটকগুলিতে

"স্থাপনা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আরও এক কথা,—শূদ্রক ও কালিদাস প্রভৃতির নাটকের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকারের নাম ও রচনাদির উল্লেখ থাকে, কিন্তু এই নাটকগুলির "স্থাপনায়" তাহার কিছুই নাই। এবং নিম্নলিখিত ভরত-বাক্য দিয়া প্রায়ই এই নাটকগুলি শেষ করা হয়ঃ—

"ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুন্তলাম।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহ প্রশাস্তুনঃ" ॥

এই সকল নাটকের বাক্য রচনা ও গঠন পর্য্যালোচনা করিলে নিসংশয়রূপে প্রতীতি হয় যে উহা একই গ্রন্থকারের রচনা।

এই সকল নাটকের "স্থাপনায়" গ্রন্থকারের কিংবা গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় নাই; ইহাতে মনে হয়, ঐরূপ নামোল্লেখের রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই নাটকগুলি রচিত হয়। "স্বপ্নবাসবদত্ত" নাটকের উল্লেখমাত্র কোন কোন আলঙ্কারিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতাবৎকাল আধুনিক পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ গ্রন্থখানি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। "স্বপ্নবাসবদত্ত" যে ভাসের রচিত তাহা "শক্তি মুক্তাবলী"তে উদ্ধৃত কবি-রাজশেখরের একটি শ্লোকে অবগত হওয়া যায়ঃ—

ভাসনাটকচক্রেঽপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ ॥ (১)

কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় বলিয়াছেনঃ—

"প্রথিত যশসাং ভাসসৌমিল্ল কবিপুত্রাদিনাং প্রবন্ধাতিক্রম্য"।

আবার কবিবর বাণভট্ট, ভাসের নাটকগুলিকে, "সূত্রধার কৃতারম্ভৈঃ" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। কারণ ভাসের নাটকগুলির গোড়াতেই থাকেঃ—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।"

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেব কুলৈরিব ॥

কালিদাস প্রভৃতি ভাসের উত্তরবর্ত্তী কবিগণের কোন কোন শ্লোকে ভাসের ছায়া ও রচনাভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। যথা, ভাসের অভিষেক-নাটকের চতুর্থ অঙ্কের একস্থলে এইরূপ আছেঃ—

"যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলাঅপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমা
সেয়ং শত্রুরিপোবশোকবণিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপতাম॥"

উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত "প্রিয়মণ্ডনাপি," "স্নেহাৎ," "পল্লবান্," "সেয়ং" এই শব্দগুলি কালিদাসের শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের ঐরূপ একটি শ্লোকেও পরিলক্ষিত হয়, যথাঃ—

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি পয়ো যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যেবঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

আবার, ভাসকৃত "বালচরিতের" প্রথম অঙ্কের একটি শ্লোকে আছে, দেবকী স্বীয় শিশুটিকে বাসুদেবের হস্তে সমর্পণ করিবার সময় মনে হইতেছে যেন তিনি দুই বিভিন্ন দিকে গমন করিতেছেন—তাঁহার শরীর তাঁহার কারাগারের দিকে, এবং তাঁহার মনটি শিশুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। যথাঃ—

"হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥"

(১) ফরাসী পণ্ডিত Felicien levia গ্রন্থেও এই শ্লোকগুলির উল্লেখ আছে—২।৩ মাস পূর্ব্বে ভারতীতে মৎকর্ত্তৃক অনূদিত হয়।—শ্রীজ্যো।

এই ভাবের একটি শ্লোক কালিদাসের প্রথম অঙ্কে আছে। যথাঃ—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তুতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

ভাস ও কালিদাসের রচনার মধ্যে এইরূপ ছোটখাট অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, এইরূপ সাদৃশ্য ভবভূতীর রচনাতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্তঃ—"স্বপ্নবাসবদত্ত"-নাটকের প্রথম অঙ্কে "ব্রহ্মচারীর" ব্যাক্যালাপের সহিত, "উত্তরচরিতের" "অত্রেয়ীর" বাক্যালাপের খুবই সাদৃশ্য আছে। আবার অভিষেক-নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের অনুরূপ, উত্তরচরিতের ষষ্ঠ অঙ্কে "বিদ্যাধরের" বাক্যালাপ।

যে মৃচ্ছকটিক-নাটক কালিদাসের নাটক অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া খ্যাত, তাহাতে ভাসের রচনাবলীর সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এমন কি ভাসকৃত "চারুদত্ত"-নাটকের কতকগুলি শ্লোক ও উক্তি অবিকৃতভাবে অথবা স্বল্পপরিবর্ত্তনসহকারে মৃচ্ছকটিক-নাটকে গৃহীত হইয়াছে।

"চারুদত্ত"-নাটকের প্রথম অঙ্কে এইরূপ একটি শ্লোক আছে যথাঃ—

"যাসাং বলির্ভবতি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিভক্তপুষ্পঃ
তাস্বেব পূর্ব্ববলিরূঢ়য়বাঙ্কুরাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীরূঢ় ॥"

ইহার অনুরূপ শ্লোক "মৃচ্ছকটিকে" যথা ঃ—

"যাসাং বলিঃ সপদি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ।
তাস্বেব সংপ্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ ॥"

আবার, চারুদত্ত-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছেঃ—

"মার্জ্জারঃ প্লবনে বৃকোঽপসরণে শ্যেনো গৃহালোকনে
নিদ্রা সুপ্তমনুষ্যবীর্য্যতুলনে সংসর্পণে পন্নগঃ।
মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ্ দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটে চ তিমিরং বায়ু স্থলে নৌর্জলে" ॥

ইহার অনুরূপ মৃচ্ছকটিকেঃ—

"মার্জ্জারঃ ক্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্যেনো গৃহালুকনে
সুপ্তাসুপ্ত মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ।
মায়ারূপশরীরবেষরচনে বাগ্ দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটেষু ডুডুমো বাজী স্থলে নৌর্জলে॥"

এইরূপ অনেকগুলি শ্লোক ও বাক্যাবলী দুই নাটকেই সমান। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। উভয় নাটকেরই নায়ক চারুদত্ত। তবে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই বিচার্য্য। "চারুদত্ত-নাটক" হইতেই যে "মৃচ্ছকটিক" নাটকের মূল-আখ্যান এবং অনেক শ্লোক ও বাক্য গৃহীত হইয়াছে তাহা খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কেননা, পরবর্ত্তী কালের নাটকেই গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের নামাদির উল্লেখ আছে। "মৃচ্ছকটিকের" প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বর্ণনা আছে, কিন্তু "চারুদত্ত" নাটকে তাহা নাই। ইহাতেই সপ্রমাণ হয়, মৃচ্ছকটিক-নাটক পরবর্ত্তীকালের রচনা। তবে, মৃচ্ছকটিক নাটকে এমন কতকগুলি ভাল-ভাল শ্লোক আছে যাহা চারুদত্তনাটকে নাই। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয়, চারুদত্ত-নামক ক্ষুদ্র নাটকটি, আরও কতকগুলি ভাল-ভাল শ্লোকসংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উহার আখ্যানবস্তুও আরও একটু চিত্তাকর্ষক করিয়া রচিত হইয়াছে। শূদ্রককে মৌলিক গ্রন্থকার

বলা যাইতে পারে না, তিনি শুধু পুরাণো মালমস্‌লা লইয়া একটি ইমারৎ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছেন মাত্র। শূদ্রক কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী এরূপ কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত, শূদ্রক, অলঙ্কারগ্রন্থকার বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেননা, তাঁহার গ্রন্থে এই কথা আছে ঃ—

"শূদ্রকাদি রচিতেষু প্রবন্ধেষস্ত (শ্লেষাখ্যগুণস্ত) ভূয়ান্ প্রপঞ্চো দৃশ্যতে।"

ভাসের নাটকগুলি কালিদাসের সময়ে যে খুব প্রচলিত ছিল তাহা এই শ্লোকে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় ঃ—

"প্রথিত-যশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদিনাম্।"

পক্ষান্তরে কোন কারণে শূদ্রকের সময়ে ভাসের নাটকগুলি বিরলপ্রচার হইয়াছিল। তাই শূদ্রক, "চারুদত্ত" নাটকের বিবিধ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু কিছু নূতন যোজনা করিয়া তিনি তাঁহার মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা করেন।

ত্রিবন্দ্রমের গণপতি শাস্ত্রীমহাশয় যেরূপ শ্রম ও অধ্যাবসায় সহকারে মহাকবি ভাসের এই লুপ্ত নাটকগুলির আবিষ্কার করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতের ও সমস্ত সভ্যজগতের সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগী ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি-মাত্রই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। এই আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে "চারুদত্ত" ছাড়া আর সবগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় অতীব পাণ্ডিত্য সহকারে গ্রন্থগুলি প্রতিসংস্কৃত করিয়াছেন এবং "স্বপ্নবাসবদত্তের" ভূমিকায় ভাসের কাল ও রচনাবলী সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাই আমি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুসলমানকোর্টে বাঙ্গালী সেনাপতি

১০৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্যবিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ যথাক্রমে গজনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পরিশেষে ১১৫২ খৃষ্টাব্দে ঘোরনগরের অধিপতি আলাউদ্দীনের সহিত গজনীরাজ বেহরামের কলহ হইতে থাকে। তাহার ফলে আলাউদ্দীন বিজয়লাভ করিয়া গজনীনগরী বহ্নি ও অসিদ্বারা ছারখার করিয়া সেই সুন্দর রাজধানীর ধ্বংস সাধন করেন। সেই হইতে গজনীরাজ্য বিলুপ্ত হয়। একথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। আমরা যে সেনাপতির কথা বর্ণনা করিব তিনি সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি তিলক নামে অভিহিত। ইনি নরসুন্দর পুত্র ছিলেন বলিয়া উক্ত; ইঁহার পিতার নাম জয়সেন। তিলক সুপুরুষ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার বাগ্মীতায় সকলেই মুগ্ধ হইত। ইনি বহুদিন কাশ্মীরে বাস করেন। তথায় অবস্থানকালে হিন্দী ও পারশীতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর মুক্তা-

পাঁতির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইত। কথিত আছে, তিনি কাশ্মীরে বাস করিয়া যাদুবিদ্যা, আত্ম-গোপন প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করেন।

এই সময়ে আমীর মাহম্মদ একজন সুদক্ষ এবং সুচতুর কর্ম্মচারী অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি তিলককে দোভাষীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কর্ম্মদক্ষতায় আমীর মাঃমুদ তাহার উপর সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ঐতি-হাসিক আবুল ফজেল বলেন, তিনি তিলককে আমীর মাহমুদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যুগপৎ দোভাষী ও সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছেন। এইপ্রকারে তাঁহার অদৃষ্ট খুলিয়া গেল।

অনন্তর সুলতান মামুদের রাজত্বকালে তিলক তাঁহার কতিপয় গুরুতরকার্য্য গুপ্তভাবে সাধন করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সুলতান মামুদের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হন। তিনি কৌশল অবলম্বন করিয়া হিন্দুকাতার ও কতিপয় বহির্ভাগের প্রদেশ স্বকবলে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাহ মাহমুদের হিরাট হইতে বল্‌ক নগরে প্রত্যাগমনকালে সুন্দর নামে জনৈক হিন্দু-সেনাপতি তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সুযোগে তিনি তিলককে হিন্দু সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া আপন সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তিলককে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য সা মাহম্মুদ তাঁহাকে একটি স্বর্ণালঙ্কৃত পরিচ্ছদ প্রদান করেন; তাঁহার গলদেশে বিবিধ মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণমাল্য প্রদত্ত হয়। তাঁহার অধীনে সর্ব্বদা একটি সৈন্যদল থাকিত। এখন হইতে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠেন। তাঁহার ব্যবহারোপযোগী একটি তাঁবু ও ছত্র তাঁহাকে প্রদান করা হয়। এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বাসভবনও নির্ম্মিত হয়। তাঁহার দ্বারদেশে সর্ব্বদা ভেরী নিনাদিত হইত। তৎকালে যাঁহারা হিন্দু অধিনায়ক হইতেন তাঁহাদের বাসভবনের জন্য ঐ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। অচিরে তাঁহার বিশাল ভবন সুবর্ণচূড়াবিনির্ম্মিত ধ্বজপতাকাদি দ্বারা শোভিত হইল। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। তিনি রাজসভায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত উপবেশন করিবার সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। আবুল্‌ফজেল্ বলেন, তাঁহার উপর রাজ্যসংক্রান্ত বহু গুরুভার ন্যস্ত ছিল।

একদা আমীর উদ্যানবিহারে গমন করিয়াছেন। তথায় দিবসরজনী আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইতিমধ্যে কতিপয় জরুরী পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমীর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সেই পত্রসমূহের সারমর্ম্ম এই ঃ— "নিয়ালটিগীন তুর্কীগণের সহিত লাহোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার সহিত বহু দুর্দ্দান্ত লোক যোগ দিয়াছে। দিনে দিনে তাহার দল বাড়িয়া উঠিতেছে। যদ্যপি অচিরে ইহার প্রতিবিধান না হয় তবে দেশের অবস্থা অতি ভীষণ এবং শোচনীয় হইয়া পড়িবে। তাহার ক্রমেই প্রতাপ বর্দ্ধিত হইতেছে।" এই সংবাদ পাইবামাত্র আমীর একটি গুপ্ত পরামর্শসভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে জঙ্গীলাট, সেনাপতিগণ এবং সৈন্যদলের কর্ম্মচারীগণকে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইল। সকলে সমবেত হইলে আমীর উপস্থিত বিপদ বিজ্ঞাপিত করিয়া সকলকে ইহার উপায়

উদ্ভাবন করিতে বলিলেন। নিয়ালটিগীন ঘটিত বিপ্লব দমন করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গীলাট (Com ander-in Chief) বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যদ্যপি হুজুর আমাকে তথায় গমন করিতে আজ্ঞা করেন তাহা হইলে এখনি আমি তাহা সম্পাদন করিতে পারি। আমি গ্রীষ্মাধিক্য সত্ত্বেও সপ্তাহ মধ্যে সমগ্র বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া নিয়ালটিগীনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে পারি।" আমীর বলিলেন, "তোমার এক্ষণে তথায় গমন করা অকর্ত্তব্য দেখিতেছি। কারণ খোরাসানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়াই আছে। খাটলান ও টুকারিস্থানে রাজবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্রী খাজা আহমুদকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। তিনি তথায় বিলক্ষণ সুবন্দোবস্ত করিতেছেন। শরৎকাল শেষ হইয়া গেলে আমাকে একবার বলখে যাইতে হইবে। তোমাকেও সেই সঙ্গে সসৈন্যে তথায় গমন করিতে হইবে। আমি অন্য একজন সেনাপতি তথায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি।"

তিলক দেখিলেন, জঙ্গীলাট ভিন্ন সকল সামন্তেরাই মস্তক অবনত করিয়া বিষণ্ণ ভাবে উপবিষ্ট আছেন। হিন্দুস্থানের কষ্টকিচ্ছ্র কার্য্যে তাঁহারা কেহই গমন করিতে ইচ্ছুক নহেন। সেই জন্য আমীর চিন্তাভারাক্রান্ত। তাহা দেখিয়া তিলক বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দীর্ঘ জীবী হউন। হুজুর যদ্যপি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়া কৃতার্থ হই এবং হুজুরের উদ্বিগ্নতা বিদূরিত করি। অপিচ, আমি হিন্দুস্থানবাসী, ঐ দেশের জলবায়ু আমার কোন অনিষ্ট করিবে না। আপনি পণ্ডিত, যদ্যপি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমি উক্ত কার্য্য সাধনে তৎপর হইতে পারি।" আমীর পূর্ব্ব হইতেই তিলকের কার্য্যপটুতা অবগত ছিলেন, এক্ষণে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার মনে মনে বলিলেন, "যাক শত্রু পরে পরে"।

তিলক কর্ম্ম-নিয়োগ-পত্র—"লিখিত নামা" প্রাপ্ত হইয়া, অচিরে নক্সা দ্বারা কার্য্য প্রণালীর বিশদ বিবরণ বাদসার গোচরীভূত করিলেন। আমীর তিলককে যথোচিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া হিন্দু প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহের ভার ন্যস্ত করিলেন। ইহাকে পারশীতে "বাজঘুরক" কহে। তিলক বিপুল সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মঙ্গলবারে ঈদ্ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। আমীর সঙ্গীগণ লইয়া আনন্দে ভরপুর এমন সময় লাহোর হইতে সংবাদ আসিল, নিয়ালটিগীন দুর্গ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে এ কথাও উক্ত আছে যে তিলক নামে জনৈক বঙ্গীয় হিন্দু 'কমাণ্ডার ইন-চিফ' চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি মহতী সেনার সমাবেশ করিয়াছেন। তিনি নিয়ালটিগীনের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন। এই দুই সৈন্যদলের ব্যবধান দু ক্রোশ মাত্র। অল্পদিনের মধ্যে কিরমানে একটি যুদ্ধ হইল। তাহাতে দুই হাজার হিন্দু, এক হাজার তুর্কী এবং এক হাজার কার্দ্দি সৈন্য ছিল। তিলক স্বীয় কৌশলবলে বিভিন্ন স্থানে

সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। তিনি অপর স্থানে সৈন্যাদির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, মাত্র চারিহাজার সৈন্য লইয়া কিরমানের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইত্যবসরে শত্রুপক্ষ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সঙ্গে সৈন্যগণের সামান্য মাত্র রসদ ছিল; তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। এই যুদ্ধের ফল তত সন্তোষজনক হইল না। তাঁহার হিন্দু সৈন্যগণকে চারিমাসকাল খাদ্যাভাবে বার্লীর রুটি খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের ফল সন্তোষজনক না হইবার ইহাও একটি কারণ।

আমীর তিলকের সংবাদ পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে তিনি ৪২৫ হিজীরা বা ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ফসরে বহির্গত হইলেন।

অবশেষে তিনি মদ্যপান করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিনে তিলকের নিকট হইতে দূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল "মদগর্ব্বী বিদ্রোহী আহম্মদ নিয়ালটিগীন হত এবং তাহার পুত্র ধৃত হইয়াছে। নিয়ালটিগীনের তুর্কী পারিষদবর্গ তিলকের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমীর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি জয়ঢক্কা বাজাইবার অনুমতি প্রচার করিলেন। দূতগণকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদে বিভূষিত করা হইল। অতঃপর তিলকের নিকট হইতে পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে;—তিলক লাহোরে উপস্থিত হইয়া কতিপয় দুর্দ্দান্ত মুসলমান নেতাকে কারারুদ্ধ করেন। তাহারা আহম্মদের অনুচর। তিলক তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া অন্যান্য অনুচরবর্গকে অত্যন্ত ভীত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা দর্শন করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহম্মদ নিয়ালটিগীনের দল পরিত্যাগ করিয়া তিলকের শরণাপন্ন হইল। তাহার পর হইতে লাহোরের শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায় বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইতে লাগিল। যখন তিলক দেখিলেন উক্ত দুইটি কঠোর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে তখন তিনি বিপুল সৈন্য লইয়া নিরাপদে আহম্মদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে হিন্দু সৈন্যই অধিক ছিল। কিয়ৎকাল পর হইতেই নিয়ালটিগীনের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহার প্রত্যেকটিতেই আহম্মদ পলায়ন করিতে লাগিল। তিলক পশ্চাদনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিয়ালটিগীনের দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে নিয়ালটিগীন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহার তুর্কী সৈন্যগণ একযোগে তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তিলকের নিকট আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইল। তিনি তাহাদের অভয় দিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আহম্মদ কেবলমাত্র তিনশত অশ্বারোহী লইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তিলক সময় নষ্ট না করিয়া বিদ্রোহী জাঠগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যদ্যপি তোমরা মঙ্গল চাও বিনাপত্তিতে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।"

তাহারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং কালবিলম্ব না করিয়া তিলকের শরণাপন্ন হইল। অবশেষে তিনি দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, যদ্যপি কেহ নিয়ালটিগীনের মস্তক লইয়া আসে এবং তাহার পুত্রকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিতে পারে তাহাকে ৫০০,০০০ ডারহাম নামক রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হইবে। উহা গ্রীসদেশীয় মুদ্রাবিশেষ। উহার প্রত্যেকটির মূল্য ৯½ পেন্সের কিঞ্চিৎ অধিক। উক্ত মুদ্রা প্রাচীন গ্রীশে, তুর্কীস্থানে, আরব ও পারস্যদেশে ব্যবহৃত হইত। এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিতে লাগিল। তখন আহম্মদের জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। জাঠ ও অন্যান্য বিদ্রোহীগণ তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

একদা নিয়ালটিগীন দুইশত অশ্বারোহী লইয়া একটি নদী উত্তীর্ণ হইতেছে এমন সময় দুই তিন সহস্র জাঠ অশ্বারোহী তাহাকে অতর্কিতভাবে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। সে তৎক্ষণাৎ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পুত্রসহ নদী মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে জাঠগণ আক্রমণ করিয়া তাহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। দেখিতে দেখিতে নদী মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আহম্মদের মুষ্টিমেয় সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া জাঠগণ নিয়ালটিগীনের সম্মুখীন হইল। সে তখন তাহার পুত্রকে নিজহস্তে হত্যা করিবার জন্য প্রয়াস পাইল কিন্তু জাঠগণ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া তাহার পুত্রকে নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিল। পরিশেষে তাহারা আহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি চালাইল। অচিরাৎ নিয়ালটিগীনের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল; তাহার পর হতাবশিষ্ট লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল। তিনি তখন জাঠগণকে এক লক্ষ ডারহাম নামক রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহারা নিয়ালটিগীনের মস্তক ও তাহার পুত্রকে তিলকের নিকট প্রদান করিল। তিলক জয়োল্লাসে আহম্মদের মস্তক এবং পুত্রটিকে লইয়া লাহোরে গমন করিলেন। তার পর তিনি সেখানকার শান্তি রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া আমীরের দরবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিলক নিজের ক্ষমতায় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী সকল সময়ই তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। কোথাও তিনি অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। বাঙ্গালী বীর *তিলক স্বল্পকাল মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হইয়া উন্নতির চরম সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি ভিন্ন আর কেহ জঙ্গীলাট হয়েন নাই। তাঁহার জীবনের আর অধিক কোন কথাই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব আমরা এই স্থলেই তাঁহার জীবনের উপসংহার করিলাম।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

---

* তিলক যে বাঙ্গালী ছিলেন—এ প্রবন্ধে তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আশা করি প্রবন্ধ লেখক পরে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। ভাঃ সঃ

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৫)

মশা মাছি তাড়াইবার উপায়

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মশা, মাছি প্রভৃতি দ্বারা সংক্রামক রোগের বিস্তার সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে জ্বরে যত অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে! পুনশ্চ সকল প্রকার জ্বরের মধ্যে এদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মশকদংশন ব্যতীত ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় না, ইহা এক্ষণে অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা মশকের দৌরাত্ম্য হইতে একেবারে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের জন্য ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগী ও এনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশক, এতদুভয়ের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তের মধ্যে উক্ত রোগের কীটাণু বিদ্যমান থাকে; মশকী দংশন দ্বারা উহাকে রোগীর রক্তের সহিত শোষণ করিয়া লয়। পরে মশকীর দেহের মধ্যে থাকিয়া উক্ত কীটাণুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং অবশেষে ঐ মশকী সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে ঐ পরিবর্ত্তিত কীটাণু প্রবেশ করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার নিবারণ করিতে হইলে, হয় মশককুল একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, নতুবা রোগীর রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়া রোগের কীটাণু অবস্থিতি করে, তাহার ধ্বংস করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না তাহা হইলে মশকের দংশন দ্বারা উহা রোগীর শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ম্যালেরিয়াবাহী মশককুলের এককালীন ধ্বংস সাধন করা অসম্ভব। যেখানে জল অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে, সেইখানেই মশকের প্রাদুর্ভাব হইবে। পল্লীগ্রামে নালা, ডোবা, অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী, স্রোতবিহীন নদী এবং যে সকল স্থানে অল্পগভীর জল সঞ্চিত থাকে, সেই সকল স্থানেই মশকের বংশবৃদ্ধি হইবার সুবিধা হয়। এইরূপ স্থানেই মশকীরা ডিম পাড়ে এবং কালে ঐ ডিম ফুটিয়া অসংখ্য নূতন মশকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে জল নিকাশ হইবার স্বাভাবিক পথ সমূহ অনেক স্থানে একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এই সকল স্থানই ম্যালেরিয়ার প্রধান আবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ষার অব্যবহিত

পরেই পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং বসন্তের প্রারম্ভে, যখন বর্ষাসঞ্চিত জল শুষ্ক হইয়া যায়, তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একেবারেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ জানা ছিল না, তখন চিকিৎসকেরা মনে করিতেন যে জলাভূমি প্রভৃতি যে সকল স্থানে জল অবরুদ্ধ থাকে, তথা হইতে এক প্রকার দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদন করে। জলাভূমির ন্যায় স্থান সমূহে মশক জন্মিবার সুবিধা হয় বলিয়াই উহারা ম্যালেরিয়ার আকর; ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইলেও উহা ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপাদন করে না অথবা ঐ সকল স্থানের জল পান করিলেও ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হয় না।

আমাদের দেশে জল নিকাশের সুব্যবস্থা এক অতি কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বহুব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং ইহার ব্যবস্থা-প্রণয়ন সাধারণ লোকের ক্ষমতার বহির্ভূত। গবর্ণমেণ্ট্ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্যয়বাহুল্যবশতঃ ইহা সম্পূর্ণ হইতে অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং বিস্তৃতভাবে জল নিকাশের বন্দোবস্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া পল্লীগ্রামবাসীদিগের স্ব স্ব ও সমবেত চেষ্টায় যে উপায়ে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইল।

১। বাটীর মধ্যে বা আশে পাশে ডোবা, গর্ত্ত প্রভৃতি থাকিলে দূর হইতে মাটী আনিয়া তাহা বুজাইয়া দিবে—যেন কোন মতে তথায় জল জমিয়া থাকিতে না পারে। পল্লীগ্রামে অনেক সময়ে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাটীর নিকট হইতেই মাটী খুঁড়িয়া লওয়া হয় এবং সেই সকল ডোবা কোন কালে বুজান হয় না। এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। ঐ সকল স্থানে জল জমিলেই মশকীরা তথায় ডিম পাড়িবে এবং বাটীর মধ্যে মশার প্রাদুর্ভাব হইবে।

২। জল নিকাশের নালার মধ্যে যদি জল জমিয়া থাকে অথবা বাটীর নিকটে বড় ডোবা বা অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী থাকে (যাহা মাটী দ্বারা বুজাইবার সম্ভাবনা নাই), তাহা হইলে ঐ সকল স্থানে প্রতি সপ্তাহে একদিন জ্বালানি কেরোসিন্ তৈল ঢালিয়া দিবে; ইহা দ্বারা মশকের ডিম ও শাবক নষ্ট হইয়া যাইবে। কেরোসিন তৈলের সহিত পেষ্টারিন্ (Pesterine) নামক কেরোসিন্ জাতীয় অপর এক প্রকার তরল পদার্থ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া জলে ঢালিয়া দিলে মশককুল শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

৩। বাটীর মধ্যে উঠানে বা উহার সন্নিকটে ভাঙ্গা হাঁড়ি, গামলা, পুরাতন টিনের কানেস্তারা, কৌটা ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকিতে দিবে না। এই সকল পাত্রের মধ্যে জল সঞ্চিত হইলে তন্মধ্যে মশকী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ডিম পাড়ে। এই সকল অব্যবহার্য্য পদার্থ বাটী হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিবে।

৪। বাটীর মধ্যে অবস্থিত এবং গ্রামের সাধারণ জলপথগুলি যদি "কাঁচা" না হইয়া "পাকা" করিয়া "গাঁথা" হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে পারা যায়, সুতরাং তথায় মশকজাতির বসবাসের বা ডিম পাড়িবার সুবিধা হয় না। যে সকল গ্রামে "পাকা" ড্রেনের বন্দোবস্ত আছে, তথায় মশকের উপদ্রব এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। গ্রামের মধ্যে যে সকল বৃহৎ পুষ্করিণী পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিতান্ত অপরিষ্কৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও মশকদিগের এক একটী প্রধান আবাসস্থল। এই সকল পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ ঢালিয়া মশক ধ্বংস করা কোনক্রমে সুবিধা জনক নহে, কারণ জলে কেরোসিন্ ঢালিয়া দিলে উহা এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে কেহ সহজে উহা পান বা রন্ধন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। পুনশ্চ পুষ্করিণীর জল কেরোসিন্ মিশ্রিত হইলে উহার মধ্যে যে সকল মৎস্য থাকে, তাহারা মরিয়া যায়। এইজন্য ব্যবহার্য্য পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ না ঢালিয়া অন্য উপায়ে মশক ধ্বংসের ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কতিপয় ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য মশকের ডিম ও মশক শাবকের পরম শত্রু—দেখিতে পাইলেই উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আমেরিকার অন্তঃপাতী বার্বাডোজ (Barbadoes) নামক প্রদেশে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য জন্মে; তাহারা "বার্বাডোজ্ মিলিয়নস্" (Millions) নামে পরিচিত। ইহারা মশকের ডিম ও শাবক নষ্ট করিয়া ঐ স্থান একপ্রকার ম্যালেরিয়া মুক্ত করিয়াছে। সেদিন কলিকাতা মেডিক্যাল্ ক্লবে গভর্ণমেণ্ট ফিসারির সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্ সি মহাশয় এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি মশক ধ্বংসের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ ঢালিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন যে কয়েক জাতীয় মাছ পুষ্করিণীর মধ্যে জন্মাইলে এ বিষয়ে আমরা অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এই সকল মৎস্যের মধ্যে "তেচোকো", "পাঁচচোকো", "খলসে", "কই", "চিলুই" প্রভৃতি মৎস্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "তেচোকো" মাছ অল্পজলে বাস করে, অতি শীঘ্র সংখ্যায় বাড়িয়া যায়, সহজে মরে না এবং পুষ্করিণীর কিনারায় "দামের" মধ্যে (যেখানে মশকীরা ডিম পাড়ে) থাকিতে ভালবাসে। মশকের ডিম ও শাবক ইহাদিগের প্রধান আহার।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গাচিরা (Tadpoles) মশকের ডিম ও শাবক ভক্ষণ করিয়া মশক কুল ধ্বংস করিয়া থাকে।

৬। বাটীর মধ্যে বা চতুষ্পার্শে ঝোপ বা জঙ্গল থাকিতে দিবে না। এই সকল স্থানে মশকগণ দিবাভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সন্ধ্যার সময়ে বাহির হইয়া লোকের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। ঝোপের মধ্যে অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন স্থানে ঝোপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

৭। গ্রামের চতুঃপার্শ্বের জমীর ২০০ হাত বাদ দিয়া চাষের কাজ করিবে এবং ৪০০ হাতের মধ্যে ধান জমী রাখিবে না।

৮। গৃহের মধ্যে যে স্থান অন্ধকারময়, যে স্থানে বই, কাগজ, শিশি বোতল প্রভৃতি রাখা হয় অথচ উহাদিগকে সর্ব্বদা স্থানান্তরিত করা হয় না, যেখানে কাপড় জামা টাঙ্গান

থাকে, তাহার আশেপাশেই মশকদিগকে দিনের বেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। গৃহের মধ্যে প্রচুর আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিলে এবং গৃহের সর্ব্বস্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর দৃষ্টি থাকিলে মশকেরা গৃহের মধ্যে বাস করিবার সুবিধা পায় না।

৯। মশকেরা ধূনা, লোবাণ, গন্ধক, কর্পূর, নিমপাতা, আকরকরা (Pyrethrum), ঘুঁটে প্রভৃতির ধূম এবং টার্পিন্, কেরোসিন্, ফর্ম্মালিন্, মেন্থল্ প্রভৃতি পদার্থের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সন্ধ্যার পর ঘর রীতিমত বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে এই সকল পদার্থের ধূম উৎপাদন করিলে গৃহে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়।

১০। এনোফিলিস্ নামক যে জাতীয় মশক, দংশন দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের বীজ বহন করে, তাহারা দিবাভাগে উপদ্রব করে না, ঝোপের মধ্যে অথবা গৃহাভ্যন্তরস্থ অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া থাকে। উহারা সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া উপদ্রব করিয়া থাকে। এইজন্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে দিবাভাগে অবস্থান করিলে নবাগত ব্যক্তির কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না, কিন্তু রাত্রি কাটাইলেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

১১। পল্লীগ্রামে রাত্রিকালে মশারি না খাটাইয়া শয়ন করা কদাচ উচিত নহে। ডাক্তার রস্ বলেন যে যদি পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি মশারির মধ্যে শয়ন করে, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল এনোফিলিস্ জাতীয় মশক থাকিলেই ম্যালেরিয়া রোগ হয় না; মশকের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তির অবস্থানও অবশ্য প্রয়োজনীয়। মশক দংশন দ্বারা উক্ত রোগীর রক্ত হইতে ম্যালেরিয়ার বীজ সংগ্রহ করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করাইলে, পর ঐ রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগীকে সমস্ত রাত্রি মশারির মধ্যে রাখিয়া দিলে মশকেরা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে রোগ সংক্রমণ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ঘরের মাপের মত বড় মশারি প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যার সময় হইতে তন্মধ্যে পরিবারস্থ সকলে অবস্থান করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারা যায়। ঘরজোড়া মশারি হইলে বিছানা না পাতিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া মশারির মধ্যে আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়। একসময়ে ইতালির প্রদেশ-বিশেষে ও আমেরিকার অন্তঃপাতী পানামা নামক স্থানে ম্যালেরিয়ার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব ছিল; নূতন লোক সেখানে যাইলে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। লোকে মশকের দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সূক্ষ্ম তারের জালের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস ও সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল গৃহের মধ্যে একটীও মশক প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। যাহারা এই সকল গৃহের মধ্যে বাস করিত, তাহারা ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। এরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ; আমাদিগের দেশের সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলন অসম্ভব। তবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা তারের জালের দুই একটী বড় ঘর প্রস্তুত করিয়া ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় রাত্রিকালে উহার মধ্যে বাস করিতে পারেন। গৃহস্থ লোকের বাটীর সমস্ত দরজা জানালায় সূক্ষ্ম মল্‌মল্ কাপড়ের পর্দ্দা বা চিক টাঙ্গাইয়া দিলে রাত্রিকালে বায়ুসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইবে না, অথচ মশকের উপদ্রব হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যাইবে। সাধারণ লোকের পক্ষে ম্যালেরিয়ার কয়েক মাস বড় মশারির ভিতর সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি থাকিবার বন্দোবস্ত করাই অল্পব্যয়সাপেক্ষ ও সহজসাধ্য। ইহা বিস্তৃত-ভাবে পল্লীগ্রামে প্রচলিত হইলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইবে।

১২। মশকেরা প্রায়ই হস্ত বা পদদ্বয়ে দংশন করিয়া থাকে; এইজন্য ম্যালেরিয়ার সময়ে এই সকল স্থান আবৃত করিয়া রাখিলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, যাঁহাদিগকে নগ্নপদে কোন কার্য্য করিতে হয় না, তাঁহাদিগের রাত্রিকালে মোটা গরম মোজা পায়ে দেওয়া থাকিলে ভাল হয়। অনেক সময়ে ইউকালিপ্টস্ তৈল (Eucalyptus Oil) অথবা নেবুর তৈলের (Oil of Lemons) ন্যায় কোন সুগন্ধি তৈল পায়ে হাতে মাখাইয়া রাখিলে মশা কাছে আসে না। মশকেরা কেরোসিন্ তৈলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সামান্য অবস্থার লোকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় গৃহমধ্যে কেরোসিন্ ছড়াইয়া দিলে অথবা সন্ধ্যার পর হাতে পায়ে কেরোসিন্ মালিস করিলে মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি এবং জ্বরের আক্রমণ হইতে কতক পরিমাণে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে হাতে পায়ে সরিষার তৈল মাখিলে মশকের উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে হয় না।

১৩। বাটীর মধ্যে মশক যেখানেই থাকুক না কেন, দেখিতে পাইলেই কষ্ট করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশক ম্যালেরিয়া বীজের বাহন হইলেও যদি একটীও ম্যালেরিয়া রোগী না থাকে, তাহা হইলে সহস্র মশক বিদ্যমান থাকিলেও ম্যালেরিয়ার বিস্তার সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং মশকের অস্তিত্বের ন্যায় ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত রোগীর বিদ্যমানতাও এই রোগের বিস্তারের অন্যতম কারণ। রোগীর রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়ার বীজ অবস্থিতি করে, যদি কোন উপায়ে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মশকের দ্বারা এই রোগের বিস্তৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ যদি রোগের বীজেরই অভাব হয়, তাহা হইলে মশকের দংশন কষ্টকর হইলেও উহাদ্বারা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। কুইনিনের ন্যায় ম্যালেরিয়ার বীজ ধ্বংস করিবার শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে অবস্থিতি করে। যখন উহা পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন উহা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি সাধন করে। এই সকল ক্ষুদ্র বীজাণু (spores) রক্তকণিকা হইতে বহির্গত হইয়া

রক্তস্রোতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে রোগীর কম্পজ্বর উপস্থিত হয়। এইরূপ বংশবৃদ্ধি হইতে বীজ বিশেষে ২৪, ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে; এইজন্য আমরা ১ দিন, ২ দিন বা ৩ দিন অন্তর পালা জ্বরের আক্রমণ দেখিতে পাই। যথারীতি কুইনিন্ সেবন করিলে এই সকল বীজ এরূপ নির্জ্জীব হইয়া পড়ে যে উহাদের বংশবৃদ্ধি স্থগিত থাকে, সুতরাং কম্পজ্বর বন্ধ হইয়া যায়। কুইনিন্ অধিক দিন সেবন করিলে ম্যালেরিয়া রোগের বীজ যে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাই নহে, উহা দ্বারা সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনিন্ সেবনেও বিরাম লাভ করিতে দেখা যায় না, এইজন্য কেহ কেহ বলেন যে কুইনিন্ দ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক স্থলে অপকার সাধিত হয়। এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। কুইনিন্ ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ ঔষধ। যে স্থলে কুইনিন্ ব্যবহার করিয়া উপকার দর্শে না, সে স্থলে, হয় কুইনিন্ যথারীতি সেবিত হয় নাই, অথবা উক্ত জ্বর ম্যালেরিয়াঘটিত নহে।

সম্প্রতি সিমলা শৈলে যে ম্যালেরিয়া কমিসন্ সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহার মতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময়ে প্রত্যেক সুস্থব্যক্তির প্রত্যহ অপরাহ্নে ৫ গ্রেণ কুইনিন্ সেবন করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তি বহুদিন কুইনিন্ এই মাত্রায় ব্যবহার করিলেও কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিউটন

যেমন শিব নটকুলচূড়ামণি, যেমন পর্ব্বতের মধ্যে হিমাদ্রি শ্রেষ্ঠ, যেমন তারকাসুন্দরীগণের মধ্যে রোহিণী বরণীয়া, যেমন "কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ" তেমনই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে নিউটন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুধু ইংরাজ কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতি একবাক্যে নিউটনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আসন প্রদান করিয়াছেন। অথচ এই আত্মাভিমানশূন্য কর্ম্মবীর মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন "আমি জানি না জগৎ আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কি মনে করিবে; কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় প্রস্তর খণ্ড কুড়াইয়াছি মাত্র, আর বিশাল জ্ঞানসমুদ্র সমস্তই অনাবিস্কৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।"

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিনকনসায়ারের মধ্যস্থ উলস্থর্প নামক গ্রামে নিউটনের জন্ম হয়। যিনি এককালে বিশ্বের 'আকর্ষণ' আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইবেন, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এত ক্ষুদ্রকায় ছিলেন যে তাঁহার মাতা বলিতেন ছিলেন যে তিনি তাঁহার সন্তানকে একটী

বোতলের মধ্যে অনায়াসে রাখিতে পারিতেন। ভূমিষ্ঠ শিশু এতই দুর্ব্বল ছিল যে দুইটি স্ত্রীলোক তাহার জন্য ভিন্ন গ্রামে ঔষধ আনিতে যাইবার কালে মনে করে নাই যে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া শিশুটিকে জীবন্ত দেখিতে পাইবে। যাহা হউক, বিধাতা পৃথিবীর হিতের জন্য যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনিই বাঁচাইয়া রাখিলেন।

নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে লালনপালন করেন। বাল্যকালে নিউটন নিজ গ্রামের সন্নিকটস্থ এক স্কুলে পড়িতেন। লেখাপড়ায় বালক নিউটনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না, এবং ক্লাশে তিনি সকলের নীচে থাকিতেন। তবে অন্য বালকেরা যখন খেলা করিয়া বেড়াইত তখন নিউটন স্বহস্তে ছোট ছোট খেলনা প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কখনও জল ঘড়ি প্রস্তুত হইতেছে, কখনও একটা ইঁদুরকে ধরিয়া তাহার দ্বারা একটা ছোট কল চালান হইতেছে, আবার কখনও কখনও একটা ঘুড়ির লেজে একটা কাগজের লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া হইত, যেন গ্রামের লোকেরা দিনের বেলায় তারা দেখিতে পায়! এইরূপ ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহার বেশী আগ্রহ দেখা যাইত। একদিন উপর ক্লাসের একটি বেশী বয়সের ছেলে তাঁহাকে একটা লাথি মারে; নিউটন তাহার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সহিত মারামারি করেন। এই মারামারিতে তাঁহারই জয় হয়। মারামারিতে জয় লাভ করার পর হইতে লেখাপড়ায়ও অপর বালকদিগকে জয় করিবার জন্য তাঁহাকে সচেষ্ট দেখা যায়। ইহার পর হইতে নিউটন স্কুলের একজন ভাল ছেলে বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন তাঁহার বয়স পনের বৎসর তখন তাঁহার মাতা পুনরায় বিধবা হইয়া উলস্থর্পে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনেন এবং চাসবাসের তত্ত্বাবধান কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে চাসবাসের তত্ত্বাবধান তাঁহার দ্বারা ভালরূপ হইতেছে না। প্রায়ই দেখা যাইত যে তিনি চাসবাসের তত্ত্বাবধান ফেলিয়া কোন বেড়ার বা ঝোপের ধারে বসিয়া বসিয়া অঙ্ক কসিতেছেন বা ছোট ছোট কল প্রস্তুত করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার এক মামা তাঁহার মাকে বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেখান হইতে শীঘ্রই তিনি বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটী কলেজে প্রেরিত হইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করার পর হইতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। তিনি অনন্যমনে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সতীর্থ যুবকগণকে ঐ বিদ্যায় ছাড়াইয়া গেলেন। কলেজের পঠদ্দশাতেই তিনি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গুলি মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। একুশ বাইশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি দ্বিপদ-সিদ্ধান্ত (binomial theorem) আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং শীঘ্রই শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত

(theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়া ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস্ (Differential calculus) নামক গণিতবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল আবিষ্কার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ পাশ করিয়া একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর বৎসর কেম্ব্রিজে প্লেগ হওয়াতে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার

কেম্ব্রিজ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই নিউটন জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জ্যোতিষের একটা প্রশ্ন তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতেন "আচ্ছা! চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে কেন? গ্রহ উপগ্রহগণই বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? উহারা সোজা চলিয়া যায় না কেন? বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? একটি গোল মার্ব্বেলকে একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর গড়াইয়া দিলে উহা বাতাস বা ক্ষেত্রের ঘর্ষণজনিত কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইলে বরাবর সোজাই চলিতে থাকিবে। তবে গ্রহ উপগ্রহ সকল সোজা চলিয়া যায় না কেন? কোন্ শক্তি উহাদিগকে ঘুরাইতে থাকে?" তিনি ইহার কারণ কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া প্লেগের বৎসরে তিনি স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন। সেখানেও সেই চিন্তা। একদিন বাগানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একটি পক্ক আপেল ফল মাটিতে সশব্দে পড়িয়া গেল। তিনি উহা লক্ষ্য করিলেন, তখনই মনে মনে প্রশ্ন উঠিল, আপেল পড়ে কেন? মনে মনে তখনই উহার জবাবও মিলিল;—"পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে বলিয়াই আপেল মাটিতে পড়ে।" যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি সম্মুখস্থ কাষ্ঠখণ্ড দর্শনে অথবা অন্ধকার গৃহমধ্যস্থ বন্দী অপ্রত্যাশিত ক্ষীণ জ্যোৎস্না দর্শনে যেরূপ পুলকিত হয়, নিউটনও এই অপ্রত্যাশিত মানসিক উত্তর পাইয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। পৃথিবীর আকর্ষণ যে ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এমন নহে। নিউটনের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বৈজ্ঞানিক গনের উজ্জ্বল ভাস্কর ভাস্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন:—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু
স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক
পতত্বিয়ং মে॥

অর্থাৎ "পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে; সেই শক্তির বলে শূন্যমার্গে প্রক্ষিপ্ত গুরু বস্তু পুনরায় পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই বস্তু সকল পতনশীল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের আকাশ সমান হওয়াতে পৃথিবী আর কোথায় পড়িবে?" অতএব পৃথিবীর আকর্ষণ প্রাচীন কালে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ভারতবাসী গৌরব করিতে পারেন।

নিউটন এই পৃথিবীর আকর্ষণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া উহা বিশ্বের আকর্ষণের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে পরিমাণাত্মক নিয়মও (quantitative law) আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।

নিউটন ভাবিলেন, যদি পৃথিবী ক্ষুদ্র আপেল ফলটিকে বা উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত বস্তুমাত্রকেই টানিতে পারে তবে উহা পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চন্দ্রকে আকর্ষণ করিবে না কেন? পৃথিবী যদি চন্দ্রকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক সূর্য্য, পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রবর্গকে আকর্ষণ করিবে না কেন? নিউটন ক্রমশঃ স্থির করিলেন যে এই বিশ্বাকর্ষণই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে শূন্যমার্গে বৃত্তাকারে ঘুরাইতেছে। পাঠকবর্গকে নিউটনের সিদ্ধান্ত সহজেই বুঝান যাইতে পারে। একখণ্ড দড়িতে একটা ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঢিলটা সোজা চলিয়া যাইবে; কিন্তু ঘুরাইবার সময় হস্তসংলগ্ন দড়ির আকর্ষণে উহা বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঢিলটির উপর দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে—একটি শক্তির দ্বারা উহা সোজা চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত ও অপরটি অর্থাৎ হস্তের আকর্ষণ উহার সোজা গতিকে প্রতিনিয়ত ফিরাইয়া দিতেছে। এইরূপে ঢিলটি হস্তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও হস্তের উপরে পড়িতেছে না, বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। সেইরূপ চন্দ্র কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে গতিশীল; উহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে বরাবর সোজা চলিয় যাইত; কিন্তু পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেইরূপ এই আকর্ষণের জন্য, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া উহাকে কেন্দ্র করিয়া অপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।



নিউটন

এইরূপে নিউটন মানসপটে ভ্রাম্যমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির রহস্যময় চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

তিনি এই আকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি আকর্ষণের পরিমাণ জানিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী কেপ্‌লার নিউটনের পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘবৃত্তাকারে (ellipse) চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রমণকালে গ্রহগণ সূর্য্যের নিকটস্থ হইলে বা সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে আকর্ষণের কিরূপ বিভিন্নতা হয় তাহা নিউটন গণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ গণনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ যতই দূরে যায়, সূর্য্যের আকর্ষণ ততই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কমিতে থাকে। তিনি স্থির করিলেন যে এই আকর্ষণ দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত ভাবে (inversely as the square root of the distance) কমিতে থাকে; যথা—দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয় আকর্ষণ চতুর্থাংশ হইয়া যাইবে, যদি তিনগুণ হয়, আকর্ষণ নবমাংশ হইবে ইত্যাদি।

বিশ্বের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চন্দ্রের গতি পৃথিবীর আকর্ষণের দ্বারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই গণনাতে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পরিধি পর্য্যন্ত দূরত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু তৎকালে পৃথিবীর পরিধি বা ব্যাস সঠিক জানা ছিল না। যাহা জানা ছিল তাহা লইয়া তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার গণনা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত চন্দ্রের গতি মিলিতেছে না;—চন্দ্রের পরীক্ষিত গতি তাঁহার গণনা অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে। তিনি এই অসামঞ্জস্য মিলাইতে না পারিয়া, কাগজ পত্র সমস্ত দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন নাই বা কাহাকেও সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে একদিন রয়েল সোসাইটির অধিবেশনে পিকার্ড নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি সঠিকভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত পরিধি প্রচলিত মাপ হইতে কিছু বেশী হইয়াছিল। নিউটন এই সংবাদ প্রথমে পান নাই। কয়েক বৎসর পরে এই সংবাদ পাইয়াই তিনি বাটী গিয়া পুরাতন কাগজপত্র বাহির করিয়া আবার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার ঠিক মিলিয়া গেল। কথিত আছে, যে যখন তিনি অঙ্ক কসিতে কসিতে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার গণনা মিলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে তখন তিনি আনন্দে এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গণনার শেষ ফল তিনি একজন বন্ধুকে কসিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনা সফল হইয়াছিল;—তিনি অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির কারণ সঠিকরূপে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"প্রিন্সিপিয়া" গ্রন্থ

ইহার পর হইতে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া অনন্যমনে বিশ্বাকর্ষণ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে

লাগিলেন; এবং তাঁহার গবেষণার ফল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় চিন্তায় এমনই নিমগ্ন থাকিতেন যে স্নানাহারের কথা অনেক দিন ভুলিয়াই যাইতেন। একদিন তাঁহার এক বন্ধু—ডাক্তার ষ্টক্‌লে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে একটি টেবিলে নিউটনের জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে; নিউটন কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ভোজন সমাপ্ত করিয়া মুরগীর হাড়গুলি প্লেটে রাখিয়া দিয়া যেমন ঢাকা ছিল সেইরূপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলেন; তার পর অনেকক্ষণ পরে বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আবার আহার করিতে বসিয়া প্লেট খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঃ! আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি এখনও খাই নাই বুঝি, এখন দেখিতেছি আমার খাওয়া হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ একাগ্রতা, এইরূপ অধ্যবসায় না থাকিলে "প্রিন্সিপিয়ার" ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ কখনও রচিত হইতে পারিত না। আবিষ্কৃত বিশ্বাকর্ষণের সিদ্ধান্ত হইতে এই নূতন তথ্য অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইংরাজের পরম দুর্ভাগ্য যে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইংরাজ কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হয় নাই—তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ল্যাটিনভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যখন এই মহাগ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইল তখনও উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা নিউটনের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত জ্ঞানেরই উপাসক ছিলেন, নামের উপাসক ছিলেন না। তাই তিনি লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি একটা দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন; ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ উহা প্রকাশ করিবে। কিন্তু ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ এডমণ্ড হ্যালে প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি নিউটনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করেন। যখন উহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিক সমাজে দশ বারো জন লোকও উহা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সিপিয়ার এক নূতন সংস্করণ বাহির হয়, এই সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এস্থলে এই মহাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সেইজন্য নিম্নে গুটিকতক বিষয়ের চুম্বকমাত্র প্রদত্ত হইল।

বিশ্বাকর্ষণের নিয়ম। জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ-শক্তি প্রত্যেক অণুর ভার অনুযায়ী ও দূরত্বের বর্গফলের বিপরীতানুযায়ী। (varies directly as the mass and inversely as the square of the distance)

গতি নিয়মাবলী। (Laws of the motion)—গেলিলিও গতিশীল বস্তু সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নিউটন সেগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি এই সকল

নিয়মের সাহায্যে পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম গণনা করেন এবং তাহাদের পথের স্বরূপও নির্ণয় করেন।

কেপলারের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী।—কেপলার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন নিউটন সেইগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা হইতে বিশ্বাকর্ষণের দূরত্বমূলক নিয়ম ও অন্যান্য কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করেন।

দ্রব্যের ওজন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আপেক্ষিক গুরুত্ব। তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে বিশ্বাকর্ষণই দ্রব্যসমূহের ওজনের কারণ এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ গুরু বা লঘু তাহাও তিনি নির্ণয় করেন, যথা চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তিরাশি গুণ লঘু এবং সূর্য্য ৩১৬০০০ গুণ ভারী।

জোয়ার ভাটার কারণ।—তিনি দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই সমুদ্রে জোয়ার ভাটা খেলে; এবং জোয়ার ভাটার পরিমাণও তিনি গণনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর আকার।—তিনি কেবল মাত্র গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার নহে, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা এবং কতটা চাপা তাহাও সঠিক নির্ণয় করেন। তিনি দেখাইলেন যে ভূমধ্য রেখা-ব্যাস মের-রেখা-ব্যাস অপেক্ষা ২৮ মাইল বড়।

গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ জনিত তাহাদের গতির বিকৃতি।—তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ কেবল সূর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, অন্যান্য গ্রহের দ্বারাও হইয়া থাকে, সেই জন্য উহাদের গতির বিবিধ বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। তিনি এই সকল ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন ও তাহাদের পরিমাণও নির্দ্ধারণ করেন।

ধূমকেতু।—তিনি দেখাইলেন যে অনিশ্চিত ধূমকেতুও বিশ্বাকর্ষণের অধীন এবং তাহারা পরবলয় (parabola) আকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া থাকে। তাহাদের পুনরাগমনের কালও গণনা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত এই সকল তথ্য ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা ও গণনা এই মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থের শেষভাগে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও গতির অনন্ত সৌন্দর্য্য মানসপটে নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিনম্র মস্তকে জগতস্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না যে এই বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র এক সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন আর গ্রহজ্যোতিষ্কবর্গ মানবনেত্রের সম্মুখে লক্ষ্যহীন বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে না, উহারা পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া একটি সম্পূর্ণ সমষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বিশ্বাকর্ষণ ও প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া নিউটনের জীবনে ঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই। আমরা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগের বৎসরে তাঁহাকে স্বগ্রামের বাটীর বাগানে

বসিয়া বৃক্ষ-পতিত আপেল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যে কলেজে পড়িতেন সেই কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং দুই বৎসর পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত লিউকেশিয়ান-অধ্যাপক-পদে ডাক্তার ব্যারোর স্থানে নিযুক্ত হন। ডাক্তার ব্যারো অবসর গ্রহণ করিবার সময়, অঙ্কশাস্ত্রে নিউটনের অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়া, নিজেই তাঁহার নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিউটন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তাহার যশ পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিলে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে টাঁকশালের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং যাবজ্জীবন তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ
(Dispersion of sunlight)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৬৬ সাল হইতে ১৬৭২ বা তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত নিউটনের বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা বন্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই কয় বৎসর তিনি যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ সময় তিনি আলোকশাস্ত্রে (optics) মনোবিবেশ করিয়াছিলেন এবং আলোক সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে, যে বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে সেই বিষয়ে একেবারে অনন্যমনা হইতে না পারিলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা সহকারে আলোকশাস্ত্রের কয়েকটি আবিষ্কার লইয়া এই কয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়াছেন ত? কিন্তু ঐ বিচিত্র বর্ণ কেমন করিয়া হয়? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এনটনিও ডমিনিস নামক একজন ইটালিয় ধর্ম্মযাজক সর্ব্বপ্রথমে রামধনুর বর্ণের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ জলবিন্দুর উপর প্রতিভাত হইয়া রামধনুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহার পর ডেকার্টে দেখাইয়াছিলেন যে সূর্য্য-কিরণ একটি ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া যাইলে রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই যে কেন এবং কিরূপে এইরূপ বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে।

নিউটন একটি অন্ধকার ঘরের জানালায় একটি গোল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আনয়ন করিয়া একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া দেখিলেন যে অপর দিকস্থ একটি পর্দ্দার উপর একটি লম্বা রামধনুর বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বর্ণছত্র (spectrum) শোভা পাইতেছে। সেই বর্ণছত্রে তিনি সাতটি রং উপরি উপরি দেখিতে পাইলেন—সর্ব্বনিম্নে লাল, তাহার উপরে কমলালেবুর রং, তাহার উপর হরিদ্রার রং, সবুজ রং,

নীল রং, গাঢ় নীল, সর্ব্বোপরি বেগুনে রং। বাস্তবিক বর্ণছত্র যে ঠিক সাতটি রঙ্গের সমবায় তাহা নহে – অসংখ্য রং উহাতে আছে, তবে সাতটি রং বেশ ধরা যায়। এখন নিউটনের জিজ্ঞাস্য হইল দুইটি বিষয়—প্রথম, এই বিচিত্র বর্ণছত্র সূর্য্যের শ্বেত আলোক হইতে কিরূপে আসিল? এবং দ্বিতীয়, বর্ণছত্র গোল না হইয়া লম্বা হইল কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য তিনি বর্ণছত্রের প্রত্যেক রং এক একটি করিয়া অপর একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া উহা আর একটি পর্দ্দায় ধরিলেন। তাহাতে তিনি দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন—প্রথম, এই সাতটি রঙ্গের কোনটিও ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া গিয়া আর ভাঙ্গিয়া অন্য রঙ্গে পরিণত হইতেছে না, লাল রং লালই থাকিয়া যাইতেছে, বেগুণে রং বেগুনেই থাকিতেছে। দ্বিতীয়—যে রংটি বর্ণছত্রে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখনও উহা ঠিক পর পর সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি তাঁহার দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর পাইলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্থির করিলেন যে যখন লাল প্রভৃতি সাতটি রং বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্য রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, তখন উহারা আদি রং (primitive colours) এবং সূর্য্যের শ্বেত আলোক এই সাতটি আদি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় শ্বেত আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি আদি রঙ্গে পরিণত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর মিলিল—তিনি দেখিতে পাইলেন যে সাতটি রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়া যায় (refracted); —লাল রং সর্ব্বাপেক্ষা কম বাঁকিয়া থাকে আর বেগুনে রং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাঁকিয়া যায় এবং অন্য অন্য রংগুলি এই দুই রংএর মাঝামাঝি পরিমাণে বাঁকিয়া থাকে। সেই জন্যই বর্ণছত্রে লাল রং সর্ব্বনিম্নে থাকে এবং বেগুনে রং সকলের উপরে থাকে এবং অপর রংগুলি এই দুইয়ের মাঝামাঝি থাকে। এইরূপে রংগুলির জন্য বিভিন্ন স্থানের সংকুলান করিতে গিয়া বর্ণছত্র লম্বা হইয়া পড়ে।

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা নিউটন দুইটি বিষয় আবিষ্কার করিলেন—প্রথম, সূর্য্যালোক আদি রং নহে, উহা সাতটি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; দ্বিতীয় প্রত্যেক রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন ভাবে বাঁকিয়া যায়। নিউটন শুধু শ্বেতালোক বিশ্লিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সাতটি আদি রং মিলাইয়া শ্বেত রং প্রস্তুত করিয়াও গিয়াছেন। একখানি কার্ডবোর্ডের বড় চাকৃতিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে সাত রকম কালি দিয়া সমান করিয়া পাঁচটি বর্ণছত্র আঁকিলেন; তাহার পর এই চাকৃতিখানি একটি ঘোরাইবার যন্ত্রের উপর রাখিয়া জোরে জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন; ঘুরাইবার সময় সাতটি রং এক সঙ্গে চক্ষুতে প্রতিভাত হইবার দরুণ একত্র মিলিত হওয়াতে সাদা বা ঈষৎ ধূসরবর্ণের সাদা দেখাইতে লাগিল। একেবারে সাদা না দেখাইবার কারণ আর কিছুই নয়—সকল কালির রং বর্ণছত্রের সাতটি রঙ্গের ঠিক অনুরূপ হয় না।

নিউটন শ্বেত আলোকের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া রঙ্গের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন দ্রব্যের রং দ্রব্যে নাই, উহা আলোকে আছে। লাল দ্রব্য যে লাল দেখায়—তাহার কারণ এই যে, ঐ দ্রব্য লাল ব্যতীত অন্য রঙ্গের আলোক শোষণ করিয়া থাকে, কেবল লাল আলোক শোষণ করিতে পারে না। নীল কাচের মধ্যে দিয়া সূর্য্যালোক যাইলে সূর্য্যালোক নীল হইয়া যায়, তাহার কারণ নীল কাচ

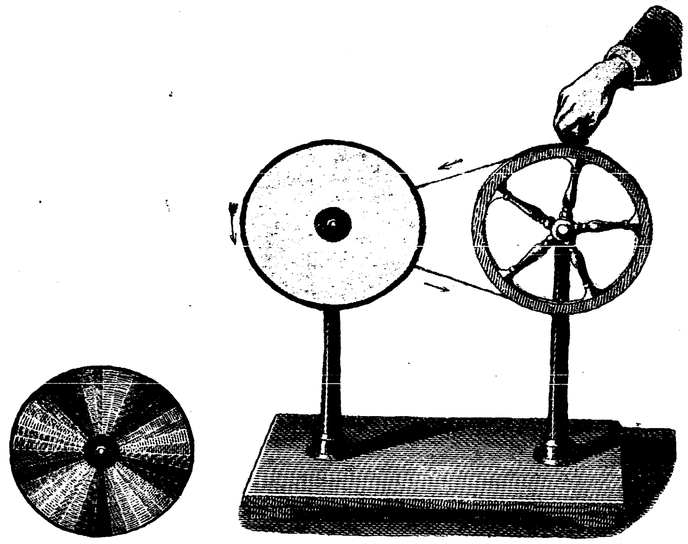

সাতটি রঙ্গে চিত্রিত কার্ডবোর্ড ঘুরাইবার সময় সাদা দেখাইতেছে।

সূর্য্যালোকের আর সকল প্রকার রঙ্গের আলোককে শোষণ করিয়া ফেলিয়া কেবল নীল আলোককে যাইতে দেয়। নিউটনের এই অভিনব মত তখনকার প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অনেকে তাহার এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

"অপ্‌টিকস্" গ্রন্থ

নিউটন আলোক সম্বন্ধে আরও অনেক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আলোক সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার তাঁহার "অপ্‌টিকস্" (optics) নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি আর কিছু না করিয়া যদি কেবল এই গ্রন্থখানিই রচনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। এখানে এই সকল আবিষ্কারের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া সংক্ষেপে দুই একটি উল্লেখ করা গেল মাত্র।

নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

—সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রে কাচ নির্ম্মিত উন্নতোদর লেন্সের (convex lens) ব্যবহৃত হইত

বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণছত্র ছবির চারিপাশে দেখা যাইত। তাহাতে ছবি অস্পষ্ট হইত। নিউটন কাচের লেন্স পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত নতোদর দর্পণ (concave metallic mirror) ব্যবহার করিলেন। এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে "পরাবর্ত্তণীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র" (reflecting telescope) বলে এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিউটনের আবিষ্কার যন্ত্রের অনুযায়ী করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রয়েল সোসাইটীতে এখনও রক্ষিত আছে। উহার একখানি প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল।

ষষ্ঠাংশ যন্ত্র।—(sextant)। আধুনিক নাবিকেরা উপরোক্ত যন্ত্র এখন যে আকারে ব্যবহার করেন তাহার আবিষ্কর্ত্তা নিউটন।

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।—আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে নিউটনের মত এই ছিল যে আলোকিত দ্রব্য হইতে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়া আলোকের উদ্ভব হয়। এই সিদ্ধান্তকে আলোকের "নির্গম সিদ্ধান্ত" (emission theory) বলে। আলোক সম্বন্ধে নিউটনের এই সিদ্ধান্ত এখন আর প্রচলিত নাই। এখন স্থির হইয়াছে যে ইথার (ether) বা ব্যোম নামক সর্ব্বত্র বিদ্যমান অতি সূক্ষ্ম পদার্থের হিল্লোলে আলোকের উদ্ভব হইয়া থাকে।

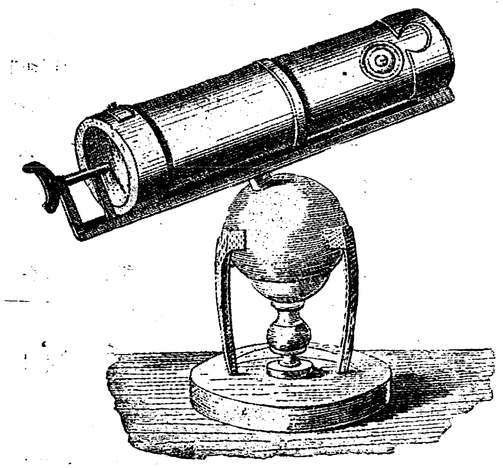

নিউটনের আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র

শব্দের গতি নির্ণয়।—আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ব্যতীত শব্দ (sound) সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। শব্দ সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা ব্যোম বা আকাশের (ether) গুণ শব্দবহন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমান করিয়াছে যে ইথার প্রকৃতপক্ষে শব্দবহ নহে, বায়ুই শব্দবহ। শব্দিত দ্রব্যের দ্বারা বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং সেই তরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করে বলিয়া আমরা শব্দ শুনিতে পাই। শব্দজনিত বায়ুর তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত ও পতিত হয় নিউটন তাহা সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া যান এবং শব্দের গতিও (velocity) নির্ণয় করেন। তাঁহার গণনা একেবারে সঠিক না হইলেও তাহা প্রথম চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

নিউটনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শুধু জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যার গবেষণাতে ক্ষান্ত হয় নাই, নিউটন রসায়নশাস্ত্রেও গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার ডায়মণ্ড নামক কুকুর তাঁহার অনুপস্থিতে একদিন একটা বাতি উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়াতে সেই আগুনে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণার পাণ্ডুলিপিগুলি সব পুড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! তুমি জাননা যে তুমি আজ কি ক্ষতিই করিয়াছ!" এই দুর্ঘটনার পর তিনি আর কোনও বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিউটন আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অনেক সময় তাহা জনসমাজে প্রচারিত করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে অনেক সময় তাঁহাকে স্বীয় আবিষ্কারের মৌলিকতা লইয়া অপরের সহিত বিবাদ করিতে হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বহু পরে অর্থাৎ ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবামাত্র বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক লাইবনিট্‌জের সহিত উক্ত আবিষ্কারের পূর্ব্বপর লইয়া তাঁহার বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। যদি তিনি উক্ত আবিষ্কার সময়মত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে লাইবনিট্‌জের দাবী আদৌ উঠিত না। ফলে যে সময় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সময়ে জার্ম্মাণিতেও উহা লাইবনিট্‌জ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবার যখন "প্রিন্সিপিয়া" রচনার অনেক পরে উহা হ্যালে কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল তখনও হুক নামক আর একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের ভাগ লইবার দাবী করিয়া বসিলেন। আসল কথা এই যে বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের আবিষ্কার যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়াতে হুক, রেন, হ্যালে প্রভৃতি অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণও ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমকালীন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকজগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক চিরশান্তিপ্রিয় নিউটনকে বড়ই মর্ম্মপীড়া দিত। তিনি একদা বলিয়াছিলেন "বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এমনই মোকদ্দমাপ্রিয় যে তাঁহার অনুচরবর্গকে তাঁহার সেবা করিতে হইলে বিলক্ষণ আইনজ্ঞও হইতে হইবে।" আর এক সময় তিনি লাইবনিট্‌জকে লিখিয়াছিলেন "আমার আলোক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইয়া তর্কবিতর্কে আমি এত উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমার দুঃখ হয় যে একটা ছায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া আমি আমার জীবনের সুখশান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি।"

নিউটনের শেষজীবন স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল। তিনি টাঁকশালের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়া বাৎসরিক বারশত পাউণ্ড মাহিনা পাইতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ইউরোপের সর্ব্বত্রই সম্মানিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্ঞী অ্যান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে

নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, বোধহয় বিবাহ করার কল্পনাও তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ও তাঁহার স্বামী তাঁহার গৃহস্থালী রক্ষা করিতেন। তিনি চিরকাল ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে পঁচাশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবীতে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হয় এবং ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার শবাধার বহন করেন। গেলিলিওর শোচনীয় পরিণাম ও তাঁহার প্রতি ইটালীবাসীগণের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করিলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে হয় তেমনি নিউটনের প্রতি ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের এইরূপ সম্মান-প্রদর্শনে আনন্দ হয়।

নিউটনের আবিষ্কার কাহিনী সম্যক পাঠ করিলে স্বতই বিস্মিত হইতে হয় যে কেমন করিয়া এক ব্যক্তি এতগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে প্লঠদ্দশাতেই তিনি দ্বিপদ সিদ্ধান্ত (binomial theorem) ও শূন্যবৃদ্ধি সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার এবং শ্বেত আলোক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন দিক্‌দর্শন যন্ত্রের উন্নতিসাধন, ষড়াংশযন্ত্র নির্ম্মাণ, আলোক-সিদ্ধান্ত, রং সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শব্দের গতিনির্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ আবিষ্কার তিনি একাই করিয়াছিলেন এই আবিষ্কারগুলি যদি দুইজন বৈজ্ঞানিক মিলিয়া করিতে পারিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই এক একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি যখন দেখিতে পাই যে এ সকল ভিন্ন তিনি বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া জগৎ সৃজনের একটি গূঢ় রহস্য উৎঘাটন করিয়া গিয়াছেন, অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ব্যোমমার্গে অত্যদ্ভুত ভ্রমণবৃত্তান্তনিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব উৎঘাটিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন তখনই তাঁহার অতিমানুষিক মানসিক শক্তির প্রাখর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হই। এইরূপ একজন বিস্মিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলিয়া গিয়াছেন "নিউটন কি আমাদের মত মানুষের ন্যায় পানাহার করিতেন ও নিদ্রা যাইতেন? আমার নিকটে তিনি কিন্তু স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন— যেন তিনি এই মরজগতের বাঁধাবাঁধির অতীত।" অথচ এই মহাপুরষ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া পাথর কুড়াইয়াছি মাত্র, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র অনাবিষ্কৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।" যিনি "মহতো মহীয়ান" তাঁহার জগৎসৃষ্টির অনন্ত রহস্যের মধ্যে যিনি ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন এই কথা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বাগ্‌দত্তা

(৩২)

জঙ্গলে পূর্ণ পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামগুলিকে বাহির হইতে স্থানে স্থানে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ভগ্ন গৃহে গৃহস্থ তাহার সুখদুঃখ লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বাহিরে লোনাধরা দেওয়ালে বঙ্গভূমির সম্পদচিহ্ন শ্যামলতা প্রকটিত, ভিতরে তাহারই সঞ্চিত ম্যালেরিয়া পূর্ণ প্রকোপে প্রতিষ্ঠিত। কলমিদল ও কলমীলতার ডোবার উপর মহাকলরবে মশকগণ সান্ধ্যসঙ্গীত গাহিয়া বিষ বর্ষণ করিতেছে, জ্বরের ঘরকে বৃদ্ধ বিছানায় পড়িয়া কাঁপিতেছে, কচি ছেলে চেঁচাইয়া রুগ্না প্রসূতির যন্ত্রণা দ্বিগুণ করিতেছে, গৃহের অভিভাবক কলিকাতার মেসের বাবু সপ্তাহে গৃহে আসিয়া দুহপ্তার অফিস কামাই জন্য জরিমানা দিয়াছেন, ঘরে যত কুইনিনের শিশি জমিয়া উঠিতেছে সাবুর বাটীতে দুধ মিছরির অংশ ততই কম পড়িতেছে। সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমির, অবস্থা এইরূপ। গ্রামের বড় লোকেরা প্রায় সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন। পাড়া নিরন্ত, দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়াকাণ্ড সবই প্রায় বিলুপ্ত। কোথাও কোন নিস্তব্ধ গৃহে দূরসম্পর্কীয়া প্রবীণা আত্মীয়া সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া পুরোহিত দ্বারা গৃহদেবতাকে একমুঠা আতপ চাউল ও দুটা ফুল ফেলিয়া দিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন। কোথাও চিলেছাদে, প্রাচীরে অশথবট সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া আশ্রয় স্থলকে মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিয়াছে, প্রবেশ দ্বারে তালা বন্ধ।

এইরূপ একটি জঙ্গলমরুস্থানে একখানি অপরিচ্ছন্ন গৃহে করালীচরণ আসিয়া সংসার পাতিল। মূলাযোড়ের বিখ্যাত কালীবাড়ীতে সে পূর্ব্বে কিছুদিন দপ্তরখানায় কাজ করিয়াছিল, পুরাতন দাবী তুলিয়া একটা কর্ম্ম জোগাড় করিয়া সে যে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল তাহার প্রধান কারণ কমলার দর বাড়ান। ত্রিবেণীতে থাকিলে শিবনারায়ণ সর্ব্বদা সংবাদ পাইবেন, একটু সরিয়া থাকিলে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র তাহার নিকট হইতে বন্দকী গহনার মত কমলাকে খালাস করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইবেন। শিবনারায়ণকে সে পত্র লিখিল "কমলার জন্য অপর পাত্র স্থির হইয়াছে, সে ব্যক্তি আড়াই হাজার টাকা দিতে চাহে আপনার ইচ্ছা থাকিলে উক্ত টাকা লইয়া আগামী সোমবার নৈহাটী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন, 'কমলাকে দিয়া টাকা লইয়া আসিব।" সোমবার সে সপরিবারে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল। সেখানে প্রচার করিয়া আসিল কলিকাতায় বিবাহ দিতে যাইতেছে। সেদিন ষ্টেশনে সন্ধ্যা অবধি চাকদহ হইতে কেহ আসিল না, করালী একটু ফাঁপরে পড়িল, এতটাকা দিয়া অপর কেহ কমলাকে বিবাহ করা সম্ভব নয় তাহা সে বুঝিত। দরিদ্র বংশজ সন্তানগণ পাঁচ সাত সতেরর অধিক উঠিতে অক্ষম, ধনীগণ পণ দিয়া বিবাহে অসম্মত, শিক্ষিত

সমাজে পুত্রপণপ্রথা সসম্মানে চলিতে থাকিলেও কন্যাপণ ঘৃণ্য বলিয়াই বিবেচিত। বেশী টানিতে গিয়া জাল ফাঁসিল নাকি?

কিন্তু সে পত্র যে শিবনারায়ণের নিকটে আদৌ পৌঁছায় নাই এ সংবাদ সে জানিত না। ডাকঘরে প্রেরণের জন্য শিশু হস্তে দত্ত পত্রখানা কমলা হাতে পাইয়া পাঠান্তে রন্ধন চুল্লির মধ্যে তাহাকে স্থানদান করিয়াছিল।

সে মনে মনে বলিল 'আমার জন্য তাঁদের এ অপমান আমি ঘটিতে দিব না।' কিন্তু তথাপি নৈহাটি ষ্টেশনে সে বারম্বার সম্মুখে পার্শ্বে চমকিয়া চাহিতেছিল, হায় যদি সহসা, অতর্কিত তাঁহাদের কেহ একজন আসিয়া পড়িতেন! যদি কেহ তাহাকে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন! গর্ব্বের সহিত অনুতাপের বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল; সে বলিল, তুমিইতো অহঙ্কার করিয়া চিঠি ছিঁড়িলে, নহিলে হয়ত মুক্তি পাইতে।" ভিতর হইতে আত্মমর্য্যাদা মাথা তুলিয়া উত্তর দেয় 'যাহয় হউক, তাই বলিয়া আমি তাঁহাদের কাছে অর্থমূল্যে কেমন করিয়া আত্মবিক্রয় করিব? এমন করিয়া দিন কাটাইয়া দিব তথাপি তাহা পারিব না।

আজন্ম বুভুক্ষার আদর্শ লইয়া মাতুল গৃহের নূতন গৃহস্থালী কমলাকে তাহার গৃহিণী পদে বরণ করিল। অভাব তাহার শীর্ণ বাহু তুলিয়া কঠোর কর্কশকণ্ঠে আবাহনের আগমনী গাহিল। দাসী পাচিকা গৃহিণী এতগুলি সম্মানিত অধিকার একসঙ্গেই লাভ—এমন তরুণ বয়সে সবার ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না।

কিন্তু আর যাহার পক্ষে যাহাই হউক, সত্যকালী তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার জীবনে অন্ধকার দারিদ্র্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সহানুভূতিহীন স্বার্থচিন্তামগ্ন স্বামীর নিকটে এতটুকু শান্তি কোনদিন আদায় হয় নাই, শারীরিক মানসিক উভয় শ্রমে দেহ পিশিয়া গিয়াছে, হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে তবু বিশ্রাম মিলে নাই? এতদিনে তাঁহার মনে হইল "তবে বোধহয় দেবতা আছেন!' কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন 'আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি মা! নৈলে এতদিন পরে এ সময় কোথা থেকে এলি বল্ দেখি!"

অনেকগুলি মরিয়া হাজিয়া এক বিবাহিতা মেয়েটি ছাড়া আরও তিনটি শূন্য কন্যা। সবগুলিই কচি কাচা বুভুক্ষিত এবং রুগ্ন। ইহার মধ্যে মেয়েটির উপরই একটু যত্ন লওয়া হইত কারণ তাহার পিতা বলিতেন "ভুলে যেওনা,—হাবি আমার পাঁচশো টাকার মাল।" ছেলে গুলা কুলীন সন্তান নহে কাজেই তাহাদের আদর নাই। কমলা আসিয়া এই পরিত্যক্ত মানবগুলিকে সমস্ত চিত্তে কাছে টানিয়া লইল। অবসর যদিও একান্ত অল্প তথাপি সে নিজে বিশ্রাম না লইয়া, ধোয়াইয়া মোছাইয়া ঘা-পাঁচড়ায় ঔষধপত্র দিয়া তাহাদের মানুষের চেহারা বাহির করিল। সাত বছরের বড় ছেলেটির পিলার দাপটে পেটটা বাদ্যযন্ত্র বিশেষের মত আকার ধারণ করিয়াছিল, বসিলে তাহা বুকের উপরেও ঠেলিয়া উঠিত। সেকালের গৃহিণীরা অনেক টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন। করুণাময়ী ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর নিকট এই

সকল বিদ্যার কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন, কমলা তাঁহার দেখাদেখি ছেলেটির পেটে গোমূত্রের সেক ও গাছড়ার ঔষধ খাওয়াইয়া মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে অনেকখানি সুস্থ করিল। একখানা বর্ণপরিচয় সংগ্রহ করিয়া শিশু দুইটিকে সুযোগমত একটু একটু পড়াইতে গিয়া দেখিল মেধাশক্তি এই জন্ম-অনাদৃত শিশুদিগের এখনও কিছুমাত্র অল্প নয়। করুণায় হৃদয়পূর্ণ করিয়া সে ভাবিল, এ ভালই হইয়াছে অত টাকা অন্য কেহই দিবে না সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত, চাহি কি সারা জীবন ধরিয়াই আমি এই দুর্ভাগাদের লইয়া কাটাইয়া দিব। নাই বা আমার সুখ হইল নাই বা আমি তাঁহাদের পাইলাম, সেই দুদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করিব, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দুঃখীদের সুখী করিব, আর কি চাই? মামার পণ্য হওয়ার চেয়ে শতগুণে সে আমার ভাল।"

সংসারে সকলেই গুণের বশ, সত্যকালীর রোগশোকঅভাবগ্রস্ত অসহিষ্ণু চিত্ত এই মোহিনী মায়ায় সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ ছেলে দুটির উপর কমলার যত্ন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া যাইতেন। গালিগালাজ নাই, মারামারি কমিয়া গিয়াছে, চেহারাও ফিরিয়াছিল, আহা যদি এতদিন কমলা থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার অন্য সন্তান দুইটি ভুগিয়া ভুগিয়া অসময়ে চলিয়া যাইত না। করালীচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সব চাহিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার মুখের পাষাণ রেখার মত কঠোর কাঠিন্যে সামান্য দাগটুকুও পড়ে না, মনে মনে সে হাসিয়া বলে মেয়েটা খুব সেয়ানা, ভেবেছে ভোল দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবে, তা তেল দাও ফুল দাও ভবি ভোলবার নয়।"

কিন্তু যত বড়ই সুগৃহিণী হোউন, যতই তিনি আত্মোৎসর্গ করুন সংসার চালাইতে হইলে আর একটা জিনিষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন আছে তাহা রৌপ্যচক্র! এ সংসারে সেই বস্তুটির সব চেয়ে টানাটানি। কাজেই গৃহিণীপণার যত কিছু কৌশল আছে সব খাটাইয়াও শ্রীবৎস উপাখ্যানের অচল তরণীর ন্যায় ইহাকে চালান কমলার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মাতুলের সহিত কথা কহা তাহার পক্ষে একান্ত ক্লেশকর, বিশেষ টাকা কড়ির কথা। সত্যকালীকে দিয়া সে তাঁহাকে বলাইল। করালীচরণ মুখবিকৃত করিয়া কহিলেন—"টাকা আমি কি বাটপাড়ি করে আনব নাকি? যেমন চলচে চালিয়ে নাও না।" সত্যকালী কহিলেন "ওই কি বাটপাড়ি করতে যাবে নাকি? কথা শোন যেন ও-ই চোর দায়ে ধরা পড়েচে, যে ক'টাকা হাতে ছিল এতদিন সে কটি খুইয়ে তোমার সংসার চালালে, বার মাস কোথা পাবে?"

"যেখান থেকে পায় দিক, ওর জন্যেই আমার ডবল খরচ পড়চে। হতভাগা ছোঁড়া দুটোর অত আদর কেন? তোমার কাপড় তো দেখি দিব্যি সাফ; আদা, মরিচ, মিছরি, নিত্যি আস্‌চে কেবল বাজে খরচ?" আমি কি নবাব যে অত সব জোগাব?"

"নিজের গাঁজা ভাঙ্গ, তামাকের পয়সা গুলো যত কাজের খরচ, না? সাফ্ কাপড়

পরি না পরি তোমার কত খরচ তাতে করিয়েছি শুনি! ছেলে দুটো যেন তোমার আপদ হয়েছে, সব ক'টাই তো গেছে ওদেরও তুমি বাঁচতে দেবে না দেখচি"—বলিতে বলিতে সত্যকালী ক্রোধে দুঃখে, অভিমানে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া পিছন ফিরিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে কমলা বড় ছেলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া একটি প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করিল, সেই বাড়ীর একটি মেয়ের সহিত স্নানের সময় পুখুর ঘাটে তাহার একটু আলাপ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় করুণাময়ী দত্ত বালা দুই গাছি তাহার হাতে আর দেখা গেল না। এক গাছি করিয়া রাঙ্গা কড়া ইহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ এ সম্মান লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না; কাজ কর্ম্মের ভিড়ে পলকা জিনিষ দুই খণ্ড হইয়া খসিয়া পড়িল, কমলা একবার মাত্র শিহরিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া হাতখানা ঢাকিয়া ফেলিয়া পুনরায় আরব্ধ কর্ম্মের দিকেই মনোনিবেশ করিল। সত্যকালী ভর্ৎসনার সহিত স্বামীকে সংবাদটা জানাইলে মাতুল ভাগিনেয়ীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বটে! তবে তো মেয়েটার বুদ্ধি সুদ্ধি ভাল দেখতে পাচ্চি! বেশ করেচে কখন চোর এসে ছিনিয়ে নেয়ে যেত, তবু কাজে লাগল।" কমলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কহিল "বড় খুসী হয়েচি, হাজার হোক নারাণীর মেয়ে তো, নারাণী বড় মানুষের ঘরে গেছলো দাদা বল্‌তে খুন হত, ভাই ফোঁটার সময় মিহি মিহি শান্তিপুরে ধুতি পাঠাত। আমার বরাতে অমন বোন চলে গেল, না হলে আমার ভাবনা কি?"

(৩১)

পৌষ গত হইয়া মাঘ মাসেরও অর্দ্ধার্দ্ধি চলিয়া গিয়াছে, শীতের প্রকোপ ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছিল। রাত্রে হিমপাত অল্প হইয়া গ্রহ তারকার উজ্জ্বলতা এবং শুক্লা জ্যোৎস্নার হৈমপ্রভা উভয়ই বর্দ্ধিত হইত, নূতন ভূণ গ্রহণের জন্য উন্মুখ বৃক্ষলতাগুলি পুরাতন জীর্ণ পত্ররাশি পরিত্যাগ করিতেছিল। আকাশে বাতাসে সূর্য্যের কিরণে, নবোদ্গত কিশলয়ের চিক্কণ অরুণিমায় সর্ব্বত্রই একটা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল। আবার শুধুই জড় জগতে নহে জীব জগতেও এই নব বসন্তের সূচনা দেখা দিয়াছে। পশু পক্ষীগুলাও প্রকৃতির প্রদান প্রত্যাখ্যান করে নাই, গহ্বরশায়ী কীট গুলা বাহিরে আসা আরম্ভ করিয়াছে, নবীন চ্যূতমুকুলের আঘ্রাণে আমোদিত মধুমক্ষিকা ঝাঁক বাঁধিয়া সেইখানেই বাসা বাঁধিয়াছে, এমন কি ঝোপ ঝাপের মাঝখান হইতে ইতিমধ্যেই বসন্তের সহচর তাহার চিরপরিচিত রাগিণীর আলাপ সুরু করিতে ভুল করে নাই।

মানুষের মধ্যেও ঋতুর প্রভাব কম কার্য্যকরী নহে। শীত কমায় আজকাল সত্যকালী অনেকখানি সুস্থ বোধ করিতেছিলেন, বিছানা ছাড়িয়া প্রথম দিন একটু বাহিরে আসিয়া বসিতে পারিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার চির বিষণ্ণমুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে টুকুর অর্থ এবারের মত তবে আমি বাঁচিয়া গেলাম!" যে যতই দুঃখ ভোগ করুক

সকলেই প্রায় মরণকে সকল দুঃখের সেরা বলিয়াই মনে করে।

আজ কাল বোধ হয় নব বসন্তের উতলা হাওয়া কমলার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বার নিকুঞ্জের মাধবী শাখার পত্রমর্ম্মরে সুপ্ত কোকিলকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কাজ কর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার পর নির্ব্বাপিতালোক কক্ষের কঠিন শয্যায় আর সে বিনিদ্র যামিনী যাপন করে না। তৈল খরচের ভয়ে সন্ধ্যায় একবার জ্বলিয়াই দীপ নেভে বটে কিন্তু সেও সেই সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে জ্যোৎস্নালোকে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতিবাসী দু একজনমাত্র, সবারই গৃহের মধ্যে পচা পুষ্করিণীর ধারে; কালকাসন্দা, ডাঁটাপত্র বেড়া ঘেরা সবজির বাগান ব্যবধান। সে স্তব্ধ বক্ষে অদূর বংশবনে বাতাসের খেলায় জ্যোৎস্নার হিল্লোল চাহিয়া দেখে, সারাচিত্ত ভরিয়া তেমনি একটা আশা-শোকবিকম্পিত পুলকহিল্লোল মধ্যে মধ্যে তাহারও বুকের ভিতর তরঙ্গিত হইয়া উঠে, বাতাস বন্ধ হইয়া চারিদিক নিঃসাড়া হইয়া যায়, তাহারও বক্ষ কাতর তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতে থাকে। উপরে আকাশভরা ফোটা ফুলের মত নক্ষত্রের দীপ্তি, আশে পাশে গাছের গায়ে গায়ে জোনাকীর ঝিক্‌মিকানি, কমলার দৃষ্টি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে, অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে ব্যাকুল হইয়া ফিরে, যদি সে ঐ সব ছোট ছোট আলোগুলির কোনটির মধ্যে একদিন নৈশ অন্ধকারে চিতাগ্নির পাশে করুণাপূর্ণ বেদনাব্যথিত যে মুখ দেখিয়াছিল তাহারই ছায়াটি দেখিতে পায়! কিন্তু হায়, এ প্রতীক্ষা, এ আশা আকাশকুসুম মাত্র! কোথায় তিনি, আর সে কোথায়? মন তবু বুঝে না প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া মনে হয় আজ সেখান হইতে কেহ আসিবে, রাত্রে বিছানায় পড়িয়া কেবলই সেই দুদিনের স্বপ্ন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে, প্রত্যূষে সেই স্মৃতিটুকু অবলম্বন করিয়া সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিয়া যায়,—কিন্তু দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেলেও কেহ আসে না, কেবল দুই চোখে জল ভরিয়া আসে।

সেদিন কর্ম্মক্লান্ত শরীরে সে যখন প্রাত্যহিক বিশ্রামস্থানটি গ্রহণ করিল তখন আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল হইয়া আসিয়াছে, একখানা হাল্কা মেঘ লঘুপক্ষ শ্বেত পক্ষীর মত বায়ুভরে উড়িয়া যাইতেছিল। সে অল্পক্ষণ পরেই সেদিন নিরানন্দ চিত্তকে গভীর সুস্বপ্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে, অল্প দূরে একদল শৃগালের ঐক্যতানে প্রথম প্রহর অতীতপ্রায় এই সংবাদ ঘোষণা করিতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিতে গিয়া সহসা যেন চমকিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে জ্যোৎস্নালোকে মৃত্তিকা'পরে লিখিত তাহার নিজের ছায়াপার্শ্বে অপর আর এক ব্যক্তির ছায়া পুরুষের দীর্ঘ মূর্ত্তি! সে সুস্পষ্ট দেখিল মুহূর্ত্তে ছায়া অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তাহার পা হইতে মাথা অবধি কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠের অত্যন্ত নিকট একটা সাতঙ্ক আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তে ঠেলিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু যাহার জীবন শীত দেশের কাঁচের ঘরের মধ্যে বদ্ধ করা গ্রীষ্মের লতার মত আবরণের চাপ মাথায় করিয়া বাড়িয়া উঠে নাই, মুক্ত আকাশের তলায় নিজের শক্তিতে বাঁচিয়া

থাকিবার জন্য পদে পদে যুদ্ধ করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—শৈশব অতিক্রান্ত হইতে না হইতে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় লইয়া ঝড় ঠেলিয়া যাহার ঊর্দ্ধদিকে গতি,- বাজ পড়িলেও সে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়াইয়া দগ্ধ হয়, ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে চীৎকার করিল না, যেদিকে ছায়া অপসৃত হইয়াছিল সেইদিকে বরং একটুখানি অগ্রসর হইল কই কেহ কোথাও নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে, চাঁদ নীচের দিকে নামিয়া পড়িতেছিলেন। বাতাসে শাখা নড়িয়া শুষ্ক পত্রগুলা ঝরাইয়া ফেলিল, মনে হইল কে যেন সাবধানে চলিয়া যাইতেছে, নিজের চমকে নিজে লজ্জিত হইয়া সে ফিরিতে গেল,—এ কি! তাহার পদস্পৃষ্ট হইয়া একটা গোলাকার বস্তু গড়াইয়া গেল,—ইট কাঠের মত জিনিষটা নহে কোন ধাতু দ্রব্য হইবে! শব্দানুসরণে সে নিকটে গিয়া উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে একটা চকচকে টিনের কৌটা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইল। ছেলেরা ফেলিয়া গিয়াছে এই কথাই প্রথমটা মনে হইয়াছিল, কিন্তু সহসা মনে হইল কই এ কৌটা তো তাহাদের নিকট দেখি নাই! কে রাখিল? কৌটাটা অন্যমনস্ক ভাবে খুলিয়া ফেলিল। মেঘখানা সরিয়া গিয়াছে, দিবালোকের মত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে ধরণী তৃণপুষ্পটি পর্য্যন্ত সুগোচর হইতেছিল— তাহার হস্ত যেন সেই মুহূর্ত্তে একটা ভয়ালসর্প স্পর্শ করিল এমনি সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল দেখিল, সেই কৌটা মধ্যে দুই গাছি স্বর্ণ কঙ্কন রহিয়াছে। তা ছাড়া সেই সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা একখানি পত্র। উপরের বৃহদাকার অক্ষরে লেখা সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়িল "কমলার জন্য"। তাহার কম্পিত হস্ত ভার বহনে অক্ষম হইয়া আসিল, সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরও অবশ হইয়া আসিয়াছিল। অবলম্বনের জন্য সে নিকটবর্ত্তী গৃহ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। এত বড় অপমানও তাহার ললাটে লিখিত ছিল! ঘৃণার্হ বস্তু যেমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলে তেমনই করিয়া সেই কৌটাটা মাটিতে সে নিক্ষেপ করিতে গেল, কিন্তু আবার মনে হইল পত্রখানা সব পড়িয়া দেখা উচিত। অক্ষর বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট আলো ছিল সে সাবধানে পত্রখানা বাহির করিয়া পাঠ করিল, তাহা এইরূপ ;—"কমলার জন্য"

তোমার অযোগ্য হইলেও গ্রহণে কুণ্ঠিত হইও না ; তোমাকে দিবার অধিকার না থাকিলে দিতে সাহসী হইতাম না জানিও। এরূপ ভাবে রাখিয়া যাইবার কারণ প্রকাশ্যে দিবার অধিকার 'এখনও আমি পাই নাই।"

"এখনও 'আমি পাই নাই!' তবে এক দিন যদি এ অধিকার পাইবেন এ তাঁহারই দান! হায় মূঢ় কমলা, তুই না জানিয়া কাহাকে অপমান করিতেছিলি? গভীর আবেগের অশ্রুজলে তাহার কৌমুদী বিভাষিত গণ্ডযুগল প্লাবিত হইয়া গেল, সকল দুঃখ যেন আজ সার্থক মনে হইল। নির্নিমেষ জাগ্রত দেবতার মত তিনি তাহার চারিপাশে নিজের রক্ষা হস্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন! সে যে ভূষণহীন হস্তে রহিয়াছে ইহা তাঁহার প্রাণে সহে নাই, তাই এ অকাল উপহার! গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একই প্রচণ্ড ক্ষুধা যে এক মুহূর্ত্তে সর্ব্বগ্রাসী শক্তি লইয়া উদ্যত

হইয়া উঠিল, জোয়ারের জলের মত মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত হৃদয়ের ঢেউ উথলাইয়া কূল ছাপাইয়া বাঁধ ভাসাইয়া দিল। তখন সে সমুদয় দ্বিধা লজ্জা সরাইয়া ফেলিয়া সেই প্রথম প্রাপ্ত উপহার সসম্ভ্রমে তুলিয়া লইয়া নিজের ললাটে ঠেকাইল। সে শ্রদ্ধা এ জড়ের প্রতি নয় যে চেতন পুরুষ এই জড়ের মধ্যে তাঁহার স্নেহ প্রীতির ধারা ঢালিয়া ইহার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন প্রণাম সেই তাঁহার অভয় পদোদ্দেশ্যে। বলয় দুগাছি বহুমূল্য নয়—কিন্তু কমলার চোখে তাহা সাত রাজার ধন মাণিকের মত অমূল্য বস্তু বলিয়া মনে হইল। যে অলক্ষ্য দৃষ্টি তাহার এই নিরলঙ্কার হাতখানি সহিতে পারে নাই তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই যেন সে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারই দত্ত অলঙ্কার ধারণ করিল, তিনি হয় ত এখনও কোন অদৃশ্য স্থান হইতে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তখন সহসা মনে পড়িয়া গেল এইমাত্র সে যে ছায়া তাহার পশ্চাতে অপসৃত হইতে দেখিয়াছিল যে পদ শুনিয়াছিল তাহা তবে তাহার ভ্রম নহে? সেই ছায়া মনীশের। সেই পদশব্দ তাঁহারই?

তাহার আত্মাভিমান আজ বিজিত বন্দীর মত মাথাবনত করিয়া বলিল 'আর না পণ ছাড়!' আজ গর্ব্বের পরাজয়ে হৃদয়রাজ্যের চারিদিকেই মহোৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। আর কি মান অপমান ধরিয়া নিজের সহিত যুদ্ধ করা চলে। দেবতা যখন নিজেরই দ্বারের অতিথি তখন কিসের আবার লজ্জাদ্বিধা! যুক্তি তখন ইহার অনুকূল হইয়া কহিল "যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পার এ জীবন জন্মান্তর উৎসর্গ করিতে পার এই তুচ্ছ দেহখানা কি! তাহা লইয়া এত মান অপমান! এই ক্ষুদ্রতার অভিমানে ভরা মন লইয়া কি পূজার অধিকার পাওয়া যায়? সেদিন সন্ধ্যার কর্ম্মাবসরে বাহিরে বসিয়া সে চিত্ত স্থির করিয়া লইল। মানুষের অজ্ঞাতে পলে পলে তাহারই মর্ম্মের মধ্যে যখন নূতন নূতন সৃষ্টি চলিতে থাকে তখন মাতৃকুক্ষিস্থিত শিশুর মত তাহা নিজের নিকট সম্পূর্ণ গোপন থাকে, কিন্তু যখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে তখনি সে মাটির উপরে সর্ব্বলোচনে আত্ম প্রকাশ করে। কমলা যে আজই এই মতটা স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করিল তাহা নয়; এত দিন ধরিয়া যে নবযুগ তাহার মধ্যে বীজে বৃক্ষের মত, মহাপ্রকৃতির মধ্যে ভবিষ্য সৃষ্টির ন্যায় লীনাবস্থায় ছিল তাহাই আজ সহসা অঙ্কুরিত উদ্বোধিত হইল মাত্র। আপনাকে সে দানের সুখে ধূপের মত নিঃশেষ করিয়া দিল, কিছু বাকি রাখিল না। মনের মধ্যে এই কথা বলিয়া সে সান্ত্বনা লাভ করিল যে 'এই ভাল, তাই হোক আমার স্বাতন্ত্র্যে আর কাজ নাই।'

হায় সে যদি এ কথা আগে জানিত!

রাত্রির অন্ধকারকে সহস্র রশ্মিচ্ছটায় বিদ্ধ করিয়া অম্লান প্রভাত আত্মপ্রকাশ করিল। প্রত্যূষে উঠিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলা তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে কাগজ কলম জোগাড় করিয়া করুণাময়ীকে পত্র লিখিতে বসিল, এক রাত্রির ভিতরে ইটালী জয় হইয়াছিল, এক রাত্রের ভিতরে তাহার অন্তরের মধ্যে একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। মানসিক প্রফুল্লতা কর্ম্মব্যস্ত কমলার চোখে মুখে

কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। আজ তাহাকে কেহ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া যদি পথে পথে ঘুরিতে বলে এখান হইতে মুক্তি ক্রয় করিবার জন্য বোধ হয় সে তাহাতেও অসম্মত হয় না, সে এখন কোন মতে চাকদায় ফিরিতে পারিলেই বাঁচে—যেন আর বিলম্ব সহিতেছিল না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া করালীচরণ তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া অস্বাভাবিক প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন "ওগো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়, কমলির কাল গায় হলুদ তরসু বে।" "বলো কি এত শীঘ্র?" "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাদের এই রকম মরজি, তারা আর দেরি করতে চায় না। আমি টাকা গুলো কলকতায় জমা দিতে যাচ্চি। জানিস্ এই থলিতে কত টাকা আছে? পঁশিচ শো! বিয়ের দিন আরও পাঁচশো দেবে বলেচে। দুটো চারটে আরও যদি এমনি ভাগ্নি থাকত! তোর যে ছাই ছাই সব মেয়ে!"

ক্রমশঃ

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৭)

সোলাপুর

সোলাপুর জেলায় আমি অনেক বৎসর কর্ম্ম করি। ১৮৭৪ সালে বিজাপুর তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই দুই জিলা একটি জজিয়তীর অন্তর্ভূত হয়। আমি প্রথম হইতেই এই কোর্টের ভার গ্রহণ করি এবং কোর্টের সমুদায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কার্য্য শৃঙ্খলা বাঁধিয়া দেওয়া, এ সমস্ত আমাকেই করিতে হয়। সোলাপুরে মল্লাপ্পা (আপ্পাসাহেব) বারদ প্রমুখ কতিপয় দেশানুরাগী কর্ম্মিষ্ঠ সজ্জন ছিলেন, তাঁহাদের উদ্যোগে কাপড়ের কল-কারখানা ও অন্যান্য সার্ব্বজনিক মঙ্গল কার্য্যের সূত্রপাতে ঐ পুরী অনতিকাল মধ্যে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। আমার বন্ধু আপ্পাসাহেব বারদ এখন আর নাই, তিনি একটি নাবালক পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোকগত, কিন্তু সোলাপুরে তাঁহার কার্য্য কলাপের স্মৃতি-চিহ্ন সকল বিদ্যমান—তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা বৃথায় যায় নাই। আমার সময় একটি মাত্র কাপড়ের কল ছিল, এইক্ষণে ৫।৬টি যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, বড় বড় বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সোলাপুর ধন-দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, সে সোলাপুর বলিয়া এখন আর তাহাকে চেনা যায় না।

---

* বারদ তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয় সম্পত্তি ট্রষ্টীর হস্তে দিয়া তার একটা সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সোলাপুর হইতে এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। ট্রষ্টীগণ আমাকে বারদের ও তাঁহার নূতন বাসগৃহের যে ফোটো পাঠাইয়াছেন পর পৃষ্ঠায় তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

লিঙ্গায়ৎ

এ অঞ্চলে লিঙ্গায়ৎ বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়ের লোক অনেক দেখা যায়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহারা শৈব অথচ সাধারণ হিন্দুসমাজ বহির্ভূত বেদ-বিরোধী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। লিঙ্গায়ৎ স্ত্রী পুরুষ সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ করে, তাহা হইতে তাহাদের নাম লিঙ্গায়ৎ। তাহাদের আদিগুরুর নাম বসপ্পা (বৃষভ শব্দের অপভ্রংশ), লিঙ্গায়তেরা তাঁহাকে নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি বিজাপুর অঞ্চলে একটি শৈব ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে উপনয়নের



আপ্পাসাহেব বারদ

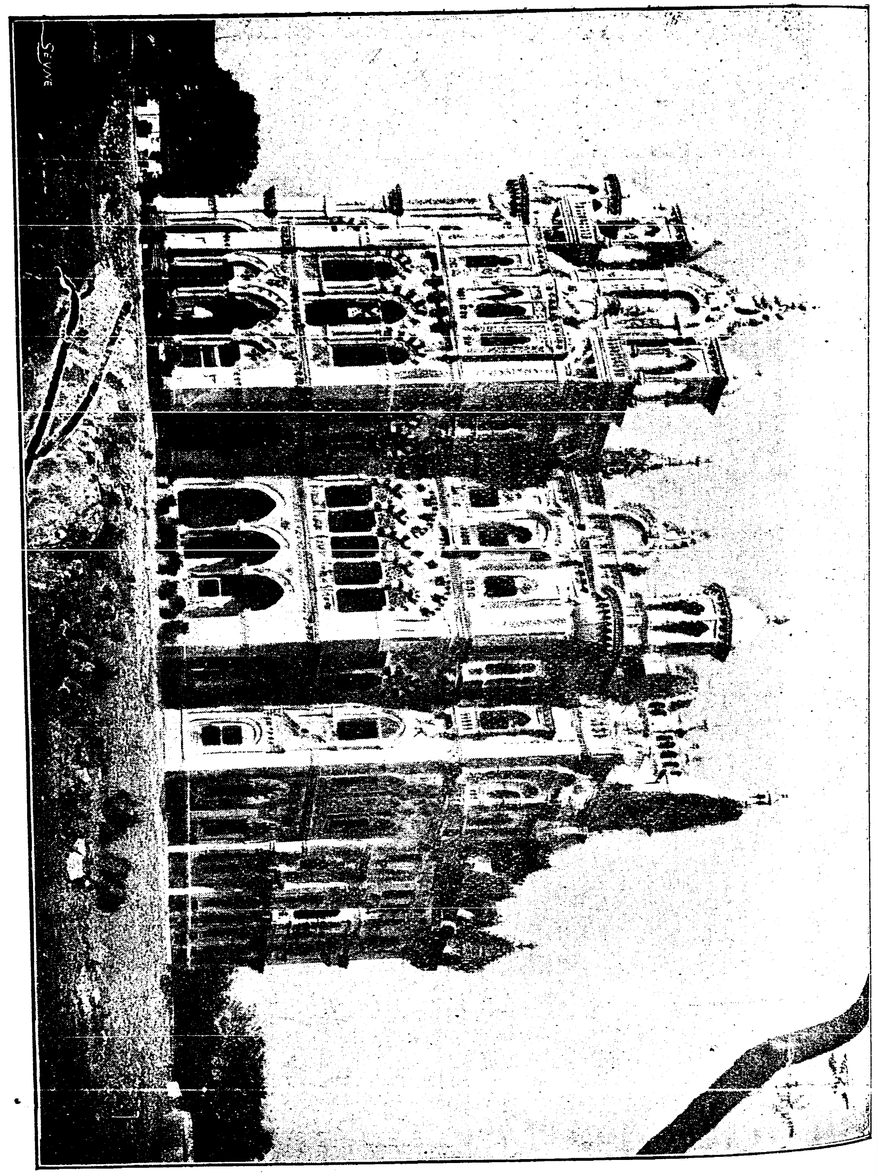

খাস ভবন

সময় বালক বসপ্পা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবীত ধারণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না—বলিলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমার কোন গুরু নাই। এই অপরাধে পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বসপ্পা পলায়ন করিয়া বিজ্জল রাজার শরণাপন্ন হন। বিজ্জলের রাজধানী কল্যাণ তথায় তাঁহার এক মাতুল পুলিষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার বাটী গিয়া রহিলেন এবং তাঁহাকে মুরব্বি ধরিয়া সরকারী চাকরী-

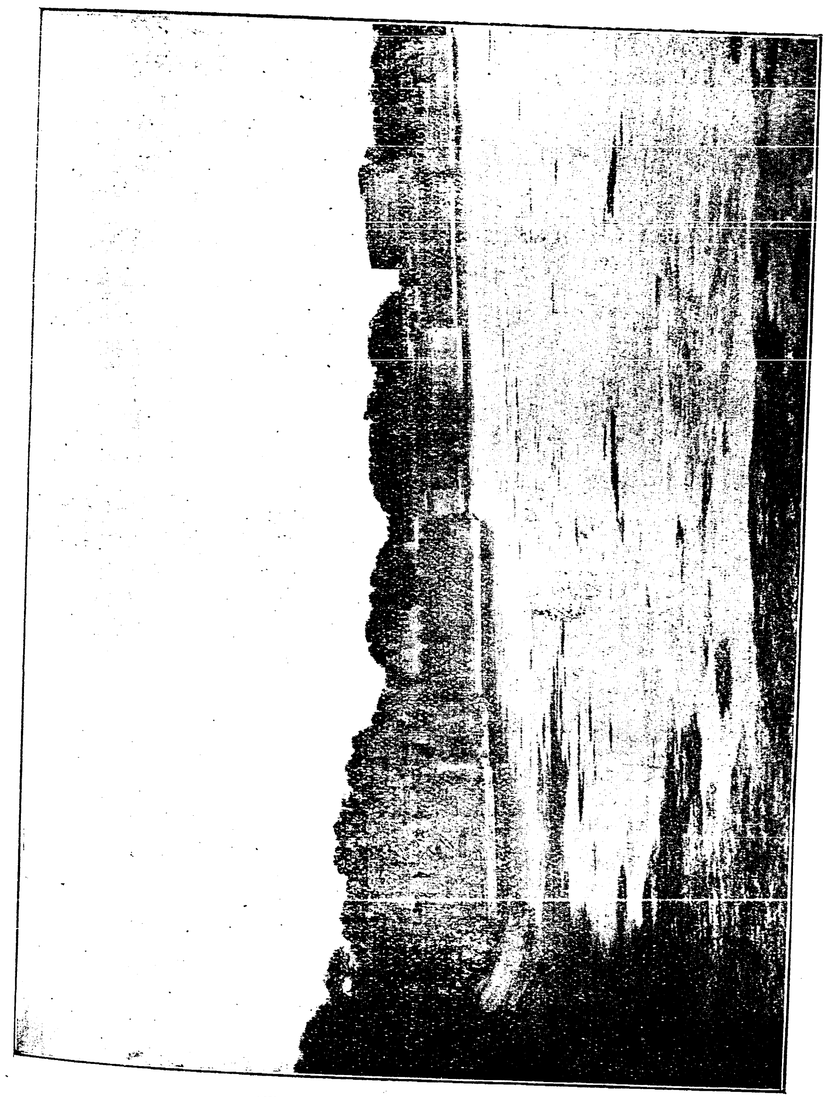

সোলাপুর দুর্গ

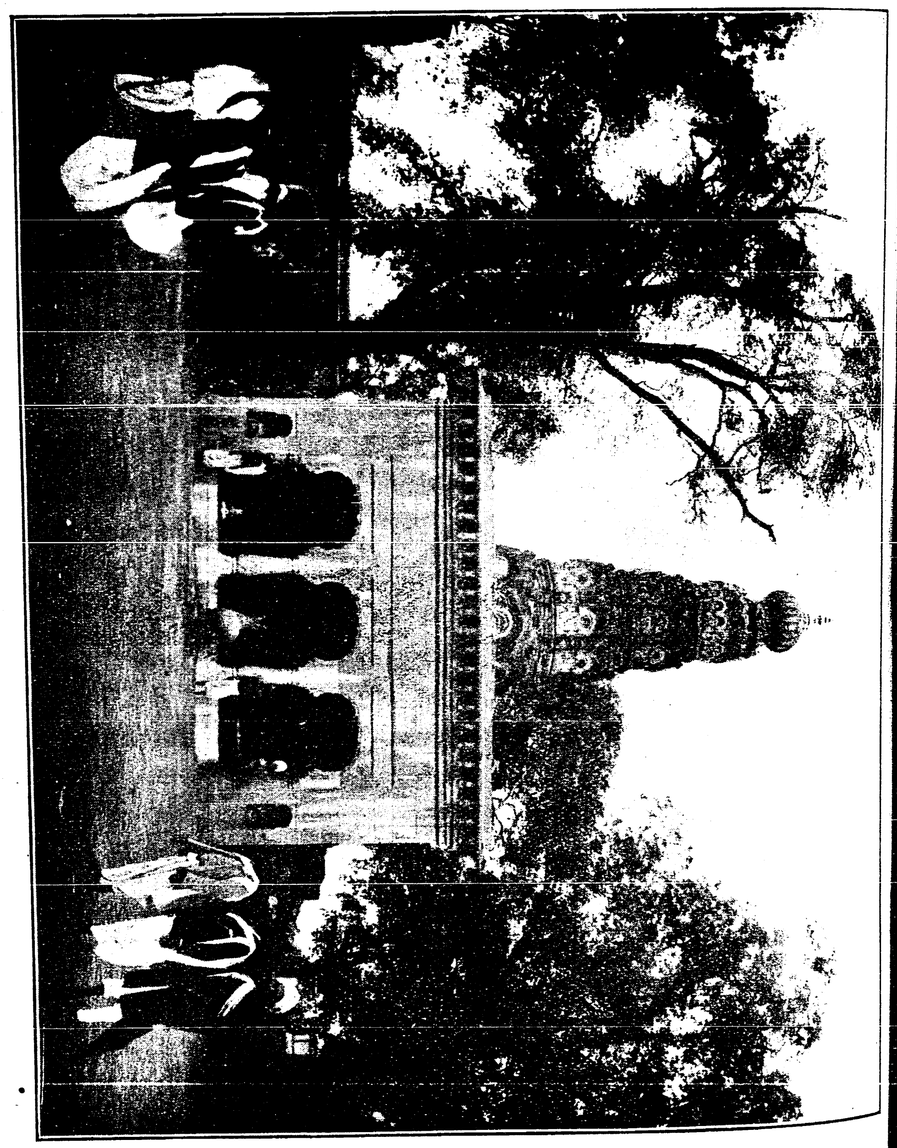

শিবের মূর্ত্তি

যোগে প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিলেন, এবং পরে তাঁহার উপার্জ্জিত বিত্ত দানধর্ম্মে ব্যয় করিয়া লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইল তখন জৈন স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার নূতন মত প্রচার আরম্ভ করিলেন। লিঙ্গোপাসনা, শৌচাশৌচ অবমাননা, বেদ-ব্রাহ্মণ নিন্দা ইত্যাদি উপদেশ সেই মতের অঙ্গীভূত। এই সকল কারণে তিনি জৈন ও অপরপন্থী লোকদের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহার বিপক্ষে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজার কোপানলে পড়িয়া অবশেষে তাঁহাকে কল্যাণ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। কিন্তু তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে গিয়া রাজা স্বয়ং বিপদে পড়িলেন ও বাসবের এক শিষ্য কর্ত্তৃক নিজ প্রাসাদেই নিহত হইলেন। বাসব (বসপ্পা) কল্যাণ ছাড়িয়া কৃষ্ণা ও মলপ্রভার সঙ্গমস্থল সঙ্গমেশ্বরে বাস করিতেছিলেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৃষভ পুরাণ নামক একখানি পুরাণে বাসবের চরিত্র বর্ণনা আছে। এই পুরাণ লিঙ্গায়ৎদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার মতে জাতিভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচবিচার, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পদ্ধতি, হিন্দুধর্ম্মের বিধি ও অনুষ্ঠান ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে হিন্দু আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র শিবপূজা তাহাদের শাস্ত্রবিধান হইলেও তাহার উপরে দেবদেবী ও সাধুভক্তের পূজা স্থান পাইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ পুরোহিতের নাম জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে গৃহস্থ ও বিরক্ত দুই শ্রেণী। গৃহস্থ জঙ্গম বিবাহ করে, বিরক্ত জঙ্গম অবিবাহিত। লিঙ্গায়ৎদের শবদাহন প্রথা নাই, গোর দেওয়া তাহাদের রীতি। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট ভয়ের জিনিস নহে, প্রত্যুত মৃত্যুই কৈলাস-শিখরে আরোহণের পথ, এই জানিয়া মৃত্যুতে তাঁহারা অভিনন্দন করেন। লিঙ্গায়ৎ শবগৃহে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করা যায়। একদিকে বিধবার ক্রন্দনধ্বনি, অন্যদিকে বাদ্য-সমারোহে জঙ্গমদের ভোজ লাগিয়া যায়। মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুষ্পচন্দন বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া গাড়ী করিয়া সমাধিস্থলে সমানীত হয়। সম্মুখে বাদ্যের ঘটা পশ্চাতে শবযাত্রীর প্রোশেসন চলিয়াছে। তাহাদের গুরুভক্তি এমনি প্রবল যে গুরুর পাদোদক মৃতদেহোপরি সিঞ্চিত হয় ও মহাদেবের প্রতি গুরুর আজ্ঞাপত্র তাহাতে সংলগ্ন হয়, সে পত্র পাইবামাত্র মহাদেব প্রেতাত্মাকে স্বীয় দেবনিকেতনে সাদরে ডাকিয়া লইয়া যান। সমাধিস্থলে কুল-পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া আত্মার সদ্গতি সাধনের বিবিধ উপায় সকল যোজনা করিতে তৎপর থাকেন।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার নিশিকান্তের সঙ্গে সোলাপুরে আমার প্রথম আলাপ। তখন তিনি য়ুরোপ হইতে সদ্য প্রত্যাগত হইয়াছেন—বৈলাতিক তীব্রবাস তাঁহার গায়ে লাগিয়া আছে। বিলাত হইতে খুব নাম করিয়া আসিয়াছেন—কোন এক জর্ম্মন য়ুনিবর্সিটি হইতে Doctor of Philosophy উপাধি

পাইয়াছেন—রুষিয়ায় গিয়া কি সব কাণ্ড করিয়াছেন—তাঁহাকে গুপ্তচর (Spy) সন্দেহ করিয়া ও-দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল, সে নির্ব্বাসনবার্ত্তাও তাঁহার গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার উপর দেশের আশা ভরসা কতই ছিল! ইংরাজী ফরাসী জর্ম্মন রুষ—এই বিবিধ য়ুরোপীয় ভাষা তাঁর মুখাগ্রে—তাঁহার ইচ্ছা ছিল এদেশে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে Foreign officeএ প্রবেশ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহাতে যদিও কৃতকার্য্য হইলেন না তথাপি দেশে ফিরিয়াই মহানুভব বড়লাট রিপণের অনুগ্রহে নিজাম-রাজ্যে শিক্ষাবিভাগে একটা বড় কাজে নিযুক্ত হইলেন—হাইদ্রাবাদ কালেজের প্রিন্সিপাল, খুবই উচ্চপদ! দুর্ভাগ্যক্রমে সে পদ অধিকদিন রাখিতে পারিলেন না। পরে অন্য দুই এক কাজে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিবার সুযোগ হইল কিন্তু নিজ দোষে একে একে সব হারাইলেন। নিজামরাজ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাসোন্মুখ হইতে চলিল, শেষে হাইদ্রাবাদে অপদস্থ হইয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর একে এই আর্থিক দুরবস্থা, তার উপর আবার পারিবারিক অশান্তি! আমি হাইদ্রাবাদে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই—তখনো তিনি মাথা তুলিয়া আছেন, Wolseyর ন্যায় তাঁহার পতন হয় নাই। সে সময়ে নিজামৎগগনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গসূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে—দুই চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত ও অঘোরনাথ। এই শেষোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বনাম অপেক্ষা তাঁহার প্রতিভাশালিনী কন্যা সরোজিনী নাইডুর নামে লোকসমাজে সমধিক পরিচিত। এইরূপে দিন যায়, পরিশেষে একদিন শোনা গেল যে নিশিকান্ত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক স্পৃহা এই ছিল কোন এক বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়া হাইদ্রাবাদ নবাবপরিবারভুক্ত হন—তাঁহার বিশ্বাস এই যে তাঁহার রূপগুণে সেখানকার সকলেই এমনি মুগ্ধ যে তিনি একটুকু ইঙ্গিত করিবামাত্র কতশত বেগম তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। হায়, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না! এই গোলযোগের মধ্যেই সেদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি আপশোষ! তাঁর মুখে একটু জল দিবার জন্য আপনার লোক কেহ কাছে নাই—তাঁহার স্ত্রী তাঁহা হইতে বহু দূরে—একটিমাত্র পুত্র অনেকদিন মারা গিয়াছে এই শোকতাপ দুঃখযন্ত্রণায় বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন—মনে হইলেও কষ্ট হয়!

লোকটার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল কিন্তু হইলে কি হয়, কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরে মনুষ্যত্ব হয় না। তাঁহার চরিত্রগত কি একটা নৈতিক বিকলতা ছিল—সেই এক ছিদ্র হইতে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পৌরুষ মানসম্ভ্রম একে একে সকলি ক্ষরণ হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ করিয়া ফেলিল। নিশিকান্তকে দেখিলাম, তড়িতের ন্যায় তাঁর প্রকাশ তড়িতের ন্যায় অন্তর্ধান। যাক্, ওসব কথায় আর কাজ নাই—মৃতের ভাল দিক্ দেখাই ভাল—

De mortuis nil nisi bonum—
Of the dead nothing but good!

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা

সোল'পুরে খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার সহিত আমার চেনাপরিচয় হয়। তাঁহার বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনকাহিনী কৌতূহলজনক। তিনি এদেশের একজন কৃতিবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন, প্রোফেসর মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের সহিত বিলাতযাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কালেজে অধ্যয়ন করেন। যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক অক্ষর জানিতেন না অথচ অল্পকাল মধ্যে এই দুই কঠিন য়ুরোপীয় ক্লাসিকের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যে ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌স্ সে সময়ে তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজি অভিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন শ্যামাজী ঐ কার্য্যে তাঁহাকে বিস্তর সাহায্য করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে Oriental Congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন ও বারিষ্টর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই রতলমের দেওয়ানী পদ পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতি-বর্গের অনুরোধে তিনি নাসিকে গিয়া শিরোমুণ্ডন ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া ম্লেচ্ছসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার পরেও বিলাতযাত্রার নেশা ছুটিল না, পুনর্ব্বার সিন্ধুপারে তাঁহার সাধের বিলাতভূমিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন! এবার কিন্তু সেদেশে গিয়া এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, ইংরাজ রাজদ্রোহী ঘোরতর anarchist হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ মুখোস পরিয়া তিনি এদেশের গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন—দূর হইতে অশেষ প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপর দিয়াও অনেক ঝড় তুফান বহিয়া গেল—শেষে এমন হইল যে প্রাণের দায়ে ইংলণ্ড ছাড়িয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। এক্ষণে তিনি ফরাসী রাজধানী পারী নগরীতে বাস করিতেছেন ও সেখানে লুক্কায়িত থাকিয়া এই গবর্ণমেণ্টের উপরে যথাসাধ্য গোলাগুলি বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত নহেন।

'নবেলী' শকুন্তলা

সোলাপুরে থাকিতে বাহির হইতে গাইয়ে-ওস্তাদ, নাট্যমণ্ডলীর লোকেরা মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। একবার এক পারসী নাট্যশালার ম্যানেজার আসিয়া আমাকে মুরব্বি ধরিয়াছিল, তাহার অনুরোধে আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাঁহারা জজ সাহেবের অভিমতে নাটক অভিনয় করিবেন কিন্তু কি নাটক? তাঁহাদের অভ্যস্ত নাটকের তালিকা আমার নিকট পাঠানো হইল তাহার মধ্যে আমার যাহা ইচ্ছা বাছিয়া দিবার কথা। দুর্ভাগ্য-ক্রমে অভিজ্ঞান 'শকুন্তলা' আমার মনোনীত হইল। ঘনঘটা করিয়া অভিনয় আরম্ভ হইল—সে অভিনয় দেখিয়া আমার আপদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাপসকন্যা একেলে পারসী রমণীর বেশে রঙ্গ ভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, দুষ্যন্ত একালের নবেল বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্থানী

ভাষায় গান করিতে লাগিল। দুষ্যন্তের পুত্র, সেও নব্য পারসী বালক, পিতাকে দেখিয়া তাহার উপর একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল,—'সর্ব্বদমন' বালকের সেই আত্ম পরিচয়! আর সে যে আশ্রম, সে ঋষিকুমার, সে কণ্বমুনি—কালিদাস তাঁহার নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না। আমি মনে মনে ভাবিলাম—"কবির মুখ হইতে হঠাৎ দুর্ব্বাসার শাপের মত কি অভিশম্পাৎ বর্ষণ হত কে বলতে পারে—শেষে ম্যানেজার বেচারাকে মুস্কিলে পড়তে হত!"

পণ্ডরপুর

ভীমা-নদী তীরস্থিত সোলাপুর জিলায় এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে বিঠ্যল বা বিঠোবা দেবের মন্দির ও আর কয়েকটি মন্দির আছে। বিঠোবাদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত। শিবাজী রাজার সমসাময়িক সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারাম বিঠোবাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার রচিত অভঙ্গাবলি বিঠোবার স্তুতিগীতে পূর্ণ। তাঁহার পিতামাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপুরে তীর্থ করিতে যাইতেন। প্রবাদ এই যে, বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্ব্বপুরুষ চিরন্তন প্রথানুসারে এই তীর্থ যাত্রায় যাইতেন। এইরূপ ষোলবার তীর্থ করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয় যে বিঠোবাদেব ও রুক্মাই দেবীর স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি তাঁহার গ্রামের এক আম্রবনে নিহিত আছে—এই স্বপ্নদৃষ্ট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া তিনি নিজ গ্রামে ইন্দ্রায়ণী নদী তীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবাদেব বিশ্বম্ভরের কুলদেবতা হইলেন। আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পণ্ডরপুরে বৎসরে দুইবার মেলা হয় তাহাতে অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী নিশান উড়াইয়া বিঠোবা দর্শনে সমাগত হয়। এই সকল যাত্রীর নাম 'বারকরী।' পুরাকালে এই স্থান সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল, বুদ্ধ মূর্ত্তির স্থান এইক্ষণে বিঠোবাদেব অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। উৎসবের দিন জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও মন্দিরের ভিতর জাতি বিচার থাকে না—সেইটুকু সীমার মধ্যে অস্পৃশ্য জাতির হস্ত হইতেও অন্নগ্রহণ দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না।

মন্দিরে দুই শ্রেণীর পুরোহিত আছে—বড়ুয়া ও সেবাধারী। এই দুই দলের ঘরাও বিবাদে অনেক সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া পূজা বন্ধ হইত। আমি তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকার নিরূপিত হইয়া ডিক্রী জারী হইল তবুও তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন হয় না। বড়ুয়াদের হস্তে শুধু যে ঠাকুর পূজার ভার তাহা নহে, তাহারা আবার মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ। পেশওয়া প্রভৃতি মহা মহা যাত্রীদের প্রসাদে বিঠোবাদেবের ধনরত্নের অভাব নাই, মন্দিরে স্থানাভাব প্রযুক্ত সেই সকল বহুমূল্য মণি মুক্তা বড়ুয়াদের ঘরে ঘরেই রাখিতে হইত, তাহাদের উপর সেই সমস্ত গহনা পত্রের অপব্যবহারের চার্জ আসে, ইহার মীমাংসা করা—বিঠোবাদেবের বিবিধ অলঙ্কারের তালিকা করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সামান্য ঝঞ্ঝাটের কর্ম্ম নহে। মোগলাই আমলে বিঠোবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

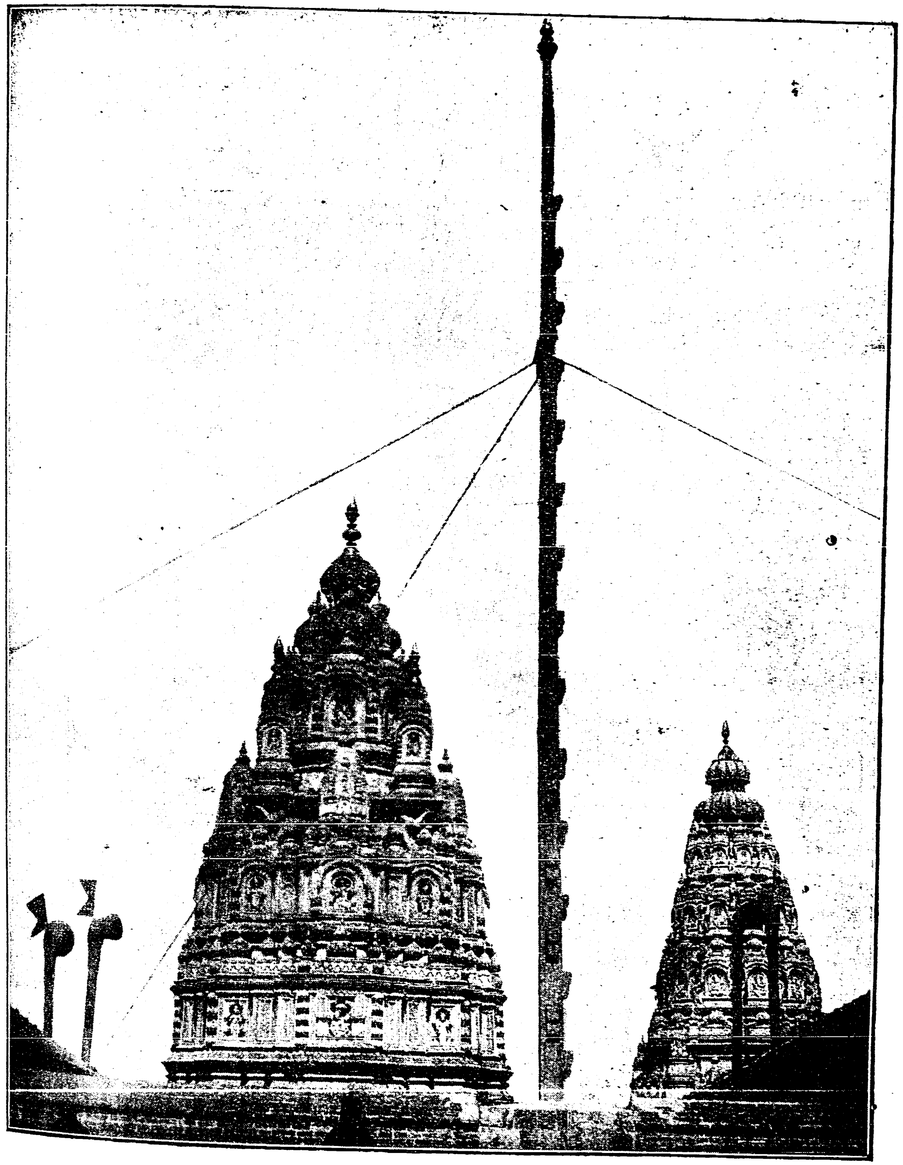

বিঠোবা মন্দির

বড় য়াদের হস্তে ছিল। তথাকার যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তির মধ্যে ঠাকুরের অন্য একটি মূর্ত্তি গড়াইয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য একটি গুপ্ত স্থান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। জজ সাহেবের ভাগ্যে তাহারও দর্শন ঘটিয়াছিল অন্য লোকেরা যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না।

পণ্ডরপুরে অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রম, এই দুইটি আশ্রম উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭৬।৭৭ সালে



বিঠোবা মূর্ত্তি

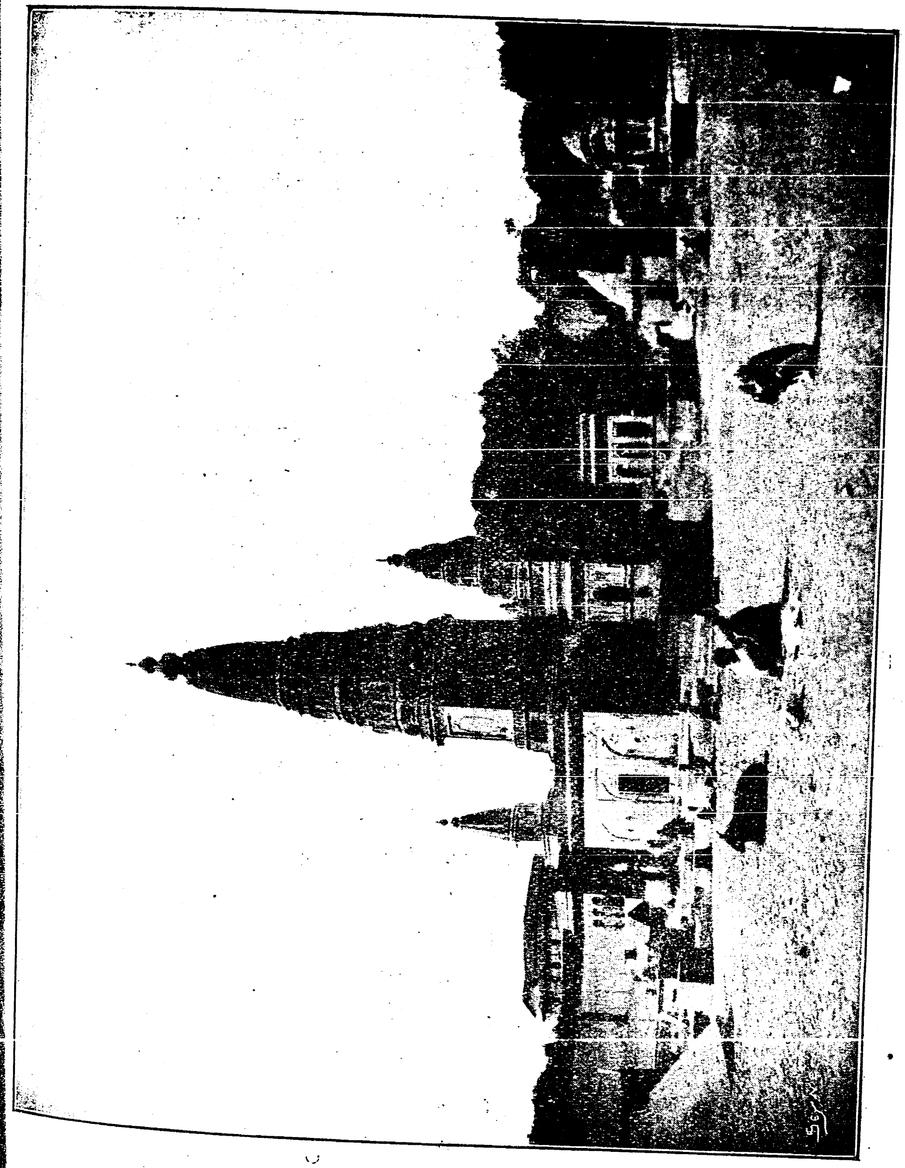

পুণ্ডলীক মন্দির

সোলাপুর জিলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে পিতামাতা আপন শিশু সন্তান ছাড়িয়া অনেকে দূর দেশে চলিয়া যায়, কতক বা মরিয়া যায়, এইরূপ পিতৃমাতৃহীন অনেক শিশু সন্তান আশ্রয় হীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে প্রার্থনাসমাজের একটি সভ্য লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর পণ্ডর-পুর জিলায় সব জজ ছিলেন। তিনি এই নিরাশ্রিত শিশুদের আশ্রয় দানে কৃতসংকল্প হইয়া চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করেন ও ১৩০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে একটি স্থানীয় কমিটি তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করে ও পরে সেই কার্য্য বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের হস্তে আইসে। এইক্ষণে একজন বেতনভুক্ অধ্যক্ষ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে ভ্রূণহত্যা নিবারণের উদ্দেশে একটি বিধবাশ্রম ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বিভাগ মিলিত হইয়া যে একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহার জন্য ম্যুনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ৫০০ টাকা বার্ষিক দাতব্য নিরূপিত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় যে ইহা হইতে অনেকগুলি বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা রমণী বিবাহ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ও অনেক অনাথ বালক শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

পণ্ডর পুরের কথায় একটা ছড়া মনে হইতেছে তাহা এই :—

পাউস পড়লা চিখ্‌খল ঝালা নদিলা আলাপুর
মাঝা ইথেচ পণ্ডরপুর।
বৃষ্টি বাদল, কাদায় পিছল, নদী এল পূর
আমার হেথাই পণ্ডরপুর।

বিজাপুর

আমি যখন সোলাপুরে জজ ছিলাম তখন বিজাপুর আমার অধীনে ছিল, ইহাদের কলেক্‌টর আলাদা কিন্তু একই জজ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্র পশ্চাৎ প্রায় দুইশত বৎসর বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ও আদিলসাহী বাদসাদের রাজধানীরূপে প্রখ্যাত ছিল। এই সহর সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণ সীমা ও কৃষ্ণা নদীর অধিত্যকায় অবস্থাপিত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ রেলওয়ের একটি নামাঙ্কিত ষ্টেসন। ইহার আশপাশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু নাই। বৃক্ষপল্লব পরিবর্জিত তরঙ্গায়মান মাঠ ময়দান—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র এই যা প্রকৃতির মুখচ্ছবি। রেল গাড়ীতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুরের দূতস্বরূপ "গোলগুম্বজ" ইমারতখানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে—ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয়া দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়। পরে সহরের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই গোর মসজিদ ও অন্যান্য ছোট বড় ইমারতের ভগ্নমূর্ত্তি সকল নেত্র পথে পতিত হয়। সহরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর প্রাচীর, ইহার পরিধি অন্যূন তিন ক্রোশ ব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত ও অল্পাধিক বলশালী শতাধিক বুরুজে সুরক্ষিত।

পঞ্চতোরণের মধ্যদিয়া সহরে প্রবেশ করা যায়। তার চারিটী অক্ষত রহিয়াছে; পঞ্চমদ্বার সরকারী ঘরবাড়ীতে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিক্ দিয়া প্রবেশ কর সহরের এক সুমহান্ অপূর্ব্ব দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়।

বিজাপুরের প্রাচীর বুরুজ, ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ইহা এক সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ভিতরে প্রবেশ করিলে সে ভ্রম দূর হয়। সহরে বসতিগুলি কেমন খাপছাড়া ও গুটিকত প্রাচীন ইমারত ছাড়িয়া দিলে তাহাতে বাড়ী ঘর দুয়ার বিশেষ কিছুই বর্ণনীয় নাই। প্রাচীন ও নব্যসহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আধুনিক লোকালয় পশ্চিম দ্বারের সন্নিহিত। তাহা ছাড়াইয়া গেলে অন্তরের ভগ্ন বিজনতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। নগরের মধ্যভাগে দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাজপথ গিয়াছে তাহা পথিককে মধ্যদুর্গে লইয়া যায়। এই দুর্গের নাম 'আর্ক কেল্লা'। ইহা গোলাকৃতি, ইহার বেষ্টন প্রায় এক মাইল হইবে। 'আর্ক কেল্লায়' যত বড় বড় সাহেব সুবার বাসগৃহ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় প্রভৃতি সার্ব্বজনিক ইমারতশ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত 'সাত মজলী' প্রাসাদ, 'আনন্দ মহল' 'গগন মহল' বাহিরে 'আসার মহল' 'মালক জহান' মস্‌জিদ ও আলি আদিলসার অসম্পূর্ণ সমাধিমন্দির মিলিয়া যে সৌধমালা উন্মেষিত হয় তাহার বিজাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতিতে পূর্ণ। এই পূর্ব্বগৌরবের কঙ্কাল সকল সহরময় বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গল পরিবৃত ছাদহীন ভগ্নগৃহ, কোথাও একটি গোর কিংবা মস্‌জিদ ঝোপঝাপের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে, কোথাও বা ভগ্ন স্তূপের মধ্যে ফোয়ারা ও জলযন্ত্রসংযুক্ত মনোহর উদ্যানের চিহ্ন সকল পড়িয়া আছে। কোথাও ভগ্ন জলযন্ত্র শুষ্ক, ফল-ফুলের বৃক্ষসকল বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, কোনস্থানে হয়ত একটি অযত্নসম্ভূত জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়, সেই ভুবনবিখ্যাত বিজাপুরের এই দুর্দ্দশা—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

কোথা মথুরাপুরী গেছে যদুপতির।
রঘুপতির কোশলা ও সেই পথে।
সবে এতেক ভাবি মন করহ স্থির
জেনো কিছুই স্থির নহে এ জগতে॥

উপরে আর্ককেল্লার নামোল্লেখ করিয়াছি। আর্ককেল্লাই বিজাপুরের শোভনতম স্থান, ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। যুসফ আদিল সা প্রথম সুলতান এই দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, ইব্রাহিম আদিল সা'র আমলে ইহার কার্য্য শেষ হয়; ইহার প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক ভূমিখণ্ড প্রাচীন বিজাপুরের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এই দুর্গ আদিলসাহী বাদসাদিগের কত লীলাখেলা, যুদ্ধ বিগ্রহের স্থান—ইহাই আবার সেই রাজবংশ নিপাতের সাক্ষী। বিজাপুর পতনকালে এই স্থানে সুলতান সেকন্দর সহস্র সহস্র প্রজার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের মধ্যে বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজমুকুট সমর্পণ করেন। যদিও ইহার সৌধাবলী ভগ্ন প্রায়, ইহার উদ্যান কানন তৃণ কণ্টকাবৃত, ইহার উৎস জলপ্রণালী সকল শুষ্ক তথাপি ইহা এক অনির্ব্বচনীয় মহিমামণ্ডিত, সেই সমুদ্ধত রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান।

বিজাপুরে যে সমস্ত প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান তন্মধ্যে "গোলগুম্বজ"

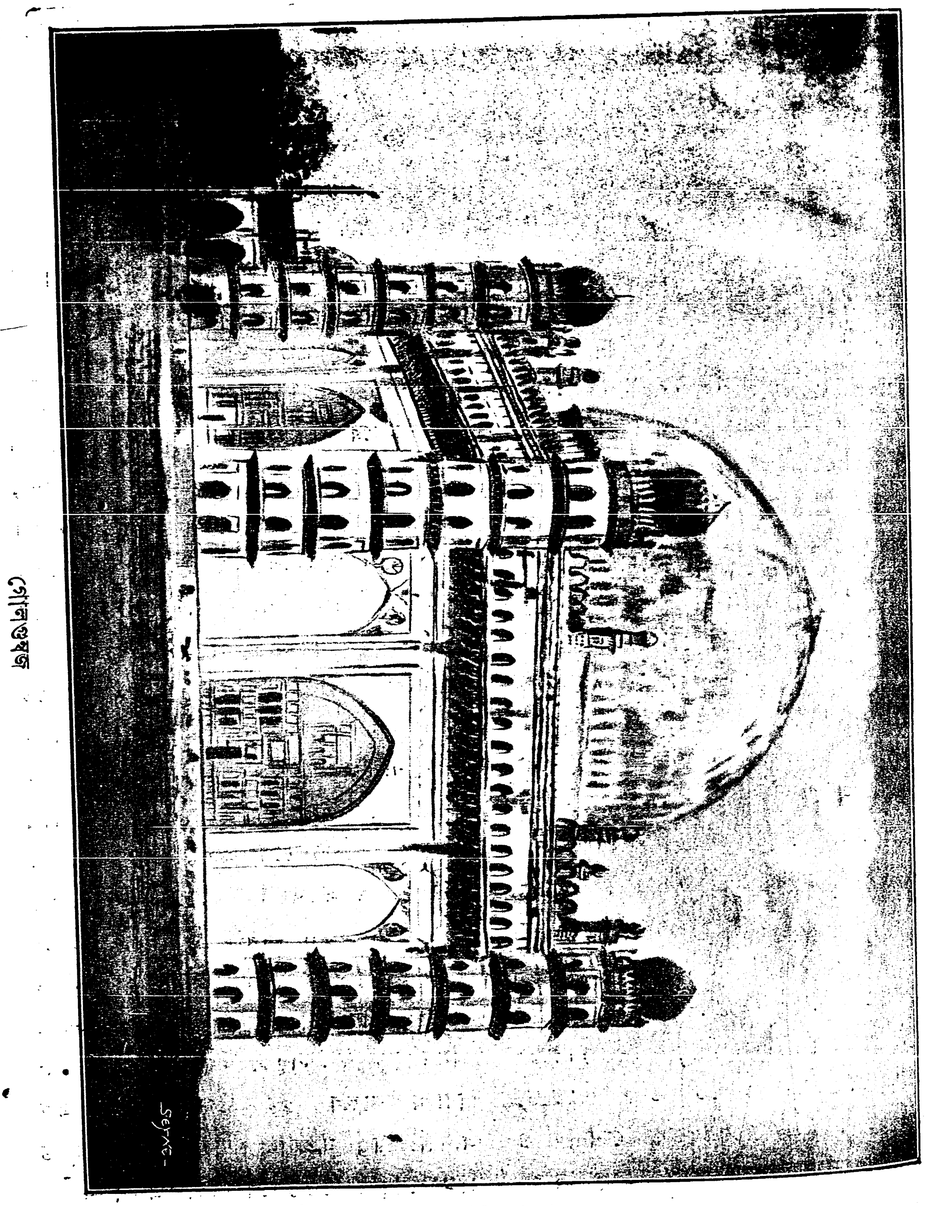

গোলগুম্বজ

সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা সুলতান মাহমুদের সমাধি মন্দির। সহরের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়, পৃথিবীতেও দুএকটি ভিন্ন এমন বিশাল গুম্বজ আর নাই। গুম্বজরাজ বহির্ভাগ হইতে ১২৮ ফুট উচ্চ ও যে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫ ফুট দীর্ঘ। ইমারতখানি সমচৌকস ১৮,২২৫ ফুট, রোমনগরের পান্থিয়ন হইতেও বৃহত্তর। বাহিরের চারিকোণে চারিটি গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটির সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছতালা পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভন দৃশ্য সন্দর্শন করা যায়। ভূচর নরকীটেরা কি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। এই গুম্বজে প্রতিধ্বনি গ্যালরি (Whisperirg gallery) এক চমৎকার জিনিস। তথায় প্রতিধ্বনির আর বিরাম নাই। একসীমায় কাণে কাণে কথা কহিলে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়। এককণ্ঠ বিনির্গত সুর হইতে শত শত কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়। দক্ষিণদ্বার হইতে সমাধি গৃহে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্তর মঞ্চের উপর সুলতান মাহামুদ, তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের গোরপ্রস্তর সকল দেখা যায়। দক্ষিণদ্বার নিকটস্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পারস্য লেখ আছে। তাহাতে সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ পাওয়া যায় তাহা ১০৬৭ অর্থাৎ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সকল বৃহৎ প্রস্তরের ইমারত, ইহাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া লোকের মনে সহজে কৌতূহল জন্মিতে পারে, কি উপায়ে কি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার সৃষ্টি হইল, না জানি ইহাদের উপর কত মজুর মিস্ত্রী খাটিয়াছে—কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইব্রাহিম রোজানামক ইব্রাহিম বাদসার গোরস্থানে পারস্য ভাষায় একটি শিলালেখ আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হয়। সে লেখ এই :—"মালিক সান্দাল ১৷৷০ লক্ষ ৯০ হুন ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।" হুনের মূল্য ৭ শিলিং করিয়া হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌণ্ড দাঁড়ায়, মোটামুটি ধর ৫৷৷০ লাখ টাকা। কিন্তু এ হয়ত শুধু গুম্বজ নির্ম্মাণের ব্যয়—সমুদয়টা ধরিতে গেলে ১ কোটি মুদ্রারও অধিক হইয়া যায়। ঐ লেখে আরো আছে যে এই কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাটিত, কার্য্য শেষ হইতে ২৬ বৎসর ১১ মাস ১১দিন লাগিয়াছিল। এই লোক সংখ্যায় মুটে মজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবি সামিল কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ উহা শিল্পী রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নির্দ্দেশক। তদ্ভিন্ন নিকৃষ্ট শ্রমজীবিদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার সন্দেহ নাই, নতুবা এই সকল ইমারত নির্ম্মাণ কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধি মন্দির প্রস্তুত করা, মুসলমানদের এক অদ্ভুত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভস্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে উৎসুক, মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ। সুলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা গোলগুম্বজের সমস্পর্দ্ধী এক গোরমন্দির

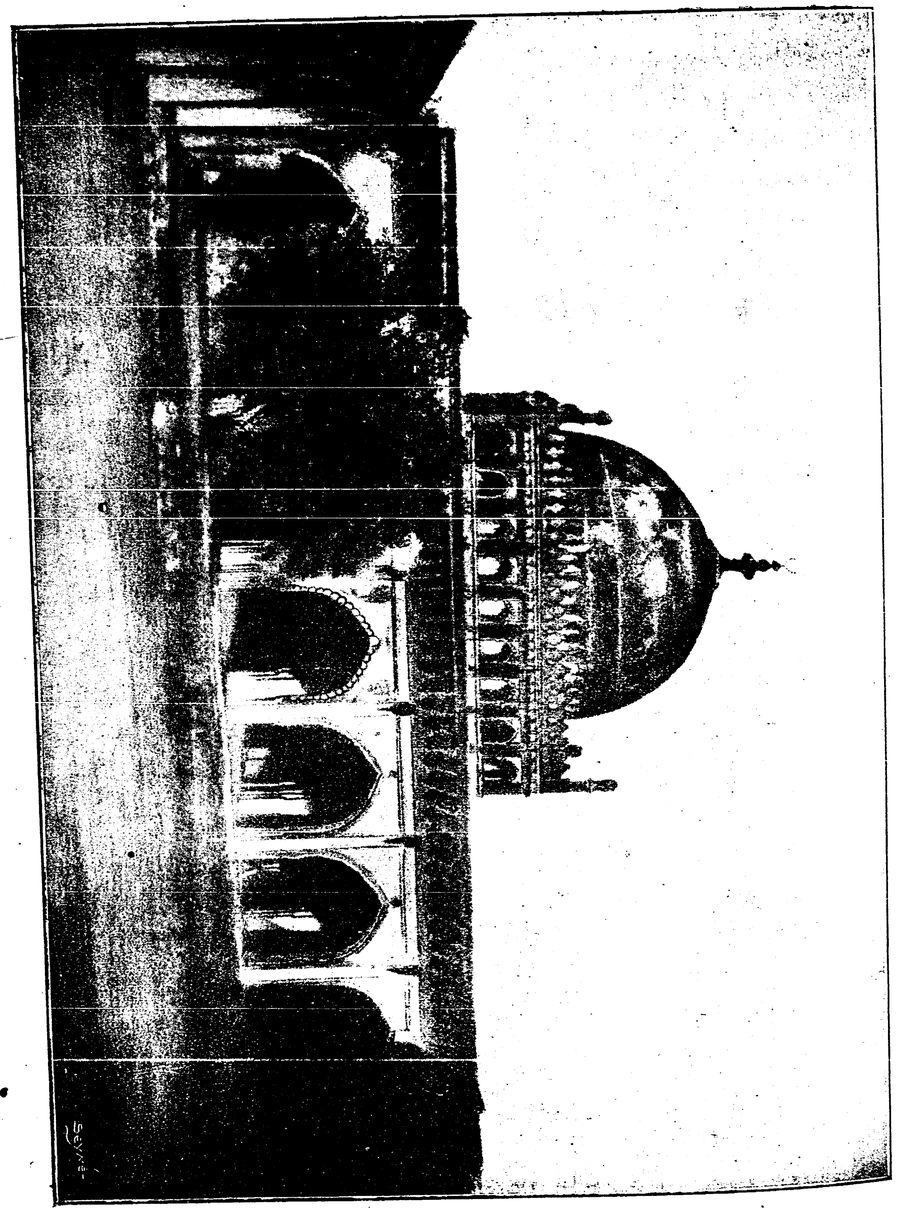

ইব্রাহিম রোজা

নিজের জন্য পত্তন করেন। তাহার ছায়া পিতার গোরের উপর গিয়া পড়ে, এই তাঁহার ইচ্ছা কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মন্দির প্রস্তুত হইতে না হইতেই রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন ও এই ভগ্নগৃহেই তাঁর সমাধি হয়। এই সমাধি মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "আলিরোজা।" কিন্তু মৃতহস্তীরও দাম লাখ টাকা; সেইরূপ ইহার ভগ্নমূর্ত্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে ইহা সত্য সত্যই গোলগুম্বজকে অতিক্রম করিয়া উঠিত—আলিও মনের সাধ মিটাইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় বিশ্রাম করিতে পারিতেন।

ইহার উত্তরে মক্কা ফটক হইতে কেল্লার পথ দুটি গোর মন্দিরে অলঙ্কৃত, তাহাদের পরস্পর সান্নিধ্যবশত 'যমক বোন' নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় আলির সচিবপ্রধান খাওয়াস খাঁ ও তাঁহার গুরু আবদুল খাদির এই দুই মন্দিরে শয়ান রহিয়াছেন। ইহাদের গোরগুলি ভিত্তি প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, গম্বুজগৃহ যেন বাসস্থানের জন্য নির্ম্মিত বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহার একটি গম্বুজ বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে, শ্মশানভূমির উপরে জীবন্ত মনুষ্য বাস করিতেছে।

যমকের অনতিদূরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। এই গোরের শ্বেতপাষাণ দিল্লী হইতে আনীত হয়, এরূপ প্রস্তর বিজাপুর অঞ্চলে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাটের কন্যার গোরস্থান। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শিবাজী রাজার দিল্লি প্রবাসকালে রাজকুমারী তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হন। শিবাজী মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করিলে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বাদসাহের কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনেকে উৎসুক ছিল কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অবিবাহিত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয় ও বিজাপুর বিজয়ের তিন বৎসর পরে ঐ স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

গোরস্থান ভিন্ন মসজিদ অট্টালিকা অনেকানেক আছে—কতক ভাল কতক বা ভগ্নাবস্থায়, প্রাচীনের এই স্মৃতিচিহ্ন সকল যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। গোরের মধ্যে যেমন গোলগুম্বজ, মসজিদের প্রধান তেমনি জুম্মা মসজিদ।

দাক্ষিণাত্যে জুম্মামসজিদের মত সুন্দর মসজিদ প্রায় দেখা যায় না। লালিত্য, শিল্পকৌশল ও কার্য্যকারিতা ইহা সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার্হ। এ মসজিদ একজনের রচনা নহে। প্রথম আলি আদিলসা হইতে ঔরঙ্গজীব পর্য্যন্ত নৃপতিগণের হস্তচিহ্নসকল ইহাতে বর্ত্তমান। প্রধান দ্বার দিয়া চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিবে তিন দিকে মসজিদের গৃহাবলী, প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি শুষ্ক ফোয়ারা। মসজিদের খিলান, স্তম্ভময় সুদীর্ঘ শালা, সুন্দর গুম্বজ, সুরঞ্জিত ভজনালয় (মেহরাব) সকলি চমৎকার। চকচকে মেজের উপর এক একজন উপাসকের বসিবার আঁচড়কাটা আসন আছে, সে সকল গণনা করিলে দেখা যায় ইহাতে প্রায় ৪০০০ উপাসকমণ্ডলীর বসিবার স্থান সঙ্কুলান হয়। মেহরাবে

কতকগুলি শিলালেখ আছে, তাহার চারিটি বচন দিওয়ান হাফেজের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; অবশিষ্ট দুইটি লেখ হইতে জানা যায় যে, সুলতান মাহমুদের আদেশে তাহার ভৃত্য মালিক কাফুর কর্ত্তৃক ১০৪০ (১৬৩৬) অব্দে এই মেহরাব নির্ম্মিত ও অলঙ্কৃত।

আর একটি মসজিদ কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত—তাহার নাম "মেহতর মহল"। ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক প্রশংসনীয়। দোতলার ছাদ এক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা সমতল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঠ বলা ঠিক হয় না, কেননা উহা প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহা বোঝা যায় না। পৃথিবী বাসুকীর পৃষ্ঠে—বাসুকীর আশ্রয় কে? মেহতর মহলের ছাদ সম্বন্ধেও এই প্রহেলিকা,—ইংরাজ এঞ্জিনিয়রদেরও ধাঁদা লাগিয়া যায়। এই গৃহের শিল্পকার্য্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। পাথরের উপর ফল ফুল প্রভৃতি নানারকম নক্সা। ফরগসন সাহেব বলেন যে অলঙ্কার ও শিল্পচাতুর্য্যে এই বাড়িটি মিশরের কায়রোর কোন বাড়ীর নিকট হার মানে না।

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দমহলের সন্নিকট মক্কা মসজিদ। মক্কায় যে মসজিদ আছে তাহার আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া ঐ নাম। ইহা বেশ একটি সুন্দর ছোটখাট মসজিদ, ঠিক যেন একটি খেলানার জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত এবং মসজিদটি উন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত।

প্রাসাদের মধ্যে 'আসার মহল' অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহা সুলতান মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা আদালতের জন্য নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'আদালত মহল' অথবা 'দাদমহল' ছিল। আচ্ছাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে এক নূতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন ও ইহা কার্য্যান্তরে নিয়োজিত হয়। মহম্মদের শ্মশ্রুর দুইটি কেশ ইহার ভাণ্ডারজাত হওয়াতে ইহার পদোন্নতি হইয়াছে। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন উপদ্রব ঘটে নাই, মহম্মদের শ্মশ্রুর প্রসাদে সে অনেক বিঘ্নবিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। আসার মহল চতুষ্কোণাকৃতি, ১৩৫ ফুট প্রস্থ দ্বিতলগৃহ। দ্বিতীয় তলের একটি ঘরে মহম্মদের শ্মশ্রু রাখা হইয়াছে। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শন জন্য কেবল একবারমাত্র খোলা হয়। আর কতকগুলি ঘর কার্পেট, বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরাণো সামগ্রী সকলের ভাণ্ডার ঘর। এই সকল ঘরের প্রাচীর ও ছাদ বিচিত্র লতাপাতা ও মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের গায়ে মাহমুদ বাদশার ছবি মোগল সম্রাটের বর্ব্বরহস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। আরো অনেকগুলি চিত্র কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আর্ক্ কেল্লা ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। এই কেল্লায় যে সকল বিশাল সুন্দর ইমারত একত্রীকৃত তাহার একভাগ চীনমহল। চীনমহলের সৌধমালা : জজের আদালত, কলেক্টর

মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে পরিণত হইয়াছে। এই মহলের এককোণে এক সরোবরতীরে সপ্ততল প্রাসাদ (সাতমঞ্জলী) গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। "গগনমহল" রাজাদের দরবারশালা। তাহার সম্মুখে যে বিশাল খিলানদ্বার (arch) মুখব্যাদান করিয়া আছে তাহা বিজাপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খিলান। উত্থানসংযুক্ত সুসজ্জিত "আনন্দমহল" রাজাদের বিহারভবন ছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড ভূতলগৃহ। রাণীদের বায়ু সেবনের জন্য উপরে প্রশস্ত ছাদ—ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বাহিরের তামাসা দেখিবার সুবিধা। এই গৃহে কত সিঁড়ি, খুপরি খুপরি ঘর তাহার অন্ত নাই। বোধ হয় যেন ইহা রাজারাণী মিলিয়া লুকাচুরি খেলিবার জন্য নির্ম্মিত।

বিজাপুরে এইরূপ যে কত অট্টালিকা, কত কত গোর গুম্বজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের বিস্তার বর্ণন করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, অতএব এইখানে শেষ করি। যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাতে যদি কাহারো কৌতূহল উদ্দীপন হইয়া থাকে তিনি একবার বিজাপুরে গিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া আসুন, এই আমার অনুরোধ।

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমরা যেন এজ্ সহরটুকু বিজাপুর বলিয়া কল্পনা না করি। সহর অপেক্ষা সহরতলি ভারি, সহরের শাখা প্রশাখা অনেকদূর বিস্তৃত ছিল। আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতির বিবরণ শুনিতে পাই, সে সহর সহরতলি দুটা ধরিয়া। বিজাপুরের প্রান্তবর্ত্তী জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, সাহাপুর ইত্যাদি পুররাজির মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। এই সাহাপুর বিজাপুর মিলিয়া স্থান জুড়িয়া যে প্রদেশ তাহাই সাধারণভাবে বিজাপুর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল।

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজুলপুর সুবিখ্যাত আফজুল খাঁর বাসস্থান ছিল—সেই আফজুল খাঁ যিনি রাজা শিবাজীকে মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। গ্রামের কিয়দ্দূরে নবাব পরিবারের কতকগুলি গোর দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে এক লোমহর্ষণ গল্প আছে। গোরগুলি সকলি স্ত্রীলোকের গোর। এক লাইনে সাতটি গোর এমন ১ লাইন। সকলেরই আকার প্রকার প্রায় সমান। গল্পটা এই যে আফজুল যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, তখন গণৎকারেরা গণিয়া বলে যে এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা, আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তাঁহাদের কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই গৃহ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার সপ্ত সপ্ততি বেগম ছিল তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া পুকুরের ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন, এই ভাবিয়া তাহাই করিলেন। গল্পটা সত্য কি না ঠিক বলা যায় না, কিন্তু সারি সারি একই ধরণের এতগুলি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয়

ইব্রাহিম বিজাপুর ছাড়িয়া এই এক নূতন রাজধানী পত্তনের সংকল্প করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশে ঐ স্থানে ১৬০০ অব্দে অনেক বড় বড় ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। স্থানটি গিরিকানন পরিবৃত, বিজাপুর অপেক্ষা দেখিতে সুদৃশ্য। ইব্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণৎকারের অন্তরায়। তাঁহারা তাঁহাকে রাজধানী পরিবর্ত্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আর সাহস করিলেন না। তাঁহার সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। আমাদের নূতন দিল্লীর দশা সেরূপ না হয় তবেই রক্ষা!

বিজাপুরের সুখ সম্পদের পূর্ণাবস্থার মধ্যে এক একজন পরিব্রাজক আসিয়া বিস্ময়ানন্দ উচ্ছ্বাসে যে সহরবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সেকালের অবস্থা কতকটা অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে আসাদবেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আসাদবেগ লোকটা কে তাহা জানা আবশ্যক। ১৬০০ সালের প্রারম্ভে ইব্রাহিম আদলসা ও সম্রাট আকবর—ইঁহাদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। সেই উপলক্ষে সম্রাটের পুত্র রাজকুমার দানয়েলের সহিত ইব্রাহিম স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে আসাদবেগ মোগল সম্রাটের দূত হইয়া বিজাপুর আসেন। তথায় সুলতান যথোচিত আতিথ্য সংকার সহকারে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বহুমূল্য উপহার দিয়া তাঁহাকে রাজকুমারী সমভিব্যাহারে বিদায় করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তাও কন্যাযাত্রী দলে ছিলেন। এই সঙ্গে মোগল সম্রাটের জন্য বহুমূল্য মণি রত্ন ও বাছা বাছা হস্তী উপঢৌকন প্রেরিত হয়। এই বিবাহে রাজকুমারীর নিজের ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভীমা তীর পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাত্রে এক প্রবল ঝড় উঠিল, তাম্বু কানাত ছিন্নভিন্ন হইল ও রক্ষকের ছড়িভঙ্গী হইয়া পড়িল। এই অবসরে রাজকুমারীও পলায়ন করিলেন। সকালে আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয় ও আসাদবেগ যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে পৌঁছিয়া দেন। এই আসাদবেগ বিজাপুর দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহর বর্ণনা এই:—

বিজাপুর প্রাসাদঅট্টালিকা পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ নগর। বাজার ৬০ হস্ত প্রস্থ, দুই ক্রোশ বিস্তৃত। প্রত্যেক দোকানের সামনে এক একটি ছায়াতরু ও হাটবাজার সকলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল দোকান যে সকল পণ্য সামগ্রীতে সজ্জিত তাহা অন্যত্রে সচরাচর দেখা যায় না। গহনা, বস্ত্র, অস্ত্র শস্ত্র, মৎস্য মাংস ফল মিষ্টান্নের ও অন্যান্য লোভনীয় জিনিসের দোকান, পান্থশালা, নাট্যশালা, এই সকল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—কোন স্থানে সহস্র সহস্র লোক নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদে রত, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, অবিরাম আনন্দ-ধারা; এরূপ সুচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও কাছে কি না সন্দেহ। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়—মর্ত্ত্যে যদি কোথাও বেহস্ত (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা এই—

অগর বেহস্ত অন্দর জমীন হস্ত্
হমীনস্ত্ হমীনস্ত্ হমীনস্ত

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে মর্ত্ত্য ধামে,
সে তবে এইখানে এইখানে—এইখানে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।



কাল বৈশাখী
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

রাবণের চিতা

(গল্প)

আমি সবেমাত্র বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া বেকার বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন আমার এক উকিল বন্ধুর অনুগ্রহে জগদীশপুরের বিপুল ষ্টেটের রিসিভারের চাকরি আমার জুটিয়া গেল। জগদীশপুরের জমীদার কয়েকটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মারা যান। ষ্টেট বহু দেনা ও নানা গণ্ডগোলে ভারাক্রান্ত। জমীদারবাবু জমীদারীর কাজ কর্ম্ম কখনো ভালো করিয়া দেখিতেন না;—তীর্থে তীর্থে এবং দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কর্ম্মচারীরা যাহা-খুসি করিয়া এবং যথেচ্ছা আত্মসাৎ করিয়া বিষয়টাকে প্রায় উৎসন্ন দিয়াছিল; কাজেই তাহা রিসিভারের হাতে না আসিলে আর উপায় ছিল না।

বিষয়টা হাতে পাইয়াই আমি নূতন উদ্যমে কাজে লাগিয়া গেলাম,—কাগজপত্র আগা-গোড়া-সমস্ত ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে জমীদার-বাবু উইল করিয়া যান। উইলে তিনি তিন পুত্রকে সমান অংশে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন; একমাত্র কন্যার জন্য নগদ পঞ্চাশ হাজার এবং একখানি বাড়ি দান করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া, উইলে আরো অনেক দানের উল্লেখ ছিল; তাহার মধ্যে একটি অত্যন্ত অদ্ভুত। সেট এই:—"১২৭৯ সালে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে পুরীর ডাক-বাংলার কাছে, অনন্ত সমুদ্রের সম্মুখে, যে পুণ্যবতী বিধবার প্রাণ অনন্তের কোলে মিশিয়া গিয়াছিল, তাঁহার কোনো নিকট আত্মীয়—পুত্র হোক কিম্বা কন্যা হোক—যিনি থাকেন তাঁহাকে আমার বিষয়ের আয় হইতে এককালীন নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে। আমার বিষয় যাঁহারা ভোগ করিবেন তাঁহাদের উপর আমার এই আদেশ রহিল যে উল্লিখিত বিধবার আত্মীয় কে কোথায় আছেন তাহা ভালো করিয়া সন্ধান লইয়া উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার টাকা যেন দান করেন। তাঁহারা যদি আমার জীবনের এই শেষ-ইচ্ছা প্রতিপালনে অবহেলা করেন তাহা হইলে তাঁহারা যেন অচিরে উৎসন্ন যান—এবং আমার অভিশাপ বজ্রের মতো যেন তাঁহাদের মাথার উপর পড়ে! যে বিধবার কথা বলিলাম তাঁহার যেটুকু পরিচয় আমি জানি তাহা আমার উইলের সংশ্লিষ্ট লাল ফিতা-বাঁধা কাগজে লেখা রহিল।"

লাল ফিতা বাঁধা কাগজের তাড়া উইলের সঙ্গেই ছিল। তাহাতে যাহা লেখা আছে আমি তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"তাঁহার সহিত আমার পরিচয় জীবনে এক রাত্রের কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। বৈশাখী পূর্ণিমার জ্বলন্ত রাত্রে তাঁহাকে সেই যে চকিতের মতো দেখিয়াছিলাম, আর দেখা হয় নাই। জীবনে কত লোকের সহিত কতবার দেখা হইয়াছে, তাহাদের অনেককে তো মনেই পড়েনা; কিন্তু কি জানি কি নিগূঢ় রহস্যের আবর্ত্তনে তাঁহার সহিত এক মুহূর্ত্তের সংস্পর্শ আমার সমস্ত জীবনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল।

আমি সমুদ্র উপকূলে বসিয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম। তরল চন্দ্রকিরণ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের সহিত আনন্দে দুলিতেছিল. নাচিতেছিল; দুগ্ধনিভ ফেণপুঞ্জের মাথায় মাথায় স্বর্ণকিরীট ফুটিয়া উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল; আমি তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিলাম—ও কার স্বর্ণকিরীট! কেনই বা উহার চূড়া ক্ষণেকের জন্য জাগিয়া, মিলাইয়া যাইতেছে! আমার মনে হইতেছিল, যেন এই নীলসমুদ্রের নীলাম্বরী রাণী জলবিহারে আসিয়া, হঠাৎ আমাকে দেখিয়া যেন লজ্জায় লুকাইয়া পড়িতেছেন!

এই বিপুল বিশাল উচ্ছ্বাসময় সমুদ্রের গোপন-অতলতার মধ্যে কত কী যে রহস্য লুকানো আছে কে জানে! আমি ভাবিতে ভাবিতে সমুদ্রের কলকল্লোলে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিলাম।

হঠাৎ আমার শান্ত মনের নিস্তব্ধতার উপরে ঢেউ তুলিয়া আমার পাশে আসিয়া কে যেন বসিল। চাহিয়া দেখি, এক তরুণী।

সে আমার দিকে তাকাইল না;—একমনে সমুদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইতেছিল, তাহার পিপাসিত চিত্ত যেন সমস্ত সৌন্দর্য্য রস এক-নিশ্বাসে পান করিয়া লইতেছে।

দেখিলাম তরুণী বিধবা।

আকাশে, বাতাসে চতুর্দ্দিকেই শুভ্রতা;—তাহার মধ্যে শুক তারার মতো এই শ্বেতবসনা রমণীকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল যেন এই অসীম শুভ্রতা হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বীণাপাণি সশরীরে নামিয়া আসিয়াছেন। সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আমার চক্ষু যেন জুড়াইয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য আমার মুগ্ধ মন, সমুদ্র-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস-চঞ্চল সৌন্দর্য্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া, এই শান্ত স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের উপর নিবদ্ধ হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিল।

চন্দ্রকিরণের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল;—সীমাবদ্ধ অসীম সমুদ্র আজ মনের আনন্দে সীমা হারাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল! মনে হইতেছিল, যেন জল স্থল আকাশ আজ এখনই একাকার হইয়া যাইবে!

পায়ের কাছে জল আসিয়াছে, তবুও দেখিলাম রমণীর দৃকপাত নাই—এ লোক হইতে তাঁহার মন উড়িয়া গিয়া যেন কোন্ মায়ালোকের স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। তাঁহার এ সুখস্বপ্ন ভাঙাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া আমার কথা কহিতে হইল।

কিন্তু আমার ডাকে তাঁহার চমক ভাঙিল না;—তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। পায়ের কাছে আসিয়া উচ্ছল জলদল মণিমুক্তার অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। এ যেন ঠিক সুন্দরের পূজা সুন্দর করিতেছেন! আমার মনে হইতেছিল, অনন্ত সৌন্দর্য্য হইতে বিশিষ্ট হইয়া যে সৌন্দর্য্য রমণীরূপে পৃথিবীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ যেন আবার তাহা সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত এক হইতে আসিয়াছে!

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল ঠিক আমার মনে নাই। হঠাৎ দেখি, রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন;—তাঁহার সিক্ত বসনের উপর শীকরসম্পৃক্ত

বাতাস লাগিয়া তাঁহার ক্ষীণ তনুখানিকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

গগনের শুকতারা যেমন করিয়া অস্ত যায় তেমনি করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন..... ক্ষণেকের জন্য চন্দ্রালোক যেন নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, সমুদ্র স্তব্ধ হইল, বাতাস নিস্পন্দ হইয়া গেল!

উদাস মনে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অন্যমনস্ক ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলাম;—রমণী যেখানে বসিয়াছিলেন, কি জানি কেন, বার কতক সেইখানে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মনের মধ্যে কিসের একটা অস্পষ্ট উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে পায়ের দিকে হঠাৎ চোখ পড়াতে দেখিলাম, কি একটা কালো মতন জিনিস সাদা বালির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। হাতে করিয়া উঠাইয়া লইয়া দেখি—একখানা খাতা। তাড়াতাড়ি পাতাগুলি একবার উল্টাইয়া গেলাম। সুন্দর ছাঁদে, পরিষ্কার করিয়া লেখা ছোটো বড় অনেক কবিতায় খাতাখানি ভরা। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল;—সমস্ত রক্তস্রোত ক্ষণেকের জন্য যেন বন্ধ হইয়া গেল। গরীব ভিক্ষুক অপ্রত্যাশিত বিপুল ধনলাভে যেমন আত্মহারা হয় আমিও তেমনি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম।

জ্যোৎস্নার আঁচল-বিছানো বালির চরের উপরে গা এলাইয়া চাঁদের আলোয় কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সমস্ত মনটা একেবারে ভরিয়া উঠিল। চমৎকার! কী সুন্দর রচনা! যেমন ভাব, তেমনি ছন্দ—যেন পাগল করিয়া দেয়। ভাবে রসে গানে ছন্দে সুন্দর একখানি হৃদয় যেন আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সমুদ্রের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম—হে রত্নাকর! আজি এ কী রত্ন উপহার আনিয়া দিলে! ধন্য আমি!

* * *

আমি ধনবানের পুত্র। লক্ষ্মীর অচঞ্চল কৃপা আমাদের বংশের চিরখ্যাতি। পিতার চেষ্টায় সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে আমি যে নিতান্ত বঞ্চিত ছিলাম তাহা নহে। বিদ্যা-মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে আমার স্থানলাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমি নিতান্তই দুরাকাঙ্ক্ষ। সরস্বতী যে শতদলটির উপরে পা রাখিয়া বীণা-বাদন করেন তাহারই একটি দল হইয়া আমি ফুটিয়া থাকিব, ইহাই আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। আর সব খ্যাতি বৃথা—ক্ষণিক, ভঙ্গুর! কেবল কবিত্ব-খ্যাতিই দিকদিগন্তবিস্তৃত, অনন্তকালস্থায়ী;—মহা প্রলয়েও তাহার ধ্বংস হয় না। সেই খ্যাতি যদি লাভ করিতে পারি তবেই তো জীবন সার্থক! আজ আমার বাঁশি যে গান গাহিবে অনন্তকাল সেই গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া থাকিবে;—শত বর্ষ পরেও আমার রচিত প্রণয়-সঙ্গীত গাহিয়া ভবিষ্যযুগের প্রণয়ীরা প্রণয় নিবেদন করিবে। এ কি কম প্রলোভন! আমি এই মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটিতেছিলাম। কিন্তু হায়, আমার আশা, মরীচিকার মতোই মিলাইয়া যাইতেছিল! সাধ থাকিলে কি হয়, সাধ্য কোথায়? মানুষের সাধ কখনো সাধ্য বুঝিয়া চলে না। বামন চাঁদে হাত

দিতে চায়—পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘনের আশা রাখে!

মনকে কিছুতেই আমার অক্ষমতা স্বীকার করাইতে পারিতাম না। সে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যেমন করিয়াই হৌক কবিত্ব-যশ অর্জ্জন করিতেই হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? তাহা সে শুনিতে চাহিত না। মনের এই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে কী না ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে! পাগলের মতো বেড়াইয়াছি, কিন্তু আশার আলো পাইয়াছি কৈ!

জানি, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না। কিন্তু সরস্বতীর সাধনা বড় দুশ্চর সাধনা। দেবী বীণাপাণি পাষাণী;—অল্পে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। কত মহা মহা তপস্বী, কত শত দেবদেবীকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়াছেন কিন্তু সরস্বতীর বরলাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে?

আমার সাধনায় আমি যেটুকু লাভ করিয়াছি তাহার মূল্য কতটুকু! কতটুকুই বা তাহার প্রাণ! কত দিনই বা সে আমার স্মৃতি বহন করিবে! জলবুদ্বুদের মতো ভাসিয়া উঠিয়া লাভ কি!

আমি হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

* * *

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস মেঘগর্জ্জনে কূলের উপর আচড়াইয়া পড়িতেছিল। উল্লসিত চন্দ্র-কিরণকে সমস্ত বুক দিয়াও পৃথিবী আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল। কবিতার খাতাখানি বুকে করিয়া আমাকেও আমি আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল, চতুর্দ্দিকেই আজ প্রকৃতির দান অপর্য্যাপ্ত!

আমি বালির উপরে পড়িয়া পড়িয়া লুটাইতেছিলাম;—সমস্ত চন্দ্র-কিরণটা সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া মাখিয়া লইতেছিলাম।

এমন সময় আবার সেই রমণী। দেখিলাম, তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিক চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন;—দৃষ্টি আর কোথাও নাই—কেবল মাটির দিকে।

রমণী এবার বসিলেন না—চতুর্দ্দিকে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমার কাছে আসিয়া হঠাৎ একবার থমকাইয়া দাঁড়াইলেন।

নয়নে তাঁহার কী করুণ দৃষ্টি! যেন একখানি সদ্য শোকাহত হৃদয় দর্পণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আমি তাঁহার চোখের পানে চাহিতে না চাহিতেই, বাতাস হা হা করিয়া উঠিল—সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা আর্ত্তনাদ গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। আমার বুকের ভিতরটাও শুষ্ক হইয়া উঠিল!

রমণী আমার পানে চাহিয়া কথা কহিলেন। কিন্তু সে যেন কথা নয়—কান্না! শুধু দুইটি শব্দ—"আমার খাতা!" মুখ হইতে বাহির হইবা মাত্রই যেন সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া গেল! বাতাসের হিল্লোল, সমুদ্রের কল্লোল সেই কথা দুইটি লইয়া দিকে দিকে ছুটিয়া গেল;—গগনের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—"আমার খাতা!"—"আমার খাতা!"

আমি সেই শব্দে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেই করুণ দৃষ্টি আমাকে

আবার সজাগ করিয়া তুলিল। অমনি আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল উজ্জ্বল দৃশ্য—আমি যেন সম্রাট হইয়া বসিয়াছি, যুগযুগান্তরের ও দেশদেশান্তরের মানবকুল আমার বন্দনা করিতেছে! আকাশে আকাশে উড়িতেছে আমার নামের মহিমা-উজ্জ্বল ধ্বজা;—পবনে পবনে ধ্বনিত হইতেছে আমার কীর্ত্তির গৌরব-গাথা!

রমণী আমার নিকট হইতে কোনো উত্তর না পাইয়া হতাশভাবে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে কী কাতরতা! কে যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়াছে—বুকের ধন কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে!

তাঁহার এ মর্ম্মভেদী কাতরতা দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছিল খাতাখানা ফিরাইয়া দি। কিন্তু কথাটা মনে হইবামাত্রই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—একটা অসীম শূন্যতা লইয়া আমার ভবিষ্যৎ! আমি সে দিকে চোখ মেলিয়া বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না।

আমি পাষাণ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মানুষের মন নিষ্ঠুরতার যে অতলতায় পৌঁছিলে মানুষ খুন করিতে পারে—জগতের জঘন্যতম কার্য্যে পশ্চাৎপদ হয় না, আমার তখনকার মনের অবস্থা ঠিক সেইখানে ছিল।

রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

সে রাত্রে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই। সারা রাত বারান্দায় পায়চারি করিয়াছি। কেবলই চোখের সামনে দেখিয়াছি চারিদিকে অসংখ্য রমণী যেন সমস্ত রাত ধরিয়া সমুদ্রতীরে বালুকার কণাগুলি পর্য্যন্ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছে। সে খোঁজার আর অন্ত নাই!

তাঁহাকেও একবার স্পষ্ট—জাজ্বল্য দেখিয়াছিলাম। তখন অনেক রাত্রি। চারিদিক নিশুথী। কেহ কোথাও নাই—তিনি একা ছায়ার মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সমুদ্রতীরটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছেন.....হঠাৎ যেন মনে হইল, তিনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন.....

কেমন করিয়া কখন গিয়া ঘরে শুইয়াছি ঠিক মনে নাই। যখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম তখন বেশ বেলা হইয়াছে;—বালির উপর সূর্য্যালোক এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাওয়া যায় না।

ঘুম ভাঙিয়া অবধি নিজেকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, রাত্রের ঘটনাটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র! তাহার উগ্রতা আর তেমন করিয়া মনের মধ্যে বিঁধিতেছিল না;—রাত্রের অস্পষ্টতায় কাল যাহাকে ভয়ানক করিয়া দেখিয়াছি, দিনের আলোয় তাহা যেন সহজ হইয়া আসিতেছিল;—তাহার ভীষণতাটাকে মনে মনে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছিলাম।

আমি ধীরে সুস্থে খবরের কাগজখানা খুলিয়া চা পান করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার চাকর নিধিরাম আসিয়া

খবর দিল—"একটা মেয়ে-লোককে বাবু, কাল রাত্রে ঐ সমুদ্রের ধারে কে খুন করেছে!"

আমি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"কি রকম মেয়ে লোক?"

—"বিধবা!"

চায়ের পেয়ালা আমার হাত হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল।

...খুন!...খুনই বটে! আমার অন্তরাত্মা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"শুধু চোর নোস্ তুই! তুই খুনে!"

আমিই তো এ নারীহত্যা করিয়াছি। স্বার্থের জন্য—ফাঁকি দিয়া কবিত্ব-যশ অর্জ্জন করিবার জন্য—তাঁহার বুকের ধন কাড়িয়া লইয়া আমিই তো তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছি!

আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম;—অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া রহিল।

কী করি!

একটা তীব্র বেদনা—একটা আকুল চঞ্চলতা, আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। মনের উদ্বেগে আমি সমুদ্রের ধারে ছুটিয়া গেলাম। সেখানে কোথাও কোনো চিহ্ন নাই—কোনো পরিবর্ত্তন নাই;—সেই একই ভাবে সমুদ্রের জল বার বার কূলের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ফিরিয়া যাইতেছে;—সেই একই ভাবে, একই শব্দে বাতাস বহিতেছে। তাহাদের চোখের সামনে তীরের উপর কোথায় কি হয়, সে খবর তাহারা কেহই রাখে না;—একেবারে উদাস!

আকাশে বাতাসে কোনোখানেই তাঁহার কোনো সম্বাদ আমি পাইলাম না! আমি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কবিতার খাতাখানা তখনও আমার বুকের পকেটে ছিল। তাহার জ্বলন্ত আগুন আমার বুকের পঞ্জর অবধি যেন দগ্ধ করিতেছিল। আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া টান মারিয়া সেখানা একবার ফেলিয়া দিলাম। অমনি চোখের সম্মুখে ধূ ধূ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল;—দেখিতে দেখিতে চারিদিক অগ্নিময় হইয়া গেল। কেবল আগুন!—আকাশ জ্বলিতেছে, বাতাস জ্বলিতেছে; স্থলেও আগুন, জলেও আগুন;—অগ্নির এ কী বিশ্বব্যাপী ভীষণ তাণ্ডব লীলা!.....দেখিলাম, সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেই জন্য ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি খাতাখানা উঠাইয়া লইয়া আমার বুকের আগুন আমার বুকেই চাপিয়া রাখিলাম!

পুরীর চতুর্দ্দিকে তাঁহারই মৃত্যুর কথা। যাহার সহিত দেখা হয় সেই কেবল সেই কথা তোলে। 'ওরে বাপু, আমি শুনেছি! শুনেছি!' তবুও কেহ নিষ্কৃতি দেয় না। হত্যাপরাধী বিচারকের মুখে একবার মাত্র ফাঁসির হুকুম শোনে—কিন্তু এ যে আমাকে পলে পলে ফাঁসির হুকুম শোনানো!.....

সবাই বলিতেছে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রে প্রায়ই তিনি লুকাইয়া একা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বাহির হইতেন। হঠাৎ কোনো উত্তেজনাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ!.....

কিন্তু আমি জানি.. ...কথাটা নিজমুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম কৈ!

সে দিন সমস্ত দিন আমার মনের কোনো ঠিক ছিল না। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ খেয়াল হইল

তাঁহাদের খবরটা একবার লই। কিন্তু খোঁজ করিতে গিয়া শুনিলাম, সেই দিনই বৈকাল-বেলা তাঁহার আত্মীয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে পুরী হইতে চলিয়া গেছেন। তাঁহাদের সহিত কোনো পুরুষ অভিভাবক ছিলেন না, মেয়েরা বাড়ির ভিতরই থাকিতেন;—কাজেই তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, কোথায় গেলেন, কোথায় থাকেন এ সম্বাদ কেহই পায় নাই। কবিতার খাতাতেও নাম ধাম কিছুই লেখা নাই। আমি হতাশ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"তবে কী করি!"

সেইদিন হইতে কত অনুসন্ধান করিয়াছি, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কত দেশবিদেশে ঘুরিয়াছি কিন্তু তাঁহার আত্মীয়দের কোনো সম্বাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

তবে এ খাতাখানা লইয়া কী করি! কাহাকে দি এ যে ফেলিতেও পারি না—রাখিতেও পারি না;—দিবারাত্রি রাবণের চিতা বুকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি!"

.....

জমীদারবাবুর আত্ম-কাহিনী শেষ করিয়া আমি কবিতার খাতাখানির সন্ধান করিতে লাগিয়া গেলাম;—সেখানা দেখিবার জন্য ভারি কৌতূহল হইতেছিল! কিন্তু সমস্ত কাগজ পত্র উল্টাইয়া, সমস্ত বাক্স দেরাজ হাৎড়াইয়া তাহার কোনো খোঁজ পাইলাম না। জমীদারবাবু হঠাৎ কাশীধামে মারা যান—সে সময় সেখানে তাঁহার নিকট-আত্মীয় বড় কেহ ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা তাঁহার জিনিসপত্র একরকম লুট করিয়াই লইয়াছিল;—বোধ হয় সেই হট্টগোলে খাতাখানি নষ্ট হইয়া থাকিবে।

একটা কথা ধাঁ করিয়া আমার মনে হইল। আমি ভাবিতেছি, জমীদারবাবুর সেটা মাথায় আসে নাই কেন! কে জানে, কেন!

সেই দিনই বাগজে কাগজে ৩৩২৫ নং ঠিকানা দিয়া একটা বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিলাম। দেখি, ইহাতে সেই বিধবার কোনো সন্ধান পাই কি না।

আমি অধীর ভাবে বিজ্ঞাপনের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যাবেলা আমার চেম্বারে বসিয়া চুরুট ফুঁকিতেছি, এমন সময় দেখি, আমার বৃদ্ধ মাতুল উপস্থিত। তিনি কখনো এদিকে আসেন না—হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমি তাড়াতাড়ি চুরুট ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি স্থান গ্রহণ করিলেন। ধীরে ধীরে পকেট হইতে চশমাটি বাহির করিয়া চাদরের খুঁটে কাচ দুখানা বারকতক ঘসিয়া চোখের উপর ঠিক করিয়া লইলেন। তারপর একখানা খবরের কাগজের পাতা এদিক-ওদিক-চারিদিক বহুবার উল্টাইয়া, লাল কালীতে দাগ দেওয়া একটা অংশ বাহির করিয়া আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি! এ বিজ্ঞাপনটা দেখেচ?"

আমি দেখিলাম, সে আমারই প্রদত্ত বিজ্ঞাপন।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"এর কোনো সংবাদ আপনি জানেন না কি!"

—"খুব জানি! সে কি ভোলবার কথা বাবা!"

বলিয়া তিনি চোখ হইতে চশমাখানি খুলিয়া লইলেন;—ধীরেসুস্থে খাপের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে লাগিলেন। আমি অধীর ভাবে উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—"এ বিধবাটি কে জান?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কেমন করে জানব!"

—"তা বটে! তুমি ছেলেমানুষ—এ সব কথা কেমন করেই বা জানবে!"

আমি অবাক হইয়া রহিলাম।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বিধবাটি তোমারই জননী!"

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

ঘটনাচক্রের কী আশ্চর্য্য গতি!

বৃদ্ধ আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"তা হলে এ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমারই প্রাপ্য!"

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু কবিতার খাতা! সে কার?"

বৃদ্ধ আমার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি সেই লাল ফিতা-বাঁধা কাগজের তাড়াটা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম—"এই পড়ে দেখুন!"

তিনি বিস্মিত নয়নে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পড়া শেষ হইলে কাগজগুলা আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া একটা রুদ্ধশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"এ খাতাখানি তোমার পিতাঠাকুরের! তিনি অল্প বয়সে মারা যান;—আহা! বেঁচে থাকলে তিনি একজন বড় কবি হতেন।"

বৃদ্ধ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিয়া উঠিলেন—"দেখি, খাতাখানা একবার!"

আমি বলিলাম—"সেই খাতাখানাই তো খুঁচছি—কিন্তু পাচ্ছিনা যে!"

আমার মামা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ঐ খাতাখানি আমি অনেকবার দেখেছি! আহা! তোমার মা ঐখানি নিজের সন্তানের মতো দিনরাত বুকে করে করে বেড়াতেন,—ঐ খাতা নিয়েই তিনি স্বামীশোক ভুলেছিলেন! ঐ খানি তোমার বাবা, মারা যাবার দিন, তাঁকে উপহার দিয়ে যান!

আমার জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন;—তাঁহাদের কাহাকেও আমার মনে পড়ে না। আজ তাঁহাদের স্মৃতি নূতন করিয়া জাগিয়া আমার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। আজ আমি এই প্রথম পিতৃমাতৃ-বিয়োগের শোক হৃদয়ে অনুভব করিলাম।

ভারি ইচ্ছা হইতেছিল, সেই কবিতার খাতা খানা যদি কোনো রকমে খুঁজিয়া পাই। কিন্তু ভাবিলাম, কাজ নাই সে রাবণের চিতায়! সে আমার বাপকে খাইয়াছে, মাকে খাইয়াছে, জগদীশপুরের জমীদারকে ধ্বংস করিয়াছে; শেষে কি আমাকেও ভস্মসাৎ করিবে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জাপানের ঝরণা

জাপানের প্রকৃতি-শ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে জাপানের ঝরণাগুলি। সেখানকার পাহাড়ের কোলে কোলে যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার তুবড়ির মতো শুভ্র ঝরণাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, সে স্থানগুলি এমনি চমৎকার ও মনোরম যে মনে হয়, যে লোকে যে বলে ইহা দেবতার লীলাভূমি তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। জাপানের সৃষ্টির দিন হইতে—অর্থাৎ যে দিন দেবী ইজানামি ও দেব ইজানাগি তাঁহাদের মণিমাণিক্যমণ্ডিত শূলের দ্বারা সমুদ্রের জল আলোড়ন করিতে করিতে শূলের উজ্জ্বল অগ্রভাগ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া এই জাপান দেশটি সমুদ্রের বুকের উপরে একটি পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই দিন হইতেই জাপানের ঝরণা এক অসীম ক্ষমতাশালী দেবতার বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। এই দেবতারই অনুগ্রহে জাপানের



নাচীর ঝরণা

আকাশে আলো ফোটে, বাতাস ছোটে ও মেঘ জলদান করে ; ইঁহারই ক্রোধে, ঝড় উঠিয়া দেশ লণ্ডভণ্ড হয়, প্লাবনে সব ভাসিয়া যায়, আগুনে ভস্মসাৎ হয়।

জাপানীরা চিরদিনই প্রকৃতির উপাসক ;—শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়ে তাহারা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ আভরণ এই ঝরণাগুলি সম্বন্ধে জাপানে প্রবাদের অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, ঝরণার এই পবিত্র জল লইয়া কত অভিষেক হইয়াছে, কত পাপীর পাপক্ষালন হইয়াছে, কত তপস্বী ইহার কোলে বসিয়া তপস্যা করিয়াছে, কত অনুতপ্ত পাপী তাহাদের পাপতাপের জ্বালা জুড়াইয়াছে, কত ব্যর্থজীবন ইহাতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে—সেই সমস্ত স্মৃতি বহন করিয়া এই শুভ্রোজ্জ্বল ঝরণাগুলি মানবের ভয়বিস্ময়মুগ্ধ চোখের সম্মুখে এখনও জীবন্ত হইয়া আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঝরণাগুলি কী প্রদেশের অন্তর্গত নাচীর মধ্যে বিরাজিত। এইখানে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির আছে। 'কানন' সম্প্রদায়ের যে তেত্রিশটি পবিত্র তীর্থমন্দির আছে তাহার মধ্যে এই মন্দিরটি প্রথম।



শিরাইতো ঝরণা, নাচীর

এই ঝরণাগুলির নাম ঈচি, নী, সান্-নো-তাকি অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঝরণা। এই নামগুলি ঝরণাসমূহের সংখ্যা ও পর্য্যায় অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম যেটি সেইটিই সব চেয়ে বড়—২৭৫ ফুট তাহার উচ্চতা।

ইহারই জলের ধারে বসিয়া বহুদিনের তপস্যার পর সম্রাট কোয়াজান মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। মোংগাকুর হত্যাপরাধের পাপক্ষালন এইখানেই হইয়াছিল; এইখানে বসিয়াই অবশেষে সে ঋষিত্ব লাভ করে।

মোংগাকু, কেসা-গোজেন নামে এক রমণীকে ভালোবাসিত। কিন্তু রমণী ছিল বিবাহিত;—স্বামীর প্রণয়ে ছিল সে মুগ্ধ। সেই জন্য মোংগাকু এমনই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল যে কেসা-গোজেনকে না পাইলে সে যেন পৃথিবীকে রসাতলে দিবে। তাহার হাতে কেসা-গোজেনের জননীর লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না ;—তাঁহার কাছে মোংগাকু দাবী করিয়া বসিয়াছিল যে যেমন করিয়াই হোক্ তাঁহার কন্যাকে তাহাকে দিতে হইবে, —নইলে সে তাঁহাকে খুন করিবে!

মায়ের বিপদ দেখিয়া কেসা-গোজেন ভীত হইয়া উঠে এবং মোংগাকুর প্রস্তাবে সম্মত হয়। সে মোংগাকুকে গোপনে বলে যে যদি তাহার স্বামীকে সে হত্যা করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পত্নী হইতে কেসা-গোজেনের কোনো আপত্তি থাকিবে না।

মোংগাকু ইহাতে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিল। সমস্ত ঠিক হইল ;—কখন্, কোন্ সময়ে কেমন করিয়া আসিয়া মোংগাকু স্বকার্য্য সাধন করিবে তাহা কেসা-গোজেন তাহাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল ;—এবং তাহার স্বামী রাত্রে কোন্ বিছানায় শয়ন করে তাহা মোংগাকুকে ভালো করিয়া চিনাইয়া দিল।

যথাসময়ে মোংগাকু আসিয়া তাহার প্রণয়িনীর স্বামীর আপাদমস্তকাবৃত দেহের উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি বসাইয়া দিল।



কেগোন



কিরিফুরি

কিন্তু এ কি! আর্ত্তনাদের স্বর এমন মিহি কেন। এ তো পুরুষের কণ্ঠ নয়! মোংগাকু তাড়াতাড়ি আবরণ খুলিয়া ফেলিল; দেখিল, পুরুষ-বেশে সজ্জিত তাহারই প্রণয়িনীর বুকে তাহার হাতের সুতীক্ষ্ণ তরবারি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

মোংগাকু অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তখনই বিবাগী হইয়া গেল।

যেখানে ঝরণা জোড়া জোড়া আছে সেখানে তাহাদের স্ত্রী পুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নুনোবিকির ঝরণা—মি-দাকি—স্ত্রী এবং ওদাকি—পুরুষ—কোবে সহর হইতে খুব কাছে। যাঁহারা কোবে সহরে যান তাঁহাদের কাছে ইহা বিশেষ আকর্ষণের সামগ্রী। এখানে অনেক চায়ের আড্ডা আছে—দর্শকের ভিড়ে সেগুলি সর্ব্বদাই গুলজার।

শোজি হ্রদের সন্নিকটে—ফুজি পর্ব্বতের পাদদেশে শিরোইতে ঝরণা-পরিবার। সত্যই যেন একটি পরিবার। দুইটি বড় বড় ঝরণা যেন স্বামী ও স্ত্রী; এবং আশে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট—যেন ছেলেমেয়ে, নাতিনাত্নিরা ঘেরিয়া আছে। ইহাদেরই কাছে আর একটি বিপুল উচ্ছ্বাসময় ঝরণা আছে, সকলে তাহাকে বলে "ওতো-দেমে"—অর্থাৎ চুপ!

দুই ভাই তাহাদের পিতৃহন্তাকে দুই দিক হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে এই ঝরণার নিকটে আসিয়া পৌঁছে—একজন উপরে, একজন নীচে। দুই জন দুই জনের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে কিন্তু জলের গর্জ্জনের জন্য পরস্পরের কথা শুনিবার উপায় নাই। অনেক দিনের পর দুই ভাইয়ের দেখা—কথা কহিবার জন্য তাহারা আকুলিব্যাকুলি করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। তাহাদের এই ব্যাকুলতা দেখিয়া হঠাৎ ঝরণা তাহার গর্জ্জন থামাইয়া লইল। দুই ভাইয়ের কথা শেষ হইলে আবার প্রপাতের শব্দ আরম্ভ হইল। এইজন্যই ইহার নাম হইয়াছে "চুপ"!

মিনো প্রদেশে ওঙাকি-সন্নিকটে একটি জলপ্রপাত আছে। ইহা বহুদিন ধরিয়া সুরার ফোয়ারা খুলিয়া রাখিয়াছিল।

এক ছিল বৃদ্ধ কৃষক, তাহার ছিল এক পুত্র। তাহাদের মতো এমন গরীবদুঃখী দেশের মধ্যে আর একটি ছিল কি না সন্দেহ। পিতা স্থবির—কোনো কাজ কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য তাহার নাই; পুত্র সমস্ত দিন ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোনো রকমে বাপের মুখে দুই মুঠা দিয়া নিজের মুখে এক মুঠা তোলে। বাপের ভারি ইচ্ছা হইল, সুরা পান করতে। পিতা বুড়ো, কবে মরিয়া যাইবে ঠিক নাই—তাহার এই শেষ বয়সের শেষ সাধ মিটাইতে না পারিলে চিরদিন অনুতাপ থাকিয়া যাইবে—এই ভাবিয়া পুত্র ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। কিন্তু উপায় কি? পুত্র অনেক ভাবিয়া স্থির করিল যে নিজের এক মুঠা অন্ন হইতে কমাইয়া আধ মুঠা করিয়া, কখনো বা অনাহারে থাকিয়া, তাহার বিনিময়ে বাপের জন্য সুরা সংগ্রহ করিবে। শেষে অনাহারে অনাহারে পুত্র একেবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল—নড়িতে পর্য্যন্ত পারে না; কিন্তু তবুও বাপের জন্য সে কাজে যাইত—নইলে বাপ যে না-খাইয়া মারা যাইবে! পিতার তুষ্টির জন্য এত কষ্ট স্বীকার—এমন পিতৃভক্তি—দেখিয়া দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া এই ঝরণার মুখে সুরার উৎস খুলিয়া দিলেন। বাপ যত দিন জীবিত ছিল, এইখান হইতে পুত্র তাহার জন্য সুরা লইয়া যাইত।

নিক্কোর সন্নিকটবর্ত্তী কেগোন-প্রপাত জাপানের ঝরণার মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার জল আড়াই শত ফুট উচ্চ হইতে ঠিক ঋজু ভাবে মাটিতে আসিয়া পড়িতেছে। তাহাতে চতুর্দ্দিকে কী চমৎকার শীকর-নির্ম্মিত-মায়াজাল রচিত হইয়া উঠিতেছে! শোভায় ও সৌন্দর্য্যে এই ঝরণাটি শ্রেষ্ঠ;—জাপানীরা এটিকে বড়ই ভালোবাসে, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে ইহার উপরে একটি শোকের কালিমা আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক বিফলমনোরথ ছাত্র ইহারই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহার দেখাদেখি আরো কয়েকটি সমাবস্থার ছাত্র পরে পরে তাহার গতি অনুসরণ করে। এই স্থানে আসিয়া আত্মহত্যা করাটা ছেলেদের মধ্যে যেন চলিত হইয়া পড়িতেছিল। সেই জন্য এই স্থান এখন প্রহরী-বেষ্টিত। নিক্কোর নিকটবর্ত্তী আরো একটি ঝরণার নাম কিরিফুরি অর্থাৎ কুহেলি-প্রপাত!

ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি বিখ্যাত ঝরণা আছে তাহার মধ্যে দুই একখানির ছবি এইখানে প্রদত্ত হইল।

সেংসু প্রদেশের মিনোয়া পর্ব্বতের উপরে মিনোয়া নামেই একটি প্রকাণ্ড ঝরণা আছে। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।



শোনাই



ওশিমা

সেই সময় রাজসরকার হইতে এই ঝরণার অধিষ্ঠাতা দেবতার জন্য বিপুল সম্ভারে পূজা গিয়াছিল। তাহাতেই না কি বহুদিনের অজন্মা ও অনাবৃষ্টি দূর হইয়া দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসে।

এমনি করিয়া নানা প্রকারে জাপানের ঝরণাগুলি বহুদিন হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছে;—কত কবি ইহার সৌন্দর্য্য-গান গাহিয়াছেন, কত চিত্রকর ইহার প্রাণের কথা আঁকিয়াছেন, কত পুণ্য স্মৃতির সহিত, কত বিখ্যাত চিত্রের সহিত, কত গীত-গাথার সহিত জড়িত হইয়া ইহাদের নাম জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

অন্তিমে

(কোনও রুশ নাটিকার ভাবানুবাদ)

সময় রাত্রিকাল, স্থান নাগরিক রঙ্গালয়; অভিনয় সমাপ্ত। ডাইনে মোটা কাঠের ভারী ভারী দরজায় সারি, সবগুলিই সাজঘরে যাইবার পথ, বাঁয়ে, দূরে রঙ্গমঞ্চ, বহু অনাবশ্যকীয় আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ—মধ্যে একখানি কাঠের টুল উল্টাইয়া পড়িয়া আছে।

পাত্র-অভিনেতা বৃদ্ধ পরমানন্দ—বয়স, আটষষ্টি বৎসর এবং ভৃত্য জগাই।—

সাজঘর হইতে হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি লইয়া অভিনেতা পরমানন্দের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ এবং উচ্চ হাস্য করিয়া—

সত্যি বড় মজা, এমন আমোদ আর কখনো হয়নি, অভিনয়ের পরে আমি সাজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সবাই চলে গিয়েছে, আর আমি কিনা এখনো সেখানে পড়ে নাক ডাকাচ্ছি। আর ভাই বুড়ো হয়ে গিয়েছি, বাহাত্তুরে পেয়েছে। বদঅভ্যেস গুলোও তো ছেড়ে গেল না, আজ ধান্যেশ্বরীর পূজাটা বিধিমত হয়েছিল, তাই শুতে আর হয়নি, বসে বসেই স্বপ্ন প্রয়াণ, এটা কি কম বুদ্ধির পরিচয়! শোবার শ্রমটুকুও করতে হ'ল না একেবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দিব্য গতি। আরে জগা, আরে মেধো কোথা গেলিরে? দাঁড়ানা, সাড়া দেওয়া নেই? একেবারে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছি। হতভাগারা ঘুমিয়েছে, মাতা বসুমতীর অপস্মার রোগে কাঁপতে কাঁপতে কাশীপ্রাপ্তি হ'লেও কুম্ভকর্ণদের নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে না। আরে একেবারে নিঃশব্দ, শুধু প্রতিধ্বনি ভয়ে ভয়ে "কু" দিচ্ছে, পাছে চোর ধরা পড়ে! জগাই জগরাম, (টুলটা উঠিয়ে নিয়ে তার উপর বসে), আমি জগাকে আর মেধোকে কিছু বকশিষ দিয়েছিলাম, তাই একেবারে বেমালুম অদৃশ্য! বদমায়েস দুটো পলাতকা, আমাকে বুঝি বা বন্ধ করেই রেখে গেছে —নাটমন্দিরের সব পথই দেখছি যে রুদ্ধ! (চারিদিকে দেখে) এখনও নেশাটা আছে যেন! রাম রাম, আজকের অভিনয় আমার উপকারের জন্যেই হয়েছিল, তারি সম্মান রক্ষা করে গলার এই চোঙটার মধ্যে দিয়ে কত মদই যে উদরজাত করেছি এখন মনে করে ঘৃণা হচ্ছে! মা দুর্গে, শরীরে যে বাড়বানল প্রবেশ করেছে, মুখের মধ্যে শুধু একখানি জিহ্বাই দিয়েছিলে, এখন যে লোলায়মান, ঊর্ম্মিমুখী সহস্র শিখায় সে আমার প্রাণান্ত করছে। কি ভয়ানক কি বিবেচনা রহিত। এ নরাধম আবার একেবারে মদিরা-বিহ্বল, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, সে জানেও না, কে তাকে আজ সম্মান করে গেল। মাথাটা ফেটে পড়ছে, শরীরে ভূমি-কম্প ধরেছে - রসাতলের নাগিনী সবাই মিলে কামড় দিচ্ছে। অন্তরে বাহিরে অন্ধকার, শীতার্ত্ত আমি যেন কোন ব্যবসাদারের মদের বোতল জমায়েৎ করবার মাটির নীচেকার চোর কুঠুরি। শরীরটা তো গেছে, এতদিন তার কথা ভাবিনি, আজ ভাবলেও দুঃখ হবে না, তবে বয়স যে হয়েছে, তাদের আর ভুলে থাকবার যো নেই। বুড়ো

বেল্লিক আমি, ভেবেই বা কোন উপায় হবে? ভাঁড়ামি করলেই কি আর যৌবন ফিরবে, তুমকি হামকি কর, আর বাপু বাছাই বল, সে যাদুধন আর ফিরেও চাইবে না! তবে রীতিমত কুর্ণিশ করে, আটষট্টি বছরের কাছে বিদায় নাও—আর তাদের দেখা পাবে না! যাওয়াও তো ক্ষণিকের অদর্শন নয়, এ যে একেবারে কাল সাগরে লীন; আর আর আসবে না, আর কখনোই আসবে না, বুদ্বুদ হয়েও দেখা দেবে না যে। বোতলটি নিঃশেষ করে পান করেছি —তলানি দু'এক ফোঁটা ছাড়া কিছুই পড়ে নেই পরমানন্দ গোঁসাই, সত্যিকে ভয় করে পার পাবে না! নেই, নেই কিছুই নেই। এখন তোমায় বোবা হতে হবে। উগ্ররসে জরান জারক নেবুটির মত; নিঃশব্দে গোতলজাত হয়ে থাক আর কি! জড়ের অভিনয় কর, চলা বলা সব বন্ধ। যমরাজা আর বড় দূরে নেই। (সম্মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) বল্লে প্রত্যয় যাবে না, আজ ৪৫ বৎসর রঙ্গমঞ্চের উপরেই জীবন যাপন করলাম, তবু দীপ নির্ব্বাণের পর, আজকের রাতে এই প্রথম আমি নাট্যশালাখানি চক্ষু চেয়ে দেখলাম। এই প্রথম, মহামায়া, চারিদিক কি অন্ধকার! (ফুট লাইটের কাছে গিয়ে) একেবারে কিছুই দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না, না, না, অস্পষ্ট ভাবে প্রম্পটারের ছোট্ট কুঠুরিটি আর তার ডেস্ক দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া আর সব আলকাতরার মত নিবিড় জমাট কালো! অতল গহ্বর—কবরের মত, মৃত্যু বুঝি বা ঐখেনেই লুকিয়ে আছে! হরি, হরি, কি ভয়ানক শীত; রঙ্গালয়ের মধ্যে দিয়ে বাতাস চলা-ফেরা করছে, ঠিক যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে বরফের তীর সব ছুটে চলেছে; যেখানে ছুঁচ্ছে একেবারে অসাড় মৃতপ্রায় করে দিয়ে যাচ্ছে। ভূত, প্রেত, আর কোথায়, এইখানেই সব বাসা বেঁধেছে! শীতে আমার বুকের পাঁজরা, পিঠের দাঁড় ধরে সজোরে নাড়া দিচ্ছে।—জগা, মেধো দুজনে তোরা কোথায় গেলিরে? মনের মধ্যে বড্ড ভয় লাগছে, কত বিভীষিকাই দেখছি। মদটা না ছাড়লে চলছে না দেখছি। বুড়ো হয়েছি আর তো বেশী দিন নেই। আটষট্টি বৎসর, এখন পরপারের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়—পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণা, দান দক্ষিণার এই ত সময়, আর শিবশম্ভো, আমি কি করছি—মদের ভাঁড় হাতে, গায়ে দুর্গন্ধ, টলমল করে, আবোল তাবোল বকে, উঠে পড়ে রীতিমত ভাঁড়ামি করেই চলেছি! হায়, আমার দিকে চেয়ে দেখলেও অন্যের পাপ স্পর্শে! এখুনি বদল করতে হবে, দেরী নয়, আর দেরী নয়; এই বেশে, এই দেশে, এই ভাবে আর বেশীক্ষণ থাকতে হলে, ভয়েই মারা যাব। (সাজ ঘরের দিকে অগ্রসর হতে, ঠিক সেই সময়ে দূরে রঙ্গমঞ্চের অপর দিকে আলখাল্লা হাতে ভৃত্য জগাকে দেখে ভয় খেয়ে, বেজায় চীৎকার করে পিছিয়ে গিয়ে) আরে কে তুই, কে তুই বল্ না, কি চাস, বল কি চাস্? (পা দাপিয়ে আবার) কে তুই রে কে তুই?

জগা।—বাবুজি আমি যে জগা!

পরমানন্দ।—কে তুই, বল না কে?

জগা।—(অ'স্তে সমুখে এগিয়ে গিয়ে) আমি জগা, বাবুজি রোজ অভিনয়ের সময়

পাঠ ভুলে গেলে, আমিই যে তোমায় মনে করিয়ে দি, আর তুমি আমায় একেবারে বিস্মরণ হলে!

পরমানন্দ।—(নিতান্ত নাচার ভাবে টুলের উপর বসে, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ও হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে) ত্রাহি মধুসূদন! কে তুই বল না। (নিরীক্ষণ করে দেখে) মাভৈঃ মাভৈঃ ওরে বুঝেছি, তুই হচ্ছিস জগাইনাথ! আচ্ছা জগ পরামাণিক এখানে কি করা হচ্ছে?

জগাই। বাবুজি, এই সাজঘরে আমি রাত কাটাই, দোহাই তোমার, কথাটি কারো কাছে ফাঁস ক'রো না! আমি আর কোথায় যাব বল? ঘর বাড়ী তো কিছুই নেই—এই আমার আস্তানা, আমার একমাত্র আশ্রয়।

পরমানন্দ।—জগাই এ যে তুই বটে, সে কথা এতক্ষণে বুঝলুম। একবার ভেবে দেখ দেখি, আজকের দর্শক মণ্ডলী আমাকে Encore করে, বার বার ষোল বার ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আমাকে দেখে তাদের আশ যেন আর মিটছিল না, কতগুলো গড়ে মালা চারিদিকে ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছিল, কত ফুল, কত কি, তার কি গোণাগুন্তি ছিল? উৎসাহে তারা ক্ষেপে উঠেছিল বল্লেও বেশী বলা হয় না! কিন্তু যখন সব হয়ে গেল, শেষ হ'ল, তখন কি একটি প্রাণীও আমায় জাগালে না, বুড় অসমর্থ মাতালটাকে বাড়ী এগিয়ে দেবার জন্যে এলো না! জগাই, বুড় হয়ে গেছি, একেবারেই বুড়, আটষট্টি বৎসরের অক্ষম রুগ্ন বুড়ো! আবার যে পথ চলি, আবার যে এগিয়ে যাই, সে সামর্থ্য আর কোথায়? (জগাইএর গলা ধরে কান্না) জগু, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না, আমি বুড়ো, আমি অথর্ব্ব, মরণ এগিয়ে আস্‌ছে বেশ জান্‌তে পারছি। হায় হায় কি হবে? কি ভয়ানক পরিণাম!

জগা।—(মমতা ও সম্মানের সঙ্গে) বাবুজি এস, বাড়ী চল—রাত অনেক হয়েছে, বাড়ী যাবার সময় হল যে!

পরমানন্দ।—বাড়ী যাব? ওরে আমার বাড়ী কোথায় যে যাব? বাড়ী নেই, ঘর নেই, কিছু নেই, কেউ যে নেই!

জগা—বাবুজি, তোমার বাসা কি ভুলে গেলে?

পরমানন্দ।—না। আমি সেখানে যাব না, কখনই না, কে আমার সেখানে আছে! ওরে আমার কেউ নেই, কেউ নেই. স্ত্রী নেই পুত্তুর নেই! আমি পতিত মাঠের উপরকার হঠাৎ বয়ে যাওয়া হাওয়া। চলে গেলে কেউ আর মনে রাখে না। ওরে একার মত দুঃখু নেই, কেউ যারে চায় না, হেসে কথা কয় না, আদর করে না, ঝুঁকে পড়লেও তুলে ধরে না, টলে পড়লে গড়িয়ে গেলেও হাতে ধরে নেয় না। আমি কার রে জগা? কে আমারে চায়, হায় কে ভাল বাসে! কেউ নারে কেউ না!

জগা।—(কাঁদতে কাঁদতে) বাবুজি থিয়েটার দেখতে দলে দলে যারা আসে, তারা সবাই যে তোমায় কত ভালবাসে।

পরমানন্দ।—তারা সবাই তো ঘরে ফিরে গেছে, সবাই তো আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে, এ বুড় বাঁদরকে আর কে মনে রেখেছে বল! ডুগডুগির তালে যতক্ষণ নেচেছিলাম ততক্ষণই ছিল আদর! আমাকে সত্যি কারো দরকার

নেই, কারো মমতা আমায় অনুসরণ করে না, না আছে আমার স্ত্রী পৃথিবী ভরা এত মানুষ জন, আর আমার একটি ছোট্ট ছেলেও নেই!

জগা।—বাবুজি দিন থাক্‌তে কাউকে ঘরে আনলে না, এখন ছেলে আসবে কোথা থেকে—এখন এ সব কান্নাই বৃথা!

পরমানন্দ।—তবু আমি মানুষ তো বটি, এখনও বেঁচে আছি যে! তাজা গরম রাঙা রক্ত আমার শিরায় ছুটে চলেছে, যার তার রক্ত নয়, একেবারে নিছক রাজ-বংশের—বঙ্গদেশের রাজতম বংশে আমার জন্ম, আমার আভিজাত্যের পরিচয় কি আর কাউকে বলে দিতে হয় জগাই? এমন জাহান্নমে যাবার আগে আমি যে আর একটা মানুষ ছিলাম—তীরের মত সোজা, দেবদারু গাছের মত সুশ্রী আর বাতাসের মত উৎসাহী! সে অতীত সুখের দিনগুলো গেল কোথায়? এই অন্ধকূপ, এই রসাতল পুরীইতো তাকে গ্রাস করে বসে আছে—আজ মুখে কথাটি নেই, স্নেহের এতটুকু ইঙ্গিতও কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে না। সব যে একে একে মনে উদয় হচ্ছে—পঁয়তাল্লিশ বৎসর অর্দ্ধশতাব্দি ঐখানে কবর দিয়েছি। সে কি জীবন জগা? আমি তোর মুখের মত তার প্রতি রেখা, প্রত্যেক বিন্দুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যৌবনের সেই নিরুপম উল্লাস, সেই আশা সেই উচ্ছ্বাস, সেই মোহ আর সেই ভালবাসা—রমণীর রমণীয় ভালবাসা!

জগা।—এখন শুতে গেলে, হ'ত না? রাত যে ভোর হয়!

পরমানন্দ।—সেই যে সময় রঙ্গমঞ্চের রাজা হয়েছিলাম, যৌবনের সব সৌন্দর্য্য চারিদিকে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, মনে পড়ছে তখন একজন নারী আমার অভিনয়ের জন্যে আমায় ভালবেসেছিল। সে কি সুন্দরী, সুকুমার দেহযষ্টিখানি তরুণ তরুর মত নম্র কোমল, কিশোরীবালা, নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক, স্বর্গ সুষমা অবিরত তার মনে বাস করত, তারি ছায়ায় তার চোখ দুটি আচ্ছন্ন থাক্‌ত, চৈত্র প্রভাতের মত সে বিচিত্র লীলাময়ী সুশোভনা ছিল, তার হাসির জ্যোৎস্নায় জীবনের অন্ধতম রাত্রিও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আজ তোর সামনে যেমন দাঁড়িয়ে আছি, একদিন এমনি নিকটে তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিনের মত অমন সুন্দর আর তাকে কখনো দেখিনি। সে একটিবার আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল, ওরে মুখের কথা নয়, চোখের অকৃত্রিম ভাষা, মরমের মমতা-বারতা! সে দৃষ্টি কে সৃষ্টি করেছিল? কখনো সে চাহনি ভুলিনি, কখনো ভুলতে পারব না, চিতাশয়নেও না, পরলোকেও না! স্নিগ্ধ, সুকোমল, সুগভীর উজ্জ্বল তরুণ দৃষ্টি! অনুপম আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে, অমৃত-মুগ্ধের মত, আমি জানুপেতে, করজোড়ে তার কাছে, আমার জীবনদেবতার কাছে, সুখের বরভিক্ষা করলাম—"সে শুধু বল্লে, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে এস, নটের ব্যবসা ত্যাগ কর।" রঙ্গমঞ্চ ছাড়তে হবে? ওরে বুঝলিনে, সে নটকে ভালবাস্‌তে পারে, বিয়ে করতে কখনো পারে না, আত্মসমর্পণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সেদিন যার চরিত্র অভিনয় করেছিলাম, সে একজন বিদূষক, তরলমতি চঞ্চল যুবক।

অভিনয় কর্ত্তে কর্ত্তে আমার চোখের

উপর হ'তে একটা পর্দ্দা যেন খসে গেল—আমি বুঝলাম, যে শিল্পকলাকে আমি পূজা করেছি, যাকে আমি দেব আরাধনার মত পুণ্যসাধনা মনে করেছি, সেটা কিছুই নয়, সে শুধু মায়া-ভ্রান্তি, নিষ্ফল স্বপ্নমোহ! আর আমি? সাধক নই, ভক্ত নই, পুরোহিত নই, আমি শুধু অপরের পদানত ক্রীতদাস, অপরের আমোদের উপায়মাত্র, অজানিত মমতা-রহিত জনতার ক্রীড়াপুত্তলি। আমি সেই মুহূর্ত্তেই আমার দর্শকদের বুঝতে পারলাম, তারপর হতে আর কখনো তাদের প্রশংসাবাদে আস্থা স্থাপন করিনি, তাদের পুষ্প-উপঢৌকন, উৎসাহের জয়ধ্বনি আমার মনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারেনি! সত্যি কথা জগাই, তাদের জয় জয়কারে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, আমার ছবি কিনে তারা ঘরে সাজিয়ে রাখে, তবুও আমি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত! তারা আমায় জানেনা, পদদলিত ধূলিরাশির মত সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। আমার সঙ্গে বসে, দুদণ্ড হাসি মস্করা করতে তাদের সবাই উৎসুক, তাই বলে, তাদের বোন কি মেয়েকে আমার সঙ্গে জীবন সম্বন্ধ পাতাতে দেবে, এমন কথা স্বপ্নেও কল্পনা করে না! সমাজগণ্ডীর বাইরে পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত জাতিচ্যুত আমি গৃহ-সীমায় স্থান পাবার যোগ্য নই। তাদের আমি বিশ্বাস করিনে, তাদের সহৃদয় ব্যবহারেও আমার মনে স্নেহের প্রত্যয় আনে না!

জগা।—বাবুজি, তোমার মুখ যে বড্ড ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—আমাকে একেবারে ভয় খাইয়ে দিলে যে, দোহাই তোমার পায়ে ধরি, এবার বাড়ী চল!

পরমানন্দ। সেই দিনই আমি সব চাতুরী বুঝতে পেরেছিলাম, শ্যামা শিবমোহিনী, মাগো, বড় বেদনার মধ্যেই জ্ঞানের জন্মলাভ হয়েছিল, জগা সেই দিন, যেদিন সেই মেয়েটি, তারপর; যাক তার কথা! তখন হতে আমার জীবনের লক্ষ্য চলে গেল, প্রত্যেক দিনই আমার অতীত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের কেন্দ্র হয়ে উঠল, ক্ষণিক আমার অনন্তকে গ্রাস করলে! আজকে ছেড়ে কালকের কথা আর আমার মনে স্থান পেত না! সেই সময় হতে আমি, বিদূষক আর অতি হীনচরিত্র সকলের অভিনয় করতে আরম্ভ করলাম; আমার মনের, আমার শক্তির ক্রমে ক্রমে বিনাশসাধন হ'ল। তবুও, একদিন আমি অতি প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলাম, অল্পে অল্পে আমার প্রকাশের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল, আমার সৌন্দর্য্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, মনুষ্যত্ব গেল, বাকী রইল শুধু ধার করা অস্তিত্ব, যাত্রার সং, নাটকের বিদূষক, রাজসভার বিট! সম্মুখের ঐ অন্ধকার অতল গহ্বরই রাক্ষসীর মত মুখব্যাদান করে আমার সমস্ত জীবনটা শুধু গ্রাস করেনি, পরিপাক করে বসে আছে! আজকের আগে সেকথা, আমি এমন ভাল করে বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ ঘুম ভেঙে উঠে সব কথা আমার মনে যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠল, এমন আর কখনো হয়নি! ফিরে চেয়ে, আমি যেন আমার সেই অতীত আটষট্টি বৎসরকে একে একে সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম। বুড় হয়ে যাওয়ার যে কি কষ্ট, বার্দ্ধক্য, জরা কি ভয়ানক! এই মুহূর্ত্তে বুঝলাম—সব গিয়েছে—আর বাকী কিছু নেই—

(কাঁদতে কাঁদতে) ওরে আর কিচ্ছুই নেই!

জগা।—বাবুজি থাক্, থাক্ কেঁদনা, কেঁদনা, দয়া কর, শান্ত হও। মেধো হরা এদিকে আয়!

পরমানন্দ।—কি শক্তি আমি ধরতাম, বিধিদত্ত সে ধন সাধনায়ও মেলে না। সে সৌভাগ্যের অর্জ্জন, অযাচিতে আসে, অমূল্য বলেই তার সমাদর আমরা জানিনে! আরে জগাই, তুই কি জানবি ভাষা কি হিল্লোলে অবাধে ভেসে চল্‌ত—কি করুণ কল্লোলে, কি সুমধুর ধ্বনিতে (বুকে হাত দিয়ে) প্রাণের তন্ত্রী কত অভিনব রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হত। মনে করতেও আমার নিশ্বাস আটকে আসে, শোন্ জগা, দাঁড়া একটু দম্ নিয়েনি। এইবার শোন দেখি—

দারা শেকো, সেই তার রক্ত-প্লুত ছায়া
ফিরে এসে, বিদ্রোহের দুরন্ত নিশ্বাসে
ছড়াইছে দাব দাহ! মৃত সাহাজাদা
জীবনের সিংহাসনে যাচে অভিষেক—
ব্যর্থ হবে আবেদন তার? বন্দীসম
সে কি কভু যাচিবে করুণা? যুবরাজ,
রাজ্যলোভে অপরের করিবে সাধনা?

বল্ তো রে কেমন বলেছি? দাঁড়া এবারে আর কিছু বল্‌ব—বর্ষার দুর্য্যোগ, ঘনঘোর তমিস্রা, বৃষ্টির আর অন্ত নেই, বজ্রনাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত, বিদ্যুৎ আকাশের আচ্ছাদনখানা ছেঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করছে—তারি মাঝে কাঁদ্‌ছে কে? কোন্ হতভাগ্য—রাজ্যচ্যুত রাজা!

প্রভঞ্জন, রুদ্র শঙ্খে পূরিতে নিশ্বাস
স্ফীত গণ্ড আজি তোর কেটে পড়ে যাক্,
প্রলয়ের প্রচণ্ড পিণাক বজ্রনাদ
করুক প্রচার, বরষার বাধাহীন
উদ্দাম প্লাবনে মগ্নহোক বসুন্ধরা,
লুপ্তহোক দেবতার নিকেতন যত;
গৃহ পারাবত সবে চলুক ভাসিয়া!
লৌহ-তন্তু চিন্তা জাল ছিন্ন করে-দেওয়া
বিদ্যুতের দীপ্ত করবাল সুশাণিত
হোক আরো, বারম্বার নির্ম্মম আঘাতে,
বাসবের ঐরাবত দৃপ্ত শুণ্ড ভরি
অবিরাম ঢালুক প্রপাত, পল্লবিত
অশ্বত্থের, মন্দিরের মণ্ডপের মত
প্রকাণ্ড শিখরে, পড়ুক ইন্দ্রের বজ্র,
বিজুলি শিখায় তারি দগ্ধ হোক মম
পলিত মস্তক, বিশ্বে অপস্মার আনা
ভীম বজ্রনাদে ধরণীর পূর্ণ গর্ভ
হোক ধরাশায়ী, লীলাময়ী প্রকৃতির
সব সৃষ্টি চূর্ণ হোক, অণু পরমাণু
যা দিয়ে গঠিত অকৃতজ্ঞ মানবের
সুন্দর শরীর, প্রতি পরমাণ তার
মিশাক ধূলার সনে চরণের তলে!

শুনলি ত জগচন্দ্র, কেমন শুনলি বল?

এবারে, এক মুখ হেসে একটু ভাঁড়ামি করা যাক্, দেখবি তাও কেমন যুৎ করে পারি!

"ওগো খুড়ো, শুকনো বাড়ীতে রাজসভার পতিতপাবন সলিল, পথে ঢলান এ নালার জলের চেয়ে ঢের ভাল। খুড়ো মশাই, অন্তঃপুরে ঢুকে কল্যাণী পুত্রবধূর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে আন, এ যে রাত—পণ্ডিত কি গণ্ডমূর্খ, কাউকে খাতির কর্ব্বে না!"

পেট যদি করে গড় গড়, আগুন উদ্গার তোল,
কুলকুচো কর বৃষ্টিধারা, ক্ষিতি, অপ তেজ আর
মরুৎ, আকাশ পুত্র কিম্বা কন্যা রত্ন নহে মোর
তাদের কৃতজ্ঞ হতে বলিব কেমনে? কোন জোরে?
রাজ্য ধন দিইনি তাদের,—বাছা বলে কোলে টেনে!

(হেসে জগাকে কোলের মধ্যে টেনে), বাহবা, বাহবা, Encore Encore—এর মধ্যে বৃদ্ধাবস্থা কোথা? কে বল্লে আমি বুড়? কখ্‌খনই না, কখ্‌খনো হব না।

বোকায় বুড় হয়! শক্তির প্লাবন আমার শিরায় শিরায় ছুটেছে, আরে এই ত জীবন, এই যৌবনের অনুপম উল্লাস। বার্দ্ধক্য আর ধীশক্তি একত্রে বসবাস করতে পারে না। জগা তুই যে একেবারে বোবা হলিরে! আচ্ছা সবুর কর, বুদ্ধিটাকে একটু ঘুরিয়ে আনি হরি বল, হরি বল, মধুময় রামনাম বল, গৌড়ানন্দ অদ্বৈত নিতাইকে স্মরণ কর!

আরে আর একবার শোন্—এমন ললিত সুকুমার, মন কেড়ে নেওয়া মধুকথা আর কখনো শুনেছিস? মরমের এমন মীড়, এমন দরদ-ভরা অশ্রুতে অভিষিক্ত বেহাগ?

অতি মৃদু ভাবে—

পাণ্ডু চন্দ্র অস্ত গেছে, কোথাও আলোক নাহি আর,
শুধু জাগে, নিবু নিবু নক্ষত্রের অগণিত দীপ
আকাশের প্রান্ত পথে, বনানীর নিভৃত আঁধারে
খদ্যোত শিহরি ফেরে, কম্পমান কিরণে তাহার
অশোকের নূতন অরুণ ধীরে অবারিত হয়,
চম্পকের বাসন্তী বাহার ফুল্ল হয়ে ওঠে আরো,
শুধু যার বুকের আলোক, তারি শান্তি নাহি আর,
ভীরু প্রেমিকের মত লাজ ভয়ে সারা হয়ে যায়।

দরজা খুলিবার আওয়াজ পেয়ে, ও কি শব্দ, ও কী শব্দ?

জগা।—বাবুজি হরি আর মাধু এল, তোমার যে দৈবী শক্তি আছে, সে কথা কে অস্বীকার কর্ব্বে? সেত সবাই জানে বল্‌তেও কসুর করে না।

পরমানন্দ।—(দরজার দিকে মুখ করে)—ওরে মেধো, ওরে হরা, আয় এদিকে, শুনবি আয়! (জগাইএর দিকে ফিরে), চল্ এবার সাজসজ্জা করা যাক্—আমি বুঝি বুড়? বলুক ত বুড় কার সাধ্যি বলুক তো আমায় দেখি। (উচ্চ হাস্যে) আরে জগা, কাঁদিস কেন? বুড়ি খুড়থুড়ি ঠান্‌দিদির চোখের জলের সাধনা তোরে সাজেনারে! কান্না আবার কিসের? দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে দুদিন পিছে বইত নয়—তবে আর পরোয়া কি! জগাই কেঁদনা, কেঁদনা দোহাই তোমার! আরে হাবা, অমন করে অবাক হয়ে চেয়ে রইলি কেন? ফিরিয়ে নে তোর চোখ, ফিরিয়ে নে! (জগাকে কোলাকুলি করে চোখের জলে) আরে ভাই কাঁদিস কেন? যেখানে ভাস্কর্য্য, চারুচিত্র, কাব্য প্রতিভার বসতি, সেখানে জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, স্থান পায় না। যমরাজকেও তার ভয়ে এগোতো হয়, মনীষার সতীত্বের সত্যবানের মত প্রতিভাবান চিরমৃত্যুহীন। (আবার কাঁদতে কাঁদতে) নারে জগা, যে মানছে না, সেত কেবলি বল্‌ছে, গেল গেল, সব গেল। ইহলোকের সম্বলহীন পরলোকের পাথেয় তার কোথায় সংগ্রহ হবে? আমার প্রতিভা, মেধা, মনীষা! হায় কতটুকুর আমি অধিকারী? কি ছিল কি আছে আজ আমার? আমি নিঙড়োন নেবুর মত, ফাটা বোতলের মত অকেজো! আর তুই জগাই, থিয়েটারের প্রম্পটার মূষিক, কুটুর কুটুর করে প্রম্পট্ করা তোর কাজ! চল এখন, (দুজনের প্রস্থান) ওরে আমি প্রতিভাশালী নই, রাজার বিদূষক, সে পদ রাখবার মত পদার্থও আর আমার নেই। অমর কবির ছত্রগুলো মনে পড়ে জগু?—

বিদায় প্রশান্ত চিত্ত, চিত্তের অভয়,
বিদায় সমর অশ্ব, নিত্য যুদ্ধ জয়,
দুরাশা যাহার আশে দৃপ্ত বলীয়ান,



"দিন যে যায় না কি করি!"
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

বিদায় অশ্বের হ্রেষা, উল্লাস উদ্দাম,
বিদায় মৃদঙ্গ মন্দ্র, দুন্দুভি আরাবে,
কর্ণে পশি, উচ্ছ্বসিত যাহার প্রভাবে
প্রত্যেক ধমনী মত্ত রুধির ধারায়
আলোড়িত, নেত্র জাগে উদ্দীপ্ত প্রভায়!
রাজেন্দ্রের বৈজয়ন্তী সুবর্ণ কেতন
বিদায়, বীরের গর্ব্ব আনন্দ মরণ!

জগা।—তুমি দেবতার অবতার, বাণীর বরপুত্র!

পরমানন্দ। আবার শোন—
যাও তবে, অম্বরে চন্দ্রমা, তবু প্রান্তর আঁধার,
পলাতক ক্ষিপ্রমেষ পান করি সুবর্ণ কিরণ,
আসন্ন ঝটিকা ডাকে তিমিরের তরঙ্গ অপার,
নিশীথের যবনিকা আবরিল তারা অগণন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিরহতপের শেষে

সেদিন বসন্তে যবে মদকল-পিকরবে
কানন কেলিল জাগি' মলয়ের শ্বাস,
রসাল মুকুল-মূলে, চম্পক বকুল ফুলে
কবরী কপোলে ছুটে মদিরা উচ্ছ্বাস।
সেদিন এলে না বঁধু সুগন্ধ পরাগ মধু
ঝরিয়া পড়িল উড়ি ধরণীর বুকে,
বসন্তের বিম্বাধরে প্রকৃতির গণ্ড পরে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে কিংশুকে।
তোমারি আশায় নাথ, জাগিনু চাঁদিনীরাত,
করি অঙ্গে দোললীলা লাবণ্যের ফাগে,
পরিয়া রতন টিপ, যতনে জ্বালিয়া দীপ,
অধর করিনু রাঙা তাম্বুলের রাগে।
কপোলে গোলাপী ভাতি, কুসুম শয়ন পাতি,
রাখিনু মালিকা গাঁথি, কাঁচুলী আঁচলে,
পর্ণপুষ্পভারনতা যেন পল্লবিনী-লতা,
তরুর বাহুটি খসি পড়িয়া ভূতলে।
যৌবনের তট টুটি' লাবণ্য পড়িছে ছুটি
তনু রোমাঞ্চিত ফুটি কদম্বের প্রায়,
সেদিন এলে না প্রিয়, সব কান্তি কমনীয়
জ্বলন্ত গরল হয়ে দহিল আমায়।

সহসা আসিলে যবে, দগ্ধ করি মনোভবে
তখন হরের কোপ দহেছে কানন।
শুষ্ক পত্র মরমরে প্রখর তপন করে
ঝলসি মলিন শীর্ণ ধরার আনন।
অশ্রুসিক্ত ছিন্নবাস, ধূসর চিকুররাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর হেয় পক্ষজঙ্গ,
ধূ-ধূ বেলা বালুকায় নিদাঘ তটিনীপ্রায়
নাহি রস কান্তি, সার কঙ্কাল।
তোমার দরশ লাগি' বিরহ যামিনী জাগি
মলিন কোটরগত অরুণ নয়ন,
নাহি ভূষা নাহি রূপ যেন দগ্ধপ্রায় ধূপ,
অনশনে তনু ক্ষীণ ভূতলে শয়ন।
সহসা আসিলে বঁধু নাহি সুধা, নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন, ভাষায়, ভূষণে।
গৃহে নাহি দীপ জ্বালা, গাঁথা নাহি বনমালা,
নাই লাবণ্যের থালা—বরিব কেমনে?
বিরহ তপের শেষ! এসো এসো হৃদয়েশ!
এস নীলকণ্ঠ মোর, মানস-মোহন!
অনলে দহিলে প্রভু তাই ভস্মমাখা, তবু,
তার মাঝে আছে হৃদি-হেম সিংহাসন।

শ্রীকালিদাস রায়।

সৌধ-রহস্য

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গেব্রিয়েল ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া দৃঢ় অনুজ্ঞা-ব্যঞ্জক স্বরে তিনি কন্যাকে আদেশ করিলেন, "ঘরে যাও।" কন্যা চলিয়া গেল। গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া যতক্ষণ তাহার শ্বেতবস্ত্রের প্রান্তটুকু দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। গেব্রিয়েলের ছায়ার চিহ্ন অবধি যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল, তখন সহসা তিনি এমনভাবে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন যে, ভয়ে আমি দুই পা পিছু হঠিয়া হস্তস্থিত লাঠিটাকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলাম। ক্রোধে তাঁহার গলার শিরগুলা পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বর বদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, কম্পিত স্বরে তিনি কহিলেন, "কি সাহসে তুমি আমার বাড়ীর মধ্যে এসেছ? তুমি কি ভেবেছ যে, এই এত বড় বেড়াটা আমি দিয়ে রেখেচি, এ শুধু বাইরের কতকগুলো নিষ্কর্ম্মা হতভাগা —ছোট লোককে জড় করবার জন্য? এখনি তোমায় রীতিমত শিক্ষা দিতাম, কিন্তু দিলাম না। মানে মানে বাড়ী যাও—খবরদার—আমার বাড়ীর দিকে আর এক পা বাড়িয়ো না। দেখেছ—"কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পকেটের ভিতর হইতে একটা পিস্তল টানিয়া বাহির করিলেন, কহিলেন, "যদি তুমি বেড়ার ফাঁক দিয়া আমার জমির ভিতর এতটুকু পা বাড়াতে, তাহলে এই যে পিস্তল দেখচ, এর গুলিতে আজ তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম। এটা বদমায়েসের আড্ডা নয়—চামড়া কালো হো'ক আর সাদাই হো'ক—তোমার মত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা আমার দস্তরমত জানা আছে!"

সে অবস্থায় যতখানি সম্ভব, শান্ত ভাব দেখাইয়া সংযত স্বরে আমি বলিলাম, "আমি আপনার কোন অনিষ্ট করতে আসি নি, করিও নি—কি জন্য যে আপনি আমায় এমন গালি গালাজ করছেন, তাও জানি না। যাই হোক, মশায়ের হাত যে রকম কাঁপচে আর বন্দুকটা আমার বুকের উপর যেভাবে ধরে আছেন, তাতে হঠাৎ আওয়াজ হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য্য নয়। বন্দুকটি সরিয়ে নিন্। না হলে এই লাঠিটা আপনার হাতে পড়তে দেরী হবে না।"

অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে বৃদ্ধ তখন প্রশ্ন করিলেন, "কি জন্য তাহলে—তুমি এখানে এসেচ? বোধ হয়, সহরে যাবার রাস্তা ভুল করে—এখানে আসনি? তোমাদের জ্বালায় ভদ্রলোক কি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার বাড়ীতেও বাস করতে পাবে না? পরের বাড়ীতে উঁকি ঝুঁকি দেওয়াটাই বা কি রকম ভদ্রতা!"

গম্ভীরভাবে আমি উত্তর দিলাম, "না, না, আমি উঁকি ঝুঁকি দিতে এখানে আসিনি। আপনার কন্যা গেব্রিয়েলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এসেছিলাম,—আরও অনেকবার আমাদের মধ্যে দেখা-শোনা হয়েছে। তাঁর অসাধারণ সদ্‌গুণে আমি মুগ্ধ হয়েচি। তিনি আমার বাক্‌দত্তা—"

যে আসন্ন ভয়ানক ঝটিকাঘাত সহ্য করিবার জন্য আমি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলাম, তাহার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া তিনি যেন অনেকটা অবাক হইয়াই আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বেড়ার গায়ে ভর দিয়া আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ইংলিস্ টেরিয়ার কুকুরগুলো কেঁচো খুঁড়তে ভারী ভালবাসে, যখন তাদের আমরা ভারতবর্ষে নিয়ে গেছলাম, তখন তারা সেখানে গর্ত্ত দেখ্‌লেই কেঁচোর গর্ত্ত মনে করে খুঁড়তে যেত—একদিন ঐ রকম একটা গর্ত্ত খুড়তে গিয়ে সাপ্ বেরুল। সেইদিন থেকে বেচারারা আর সে-মুখো হত না। আমার বোধ হয় তোমার অবস্থা তাদেরই মত, কোন তফাত নেই!"

অত্যন্ত ঘৃণার স্বরে আমি উত্তর দিলাম, "অকারণে আপনার কন্যার নিন্দা করবেন না।"

তাচ্ছল্যের সহিত আমার দিকে চাহিয়া পিস্তলটা পকেটে রাখিতে রাখিতে জেনারেল উত্তর দিলেন, "না, গেব্রিয়েল ঠিকই আছে, তাকে আমি কিছু বল্‌চি না,—কিন্তু আমাদের বংশ এমন নয়—যে, যে সে কোন যুবা পুরুষকে বিয়ে করতে পারে।—আচ্ছা বাপু, নিজেদের সম্বন্ধে তোমরা যে মনে মনে এমন একটি সুবন্দোবস্ত করে ফেলেচ, আর সে সম্বন্ধে আমায় এতটুকুও জান্‌তে দাওনি—এর মানেটাই বা কি শুনি?"

উপস্থিত ক্ষেত্রে সকল কথা খুলিয়া বলাই ভাল ভাবিয়া আমি তাঁহাকে ধীর ভাবে কহিলাম, "তার কারণ, শুধু ভয়। আমরা ভয় করেছিলাম আপনাকে সব কথা জানাতে গেলে, হয়ত বিপরীত ফল হবে। আপনি আমাদের দুজনকে তফাৎ করে দেবেন—হতে পারে, আমরা ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন বিষয় স্থির করবার আগে আমার এইটুকু অনুরোধ যে আপনি শুধু এইটুকু দেখবেন, আপনার বিচারের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখই নির্ভর করচে। আমাদের দেহকে আপনি পৃথক্ করতে পারেন, কিন্তু হৃদয়কে পারবেন না।"

ঈষৎ নম্রস্বরে জেনারেল উত্তর দিলেন, "থাম, বাপু থাম।—তুমি পাগল,—কি যে বল্‌চ, তা তুমি নিজেই জান না! হিথারষ্টণ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা, তুমি কেন, —সকলের পক্ষেই অসম্ভব। তাতে যে প্রতিবন্ধকতা আছে, সে প্রতিবন্ধকতা কখনই দূর হবার নয়।"

জেনারেলের মুখ হইতে রাগের ভাব একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে একটু ঘৃণা-মিশ্রিত আনন্দের ক্ষীণ হাসি তাঁহার কুঞ্চিত ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার সে বাক্যে ও ভাবে তৎক্ষণাৎ আমার আহত বংশ-মর্য্যাদা অন্তর-মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মতই কঠিন স্বরে আমি উত্তর দিলাম, "যে প্রতিবন্ধক আপনি মনে করচেন—তার জন্য ভাবনা নেই,—যদিও নির্জ্জন পল্লীতে এসে আমরা বাস করচি, তবুও খুব সম্মানিত উচ্চবংশেই আমার জন্ম,—আর আমার মা? বুদাণের বুকাণদের মেয়ে তিনি। না বুঝে আমি অন্যায় প্রস্তাব আপনার কাছে করিনি।"

"তুমি বুঝ্‌তে পারনি, মিঃ জন্, বুঝ্‌তে

পারনি, প্রতিবন্ধকটা তোমার তরফ থেকে নয়, সেটা আমার তরফ থেকে। আমাদের বংশে এমন কোন প্রতিবন্ধক আছে, যাতে আমার মেয়েকে চিরকুমারী হয়েই থাকতে হবে। তাকে বিয়ে করলে তোমার কোন সুবিধা হবে না—" বাধা দিয়া সবেগে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "কিন্তু—আমার ভাল-মন্দর বিচার বোধ হয় আমিই ভাল করতে জানি। আমি জোর করে বলচি—তাকে বিয়ে করবার অনুমতি পাওয়ার কাছে পৃথিবীর অপর কোন সুবিধা-অসুবিধাকেই আমি গ্রাহ্য করি না। গেব্রিয়েলকে বিয়ে করতে পেলে আমি কোন অভাব, কোন কষ্ট বিপদকেও ভয় করব না। শুধু আপনার কাছে আমার এই মিনতি—এই প্রার্থনা, যে, আপনি আদেশ দিন।" অবিশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিয়া জেনারেল বলিলেন, "তুমি যে ভারী সাহসী দেখচি হে বাপু! বিপদকে তুচ্ছ করাটা খুবই সহজ—যতক্ষণ না জানা যায় যে, সে বিপদটি কি?"

"আপনি আমায় পরীক্ষা করে দেখুন। বলুন, সে কি বিপদ! গেব্রিয়েলের জন্য সহ্য করতে পারব না, এমন বিপদ আমি ত কিছু কল্পনাও করতে পারি না।"

"না! না—তা হয় না!" বলিয়া বৃদ্ধ যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে আত্মগত বলিলেন, "ছেলেটি দেখচি বুদ্ধিমান—আর নেহাৎ ছেলে মানুষও নয়—সাহসও আছে দেখচি, একে আমাদের সঙ্গে না রাখলে খারাপই হবে!"

পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ওয়েষ্ট, —আমি যদি তোমায় ইতিপূর্ব্বে কোন রূঢ় কথা বলে থাকি ত আমায় ক্ষমা কর। এই দ্বিতীয় বার আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—আমার বিশ্বাস, এ রকম ঘটনা আর হবে না। কি জান, আমি সকল জিনিষেরই ভিতর অবধি তলিয়ে দেখতে চাই। তার কারণ, আমি নির্জ্জনতাটার কিছু বেশী পক্ষপাতী। আর এ স্বভাব—বা ইচ্ছা—আমি কখনও বোধ হয় ত্যাগ করতে পারব না। সত্য হোক, আর মিথ্যাই হোক,—আমার মাথায় একটা খেয়াল ঢুকেচে এই যে, আমার জমির উপর এক দিন একটা বড় রকম ডাকাতী হবে আর যদি বাস্তবিকই তা হয়—আমি কি সে সময় তোমার সাহায্য পাবার আশা রাখতে পারি?"

বর্ষায় ঝটিকা জল ও মেঘের মিলনে যেমন একটা দারুণ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আমার মনের মধ্যেও তেমনি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিত্যের একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এই বৃদ্ধ,—কয়েক মিনিট পূর্ব্বে—যাঁহার ক্রুদ্ধ মুখ, রুদ্র রোষানল—বজ্রের ন্যায় আমায় ভস্ম করিতে চাহিতেছিল, বর্ষার ঘন ঘোর মেঘ সঞ্চিত জল ধারার মতই এখন তাহা এমন শীতল হইয়া গেল! তিনি আমারই সাহায্যপ্রার্থী! এ এক দারুণ সমস্যা! তাহা অমীমাংসিত রাখিয়া দিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমি উত্তর দিলাম. "নিশ্চয়—সর্ব্বান্তঃকরণে।"

"আচ্ছা! মনে কর,—যদি এমন হয়—কোন দিন মাঝ রাতে আমি খবর পাঠাই যে, "ওয়েষ্ট" অথবা "ক্রমবার"—তাহলে তুমি আসবে কি?"

"নিশ্চয়ই আসব! কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—কি রকম বিপদের আপনি আশঙ্কা করচেন?"

"না, না, সে সব জেনে তোমার কোন লাভ নেই। আর যদি আমি সব কথা তোমায় বলি,—তাহলেও তুমি কিছু বুঝতে পারবে না, বেশ,—এখন তাহলে বিদায়—অনেকক্ষণ আমি তোমার কাছে এসেচি,—মনে রেখ, ওয়েষ্ট, তোমায় আমি আজ থেকে ক্রমবারের একজন রক্ষী বলেই মনে করব।"

বাড়ীর দিকে তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আমারও একটি প্রার্থনা,—আমার জন্য বাধ্য হয়ে আপনার কন্যা আপনার কাছে যে গোপনতা করেছে, তার সে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

মর্ম্মস্পর্শী মৃদু সকরুণ হাসি হাসিয়া অত্যন্ত ধীরভাবে কোমল স্বরে জেনারেল উত্তর দিলেন, "আমার সংসারে আমি অবশ্য একজন ভয়ানক দৈত্য-টৈত্যর মত কিছু নই। দেখ বাপু, তোমায় আমি বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিচ্চি, এই অসম্ভব দুরাশার তুমি এখানেই শেষ কর।—আর যদি একান্ত তাতে অক্ষম হও—তাহলে অন্ততঃ—এখন, এখন একেবারেই এ ইচ্ছা চেপে রাখ। ঘটনা-চক্র কোন্ দিকে যাবে, সে কথা ত কিছুই বলা বলা যায় না, তবে বিদায়—।"

জেনারেল চলিয়া গেলেন। আমার মনের মধ্যে পাষাণ-খণ্ডের মত চিন্তার যে দারুণ ভার চাপিয়া বসিয়াছিল—তাহার তীব্র বেদনায় আমার যেন নিশ্বাস অবধি রোধ হইবার উপক্রম করিতেছিল। জেনারেলের এ আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে আমার মনে তখন যে ভাব হইয়াছিল আমি নিজেই তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছিলাম না,—এই যে বেদনা, ইহা সুখের, না দুঃখের? এই ঘটনার পর গেব্রিয়েলের সহিত সাক্ষাতের আশা—একান্তই দুরাশা! তবু তিনি আমায় আশা রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন! প্রেমের স্বপ্ন সুখের বটে, কিন্তু স্বপ্ন বাস্তব নহে! তাহা সুখের ছলনামাত্র। জীবনে স্বপ্নাপেক্ষা বাস্তবই মানবের প্রিয়। এত দিন আমরা স্বপ্ন-জগতে ছিলাম, সে স্বপ্নে সুখ ছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা বিমান-প্রাসাদের মত পতনোন্মুখ! জাগ্রতে সুখ-স্বপ্ন টুটিয়া গেলেও এখন একটা অবলম্বন মিলিয়াছে,—মোটের উপর অবস্থাটা ভালই বলিতে হইবে।

কিন্তু এই যে বিপদ?—ছায়ার মত আধার-হীন—অব্যক্ত বিপদ? জেনারেল বলিয়াছেন, "যদি সব কথা তোমায় খুলিয়া বলি তথাপি বিপদটা যে কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না!" ঠিক! প্রথম আলাপে মরডণ্টও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল।—কিন্তু কি—এ-বিপদ,—যাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না? এই বচনাতীত, অব্যক্ত বিপদ,—কি সে?

রাত্রে নিদ্রার জন্য শয়ন করিলাম—তখনও সেই চিন্তা। সম্মুখে আমারই অন্তরের অন্ধকারের মত দিগন্ত-প্রসারিত অসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে যে নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতি দৃষ্টি হইতেছিল, আমার হৃদয়ে তেমনি আশার ক্ষীণ আলোক আছে কি? বুঝি, আছে! আশা নহিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না,—অন্ধকারের দিকে হস্ত ক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিলাম, গেব্রিয়েল! আমার গেব্রিয়েল! মানুষিক, অমানুষিক, এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমার হৃদয় হইতে তোমার ঐ পবিত্র দিব্য মূর্ত্তি টানিয়া ফেলিতে পারে! (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি ?

খাদ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, স্তন্যপায়ী জীবসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১ম) মাংসাশী ; (২য়) নিরামিষাশী, ইহার মধ্যে আবার দুইটি উপশ্রেণী আছে—(অ) তৃণভোজী ; (আ) ফলভোজী। তৃণভোজী জন্তুদের মধ্যে হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, মেষ, মৃগ, শশক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা তৃণপত্র, বৃক্ষের বল্কল, লতা প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের খাদ্যে সারাংশ খুব কম আছে বলিয়া ইহাদের খুব বেশী না খাইলে চলে না। এই কারণে ইহাদের পাকাশয় অন্যান্য জন্তুদের তুলনায় বৃহৎ এবং অধিক ধারণক্ষম। ফলভোজী জন্তুরা, যেমন কাঠবিড়াল, বাঁদর প্রভৃতি, শস্য ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। শস্য ও ফলে তৃণপত্রাদির অপেক্ষা অধিক সারভাগ থাকায় ইহাদের খাদ্য পরিমাণে খুব অধিক আবশ্যক করে না এবং সেই কারণে ইহাদের পাকাশয়াদি তৃণভোজীদের তুলনায় খুব বেশী বড় নহে। গরু মহিষাদির অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধির ভাগ বেশী হওয়ায় এবং হাত দিয়া ধরিবার সামর্থ্য থাকায় ইহারা তৃণভোজী পশুদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। মিশ্রভোজী জীবগণ (কতকগুলি ফলভোজীও ইহাদের অন্তর্গত) বিশেষ বুদ্ধিশালী এবং হস্তবিশিষ্ট হওয়ায়, নিরামিষ ব্যতীত কিয়ৎপরিমাণে আমিষ খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারে। কাঠবিড়াল প্রধানতঃ শস্যজীবী হইলেও সময় বিশেষে পোকাটা মাকড়টা যে না খায় এমন নহে। মর্কটদিগের মধ্যেও এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে, যাহারা মর্কটের স্বাভাবিক খাদ্য ফলমূলাদি ছাড়া, পোকা মাকড়, ছোট ছোট পাখী, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতির ডিম পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, স্তন্যপায়ী জীবদের যে তিনটি শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মানুষ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত? প্রকৃতির নির্দ্দেশানুসারে, মানুষকে মাংসাশী, না নিরামিষাশী না আমিষ-নিরামিষাশী বলা সঙ্গত? অন্যকথায়, কোন্ খাদ্য মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে হয়? প্রকৃতি মানুষকে যে ভাবে সৃজন করিয়াছে, তাহাতে মিশ্রখাদ্যই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে হয়। কেন হয়, তাহা বুঝিতে গেলে, মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসটা একবার আলোচনা করা আবশ্যক। মর্কট হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে; দার্ব্বিন (Darwin) ওয়ালেস্ (Wallace) প্রভৃতির কৃপায় তাহা সকলেই অবগত আছেন। শুধু তাহা নয়, যে মর্কটবংশে মানুষের জন্ম, তাহার সহিত বর্ত্তমানকালের গোরিলা, ওরাং, সিম্প্যান্জি, গিবন্ প্রভৃতি মর্কটদিগের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ স্থলে কেহ যদি এমন অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান ওরাং, সিবন্ প্রভৃতির যাহা স্বাভাবিক খাদ্য, মানুষের পূর্ব্বগামী মর্কটদিগের খাদ্যও অনেকটা সেইরূপ ছিল, তাহা হইলে অনুমানটা যে একবারে অসঙ্গত, বোধ করি, জোর করিয়া এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। এই অনুমানের অনুকূলে আরও একটি প্রবল যুক্তি আছে। সে যুক্তিটি হইতেছে এই যে মানুষের পাকাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি পাক-যন্ত্রে আর একটা গিবনের পাক-যন্ত্রে বড় বেশি পার্থক্য থাকিতে দেখা যায় না—অনেকটা এক রকম বলিয়াই বোধ হয়। ওরাং, গিবন্, সিম্প্যাঞ্জি প্রভৃতি বানরগণ স্বাভাবিক স্বাধীন অবস্থায় কি খায়, না খায়, তাহা জানা খুবই আবশ্যক, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা জানা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কারণ ইহারা এত লজ্জাশীল ও সন্দিগ্ধমনা যে মানুষ দেখিলেই তাহাদের স্বাভাবিক আচরণের ব্যতিক্রম না ঘটিয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে প্রধানতঃ শস্য ও ফল মূলভোজী বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু সময় বিশেষে ইহারা কচিপাতা, টিক্‌টকি, পাখী পতঙ্গ প্রভৃতিও যে না খায় এমন নহে। তাহা যদি হয়, তবে আমরা অবাধে একথা বলিতে পারি যে, মানুষ যে মর্কটবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ নিরামিষাশী হইলেও, আমিষ যে একবারে স্পর্শ করিত না, এমন নহে।

বনমানুষ হইতে মানুষের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ঠিক নাই; তথাপি বর্ত্তমানকালে আমরা যে সব আদিম বর্ব্বর জাতি দেখিতে পাই, তাহাদের খাদ্য আর একটা গোরিলা কি সিম্প্যান্জির খাদ্যে খুব যে বেশি তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সব আদিম বর্ব্বর মনুষ্য বনমানুষেরই মত বনজাত ফলমূল, শস্যপত্র প্রভৃতি এবং শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা কৃষিকার্য্যও জানে না এবং গো, মহিষাদি পশুপালনও করে না। ইহারা এমন দুর্গম স্থানে বসবাস করে যেখানে সভ্যজাতির গমনাগমনের অল্পই সম্ভাবনা। সুতরাং সভ্যজাতির সংস্পর্শে তাহাদের ব্যবহারাদির যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। ইহারা এতকাল পর্য্যন্ত তাহাদের আদিম মৌলিক বর্ব্বরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যে বানর-কুলে মানুষের জন্ম, আজ আর তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই সত্য, তথাপি, বানর হইতে উৎপন্ন হইয়া মানুষের অবস্থাটা কিরূপ ছিল, আজকালকার বর্ব্বর জাতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার কতকটা আভাষ যে না পাওয়া যায় এমন নয়। ইহাদের খাদ্য কিরূপ, তাহা জানিতে পারিলে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য বিষয়ে বিচার করা, অনেকটা সহজ হইবার কথা। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, আদিম বর্ব্বর জাতিদের খাদ্যের অর্দ্ধেকটা আমিষ, বাকিটা নিরামিষ। অবশ্য এমন অনেক বর্ব্বর জাতি আছে, যাহাদের খাদ্যে নিরামিষ অপেক্ষা আমিষেরই ভাগ অধিক থাকিতে দেখা যায়। এস্কুইনোক্স্ (Esquinoax) নামক অসভ্য জাতি প্রধানতঃ আমিষ খাইয়াই জীবন

ধারণ করে, তাহার কারণ, তাহারা যেখানে বাস করে, সেখানে উদ্ভিদ্ জন্মাইতেই পারে না। আবার ক্যালিফোর্ণিয়া দেশে এমন অনেক আদিম জাতি আছে, যাহাদের খাদ্যের ৬ ভাগ নিরামিষ, বাকিটা আমিষ। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে আদিম বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ কোন কালেই খাঁটি নিরামিষাশী ছিল না। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল নিরামিষ আহার মানুষের পক্ষে যেন স্বাভাবিক হইতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে মিশ্রভোজী করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ প্রকারই চেষ্টা করিয়াছে।

মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে যে সময় মানুষ চাষবাস জানিত না, সে সময় কেবল ফলমূলাদির উপর নির্ভর করিয়া, মানুষের একদিনও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। অরণ্যজাত ফলমূলাদির অধিকাংশই সে সময় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। ইহারা হয় বিষাক্ত, নয় এত কটু, তিক্ত কষায় দোষবিশিষ্ট কিম্বা এত দৃঢ়তন্তু-বিশিষ্ট ছিল যে স্বাভাবিক অবস্থায় কেহই তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে খাদ্যের জন্য মানুষকে জীব-জগতের উপর বড় কম নির্ভর করিতে হয় নাই। ইহার পর মানুষ যখন আর একটু সভ্য হইল—অথচ এত সভ্য হয় নাই যে, চাষ করিতে শিখিয়াছে,—সে সময়, সে বিষাক্ত কঠিন-তন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্যকে নানা কৌশলে পরিশোধিত করিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। জলে ভিজাইয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, আগুনে ঝলসাইয়া, এইরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, সে অখাদ্য উদ্ভিজ্জ পদার্থকে খাদ্য করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু তবুও তাহা যথেষ্ট হইল না—পশু শিকার করিয়া ও মৎস্য ধরিয়া, তাহাকে খাদ্যের অভাব পূর্ণ করিতে হইত। চাষ আবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে শুধু নিরামিষের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না; সে সময় মানুষের খাদ্যে আমিষের ভাগই অধিক ছিল এবং তাহার জন্য শিকার ও মৎস্য ধরাই তাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। আগুনের ব্যবহার ও রন্ধন-কৌশল শিক্ষা করার পর হইতেই তাহাদের খাদ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রবেশ করিতেছিল সত্য কিন্তু তখনও তাহার প্রধান খাদ্য ছিল আমিষ, নিরামিষ নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষের পূর্ব্বগামী বানর-গণের প্রধান খাদ্য ছিল ফলমূল। তাহা হইলে দাঁড়াইল কি? এই দাঁড়াইল যে, আদিমতম বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ প্রধানতঃ নিরামিষাশী ছিল; তাহার পর তাহার খাদ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।—যে দিন হইতে মানুষ অগ্নির ব্যবহার শিখিল সে দিন হইতে তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষ আর বাড়ে নাই বটে, কিন্তু তখনও পশু শিকারই তাহার প্রধান জীবিকা ছিল; তারপর যেদিন হইতে সে চাষ করিতে শিখিল, সে দিন হইতেই আর তাহাকে শিকারী মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না; তখন হইতে সে বনে বনে বিচরণ করিয়া না বেড়াইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিয়া, দস্তুর মত চাষী হইয়া পড়িল।



সচকিতা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই অঙ্কিত চিত্র হইতে

তাহা হইলে আমরা এই দেখিলাম যে যে সময় মানুষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইত, তখন আমিষই তাহার প্রধান খাদ্য ছিল—এবং সে সময় আমিষই তাহার উপযুক্ত খাদ্য ছিল। কেননা খাদ্যের জন্য যে সময় নিয়ত ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় অধিক শ্রম-বশতঃ সে সময় আমিষ জীর্ণ করা ও দেহজাত করা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। মাংসাশী পশুরা যে অবাধে অত মাংস হজম করিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ, খাদ্যের জন্য তাহাদের অনেকটা ছুটাছুটি করিতে হয় বলিয়া। একটা বিড়ালকে নড়িতে চড়িতে না দিয়া এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া যদি সুধু মাংস দিয়া রাখা যায় তাহা হইলে এই দেখা যায় যে বিড়ালটির মোটেই মাংস সহ্য হয় না। অথচ স্বাধীন অবস্থায় সে ততখানি মাংস অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই—মানুষের প্রকৃত খাদ্য কি? কেবল আমিষ, না কেবল নিরামিষ, না উভয়ই? মিশ্র খাদ্যই যে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য সে বিষয়ে সন্দেহই নাই,—তবে কতটা আমিষ, কতটা নিরামিষ খাওয়া উচিত—তাহা অনেক গুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

"চিঠি কই"

আজি এ বাদল দিনে হেন আশা নাই
আসিবে পথিক কেহ, কোন যে অতিথি,
তবু দুরু দুরু বুক ফিরে ফিরে চাই,
যদি আসে চিঠিখানি পরবাসী-প্রীতি!

গুঁড়ি গুঁড়ি ঝরে জল, বাতাস শিহরে,
ঘুরিতে ছাড়ে না তবু আঁধার কাননে,
পাখীর নাহিক সাড়া, হরিণী কাতরে
দোর মাঠের লাগি ডাকে ক্ষুণ্ণ মনে!

বাকি-বেশ হরকরা ভিজে ভিজে আসে,
দেখা পড়ে না চোখে, আশা-দুখে-মেশা
কালো লালে বাঁধা তার পাগড়ি বিকাশে
দুরাশা আঁধারে রাঙা বাসনার নেশা!

চিঠি আসে, চিঠি আসে! ওঠে আর পড়ে
হিয়ার শোণিত, দৃষ্টি কেন ছুটে নেয়?
নিশ্বাস পড়ে না, হায় কোন ক্লান্তি ভরে
নিতে গিয়ে ব্যগ্র হাত সব ফেলে দেয়?

কোথা তার হাতের আখর? ভারে ভারে
মাসিকে দৈনিকে এল দুনিয়ার কথা!
আকাশে আলোর আশা গেল একেবারে,
ভাঙিয়া নামিল মেঘ, মুক্ত আকুলতা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ

(A Practical Bengali Grammar by W. S. Milne I. C. S.)

বাঙ্গালীতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখেন না, লেখেন শুধু ইংরাজে। কথাটা হঠাৎ শুন্‌তে একটু খট্‌কা লাগলেও মিছে নয়। বাঙ্গলার নবপ্রকাশিত মাসিকপত্র "ভারতবর্ষে" প্রকাশ যে "ব্রেসি হালহেডের প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বাঙ্গলাদেশে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন।" ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক হুগলিতে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি W. S. Milne আর একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালীর হাত থেকে অবশ্য অসংখ্য শিশুবোধ ব্যাকরণ বেরিয়েছে, কিন্তু যতদূর আমার জানা আছে তার একখানিও বঙ্গভাষার ব্যাকরণ নয়। সে সকল বইয়ের উদ্দেশ্য আমাদের ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাধীন করা। কারণ এই শ্রেণীর বঙ্গ-বৈয়াকরণিকদিগের বিশ্বাস যে "যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে এবং কহিতে পারা যায় তাহার নাম ব্যাকরণ।" বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে যে বাঙ্গলাভাষায় কথা কইবার জন্য কোনরূপ "শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ" করতে হয় না—এ সহজ সত্যটি আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই নে। কাযেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে পদ এবং বাক্যের গঠনের নিয়ম, "বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি নির্দ্ধারণ" করা, এ ধারণা আমাদের জন্মায় না।

আমাদের পক্ষে চলাফেরা কর্‌বার জন্য যেমন নিজ নিজ দেহযন্ত্রটির গঠন জানবার কোনরূপ আবশ্যকতা নেই, তেমনি মাতৃভাষা লেখবার এবং বলবার জন্য সেই ভাষাযন্ত্রটির গঠন জানা আবশ্যক নয়। ঐ যন্ত্রটি বিগ্‌ড়ে গেলে তার মেরামত কর্‌বার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র কাজে লাগে। আমরা যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষাই বিশুদ্ধ বাঙ্গলাভাষা। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে, সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে, পণ্ডিতদের হাতে-গড়া কোনও ভাষা তার চেয়ে বেশি শুদ্ধ হতে পারে, সাধু হতে পারে, কিন্তু সে ভাষা বঙ্গভাষা নয়। লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এই কৃত্রিম শুদ্ধাচারের প্রতি অতিভক্তি-বশতঃ, দেশাচার লোকাচার এবং কুলাচারের জ্ঞান আমরা হারাতে বসেছি। বাঙ্গলা যে প্রায়-সংস্কৃত ভাষা নয়, কিন্তু একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ভাষা, এ জ্ঞান না থাক্‌লে বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখবার প্রবৃত্তিও হয় না, লেখাও যায় না। এই কারণে আমরা বাঙ্গলা ব্যাকরণ লিখিও না, পড়িও না।

কিন্তু বিদেশীর পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত কর্‌তে হলে, তার মূল প্রকৃতি এবং গঠনের নিয়ম জানা দরকার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত বিদেশীর পক্ষে ভাষাজ্ঞান বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

হালহেড সাহেব যে ঐ কারণে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, তা তাঁর

ভারতবর্ষ-ধৃত বচন থেকেই জানা যায়। সে বচন এই :—

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদংগ্রেজি"।

তারপর অবশ্য স্কুলপাঠ্য বহুতর বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত সেই সকল বই থেকে লিখিত ভাষার জ্ঞান কতকটা জন্মালেও, খাঁটি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই Milne সাহেব এই নূতন ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে"—When studying Bengali I found myself greatly hampered by the want of a Grammar dealing with the colloquial idioms of the modern language. In this book an effort has been made to present to the English student those peculiarities of idiom which are likely to cause difficulties."

যদিচ মুখ্যতঃ ইংরাজের জন্যই এই ব্যাকরণ লেখা হয়েছে, তবুও প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বইখানি পড়া উচিত। বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙ্গলা ব্যাকরণ যে রচনা করা উচিত, এ ধারণা আজকাল বহুলোকের মনে জন্মেছে। কেউ কেউ আংশিক ভাবে বাঙ্গলা ভাষার গঠনের নিয়ম আবিষ্কার কর্‌বার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু মিল্‌ন্ সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ইতিপূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত, অপর কোনও বঙ্গলেখক এরূপ ব্যাকরণ লেখবার চেষ্টামাত্রও করেছেন বলে আমার জানা নেই।

রামমোহন রায়ের "গৌড়ীয় ভাষা-ব্যাকরণ" স্কুলবুক সোসাইটির অনুরোধে লিখিত হয়। "পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনর্দৃষ্টির সাবকাশ পান নাই।" ফলে "গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণে" যদিচ রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পত্রে পত্রে পাওয়া যায়, তবুও সাধারণ শিক্ষার্থীদের তা বিশেষ কাজে লাগে না। কারণ তা প্রথমতঃ উপক্রমণিকা মাত্র, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসকল, একালের বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। রামমোহন রায় কেবলমাত্র সত্তরখানি পাতায় বাঙ্গলা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন,—মিল্‌ন্ সাহেব প্রায় ছয়শ' পাতায় বাঙ্গলা ব্যাকরণের নিয়মগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। সম্ভবতঃ রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ মিল্‌ন্ সাহেবের হাতে কখন পড়ে নি, অথচ অনেক বিষয়ে উভয়ের সম্পূর্ণ মিল আছে।

সন্ধি এবং সমাস যে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতিগত নয়—এ কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এমন কি, সংস্কৃতের অনুকরণে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও নানারূপ শব্দের মধ্যে যে অবৈধ সন্ধি স্থাপন করেছিলেন, পরবর্ত্তী লেখকদের হাতে আবার তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। রামমোহন রায় তাঁর ব্যাকরণে সন্ধির বিষয় যে কেন কিছু লেখেন নি, তার কারণ দেখিয়ে বলেছেন যে "এ সকল জানিবার রীতি সংস্কৃত

সন্ধি প্রকরণে আছে এবং ভাষায় সেই রীতিক্রমে ওই শব্দসকল ব্যবহার্য্য হইয়াছে; অতএব সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরং আক্ষেপের কারণ হয়।"—তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গ-বৈয়াকরণিকগণ এই কথাটি মনে রাখলে, স্কুলের ছাত্রদের অনেক কষ্টের লাঘব হত। "অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়ার নাম সমাস।" ঐরূপ কথার জড়াপট্‌কি বেধে যাওয়াটা বাঙ্গলা ভাষায় স্বাভাবিক নয়। বাঙ্গলা ভাষায় দুটি মাত্র পদ ঐরূপ সমাসবন্ধনে আবদ্ধ হয়। গাছপাকা, বর্ণচোরা ইত্যাদি পদ, খাঁটি বাঙ্গলা সমাসের নমুনা। (এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষায় পদ মানে word, এবং বাক্য মানে sentence,—আমরা আজকাল ঐ দুটি শব্দ ঠিক উল্‌টো উল্‌টো অর্থে ব্যবহার করি। এ প্রবন্ধে আমি পদ এবং বাক্য সংস্কৃত অর্থেই ব্যবহার করব।)

তারপর রামমোহন রায় বলেন যে "সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের যে নিয়মসকল, তাহা বাঙ্গলা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাষাতে কি ক্রিয়াপদে, কি প্রতিসংজ্ঞায় (সর্ব্বনাম), কি বিশেষণ পদে, লিঙ্গ জ্ঞাপনের কোন চিহ্ন নাই।" মিল্‌ন্ সাহেবের মতও তাই। এই সত্যটি মনে রাখ্‌লে বাঙ্গলা ব্যাকরণ আমাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠে না।

Milne সাহেবের বইতে, কারক এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকরণ দুটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এই দুটি বিষয়ের আলোচনাতে বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আমি বাঙ্গালী পাঠক মাত্রকেই মনোযোগ সহকারে এই দুটি প্রকরণ পড়্‌তে অনুরোধ করি। রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিল্‌ন্ সাহেবের কারক এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ লক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মিল্‌ন্ সাহেব বাঙ্গলা ভাষাতেও সাতটি কারকের অস্তিত্ব মানেন। কিন্তু রামমোহন রায় কেবলমাত্র কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, এই চারটি কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অন্য তিনটিতে শব্দের কোনও রূপান্তর হয় না বলে' তিনি,—সেগুলি কারক শ্রেণীভুক্ত করেন নি। বাঙ্গলায় সম্প্রদান, কর্ম্মের রূপ ধারণ করে বলে', তিনি তাকে গৌণ কর্ম্ম স্বরূপ মনে করেন। করণ এবং অপাদান,—দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক, এবং হইতে, থেকে, প্রভৃতি অপর একটি শব্দের সাহায্যে সিদ্ধ হয় বলে', তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সেগুলিকে বিভিন্ন কারক হিসেবে দেখেন না। আমার বিবেচনায় রামমোহন রায়ের মত অনুসারে, পদগঠনের বিভিন্নতার দরুণ কর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ যে এক শ্রেণীর কারক, ও করণ, সম্প্রদান এবং অপাদান যে আর এক শ্রেণীর কারক, এ বিষয়ে বৈয়াকরণিকদের লক্ষ্য থাকা দরকার।

মিল্‌ন্ সাহেবের মতে—

Bengalee verbs may be divided into three classes, according to their infinitive endings.

	Infinitive	Radical.
I.	আ করা	কর
II.	আন দাঁড়ান	দাঁড়া
II.	ওয়া যাওয়া	যা

কিন্তু রামমোহন রায়ের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—

"ক্রিয়াবাচক শব্দ, যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগ দ্বারা নানাবিধ পদ সিদ্ধ হয়, তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে:—অর্থাৎ "অন" যাহার অন্তে থাকে, যথা "মারণ"। "ওন" যাহার অন্তে থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যথা "যাওন"। আর "আন" অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন "বেড়ান"।

আমি রামমোহন রায়ের কৃত শ্রেণী বিভাগের পক্ষপাতী। কারণ যদিচ এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তথাপি একটি বিশেষ কারণে রামমোহন রায়ের মতই সমীচীন বলে' মনে হয়। ক্রিয়াকে ণিজন্ত করবার নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, রামমোহন রায় কৃত শ্রেণীবিভাগই সঙ্গত।

মিল্‌ন্ সাহেব বলেন যে—

"Causal verbs are formed by adding ন after the final আ of the first and third classes, e.g. করান to cause to do, বসান to cause to sit, খাওয়ান to cause to eat.

Causal verbs of the second class are formed by adding another verb. দাঁড়ান to stand; দাঁড় করান to cause to stand. There is also a double causal form with the verb দেওয়া to give, খাইয়ে দেওয়া &c.

রামমোহন রায়ের মতে—

ক্রিয়াকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই যে,—প্রথম প্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে "আ" দিতে হয়, যেমন "দেখন" হইতে "দেখান", করণ হইতে "করান" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে "য়া" দিতে হয়—যেমন "খাওয়ান।"

আর তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া ণিজন্ত হয় না। ক্রিয়ার ণিজন্ত করতে অপর একটি ব্যঞ্জনবর্ণ বাইরে থেকে টেনে আনবার কোনও আবশ্যক নেই - স্বরবর্ণের গুণবৃদ্ধির দ্বারাই তা সিদ্ধ হয়। এই কারণে রামমোহন রায়ের মতই গ্রাহ্য।

একটি ছোট প্রবন্ধে মিল্‌ন্ সাহেবের ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত সমালোচনা করা সম্ভব নয়, এবং আমার মত অশাস্ত্রীয় লোকের পক্ষে সেরূপ চেষ্টা করাটাও অনধিকার চর্চ্চা। তবে একথা নির্ভয়ে বলা যায়, যে এই ব্যাকরণ বাঙ্গলাভাষার একমাত্র পূর্ণাবয়ব ব্যাকরণ। এ বইয়ের প্রতি অধ্যায়ে লেখকের অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও বিদেশী লোকের দ্বারা যে বাঙ্গলা ভাষার এরূপ ব্যাকরণ লেখা হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মিল্‌ন্ সাহেবের বইয়ের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এক হিসাবে এখানিকে বাঙ্গলা ভাষার Dictionary of Idioms বলা যেতে পারে। বাঙ্গালী মাত্রেরই এ জ্ঞান-টুকু আছে যে যতক্ষণ আমরা ইংরাজি ভাষার idiom না আয়ত্ত করতে পারি, ততক্ষণ ইংরাজি ভাষা শিখি নে, এবং যতক্ষণ আমরা idiomatic ইংরাজি লিখ্‌তে না পারি,

ততক্ষণ ইংরাজি লিখ্‌তে শিখিনে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আর একটি বিশ্বাস আছে যে, যতক্ষণ আমরা বাঙ্গলা ভাষার idiom না ভুলে যাই, ততক্ষণ বঙ্গভাষা আমাদের আয়ত্ত হয় না, এবং idiomatic বাঙ্গলা লিখ্‌তে না ভুলে গেলে আমরা লেখক বলে অহঙ্কার কর্‌বার অধিকারী হই নে। কিন্তু যে দুচার জন লোক আজও idiomatic বাঙ্গলাকেই বাঙ্গলা ভাষা বলে জানেন, তাঁদের কাছে মিল্‌ন্ সাহেবের এই বইটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

ব্যাকরণ লেখা শক্ত হলেও, তা পড়া আরও শক্ত। ব্যাকরণের নাম শুন্‌লে যে লোকে আঁতকে ওঠে—তার কারণ সচরাচর যেরূপ ফর্দ্দওয়ারি ভাবে এ শাস্ত্র লেখা হয়ে থাকে, তার চাইতে নীরস লেখা সাহিত্যে পাওয়া দুষ্কর। মিল্‌ন্ সাহেবের বইয়ের এই একটি প্রধান গুণ যে, বইখানি আগাগোড়া সরস। উদাহরণ সংগ্রহের চাতুরির গুণে, এই ছয়শ' পাতার বইও এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়।

লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয় করে বলেছেন, যে বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ লিখ্‌তে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভুল ভ্রান্তি করেছেন। দুট চারটি ছোটখাট ভুলভ্রান্তি যে এখানে ওখানে দেখা যায় না, এমন নয়; কিন্তু সে সব ভুল এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে গ্রন্থকার একটি মহাভুল করেছেন—সে হচ্ছে গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে। একে ব্যাকরণ, তা আবার যদি দশ টাকা দাম দিয়ে কিন্‌তে হয়, তাহলে এ বই সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ভোগে কখন আস্‌বে না। মিল্‌ন্ সাহেব বাঙ্গলাভাষা যেরূপ জানেন, বাঙ্গলা ভাষার বাজার দর যদি তার সিকির সিকিও জান্‌তেন তাহলে ঐ দামের অঙ্কের শেষ শূন্যটা মুছে দিতেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

যোগীবেশ

দুঃখ সুখের উপরটিতে বাঁধব আমি ঘর,
সেথায় গিয়ে তোমার সাথে মিলব যোগীবর।
আমার মনের এই আশাটি বিফল হবার নয়;
যতই কঠিন হোক্ না কেন দুঃখ সুখের জয়।

সকল-ত্যাগী তোমার লাগি দুঃখের ভাগী হব,
এই কথাটি মনে আমার রয় গো যদি ধ্রুব,
তবেই আমার মনের আশা বিফল হবার নয়
যতই কঠিন হোক্ না কেন দুঃখ সুখের জয়।

তুমি যোগী, তোমার মনে নাইক কোন আশা,
তাইতে সেথা দুঃখ সুখে বাঁধতে নারে বাসা।
তোমার মনের সঙ্গে আমার মনটি করি লয়,
অনায়াসে করব আমি দুঃখ সুখে জয়।

তোমার সাথে মনটি আমার ধরবে যোগীবেশ
সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি দুখের পর্ব্ব শেষ।
ওহে যোগি, তোমায় মাগি—শুধু তোমায় চাই
দুঃখ সুখের বালাই আমার তিরসীমানায় নাই।

শ্রীহেমলতা দেবী।



"বাজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ-দহন-সুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।"

—ভানুসিংহ

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত রেখা-চিত্র হইতে

ভুক্ত-ভোগীর পত্র*

তোমরা যে "ভাই-বোন্-সমিতি" স্থাপন করেছ, তা-থেকে নানান্ কথা আমার মনে আস্‌ছে—সে কথাগুলি তোমাদের বলা ভাল —তাতে কতকটা তোমাদের উপকার হ'তে পারে।

কৈ—তোমাদের এই বয়সে, "ভাই-বোন্ সমিতি"র মত কোনও উচ্চতর কল্পনা তো আমাদের মাথায় আসে নি। সব ভাই বোন্ মিলে জ্ঞানের চর্চ্চা করা—বড় ভাই ছোট ভাইয়ের শিক্ষার ভার স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করা—পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন করবার চেষ্টা করা —জ্ঞান চর্চ্চা ও কর্ত্তব্য-সাধনের উচ্চতর আনন্দ এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আমোদ বিশুদ্ধ-ভাবে উপভোগ করা—এ প্রকার ভাব, সকালে আমাদের মনে তো উদয় হয় নি—এর কারণ কি? এর কারণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের কতকটা সমালোচনা করতে হয় —তখনকার সমাজের সহিত এখনকার সমাজের তুলনা করতে হয়।

ভাল হোক্, মন্দ হোক্ কতকগুলি বিশেষ ভাব নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি—আবার কতকগুলি ভাব আমরা আমাদের চারিদিক থেকে কতকটা জ্ঞাতসারে এবং কতকটা অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করি। ছেলেবেলায় যখন মন নবম থাকে তখন বাহিরের ছাপ সহজেই তাতে পড়ে—যা দেখি তাই অজ্ঞাতসারে শিখি; চোখের সাম্‌নে ভাল দৃষ্টান্ত থাকে তো ভাল শিখি, মন্দ দৃষ্টান্ত থাকে তো মন্দ শিখি। ছেলেবেলায় আস্তে আস্তে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল হয়, বেশী বয়সে ইচ্ছা করলেও তা' সহজে উন্মূলিত করা যায় না। অল্পঅল্প পলি পড়ে' পদ্মানদীর গর্ভ থেকে যেমন বিস্তীর্ণ চড়ার উদ্ভব হয় —সেইরূপ ছেলেবেলা থেকে নানা প্রকার সংস্কার ক্রমশ জমে' জমে' ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে— একবার গড়ে উঠ্‌লে তা সহজে ভাঙ্গা যায় না। অতএব ছেলেবেলায় আমরা কিরূপ দৃষ্টান্ত চারিদিকে দেখ্‌তে পাই—কিরূপ শিক্ষা লাভ করি তারই উপর আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি অনেকটা নির্ভর করে।

তখন আমাদের বাড়ীতে দুর্গা পূজার বড়ই ধূম হত। ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর চাকচিক্য-শালী—বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত, বিবিধ ভূষণে ভূষিত প্রতিমা আমাদের মনকে প্রবলরূপে আকর্ষণ করত। ইস্কুল থেকে তাড়াতাড়ি এসে আমরা প্রতিমা গড়া দেখ্‌তে বস্‌তেম—তাতে বড়ই আমাদের আমোদ হত। পূজার তিন দিন উঠানে যাত্রা হত—এবং বৈঠকখানায় বাই-নাচ হত। যাত্রা শোন্‌বার আশায় আমরা দিনের বেলায় নিদ্রা যেতেম এবং আমাদের

* আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছেলেরা "ভাই-বোন্-সমিতি" নামে এক সম্মিলনী-সভা স্থাপন করিয়াছে তাদের বাড়ীর এক ছেলেকে এই পত্রখানি লেখা হয়। ভা-সঃ

চাকররা কতকরাত্তির পর্য্যন্ত জোর করে' আমাদের বিছানায় শুইয়ে রাখ্‌ত—কিন্তু আমাদের ঘুম হবে কেন?—ঢোলে যেই চাঁটি পড়ত অমনি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে একছুটে আমরা খড়খড়ের বারাণ্ডায় হাজির হতেম।

উঠানে কোন কিছু ব্যাপার হলে, খড়খড়ের বারাণ্ডাই মেয়ে-মহলের আড্ডা হয়ে থাকে—সেইখানে মেয়েদের সঙ্গে বসে যেতেম; তার পর আমাদের খানসামা প্রভুরা এসে—জরির কাজ-করা ফুলকাটা সাটিনের চাপকান পায়জামা, জরির কোমরবন্ধ—জরির টুপি, হাতে ঝোলাবার জন্য রেশমের একটা রুমাল,—এইরূপ সেকালের খোকাবাবুর সজ্জায় সজ্জিত করে' চণ্ডিমণ্ডপের দালানের রোয়াকে আমাদের বসিয়ে দিত। যাত্রার মধ্যে সং-ই আমাদের ভাল লাগত—কোন কোন মুখস-ওয়ালা সং দেখে আমরা বড়ই ভয় পেতেম—আমার মনে পড়ে, নিমাই দাসের দলের ধূম্রলোচনকে দেখ্‌লে আমরা আঁৎকে উঠে চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্‌তেম। পূজার কয়দিন চারিদিকে মদের ছড়াছড়ি—যে ঘরে যাও সেইখানেই মদের গন্ধ। এই পূজার সময় পিতৃদেব প্রতি বৎসরেই কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বাহির হতেন, বাড়ী থাকতেন না।

* * * * * *

আমাদের সময়ে ছেলেদের উপর খুব কড়া শাসন ছিল—সঙ্গে সঙ্গে চাকর লেগেই আছে—অভিভাবকদের না বলে' এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাবার জো নেই—পাছে ছেলে খারাপ হয়ে যায়; একেই বলে "গোড়া কেটে আগায় জল"। তখনকার ছেলেরা শাসনের চাপে একেবারে পিষে থাক্‌ত। অভিভাবকের শাসন—গুরুমহাশয়ের শাসন—আবার চাকরের শাসন, অভিভাবকের ধম্‌কানি—গুরুমহাশয়ের বেত, চাকরের গুঁতো;—ছেলে-বেচারা কদিক সাম্‌লাবে। এইরূপ শাসনে শাসনে যখন সে স্ফূর্ত্তিহীন নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে, তখন তার আবার ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় হয়ে এল। ইস্কুলে আবার মাষ্টারের শাসন—তার উপর দুষ্ট সহপাঠীদের অত্যাচার—ইস্কুলকে তাই আমাদের যমপুরী বলে মনে হত, পড়াশুনা কর্‌তে আদপেই মন যেত না। কিন্তু বাড়ি এসেও নিস্তার নেই—বাড়িতে এসেই দু-চারখানা বই খেয়েই আবার ঘাড় গুঁজে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়তে হত—একটু যে খেলা-ধূলা করা যাবে তার জো নেই; শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন—ঘুম পাচ্চে—ঢুলে ঢুলে পড়চি, অভিভাবকের পায়ের শব্দ শুন্‌বামাত্রই—সজোরে "বি এ ব্যাট্—সি এ টি ক্যাট" আওড়াচ্চি। তার পরেই আবার বাড়ির মাষ্টার—"স্যার" (Sir); তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন, তিনি আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করতেন না। বাঙ্গলা ইস্কুল দুর্নীতি শিক্ষার একটি প্রধান স্থান—কুসঙ্গ যতদূর হতে পারে তা সেইখানে হয়। এখন বাঙ্গালা ইস্কুলের সেইরূপ অবস্থা আছে কিনা বল্‌তে পারি নে—যদি থাকে তা হলে সে সকল ইস্কুলে শিক্ষার

বালকদের পাঠানোর চেয়ে তাদের বাড়িতে রেখে শিক্ষা দেওয়া ভাল। ইংরাজি ইস্কুলে অনেকটা দুর্নীতিশিক্ষার ভয় নেই; তোমরাও বোধ হয় তোমাদের নিজের পরীক্ষায় তা দেখেছ। ইংরাজি ইস্কুলে মারামারি ঘুসাঘুসির প্রাদুর্ভাব থাক্‌তে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা ইস্কুলের ছাত্রদের মত ওরূপ অভদ্র আচরণ ইংরাজীয় বালকদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তার কারণ বোধ হয় ইংরাজ বালকেরা এক-ধর্ম্মাধীন বলে' তাদের মধ্যে নীতিগত বৈষম্য ততটা নেই—কিন্তু আমাদের মধ্যে বর্ণভেদ থাকায়, প্রত্যেক বর্ণের পুরুষপরম্পরাগত সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষাভেদে—আমাদের মধ্যে নীতিগত অনেকটা বৈষম্য হয়ে পড়েছে, সভ্যতারও যেন ভিন্ন স্তর পড়ে গেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বালক হলেও তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভদ্রতা ও সভ্যতার ভাব দেখা যায়—কিন্তু অন্যতর শ্রেণীর বালকেরা ধনীর সন্তান হলেও তারা সভ্যতার যেন একটা নিম্ন স্তরে আছে ব'লে' মনে হয়। তাদের মুখে সর্ব্বদাই অশ্লীল কথা শোনা যেত। (১) ইস্কুলে আমি এইরূপ কতকগুলা ছেলের পাল্লায় পড়েছিলেম। তাদের মধ্যে তাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। কেউ যদি তাদের মতের বিরুদ্ধে যেত তাহলে তাকে তারা এক ঘরে করে' জব্দ করত। একদিন মাষ্টার-মশায় ক্লাসে আস্‌বার পূর্ব্বে ঐ দলের দুষ্ট ছেলে পরামর্শ করে' তাঁর চৌকিতে আলকাতরা ঢেলে দিয়েছিল—মাষ্টারমহাশয় যেমন তাতে বস্‌বেন, তাঁর কাপড়-চোপড় কালিতে প্লাবিত হয়ে গেল—তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে কে এ কাজ করেছে, প্রত্যেক ছাত্রকে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন; কেউ তার নাম বল্‌লে না—শেষে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সত্য কথা বল্লেম। সেই অবধি আমার উপর তাদের বিশেষ আক্রোশ হল—আমাকে একব'রে করলে—আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে' দিলে—আমার পড়বার বই চুরি করে' এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখত যে আমি কোথাও খুঁজে পেতেম না—রোজ রোজ বই হারিয়ে বাড়ীতে ধম্‌কানি খেতে হত—এমন মুস্কিলে পড়েছিলেম কি আর বলব। এই সকল কারণে ইস্কুলের নামে জ্বর আসত—পড়াশুনার উপর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। কোনপ্রকারে এন্‌ট্রান্‌সটা পাশ করেছিলেম। তার পর, কালেজে Second year ক্লাসে পড়তে পড়তেই, মেজদাদা আমাকে সঙ্গে করে' বোম্বাই নিয়ে গেলেন—সেইখানে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে আমার জ্ঞানস্পৃহা আবার অল্পেঅল্পে ফুটে উঠ্‌ল—তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে আমার শিক্ষা আরম্ভ হল বলতে হবে। ছেলেদের রাশিরাশি জ্ঞান অল্পসময়ের মধ্যে জোর করে' গিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে যাতে তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা উদ্বোধিত হয় তারই উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও তার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। অতিশাসনে ও অতিশিক্ষায় হিতে বিপরীত হয়ে পড়ে। জ্ঞানস্পৃহা একবার উদ্বোধিত হলে, পড়া

(১) শিক্ষার প্রসারে এখন বোধ হয় এরূপ বর্ণগত নীতি-বৈষম্য আর নাই। অবশ্য তখনও নিম্নবর্ণের ছেলের মধ্যে সুশীল সজ্জন না দেখিয়াছি এমন নয়। তবে সাধারণ ভাবটা ঐরূপ ছিল। জ্যো

শুনায় মন দেবার জন্য অন্যের শাসন ও পীড়াপীড়ির অপেক্ষা-করে না। তোমাদের গোড়ার শিক্ষা এই প্রণালীতে হয়েছিল বলে' বই পড়বার জন্য তোমাদের কখন পীড়াপীড়ি করতে হয় নি—বরং কখন কখন বই থেকে তোমাদিগকে তফাৎ রাখবার জন্য পীড়াপীড়ি কর্‌তে হত।

তার পর আমাদের পরিবারের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল—পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্ম উঠে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হতে লাগল—আমাদের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ ব্রহ্মমণ্ডপে পরিণত হল। এখন থেকে অশরীরী উচ্চ ভাবের কথা, গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা আমাদের কাণে প্রবিষ্ট হতে লাগল। এই থেকেই আমরা মানুষ হয়ে উঠলেম। তবে তোমাদের মধ্যে এখন যেরূপ জ্ঞানের আলোচনা হচ্চে, আমাদের-মধ্যে তখনো ততটা হয়নি। তোমাদের মত আমাদেরও মধ্যে একটা সভা ছিল; কিন্তু তার বেশি বর্ণনা করতে হবে না—তার নামটি বলবামাত্রই তার পেটের কথা আপনিই বের হয়ে পড়্‌বে—তার নাম ছিল "eating club"। এই সভার প্রত্যেক সভ্যকে পালা করে' খাওয়াতে হত। আহারের ব্যাপারটা যে দৃষ্য তা আমি বল্‌চি নে; শারীরিকের সঙ্গে যদি মানসিক খাদ্যের কিছু যোগাড় থাকৃত তা হলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত!

আমাদের সময়ে কিন্তু অনেকগুলি মহৎ কল্পনার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল—আশা হচ্ছে, আজ তোমরা সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত করতে পারবে। আমাদের বাড়ীর সাহায্যে নবগোপাল বাবু (২) হিন্দু মেলা স্থাপন করেন—সেই অবধি জাতীয় ভাবের আন্দোলন আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছে; বাঙ্গালীদের মধ্যে জীম্‌ন্যাস্‌টিক্ সর্কস্ সেই আন্দোলনের ফল। তখন ঐ মেলায় জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা সকল পাঠ হত। আমার সঙ্গে নবগোপাল বাবুর যখনই দেখা হত তিনি ঐরূপ উত্তেজনার কবিতা আমাকে লিখ্‌তে অনুরোধ করতেন; আমার কবিতা লেখা কখনও অভ্যাস ছিল না—কিন্তু এইরূপ দায়ে পড়ে' একটা কবিতা লিখেছিলেম। সেবারকার মেলায় শিবনাথ বাবুর, (শাস্ত্রী), অক্ষয়ের (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী) ও আমার কবিতা পাঠ হয়—সেই অবধি জাতীয়ভাবউদ্দীপক বিষয়সকল লিখতে আমার প্রবৃত্তি হল। সাহিত্যচর্চ্চায় আমার মন গেল। ছোটখাট ঘটনা থেকে অনেক সময়ে জীবনের গতি কেমন অলক্ষিতভাবে ফিরে যায়! ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গেসঙ্গে আমাদের বাড়িতে একটা জ্ঞানের ঢেউ এসেছিল; পিতৃদেবের জ্বলন্ত ব্যাখ্যান—মেজদাদার মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত—বড়দাদার গভীর তত্ত্ববিদ্যা ও অনুপম স্বপ্নপ্রয়াণ—জ্ঞানধর্ম্মের আলোক বিস্তার কর্‌ছিল; ওদিকে আবার আর একটি "নব ভানু" আমাদের পারিবারিক সাহিত্য-আকাশে উদয় হয়েছিল—সেই ভানু এখন পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করচে এবং তার প্রদীপ্ত কিরণ এখন আমাদের

(২) এত লোকের এত স্মৃতিচিহ্ন হচ্চে, নবগোপাল বাবু যে অমন একটা কাজ করেছিলেন, এখন কেউ তাঁহার একবার নামও করে না। কি দুঃখের বিষয়! শ্রীজ্যো

পারিবারিক গগনকে অতিক্রম করে' সমস্ত বঙ্গভূমিকে আলোকিত করচে।

"ভারতী পত্রিকা" এই পারিবারিক সাহিত্য-আন্দোলনের আর একটি ফল। এই পত্রিকা আমাদের জ্ঞানচর্চ্চার একটি উর্ব্বর ক্ষেত্রস্বরূপ। উহাতে যে সকল সাহিত্য-বীজ রোপণ করা হয়েছিল, তা রবির কিরণে, সতেজ ও পরিপুষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়ে এখন স্বর্ণফল প্রসব করচে!

আমাদের পারিবারিক উন্নতির আর একটি প্রধান নায়ক হচ্চেন মেঝদাদা। তিনিই স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রধান প্রবর্ত্তক। আমাদের মেয়েরা যে অন্তঃপুরের কারাগার হতে মুক্তি লাভ করেছেন—শোভন পরিচ্ছদ পরিধান করচেন—মহৎকল্পনাসকলের আন্দোলনে পুরুষদের সঙ্গে যোগ দিতে পারচেন সে কেবল মেজদাদার প্রসাদে। তিনি যদি প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাব আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তন না করতেন, তাহলে ভাই-বোন মিলে যে কোন-সভা করা যেতে পারে এ কল্পনা তোমাদের মনে কখনই আস্‌তে পারত না। এখন যে মেয়েরা গাড়ী করে বাহিরে যাচ্চেন, পুরুষদের সঙ্গে মেলা মেশা করচেন—তোমাদের কাছে এ সমস্ত ভারি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে—কিন্তু বাস্তবিক ধরতে গেলে, এ সমস্ত বড় সহজে হয় নি—এই নিয়ে অনেক নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়েছে—আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে—অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। অল্পে অল্পে একটু একটু করে'—একপা-একপা অগ্রসর হয়ে এতদূর এসে পড়া গেছে। আমার মনে পড়ে, প্রথমে যখন মেয়েরা গাড়ি করে বেড়াতে আরম্ভ করেন—গাড়ির দরজা খুলতে আমি কিছুতেই দিতেম না—ক্রমশঃ একটু একটু খুলে দিতে আরম্ভ করলেম—সিকিখানা—আধখানা—ক্রমে ষোল আনা। তখন বাহিরের কোন পুরুষ আমাদের মেয়েদের মুখ দেখলে আমার যেন মাথা কাটা যেত; প্রথমে দরজা-বন্ধ ঢাকা গাড়ি, পরে দরজা-খোলা ঢাকা গাড়ি, পরে টপ-ফেলা ফিটেন গাড়ি—ক্রমে একেবারে খোলা ফিটেন গাড়ি ধরা গেল—গুটিপোকা ক্রমে প্রজাপতিতে পরিণত হ'ল। অভ্যাসের এমনি গুণ—এখন আর কিছুই মনে হয় না। এ স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে ভাল ফল হয়েছে তার সন্দেহ নাই। কোন জাতির মধ্যে কিম্বা কোন পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পদবীর উন্নতি না হলে কখনই সেই জাতির কিম্বা সেই পরিবারের সমগ্র উন্নতি হয় না। স্ত্রী জাতির সুশিক্ষা না হলে পুরুষের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। ছেলে মানুষ-করা মায়ের কাজ—শুধু বড় করে' তোলাকে যদি মানুষ করা বলে, তাহলে গাধাও মানুষ হচ্চে, ঘোড়াও মানুষ হচ্চে—তাকে আমি "মানুষ করা" বলি নে। যাতে ছেলে বড় হলে মনুষ্য নামের যোগ্য হয়—তার মনুষ্যত্ব জন্মে, এরূপ করে' তাকে লালনপালন করা, তার শিক্ষা দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য। মা নিজে সুশিক্ষিতা না হলে এরূপ গুরুতর ভার কি করে' গ্রহণ করবেন? স্ত্রীলোকদের কতকটা স্বাধীনতা না থাক্‌লে চরিত্রের বল কিরূপে সঞ্চয় হবে?—অন্তঃপুর থেকে

বাহিরে গিয়ে জ্ঞাতব্য পদার্থ সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলেই বা কিরূপে তাদের শিক্ষার পূর্ণতা হবে?—পরিবারের মধ্যে যদি পুরুষেরা সুশিক্ষিত হয়, আর মেয়েরা অশিক্ষিতা থাকে তাহলে বড়ই গোল বাধে। পুরুষেরা ভাল বলে' যা করতে যায়, মেয়েরা বুঝ্‌তে না পেরে তার বাধা দেয়—স্পষ্ট বাধাও যদি না দেয়—পুরুষের সঙ্গে সে সকল বিষয়ে তারা সহানুভূতি করতে পারে না—কাজেই পরিবারের মধ্যে একটী অশান্তি ও কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। তাই বল্‌চি, তোমরা শুধু আপনার উন্নতির চেষ্টা না করে', সেই সঙ্গে তোমাদিগের বোন্‌দিগেরও উন্নতির চেষ্টা করচ এ বড়ই আহ্লাদের বিষয়। যদি কোন পরিবারে পুরুষদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা থাকে—তা হলে সাক্ষাৎভাবে না হোক্ অন্ততঃ অসাক্ষাৎভাবে কতকটা সেই আন্দোলনের ফল স্ত্রীলোকদের মধ্যেও এসে পড়ে—তাতে আবার যদি সেই পরিবারে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে মেলা-মেশা ও দেখাশুনা কথাবার্ত্তার বিশেষ সুযোগ থাকে তাহলে ভাবের আদানপ্রদানে সেই শিক্ষার আরও বিস্তার হয়।

আমরাই আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন দেখেছি। এখন আমাদের মেয়েরা স্বাস্থ্যের নিয়ম যেরূপ বোঝেন, সেরূপ পূর্ব্বে আমাদের বাড়ির মধ্যে দেখা যেত না। এখন কোথায় একটু অপরিষ্কার হল—দুর্গন্ধ হল—অমনি, সকলে ব্যতিব্যস্ত, তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। ছেলেরা যাতে ভাল হাওয়ায় থাকে—পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায়—তার প্রতি সকলের এখন বিশেষ দৃষ্টি। ছেলেদের নীতিশিক্ষার বিষয়েও এখন মায়েরা মনোযোগী। চাকর দাসীরা ছেলেদের ভূতের ভয় না দেখায়—ছেলে ভোলাবার জন্য মিথ্যা কথা না বলা হয় ইত্যাদির প্রতি তাঁদের লক্ষ্য আছে। ছেলের মঙ্গলের জন্য শুধু শান্তি স্বস্ত্যয়নের উপর এখন তাঁরা নির্ভর করেন না। আর একটি শিক্ষার ফল এই দেখা যায়—ছেলে মেয়েদের বিবাহের বয়স হলেই যে তাদের বিবাহ দিতে হবে এরূপ সংস্কার আমাদের মেয়েদের মধ্যে এখন আর নেই। এখন বিবাহ দেবার পূর্ব্বে ছেলের জীবিকার উপায় আছে কি না, শিক্ষার ব্যাঘাত হবে কি না ইত্যাদি সাত পাঁচ অনেক ভাবেন; তাছাড়া যার সঙ্গে বিবাহ হবে তার ধন আছে কি না, বিদ্যা আছে কি না—তার শরীর নীরোগ কি না—তার পিতামাতার স্বভাবচরিত্র কিরূপ—তাঁদের শরীরে কোন সংক্রামক রোগ আছে কি না ইত্যাদি। এমন কি ফ্রেনলজির মতে পাত্রের মাথায় কোন্ ঢিবি বেশি ফুলো আছে তার পর্য্যন্ত সন্ধান লওয়া হয়। (ফ্রেনলজি আমাদের বাড়ির মধ্যে এমন প্রচার হয়ে পড়েছে যে, আমাদের দিদিমা বুড়িও দুই একটা ঢিবি হাত্‌ড়ে বল্‌তে পারেন)। এর থেকে বুঝ্‌তে পারবে বাড়ির পুরুষদের জ্ঞানানুশীলনের ফল মেয়েদের মধ্যে কত দূর পর্য্যন্ত পৌঁছোয়।

আমাদের পালা প্রায় একরকম শেষ হয়ে এসেছে এখন তোমাদের পালা; তোমরা এখন আসরে নেবেছ—দেখা যাক তোমরা কি করে ওঠো। যে রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে তো খুব ভালই বোধ হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে সাহিত্যের চর্চ্চা, বিজ্ঞানের চর্চ্চা, সঙ্গীতের চর্চ্চা—সদ্ভাবের চর্চ্চা দেখতে পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু আমার বোধ হয় একটার প্রতি তোমাদের তেমন দৃষ্টি নেই—সে হচ্চে ব্যায়াম-চর্চ্চা। প্রদীপে পূর্ণমাত্রায় তেল না থাকলে প্রদীপ যেরূপ সমানভাবে ভাল করে জ্বলে না—এক এক-বার দপ্ করে জ্বলে পরক্ষণেই নিবে যায়, সেইরূপ শরীরের উন্নতি না হলে—মানসিকই বল, আধ্যাত্মিকই বল, কোন উন্নতিই স্থায়ী হয় না, কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। ইংরাজদের মত' আমরা এখনও ব্যায়ামের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি;—তা যদি পারতেম তা হলে যেরূপ এখন আমরা সবাই নিয়মিত আহার করি, স্নানাদি করি, সেইরূপ প্রত্যহ ব্যায়ামও করতেম। ব্যায়াম না হলে চলে না—এরূপ আমরা মনে করি না, ওটাকে আমরা সখের জিনিস বলে' মনে করি। তাই কেউ সখ করে ব্যায়াম চর্চ্চা করে—কেউ বা করে না। কিন্তু তা তো ঠিক্ নয়—নিয়মিত ব্যায়াম না করলে কিছুতেই আমাদের শরীর বলিষ্ঠ ও সুস্থ থাকতে পারে না। যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ বা বিজ্ঞানশিক্ষা—কেহ বা সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছ—সেইরূপ কেহ যদি ব্যায়াম শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ কর তো ভাল হয়।

* * *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৯৩
সাজাদপুর জমিদারী কাছারী।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(জন্ম ৭ই কার্ত্তিক ১২৫১, মৃত্যু ৩১ জৈষ্ঠ ১৩২০)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী ও অন্য বহু গ্রন্থপ্রণেতা, অসামান্য বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও নারীসুহৃদ্ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিনে আমাদের এই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাচস্পতি বাঁশবাড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব রায়ের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ ও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল-বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গার পশ্চিমকূলে বাঁশবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন।

নগেন্দ্রনাথের পিতৃকুলের কুলমর্য্যাদার সঙ্গে অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, ও উদারতা দর্শনে রাজা নৃসিংহ অত্যধিক আকৃষ্ট হন। বহু গুণের আধার পণ্ডিত রামশরণের চরিত্রসৌরভ কস্তুরীর ন্যায় রাজার হৃদয়মন মাতাইয়াছিল, তাই তিনি

বহু বিত্ত দানে রামশরণকে বাঁশবাড়িয়াতে বাস করাইয়াছিলেন, সে আজ দুইশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বের কাহিনী। নগেন্দ্রনাথের পিতামহ দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত যেমন পণ্ডিত তেমনি উদারহৃদয় ছিলেন। ভারতবর্ষের নানাস্থানের ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। তিনি বিদ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানে কল্পতরুসদৃশ ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে, একদা কোনস্থানে যাইবার সময়ে পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। এক চণ্ডাল-কৃষক তাহার কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার সঙ্গ লইয়া তাঁহাকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিলে, তিনি তাহাকে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে সেই কৃষক কুণ্ঠিত ও কাতর হয়, এবং সমাজেও একটু আন্দোলন হয়, কিন্তু দেবনাথ

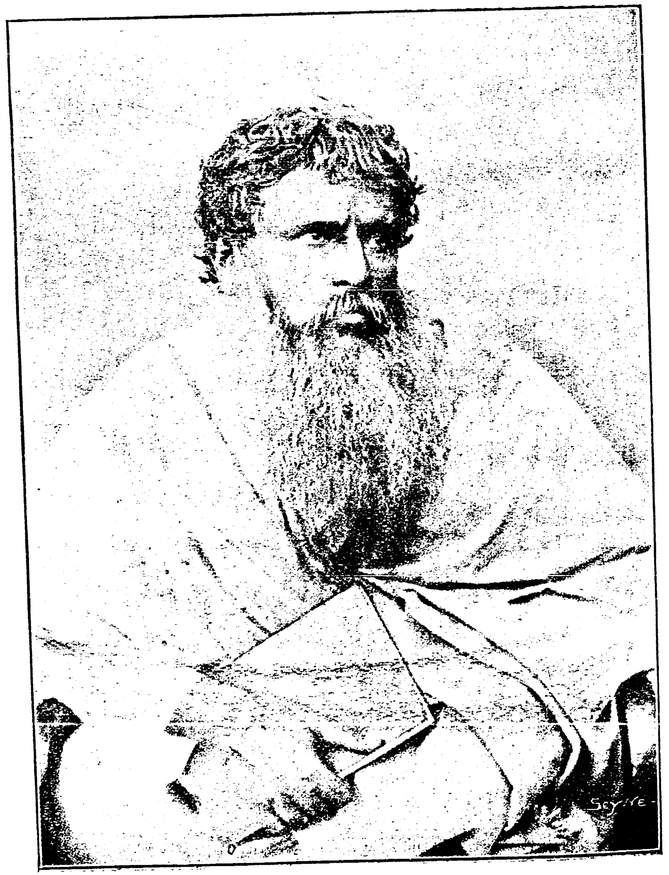

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে পথপ্রদর্শক গুরু বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এইরূপ উচ্চ উদারতার ফলেই পৌত্র নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, প্রচারক ও দীনবৎসল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন।

দেবনাথের একপুত্র ও নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত পণ্ডিত রমানাথ তর্কবাগীশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচিত চারিজন বেদাধ্যয়নকারীর অন্যতম। বাঁশবাড়িয়া যে মহর্ষির বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত প্রিয়স্থান হইয়াছিল, তাহার মূলে পণ্ডিত রমানাথের আকর্ষণ যে বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বাঁশবাড়িয়াতে স্থানান্তরিত হওয়ার মূলেও নগেন্দ্রনাথের পিতৃকুলের সম্পর্ক বিদ্যমান।

নগেন্দ্রনাথের পিতা পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নও উদারহৃদয়ের লোক ছিলেন। মাতা তারাশঙ্করী লোকের দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না, লোকের অভাবমোচনে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে নগেন্দ্রনাথের উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান, সহৃদয়তা ও উদারতার মূলে তাঁহার পিতৃমাতৃবংশগত আচার আচরণ, ভাবভঙ্গী ও ধাতটুকু বেশ স্থান পাইয়াছিল, এবং পরে বিস্তৃত আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের জীবন যাপন হইতে বেশ অনুভূত হইতেছে যে শোণিতমর্য্যাদা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নহে! এরূপ পিতৃপিতামহের গুণধর না হইয়াও যে, কেহ উচ্চ চরিত্ব জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না, একথা বলি না, কিন্তু এরূপ পিতৃমাতৃকুল প্রাপ্তি যে সৌভাগ্যের বিষয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনগত বিবিধ উপকরণগুলি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ পিতামাতার একমাত্র পুত্র। ইঁহাকে রাখিয়া পিতামাতার লোকান্তর হইলে, খুল্লতাত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঁহার লালনপালনভার গ্রহণ করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে রক্ষা করিতেন। উপনয়নের পর নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণজনোচিত নিত্যকর্ম্মগুলি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিতেন। কখনও সে সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার দ্বিধা বা সন্দেহের উদয় হয় নাই।

পিতামাতার অবর্ত্তমানে বালক নগেন্দ্রনাথ ও একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদরা অনুপমা হরিনাথের আশ্রয়ে রহিলেন। হরিনাথ মহীশূর নবাব প্রতিষ্ঠিত রসা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ রসা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ইহার পরেই খুল্লতাত হরিনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলে, ভগ্নীসহ নগেন্দ্রনাথও কৃষ্ণনগর গমন করেন, এবং সেখানে লেখা পড়া শিখিতে থাকেন। এই স্থানেই শিক্ষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের শোণিতগত স্বভাবসিদ্ধ উদারভাব আর এক মহৎ ও উদার হৃদয়ের সংস্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ইনিই বঙ্গের সর্ব্বজনপূজ্য আদর্শ শিক্ষক স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ যখন যেখানে শিক্ষকরূপে গমন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রশোভা সকল লোকের, বিশেষ

ভাবে ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার নীরব প্রভাব ও আচার আচরণই সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে। এই কৃষ্ণনগরেই গুরু শিষ্যের হৃদয় বিনিময় ও ভাবের আদান প্রদানে নগেন্দ্রনাথ নূতন পথের পথিক হইলেন। খুল্লতাত হুগলীতে বদ্‌লী হইবার সময়ে নগেন্দ্রনাথকে সেখানে লইয়া যাইবেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণনগরেই রহিলেন। হরিনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই পুত্র-স্থানীয় ভ্রাতুষ্পুত্রেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সেই আশাভরসার মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান দিলেন। হরিনাথ পৈতৃক সম্পত্তি ও তাঁহার অর্জ্জিত অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া বহুবিধ প্রকারে নগেন্দ্র নাথকে আপনার নিকট রাখিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু নগেন্দ্রনাথ রামতনুর সঙ্গত্যাগে সম্মত হইলেন না।

নিঃসন্তান হরিনাথ নগেন্দ্রনাথ ও অনুপমাকে পুত্রকন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতি-পূর্ব্বেই নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু অর্থব্যয় করিয়া নগেন্দ্রনাথের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পিণ্ডদানের পাত্রাভাব বশতঃ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে হয় দাও, জাতিচ্যুত হইও না। উপবীত ত্যাগ করিও না। কে সে কথা শুনিবে? নগেন্দ্রনাথ নবোদ্যমসম্পন্ন যুবা-পুরুষ। পৈতৃকগুণে সবল ও স্বাধীনচিত্ত, নগেন্দ্রনাথ কি সমানভাবে মানবের প্রতি প্রেমানুভবে বিরত হইতে পারেন? তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যা, স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও উদার হৃদয় রামতনু বাবুতে মানব জীবনের উচ্চ আদর্শ পরিস্ফুট দেখিয়া চুম্বকের ন্যায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল এবং উভয়ে মণি-জড়িত কাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হরিনাথ বহুচেষ্টা করিয়া যখন তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন সাহায্যদান বন্ধ করিলেন। নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। বাঁশবাড়িয়ার বাটীর সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, নগেন্দ্রনাথের এই পরিবর্ত্তনে বাঁশবাড়িয়ার বাটীতে মৃত্যু-ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল। হাহাকারে ও আর্ত্তনাদে সে গৃহ কম্পিত হইয়াছিল।

এই যে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে অর্থা-ভাবের সূত্রপাত হইল, এই যে অভাবের আগুন জ্বলিল, এই যে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত রহিলেন, এই যে জীবন সংগ্রাম সূচিত হইল, সে দিন নিমতলার ঘাটে নগেন্দ্রনাথের শ্মশান-সমাধিতে সেই যাতনা ও ক্লেশ, কল্পনায় অননুভূত সেই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ শান্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে যে শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট ও শতবিধ অভাবের দাবানল নিয়ত প্রজ্বলিত দেখিয়াছি, এ যন্ত্রণা অনেকেরই আছে বটে, কিন্তু আর কোথাও কোন ব্যক্তিতে তাহার তুলনা হয় বলিয়া এখনও অনুভব করিতে পারি নাই।

নগেন্দ্রনাথ এই দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় লইয়া আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতায় বঞ্চিত

হইয়া ও তাঁহাদের প্রদত্ত বিবিধ নির্যাতন ভোগ করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে ও শান্ত মনে ব্রহ্মসাধনায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইলেন। তাই অনেক সময়েই নগেন্দ্রনাথে বিধাতার বিচিত্র বিধান অনুভব করিয়া, তাঁহার শান্ত ও সমাহিতচিত্ত দর্শন করিয়া, তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মপটুতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগের অর্থসম্পদবহুল জনগণের মধ্যস্থলে তিনিই কৃপা করিয়া এক বিরাট আদর্শ দেখাইবার জন্য নগেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছিলেন।

এই সকল কারণে নগেন্দ্রনাথের উচ্চ শিক্ষা লাভে বিঘ্ন ঘটিলেও এবং ছাত্র জীবনের মধ্য পথেই অর্থোপার্জ্জন ও উদরান্নের জন্য ব্যস্ত হইতে হইলেও, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন বাসনা প্রবল ছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে উত্তম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁহার বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিত। কৃষ্ণনগরে অবস্থান সময়েই তিনি কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং পত্নীকে নিজের নিকটে আনয়ন করেন। তাঁহার অল্প বয়স্কা ও প্রায় অপরি-চিতা পত্নীকে বাঁশবাড়িয়ার বাটীর সকলে—বিশেষভাবে পুরমহিলাগণ অনেক বুঝাইয়া নগেন্দ্র বাবুর সহযাত্রী হইতে নিষেধ করিলেও সেই বালিকাবধূ তাহাতে সায় দেন নাই। বলিয়াছিলেন, যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন, তাঁহারই নিকট যাইব, আর তাঁহারই সঙ্গে কাল থাকিব। এই মহিলাকে আমরা দীর্ঘকাল দেখিয়াছি। তাঁহার অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসের, তাঁহার বিধাতার কৃপার উপর অকৃত্রিম নির্ভরের ভাব দেখিয়া অনেক সময়ে কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি বিধাতার বীরপুত্র নগেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ধর্ম্ম-পত্নীরূপে দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া স্বামীর লোকান্তর গমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দলভুক্ত হইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানপ্রিয় নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবুদ্ধির সমগ্রভাগটা ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে কোনও দিন আবদ্ধ ছিল না। অনন্ত জ্ঞানপারাবার কোথাও কোনও মতে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, তাই তিনি তদানিন্তন থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইয়া তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে নানাবিধ মতভেদ নিবন্ধন তখনই প্রচারক পদ গ্রহণ করা হইল না। এই সময়ে তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত পরিচিত ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যুগে তাঁহার আর প্রচারক-পদ গ্রহণ ঘটে নাই। পরবর্ত্তী কালে থিওজফিক্যাল সোসাইটির কার্য্যকলাপে যখন তাঁহার চিত্তে সন্দেহের সঞ্চার হয় তখন তিনি ঐ সভার সংশ্রব ত্যাগ করিলে পর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতেই প্রচারক-পদে বরিত হন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। যে দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব প্রথম চারিজন প্রচারক নিযুক্ত হয়েন,

সেই দিনের অনুষ্ঠান ভার- অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও অপর দুই জনকে নিয়োগপত্র দান, উপাসনা ও সেদিনকার অনুষ্ঠানের গুরুতর দায়িত্ব বুঝাইবার ভার আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণ সমাজের আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কয়েক বৎসর প্রচারক-পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিংবা পান নাই। পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঐ কার্য্যে ব্রতী হন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের কথঞ্চিৎ বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এই জাগরণের মূলে নগেন্দ্রনাথ প্রবল-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্ববিধ আলোচনাক্ষেত্রে রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালী জাতি —বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদল নগেন্দ্রনাথের নিকট সে জন্য চিরঋণে আবদ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চিরদিনই সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক, নগেন্দ্রনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ যখন মহর্ষি সদনে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, মহর্ষি তৎক্ষণাৎ সেই অনুষ্ঠানের জন্য নিজ ভবনের সদর বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উপযুক্ত স্থান বলিয়া নিদর্শন করিলেন এবং অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের উৎসবের সময় মহর্ষি ভবনে তিন সমাজ মিলিত হইয়া রামমোহন রায় স্মৃতিসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সভায় ব্রাহ্মগণ জানিতে পারিলেন যে নগেন্দ্রবাবু এক দীর্ঘ উপেক্ষিত বৃহদনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছেন। সেই সভায় নগেন্দ্রবাবু তাঁহার রচিত রাজার জীবনচরিতের ফাইল হইতে নানাস্থান পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই গভীর অনুরাগ ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে রাজার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন জীবনচরিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অন্য কোনও কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও এই এক সুবৃহৎ সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার নাম বাঙ্গলা সাহিত্যে অক্ষয় মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু সুবৃহৎ হইলেও, ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে। তিনি দীর্ঘজীবন তপস্যানিরত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিয়া নিজ লেখনী ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনের লেখকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযাত্রী। তাঁহার বিশুদ্ধ বাঙ্গালারচনা বঙ্কিমচন্দ্রের এই আনন্দ উৎপাদন করিত যে প্রয়োজন হইলেই তিনি নবীন লেখকগণকে নগেন্দ্রবাবুর বাঙ্গলা রচনা পাঠ করিতে বলিতেন। তাঁহার রচিত থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাভাষায় ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃ-ভাষার আলোচনাশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বনে "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" নামে দুই ভাগ গ্রন্থ তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছে।

বাঙ্গালাভাষার যে প্রাণ আছে, এই ভাষায় বক্তৃতা করিয়া লোককে মাতাইয়া তোলা

যায়, ইহার পথপ্রদর্শকও তিনি। জানি না আজ সকলের স্মরণ আছে কি না,—যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস আদেশ হয়, যে সময়ে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব হয়, সে সময়ের সভায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়মহাশয় জাতীয় কর্ত্তব্য-সাধনে বাঙ্গালীজাতিকে আহ্বান করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে ভাষার শক্তিসম্পদ আজও আমাদের প্রীতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই এক বক্তৃতার ফলে সেদিন অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। সে আজ ত্রয়োবিংশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যেদিন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় লোকান্তর গমন করেন, সেইদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "জাতিভেদ" শীর্ষক এক বক্তৃতা শুনিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ও সেদিন যে আগ্নেয়পর্ব্বতের অগ্নুদ্গীরণ করিয়াছিলেন, যে দাবানলে, জাতিভেদরূপ রাক্ষসীকে নিপাত করিতে বদ্ধপরিকর দেখিয়াছিলাম, সে দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, যে সে বক্তৃতা না শুনিয়াছে, শত বর্ণনাতে তাহা আমি তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। সেইদিন সেই সভাক্ষেত্রে বক্তৃতার পর নগেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে অতি উচ্চ উদারতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন "আজ আমি আমার ফার্ষ্ট প্লেস্ হারাইলাম, এতদিন আমিই প্রথম ছিলাম, আজ সেকেণ্ড প্লেস্ হইল, আজ তুমি আমাকে হারাইয়াছ আজ তুমিই ফার্ষ্ট।" কেমন ঈর্ষাহীন সরলস্বভাব! যিনি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে তিনি গুণগ্রহণে আত্মপর, স্বজাতি ও বিদেশী, এ ধর্ম্ম ও সে ধর্ম্ম বিচার করিতেন না। গুণের সমাদর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার মহাচ্চরিত্রের শোভাবর্দ্ধন করিত।

তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্যে তিনি সর্ব্বত্র অজাতশত্রু ছিলেন। দুইদিন তাঁহার সঙ্গে কেহ বাস করিলে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি মানুষের দোষ-ভাগ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা গুণগ্রহণে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। কোথাও কাহারও সম্বন্ধে আলোচনায় নিন্দার গন্ধ পাইলেই তাহার গুণের উল্লেখ করিয়া নিন্দাকারীকে লজ্জা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার কথাবার্ত্তায় মধু ক্ষরিত, তিনি সুরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার মজলিস জমাইয়া তুলিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যে নিমন্ত্রণক্ষেত্রে নগেন্দ্রবাবু ও শাস্ত্রীমহাশয়ের মিলন হইত, সেখানে কর্ম্মকর্ত্তার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। নগেন্দ্রবাবুর গল্পের ফোয়ারা ছুটিলে সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে অট্টহাসির প্রবল তরঙ্গে চারিদিক নিনাদিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকর্ত্তার হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিত, পাছে তাঁহার আয়োজনে অকুলান হইয়া পড়ে। দুঃখ এই যে, আর সে আনন্দপ্রবাহে ভাসিবার সুযোগ পাইব না।

প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন জন্য বঙ্গের নানা স্থানে, বিশেষ ভাবে কলিকাতায় আন্দোলন আরম্ভ করিয়া বঙ্গবাসীজনগণের মার্জ্জিত জ্ঞানের খর্ব্বতা সাধনে প্রাণপণ

প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে সময়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চ উদার যুক্তি-মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রচারিত পন্থার ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র শ্রোতার সমক্ষে প্রতিপক্ষের পরাজয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রবল চাপে, শশধর প্রমুখ দলের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এমন একটি সরল হৃদয় সুহৃদ আমরা আমাদের বহুপুণ্য ফলে লাভ করিয়াছিলাম। আজ লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযুক্তি সহকারে বিষয়বিশেষের আলোচনার প্রয়োজন হইলেই তাঁহার অভাব আমাদের হৃদয়ের বেদনাভার বৃদ্ধি করিবে।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর অবস্থান কাল হইতে প্রেততত্ত্বে আস্থাবান্ ছিলেন। পরলোকবাসী আত্মার অস্তিত্বে আবছায়ার ন্যায় বিশ্বাস অল্পাধিক সকল মানুষেরই আছে, কিন্তু পরলোক, পরলোকের ব্যাপার ও আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস অতি অল্পলোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকতত্ত্বে নগেন্দ্রনাথের বিশ্বাস দৃঢ় থাকায় তিনি জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই ঐ বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন। তিনি নব্যভারত পত্রিকায় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, সাধনার দ্বারা মানুষের দিব্যদৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতির ন্যায় একটা উচ্চ শক্তি লাভ হইয়া থাকে। পরলোকবাসী আত্মারা এরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তিনি শেষ জীবনে মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আত্মাদের উক্তি সকল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের ঠিক তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না, তাই এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ নিরাপদ নহে। সত্যের সেবক নগেন্দ্রনাথ যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে,—মুক্ত আত্মা পুনরায় এই লোকে মনুষ্যাত্মার সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, সাধু নগেন্দ্রনাথের পবিত্র আত্মা যে পবিত্রতম স্বর্গধামে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা

তপতী। (নাট্যকাব্য) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহার ভাব উচ্চ, ভাষাও ভাবের অনুসরণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ছন্দে নাটকখানি রচিত। ছন্দে বেশ তেজ আছে—তাহা শান্ত ও গম্ভীর। নাটকখানি হস্তিনা-নৃপতি সম্বরণের সহিত সূর্য্য-কন্যা তপতীর বিবাহ অবলম্বনে রচিত। রূপক ব্যাখ্যাতেও গ্রন্থকার কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। প্রাচীন ভারতের গৌরব-চিত্রটুকুও সঙ্গে সঙ্গে দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ও বহুস্থলে প্রকটিত হইয়াছে।

কারবালা। শ্রীআবদুল বারি প্রণীত। নোয়াখালি, মাইজ্‌দী হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, কাপড়ে বাঁধা পাঁচ সিকা। এখানি কাব্য। মহরমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহার পরিকল্পনাটুকু ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং লেখককে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। কাব্যখানি পড়িয়া মোটের উপর আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। লেখকের ভাষা ভাল, ছন্দও স্নিগ্ধ-গম্ভীর। কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুসলমান-সমাজ-প্রচলিত কথা থাকাতে রসের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে যখন এনাম শিবিরে মন্ত্রণা-মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে; একজন বলিলেন, "হবে যে লায়েক না ভাবিয়া অন্য, মানিবে সকলে তাঁহাকে সর্দ্দার।" এখানে এই 'লায়েক' কথাটি ভাবের প্রবাহে একটু বাধা দিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যে উচ্চ বিষয় লইয়া লেখা হইতেছে, তাহাতে ভাব-সম্পদও সেইরূপ উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন। বৃত্রসংহার ও মেঘনাদ বধ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। সে কাব্যের কবি কোথাও একটা গ্রাম্য বা চলিত কথার ব্যবহার করেন নাই। বিষয়োপযোগী ভাষা ও ভাব ব্যবহার না করিলে কোন রচনাই পরিপূর্ণতা লাভ করে না, সুন্দর হয় না। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া ও ভাবিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে ত্রুটিগুলি সারিয়া লইলে 'কারবালা' বঙ্গসাহিত্যে স্বকীয় বিশেষত্বে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, আমাদিগের এমন আশা বিলক্ষণই আছে।

ঢাকার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযামিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ৩।০ মাত্র। সাল তারিখ বা যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীই ইতিহাস নহে। এ সকল ইতিহাসের বাহ্য বস্তু, কঙ্কাল। কিন্তু তাই বলিয়া যে এ সকলের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, এমন নহে। ঐতিহাসিক সাল-তারিখের মূল্য আছে, প্রয়োজনও আছে, কিন্তু তাহাই ইতিহাস নহে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস দেশের ইতিহাস নহে, ইতিহাসের কঙ্কাল (Constitutional history) ইতিহাসের আভ্যন্তরিক প্রাণটুকুর পরিচয় লইতে হইলে আমাদিগকে ছুটিতে হইবে, দেশের লোকের হৃদয় যেখানে, সেইখানে তাহাদের উৎসব-আনন্দ-শোক-অভাব অনুযোগের মধ্য দিয়া কি করিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া উঠিল, তাহার সন্ধানে। বাঙ্গলার নদ-নদী খাল-বিল মেলা মঠ-মজজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই বাঙ্গলার ইতিহাস নিহিত—নানা প্রদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র বিবরণীসমূহ সংগৃহীত হইলে তবেই সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার পাইবে। সৌভাগ্য-ক্রমে এ কথা আমরা বুঝিয়াছি এবং এদিকে আমাদিগের দৃষ্টিও খুলিয়াছে। এবং বহু লেখক বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায় লইয়া বাঙ্গলার ধ্বংস-স্তূপের ধূলি-জঞ্জাল হইতে দেশের ইতিহাস সংগ্রহে মন দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক যতীন্দ্রবাবু অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ঢাকার অন্তরের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ঢাকার প্রাচীন খাল বিল, ঢাকার সূক্ষ্ম চারু শিল্প, কৃষি, ভেষজ, ঢাকার তীর্থ দেবালয়, ঢাকার প্রাচীন কাহিনীর সারোদ্ধার করিয়া তিনি প্রথম খণ্ড ঢাকার ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠা যেমন বিপুল তথ্যে পরিপূর্ণ, বিষয় সন্নিবেশেও তেমনি সুশৃঙ্খল পর্য্যায় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি! উপন্যাস বা নাটকও বোধ করি এতটা ধৈর্য্য-সহকারে পড়া যায় না,—বইখানি এমন সরস। ভাষা ও রচনার ভঙ্গী সরল। এ গ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক। দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য আমরা আশা-পথ চাহিয়া রহিলাম।

উজানি। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লিখিত দেখিলাম না। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অনেক গুলিই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস। সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।" গ্রন্থে ৩২টি খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরল ও সহজ, ছন্দ মধুর, ভাষা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাবও স্বচ্ছ, লঘু। লেখকের আন্তরিকতার গুণে কবিতাগুলি পল্লী-হৃদয়ের সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্য দিয়া বেশ দীপ্ত অনাড়ম্বর মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল কবিতা সুস্নিগ্ধ,

উপভোগ্য সেগুলি এতটুকু চমক লাগায় না, একেবারে প্রাণের কোমল তারে ঘা দেয়। বহিখানির ছাপা কাগজও রমণীয় হইয়াছে।

ডালি। শ্রীমতী শরৎশশী মিত্র প্রণীত। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। কাপড়ে বাঁধাই ১।০। ডালি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি বালিকার রচনা। ছন্দে যে একটি আধ-আধ সুর আছে, সেটুকু মিষ্ট। বালিকার হৃদয়ের আন্তরিক সরল উচ্ছ্বাসে 'ডালির' বহু পৃষ্ঠা জ্বল জ্বল করিতেছে।

খুকুরাণীর ডায়েরি। শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। লেখিকা মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "ইহা একখানি শিশু জীবনী মাত্র। কৃত্রিম বা অতিরঞ্জিত কথা ইহাতে নাই।" লেখিকার ভাষা সরল, তবে রচনায় কোন লিপি-চাতুর্য্য নাই।

পরিণাম। শ্রীমতী সরলাবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লনাথ মজুমদার। চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক,—পড়িয়া তৃপ্তি হইল না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

ওগো আষাঢ়ের প্রথম দিবস, মুক্তির মায়াপুরী—
সঙ্গোপন আজ রহিল না কিছু, নিখিল ভুবন জুড়ি'—
জলধির মনে লুকায়ে যে ছিল বাষ্প রহস্য ময়,
ভরি ওঠে মেঘে, উরস চিরিয়া ঢালে বারি বিন্দু চয়!
ধরণীর বুকে নীরবে লুকান কোন বীজ কবেকার,
অঙ্কুরে জাগে, রোমাঞ্চে কহে মর্ম্ম বারতা তার!
কালো নীরদের আনত নয়ানে কে জানিত ছিল ঢাকা!
বিদ্যুৎ শাণিত দীপ্ত কটাক্ষ অসির মতন বাঁকা!
সহসা হানিয়া হাসিয়া কাটিল অজানার সব জাল,
ব্যক্ত নভের মুক্ত কবাটে অবারিত মহাকাল!
গুহা কন্দরে, ফাটলের ফাঁকে, কাননে তরুর মূলে
লতায় পাতায় গাঁথা ছিল গান সেকথা আছিনু ভুলে!
শুধু ঝর ঝর বরষা বীণার শুনি মল্লার তান
কাকলি জাগিল কল সঙ্গীতে, ভুবনে ভরিল গান!
পরাণ উতলা আজিকে ভাঙিতে কায়ার এ কারাগার,
আকাশে বাতাসে ছায়ায় মিলাতে মুক্ত মানস তার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সনেট পঞ্চাশৎ*

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ফরাসী দেশে বসিয়া, বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন। যে শক্তিমান পুরুষ বাংলা পয়ারের পায়ের বেড়ী ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তিনিই আবার আষ্টে-পৃষ্ঠে মিল-বিশিষ্ট সনেট চালাইলেন। যিনি পুরাণো আইন ভাঙিয়া বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়াছিলেন, 'গদি' পাইয়া, মস্‌নদে বসিয়া, তিনি স্বয়ং যে আইন প্রণয়ন করিলেন তাহাতে কড়াকড়ির বেজায় বাড়াবাড়ি। মাইকেলের পর, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বাংলা ভাষায় সনেট লিখিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সনেটের মূল চেহারা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কেবল শ্রীমতী কামিনী রায়ের কয়েকটি সনেট গঠন হিসাবে নিখুঁৎ। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "সনেটের কঠিন বন্ধন" বজায় রাখিয়া "সনেট পঞ্চাশৎ" নামে একখানি বহি বাহির করিয়াছেন। পুস্তকখানির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, সনেটের ঠিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কারণ সাধারণতঃ যাহা সনেট নামে চলে তাহা সনেটের বিকৃতি। এই অবসরে সনেটের যথার্থ আকৃতিটার সহিত পরিচিত হওয়া মন্দ নয়।

সনেটের আকৃতি

'সনেট' মানে শব্দ-শিল্পাত্মক সঙ্গীত। সনেটে মোট চৌদ্দটা পংক্তি, তাহা মধু-প্রদত্ত 'চতুর্দ্দশ পদী' নামেই প্রকাশ। ইহার মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে। প্রথম আটটা পংক্তিকে বলে Octave; ইহাকে আমরা বাংলায় বলিব অষ্টপংক্তিক বা অষ্টদল পদ্ম। শেষ ছয়টা পংক্তির নাম sestet; বাংলায় ষট্‌পদক। অষ্টদলের প্রথম পংক্তির সঙ্গে চতুর্থ পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তির মিল থাকা নিয়ম; এবং দ্বিতীয় পংক্তির সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তির মিল থাকাই রীতি।

ষট্‌পদকের ছয়টা পংক্তির বিন্যাস সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। সনেটের আদিজন্ম-ভূমি ইতালিতেই এই অংশের তিন চার রকম মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

(১) প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল, দ্বিতীয় ও পঞ্চমে মিল এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠে মিল। (২) প্রথমে পঞ্চমে, দ্বিতীয়ে চতুর্থে এবং তৃতীয়ে ষষ্ঠে মিল। (৩) প্রথমে তৃতীয়ে পঞ্চমে মিল এবং দ্বিতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল। (৪) প্রথমে তৃতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল এবং দ্বিতীয়ে ও পঞ্চমে মিল। ষট্‌পদকের এই চারিটি মূর্ত্তিই স্বয়ং পেত্রার্কার মূল রচনার মধ্যে দেখিয়াছি।

এইখানে 'সোনেত্তো' বা সনেটের প্রথম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস পেত্রার্কা সনেটের জন্মদাতা। কিন্তু পেত্রার্কার জন্মের অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে সনেটের জন্ম সে বিষয়ে কিছুমাত্র

* শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত এবং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সন্দেহ নাই। দান্তে (খৃঃ ১২৬৫-১৩২১) দারেৎসো (১২৩০—৯৪), রুস্তিকো দি ফিলিপ্পো (১২৫৫—৯৭) এবং গুইদো কাভাল্‌কান্তির (১২৫৫—১৩০১) রচনাবলীর মধ্যে অনেক-গুলি করিয়া সনেট আছে। এক দান্তে ভিন্ন এই তিনজনই পেত্রার্কার জন্মের (১৩০৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং পেত্রার্কার দাবী টিঁকিতেছে না। তবে কবিত্ব হিসাবে যে পূর্ব্বজ কবিগণের সনেট অপেক্ষা পেত্রার্কার সনেট উচ্চ সে বিষয়ে কোনো ভুল নাই। তদ্ভিন্ন, পেত্রার্কা ও তাঁহার আরাধনার সামগ্রী সুন্দরী লরার দিব্য-প্রণয়ের অবদান—যাহা তাঁহার সনেটের প্রাণ—সেই অপূর্ব্ব রোম্যান্টিক্ কাহিনী কবিকে এবং তাহার সঙ্গে তৎকালে-অখ্যাত সনেট-রচনা-পদ্ধতিকে য়ুরোপের সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই সাধারণের বিশ্বাস, পেত্রার্কা সনেটের সৃষ্টিকর্ত্তা। অদৃষ্টবাদী হইলে বলিতাম লোকটার যশোভাগ্য খুব। কলম্বস্ যে মহাদেশের আবিষ্কার করিলেন তাহার নাম হইল পরবর্ত্তী পর্য্যটক আমেরিগো ভেস্‌পুচ্চির নামের অনুসারে—আমেরিকা!

পেত্রার্কার পরবর্ত্তী ইতালীয় কবিদিগের মধ্যে বোয়ার্দ্দো, বোক্কাচ্চিয়ো, লোরেঞ্জো দে মেদিচি, আরিয়োস্তো, তাস্‌সো, ফিলিকায়া এবং মেতাস্তাসিয়ো যে সমস্ত সনেট রচনা করেন তাহা ছন্দ-হিসাবে পেত্রার্কার সনেটের অনুরূপ। আল্‌ফিয়েরির সনেট একটু স্বতন্ত্র। আমাদের মাইকেল মধুসূদনের কতকগুলি সনেট আল্‌ফিয়েরির ছন্দের দৃষ্টান্তে রচিত বলিয়া বোধ হয়। গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে নিজ্ ইতালীতেই উগো ফোস্কোলো, কার্দ্দুচ্চি প্রভৃতি কয়েকজন আধুনিক কবি আল্‌ফিয়েরির পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে সনেটের প্রবর্ত্তক স্যার টমাস্ উইয়্যাট্। তাহার পর হইতে সার্রে, স্পেন্‌সার, সেক্সপীয়ার, মিল্টন, কাউপার, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, বায়রন, শেলি, কীট্‌স্, ব্যারেট্ ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্ণল্ড প্রভৃতি অনেকেই সনেট লিখিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে মিল্টনের এবং কীট্‌সের অধিকাংশ সনেট ছন্দ হিসাবে খাঁটি, অর্থাৎ ইতালীয় আদর্শের অনুরূপ। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কতকগুলি নিখুঁৎ, কতকগুলি অদ্ভুত। সেক্সপীয়রের সনেট কবিতা হিসাবে চমৎকার হইলেও ছন্দের হিসাবে ইতালীয়ের ধারে দিয়াও যায় না।

স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার লোপে দে-ভেগা সনেটের উপর একটী কৌতুকজনক সনেট লিখিয়াছিলেন। ইহার রচনাপদ্ধতি ইতালীয় আদর্শের অনুরূপ। আদিম সনেটের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য ছন্দ বজায় রাখিয়া নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল;—

"সনেটের উপর সনেট"

সনেট লিখিতে প্রিয়া হাস্যমুখে ফর্ম্মাইল মোরে;
সনেট লেখার মতো জ্বালা কিন্তু ত্রিভুবনে নাই।
সনেটে চৌদ্দটা মাত্র চোখা চোখা পংক্তি থাকা চাই;—
এরি মধ্যে দেখি তার তিনটা ফেলেছি ব্যয় করে!

ভেবেছিনু মিল্ দিতে আজি মোর যাবে মাথা ধরে,
এবে দেখি—আরে একি! পৌঁছেছি দ্বিতীয় শ্লোকে, তবু
'ষট্-পদের' আদ্যপদে একবার যদ্যপি পৌঁছাই,—
এ 'অষ্ট-পংক্তির' চিন্তা—স্পষ্ট দেখি—যাবে দূরে সরে।

সদ্য পৌঁছিলাম, দেখ, ষট্‌পদের আদ্য ত্রিপংক্তিতে;
আহ্লাদী লেখনী মোর বেগে ধায় মুখে মাখি' মসী;
প্রথম ত্রিপংক্তি শেষ! তা-তা-ধিন্! ধিন্-তা! তা ধিনা!

অন্ত্য-ত্রিপংক্তিতে এনু—ডগমগ হরষিত চিতে,
নাচিতে নাচিতে নেমে—এই এল পংক্তি ত্রয়োদশী;
এই তো কাবার! ধর! গুণে দেখ—চৌদ্দ হল কি না।

পেত্রার্কার অধিকাংশ সনেটের আকার ঠিক এইরূপ।

ইংলণ্ডের মতো ফরাসীদেশেও বহুদিন হইতে ইতালীয় সনেট-পদ্ধতি অনুকৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় রঁসার্দ্দের সময় হইতে ফরাসীভাষায় সনেটের চাষ সুরু হইয়াছে। সেখানে সনেটের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম আট পংক্তির বিন্যাস অবিকল ঠিক ইতালীয় সনেটের মত। কিন্তু শেষ ছয় পংক্তির বিন্যাস ঈষৎ বিকৃত হইয়াছে। ফরাসী কবিরা সনেটের নবম ও দশম লাইনে মিল দিয়া সেটকে আলাদা করিয়াছেন এবং ভাববিকাশের সুবিধার অনুসারে ওই দুইটা লাইন কখনো বা পূর্ব্বার্দ্ধের সঙ্গে জুড়িয়া দেন, কখনো বা উত্তরার্দ্ধের স্কন্ধে চাপান। কখনো সাতনরের ধুক্‌ধুকি, কখনো চন্দ্রহারের থামি। ফরাসী আলঙ্কারিকদের মতে এইরূপ করাই সমীচীন। ইহাতে, পড়িতেও বোধ হয় মধুরতর শোনায়। জর্ম্মানীর হায়েন্, ইংলণ্ডের সুইন্‌বার্ন্ এবং আলোচ্য "সনেট পঞ্চাশতের" কবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই ফরাসী পদ্ধতির অনুসারেই সনেট রচনা করিয়াছেন।

মাইকেলের "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রকাশিত হওয়া অবধি, বাংলাদেশের অনেক কবিই সনেট লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "চৈতালি" "নৈবেদ্য" ও অন্যান্য নানা গ্রন্থে প্রকাশিত সনেটগুলিই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য। তবে সেগুলি ছন্দহিসাবে ইতালীয় সনেটের মত নয়। "কড়ি ও কোমলের" কতকগুলি সনেট সেক্সপীয়রের সনেটের মত; আবার কতক-গুলি অনেকটা স্পেন্‌সারের মত। "নৈবেদ্যের" এবং "চৈতালির" সনেট গুলি ভাবগত ঐক্যে ও কেন্দ্রানুগতায় শ্রেষ্ঠতম সনেটের সমকক্ষ হইলেও "Vers Libre" বা মুক্তছন্দে রচিত চতুর্দ্দশ পংক্তির সমষ্টি। সনেটের আকৃতিগত বিশিষ্টতা উহার মধ্যে নাই; সনেটের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা অবশ্য যথেষ্ট আছে।

সনেটের প্রকৃতি

প্রাচ্যদেশীয় কোনো কবিতা-রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে সনেটের আকৃতিগত মিল নাই। সনেট সামগ্রীটা জোর করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারের শাসনে আনিতে হইলে, অবশ্য, উহাকে গীতি কাব্যের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে এবং কোষ কাব্যের অন্তর্গত "অকারাদি হকারান্তাত্মক্ষর" সূত্রানুযায়ী (অর্থাৎ বর্ণমালানুসারে সাজাইয়া) সনেট-সমষ্টিকে গ্রন্থবদ্ধ করিয়া "ব্রজ্যা" নামে অভিহিত করিলেও হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। Strophe এবং Ante-strophe বিশিষ্ট Greek Ode এর সঙ্গে চিতেন্ পর-চিতেন্-ওয়ালা কবির গানের সুদূর সাদৃশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু Sonnet এর সঙ্গে সংস্কৃত 'যুগ্মক' প্রভৃতির কোনোখানে কোনো মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! "জাপানী সনেট" তান্‌কার সঙ্গেও প্রকৃত ইতালীয় সনেটের কোনো মিল নাই; মালয় উপদ্বীপের "পান্তমের" সঙ্গেও না।

যদি কাহারও সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকে, তবে সে ইরাণের 'তর্জ্জী বন্দ্' 'মুসাম্মাৎ' এবং বিশেষ করিয়া 'মুরব্বা'র সঙ্গে আছে। মুরব্বা চারি শ্লোকের কবিতা, উহার প্রথম শ্লোকের প্রথম ও শেষ চরণে মিল থাকে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের শেষ চরণ প্রথম শ্লোকের শেষ চরণের সঙ্গে মেলে।

আকৃতিগত সাদৃশ্য তো নাইই, প্রাচ্যদেশীয় কোনো রচনা-রীতির সঙ্গে সনেটের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও নাই। সাদৃশ্য আছে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার সঙ্গে। তামাসা নহে, প্রকৃতই তাই। ইহার পূর্ব্বাংশের অর্থাৎ অষ্টদলের প্রথম চারি চরণে ভাব-বস্তু নিবেদিত হয়; বাকী চারি চরণে উদাহৃত হয়। শেষাংশের অর্থাৎ ষট্-পদকের প্রথম ত্রিপংক্তিতে (tercet, ভাব-বস্তু সংলগ্নীকৃত হয় এবং বাকী ত্রিপংক্তিতে উপসংহৃত হয়। জ্যামিতির আর বাকী কি? ইহাতে কবিতার একদিকে যেমন কোমলতার হানি হয়, অন্যদিকে উহা তেম্‌নি মর্ম্মর-প্রতিমার মত স্থির সৌন্দর্য্য লাভ করে। সনেটে বাক্যকে পল্লবিত করিবার উপায় নাই; বাচালতার অবসর নাই। যাহাদের ভাষা ভারে কাটে, ধারে কাটে না, তাহারা কখনো ভালো সনেট লিখিতে পারে না। যাহারা ফেনাইতে ভাল-বাসে, রস-সংযমে (reticence) অক্ষম, তাহারা সনেট লিখিলে তাহা কাঁচা থাকিয়া যায়। যাহাদের ওজনজ্ঞান প্রবল তাহারাই এই পাকা ছাঁচে ছাঁচ তুলিতে পারে। যে প্রকৃত গুণী সে বাঁশীর সাতটা ছিদ্র দিয়া হৃদয়ের হাজার-দরজা খুলিয়া দিতে পারে; যে বাস্তবিক নিপুণ শিল্পী সে সনেটের এই কঠিন বন্ধনের ভিতরেই মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়। সনেট সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট নিয়মানুসারে পরিকল্পিত, সংগঠিত ও পরিবর্দ্ধিত। উহা ক্ষুদ্র আয়তনে বৃহত্তের আভাস।

স্বর্গবদ্ধ মহাকাব্যের এবং পঞ্চ-লক্ষণসংযুক্ত দৃশ্যকাব্যের যেমন নিজস্ব নিয়ম আছে, সনেটেরও তেমনি বীজ হইতে বিকাশের স্বতন্ত্র নিজস্ব নিয়ম বর্ত্তমান। সনেট মাত্রেরই বিশেষ একটি ভাব, কিংবা বিশেষ কোনো হৃদয়াবেগ অথবা কবিজনের মনঃপূত বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার বা লৌকিক কোনো ঘটনা অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হওয়া বিধি।

প্রথমেই অষ্টদল (octave) পদের চারিটী দল খুলিয়া যাইবে ও ভাব-বস্তু উন্মেষিত হইবে; তারপর আর চারিটী পাপড়ি প্রস্ফুরিত হইয়া উহাকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। সর্ব্বশেষে ষট্ পদের মত ষট্‌পদক (sestet) আসিয়া উহাতে সংলগ্ন হইবে এবং উহাকে সার্থক করিবে। ইহাই সনেটের বিকাশ-বিধি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাট্য-রচনা-পদ্ধতিকে গো-পুচ্ছের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আরম্ভে ও অবসানে উহা সূক্ষ্মাগ্রগতিসূক্ষ্ম; মধ্যে স্থূল। আমার মনে হয় সনেট সম্বন্ধেও ঐ উপমা ব্যবহার করিলে খুব বেশী দোষের হয় না।

সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইখানে শেষ করিয়া "সনেট-পঞ্চাশতে" চৌধুরী মহাশয়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

নিজের মানসিক বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া, অথচ তাল-জ্ঞান ও ওজন জ্ঞান না হারাইয়া,

নব নব সৌন্দর্য্যের প্রতিমা-নির্ম্মাণ করাই যথার্থ কাব্য-শিল্পীর কাজ। পঞ্চাশটি সনেটের নাতিবৃহৎ এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় আমরা এই বিশিষ্টতা এই সৌন্দর্য্যানুভূতি ও ভাব-স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি। পাকা হাতের এবং পরিণত মনের ছাপ ইহার ছত্রে ছত্রে।

কবিতাগুলি প্রথম হেমন্তের শান্ত সন্ধ্যার মত "সুবর্ণে গৈরিকে" চিত্রিত। হেমন্তের হেম-সম্ভার ফলে ও ফসলে পলে পলে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে; কুবেরের ঐশ্বর্য্যের মত পিণ্ডীভূত সূর্য্যতেজ, কৌৎস ঋষির কৌষেয় উত্তরীয়ের মত সন্ধ্যার আকাশ রঙীন করিয়া তুলিতেছে। হেমন্তের হাওয়া উঠিয়াছে; ভরা ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে মন উদাস হইয়া আসিতেছে। পুরবী রাগিণীর সুরে সুর মিলাইয়া কবি বলিতেছেন:—

"উদাসিনি! তব মন্ত্রে হ'য়েছি উদাস।"

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবগাহন করিয়াও কেমন যেন ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বলিতেছেন:—

"তব প্রাণে ভালবাসা রয়েছে ঘুমিয়ে
জাগাতে পারিনি আমি হাজার চুমিয়ে।"

তখনি আবার পথিকের কলরব কানে আসিতেছে, কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ, পাপিয়ার গান,—পৃথিবীর চিরনবীনতার কথা হাজার রকম করিয়া দিকে দিকে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে, কবির মন আবার সুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাই তিনি বলিতেছেন:—

"কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছে প্রাচীন?"
"আজিও প্রকৃতি আছে সবুজে সৌখীন;
নরনারী আজো ধরে পরস্পরে বক্ষে,—
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন্!"

আবার পর মুহূর্ত্তেই বলিতেছেন:—

"—অন্তরে মোর গভীর বিরাগ
হেমন্তের রাত্রি হেন থাকে গো জড়িয়ে।—
যাহার সর্ব্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ।"

এই রকম করিয়া কবি বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙের সুতার সঙ্গে অনুরাগের জরির সুতা মিলাইয়া সরস্বতীর অঙ্গে নূতন জড়োয়া চেলি জড়াইয়া দিয়াছেন।

সনেট পঞ্চাশৎ পদে পদে আমাদিগকে চকিত-চমৎকৃত করে, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে, চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপিত—উত্তেজিত—এমন কি প্রকুপিত করিয়া তোলে বলিলেও ভুল বলা হয় না। অন্তঃকরণের মধ্যে জীবনের ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এ গুলিকে লইয়া খুসী হইতে পারা যায়, তর্ক করিতে পারা যায়, ঝগড়া করিতে পারা যায়, আর রসান্বেষী রসিক হইলে ইহার দ্বৈত ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের ছন্দ আবিষ্কার করিয়া আনন্দিত হইতে পারা যায়।

"কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিশ্বাস
পক্ষে পক্ষে ফিরে আসে সংশয় বিশ্বাস।"

এমন সহজ সত্য কথা এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া বলিতে অনেকদিন শোনা যায় নাই। ইহা আমাদের মত সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা; সাধকের বা সাধুর মুখে ইহা শোভন না হইতে পারে; ধর্ম্মসংহিতায় ইহার স্থান না থাকিতে পারে, তবুও ইহা প্রকৃত সাহিত্য, কারণ সাধারণ মানুষের মনের কথা লইয়া ইহার কারবার।

সম্প্রতি দেশে একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমানযুগের বাংলা সাহিত্য টিকিবে না,

তাহার কারণ, দেশের ধর্ম্মে উহার ভিত্তি নাই। আমাদের দেশে পুরাতন ঘেঁটুর পাঁচালি এবং মাকাল-মঙ্গল যে আজও বাঁচিয়া আছে তাহা কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া। ভারতচন্দ্র দেশের ধাতু বুঝিতেন তাই বিদ্যাসুন্দরের বুকে পিঠে কালীনামের নামাবলী বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মাথার ভিতর এমন কোনো মৎলব ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, তা' বাংলাভাষার হঠাৎ-মুরুব্বিরা যাহাই বলুন। আর তেমন মৎলব থাকিলেও বড় আসে যায় না। কারণ ভারতচন্দ্রের রচনা যে লোকে এখনো পড়ে, সে কেবল তাঁহার ভাষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া। ভারতচন্দ্র প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই এখনো টিঁকিয়া আছেন। নহিলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া আরো অনেকেই তো কাব্য লিখিয়াছিলেন, আর তাহাতে কালীনামের জোড়া-তালিও তো যথেষ্ট ছিল, তবে সে সব কাব্য স্থায়ী হইল না কেন? এমন কি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও টিঁকিল না কেন? উত্তর সহজ—সাহিত্য হয় নাই বলিয়া। নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরিচয় ছিল না বলিয়া। কান্তার মত মানুষের মন হরণ করিবে, তবেই না কাব্য; সেই মনই যখন বশ করিতে পারিল না, তখন বাঁচিবে কি করিয়া? কি লইয়া? কাহার জোরে?

বিশ্বাসও যেমন মনের ধর্ম্ম সংশয়ও তেম্‌নি; ইহার মধ্যে যে কোনো একটিকে একঘ'রে করিয়া রাখা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উহাতে আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে পায় না।

"দু'মনা করাই" হয় তো সাধারণ মানুষের "দুর্গতির মূল" কিন্তু, উহাই মানুষের মনের ধর্ম্ম। অবস্থায় পড়িয়া আমরা কখনো নিতান্ত জড়বদীর মত বলিঃ—

"নাহি জানি অশরীরি মনের স্পন্দন
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।"

আবার পর মুহূর্ত্তেই মুগ্ধচিত্তে বলিতে হয়—

"রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ স্পর্শন।"

এই পরিবর্ত্তনই মানুষের ধর্ম্ম; এই পরিবর্ত্তনে, এই ভাব হইতে ভাবান্তরে পর্য্যটনেই মানুষের চিত্ত বিহঙ্গ ডানায় বল সঞ্চয় করে। গেটে যাহাকে Duration in change বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভাব-সন্ধির অন্তর্দশা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অবশ্য সেটুকুরও অস্তিত্ব থাকা চাই; নহিলে সমস্তই খাম্‌খেয়ালি হইয়া উঠে, পাগলামি হইয়া উঠে। মানুষের মতামত সম্বন্ধেও একথা খাটে! গালিই দাও আর অভিশাপই দাও পরিবর্ত্তনই মানব মনের বিশেষত্ব; তাই একই মানুষ "নাস্তিকের শিরোমণি" হইয়াও "আস্তিকের রাজা।" হইতে পারে—

তার "ধর্ম্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা।"

সনেট পঞ্চাশতের কবি আমাদের এই বহুরূপী মূর্ত্তিটী ধরিয়া দিয়াছেন; ভাষায় ভাব-জীবনের অপূর্ব্বছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; সেজন্য আমরা তাঁহার কাছে ঋণী।

আমরা বহুরূপী, কাজেই আমাদের সাহিত্য বহুরূপী, আমাদের দর্শন বহুরূপী, আমাদের শিল্প বহুরূপী। আমরা শূন্যপুরাণ লিখিয়াছি, আমরা মনসার ভাসান লিখিয়াছি, আমরা অন্নদামঙ্গল লিখিয়াছি। আবার আমরাই মেঘনাদ রচিয়াছি, পদাবলী রচিয়াছি, গীতাঞ্জলি গাহিয়াছি। আমরাই স্বভাবের নকল করিয়া কৃষ্ণনগরের পুতুল গড়ি, আবার আমরাই ভাবপ্রধান ভারতীয় চিত্র কলায় নবজীবন সঞ্চারিত করি। আমরাই প্রখর বুদ্ধির খেলা দেখাইয়া নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি এবং তর্ক-বিলাসিতার চূড়ান্ত করিয়াছি; আবার আমরাই ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উন্মাদের মত দেশে দেশে উদ্দাম নৃত্য করিয়া ফিরিয়াছি। আমরা যখন খৃষ্টান হইয়াছি তখন একেবারে প্রোটেষ্টাণ্ট হইয়াছি; সাক্ষী কৃষ্ণ বন্দ্যো, লাল বিহারী, কালিচরণ প্রভৃতি। যখন মুসলমান হইয়াছি তখন একেবারে সুন্নি; সাক্ষী বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম। কিন্তু যতক্ষণ পুরাতন ধর্ম্মে আছি, ততক্ষণ কেবল নিত্য-নূতন অবতারের স্বপ্ন দেখিতেছি।

এই বহুরূপীর নিজস্ব মূর্ত্তি কোনটি তাহা ভগবানই জানেন। ইহার শক্তি অনুসারে, শক্তির বৈচিত্র্য অনুসারে ইহার কর্ম্মক্ষেত্র যে বহুবিস্তৃত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। চৌধুরী মহাশয় এই বহুরূপীর বহুরূপের পঞ্চাশখানা ফোটো তুলিয়া তাহার উপর পঞ্চাশটা সনেট না লিখুন, তবু তিনি যে আমাদের মানস-জীবনের বিচিত্র মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাহা ছাড়া ফোটো তোলা তো কবির কাজ নয়, উহা তো যন্ত্রের কাজ বা যন্ত্রবৎ জড়-ভরতের কাজ। উহাতে মানুষের পরিচয় কোথায়? অন্তঃকরণের পরিচয় কোথায়? কবির কাজ হইল উদ্বোধিত করা। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা অভিনবতার সমাবেশ দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে সজীব রাখা। কবি দৈত্যপুরীর সকল দিকের সকল কুঠারীর চাবিই খুলিয়া দিবেন; তাহাতে, যে খুসী হয় হোক্, যে ভয় পায় পাক। কঙ্কাল সঞ্চিত আছে বলিয়া কোনো প্রকোষ্ঠ চিরকালের জন্য বন্ধ রাখা চলে না।

* * *

কথায় বলে "Criticism is a mode of auto-biography" সমালোচক কবির সৃষ্ট সামগ্রী নিজের চোখ দিয়াই পরখ করেন; অন্য উপায় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি যে ভাবে সনেট পঞ্চাশতের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা কবির মতের সঙ্গে নাও মিলিতে পারে।

চৌধুরী মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বাহুল্য। যাঁহারা তাঁহার গদ্য-রচনা 'তেল-নুন্-লকড়ি প্রভৃতি পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে সনেট পঞ্চাশতের খাঁটি, অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সরল ভাষার গুণ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এম্‌নি ভাষাতেই কাব্য লিখিতেন। ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিয়া সনেট-পঞ্চাশতের ভাষার বিশেষত্ব বুঝাইতে আমি অক্ষম।

সনেট পঞ্চাশতে "জোর-করা" ভাব আর "ধার-করা" ভাষার নাম গন্ধ নাই। স্থানে স্থানে হাল্‌কা ভাব আছে কিন্তু জোর-করা ভাব নাই; জায়গায় জায়গায় ভাষা হয় তো গদ্যের গা ঘেঁষিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা নিজস্ব, মার্কা-মারা; ধার-করা নয় এদিকেও কবির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ।

বিখ্যাত সমালোচক ওয়াল্‌টার পেটার যাহাকে "Gem like flame" বলিয়াছেন চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে চিত্তপ্রসাধনের সেই চিরন্তন চিহ্ন সেই রত্ন কল্প-স্থির-দীপ্তি বিদ্যমান। তাঁহার অধিকাংশ সনেট এই রত্ন-কল্প-স্থির দীপ্তির আলোকে সমুজ্জ্বল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হাসি

জননীর অঙ্কে শুয়ে
হেসেছিল, সে যখন
সে হাসিতে দেখেছিনু
ঊষালোক সুশোভন।
যখন বালিকা ক্ষুদ্র
হেরেছি তাহার হাসি,
তাহাতে ছড়ান ছিল
যুঁই ফুল রাশি রাশি।
সলজ্জ মধুর হাসি
দেখেছি যৌবনে তা'র,
সে হাসিতে ছিল মাখা
লুকোচুরি চন্দ্রমার।
পুত্রমুখ চুমি' চুমি'
হেসেছিল সে যখন,
হেরেছি সে হাসি হ'তে
সুধাধারা বরিষণ।
যে হাসি হাসিয়া, আহা!
সে গেল ত্যজিয়া ধরা,
দেখিয়াছি সে হাসিও
সন্ধ্যার করুণা-ভরা।
সাঙ্গ সে হাসির খেলা;—
আজি ভাবি অনিবার,—
সব চেয়ে সুমধুর
কোন্ সে হাসিটি তা'র?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আজ

(১)

প্রথম স্বপনে যবে এসেছিলে হেসে,
—ছিলে মোর আরাধ্য রতন;
তোমার হৃদয়ে ছিল প্রাণভরা প্রেম,
ছিল কিবা আনন্দ স্পন্দন!

থেমে গেছে সে পুলক লীলা;
—বিজলীর জ্যোতি ম্লান! গতি সুমন্থর!
চরণে শিকল, বুকে শিলা!

(২)

আজ তুমি পুরাতন, অন্তর তোমার
জাগে শুধু—জীর্ণ প্রাণ লয়ে।
জগত সেই ত হাসে চাঁদের কিরণে
ভরা প্রাণে নদী যায় বয়ে!
চিরন্তন প্রীতিটুকু তার প্রাণে আছে
পুরাতনে তাই সে নূতন!
দুদিন এসেছ এই— এরি মধ্যে হায়
তুমি হ'য়ে গেলে পুরাতন!

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

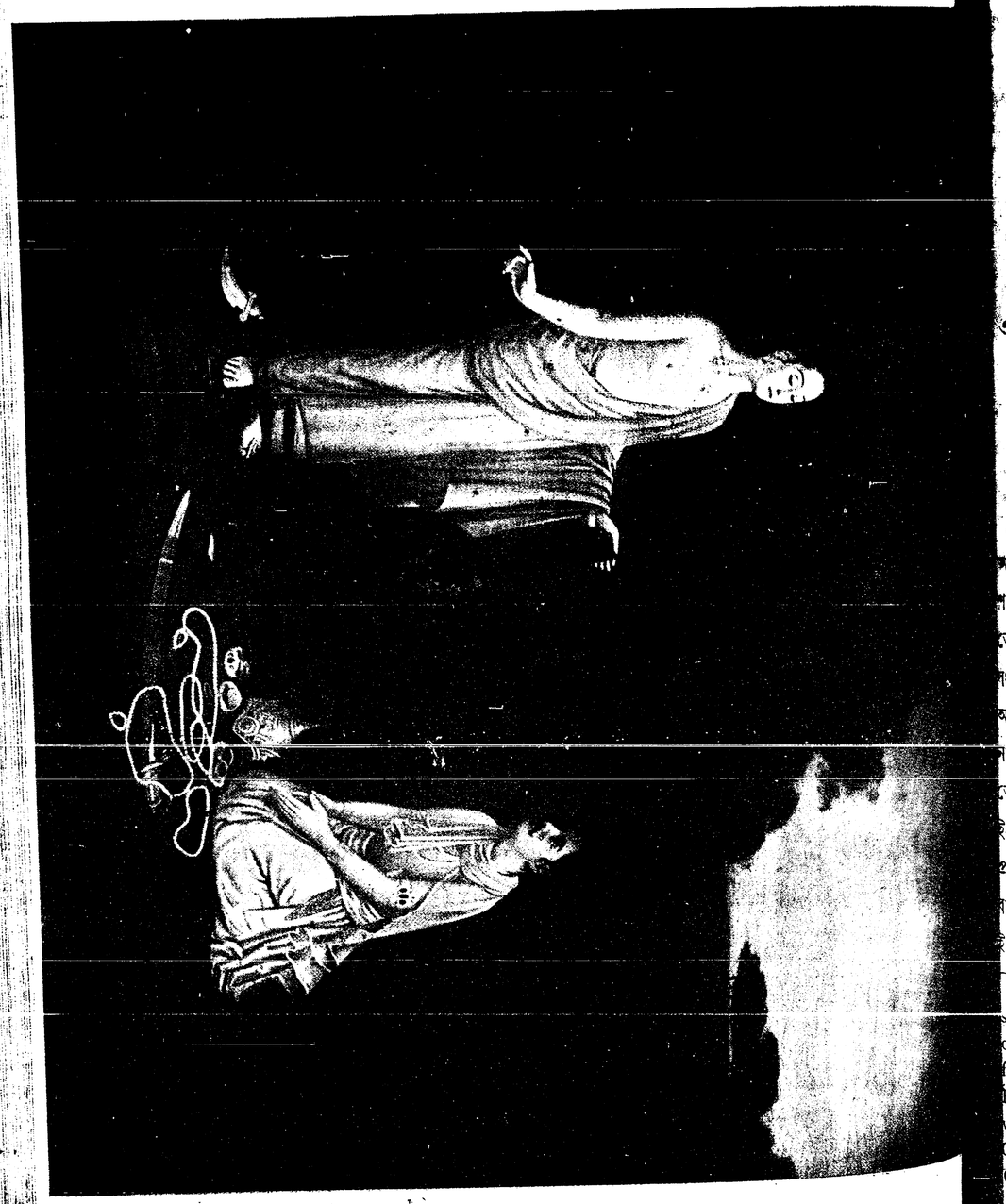

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২০ [৫ম সংখ্যা

হোলাকা বা হোলির প্রকৃততত্ত্ব

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের অন্যতম প্রমাণ)

হোলি বা দোলোৎসবের নাম হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। দুর্গোৎসব যেমন হিন্দুর শারদীয় মহোৎসব, দোলযাত্রা বা দোলোৎসব তেমনই হিন্দুর বসন্তমহোৎসব। এই হোলি সংস্কৃত হোলাকা বা হোলিকা নামেরই অপভ্রংশ। হোলাকা বা হোলিকা সংস্কৃত নাম হইলেও ইহার মূলার্থ অবধারণ করা তেমন সহজ নহে। কিন্তু ইহার অস্পষ্ট অর্থই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অন্যতর বলবত্তর প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিক ইহার প্রকৃতার্থের উদ্ধার হইলে ইহাতে কিরূপ কৌতুকাবহ পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা আমরা দেখিতে পাইব। ইহার প্রকৃতার্থের উদ্ঘাটন জন্য আমরা প্রথম ভারত ইতিহাসে অনুসন্ধান করিব না কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের আদিজ্ঞাতি পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিব। কর্ণেল টডের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে বসন্তসমাগমে প্রাচ্যজাতিদিগের মধ্যে যেমন অশ্বমেধরূপ আনন্দোৎসব হইত পাশ্চাত্যদিগের মধ্যেও তদনুরূপ আনন্দোৎসব হইত। স্কন্দনভীয়দিগের মধ্যে ইহার নাম ছিল "হ:য়েল" বা "হায়ুল"। Cyclopædia of India * (ভারতকল্পদ্রুম)

* Col. Tod surmises that at the grand solstitial feslival, the Aswa Medha or sacrifice of the horse (The type of the sun), which was practised by the children of Vaivaswata the 'Sun-born' was most probably simultaneously introduced from Scythia into the plains of India, and west by the sons of Odin, Woden, or Boodha into Scandinavia where it became the Hiel or Hi-ul, the festival of the winter solstice the grand jubilee of northern nations and in the first ages of Christianity, being so near the epoch of its rise, gladly used by the first fathers of the Church to perpetuate that event." Cyclopœdia of India by Balfour p. 196.

নামক গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

"কর্ণেল টড্ অনুমান করেন যে শীত-সংক্রান্তির মহোৎসব সময়ে বৈবস্বত মনুর সন্ততিবর্গ কর্ত্তৃক যে অশ্বোৎসর্গ বা অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইত তাহা সম্ভবতঃ শক্‌দিগের দেশ হইতে ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে যেমন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তেমনই প্রতীচ্যদেশে ওডিন্ (বুধ) সন্তানকর্ত্তৃক স্কন্দনভীয়াতেও একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তথায় ইহা 'হায়েল' বা 'হায়ুল' এই নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা উদীচ্য জাতিদিগের সুমহান্ প্রমোদোৎসব। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি সময়ের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার আদি-বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তৎকালের যাজকগণকর্ত্তৃক এই মহোৎসবটী অনুসৃত হয়।"

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরি উল্লিখিত বসন্তোৎসব—ইষ্টার রবিবার (Easter Sunday) শ্বেত রবিবার (White Sunday) প্রভৃতি পর্ব্ব বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়। ইষ্টার নামের উৎপত্তির ইতিহাস Chambers's Twentieth Century Dictionaryতে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদের মন্তব্যের যথেষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায়—যথা "Bede derives the word from Eastre, a goddess whose festival was held at the spring equinox." ইহার অর্থ এই যে বিড্ (সাহেব) ইষ্টার নামক দেবী হইতেই ইষ্টার শব্দটী উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন; বসন্তকালে সূর্য্যের বিষুবরেখায় আগমন সময়েই ইহার উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

কর্ণেল টড্ পূর্ব্বোক্ত হায়ুল নামটি 'হয়' ও 'উল' শব্দযোগে নিষ্পন্ন করিয়া ইহার অর্থ অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছেন। এখানে আমরা যজ্ঞেশ্বরবাবুর "রাজস্থানে"র অনুবাদ হইতে কর্ণেল টডের মতের মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

"শীত সংক্রান্তিতে এই অশ্বমেধোৎসব সমাহিত হইত। রাজপুত, স্কন্দনভীয়, অশ্ব ও জিৎ সকলেই এক সময়ে এই মহোৎসব সম্পাদন করিতেন। বাল্‌টিক সাগরোপকূলবর্ত্তী প্রাচীন জর্ম্মন্‌গণ এই যজ্ঞকে হয়োল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হয় (অশ্ব) এবং উল (দাহ করা) এই শব্দদ্বয়ের মিশ্রণে হয়োল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দটী যে জর্ম্মন্‌গণ সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" (সচিত্র "রাজস্থান" বসুমতীর ছাপা ৫পৃঃ।)

উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে দোলোৎসব যে অশ্বমেধরূপে প্রথম অনুষ্ঠিত হইত তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। বর্ত্তমানে দোলোৎসবের পূর্ব্ব দিবসের সায়ং সময়ে যে বহ্ন্যুৎসব হয় এবং তাহাতে যে তণ্ডুলের গুড়িকানির্ম্মিত মেষ বলিরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণেল টডের মতানুসরণ করিলে আমরা 'হয়োল' শব্দকেই হোলিকা শব্দের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু কর্ণেল টডের অনুমানটিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইলেও, ইহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইতে পারি না, কারণ তাঁহার অনুমিত 'হয়োল' শব্দের নিদর্শন সংস্কৃত ভাষার অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা স্কন্দনভীয়-

দিগের হায়েল বা হায়ুল এবং ভারতীয় হিন্দুদিগের 'হোলাকা' 'হেলিকা' বা 'হোলি' উভয়েরই সূর্য্যবাচক সংস্কৃত 'হেলি' শব্দটীকেই মূল বলিয়া মনে করি। স্কন্দনভীয়দিগের মধ্যে আমরা হোলি শব্দের অপভ্রংশমাত্র দেখিতে পাইলেও, গ্রীকদিগের সূর্য্যবাচক Helios শব্দে ইহার অধিক অবিকৃত রূপ দেখিতে পাই।

দক্ষিণায়নের ছয় মাস অদর্শনের পরে উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণ যখন সূর্য্যকে উত্তরায়ণে প্রথম উদিত দেখিতে পাইতেন তখন তাঁহাদের মনে যে অপার আনন্দের আবেগ উপস্থিত হইত হোলি উৎসবের দ্বারাই তাঁহারা ইহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। শীতের নির্জ্জীব ভাবের পর সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতিতে বিষুবরেখায় প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বারা উত্তর কুরুর প্রকৃতি-জগতে যে নবজীবন ও নবস্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইত, হোলিকা উৎসবে তাহাই পূর্ণ প্রকাশ পাইত; সুতরাং এই উৎসবটী যে কিরূপ হৃদয়মনউন্মাদনকারী হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

অশ্বমেধ ও হায়োল উৎসব যে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইত তাহা আমরা উপরে দেখাইলাম কিন্তু হোলিকা উৎসব আমরা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে দেখি। ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে করিতে হইবে এসম্বন্ধে স্বতঃই আমাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এতৎ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদে বিষ্ণু সূর্য্যেরই বিকাশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর ধ্যানেও আমরা ইহারই স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই যথা :—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ইত্যাদি।" এখানে সূর্য্যমণ্ডলকে বিষ্ণুর স্থানরূপে নির্দ্দেশ করায় বিষ্ণু ও সূর্য্য যে অভিন্ন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

হোলিকা উৎসবের অপর নাম "ফল্গুৎসব"ও পাওয়া যায়। আমরা অভিধানে এই ফল্গু শব্দের রেণু ও বসন্তঋতু এই উভয় অর্থই দেখিতে পাই। বসন্তঋতু ও রেণু অর্থের একত্র যোগের দ্বারা এখানে রেণু আমরা পুষ্পরেণু বলিয়াই মনে করি। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ফল্গু শব্দের অপভ্রংশে ফাগু শব্দই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের দ্বারা বসন্তঋতু প্রবর্ত্তিত হইয়া চিত্রবিচিত্র পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে সুখোষ্ণ বসন্ত পবনদ্বারা ঐ সমস্ত পুষ্প হইতে পরাগ সকল চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে যে চিত্ত-বিমোহন ক্রীড়াময় স্ফূর্ত্তিময় উদ্দামভাব ব্যাপ্ত করে ফল্গুৎসবে তাহারই চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফল্গুৎসব যে হোলিকা উৎসবেরই ন্যায় আর্য্যজীবনের আদিকালের উৎসব তাহার প্রমাণ আমরা গ্রীক্‌দিগের বাসন্তীদেবীর (Phagesia) নাম হইতেই পাইতে পারি।

আমরা উপরে ফল্গুর অপভ্রংশ যে ফাগু শব্দের উল্লেখ করিয়াছি ফাগেসিয়া নামেতে আমরা তাহার প্রায় অবিকলরূপই বিদ্যমান দেখিতে পাই।

উপরে আমরা প্রাচ্য হোলিকা বা হোলি এবং ফল্গুর সহিত পাশ্চাত্য হায়েল বা হায়ুল এবং ফাগেসিয়ার তুলনা দ্বারা যে সৌসাদৃশ্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম তাহা হইতে আমরা

সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে আর্য্যগণের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যশাখার একত্র বাসের সময়েই তাহাদের মধ্যে হোলিকা বা হোলি উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহাদের একত্র বাস যে উত্তর কুরুতে হইয়াছিল হোলিকা উৎসবের মূল বর্ণনা হইতে আমরা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। হোলিকা শব্দটী সূর্য্যের হেলি নাম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যের সহিত যে হোলিকা উৎসবের বিশেষ যোগ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এবং এই যোগ যে কেবল বসন্তকালের যোগ নহে কিন্তু দক্ষিণায়ণের ছয় মাস অদর্শনের পর উত্তরায়ণে সূর্য্যের প্রথম প্রকাশের সহিত যোগ তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়।

যে সমস্ত স্থানে সর্ব্বদা সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে তথায় বসন্তকালের সূর্য্য তেমন বিশেষভাবে লক্ষিত হওয়ার কথা নয়; কিন্তু যে সমস্ত স্থানে সূর্য্য দীর্ঘকালের জন্য অদৃষ্ট থাকে সেইখানেই দীর্ঘকাল অদর্শনের পর ইহার প্রথম দর্শন বিশেষভাবে লক্ষিত হওয়ার ও তাহাতে লোকের মনে বিশেষ প্রমোদ্‌ভাব সঞ্চারিত হইবার কথা। উত্তর কুরু ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী স্থানসকলেই সূর্য্য দক্ষিণায়নের ছয় মাস অদৃষ্ট থাকিয়া পুনরায় উত্তরায়ণ গতিতে বসন্তকালে বিষুবরেখায় আসিয়া প্রথম প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং উত্তরমেরুমণ্ডলের সন্নিহিত স্থানসকলে সূর্য্যের এবম্প্রকার নব-প্রকাশের দ্বারা যে লোকের মধ্যে নবজীবনের নবোৎসব জাগরিত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইজন্যই আমরা প্রাচ্য উত্তরকুরুবাসী এবং জার্ম্মেন ও স্কন্দনভীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী জাতিদিগের মধ্যেই বসন্তোৎসবের বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই।

মুসলমানগণ ইদ্ পর্ব্বের সময় কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়ের পর কিরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পরস্পরে মিলিত হইয়া শুক্লপক্ষের নবোদিত ইন্দুকলা (যে ইন্দু হইতে তাহাদের ইদের নাম হইয়াছে) সন্দর্শন করে তাহা সকলেরই সুবিদিত। উত্তরকুরুতে ছয় মাসের পর উত্তরায়ণের প্রথম সূর্য্য দর্শনে লোকের মনে যে তদপেক্ষা কত গুণ অধিক আনন্দ ভাব উচ্ছলিত হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ছয় মাসের সোৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার পর উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণ যখন সূর্য্যকে প্রথম দেখিতে পাইলেন তখন আনন্দভাবে বিহ্বল হইয়া সূর্য্যের "হেলি" নাম লইয়া "ঐ হেলি" (সূর্য্য); "ঐ হেলি" (সূর্য্য) বলিয়া যে ইহাকে অভিনন্দিত করিতেন এবং অন্যকে এই সংবাদ প্রদান করিয়া অভিনন্দনের জন্য সাদর আহ্বান করিতেন আমরা এইরূপ কল্পনা করিলে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। বরঞ্চ এইরূপ কল্পনা হইতে ইহা আমরা পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব যে মুসলমানদিগের চন্দ্র দর্শনের উৎসব যেমন চন্দ্রের 'ইন্দু' নাম হইতে ইদ্ নামে আখ্যাত হইয়াছে—হিন্দুদিগের সূর্য্যদর্শনের উৎসবও তেমনই সূর্য্যের হেলি নাম হইতে হোলিকা নামে আখ্যাত হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বসন্ত পর্ব্ব সকল যে উত্তর-ইউরোপের বসন্তোৎসবেরই অনুকরণে পরিকল্পিত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইষ্টার সান্‌ডে, হোয়াইট সান্‌ডে প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্ম্মের বসন্ত-পর্ব্বসকলে আমরা যে সূর্য্যবাচক সান্ (Sun) শব্দের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পাই তাহাতেও সূর্য্যের সহিত বসন্তোৎসবের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় নিদর্শন পাই। ইষ্টার নামটী পর্য্যন্ত যে বসন্তকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইষ্টার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। এই ইষ্টার (Eastre) দেবী আমাদের নিকট গ্রীক্ ইয়োস্ (Eos) দেবীর নামেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। গ্রীক্ ইয়োস্ দেবী আমাদের ঊষা দেবীরই নামান্তর মাত্র। বসন্তকালে উত্তরায়ণ গতিতে সূর্য্য বিষুবরেখায় প্রথম যে প্রভাতে উদিত হইতেন—সেই অপূর্ব্ব নব সৌন্দর্য্য-শালিনী প্রথম বসন্তঊষাই—ইষ্টারদেবী এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের উত্তর কুরুবাসী আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের উত্তরায়ণের প্রথম সূর্য্য দর্শনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতেই বর্ত্তমান হোলি উৎসবের উৎপত্তি এবং সূর্য্যের নামানুসারে হেলি উৎসব বা সূর্য্য উৎসব ইহাই ইহার নামের প্রকৃত মূলার্থ।*

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রেলযাত্রী

(গল্প)

একটি ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন এক্সপ্রেস ট্রেণ্ প্ল্যাট-ফরমে আসিয়া গিয়াছে। আমার একে থার্ড ক্লাসের টিকিট তাহার উপর আবার যখন দেখিলাম যে আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছে, তখনই বুঝিলাম যে কপালে বহু কষ্ট আছে। যে গাড়ীতে উঁকি দিয়া দেখি, সেই গাড়ীই ভর্ত্তি। বাঙ্গালী আরোহী থার্ডক্লাসে ত দেখিতে পাইলাম না; ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের জানালা হইতে চসমামণ্ডিত-চক্ষু এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক উঁকি দিতেছেন দেখিলাম। থার্ড ক্লাসের সকল গাড়ীগুলিই হিন্দুস্থানি স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ। এক একটি কামরায় ঢুকিতে যাই, অমনি তাহাদের দারুণ কলরব। মহা মুস্কিল হইয়া পড়িল, গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে এ গাড়ি হইতে ও গাড়ি ছুটাছুটি করিতেছি এমন সময় থার্ডক্লাসের একটি গাড়ির জানালা হইতে একজন মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয় কোথায় যাবেন?" রেলগাড়িতে সকলেই স্বার্থপর। পাছে অপর কেহ উঠে এই ভয়ে বড় একটা কেহ যাচিয়া আলাপ করেন না। তাই ইহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তৎক্ষণাৎ মুটিয়াটিকে পিছনে

* চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে পরিগৃহীত।

লইয়া সেই গাড়ীর দ্বারে গিয়া বলিলাম "আসানসোল। একটু জায়গা হবে কি?" "আসুন না" বলিয়া ভদ্রলোকটি দরজা খুলিয়া দিলেন। কুলির মাথা হইতে তোরঙ্গ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। বক্‌সিসের জন্য কিছুক্ষণ গোলমাল করিয়া সে চলিয়া গেলে তোরঙ্গটিকে একটি বেঞ্চের নীচে ঠেলিয়া দিয়া ও বিছানাটি উপরকার ঝোলান তক্তাখানির উপর রাখিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়ীর মধ্যে আর দুই জন বাঙ্গালী রহিয়াছেন। তাঁহারা প্ল্যাটফর্‌মের দিকের বেঞ্চে বসেন নাই বলিয়া ছুটোছুটি করিবার সময় দেখিতে পাই নাই। একজন শীর্ণকায়; তাঁহার গায়ে একটি কাল কোট, গলায় কম্ফর্টার জড়ান, কোটের উপর একখানি সবুজ আলোয়ান, থান ধুতি পরিধান, পায়ে ক্যান্‌ভাসের জুতা। তিনি একটি ব্যাগের উপর হেলান দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। আর একজন বেশ বাবুগোছের,—তাঁহার গায়ে আলষ্টার, মাথায় নাইট ক্যাপ্। সিগারেট ধরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি ধূমপান করিতেছিলেন। যে ভদ্রলোকটি আমাকে সেই গাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন, তিনি স্থূলকায়; তাঁহার গোঁফ, দাড়ি কামানো; গায়ে একখান বালাপোষ, পায়ে চটিজুতা। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া মনে হইল!

আমি বসিয়া বলিলাম "ওঃ, আজ দেরীতে এসে যে বিপদে পড়েছিলুম। কোনও গাড়ীতে আর জায়গা পাই না। আর ভীড়ও কি অসম্ভব হইয়াছে।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন "এই শীত, তবু গাড়ীর ভিতরে বসে কি রকম গরম বোধ হচ্ছে! যেন হাঁফ ধরবার যোগাড়।" তিনি একে স্থূলকায়—তার উপর আমাকে বসিবার স্থান দিয়া আমার ও একজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানীর চাপে পিষ্ট হইতেছিলেন। কাজেই হাঁফ লাগিবার কথা।

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি ব্যাগ হইতে জর তুলিয়া লইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "গরম! তা হবেই ত'। আমি এ গাড়ীতে রয়েছি। গরম হবে না? শীতের দিনে ভালই ত!"

আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। প্রথমে মনে করিলাম তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবে কৌতুকের কোনও লক্ষণ বোঝা গেল না। আলষ্টারপরা বাবুটি মুখ হইতে এক রাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন "কি রকম?"

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন "এই দেখুন না কেন সূর্য্য আমার কাছে কাছেই থাকেন। যেখানে থাকি সেখানে কাজেই রোদ হয়। গরম বেশ পড়ে।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম। শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন "আপনারা কি ঠাট্টা মনে করলেন না কি? আমি ঠাট্টা কচ্ছিনে। বিলাতে এত ঠাণ্ডা কেন জানেন? সেখানে আমি যাইনা। আমি থাকলে সূর্য্য আমার কাছেই উঠ্‌ত। সে দেশটাও গরম হ'ত।"

বাবুটি সহাস্যে বলিলেন "তবে সাহারা মরুভূমি এত গরম কেন? মহাশয় ত আর সেখানে থাকেন না।" উত্তর হইল, "সাহারায় বালি আছে, শীঘ্রই গরম হয়। সেই তার

কারণ।" আমরা সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম।

তিনি অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "হাস্‌ছেন যে? আমি কি তামাসা কচ্ছি? আমি কে জানেন? বিলাসপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার কিরণচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন? আমিই সেই কিরণচন্দ্র বসু।" কথাগুলি এরূপ ভাবে উচ্চারিত হইল, যেন তিনি কোন ছদ্মবেশী সম্রাট আত্মপ্রকাশ করিলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

আমি অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম "সূর্য্য আপনার কাছে থাকেন কি রকম?" তিনি তখন ব্যাগ খুলিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি হাতে করিয়া বলিলেন "আপনারা ত সকলে জানেন পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু ইহা ভ্রম। বিষম ভ্রম। পৃথিবী স্থির। সূর্য্যই ঘুরিতেছে। আমিও আগে আপনাদের মত ভুল শিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে ভুল আর নাই। আমি প্রমাণ করিতে পারি যে সূর্য্য ঘুরিতেছে। এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখুন।" এই বলিয়া সেই কাগজ তাড়াটি আমার হাতে দিলেন। খুলিয়া দেখি এক সুবৃহৎ প্রবন্ধ। ভাষার খুব বাঁধুনি। "আজ পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী বহু মনীষিগণের বিশ্বাস যে নিউটন, গ্যালিলিও প্রভৃতির প্রচারিত মত অভ্রান্ত। কিন্তু ধীরভাবে প্রমাণের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অমূলক।..." ইত্যাদি। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি আমার কাণে কাণে বলিলেন, "ও পাগল।" আমিও তখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি তখন বলিলাম "মহাশয় এ গূঢ় সত্য কতদিন জানিতে পারিয়াছেন?"

"শুন্‌বেন? সে অনেক কথা। আপনাদের সব খুলিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন।

"আমার প্রথম চাকরি এতনাদপুর গ্রামে। তখন সবে বি,এ পাশ করিয়াছি। বেঙ্গলীতে এক চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ষ্টেশনের নিকট ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে একটি ছোটখাট স্কুল। সেই স্কুলে ইংরাজী পড়াইতে হইবে।

প্রথম যেদিন আমার কর্ম্মস্থলে পৌঁছিলাম, সেদিন রবিবার। স্কুল বন্ধ। স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। তাঁহার নাম—লালা রামকিশোর। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া ছোট স্কুলবাড়ীটিতে লইয়া গেলেন। সেইখানেই আমার বাসের জন্য একটি ছোট ঘর পাইলাম। বেতন অধিক নয়, নিজেই রাঁধিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। বাসন মাজিবার জন্য গ্রামস্থ একটি রমণী নিযুক্ত হইল। তাহার নাম জানকী।

প্রথম যেদিন সে কাজ করিতে আসিল, তাহার সঙ্গে নয় দশ বছরের একটি ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি অতি সুন্দর। বড় বড় চোখ, কালো গোছা গোছা চুল অযত্নে মুখের আশে পাশে পড়িয়াছে, আমি জানকীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কে?"

জানকী এক করুণ কাহিনী শুনাইল। বালকের পিতামাতা উভয়েই মৃত। বালক যখন দুই বৎসরের তখন তাহার ভার লইবার আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা জানকীরও

আর কেহ আত্মীয় নাই। তাই সে পরমযত্নে বালকটিকে লালনপালন করিয়াছে। জানকীর শেষ বয়সে এই বালকটিকে পাইয়া তাহার চি'সঞ্চিত মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাইয়া তাহাকে সে স্নেহযত্ন করিয়া আসিতেছে।

এরূপ অপরিসীম আদর পাইলে স্বভাবতঃ বালক দুরন্ত হয়, কিন্তু এ ছেলেটি সেরূপ ছিল না। প্রথম পরিচয়েই বুঝিলাম—বালকটি অতি ধীর ও শান্ত,—এই শ্রেণীর অন্যান্য বালক হইতে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রামের বালকেরা স্কুলের ছুটির পর বাড়ী যাইবার সময় পথে কত ঝগড়া, মারামারি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিত; এই বালকটি বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া তাহা দেখিত ও একপাশ দিয়া ধীরভাবে নীরবে চলিয়া যাইত। জানকীর নিকট কখনও কোন আবদার করিত না। জানকী যখন আমার বাসন মাজিত সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানের একখানি ছোট গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। কথা কহিবারই বা তেমন লোক কোথায়? আমি আবার ছোট ছোট ছেলেদের সহিত কথা কহিতে বড় ভালবাসিতাম। কাজেই জানকীর পালিত পুত্র কিষণলালের সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বালকটি আমাদের স্কুলেই পড়িত। প্রধান শিক্ষক বলিয়া ভয়ে প্রথমে সে ভাল করিয়া আলাপ জমাইবার সুবিধা করিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

অপরাহ্ণে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি খাটিয়াখানির উপর যখন গা ঢালিয়া দিয়া একটু বিশ্রাম করিতাম, তখন কিষণলাল খানদুই জীর্ণ বই ও শ্লেট লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত। কিছুক্ষণ পড়াইতাম। তারপর গল্প হইতে থাকিত। আমাদের দেশের ছেলেরা কেমন, আমাদের দেশের পল্লীজীবনের বিবরণ, তথাকার গুরুমহাশয় ও পাঠশালার ইতিহাস প্রভৃতি তাহার মনে ফুটাইবার চেষ্টা করিতাম। সেও নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহা শুনিত।

সব চেয়ে তাহার ভাল লাগিত আমার নিজের বাল্য-জীবনের বর্ণনা। আমি যখন ছোট ছেলে ছিলাম, তখন পাততাড়ি বগলে করিয়া কিরূপে পাঠশালায় যাইতাম, গুরুমহাশয় কিরূপ ছিলেন, কি রকম করিয়া এত লেখাপড়া শিখিলাম প্রভৃতি কথা সে খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিত। তাহার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত "মাষ্টারজীর" বাল্যাবস্থার বোধহয় তুলনা করিত। নিজেও বোধহয় কল্পনা করিত একদিন "মাষ্টারজী"র মতই পণ্ডিত হইয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইবে।

এইরূপে বেশ সুখে আমাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রামলীলার উৎসব নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল।

একদিন সকালে মুখ হাত ধুইয়া একখানি বই খুলিয়া পড়িতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় দুইজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের কপালে চন্দনরেখা, মাথায় পাগড়ী, বেশভূষায় বোধ হইল যেন পুরোহিত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি?" তাহারা অনেক কথা বলিতে লাগিল।

তাহার সার মর্ম্ম এই—রামলীলার উৎসব আসিতেছে। এই উৎসবে রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির চরিত্র অভিনয়ের জন্য তাহারা লোক সংগ্রহ করিতেছে। রামের চরিত্রে তাহারা কিষণলালকে চায়। কিছুদিনের জন্য তাহাকে ছুটি দিতে হইবে।

আমি শুনিয়াছিলাম পশ্চিমে রামলীলার খুব ধুম। রামায়ণের ঘটনা সকল অঙ্গভঙ্গী সহকারে অভিনীত হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিষণলাল রাজি ত?" তাহারা বলিল "হাঁ, তাহাকে রাজি করিয়াছি।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, তাহার ছুটি মঞ্জুর।" তাহারা অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় জানকী কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল, সে কিষণলালকে কিছুতেই রাম সাজিতে দিবে না। যে ছেলে দেবতা সাজে সে কিছুতেই বাঁচে না। সে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস কিষণলাল রাম সাজিলে তাহার নিশ্চয়ই অমঙ্গল ঘটিবে।

আমি তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে কোনও কথা শুনিল না। বলিতে লাগিল "গরীব ব'লে এত জুলুম। কিষণলালের বাপ মা নেই ব'লে কি তাকে দেখ্‌বার কেউ নেই? পুরুতদের নিজের ছেলেদের সাজাক্ না। আমার ছেলেকে আমি কখনও ছাড়্‌ব না।"

তাহার পরদিন সকালে কিষণলালকে লইয়া পুরোহিত দুইজন আসিয়া উপস্থিত। কিষণলালকে নূতন কাপড়, নূতন জামা ও টুপি কিনিয়া দিয়াছে। তাহার আনন্দ দেখে কে? সে বলিতে লাগিল "মাষ্টারজী, আমার একটা ধনুক আছে। সেই ধনুকে তীর দিয়া রাবণবধ করিব।" কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তি হইলে হইবে কি? জানকী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে রাজি নয়। পুরোহিতেরা আমাকে ধরিয়া বসিল,—"হুজুর যা করেন। জানকীকে বুঝাইয়া বলুন। সে আমাদের কথা মানে না। আপনি বলিলে নিশ্চয়ই শুনিবে।"

তাহাদের কাতর প্রার্থনায় আমি জানকীকে ডাকাইলাম। সে পুরোহিতদের দেখিয়াই গালি দিতে আরম্ভ করিল। বহুকষ্টে তাহাকে থামাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা তর্কের পর সে আমায় বলিল "মাষ্টারজী, আপনি আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দিবেন?"

আমি বলিলাম "হাঁ! তোর কোনও ভয় নাই। আমি শপথ করিতেছি তোর ছেলের কোনও বিপদ্ ঘটবে না।"

জানকী বলিল "ভগবান্ সূর্য্য সাক্ষী রইলেন।" সে চলিয়া গেল।

রামলীলার মহা ধূম আরম্ভ হইল। আমি তাহার পরদিন হইতে ঘোর জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। জ্বর ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম। কতদিন কাটিয়া গেল তাহা কিছুই জানি না।

সজ্ঞান হইয়া দেখিলাম,—আমার দাদা বিছানার পাশে বসিয়া রহিয়াছেন। বৌদিদি এককোণে ঔষধের শিশিগুলি সাজাইয়া রাখিতেছেন। বুঝিলাম তাঁহাদের সংবাদ দিয়া আনান হইয়াছে। আমি বলিলাম "আজ কত

তারিখ?" দাদা বলিলেন "কথা কয়ো না। চুপ্ করে শুয়ে থাক।" বৌদিদি আমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমার বিছানার কাছে আসিলেন। দুই ফোঁটা চোখের জল তাঁহার গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

এই সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। বেগে উন্মাদিনীর মত জানকী সে কক্ষে প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া বলিল "মাষ্টারজী, আমার কিষণকে ফিরে দাও। সূর্য্য সাক্ষী আছেন। আমার কিষণকে ফিরে দাও। তোমার শপথ রাখ।" দুই তিনজনে ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিষণলাল তাহা হইলে মারা গেছে! কতদিন আমি পড়ে আছি! আমি অসহ্য বেদনায় অধীর হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, মাথার মধ্যে শত সূর্য্য দীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

আকুলব্যাকুল চিত্তে পুনরায় চোখ খুলিলাম—সমস্ত প্রকৃতি সূর্য্যময় দেখিলাম—কর্ণে শুনিতে পাইলাম সূর্য্য সাক্ষী! সূর্য্য সাক্ষী! সেই অবধি সূর্য্য আমার সঙ্গ লইয়াছেন—জাগরণে সূর্য্য—স্বপ্নেও সূর্য্য। যেখানে যাই—সেখানেই সূর্য্য—ঠিক বলছি আমি,—অবিশ্বাস—

"আসানসোল! আসানসোল!" কুলিরা হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। গাড়ী আসানসোলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কিরণবাবুর কথার শেষটুকু আর শুনিতে পাইলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী

লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী ভবনের সহিত রাজ্যধ্বংসকারী সিপাহী বিদ্রোহের যে গভীর বিষাদ-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে তাহা কল্পনাপথে আনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বহুদিন অবধি আমি এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গৃহ দেখিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম।

গোমতীর উপর এক উচ্চ স্থানে রেসিডেন্সীর এই রমণীয় অট্টালিকা অযোধ্যার তৎকালীন নবাব সাদৎ আলি কর্ত্তৃক ১৮০০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু, কালক্রমে অযোধ্যায় ইংরাজের শাসনদণ্ড পরিচালনের ভার আসিলে ইহা তাঁহাদিগের দুর্গ এবং রেসিডেন্সী ভবনে পরিণত হইয়াছে। "কর্ণেল বেলী (Col. Bailey) যখন অযোধ্যার রেসিডেণ্ট হ'ন তখন সর্ব্বপ্রথমে দুর্গের বর্হিদ্বারে তিনি প্রহরী রক্ষা করেন। একজন সুবাদার উহাদের অধ্যক্ষ হয়। তদবধি ইহা সাধারণের নিকট 'বেলিগার্ড' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। গোমতীর তীরে এই বিরাট 'বেলিগার্ড'ভবন ১৮২০০ বর্গফুট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পথ প্রদর্শক (Guide) দ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন আমি এই বিষাদ-স্মৃতি-জড়িত রেসিডেন্সী ভবনের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য

বেলিগার্ড গেট' মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন ইহার চূর্ণ-বিচূর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত, দেওয়াল-গুলি দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। চিরস্মরণীয় ১৮৫৭ সালের জুন মাসে যখন ভীষণ বিপ্লব বহ্নিস্রোত, ক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, অযোধ্যার সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহকে নিমেষে হতশ্রী করিয়া সুন্দর সৌধমালাসুসজ্জিতা গোমতী তীরস্থ লক্ষ্ণৌ নগরীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, বিদ্রোহের বিজয়ভেরী বাজাইল,—হায়! তখন অসংখ্য ইংরাজ নরনারীগণ নিজেদের সম্মুখ মৃত্যুর সুস্পষ্ট করালছায়া দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত, অসহায় ইংরাজগণ প্রাণভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। সশব্দে দুর্গদ্বার বন্ধ হইয়া গেল। ত্রিশ সহস্র যোদ্ধা এবং সাধারণ লোক

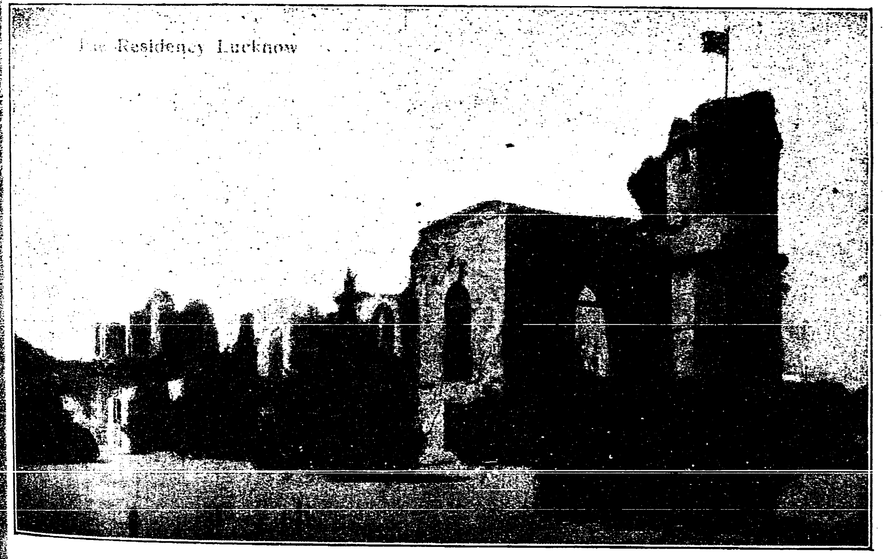

লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী।

আত্মরক্ষার উপায়ের জন্য ইহার মধ্যে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইল। তন্মধ্যে ১৭০০ জন বীরপুরুষ এবং রীতিমত যোদ্ধা। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ১০০০ জন গোরা সৈন্য। অবশিষ্ট ১৩০০ জনের মধ্যে ৭০০ জন দেশীয় লোক এবং ৬০০ জন ইংরাজ স্ত্রী এবং শিশুসন্তান। এদিকে ইতিমধ্যে ক্ষিপ্তপ্রায় অসংখ্য বিদ্রোহীগণ সহরের রাজপথ বহিয়া দীর্ঘ কামানশ্রেণী টানিয়া আনিয়া বেলিগার্ডের চতুর্দ্দিকের উন্নত স্থানগুলি অধিকার করিয়া বসিল। তাঁহাদের সেই শত শত ভীষণ কামান-সকল দিবারাত্র অনলোদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে ভয়াবহ অগ্নিবৃষ্টির বর্ণনা হয় না। গোলাগুলির প্রভাবে 'বেলিগার্ড'টি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'বেলিগার্ড গেট' উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণদিকে ছাদশূন্য অসংখ্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষসংবলিত 'বেলিগার্ড হাউস্' দেখিলাম। একপার্শ্বে 'বেগম কুঠি' এবং তাহার সঙ্গে ডাক্তার ফ্রেয়ারের আবাস (Dr. Frayer's House)। এই স্থানেই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবসে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ সদাশয় সার হেন্‌রী লরেন্স (Sir Henry Lawrence) সিপাহীর গুলির দ্বারা নিহত হ'ন। ঠিক মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উন্নতভূমিতে খাস রেসিডেন্সীভবন এখনও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যদিও বিদ্রোহীদিগের অবিশ্রান্ত গোলাগুলিবৃষ্টিতে তাহার সুন্দর দেওয়ালগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে, যদিও তাহার অধিকাংশ কক্ষের ছাদ অনলবর্ষণে উড়িয়া গিয়াছে, যদিও তাহার গগনস্পর্শী চূড়াবলী ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে, যদিও বারুদের ধূমে তাহার সমস্ত কক্ষ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি অতীতের সাক্ষ্য দিবার জন্য, সেই শোধ প্রতিশোধের জীবন্ত ছবিখানি—সেই জীবনমরণের বাস্তব লীলাভূমি রেসিডেন্সীভবন এখনও দর্শকগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান। প্রায় তিন মাস ধরিয়া কি ভীষণ যুদ্ধই হইয়াছিল। দুর্গের গড়খাইএর বাহিরে সিপাহীগণ মুহুর্মুহুঃ রক্তগোলক সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রতিশোধের বিষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল। অধুনা রেসিডেন্সী ভবনের চারিপার্শ্বে চারিটি বিরাট কামান স্থাপিত করা হইয়াছে। বারাণ্ডার নীচে একপার্শ্বে কতকগুলি কামান এবং অসংখ্য গোলা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। রেসিডেন্সীর সম্মুখে তাহাদের প্রিয় সেনাপতি হেন্‌রী লরেন্সের শ্বেতমর্ম্মর মনুমেণ্ট-রূপ (Monument) স্মৃতিচিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে কি এক করু বিষাদ ভাব জাগিয়া উঠে। সেই অনাবৃ অনাড়ম্বর স্মৃতিচিহ্নের উপর একটি প্রস্ত ফলকে এই কয়েকটি কথা—

Here Lies
Henry Lawrance
Who tried to do his duty.
May The Lord have mercy
Upon his soul.

Born 28th Jnne, 1806. Died 4th July, 18

আমার 'গাইড' (Guide) চতুর্দি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অবশেষে আমাকে তয়খানা (ভূমধ্যস্থ কুঠরী) মধ্যে লইয়া চলিল সেই ঘূর্ণায়মান ধাপের সাহায্যে ক্রমাগ নীচে চলিতে চলিতে বোধ হইল পাতালেই যাইতেছি। যাইয়া কি দেখিলাম দেখিলাম—সেই অন্ধকার গৃহগুলিতে, যেখা নিরীহ শ্বেতমহিলা এবং শিশুগণ আশ্র লইয়াছিল, যে স্থানে, সূর্য্যের র এখনও অতি মৃদুভাবে প্রবেশ করে, স্থানে, সেই অতীত দিনের স্মৃতি আজ সুস্পষ্টভাবে জাগরূক রহিয়াছে। সেই স্থা কামানের গোলা সকল পড়িয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিল! এখনও সেই শোণিতে চিহ্ন বিদ্যমান! কি মর্ম্মভেদী দৃ আমাদের নিজেদের কথাগুলি দেওয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া আমাদের ভীতি উৎপা করিতে লাগিল। আমার বোধ হই যেন এখনও অশরীরীর অট্টহাস্য অ অন্ধকার কক্ষগুলিতে নৃত্য করি বেড়াইতেছে। আমি ত্বরায় সে স্থান হই

প্রস্থান করিলাম। উপরে উঠিয়া রেসিডেন্সী মিউজিয়াম গৃহে (Residency Museum) গমন করিলাম। একটি প্রকাণ্ড হল্ (Hall) চতুর্দ্দিকে সিপাহীবিদ্রোহের নানারূপ ছবি ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। একপার্শ্বে বর্ত্তমান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর স্বহস্তে লিখিত নিজ নিজ নাম একখণ্ড কাগজে বাঁধাইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে। মধ্যস্থলে একটি কাচের আলমারিতে (Show Case) কাপ্তেন মোরে (Capt. Moray) কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ অবরোধের একটি প্রকাণ্ড ম্যাপ। তাহাতে অবরোধকারী এবং অবরুদ্ধ দল—এই উভয় পক্ষেরই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বেলিগার্ড এবং বাহিরের যুদ্ধস্থলের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের একটি সুন্দর প্রতিলিপি অঙ্কিত করা রহিয়াছে। সেখানি এত সুন্দর যে দেখিলে সজীব যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়। একপার্শ্বে



বেলিগার্ড গেট।

যুদ্ধে ব্যবহৃত তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

অদূরে যুদ্ধে নিহত ইংরাজের নীরব শোকস্তম্ভগুলি, শ্যামচ্ছায়াস্নিগ্ধ লতাপুষ্পমণ্ডিত সমাধিউদ্যানের মধ্যে দাঁড়াইয়া দর্শকগণকে সেই অতীত যুদ্ধের চিরস্মরণীয় দিনগুলি এক মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু হায়! সেগুলি আমাদিগের (Natives) পক্ষে Forbidden Area অর্থাৎ সে স্থানে আমাদের যাইবার অধিকার নাই। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, আমার গাইডকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিয়া বেলিগার্ডের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। নিম্নে গোমতীর তীরস্থিত দীপগুলি একে একে জ্বলিয়া উঠিতেছিল আর পরপার হইতে মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণে ইমন কল্যাণের মধুর গম্ভীর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

মিরজা ইটেসাম্ উদ্দিনের ইংলণ্ড ভ্রমণ

(খৃঃ ১৭৬৫-৬৮)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সন্ধি স্থাপিত হইল। শাহ আলম তখন দিল্লীর অধীশ্বর। এই সন্ধির ফলে লর্ড ক্লাইব দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীপদ আদায় করিয়া লইলেন। দিল্লীর চতুর্দ্দিকে তখন শত্রু। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতাও তখন মুষ্টিমেয় হইয়া আসিয়াছে—শীতের বৃক্ষপত্রের ন্যায় তাহা প্রাণহীন জীর্ণ, সামান্য বাতাসেই ঝরিয়া পড়িবার মত। এদিকে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়ানীপদ দেওয়াতে দিল্লীশ্বরের অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্লাইব যখন দেওয়ানীপদ লইয়া বাংলায় ফিরিবার জন্য সম্রাটের কাছে বিদায় লইতে আসিলেন তখন শাহ আলম প্রমাদ গণিলেন। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্লাইবকে বলিলেন, "আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া আপনি ফিরিয়া চলিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুরা এখনি আমার উপর আসিয়া পড়িবে। আপনার সৈন্যগণ কাছে ছিল বলিয়াই তাহারা এতদিন আমাকে কিছু বলে নাই। এ অবস্থায় কি করিয়া দিল্লীতে রাজত্ব করিব?"

ক্লাইব তখন বলিলেন, "ইংলণ্ডের রাজা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত আপনার সাহায্যের জন্য আপনার কাছে ইংরেজ সৈন্য রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সমস্ত ঘটনা আমাদের রাজার কাছে উপস্থিত করিতে পারি, তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন পরে তাহাই করিব।"

দিল্লীশ্বর অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ একদল ইংরেজ সৈন্য দিল্লীতে রাখিবার জন্য ইংলণ্ডরাজের অনুমতি চাহিয়া শীঘ্রই এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র লিখিত হইল। কাপ্তান এস্ এই পত্র লইয়া ইংলণ্ড রওনা হইলেন এবং তাঁহার মুন্সী বা কেরাণী মিরজা ইটেসাম উদ্দিনও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এই মিরজা সাহেব ডায়েরীতে তাঁহার যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আমরা পাই।

মরিশসে মিরজা সাহেব কতকগুলি ভারতীয় ক্রীতদাস দেখিতে পাইলেন। সেই সময় ইহাদের প্রত্যেককে সেখানে ৬০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইত। সেই স্থানের ধনী অধিবাসীরা বঙ্গদেশ হইতে আনীত চাল ও গম খাইয়া প্রাণধারণ করিত। বাজারে আম, তরমুজ, শসা, ইত্যাদি বঙ্গদেশের নানা প্রকার ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই দ্বীপ সম্বন্ধে তিনি এক অদ্ভুত গল্প শুনিতে পান। মরিশস্ প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত ছিল কিন্তু এই দ্বীপ সর্পপূর্ণ থাকায় তাহারা বাস করিতে না পারিয়া ফরাসীদিগকে ইহা দিয়া ফেলে। ফরাসী সাপুড়িয়াগণ এক প্রকার আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি দ্বারা এই সাপগুলি একত্রিত

করে ও অবশেষে একটি নৌকায় তুলিয়া ছয় মাইল দূরবর্ত্তী এক ছোট দ্বীপে ফেলিয়া আসে। সেই অবধি মরিশস দ্বীপ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রবাদটি আমাদের মিরজা সাহেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

অতঃপর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হটেন্টট্গণ শীকারে অতিশয় পটু এবং তাহারা এত দ্রুত চলিতে পারে যে বন্য শূকর ইত্যাদি শীকার করাও তাহাদের পক্ষে অতি সহজসাধ্য। এক অদ্ভুত উপায়ে তাহারা হাতী ধরিত। যেখান দিয়া হাতী চলাফেরা করিত সেই সব জায়গায় তাহারা বড় বড় গর্ত্ত করিয়া রাখিত এবং হাতীর দল দেখিলেই উহাদিগকে সেই দিকে তাড়াইয়া আনিত। কাজেই উহারা ঐ সকল গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া যাইত এবং কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তখন উহাদের দন্ত ও অস্থি তুলিয়া লইয়া বণিকদের কাছে বিক্রয় করা হইত।

যে কালের কথা লেখা হইতেছে তখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা বঙ্গদেশ হইতে বহু নরনারী ও শিশু চুরি করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বিক্রয় করিত। মিরজা সাহেব ইহাদের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা মাতৃ ভাষা ভুলিয়া যাওয়াতে নানা প্রকার সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে ইহাদের সহিত কথা বলিতে হইয়াছিল।

সেখান হইতে প্রায় একমাস পরে তাঁহারা এসেন্সন্ দ্বীপে উপস্থিত হন। এখানে তিনি এত বড় বড় কচ্ছপ দেখিতে পান যে তাহার ওজন কুড়িমনেরও অধিক।

তৎপর প্রায় এক পক্ষকাল ফ্রান্সে থাকিয়া, ডোভার অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে উপনীত হন। লণ্ডন দেখিয়া তিনি একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। লণ্ডন সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন; "লণ্ডনের প্রশংসা আমি কিরূপে করিব? কারণ পৃথিবীর উপর এত বৃহৎ ও সুন্দর আর কিছুই নাই।"

যে উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিয়া যান নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হয়, সে সব বিষয় এত গোপনীয় যে তাহার বিবরণ কিছু লিখিয়া যাওয়া উচিত মনে করেন নাই, না হয়, এ সব বিষয়ে তাঁহার কোনো কিছু করিবারই ছিল না। তিনি যে সব বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অতি সাধারণ লোকের মত, পড়িলেই বুঝা যায়, লেখকের জ্ঞান ও শিক্ষা সামান্য। রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। কিন্তু সেণ্ট জেম্স্ পার্ক্ নামক উদ্যান সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন! "চতুর্দ্দিকে রৌপ্যকান্তি রমণীগণ ভ্রমণ করিতেছে এবং কোণে কোণে চিত্তহারিণীগণ নানা প্রকার মনোহর ভাবভঙ্গী করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাদের সৌন্দর্য্যে ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছে। স্বর্গও বুঝিবা এখানকার প্রেমিকদের সুখ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। প্রেমিকগণ কোতোয়ালের কোনো ভয় রাখে না এবং তাহাদের ইচ্ছামত প্রণয়ীদের সহিত মিশিতেছে—ইত্যাদি।"

ইংরেজ চিত্রকরের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে কোনো এক বিখ্যাত চিত্রকর

মানবের নানা অবস্থার ভাবভঙ্গিমা চিত্রে হুবহু অঙ্কিত করিতে পারিতেন বলিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মানুষকে কষ্ট দিয়া মারিলে তাহার মুখে কিরূপ ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠে তাহা অঙ্কিত করিবার জন্য তিনি একদা এক দরিদ্র ব্যক্তিকে তাঁহার গোপন কুঠরীর ভিতর লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাকে মদ দিয়া অজ্ঞান করিয়া দেয়ালের উপর স্থাপন পূর্ব্বক পেরেক দিয়া তাহার হাত পা দেয়ালের সহিত লাগাইয়া দিলেন। তারপর এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এই অবস্থায় মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার মুখে যে কষ্টের ভীষণ ভাব ও ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তিনি অতি যথাযথ ভাবে অঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। সকলেই এই চিত্রের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে এই হত্যার কথা প্রচার হইয়া পড়িল এবং বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইল। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইবার কিছু পূর্ব্বে তিনি এই বলিয়া তাহা সেদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন যে, চিত্রটি এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, উহাতে আরো কিছু কিছু রঙ ফলাইতে হইবে। তৎপরে চিত্রটি তাঁহার কাছে আনীত হইলে তিনি উহার উপর কালি ঢালিয়া দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। পার্শ্বস্থ লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায়, হায়! কি সুন্দর জিনিষটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল।" তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এই সুন্দর চিত্রটি নষ্ট করিলে?" চিত্রকর উত্তর করিলেন, বহুকষ্টে ও পরিশ্রমে আমি এই চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলাম; এখন ইহার জন্য যদি আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় তবে ইহা রক্ষা করিয়া আমার কি লাভ!" রাজা বলিলেন, "আমি যদি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করি তবে তুমি কি আবার চিত্রখানির পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে?" চিত্রকর উত্তর করিল "নিশ্চয়ই।" চিত্রকর শীঘ্রই তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিলেন; রাজাও তাঁহার কথা পালন করিলেন।

মির্জ্জা সাহেব এই গল্পটি লিখিয়া এইরূপ টীকা করিয়াছেন;—'শিল্প, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার যেখানে সমাদর ও উৎসাহদাতা আছে সেখানে এ সকল বিদ্যার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; এবং সেখানে একটি চিত্রের জন্য লক্ষটাকা দান বা নরহন্তাকে মুক্তিদান একটুকও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি কেহ শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা সমস্ত মানব জাতিকেও অতিক্রম করিয়া উঠে তথাপি লোকে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিবে না; সে সম্মান বা খ্যাতি লাভ করিবে না এবং অবশেষে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ করিতে হইবে।

ইংলণ্ড ও ভারতের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—ভারতবর্ষের মত এখানকার পদস্থ ব্যক্তিগণ,—এমন কি রাজপুত্রগণও এক বা দুই মাইল হাঁটিয়া যাওয়া মোটেই অপমানের কাজ বলিয়া মনে করেন না। হাতে একখানা ছড়ি লইয়া সাধারণ পোষাকে তাঁহারা রাজপথে বা

বাজারে স্বচ্ছন্দচিত্তে হাঁটিয়া বেড়ান। এ বিষয়ে তাঁহারা আমাদের দেশের রাজা বা ধনীব্যক্তিগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নকীব, চোপদার, সওয়ার প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাস্তায় বাহির হওয়াকে তাঁহারা লজ্জাকর ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের ধনী লোকেরা এরূপ আড়ম্বরপ্রিয় নির্ব্বোধ বলিয়া ইহাঁরা আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি তাঁহাদের দেশের কেহ এইরূপ জাঁকজমক করিয়া পথে বাহির হয় তাহা হইলে বালকেরা হাতাতালি দিয়া তাহাদিগকে ঠাট্টা করিবে ও তাঁহাদের উপর ঢিল ছুড়িবে।

ইংলণ্ডের শুল্কবিভাগের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির জাহাজ যখন ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছে তখন তাহাদিগকে কোন শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু যাত্রীদিগের প্রত্যেক জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হয়। ভারতবর্ষ হইতে আনীত বস্ত্র, পশম, বা আফিম প্রভৃতি কোন জিনিষই বিনাশুল্কে জাহাজ হইতে উপরে তুলিতে দেওয়া হয় না। সে শুল্কও আবার নেহাৎ কম নয়। এমন কি, যাত্রীদিগের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ট্রাঙ্কেও যদি একখানা রেশমী রুমাল বা এক তোলা আফিম পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত জিনিষপত্রতো বাজেয়াপ্ত হইবেই, এ ছাড়া তাহাকে হয়তো চারি কি পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে। আমার ট্রাঙ্কের ভিতর কয়েকখানা রুমাল ছিল এবং আমার সহযাত্রী মিসেস্ পীককের ট্রাঙ্কে একখানা মূল্যবান কাপড় ছিল। এই জন্য তাঁহার, কাপ্তান এসের ও আমার সমস্ত জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত হইল। আদালতে ইহার বিচার হইয়া মাসাধিক কাল পরে প্রমাণীত হইল যে শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী মদের নেশায় মিসেস্ পীককের প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহদের সমস্ত জিনিষপত্র ফেরত দেওয়া হইল। এবং আমার রুমালগুলি সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলাম যে, "ইহা অতি সামান্য দ্রব্য এবং এগুলি এখানে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় নাই। এই মুন্সী একজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি তিনি কখনো ইংলণ্ডে আসেন নাই, কাজেই এখানকার রীতিনীতিও তাঁহার জানা নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম।"

ইংলণ্ডে তিনি নানাপ্রকার ভারতীয় ও পারস্যদেশীয় ফুল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের গোলাপ অন্যান্য দেশের গোলাপের চেয়ে অনেক বড়। তিনি ইংলণ্ডের সমস্ত ভূমিতেই শস্যাদি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন; এমন কি তাঁহার ভ্রমণকালে একখানাও অকর্ষিত ভূমি দেখিতে পান নাই।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

বাগ্দত্তা

(৩৪)

কলিকাতার এক বড় রাস্তার উপরে একটি ত্রিতল অট্টালিকার দ্বিতীয় তলস্থ সুসজ্জিত কক্ষে গৃহস্বামীর কন্যা শিক্ষকের নিকটে পাঠাভ্যাস করিতেছিল। সুকেশী সুবেশী বালিকাটি গঠন সৌকুমার্য্যে, বর্ণ উজ্জ্বলতায়, সর্ব্বোপরি একটি কমনীয় সরলশ্রীতে সকলেরই নয়ন মন আকর্ষণ করে। মাষ্টার বই খুলিয়া আজিকার পাঠ্য পাঠ করিতে আদেশ করিলেন,—ছাত্রী পড়িল "কতোকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেনদেশে কর্ক নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। তাহার বল্কল এরূপ স্থূল,'—হ্যাঁ মাষ্টারমশাই বল্কল কি রকম? গাছের ছাল যে বল্লেন, তাহলে রাম, লক্ষ্মণ কেমন করে বাকল পরেছিলেন? মানুষে কক্ষণো গাছের ছাল পরতে পারে না।" "কোন কোন গাছের ছাল নরমও হয় কিনা; আচ্ছা বুল দেখি স্পেনদেশ কোথায়?" "কেন আফ্রিকায়? সেইখানেই তো খুব বীর একটা জাত (স্পার্টান্ বুঝি?) জন্মেছিল, তারা—"

"নাঃ, স্পার্টান্‌রা তো স্পেন দেশে জন্মায় নাই, তারা গ্রীসদেশের অধিবাসী ছিল। কাল যে ম্যাপে ভাল করেই দেখিয়ে দিলুম স্পেনদেশ ইউরোপে। বৃক্ষ কাকে বলে?"

"তা বলে এটা আর ভুল হবেনা,—বৃক্ষ মানে গাছ।"

"ঠিক! আচ্ছা স্থূল মানে কি?" "গোলমাল"। "গোলমাল?"

"হ্যাঁ, লোকে যে বলে হুলস্থূল! হলোনা?"

মাষ্টার ইন্দুভূষণ হাসিল, "এতটা কল্পনা শক্তি না যোগকরে শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই যে আমি বাঁচি। আচ্ছা তৈমুরলঙ্গ কোন দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বল দেখি?" "তুরস্ক"।

"না, ভেবে বলো"।

"আফ্‌গানিস্থান? তবে আমি জানিনে, মাগো মা অত কি মনে করে রাখা যায়?"

"কেন যাবে না সবাই তো রাখে, মন দিলে তুমিও পারো, বই দেখে নাও ভাল করে।" ছাত্রী পুস্তকে বারেক দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই তাহা মুড়িয়া বলিল,—

"বাবাকে বলবো আমি আর পড়তে পারব না, কত আর শিখব। কক্ষণো পড়ব না।"

"কেন গৌরী পড়বে না?"

"আমার ভাল পড়া হয় না, মনে থাকে না।"

"নাই থাক, এমনই করে পড়ো।"

"তাতে আপনি রাগ করেন যে!"

"আমি কি কখনও তোমায় এর জন্য বকেছি?" ছাত্রী একটু চিন্তা করিয়া কহিল "না, কিন্তু আপনার মনে মনে রাগ হয় আমি বুঝতে পারি, সেদিন যে "ফল," না না "ফুল" বলতে বলতে চুপ করে গেলেন, "ফুল" মানে কি মাষ্টার মশাই?"

অনুশোচনার লজ্জায় মাষ্টার মুখ নত করিলেন, ঈষৎ মৃদু স্বরে উত্তর করিলেন "নির্ব্বোধ। তোমার সকল সময় তো বেশ বুদ্ধি, পড়ার সময় মনে থাকে না কেন?"

"আচ্ছা নির্ব্বোধকে 'ফুল' কেন বলে? ফুলের মত নড়তে চড়তে পারে না? আহা আমার চন্দ্রমল্লিকা গুলি সব মরে গ্যাছে, ঝুমকালতাটাও মরমর।"

"ইন্দুভূষণ! তোমার কাজ শেষ হলে আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরি ঘরে দেখা করে যেও।"

এই বলিয়া গৃহস্বামী কন্যার পাঠাগারের দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য এই বালিকা ছাত্রী গৌরী এবং এগৃহের অধিস্বামী তাহার পিতা নন্দকিশোর। পিতার সাড়া পাইয়া গৌরী বই ফেলিয়া উঠিয়া ডাকিল "বাবা!" নন্দকিশোর গৃহে প্রবেশ করিলেন। "আজ বাগানে বেড়াতে যাবে? আমি আর পড়তে পারিনে বাবা, আজ ছুটী দিতে বলে দাও।"

গৌরী তাহার পৃষ্ঠলম্বিত বেণী দুলাইয়া গোলাপ অধর ঈষৎ ফুলাইয়া পিতার মুখের দিকে আব্দারের সহিত চাহিল, পিতা কহিলেন "ইন্দুভূষণ আজ ওর ছুটী হোক্।" শিক্ষক বিষণ্ণমুখে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ ঘটনা আকস্মিক নহে, নিত্যকার, তবু মনে একটা ব্যথা লাগে। ছাইভস্ম যাহাই কেন ছাত্রী পড়িয়া যান্ দুইঘণ্টা তিনচার ঘণ্টায় পরিণত হইলেও সম্মুখস্থ ঘড়িটার উপর শিক্ষকের নজর পড়ে না। জগতে যত মানুষ তাহাদের খেয়ালও তেমনই বিভিন্ন। এই এম এ ক্লাশের দরিদ্র ছাত্রটি প্রথম যখন গৃহশিক্ষকের পদগ্রহণ করে তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে প্রথম দিন তাহাকে যাহার সঙ্গ সঙ্কোচে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, দুদিন না যাইতে তাহারই শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল মধুর ভাবটুকু মায়াযষ্টির মত তাহার চিত্তকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিবে। এখন ছুটীর দিন ইন্দুভূষণের শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যে সে নিজের হৃদয়ে এই ধনী দুহিতার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণের বেগ অনুভব করিতেছিল, মাধ্যাকর্ষণের মত নিজের কক্ষেই তাহা স্থির থাকে সীমাতিক্রম করে না। সে মাঝে মাঝে ছাত্রীর নবরবিকিরণ-মণ্ডিত ঝলমলে, শিশির বিন্দুটির মত কৈশোর মাধুর্য্যে মণ্ডিত মুখখানির উপরে তাহার চোখের সশঙ্কিত দৃষ্টি রাখিয়া একটি মধুরবুলি তোতাপাখীকে ভালবাসিয়া বালকের যে সুখ সেইরূপ একটা আনন্দ লাভ করিত মাত্র।

ছুটী শুনিয়া গৌরী প্রায় লাফাইয়া কেদারা ত্যাগ করিল "বাঁচাগেল, বাবা এসো,—তোমায় আমার সাদা খরগোষের বাচ্চাগুলি দেখাই গে, এই সেদিন কিনে দিয়েছ এরই মধ্যে কত বড় হয়ে গেল দেখবে এসোনা। মাগো, মাষ্টার মশাইকে নাম ধরে বলা হয়নি অমনি চলে যাচ্ছেন, আপনিও আসুন না—"

পিতার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া চলিল, অগত্যা ইন্দুভূষণও তাহাদের অনুসরণ করিল।

যে বাড়ী এক সময় পরিত্যক্ত পুরীর মত

নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আজ এই একটি বালিকার আগমনে বসন্তাগমে পক্ষীকলকুজনের ন্যায় ইহার প্রতিগৃহ থাকিয়া থাকিয়া কলহাস্য নূপুরনিক্কনে, উচ্চ কণ্ঠস্বরে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। আবার চারুবনস্থলী ঋতুরাজ পদস্পর্শে অভিনবশ্রী ধারণ করিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত ছিল না পুষ্পে মধু সঞ্চারের ন্যায় অলক্ষ্যে ইহার মধ্যে বসন্তবিভবও প্রদান করিতেছিল। নন্দকিশোরের শুষ্কচিত্ত বর্ষার বন্যার ন্যায় কূলবিপ্লবী সলিলস্রোতপ্রান্তে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যৌবনের আশাহত নিরানন্দচিত্ত অপরাহ্নের দিকে জগদানন্দ আলোকের সন্ধান পাইয়াছিল। তাঁহার সুখের সীমা নাই।

সময়ের চেয়ে পরিবর্ত্তনকারী জগতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। গৌরীর ক্ষুদ্র হৃদয়মধ্যেও ইহার কার্য্য স্থগিদ ছিল না। আকর্ষণ প্রত্যাকর্ষণ না করিয়া স্থির থাকিতে অক্ষম, তাই—আর বোধহয় সম্বন্ধগুণেও সে তাহার পূর্ব্ব বিদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে অনেকখানি ভালবাসা প্রদান করিয়াছিল। তাহার চিত্তসমুদ্রের অতল তলে এখনও তাহার পূর্ব্বস্মৃতির রত্নসম্ভার আদরে সঞ্চিত থাকিলেও উপরে নীলাম্বুরাশি সলিলবর্ষণকারী মেঘেরই ছায়া ধারণ করিয়াছে। সে যতই বালিকা হোক্ অনভিজ্ঞা হোক পিতৃহৃদয়ের বেগব্যাকুল স্নেহধারার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকিতে পারে নাই, তাই ইহার একটা সূক্ষ্মযোগ তাহারও চিত্তকে নির্ঝরের সবেগধারার মত এইখানে বহিয়া আনিয়াছিল। সে তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার সকল শরীরে সুখানুভূতির তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটাইয়া কহিয়াছিল "বাবা, আমি তোমার খুব ভালবেসেছি।"

দিন সুখেই কাটিতেছিল। গৌরীর মনের উপর হইতে আজকাল বলিতে গেলে দুঃখের ছায়াখানা একেবারেই সরিয়া গিয়া তাহার পূর্ব্বস্বভাব ফিরাইয়া আনিয়াছে। গল্পে, ভ্রমণে, দুজনকে অবলম্বন করিয়া দুইজনার জীবন আশ্রয়তরু ও আশ্রিতলতার মত একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। নন্দকিশোর ইদানীং তাহাকে 'সত্যদা'র উপরে অনেকখানি উদাসীন দেখিয়া মনের মধ্যে একপ্রকার স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কন্যার মুখের চিন্তারেখাহীন সরলহাস্য তাঁহার চিত্তে আশ্বস্ত আনন্দ ছড়াইয়া দিয়াছিল, সে তাঁহারই, একমাত্র তাঁহার বক্ষনীড়েই সে বাসা বাঁধিয়াছে ;- কেন বাঁধিবে না? অন্য কাহারও তাহার উপর কিসের অধিকার?

কিন্তু বেশিদিন এ স্বার্থসঙ্ঘাতে নিজের দিকটাকে বাঁচাইয়া রাখা চলিল না, দেশাচার, লোকাচার শতমুখে তিরস্কার করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ কন্যাকে শীঘ্র পাত্রস্থ না করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাবতরণ অনিবার্য্য। অনেক ভাবিয়া, খুঁজিয়া, একটি মনের মত পাত্র পাওয়া গেল, ছেলেটির দারিদ্র্যখ্যাতি তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যশঃসৌরভেরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। বক্তব্যবাহুল্য এই নির্ব্বাচিত পাত্রটিই আমাদের পরিচিত গৃহশিক্ষক ইন্দুভূষণ।

সেদিন ইন্দু গৃহস্বামীর আদেশমত

বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ছাত্রীর টবের গাছের মাটি নিড়াইয়া দিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় নন্দকিশোরের সহিত ইতিপূর্ব্বে সে বিদায় লইতে পারে নাই।

গ্রীষ্ম অপরাহ্নের রৌদ্র তখনও বেশ উজ্জ্বল রহিয়াছে, জানালার সার্সির উপর দিয়া ক্রমে ছায়া ঘরের মধ্যে অবতরণ করিতেছিল, কিন্তু ছাদের কার্ণিসের উপর অংশে কাচের প্রতিবিম্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ সমাবেশ করিয়াছে। ইন্দুভূষণ গিয়া দেখিলেন, একখানা আরাম কেদারার উপর হেলিয়া নন্দকিশোর একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ হইতে চশমা খুলিতে খুলিতে হস্ত দ্বারা নিকটস্থ চৌকি-খানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "বসো"।

ইন্দ্রভূষণ নীরবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। সে আজ তাঁহার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষাও কোমল, সমধিক স্নেহপূর্ণ! ইহা কি কোন দুঃসংবাদের সূচনা!

নন্দকিশোর কহিলেন "তোমার অবস্থাও ভাল নয়, এবং অভিভাবক সেরূপ কেহই নাই, এ অবস্থায় বি-এল, পাশ না করে তুমি ডাক্তারি পড় নাই কেন? কিছু সুবিধা হতে পারত তো?"

ইন্দু বুঝিল এটা কথা পাড়িবার একটা অবান্তর সূত্র—মূলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, সবিনয়ে কহিল "ডাক্তারি পড়ায় খরচ বেশি তাই সাহস করি নাই, স্কলারশিপের টাকা কয়টিই ভরসা ছিল।"

"পাশ করে কি করবে স্থির করেছ? ওকালতি?"

"আমাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে ওকালতি—"

"যদি তোমার এ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তাহলে?"

ইন্দুভূষণ কিছু না বুঝিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিল, বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া নন্দকিশোর কথাটা একটু ফিরাইয়া লইলেন "গৌরীকে তোমার কেমন মনে হয়? লোকে তাকে পাগল বলে সেটা—"

ইন্দুভূষণের সব দ্বিধা ঘুচিয়া গেল সে সবেগে কহিয়া উঠিল "না না, পাগল কেন, অত্যন্ত, অতি চমৎকার মেয়ে।"

নন্দকিশোর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে সোৎসুক্যে তাহার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিয়া উঠিলেন "তুমি তাকে নিয়ে আমার পুত্র স্থানীয় হও, আমার কাছে থাক, এই আমার ইচ্ছা। এই জন্যই আমি তোমায় তাকে চেনবার ভার দিয়েছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখে তাকে না বুঝে পাছে তার প্রতি অবিচার করো এই ভয়। তোমার আপত্তি নাই?"

চাঁদ যদি নিজে পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসেন, পৃথিবী কি তাঁহার আতিথ্যকুণ্ঠিত হইবেন?

(৩৫)

পরদিন নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন ছাত্রী তখনও পাঠ গৃহে অনুপস্থিত, পড়িবার টেবিলের উপর মোটা খাতায় বড় বড় আঁকাবাঁকা বিবিধ ছাঁদের অক্ষরে তাহার দৈনিক হস্ত লিপি-গুলা শুধু পড়িয়া আছে। পুস্তকগুলা মসি-লিপ্ত, ছিন্নার্দ্ধ মূর্ত্তি লইয়া শুভ্র আস্তরণের উপর

বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়া অধিকারিণীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ইন্দুভূষণ একবার জানালার নিকট গিয়া কর্ম্মকোলাহলক্লান্ত রাজপথে চাহিয়া দেখিল; তার পর ফিরিয়া টেবিলের নিকট স্বস্থান গ্রহণ-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল। সহসা গৌরী গৃহে আগমনপূর্ব্বক সহাস্যে কহিল,—

"আপনি এসেছেন? আমি জান্‌তে পারিনি তো। আজ একটা চন্নমা কিনেছি কি না সেইটেকে খাওয়াচ্ছিলাম, অনেকক্ষণ এসেছেন? ডাকেন নি কেন?

ইন্দুভূষণের মনে হইল এ কণ্ঠ অন্য দিনাপেক্ষা যেন অনেক কোমল, মধুর রসসিক্ত। সে কহিল, "হ্যাঁ,—না অনেকক্ষণ তেমন নয়।" ছাত্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল "হাঁ, না কি মাষ্টার মশাই?—আপনার ছাতাটা বুঝি চুরি গেছে? তাই এই নূতন ছাতাখানা কিনেচেন বেশ হাতলটি তো? মাষ্টারমশাই জুতোটা, ওতো নতুন? ও-মা, সবই যে দেখ্‌চি নতুন জিনিষ! কেন মাষ্টার মশাই? নেমন্তন্ন খেতে যাবেন?" মাষ্টার ছাত্রীর এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে অকস্মাৎ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তবে কি তাঁহার সাজসজ্জাটা এমনই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! সহসা এই চারিমাস পরে আজই যে প্রথমে নিজের ছিন্ন মলিন বেশ তাহাকে একান্ত ব্যথিত ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল সে কি করিবে? ইন্দুভূষণ বিব্রত ভাবে কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল "আজ তবে তুমি পড়বে না?"

"বাঃ আমি যেন তাই বলেচি? ঘরে পাখা চলচে তবু আপনি কত ঘামচেন, মুখটা রাঙ্গা হয়ে গ্যাছে, বুঝিছি বুঝি আপনাদের আজ ম্যাচ আছে এখনি যেতে হবে, না?"

"না। তোমার ইতিহাস মুখস্ত দাও।"

"১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে—ইংরাজেরা—যাঃ ভুলে গেছি! কতদিন আর পড়তে হবে মাষ্টার মশাই"?

"গৌরি!"

"কি মাষ্টার মশাই?"

"আমি যদি বলি আর তোমাকে পড়তে হবে না?"

"তা কি বাবা শুন্‌বেন?· বাবা বলেন লেখাপড়া শেখা বড় ভাল'।"

"যদি শোনেন?"

"তাহলে আমার বড় আহ্লাদ হবে।"

"শুধুই আহ্লাদ হলে তো হবে না, কি দেবে বলো?"

"আপনাকে?"—গৌরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "পুষুমণিকে দোব আর-এক খাঁচা মুনিয়া পাখী দোব।"

ইন্দুভূষণ মৃদু হাসিল "তাতে হবে না।" "আচ্ছা টিমি কুকুরটা তো নেবেন? ওটা কেমন সুন্দর, চোর টোরও তাড়াতে পারে, কত ভাল!"

মাষ্টার এই উত্তম পুরস্কারটির লোভও সম্বরণে সমর্থ হইলেন, পরে বলিলেন "গৌরি?" গৌরী হাসিয়া ফেলিল "আজ কেবলই আমায় ডাকচেন কেন? আমি কি কালা হয়েচি? কি চাই বলুন, না বলুন তা হবে না।"

ইন্দু অপ্রতিভ ভাবে মুখ নীচু করিল, তার পর সহসা মাথা তুলিয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিয়া গেল "আমি এই টুকু শুনতে চাই গরীব বলে আমায় তুমি ভবিষ্যতে ঘৃণা অবহেলা করবে না?"

গৌরী এই কথা শুনিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল "ও মাগো এ কি কথা? ঘৃণা কি করব? গরীবকে বুঝি ঘৃণা করে? দাদু বলেন তিনি গরীব, তাঁকে কেউ না কি ঘৃণা করে!"

"গৌরি, তোমার মত শিশুকে যে এসব ক্ষুদ্র আলোচনার মধ্যে জড়াতে চায় সে নিতান্ত পাষণ্ড! না তোমার কাছে এ সব ছোট জিনিষ ঘেঁষতে পারে না, আমায় ক্ষমা করো। কত তপস্যায় আমি এ রত্নের অধিকারী হচ্চি! তুমি যাতে সুখী হও আমি প্রাণপণে তাই করবো, অনাবিল শান্তি সুখে জীবন কেটে যাবে।"

কথাগুলা যেন হেঁয়ালির মত শুনাইল অর্থ বোধ হইল না, সে বিস্ময়ের সহিত দুই স্বচ্ছ সরল নেত্র বিস্তৃত করিয়া কহিল "কি বলচেন, কেতাবের কথা কি?"

"কেতাব তো মানুষেই তৈরি করে। তোমার বাবা তোমায় কিছু বলেন নি?" হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মত বিস্মরণের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল, "ধেৎ" বলিয়া সবেগে বেণী দুলাইয়া সে মুখ লুকাইল। পিতা পূর্ব্ব রজনীতে একবারটি বলিয়া ছিলেন বটে "আচ্ছা ইন্দুর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দিই?" সে সেখানেও যে উত্তর করিয়া ছিল এখানেও তাহাপেক্ষা কোন প্রভেদ দেখাইল না। টেবিলের সহিত মাথাটাকে এক করিয়া ফেলিয়া মুখখানা তাহারই অন্তরালে লুকাইয়া রাখিল। ইন্দুভূষণ স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কিরে গৌরি, তোর পড়া হলো?" বলিতে বলিতে তাহার অভিভাবিকা বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সাড়া পাইয়াই শিক্ষক ছাত্রী উভয়ে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার সম্মুখের পুস্তক খানার পাতা উল্‌টাইয়া প্রশ্ন করিলেন "প্রভঞ্জন কথাটার মানে কি?" বলিতে বলিতে চকিতের মধ্যে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কি ম্লান সে মুখ! একি হাস্যময়ী গৌরী! তাহার বক্ষে একটা অজ্ঞাত বেদনা বাজিল, কেন সে সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল?

অভিভাবিকা দূর সম্পর্কে গৌরীর পিতার পিতৃষসা সম্পর্কে ঠান্ দিদি, তিনি কহিলেন "ইন্দু তুমি তো ওকে এত করেও পড়াশোনায় তেমন উন্নতি করাতে পারলে না কাল থেকে একজন শিক্ষয়িত্রী স্থির করা হয়েচে; তোমার ভাই চাকরীটি এবার গেল; তা যে নতুন কাজ পাচ্চো, ডবল প্রমোসন পেয়ে গেলে;—তোমার ক্ষতি কিছু হবেনা—ওকি উঠে দাঁড়ালে কেন? বসো বসো—"।

ইন্দুভূষণ মনের প্রফুল্লতা গোপন করিতে অক্ষম হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল "না আর বসবোনা একটু কাজ আছে—" বলিতে বলিতে ছাতাটার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পলাইয়া গেল। গৌরী নতনেত্রে নিজের চরণাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইন্দুভূষণ চলিয়া গেলে

সহসা মুখ তুলিয়া ঠান্‌দির দিকে চাহিল; তিনি তাহাকে একটা ব্যঙ্গরসসিক্ত মধুর সম্ভাষণে ভাষিত করিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "বাবাকে বলুন না আমি বিয়ে করবো না!"

ঠান্‌দিদি হাসিলেন "পাগল! আমি বল্লেই বা এমন অদ্ভুত কথা তিনি রাখবেন কেন? কেন বিয়ে করবিনে?"

"আমি জানিনা।"

"ইস্ বিয়ে কর্ব্বেন না, ন্যাকা মেয়ে! বিয়ে সবাই করে মেয়েমানুষ কি আইবড় থাকে।"

"তাহোক না—উনি মাষ্টারমশাই যে, ও কি রকম?"

"তাতে কি! স্বামীও তো গুরু,—ভালই হবে।" মুহূর্ত্তে হাসির কলতানে কক্ষ মুখর করিয়া বিষণ্ণা গৌরী ঠানদির কোলে লুটাইয়া পড়িল "গুরু, স্বামী গুরু! তাহলে আমাকে পা ধুইয়ে দিতে হবে? প্রণামী দিতে হবে, মাগো মা, এমন কথাও শুনিনি!"

নন্দকিশোরের কন্যার বিবাহসংবাদ দুদিনেই সুপ্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকরা ও দোকানীপসারীর আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুভূষণ বেচারার এ গৃহে আগমন বন্ধ হইল, আর তা ভাল দেখায় না। পাড়ার মেয়েরা জানালার পাখী তুলিয়া কাণাকানি করে। গৌরী যখন দেখিল বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে তখন সে একদিন স্থির করিয়া বসিল নিজেই সে পিতাকে বলিবে যে বিবাহ করিবে না। সে সেদিন স্কুলে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে সেখানে কত বড় বড় মেয়েরা আইবড় রহিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সে দেখি বাড়ীর সরকার একখানা বোঝাই গাড়ি হই নামাইয়া বড় বড় দুইটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক, কতকগু রেশমী ও সুতী সাড়ি বাড়ীর ভিতর পাঠাই দিতেছে। এদিকে ঠান্‌দিদি দশরথ চাকর ডাকিয়া আদেশ করিতেছেন "ওরে মালীকে টোপর সিঁথি ময়ূরের জন্য আজ বলে দে, ভুলটুল হলেই শেষে মুস্কিলে পড়তে হবে।" কন্যা গিয়া ডাকি "বাবা!"

"মা!" নন্দকিশোর টেবিলের উপ হইতে একটা ভেলভেটের বাক্স তুলি লইয়া তাহার আবরণ মোচনপূর্ব্বক কন্যা সম্মুখে ধরিলেন "তোমার হার পছন্দ হয়?"

"বেশত! কত মুক্তো! ওগুলো কি হীরা কি রকম চকচকে! একে কি বলে চুনি বাবা?"

"কি মা? পর, আমি একবার মে মাকে আমার কেমন দেখায়।" গৌরী অগত্যা হার পরিল কিন্তু কিসের জন্য এ অলঙ্কার ইহা স্মরণে তাহার মনে উৎসাহ জন্মিতেছি না। "বাবা আমি বিয়ে করব না"।

"সেকি কেন মা?" নন্দকিশোর চমকি উঠিলেন "তা জানিনা, এমনি করবো না গৌরী নিজের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা অনুভ করিতেছিল কথা জড়াইয়া কান্না আসি কিন্তু জোর জুলুম আসিল না। পি সন্দিগ্ধচক্ষে দেখিতে দেখিতে স্নেহস্বরে কহিলেন "তাকি হয়, কেন তোমায় কোথাও যেতে হবেনা, তুমি সর্ব্বদা আমা কাছেই থাকবে।"

গৌরী নিরুত্তর হইয়া পড়িল।

(৩৬)

বিবাহ বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন যতই অধিক আনন্দ সমারোহ জাগাইতেছিল পিতা পুত্রী উভয়ের মনের মধ্যে বেদনা ও উদ্বেগ ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল। নন্দকিশোর এই বিবাহ উপলক্ষ্যে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছিলেন, সামাজিক বিতরণ, দরিদ্র ভোজন, সৎকার্য্যের সহায়তায় দান হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসীর মধ্যে বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ, ভোক্ষ্য ভোজ্যের অপর্য্যাপ্তি আয়োজনে পাড়াপ্রতিবেশীর সন্তোষ বিধান—কিছুরই তিনি ত্রুটি করেন নাই, তথাচ মনে একটা দুঃখের ভার চাপিয়া তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চিত্তে পিতৃমাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বেদনা, পরহস্তে সমর্পণের সুখজড়িত ব্যথা তো ছিলই, ইহার উপর গৌরীর পরিবর্ত্তন তাঁহার চিত্তে একটা প্রধান ভার হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে সহসা এমন বদলাইয়া কেন গেল, এই সন্দেহ যেন তাঁহার প্রাণটাকে পাক দিয়া মোচড়াইতেছিল। হাসি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই অতস্পৃহ-বর্ষীয়সীর মত স্তব্ধ হইয়া থাকে, কি? একদিন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি হয়েচে?"

"কিছু তো হয়নি—" বলিয়াই সে মুখ নত করিল, "আমার আবার হবে কি, বাবা?" বলিয়া তো তেমনি কলঝঙ্কারে হাসিয়া উঠিল কিন্তু! কেন এমন হইল?

একদিন সন্ধ্যাকালে মধুর সুরে সানাই বাজিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে জানাইয়া দিল বিবাহ নিকটবর্ত্তী। রঙ্গীন কাপড়পরা দাসদাসীগণ কর্ম্মবাড়ী কোলাহলে সরগরম করিয়া তুলিল।

দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের কনে নীচের উঠানে লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছিল। অদূরে শকটচক্রমথিত, জনসঙ্ঘর্ষিত রাজপথ, তাহাতে বহুবিধ লোক জন, গাড়িঘোড়া; এবং টুং টাং শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া বিসর্পিতগতি ট্রামগুলা ঘড় ঘড় শব্দে কর্ণবধীর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

গৌরী হস্তস্থিত বিলাতি ফুলটির রক্ত-পাপড়িগুলি নখরছিন্ন করিতে করিতে গ্যাসালোকে উদ্ভাসিত সাগরোর্ম্মিমালাতুল্য প্রসাদময়ী নগরীর পানে অনিমেষে চাহিয়াছিল। যে দিন এই দৃশ্য তাহার সরলনেত্রে বিস্ময়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল আজ আর সেদিন নাই, আজ তাহারা তাহার এই স্বচ্ছ নেত্রদর্পণে ভাসিতেছে ভিতরে প্রতিফলিত হয় নাই, সে বস্তুর কিছুই দেখিতেছিল না, চাহিয়াছিল মাত্র। এমন সময় নন্দকিশোর চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ডাকিলেন "গৌরি?" গৌরী যেন একটু চমকিয়া উঠিল, তারপর কবরীবদ্ধ চুলের মধ্য হইতে যে গুচ্ছটা শিথিল হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সেটাকে বামহস্তে সরাইয়া মুখ ফিরাইল। নন্দকিশোর নিকটে আসিয়া তাহার মস্তকে একখানি হাত রাখিয়া সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করচো মা! একলা কেন? একি কাঁদচো?" তিনি তাহার গণ্ডের অশ্রু বিন্দুটি দেখিতে

পাইয়াছিলেন। ব্যথিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা ?"

গৌরী কথা কহিল না, কোল একবার ছলছল চোখ তুলিয়া পিতার দিকে চাহিল, ক্ষুদ্র বুকখানা হইতে একটা আকুল নিশ্বাস বাহিরের ধূমভারাতুর বায়ুর মধ্যে মিলিত হইল, পুনশ্চ নতমুখে সে একটু দ্রুতহস্তে ঝালর দীর্ণ করিতে লাগিল। নন্দকিশোর অল্পক্ষণ তাহার বিষাদপূর্ণ মুখের উপর স্থিরচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া পরে জোর করিয়া যেন দুর্ভাবনাটাকে পরিত্যাগের চেষ্টায় কহিলেন "দুজন কে কে এসেছেন বলো দেখি ?"

গৌরী জিজ্ঞাসার ভাবে চাহিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিল না যে কে ? তখন নন্দকিশোর আপনা হইতেই কহিলেন "তোমার মাসিমা আর সত্যেন্দ্র।"

"সত্যদা এসেছে ? এতদিন পরে এসেছে—"গভীর হর্ষোচ্ছ্বাসের মাঝখানেই অকস্মাৎ বালিকা থামিয়া গেল। "কোথা যাচ্ছো গৌরি, এসো সে নীচে আছে, দেখা করবে এসো, এখনি সে ফিরে যাবে।"

দেড় বৎসর পরে দুইজন বাল্য সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। দুজনেই দুজনকে দেখিয়া মনে মনে যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করিল, দুজনেই ভাবিল 'চেনা যায় না, কি বদলে গেছে!' বহুক্ষণ নীরব পর্য্যবেক্ষণের পরে সত্যই প্রথম বাল্যসখীকে সম্বোধন করিল "ভাল আছ গৌরি ?"

"গৌরী, ভাল আছ ?" যেন কেতাবের ভদ্রতার কথা! তথাপি গৌরী হাসিবার এত বড় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িল, কথা কহিতে পারিল না। চোখে কেবলই একটা জলের ঝাপ্‌সা রেখা আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল।

সত্য দেখিল, তাহার সখী শুধু মাথাতেই বাড়িয়া উঠে নাই সে স্বভাবেও অনেকখানি বড় হইয়া গিয়াছে। সে যে গাড়িতে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া স্থির করিয়াছিল ছিপ বঁড়শি, আমচুরি লইয়া তাহার সহিত কি কি আলোচনা করিবে—সে সব কথা এই সুসজ্জিতা, সুন্দরী কিশোরীর সম্মুখে উত্থাপন করা আর সম্ভবপর হইল না। গৌরী আর সে গৌরী নাই। এত সুন্দরই বা সে কি করিয়া হইল! কই সে ত—"সত্যদা" বলিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল না, গচ্ছিত দ্রব্য গুলার দাবী করিল না,—সেগুলা যে তাহারই অনবধানতায় খোয়া গিয়াছে ইহা জানাইয়া তাহাকে একটুকু তিরস্কারও করিল না। গৌরী এখন এত পর হইয়া গিয়াছে! তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহিতার তাপে তাতিয়া উঠিল, চৌকীর নিকট দাঁড়াইয়া সেও পূর্ণ অবহেলার ভানে গৃহসজ্জা পরিদর্শনে মন দিল। ঈস্ মেয়ের বিয়ে হইতেছে সেইজন্য কিছুই গ্রাহ্য নাই।

গৌরী তাহার অভিমান বুঝিল না, সে যে তাহার প্রতি এত বড় অবিচার করিতেছে এ সম্বন্ধেও সে পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া যেন জলে অহেতুক ভিজিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সেই ঘরেরই অপর প্রান্তে যিনি আলোকাধারের সম্মুখে বই খুলিয়া একজোড়া চশমার পরকলার মধ্য হইতে তাহাদের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া ছিলেন



তুষার অমুল বক্ষ যেথায় কমল নীরবে খোলে
শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

তিনি বোধ হয় তাহাদের দুজনকেই বুঝিতে
ছেন, কারণ তিনি তাহাদের মত অনভিজ্ঞ
বালক নহেন।

নন্দকিশোর কহিলেন "সত্যেন্দ্রবাবুকে
কছু জিজ্ঞাসা করলে গৌরি?" গৌরী
ত্তর না দিয়া সত্যেন্দ্রের মুখের দিকে কোন
তে চাহিল, সত্যও সেই সময় তাহার দিকে
ষ্টি ফিরাইয়াছিল, চোখে চোখে মিলিতেই
স হাসিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া পূর্ব্বে
াহাদের সহস্র বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, বুঝি
সই কথা তাহার স্মরণ হইয়া থাকিবে।
কন্তু আজ আর তাহা হইল না, সে হাসির
ত্যুৎ গৌরীর মেঘাচ্ছন্ন নেত্র হইতে ঝর ঝর

করিয়া জলের ঝরণা ঝরাইয়া ফেলিল, গৌরী অকস্মাৎ ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর ডাকিলেন "গৌরি! গৌরি?" সে ফিরিল না।

বিন্ধ্যবাসিনী অনুসন্ধান দ্বারা সংবাদ বাহির করিয়া যখন তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন কে জানে কেমন করিয়া সে ঘরের আলো নিভিয়া গিয়াছিল, নীরব-কক্ষে থাকিয়া থাকিয়া একটা রুদ্ধবেদনার অর্দ্ধব্যক্ত ফোঁপানির শব্দ আপনাকে যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

ত্রিমূর্ত্তি

১

উষায় হেরি গো তোরে ফুলরাণী-সাজে,
বিকশিত পুষ্পে ঢাকা কমনীয় কায়,—
ললাটে বালার্কভূষা কি মধুর রাজে
সোনালি অঞ্চল তোর, অনিলে দোলায়!
গাহ গো বিহগকণ্ঠে আনন্দের গান,
অভিষেক করি ধরা আনন্দ ধারায়,—
সঞ্চারি শকতি হৃদে নাচাইয়া প্রাণ,—
প্রদানি' চেতনা নব সুপ্ত বসুধায়।

২

মধ্যাহ্নে হেরি গো তোরে উদাসিনী বেশে,
ম্লান সে পুষ্পের সাজ, স্তব্ধ সেই গান
বিতৃষ্ণ ধরায় যেন দুঃখের নিষ্পেষে
কিম্বা তীব্র যাতনায় মৃদু বেপমান!

৩

প্রদোষে গৈরিকবাসে যোগিনী নবীনা
আবৃত সোনার তনু তমঃ পাংশুজালে
বিষাদের গান এবে গায় স্বর্ণ বীণা
রক্ত চন্দনের ফোঁটা রবি শোভে ভালে।

বুঝি প্রতারিত হ'য়ে ছেড়েছ সংসার,
লভিয়া যাতনা চির, শান্তির বিহনে—
গাহিয়া বেড়াও তাই দুঃখ আপনার,
পীড়নে যাহার, তুমি যোগিনী যৌবনে।

শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার

ফোটোগ্রাফারকে নাকি যন্ত্রের সাহায্যে, আপনার আদর্শ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, সেই কারণে, অল্প বয়স হইতেই এই যন্ত্রের সাধনা আরম্ভ করা আবশ্যক। সঙ্গীত কিম্বা ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে, যেমন শিশুকাল হইতেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে হয়, ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধেও ভিন্ন নিয়ম নাই। কোনও বিষয় বিশেষে পারদর্শী হইতে হইলে, যে পরিমাণ যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায়, একান্ত নিষ্ঠা, এবং চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। ক্যামেরা এইরূপে, ফোটোগ্রাফারের জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবহার কালে কোনও দ্বিধা কিম্বা নৈপুণ্যের অভাব থাকিলে চলিবে না, যাহা করিতে হইবে, সে বিষয়ে জ্ঞান যেমন সম্পূর্ণ, প্রয়োগ-প্রণালী তেমনি সুশিক্ষিত এবং ক্ষিপ্র সুচতুর হওয়া আবশ্যক। তবেই শিল্পীর মন স্বাধীন থাকিয়া, প্রকৃতি তাহাতে যে ভাবাবেগ সঞ্চার করিবে, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। ক্যামেরার শক্তি সীমাবদ্ধ; বিশেষ রূপেই সীমাবদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। কিন্তু হায়, প্রকাশের অবাধ অসীম উপায় কোন বিষয়েই বা আছে, আর কেইবা তাহার বশীকরণ মন্ত্র জানে?

ক্যামেরা আর কিছুই করিতে না পারুক, একটি কাজ করে, সে আমাদের চারিদিকের এই সুন্দরী পৃথিবীর সহিত পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ করিয়া দেয়, আমাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রসারিত করে। অতি ছোট একটি ক্যামেরা আর অত্যধিক অনভিজ্ঞতাও এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারে না; আর ধৈর্য্য যদি তোমার অবিচলিত থাকে, তবে অবশেষে একদিন, হৃদয়ের ভাব সকল সৌন্দর্য্যে প্রকাশ করিবার যে নির্ম্মল অনুপম আনন্দ তাহা হইতে কখনই বঞ্চিত হইবে না। স্থানীয় কোন প্রকার বিশেষত্ব প্রকাশ করা অপেক্ষা, মনের ভাববিশেষকে চিত্রে ব্যক্ত করিবার চেষ্টাই আমি করিয়া থাকি। ক্যামেরার দ্বারা এ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা, কত সহজ নয়, কেন না যন্ত্রটিকে স্বাধীনতা দিলে, স্থূল যাহা সে সহজে ধরিতে পারে, তাহাই প্রচার করে--সূক্ষ্ম ভাব-সৌন্দর্য্যের ধার ধারে না। যদি বল ক্যামেরা আবার কেমন করিয়া ভাবের অতীন্দ্রিয় মাধুরী বিকাশ করিবে? তবে আমি বলিব, ভাল ফোটোগ্রাফ তুলিবার, ভাবের বিকাশ সাধন করিবার, একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠতম উপায় ধৈর্য্য, ও মুহূর্ত্তের জন্য সতর্ক ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকা; আর সৌভাগ্যবশতঃ সে সহসা যখন আসিয়া আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে চিনিয়া লওয়া। আত্মসংযম ইহার আর একটি প্রধান উপকরণ, অনেক দৃশ্য, যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চক্ষে সুন্দর লাগে, আপনার মনের আদর্শ মনে রাখিয়া, তাহার উপযোগী হইবে না জানিলে, রমণীয়



চিত্র সাধনা

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

হইলেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। যে ফোটোগ্রাফারের সৌন্দর্য্যবোধ আছে, সে কেবলি, সেই নিরুপম মুহূর্ত্তের জন্য, উৎসুক চিত্তে সচেতন ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে,—সেই অপূর্ব্ব অবসর, যখন বহুর সমাবেশে বিচিত্র প্রকৃতির দৃশ্য-জনতার মধ্য হইতে, একটি নিরতিশয় সুন্দর নিমেষ, আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একাকী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর মধুরহাস্যের মত, তাঁহার নেত্রের সকরুণ দৃষ্টির মত, আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে। আলোকের লীলায়, মেঘের ছায়ায় কুহেলিকার রহস্যে, দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত, ক্ষণিকের মধ্যে অনন্তকে প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়।

ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে কম্পোজিশান অর্থাৎ বহু এবং বিবিধের সংমিশ্রণ, কথাটি একেবারেই খাটে না—বরং (Isolation), বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া, এককতা সাধন বলিলে ভাব তবুও কতকটা ব্যক্ত হয়। অধিকাংশ স্থলে কার্য্যতঃ তাহাই করিতে হয়। চিত্রকরের মত ফোটোগ্রাফারের বিপুল ক্ষমতা নাই সত্য, মহাবীরের মত গন্ধমাদন উৎপাটন করিয়া আনা তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়, তবুও ছোট্ট ক্যামেরাটি নড়াইয়া সরাইয়া অল্প পরিসর ও স্বল্প সময়ের মধ্যে ভানুমতির মায়া খেলার মত সেও যাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহাও বড় কম কৌতুকাবহ নয়। দুএক যব এদিকে ওদিকে, দৃশ্যের দর্শনীয়তায়, ভাবের লালিত্যে কত যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বোঝা কঠিন। এইরূপে কাচের উপর যে ছবিখানি ছাপিয়া যায়, তাহাকে তুলিকা কিম্বা লেখনীর সাহায্যে সংশোধন করার আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। ছবিখানিতে সৌকুমার্য্যের অভাব হয় হউক, আলোক-পাত যদি অত্যুজ্জ্বল, ছায়া যদি নিবিড় কালিমায় পরিণত হয় সেও ভাল, আর কিছু না হউক, যাহা সত্য যাহা প্রকৃত, তাহারি প্রতিকৃতি সেখানে আমরা দেখিতে পাইব। আর ধুইয়া, মুছিয়া প্রলেপ লাগাইয়া যাহা দাঁড় করাইব, তাহাতে যেমন সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিবে, তেমনি তাহা সত্যের গৌরব ভ্রষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। পুরাণ কালে ফোটোগ্রাফ যে প্রথায় লওয়া হইত, এই জন্যই আমি তাহার পক্ষপাতী—যে, তাহার প্রকাশ সত্যের অভিব্যক্তি। তাহা কতক ফোটোগ্রাফি আর কতক দোষ-বহুল অঙ্কনবিদ্যা নয়, তাহার বংশ পরিচয়ে তাঁতিকুল, বৈষ্ণবকুল দুইই নষ্ট হয় নাই, কুল যেমনই হউক না সে তাহার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে। আজকালকার প্রদর্শনী-গৃহের প্রাচীর সকল, যে ফোটোগ্রাফ সমূহে সজ্জিত হয়, তাহার অধিকাংশই কোন্ কুলের বোঝা কঠিন। অনুকরণ সহজেই করা যাইতে পারে, হয়ত বা এমনি পরিপাটী ভাবে করা সম্ভব নকল কিছুই ধরা পড়িবে না,—তবে তাহাতে গৌরব কতটা বৃদ্ধি হয় তাহাই বিবেচ্য। তাই মনে হয়, ফোটোগ্রাফিকে আপন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করাই বিজ্ঞের কাজ, চিত্রের অবাধ বিচিত্র ক্ষেত্রে চরিবার স্বাধীনতা দান যুক্তিযুক্ত নয়। এই সকল জাতিগোত্রহীন ফোটোগ্রাফের দ্বারা ফটোগ্রাফির যত অধিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব এমন আর কিছুতে নয়। ছোট্ট ক্যামেরা

দ্বারা যে সমুদায় সামান্য ফোটোগ্রাফ (Snap Shot) আমরা সহজেই লইতে পারি, তাহার মধ্যে অধিক কারুকার্য্য না থাকিলেও তাহারা খাঁটি জিনিস, নির্দ্দোষ আমোদ, ক্ষণিকের সুখময় আত্মবিস্মৃতি। কাহারো উপকার, কোন কিছুর উন্নতি তাহার দ্বারা হয় কিনা জানিনা, তবে তাহাতে কোন চারুশিল্পের হানি যে হয় না তাহা নিঃসন্দেহ।

এসংসারে যশস্বী ও কৃতকার্য্য হইবার কোন বিশেষ ধারাবাহিক বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে কিনা বলিতে পারি না, তাহা যেমন কতক ক্ষমতা, কতক চেষ্টা, কতক বিধিদত্ত বুদ্ধি ও অনুকূল অবস্থার সাহায্যে হস্তগত করিতে হয়, ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে সফলকাম হইতে হইলেও নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী।

সুজার মৃত্যু

সম্রাট শাজাহান-সুত সুলতান মহম্মদ সুজার মৃত্যু এক গভীর তমসায় আচ্ছন্ন। এবিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই বলেন,—ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়া তিনি আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং তথায় বর্ব্বরদিগের হস্তে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন (১)

কেহ কেহ বলেন, সুজা সপরিবারে আরাকানরাজকর্ত্তৃক নিহত হন।(২)

মহামতি রমেশচন্দ্র দত্তও এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মার্সম্যান সাহেবের সহিত একমতহইয়া তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

আরাকানরাজের সহিত সুজার বিবাদ সংঘটিত হয় এবং আরাকানরাজ সুজাকে সপরিবারে নিহত করেন। (৩)

Stewart ও সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী Bernier বলেন যে, মিরজুমলাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সুজা ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তথায় আসিয়া দেখিলেন সমুদ্রতীরে কোন জাহাজ নাই, তাই আপনার সৈন্য প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া কেবলমাত্র চল্লিশজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ সপরিবারে পদব্রজেই সমুদ্রতীর ধরিয়া আরাকানের প্রান্তরস্থিত "নাফ" নদীর তীরে

(১) After another twelve month's struggle he (ঔরঙ্গজেব) drove out of India his second brother, the self indulgent Shuja (1660), who perished miserably among the insolent savages of Arakan.—W. W. Hunter's Brief History of Indian People. p. 132.

(২) He took refuge at length, with the King of Arracan, by whom he and his whole family were barbarously murdered.—E. F. Catron's General History of the Mogul Empire.

(৩) It is certain that dissensions arose between Suja and the Raja of Arracan and the former with all his family, were cut off.···History of India by Marshman. p. 147.



মালা গাঁথা

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজা স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র সুলতান বঙ্ককে আরাকানরাজ সমীপে আশ্রয় যাচ্ঞার্থ প্রেরণ করিলেন, আরাকান-রাজও অতি সমাদরে তাঁহাদিগকে স্বপুরে আশ্রয় দিলেন।

তৎপর কিছুকাল আরাকানগৃহে অবস্থান করিয়া সুজা একখানি জাহাজের নিমিত্ত রাজার নিকট আবেদন করিলেন। পিশাচের মায়ামূর্ত্তি কতক্ষণ স্থায়ী? সুজার আবেদনের কোন উত্তর আসিল না, তৎপরিবর্ত্তে আরা-কানরাজ লিখিলেন যে, তাঁহার কোন একটী কন্যাকে রাজহস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

সুজার অন্তঃকরণ নিরাশার তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হইল। মরুভূমে মরীচিকা দ্বারা আকৃষ্ট নিরীহ পথিকের মতন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

আরাকানরাজ পৌত্তলিক হইলেও তাঁহার রাজ্যে বহু মুসলমানের বাস ছিল। সুজা মৃত্যুকালে 'মরিয়া' হইয়া উঠিলেন, তিনি স্থির করিলেন ঐ সমস্ত মুসলমানকে অর্থে বশীভূত করিয়া, একদিন অতর্কিতভাবে আরাকান রাজপুরী আক্রমণ করিবেন। সুলতান বঙ্কের উত্তেজনায় আরাকানের মুসলমানগণ সুজার অধীন হইল। কিন্তু পুরী আক্রমণের পূর্ব্বদিবস এই অভিসন্ধি প্রকাশিত হওয়ায়, আরাকানরাজ ক্রোধে সুজার পরিবারদিগকে আক্রমণ করিলেন। একদিকে সুজা অপরদিকে বঙ্ক সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ব্বর আরাকান-সৈন্যগণ মস্তকোপরি প্রস্তররাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুলতান বঙ্ক অবশেষে তাঁহার দুইটী শিশুভ্রাতা, ভগিনীগণ ও মাতা পিয়ারা-বানুর সহিত বন্দী হইলেন। (৪)

এই পর্য্যন্ত বার্ণিয়ারের সহিত ষ্টুয়ার্টের মিল। কিন্তু পরক্ষণেই অসামঞ্জস্য।

ষ্টুয়ার্ট বলিতেছেন, সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, শত্রু আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার পরিবারগণ-সহ তাঁহাকে "নাফ" নদীর মধ্যভাগে আনয়ন করিল। সুজা নদীতে ঝম্পদ্বারা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিয়া রজ্জু-বদ্ধভাবে নদীমধ্যে নিমজ্জিত করা হইল। তাঁহার দুইটী অনুচর সন্তরণ দ্বারা পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইলে, তীরে আসিতে না আসিতেই শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। (৫)

কিন্তু বার্ণিয়ের বলিতেছেন,—সুজা একজন রমণী, একজন হাজি, এবং দুইজন অনুচরসহ একটী পর্ব্বতোপরি আরোহণের সময় প্রস্তর দ্বারা আহত হইতে হইতে পর্ব্বত-পাদস্থিত অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। (৬)

---

(৪) Bernier's Travel, (translation by Ouldinburgh,) Bangabasi report, p. 104 and Stewart, Same Edition p. 307.

(৫) See Syme's Embassy to Ava. Stewart's History of Bengal. Bangabasi reprint. p. 310.

(৬) Bernier's Travels in Hindustan, p. 104.

এই কথা আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সমর্থন করিয়াছেন।(৭)

কিন্তু সুজা ইহার পরও জীবিত ছিলেন বলিয়া শ্রুত হয়। (৮)

তাঁহার সমাধি Darleymple নামক কোন সাহেবকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।(৯)

এসম্বন্ধে বার্ণিয়ের বলেন,—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রারম্ভে জনরব উঠিল, গোলকণ্ড ও বিজাপুরের রাজার সহিত যোগ দিবার জন্য সুজা মসলিপত্তনে পৌঁছিয়াছেন। আর একবার শ্রুত হইল যে পেগুরাজদত্ত রক্তপতাকা হস্তে সুলতান সুজাকে সুরাটে দুইটী অর্ণবপোতের সহিত দেখা গিয়াছে। ক্রমে তিনি নাকি পারস্য দেশে সিরাজ নগরে ও তৎপরে গান্ধারে (Candahar) ও অবশেষে কাবুল রাজ্যে আগমন করেন। ঔরঙ্গজেব এই সমস্ত বার্ত্তা অবগত হইয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "অবশেষে সুলতান সুজা আগি (তীর্থযাত্রী) হয়ে পড়লেন।" শেষ প্রবাদ এই যে, তিনি Constantinople (রুম) হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পারস্যদেশে অবস্থান করিতেছেন।(১০)

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন সুরাট আক্রমণ করেন তখন তিনি ঔরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন যে, সুলতান সুজা তাঁহার শিবিরে আছেন, এবং শাজাহানের প্রকৃত উত্তরাধিকারীভাবে তিনি তাঁহাকে সুরাট দান করিয়াছেন।(১১)

বার্ণিয়ের এই সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে ভিত্তিহীন জনপ্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, যদিও তিনি আরাকানরাজকর্ত্তৃক হত হন নাই তবুও সেই অরণ্যসঙ্কুল বনপ্রদেশের কোন নিভৃত স্থানে দস্যু কিম্বা ব্যাঘ্রের হস্তে পড়িয়া তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছিল। সুজার মৃত্যুর পর তাঁহার অসি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Elphinstone সাহেব ষ্টুয়ার্টের বাক্য সমর্থন করিয়া সুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

তাঁহাদের সম্বন্ধে জনপ্রবাদ যাহাই বলুক না কেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। * *

সুজার সন্ধান না পাইয়া কিছুদিন ঔরঙ্গজেব একটু ভয়ে ভয়ে ছিলেন, কিন্তু বৎসর না যাইতেই তিনি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।(১২)

শ্রীতারানাথ রায়।

(৭) He was overcome by Aurangzib's able lieutenant Mirjumla, and ultimately driven into Arakan, where, according to some accounts, he was at last seen fleeing over the mountains, accompanied by three faithful men and one woman—Vincent A. Smith's History of India, p. 137.

(৮) He had eseaped which is belived, as we are informed, in the island of Soolo, far from Arracan and Bengal, where his tomb is shown at this day. This uncertainty of his fate, furnished credulity and intrigue with pretentions to assert, that he continued alive in Indostan, concealed now here, now there; but ready to appear on any favourable opportunity of asserting his right to the throne.—Orme's Historical Fragments. Bangabasi reprint p. 63.

(৯) Ibid. see Note xxx. p. 60.

(১০) Bernier's travels. p. 104.

(১১) Orme—see Note xxxII. p. 60.

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৮)

বিজাপুর ইতিহাস

বিজাপুর-রাজ্য সংস্থাপক যুসফ আদিল সা তুরস্ক সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৪৪৩ সালে তাঁহার জন্ম। সুলতান রাজবংশে একটমাত্র পুত্রসন্তান জীবিত রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথানুসারে সুলতান মহম্মদ সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন—যুসফ তাহাদের মধ্যে একজন। যুসফের মাতা সন্তানের প্রাণরক্ষার অনেক চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্দীন নামক জনৈক পারস্য বণিক স্তাম্বুল সহরে বাস করিতেন; তাঁহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থানে অপর একটি বালককে সাজাইয়া দিয়া যুসফকে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাঁহার জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়া যুসফকে পারস্য দেশে লইয়া যান ও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানে তাঁহার জীবন-রহস্য প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। অবশেষে অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর যুসফের স্বপ্ন হয় যে ভারতবর্ষ প্রয়াণেই তাঁর কল্যাণ, সেই স্বপ্নানুসারে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে (রত্নগিরি) উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর—তিনি রূপবান্ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন পুরুষ। জনৈক পারস্য বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাভোল হইতে বাহমন-রাজধানী বিদুরে গমন করেন। তথায় রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়ানের অনুগ্রহে সৈনিক পদে নিযুক্ত হয়েন। সত্বর

(১২) Though there were many rumours regarding them,—were never heard of again. * * *

His ingnorance of Shuja's fate left Aurangzib in some uneasiness for a time but all his other grounds of anxiety were removed before the end of the next year.—Elphinstone's History of Indla. p. 611.



বিজাপুরের অষ্ট বাদ্‌সা।

তাঁহার পদোন্নতি হইল। বিদূর হইতে বহ্মাডে গিয়া তিনি ১৫০০ অশ্বের অশ্বপতি ও আদিল খাঁ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহম্মদ গাওয়ান তাঁহাকে দৌলতাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বহমণী রাজার অধীনে তাঁহার কর্ম্ম হয়। ১৪৮৯ অব্দে তিনি অধীনতা-বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপদবী গ্রহণ ও বিজাপুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮ অব্দে দক্ষিণ সুলতানেরা বাহমণী রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়া ও তৎ-সমীপবর্ত্তী প্রদেশ য়ুসফের ভাগ্যে আইসে। তখন ভাস্কো ডি-গামা ভারতবর্ষের নূতন পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক কর্ণাটকতীরে আবির্ভূত হন, তখন য়ুসফ বিজাপুরের অধীশ্বর। পোর্ত্তুগীসদের সঙ্গে গোওয়া লইয়া তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীসদের রাজ প্রতিনিধি আলবুকর্ক বিজাপুর বিপক্ষে বিজয়-নগর রাজার সহিত সন্ধি-বন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকর্কের হস্তে বিজাপুর সৈন্যের পরাভব হওয়ায় গোওয়ায় পোর্ত্তুগীস রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

বিজাপুরে দুই শত বৎসরের মধ্যে নয়জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। সে কাল সুখশান্তিভোগের কালই নহে। নিয়ত উপদ্রব—তুমুল বিপ্লব - গভীর অশান্তির মধ্যে তাঁহাদের রাজত্ব করিতে হইত। হয় শত্রুরা নির্য্যাতনের চেষ্টা, নয় শত্রু হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় চিন্তন—ইহাতেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইত। সিয়া ও সুন্নী মুসলমানে যুদ্ধ, অ-প্রতিবাসী সুলতানের সহিত যুদ্ধ—বিজয় নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ধ—মোগলের সহিত যুদ্ধ—এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিজাপুর রাজারা কখন্ যে রাজ্যশাসনে রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাইতেন তাহা ভাবিয়া ওঠা যায় না।

য়ুসফ আদিল সা পারস্যে বাস ও শিক্ষা-লাভ করিয়া সিয়া ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় রাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়। তাঁহার সেনাদের মধ্যে তুর্কজাতীয় অনেক সুন্নী মুসলমান ছিল, আর প্রতিবাসী সুলতানেরাও এই নূতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই সূত্রে যে যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর, গোলকুণ্ড', বিদূরের সুলতানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে পর য়ুসফ অনেক কষ্টে এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গোঁড়া সিয়া ছিলেন না—স্বরাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্নীদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ নিষেধ করিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত ছিল। তিনি বলিতেন "যেমন স্বর্গের নানা নিকেতন তেমনি ইসলামের নানা সম্প্রদায়।" হিন্দুদের উপর তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল, তিনি একজন মারাঠী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দু জাতির সহিত সহানুভূতির পরিচয় দিলেন।

মারাঠী মহিষীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে—নাম ইস্মায়েল। য়ুসফের মৃত্যুর পর ইস্মায়েল আদিল সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। রাজ্যাভিষেক কালে তিনি সিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কমাল খাঁ সুন্নী। রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিষম

গোলযোগ উপস্থিত। মন্ত্রীর মতলব স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুন্নীধর্ম্ম প্রত্যানয়ন করেন।

বালক সুলতান ও তাঁহার মাতা, কমাল খাঁ কর্ত্তৃক প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। মন্ত্রী স্বয়ং বলপূর্ব্বক রাজ্যলাভের অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণৎকারেরা গণিয়া বলিল এখনো সময় হয় নাই, তাই তিনি নিজগৃহে শুভলগ্ন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহার পুত্রের সমূহ শঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া একজন বিশ্বাসী তুর্ককে কমাল খাঁ বধে নিযুক্ত করিলেন। তুর্ক মক্কাযাত্রীর ভান করিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। মন্ত্রী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর যেমন তুর্কের হাতে পান দিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি সে তড়িতের ন্যায় ত্বরিতে লুক্কায়িত খড়্গ বাহির করিয়া মন্ত্রীর বুকে বসাইয়া দিল; মন্ত্রীর অনুচরেরা সেই দণ্ডে তুর্ককে কাটিয়া ফেলিল। মন্ত্রীও তাঁহার হন্তা দুজনেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইলেন।

মন্ত্রীর মাতাও সুলতানা সদৃশী সাহসিকা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র হারাইয়া আপন পৌত্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার পুত্র কমাল খাঁ মরেন নাই, আহত হইয়াছেন মাত্র। মৃতদেহ বসনভূষণে সাজাইয়া বারান্দায় পালঙ্কের উপর শোয়াইয়া রাখিলেন যেন লোকেদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে রীতিমত বসিয়া আছেন। এদিকে সফদর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে চলিলেন।

রাজ্ঞীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দিলসদ নামক রমণী তাঁর সখী এবং তিনি নিজে যুদ্ধ বেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ঘরে লোকজন বড় বেশী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে একদল শিয়া পক্ষপাতী সৈন্যের প্রবেশ লাভে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইল। সফদর খাঁ তাঁহার সুন্নীদের লইয়া যেমন প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন, অমনি উপর হইতে তাহাদের উপর গোলাগুলি প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সিয়া সুন্নীদের ঘোরতর সংগ্রাম। অনেকে হত ও আহত হইয়া পড়িল। পরিশেষে সফদর খাঁ দ্বার ভেদ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে একবাণে তাঁর নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই প্রাচীরের উপর বালক সুলতান উপস্থিত। শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইস্মায়েল এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা সফদার খাঁর মাথায় পড়িয়া তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইস্মায়েল নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ইস্মায়েলের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্য-রাজা তাঁহার সম্মানার্থে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন।

ইস্মায়লের পুত্র মল্লু তাঁহার উত্তরাধিকারী। মল্লু উগ্রচণ্ড দুরন্ত নরপতি ছিলেন। রাজ্য উচ্ছন্ন যায় দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ দেন। ছয় মাস রাজত্বের পর মল্লু অন্ধীকৃত বন্দীকৃত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন। সুন্নীদের মানবর্দ্ধন সিয়াদের নির্য্যাতন ও অপদস্থ করা, এই তাঁহার কাজ; এমন কি, অনেক সিয়া মুসলমান তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া বিজয়নগর রাজার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অমিতাচারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার রোগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাজচিকিৎসকের মুণ্ডচ্ছেদ ও হস্তী পদমর্দ্দনে প্রাণদণ্ড হয়।

ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্বকালে বিজয়-নগরে ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ত্রিংশবৎসর পরে হক্কা ও বুক্কা দুই ভাই শৃঙ্গিরি মঠাধিপতির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর পত্তন করেন। ১৩৩৫এ হক্কা হরিহর রায় নামে বিজয়নগরের রাজা হইয়া মুকুট ধারণ করেন। ঐ সময়ে আবার হসন গাঙ্গু নামক জনৈক পাঠান আল্লাউদ্দীন নাম ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের সূত্রপাত করেন। হসন গাঙ্গু একজন ব্রাহ্মণ গণক ঠাকুরের উপকার ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি "বামণ" পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশ "বাহমণী" বলিয়া বিখ্যাত। বিজয়-নগর ও বাহমণী সুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। বিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাঁড়াইলে সেও বিজয়নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম বাদসাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা। তিম্মা নামে তাঁহার মন্ত্রী ছিল। দেবরায়ের মৃত্যু কালে তাঁহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিম্মা একজন বালক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবনপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিয়া আর একটি বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয়;—এইরূপ উপর্য্যুপরি তিনজন বালক রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিম্মা দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রামরায়ের বিবাহ দিয়া রামরায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমূলে নির্ম্মূল করা তিম্মার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হইল। কেবল তির্ম্মল নামক একজন আধপাগলা জানোয়ার আর কন্যাকুলের একটি রাজকুমার এই দুই রাজ-বংশধর অবশিষ্ট রহিল।

রামরায় অবাধে রাজ্য লাভ করিলেন কিন্তু নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিলনা। রাজপদ পাইয়া তিনি প্রগল্‌ভ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রজারা তাঁহার উপর চটিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল—তাহারা বলিতে লাগিল, ইনি কোথাকার জালরাজা আমরা একজন খাঁটি রাজা চাই। রামরায় বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট রাজকুমারটিকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে তাঁহার অরিকুল ধ্বংস করিয়া রাজাকে সরাইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও রাজ্যের শান্তি হইল না। এ দিকে আবার আধপাগলা তির্ম্মল গোলযোগ আরম্ভ করিল, তাহারও রাজা হইবার চেষ্টা। তির্ম্মল ও রামরায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। অনেকে রামরায়ের পক্ষ হইয়া তির্ম্মলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ

করিল। তির্ম্মল এই শঙ্কটে বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে অনেক ধনরত্ন উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ইব্রাহিম আহ্লাদের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন, তির্ম্মল তাঁহাকে স্বাগত বলিয়া বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবনরাজের হস্তক্ষেপ সকলেরই অসহ্য হইল। রামরায় ও তৎপক্ষীয় লোকেরা তির্ম্মলকে সুলতান বিসর্জ্জনে অনুরোধ করিল—বলিল আমাদের কথামত কাজ করিলে আমরা চিরকাল আপনার অনুগত ভৃত্য হইয়া থাকিব। তির্ম্মল আশ্বাস পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়া অনেক কষ্টে ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানেরা যেমন কৃষ্ণা পার হইল প্রজারাও আপনাদের বচন ভুলিয়া দাঁত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তির্ম্মলকে ধরিতে আসিতেছে। এই সংবাদে তির্ম্মল একেবারে অধৈর্য্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িলেন। অশ্বগজের চক্ষু উৎপাটন, রাজবাটীর গহনাপত্র জাঁতায় পিশিয়া চূর্ণীকরণ, এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শত্রুরা রাজভবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যায় বিপদ-রাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামরায় এখন নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন—তাঁহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈর্ষা ও ভয়ের সঞ্চার হইল।

এদিকে ইব্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল খাঁ বিজাপুরের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতা বন্ধন করেন। হিন্দু মুসলমানদের এরূপ মিলন আর কখনও শুনা যায় নাই। রামরায়ের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিজয়নগরের রাজা ও রাণী আলিকে পুত্ররূপে বরণ করেন। আহমদনগরের সহিত আলির যখন যুদ্ধ হয় তখন রামরায় বিজাপুর সুলতানের সহায়তা করেন।

হিন্দুদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানের পর রামরায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া যবনরাজ্য তৃণবৎ দেখিতে লাগিলেন—মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর নাই। মুসলমানদের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। মসজিদে ঘোড়ার আস্তাবল, তাহাদের ধর্ম্মের অপমান। তখন সুলতানেরা চটিয়া উঠিয়া প্রগল্‌ভ হিন্দুরাজাকে দমন করিতে কটিবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া বিদূর ও আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই চতুঃ সুলতান বিজাপুরে আসিয়া একত্র হইলেন। তথা হইতে চারি সুলতান বিজয়নগরের উপর হল্লা করিতে কৃষ্ণানদী পার হইলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখেন রামরায়ের সৈন্যদল পরপারে সম্মিলিত। নদীর ঘাট সুরক্ষিত, পারাপার বন্ধ। সুলতানেরা এক ফন্দী করিলেন। তাঁহারা নদীর কিনারা দিয়া কতকদূর চলিয়া গেলেন, যেন পার হইবার অপর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্বস্থান ছাড়িয়া পরপারে শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে

যাত্রা করিতে লাগিলেন। তিন দিন এইরূপ চলিল। তৃতীয় রাত্রে সুলতানেরা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে নদীপার হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা রামরায়ের সৈন্যের পাঁচ ক্রোশ দূরে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

প্রভাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। উভয়েই বন্দুক কামান ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। হিন্দুরা মহারোখে আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল কিন্তু মধ্যভাগ অটল। মধ্যভাগের নেতা আহমদনগরের 'দিওয়ানা' সুলতান হুসেন নিজামসা শীঘ্রই রামরায়ের সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কামান ছিল তাহাতে পয়সা পুরিয়া হিন্দুদের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন—সেই মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দুসৈন্যের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটিল। ক্রমে হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রামরায় তাহার পালকীতে উঠিয়া বেহারাদের দূরে যাইতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ খানিক দূরে গিয়া পালকী রাখিয়া পলায়ন করিল। রামরায় অন্ধকারে হগে পলায়নোদ্যত, এমন সময়ে ধৃত হইয়া হুসেন সার সমক্ষে আনীত হইলেন। হুসেন সা তাঁহার 'দিওয়ানা' পদবীর উপযুক্ত রূপ কার্য্য করত মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম দিলেন—তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। সুলতানের অনুচরেরা রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রাজার এই দশা দেখিয়া হতাশ্বাসে পলায়ন পরায়ণ হিন্দুসৈন্যগণের পশ্চাতে মুসলমানেরা ধাবমান হইয়া তাঁহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুপক্ষের লোক মিলিয়া সমরক্ষেত্রে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ সেনার সম্মিলন হয়। হিন্দু সৈন্য বিস্তর মারা পড়ে এবং বিজয়ীদের লুণ্ঠন-জাত প্রচুর ধনরত্ন লাভ হয়। অতঃপর বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক নগরমধ্যে জয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেখানকার লুটপাটের ব্যাপার বর্ণনাতীত। নগরের বাড়ীঘর দুয়ার লণ্ডভণ্ড—হিন্দু কীর্ত্তির চিহ্ন-সকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড জয়স্তম্ভ স্বরূপ আহমদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা বিজাপুরে স্থাপিত হয় এই প্রস্তর মুণ্ড আর্ক কেল্লায় সেদিন পর্য্যন্ত অনেকে দেখিয়াছেন। তালিকোটের যুদ্ধেই বিজয়নগরের ধ্বংস। এই যে তাহার পতন হইল আর তাহার উত্থান শক্তি রহিল না। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য চিরকালের মত প্রলয়সাগরে ডুবিয়া গেল।

১৫৮০ অব্দে আলির মৃত্যু হয়। ইমারত নির্ম্মাণে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। জুম্মা মসজিদ, তাজ বাউড়ী, সহরের প্রাচীর, জলপ্রণালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাঁহার সময়কার। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীশ্বর আকবর প্রেরিত কয়েকজন দূত বিজাপুরে আগমন করেন, তাঁহাদের কি গূঢ় অভিপ্রায় ছিল প্রকাশ পায় নাই। মোগলের গুপ্তচরেরা বিজাপুরের উপর সেই যে শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল, অচিরাৎ তাহার গরল ফল ফলিত হইল।

আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতৃব্যের মৃত্যু কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর মাত্র। তাঁহার নাবালক অবস্থায়

আলির মহিষী চাঁদবিবি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কমাল খাঁ সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিদ্রোহ চেষ্টা প্রকাশিত হওয়াতে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন। তাঁহার পরে কিশোর খাঁ প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া চাঁদবিবির শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ও ছলে বলে কৌশলে রাজ্ঞীকে সাতারার দুর্গে নির্ব্বাসিত করিলেন। মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অত্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। চাঁদবিবি স্বপক্ষীয় সৈন্য সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হইলেন, কিশোর খাঁ প্রাণভয়ে পলায়নানন্তর গোলকুণ্ডার একজন হন্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অনন্তর মন্ত্রী দিলাবর খাঁ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইল। তিনি আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ও গোলকুণ্ডা-সুলতানের ভগিনী চাঁদ সুলতানার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিয়া দিলেন। দিলাবর খাঁ ইব্রাহিম বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। মন্ত্রীর অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৫৯৪ সালে তাঁহার ভ্রাতা ইস্মায়েল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোগে আহমদনগর সুলতান বহ্লান নিজাম সা বিজাপুর আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হইল না; প্রত্যুত এই যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যনাশের মূল। যুদ্ধান্তের অনতিকাল পরে বহ্লানের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রও রণক্ষেত্রে বিজাপুর সৈন্য হস্তে নিহত হন; আহমদনগরে ঘোর বিপ্লব বাধে।

বহ্লান নিজাম খাঁর মৃত্যুর পর আহমদনগর দুই দলে বিভক্ত হয়, চাঁদবিবি তন্মধ্যে এক দলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেককাল অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সম্রাটের আবেদনে ক্রমে মোরাদ আহমদনগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন। মোগল আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী চাঁদবিবি। তিনি কবচ ধারণ পূর্ব্বক তরবার হস্তে স্বয়ং দুর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহদান ও দুর্গ-রক্ষণের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; ইব্রাহিম আসিলেন বটে কিন্তু সময়মত আসিতে পারেন নাই। যখন আসিলেন তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। চাঁদবিবির যত্ন ও চেষ্টায় মোগলেরা প্রথমবার অল্পে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়। যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বহ্রাড় প্রান্ত (Berar) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদবিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। এবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিলেন তখন আর শত্রু হস্ত এড়াইতে

পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু, তাহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ; উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলদের সহিত সন্ধি সাধনের উদ্যোগ দেখিতেছেন এমন সময় সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন বিদ্রোহী সৈনিকের খড়্গাঘাতে রাণী প্রাণ হারাইলেন; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রু হস্তে নিপতিত হইল। চাঁদবিবি ভারত বীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন; দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নাম ও যশ চিরস্মরণীয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম শিল্পবিদ্যাবিশারদ সুশিক্ষিত সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। মহারাষ্ট্রী ও পারস্য ভাষামিশ্রিত ব্রজভাষা সদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্‌গুরু তাঁহার আখ্যা—লোকে তাঁহাকে ইব্রাহিম জগদ্‌গুরু বলিয়া মানে। বিজাপুর মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সময়কার কোন কোন দলিলের উপর "শ্রীসরস্বতী প্রসন্ন" শিরোনামা দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজাপুরের পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থা—রাজভাণ্ডারপূর্ণ—প্রজাগণ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন—দুই লক্ষ পদাতিক ৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যবল।

ইব্রাহিমের পর মাহমুদ আদিল সা। মাহমুদের রাজত্বকাল ৪০ বৎসর। ইনি যুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন না, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাপী, সরোবর, জলপ্রণালী সমস্ত রচিত হইয়া সহরের জলসৌকর্য্য সম্পাদিত হয়। জুম্মা-মসজিদের সুবর্ণরঞ্জিত ভজনালয় তাঁহার রচিত। বিপুল কাষ্ঠস্তম্ভাবলম্বিত উচ্চছাদ, চিত্রিত প্রকোষ্ঠসমন্বিত আসার মহল তাঁহারই কীর্ত্তি-স্তম্ভ। আর বিজাপুরের বিশেষ ভূষণাস্পদ যে গোলগুম্বজ তাহা তাঁহারি সুযোগ্য সমাধি-মন্দির।

শিবাজী

মহামুদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পিতার সর্ব্ববাদিসম্মত রাজভক্তির আড়ালে ও মাতার উৎসাহবাক্যতলে তিনি এক একটি করিয়া পাহাড় দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন বিজাপুর রাজার হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত প্রদেশ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ১৬৪৩ সালে পুনার নিকটবর্ত্তী তোরণা দুর্গের অধিকার ও তন্নিহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোকনস্থ কল্যাণ হইতে বিজাপুরে রাজস্ব লইয়া এক দল লোক আসিতেছিল শিবাজী সে ধন লুণ্ঠন করিলেন ও ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজা তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। সাহাজী তখন কর্ণাটকে—তাঁহাকে বিজাপুরে আনাইয়া জেলখানায় বন্ধ করিয়া বলা

হইল যে তাঁহার পুত্র যতদিন ধরা না দেন ততদিন তাঁহার মুক্তিলাভ নাই। শিবাজী মোগল সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া অনেক কষ্টে পিতার মুক্তিসাধনে কৃতকার্য্য হয়েন ও আবার পূর্ব্ববৎ লুটপাটে রাজ্যবৃদ্ধি করিবার সন্ধি লাভ করেন। মাহামুদের রাজত্বকালে শিবাজীর এই কাণ্ড। দ্বিতীয় আলি আদিল সার সময়ে তাঁর দৌরাত্ম্য ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মোগল ও মহারাষ্ট্রীদের উপদ্রবে বিজাপুরের মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। ১৬৫৪ অব্দের পূর্ব্বে শিবাজী বিজাপুরের অধীনস্থ অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ ও কায়েম করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দমন করিবার ভার বিজাপুর সেনাপতি আফজুল খাঁর হস্তে সংন্যস্ত হয়।

আফজুল খাঁ।

আফজুল খাঁর যুদ্ধযাত্রার পরিণাম জানাই আছে। ঘটনাটি গ্রাণ্ট ডকের মারাঠী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত :—

আফজুল শিবাজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পদাতিক ৫০০০ বোড়সওয়ার ও কামান অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া মহা আড়ম্বরে কুচ করত প্রতাপগড় পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। শিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত, প্রতাপগড়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ধার্য্য হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাঁহাদের সম্মিলনে অন্য লোকজন উপস্থিত না থাকে। নবাবসাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া সৈন্য সামন্ত পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটি মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পা ফেলিতে দেখিয়া নবাব সাহেব তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে বাঘনখ প্রচ্ছন্ন ছিল, কোলাকুলির সময় সেই গুপ্তাস্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করেন ও ভবানী খড়্গাঘাতে কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সৈন্যগণ ঝোপ ঝাপ অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবাবসৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদের ছারখার করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূলপত্তন করিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার পরেও বিজাপুরের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু যুদ্ধে হারাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। একস্থানে যদি পরাজিত হন, অমনি অপর স্থানে ঘুঁড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে বিজাপুর রাজা হার মানিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। শিবাজী যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় কোঙ্কনতীর ও ভীমা হইতে বর্ণানদী পর্য্যন্ত ১৩০ মাইল দীর্ঘ ও ১০০ মাইল প্রস্থ সহ্যাদ্রির উত্তরস্থ ভূমিখণ্ড। শুদ্ধ তাহা নহে, শেষে এমন হইল যে শিবাজীর বর্গী নিম্পীড়িত

চৌথাইকর হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিজাপুর তাঁহাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে প্রতিশ্রুত হইল। মারাঠীগণের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও বিজাপুরের শান্তি নাই। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। আলি যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু দেখিলেন যে দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ মোগলদের হস্ত হইতে তাঁর রাজ্যরক্ষা করা সুকঠিন। দুইবৎসর পরে মোগল সম্রাটের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয় তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ভীমা নদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত হইল। ১৬৭২ অব্দে ১৬ বৎসর বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ রাজত্বের পর দ্বিতীয় আলি আদিল সা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

আলির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সেকন্দরের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর। সেকন্দর আদিল সা বিজাপুরের শেষ সুলতান, ইঁহার রাজত্ব কালে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করেন।

অনেক দিন হইতে বিজাপুর বিজয়ে তাঁহার সাধ। যদিও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই, তাঁহার সেনাপতিগণ বারম্বার বিফল-প্রযত্নে বিজাপুরের দ্বার হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি সে চিরপোষিত রাজ্যলোভ নিরস্ত হইবার নহে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ বিজয় উদ্দেশে অসীম সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—সেই যে দিল্লী ছাড়িলেন আর ফিরিবার অবকাশ পাইলেন না। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৩ বৎসর—তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পথে পথে তাম্বুতে তাম্বুতে অতিবাহিত হইল। অনেক যুদ্ধে তিনি দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল জয় করিলেন বটে কিন্তু মারাঠীদের দমন চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত বলহানি, সমস্ত আয়ুক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ৬৯ বৎসর রাজত্বের পর অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থা! অতীতের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর, ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী, উৎপীড়িত হিন্দুরাজগণ প্রতিপীড়নে সমুদ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ সুলতানদের সহিত মিলিয়া মহারাষ্ট্রীদের দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিন্তু দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল গ্রাস করিয়া সে পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে প্রলয়ের বীজ বপন করিয়া গেলেন—অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্নচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে কারেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ঔরঙ্গজেবের ক্যাম্প দেখিতে যান, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটের চালচলন ও যুদ্ধপ্রবাসের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারেরি রাজদরবারে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঔরঙ্গজেব কৃশাঙ্গ, খর্ব্বকায়, বৃহন্নাসা, বয়োভারে অবনত, শুভ্রবেশ পরিহিত ও মুক্তাজড়িত জরির কিরীট বিভূষিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্রাট। তাঁহার শ্যামমুখে

শুভ্র দাড়ী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরবার-তাম্বুর মধ্যে সুরঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন—চারি কোণে চারিটি রজত স্তম্ভ—উঠিবার একটি রূপার পাদপীঠ। সম্রাট এই সিংহাসনে উপবিষ্ট, আমীর সভাসদেরা তাঁহার আশে পাশে বিনম্রভাবে উপবিষ্ট—দুইজন ভৃত্য চামর ব্যজন করিতেছে, একজন ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। সম্রাট সহাস্যবদনে নিজহস্তে প্রজাদের আর্জী সকল গ্রহণ করিতেছেন—বিনা চসমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে হুকুম লিখিতেছেন। কারেরি বলেন সম্রাটের সঙ্গে সৈন্যবল দশলক্ষ পদাতিক—অশ্ব ৬০,০০০, মালবহনের জন্য ৫০,০০০ উষ্ট্র, আর হস্তী ৩০০০; সেনানিবাস ৩০ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন ব্যাপারী দোকানদার কারিগর কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়া জনসংখ্যা

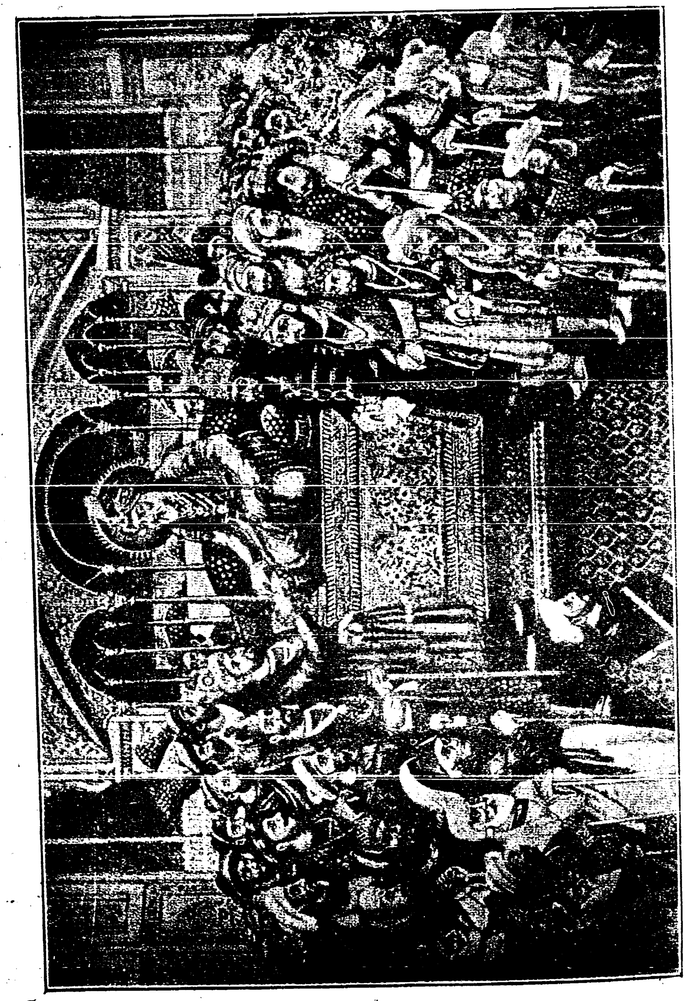

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজদরবার।

সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে; নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সকল প্রকার সামগ্রীসমাকীর্ণ সম্রাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জঙ্গম পুরী বলিলেই হয়। হাট বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচরবর্গের জন্য প্রত্যেক আমীরের আলাদা আলাদা হাট বাজার। সম্রাট ও রাজাদের তাম্বু প্রায় ৩ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে সুরক্ষিত; তীর ধনুক বর্ষা তরবার পিস্তল বন্দুক—গুরু ও লঘু কামান এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোর্ত্তুগীস ওলন্দাজ জর্ম্মন্ ফরাসিস্ প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত। বিদেশীগণ একবার মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাড়িবার পথ পায় না—পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই এক দৃশ্য আর মারাঠী সেনাদের ধরণ দেখ। সংস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনা—তাহাদের কোন নিয়ম নাই, বন্দেজ নাই—পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়ত কোন বিজন প্রদেশে সম্মিলিত। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খোরাক; ঘোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল পুরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত—দিবসে গাছতলায় কিম্বা কম্বলের আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম—রৌদ্রের উত্তাপে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বাঁধা ও অশ্বের সামনে ভূমিথনক এক একটি বল্লম। এই সব সামান্য সরঞ্জাম লইয়া মারাঠী বীরেরা যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইতেন, মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। অনেক বৎসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট আপনার ক্যাম্পেই বন্দী হইয়া পড়িলেন, মহারাষ্ট্রী সেনাগণ মুমূর্ষু সম্রাটের চতুর্দ্দিকে বীরদর্পে নৃত্য করিতে করিতে মোগলদের নাজেহাল পিশেহাল করিয়া তুলিল।

১৬৮৯ সালে রাজকুমার আজম সোলাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুরবিজয় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সোলাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিজাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্তু সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাধা পড়িল। মোগলদের আগমনে বিজাপুরের লোকেরা কলহ বিবাদ দলাদলি সব ভুলিয়া ঐক্যবন্ধনে মিলিত হইল। বিজাপুর সৈন্যের প্রতিঘাতে মোগলেরা বিপদগ্রস্ত হইয়া ভীমা নদীর উত্তরে হটিয়া গেল। বর্ষ শেষে আজম পুনর্ব্বার সৈন্যসহ প্রত্যাগত হইলেন। এবার বিজাপুর সেনাগণ আর এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সীমান্তে মোগলদের প্রতিরোধ না করিয়া রাজধানী মধ্যেই বল সঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এইরূপ আচরণের সুফল আপনা হইতেই ফলিল। বিজাপুরের উত্তরাঞ্চলে ধান্য শস্য জলের অভাব—অতবড় মোগল সৈন্যের আহার যোগানো বিষম দায়। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত—এদিকে বিজাপুরের অশ্বারোহীদল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে—মহা উৎপাত! অবশেষে আহমদনগর হইতে অনেক কষ্টে এক বোঝাই ধান্য আমদানী হওয়ায় মোগল সৈন্য রক্ষা পায়। ইত্যবসরে সম্রাট স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন

তাহা কোনমতে তালিতুলি দিয়া শেষ করিয়া সসৈন্য যুদ্ধ যাত্রার বাহির হইলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার পুত্র আজমের সৈন্য বিজাপুর একপ্রকার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে - সে সৈন্যের যে সমস্ত অভাব ছিল তাঁহার আগমনে তাহা দূর হইল। সহরের দক্ষিণে প্রাচীর-ভেদ-যোগ্য কামানসজ্জা প্রস্তুত হইল ও তাহার বলপ্রয়োগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই—ভিতরে অন্নকষ্টেই কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই বাক্য স্মরণ করত পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। অন্নাভাব যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবরে নগরপালেরা হার মানিয়া সম্রাটের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার আমীর উমরাও ও প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজাপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গের বিলাপধ্বনির মধ্যে আর্ক কেল্লার গগনমহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সর্দ্দারদের নজরানা গ্রহণ করিলেন। অভাগা সেকন্দর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, বন্দীকৃত বিদ্রোহীর ন্যায় রজত শৃঙ্খলে সম্রাট সমক্ষে সমানীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে বসিবার আসন ও অভয় বচনে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার একলক্ষ টাকা বার্ষিকী বাঁধিয়া দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেকন্দর লোকান্তরে গমন করেন। তাঁহার ইচ্ছামতে সহরের উত্তর পূর্ব্বে আপন গুরু গোরের সন্নিকটে এক সামান্য গোরস্থানে তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জীবদ্দশার অনুরূপই তাঁহার চরমগতি। তাঁহার প্রবলপ্রতাপ পূর্ব্বপুরুষদের সমুন্নত সমাধি মন্দিরসকল সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, আর আদিলসাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকন্দরের মৃতদেহোপরি অন্ত্যেষ্টির চিহ্নস্বরূপ একটি প্রস্তরখণ্ডও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিজাপুরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অপনোদিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল আর ফিরিল না। ঔরঙ্গজেব তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিজাপুর সৈনিকদের আশ্রয় দান, আমীর ওমরাওদের মানমর্য্যাদা রক্ষণ, ভূমি সম্পত্তি ও বিবিধ ইনাম দানে প্রজাদের মনোরঞ্জন, বসতি বিস্তারের উত্তেজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভাঙ্গা যেমন সহজ গড়া তেমন সহজ নয়। স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া অবধি সহরের জীবন বিনষ্ট হইল. তাহার শ্রীসম্পদ চলিয়া গেল। মানুষের অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতির উপদ্রব। ঔরঙ্গজেব থাকিতে থাকিতেই এমন এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইল যে তাহাতে লক্ষাধিক লোক মারা পড়ে ও অনেকে সহর ছাড়িয়া পালায়। ঔরঙ্গজেবের মহিষীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গোরের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। মড়ক থামিয়া গেলে সম্রাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল যে লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লাখের কিছু কম;

মাহমুদ আদিলসার রাজত্বকালে বিজাপুর ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী সাহাপুর মিলিয়া যে লোক সংখ্যা নির্ণীত হয় তদপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ১৬ হাজার লোক কমিয়া গিয়াছে। মোগল হইতে মারাঠিদের হস্তে পড়িয়া বিজাপুর দিন দিন আরো অবসাদ হিমে ম্লান হইতে লাগিল। মোগলদের সময় তাহার শ্রীসৌভাগ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বর্গীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল। পেশওয়ার অধিকার গিয়া সাতারা রাজাদের আমল আরম্ভ। সাতারার শেষ রাজা সাহাজী। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাহাজী অপুত্রক মরণানন্তর ইংরাজেরা সাতারা আত্মসাৎ করেন, সেই সঙ্গে বিজাপুরও ইংরাজরাজ্যে মিলিত হইল।

এই বিখ্যাত প্রাচীন সহর এইক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত হইয়াছে। জিলায় রাজধানী হইয়া বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া লৌহপথ মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসার উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার ভগ্ন জীর্ণ গৃহাবলী, কতক বাসোপযোগী কতক বা সরকারী কার্য্যালয় রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, মুসলমান রাজভবনগুলি জজ কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট পুলিসাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ, জেলখানা পোষ্ট আফিস এই সকলের জন্য পুরাতন গৃহ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, ভজনালয় গোরমন্দির পর্য্যন্ত অবৈধ ব্যবহারে কলঙ্কিত। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট Lord Curzon এইরূপ অত্যাচার নিবারণে বিশেষ মনোযোগ দান করেন, তাঁহার শাসনে ইমারত গুলির অপব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে বন্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই সকল উপায়ে এই শবপুরীতে কি প্রাণ সঞ্চার হইবে? এ আশা দুরাশা মাত্র। লোকদের সে জীবন্ত ভাব, সে স্বাধীন স্ফূর্ত্তি কোথায়? এই পুরীর ভগ্নগৃহের উপর কারিগিরি মৃতদেহে পুষ্পসজ্জার মত বিসঙ্গত বোধ হয়। আর আধুনিক কারিগরেরা স্বীয় কারুকার্য্যের বাহার যতই বাহির করুক না কেন, কল্পনা এ সকল ছাড়িয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপের উপরেই অতীতের সহিত ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আসন্ন সন্ধ্যা

আমার আসিছে সন্ধ্যা গোধূলির ছায়া
পড়িছে প্রান্তরে,
নিঃশব্দ ব্যাপিয়া যায়, কায়াহীন মায়া
জাগিছে অন্তরে।
রক্ত রবি অস্ত গেল, পাণ্ডু চন্দ্রালোক
তারো দেখা নাই,
মেঘের অঞ্চলাঘাতে নিবিল সহসা
তারকা সবাই!
বুকের স্পন্দন মন্দ, আলোকের লীলা
নয়নে লুটায়
সম্মোহন বাণাহত সব স্বপ্ন পাখী,
সঙ্গীত ঘুমায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* Bombay Gazetter Vol. 23, Bijapur Wheeler's History of India, Vol. 4 Part I.

রাজকুমার

(সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে)

১

যুবরাজপত্নী ইলা। দেখচ না, ও—পাগল!—ছেড়ে দাও!

পাগল। না-না-না আমি পাগল নই! —আমি যুবরাজ ··আমায় আমায় চেনো না? তোমার বুঝি ছেলে নেই? সে বুঝি বাঁশী বাজিয়ে আজো ফাঁসি যায় নি?

রাজকুমার। পাগল? দারুণ ধূর্ত্ত—এ!! পাগলের ছল করে আমায় তিরস্কার করতে এসেচে! রাজপ্রশ্রয়ে প্রজার স্পর্দ্ধা এত বেড়ে উঠেছে যে, সে আমার প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করে আমায় ভর্ৎসনা করতে সাহস করে! এ স্পর্দ্ধা রাখতে দেব না—দেব না! বাঁশী বাজানর দরুণ তোর ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছি, তোকে—কুকুর দিয়ে খাওয়াব!

পাগল। হাঃ-হাঃ! মড়কের কাছে চালাকি? কেমন এখন বিশ্বাস হোল—যে আমি রাজকুমার? যে সে নই—আমি রাজকুমার!—কাউকে রাখব না—ছেলে বুড়ো মানব না—একধার থেকে সাফ্ করে যাব! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ইলা। (স্বামীর প্রতি) তুমি এ দিন-দিন হচ্চ কি? কি অতৃপ্তি অশান্তি তোমার প্রাণে যে, অভিসম্পাতের মত দিনরাত দেশের বুকের উপর এমনি করে হাহাকার ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ! তুমি চাও—কি?

পাগল। হাঃ-হাঃ মড়ক আবার চায় কি? শোকের ঝড়—আর অশ্রুর বন্যা! দেশের মাটি—দেশের নদী—লালে লাল করে দেবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ইলা। ছেড়ে দাও পাগলকে—···! অনর্থক অত্যাচার করে রাজ্যের দীর্ঘনিশ্বাস কুড়িয়ো না..বড় জ্বালা তার!

পাগল। ছেলের শোকের চেয়ে?-ওঃ-।

ইলা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!—পুত্র-শোকাতুর পাগল—ও।

রাজকুমার। ইলা, যমের মুঠো বরং একদিন শিথিল হতে পারে—

পাগল। কিন্তু আমার হবে না—আমি যে মড়ক! হাঃ-হাঃ।

(পাগলকে লইয়া রাজকুমারের প্রস্থান)

ইলা। কি ভীষণ অত্যাচার—কি জঘন্য রক্ত পিপাসা! পিশাচে অসম্ভব যা মানুষে তা সম্ভব কেমন করে হয়?...মানুষ কি তবে পিশাচেরও অধম? অথবা মানুষের চামড়া ঢাকা পিশাচের বাড়া একটা নতুন সৃষ্টি—ও! সৃষ্টি? কার? ভগবানের? যিনি এ বিশ্ব সংসার এমন সুন্দর করে গড়েচেন—তাঁর? বিশ্বাস হয় না!—অসম্ভব! ভগবান! আমার স্বামীর এ জঘন্য রক্তপিপাসা নিবারণ কর!

২

রাজা। না, মন্ত্রি, আমাকে তোমরা নামিয়ে দাও—এ রাজতক্ত হ'তে।—আমি রাজা হবার উপযুক্ত নই।

মন্ত্রী। এমন সর্ব্বগুণাধার রাজা কোন শের প্রজার ভাগ্যে ঘটে মহারাজ!

রাজা। বল্‌ছ কি মন্ত্রী। যে রাজা হের পায় দাসখৎ লিখে দিয়ে ছেলেকে তার সন করতে পারে না, দুর্বৃত্ত ছেলের ত্যাচার থেকে প্রাণের অধিক প্রজাদের া করতে যার শক্তি নেই, সে আবার—জা? সর্ব্বগুণাধার রাজা? (ক্ষণকাল রব রহিয়া) ভাল, মন্ত্রি!—যাও সে তানকে জিজ্ঞাসা করে এস,—সে কি য়, আমি তাই দেব—সে যেন আর মার প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার ছড়িয়ে বেড়ায়।

সহসা ঝড়ের মত রাজকুমারের আবির্ভাব)

রাজকুমার। কি, চাই আমি? আমি ই—আমাদের নারী রাজার বিপুল স্নেহাঞ্চল না শোণিতের রঙে রাঙিয়ে তুল্‌তে!

রাজা পুত্রের মুখের দিকে বারেক চাহিয়া মুখ নত করিলেন)

রাজকুমার। মহারাজ! চেয়ে দেখুন, পনার ওই বিপুল স্নেহাঞ্চলের তলে কি ণ প্রশ্রয় দিন দিন বেড়ে উঠ্‌চে! এখনো য় আছে, স্নেহাঞ্চল গুটিয়ে নিন,—নয়তো ন রাঙিয়ে তুলব ও স্নেহাঞ্চল যে, দিনান্তের ও তার কাছে ফিকে হয়ে যাবে!

(সদর্পে রাজকুমারের প্রস্থান)

রাজা। (মৃত পত্নীর উদ্দেশে অর্দ্ধস্ফুট ধে) কল্যাণি, আজ তুমি বেঁচে থাকলে ত এমন স্নেহদুর্ব্বল হয়ে পড়তুম না—নিশ্চয় দুরন্ত উদ্ধত সন্তানকে, শাসনের স্বাদ কত র বোঝাতে পারতুম!—ওঃ—!

৩

রাজকুমার। মড়ক আমি! মড়ক—মন্দ বলেনি, বেশ কথাটি! ঠিক খাটে! ইলা আবার একটা নতুন কথা বলেছে—অভিসম্পাত! সেটাও নেহাৎ মন্দ নয়!—অভিসম্পাৎ আমি!—অতৃপ্তিতে অশান্তিতে ভরা! কিন্তু কিসের অতৃপ্তি আমার?—কি চাই,—পাই না? রাজসিংহাসন?—সেই করুণায় স্যাঁৎসেতে রাজসিংহাসন? যেখানে বসলে পুরুষের পৌরুষ নিভে যায়, পুরুষ একটি স্নেহময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়—সেই সিংহাসন? যার সংস্পর্শে দুর্বৃত্তকে দমন করবার শক্তি লোপ পায়, যেখানে বসলে কেবল চোখের জলের আর দয়ার চর্চ্চা করতে হয়—সেই রাজতক্ত! না, না, তা আমি চাই না! পুরুষ আমি—তেজে গড়া!—কোমলতা আমার ব্যবসা নয়! আমি আগ্নেয় গিরির মত সর্ব্বদা দেশের প্রাণে আশঙ্কা, উদ্বেগ, আতঙ্ক জাগিয়ে রাখব,—আর মাঝে মাঝে ভূকম্পের মত সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলে গৈরিকস্রাবের মতন সর্ব্বনাশ আর হাহাকার ঢেলে দেবো! সেই সর্ব্বনাশ হাহাকারের কণ্ঠে কণ্ঠে যে একটা বিরাট গান আকাশে প্রতিধ্বনি তুলে বেজে উঠ্‌বে তার কাছে কোন্ সঙ্গীতের মাধুর্য্য পাল্লা দেবে? মাধুর্য্য নেই তাতে?··ভীষণতায় ভরা? আমি নারী নই পুরুষ আমি—ভীষণতাই আমার মাধুর্য্য,—ঝঞ্ঝাই আমার শান্তি···বিপদই আমার আশীর্ব্বাদ! সেই ভীষণ শান্তি, সেই হাহাকারে ভরা আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বর্ষার মত অজস্র-ধারে এ রাজ্যের উপর যেদিন ঢেলে দিতে

পারব, সেইদিন···সেইদিন—সেইদিন, কি ? তৃপ্তি পাব ? না, না পুরুষ আমি—তৃপ্তি আমার জন্যে হয় নি, না,—তৃপ্তির স্বাদ আমি চাই না...অতৃপ্তিই আমার বাসনা অতৃপ্তিই আমার সাধনা !—এ অতৃপ্তি যেদিন আমার ঘুচবে - সেইদিন আমারো শেষ !

(সহসা ইলার প্রবেশ)

ইলা। উন্মত্তের মত—এ কি বক্‌চ ! একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ—দিন-দিন কি হচ্চ তুমি ! কল্পনার অতীত অত্যাচারকে কেন এ বাস্তব মর্ত্ত্যে ছেড়ে দিয়েচ...শৃঙ্খলিত কর তাকে ! মানুষ তুমি, মানুষকে হিংসা করো না ! - মনুষ্যত্বকে লজ্জা দিও না !

রাজকুমার। ইলা, ঝড় যখন উঠেচে, তখন সে বইবেই—কারুর কথা মান্‌বে না ! তবে যদি একান্ত থামাতে চাও, তবে ঝড়ের চেয়ে প্রবল হও !—অত্যাচারে অবিচারে নৃশংসতায় আমাকে ছাপিয়ে ওঠো,—আমি তলিয়ে যাই ! তারপর যা হয় কোরো ! কেন এমন কচ্চি ? মাতালে কেন মদ খায় ! কি সুখে ? শুধু নেশা ! আমারো তাই !

ইলা। প্রজার জীবন-মরণ নিয়ে খেলা ! কি ভীষণ !

রাজকুমার। কেন ? জীবন মরণের কোনটা দুর্লভ ? মরণ ? তার চেয়ে জগতে সুলভ কি ? জীবন ? প্রজার জীবন এত দামী যে রাজপুত্র তা নিয়ে খেলা করতে পারে না ?

ইলা। আর বোলো না—বোলো না ও কথা !—জগতের শান্তি শিউরে উঠ্‌বে !

রাজকুমার। বলেছি ত, শান্তি চাও যদি,—আমাকে ছাপিয়ে ওঠো !

ইলা। বলো, কি করতে হবে !— করবো ! শিখিয়ে দাও কেমন করে ছাপিয়ে উঠ্‌তে হয় !!

রাজকুমার। রাজার স্নেহান্ধ রক্তের কাজল পরাতে হবে—পাগলকে নিজের হাতে বধ করতে হবে !— পারবে ?

ইলা। উঃ !!

৪

রাজা। হা ঈশ্বর ! কি পাপ করলে হৃদয় নিয়ে মানুষ রাজা হয় ! প্রজার চোখে জল যে সিংহাসন ছাপিয়ে ওঠে ! এ অসাড় আমি যেন জমে গেছি ! নিজে ছেলেকে শাসন করবার ক্ষমতা নেই আমি কেন রাজা হলুম ?—কে আমার তক্তে বসালে ? প্রজারা কেন বিদ্রোহী না ? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) না— আমি দুর্ব্বল নই—আমি রাজা !—এ মঙ্গলের জন্য আমি সব বলি দিতে বাধ্য পুত্র-স্নেহকেও ! আমি আজই তার দণ্ডের আদেশ দেবো— কর্ত্তব্যের কাছে মান্‌ব না। (পুত্রের প্রাণদণ্ডের আ লিখিতে গিয়া) এ কি !—হাত যে নড়ে না অক্ষর জড়িয়ে যায় যে ! না...না চলবে না...থাম্‌তে পারব না !— হাহাকারে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে উপক্রম করেচে...তার প্রাণদণ্ড চাই, প্রাণদণ্ড চাই···দুনিয়ার দুষমণ হয়ে তার বেঁচে থাকা হতে পারে না ! দুষমণ সে দুনিয়ার ? না...না... আমার যে সে বুকের হাড় ! অই স্বর্গ থে আজো যে একজন অশ্রান্তধারে তাকে

দিচ্চে ! এ জল্লাদ পিতাকে নৃশংস দেশ লিখতে দেখে জীবনের পরপার কে হয়ত সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে...সেই আমারো এ তালি দেওয়া বুকটা কেটে খান হবে...কিন্তু কি করব ? তবু—তবু কাটা বুক চেপে ধরে এ রক্তের দাগ কে যেতে হবে !

[মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রি—মন্ত্রি রটিয়ে দাও রাজ্যময়—আজ দের রাজা পুত্রস্নেহকে বলি দিয়ে সেই ক্ত ছেলের প্রাণদণ্ডের আদেশ লিপি খে দিয়েছে !—পুত্রের রক্তে রাজ্যের হাকার নিভে যাক্—প্রজার কল্যাণ ফিরে আসুক !

মন্ত্রী। মহারাজ !

রাজা। মন্ত্রি ! চুপ কর ! অনেক ষ্ট ঘুম পাড়িয়েছি—হৃদয়ের সে সুপ্ততীরে দিয়ো না—বড় দুর্ব্বল আমি—হেরে যাব—জার কর্ত্তব্য করে উঠ্‌তে পারব না !

মন্ত্রী। মহারাজ ! সুসংবাদ আছে !

রাজা। কি, প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে ? ষ্ঠান বলিদান থেকে রক্ষে পেয়েছি ?—ড়ে ফেলি এ রক্তলোলুপ আদেশ পত্র ?

মন্ত্রী। ও ভীষণ আদেশের কোন য়োজন নাই মহারাজ ! যুবরাজ জানিয়েছেন প্রজার শাসনের ভার গ্রহণ কর্‌তে দি আপনি সম্মত হন তবে তিনি আর ানরূপ অশান্তি উৎপাদন করবেন না। ার—

রাজা। থাম্‌লে যে মন্ত্রি ?

মন্ত্রী। আর—

রাজা। বড় ভীষণ কথা কোনো ? জিব্ জড়িয়ে যাচ্চে ? কি করবে ? বল্‌তে হবে !

মন্ত্রী। আর সেই পাগলকে আপনার নিজের হাতে বধ—

রাজা। মন্ত্রি ! একি হল ! এ যে শুধু শান্তির মরীচিকা দেখালে—আসল জিনিস তো পেলুম না ! রক্তের স্রোত তো কই থামল না ? ছেলের রক্ত ভেবে শিউরে উঠেছিলুম—এ যে প্রজার রক্ত—অসহায় পাগল প্রজার—ছেলের চেয়ে কম দরদের নয় ! না, না পারব না—পুত্রস্নেহে অন্ধ হতে পারব না—!

৫

১ম প্রজা। কি করা যায় !

২য় প্রজা। কেন ?...চট্‌পট মরো !

১ম প্রজা। শুধু শুধু মরব ?

২য় প্রজা। সময় পাও--একটু তবলা বাজিয়ে নিয়ো !

১ম প্রজা। মরবো ?—কোন অপরাধ ?

৩য় প্রজা। যে অপরাধে পোকা মাকড় মরে !

১ম প্রজা। আমাদের কি কোন শক্তি নেই ?

২য় প্রজা। আজে বৈকি শক্তি—মরতে !

৩য় প্রজা। না,—তা নেই ! বুক ফুলিয়ে মরবার শক্তি থাক্‌লে মানুষ মরে না !

২য় প্রজা। আমরা না হয়, মরবার আগে না ফুলে, মরবার পরে ফুলি—এই যা !

৪র্থ প্রজা। চলো—দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ি !

৩য় প্রজা। রাজার কাছে কেঁদে ফল? শুধু পাল্টা কান্না শুন্‌তে?

৪র্থ প্রজা। তবে কি করতে বল?

৩য় প্রজা। মর্‌তে!

২য় প্রজা। সেটার জন্যে আর বিশেষ উপদেশ কেন? যুবরাজের একবার খেয়াল হলেই হোল!

৩য় প্রজা। না,—পরের খেয়ালে নয় —নিজের সাহসে মরতে হবে!

(জনৈক প্রজার প্রবেশ)

আগন্তুক। শুনেছ?—সর্ব্বনাশ! রাজাও আমাদের যুবরাজের সঙ্গে রক্তের খেলায় যোগ দিয়েছেন।

সকলে। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) এ্যা—এ্যাঁ ···কি?···কি?

৫ম প্রজা। রাজা ছেলের কথায় স্বহস্তে সেই সেই পুত্রশোকপাগল বেচারার মুণ্ডচ্ছেদ করেচেন!

সকলে। এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ!

৩য় প্রজা। ওকি?—শিউরে উঠছ কেন? ···রাজভক্তিতে তর্‌-র্‌ হয়ে থাকো!

১ম প্রজা। কি কর্‌তে বলো?—বিদ্রোহ?

৪র্থ প্রজা। ছিঃ—ছিঃ সে যে মহাপাপ!

[প্রস্থান]

৬

রাজকুমার। কি রকম হল—এ! আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল?—আমার? বজ্রে শিশির ঝরল? তবু আমার সামনে তার হত্যা হয়নি—শুধু রাজার হাতে রক্তঝরা খড়্গ আর পদতলে হতভাগ্যের ছিন্নশির দেহ··· এই দেখে এমন হলুম?···কেন? প্রজার রক্তে নদী বইয়েছি—কই একদিনো ত কেঁদে ওঠেনি? আজ একি হলো? ইন্ —বলেছিলুম··আমায় থামাতে চাও আমায় ছাপিয়ে ওঠো!—একি—তাই হো ঐ একটা হত্যায়? না, না, না—তা হত্যায় আমায় কেউ ছাপিয়ে ওঠে ঘটনার ঢেউ আমায় তলিয়ে দিয়েচে! কা উপর শত কালো দাগ ফোটে না—নি সাদার বুকে একটা ক্ষীণ কালো রে জ্ব: জ্বল করে উঠে!—নৃশংস আমি আমার হাতের হত্যায় ভীষণতা ফুটে ও ··কিন্তু রাজা করুণায় গড়া তাই তাঁর হ হত্যা দেখে আমারো পাষাণ প্রাণ কে উঠেছে! এ তো রাজা হত্যা করেন নি জগতের করুণা নিজের হাতে খড়্গ তু ···তাই তলিয়ে গেছি!

(জনৈক দুর্বৃত্ত অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। যুবরাজ!—একি! চারিদি ষড়যন্ত্র! আপনি এখনো নিশ্চিন্ত!

রাজকুমার। কেন? আর কি চা রাজাকে রঙের খেলায় নামিয়েছি!—আ কি বাকি?—সুধাকে বিষ করেছি···করু নৃশংস করে তুলেছি···আমার কাজ ফুরিয়েচে!

অনুচর। যুবরাজ! প্রতারিত হয়েছে আপনি! রাজপদতলে সেই রক্তাক্ত ছি মুণ্ড—পাগলের নয়!—সেটা একটা অপ শবদেহ! কৃত্রিমরক্তে রঞ্জিত করে আপনা শান্ত করা হয়েচে!

রাজকুমার। কি বল্লে!

অনুচর। অবিশ্বাস করচেন?

রাজকুমার। না···না অবিশ্বাস

না।—করুণা সত্যই নৃশংস হতে পারে না। (ক্ষণকাল চিন্তার পর) কিন্তু করুণা যদি নৃশংস হতে না পারে, মড়ক আমি,—আমি কেমন করে মধুর হবো? ভুল ধারণায় নিবে আসছিলুম—ভ্রম কেটে গেছে—ভাল হয়েছে·· এবার দ্বিগুণ জ্বলে উঠবো! চলো —এবার হত্যায় আকাশ রাঙিয়ে তুলবো!

৭

রাজা। মন্ত্রি! ধন্য তোমার বুদ্ধি। তুমি আমাকে ছেলের হত্যা থেকে রক্ষা করেছ —তুমি আমার প্রজাকে বাঁচিয়েছ। তোমার এ বুদ্ধি না এলে কি হতো—কি করতুম··· উঃ ভাবতে প্রাণ কেঁপে উঠে! কিন্তু মন্ত্রি, প্রাণ কেন তবু নিশ্চিন্ত হতে পারচে না?··

মন্ত্রী। মহারাজ! কোন আশঙ্কা নেই ···নিশ্চিন্ত হ'ন—যুবরাজ এখন শান্ত এবং বরং নিজের পূর্ব্ব আচরণে সন্তপ্ত!

রাজা। সন্তপ্ত! আঃ—তাই হোক্—তাই হোক্। প্রজার ব্যথা বুঝতে শিখুক! বুঝেছি, বাইরে সে কঠোর হলেও অন্তর তার কোমলতায় ভরা! দেখেচ তো সেদিন —আমার সেই নৃশংসতার অভিনয় দেখে কেমন শাদা হয়ে গেছল? আহা, হবে না —আমার ছেলে সে!

মন্ত্রী। কেবল দুর্বৃত্তদের উত্তেজনাই যুবরাজকে বিচলিত করে তুলেছিল!

রাজা। ঠিক বলেচ মন্ত্রি! কেবল পরের পরামর্শে সে আমার, অমন হয়ে উঠেছিল। ভগবান তাদেরও যেন সুমতি দেন।

(সহসা ত্রস্তভাবে দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ সর্ব্বনাশ! যুবরাজ জান্‌তে পেরেছেন—পাগল নিহত হয়নি! এবার দ্বিগুণ ভীষণ হয়ে পাগলের সন্ধানে ধাবিত হয়েচেন!

রাজা। মন্ত্রি! সব ব্যর্থ হল! ওঃ—

[রাজা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন]

৮

রাজকুমার। তোর স্বামী কোথায়—বল্‌!

পাগলের পত্নী। জানি না যুবরাজ স্বামী কোথায় ইহলোকে না পরলোকে?

দুর্ব্বৃত্ত অনুচরগণ। যুবরাজ! সব জানে এ নারী!

রাজকুমার। আমার জিঘাংসা থেকে তোর স্বামীকে লুকিয়ে রাখবি?—কতক্ষণ? জানিস্‌ তার জন্য কি ভয়ানক দাম দিতে হবে?···আচ্ছা, তোর স্বামী কোথায় বলাতে পারি কিনা দেখি!—জল্লাদ!—ওর সামনে ওর দুটো ছেলেকে বধ কর!

ছেলে। (ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা!—মা!

পাগলের পত্নী। বাবা আমার—বাবা আমার!·· কোথায় লুকোবো তোকে!

(মাতা আতঙ্কে ছেলেকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিল)

রাজকুমার। জল্লাদ!—মায়ের বুক থেকে টেনে আন ওকে!

পাগলের ছোট ছেলে। দাদা—দাদা! মরতে ভয় করিস? মার গায় জল্লাদে হাত দেবে তবু তুই মরতে ভয় করিস? যুবরাজ!

...জল্লাদ!...এই আমি—আমায় আগে বধ কর।

ভীত সন্তান। (মাতার বক্ষ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া) না—না ভাই মরতে আর ভয় করব না...এই এসেছি! কই যুবরাজ! কই জল্লাদ!...খুন কর আমাকে!

(মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

রাজকুমার। জল্লাদ!—এখন নয়!—মূর্চ্ছা ভঙ্গ হোক্ ওর মার,—তখন তার সামনে জোড়া ছেলে এক সঙ্গে বলি দেবো!

ছেলে। মা! তোর ও মূর্চ্ছা আর যেন না ভাঙ্গে—তুই মরে যা মা! (সহসা যুবরাজের সম্মুখে নত জানু হইয়া) যুবরাজ! আর যা করো—সব সইবে!—শুধু মার চোখের ওপর সন্তান হত্যা কোরো না! যুবরাজ তোমার কি মা নেই?

পাগলের পত্নী। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) কই! বাছারা আমার কই?.....এঁ্যা—এঁ্যা!

ছেলে। মা, কেঁপে উঠিস্ নে। তুই যে আমাদের মা, তা খানিক ক্ষণের জন্যে ভুলে যা—এমন কি ভুলে যা—যে তুই নারী!

ছোট ছেলে। কাঁদিস নে ও মা। বুকের জ্বালা নিবে যাবে—আর এ অত্যাচার পুড়ে ছাই হবে না!—কাঁদিস নে মা!

রাজকুমার! জল্লাদ!

[আদেশ মাত্র ঘাতকের খড়্গ ঊর্দ্ধে ঝলসিয়া উঠিল! এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে কে আসিয়া সেই খড়্গতলে পতিত হইল... খড়্গাঘাতে দেহত্রয় এক সঙ্গে ছিন্নশির হইয়া পড়িল!]

রাজকুমার। এঁ্যা!—একি!—পিতা! উঃ! প্রজা এমন ভালবাসার জিনিস? ওঃ!—আগে বুঝ্‌লুম্ না কেন!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা

নিদ্রা নাই, নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
হে প্রবাসি! তোমা লাগি, হায় অচেনার
বেদনা জনমে, পরিচিত গৃহদ্বারে
বাতায়ন আশঙ্কায় কাঁপে বারে বারে,
কেঁদে ওঠে সৌধছাদ, নিভৃত পিঞ্জরে
জাগে পিক,—ভগ্নতন্দ্রাবিজড়িত স্বরে;
ভুলিয়া কাকলি গাথা কি গাহে প্রলাপ!
নিঃশব্দে প্রাঙ্গণে ডরি' কার অভিশাপ
চঞ্চলা হরিণী; অন্ধকার করি দূর
খণ্ড কৃষ্ণপক্ষ চাঁদ, বিরহ বিধুর
আসে ক্ষীণ যক্ষের মতন; স্বপ্নেকার
ভগ্নতট পঞ্জরের মাঝে একবার
গঙ্গাহাসে ম্লানহাসি; প্রিয় সে কোথায়?
নিরুদ্দেশ বহুদূর—কোন্ অজানায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।



"কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।"
(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে)

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৬)

সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা

বাটীর মধ্যে কাহারও কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, যেরূপে তাহার শুশ্রূষা করিলে ঐ রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারিত হইতে পারে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এ বিষয়ের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা অনেক সময় নানাবিধ অসুবিধা, ক্লেশ, অর্থনাশ ও মনস্তাপ সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকি।

সকল দেশেই রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার প্রধানতঃ রমণীদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি স্বভাবতই ধীর, মধুর ও স্নেহ-প্রবণ; শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর শারীরিক ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে দেখা যায়। রোগীর যিনি সেবা করিবেন, তাঁহার এই সকল গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক এবং বোধ হয় সর্ব্বত্র রোগীর সেবার ভার রমণীদিগের হস্তে যে অর্পিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা এক প্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় না।

ইউরোপে শুশ্রূষা শিক্ষা করিবার সুব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। তথায় বহুসংখ্যক রমণী যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়া শুশ্রূষা-ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। ইঁহারা নার্স্ (Nurse) নামে পরিচিত এবং ইঁহারাই যাবতীয় সাধারণ চিকিৎসালয়ে (Hospital) এবং ভদ্রলোকের বাটীতে রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারা রোগীর সেবা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তখন সাধারণ চিকিৎসালয়সমূহেও পুরুষদিগের দ্বারাই সেবার কার্য্য সম্পন্ন হইত। এক্ষণে আমাদের দেশের বড় বড় সহরে, বিদেশীয় ও স্বদেশীয়, অনেক স্ত্রীলোক এই বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া নার্সের ব্যবসা করিতেছেন। কিন্তু অনেক সময়ে হিন্দু-পরিবারের মধ্যে ইঁহাদিগের দ্বারা রোগীর সেবা-কার্য্য সুবিধাজনক হয় না। নার্সের জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া অনেকস্থলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়; তাঁহাদের হস্তে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে অনেকেই (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা) সম্মত হন না। অপরন্তু ব্যয়-বাহুল্যবশতঃ অধিকাংশ গৃহস্থলোকেই রোগীর সেবার নিমিত্ত নার্স্ নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে নার্সের নিয়োগ-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া এখনও বহুসময়-সাপেক্ষ। যাঁহারা নার্স্ নিয়োগ করিতে সমর্থ,

তাঁহাদিগের বাটীতেও দেখা যায় যে নার্স্ নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ হৃদয়ের আবেগবশতঃ স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, নার্স্‌কে বড় কিছু করিতে দেন না। সুতরাং যখন এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে রোগীর শুশ্রূষার ভার অর্পিত থাকিবে, তখন এ বিষয়ের প্রকৃত শিক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তজ্জন্য এদেশীয় চিকিৎসকমাত্রেরই সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। রোগ আরোগ্য হওয়া সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা, এই উভয় ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে; একের অভাব হইলে রোগ-উপশমের সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিকিৎসক যদি সেবা-কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং তিনি শীঘ্র তাঁহার চিকিৎসার সুফলের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই জন্য বলিয়াছি যে যাহাতে শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারিত ভাবে আমাদিগের সমাজে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

অনেক সময়ে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাবশতঃ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই অনভিজ্ঞতা হেতু কত আশাপ্রদ জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে, কত পরিবারের সুখ শান্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সুতরাং সেবা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইলে যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ আমরা সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার সাধারণ ব্যবস্থাগুলির বিষয় আলোচনা করিব। পরে রোগ-বিশেষে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথার উল্লেখ করিব।

সাধারণ ব্যবস্থা।—যে কোন সংক্রামক রোগে রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির মেশামিশি যত কম হয়, ততই রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া থাকে। এ কারণ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি হইতে যতদূর সম্ভব, পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। এ বিষয়ে আমরা যথোচিত সাবধান হই না বলিয়া অনেক সময় আমাদিগকে গুরুতর বিপদ ভোগ করিতে হয়। রোগীর জন্য এরূপ একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহার মধ্যে পরিবারস্থ অপর কাহারও সর্ব্বদা যাইবার আবশ্যকতা হয় না। এই গৃহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশের সুবিধা থাকা উচিত। যথোচিত বায়ু ও আলোকের অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা; এরূপ গৃহে রোগী বাস করিলে, রোগ ও রোগের সংক্রামক-গুণ, উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর চিত্তও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল থাকে। যদি বাসগৃহ দ্বিতল বা ত্রিতল হয়, তাহা হইলে রোগীর গৃহ সর্ব্বোচ্চ তলে অবস্থিত হওয়া শ্রেয়স্কর। গৃহটী এক পার্শ্বে ও সাধারণের গমনাগমনের পথ হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত, কারণ ঐ গৃহের নিকট দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিলে

রোগীর বিশ্রামের যে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, শুধু তাহাই নহে, এতদ্বারা নানা কারণে ঐ রোগ সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা।

রোগীর মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা তাহার গৃহের সন্নিকটে কোন স্থানে হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। যে স্থান বাটীর অপর সকলে মলমূত্রত্যাগের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথায় রোগীর গমন করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। অধিকাংশ সংক্রামক রোগে মলমূত্রের সহিত রোগোৎপাদক বীজাণু দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা পরিজনবর্গের মধ্যে রোগের পরিব্যাপ্তি সহজেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব সংক্রামক-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্থানে হওয়া আবশ্যক। ঐস্থানে স্বতন্ত্র পাত্র রাখিয়া মলমূত্র ত্যাগের পর উহার সহিত কোন বিশোধক ঔষধ (Disinfectant) মিশ্রিত করিয়া উহাকে বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষভাবে নিবারণ করা যাইতে পারে।

যে গৃহ রোগীর অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে গৃহসজ্জা যত কম থাকে, ততই রোগীর পক্ষে শুভজনক। রোগীর গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুস্থান (Air-space) থাকা কর্ত্তব্য। গৃহসজ্জার পরিমাণ যত অধিক হইবে, গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে, সুতরাং ইহা দ্বারা রোগ উপশমের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদের আহার, বিশ্রাম ও শয়নের জন্য রোগীর গৃহের পার্শ্বে আর একটী ঘর থাকা আবশ্যক। অভাবপক্ষে রোগীর গৃহে রোগীর বিছানা ব্যতীত, যিনি তাঁহার সেবা করিবেন তাঁহার শয়নের জন্য, একটী স্বতন্ত্র বিছানার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রাত্রিকালে রোগীর সহিত তাঁহার এক বিছানায় শয়ন করা নিতান্ত দোষাবহ। মশার উপদ্রবের জন্য রাত্রিকালে মশারি খাটাইবার আবশ্যক হয়; রোগীর সহিত এক মশারির মধ্যে শয়ন করিলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অনেকস্থলে স্বামী হইতে স্ত্রীর অথবা স্ত্রী হইতে স্বামীর দেহে ক্ষয়কাশ এইরূপে বিস্তার লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এই দুইটী বিছানা ব্যতীত ঔষধ ও পথ্যাদি রাখিবার জন্য একখানি চৌকি বা একটী টেবিল্, একটী ফুলদানি একখানি চেয়ার্ বা টুল্, রোগীর বস্ত্র, তোয়ালিয়া, গামছা প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটী আল্না, একটী পিক্‌দানি, একটী জলের কুঁজা ও গেলাস এবং একটী ঘড়ী উক্ত গৃহে রাখিবার আবশ্যক হয়। গৃহ বিস্তৃত হইলে তন্মধ্যে একখানি আরাম-চৌকি রাখা যাইতে পারে; যিনি রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, প্রয়োজন মত তিনি উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ রোগীর গৃহে অপর কোনরূপ গৃহসজ্জার আবশ্যক হয় না। সুতরাং অনাবশ্যক গৃহসজ্জা যত শীঘ্র স্থানান্তরিত করা যায়, ততই রোগীর সত্বর আরোগ্য লাভের সুবিধা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে আলমারি, সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বোঝাকরা ময়লা কাপড় ও বিছানার দ্বারা

রোগীর গৃহ পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সংক্রামক রোগের বীজাণু, বস্ত্র বা শয্যাদির সহিত একবার সংলগ্ন হইলে, উহাকে সহজে দূরীকৃত করিতে পারা যায় না এবং উহা এইরূপে বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটন করে। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি, যত দূর সম্ভব, রোগীর গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। যদিও অনেকস্থলে আমাদিগের অর্থাভাব এবং বাসগৃহে যথোচিত স্থানের অসদ্ভাব হেতু এইরূপ অব্যবস্থা ঘটিতে দেখা যায়, তথাপি ইহার সমূহ অনিষ্টকারিতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলে সকলেই যথাসাধ্য এবিষয়ে সাবধান হইতে চেষ্টা করিবেন।

যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রোগীর গৃহের বাহিরে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র আল্‌না রাখা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র পরিয়া রোগীর শুশ্রূষা করা যায়, তাহা লইয়া বাটীর অন্য কোন স্থানে গমন করা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু এই নিয়মের পালন সম্বন্ধে আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগীর সেবা করিতে করিতে অন্য কোন গৃহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাওয়া তাঁহাদের সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। রন্ধন বা ভাণ্ডার গৃহে যোগাড় দিবার জন্য, পরিজনদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য, অথবা রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশোধক ঔষধ ও সাবান দ্বারা হস্ত পদ ধৌত করিয়া এবং বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে অনেক বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তাহার পালন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। এই অনবধানতা বশতঃ পরিবারস্থ একের অধিক লোকের কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর, হাম, রক্তআমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। অবশ্য রোগ সংক্রামক না হইলে ইহা তত দোষের হয় না বটে, কিন্তু অনেক স্থলে রোগ সংক্রামক কিনা, তাহা প্রথম অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই সুকঠিন; এমন কি, চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে অনেক সময়ে নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে সমর্থ হন না। সুতরাং রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর অন্যত্র না যাওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। ইহাতে অসুবিধা কিছু মাত্র নাই অথচ ইহা পালন করিলে অনেক ভবিষ্যৎ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়. আমাদিগের পরিবারস্থ রমণীরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রোগীর সেবা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদিগের নমস্যা। তাঁহাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শুশ্রূষা সম্বন্ধে এই সহজ নিয়মগুলি পালন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য একেবারে নির্দ্দোষ করিতে যত্নবতী হয়েন।

রোগীর গৃহের বাহিরে তাহার মলমূত্র ত্যাগ করিবার পাত্র, জল, সাবান, বিশোধক ঔষধাদি সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখা উচিত। এই সকল দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষিত হইলে দরকারের সময় উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি

করিবার আবশ্যক হয় না, সুতরাং রোগী বা যিনি তাহার সেবা করেন, কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

যাহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে, যাহাদের বাটীতে দুই একটির অধিক ঘর নাই অথচ পরিজনবর্গের সংখ্যা অধিক, যাহাদের বাসগৃহ ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের অবস্থা স্বাস্থ্যকর নহে এবং যাহাদের লোকবল কম, এরূপ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে রোগীকে সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। আমাদের দেশের লোকের, সাধারণ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপর, বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। তদুপরি জাতিনাশ, শবব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিধ অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সাধারণ চিকিৎসালয়ে গমন করিতে আপত্তি করিয়া থাকে। আজ কাল সাধারণ চিকিৎসালয় সমূহে সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ সুব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, সাধারণ লোকের বাটীতে তাহা ঘটিয়া উঠা একেবারেই সম্ভবপর নহে। যে একবার হস্‌পিটালে থাকিয়া আসিয়াছে, তাহার মুখে তথাকার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা কখনই শুনা যায় না। যাহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানে না বা কিছু দেখে নাই, তাহাদেরই মুখে হস্‌পিটালের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের গরীব দেশে যত অধিক লোক হস্‌পিটালে যাইয়া চিকিৎসা করাইবে, ততই সঞ্চয় ও আরোগ্য উভয় বিষয়েই তাহারা সুফল লাভ করিবে এবং সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তিও বিশেষ কমিয়া যাইবে। বোম্বাই সহরে যখন প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব, তখন তথাকার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয় সমূহই প্লেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ স্থান। ইহা সাধারণ চিকিৎসালয়-গুলির পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং যাঁহাদের হস্‌পিটালের কার্য্য ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাধারণ লোকের মনে হস্‌পিটাল্ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আছে, তাহা যদি অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের একটী প্রকৃত উপকার সাধন করা হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, পরিবারস্থ অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের মেশামিশি না হইলেই ভাল হয়। একারণ যাঁহাদের শিশু সন্তান পালন করিতে হয়, তাঁহাদের উপর রোগীর সেবার ভার ন্যস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

দুই তিনজন লোকের উপর "পালা" করিয়া রোগীর সেবার ভার অর্পণ করা উচিত। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্নেহাধিক্যবশতঃ ৩।৪ জন লোক একত্রে রোগীর কাছে দিবারাত্রি বসিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই শরীর শীঘ্র অপটু হইয়া পড়ে এবং এরূপ ব্যবস্থায় আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে পূর্ণমাত্রায় সেবার কার্য্য প্রাপ্ত হই না। "পালা" করিয়া কার্য্য করিলে অল্প পরিশ্রমেই কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহে যাঁহারা সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রবেশ

করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এই ব্যবস্থা যদি দৃঢ়ভাবে পালন করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময়ে যাহার সংক্রামক রোগ হইয়াছে, রোগ তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যায়, পরিবারের মধ্যে বা পল্লীর মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করিবার অবকাশ পায় না। আমরা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। রোগ যতই সঙ্কট হয়, রোগীর গৃহ ততই একটী "হাটে" পরিণত হইতে থাকে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই, প্রয়োজন সত্ত্বে বা প্রয়োজনের অভাবে, তথায় সমাগত হইয়া গৃহের বায়ু দূষিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কলরবে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এবং তাহার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনেরও (যাহা তাহার পক্ষে ঔষধ অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়) সবিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। একেত আমরা রোগীর ঘরের তাবৎ বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া থাকি, তাহার উপর গৃহের মধ্যে জনতা হইলে উক্ত গৃহের বায়ুর কিরূপ দুরবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি যে বাহির হইতে রোগীর সংবাদ লইলে প্রকৃত আত্মীয়তা প্রদর্শন করা হয় না, রোগীর গৃহে যাইয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে পর, তবে আপনার লোকের কায করা হয়। রোগী অনেক সময়ে এই ভালবাসার উপদ্রবে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; পরিবারবর্গ অবশেষে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের ভালবাসা এতই বেগবান্ যে অনেকস্থলে চিকিৎসকের অনুজ্ঞায়ও কোন সুফল দর্শিতে দেখা যায় না। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমাদিগের অবিবেচনার কথা মনে করিয়া বড়ই লজ্জিত হইতে হয়। আমি আশা করি যে উপরোক্ত কয়েক ছত্র যাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাঁহারা যেন এরূপ আচরণের অবৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন। বিশেষতঃ এ কথা যেন সকলে মনে রাখেন যে অধিকাংশ স্থলে রোগীর গৃহে লোক-সমাগমহেতু সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীচুনীলাল বসু।

প্রাণের কথা

এ প্রাণ আমার পাঠিয়ে দেব
তোমার দিকে,
তোমার কথা প্রাণের পাতে
আনব লিখে,
পড়ব খুলি যখন আমার
ইচ্ছা হবে,
আমার প্রাণে তোমার কথা
নিত্য র'বে।

যখন তোমায় পাব না হায়
জ্ঞানে ধরি,
মনের মাঝে পাব না কো
মনন্ করি,
তখন তুমি থাকবে আমার
প্রাণে আঁকা,
অচেতনে র'ব আমি
চেতন মাখা।

শ্রীহেমলতা দেবী।



(শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত চিত্র হইতে)
মা যশোদা

নিরুদ্দেশ

প্রান্তর হতে একে একে গাভীগুলি
পৃষ্ঠে বুলায়ে পুচ্ছ, উড়ায়ে ধূলি,
মন্থর পদে গোয়ালে আইয়া ফিরে',
লেহিছে আলসে কান্ত বৎসটিরে।

তপন তপন পশ্চিমে গেছে ডুবে'।
পাণ্ডু চন্দ্র ফুটতে চাহিছে পূবে।
ভরিয়া গিয়াছে রঙীন রশ্মি লেগে'
অম্বরতল উজল খণ্ড মেঘে।

সন্ধ্যা-আঁধারে কুহেলির কালি মাখা
মন্দ পবনে কাঁপিছে পাদপ শাখা ;—
নিবিড় তিমির সাপটি' বিরাট ডানা
যেন বারবার আলোরে দিতেছে হানা!

বেদনা-বিবশ, স্তব্ধ, মৌন সাঁঝে
একা পড়ে' আছি শূন্য কক্ষ মাঝে,
সমুচ্ছ্বসিত শ্রান্তি ও অবসাদে
গুণ্ঠিত হ'য়ে গুমরি' এ হিয়া কাঁদে!

মুক্ত করিয়া ধীরে বাতায়ন খানি,
তাপিত এ ভাল থুইনু তথায় আনি'।
গগনে চাহিয়া দেখিনু—বর্ণরাশি
আঁধার-দৈত্য ফেলিতেছে ধীরে গ্রাসি'।

* * *

হেন কালে তুই -- কেরে তুই ছোট পাখী
ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে যাস্ ডাকি' ডাকি' ?

একা, একা, একা, এ ঘোর আঁধারে ঠেলি
কোথা যাস্ ওরে, ক্ষুদ্র পক্ষ মেলি'!

ওরে পাখি, ওরে অসহায় ছোট পাখি,
কুলায় যে তোর কোথায় জানিস্ না কি ?
এ ঘন আঁধারে ও দু'টি পক্ষ দিয়ে
আলোড়ি' এমন, কোথায় পড়িবি গিয়ে।
ওরে, তুই আর এখন যাবিরে কোথা ?
(মরি, ওই বুকে এ কি তোর আকুলতা!)
মূর্চ্ছিত হ'য়ে মহা ক্লান্তির ভরে
উলটি পড়িবি যখন পাথার 'পরে,
কে তোরে তখন বাঁচাবে বক্ষে তুলি?
—থাম্, থাম্! আহা যাস্‌নেরে পথ ভুলি'!

ছুটে যায় তবু। কহিনু তাহারে হাঁকি'—
কোথা যাবি আর অসীমের পোষা পাখি!
আঁধার মথিয়া কোথায় যাস্‌রে চলি' ?
—থাম্, থাম্, ওরে, শোন দুটো কথা বলি।

চলে' গেল ; মরি—মিলাল তিমির তলে!
ধাইনু তাহার উদ্দেশে আঁখি-জলে।
আঁধারে বারেক শুনিনু মাঠের পরে
দূরে – অতি দূরে ক্ষীণতর সেই স্বরে!

* * *

আঁধারের ভাষা উঠিল তখনি ফুটে',—
জলদ-মন্দ্রে জলধি গর্জ্জি উঠে!
বুঝিলাম ;—হায়, এ জীবনো অসহায়
এমনি তো ধীরে তিমিরে মিলায়ে যায়!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

দৈত্যের স্বর্গ

(Oscar Wilde লিখিত গল্প অবলম্বনে)

প্রতিদিন পাঠশালার ছুটির পর ছেলে মেয়েরা দৈত্যের প্রমোদ কাননে খেলিতে আসে।

দৈত্যের ভারি সখ, স্বর্গে যেমন নন্দন কানন, তেমনি মর্ত্ত্যে একটি নন্দন কানন সে তৈরি করিয়া তুলিবে ;—সেই জন্য যেখানে যে ভালো জিনিসটি দেখিত, জোগাড় করিয়া আনিয়া, তাহার বাগানে সাজাইয়া রাখিত।

কাননটি যেমন প্রকাণ্ড—শেষ দেখা যায় না, তেমনি চমৎকার—যেন ছবিখানি! সমস্ত বাগানখানির বুক জুড়িয়া নবীন তৃণপুঞ্জের কোমল শ্যামলতায় চোখ জুড়াইয়া যায় ; মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফুলগুলি যেন তারা ছড়াইয়া গিয়াছে। এই বাগানে প্রবেশ করিয়া ছেলেমেয়েরা মোহিত হইয়া যায়। স্তরে স্তরে সাজানো কত যে ফুল! তাহাদের বর্ণে, গন্ধে, বিচিত্রতায় শিশুদের চক্ষু উল্লসিত হইয়া উঠে, মন মাতোয়ারা হইয়া যায়। আবার যখন পাখীর কাকলী চারিদিকে সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিত, তখন কোথায় পড়িয়া থাকিত তাহাদের খেলাধূলা! তাহারা সব ভুলিয়া তন্ময় হইয়া সেই গান শুনিত। এমন আনন্দের মেলা শিশুরা আর কোথাও পাইত না।

হঠাৎ একদিন দৈত্য ফিরিয়া আসিল। সে গিয়াছিল তাহার এক বন্ধুর কাছে কি-একটা কথা বলিতে। কথা বেশী ছিল না ; —সাত বৎসরের মধ্যেই তাহার বলিবার কথাটুকু ফুরাইয়া গেল। কাজেই সে চট করিয়া কাজ সারিয়া নিজের আস্তানায় ফিরিয়া আসিল।

আসিয়া দেখে এই ব্যাপার! তাহার বাগান জুড়িয়া ছেলেমেয়েরা হট্টগোল জুড়িয়াছে, —জিনিস পত্র সব তচনচ করিয়া ফেলিতেছে! এমন করিয়া উৎপাত করিলে তাহার নন্দন কানন কেমন করিয়া তৈরি হইবে! সে চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল ; চোখ দুটা পাকাইয়া এক একটা করিয়া ছেলের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বাগান হইতে বাহির করিয়া দিল। বলিল—"দূর হ! খবরদার আর আসিসনে!" তারপর, আর কেহ আসিয়া যাহাতে বাগান নষ্ট করিতে না পারে তাহার জন্য সমস্ত বাগান বেড়িয়া আকাশ প্রমাণ এক প্রকাণ্ড পাঁচিল গাঁথিয়া দিল, এবং পাঁচিলের গায়ে একখানা কাঠ মারিয়া তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিল—

প্রবেশ নিষেধ।

ছেলেদের খেলা ঘুচিয়া গেল। কোথায় আর তাহারা খেলে? পথের ধূলা-কাঁকরের উপরে বসিয়া তো আর খেলা যায় না! কাজেই তাহারা দৈত্যের প্রমোদ কাননের বাহিরে বাহিরে ম্লান মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়,—বাগানের সেই খেলার কথা মনে পড়িয়া তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাস উঠে।

দেখিতে দেখিতে শীত গিয়া দেশের চারিদিকে বসন্ত আসিবার সাড়া পড়িয়া গেল ; —তাহার রথের ধ্বজা শীতের কুয়াশা ভেদ করিয়া দেখা দিল ;—ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, আকাশের নীলিমায় বসন্তের আবির্ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেশের সর্ব্বত্র বসন্তের হিল্লোল লাগিল—লাগিল না শুধু প্রাচীর-ঘেরা এই স্বার্থপর দৈত্যের প্রমোদ কাননে। সেখানে জাগিয়া রহিল তখনও জমাট শীত। ছেলেদের সাড়া না পাইয়া ফুল ভাবিল বুঝি তাহার এখনো ফুটিয়া উঠিবার সময় হয় নাই ; পাখী বলিল—গান গাহি আর কাহার জন্য? সবাই চুপ করিয়া ঘুমাইয়া রহিল। কোনোদিন কোনো-এক পুষ্পশিশু বাহিরে কি হইতেছে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া যদি বা ঘাসের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া একবার উঁকি মারিয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল কেহ কোথাও নাই, কাহারও আসিবার সাধ্যও নাই, সম্মুখে আকাশ-প্রমাণ প্রাচীর, তাহার গায়ে বড় বড় করিয়া লেখা "প্রবেশ নিষেধ!" তখন সে মুখখানি মলিন করিয়া ঘাসের মধ্যে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ফুল আর ফুটিল না, পাখীও আর ডাকিল না ; বসন্তের বাতাসও তবে বহিল না।

দৈত্য দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিতে লাগিল—এবার ব্যাপার কি! শীত যে যাইতে চাহে না, ক্রমেই বরফের স্তূপ আটি চাপিয়া বসিতেছে, উত্তরে বাতাসের তীক্ষ্ণতা ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার উপর শিলাবৃষ্টিও দেখা দিয়াছে—প্রাণ যায়।

দৈত্য প্রতিদিন সকালে লেপের ভিতর হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিত, বসন্ত আসিয়াছে কি, না, উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, বসন্তের কোনো সাড়া পাওয়া যায় কি না। কিন্তু হায়, কোথায় বসন্ত! শীতের বাতাস কেবলই হুঙ্কার দিয়া ফিরিতেছে—সমস্ত বিশ্বের প্রাণ যেন তাহারই তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে! এই সব দেখিয়া জড়সড় হইয়া সে লেপের ভিতর আবার মুখ লুকাইয়া ফেলিত।

এমনি করিয়া, দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, কিন্তু হায়, বসন্ত আসিল কৈ! দৈত্য ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতির শ্যামলতা নাই, ফুলের সৌরভ নাই, পাখীর গান নাই ;—দৈত্যের কানন যেন শ্মশান! এত যত্ন করিয়া সে যে নন্দন কানন সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল তাহা আজ কাহার অভিশাপে এমন শ্মশান হইয়া যাইতেছে! কোথায় আমোদ, কোথায় প্রমোদ, কোথায় আনন্দ! চতুর্দ্দিকেই কেবল বিভীষিকা। বরফের স্তূপ জমিয়া জমিয়া দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর দৈত্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে ; বাতাসের হুঙ্কারে বুক কাঁপিয়া উঠে। দৈত্য আকুল হইয়া প্রার্থনা করিল—"হে ভগবান! দূর কর এ বিভীষিকা। দাও বসন্তের হিল্লোল, জীবনের কল্লোল, নন্দন-কাননের শোভা! নইলে যে আর বাঁচি না!"

সেই দিনই ভোরবেলা দৈত্য শুনিল, যুগযুগান্তের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া কোথা হইতে একটি চমৎকার সুরের লহরী ভাসিয়া আসিতেছে। দৈত্য এক-মনে শুনিতে লাগিল ;

—তাহার সমস্ত শরীরের উপর পুলকের রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিল;—এত কালের সঞ্চিত অবসাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেই বুঝিতে পারিল, তাহারই রুদ্ধ জানালার বাহিরে বসিয়া পাখী গান ধরিয়াছে। সে যেন গাহিতেছে—"ওগো জাগো, জাগো! রুদ্ধ দুয়ার আজ খুলে দাও—অতিথি তোমার দুয়ারে!"

দৈত্য তখনই ঘরের দরজা, জানালা সব খুলিয়া দিল;—অমনি বসন্তের বাতাস পুষ্প-সৌরভের বরণ-ডালা লইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল! দৈত্য দেখিল, ভোর না হইতেই তাহার বাগানে আজ আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে,—কে যেন রূপের হাট খুলিয়া বসিয়াছে! গন্ধে, বর্ণে, গানে মাতামাতি চলিতেছে! কে এমন করিল রে! কোথা হইতে এ আনন্দের বন্যা আজ দেখা দিল রে! দৈত্য জানালায় দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ দেখিল, তাহার বাগানের সেই প্রকাণ্ড পাঁচিলের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া পিল্ পিল্ করিয়া দলে দলে চঞ্চল শিশুরা নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছে;—তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিদ্রটুকুর মধ্য দিয়া বসন্তের বাতাস আসিয়া বাগানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। —যেখানে শিশুরা যাইতেছে সেই খানেই ফুল ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। ছেলেরা বসিয়া গিয়াছে গাছের ডালে ডালে;—তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে থয়ে বিথরে; তাহাদের সাড়া পাইয়া পাখীরা গাহিয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দে! শিশুদের চরণ স্পর্শে তৃণ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের নিশ্বাসে পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের কলস্বরে পাখী গাহিয়া উঠিতেছে—এ যেন মায়ার খেলা!

দৈত্য অবাক হইয়া দেখিত লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। জানালার ধারে বসিয়া পাখীটা তখনও চীৎকার করিয়া গাহিতেছিল—"ওগো অতিথি তোমার দুয়ারে!—দেখ, অতিথি তোমার দুয়ারে!"

এমনি করিয়া পাখীর ডাক বার বার তাহার কঠিন হৃদয় দুয়ারে আঘাত দিতে লাগিল। দৈত্য খানিকক্ষণ চুপ করিয়াছিল, কিন্তু তার পর আর ঘরে থাকিতে পারিল না। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমনি মুক্ত আকাশের তল হইতে বসন্তের হিল্লোল আসিয়া তাহাকে একেবারে বন্দী করিয়া ফেলিল। তখন আর কোনো দিকে তাহার দৃকপাত রহিল না;—ছেলেরা কে কোথায় ফুল ছিঁড়িতেছে, গাছ ভাঙিতেছে, বাগান নষ্ট করিতেছে সে দিকে তাহার মনই গেল না;—সে কেবল অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার কানন যে আজ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! এত দিন ধরিয়া, এত জিনিস দিয়া সাজাইয়া সে যাহার সৌন্দর্য্যকে শেষ করিয়া তুলিতে পারে নাই—আজ এক নিমেষে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে;—বাগানের যেন আর কিছু অভাব নাই—আর কিছু বাকি নাই। দৈত্য অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, ইহা কেমন করিয়া হইল—কোন্ মায়াবীর মায়াবলে এ অসাধ্য সাধন হইয়া গেল!

দৈত্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হঠাৎ দূর হইতে দেখিল, একটি ছোট্ট ছেলে গাছের একটি শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; শাখা তাহার বুকের কাছ অবধি নুইয়া আসিয়া বলিতেছে—"ওঠ! ওঠ!" কিন্তু তবুও সে উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া কাঁদিতেছে। সে বলিতেছে—"আমি যে বড্ড ছোটো—তুমি আর একটু নীচু হও, নইলে যে পারচি না উঠতে!" কিন্তু শাখা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আর নত হইতে পারিতেছে না। শিশু আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। সবাই গাছের ডালে গিয়া বসিয়াছে, কেবল সে-ই মাটিতে দাঁড়াইয়া। এ দুঃখ সে রাখে কোথায়। চোখ দিয়া তাহার দরদরধারে অশ্রু বহিতেছিল! এমন সুন্দর মুখখানি, আহা, অশ্রুতে মলিন! দৈত্যের মনটা কেমন করিতে লাগিল, সে তাহারই দিকে ছুটিয়া গেল।

দৈত্যকে দেখিয়া ভয়ে আর-সব ছেলে-মেয়েরা সেই গর্ত্তটির ভিতর দিয়া পালাইয়া গেল, কেবল এই ছেলেটি চোখের জলে দৈত্যকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া পালাইল না। দৈত্য তাহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া গাছের ডালে বসাইয়া দিল,—ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা হইয়া দৈত্যের গলা জড়াইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। অমনি দৈত্য যেন কেমনতর হইয়া গেল;—তাহার মূর্ত্তির সে ভীষণতা দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে যেন ঝরিয়া পড়িয়া গেল। যে ছেলেরা ভয়ে পালাইয়াছিল তাহারা অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল;—কেহ তাহার কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ তাহার হাত ধরিয়া টানে, কেহ তাহার কাঁধে উঠিয়া পড়ে, কেহ তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এমনি করিয়া শিশুরা তাহাদের উচ্ছ্বসিত স্নেহের চিহ্ন আষ্টে পৃষ্ঠে দাগিয়া দিয়া দৈত্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া দিল।

চারিদিকে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল; ক্রমেই সে স্রোত ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়া কাননের সেই পাষাণ প্রাচীরের গায়ে সজোরে আঘাত দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অত বড় প্রাচীর মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গেল;—তখন বাহিরে ও ভিতরের সে কোলাকুলি গলাগলি দেখে কে!

সেইদিন হইতে ছেলেমেয়েদের দৈত্যের প্রমোদ কাননে খেলিতে আসিবার আর কোনো বাধা রহিল না।

তাহারা প্রতিদিন যখন-খুসী আসিয়া এইখানে জমায়েৎ হইত;—দৈত্যও তাহাদের সহিত খেলায় যোগ দিত।

ছেলের দল যখন এই প্রমোদ কাননে পুষ্পকুঞ্জের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত তখন দৈত্যের মনে হইত যেন একটা প্রকাণ্ড ফুলের সমুদ্র দুলিয়া উঠিয়াছে! সে আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া, বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া, চাহিয়া থাকিত।

সবাই আসে, কিন্তু সে আসে না কেন? দৈত্য যে ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে করিয়া গাছে চড়াইয়া দিয়াছিল তাহাকে তো আর দেখা যায় না! দৈত্য প্রতিদিন ব্যাকুলভাবে তাহার কথা সকল ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিত কিন্তু কেহ তাহার কোনো খবর দিতে পারিত না। সকলেই বলিত—"কৈ তাহাকে তো চিনি না!"

তাহার জন্য দৈত্যের এত আনন্দের মধ্যেও যেন একটা বিষাদ জাগিয়া ছিল। সব ছেলেকেই তাহার লাগিত ভালো—কিন্তু বিশেষ করিয়া এই ছেলেটির সেইদিনকার সেই কোমল বাহুস্পর্শ, সেই আলিঙ্গন, সেই চুম্বন সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না;—এত দিন ধরিয়া এত ছেলের এত আদর, এত চুম্বন সে উপভোগ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তেমনটি কৈ! সে তৃপ্তি কোথায়!—তাই তাহার প্রাণ কেবলই হায় হায় করিয়া বলিত—হায়, সে আসে না কেন? সে আসিবে কবে?

বহু বৎসর কাটিয়া গেছে—দৈত্য বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সে আর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে পারে না, কাজেই চুপটি করিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া থাকে;—ছেলেমেয়েরা তাহার চারি পাশে খেলিয়া বেড়ায়, সে দেখে। তাহাতেই তাহার আনন্দ।

এমনি করিয়া দৈত্যের দিন যাইতে লাগিল। দিন তো যায়—জীবন তো ফুরায়! তাহার চিরজীবনের সাধনার ধন সেই ছেলেটির দেখা এই অন্তিম সময়েও কি মিলিবে না? হে প্রভু, তাহাকে কি একবার ক্ষণেকের জন্যও আনিয়া দিবে না।—দৈত্য একান্ত মনে এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

সে দিন শীত জমাট হইয়া পড়িয়াছে। দৈত্যের মনে হইতেছিল, তাহার দেহ যেন জমিয়া আসিতেছে, নিশ্বাস যেন আর বহিতে চাহে না—প্রাণ যেন ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। দৈত্য জানালার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ দেখিল বাগানের একটি কোণ কুয়াসার জাল ছিঁড়িয়া এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার শীতার্ত্ত গাছটি আর অবসন্ন হইয়া নাই;—তাহার পুলকিত দেহ ফুলে ফুলে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে! তাহারই তলে দাঁড়াইয়া—ফুলের মধ্যে লুকাইয়া সেই ছোট্ট ছেলেটি!

দৈত্য অবাক!

তাহার এতদিনের সাধনার ধন কি আজ সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে!

ছুটিয়া গিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য তাহার প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু দেহ যে আর ছুটিতে পারে না! সে তাহার ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু হায়, তাহার জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তটিতে সে সাড়া দিল কৈ! চিরজীবন সে যে জাগিয়াছিল সে তো বৃথায়—এখনই তো তার জাগিবার সময়! এই তো তার স্ফূর্ত্তির সময়—দৈত্য হতাশ হইয়া এই কথাই ভাবিতেছিল।

কিন্তু আর হতাশ হইয়া পড়িয়া থাকিলে তো চলিবে না—এমন সুযোগ ইহ-জীবনে কি আর আসিবে!—দৈত্য কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু এ কী! কোন্ নিষ্ঠুর এই কোমল অঙ্গ এমন করিয়া কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে! দৈত্য রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"বল, কে তোমায় এমন করে বেঁধেছে!—আমি তার সমুচিত শাস্তি দেব!"



দৈত্যের স্বর্গ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ছেলেটি হাসিয়া বলিল—"এ তো তুমিই বেঁধেছ আমায়!"

দৈত্য অবাক হইয়া ছেলেটির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে হইতেছিল, এ কোন্ দেবতা আজ তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে! সে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা আতঙ্ক অনুভব করিতে লাগিল—তাহারই তাড়নায় নতজানু হইয়া সে বলিয়া উঠিল—"ওগো, বল তুমি কে! কোন্ দেবতা!"

ছেলেটি সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে দৈত্যের হাত দুখানি ধরিয়া শুধু বলিল—"ভাই, একদিন তোমার এই প্রমোদ কাননে আমায় খেলতে দিয়ে ছিলে, আজ চল আমার কাননে তুমি খেলবে।"

দৈত্য বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোমার কানন! সে কোথায়!"

ছেলেটি বলিল—"নন্দন বন।"

নন্দন বন! তাহার আরাধনার সামগ্রী, স্বপ্নের ধন, সেই নন্দন কানন! দৈত্য আনন্দে অবশ হইয়া পড়িয়া গেল।

* * * *

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ছেলের দল খেলিতে আসিয়া দেখিল, প্রমোদ কাননের ভিতর, গাছের তলায়, ঝরা ফুলের মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া আছে তাহাদের খেলার সঙ্গী সেই দৈত্য!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মরীচিকা

প্রকৃতির অবগুণ্ঠনের মধ্যে যে কত প্রকারই অভিনব ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত ব্যাপার ছাড়া আর যাহা কিছু কখনও দেখিতে পাই তাহাই আমাদের নিকট অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক বলিয়া মনে হয়। আপনারই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনিয়া মানুষ এক দিন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল। মেরু প্রদেশের উদীচ্যালোক (Aurora Boreales) মানুষকে একদিন অত্যন্ত বিস্ময়-বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আলেয়া যে একটা ভৌতিক পদার্থ এ বিশ্বাস এখনো অনেকেরই আছে। মানব সভ্যতার অতি আদিমকালে বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় বৃষ্টি ও উষার অভিনবত্বে বিস্মিত হইয়া উহাদের উদ্দেশে শত শত স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির এই সকল অভিনব-সংঘটনের মধ্যে মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে ও বিপদে ফেলিয়াছে মরীচিকা। মানুষ কত সময় এই মায়া মরীচিকার মোহিনী মূর্ত্তিতে ভুলিয়া—এই স্বর্ণ মৃগের পশ্চাতে উধাও হইয়া ছুটিয়া অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিস্তীর্ণ বালুকাময় উত্তপ্ত মরুভূমিতে ও শান্ত প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষেই এইরূপ অভিনব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মিশর দেশের বালুকাময় প্রান্তরে নিরন্তর এই প্রকার

মরীচিকার খেলা চলিতেছে। মরীচিকা নানারূপ ছলনাপূর্ণ দৃশ্য মরুযাত্রীর চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া স্বচ্ছ শীতল সলিলা দীর্ঘিকার আশায় ভুলাইয়া তাহাকে মধ্য মরুতে টানিয়া কত সময় যে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহার ঠিক নাই।

এই মরীচিকা প্রকৃতির যে একটি সাধারণ ও নিত্যকার জিনিষ, বিজ্ঞান এ যুগে সে খবর বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। একটা জলপূর্ণ কাচের গ্লাসে একটি পেন্সিল অর্দ্ধেকটা ডুবাইলে মনে হয় যে, জলের মধ্যে পেন্সিলের নিমজ্জিত অংশটা বাঁকিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ; যখন একটা স্বচ্ছ পদার্থ হইতে কোন দ্রব্য অপর একটা পৃথক্ প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাহার স্বাভাবিক গতি বক্রভাবাপন্ন দেখায়। বায়ু ও জল উভয়ই স্বচ্ছ পদার্থ এবং উভয়ের ঘনতা অসমান সুতরাং বায়ু হইতে যদি একটি পেন্সিল জলে প্রবেশ করে তাহা হইলে জল ও বায়ুর বিচ্ছেদ-সমতল হইতে পেন্সিলটি দৃশ্যতঃ বাঁকিয়া যায়। যে স্বচ্ছ পদার্থের ঘনতা যত অধিক, তাহার বক্রীকরণ শক্তিও তত অধিক।

বায়ু স্বচ্ছ পদার্থ এবং তাহার ঘনতা স্থান বিশেষে ও স্তর বিশেষে বিভিন্ন। এই জন্য বায়ুর মধ্যেই বিভিন্ন ঘনতার স্তরের ভিতর দিয়া বস্তুসকল সময়ে সময়ে বক্রভাবাপন্ন দেখায়। কোনো প্রদেশের তাপের আকস্মিক হ্রাস বা আধিক্য বশতঃ বায়ুস্তরের ঘনতা ও তাহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর বক্রীকরণ বৈষম্য ঘটিয়া মরীচিকার সৃষ্টি হয়। এইরূপ তাপের আকস্মিক পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ মরুভূমিতে বা সমুদ্র বক্ষেই ঘটিয়া থাকে। অপর কোথাও এরূপ প্রায় ঘটে না। সেই কারণে মরুপ্রান্তর ও সাগরবক্ষই মরীচিকার লীলাভূমি।

বায়ুস্তরের ঘনতা-বৈষম্যের প্রকৃতি-ভেদে, নানা প্রকার মরীচিকা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। কখনো মরুভূমির দিগন্ত প্রান্তে বালুকাতটের উপর, কখনো আকাশ মার্গে, কখনো সোজাভাবে কখনো উল্টাভাবে কখনো বা আলেখ্যের ন্যায় স্থির আবার কখনো বা বায়স্কোপের ছবির মত পরিবর্ত্তনশীল নব নব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়!

সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে মরুভূমির বালুকা রাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও তাহার অসামান্য দীপ্তিতে মরুভূমির বালুকাতট মুকুরের মত ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। সেই উত্তপ্ত বালুকার সংস্পর্শে সর্ব্বনিম্নস্তরের বায়ু বিস্ফারিত হয় ও ঘনতার হ্রস্বতা ঘটে, তদূর্দ্ধ স্তর বালুকার সংস্পর্শে না থাকায় ততটা বিস্ফারিত হয় না। এইরূপে বিভিন্ন স্তরের বায়ু বিভিন্ন ঘনতা বিশিষ্ট হয়। দূরে হয়ত একটি খেজুর গাছ আছে। খেজুর গাছের দৃশ্যটি বিষম ঘন বায়ুস্তরসমূহের মধ্য দিয়া দর্শকের চক্ষে পড়িয়া প্রতিফলিত হয়। তাহার ফলে খেজুর গাছটির নিম্নদিকে উল্টাভাবে তাহারই আর একটি প্রতিচ্ছবি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে খেজুর গাছটির নিম্নস্থিত সরোবরে তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ধারণা জন্মে। অথচ বৃক্ষনিম্নে জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নাই। দূর হইতে সূর্য্যালোক-দীপ্ত বালুকাতটের উপর ঐরূপ মায়া মরীচিকার বিভ্রমে দৃষ্টিভ্রান্ত হইয়া, সরোবর তীরবর্ত্তী

খেজুর গাছের ছবি তাঁহার স্বচ্ছ সলিলের উপর প্রতিবিম্বিত দেখিয়া তৃষ্ণার্ত্ত পথিক পাণপণ-বলে সহকারে তাহার অভিমুখে আপনার ক্লান্তিদগ্ধ দেহ টানিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু যখন সেই বিশুষ্ক বালুকা সমুদ্রের মধ্যস্থিত ধূমায়িতমস্তক, রৌদ্রদগ্ধ খেজুর গাছটির নিকট উপস্থিত হয় তখন নিদারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ ক্লান্তিভরে মরুভূমির অনলতপ্ত বালুকা বিস্তারে লুটাইয়া পড়ে।

মরীচিকা মানুষকে অনেক বিপদে ফেলিয়াছে এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা ঐরূপ মরুপথে অনেকবার

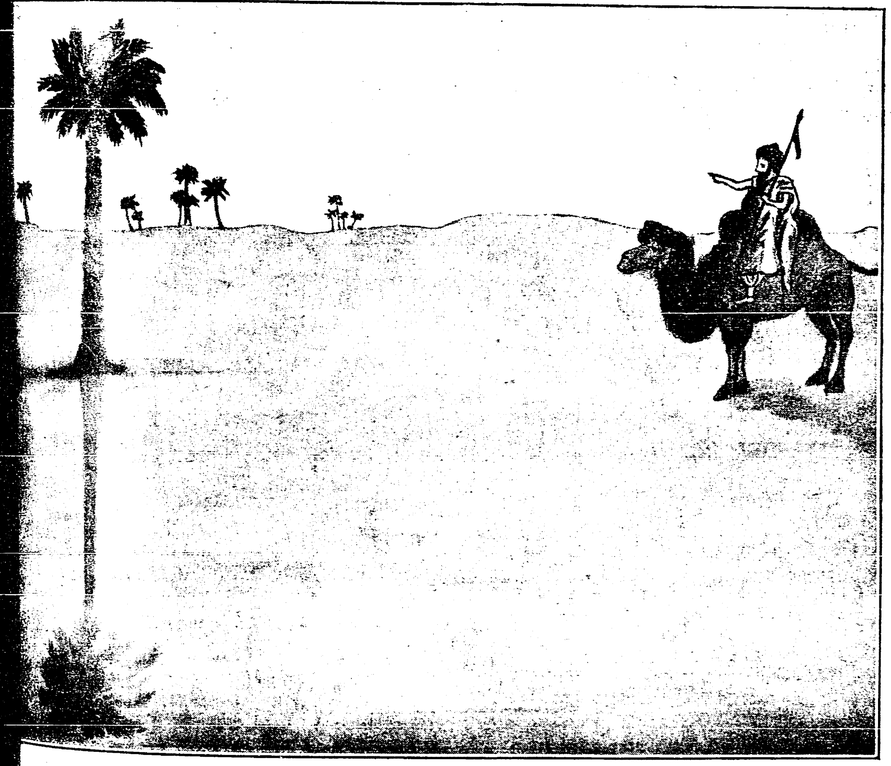

মরুভূমিতে খেজুর গাছের মিথ্যা প্রতিবিম্ব।

তায়াত করিয়াছে, এরূপ দৃশ্য অনেক দেখিয়াছে তাহারা ইহাকে আর বড় একটা বিস্ময়ের চক্ষে দেখে না। শত মরীচিকার মধ্যে নাই একজন আরব বেদুইনকে অথবা মরুর সূর্য্যদগ্ধ যাত্রীদিগকে মরীচিকা তাহাদের গন্তব্যপথ হইতে সামান্য মাত্র বিচ্যুত করে। শুধু অর্ব্বাচীন মরুযাত্রীদিগের পক্ষেই এরূপ দৃশ্য বিশেষভয়ের কারণ। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়ানের মিশর বিজয়কালে—মিশরের মরুভূমির মধ্যে ঐরূপ মরীচিকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সকলেই জানেন সম্রাট নেপোলিয়ান বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ

জ্ঞানের একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন; স্বয়ং একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। প্রায় সকল সময়েই তাঁহার সহিত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ থাকিতেন। তিনি তাহাদিগকে উক্ত মরীচিকার উৎপত্তির কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মাঙ্গ প্রথমে ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান দ্বারা সম্রাটকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই জগতের সমক্ষে সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন যে বায়ুর ঘনতা-বৈষম্যই মরীচিকা উৎপত্তির কারণ।

কখনো কখনো মরুভূমির মধ্যে দিক্‌চক্রের সন্নিকটে কুঞ্জছায়াচ্ছন্ন স্বচ্ছসলিলা নদীবেষ্টিত জলপূর্ণ গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। কখনো আকাশ মার্গে উল্টাভাবে স্থাপিত—সমুদ্র অর্ণবপোত প্রভৃতির দৃশ্য মরুযাত্রীদিগের দৃষ্টি গোচর হয় বলিয়া শুনা গিয়াছে।

ইটালীর নেপল্‌স উপসাগরে ও সিসিলির উপকূলে বায়স্কোপের ছবির মত সচল অসংবদ্ধ দৃশ্যসমূহ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই প্রকার মরীচিকাকে Fata Morgara কহে। সময়ে সময়ে দূরে স্তম্ভ, প্রাসাদ, গির্জ্জা, গম্বুজ, কেল্লা, বড় বড় নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি সহসা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল জিনিষ এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ-ভাবে এরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা ও অপূর্ব্ব ভঙ্গির সহিত বায়স্কোপের ছবির মত চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় যে দর্শককে তাহাতে বিস্ময়মুগ্ধ করিয়া তোলে। বিষমঘন বায়ুস্তর যখন সচল অবস্থায় থাকে তখন দূরাবস্থিত নগর গ্রাম প্রভৃতির দৃশ্যই ঐরূপ ভাবে চোখের সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া যা প্রকৃত পক্ষে যে স্তম্ভটা অভগ্ন তাহাকে দেখায়—এইরূপে সমস্ত জিনিষই বক্র বিকৃত অবস্থায় পরিদৃশ্যমান হয়। ক দেখা যায় যে আকাশ মার্গে উল্টা অবস্থিত একটি জাহাজের উপর আর এ জাহাজ সোজা ভাবে বসানো আছে। ক কখনো ঐ দ্বিতীয় জাহাজখানির উ উল্টাভাবে অবস্থিত একখানি তৃতীয় জাহা দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। তিনটি প্রতিবি একরূপ বা একটি জাহাজের। দূরে দি চক্রের পরপারে কোন জাহাজ আ তাহারই দৃশ্য বিষম-ঘন বায়ুস্তরের ভি দিয়া আসিয়া আকাশ মার্গে ঐরূপ রচনা করে।

অনেক দিন পূর্ব্বে ইতালীর বৃন্দিসি হইতে সমুদ্রের ঠিক পরপারে অবস্থি আফ্রিকার কাইরো নগরের পিরামিড অন্যান্য সৌধমালার ভগ্ন স্তম্ভগুলি অতি স্প ভাবেই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

মরীচিকা সুবিধা পাইলে কোনো দি মানুষকে বিপদে ফেলিতে ছাড়ে নাই ব কিন্তু সে যে সর্ব্বথা আমাদের শত্রুতা সা করিতেছে এরূপ বলিলে তাহার উ নিতান্তই অবিচার করা হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বায়ু প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে বক্রীকরণ শক্তির ভিতর দিয়া যে দৃ আমরা দেখিতে পাই তাহাই মরীচিকা যদিও মরীচিকা বলিতে সাধারণতঃ আম একটু পৃথক্ জিনিষই বুঝিয়া থাকি, তথা সকল মরীচিকাই এই একই কারণ হই উদ্ভূত। অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়া

ান্তর-অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্য তারকাদির রশ্মি ন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন ায়ুর বক্রীকরণ শক্তির প্রভাবে উক্ত োতিষ্কের গতি তাহার মৌলিক পথভ্রষ্ট । বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া বক্রভাব ধারণ রিয়া যে রশ্মি আমাদের চক্ষে পতিত হয় ই বক্রাংশকে প্রসারিত করিলে তাহা ক্ত জ্যোতিষ্কের প্রকৃত অবস্থান-বিন্দুতে

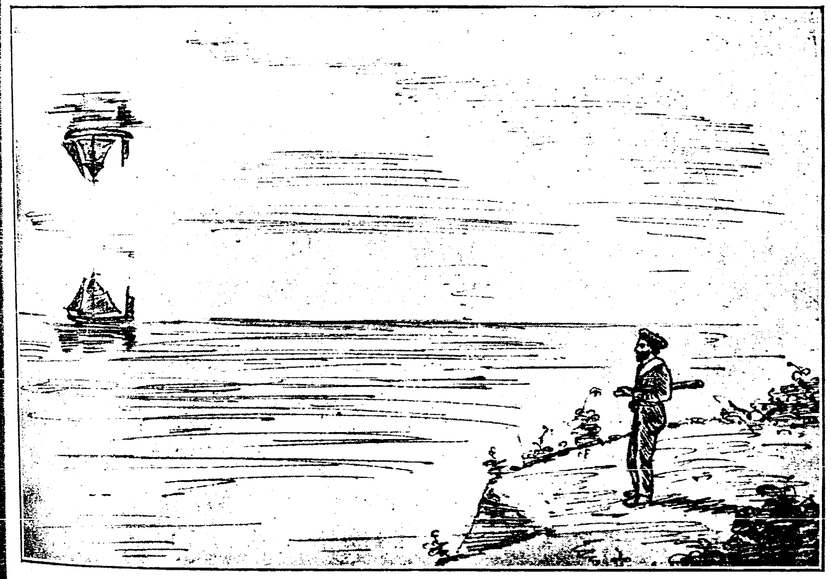

আকাশে জাহাজের প্রতিবিম্ব।

বিরাজিত দেখি। সূর্য্য অস্তগত হইয়া গন্থ-নিম্নে খানিকটা নামিয়া গেলেও ঐ কই কারণে আমরা তাহাকে দিগন্তের পরেই কিছুক্ষণ দেখিতে পাই। সুতরাং ায়ুমণ্ডলের বক্রীকরণ শক্তি থাকায় প্রকৃত াক্ষে যখন অপরাহ্নে অন্ধকার হওয়া উচিত ল তখনও আমরা আলোক পাই আবার াত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সূর্য্যকে আসিয়া পড়ে না—বহুল পরিমাণে দূরেই পড়িয়া থাকে। এবং আমরা সেই কারণে গ্রহনক্ষত্রাদি কিছুই তাহাদের স্বস্থানে দেখিতে পাই না—তাহাদের প্রকৃত অবস্থান হইতে অনেকটা বিচ্যুত অবস্থায় দেখি। সেই জন্য সূর্য্য বা চন্দ্র প্রকৃত পক্ষে চক্রবালের নিম্নে থাকিতেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বক্রীকরণ শক্তির প্রভাবে তাহাদিগকে দিগন্তোপরি উদিত দেখি। আবার সূর্য্য একেবারে দিগন্ত নিম্নে নামিয়া গেলেও তাহার বিক্ষিপ্ত রশ্মিমালা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্রভাবে পৃথিবীর উপর পতিত হয় ও কিছুক্ষণ তাহাকে আলোকিত করিয়া রাখে। এই অবস্থাতেই পৃথিবীতে উষা ও গোধূলিসন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। এইরূপে আমাদের দিনের বিস্তৃতি প্রকৃত পক্ষে যতটুকু

পাওয়া উচিত ছিল আমরা তদপেক্ষা অনেক বেশী ভোগ করিয়া লই। ইহার উপর আর একটা বড় রকমের লাভ এই যে, বায়ুর বক্রীকরণ শক্তি থাকায় আমরা উষা ও সন্ধ্যা এই দুইটি কবিপ্রিয় ক্ষণকে কাব্যলক্ষ্মী আদরণীয় রূপে ও প্রকৃতির ভূষণরূপে লা করিয়াছি। অন্যথা এরূপ একটা মহাগু হইতে আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতাম।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

বিক্রমোর্ব্বশী

(ফেলিসিয়াঁ লেভির ফরাসী হইতে)

পূর্ণতার উচ্চশিখরে নীত হইয়া, ভারতীয় নাট্যকলা আবার নিম্নে নামিয়া আসিল এবং তাহার স্বাভাবিক অভ্যস্ত পথের অনুসরণ করিল। "বিক্রমোর্ব্বশীর" সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস নিজেই এই অধোগতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নাটকটি কালিদাসের শেষ রচনা এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে অবশ্য ইহার অভিনয় হয়। বসন্তোৎসবে যেরূপ "শকুন্তলা" ও "মালবিকার" অভিনয় হইয়াছিল, বিক্রমোর্ব্বশীর প্রস্তাবনায়, অভিনয়ের ঐরূপ কোন কাল বা উপলক্ষ্য সূচিত হয় নাই। তাছাড়া এই নাট্যরচনাটি ক্ষুদ্র, সাদাসিদা ধরণের, ও তেমন সুগঠিত নহে। বিক্রমোর্ব্বশী—নাটক নহে;—উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাট্যরচনা—উহা তোটক। তোটকের লক্ষণগুলি এই ঃ—উহাতে কোন বীরের এবং কোন দেবীর প্রেমলীলা বর্ণিত হইবে। সকল অঙ্কেই বিদূষকের প্রবেশ থাকিবে (এই শেষোক্ত নিয়মটি যে একান্তই অপরিহার্য্য তাহা নহে;—আদিরসের প্রাধান্য সূচিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য)। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের নায়ক —পুরূরবা;—অতি প্রাচীন কালের চন্দ্রবংশী এক রাজা। নায়িকা—উর্ব্বশীনাম্নী এ অপ্সরা। ভারতের প্রাচীনতম পৌরাণি আখ্যানে উহাদের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছ ঋগ্বেদে সংবাদের আকারে একটি সূ আছে, ঐ সূক্তিতে উভয়ের মধ্যে বাকাবা চলিতেছে। ঋগ্বেদের এই সূক্তিটী যারপ নাই কঠিন ও দুর্ব্বোধ। স্বর্গের সঙ্গিনীদে সহিত মিলিত হইবার জন্য উর্ব্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করিল; হতাশ নায়ক, প্রত্যাগমনে জন্য তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু অপ্সরা তাহার অসম্মতি স্পষ্টরূ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথি করিয়া তুলিল; উর্ব্বশী, পুরূরবাকে কে এই কঠোর শিক্ষাটি দিয়া গেলেন:— "রমণীদিগের উপর প্রেমস্থাপন করিতে নাই উহাদের হৃদয় তরক্ষুর হৃদয়।" এ "সংবাদের" অন্তর্ভুক্ত শ্লোকগুলি, মনে হ —কোন এক পৌরাণিক আখ্যানের বিচ্ছি অংশ মাত্র। সমস্ত আখ্যানটি বহুপূর্ব্বে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে শত পথ-ব্রাহ্মণে আর একটি আখ্যান সন্নিবেশি

হইয়াছে—মনে হয়, গূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা করাই যেন উহার উদ্দেশ্য ঃ—যজ্ঞানুষ্ঠানে যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রাদি আছে তাহার সমর্থনার্থেই যেন এই উর্ব্বশী-পুরূরবা-ইতিহাসের অবতারণা করা হইয়াছে। যেন উহার আর কোন সার্থকতা নাই।

পরবর্ত্তী কালের রচনাদিতে, আবার এই উর্ব্বশী-পুরূরবার কাহিনীটি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কালসহকারে ইহা রূপান্তরিত ও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবত-পুরাণে দেখা যায়,—মিত্র ও বরুণের শাপে উর্ব্বশী স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পতিত হইয়াছে। এই আখ্যানের অবশিষ্ট অংশ শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত ইতিহাসেরই পুনরুক্তি। এই বিষয়ে ভাগবতের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মিল আছে। কিন্তু বৃহৎকথার আখ্যানটি ইহা হইতে অনেক ভিন্ন। পুরূরবা বিষ্ণুর একজন ভক্ত; তাঁহার নিকট, স্বর্গলোক ও মর্ত্ত্যলোক উভয়ই সুপরিচিত। ইন্দ্রের স্বর্গে তিনি অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র উর্ব্বশীর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন, উর্ব্বশীও তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া বিষ্ণু, নায়কের সহিত অপ্সরাকে যাইতে দেওয়া হউক, এই বলিয়া ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন। এমন সময়ে, দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। অসুরেরা পরাভূত হইল। ইন্দ্র এই বিজয়োৎসব উপলক্ষে, একটি বৃহৎ নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ করিলেন। অপ্সরা রম্ভা এই নাট্যাভিনয়ে "চলিত" নামক নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করিলেন। পুরূরবা গর্ব্বভরে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ—উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে উহা অপেক্ষা ভাল-ভাল নৃত্য দেখাইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরু পুরূরবার এইরূপ অবজ্ঞাদর্শনে ব্যথিত হইয়া এই অভিসম্পাৎ করিলেন,—যাবৎ না কৃষ্ণ এই শাপ মোচন করেন তাবৎ পুরূরবার সহিত অপ্সরার বিচ্ছেদ ঘটিবে। গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল এবং পুরূরবা বিষ্ণুকে লাভ করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বিষ্ণুর প্রসাদে, উভয়ের পুনর্ম্মিলন হইল।

অবশ্য এই পৌরাণিক আখ্যানের উপরি-বর্ণিত রূপটিই কালিদাসের সময়ে খুব লোক-প্রিয় ছিল;—বৃহৎকথার সঙ্কলনকর্ত্তা গুণাধ্যায়, হাল বা শতবাহনের সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ (পৃঃ খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী)। এই আখ্যানটিকে রঙ্গপীঠে প্রত্যারোপণ করিবার জন্য কবিবরকে এই গল্পের কতকগুলি মুখ্য অংশের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। নরের প্রেমে অমর মুগ্ধ—এই কথা সমর্থনার্থ গোড়াতেই একটা সুবিধাজনক ঘটনার আশ্রয় লওয়া হইল। পুরূরবা এক অসুরের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিলেন। ঔৎসুক্য ও চিত্ত-চাঞ্চল্য আরও বাড়াইবার জন্য প্রণয়ীযুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হইল।—এবং এই বিচ্ছেদ হইতেই উহাদের প্রেমানল অতিমাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যে ব্যক্তি প্রেমবিহ্বল, স্বভাবতই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে; অপ্সরাকেও এই অন্যমনস্কতার জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইল। স্বর্গের কোন নাট্যাভিনয়ে উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু পুরুষোত্তমের নাম উচ্চারণ না করিয়া তাহার স্থলে সে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করিল। এই অপরাধে, নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি উর্ব্বশীকে

শাপ দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া তাহার শাস্তিকালের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ধরায় অবতীর্ণ হইয়া উর্ব্বশী দেখিল, পুরুরবা অন্যাসক্ত। ঈর্ষ্যায় আত্মহারা হইয়া,—যে বনে কার্ত্তিকেয় স্ত্রীলোকদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—উর্ব্বশী সেই নিষেধ-আজ্ঞা না মানিয়া ঐ বনে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ একটি লতারূপে রূপান্তরিত হইল। এক "সঙ্গম-মণি" ভিন্ন তাহার নিজ রূপ ফিরিয়া পাইবার আর অন্য উপায় রহিল না। পার্ব্বতীর সৃষ্ট এই সঙ্গম-মণি। পুরুরবা প্রণয়িনী-বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যখন বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে হঠাৎ এই সঙ্গম-মণিটি প্রাপ্ত হইলেন। প্রণয়ি-যুগলের আবার মিলন হইল। যেদিন পুত্র মুখ দর্শন করিবেন সেই দিনই উর্ব্বশী স্বর্গে প্রস্থান করিবেন এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু এই বিষয় সম্বন্ধেও কালিদাসের চিত্তসৌকুমার্য্য লক্ষিত হয়। পৌরাণিক আখ্যানে আছে, উর্ব্বশী একটি পুত্র প্রসব করে এবং পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কবি এই প্রচলিত আখ্যানের মর্ম্মানুসরণ না করিয়া দেখাইলেন যে, দাম্পত্য-প্রেমের আতিশয্যবশতই পুত্র "আয়ু"কে জননী পরিত্যাগ করিয়াছিল। আয়ু এক আশ্রমে প্রতিপালিত হইল। তাহার অকাল-বিকশিত বীরত্বের একটি কার্য্যে তাহার বংশ প্রকাশ হইয়া পড়িল। আয়ু রাজার নিকট নীত হইল। রাজা আয়ুকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজে বন গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু নারদ, ইন্দ্রের নিকট হইতে এক সন্দেশ লইয়া এই সময়ে উপনীত হইলেন। পুরুরবার কৃত বহুল উপকার স্মরণ করিয়া দেবরাজ উর্ব্বশীকে আমৃত্যু পুরুরবার সহিত থাকিতে অনুমতি দিলেন।

এই নাটকের অনেকগুলি কার্য্যপ্রকরণ শকুন্তলানাটকের কার্য্যপ্রকরণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একই প্রকারে, একজন তাপসের অভিসম্পাতের সূত্রাবলম্বনে নাট্যগ্রন্থি বন্ধন করা হইয়াছে এবং হঠাৎ একটি শিশুর অবতারণা করিয়া একই প্রকারে ঐ গ্রন্থিটী মোচন করা হইয়াছে। আবার উভয় নাটকেই একটি মণি-রত্নের সাহায্যে প্রণয়িযুগলের পুনর্ম্মিলন ঘটিয়াছে। অনেক ছোটখাটো বিষয়েও এই দুই নাটকের মধ্যে মিল দেখা যায়। উর্ব্বশী যখন রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, একটা মালার বাধা পাইয়া সেই ছুতায় থমকিয়া দাঁড়াইল; শকুন্তলাও এইরূপ পায়ে কাঁটা বিঁধিবার ও গাছে কাপড় আটকাইবার অছিলা করিয়া একটু থামিয়া ছিল। শকুন্তলার ন্যায় উর্ব্বশীও একটা ভূর্জ্জপত্রে লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল; শকুন্তলায়, মাতলী যেমন বিদূষককে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল—সেইরূপ বিক্রমোর্ব্বশীতে, একটা পাখী মণিটী উঠাইয়া লইয়া যায়। বালক ভরতের ন্যায়, বালক আয়ুও খেলা করিবার জন্য তাহার খেলনা-ময়ূর চাহিয়াছিল।

রাজা বিমানে চড়িয়া যখন যাত্রা করিতেছেন, সেই সময় কবি যে বর্ণনার বিষয় পাইয়াছেন, উহার অনুরূপ বর্ণনার বিষয় শকুন্তলা নাটকেও আছে। কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশীর আখ্যানবস্তুটি শকুন্তলার আখ্যানবস্তু অপেক্ষা স্বভাবতই নিকৃষ্ট। বিক্রমোর্ব্বশীতে বিস্ময়রস অথবা অতিমানুষিক ব্যাপারই প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে। নায়িকা স্বর্গের অপ্সরা,—দৈবশক্তিসম্পন্না। তাই তিনি অদৃশ্য থাকিয়া বিদূষকের সহিত রাজার বিশ্রম্ভালাপ শুনিতে পাইতেছেন, রাজার নিকট সহসা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, আকাশ-পথ দিয়া তাঁহার সম্মুখে অবতরণ করিতেছেন। দৈব-শক্তি থাকায় তাঁহার পদমর্য্যাদা রাজারও উপরে। সুতরাং রাজা নাটকের নায়ক হইলেও, প্রধান স্থান নায়িকাই অধিকার করিয়াছে। উর্ব্বশীই বেশী অগ্রসর, উর্ব্বশীই নায়কের অন্বেষণ করিতেছেন, উর্ব্বশীই নায়ককে কুপিত করিয়া তুলিতেছেন। এই নাটকে নায়কের ব্যক্তি-গৌরব একটু খর্ব্ব হইয়াছে; এবং এই দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণের পক্ষে উর্ব্বশীর চরিত্রও পর্য্যাপ্ত নহে। জননী স্বীয় শিশুপুত্র আয়ুকে ফেলিয়া যে পলায়ন করিল,—অতিমাত্র দাম্পত্যপ্রেমও এই আচ-রণের দোষক্ষালণ পক্ষে যথেষ্ট নহে। নাটকের অন্য পাত্রগণেরও কোন বিশেষত্ব নাই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নাই—অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণানুরূপ চরিত্র রচিত হইয়াছে মাত্র। বিদূষক আহার-বিলাসী অপেক্ষা বেশী ঔদরিক, হাস্যরস অপেক্ষা তাহার উদ্ভটভঙ্গিমাই বেশী, সূক্ষ্ম-রসিকতা অপেক্ষা সে স্থূলধরণের রসিকতাতেই বেশী অভ্যস্ত। উর্ব্বশীর সখী চিত্রলেখা সেই মামুলী আদর্শের চরিত্র—কোন বিশেষত্ব নাই। অন্যান্য অপ্সরা ও রাণী ঔশিনরী—ইহারা অস্ফুট রেখাচিত্রমাত্র। তুম্বুরু, নারদ, চিত্ররথ, ভরতের শিষ্যগণ ইহাদেরও কোন নিজত্ব নাই।

নাটকের আখ্যানবস্তুটিও শীর্ণকায়,—পঞ্চাঙ্ক পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে; চতুর্থ অঙ্ক—দুইটি ক্ষুদ্র কথোপকথনের মধ্যে সন্নিবেশিত একটা দীর্ঘ স্বগতোক্তি বই আর কিছুই নহে। পুরুরবা স্বীয় প্রিয়তমার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং ময়ূর, কোকিল, হংস, ভ্রমর, হস্তী, পর্ব্বত, নদী, হরিণ—ইহাদিগকে গীতি-কবিতার ভাষায় প্রিয়ার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই দৃশ্যসংস্থানটি নাটক অপেক্ষা গীতিকাব্যের অধিক উপযোগী। কিন্তু এই দোষটি কালি-দাসের উত্তরবর্ত্তী নাট্যকবিগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ আখ্যানবস্তু অপেক্ষা শ্লোকরচনায় বেশী দক্ষ। ইহার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ভবভূতির "মালতী মাধবে" (৯ অঙ্ক), রাজশেখরের "বাল-রামায়ণে" (৫ অঙ্ক), জয়দেবের "প্রসন্ন রাঘবে" (৬ অঙ্ক), ভাস্করের "উন্মত্ত-রাঘবে," বিশ্বনাথের "প্রভাবতী পরিণয়ে" (সাহিত্য দর্পণ দ্রষ্টব্য)। এই নাটকে নাটকীয় ঔৎসুক্য অপেক্ষা দৃশ্যের ঔৎসুক্য উৎপাদনের প্রতিই কবির বেশী লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যরস অপেক্ষা, নাট্যকলার গৌণ উপাদান যে নৃত্যগীত সেই নৃত্যগীতই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইজন্যই আলঙ্কারিকগণ,—দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যরচনা যে "তোটক", এই নাটকটিকে সেই তোটক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই নাটকটি অন্তরিন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে না পারিলেও, প্রেক্ষকগণের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিমোহিত করে। হিমালয় শিখরে সমবেত ভয়-কম্পিতা অপ্সরা-গণের আশ্রয় যাচ্ঞা, বিমানে আরোহণ করিয়া রাজার প্রবেশ, চিত্রলেখার হস্তাবলম্বন-পূর্ব্বক উর্ব্বশীর প্রত্যাগমন, অপ্সরাদিগের

আনন্দ,—এই সমস্ত চিত্তবিমোহন চিত্র নাটকের আরম্ভ হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং শেষ অঙ্কে আয়ুর রাজ্যাভিষেক দৃশ্যেও পরিচ্ছদাদির জাঁকজমক ও রাজবিভব প্রদর্শন করিবার বেশ সুযোগ হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে, বিবিধ সুরসংযোগে যে কবিত্ব-পূর্ণ পদাবলী গীত হইয়া থাকে এবং তৎসহকৃত যে অপূর্ব্ব ঐকতান-সঙ্গীত বাদিত হয় তাহা ইন্দ্রিয় ও কল্পনা উভয়কেই পরিতৃপ্ত করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌধ-রহস্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল যেমন নিকটস্থ সমুদয় ভূমিকে আপনার অধিকারে টানিয়া লয়, তেমনি এই ক্লুমবার হলের বিপদ-সম্ভাবনা আমার হৃদয়ের সমস্ত চিন্তাকে জুড়িয়া বসিল। এই চিন্তা-কাতর উত্তেজিত উদ্ভ্রান্ত চিত্ত লইয়া কেমন করিয়া আমি আমার দৈনিক কাজের হিসাব-নিকাশ করিব? জমিদারীর কার্য্যাবলী-পরিদর্শন আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল! আহা, সরল প্রভুভক্ত কৃষকের দল! তাহাদের ছোট-খাট অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার কথা আর আমার মনেও পড়িত না! সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাই, পাল তুলিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি সামুদ্রিক পাখীর মতই ডানা মেলিয়া ঢেউয়ের বুক বহিয়া ভাসিয়া যায়, নীল সমুদ্রের মাঝখান দিয়া দুই ধারে চন্দ্রালোকিত ফেনরাশি কাটিয়া সুদূরগামী বড় বড় জাহাজ চলিয়া যায়, সূর্য্য শীত প্রভাতের কুয়াশা-জাল ছিন্ন করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় জাগিয়া উঠে, আমার লক্ষ্যহীন আঁখি শুধু যে সাগর-পানে চাহিয়া থাকে,—কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার মধ্যে যেটুকু মধুরতা ছিল, তাহার উপভোগ শক্তি আমার শান্তিহীন চিত্ত হইতে যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

প্রকৃতির যে নিভৃত সৌন্দর্য্য, কর্ম্মের যে সুগভীর আনন্দ আমার তরুণ জীবনকে দারিদ্র্যের অভাবে, বা দুঃখে কোনদিন নিষ্পেষিত হইতে দেয় নাই, একমাত্র ঐ শ্বেত প্রাসাদের অজ্ঞাত রহস্য, সেই-আমাকেই সম্পূর্ণ অভিভূত পদানত করিয়া ফেলিয়াছিল। মুক্তির ইচ্ছা আর মনে আসে না,—কেমন করিয়াই বা আসিবে? আমার প্রাণাধিকা, প্রিয়তমা গেব্রিয়েল, সে-ও যে ঐ প্রাচীর-বেষ্টিত বিরাট রহস্য-নিকেতনের সহিত চির আবদ্ধ! উদ্বেলিত অশান্ত চিত্ত শুধু ঘটনা-পরম্পরার স্রোতে ভাসিয়া এই অতল বিপদ সাগরের তল দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া রহিয়াছে!

কোথায় যাইব? গৃহের বাহিরে? পল্লীর মধ্যে? সমুদ্র-তীরে? যেখানে যাই, সেখানেই সেই অত্যুচ্চ শ্বেত অট্টালিকার চূড়া

কান্তরাল ভেদ করিয়া নেত্র-পথে ফুটিয়া উঠে। ব্যাকুল চিত্ত মুহুর্মুহুঃ বলিতে থাকে, "অভাগা পরিবার, ঐ গৃহে দিবারাত্রি এক অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত বিপদের প্রতীক্ষায় শুধু চাহিয়া আছে!" পূর্ব্বে যখন আমরা দর্শকের আসনে বসিয়া এই অদ্ভুত-প্রকৃতি পরিবারের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতাম, তখন শুধু একটু কৌতূহলের "আহা" শব্দ উচ্চারণ করিয়াই সকল কর্ত্তব্য সকল দায়িত্বের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু এখন—? কেমন করিয়া বুঝাই, এখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ!

আমার মনের ভাব যখন এমনি-ধারা, সেই সময় সহসা একদিন নেপ্‌লস্ হইতে কাকার এক পত্র আসিল। কাকা বাবাকে লিখিয়াছেন, বায়ু-পরিবর্ত্তনে আশাতিরিক্ত উপকার পাওয়ায় আরও কিছুকাল তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের বাহিরে থাকিতে চাহেন; বাবা আরও কিছুকাল এইখানে থাকিলে ভাল হয়। এ সংবাদে আমরা সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলাম। বাবা এই কোলাহল-হীন বাধা-বিপত্তি-বিহীন স্থানে সাহিত্যালোচনার যে অতি সুযোগ লাভ করিয়াছেন, এমন সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে আর পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই! বস্তুতঃ তাঁহার বিশ্বাস এমনই! আর আমরা উইগটাউনের জলাভূমিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চিত দেখিতাম, তাহার কথা খুলিয়া বলার প্রয়োজন দেখি না।

জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের দিন হইতে প্রতিদিনই প্রায় সকালে-সন্ধ্যায় একবার করিয়া আমি "ক্লুমবারে" বেড়াইতে যাইতাম। অবশ্য বাড়ীটার বাহিরের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া আমার বুভুক্ষু দৃষ্টির অপর কোন দুরাশাই পূর্ণ হইত না। তথাপি কর্ত্তব্য-বোধেই আমি নিত্য একবার করিয়া বাড়ীটা দেখিয়া আসিতাম।

যে অসামান্য যোদ্ধা একদিন সহস্র ভয়ার্ত্তকে আশ্রয় দিয়াছেন—তিনিই আজ ভীত শিশুর মত আমার ন্যায় সামান্য লোকের সাহায্য-প্রার্থী! নিয়তির নির্ম্মম পরিহাস! ইহাতে আমার আনন্দ হয় নাই, সুগভীর সমবেদনাতেই সারা চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল!

পূর্ব্বে তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিতাম, এখন আর সেভাবে দেখি না। কি ভ্রান্ত ধারণাই না এতদিন তাঁহার বিরুদ্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছি! সে কথা ভাবিতেও এখন কেমন লজ্জা হইত।

একদিন ক্লুমবারের নিকট বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে হইল, তাঁহার মন যেন স্নায়বিক উত্তেজনার চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অত্যন্ত ভীত-চকিত দৃষ্টিতে ডাহিনে-বামে লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন। গেব্রিয়েলের কথা স্মরণ হইল,—৫ই অক্টোবর যতই কাছে আসে, বাবার ভয়ও তত সীমা ছাড়াইয়া যায়! সত্য! কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষে জ্বালাময়ী দৃষ্টি, হস্তে অকারণ কম্পন, মুখে অস্বাভাবিক উত্তেজনার চিহ্ন স্পষ্ট দীপ্যমান,—এরূপ উত্তেজনা মানুষ কয়দিন সহ্য করিতে পারে? তাঁহার বয়স যেন সহসা দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল।

আমার সহিত অত্যন্ত ভদ্রভাবেই তিনি

দুই-চারিটি কথা কহিলেন। পূর্ব্ব-কথার কোনই আলোচনা হইল না।

জেনারেল চলিয়া গেলে আমি একবার বেশ করিয়া কাঠের বেড়াটার চারিধার পরীক্ষা করিয়া লইলাম। যে তক্তাগুলা আল্‌গা ছিল, এবং যে কয়খানা আমরা চেষ্টা করিয়াই খুলিয়া রাখিয়া ছিলাম, সেগুলা আবার পেরেক ঠুকিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বারে দিবারাত্রিই তালা সংলগ্ন থাকে। এক কথায়, এখন আর বাটীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বিড়াল-প্রবেশেরও পথ রাখা হয় নাই।

এখানে, সেখানে, গাছের ফাঁক দিয়া, বেড়ার ফুটা-ফাটার মধ্য দিয়া, দরজার সূক্ষ্ম রেলিংয়ের ছিদ্র-মধ্যে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া, ভিতরকার সংবাদ লইবার নিষ্ফল চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া অনেকবার ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপ অনুসন্ধান-কালে, একদিন নীচেকার একটা জানালার তলায় আমি একজন লোককে দেখিতে পাইলাম। তাহার আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া অনুমান করিলাম, বুঝি সে জেনারেলের কোচম্যান ইজরেল টেক্স। মরডণ্ট বা গেব্রিয়েলের কোনও চিহ্নই নাই! ভিত্তি-গাত্রেও তাহাদের ছায়াটুকু পড়ে না! বাহিরে অনেক সময় কান খাড়া করিয়া থাকি, কিন্তু কোথায় সে সুললিত প্রিয় কণ্ঠস্বর! নিশ্চয়ই তাহাদের তবে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে! খোলা থাকিলে যে কোন উপায়ে হৌক, নিশ্চয় তাহারা এতদিনে একটা কিছু সংবাদ দিত।

পৃথিবীর অসংখ্য সুখ-দুঃখের, কাহিনী বক্ষে ধরিয়া জলস্রোতের মতই কাল-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমার ভয় ও ভাবনার মাত্রা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়া ছিল, যে সময় সময় মনে হইত, আমিও না ঐ রংরুট নিকেতনের অধিবাসীদের মত একদিন ক্ষেপিয়া যাই!

২রা অক্টোবর। কুয়াশা-মণ্ডিত ক্ষীণ আলোক-বিচ্ছুরিত পথ দিয়া, যখন আমি প্রতিদিনের মতই প্রিয়তমার নিষ্ফল উদ্দেশে ব্রুমবারের অভিমুখে যাইতেছিলাম, সহসা তখন পথের ধারে একটা উইলো গাছের তলায় আমার দৃষ্টি পড়িল। একখানা পাথরের উপর একজন অপরিচিত বিদেশী লোক বসিয়া ছিল। এখানকার সকলকেই আমি জানি। লোকটির পরিচ্ছদের দুর্দ্দশা এবং জুতার মলিনতা দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, সে বহু দূর হইতে আসিয়াছে। হাঁটুর নিকট একটা খোলা ছুরি ও অর্দ্ধখণ্ড পাঁউরুটি পড়িয়া আছে! আপনার ক্রোড় হইতে রুটির গুঁড়া-গুলা সে ঝাড়িয়া ফেলিতেছিল। সম্ভবতঃ এইমাত্র সে প্রাতরাশ সমাধা করিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করিবা-মাত্র লোকটা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার আকারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং হস্তস্থ ছুরিকার তীক্ষ্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি ধীরে ধীরে পথের অপর প্রান্তে সরিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস, অভাবই মানুষকে মরিয়া করিয়া তোলে। হয়ত আমার ওভারকোটের পকেটে যে সুবর্ণ শৃঙ্খলযুক্ত ঘড়িটা আমার বক্ষ-স্পন্দন-শব্দেরই অনুকরণ করিতেছিল, তাহার লোভ সম্বরণ করা বেচারার পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আর এই জনহীন কুয়াশাচ্ছন্ন, আধো-অন্ধকার পথে—সে কাছ

বই সহজ-সাধ্য ছিল। আমার বিশ্বাসকে নাইয়া তুলিবার জন্যই যেন সে নিমেষে আমার গন্তব্য পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন যদিও তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি-র্কের অবতারণায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে-ছিল, তথাপি যথাসাধ্য শান্ত ভাব ধরিয়া ংযত কণ্ঠস্বরে যথা-সম্ভব মৃদুতা রক্ষা করিয়া ামি কহিলাম, "কি চাই তোমার? আমি তামার কোন উপকার করতে পারি কি?"

রৌদ্রে পুড়িয়া লোকটার মুখের রং কেবারে পাকা মেহগ্নি কাঠের বর্ণে পরিণত ইয়া ছিল। গালে প্রকাণ্ড একটা কাটা াগ, ইহা তাহার শ্রীর বিশেষ উন্নতি সাধন রে নাই। মাথায় একটা ডগা-উল্টানো পী, দেখিলে মনে হয়, কখনো সে সৈন্য ভাগে কাজ করিত! মুখখানা কদাকার। ক কথায় লোকটাকে দেখিয়া তাহার প্রতি ামার মনে কোনরূপ অনুকূল ভাব জন্মানো র থাক্, বরং তাহাকে একটা বদ্‌মায়েস ণ্ডা বলিয়াই ধারণা হইয়া ছিল।

বর্ব্বরটা কোন কথা না কহিয়া কিছুক্ষণ রিয়া জ্বলন্ত আরক্ত দৃষ্টিতে আমার আপাদ স্তক নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে হস্তস্থ রিকাখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার পর হিল, "আমার বোধ হয়, তুমি পুলিসের াক নও? তোমার বয়স খুব কাঁচা বলেই ন হচ্চে। পাজী,—অকর্ম্মণ্য, পুলিসের াকগুলো, একবার আমায় পেস্‌লীতে আর কবার উইগটাউনে ধরেছিল, কিন্তু ফের দি কেউ সে চেষ্টা করে ত, তাকে অনেক াল করপোর‍্যাল স্মিথের নাম মনে করিয়ে াখাব? মজার দেশ যা হোক, কাজ দেবার বেলা খোঁজ নেই,—কি করে খাই? কি সম্পত্তি,—তা বল্‌তে না পারলেই শ্রীঘর? জাহান্নমে যাক্ সব!"

আমি ধীরভাবে উত্তর দিলাম, "একজন সৈনিক পুরুষের এ রকম অবস্থা-বিপর্য্যয় হয়েচে, শুনে আমি ভারী দুঃখিত হলুম। তুমি কোন্ পল্টনে কাজ করতে?"

"এইচ্ ব্যাটারী; রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগ। উচ্ছন্ন যাক্ তারা,—আমার এই ষাট বছর বয়স হল, ভিক্ষের মত পেনসন্ পেলুম কি না, আটত্রিশ্ পাউণ্ড দশ সিলিং—এতে ত আমার বিয়ার আর তামাকের খরচও কুলোয় না!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার বিশ্বাস, আটত্রিশ পাউণ্ড দশ সিলিংয়ে তোমার এ বুড়ো বয়সে ভাল রকমই দিন কাটতে পারে!"

বিকট মুখখানা খিঁচাইয়া লোকটা সহসা আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল, ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার হলে হত, সত্যি না কি,—তুমি কি তাই মনে কর?" তাহার পর ললাটের উপর হইতে রুক্ষ কর্কশ বিশৃঙ্খল চুলগুলা বাম হস্তে সরাইয়া দিয়া, ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া, পুনরায় কহিল, "তলোয়ারের এই যে চোট্‌টি দেখ্‌চ, এর দাম কত? দিন নেই,—রাত নেই, জল, ঝড়, বজ্রাঘাত মাথা পেতে নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে এই যে হাড়ের বোঝা বয়ে বয়ে কামান-বন্দুকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানো,—কেন? জীবনটা কি ফ্যাল্‌না, না কি? এই যে পূবে বাতাস বইলেই কোঁ-কোঁ-কোঁ-কাঁপুনি, জ্বর, পিলে-লিবারে পেট ফুলে জয়ঢাক, ভারতবর্ষের

আগুনে বাতাসে, রোদে পুড়ে ঝল্‌সে ওঠা —বনে-জঙ্গলে জানোয়ারের মত ওৎ পেতে বসে থাকা—এ সব কিসের জন্যে? ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার এই আটত্রিশ পাউণ্ড! ছোঃ—! এ সব জিনিষের বাজার-দর কত? কি বল গো মশাই?" লোকটার স্বরে বিদ্রূপের সুর ধ্বনিয়া উঠিল।

শান্ত স্বরেই আমি উত্তর দিলাম, "এটা গরীবদের দেশ—এ অঞ্চলে যার আয় তোমার মত, তাকে লোকে অবস্থাপন্নই বলে থাকে।"

পকেট হইতে একটা প্রকাণ্ড পাইপ টানিয়া বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে সে উত্তর দিল, "তোমরা ভারী বোকা,—আর তোমাদের মতি-গতিও বোকার মত। হ্যাঁ! সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাক্‌তে হয় কেমন করে, তা আমরা বেশই জানি। আমার হাতে যতক্ষণ অবধি একটি সিলিং থাকে,—কি করে তার সদ্‌ব্যয় করতে হয়, তা আমার বেশ জানা আছে। দেশের কথা বলচ? দেশের জন্যেই আমি লড়াই করেচি,—দেশ আমার জন্যে কল্লে কি?—আমরা এইবার রুসিয়ানদের সঙ্গে মিলে তাদের দেখিয়ে দেব যে, কত সহজে হিমালয় পার হতে হয়! তখন ইংরেজ আর আফগান কারো সাধ্য হবে না যে তাদের প্রবেশ নিষেধ করেন! সেণ্ট পাটার্স্‌বার্গে এ সব খপরের দাম কত, মশায়, তার কিছু খবর রাখেন কি?"

অত্যন্ত ঘৃণার সহিত আমি উত্তর দিলাম, "একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখে তামাসাতেও এমন কথা শুনতে আমার লজ্জা হয়।"

"তামাসা?" একটা অকথ্য শপথ গ্রহণ করিয়া চীৎকার-স্বরে সে উত্তর দিল, "তামাসা অনেক দিন আগেই আমি এ কাজ করতু যদি রুশিয়ানরা আমার পরামর্শ নিত! স্কো লফ্‌ লোকটা তাদের দলের মধ্যে সব চাইতে ভাল, গুণীর সে কদর বোঝে, কিন্তু দ তাকে আমোলই দিলে না যে। ছোট লোকে দল!—যাক্‌, সে এখানকার কথাও নয়— সেখানকার কথাও নয়। এখন বল দে মশায়, হিথারষ্টন বলে এ দেশে কেউ বা কচ্ছে কি না? একচল্লিশ নম্বর বাঙ্গা সৈন্যের দলে যে ছিল। উইগটাউনে খব পেলুম, লোকটা এইখানেই কোথা থাকে।"

"ঐ দেখছ, উইলো গাছের ঝোপের পা দিয়ে একটা সরু রাস্তা দক্ষিণ দিকে সোজা চ গেছে, ঐটে ধরে যাও—সামনেই দেখবে, সাদা বাড়ী! কিন্তু বাড়ী পেলেই যে বিশে কিছু কাজ হবে, তা নয়—তিনি কারো স দেখা করেন না।" ক্লুমবারের দিকে চাহি আমি উত্তরচ্ছলে তাহাকে আমার মন্তব্যটি জানাইয়া দিলাম।

আমার কথার শেষ অংশটুকু শ্রুতিগোচ হইবার পূর্ব্বেই সে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষে ক্লুমবারের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল লোকটার চলনে কিছু বৈচিত্র্য ছিল। দক্ষি পদটি এক হাত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বা পদটি ছয় হস্ত অগ্রসর হইয়া যায়। সম্ভব যে কোন কারণে হোক দক্ষিণ পদের জো কম থাকায় বাম পদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছি আমি বিস্মিত নেত্রে তাহার সেই অপূর্ব্ব গ ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম

সেই কুৎসিত অপ্রিয়-দর্শন লোকটার পা চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রথমেই আমা

চিন্তা হইল যে, ইহার সহিত কোপন-স্বভাব জেনারেলের সাক্ষাতের ফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা! কথাটা স্মরণ হইবামাত্র কাল-বিলম্ব না করিয়া আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। দুই ধারের ঘন-সন্নিবিষ্ট উইলো ও ঝাউগাছের ছায়া-স্নিগ্ধ পথ ধরিয়া অত্যন্ত দ্রুত পদে ক্লুমবারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

কুয়াশা কাটিয়া তখন সূর্য্যালোক তরুণীর লজ্জাবগুণ্ঠনের মত সবেমাত্র ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে ঝিক্‌মিকে রৌদ্রের ছায়া, পথের উপর আলোকের গোলক-বিন্দু অঙ্কিত করিতেছিল। সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া বায়ু-প্রবাহ হু-হু-স্বরে বহিয়া আসিয়া বৃক্ষ-শাখা কম্পিত করিতেছিল। সৈকতে জলের উচ্ছ্বাস-শব্দ অস্পষ্ট সোহাগের মতই মনে হইতেছিল। পথের ধারে একটা তন্দ্রাতুর কুকুর পড়িয়া ঝিমাইতেছিল, আমার দ্রুত-গমন-শব্দে, নিদ্রালস চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া একবার সে চাহিয়া দেখিল।

ফটকের ধারেই লোকটার সাক্ষাৎ মিলিল। সে তখন বেড়ার ফাঁকের ভিতর দিয়া তাহার কৌতূহলী চক্ষুর দৃষ্টি ভিতরে প্রেরণ করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "লোকটা কি ভয়ানক চালাক! ঐ গাছের আড়ালে যে প্রকাণ্ড কোঠাখানা দেখা যাচ্ছে, ঐটেতেই বুঝি সে থাকে!"

"হাঁ, বাড়ী ঐ-ই বটে, কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোন, তাহলে তাঁর সঙ্গে একটু সাবধানে কথা-বার্ত্তা কবার চেষ্টা করো, অমন আবোল-তাবোল শোন্‌বার লোক তিনি নন্‌।"

মাথা দুলাইয়া সে উত্তর দিল, "সে কথা মিছে নয়। লোকটি বড় সহজ নয়, কিন্তু ঐ যে সে আস্‌চে! নয় কি?"

দরজার ছিদ্রাংশে চক্ষু রাখিয়া আমি ভিতর-পানে দেখিয়া লইলাম,—লোকটার অনুমান মিথ্যা নহে। আমাদের কথোপ-কথনের শব্দে অথবা আমাদের দেখিতে পাইয়া, যে কারণেই হউক, জেনারেল এই পথেই আসিতেছিলেন। চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইতে ছিলেন, নয়নের চকিত দৃষ্টিপাতে চিন্তা ও ভয়ের ছায়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল।

ঈষৎ শ্লেষ-মিশ্রিত ঘৃণার সুরে রুফাস-স্মিথ কহিল, "ভয় পেয়েচে কি না,—তাই এত তদারক করা হচ্চে! কেন যে ভয়, তাও ত আমার জান্‌তে বাকী নেই! ওর মতলব, কোন রকমে না ফাঁদে পড়ে! তোমার দিব্য, এমন লোক আমি আমার জন্মে কখনো আর দুটি দেখিনি!" কথা শেষ করিয়া রেলিংয়ের উপর পদাঙ্গুষ্ঠের ভর রাখিয়া হাত দুইখানা উচ্চে তুলিয়া কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "চলে এস! সাহসী কমাণ্ডার সাহেব, চলে এস!—পথ সাফ্‌ হয়ে গেছে। চোখের সাম্‌নে শত্রু কেউ নেই,—চলে এস।"

আমার মনে হইল, তাহার কথা শুনিয়া জেনারেলের মুখের সে ভয়ের ভাবটা যেন অনেকখানি কমিয়া গেল। কিন্তু দারুণ রোষে তাঁহার কৃশ শরীর বায়ু-তাড়িত বংশ-পত্রের মতই কম্পিত হইতেছিল। উছলিত

রক্তরাগে পাণ্ডু মুখখানা একেবারে রাঙ্গিয়া উঠিল। আমার উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র, যেন অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত জেনারেল বলিয়া উঠিলেন, "এ, কে, ওয়েষ্ট! তুমি? তুমি এখন কি মনে করে? এটাকেই বা সঙ্গে করে আন্‌লে কেন?"

তাঁহার মুখ ও ললাটের ঘন-অন্ধকার ছায়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া আত্ম-সমর্থনের জন্য কতকটা বিরক্তির সহিতই আমি উত্তর দিলাম, "আমি একে নিয়ে আসিনি,—লোকটী পথের ধারে বসেছিল, আপনার ঠিকানা খুঁজছিল, তাই তাকে বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছি।"

আমার সঙ্গীর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, দৃঢ় অনুজ্ঞাব্যঞ্জকস্বরে জেনারেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

আগন্তুক টুপি স্পর্শ করিয়া, অত্যন্ত সকরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে উত্তর দিল, "আমি মহারাণীর একজন পুরোন চাকর। ভারতবর্ষে আপনার মস্ত নাম শুনেছিলুম, তাই দুঃখের দশায় পড়ে, মনে হল, যদি আপনার সহিস্ কিম্বা মালীর দরকার হয়—"

গম্ভীর মুখে ঔদাসীন্যের সহিত জেনারেল উত্তর দিলেন, "দুঃখের বিষয়, আমি তোমার কোন সাহায্যই কর্‌তে পাচ্ছি না।" চোখে, মুখে, যথাসাধ্য দীনতার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া, ভিক্ষুকের প্রার্থনার সুরে, সে কহিল, "যদি তা না পারেন, ত কোন রকমে কিছু সাহায্য—আমায় করুন? আপনার একজন পুরোনো সঙ্গী, না খেতে পেয়ে মর্‌বে, এ কি সত্যই চোখে দেখ্‌তে পারবেন? দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে আমি সঙ্গে গিয়েছি,—গিরি-পথেও সৈন্যের সঙ্গে থেকে'চি—"

জেনারেল হিথারষ্টন তীক্ষ্ণ কঠোর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মুখে বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ, এই পরস্পর বিরোধীভাবগুলা নিমেষে ফুটিয়া উঠিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া লোকটা পুনরায় আরম্ভ করিল, "গজনীতে যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ছিল, তখনও আমি আপনার পাশে, চল্লিশ হাজার আফ্‌গান আমাদের কামানের মুখে বল্লেই হয়! আমার কথা মিথ্যে কি না—পরীক্ষা করুন। আপনার কাঁচা বয়সের সময় আপনার সঙ্গেই আমি এই সব কাজ করেচি, এখন আমরা বুড় হলুম,—মরণ তার বরফের মত সাদা ঠাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে, চুলের উপর ছাপ মেরে দিয়ে গেছে, এখন কি আমি আপনার এই এতবড় বাড়ীখানা থাক্‌তে, রাস্তার ধারে হ্যাংলা কুকুরের মত না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব?"

জেনারেলের ভাব-গম্ভীর মুখে ঘৃণা-মিশ্রিত দৃঢ়তার ছায়া ফুটিয়া উঠিল, "তুমি পাকা বদমাস্,—তুমি যদি সৎ সৈনিকের ন্যায় থাক্‌তে, আজ তাহলে কখনও পরের কাছে ভিখিরীর মত হাত্ পাততে হত না। আমি তোমায় একটি পয়সাও দেব না।"

জেনারেলকে বাটীর অভিমুখে ফিরিতে দেখিয়া লোকটা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর একটা কথা, মশায়, আমি তারাদা গিরিপথেও গেছ্‌লুম।"

বৃদ্ধ জেনারেল যেন সহসা বন্দুকের

গুলিতে আহত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মুখখানা মুহূর্ত্তে মৃত মুখের মতই বিবর্ণ হইয়া গেল। রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না,—কেবল অক্ষমতা-জনিত মানসিক আবেগে বুকটা ফেনোচ্ছ্বসিত সমুদ্র-বক্ষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, পলক-হীন নেত্রে তিনি আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন। কি একটা স্মৃতির তরঙ্গ যেন তাঁহার মনের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল! দুই হস্ত বক্ষে চাপিয়া, আগন্তুকের প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া কম্পিত, জড়িত স্বরে জেনারেল ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কি বল্‌চ তুমি?"

"আমি বলছিলুম মশায়,—যে, আমি গোলাপ সিং বলে একজনকে জানতুম।" নিষ্পেষিত দন্তের মধ্য দিয়া অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী মৃদু স্বরে কথা কয়টি উচ্চারিত হইবার সময় বক্তার মুখে ঈর্ষার যে বীভৎস ছায়া স্পষ্টতর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়!

এই কথা কয়টির ফল ফলিল কিন্তু আশ্চর্য্য রূপ! বক্তা যদি জেনারেলকে বিচলিত করিবার জন্য, অথবা ভয়-প্রদর্শনের জন্য উপরি-উক্ত কথা কয়টি বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অভীষ্ট-সাধনে সে সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছিল। জেনারেল দুই হস্তে ফটকের লৌহ রেইল ধরিয়া কোনরূপে আপনার পতনোন্মুখ দেহভার রক্ষা করিলেন। তাঁহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মুহূর্ত্তে যেন সর্পদষ্টের মত নীল মাড়িয়া গেল! কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌শক্তিও যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে উদ্বেগ-পীড়িত স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গোলাপসিং? কি করে তাঁকে জান্‌লে,—কে তুমি?" স্থির অকম্পিত কণ্ঠে আগন্তুক কহিল, "আমার মুখের পানে বেশ করে তাকান্ দেখি,—চল্লিশ বছর আগে আপনার চোখের যে জলুষ ছিল—অবশ্য এখন তা নেই!"

জেনারেল সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেই অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী অশুভ-দর্শন ভিক্ষুকটার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। পাণ্ডু মুখে আবার ঈষৎ রক্ত-সঞ্চালনের লালিমা দেখা দিল। বর্ষার বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের স্তর ভেদ করিয়া অস্তমান্ সূর্য্যের রাঙ্গা আলোটুকু যেন আকাশের গায় ছড়াইয়া পড়িল। ভাবহীন চক্ষের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ্! করপোর্য্যাল রুফাস্ স্মিথ তুমি?"

"হাঁ,—এতক্ষণে আপনি আমায় ঠিক্ চিন্‌তে পেরেচেন! আমি তাই ভাবছিলুম, বলি, চেনা লোককে চিন্‌তে মানুষের কত সময় লাগে! এখন আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে ফেলুন,—ভেতরে ঢুকি।"

সস্মিত মুখে কম্পিত হস্তে জেনারেল ধীরে ধীরে ফটক খুলিয়া দিলেন।

আমার মনে হইল, রুফাস স্মিথকে চিনিতে পারিয়া জেনারেল আশ্বস্ত হইলেও সন্তুষ্ট হন নাই। ফটক খুলিয়া দিয়া জেনারেল কহিলেন, "করপোর্য্যাল, আমি অনেক সময় তোমার কথা ভাবতুম,—তুমি বেঁচে আছ কি না? কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার কখনো যে দেখা হবে, এ সম্ভাবনার কথা কখনো কিন্তু আমার মনে ওঠে নি। এখন

বল দেখি, এই দীর্ঘ বছরগুলো কি করে কাটালে ?"

"কি করে কাটালুম ? মদ খেয়ে ! পেন্‌সনের টাকাটি যতদিন হাতে থাকে তোফা ভরপুর খাই, তার পর শেষ সিলিংটিও যখন কর্পূরের মত উবে যায়, তখনন ভিক্ষের ঝুলি ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি,—দু-এক গ্লাস যা যোগাড় হয় ! এ ছাড়া আমি আপনার খবরও সর্ব্বদা নিয়ে থাকি !"

এ সকল অবান্তর কথায় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনভিপ্রেত ভাবিয়া আমি অগ্রসর হইয়া জেনারেলকে বিদায় অভিবাদন করিয়া ফিরিতেছিলাম, সহসা চিন্তিত মুখে বিষণ্ণ ভাবে জেনারেল কহিলেন, "যেয়োনা ওয়েষ্ট ! দাঁড়াও, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। আমাদের এ সব ঘরাও কথার জন্য কিছু মনে করো না। এ সব ব্যাপারের কতকটা তুমি জানও,—আর হয়ত শীঘ্রই এর সঙ্গে তোমাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে।"

করপোর‍্যাল অত্যন্ত বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে,—তার মানে ? এ আবার এসে জুটল কেমন করে ?"

কণ্ঠস্বরের মৃদুতা-রক্ষার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া জেনারেল উত্তর দিলেন, "স্বেচ্ছায় ! স্বেচ্ছায় ! ইনি আমাদের প্রতিবাসী, আর আবশ্যক হলে আমাদের বিপদে সাহায্য কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।" ব্যাখ্যানটা স্মিথের কৌতূহলকে পূর্ণ না করিয়া বর্দ্ধিতই করিয়া তুলিল। আমার প্রতি তাহার গোলাকার চক্ষুর প্রশংসমান্ দৃষ্টি নিহিত করিয়া সে কহিল, "এটা যেন ঠিক্ মুরগী লড়াই ! আমি এমন অদ্ভুত কথা ত কখনো শুনিনি ?

কথা ফিরাইবার অভিপ্রায়ে বাধা দিয়া জেনারেল বলিলেন, "তুমি ত আমায় খুঁজে বার করেচ, এখন বল দেখি, আমার কাছে চাও কি ?"

"চাই কি ?—মাথা গুঁজে থাকবার জন্য বাড়ী,—পেটের জন্য খাবার, লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড়, আর সব চেয়ে—প্রধান, বেঁচে থাক্‌বার জন্য কিছু মদ।"

"বেশ, আমি রাজী ! কিন্তু আমারও কথা আছে,—এখানে নিয়মে থাক্‌তে হবে। মনে থাকে যেন, আমি জেনারেল—আর তুমি করপোর‍্যাল—তোমায়-আমায় প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ,—দ্বিতীয় বার এ কথা যেন তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে না হয়।"

করপোর‍্যাল সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া মিলিটারী নিয়মে জেনারেলকে অভিবাদন করিল।

জেনারেল কহিলেন, "আমি ভাবচি, পুরোনো মালীটাকে জবাব দিয়ে—তোমায় মালীর কাজ দেব। আর ব্রাণ্ডি—তা কিছু কিছু পাবে, তবে পরিমিত ! এখানে মাতাল কেউ নেই।"

করপোর‍্যাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি মদ, তামাক—আকিং কিছুই খান্ না ?" দৃঢ় কণ্ঠে জেনারেল উত্তর দিলেন, "না, কিছুই না।"

"তাহলে আমি বল্‌চি মশায়, আপনার শরীর—আর স্নায়ু, দুই-ই পাথরের চেয়ে শক্ত।

উটনির সময় ভিক্‌টোরিয়া ক্রশ লাভ করা নয়ে আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য হয় নি, তা খন আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি। আমি যদি চার ফোঁটা মদ না খেতুম, তা হলে কক্ষণো ত্তিরের পর রাত্তির সেই সব কথা শুন্‌তে হসও পেতুম না। শুন্‌লে—পাগল হয়ে তুম।"

সে কথা কানে না তুলিয়া জেনারেল মার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ওয়েষ্ট ! ই লোকটিকে আমার বাড়ী দেখিয়ে ওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ হলুম। যেমনই ীব হোক না,—আমি আমার কোন রাণো সঙ্গীকে ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছে ক'র না। বাস্তবিকই সেই কি না, পরীক্ষা কর্‌বার জই আমি প্রথমে ওর কথায় কান দিইনি। রপোর‍্যাল, তুমি হলের ভিতর যাও,—মিও এখনি যাচ্চি।"

একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নারেল কহিলেন, "আহা, বেচারা ! কটা লড়াইয়ের সময় গুলি লেগে লোকটার য়ের হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়, ডাক্তার পারেশন্ করে গুলি বার কর্‌তে চাইলে,—স্তু এমন বোকা আর একগুঁয়ে লোক ও, কিছুতেই সে গুলি বার কর্‌তে দিলে না। ই আফগানিস্থানের বন্ধুর পার্ব্বত্য পথের হসী যুবা সৈনিককে আমি যেন এখনও ষ্ট চোখের উপর দেখ্‌তে পাচ্চি। ওর ঙ্গে এমন কতকগুলো ঘটনায় আমি এক সঙ্গে ড়িয়ে আছি,—সময়ে সবই তুমি শুন্‌তে বে। এখন স্বভাবতঃই ওর উপর সহানুভূতি হচ্চে, সে জন্য ওর কিছু উপকারও কর্‌তে ইচ্ছে করছি। ও তোমাকে আমি এখানে আস্‌বার আগে কিছু বলেছিল ?"

"কোন কথাই না।" তাচ্ছল্যভাবে জেনারেল বলিলেন, "ওঃ !" বাহিরে তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করিলেও তাঁহার চোখে মুখে নিশ্চিন্ততার যে অভাব ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আমার চক্ষু এড়াইল না।

জেনারেল কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, সে হয় ত তোমার কাছে আমাদের পুরাকালের সব গল্পই করেচে। যাই হোক, তার আগমন আমার ক্ষুদ্র সংসারে বড় সহজ বিপ্লব বাধাবে না, চেহারাটি ত আর সুন্দর নয় ! বাড়ীর লোকেরা হয় ত ভয় পেয়ে গোলমাল লাগিয়ে দেবে ! দেখি, আমি ওর বন্দোবস্ত করে দি,—এখন তা হলে বিদায়—।" হাত নাড়িয়া আমায় বিদায় দিয়া, চিন্তা-মন্থর গতিতে জেনারেল ফটক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

জেনারেলের সুদীর্ঘ অবয়ব একেবারে দৃষ্টি পথের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলে, আমি একবার মূক কাষ্ঠময় প্রাচীরটার চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইলাম ! ভাষা-হীন জীবন হীন দারুময় আবরণ ! মরডণ্ট বা প্রিয়তমার কোন উদ্দেশই সে প্রদান করিতে পারিল না। হায় মানবের দুরাশা ! চলিতে চলিতেও আমি ফিরিয়া চাহিতে ছিলাম, যদি ফটকের ফাইলের ভিতর দিয়া দুইটি সুনীল নেত্রের মধুর দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও চোখে পড়ে !

ক্রমশঃ।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

সিন্ধু-তাণ্ডব

('পঞ্চচামর' ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক বাজাও মাদল
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল !

কিসের কারণ আকাশ ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্
নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু ! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—
মথন দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীত
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথ র তোমার
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়।

বিষের নিধান যে নীল্-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল্ পাগল !
উঠুক্ হে জয়জয়ন্তী তান ;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক্ নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার
কে হয় জোয়ার হাতীর মাহুত ?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্‌ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্ কেবল 'ববম্' 'ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ !
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায় !
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ !

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার হিয়ায় অতুল সোহাগ।

তিমির পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত্-সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর !

ভুবন-ভ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাব্জ-নীল !
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল।

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অনঘ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয়।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড় !

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
এসেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই !

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার !—
পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?
জগৎ-জয়ের মূরৎ সাগর !
মহৎ-ভয়ের মহৎ শরণ !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাট ও পাত

আমার 'পাত ও পলু' শীর্ষক প্রবন্ধে রেশম পোকার সহিত পাতের কিরূপ সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা তাহা দেখাইয়াছি। পাতের অপর নাম তঁত। মালদহ, রাজসাহী বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রেশমপ্রধান জেলাসমূহে প্রায় বার আনা ডাঙ্গার জমিতেই তঁতের চাষ হয় কারণ তঁত পাতা না খাইলে রেশম কীট (পলু) বাঁচে না। পূর্ব্বে প্রতি বিঘা তঁতের জমিতে খরচখরদা বাদে মোটের উপর ২০০ শত টাকা কৃষাণের লাভ থাকিত। কিন্তু সে দিন এখন চলিয়া গিয়াছে।

রেশম হইতে এই সমস্ত জেলার চারি পাঁচ সম্প্রদায় প্রতিপালিত হইতেছে, কেহ পলুপোকার খাদ্য তঁতগাছের আবাদ করে, কেহ রেশম পোকা প্রতিপালন করিয়া কোয়া তৈয়ার করে, কেহ রেশমের কোয়া খরিদ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, আবার কেহ বা রেশমের

সূতার ব্যবসা করে। এইরূপে অনেক সম্প্রদায় ইহা হইতে অন্নের সংস্থান করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন এই চারি জেলায় ৫।৬টী বড় বড় সাহেব কোম্পানীর কুঠী ছিল, এই সমস্ত কুঠীয়াল সাহেবগণের অত্যাচার ও জবরদস্তির অংশটা বাদ দিয়া উপকারের দিকটা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক কোম্পানীর কুঠিগুলিতে গড়ে প্রায় ৩০০ শত করিয়া লোক প্রতিপালিত হইত, এবং কোম্পানীর নিকট হইতে কৃষাণগণ সময়ে অসময়ে আবশ্যক মতন যথেষ্ট টাকা দাদন পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পাত ও পলুর চাষ করিতে পারিত এবং জমিদারেরও খাজনা পরিশোধ করিত। এই সমস্ত কোম্পানী ছাড়া গবর্ণমেণ্টেরও স্বতন্ত্র কৃষিবিভাগ আছে। ফারগুসন্ সাহেবের কুঠী ফেল হইলে রাইট এণ্ড এণ্ডারসন কোম্পানীর কুঠী চলিল, এই কোম্পানীর ব্যবসা মন্দা পড়ায় বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর অভ্যুদয় হইল; বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেলে লুইপ্যান কোম্পানী সেই স্থান দখল করিলেন, বিদেশী বণিকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধনী এই লুইপ্যান কোম্পানীও সম্প্রতি ফেল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভূত জমিদারী ও আসবার পত্র বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। বিদেশী বণিকগণ যখন অগ্রে দাদন দিয়া, পৃথক্ পাহারা বসাইয়া, পাতের আবাদ করাইয়া, পলু পুষিয়া সর্ব্বশেষে চড়া দরে কোয়া খরিদ করিয়াও ব্যবসা চালাইতে পারিলেন না তখন অন্যান্য ছোট ছোট স্বদেশী কারখানাগুলি যে ২।৪ বৎসরের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৈদেশিক রেশমই যে ভারতীয় রেশম নষ্ট করার একমাত্র কারণ তাহাও ঠিক নহে, কুঠিয়াল সাহেবগণ রেশম ব্যবসায়ী একচেটিয়া করিয়া, দাদন দিয়া, জবরদস্তি করিয়া কৃষাণকে পাতের চাষ করাইতে লাগিলেন, আপন ইচ্ছামত রেশম গুটির দর কম বেশী করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রজা উৎপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ পাত ও পলুর আবাদ কৌশলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। এই জন্যই ত লুইপ্যান কোম্পানীর বড় সাহেবকে, ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দুঃখ করিয়া বলিয়া যাইতে হইতেছে—"আমাদের ফ্রান্সে ধনীর ঘরে ২।৩ হাজার তাঁত চলে। আমি গত বৎসর হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সকল তাঁত চলিবার উপযুক্ত পরিমাণ রেশম বাঙ্গালা হইতে সরবরাহ করিতে পারিলাম না, এত দর বেশী দিয়াও কোয়া সংগ্রহ হইল না,—কাজে কাজেই আমাকে কোম্পানী তুলিয়া দিতে হইল,—কুঠিয়াল সাহেবের ম্যানেজার সাহেবগণ যদি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া একটু সাবধান হইতেন তাহা হইলে এক্ষণে আর বেশী দর দিয়াও রেশম কোয়া মিলান তাঁহাদের পক্ষে এত কষ্টকর হইয়া পড়িত না।"

কেবল কুঠিয়াল সাহেবগণের উৎপীড়নেই অনেক বেশমচাষী ক্রমেই পাতের জমি ভাঙ্গিয়া ধানের জমি করিয়া ফেলিয়াছে; কাজে কাজেই উৎপন্ন গড়পড়তাতেও কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দরে সে সময় কোয়া খরিদ করিলে কোম্পানীর কোন লোকসানের সম্ভাবনা ছিল না তাঁহারা নিজেদের খেয়াল বশতঃই সে সময় পাত ও পলুর চাষকে পাকে

ফেলিয়া অনেক স্থলে অত্যন্ত অল্প মূল্যে কোয়া খরিদ করিয়াছেন! প্রজাদিগের অবস্থা তত সচ্ছল নহে যে তাহারা এক বৎসর কোয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে বিশেষতঃ অধিকাংশ হিন্দু কৃষাণই পলু পোকার জীবন ধ্বংস করিয়া রেশম গুটী ঘরে বাঁধিয়া রাখা ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া মনে করে, আবার রেশম কীট উত্তাপে মারিয়া না রাখিলেও কোয়া ভাল থাকে না কোয়া কাটিয়া পোকা পাখাসমেত বাহির হইয়া পড়ে।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীর মুর্শিদাবাদে বা পূর্ব্ব রাঢ়ের পাতের জমী এখন কি করিয়া পাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে এইবার তাহাই বলিব। মুর্শিদাবাদ লাইন্ খোলার পর হইতে গঙ্গার পূর্ব্বধারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট জন্মাইতেছে। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম ধারে পশ্চিম মুর্শিদাবাদে পাটের চাষ আদৌ ছিল না, কি করিয়া পাট বুনিতে হয় তাহাও কৃষাণেরা ভাল জানিত না। ক্বচিৎ কোথাও কেহ সামান্য এক আধকাটা পাট বুনিত বটে কিন্তু কাচিতে না জানায় তাহা নষ্ট হইয়া যাইত। রাঢ়ের দক্ষিণভাগে কোন কোন চাষা শন কাচার ন্যায় পাট পচাইয়া ঘরে তুলিয়া আনিয়া এক একটি করিয়া বাছিয়া লইত। একজনে একদিনে যে পাট কাচিয়া ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিতে পারে একথা তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

গঙ্গার পশ্চিম ধারকেই আমি রাঢ় কহিতেছি, প্রকৃত রাঢ়ের মাটী অত্যন্ত কর্কশ ও আঁটাল। অতিরিক্ত পরিমাণ গোবরসার দিয়া দোআঁশ করিতে না পারিলে মধ্যরাঢ়ে পাটের গাছ লম্বা হয় না। কিন্তু পূর্ব্ব রাঢ় বা পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ডাঙ্গার মাটী মধ্যবঙ্গের মৃত্তিকার ন্যায় বেলে ও সরস। গঙ্গার বালি ও পলিতে অবশ্য এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; এই পূর্ব্বরাঢ়ের মধ্য দিয়াই এবার B. A. R. Railway line প্রস্তুত হইল এবং রেল রাস্তার দুই পার্শ্বে পাট-পচার উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর খাদও প্রস্তুত হইয়া আসিল।

এদিকে সাহেব দিগের কুঠী ফেল হওয়ায় কৃষাণগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে কি করিয়া তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইবে। যে পাতে বিঘা-প্রতি বৎসরে প্রায় দুইশত টাকা আয় হইত সেই পাত এক্ষণে গরু ও ছাগল দিয়া খাওয়াইতে হইতেছে। এখানকার এক এক কৃষকের আবাদের অর্দ্ধেকই প্রায় তুঁতের জমি, তাহারা এই সমস্ত আয়কর-ডাঙ্গায় কিরূপ ফসল উৎপন্ন করিয়া দিন গুজরান করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। এখনও যে সমস্ত ছোট ছোট কারখানা আছে সেখানকার প্রস্তুত রেশম মাড়োয়ারি মহাজনে খুব কমমূল্যে খরিদ করিতে আরম্ভ করায় সেগুলিও দিন দিন ফেল হইয়া যাইতেছে। গঙ্গার পূর্ব্ব ধারে পাটের আবাদ দেখিয়া পশ্চিম ধারের রাঢ়ের কৃষাণ পাতের জমিতে পাটের আবাদ হয় কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর কেহ কেহ পাতের জমি ভাঙ্গিয়া তাহাতে পাট বুনিয়া বিস্তর ফসল পাইয়াছে। এক্ষণে গ্রামের মধ্য দিয়া রেল চলিল, মৃত্তিকাও পাটের উপযুক্ত, আবার এদিকে তাহাদের চিরগৌরবের

পাতপলুর চাষও দিন দিন লোপ পাইতে চলিল, কাজেই রাঢ়ের কৃষাণ যে, পাটই জীবনের একমাত্র সম্বল ভাবিয়া পাটের চাষেই জীবন উৎসর্গ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাই তাহারা আজ মধ্যবঙ্গের কৃষাণের ন্যায় আপাতঃ মধুর জীবননাশক পাটের আবাদ দিন দিন বাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিদেশীর চক্রে নীলের ন্যায় পাটও বাঙ্গালা হইতে হয় ত একদিন অবসর গ্রহণ করিবে কিন্তু পাটছালভোজী মশকবাহিনী ম্যালেরিয়া চিরদিনের জন্য রাঢ়ের সুস্থ জীবন ধ্বংস করিতে তিল মাত্রও পরাঙ্মুখ থাকিবে না।

জমি সাধারণতঃ গরু ছাগল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক উঁচু পগার দিয়া পাতের ডাঙ্গা তৈয়ার করা হয়। এই সমস্ত ডাঙ্গার যেরূপ মাটী তাহাতে উত্তমরূপ পাট জন্মাইতে পারিবে এবং গঙ্গার বানেও এই সকল ডাঙ্গা ডুবিয়া যাইবে না।

আমি সম্প্রতি প্রাচীন গুপ্তরাজাদিগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের রাক্ষসীডাঙ্গা, রাজবাড়ী-ডাঙ্গা প্রভৃতি দেখিতে চাঁদপাড়া রাঙ্গামাটী আসিয়াছিলাম। গঙ্গার শাদা চরের মধ্যে চাঁদপাড়া রাঙ্গামাটীর তুঙ্গ গোলাপী মৃত্তিকা স্তূপ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রাজবাড়ীর ডাঙ্গা লইয়া সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর ও জেমোনাজাদিগের সহিত বিশেষ বিবাদ চলিতেছে। প্রভূত ধন সম্পত্তি রাজবাটীর ডাঙ্গায় নিহিত আছে সন্দেহে কেহই নিজেদের অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

এই পূর্ব্বরাঢ় রাঙ্গামাটী আসিয়া শুনিতে পাইলাম রেশমকুঠীর বড় কোম্পানী লুইপ্যান কোম্পানীও এবার ফেল হওয়ায় পাতের কৃষাণগণ আগামী সন হইতে সকলেই পাটের চাষ আরম্ভ করিবে এইরূপ কল্পনা করিতেছে।

বেহার পৃথক্ হইয়াছে, বাঙ্গল প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্ব রাঢ়ের এই কান্দী মহকুমাই রাজকর্ম্মচারিদিগের একটী স্বাস্থ্যকর সব-ডিবিসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাঢ়ের পূর্ব্বাংশে যদি শীঘ্রই পাটের আবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহা হইলে এ অঞ্চলও যে, ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়া পড়িবে কান্দীর 'non-malarial subdivision' নাম ঘুচিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কান্দীর অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে পাট আসিলে যশোহরকেও রাঢ়ের নিকট হার মানিতে হইবে।

মশকবাহিনী ম্যালেরিয়ার সহচর পাট এইরূপে রাঢ়ের পাতের জমিতে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিতেছে। এ অঞ্চলে পাতের জমিতে সুন্দর কার্পাস আবাদ হইতে পারে। এজন্য কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যদি স্থানীয় অন্যান্য জমিদারগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার সহিত যোগদান করেন তাহা হইলে তুলার চাষও এদিকে সহজেই বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।



ফলাফল

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

সতী-স্মৃতি

বিজন পল্লীর প্রান্তে ভাগীরথী তটে
লভিছ বিরাম কে গো তরুতল ছায় ?
জ্বলন্ত অনলজ্বালা হাসিমুখে সহি
সঁপিয়াছ দিব্যতনু স্বামীর চিতায় !
অলক্তক রাগে তব, সিঁথির সিঁদুরে—
এখনো ভূষিত যেন হেরি চারিধার
মনে হয় তব জ্যোতি শতবর্ষ ধরি
প্রভাতে, প্রদোষ-রাগে জাগে অনিবার।

হে দেবি, তোমার গাথা লোকমুখে শুনি,
মুগ্ধচিত্ত ; বাখানিয়া কি কহিব আর ?
সুমহান্ পতি-প্রেম—আত্মবিসর্জ্জন—
চিরদীপ্ত পুণ্যশ্লোক কাহিনী তোমার !
যতদিন এই বিশ্বে রবে রবিশশি
যতদিন সতীত্বের রহিবে আদর
যতদিন ফুটিবেক পুণ্য ফুলরাশি
ততদিন স্মৃতি তব—অমর সুন্দর।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

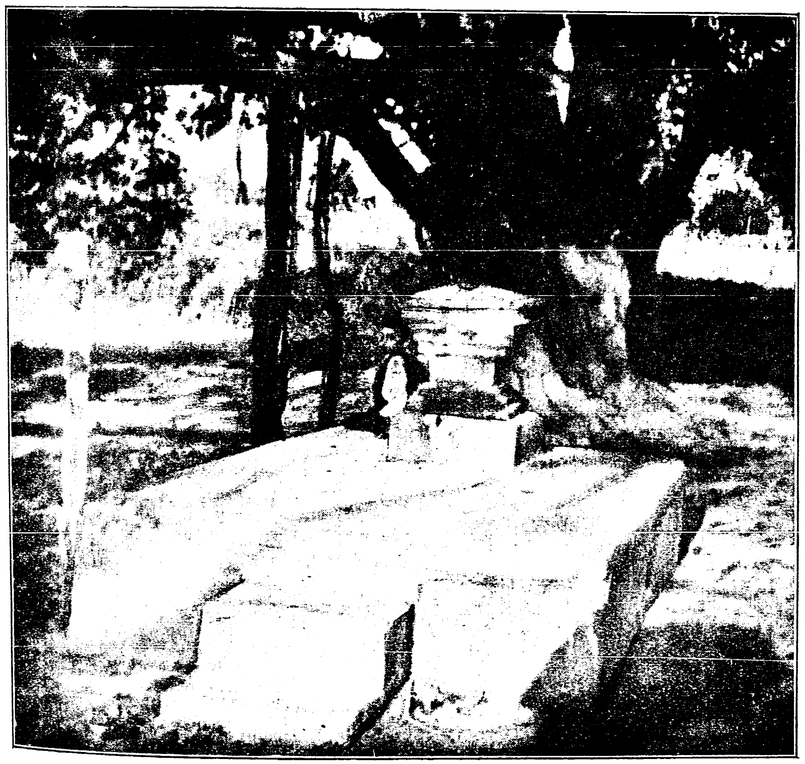

সতী-স্মৃতি *

* কবিকঙ্কণচণ্ডী বর্ণিত যে জগদ্দলগ্রামের নিকট দিয়া ভাগীরথী বক্ষে শ্রীমন্ত সওদাগর তাঁহার বাণিজ্য-পোত লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের শস্পশ্যামলা ভাগীরথী তীরে প্রাচীন হালদার বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ ৺বেচারাম হালদার কর্ত্তৃক তাঁহার মাতৃকুলের স্মৃতি-সম্মানার্থ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সতীবেদীটি স্থাপিত হয়।

সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী ?

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন গত মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় "সনেট-পঞ্চাশৎ" নামক পুস্তিকার সমালোচনা সূত্রে, সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে—"খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।"

নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখতে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্ত্তি ঢালাই করা চলে, এবং সে ছাঁচ এতই টেঁকসই যে বড় বড় কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙ্গেচুরে যায় নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দ্দশপদ গ্রহণ করে' জন্মলাভ কর্‌লে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অস্বীকার করা যায় না, যে বারো কিম্বা ষোলো না হয়ে, সনেটের পদসংখ্যা যে কেন চৌদ্দ হ'ল, তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কি কারণে সনেট চতুর্দ্দশপদী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে, এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার স্বপক্ষে কোনরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশী কিম্বা বিদেশী কোনরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই,—পিঙ্গল কিম্বা গৌর কোন আচার্য্যের পদসেবা আমি কখনও করিনি! সুতরাং আমার আলোচিত সনেটের "চতুর্দ্দশীত্ব" শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বল্‌তে পার্‌বেন।

চৌদ্দ কেন?—এ প্রশ্ন সনেটের বদলে বাঙ্গলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পার্‌ব।

আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশী। সুতরাং মাত্র অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সুযোগকে দ্বিগুণ করে' নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ্ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু'অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের সামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে—যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূত।

এই চৌদ্দ অক্ষর থাক্‌বার দরুণই বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই

সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখ্‌তে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বল্‌তে হবে এমন কোন রচনা কর্‌তে গেলে, বাঙ্গালী কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত, বাঙ্গলার কাব্য নাটক রচয়িতা মাত্রই, পূর্ব্বোক্ত কারণে, অসংখ্য পয়ার লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের মত, সনেটে চতুর্দ্দশ পদের একত্র সঙ্ঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।

বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে জীবজগৎ এবং কাব্যজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়, কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; দ্বিপদীই হচ্চে সকল দেশে সকল ভাষার আদিচ্ছন্দ। কলিযুগের ধর্ম্মের মত, অর্থাৎ বকের মত, কবিতা একপায়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই দ্বিপদী হতেই কাব্য জগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন? সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-প্রধান সনেটের গঠন-রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌তে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যা-বিশেষের উপর তার কোন নির্ভর নেই, তাই কোনরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখ্‌বার যো নেই।

দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ দ্বিপদীর মত পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর একটি চরণের অভাবে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর একটি ত্রিপদীর সান্নিধ্যলাভ কর্‌লে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাঙ্গলা সংস্কৃত ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ; কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর গঠন স্বতন্ত্র।

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে। ইতালীর ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বাপরযোগ কেবল মাত্র মিল-সূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড় হোক্ না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত, একটি কবিতার অন্তর্ভূত ত্রিপদী গুলি এই মিলনসূত্রে গ্রথিত, এবং ইস্কুর (Screw) পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে Robert Browning রচিত, "The Statue and the Bust" নামক কবিতা হতে, ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি

চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।* পাঠক দেখতে পাবেন, যে প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।

অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে, মধ্যস্থ একটি কিম্বা দুটি চরণ ডিঙ্গিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ রক্ষে করে,' চারটি চরণের মধ্যে দুজোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম! দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয় নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদবাকী যতপ্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙ্গচুর করে' নয় যোড়াতাড়া দিয়ে গড়া;—এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধ হয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।

কবিতার পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়ে একমূর্ত্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি—সেই কারণেই সনেট আকৃতি হিসাবে "সমগ্রতা একাগ্রতা" এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্তপদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্তপদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দ্দশপদ লাভ করেছে। এই চতুর্দ্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।

পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে' আস্ত দ্বিপদী বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ঐরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসী সনেটেও ঐ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়। ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছন্দ ব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলন সাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেই জন্য ফরাসী সনেটে ষষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে' চতুর্দ্দশপদী হতে বাধ্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

---

* There's a palace in Florence, the world knows well,
And a statue watches it from the square,
And this story of both do our townsmen tell.

Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East,
Asked, "Who rides by with the royal air?"

তুকারাম

১। ইক্ষুপ্রহার

ভক্ত তুকারাম সারাদিন ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলমাত্র এক আঁটি ইক্ষু সংগ্রহ করিলেন; দীর্ঘ দিনটা যে কি করিয়া কাটিয়া গেল তাহার কোনো খেয়ালই রহিল না।

ইক্ষুর আঁটি মাথায় লইয়া আপন মনে কত কি গাহিতে গাহিতে ক্ষেতের সরু আলি বাহিয়া গৃহের উদ্দেশ্যে চলিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। রাখাল ছেলেরা ধেনু লইয়া গোঠে ফিরিতেছে। পক্ষীরা নীড়ের সন্ধ্যানে সান্ধ্য আকাশ মুখর করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

"ওগো তুমি ইক্ষু লইয়া কোথায় চলিয়াছ? আমাকে দিবে না?"

ছেলের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

"এই যে, তোমাদের জন্যই আনিয়াছি, এই লও।"

'আমাকে একখানা', 'আমাকে একখানা'—

এমনি করিয়া সব ফুরাইয়া গেল।

বোঝা যতই হাল্কা হইতে চলিল, তুকারামের মুখে হাসির রেখা ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পত্নী জীজাবাইয়ের কথা আর মনে রহিল না।

সন্ধ্যাশেষে একখানি মাত্র ইক্ষু লইয়া কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া তুকারাম ডাকিলেন,

"ওগো, ইক্ষু পাইয়াছ?"

কথা শুনিয়াই স্ত্রীর শরীর জ্বলিয়া গেল। সারাদিনের পর মাত্র একখানা ইক্ষু, তার উপর আবার পরিহাস! অনেক দিন তিনি সহিয়াছেন, আজ আর তিনি সহিবেন না।

"দেখি" বলিয়া ইক্ষুখানি কাড়িয়া লইলেন। সেই ইক্ষুখণ্ড দ্বারা ভক্ত তুকারামের পৃষ্ঠে পত্নী জীজাবাই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আঘাত বড় জোরে জোরে বাজিতেছিল। ইক্ষু দুইখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

তুকারাম হাসিয়া বলিলেন,

"তুমিই আমার যথার্থ সাধ্বীপত্নী, তোমার কি প্রেম, আমি একখানিমাত্র ইক্ষু তোমাকে দিলাম, তুমি একা নিলে না, তাকে আবার দুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড আমাকে দিলে?"

২। ক্ষেতের পাহারা

ক্ষেত্রস্বামী বলিলেন,

"তুকারাম, তুমি আমাদের এই ক্ষেতে পাহারা দিবে, তোমায় কিছু কিছু দিব।"

তুকারাম আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিলেন;

"আচ্ছা, বেশত!"

"এই লও ঘাটি।"

ক্ষেত্রস্বামী তুকারামকে ঘাটি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিলেন।

প্রভাতে পাখীরা—কত রঙ বেরঙের, দলে দলে নাচিতে নাচিতে, কল কল ভাষে কত কথা কহিতে কহিতে ক্ষেতে আসিয়া পড়ে, শস্য খুঁটিয়া খায়। তুকারাম ভাবেন—

"আজ আমার ঘরে কত না অতিথি আসিয়াছেন!"

তুকারাম টোঙে বসিয়া ডাকিয়া বলেন,

"ওগো, আমার অতিথি সব, তোমরা যত পার আহার কর। আহা, তোমাদের ক্ষুধা পাইয়াছে!"

যখন পাখীরা শস্য খুঁটিতে খুঁটিতে দুপুর বেলা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র উদরও পূর্ণ হইয়া আসে—তুকারাম তখন ডাকিয়া বলেন,

"আহা, তোমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তোমাদের পিপাসা পাইয়াছে! আমার সঙ্গে চল, ক্ষেতের পাশে কূপ হইতে জল তুলিয়া দিতেছি।"

সাঁঝের বেলা গোধূলির গেরুয়া বসন যখন সোনার ক্ষেতের উপর আরও সোনালি ছড়াইয়া দেয়, পাখীরা কলরব করিয়া উঠে, তুকারাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিয়া বলেন,

"ওগো, দেখ রাত আসিয়াছে, এখন আর তোমরা চক্ষে দেখিবে না, তোমরা পথ হারাইয়া ফেলিবে, যাও এখন নীড়ে ফিরিয়া যাও, কল্য প্রভাত না হইতে হইতেই আসিবে, আমি সারারাত তোমাদের জন্য পাহারা দিব।"

* * *

বিশ্ব যাঁহার কুটুম্ব, সমস্ত বসুধা যাঁহার আপন, পৃথিবীর রত্নদ্বার পাহারা দেওয়া ত তাঁহারই সাজে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সনেট-সুন্দরী

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা॥
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র।
কলার শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র।
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা॥

সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি পরশে,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নিগ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে, নয়নের লোর॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সমালোচনা

সোণায় অরুচি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত। প্রকাশক, সান্যাল এণ্ড কোং, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি উপন্যাস। রচনায় কোন বিশেষত্ব নাই, উপাখ্যানও নিতান্ত মামুলি।

দেবব্রত। শ্রীযুক্ত কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। এখানি নাটক। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। নাটকখানি গিরিশচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ছন্দে রচিত। ছন্দ দুর্ব্বল, নাটকত্বও প্রস্ফুট হয় নাই।



চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম

সদ্ভাব-কুসুম। ৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত। এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কটন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক, কান্ত কবির রচনা। বালকবালিকাগণকে নীতি-শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি রচিত। অনাড়ম্বর বাঙ্গালী জীবনের কয়েকটি মিষ্ট সরল কাহিনীই কবিতা-গুলির প্রাণ, সে গুলি সদ্ভাবোদ্দীপক। ছেলেদের জন্য বলিয়া কাব্যরসকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা বা রসের স্থানে জল দেওয়া হয় নাই। কাহিনীগুলি কাব্যে সমুজ্জ্বল, উপদেশে স্নিগ্ধ, প্রাণারাম, কাজেই বালক-বালিকাগণের অবশ্য-পাঠ্য।

ফরাসী বীরাঙ্গনা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান্ দার্কের জীবনী ও কার্য্য-কলাপ-অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। জোয়ানের জীবনের ধারাবাহিক কাহিনীটি লেখক বেশ সুশৃঙ্খল-ভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন। ভাষা সতেজ, সরল, রচনা-ভঙ্গীতেও প্রাণ আছে। কাহিনীটিও তেমন নির্জ্জীব বা নীরস হয় নাই—কৌতূহল আগাগোড়াই উদ্রিক্ত থাকে। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ পরিপাটী, বাঁধাইও চমৎকার। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে, সেগুলির ছাপা সুন্দর। ত্রিবর্ণে রঞ্জিত ছবিখানি বাঁধাইয়া রাখিবার মত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনে জাতীয় সাহিত্যে একটা স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সঞ্চার হয়, কাজেই লেখকের উদ্যমের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত। শিলচর, এরিয়েন ট্রেডিং এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শিলচর এরিয়েন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। কবি ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান-ভাগ এই গ্রন্থে বেশ সরল মিঠা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। রচনা-ভঙ্গীটি সহজ, হৃদয়-গ্রাহী, কোথাও পণ্ডিতী হুঙ্কার নাই। আবাল-বৃদ্ধবনিতা এ গ্রন্থ-পাঠে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ঘনরামের 'মধুরকান্ত পদাবলীর'সহিত বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের তেমন পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না. অথচ ঘনরাম বঙ্গীয় আদি-কবিগণের অন্যতম। সম্প্রতি দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, বাঙ্গালী প্রাচীন কাব্যাদির সমাদর করিতে শিখিয়াছেন, তাই আশা হয়, নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে এ গ্রন্থের এক্ষণে সম্যক আদর হইবে। এ গ্রন্থে সঙ্কলক স্থানে স্থানে ঘনরামের মূল কবিতা-পংক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে পাঠক ঘনরামের কবিতার মাধুর্য্য, সরলতা ও স্বাভাবিকতার পরিচয় ত পাইবেনই, তদ্ভিন্ন অনুপ্রাস অলঙ্কারে 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য কতখানি সমুজ্জ্বল, তাহারও যথেষ্ট আভাস মিলিবে। গ্রন্থের ভূমিকায় ঘনরামের জীবন চরিত ও কাব্য-বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু আছে, সাহিত্য-হিসাবে সেটুকুর মূল্যও সামান্য নহে। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ও বাঁধাই মনোহর হইয়াছে। আশা করি, এ গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে বিরাজ করিবে।

স্নেহ-উপহার। কুমারী স্নেহলতার শুভ-পরিণয়ে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী বিরচিত।

সুভদ্রা। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা, বাঁধাই এক টাকা। সুভদ্রা আর্য্যনারীর উজ্জ্বল আদর্শ, মহাভারত-কাব্যের চরিত্রমুকুটমণিসমূহের অন্যতম। সুভদ্রার কাহিনী পুণ্যে সমুজ্জ্বল, তেজে মহীয়ান্, মমতায় সুমধুর, কাব্যে সুললিত। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সুভদ্রা-চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়া-ছেন; তাঁহার উদ্যম প্রশংসার্হ,—সুভদ্রা-জীবনের একটা ধারাবাহিক সুশৃঙ্খল কাহিনী বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের সম্মুখে ধরিয়া তিনি বাঙ্গালীর বিশেষতঃ বঙ্গীয় নারী-সমাজের সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। চরিত্র গঠনে আদর্শ-সংগ্রহের জন্য আমাদের অন্য দেশে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই,—ভারতের প্রাচীন কাব্যসমূহ বিবিধ চরিত্রের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে সুনিপুণ ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান লইলে কোন আদর্শেরই অভাব হইবে না। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুভদ্রার উজ্জ্বল আদর্শে বঙ্গরমণী অনুপ্রাণিত হউন, ইহাই আমাদিগের

কামনা। গ্রন্থে দুইখানি ছবি আছে, পরিকল্পনার সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

তপোবন। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক, সান্যাল এণ্ড কোং, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক। প্রায় পঞ্চাশতাধিক খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! অধিকাংশ কবিতারই ভাব উচ্চ, গম্ভীর, ভাষাও শুদ্ধ, সংযত। চটুলতা বা আবিলতা-দোষ কোনটিতেই নাই। বহু কবিতাতেই লেখকের স্ফুটনোন্মুখ কবি-শক্তির পরিচয় পাইলাম। কিন্তু বহু স্থলেই ভাব ঈষৎ উদ্দামভাবে ছুটিয়াছে। ভাবের রাশটি কবিকে আরও সংযত করিতে হইবে! তাহা করিতে পারিলে এই নবীন কবির ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ধ্যানলোক। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধা বারো আনা, কাপড়ে এক টাকা। এখানিও কবিতা-গ্রন্থ। তপোবন-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এ গ্রন্থ-সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযুজ্য।

নদীয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাণাঘাট, নদীয়া। কলিকাতা, ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে; ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সুতরাং 'নদীয়া কাহিনীর' সহিত যে বাঙ্গালীর কলঙ্ক-মুক্তির কাহিনী জড়িত হইল, ইহা বড় অল্প আনন্দের বিষয় নহে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতই রত্নস্বরূপ হইয়াছে। চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লেখকের সুগভীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম, সুনিয়ন্ত্রিত বর্ণনা শৃঙ্খলা যে কৌতূহল জাগাইয়া রাখিয়াছে, কোথাও তাহার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নাই। মহারাজ আদিশূরের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল অবধি নদীয়ার যে কাহিনী —সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্ম্মনৈতিক, ইতিহাস—ধারাবাহিকভাবে এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ, তাহা বিস্তৃত। বিষয়-সন্নিবেশেও লেখকের শক্তির পরিচয় পাইলাম। রচনার গুণে গ্রন্থখানি আগাগোড়া সরস হইয়াছে। বহু কাহিনীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালার অভ্যন্তরটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানিকে য়ুরোপীয় ধারা-মতে ঠিক ইতিহাস বলা যায় না; তবে ইতিহাসের মাল-মশলা ইহাতে প্রচুর সন্নিবিষ্ট আছে—গ্রন্থখানি Gazetteerএর অনুরূপ। গ্রন্থখানি যেন নদীয়ার পরিপূর্ণ মান-চিত্র, শুধু ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই, সেকাল হইতে এ-কালের নদীয়ার বিবিধ পরিবর্ত্তন দিয়া তুলির রেখায় সুস্পষ্ট আঁকিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এ রত্ন সঙ্কলন করিয়া লেখক বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীকণ্ঠ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী হইতে প্রকাশিত। বহুবাজার কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে পণ্ডিত মহাশয় মহাকবি ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত, এবং মালতীমাধবের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার অর্থ সম্যক আলোচনা। কবির বহু ভাব, বহু কথা সাধারণ পাঠকে অবশ্য বুঝিতে পারে না। সমালোচকের কর্ত্তব্য সেই সকল ভাব ও কথার সম্যক আলোচনা করিয়া তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সহিত পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া। এ বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে। সুশৃঙ্খল পর্য্যায়ে তিনি ভবভূতি রচিত নাটকাদির সংস্থান-বিন্যাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

Reg. No C. 523] ৩৭শ বর্ষ [All Rights Reserved.

আশ্বিন ১৩২০



সৌন্দর্য্যের রাণী।

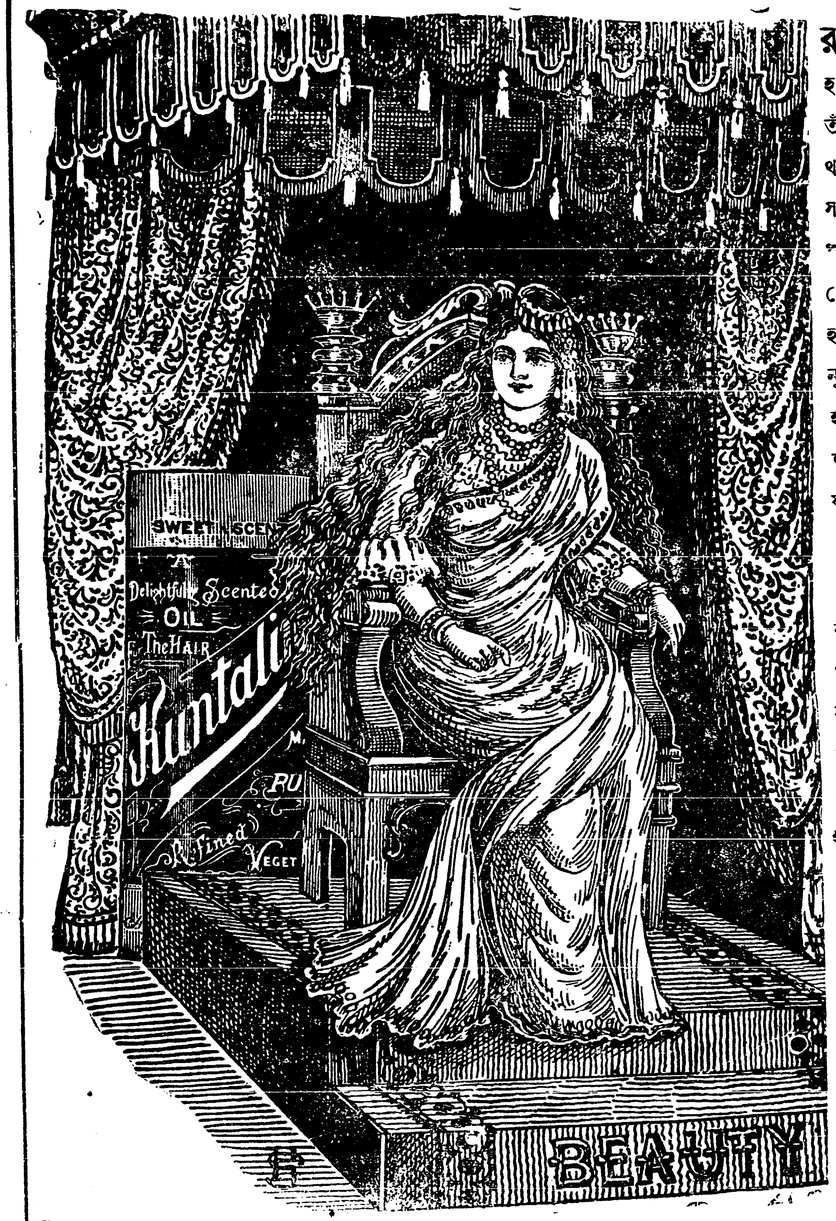

রমণীর মুখশ্রী
হউক, কেশে
তাঁহার সৌন্দর্য্য
থাকিয়া যায়।
সমাগমে তরুণ
পত্রপুষ্পে শোভি
সেইরূপ কুন্তলী
হারে নর-নারীর
নূতন কেশরাশি
হয়। যাঁহাদের
অকালে উঠিয়া য
যাইতেছে তাঁহারা

কুন্তলী

ব্যবহার করিলে,
পাইয়া সৌন্দর্য্যের
সনের অধিকারিণী
পারিবেন।
কেশ অল্প বা শো
হইয়া থাকিলে, য
আশঙ্কা থাকিলে,
কুন্তলীন ব্যবহার
তাহার উপ
নিশ্চয়ই বুঝিতে প
এ কথা সর্ব্বদা ম
কর্ত্তব্য যে, কুন্তলী
সৌন্দর্য্য-সিংহাস
রোহণের একমা

মূল্যাদি ঃ—

সুবাসিত	...	১
পদ্মগন্ধ	...	১৷৷০
গোলাপগন্ধ	...	২৲
ভায়োলেটগন্ধ	...	২৷৷০

এইচ বসু, পারফিউমার
দেলখোস হাউস, বহুবাজার কলিকাতা

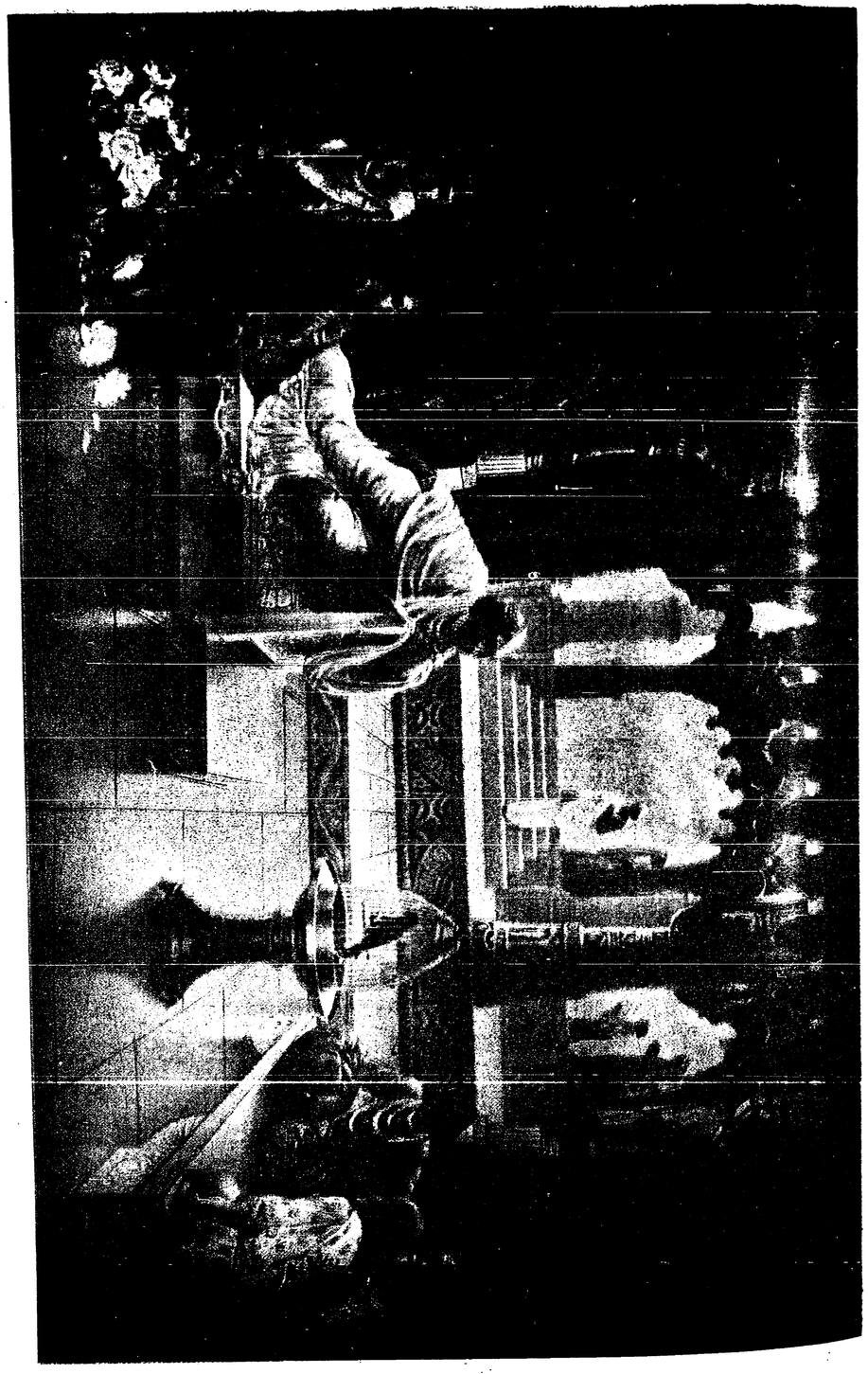

ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ।

শুক-শূদ্রক-সংবাদ।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২০ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শারদোদয়

শরতের রমণীয় ঊষা, নভনীল নেত্রোৎপল হ'তে
অশ্রুসব গিয়াছে ঝরিয়া, দীপ্ত স্বর্ণ কিরণের স্রোতে
মুক্ত প্রসারিত দলগুলি তার সীমা হতে অসীমায়
বিস্তীর্ণ নিলীন ; অজ্ঞাত উত্তর হতে নিশ্বাসের প্রায়
আসিতেছে হিমাণীর নব হিমবায়ু, কোন অজানার
বারতা বহিয়া, বক্ষোমাঝে সৃজন করিয়া বারম্বার
অপূর্ব্ব বেদনা, কামনা নূতন আশার অতীত লাগি !
মায়া স্পর্শে যায় মনের আড়াল, পায় প্রাণ অনুরাগী
আকাশের বুকের পরশ, হেরে ইন্দ্রজাল আলোকের,
বাতাসের মুগ্ধ আকর্ষণে নিত্য শোভা পূর্ণ ত্রিলোকের।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি বলিয়া একটা ন্যায়ের ফাঁকি আমরা আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দুইটারই উপরে অন্যায় ভাবে বহুকাল ধরিয়া প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি;—এবং সেই ফাঁকির বলে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এ দুইটার মধ্যে একটাও যে রক্ষা করা অথবা উন্নীত করা আমাদের মত সুশিক্ষিত জনের কর্ত্তব্য সেটা আমরা মন হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের মূর্ত্তি-অনুসন্ধান এবং আমাদের মূর্ত্তি-ভবন-স্থাপন এ দুটারই পশ্চাতে যদি স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের উন্নতি বা রক্ষা কল্পটা না থাকে, যদি সাহেবদের মত মূর্ত্তি সংগ্রহেরই বাতিক আমাদের সম্পূর্ণ চাগিয়া ওঠে অথচ মূর্ত্তি পূজার বা মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ লোপ পায় তবে সবই ব্যর্থ। দেশে একলক্ষ মূর্ত্তি সংগ্রহের সংবাদ আমরা পাইতে পারি—কিন্তু সেই সঙ্গে যদি স্থাপত্যের এবং ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি একটিও মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ আর না পাওয়া যায় তবে কাহার না ভয় হয়! স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য এ দুইটাই মিটিং করিয়া বিশ্বকর্ম্মার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে উৎসর্গ দিয়া আমরা যদি ভাবি আমাদের কাজ করিলাম, তবে এই উৎসর্গের ফলে আমাদের নিজের স্মৃতিটা যে উৎসন্ন দিবার জোগাড় করিয়া রাখিলাম সেটা নিশ্চয়। মানুষ আদিম বা অসভ্য অবস্থায় এবং চরম ও আমাদের মত অত্যধিক সভ্য অবস্থায় প্রায় একইরূপ ব্যবহার করে, অর্থাৎ সে সঞ্চয় করে, সঞ্চিতটা লইয়া খেলা করে, কিন্তু সেটিকে কাজে খাটায় না—অথবা যেটা যেমন কাজের উপযোগী সেটা দিয়া সেই কাজটা করাইয়া না লইয়া উল্টা কাজেই লাগায়; ভবিষ্যতের দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না, ভূতটার দিকে সে সসম্ভ্রমে—বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া—দৃষ্টিপাত করে এবং বর্ত্তমানের মধ্যেই কোনো-রকমে নিশ্চিন্তে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে।

আমরা যে আমাদের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য উভয়কেই ভূতের মধ্যে আর দুই ভূত বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎটা অতিশয় পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি, ইহার ফল যেদিন ফলিবে সেদিন আমাদের স্মৃতিটুকু আমাদের অনুসন্ধান অনুশাসনের জীর্ণ মাসপঞ্জীর ভিতরে কীটদষ্ট অবস্থায় ঘুণাক্ষর মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া বিরাজ করিবে;—কোন দেব-মন্দির আমাদের কীর্ত্তি-ধ্বজা, কোন রাজপ্রাসাদ আমাদের পঞ্চ অঙ্গুলির রাজ-টীকাঙ্ক বহন করিবে না। মূর্ত্তি যাহারা সৃজন করে, মন্দির যাহারা গড়িয়া তোলে তাহাদের উভয়কেই বাদ দিয়া মূর্ত্তি সম্বন্ধে গবেষণা ও মন্দির সম্বন্ধে তত্ত্বথৈবচতে বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু হইবার মত প্রয়োজনীয় যেটা সেটা একেবারেই হইয়া উঠিবার সুবিধা পায় না।

আমরা সগর-সন্তানদিগের মত পাতাল খুঁড়িয়া, মূর্ত্তি উদ্ধার করিতে খুবই উৎসাহ দেখাইতেছি, দেশের স্থাপত্যটাকে কলঙ্কের

জোরে অজর অমর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি কিন্তু হায়, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ সকল মূর্ত্তি গড়িয়াছে এবং এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ জগতের বক্ষে সুদৃঢ় করিয়া প্রোথিত করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য কি করিতেছি! যে দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধার করিতেছি সেই দীঘির ধারেই হয় ত মূর্ত্তি-রচয়িতার কোন বংশধর উপবাসে মরিতেছে, তাহার দিকে কি আমাদের দৃষ্টি কোনো দিন পড়িয়াছে? ভাঙা পাথর উঠাইয়া তাহাতে পাঁচ কিল দিলেই যে খুব আমাদের লাভ তা নয়, যে পাঁচ আঙুলে পাথর দেবতা হইয়া উঠে সেই পাঁচটি আঙুলের সন্ধান করিয়া দেখাতেই আমাদের ভাবী মঙ্গল। বিষ্ণুর চার হাতের পরিচয় ততটা প্রয়োজনীয় নয় যতটা বিষ্ণু মূর্ত্তি-রচয়িতার দুই হাতের বরাভয়। বিশ্বকর্ম্মার মাথায় ফুল চড়াইয়া পরকালের কোন কাজ হইবে না, যতদিন না কর্ম্মীর হাতের হাতুড়ি কালের ঘণ্টায় ঘা দিতেছে দেখি। আমরা মাটিই চষিতেছি, ফসল ফলাইবার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া। একদিন হঠাৎ দেখিব, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে; আমরা পিতৃপুরুষের জমীর উত্তরাধিকারী আছি, কিন্তু জমীতে আর ফসল ফলাইবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, উপায়ও দেখি না।

নিরর্থক এই যে মাটি খোঁড়া এটার অন্তরালে কপিলমুনির রোষাগ্নির মত যে একটা ভীষণ অভিসম্পাত লুকাইয়া আছে সেটা যেদিন আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে সেদিন সহস্র চেষ্টাতেও আমাদের রক্ষা হইবে না; এবং আমাদের বহু অনুসন্ধানের কাগজের বর্ম্ম ও যাদুঘরের তন্ত্রমন্ত্রের ফুৎকার কোনোই ফল দিবেনা। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। E. B. Havell মহোদয় তাঁহার নবপ্রকাশিত Indian Architecture (ভারতের স্থাপত্য) নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া যথাসময়ে সাবধান হইবার জন্যই যেন আমাদের আহ্বান করিয়াছেন। এই সুবৃহৎ পুস্তকে তিনি ভারতের তাবৎ মন্দির, প্রাসাদ, মঠ ও মসজিদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কৌশল এবং গঠন-ভঙ্গির ভিতর দিয়া ভারতীয় ভাব কেমন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রচার করিয়াছেন।

ফার্গুসন প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যে-সকল ভারতীয় ইমারতগুলিকে আরব্য, নহে ত, পারস্য বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিয়া বোকা বুঝাইয়া গিয়াছেন সেগুলা যে সম্পূর্ণ—কি নির্ম্মাণ-কৌশলে, কি ভাবে ভঙ্গিতে—আমাদের, এটা আজ আমরা প্রথম Havell সাহেবের নিকট হইতে লাভ করিলাম।

স্থাপত্য-শিল্পের অদ্বিতীয় মুকুটমণি আগ্রার তাজ। তাহাতে ভারত শিল্পীর যে কোনো অধিকার আছে এটা ফার্গুসণ প্রমুখ দেশী এবং বিদেশী কেহই স্বীকার করেন না; অথচ সেটি ভারত-ভাবসাগরে ডুব দিয়া আমাদেরই শিল্পীগণ একদিন উঠাইয়া আনিয়াছে। এটার সহস্র প্রমাণ Havell সাহেবের নিকট হইতে আমরা পাইতেছি। শুধু কথার প্রমাণ নয়, নির্ম্মাণ-কৌশলের এবং স্থাপন-বিধির তন্ন তন্ন চাক্ষুস প্রমাণ। আরব দেশীয় গুম্বজের সঙ্গে তাজের গুম্বজের যে কোনো সম্পর্ক নাই এবং তাজের বহুশত

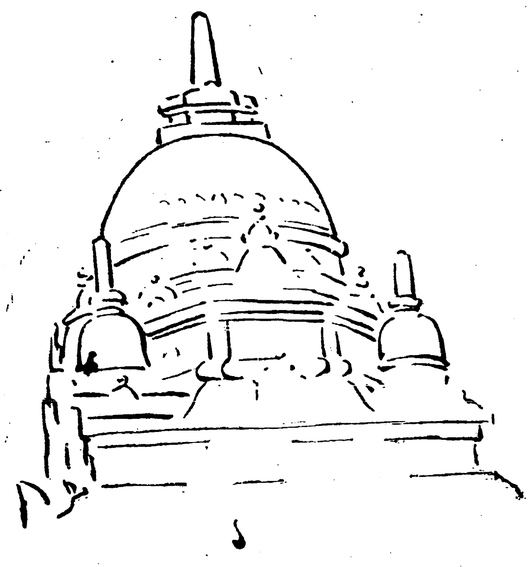

১

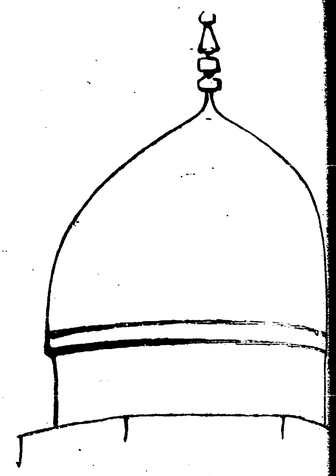

৪

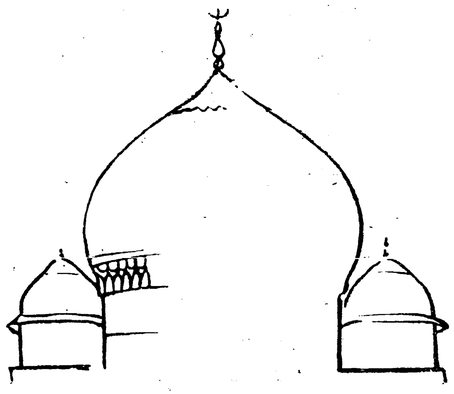

২

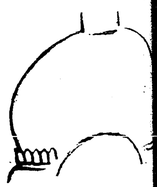

৩

খাঁটি আরব্য গুম্বজ, (৪নং চিত্র) গ্রীবার ন্যায় যে অংশ তাহার উপরে, সরলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে; তাহার গঠনে বৈচিত্র্য নাই বলিলেই চলে। তাজের গুম্বজের (২নং চিত্র) যে টলটলায়মান ভাব তাহা আরব্য গুম্বজে নাই ; সে সরলভাবে গ্রীবা হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ বিদ্ধ করে।

জল বিন্দুর মত টলায়মান সুডৌল গুম্বজের আদর্শ অজন্তাগুহায় (৩নং চিত্রে) প্রথম দেখা যায় এ গুম্বজটিকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে স্থাপন করার প্রথাও অজন্তার হিন্দু স্থপতিগণ প্রথম প্রচলিত করেন এবং তাজের গুম্বজ নির্ম্মাণের সময় যে এই পদ্মদলে শিশির বিন্দুর (মণি পদ্মে হুং) সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহা ২নং চিত্রে সুস্পষ্ট দেখা যায়। পদ্মদলের উপরে গুম্বজ স্থাপন কেবল ভারতেই দৃষ্ট হয়, অন্য কোথাও নহে। ইহা ছাড়া বড় গুম্বজের চারি কোণে ছোট চারিটি গুম্বজ স্থাপ

বৎসর পূর্ব্বের রচিত পঞ্চ রত্ন মন্দিরের সহিত তাহার যে নিগূঢ় সম্পর্ক সেটা তিনটি মাত্র চিত্র দিয়া Havell সাহেব অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। কি সুন্দর করিয়া Havell সাহেব আমাদের বুঝাইয়াছেন যে তাজ, আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন দিয়া গড়া নয়, কিন্তু আমাদের বহু শিল্পীর বহু সাধনার চরম সার্থকতা; এবং তাহার আদ্যন্ত সমস্তটা "ওঁ মণি পদ্মে হুঁম্" এই মহা মন্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের তাজ ভারতকে ফিরাইয়া দিয়া Havell সাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই ; তাঁহার পুস্তকের শেষ কয়েক পরিচ্ছেদ ভারত স্থাপত্য ও স্থপতি যে এখনও জীবিত এটা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে Havell সাহেবের Indian Architecture নামক বৃহৎ পুস্তকের সমালোচনা অসম্ভব এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নয়। কিন্তু মূর্ত্তি-ভবন-স্থাপন এবং যাদুমন্ত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ানোতে যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না সেই কথাই বলিতে চাহি।

ভারতবর্ষের স্থপতিগণের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি পরিচয়, স্থাপত্য পাণ্ডিত্যাভিনয়, এবং যাদুঘরের ভেল্কি বাজি আমাদের আসল কাজ নয়। আসল—কাজ যাহাকে পদতলে রাখিয়াছি তাহাকে উঠাইয়া লই, যেটা ছিল সেটা এখন কোথায় আছে অনুসন্ধান করি। বঙ্গভূমির যথার্থ গৌরবের দিন সেদিন আসিবে যেদিন আজ যেটা ভূমিসাৎ রহিয়াছে তাহার উপরে আবার ভারত স্থাপত্য ভাস্কর্য্য মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। ভাঙা মূর্ত্তির ধূলা ঝাড়িয়া তত লাভ নাই, যত লাভ যাহারা মূর্ত্তিকে গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের ধূলা, শীর্ণ মুখের মলিনতা ঘুচাইয়া দেওয়াতে। যতদিন তাহা না করি ততদিন আমাদের মূর্ত্তি-ভবন ভগ্নমূর্ত্তির অকেজো গুদাম ঘর ছাড়া আর কিছু নয়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ নিজের উপাসনা গৃহের সোপান-তলে ভারতের দেবমূর্ত্তিগুলা সযত্নে রক্ষা করিয়া ভারত শিল্পের জন্য যতটা করিয়া ছিলেন আমরা তাহার অধিক কিছু করিব না গুদাম ঘরে ভগ্নমূর্ত্তি কোণ-ঠাসা করিয়া। মূর্ত্তি রচয়িতা মন্দির নির্ম্মাতাদিগের উপরে ঔরঙ্গজেবের বিষদৃষ্টির একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যে ভাবে তাহাদের উপর দৃষ্টি করিতেছি তাহার কোন অর্থই নাই—স্বার্থের দিক দিয়াও নয় পরার্থের দিক দিয়াও নয়। ভগ্নমূর্ত্তির পরিচয়ের সঙ্গে নব নব মূর্ত্তি-রচয়িতার পরিচয়, প্রাচীন স্থাপত্যের সঙ্গে স্থপতিগণের সন্ধান যতদিন না আমরা পাই ততদিন আমাদের শ্রমে সার্থকতা লাভ দুর্ঘট।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথাও সম্পূর্ণ ভারতীয়। তাজের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বের রচিত সিংহলের চণ্ডী-শিব নামক পঞ্চচূড় বা পঞ্চরত্ন মন্দির এই প্রথায় গঠিত (১নং চিত্র)। এই পঞ্চচূড় বা পঞ্চরত্ন প্রথা তাজেও সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র হইতে এটা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

গঠনে তাজের গুম্বজ জগতের তাবৎ গুম্বজের সহিত পৃথক—এটা ফার্গুসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেটা ভারতের পঞ্চরত্ন মন্দিরের অনুরূপ এবং কি ভাবে বা গঠনে তাহা অজন্তাগুহার গুম্বজটির প্রতিরূপ তাহা কি ফার্গুসন কি আমরা কেহই এতদিন অনুভব করি নাই! এক মাত্র Havell সাহেব সেটার দিকে জগতের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিয়াছেন।

মহাসরস্বতী *

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা ! চিত্তময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি ঊষা-প্রভা।
সূর্য্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্নিমেষ ও তব নয়ন ;
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব।
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব
পুরাতনে নবীয়ান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ,—
ব্যাপ্ত পরিবেষ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !

---

* "ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতী ঘনান্ত-বিলসৎ সিতাংশু-তুল্য-প্রভাং।
গৌরীদেহ-সমুদ্ভবাং ত্রিনয়নাং আধার ভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতী মনুভজেৎ শুম্ভাদি দৈত্যার্দ্দিনীম্ ॥"

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খ ধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান, —
পুলকি' পরাণ ! —
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে !

মহাসঙ্গীতের রূপে' গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ, —
তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ —তখনি তো মহালক্ষ্মীলাভ।
দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা ! রক্তরশ্মি রুষ্টতারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে।
কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা।

দেবাসুর দ্বন্দ্বে দেবী ! সদ্যোজাত বজ্রের গর্জ্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে।
সিন্ধু হ'তে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।
সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি।

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবী ! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী ;
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য-গুর্ব্বিণী !

অগস্ত্যের যাত্রা পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ
তুমি দুর্গমের স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈব অসন্তোষ।

রুদ্রের দুহিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবিচিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক্
তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।

দুর্লভের গূঢ় তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা !
নক্ষত্র অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী-মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।
দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী ! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
হে অপরাজিতা !

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;

এস গো সত্যের উষা ! অসত্যের প্রলয় প্রদোষ !
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ ;
পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী.—পাপে ছন্নমতি ;
মহাসরস্বতী।

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃ কুণ্ড উঠিছে প্রধূমি'।
এস ভব্য-অনুকূলা ! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে
রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বর্জ্জিল যে হিমালয়-পারে।
ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তসুখ ! আত্মার আরাম !
কর পূর্ণকাম।
ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাশ্বতী !
বিশ্ব-বিম্ববতী !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৯)

গুজরাট ও গুজরাটী

গুজরাটের আবহাওয়া আমার তেমন পছন্দ হয় নাই কিন্তু গুজরাটীদের মধ্যে অনেকের সহিত আমার হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। কি ভাষা, কি লোকদের রীতি বিচিত্র, গুজরাটী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, যেন বাঙ্গলার একখণ্ড পশ্চিম ভারতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিস গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ আমার প্রথম কর্ম্মস্থান। এই সহর সাবরমতী নদীতীরে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ্রগণ্য। সহরের প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিম প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত, ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ, ইহার চৌদ্দটি প্রবেশদ্বার আর অনেকগুলি বুরুজ ও স্তম্ভে এই প্রাচীর সুসজ্জিত। আহমদাবাদের উপর দিয়া বহুতর রাজবংশের উপদ্রব গিয়াছে—মুসলমান, মোগল, মারাঠী—অবশেষে পেশওয়া রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে

ইহা ইংরাজরাজের হস্তগত হয় (১৮১৮)।

আহমদাবাদ জরির কাজ, রেশমের কাজ আর যন্ত্র ও হাতচরখায় তৈয়ারি সুতার কাপড়, এই তিনের জন্য প্রসিদ্ধ। কথায় বলে ইহার ভাগ্যগ্রন্থি তিন সূত্রে বাঁধা—সোনা রেশম ও তুলা। অনেকগুলি কাপড়ের মিলে সহস্র সহস্র শ্রমজীবি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নসকল সহরের স্থানে স্থানে ছাড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে কা

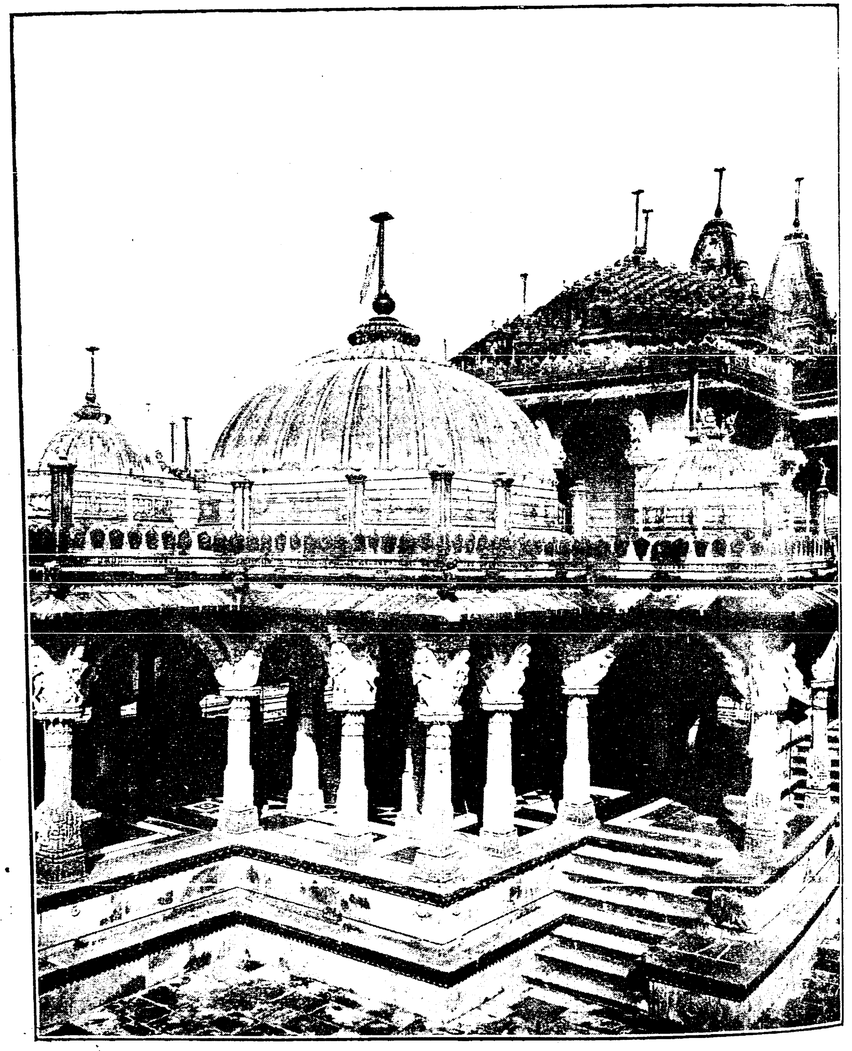

জুম্মা মসজিদ—আহমদাবাদ

কার্য্যময় মসজিদ, সমাধিমন্দির, তিনদরজা, কূপবাপী প্রভৃতি অনেকগুলি দর্শনীয় জিনিস আছে।

আমি প্রথমে যখন আহমাদাবাদে যাই সে সময়ে আমার যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দুইজন আমার বিশেষ স্মরণীয়, ভোলানাথ সারাভাই ও রণছোড়লাল ছোটালাল। ভোলানাথের নামে আহমদাবাদের প্রার্থনা সমাজ মনে পড়ে, যাহার সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন সংগ্রথিত। তিনি এই প্রার্থনা সমাজের অধ্যক্ষ, সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইহার উন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল ছিলেন। এখানে আমি যে সকল

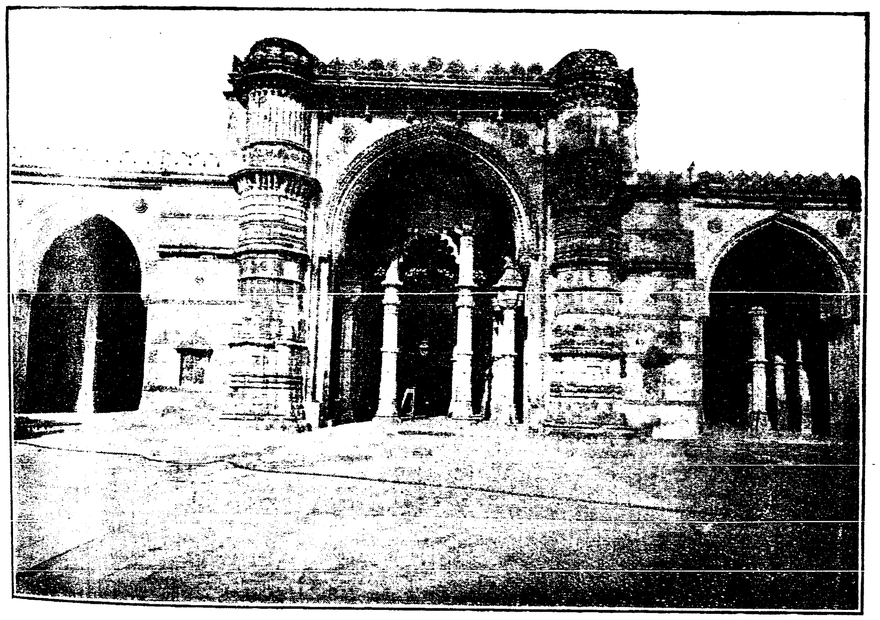

তিন দরজা—আহমদাবাদ

বক্তৃতা দিতাম তিনি তাহা শুদ্ধ গুজরাটীতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিতেন, এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। একবার তিনি তাঁহার কন্যা জিতোবাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসেন, আমরা আমাদের এক বহির্ব্বাটীতে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমার পিতৃদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল সাধুভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কন্যাও আমাদের অন্তঃপুরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাটী ধরণের রুটী ও তরকারী করিয়া খাওয়াইতেন, আমাদের খুব ভাল লাগিত, এমন পরিপাটী মোলায়েম রুটী কি কৌশলে তৈয়ার হয় সবাই জানিতে উৎসুক; মেয়েরা অবশ্য সে গুপ্তমন্ত্র শিখিয়া লইতে বিলম্ব করেন নাই, তা' বল বাহুল্য।

উপরে ভোলানাথের সহযোগী রণছোড়লালের নামোল্লেখ করিয়াছি—ধর্ম্মপ্রাণ ভোলানাথ আর বণিকবৃত্তি রণছোড়লাল এঁরা দুজন স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। রণছোড়লাল বিষয়বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য বণিক, সহরের শ্রীসমৃদ্ধি-বর্দ্ধনে কায়মনে তৎপর ছিলেন। ভোলানাথ ভাইয়ের দুইপুত্র। জ্যেষ্ঠ নরসিংহ রাও প্রাদেশিক সিবিল সর্ব্বিসে ছিলেন; অনেক সময় আমরা এক ষ্টেসনে, তিনি রেবেন্যু আমি জুড়িস্যাল বিভাগে কর্ম্ম করিতাম, এক্ষণে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণরাও (মনুভাই) ব্যারিষ্টর হইয়া আসিয়া আহমদাবাদে কর্ম্ম করিতেছেন। রণছোড়লালের পৌত্র চিনুভাই

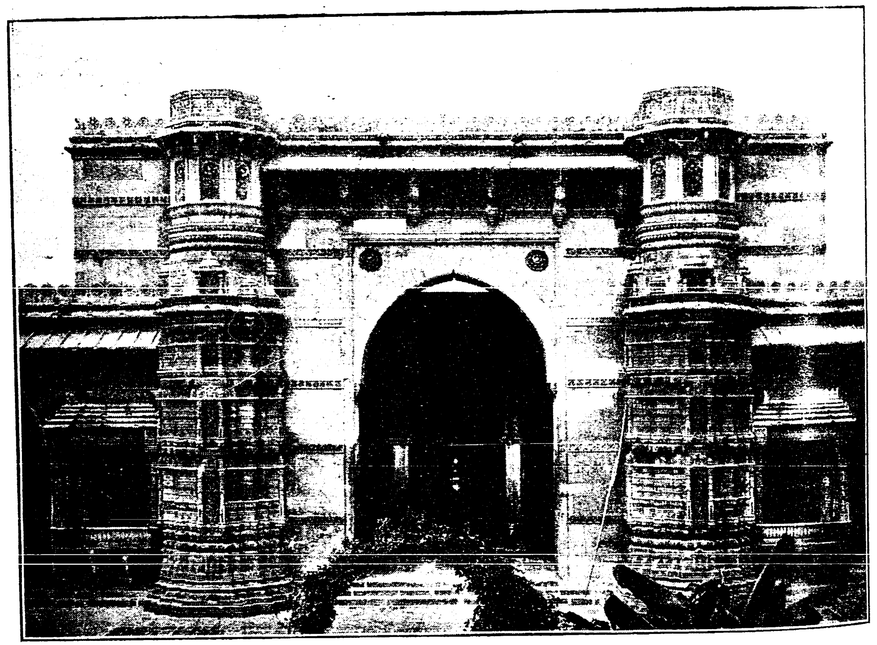

রাণী রূপাবতীর মসজিদ—আহমদাবাদ

তাঁহার পিতার বিয়োগে পিতামহের আসন অধিকার করিয়াছেন। চিনুভাই সম্প্রতি স্বজাতির মধ্যে প্রথম ব্যারণেট পদবী লাভ করিয়াছেন, প্রথম হিন্দু ব্যারণেট বলিয়া তিনি অভিনন্দনীয়। তিনি যে নাইটের পদ হইতে ব্যারণেট পদে অধিরূঢ় হইলেন সে তাঁহার নিজগুণে। দেশহিতৈষিতা, কর্ম্মক্ষমতা, দানশীলতা, এই সকল গুণে তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছেন।

এদেশে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে ব্যারণেট উপাধি পান তিনি বোম্বায়ের খ্যাতনামা পারসী, স্যার জমসদজী জিজিভাই। তাঁহার নামে সাম্রাজ্ঞীর যে আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হয় তার তারিখ ১৮৫৮ সাল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যারণেট—তাঁরাও বোম্বাই-বাসী পারসী। চতুর্থ ব্যারণেট করিমভাই ইব্রাহিম বোম্বাইবাসী মুসলমান, ১৯১০ সালে তাঁহার এই পদোন্নতি হয়। উল্লিখিত চিনুভাই



মোহাফেজ খাঁ মসজিদ—আহমদাবাদ

মাধবলাল পঞ্চম ব্যারণেট। ইহারা পাঁচ জনেই ব্যবসাদার ধনপতি—দানে মুক্ত হস্ত। পাঁচজনেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোক। আশ্চর্য্য এই যে বোম্বায়ের কপালে এই স্পৃহণীয় রাজটীকা পড়িয়াছে, এ পর্য্যন্ত ঐ প্রেসিডেন্সির বাহিরে যায় নাই।

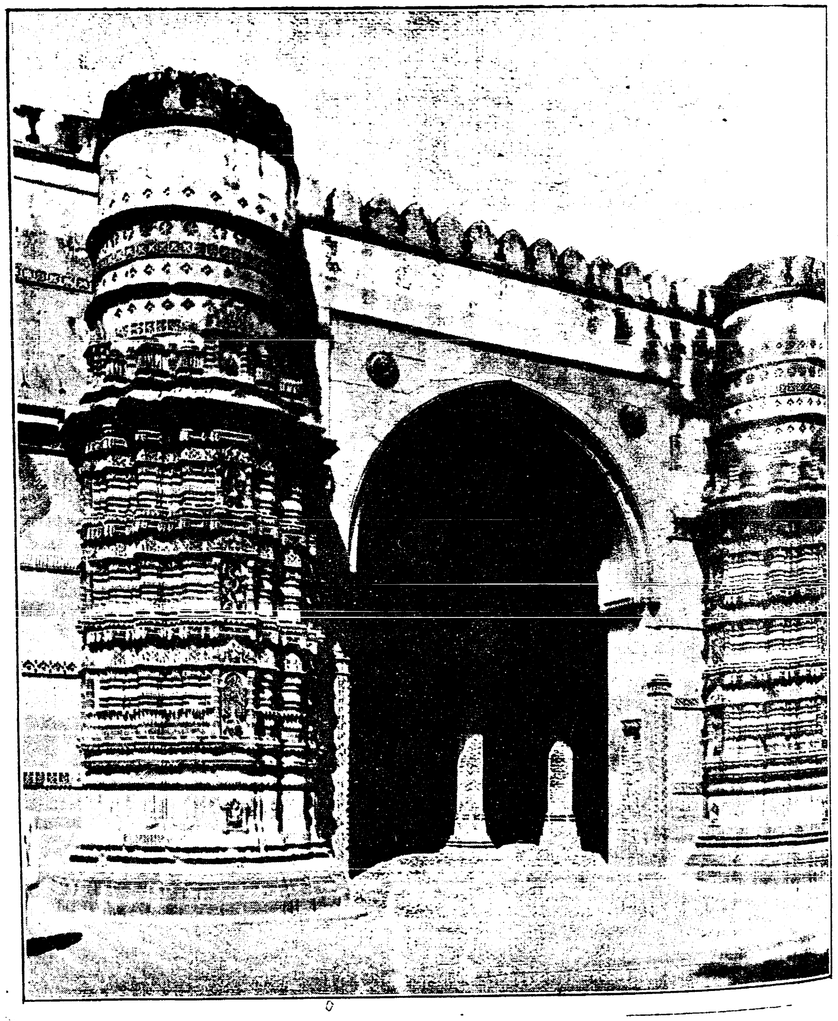

জুম্মামসজিদের এক অংশ—আহমদাবাদ

মেরি কার্পেণ্টর

আমি আহমদাবাদ যাইবার কিছু পূর্ব্বে স্বনামখ্যাত Miss Mary Carpenter আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়

। রাজা রামমোহন রায় াহার শেষ জীবনে কার্পেণ্টর-রিবার মধ্যে বাস করেন এবং ন তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া ূর্ণ হইয়া পড়িলেন তখন াহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া াহার সেবাশুশ্রূষায় কায়মনে ৎপর ছিলেন। সে সময়কার া কুমারী কার্পেণ্টর তাঁহার Last days of Raja Rammohan Ray" গ্রন্থে কাশ করিয়াছেন। রাজার ঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইয়া অবধি দেশের লোকের প্রতি তাঁর কটা টান জন্মে। আমি ও আমার বন্ধু মনোমোহন ঘোষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই. তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম ও আমাদের দেশের তখনকার সামাজিক অবস্থা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। এই সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের নানা কথাবার্ত্তা হইত। তিনি এদেশে আসিবার প্রবল ইচ্ছা জানাইলেন। তখন তিনি তাঁহার মধ্যবয়স পার হইয়াছেন; পরিণত বয়সে এদেশে আসা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে, এই বলিয়া অনেকে তাঁহার মত ফিরাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি বোম্বায়ে আসিয়া আমাদের আহমদাবাদ ভবনে



ভোলানাথ সারাভাই

কিছুকাল অতিথি হইয়া রহিলেন। নাগরিকেরা সাধ্যমত তাঁহার আদরসৎকারে তৎপর হইল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে সকলেই ব্যগ্র, সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে উৎসুক। একজন আহেলাবিলাতী রমণী, এদেশ সম্বন্ধে যাঁর কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, তাঁহার নবীন চক্ষে আমাদের দেশীয় ভাব কেমন লাগে স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন পাইতাম। তাঁহাকে সেখানকার দেবালয় সকল দেখিতে লইয়া যাইতাম, তিনি ঠাকুর দর্শন করিয়া বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিতেন—"বুৎপরস্ত" ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইত। কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে গিয়া বাড়ীর মেয়েদের দেখিতে চাহিলে গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া

আপনার স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিতেন। অবশ্য স্বভাষায় আলাপ করিবার সুবিধা হইত না, দোভাষী রাখিয়া যতদূর সম্ভব তাহাই হইত। মনে পড়ে একদিন তিনি সহরের একটি বিশিষ্ট লোকের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি যান। গৃহস্বামী তাঁহাকে আপন স্ত্রী পরিবারের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছেন



চিনুভাই রণছোড়লাল

ইনি আমার স্ত্রী—Mrs B (No 1)

মিস কার্পেণ্টার সহাস্য বদনে তাঁহার হিত shakehand করিলেন।

ইনি Mrs B (No 2)

মিস কার্পেণ্টার চমকিয়া উঠিয়া অবাক্ ইয়া চাহিয়া রহিলেন, হাত বাড়াইতে আর াজী হইলেন না।

এই Mrs B—(No 3)

মিস কার্পেণ্টার মূর্চ্ছিত প্রায়—কিঞ্চিৎ কৃতিস্থ হইয়া বাহিরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন।

মনে মনে ভাবিলেন —How Shocking! ক বীভৎস কাণ্ড। নি যদি বাঙ্গলাদেশে পত্নীক কোন জলজ্যান্ত লীন দেখিতেন—না নি কি করিতেন—! াহাকে বায়ুগ্রস্ত উন্মাদ াবিয়া তাহা হইতে হাত দূরে যাইতেন দেহ নাই।

Miss Carpenter ন কলিকাতায় আসেন নেকে তাঁহাকে ষ্টেশনে য়া অভ্যর্থনা করিলেন। ন কলিকাতায় পালকী রিয়া যাওয়া-আসার তি ছিল। এক জায়গায় াহাকে একটা সুঁড়ী ায় যাইতে হইয়া- সেখানে পালকী রিয়া না গেলে যাওয়া যায় না; কিন্তু Miss Carpenter কোন মতে পালকীতে উঠিতে চান না, মানুষের কাঁধে চাপিয়া যাওয়া কিছুতেই তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলেন, পালকী চড়িতে রাজী হইলেন না।

কলিকাতায় আসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বন্ধুটিকে অনেক সাধ্যসাধনা করা গেল কিন্তু তিনি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—



মেরি কার্পেণ্টার

"Miss Carpenter, I am sure you will be disappointed"—

Miss C. কি, তুমি বল কি ? আমাদের দেশের লোকেরা আপনার স্ত্রীর কথা কত গর্ব্ব করিয়া বলে—তাদের চোখে আপনার স্ত্রী রমণীকুলের সেরা, অন্য কোন নারী রূপে-গুণে তার সমান নয়।

B. কিন্তু দেখুন আমাদের দশা অন্যরূপ।

Miss C. কেন ?

B. আমরা ত আর পছন্দ করে বিয়ে করি না, আমাদের বাপ মা মেয়ে পছন্দ করে এনে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেন।

Miss C. আচ্ছা বল দেখি, কোন্ নিয়ম ভাল ? বিয়ের জন্য পরের চোখে মেয়ে পছন্দ করতে কি কোন পুরুষের মন যায় ? তার চেয়ে নিজে দেখে শুনে মনের মত মেয়ে বিয়ে করাতে কত সুখ !

B. কি করি নাচার ! দেশাচারে আমাদের হাত পা বাঁধা।

Miss Carpenter কে কাজেই নিরুত্তর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

সে যাহাই হৌক্ Miss Carpenter-এর মত ভারত হিতৈষিণী বিদুষী নারীরত্ন দুর্লভ। সেই দূর দেশ হইতে এই বয়সে কেবল আমাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে এদেশে আসাই তাঁর ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল, আমাদের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, আমাদের মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতি হয় সে জন্য তিনি প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু তিনি যে বদ্ধ সংস্কার লইয়া এই প্রৌঢ় বয়সে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহার সহিত দেশবাসীগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রত্যাশা করা বৃথা। রামমোহন রায়কে বাঙ্গালীদের নমুনা ভাবি তাঁহার মনে যে উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছি এদেশে তাহার অনুরূপ দেখিতে পাইবে না। তিনি ভাবিয়াছিলেন এক—দেখিবে আর, তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল !

জৈন সম্প্রদায়

আহমদাবাদে অনেক জৈন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও অন্যান্যস্থানে জৈনপন্থীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—গুজরাট তাহাদের এক প্রধান আড্ডা। সব মিলিয়া জৈন সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ হইবে। তাহাদের অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যাঙ্কিং কাজে নিযুক্ত। জৈন চাষা প্রায় দেখা যায় না, জীবহত্যার ভয়ে তাহারা লাঙ্গল ধরিতে নারাজ। আহামদাবাদে দেখিলাম জৈন ও বৈষ্ণবেরা মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে বাস করিতেছে ; তাহাদের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধও বিরল নহে, কেবল ওরূপ মিশ্র বিবাহে বরকন্যা উভয় পক্ষের একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে হয়, যেমন রোমান ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্টেণ্ট বিবাহে হইয়া থাকে কতকটা সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে কন্যাকে বরের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুঘরের কন্যা বিবাহের পর হইতে জৈনমন্দিরে ও জৈনকন্যা বৈষ্ণব মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিয় থাকে।

আহমদাবাদের নগরশেঠ প্রেমাভাই হেমাভাই নামে একটি সম্ভ্রান্ত জৈনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল—তাঁহার সহিত জৈনধর্ম্ম লইয়া অনেক আলোচনা হইত। তিনি

ঈশ্বরবাদের পক্ষ হইয়া অনেক সময় তর্ক করিতেন—তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইত জৈনেরা হীনযান বৌদ্ধদের মত নিরীশ্বরবাদী—জগৎ অনাদিকাল হইতে আপনাপনি চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সৃষ্টিকর্ত্তা তাহারা স্বীকার করে না। কিন্তু জৈনদের দার্শনিক মতের ঠিক নাই। তাহারা বলে, কোন বিষয়, হাঁ, না, দুইই হইতে পারে ;

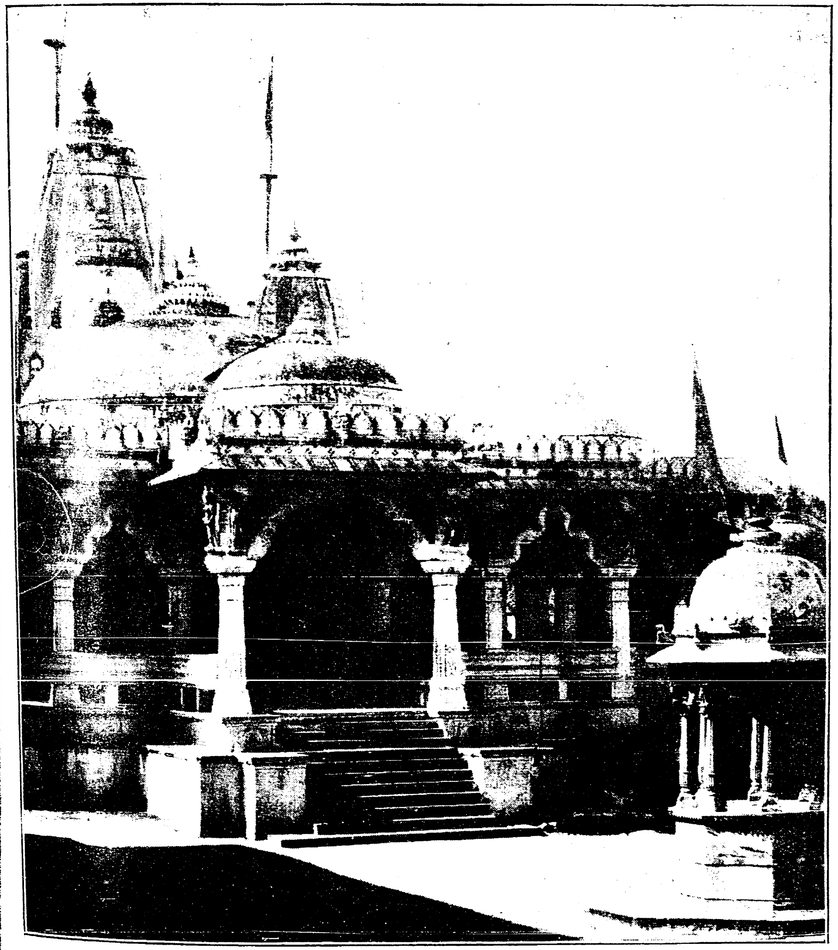

জৈন মন্দির—আহমদাবাদ

যেমন জগৎ নিত্য ও অনিত্য, প্রসঙ্গ ও সময় মীমাংসা হয় না। তাহাদের এই দ্বৈধ অনুসারে দুইই বলা যাইতে পারে। এরূপ ভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সর্ব্বদর্শন উক্তি অবলম্বন করিলে কোন তথ্যের সংগ্রহকার তাহাদিগকে 'স্যাদ্-বাদী' অর্থাৎ

বিকল্পবাদী বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। জৈনদের দার্শনিক তত্ত্ব যাহাই হউক, মানুষের স্বাভাবিক আরাধনা প্রবৃত্তি কোথায় যাইবে? দেখা যায় যে ঈশ্বরারাধনার পরিবর্ত্তে তাহাদের ধর্ম্মে বীরপূজা স্থান পাইয়াছে! তাহাদের আদিগুরু যে মহাবীর, তিনিই তাহাদের দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জৈনধর্ম্মে বোধ হয় যেন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্রিত, বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ভাগ উহার মতে অনুস্যূত। জৈনমন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গিয়া পূজার্চ্চনা করে, এমনও দেখা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মই কর্ম্মফলের নৈতিক প্রাধান্য মানিয়া লয়। আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে জীবের যোনি-ভ্রমণে উভয়েরই বিশ্বাস! যে সকল সাধু পুরুষ স্বীয় কর্ম্ম গুণে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জিন, জিনের অনুচর জৈন। জিনের অপর নাম তীর্থঙ্কর। যুগে যুগে এইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর উদয় হইয়াছেন ও ভবিষ্যৎ যুগে আরো ২৪ জন উদয় হইবেন। জৈনমন্দিরে এই সকল তীর্থঙ্করের পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ জিনদ্বয়, পরেশনাথ ও মহাবীর, জৈনদের বিশেষ পূজার্হ দেবতা। এই সকল তীর্থঙ্কর-উদ্দেশে পরেশনাথের পাহাড়, গিরনার, শত্রুঞ্জয়, আবুর পাহাড় প্রভৃতি নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ইহা বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই উপদিষ্ট ধর্ম্ম কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অনাত্মবাদী, তাহার বিপরীত আত্মবাদ জৈনধর্ম্মের সার। জৈনদের বিশ্বাস যে, জীবজন্তু, এমন কি বৃক্ষলতা উদ্ভিদ্ কোন কোন জড় পদার্থ আত্মসত্তায় পূর্ণ, এই হেতু অহিংসা ব্রত তাহাদের বিশিষ্টরূপ পালনীয়। পশু পক্ষীদের আহার যোগানো জৈন গৃহস্থের নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। জৈনদের উদ্যোগে বোম্বাই কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে পশুর হাঁসপাতাল (পিঞ্জরা পোল) স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের জৈন সাধক আপনার শরীরের রক্ত দিয়া মশা ছারপোকা পোষণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। পাছে দীপালোকে কীটপতঙ্গের প্রাণহানি হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদের রাত্রিভোজন নিষেধ, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহারের নিয়ম। জৈনযতিরা মুখে কাপড় জড়াইয়া রাস্তা ঝাঁট দিয়া চলে, পাছে তাহাদের নাসারন্ধ্র দিয়া কোন জীবাণু প্রবেশ করে, পাছে পদদলিত হইয়া কোন কীট মারা পড়ে। কথিত আছে যে এই অতিমাত্র অহিংসা নিয়ম পালন জৈন রাজ্য নাশের মূল। অন্‌হলবাড়ার শেষ রাজা কুমার-পাল গোঁড়া জৈন ছিলেন, বর্ষাকালে ভীষণ হিংসার ভয়ে তিনি নিজ সৈন্যসামন্তের চলাচল বন্ধ করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন।

ধর্ম্মনীতিতে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে উক্ত দুই ধর্ম্মে বিস্তর প্রভেদ। উভয় ধর্ম্মই সংযম ও অন্তঃশুদ্ধি উপদেশ করেন কিন্তু সাধনা এক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের যোগ প্রণালী মিতাহার, মিতাচার, জৈনপন্থা অন্যতর। বুদ্ধদেব তপশ্চর্য্যায় চূড়ান্ত সীমায় গিয়া

মধ্যপথে ফিরিয়া আসেন—ইন্দ্রিয়সেবা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী পথ। জৈনগুরু মহাবীর ১২ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তপঃসাধনে নিযুক্ত ছিলেন—জৈনদের আচার অনুষ্ঠান সেই আদর্শে নিয়মিত; দীর্ঘ উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণের নিয়ম যতিদের জীবনব্রত। তাঁহারা আর সকল জীবের জীবন রক্ষণে তৎপর, কেবল নিজের শরীরের প্রতি দয়ামায়া পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না।

জৈনপন্থীর দুই শাখা—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর জৈন শ্বেতবস্ত্রধারী, দিগম্বর নগ্ন সন্ন্যাসী, আকাশ যাঁহার বস্ত্র, গ্রীকেরা Gymnosophist বলিয়া যাঁদের বর্ণনা করিয়াছেন। একালে উভয় পন্থীই বস্ত্র ধারণ করেন, কেবল দিগম্বর জৈনেরা বিবস্ত্র হইয়া আহার করিবার নিয়ম এখনো পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রে দিগম্বর সন্ন্যাসী নিগণ্ঠ (নিগ্রন্থ) অর্থাৎ বন্ধনশূন্য বলিয়া বর্ণিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধের সময় এই সন্ন্যাসী দলের দলপতি ছিলেন নিগণ্ঠ জ্ঞাতিপুত্ত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃবংশীয় মহাবীর, জৈন শাস্ত্রে যাঁহার নাম বর্দ্ধমান মহাবীর—ইহা হইতে দিগম্বরদের প্রাচীনত্ব এবং মহাবীরকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করা যায়। সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহাদের শাখাভেদের সূত্রপাত।

জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা মাত্র, কিন্তু একথা অপর পণ্ডিতেরা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে জৈনধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে! জৈনেরা নিজে তাঁহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরকে শাক্যসিংহের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমত ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের অগ্রাহ্য। ইতিহাসে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কিন্তু আগে পরে যিনিই আসুন, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ না থাকুক উভয়কে পরস্পরের জাতভাই বলিয়া মানিতেই হইবে। উভয়েই এক মাতার সন্তান—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িয়া বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে; জৈনধর্ম্ম মায়ের কোল ছাড়িয়া দূরে যান নাই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ব্যগ্র।

বল্লভাচার্য্য

গুজরাটী হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা বিস্তর। বহুতর বণিক ও ব্যবসায়ী লোক বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। বল্লভাচার্য্যের উত্তরাধিকারী আচার্য্যগণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বল্লভাচার্য্য চম্পারণ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা

অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার মেধা এমনি তীক্ষ্ণ ছিল যে প্রবাদ এই যে, ৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া চতুর্মাসের মধ্যে চতুর্ব্বেদ, ষড়দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন সংস্করণ করিয়া শীঘ্রই ধর্ম্মপ্রচারে দেশবিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি একবার বিজয়নগরের



বল্লভপন্থী মহারাজ

রাজা কৃষ্ণদেবের রাজসভায় গিয়া স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবদের প্রধান আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে ৯ বৎসরকাল ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে কাশীবাসী হইয়া জীবন যাপন করিতে থাকেন। সেখানে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ্যে ভাগবত পুরাণের ভাষ্য বল্লভপন্থীদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। দর্শনক্ষেত্রে তাঁহার মত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ বলা যাইতে পারে। কাশীবাসেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

বল্লভের ধর্ম্ম বিলাসের ধর্ম্ম—ভোগৈশ্বর্য্য-পরায়ণ গৃহস্থের ধর্ম্ম। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োর বদন্তি"

বল্লভনির্দ্দিষ্ট মার্গ অন্যতর—তাহা ত্যাগের মার্গ নহে, পুষ্টিমার্গ। উচ্চাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকচ্ছলে গৃহীত—তাহা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার

প্রেমের প্রতিরূপ; বল্লভধর্ম্মে এই স্বর্গীয় প্রেম পার্থিব ধূলিদ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে।

করসনদাস মূলজী

বল্লভধর্ম্মের এই অনীতিদুর্গ ভেদ করিতে গুজরাট হইতে এক ধর্ম্মবীর অভ্যুদিত হইলেন—তাঁহার নাম করসনদাস মূলজী। এই মহাত্মার জীবন-কাহিনী এইস্থলে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ইনি ১৮৩২ অব্দে বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়—পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার পরিবারে বালকটিকে সঁপিয়া দেন। করসনদাস বোম্বায়ে এলফিনিষ্টন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ সংস্কার



করসনদাস মূলজী

সমস্যার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ঘটনাক্রমে এই সমাজ-সমস্যা তাঁহার জীবন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

যখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর, বিধবা বিবাহের উপর একটা পারিতোষিক প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, তঁহার লেখার কিয়দংশ কে একজন দুষ্টলোক চুরি করিয়া তাঁহার কাকিমার হাতে আনিয়া দেয়—তাঁহার এই লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। অভিভাবকের কোপানলে পড়িয়া তাঁহার সমূহ বিপদ উপস্থিত। তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইল, তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলেন। অন্য কেহ হইলে এই প্রচণ্ড আঘাতে এখানে থামিয়া যাইত, নিজস্ব মতামত একদিকে রাখিয়া তাহার অন্নদাতার মন যোগাইয়া চলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না, কিন্তু করসনদাস তেমন পাত্র ছিলেন না—ঘা খাইয়া তাঁর মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া লইয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তাঁহার অন্নচিন্তা দূর হইল এবং সমাজ-সংস্কার সমস্যা পূরণেরও অবকাশ পাইলেন।

তখনকার কালে বোম্বায়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল যেমন সারহীন, ভাষাও তেমনি অশোভন ও দোষাশ্রিত। পারসীদের মধ্যে গুজরাটী ইংরাজী মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ী ভাষা প্রচলিত ছিল। এই অভাব মোচন করিবার জন্য কয়েকজন কৃতবিদ্য পারসী রাস্তগোপ্তার নামক এক সাপ্তাহিক

গুজরাটী পত্র বাহির করেন। করসনদাস তাহার লেখকের মধ্যে একজন ছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মর্ম্মকথা সকল প্রচার করিবার যথেষ্ট প্রসার না পাওয়াতে "সত্য প্রকাশ" নামে তিনি নিজে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন—তখন হইতে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী চালনা করিবার সুযোগ পাইলেন। হিন্দু সমাজের ক্ষতস্থান সকল উদ্ঘাটন করা; মহারাজদের অনীতিগর্ভ অমানুষী কাণ্ডসকল লোকমাঝে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া, এই তাঁর ব্রত; এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া "সত্যপ্রকাশ" গুজরাট গগনে ধূমকেতুর ন্যায় উদয় হইল। তাহার সামাজিক প্রবন্ধ সকল হিন্দু সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল, বিশেষতঃ তাঁর ভাটিয়া জাতভাইদের তীব্র বিষদৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল।

ভাটিয়াদের অধিকাংশ লোক বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। তাহাদের ব্যবসাবুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ধর্ম্ম বিষয়ে গোঁড়ামীও তেমনি প্রবল। তাহারা মহারাজের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য। গোসাঁইজী মহারাজ তাহাদের চক্ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার,ভক্তগণ তনুমন ধনে তাঁহার সেবায় রত। মহারাজ তাঁহার অনুচরবর্গের রাজভক্তি গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট নহেন, তাহাদের নিকট হইতে দেব-পূজার দাবী করেন। তাই তাঁহার আরতি বন্দনা, তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ, বসন ভূষণে তাঁহার দেহমণ্ডন, তাঁহার আসন, পাদুকা অর্চ্চনা, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণামৃত পান,—এক কথায় বিষ্ণুমন্দিরে মহারাজ দেবতার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এ সকল তবুও ত পদে আছে, ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে নিন্দনীয় জঘন্য পাপাচার যাহা উল্লেখ করিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, তাহা এই যে, বৈষ্ণব কুলবধূগণ এই পার্থিক কুল সেবায় আপনাদের সতীত্ব উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

করসনদাস এই সমস্ত বীভৎসকাণ্ড অবারিত করিয়া ভাটিয়ামণ্ডলীর মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দিলেন। তাঁহার তীব্র কশাঘাতে তাহারা নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া থামাইবার চেষ্টা হইল—হিন্দু সমাজের অমোঘ বাণ দে জাতি বহিষ্কার,—সেই বাণ সন্ধানের উদ্যোগ হইতে লাগিল কিন্তু মহারাজের অনুচর বর্গের মন্ত্রতন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল।

১৮৬০ সালে গোসাঁইজী মহারাজ সুরাট হইতে বোম্বায়ে পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমনে সত্যপ্রকাশের মতামত লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহারাজ যুক্তি তর্কে না পারিয়া অশাস্ত্রীয় পাষণ্ড মতের পরিপোষক বলিয়া সম্পাদকের উপর কটুকাটব্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। করসনদাস তাহাতে পিছপাও হইবার পাত্র নহেন, তিনি তাহাদের আপনাদের অস্ত্রেই তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ উপনিষদ পুরাণাদি শাস্ত্রের বচন হইতে বল্লভী মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন ও তাহাদের অশাস্ত্রীয় ঘৃণিত আচার ব্যবহার সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। অক্টোবর ১৮৬১ সালের এক প্রকাশিত প্রবন্ধ এই নিন্দাবাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে। তাহাতে বিপক্ষদল কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল, কয়েক মাসান্তে কোথাও কিছু নাই হঠাৎ সত্যপ্রকাশের সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে সুপ্রিম কোর্টে এক লাইবেল মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত। তাহার উত্তরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে লাইবেল কিছুই নাই, তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা অক্ষরশঃ সত্য ও সমাজের হিতার্থে সেই সকল অভিযোগ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব কুলবালাদের প্রতি ব্যভিচার বল্লভী ধর্ম্মনীতির অঙ্গ, একথা তিনি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত।

এদিকে ভাটিয়ারা জোট বাঁধিয়া স্থির করিল যে তাহারা কেহই মহারাজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইবে না —তাহাদের সভায় এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা পত্র একবাক্যে স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কোন ফল হইল না, প্রত্যুত তাঁহারা আপনাদের জালে আপনারাই ধরা পড়িলেন। করসনদাস এই সকল লোকের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণার ফৌজদারী চার্জ আনিয়া তাহাদের বাণ কাটিয়া দিলেন। বিচারে তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া কাহারও ১০০০৲ কাহারও ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে তাহাদের পাপের বিলক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টে এই লাইবেল মকদ্দমার বিচার চলিতে লাগিল। ৪০ দিন ধরিয়া এই মকদ্দমা চলে। চীফ্ জষ্টিস্ Sir Joseph Arnold বিচারপতি, সুবিখ্যাত বিতণ্ডাকুশল Anstey

প্রতিবাদীর কৌন্সলী। বিচারে প্রতিবাদীই জয়ী হইলেন, বাদীর পক্ষ লজ্জায় অধোবদন। Sir Joseph তাঁহার ন্যায়াসন হইতে মহারাজদের বীভৎস কাণ্ডগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাযোগ্য তিরস্কার ও প্রতিবাদীর অসম সাহস ও বীরত্বের যথাযোগ্য সাধুবাদ দিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের বিনাশ ঘোষণা করিয়া দিলেন। আমাদের শাস্ত্রবাক্য সফল হইল :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্চতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।
অধর্ম্মে সমৃদ্ধি লভে, পূরে অভিলাষ;
পরে রিপুজয়; শেষে সমূলে বিনাশ।
পাপের পথ চিরদিনই ধ্বংসমুখী"—
(Book of Psalms)

এখনো করসনদাসের সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয় নাই—এবারকার পালা—বিলাত যাত্রা। এই উপলক্ষে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাহাদের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি করিয়া জ্বালাতন আরম্ভ করে,—এই স্থানে এ সকল কথা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই টুকু বলাই যথেষ্ট যে, করসনদাস মূলজী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন—কর্ত্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই! অবশেষে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপন করিয় ১৮৭৪ সালে এই বিপ্লবময় সংসার হইতে অপসৃত হইয়া শান্তিধামে চলিয়া যান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলোচ্ছেদ

নাটিকা

(টলষ্টয়-অবলম্বনে)

কালু কলে কাজ করে—ছিরু তাহার বন্ধু।

প্রথম অঙ্ক

স্থান—কালু মণ্ডলের কুটীর। কাল—সন্ধ্যা।

দাওয়ায় বসিয়া কালুর বৃদ্ধা মাতা সুতা কাটিতেছিল ; স্ত্রী বিন্দু ঝাঁট দিতেছিল।

বিন্দু। (ঝাঁট দিতে দিতে) এদের মতলবখানা কি, তা ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। চাল বাড়ন্ত বলে দিলুম, সন্ধ্যা হতে চল্‌ল, তা এখনও মানুষের দেখা নেই! পদা মাখনা খেলতে গেছে, ফিরে এসেই ভাতের জন্য ধুম বাধিয়ে দেবে'খন, তখন আমি কি করে কাকে সামলাব, তা জানি না—

কালুর মাতা। ও বেলার পান্তা কি কিছু নেই—চেঁচে-পুঁচে দুটিও হবে না ?

বিন্দু। ছাই হবে! কাল থেকে বলছি, চাল বাড়ন্ত—তা হুঁসই নেই, হুঁসই নেই! কে কাকে বলছে! থাক্‌গে, বাপু, যাদের সংসার, তারা বুঝুক, আমার কি!

কালুর মা। কালু কি সত্যিই ভুলে বসে আছে! আসুকই না সে—চাল কি আর আনবে না? চাল কটি ধুয়ে চাপিয়ে দিলে ভাত হতে কতক্ষণ!

বিন্দু। কত ক্ষণ তা ত জানি, কিন্তু যে সব ছেলে, তাদের কি তিল তর সইবে! আমার গায়ের মাস্ খেয়ে ফেলবে'খন! আমারও হয়েছে যেমন দশা, এগুলে নির্ব্বংশ—পেছুলেও নির্ব্বংশ!

কালুর মা। আর গজ্‌-গজ্‌ করেই বা কি হবে, বাছা? সন্ধ্যে হল, ঘরে আলো দেখাও, দোরে গঙ্গাজলটুকু ছিটিয়ে দাও—কালু এল বলে!

বিন্দু। (বাঁটা রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া) হ্যাঁ,—এল অমনি! আজ আবার মাইনে পাবে—! ওদের মাতির বাপ ফিরল, পুকুর ঘাট থেকে আসবার সময় দেখে এলুম, তবু এ মানুষের আর বাড়ী আসবার সময় হয় না।

কালুর মা। বোধ হয়, গন্তে গেছে, চাল কিনতে। ফল-ফুলুরিও কিনবে, তাই দেরী হচ্ছে!

বিন্দু। সেই হলেই রক্ষে! কিন্তু হাতে টাকাটি পড়লে বাড়ীর কথা কি আর সে মানুষের মনে থাকে? ছাই-ভস্ম গিলে বেহেড্ হয়ে ফিরবে'খন! কোথায় থাকবে চাল, কোথায়ই বা ফল-ফুলুরি! আমি আর পারি না—আমারও যেমন—মরণ নেই—শুধু ভুগতে আছি! ছেলেপিলেদের ঝঞ্ঝাট, সংসারের জ্বালা, এর উপর আবার মাতালের বদ্-খেয়ালী! একদিন একটু সোয়াস্তির মুখ দেখলুম না!

কালুর মা। কি করবে বল, বাছা—সবই বরাতের লিখন বৈ ত নয়!

[সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল ; গ্রাম্য চৌকিদার ভোলা, এক জীর্ণবেশধারী ভিক্ষুককে লইয়া কুটীরাঙ্গনে প্রবেশ করিল।]

চৌকিদার। কি গো কালুর মা, কালু ঘরে আছে ?

কালুর মা। না গো, এখনো সে ফেরেনি।

চৌকিদার। ফেরেনি! তা যাক্, তোমাকেই বলি, অতিথ এনেছি গো, বাছা, তোমাদের বাড়ী—তোমরা আমায় একটু সুনজরে দেখ কি না, তাই—

ভিক্ষুক। জয় হোক্ মাঠাকরুণ—

বিন্দু। ন্যাও—আর অত কুটুম্বিতের কাজ নেই—অতিথ্ এসেছেন! আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে! রোজ রোজ এত অতিথ-সেবা করি কোত্থেকে বল দেখি, বাপু? আমাদের কি তালুক দেখেছ না, মুলুক দেখেছ! যাও না, বড় বড় কোঠা-বাড়ীর ত অভাব নেই গাঁয়ে, সেখানে যাও না! নিজের ঝঞ্ঝাটে মচ্ছি নিজে, এর উপর আবার অতিথ্! বলে, গোদের উপর বিষ-ফোড়া! কেন বে, বাপু, এত কিসের, এ—?

চৌকিদার। আহা, বেচারা নাচার একেবারে—বুঝলে গা, কালুর বৌ—

বিন্দু। নাচার, তা কি করব—? আমারই বা কি এমন জ্বল-জ্বলাট দেখেছ—তা ছাড়া বাড়ীর মানুষ-জন বাড়ীতে নেই—করে কে সব—? এত ঝঞ্ঝাটই বা পোয়ায় কে?

চৌকিদার। আহাহা, বলি, এই রাতটা বই ত নয়! তোমাদের এই বাইরের দাওয়াটায় পড়ে থাকলে দাওয়াটা ত আর ক্ষয়ে যাবে না গো।—এই বর্ষা, রাত-বেরেত—

কালুর মা। আহা, থাক্, থাক্, বৌমা,—গরিব কোথা যায় বল? থাক গো বাছা, থাক, আজ রাতটা ঐ দাওয়ায় পড়ে থাক—ছি, বৌমা, অমন করে কি মানুষকে তাড়াতে আছে?

ভিক্ষুক। সারাদিন দাঁতে কুটোটি কাটিনি মা—ক্ষেমা-ঘেন্না করে আমায় দুটি খেতে দিও!

বিন্দু। ঐ ন্যাও—বসতে পেলে আবার শুতে চায়! কেন, গাঁয়ে কি আর মানুষ ছিল না, যে দুটি খেতে দেয়?

ভিক্ষুক। আমি ভিখিরী নই, বাছা—বরাতে আজ এ দশা করেছে, নইলে দেশে আমার—

কালুর মা। দেখ ত বৌমা, ঘড়াটার মধ্যে দুটো মুড়ির-গুঁড়ো বুঝি পড়ে আছে—মাখনা পাঠশাল থেকে এসে খেলে না—আচ্ছা, আমি না হয় এনে দিচ্ছি! (উঠিয়া একটা ছোট ধামী ভরিয়া মুড়ি আনিয়া দিল।)

ভিক্ষুক। (মুড়ি মুখে দিয়া) আঃ—!

চৌকিদার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কালু যে এখনো ফেরেনি—? কোথায় গেছে বুঝি!

বিন্দু। চুলোয়—না-হলে আমার হাড়-মাস কুরে খায় কি করে? এই মেঘ করে আসছে, সবাই যে যার ঘরে ফিরছে—এ মানুষের আর দেখা নেই! কি হল, তাই বা কে জানে!

চৌকিদার। না, ভয় কি—?

বিন্দু। ভয় নেই, তাই বা বলি কি করে? এদিকে ঘরে একটি চাল নেই—ছেলেদুটো ফিরল বলে—ফিরে আজ আমায় খাবে দেখচি।

কালুর মা। বৌমার আমার মুখের আর কামাই নেই! তা ওরই বা দোষ কি? কালুরই অন্যায়। আজ আবার মাইনে পাবে,—এখনো যখন দেখা নেই, তখন বেহুঁস হয়ে বাড়ী না ফিরলে বাঁচি।

বিন্দু। সঙ্গে আবার যদি ওদের সেই ছিরেটা থাকে, তা হলে ত কথাই নেই।

কালুর মা। কেন, ছিরে আবার কি করলে?

বিন্দু। ওমা, কি করলে! সেই ত পালের গোদা! এই মদ ত সে-ই ধরিয়েছে।

ভিক্ষুক। পুরুষ মানুষ—একটু যদি মদ খায়, তাতে দোষ কি!

বিন্দু। নাঃ—দোষ আর কি! তার টালটি যে আমাদের সামলাতে হয়—তখন?

ভিক্ষুক। কি করবে বল—পুরুষ মানুষ, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশতে হয়, পাঁচ রকম লোকের কথা রাখতে হয়, তাই একটু-আধটু না খেলে যে চলে না—তোমরা মেয়েমানুষ, ঘরের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত আছ, বোঝ না ত আমাদের একটু নেশা-ভাঙ ফুর্ত্তি-আমোদ না করলে চলবে কি করে, বল—

বিন্দু। বটে,—আর আমরা খুব ফুর্ত্তিতে আছি না? চব্বিশ ঘণ্টা এই রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, জল তোলা, ছেলেপিলে দেখা—এই নিয়েই ত আছি,—এক দণ্ড হাঁপ ছাড়বার সময় পাই না, এর উপর যদি আবার মাতালের টাল সামলাতে হয়, তাহলে ত দেখছি, একেবারে সুখের চরম! মেয়ে-জন্ম হয়েছে বলে কি এতই সইতে হবে—কেন গা,—দুটি ভাতের জন্যে কেন এত সইব? মেয়েমানুষ বলে কি অমনি বাণের জলে সব ভেসে এসেছি না কি!

ভিক্ষুক। সে কথা ঠিক! আর তা ছাড়া নেশাতেই ত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে!

চৌকিদার। হ্যাঁ গো কালুর মা, তোমার এখানে একটু তামুক-টামুক নেই—?

কালুর মা। সে সব কালু কোথায় রেখে যায়, সে-ই জানে—

ভিক্ষুক। কথাটা যখন পাড়লে, তখন বলি—আমি ভিখিরী নই, বাছা, আমার পয়সা-কড়িও এক কালে মন্দ ছিল না। আজ যে এই দুর্দ্দশা দেখছ, তা ঐ নেশার জন্যেই—

কালুর মা। আহা—

বিন্দু। তবে—

ভিক্ষুক। তবে হ্যাঁ—একটু-আধটু খেলে অবশ্য এমন কিছু অনর্থ হয় না—কিন্তু মানুষ এই মাপটুকু ত ঠিক রাখতে পারে না—

বিন্দু। ও পাপ না ছোঁয়াই ভালো—

ভিক্ষুক। সে ত ঠিকই—লোকে চোর হচ্ছে, ফকির হচ্ছে, সে ঐ নেশার জ্বালায়! বদ্ হচ্ছে, সেও ঐ নেশার খেয়ালে! নেশা করেছ, কি গোল্লায় গেছ—সেই জন্যেই না, নেশা করাকে বলে, পাপ!

চৌকিদার। আমি তবে আসি—একটু কাজ আছে আবার। (প্রস্থান)

কালুর মা। ছেলেদুটো এখনো যে ফিরল না, বৌমা—

বিন্দু। খেলায় মত্ত হয়ে সব ভুলে আছে আর কি!

কালুর মা। (ভিক্ষুকের প্রতি) তা তুমি কাজ-কর্ম্ম কর—?

ভিক্ষুক। আমি—? ঐ যে গাঁল্লের পাটের কলে কাজ করতুম—! রোজগার-পাতি মন্দ ছিল না—

কালুর মা। তবে, এমন দশা হল কিসে?

ভিক্ষুক। আর কিসে—! ঐ নেশায়,—সে মদের নয়, কোকেনের।

বিন্দু। কোকেন আবার কি?

ভিক্ষুক। সে এক রকমের নেশা। অল্প বয়সে আমার মা মারা যায়, বাপ আবার বিয়ে করলে। বাড়ীতে সৎমা এলেন, সঙ্গে তাঁর মা এলেন, কোথায় আবার এক পিশি ছিলেন, তিনিও এসে জুটলেন। বাড়ী আমার হল গে যেন সে কুটুম-বাড়ী। সময়ে ভাত পেতুম না, স্কুল যেতে দেরী হত, মাষ্টার প্রথম-প্রথম দাঁড় করিয়ে রাখত, তার পর জরিমানার ব্যবস্থা হল। জরিমানার পয়সা কোথায় পাব যে দেব? দেওয়া হত না, তখন কাণ-মলা, বেত নানা রকমই চল্‌তে লাগল। কিন্তু নিত্যি এত অত্যাচার হলে কোন্ ছেলে আর স্কুলে যায়? পালিয়ে বেড়াতুম। স্কুলের কাছে এক ছুতোর-মিস্ত্রির আড্ডা ছিল, তারা যাত্রার দল খুলে ছিল। আমি ত সেই যাত্রার দলে গিয়ে জুটলুম। তারা নেহাৎ মন্দও ছিল না, গোঁফ-দাড়ি কামায় নি,—আমায় দিলে তারা সখী সাজতে। এই সময় তামাক ধরলুম; তার পর কোকেন, এইটি ধরে শেষ এমনি হল যে হাতে পয়সা না থাকলেও এখান-ওখান থেকে কিছু চুরি-চামারি করে নেশাটা-আসটা করতে হত। ছোট চুরি,—ধরা পড়িনি, শেষে সর্দ্দার মারা গেল—যাত্রার দলও ভাঙ্গল।

বিন্দু। বাপ মোটে দেখ্‌ত শুনত না?

ভিক্ষুক। বাপ ত জুড়িয়ে বাঁচল। দায় ছিলুম বই ত নয়! যাত্রার দল ভেঙ্গে যেতে নেশার জন্যে কষ্টটা খুবই বাড়ল। শেষে খুঁজে-পেতে পাটের কলে চাকরির জোগাড় করলুম। নেশা সমানে চল্‌ল—একাদিক্রমে পনেরো বছর কলেই কেটে গেল—বিয়ে-থা করিনি; তার পর এই দু-তিন বছর হল, কাজে কামাই হতে লাগল। আমারও চাকরিতে জবাব হল। কিন্তু হাতে পয়সা নেই—নেশা চলে কি করে? পাকা চুরি ধরলুম। এই কোকেনের নেশা এমন নেশা নয়। ও জিনিসটি চাই-ই, তা যেমন করেই হোক্। শেষে একবার চুরি ধরা পড়ে গেল—দলে অন্য লোকও ছিল, তবে তারা ছিল চালাক, ফস্কে গেল, আমি ছ'মাস জেল খাটলুম। ফিরে এসে সভ্য-ভব্য হয়ে থাক্‌ব ভাবলুম। কিন্তু জো কি! চাকরি আর কোথাও জুটল না—জেল-ফেরত আসামী—দাগী—তার কি আর চাকরি হবার কোন উপায় আছে!

বিন্দু। তার পর?

ভিক্ষুক। তার পর—এই ভিক্ষেই হল জীবিকা! নেশাটি কিন্তু বাদ পড়ত না। ভিক্ষে করে চাল-ডাল যা পেতুম, তা বিক্রী করতুম,—করে সেই পয়সায় কোকেন কিনে খেতুম!

বিন্দু। ওমা, বল কি! ভাত না খেয়েও নেশা করতে?

ভিক্ষুক। বোঝ না ত, বাছা—এ নেশা বিষম নেশা। লোকে কথায় বলে, কোকেনের নেশা! কচ্ছপে কামড়ালে সে কামড় বরং ছাড়ে, কিন্তু এ নেশার কামড় একবার ধরলে আর ছাড়ান্ নেই!

বিন্দু। তার পর ?

ভিক্ষুক। তার পর হল, মুস্কিল। গাঁয়ে যেখানে যা চুরি হয়, পুলিশ চোর ধরতে না পেরে আমাকেই চালান দেয়!

বিন্দু। মিনি দোষে ?

ভিক্ষুক। তা না ত কি ? আমি একবার যখন জেল ঘুরে এসেছি, তখন আর রক্ষে আছে ? হাকিমও যেই শোনে, পুরোনো দাগী, অমনি আর আমার কোন কথা, কোন সাফাই কাণে তোলে না—দু'-চারবার আরো জেল বেড়িয়ে এলুম। তার পর—এই গাঁয়ে আসি, ভিক্ষে করতে। এখানেও ঐ দশা। কাদের বাড়ী গহনা-চুরি গেছল, চোরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না—পুলিশ আমায় ধরে চালান দিলে—জেলে গেলুম। কিন্তু আসল মজাটি হল এই যে, এ চুরি যখন হয়, তখন আমি এ গাঁয়েই মোটে আসি নি—ভিন্ গাঁয়ে এক কালী-বাড়ীতে পড়ে থাকতুম।

বিন্দু। সে কথা হাকিমকে বললে না, কেন ?

ভিক্ষুক। বলিনি কি,—বলেছিলুম—তা হাকিম কি তা কাণে তোলে! সে বললে, সাক্ষী আনো—নাম বল। আমি তখন হাজতে আটকা আছি—জামিন না হলে ত হাজত থেকে বেরুতে দেবে না, তা কে-ই বা জামিন হয়! আর সে সাক্ষীর নামই কি ছাই জানি যে, বলব, তবে সেখানে নিয়ে গেলে—তারা আমায় দেখলে বলতে পারত। সাফাইও মিলত!

বিন্দু। তাই করলে না কেন ?

ভিক্ষুক। সে কথা বলেছিলুম—তা যিনি পুলিশের হয়ে মকদ্দমা চালাচ্ছিলেন, তি হেসে বললেন, ব্যাটা দাগী চোর—আ ফন্দী বার করে মন্দ না! হাকিম চো রাঙালেন, বললেন, আদালতের সময় করছিস! ব্যস্—আমিও বোবা গেলুম—ভাবলুম, দূর ছাই, আর তর্ক কি হবে—তার চেয়ে যাই জেলে—সে আর অচেনা ঠাঁই নয়! বাইরের অবস্থা এই, অন্ন ভক্ষ্যো ধনুগুর্ণ—তার চেয়ে সেখা বাঁধা টাইমে খোরাকটা তবু জুটবে। খালাস পেয়েছি—এই চৌকিদারই আবা এখানে নিয়ে আসে—আশ্রয় চেয়েছিলুম ওর একটু ধর্ম্মজ্ঞান আছে, দেখছি!

বিন্দু। তাই ত, কি আশ্চর্য্য, বাপু! কোন ভদ্দর-নোকের কাছে দাঁড়ালে চাকরি দেয় না ?

ভিক্ষুক। কে দেবে ? গেলেই বলে আগে কোথায় কাজ করতে, চিঠি আনো আমি বলি, মিনি-দোষে জেল খেটে এসু হুজুর, চিঠি কার আনব ? শুনেই তা দূর্-দূর্ করে।

বিন্দু। কে জানে, বাপু! ধরই সে সত্যি দোষ করেই জেল খেটে এসেছে, তা পর কি আর মানুষ শোধরাতে পারে না শোধরাতে চাইলেও শোধরাতে দেবে না সত্যিই ত কাজ-কর্ম্ম না পেলে, পেটের দা ভিক্ষে করা কি চোর হওয়া ছাড়া আ উপায়ই বা কি!

ভিক্ষুক। এই! বল ত বাছা!

কালু ও ছিরুর প্রবেশ

কালুর মা। ওমা, এই যে কালু! হ্যাঁরে চাল-ডাল সব এনেছিস ত ?

কালু। (জড়িত স্বরে) ভালো আপদ! ড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই অমনি বায়না! ও, যাও, যাও, আমি চাল-ডাল আনতে রব না। ওঃ, বাড়ীতে বসে বসে সব ারী হুকুম ফরমাস হচ্ছে! হ্যাঁ রে রে—

ছিরু। কেন!

কালু। সেটা কৈ ? দে।

ছিরু। এই নাও—

কালু। মা, এই নাও দেখি—খানিকটা রিণের মাংস কিনে এনেছি—বাজারে সেছিল। ভারী উম্‌দা জিনিস, তাই এনেছি, খনি রেঁধে দাও। খাব,—ছিরেও খাবে!

কালুর মা। এতখানি মাংস এনেছিস ? ার চাল-ডাল!

কালু। চুলোয় যাক্ গে তোমার চাল-াল—এখন মাংস রাঁধো। কথা কাটাকাটি রে না—

কালুর মা। তা হলে রাতে সব খায় কি, ল্ ত বাছা! লোক ত কমণ্ডলি নয়। বৌমা কি সাধে গজ্-গজ্ করে—

কালু। কে গজ্ গজ্ করে! বৌমা! রে আমার বৌমা! দাও ও ছুঁড়ীকে াপের বাড়ী পাঠিয়ে। খেয়ে খেয়ে ভারী তজ হচ্ছে সব, না—? (ভিক্ষুককে দেখিয়া) এ আবার কে! কে বাবা, রিপু-কর্ম্ম এখানে সে আছ ?

কালুর মা। আহা, ও একজন অতিথ!

কালু। কে অতিথ ? হাম নেহি মাঙ্‌তা! নিকালো!

বিন্দু। কখনো নিকাল হবে না! ওঃ, াতাল হয়ে সে তম্বী দেখ না।

কালু। কি! তুই! তোর এত বড় তেজ! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজাটা একবার।

(বিন্দুকে প্রহার করিতে উদ্যত; ছিরে ও ভিক্ষুক ধরিয়া ফেলিল।)

ভিক্ষুক। ছি ছি, মেয়েমানুষের গায় হাত তুলতে আছে!

কালু। আলবৎ তুলব! তুই কে রে বেটা, মুড়্‌লী করতে এলি।

ভিক্ষুক। মুড়্‌লী আবার কি! মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলতে পাবে না।

কালু। বটে! ভারী দরদ দেখছি যে! ও তোর কে রে বেটা যে, তুই বাধা দিবি ? ও তোর ইস্ত্রী নয় ত। আমার ইস্ত্রী, খুসী হাত তুলব।

বিন্দু। আমার মরণ হয় ত বাঁচি।

ছিরু। আহা, থাম, থাম,—গোল করো না। নাও, নাও বৌ, মাংসটা চড়িয়ে দাও গে!

বিন্দু। বয়ে গেছে আমার! কখনো চড়াব না! মাতালের চাট রেঁধে দোব ? বটে! কখনো না। ছেলে-পিলে সব খায় কি, তার ঠিক নেই, ঘরে চাল বাড়ন্ত, মদের ঝোঁকে নবাবী করে বাবু কতকগুলো মাংস কিনে নিয়ে এলেন! নিজের পেটটিই বুঝেছেন, খালি। খেতে হয়, নিজে রেঁধে খাক্ গে, আমার দায় পড়েছে রাঁধতে!

কালু। আমার খুসী,—আমি খাব। রোজগার আমি করি, না, তুই করিস ?

ছিরু। বলি, থাম গো থাম! বৌ, এদিকে এস—আমি চট করে চাল এনে দিচ্ছি। তুমি মাংসটা নাও, চড়িয়ে দাও গে! ওহে, অতিথ, তোমার নাম কি ?

ভিক্ষুক। আমার নাম গোকুল!

ছিরু। (ইঙ্গিতে) বলি, আসে-টাসে, না, একেবারে নিরামিষ?

ভিক্ষুক। তা কিছু-কিছু আসে বই কি!

ছিরু। তাস খেলতে জান?

ভিক্ষুক। জানি।

ছিরু। তবে আর কি! কালু, নাও, নাও, মেজাজ সাফ করে ফেল! এই ত আর এক বন্ধু পাওয়া গেছে—আমি ও পাড়া থেকে হীরুকে ডেকে আনি। তাসজোড়াটা পাড়ো, খেলা যাক্। তার পর মাংস রান্না হলে আরামে খাওয়া যাবে। (মৃদু স্বরে) বোতলটা ঠিক আছে ত?

কালু। (মৃদু স্বরে) আছে।

ছিরু। বৌয়ের সঙ্গে ভাব করে ফেল, ভাব করে ফেল,—না হলে মাংস রেঁধে দেয় কে, বাবা? যাই, আমি দুটি চালের যোগাড় দেখিগে, আর অমনি হীরুকে ডেকে আনব! বৌ, যাও গো যাও। আমি চাল এনে দিচ্চি। ভায়া গোকুল, আজ দেখব, কেমন তুমি ওস্তাদ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—কালুর গৃহ। কাল—পরদিন প্রভাত।

কালুর মাতা ও বিন্দু।

কালুর মাতা। কালু এখনো ওঠে নি, বুঝি? আমি যাই, গরুটাকে বাইরে রেখে আসি। রোদ উঠে পড়েছে।

বিন্দু। আমি তা হলে সাজো বাসন-গুলো পুকুরঘাট থেকে মেজে আনিগে। ছেলেরাও ওঠেনি, উঠলে মা, বুলো, ঐখানে ঢাকা-চাপা দুটি পান্তা আছে, আর রান্নাঘর থেকে যেন ডাল-চচ্চড়ি গুছিয়ে নিয়ে সরকে খায়।

কালুর মা। বলব, তুমি যাও বাছা,—সাজ পাট সেরে নাও। গরুটাকে রেখে এসে আমি উনুনে আগুন দেব'খন।

(উভয়ের প্রস্থান)

চোখ মুছিতে-মুছিতে কালুর প্রবেশ।

কালু। ঈস্! রোদ উঠে পড়েছে। এত বুঝি ঘাটে গেছে! মা—মা—না, কারো সাড়া পাচ্ছি না। মাথাটা একটু, হ্যাঁ, ধরেছে, এই বুকের রগ্‌টা। নাঃ, এ পোষাচ্ছে না! গোকুলচাঁদ গেল কোথায়? ওহে, ও গোকুল—নাঃ, এখনো ঘুমুচ্ছে, বোধ হয়। লোকটা জুয়াড়ী হলেও এ দিকে মন্দ নয়! এই যে মা—

কালুর মার প্রবেশ

কালুর মা। উঠেছিস্?

কালু। হ্যাঁ। বলি, আনাজ-পত্তর কিছু আছে, না, এনে দিতে হবে?

কালুর মা। তবু ভালো! আমি ভাবছিনু, এখনি বলতে গেলে মারতে আসবি! বৌমার যে অত বকিস্, মার-ধোর করিস্, ও নেহাৎ ভালো,তাই,না হলে কি ও সাধে বলে, বাপু! এখন ডাগর হয়েছে, ছেলে-পিলের মা হয়েছে, এখন আর তোর ও রকম করা কি ভালো দেখায়!

কালু। যাক্, যাক্, ও নেশার ঝোঁকে কি করেছি, তা ধরতে নেই!

কালুর মা। তুমি ত বলছ,নেশার ঝোঁক, কিন্তু এ রোখ্ যার মাথায় পড়ে, কাঁহাতক তার বরদাস্ত হয়, বল দেখি, বাপু—

কালু। যখন হুঁস থাকে, তখন ত কিছু বলি না। এখন আনাজ-পত্তরের খবর কি?

কালুর মা। সে বৌমা জানে। ঘাটে গেছে, ঐ যে আসছে। ওকে জিজ্ঞেস্ কর্। আমি যাই, উনুনটোয় আগুন দিই গে। আর শোন্ বাছা, অমন করে পরের মেয়েকে আর বকিস্ নি। তোর ঝঙ্কার শুনলে আমারি হাত পা পেটের মধ্যে যায়, আমি ত তবু মা,—তোকে পেটে ধরেছি। (প্রস্থান)

কালু। ওগো, শোন দেখি—

বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। কি? আবার বক্‌বে?

কালু। না, না, সে নেশার ঝোঁকে কি বলেছি, সে কি ধরে?

বিন্দু। বটেই ত! তা এ ছাই নেশা করতে কে মাথার দিব্যি দেছে?

কালু। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার দেখো—

বিন্দু। আমি চাই না দেখতে, যা-খুসী করগে,—আমি কে যে, কথা কব?

কালু। আবার রাগ করে! না, না, সত্যি, আমি তোমায় খুব ভালবাসি। (বিন্দুর হাত ধরিল)

বিন্দু। আর যাও—আদিখ্যেতা করে না। এখনি ছেলেরা এসে পড়বে। তা কি বলছিলে?

কালু। আনাজ-পত্তর কিছু আছে—না আনতে হবে?

বিন্দু। আছে।

কালু। তবে! আর তুমি আমায় কাল কিছু-নেই বলে ধমকাচ্ছিলে!

বিন্দু। একটু সময় থাকতে বলা ভাল নয় কি? যে তোমার হুঁস!

কালু। তা ঠিক! নাঃ, তুমি দেখছি, আমার নক্ষী!

বিন্দু। তোমার ঢঙ্ রাখ। সর এখন।

(গমনোদ্যতা)

কালু। আচ্ছা, কালকের সে গোকুলচাঁদ গেল কোথায়?

বিন্দু। কি জানি! তাকে ত সকালে উঠে আর দেখিনি! লোকটা আহা, বড় দুঃখী।

কালু। তোমার ত মায়া হবেই। কাল সে তোমার দিক নিয়েছিল কি না।

বিন্দু। তা না, সে জন্যে নয়। নিজের সব কথা বলছিল। আহা, মিনিদোষে চার পাঁচ বার ওকে সবাই জেলে দিয়েছিল!

কালু। কৈ, জেল-ফেরত, তা ত আমাদের কাছে বললে না। লোকটা মোদ্দা খেলে বেশ। কাল ওতে আর ছিরুতে বসেছিল—আমাদের ঘাড়ে দু'খানা পঞ্জা দিয়ে গেছে। তাই তাকে খুঁজছিলুম,—আজ বেরুতে হবে না, ছুটি আছে, দুপুর বেলা খেলে সে পঞ্জার শোধ দেব।

বিন্দু। যাই, আমি কুট্‌নোটা ঠিক করে ফেলিগে!

(প্রস্থান)

কালু। আজ একটু ভাল রকম বাজার করে আনিগে—ছুটির দিন—

(কক্ষমধ্যে গমন)

কালুর মার প্রবেশ

কালুর মা। বৌমা—

বিন্দুর প্রবেশ

এই থোড়টুকু বামুনদের বাড়ী দিয়ে আসি মা—কি বল? আহা, ছোট মেয়েটি বিধবা হয়েছে—ভালো জিনিসে এই বয়সেই পোড়া

বিধেতা বাদ সেধেছে—তবু এটুকু যদি মুখে রোচে !

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে কালু। ওগো—)

বিন্দু। কেন ?

শশব্যস্তে কালুর প্রবেশ

কালু। সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার ঐ জামার পকেটে তিনটে টাকা ছিল—পাচ্ছি না—

বিন্দু। মেঝেয় পড়ে যায় নি ত ?

কালু। না, আমি বেশ করে খুঁজেছি। তক্তাপোষের নীচে-অবধি খুঁজেছি, চালের দামটা ছিরুকে দেব বলেছিলুম—তার পর ভুলে গেছি দিতে—সে-ও না নিয়ে চলে গেছে !

বিন্দু। দেখ, আর কোথাও রেখেছ, বোধ হয় !

কালু। না, সে আমার বেশ মনে আছে। আমি ছিরুকে বললুম, পকেটে তিনটে টাকা রইল—চালের দাম ; যাবার সময় নিয়ে যেয়ো। সে বললে, আচ্ছা—

বিন্দু। তাইত—তা হলে—

কালু। এ তার কাজ—নিশ্চয় তার কাজ। সেই গোক্‌লো ব্যাটা—ব্যাটা ঘাড় উঁচু করে দেখছিল, জামাটা কোথায় রাখি। নিশ্চয় এ সেই ব্যাটার কাজ ! তাই বেটা ভোরে সরে পড়েছে। তুমি না বললে, সে জেল-ফেরত ! তবে আর কোন ভুল নেই !

(গমনোদ্যত)

বিন্দু। যাচ্ছ কোথায় ?

কালু। সে ব্যাটার সন্ধানে ! (বিন্দু ধরিল) না, ধরো না, ছেড়ে দাও।

বিন্দু। শোন—

কালু। দেরী হয়ে যাবে, ছেড়ে দাও—

(নেপথ্যে—কালু ঘরে আছ ?)

বিন্দু। গজু ঠাকুরপোর গলা, না ?

কালু। কে ? গজু ? এস না !

প্রতিবেশী গজুর প্রবেশ

গজু। কি—বাজারে যাচ্ছ ?

কালু। যাব ত, কিন্তু ভাই, এক গেরোয় পড়েছি।

গজু। কি গেরো হে ?

কালু। কাল এরা এক অতিথ্‌কে ঠাঁই দিয়েছিল। ব্যাটা খেয়ে-দেয়ে দিব্যি আরাম করে এখানে শুয়ে ত রাত কাটালে ; তার পর আজ আমার পকেট থেকে তিনটে টাকা চুরি করে লম্বা দেছে। ভোরে উঠে দেখি, সে নেই, টাকাও নেই।

গজু। দাঁড়াও—লোকটার চেহারা কেমন, বল দেখি ?

বিন্দু। খোগা, ঢ্যাঙ্গা, রঙটা কালো—মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ—

গজু। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা—আর হাতে একটা বাঁশের লাঠি ছিল ?

কালু। তা হবে।

গজু। রসো, রসো—আর নাকটা বাঁকা, ঠিক এই গে তোমার টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত ?

কালু। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই তা হলে !

গজু। ঠিক—আমি যে এই চক্করবত্তি মশায়ের আটচালাটার সামনে ঐ ধরণের একটা লোক দেখে আসছি, এই মাত্র, হন্‌হন্ করে সে চলেছে।

কালু। ওঃ, তা হলে সে আর যায় কোথায়—ঠিক ধরব ব্যাটাকে ! এস হে গজু—

গজু। চল, ছুটে চল—এখনো বোধ হয়, ব্যাটা বোসেদের শিব-মন্দির পেরোয় নি— !

(উভয়ের সবেগে প্রস্থান)

বিন্দু। দেখ, কি সর্ব্বনাশ হয় ! (গালে হাত দিয়া বসিল)

কালুর মার প্রবেশ

কালুর মা। কি বৌমা, এমন করে বসলে যে !

বিন্দু। এরা, মা, সেই অতিথটাকে ধরতে ছুটল ! জামার পকেট থেকে তিনটে টাকা চুরি গেছে—অতিথকে দেখতে না পেয়ে তার উপর সন্দেহ হয়েছে, তাই ধরতে ছুটল !

কালুর মা। সে-ই যে নিয়েছে, তার ঠিক কি, বাছা ?

বিন্দু। কেন মরতে, জেল-ফেরতের কথা তুললুম, মা ! কি যে হবে ?

কালুর মা। তাই ত ! নাঃ, ভালো গেরো, বাছা ! তবে শুনবে, বৌমা—একটা ঘটনার কথা ? শোন, বলি। সে আজ দশ বারো বছরের কথা—তখন আমার কালু কতটুকুই বা ! ও পাড়ার মিত্তিরদের একটা কালো বক্‌না চুরি গেছল। গাঁয়ের লোক চোর ধরবার সলা আঁটতে লাগল। কেউ বললে, যুগীদের মোনাকে গোয়ালের আগড় খুলতে দেখেছে, কেউ বললে, গরু নিয়ে যেতে দেখেছে ! তখনই খোঁজ-খোঁজ ! চারদিকে রৈ-রৈ করে লোক ছুটল ! এখন ডাকাতে দীঘির ও পারে যে ক্ষেত আছে, মোনা ছিল, সেইখানে। যত লোক খোঁজ পেয়ে ত সেখানে ছুটল—মোনার চুলের ঝুঁটি ধরে সব বলতে লাগল,—'বের কর্ গরু !' সে বেচরা ফ্যাস্‌ফ্যাল্ করে সবার পানে চায়ে—সে বলে, কি বের করব ! সকলে বল্যে, মিত্তিরদের কালো বক্‌না চুরি করেছিস্—বের করে দে ! সে নেয় নি,—কোত্থেকে বের করে' দেবে ? কে নিয়েছে, তাও সে জানে না। তা সে কথা কে-ই বা শোনে, কে-ই বা মানে ! তখন ত সকলে মোনাকে ধরে লাথি, চড়, ঘুসি মারতে লাগল। মারের চোটে মার বাছা সেখানে মরেই গেল ! তার পর দিন পুলিশ চোর ধরে নিয়ে এল—সে একজন পাকা দাগী, গরু নিয়ে গেছল—মোনাকে সে চেনেও না, জানেও না— ! যা হোক্, চোর ত জেলে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলো ভদ্দর নোকের ছেলে অবধি মোনাকে মেরে ফেলার দরুণ জেল খেটে এল !

বিন্দু। তবেই ত ! কি হবে মা ? এ আবার যে রকম রাগী মানুষ—

কালুর মা। কিন্তু এ অতিথ্‌টে বাছা, লোক ভালো নয়। শুনলে ত—কি কোকিল না উকিল খেয়ে নেশা করে !

বিন্দু। না হয়, তিনটে টাকাই নিয়েছে মা—তার জন্যে তাকে মার-ধোর করেই বা ফল কি—আর সে জেলে গেলেই বা আমাদের কি লাভ !

কালুর মা। তবু দেখে আর পাঁচটা লোক শাসিত হয় !

বিন্দু। কিন্তু শুনলে ত—এ লোকটাকে কেউ চাকরি দেয় না—ভিক্ষেতেও ওর পেট ভরে না—কাজেই যদি সে চুরি করে থাকে—ঐ না গোলমাল শোনা যাচ্ছে—

কালুর মা ধরেছে না কি কাউকে— ! দেখি—

গোকুলকে ধরিয়া গজু, কালু ও প্রতিবেশিবর্গের প্রবেশ

কালু। ঠিক ধরেছি। ব্যাটা কাচার খুঁটে টাকা তিনটে বেঁধে রেখেছিল।

কালুর মা। আহা, ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে—টাকা ত তোদের আদায় হয়েছে?

কালু। ছাড়ব বৈকি! ব্যাটাকে আধ-মারা করে থানায় দেব, তবে ছাড়ব!

গোকুল। নাচার বাবা, তাই টাকা তিনটে নিয়েছি—চুরি করি নি, বাবা—খেতে পাই না,—দোহাই বাবা, চাকরি জোটে না, ভিক্ষে মেলে না—

গজু! চুরি করিস নি ব্যাটা? (প্রহার)

কালু। চুরি আবার কাকে বলে রে ব্যাটা? (প্রহার)

১ প্রতিবেশী। দাও ব্যাটাকে আরো দু'চার ঘা, না হলে শায়েস্তা হবে না।

২। কানটা আচ্ছা করে পাকিয়ে দাও!

৩। থানায় নে যাও—জেলের দানা-পানি না খেলে এ রোগ সারবে না!

৪। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেলের হাওয়া খেলেই আরাম হয়ে যাবে!

১। ব্যাটা—গাঁয়ের মধ্যে চুরি!

২। তাও আবার জামার পকেট থেকে—

বিন্দু। আহা, ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও। তিনটে টাকা চুরি করে তিরিশ টাকার মার খেয়েছে! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!

কালু। দিচ্ছি ছেড়ে! পাঁচ-সাত বার জেল খেটেছিস ব্যাটা, তবু ভয় নেই? ডর নেই? (প্রহার)

গোকুল। দোহাই বাবা, আর কখনো এমন কাজ করব না!

কালুর মা। ও গজু, ও কালু, দে বাবা, ছেড়ে দে—মেরেছিস ত খুব—

১। বল কিগো কালুর মা,—চোরকে কি ছেড়ে দিতে আছে?

২। ওকে জেলে দিতে হবে!

৪। না হলে শাসিত হবে কেন?

কালুর মা। আহা, ও বড় গরিব, বাছা—বড় গরিব!

৩। খবরদার ওকে ছেড়ো না, কালু—আইনকে সাবধান!

বিন্দু। ওগো, দোহাই তোমাদের—ওকে জেলে দিলে কি পৌরুষ বাড়বে তোমাদের? আর ও-ই বা কি শোধরাবে, বল! তার চেয়ে—

কালু। বেশ—তাই হবে। ছেড়েই দেব। (গোকুলকে দুই-তিনটা ঝাঁকানি দিয়া) যা, ব্যাটা,—এতবার জেল খেটেও যখন তোর মতি ফিরল না, তখন তোকে আর জেলে দিয়েই বা ফল কি! যা, তোকে ছেড়ে দিলুম আমি। তোর কিছু নেই, বলনি না? চাকরিও জোটে না—? আচ্ছা—নে, যা—ও টাকা তিনটে তুই নে-যা—(টাকা তিনটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে ফেলিয়া দিল।)

কালুর মা। এবার থেকে সৎপথে থাকিস্ বাছা, আর চুরি-টুরি করিস নে—এর পর নরকে যেতে হবে যে—সে ভয় নেই?

বিন্দু। সে-ত আর জেল নয়—যে দুদিন পরে খালাস পাবে—চিরকাল সেখানে পচে মরতে হবে! চাকরি না পাও,—ঐ তিন টাকা দিয়েই শাক-সব্জী কিনে ফিরি করে বেড়াও গে দেখি! একটা ত পেট—তাতে ঢের ভরবে। একটা পেটের জন্যে ক'টা টাকারই বা দরকার যে অধর্ম্ম করতে হবে?

১। এঃ, কালু, ছেড়ে দিলে—

২। তাই ত!

৩। ছোট লোক—ও ব্যাটার আর বুদ্ধি কি, বল!

কালু। বেশ বাবু, ছোট নোক হই, আমিই আছি। গোকুল, আয়, আমি তোকে চাকরি দেব। কাছারির ধারে আমি একখানা মশলার দোকান খুলব, ভাবছিলুম,—তুই সেখানকার কাজ-কর্ম্ম দেখবি, আর এখানে খাবি-দাবি। কেমন! কি বলিস্?

গোকুল। এ্যাঁ! শুধু ছেড়ে নয়—চাকরিও দেবে!..(চোখে জল আসিল) কালু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না—এমন ত কখনো দেখিনি, শুনিও-নি! চোর বলে লোকে কত মেরেছে, মেরে জেলে দিয়েছে,—তাতে আমার মন কখনো এমন হয় নি কিন্তু! জেলে বসে আক্রোশই বেড়েছে শুধু! পাপের আগুন জেলের হাওয়ায় বেড়েই উঠেছে, কখনো নেবেনি—নিবতে দিই-ও নি! আজ কিন্তু তুমি সে আগুন নিবিয়েছ! আমায় তুমি চেনো না—কালু। কালুর বৌ, কালুর মা,—তোমরাও চেনো না—আমি পাকা বদমায়েস, দাগী চোর। ভদ্দর ঘরে জন্মে নেশা-ভাঙ করে আজ আমি এই হয়ে দাঁড়িয়েছি—কখনো ফিরব বলে আশা করি নি—ফেরবার কথা মনেও কখনো উদয় হয় নি। অত লোকের লাথি-জুতো যা করতে পারে নি, যে রোগ সারাতে পারেনি, আজ তোমাদের এই মায়া মমতা তা পেরেছে, সে রোগ সারিয়েছে। আজ থেকে আমি তোমাদের চাকর! আর নেশা নয়, আর চুরি নয়! ভগবান হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন, তাই খাটিয়ে পেটের সংস্থান করব! কালুর বৌ—তুমি আমার মা—ঠিক বলেছ তুমি,—একটা পেট শুধু—তার জন্যে ক'টা টাকারই বা দরকার যে অধর্ম্ম করব?

(অশ্রু-মোচন)

বিন্দু। আহা—ভালো হও যদি ত তোমারই তাতে ভালো, বাছা—আমাদের আর কি!

৩। কালু, একটু আগে তোকে আমি ছোট লোক বলছিলুম—কিন্তু না, তোর প্রাণ মহৎ, অতি মহৎ!

কালুর মা। আহা, বাছা কেঁদে ফেলেছে গো—

বিন্দু। মানুষের প্রাণ ত বটে মা!

যবনিকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আর্য্য-নারীর প্রাচীন অবস্থা

বৈদিক যুগে আর্য্যনারীর সামাজিক অবস্থা এবং পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। নামে অনেক আসে যায়, —উহা তুচ্ছ জিনিস নয়; কারণ মনের ভাব হইতেই নামের সৃষ্টি, এবং সকল শব্দই অর্থের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। আশা করি, যাঁহারা প্রাচীন তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা অল্প একটুখানি ব্যাকরণের বিচারে বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না।

অতি প্রাচীনকালের বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয় সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল "নারী"; এই নারী শব্দ "নর" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। যাঁহারা বৈদিক ভাষার পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা হয়ত এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। নর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যে নারী হয় নাই, তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই; ঐ শব্দটি তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শতপথ ব্রাহ্মণে এবং অন্যান্য বেদ-পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে পাঠকেরা ঋগ্বেদ (১, ২৫, ৫; ১৬৭, ২০; ১৭৮, ৩; ২, ৩৪, ৬; ৩, ১৬, ৪ ইত্যাদি) এবং অথর্ব্ব বেদ (২, ৯, ২; ৯, ১, ৩; ১৪, ২, ৯ ইত্যাদি) দেখিতে পারেন। নৃ শব্দের কর্ম্মকারকের "নর্-অম্" (নৃ+অম্=নরম্) কে পরবর্ত্তী সময়ে "নর-ম্" বলিয়া (ভুল করিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক) যে নর শব্দ সৃষ্ট হইয়াছিল, প্রাচীন বেদে তাহার প্রচলন থাকিলে, সে সময়ের ব্যাকরণের হিসাবে উহার স্ত্রীলিঙ্গে "নরা" অথবা "নরী" শব্দ সিদ্ধ হইত,—"নারী" হইত না।

যে যুগে নর শব্দ ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য "নারী" শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এবং নিরুক্তকার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৯ম সূক্তের ৩য় ঋকের নারী শব্দ নেত্রী অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং বৈদিক ব্যাকরণে সর্ব্বত্রই নারী শব্দ "নী" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। কার্য্যবিশেষ পরিচালনে যেমন পুরুষের বিশেষত্ব ছিল, নারীজাতির তেমনই বিশেষত্ব ছিল। পরিবারের যে কার্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চালাইবার জন্য স্ত্রীজাতি নারী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন, সে কার্য্যের পরিচয় কথঞ্চিৎ পরবর্ত্তী "পুরং-ধি" শব্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা পুরের বা গৃহের সকল কার্য্যই আপনাদের মনের মত করিয়া স্বাধীনভাবে চালাইতেন, তাঁহাদের নাম ছিল "পুরং-ধি"।

ঋগ্বেদাদির অতি প্রাচীন ভাষায় বিবাহিতা অবিবাহিতা-অভেদে কেবল জাতিমাত্র বুঝাইবার জন্য যেমন নারী নাম ছিল, তেমনি জাতি বুঝাইবার জন্য স্ত্রী শব্দেরও প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে (১, ১৬৪, ১৬; ৫, ৬১, ৮) স্ত্রী শব্দ ঠিক্ নারীর মত সাধারণ জাতিবাচক পুমাংস্ শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। অথর্ব্ব বেদে (১২, ২, ৩৯) সর্ব্বপ্রথম জায়া বা পত্নী অর্থে স্ত্রীশব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

নারী ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ-বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না। রমণী, কামিনী প্রভৃতি অতি ঘৃণিত শব্দ বৈদিক যুগে সৃষ্টই হয় নাই। পুরুষেরা যে প্রকার আদর করিতে গিয়া নারীকে রমণী এবং কামিনী সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, অর্ব্বাচীন যুগের সেই আদর হইতেই বুঝিতে পারি যে নারী তখন পুরুষের বিলাসের উপকরণ-রূপেই গৃহীত হইতেন, এবং পুরুষের সম্পত্তি মাত্র ছিলেন। বৈদিক ভাষায় রমণী শব্দ ছিল না, কিন্তু "রামা" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই "রামা" শব্দের অর্থ ছিল বেশ্যা। একদিন যাঁহারা নেত্রী ছিলেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী সময়ে পতিতার নামে আদৃতা (?) হইয়াছিলেন। নারীরা বলিতে পারেন যে, ভগবান্ আমাদিগকে এই আদর হইতে রক্ষা করুন।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালের সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্ত্রীর আদরের সম্বোধনে "প্রেয়সী" শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত ঐ শব্দটি আমাদের সাহিত্যে খুবই প্রচলিত রহিয়াছে। এ কালে "প্রেয়সী" শব্দ যথার্থ আদরে এবং সম্মানে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু ঐ শব্দটির উৎপত্তির যুগে উহার বড় ভাল অর্থ ছিল না। যাহা যথার্থ কল্যাণকর ছিল, তাহাই ছিল শ্রেয়স্; কিন্তু যাহা মানুষকে শ্রেয়ঃ হইতে দূরে লইয়া যাইত, অথচ তৃপ্তিদায়ক ও মধুর ছিল, সেই বিপথ গমনের যাহা সহায়স্বরূপ ছিল, তাহারই নাম ছিল প্রেয়স্। এই "শ্রেয়স্-বিরোধী" প্রেয়স্ কথার স্ত্রীলিঙ্গে হইয়াছে প্রেয়সী। নারী যখন ধর্ম্মপথের বাধা, মুক্তির বাধা এবং মায়ের সহচরী হইলেন, তখনই তিনি প্রেয়সী বলিয়া আদৃতা হইতে লাগিলেন। এখানেই ব্যাকরণের কচকচি শেষ করিলাম।

এ কালে ব্রাহ্মণপত্নীরাও শূদ্রার ন্যায় ব্যবহৃতা হইয়া থাকেন; তাঁহারা স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহকে স্পর্শ করিতে পারেন না, এবং তাঁহার পূজায় নিযুক্ত হইতে পারেন না; বেদপাঠেও তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদিক যুগে পত্নী অর্থই ছিল যজ্ঞাদিতে অধিকারপ্রাপ্তা জায়া। কেবল যে এই অধিকারেরই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, তাহা নহে; নারী যে ঋষি হইতেন, মন্ত্ররচয়িত্রী হইতেন, এবং নিজে স্বতন্ত্রভাবে দেবতাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বিশ্ববারা (ঋ ৫, ২৮) প্রভৃতি নারী-ঋষির কথা, ঘোষা প্রভৃতি রমণীর স্বাধীন ধর্ম্মযাজনের কথা এ দেশের অনেক সহজলভ্য সাহিত্যেই বিচারিত হইয়াছে; কাজেই ঐ কথা লইয়া অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

হইতে পারে যে, যে-সময়ে সমাজে বাহ্যসম্পদ খুব অধিক হয় না, সে সময়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অনেক কষ্টসাধ্য কার্য্য অনায়াসে করিতে পারেন; কিন্তু কষ্টসাধ্য কথার বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্যনারীর

পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত না। নারী বিশ্‌পলার উপাখ্যানে পাই (ঋ ১, ১১৬, ১৫ ইত্যাদি) যে যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার একখানি পা কাটিয়া গিয়াছিল, এবং দেব অশ্বীদ্বয় তাঁহার লৌহজঙ্ঘা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের কোমলা অবলারা খাঁটি ননীর পুতুল হইলেই আমাদের আদর্শের মত হয়; কিন্তু ঋগ্বেদের দিনের নারীরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইতেন না। দ্রুতগমনের বিশেষ দৃষ্টান্ত দিবার জন্য ঋগ্বেদে (১, ৫৬, ২) উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরা যেমন দ্রুতপদে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, স্তোত্রসাহায্যে স্তোতাও সেইরূপ দ্রুতপদে ইন্দ্রের স্বর্গে আরোহণ করুন। কথায় কথায় যাহা সাধারণ দৃষ্টান্তরূপে প্রযুক্ত হইত, তাহা সাধারণ ভাবেই প্রচলিত ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। আমি একদিন যখন দার্জিলিং-এর সিন্‌চল পাহাড়ে উঠিতে গিয়া শ্রান্তিবোধ করিতেছিলাম, এবং দুইজন ইউরোপীয় রমণীকে দ্রুতপদে উপরে উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তখন এই বৈদিক শ্লোকের কথা মনে পড়িয়াছিল।

বৈদিক যুগে যে বাল্যবিবাহ ছিল না এবং আর্য্যনারীরা যে ইচ্ছা মত অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে চিরকাল কুমারী থাকিতে পারিতেন, ঋগ্বেদে এবং অথর্ব্ব বেদে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বহু পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্তও যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসে প্রমাণিত হয়। সকলেই জানেন যে পূর্ব্ব কালের স্মৃতির বিধানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির কাহারও "গোদান" নামক সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ বিবাহ হইতে পারিত না। বৈদিক ভাষায় গোদান শব্দটির অর্থ ই হইতেছে দাড়ি গোঁফ; দাড়ি-গোঁফ উঠিবার পরে সংস্কারটি কখনও পুরুষের পক্ষে অল্প বয়সে হইতে পারিত না। বিবাহবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রাদিতে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ভিন্ন সে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, এ প্রবন্ধে কেবল বৈদিক যুগের কথাই বলিব।

খাঁটি বৈদিক ভাষায় "বর" অর্থ ই হইতেছে wooer। বয়স্কা পত্নীসংগ্রহ করিতে হইলেই যে পুরুষকে বর হইতে হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কুমারীকে বিবাহের জন্য বশ করিতে হইলে যে মন্ত্র দেবতার কাছে পাঠ করিতে হয়, তাহা ঋগ্বেদে (৭, ৫৫, ৫ ও ৮) উল্লিখিত আছে,—অথর্ব্ব বেদে ত আছেই।

বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বিবাহ দেবর অথবা পতির নিকটসম্পর্কিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে হইত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও কোন্ কোন্ স্থলে বিধবা বিবাহ হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বেদে এবং বৈদিক সাহিত্যে ঋষিদিগের পারিবারিক জীবনের যতটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে এক পত্নী-গ্রহণই সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল এবং আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। নাম করিয়া ধরিতে গেলে যেমন যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি পত্নীর কথা পাওয়া

যায়, সকল স্থলেই সেরূপ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কোন কোন স্থলে ঋষিদিগের যে বহু পত্নী থাকিত, তাহা পত্নীপর্য্যায়ের বিশেষ বিশেষ নাম হইতে অনুমিত হয়। মৈত্রায়ণী সংহিতায় লিখিত আছে যে মনুর নাকি দশটি পত্নী ছিলেন। পত্নীপর্য্যায়ের যে বিশেষ বিশেষ নামের কথা বলিলাম, উহা রাজপত্নীদিগের কথাতেই দেখিতে পাই। রাজার যে পত্নী প্রথম পুত্রবতী হইতেন, সেই পত্নীর নাম হইতে "মহিষী"; দ্বিতীয়া পত্নীর নাম হইতে "পরিবৃক্তী"; তৃতীয়ার নাম হইত "বাবাতা" এবং চতুর্থীর নাম ছিল "পালাগলী", ইহা হইতে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ বেশ বুঝিতে পারা গেল। সেণ্টপিটার্সবর্গ অভিধানে "পরিবৃক্তী"র অর্থ the neglected বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মহিষী না হইয়াও যিনি "সুয়োরাণী" হইতেন, তাঁহার নাম হইত বাবাতা। কোন কোষ-গ্রন্থেই "পালাগলী" শব্দের অর্থ পাওয়া গেল না। কোন রাজকর্ম্মচারীর কন্যা রাজার বিহিত বিবাহিতা হইলে যে "পালাগলী" নাম পাইতেন, Weberএর এই অনুমান কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানি না। ব্রাহ্মণের বহু পত্নী থাকিলে প্রথমটিই খাঁটি পত্নীপদবাচ্য হইতেন, এবং তিনিই যজ্ঞে অধিকারিণী হইতেন। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুত্রবতী অন্য কোন ভার্য্যা পত্নীসংজ্ঞা লাভ করিতেন। পত্নী ব্যতীত অন্য বিবাহিতা স্ত্রীরা কেবল জায়া নামে আখ্যাতা হইতেন।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ যে অতি পবিত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা টেনিসনের Princess কাব্যে যখন পড়িতে পাই যে স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অর্দ্ধেক এবং পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অর্দ্ধেক মানুষ মাত্র, এবং উভয়ের সংযোগেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব সৃষ্ট হয়, তখন উহাকে উচ্চ ভাব বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি। পতি-পত্নীর সম্বন্ধের বিচারে এবং প্রাচীন যুগের বিবাহের মন্ত্রে দেখিতে পাই যে খাঁটি ঐ ভাবটি এ দেশে বহুকাল পূর্ব্বে পরিস্ফুট হইয়াছিল। স্ত্রী তাহার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫, ২, — ১, ১০) এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ, এবং স্ত্রীপুরুষের সংযোগেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতাবিধান (বৃহদারণ্যক ১, ৪, ১৭), ইহাই ছিল প্রাচীনকালের আদর্শ। "বরুণপ্রঘাস" নামক যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে পতিরা পত্নীদিগের চরিত্রের পবিত্রতার প্রতি বড় লক্ষ্য করিতেন না। কথাটি বড়ই ভুল। অনুষ্ঠানটি এই যে, বরুণপ্রঘাস যজ্ঞবিধির সময় পতি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার কোন জার ছিল কিনা। যদি কোন জার ছিল, তাহা হইলে তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। ইহাতে এই মাত্র সূচিত হয় যে, সদাচার-সম্পন্না হইলে দেবতা সমক্ষে পূর্ব্বের অপরাধের ক্ষমা হইত; কিন্তু চরিত্রের চপলতা আদৃত বা উপেক্ষিত হইত না।

কুমারী অবস্থায় নারী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, এবং বিবাহের পর তিনি যে সকল উপহার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সম্পত্তি ছিল, এবং তিনি সেই সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন। নারীরা যখন মন্ত্র রচনা করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাব

ছিল, এ কথা বলা চলে না। নারীরা সকলেই যে নৃত্য এবং গীত শিক্ষা করিতেন, ইহা ঋক্ এবং অথর্ব্ব বেদের অনেক সূক্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। নারীরা যেমন পেশস্ নামক কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র পরিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, দেবদুহিতা ঊষা তেমনি ভাবে নৃত্য করেন বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে।

বৈদিক যুগে পুত্রকন্যাদিগের নিকট মাতার সম্মান বড় অধিক ছিল। মাতাকে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের অধীনে থাকিতে হইবে, পরবর্ত্তী যুগের শাস্ত্রকারদিগের এই নির্দ্দেশ খাঁটি বৈদিক যুগে পাওয়া যায় না। তবে কোন পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ না থাকিলে ভগিনীকে ভ্রাতার রক্ষণাধীনে থাকিতে হইত; ভ্রাতা না থাকিলে "ভ্রাতৃব্যেরা"ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। ইচ্ছা করিয়া বৈদিক যুগের ভ্রাতৃব্য শব্দটি ব্যবহার করিলাম। এ যুগে Cousin অর্থজ্ঞাপক কোন শব্দ প্রচলিত নাই বলিয়া বৈদিক ভাষার ভ্রাতৃব্য কথাটির প্রচলন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সত্য যুগের কথা হইলেও বৈদিক যুগে পতিতা রমণী ছিল, এবং তাহারা বড় বড় ঋষিদিগেরও অস্পৃশ্যা ছিল, এ কথা বলা চলে না। পতিতারা বিশ্ বা আর্য্যশ্রেণীর লোকসাধারণের ভোগ্য ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছিল "বিশ্যা"। শব্দটির ব্যুৎপত্তির কথা বিস্মৃত হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শব্দের ই-কার স্থানে এ-কার হইয়া গিয়াছিল। বিশ্যার অন্য নাম ছিল "রামা" এবং "ন-গ্না", "গ্না" শব্দের অর্থ প্রথমে ছিল সম্মানিতা মহিলা, এবং পরে অর্থ হইয়াছিল দেব-পত্নী। যাহাদিগের পক্ষে গ্না হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহারাই হইত ন-গ্না। কালক্রমে ব্যবহারের নির্লজ্জতার হিসাবে নগ্না অর্থ লজ্জাহীনা হইয়াছিল, এবং ঐ শব্দের একটি পুংবাচক নূতন শব্দ সৃষ্টি হইয়া পরিচ্ছদশূন্য অর্থে "নগ্ন" শব্দ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রতিহত

কোথায় চলেছে ভাসি তরণী তোমার, তরঙ্গ বিপুল
নীল ক্ষুব্ধ পারাবারে, নিত্য প্রবাহিত আবর্ত্তসঙ্কুল
রহস্যের বক্ষ বিদারিয়া, মত্ত সমীরণ কাণে কাণে
জানায় সেথায় কোন্ অজানার আশা, আকুল পরাণে
তীক্ষ্ণ সুরে সমুদ্রের পাখী, বেদনার কোন্ আবেদন
বহিছে নিয়ত? হিল্লোল কল্লোলে হায় কেন প্রলোভন?

বর্ষা গেছে নিয়ে তার উদ্দাম পবন, নিয়ত আক্রোশ;
নীলাকাশ নীলপদ্মসম, পূর্ণতার প্রতি বীজকোষ
শরতের সুবর্ণ কিরণে, শুভ্রজ্যোৎস্না, পুণ্য বিভাবরী,
ভক্তি-মৌন শেফালিকা, তরুমূলে হেথা পড়িতেছে ঝরি
প্রসন্ন উষায়, ধীরে আসে হিমবায়ু উদাসীর মত,
শ্রান্ত জীবনের মোর সর্ব্ব ব্যাকুলতা, শান্ত প্রতিহত।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।



"বিন্দি, এখনো জল আনতে যাসনি যে।" (৬৩৫ পৃঃ)
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

বিন্দু

পরাণ মণ্ডলের বিধবা ভগিনী বিন্দু সে দিন তাহার ভোরের কাজ—ছড়া, ঝাঁট, ঘর-নিকানো প্রভৃতি সারিয়া পুকুর হইতে জল আনিতে যাইবার জন্য ঝাঁপ সরাইয়া যেমন বাহির হইবে অমনি দেখিল তাহাদের গ্রামের হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া নিতাইটা বাড়ির বাহির হইবার সমস্ত পথ জুড়িয়া বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া আছে। কেমন করিয়া বাহির হয় ঠিক করিতে না পারিয়া বিন্দু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

নিতাই পড়িয়াছিল ঠিক একেবারে দরজার মতো। তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর সুমন্ত ভোরবেলার ছমছমে আলো পড়িয়া আসন্ন মৃত্যুর চিহ্নকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার সমস্ত দেহ কাদায় ভরা;—স্থানে স্থানে খোঁচা লাগিয়া শুষ্ক রক্তের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরীরময় এত যন্ত্রণার চিহ্ন যে মনে হয় শরীরের উপর তাহার এতটুকু মায়া নাই—শরীর কাটিয়া উড়িয়া যাক, পুড়িয়া আঙার হইয়া যাক তাহাতে সে ভয়ও করে না, গ্রাহ্যও করে না।

বিন্দু যে আজ এই প্রথম নিতাইকে এই অবস্থায় দেখিল তাহা নহে—সে তাহাকে অনেকবার তাহাদের দরজার সামনে এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কিন্তু আজ একটু বেশী-রকম বলিয়া মনে হইল। অন্যদিন তাহার গায়ে এত ধূলা কাদা থাকে না, এত রক্তের চিহ্নও দেখা যায় না;—মুখখানাও তো অত পাংশু বলিয়া মনে হয় না! অন্যদিন সে যখন "নিতাই ওঠো" বলিয়া তাহাকে সরিতে বলে, সে তখনই উঠিয়া বসে, কিন্তু আজ এত ডাকেও যে সে সাড়া দিতেছে না!

বিন্দুর আর জল আনিতে যাওয়া হইল না—একটা পুরুষ মানুষকে ডিঙাইয়া সে কেমন করিয়া যায়! কাজেই কলসীটি রাখিয়া সে দাওয়ার উপর আসিয়া চুপ করিয়া বসিল। তাহার দাদা তখনও উঠে নাই;—দাদার ওঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিন্দু দাওয়ার অন্ধকার কোণটি ঘেঁসিয়া বসিয়া রহিল।

একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া তাহার কেবলই মনে উঠিতেছিল এই নিতায়ের কথা। ছেলেবেলাকার সব কথা তাহার ঠিক স্পষ্ট মনে পড়িতেছিল না—অনেক স্মৃতিই আবছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু নিতাই সম্বন্ধে যে কতকগুলা খুঁটিনাটি সে গুলাকে সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না।

(২)

নিতাই যখন সর্ব-প্রথম গ্রামে আসে তখন তাহার বয়স ছয়মাস। তখন অবশ্যই তাহার এ নাম ছিল না;—পরম বৈষ্ণব বৃদ্ধ রসিকমোহন পরকালে সদ্গতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহার এই নাম রাখিয়াছিল। নিতাই এ গ্রামের ছেলে নয়। রসিকমোহন তীর্থ হইতে এই অনাথ শিশুটিকে কুড়াইয়া

আনে। ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া তাহার মা বাপ তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কি-একটা সংক্রামক রোগে দুইজনেই একদিনে মারা যায়;—ছেলেটি রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতে থাকে—কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই। রসিকমোহন দেখিতে পাইয়া সমস্ত পথ বুকে করিয়া তাহাকে গ্রামে লইয়া আসে। সেই অবধি সে এইখানে।

রসিক একলা মানুষ। সংসারে তাহার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই—তাহাতে সে বুড়া হইয়াছে। কেমন করিয়া এই ছয় মাসের শিশুটিকে সে মানুষ করে? কাজেই তাহাকে প্রতিবাসীদের শরণাপন্ন হইতে হইল। কিন্তু ছেলেটিকে ঘরে স্থান দেওয়া দূরে থাকুক রসি মোহনের হঠকারিতার জন্য গ্রাম-শুদ্ধ লোক তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সকলেই বলিল—কাহার ছেলে, কোন্ জাতের ছেলে তার ঠিক নাই; শেষে কি অজাতের ছেলে একটা ঘরে পুষিয়া মহাপাতক হইবে! বৃদ্ধ রসিকমোহন ছেলেটিকে বুকে করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও কোনো পিতার প্রাণে এই হতভাগ্য সন্তানের উপর পিতৃস্নেহ, কোনো মাতার প্রাণে মাতৃস্নেহ জাগাইয়া তুলিতে পারিল না। বাপপিতামহের সনাতন ধর্ম্ম-জ্ঞান জাগ্রত হইয়া উঠিয়া শিশুর মুখ হইতে মাতৃস্তন্যটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে দ্বিধা করিল না।

হতভাগ্য নিতাই তাহার জীবনের এই প্রথম ঊষায় গ্রামবাসীদের নিকট হইতে যে নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যান পাইয়াছিল, ভবিষ্যতে কখনো আর তাহার প্রত্যাহরণ হয় নাই। গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও সে গ্রামের কেহ ছিল না। গ্রামের কোনো কাজের মধ্যেই তাহার স্থান ছিল না; কোনো আমোদ প্রমোদে, কোনো উৎসবে তাহার ডাক পড়িত না। এমন কি, শোকের সময়, বিশেষ আবশ্যক হইলেও, কেহ তাহার কথা তুলিত না।

(৩)

দাওয়ার উপর বসিয়া বিন্দুর মনে পড়িতেছিল তাহার শৈশবের কথা। সে আর নিতাই প্রায় সমবয়সী। সে যখন তাহার খেলার সঙ্গীদের লইয়া পাকুড়-গাছের তলায় ঠিক-দুপুর বেলাটিতে পুতুল খেলায় মগ্ন থাকিত, তখন এই নির্ব্বাসিত নিতাই একলাটি ম্লান মুখে দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিত। তাহার সঙ্গীরা নিতাইকে শাসাইত, খবরদার সে যেন তাহাদের খেলাঘরের ভিতর না আসে! একটা খোলামকুচি দিয়া তাহারা গণ্ডী কাটিয়া দিত এবং চীৎকার করিয়া নিতাইকে শুনাইয়া রাখিত যে এই গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিলে নিতাইয়ের কিছুতেই নিস্তার থাকিবে না। নিতাই প্রথম প্রথম এ সমস্ত শাসন মাথা পাতিয়া মানিয়া লইত—কিন্তু পরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত; তারপর শেষে এক একদিন হঠাৎ ঝড়ের মতো আসিয়া, চকিতের মধ্যে সমস্ত খেলা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইত।

নিতাইকে বিন্দু দূরে দূরেই দেখিত; কিন্তু একদিন তাহাকে খুব কাছেই পাইয়াছিল। সে দিন তাহার খেলার সঙ্গী কেহই ছিল না;—সকলেই জ্বরে পড়িয়াছিল। বিন্দু পাকুড়তলায় একলাটি বসিয়া কচি খেজুর

পাতার একটা মুকুট গড়িতেছিল। সেটা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে নিতাই আসিয়া বলিল—"ভাই, আমার সঙ্গে খেলবি?"

বিন্দু তখনই রাজী হইয়া গেল।

সে দিন তাহাদের দুপুর বেলাটা বড় আনন্দেই কাটিয়াছিল। নিতাইয়ের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! বিন্দুও এত আনন্দ কোনো দিন কাহারো সহিত খেলায় পায় নাই। সে নিতাইকে যখনই যাহা বলিয়াছে নিতাই তখনই তাহা করিয়াছে; সে যাহা চাহিয়াছে নিতাই তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিয়াছে। কোনো-কিছু লইয়া এতটুকু মনান্তরও হয় নাই—মতান্তরও হয় নাই। ধূলার ঘরকন্না সেদিন জমিয়া উঠিয়াছিল খুব—বিন্দুর ভাগ্যে আসল ঘরকন্না এমন করিয়া জমে নাই কোনো দিন। তারপর খেলা শেষ হইলে নিতাই যখন চাহিয়া বসিল—"ভাই! আমাকে ঐ মুকুটটা দিবি?" তখন বিন্দু অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা দিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইয়াছিল, মুকুট গড়াটা যেন সার্থক হইয়া গেল।

পরের দিনও আবার এমনি করিয়া আসিয়া নিতাইয়ের সহিত খেলিবে বলিয়া বিন্দু কথা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারি আপপোস যে সে কথা রক্ষা হয় নাই;—কোথা হইতে জ্বর আসিয়া সে রাত্রে তাহাকেও আক্রমণ করে!

তাহার পর, বিন্দু সুস্থ হইয়া উঠিয়া নিতাইকে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু দূরে দূরে। তাহাদের খেলার গণ্ডীর ভিতর সে আর স্থান পায় নাই। তাহার সঙ্গীরা নিতাইকে কিছুতেই কাছে ঘেঁসিতে দিত না। নিতাই ছল্‌ছল্ নয়নে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিত—বিন্দুর দিকে কেমন এক রকম কাতর দৃষ্টিতে চাহিত, তাহাতে বিন্দুর বড় মায়া করিত।

খেলাঘর ভাঙিয়া যে দিন বিন্দু শ্বশুর ঘরের জন্য যাত্রা করে—সেদিনে তাহাকে নৌকায় তুলিয়া দিবার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক যখন ঘাটে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন সে ভিড়ের মধ্যে নিতাই ছিল না বটে, কিন্তু দূরে অশথ গাছের আড়ালে তাহার মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল;—সে বিন্দুর দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিন্দু প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই—তারপর, নৌকা যখন ছাড়িয়া দিল, বিদায়ের অশ্রুজলে তাহার চোখ যখন ঝাপসা হইয়া আসিল, তখন তাহার সেই ঝাপসা-চোখের কুহেলিকার ভিতর দিয়া নিতাই তাহার সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া দিতে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল, কিন্তু যতক্ষণ দৃষ্টি চলে বিন্দু দেখিয়াছিল, নিতাই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর বহুদিন পরে যেদিন সিঁথির সিঁদূর মুছিয়া, অঙ্গের আভরণ খুলিয়া, শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে বিন্দু পিতৃগৃহে ফিরিতেছিল সেদিনও নিতাইয়ের করুণাভরা দৃষ্টি তাহাকে প্রথম সমবেদনা জানাইয়াছিল। সেদিন বিন্দু দেখিয়াছিল, গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ পথ দূরে নদীর ধারে তাহারই প্রতীক্ষায় নিতাই একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

দাওয়ার উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে

বিন্দুর মনের উপর দিয়া এই কথাগুলাই আজ কেবল যাওয়া-আসা করিতেছিল। নিতাই সম্বন্ধে যেখানে যতটুকু স্মৃতি ছিল সমস্তই যেন আজ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে!—মনের গোপন কুঠুরির মধ্যে যাহা চাবি-বন্ধ ছিল আজ যেন তাহা কেমন-করিয়া খোলা পাইয়া সবেগে বাহির হইয়া আসিয়াছে!—তাহাদের লইয়া বিন্দু সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

(৪)

রসিকমোহন যতদিন বাঁচিয়াছিল ততদিন প্রতিবাসীদের সমস্ত অনাদরের লাঞ্ছনা হইতে দূরে রাখিয়া নিতাইকে নিজের স্নেহনীড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর হইতেই নিতাই বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের অবস্থাটা কিরূপ। তাহার মনে হইত, সে যেন ধূলাকাদা মাখা পথের কুকুরের মতো, দ্বারে দ্বারে প্রতাড়িত হইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের আর-সব মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে অধিকার আছে,দাবী আছে তাহা নিতাইয়েরও নিজস্ব মনে করিয়া সে প্রথম প্রথম অম্লান চিত্তে সকলকার মধ্যে একজন হইয়া বসিতে চাহিত; কিন্তু কেহ তাহাকে আমোল দিত না—তাড়াইয়া দিত। এমনি করিয়া একদিন নয়, দুইদিন নয়—প্রতিদিন অস্পৃশ্য জন্তুর মতো তাড়না খাইয়া খাইয়া সে এমনি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে নিজের ভালো-মন্দের দিকে দৃষ্টি রাখার সে কোনো দরকার দেখিত না। সে যাহা খুসী তাহাই করিত;—ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া রসিকমোহনের বহুকষ্টে সঞ্চিত সে জলের মতো খরচ করিয়া দিত। সমস্ত দিন মদ খাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; —তারপর যখন চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিত, তখন পথের উপর মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িত।

এই একলা, একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন; —কাহারো কাছে দুঃখ জানাইবার নাই, সুখের কথা শুনিবারও কেহ নাই;—কেহ একটু স্নেহ করে না, আদর দেয় না, ভালোবাসা দেয় না—তাহার হিতের জন্য কেহ আসিয়া দুটো তিরস্কারও করিয়া যায় না—কেবল তাচ্ছিল্য আর তাচ্ছিল্য! এই তাহার এ অনাদৃত জীবন সে জাগ্রত রাখিবে কিসের জন্য?—কোন্ সুখে? তাই সে তাহার সমস্ত অস্তিত্বটাকে মাদকতার বিস্মৃতির মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছিল। যখনই একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইত তখনই তাহা চাপা দিত। এমনি করিতে করিতে তাহার নেশার মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। শেষে এমন হইবার উপক্রম হইতেছিল যে, কোন্ দিন বা এই নেশার মধ্যেই সে চিরদিনের মতো তলাইয়া যায়!

যখন তাহার এমন অবস্থা হইত যে তাহার মনে হইত বুঝি বা তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত, তখন সে কি জানি-কেন তাহার অবসন্ন দেহটাকে গভীর রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোনো-রকমে বহন করিয়া বিন্দুর বাড়ির ঠিক সামনেটিতে আসিয়া পড়িয়া থাকিত। বিন্দু ভোরবেলা জল আনিতে যাইবার সময় যেমন বলিত—"নিতাই সর!" অমনি সে বিন্দুর মুখের পানে একবার চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

(৫)

বিন্দুর দাদা পরাণ মণ্ডল শয়ন ঘর হইতে বাহির হইয়া বিন্দুকে দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে বলিল —"বিন্দি, এখনো জল আনতে যাস্‌নি যে!"

বিন্দু বলিল—"কেমন করে যাই দাদা! নিতাই যে পথ আগ্‌লে পড়ে!"

নিতাইয়ের নাম শুনিয়া পরাণ অধিকতর বিস্মিত হইল। তার পর যখন বাহিরে গিয়া নিতাইয়ের মূর্ত্তি দেখিল তখন রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। "হতভাগা লক্ষীছাড়াটা এইখেনে এসে মরেছে!" বলিয়া পরাণ চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে চীৎকারে নিতাইয়ের কোনো হুঁস দেখা গেল না;—সে যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। তাহাতে পরাণ আরো রাগিয়া উঠিল। "দেখেচ বেটার নবাবী! এত চীৎকার করচি তবু কোনো খেয়াল নেই" বলিয়া সে রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিল।

পরাণ মণ্ডল যখন দেখিল যে নিতাইয়ের আপনা হইতে উঠিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই—এদিকে বেলাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন সে চিন্তিত হইয়া গ্রামের সকলকার সহিত পরামর্শ করিতে গেল। শেষে কি বাড়ির সামনে পড়িয়া লোকটা মরিবে! মরিতে হয় তাহার নিজের ঘরের মধ্যে মরিয়া পচুক—ভালো মানুষের দুয়ারে কেন! অজাতের মড়া ছুঁইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে! ভ্যালা এ আপদ!

সকলকার পরামর্শ মতে গ্রামের ডোমপাড়া হইতে জনকয়েক ডোম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে জ্ঞানশূন্য নিতাইকে উঠাইয়া তাহার নিজের বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া পরাণ নিশ্চিন্ত হইল।

গ্রামের মধ্যে যে যাহার আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত। সমস্ত দিনের মধ্যে নিতাইয়ের কথা কেহ একবার তুলিলও না। সকাল বেলা অজ্ঞান অবস্থায় নিতাইকে দেখিয়া বিন্দুর একটু ভাবনা হইয়াছিল—তার পর সমস্ত দিনটা চলিয়া যায়, আর কোনো খবর না পাইয়া সে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। যেখানে শোনে কোনো কথা হইতেছে অমনি বিন্দু কান খাড়া করিয়া তোলে, কিন্তু কোথা হইতেও নিতাই সম্বন্ধে এতটুকু খবর পাওয়া গেল না।

বিন্দু ভাবিতেছিল, আহা বেচারা, একটু শুশ্রূষার অভাবে মারা যাইবে! একটা প্রাণ কি এতই তুচ্ছ!

কিন্তু সে কী করিবে! সে যে মেয়েমানুষ—সে যে বিধবা!

নিতাই ভালো আছে—এই সংবাদটুকু পাইলেই বিন্দু নিশ্চিন্ত হইতে পারে, কিন্তু এ সংবাদ কে তাহাকে আনিয়া দেয়? সে মুখ ফুটিয়া তো কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তবে সে কী করে! বিন্দু হতাশ হইয়া সমস্ত দিন ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অনেকবার মনে মনে বলিল—দূর হোক গে ছাই! পরের জন্য আমার এত ভাবনা কেন? কিন্তু মন এই তাচ্ছিল্য ভাবটাকে তাচ্ছিল্য করিয়াই উড়াইয়া

দিল।—সমস্ত দিনের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে নিতাইয়ের চিন্তাটা জোর করিয়া কেবলই ফুটিয়া-ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

এক একবার মনে হয়, নিতাই বোধ হয় এতক্ষণে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই মনে-হওয়াটার উপর নির্ভর করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে কৈ! মন যাহা বিশ্বাস করিতে পারে এমন একটা পাকা খবর পাওয়া যে দরকার!

যতই দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতে লাগিল বিন্দুর ভাবনা ততই জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। নিতাইয়ের চিন্তাটা তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কেন তাহা বিন্দু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না—সে তো তাহার কেউই নয়, তবে তাহার জন্য এমন করিয়া সে ভাবিয়া মরিতেছে কেন?

বিন্দুর চোখের সামনে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছিল নিতাইয়ের সকালবেলাকার সেই বিবর্ণ,—জর্জ্জরিত মূর্ত্তি। যতই সে মূর্ত্তি মনে পড়িতেছিল ততই তাহার হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল এবং এই করুণাকে আশ্রয় করিয়া একটা নূতনতর চেতনা তাহার অন্তরের মধ্যে একটু একটু করিয়া ফুলের মতো বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। বিন্দু যে সেটাকে ঠিক স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তি বিন্দুর মনটাকে নাড়া দিয়া তুলিতেছিল এবং তাহার যাহা কাজ তাহা বিন্দুর অজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইতেছিল।

বিন্দু ভাবিতেছিল, আহা, নিতাইয়ের কেউ নেই!—শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করে, কেমন আছ একবার জিজ্ঞাসা করে—এমন আপনার বলিতে জনপ্রাণীও নেই। তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিলে এক-বিন্দু জলও কেহ তাহার মুখে দিবে না।

গভীর রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িল তখনকার সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়া বিন্দুর ভাবনা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্ধকারে আর কিছু চোখে পড়ে না, আর-কিছু মনে আসে না—আসে কেবল নিতাই! নিতাই যেন আশপাশ চারিদিকের সমস্ত স্থানটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে!

বিন্দু ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু পদে পদে একটা ভয় ও লজ্জা তাহাকে যেন ঘরের দিকেই টানিয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু এই গভীর রাত্রে কিসের ভয়—কাহাকে ভয়? সে চুপি চুপি একবারটি গিয়া নিতাইকে দেখিয়া আসিবে মাত্র;—কে তাহা দেখিবে? কেই বা তাহা জানিবে?

বিন্দু ভয়ে ভয়ে টিপিটিপি পা ফেলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছে—বাহিরে কেহ কোথাও নাই—চারিদিক ঘোর অন্ধকার। সে এই অন্ধকার ও নির্জ্জনতার আবরণের মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া একেবারে নিতাইয়ের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

নিতাইয়ের তখন সবে মাত্র নেশা ছুটিয়াছে। সে তখন আকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বাস্তব জগৎটাকে যেন পরখ করিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু কৈ—কোথায় কি? এই যে এতক্ষণ পরে সে

জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, এখন কী লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে!—কোথায় এতটুকু প্রলোভন! তবে আর শূন্য দৃষ্টি লইয়া চোখ মেলিয়া থাকিয়া লাভ কি!—অন্ধকারের অতলতার মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া যাই। এই ভাবিয়া নিতাই আবার মদ ঢালিতেছিল এমন সময় বিন্দুর পদশব্দে সে চমকাইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ নিতাই বুঝিতে পারিল না—এ কি নেশার খেয়াল—না কী!

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল—"নিতাই, কেমন আছ?"

কথাটা শুনিয়া নিতাইয়ের নিস্পন্দ শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল;—সে গুণমুক্ত ধনুকের মত একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

নিতাই বিস্ময়ের আবেগে উদ্বেলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিন্দু, তুমি যে এখানে!"

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিল—"তোমায় দেখতে এসেছি!"

অবাক হইয়া নিতাই, বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল।—এ কি সত্য? না মায়া?

বিন্দুর কথাটা সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু বিন্দুর মুখের দিকে একবার চাহিতেই তাহার সমস্ত সংশয় চূর্ণ হইয়া গেল।

বিন্দু আর কোনো কথা কহিল না। সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিতাই অনেকক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে—মেঘ-মুক্ত পূর্ণ চন্দ্র, ঘুমন্ত পৃথিবীর সজল শ্যামলতার উপর শুভ্র আলোর জাল ছড়াইয়া দিয়াছে।—চারি দিকে আলোর ঢেউ ছুটিয়াছে। নিতাইয়ের বোধ হইতেছিল, তাহার অন্তরখানিও যেন আলোর আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিন্দুর ছেলেবেলাকার-দেওয়া খেজুর পাতার জীর্ণ মুকুটটি বাহির করিয়া একবার মাথায় পরিল; তারপর মদের বোতলটা সমুখ হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

কৈফিয়ৎ

(Terza Rima ছন্দে)

শুনাবো নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি।
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস॥

যৌবনে বাসনা ছিল দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে।
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি॥

ফলাতে সংকল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে
আকাশের নীল আর অরুণের লাল।
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে ॥

দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিলনা বেশি অন্তরের ঘটে।
এ কবি ছিলনা কভু বাণীর দুলাল ॥

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে ॥

হেথায় হয়না কভু গুরুর আকাল!
পড়িনু কত না জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল ॥

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ,
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত কর্ষণ!

বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে,
গড়িনু জ্ঞানেতে ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।

নেত্রপথে এসে দুটী সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে,—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়।

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি।
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে ॥

ফলকথা কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি!

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর
সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,
সুরু হল সেই হতে সংসার সমর ॥

পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিলনা স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ পরশে এল তন্দ্রার আবেশ ॥

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানে জগদীশ।
কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে!

এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শঃ নিকেশ ॥

দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক!

এ সব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,
না জানি কখন্ আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর ॥

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান ॥



পুরীর পুরন্ধ্রী
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে



ভঙ্গ তরঙ্গে রণে ভঙ্গ
শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র হইতে



ঝড়ে
দেশী ও বিদেশী
শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র হইতে

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ।
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে ॥

এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোট খাট তান,
বর্ণ সুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ ॥

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎপ্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ ॥

এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ" ॥

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চোদ্দ' !

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পুরী

আমাদের একটি চলিত কথা আছে "পুনকে শত্রু বড় ভয়ঙ্কর, বড় শত্রুকে পারা যায় - তবু তাকে পাবা যায় না।"

আমার একজন ইংরাজ বন্ধু প্রায়ই বলেন—"আমি মশাকে যত ডরাই বাঘকেও তত ডরাই নে।" এ কথাগুলির সার্থকতা এবার পুরী আসিয়া যেমন বুঝিয়াছি আগে তেমন বুঝি নাই। পুরীর সমুদ্র, শোভাস্বাস্থ্য সকলই পুরীর বালির নিকট হার মানিয়াছে।

পুরী মরু রাজ্য ; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বালি,—আশে বালি, পাশে বালি, খাদ্যে বালি, বিছানায় বালি, রৌদ্রে বালি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—বৃষ্টিতে ইহার ক্ষয় নাই, আর্দ্রতার চিহ্ন মাত্র নাই, ইহা অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ অনবরত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বালুতীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু বালির এক কণা নাশ করিতে পারেন নাই—তীরে বালিরাশি যেমন তেমনই আছে।

পুরীর মাটী যেমন কেবলই বালি—পুরীর সমুদ্র তেমনি কেবলই জল। আর যত সমুদ্র দেখিয়াছি,—তাহারা কত পাহাড় কত দ্বীপ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—কিন্তু পুরীর দিগন্ত-বিলোপী সমুদ্রে কোথাও একটি সামান্য প্রস্তরস্তূপ পর্য্যন্ত নাই। ইহা ঠিক বাঙ্গলারই সমুদ্র। সূর্য্য প্রাতঃকালে সমুদ্র হইতে উঠিয়া সন্ধ্যায় সমুদ্রেই লীন হইয়া পড়েন,—অন্য কোন বাধার অন্তরাল সূর্য্যের উদয়াস্ত মহিমাকে প্রচ্ছন্ন করে না।

কি সে চমৎকার শোভা! স্তরবিন্যস্ত পুঞ্জীকৃত শতবর্ণ মেঘে—স্থূলাতিস্থূল হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোহিত বর্ণ আভাসমূহের তরঙ্গ তুলিয়া—সে তরঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত আকাশ পাতাল অপূর্ব্ব মহিমায় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য নীলমধ্য হইতে আকাশে ওঠেন, নীল প্রদক্ষিণ করিয়া আবার নীলেই মগ্ন হইয়া পড়েন। জানিনা পুরীর এই উদয়াস্ত শোভা কোন চিত্রকর তাঁহার চিত্রফলকে ফলাইতে পারিয়াছেন কিনা। তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সমুদ্রস্নান এখানকার একটি প্রধান আরাম। কিন্তু বলদ্বারা লইতে না জানিলে এ আরামটিকে সহজে আয়ত্ত করা যায় না। ছলে বলে কৌশলে তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া যদি আপনাকে ঠিক রাখিতে পারা যায়—তবেই সমুদ্রস্নান পরিতৃপ্তিকর, নহিলে কেবল আতঙ্কই সার।

এখানকার মৎস্যজীবি সমুদ্রনাবিকগণ 'নুড়িয়া' নামে অভিহিত। স্নানের সময় তাহাদিগের একজনকে সঙ্গে রাখিলে আর কোন ভয় ভাবনা থাকে না। এজন্য একজন নুড়িয়াকে দুই আনা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হয়। ইহাদের অনেকেই বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে।

ইংরাজেরা প্রায়ই তিনচার জনে সার বাঁধিয়া সার্কাশের ক্লাউনের বেশে—অর্থাৎ তিন কোণা বেতের টুপি ও ইজার বডি পরিয়া দুই দিকে দুইজন নুড়িয়াকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রে নামেন। দূর হইতে পাহাড়ের মত উচ্চ ঢেউগুলা নৃত্য নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—তীরে দণ্ডায়মান নূতন দর্শক আমরা ভীত হইয়া মনে করি এই বুঝি চুবাইয়া দিল এদের! আর বুঝি রক্ষা নাই! কিন্তু তরঙ্গ মাথার উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা লাফাইয়া উঠেন, তরঙ্গ তাঁহাদের ডিঙ্গাইবে কি তাঁহারাই তরঙ্গকে ডিঙ্গাইয়া দাঁড়ান। অনবরত এইরূপ যুঝাযুঝি ও লম্ফে ঝম্পে তরঙ্গবল ব্যর্থ করিয়া তাঁহারা স্নান সমাপন করেন। আর ক্ষুদ্র মানবশক্তিকে পরাজিত করিতে না পারিয়াই যেন ক্ষুব্ধ মহা সমুদ্র বল সঞ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে উন্মত্ত উদ্দাম-ভাবে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে কূল হইতে আবার অকূলে ফিরিয়া যান।



সমুদ্র স্নান

শ্রীযুক্ত সুরীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ভীম তরঙ্গের উপর ক্ষুদ্র মানুষের এত সহজ প্রভুত্ব দেখিয়া আমার মনে হইত, সংযমই সিদ্ধিলাভের প্রকৃত পথ। বাসনা তখনই সম্পূর্ণ সফল হয় যখন বাসনাকে জয় করা যায়। সমুদ্রের জয় তখনই যখন সে বাসনায় উন্মত্ত না হইয়া ধীর প্রশান্তভাবে তলদেশ হইতে জাহাজকে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড ঝড়েও



পুরীর নুড়িয়া

শ্রীযুক্ত সুরীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

রক্ষা আছে—তাহাতে আর রক্ষা নাই। নুড়িয়াদিগের কি মাংসপেশীবহুল দেহ! কি বলিষ্ঠ মূর্ত্তি! কি অসম সাহস। ভীষণ তরঙ্গকেও উপেক্ষা করিয়া ইহারা সময়ে অসময়ে ছোট ছোট তরণীগুলি অকূলে বাহিয়া চলে, ভয়ডর কাহাকে বলে যেন জানে না। দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহারা উড়িয়া, এ দেশেরই লোক। ভীরু বলিয়া উড়ে-দিগের একটা অপবাদ আছে—কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতেছি ঠিক বিপরীত,—এই জেলেরা যেন মূর্ত্তিমন্ত সাহস,—স্বজাতির ভীরুতা কলঙ্ক পূর্ণমাত্রায় ইহারা ক্ষালন করিয়াছে! সমতল বাঙ্গলাদেশের মাটী কামড়াইয়া থাকিলে চলে, সমুদ্রের বেলা ত এ কথা বলা যায় না—সমুদ্র উড়িয়াদিগকেও এরূপ সাহসী করিয়া তুলিয়াছে, মনে মনে কত না আনন্দ উপভোগ করিতাম!

হায়! সহসা একদিন আমার এতখানি আহ্লাদ এবং এমন মস্ত একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমূল ধূলিসাৎ হইল। শুনিলাম নুড়িয়ারা উড়িয়া নয়; (ন-উড়িয়া নুড়িয়া)। ইহারা মান্দ্রাজি তৈলঙ্গী এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তখন মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল! সমুদ্রতীরবাসী উড়িয়াও, সমুদ্রগাহনকুশল নহে! ইহার জন্য অন্যের শরণাপন্ন! হায় হায়! এ মুলুকের সকলই আশ্চর্য্য! জগন্নাথজি ত আশ্চর্য্যের পরাকাষ্ঠা!

একজন সেদিন বলিতেছিলেন জগন্নাথ এ দেশের লাট সাহেব,—কথাটা সঙ্গত মনে হইল না। জগন্নাথজি হইতেছেন এ দেশের সম্রাট; আর লাট সাহেবের দল তাঁহার পাণ্ডাগণ। ইহারা সংখ্যায় বড় অল্প নহে,—মন্দির দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের খাস দরবার পর্য্যন্ত কত যে পাণ্ডা তাহার সংখ্যা নাই। ভগবানকে লাভ করিতে খৃষ্টানদিগের এক-মাত্র যিশু খৃষ্টকে প্রসন্ন করিতে হয়—এখানে

এই অসংখ্য পাণ্ডার দলকে বশে আনিয়া তবে জগন্নাথের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে! বড় সহজ কথা নয়! তাই যাত্রার সময় মনে মনে বেশ একটু ভীত হইয়া সঙ্গের বশীকরণ থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া লইতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু মন্দিরে গিয়া বুঝিলাম ভয় জিনিষটা রবারের থলির মত ফুলাইলে খুব ফোলে বটে কিন্তু থাবড়াইয়া দিলে একেবারেই চ্যাপটা হইয়া যায়। পঞ্চ তঙ্কাতেই খাস দরবারের পাণ্ডা-গণ সন্তুষ্ট হইয়া গেল—আর দ্বারের, দালানের ও অন্যান্য নানাস্থলের সঙ্গধারী প্রহরী-পাণ্ডা প্রত্যেককে দুই চারি আনা দিয়াই ঠাণ্ডা করিলাম। অনেকে পাণ্ডাদিগের এই দৌরাত্ম্য অসহ্য মনে করেন—আমার কিন্তু তাহা মনে হইল না। মন্দির দর্শনে যে আনন্দলাভ হয়—তাহার কাছে এ লাঞ্ছনা, অর্থব্যয়—কিছুই নহে।

মন্দিরের বর্ণনা আর কি করিব—

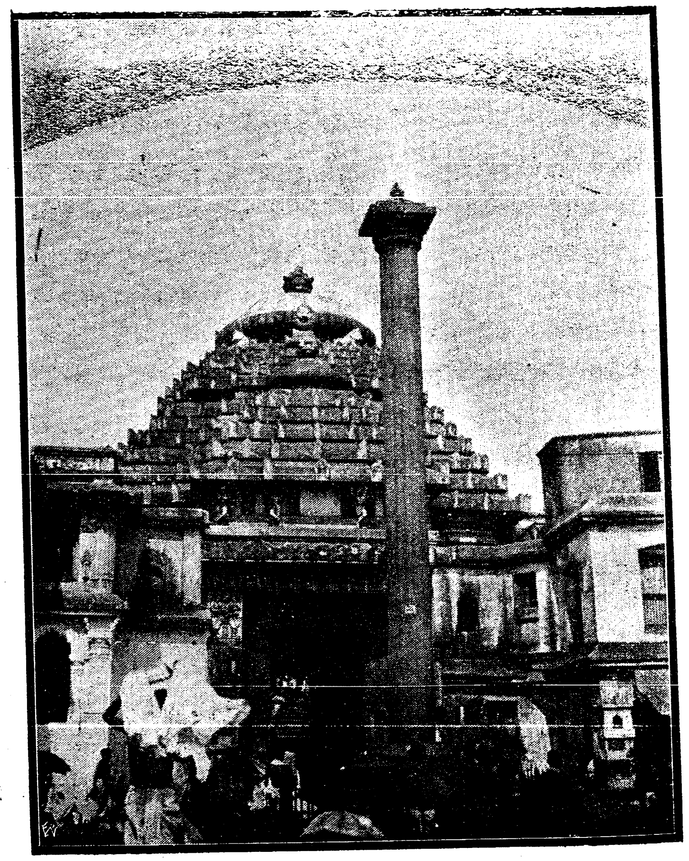

জগন্নাথের মন্দির

চিরকাল ধরিয়া বর্ণনা করিয়াও কেহ ইহার পরিপূর্ণ বর্ণনা করিতে পারেন নাই।* কি প্রকাণ্ড মন্দির! অথচ বাহির হইতে মনেই হয় না—মন্দির তেমন বড়। ভিতরে প্রবেশ কর—বড় বড় দালানের পর দালান,—প্রত্যেক দালানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। থামে থামে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দেয়ালে দেয়ালে, চূড়ায়, দরজায়,—ভিতরে বাহিরে কেবলই ক্ষোদিত মূর্ত্তি। কোথাও প্রকাণ্ড, কোথায় ক্ষুদ্র,—কোনটি রাখিয়া কোনটি দেখিব বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাচীর মধ্যে ছোট বড় ১২০টি মন্দির আছে, বলা বাহুল্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দিরটি জগন্নাথের। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি তোরণ! পূর্ব্ব তোরণটি সিংহদ্বার এখানে দুইটি সিংহ বিরাজিত,—দক্ষিণ তোরণ অশ্বদ্বার অশ্বমূর্ত্তি-যুক্ত,—উত্তরে হস্তী মূর্ত্তি—তাই ইহার নাম হস্তীদ্বার, পশ্চিম তোরণ রক্ষকমূর্ত্তিশূন্য, ইহার নাম খাঞ্জাদ্বার। শুনিলাম মন্দির চূড়ার গম্বুজ সমগ্র একখানি পাথর কাটিয়া প্রস্তুত। গম্বুজের চারিধারের চারিখানা বড় পাথরও নাকি জোড়হীন আস্ত পাথর। এখানে লোকপ্রবাদ এই যে, জগন্নাথজির মন্দির একটা বড় পাহাড়কাটা মন্দির!—অসম্ভব নহে,

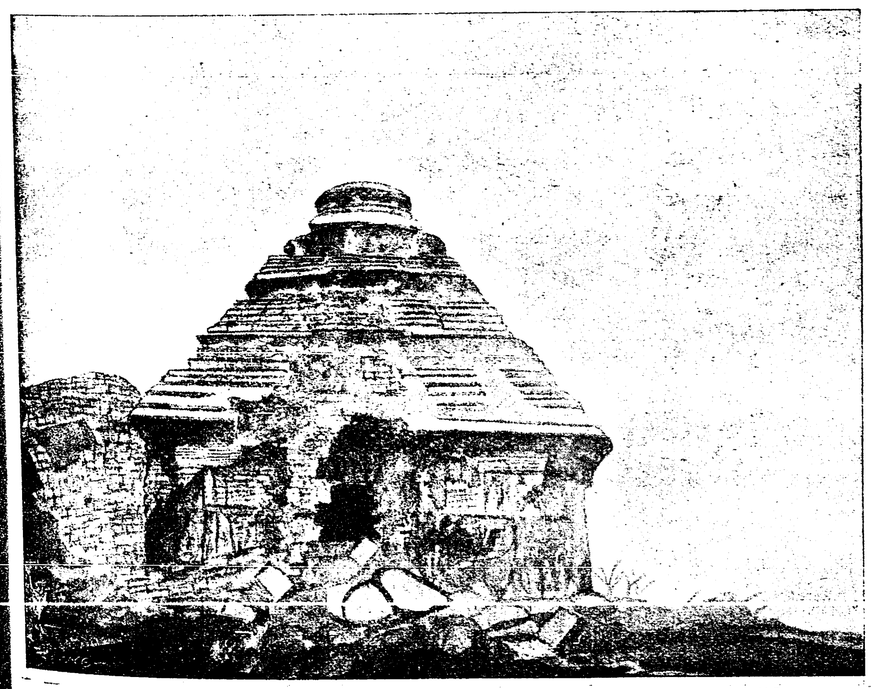

কণারকের ভগ্ন-মন্দির

* ১৩১৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীর নীলভূধর নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কি করিয়া তাহা হইল? পুরীর ত্রিসীমায় ত একটি ছোট পাহাড়ও দেখা যায় না। বোম্বাই প্রদেশে অনেক বড় বড় মন্দির দেখিয়াছি—মহাভারত কথিত বহু পুরাতন প্রসিদ্ধ গোকর্ণ মন্দির দেখিয়া কত না বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এমন কারুকার্য্য, এমন বিস্ময় জনক কার্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। ভুবনেশ্বর মন্দিরের কারু কার্য্য নাকি আরও উৎকৃষ্ট। ইচ্ছা আছে একবার দেখিয়া আসিব, জানিনা অদৃষ্টে সে পুণ্যলাভ ঘটিবে কি না!

শোনা যায় জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী অরুণস্তম্ভ কণারকের সূর্য্যমন্দির হইতে তুলিয়া আনিয়া এখানে প্রোথিত করা হইয়াছে। জগন্নাথজির ভোগ মণ্ডপের দরজার উপরে যে নবগ্রহ মূর্ত্তি আছে তাহাও নাকি কণারকের সূর্য্য মন্দিরের অংশ বিশেষ।

আমরা এই বিশ্বসৃষ্টিতে দেখিতেছি—সৃষ্টিকে বড় করিয়া গড়িয়া স্রষ্টা নিজে তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখানের মন্দিরের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি গুলি আপনাদের গঠন সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে জগন্নাথদেবকে একরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তিতে একেবারেই শিল্প-সৌন্দর্য্যের অভাব। বস্তুতঃ এ মূর্ত্তি নিরাকার ব্যঞ্জক;—তাই ভক্ত এই মূর্ত্তিতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিয়া থাকেন। চৈতন্য এইরূপ দেখিয়াই পাগল হইয়াছিলেন। এখানকার একজন পাণ্ডা বলিল, জগন্নাথ



আঠারো নালা

শ্রীযুক্ত কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে



মুক্তি হবেনা দেবদর্শনে তীর্থে পাণ্ডা বিনা;
ভক্তি সে হোক্ যেমন তেমন, ষোল আনা দক্ষিণা!

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

বুদ্ধদেবের অবতার—তিনি নিরাকার। বুদ্ধদেব এবং নিরাকার ভগবানকে তাহারা এক করিয়া তুলিয়াছে। জগন্নাথদেবের পীঠস্থান ঘোর অন্ধকার,—এই অন্ধকার মধ্যে রত্নসিংহাসনে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি একত্র বিরাজিত।

এমনই অভিভূত হইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলাম। যে তাঁহার প্রকোষ্ঠসম্মুখের অন্ধকার দালানে মেজের উপর যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা দেখি নাই। আর একটু হইলে তাহার উপর গিয়া পড়িয়াছিলাম আর কি। কে একজন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। এই পুণ্য মৃত্যু হইতে বাধা দিয়া সে কি পুণ্য লাভ করিল!

শ্রীক্ষেত্রের অন্নছত্রের দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। হিন্দুর আচারপ্লাবিত দেশে বুদ্ধদেবের উদার ধর্ম্ম-মহিমা আজিও এই অনুষ্ঠানে সমুজ্জ্বল



গুণ্ডোবাড়ী

হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের মহিমা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হয়। কোন্ ধর্ম্ম এমন প্রচার লাভ করিয়াছে! কোথায় না ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজিত! অধুনা সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের লুপ্ত কীর্ত্তির আবিষ্কার হইতেছে!

চৈতন্যদেব বহুপ্রয়াসেও জাতিভেদ উঠাইতে পারেন নাই। এমন কি ভক্ত মুসলমানকে জগন্নাথ মন্দিরে লইয়া যাইবার প্রয়াসও তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল। এই খেদে তিনি মন্দির চূড়ায় জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিভেদে সকলেরই নিকট এই মূর্ত্তি প্রকাশিত। এইরূপ জাতিবর্ণপ্রভাবসমাচ্ছন্ন ভারতে শ্রীক্ষেত্রের অন্নছত্র বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মহাকীর্ত্তি।

জগন্নাথ মন্দির ছাড়া পুরীতে দেখিবার স্থান আরও অনেক আছে, গুঞ্জোবাড়ী, আঠারনালা, চন্দন সরোবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুঞ্জোবাড়ী জগন্নাথদেবের গ্রীষ্মাবাস-মন্দির। রথযাত্রাকালে এইখানে ত্রিমূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়।

আঠারনালা একটি সেতুর নাম। এ সেতু বিনা-খিলানে নির্ম্মিত! আঠারটি নালার প্রত্যেকটির স্তম্ভচূড়ায় তির্য্যকভাবে সজ্জিত পাথরের সারির উপর এই সেতু স্থাপিত।

চন্দন সরোবরের জল অতিশয় নির্ম্মল। ইহার বক্ষে একটি কৃত্রিম দ্বীপ এবং চারিদিকেই বাঁধা ঘাট। ঘাটের প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়িগুলি জলের মধ্যে ঝক ঝক করিতেছে—দেখিতে বড় সুন্দর।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

আশ্বিন, ১৩১৯।

গোরিয়াঁ

সে বনলতাটি আপনার নবকোমল জীবনবৃন্ত দিয়া বাংলার রাজধানী গৌড়ের জীর্ণ কঙ্কালটা জড়াইয়া ধরিয়া, সেন-রাজত্বের চিতাসজ্জার উপরে এক বাদল দিনের কাজল আলোয় নিজেকে প্রথম বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল; এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইতে আসিয়া এক বিদেশী, গহনে গভীরে —বিরাট অরণ্যের অন্ধতম-স্তব্ধতার মাঝখানে, জনশূন্য গৌড় জনপদের পরিত্যক্ত রাজপুরে, পাষাণ-শয্যাশায়িতা সেই বনলক্ষ্মীকে প্রথম সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন;—এইরূপ একটা নবন্যাসের টুকরায়, মনের সহজ অবস্থায়, বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু সেদিন বর্ষার প্রভাতে, একটা সুখস্পর্শ শীতলতার মাঝখানে নিজেকে টানিয়া লইয়া, কলিকাতার গলির মাঝে আমাদের বাগানখানির সুগভীর শ্যামলতায় সম্পূর্ণ ডুব দিয়া আমি একা বসিয়াছিলাম; এবং বৃষ্টি-জলে সতেজ পুষ্প-পল্লবের বিপুলতার উপরে দিনের উন্মেষ, ও বাগানের একটি গোপন কোণ হইতে নব বর্ষার সদ্য প্রস্ফুটিত গৌড়ি ফুলের মৃদু গন্ধ আমার একটা স্বপ্ন দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। এই অবস্থায় সেদিন যাহা কতকটা দেখিয়াছিলাম, কতকটা বা শুনিয়াছিলাম তাহা এই—

পিতা আমার গৌড়-রাজবংশের শেষ বংশধর। ইতিহাস তাঁহাকে জানে না। গৌড়ের রাজসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবার পর, দুর্দ্দশা হইতে দুর্দ্দশায়, দুঃখ হইতে দৈন্যে, অনন্যসাধারণ রাজমহিমার গৌরব-শিখর হইতে অনাড়ম্বর একটা সাধারণ পরিসমাপ্তির মাঝে কবে যে পিতা আমার ধূলিধূসর, হীনতায় মলিন, অবজ্ঞা ও অবমাননায় বিশীর্ণ জীবনের ছিন্ন কন্থা বহন করিয়া আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও কেহ জানে না।

আমি সেই দরিদ্র পিতার একমাত্র দুহিতা গৌরী।

মৃত্যুকালে নিঃস্ব পিতা গৌড়-রাজকুমারী-গণের স্বাভাবিক গৌরকান্তির উপরে অনির্ব্বচনীয় পাণ্ডুপ্রভাটুকু ছাড়া আমাকে আর কিছুই দিয়া গেলেন না বটে কিন্তু নির্ব্বাণের মুখে প্রদীপের সবটুক যেমন ক্ষীণ একটি শিখায় আপনাকে জাগাইয়া তোলে তেমনি সুবৃহৎ গৌড়-রাজপরিবারের যত মহিমা, যত কালিমা সমস্ত আমার সুপাণ্ডুর গৌর তনুখানির অন্তর বাহির আশ্রয় করিয়া নূতন তেজে শেষ বার জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বালায় আমি নিজেও জ্বলিয়াছিলাম—পরকেও জ্বালাইয়া ছিলাম।

যে দেবীর নামে আমার নাম তিনি ছিলেন দেবী গৌরী—আর আমি ছিলাম মৃত্যুর ন্যায় পাণ্ডুশ্রী, শোণিতপিপাসিনী একটা রাক্ষসী! কিন্তু তবু আমাকে লোকে বলিত গৌরী—প্রেয়সী—দেবী!

ষষ্টি-সহস্র অভিশপ্ত সগর-সন্তানের মত আমার পিতৃগণ যখন আমার নারী-জীবনের ক্ষীণ ধারাটুকুর দিকে সতৃষ্ণ চাহিয়া ছিলেন তখন আমি সেটিকে সুপবিত্র সাগর-সঙ্গমের দিকে না বহাইয়া দিয়া, গৌড় বাদশাহের রংমহালের দিকেই লইয়া চলিলাম —কুটিল পঙ্কিল পথে, তরঙ্গায়িত যৌবনের উদ্দাম শক্তিবলে সমস্ত বাধাকে বিচূর্ণ করিয়া!

হায়! প্রমোদ এবং বিলাস-বিচিত্র যবনিকার অন্তরালে সে দিনের কথা আমার আজও মনে পড়ে—যেদিন আমার গৌরী নাম গোরিয়াঁ। এই তিনটি অক্ষরের মধুর মদির অলস ছন্দের মাঝে আপনাকে প্রথম ধরা দিয়াছিল।

তারপর যেদিন গৌড়ের দিকচক্রবাল অগ্নিদাহ আর চিতা-ধূমে বেষ্টন করিয়া, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী প্রলয় তাণ্ডবে ভীষণ আবর্ত্তের মত আসিয়া দেখা দিল, সেদিন আমি বা কোথা রহিলাম, কোথা বা রহিল আমার সে স্বপ্ন-রাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসন! ঘূর্ণ জলে দীপালির প্রদীপটির মত আমার কম্পমান জীবনটুকু লইয়া সহসা একটা অতলের তলে নামিয়া গেলাম।

তারপর, আবার যেদিন প্রভাতের আলোয় ফিরিয়া আসিলাম সেদিন দেখিলাম আমার জীবন প্রদীপ তার সমস্ত মহিমা, সমস্ত কালিমা লইয়া নিভিয়া গেছে এবং আমি মৃত্যুর একটা অপূর্ব্ব প্রশান্তির মাঝে আমার নিষ্কলঙ্ক পাণ্ডুশ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাতের বিদ্যালয়

আজকাল এদেশের শিক্ষাবিধি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে এখানকার ভাল বিদ্যালয়ে গিয়ে আমি বিশেষ কোনো ফল পাইনে। যে প্রণালী একেবারেই আমাদের অসাধ্য তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লাভ কি! আমার ত মনে হয় এত অত্যন্ত বেশি আয়োজনের জটিলতা সফলতার লক্ষণ নয়। যেমন বড়-মানুষের ছেলেরা অত্যন্ত বেশি খেলনা পায় বলে তাদের খেলার যথার্থ সুখ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি ছাত্রদের মনকে বাইরের থেকে নানা উপায় ও কৌশলের দ্বারা অত্যন্ত বেশি নাড়া দিতে থাকলে বাইরের দিকটাতে তাদের চিত্তের গতিকে বাড়িয়ে তোলা হয় বটে কিন্তু ভিতরের দিকে নিশ্চয়ই জড়ত্ব সঞ্চার করা হয়। মনকে অতিশয় আনুকূল্য করলে তার স্বাভাবিক সৃজন-চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার আনন্দকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি এই সমস্ত আসবাবগুলোকে বিদায় করবার জন্যে একদিন এদের মালগাড়ি ডাক্‌তে হবে। কেননা আসবাবের আধিক্যে মানুষের জায়গা কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌চে—ধন যত বড় হয়ে উঠ্‌চে ধনী ততই ছোট হতে চলেছে। আমার বোধ হচ্চে যেন একথা এরা এখনি বুঝতে আরম্ভ করেছে; —এখন থেকে এরা রিক্ত হবার সাধনায় প্রবৃত্ত হবে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তিলাভের জন্যে এদের অনেক বীরকে প্রাণপাত করে সংগ্রাম কর্‌তে হয়েছে—এবার বহির্বস্তুর বিপুল বন্ধনজাল থেকে মনকে মুক্তি দেবার জন্যে এদের অনেক তপস্বীকে তপস্যা করতে হবে। আমাদের মুস্কিল হবে এই যে এরা যেগুলো ফেলে দিতে থাক্‌বে আমরা সেগুলো সস্তায় পাব বলে কুড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে থাক্‌ব। য়ুরোপের আবর্জ্জনার বোঝা বোধ করি একদিন আমাদেরি টানতে হবে। আমাদের ধনীদের ঘরে এখনি তার লক্ষণ দেখা যায়। উপায় নেই। বস্তুর মোহের মধ্য দিয়ে না গিয়ে বোধ হয় তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না। দরিদ্র বোধ হয় সত্যভাবে মহৎভাবে দরিদ্র হতে পারে না—দু হাতে ধন ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে তবে তাকে দরিদ্র হতে হবে—যে পূর্ণ হয়েছে সেই ত রিক্ত হবার আনন্দ ভোগ করতে পারে, যে শূন্য সে কেমন করে পারবে? সেই জন্যই দেখ্‌চি য়ুরোপের বস্তুর বোঝা আমাদের মত দীন দরিদ্রের মনকে কেবলি মুগ্ধ করচে। আমরা হাত বাড়িয়ে বলচি ঐ মোট মাথায় তুল্‌তে না পারলে আমাদের আর মুক্তি নেই। অথচ দেখ্‌তে পাচ্চি এই বোঝার ভারেই য়ুরোপের চিত্তের মধ্যে একটা গভীর ক্রন্দন উঠতে আরম্ভ করেছে। সে একদিন নিশ্চয়ই বল্‌বে—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্, আজ তারই ভূমিকা হচ্ছে। য়ুরোপ যখন বল্‌বে আমি অমৃত চাই, তখন হয়ত আমরা বল্‌তে থাকব আমরা উপকরণ চাই। মানুষের আত্মার চেয়ে তার উপকরণকে বিশ্বাস করবার অন্ধ প্রবণতা আমাদের মধ্যে

ব দেখা দিয়েছে সে ত দেখ্‌তেই পাচ্চেন। আমরা কেবলি লোভ করচি। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—এ কথাটার মানে আমরা ভুলে সেছি। এ কথার মানে এই, বস্তুর কাছে াত বাড়িয়ো না, তাঁর দ্বারে দাঁড়াও। তিনি যা দেন সে ত হাতের মুঠোর উপরে ন না, তার ত ভার নেই, সে তিনি ীবনের ভিতরে সঞ্চার করে দেন—সে ম্পদ আমাদের আত্মারই অংশ হয়ে যায় তরাং তাকে লোহার সিন্ধুকে ভরতে হয় া। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" একথার পরে আমরা ভরসা রাখতে পারিনে—কননা, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এ কথাটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা নিজেকে দিয়েই সমস্তকে আবৃত করেছি। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক হতে হবে। বস্তুর উপরে বিশ্বাস, যান্ত্রিক প্রণালীর উপরে নির্ভর আমাদের আশ্রমের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে কখনো মোহন বেশে কখনো বিভীষিকার আকারে দেখা দেয়। কিন্তু তার প্রতি যদি দৃকপাত না করেন তাহলে দেখ্‌তে পাবেন সে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করবে। আমাদের আশ্রমের ইতিহাসে যা দৈত্যরূপে বাধারূপ দেখা দিয়েছে তা ছায়ার মতই নিজের কোন পদচিহ্ন না রেখে চলে গিয়েছে তা বারবার দেখেছি—ধনীর সাহায্যের দ্বারা আমরা ধনবান হয়নি একথাটি কোনো-দিন ভুলবেন না।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুম

(Paul Parfaitর ফরাসী হইতে)

এখনো চারি বৎসরে পড়ে নাই, ইহারই ধ্যে তাহার পরিবারের লোকেরা, তাহার দৃষ্ট খুব ভাল বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে াগিল। তাহার পিতা তাহার মাথায় হাত াইয়া বলিলেন:—"এ ছেলেটা একটা কিছু রবেই করবে।"

এই কথাটা কাজে ফলিবে বলিয়া কোন ক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায় নাই; কেননা, লক পড়াশুনায় যে খুব মেধা ও তীক্ষ্ণ দ্ধির পরিচয় দিয়াছিল তাহা নহে। বালক ঠশালয়ে, অঙ্কশাস্ত্র ও ল্যাটিন-পদ্যরচনা অপেক্ষা, ব্যবসায়-বুদ্ধিরই বেশী পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু তাহার এক কাকা ঠিকই বলিয়াছিলেন, ল্যাটিন প্রভৃতিতে পারদর্শী হইলে জীবিকার কোন উপায় হইবে না। উহাতে বিশেষ কিছু লাভ নাই।

বাল্যদশা পার হইয়া আমাদের গল্পের নায়ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিল। একদিন সে হঠাৎ একটা বৃহৎ সংকল্প লইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। এরূপ বৃহৎ সংকল্প সচরাচর কাহারও মাথায় আসে না।

---

* বিলাতের চিঠি হইতে।

আমার একটা কিছু করা চাই! এই "একটা কিছু" সামাজিক নাটক হইবে, কি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইবে, কি দার্শনিক নিবন্ধ হইবে, তাহাই সে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ইহা নির্দ্ধারণ করা একটা গুরুতর ব্যাপার! তবে এইমাত্র স্থির ছিল, একটা কিছু বড় কাজ করিতে হইবে;—একটা বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে।

সে ভাবিল, ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে, তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইজন্য, তাহার শক্তির লেশমাত্র যাহাতে অপব্যয় না হয় সে বিষয়ে সে খুব সতর্ক থাকিত। তাই এখন কোথাও তাহার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইত না। জনসাধারণকে তাহার গভীর চিন্তার সারটুকু উপহার দিবে বলিয়া সে একাগ্রতা অবলম্বন করিল। তাহার গ্রন্থে কি বিষয় লিখিতে হইবে তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু যাই হউক, তাহার পূর্ব্বেই গ্রন্থের একটা নাম স্থির করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিল। এই বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। যেরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সে লিখিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে তাহার উপযুক্ত একটা খুব জাঁকালো নাম হওয়াই সঙ্গত। ঐ গ্রন্থ হইতে বিশ্বমানব অশেষ শিক্ষা লাভ করিবে এই মনে করিয়া একটা নাম তাহার মাথায় আসিল। সে স্থির করিয়া ফেলিল।

আমার গ্রন্থের নাম হইবে—ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব কল্পদ্রুম! চমৎকার নাম হইয়াছে; উহাতে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ সবই বলা হইয়াছে! বিষয় নির্ব্বাচনের পথ মুক্ত রহিল, এবং যত বড় কথাই মনে আসুক না উহার মধ্যে পুরিবার কোন বাধা হইবে না। ছোট কাঠামের ভিতর বড় জিনিস প্রবে করান বড়ই দুষ্কর ও বিরক্তিজনক!

যাহারা জিজ্ঞাসা করিত:—তোমার ছেলে তবে কিছুই করচে না?

আমাদের নায়কের ভাগ্যবান পি তাহাদিগকে উত্তর দিতেন:—একটু অপে কর না, দেখে নিও ও একটা-কিছু করবে করবে।

কিছুকাল পরে, আমাদের নায়কে ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, তাহাদের বন্ধু একটি বৃহৎ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ যেহেতু এখনও বন্ধুদিগের মধ্যে ইর্ষ্যা কোন কারণ ঘটে নাই, তাহারা পূর্ব্ব হইতে গ্রন্থের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল।

আর আমাদের নায়ক, ধ্যানস্তিমি লোচনে এক্ষণে রাস্তা দিয়া চলিতেন,—যে কি একটা গভীর বিষয়ের চিন্তায় নিম তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, গ্রন্থের যে বৃহৎ নাম, তদুপযুক্ত জিনিস জনসমাজে কি-উপহার দেওয়া যাইতে পারে।

একজন স্থূলকায় বণিক এই গ্রন্থ রচনা কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁর একটি ক ছিল। এই কন্যার উপর, পণলুব্ধ অনে যুবকেরই সতৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বণি বলিলেন:—

এই ছেলেটি খুবই খাটিতেছে। অত গ্রন্থ এক সময়ে অবশ্যই বাহির হইবে আমার কন্যার জন্য এইরূপ বরই চাই আমার জামাতার সম্পত্তি থাক্ বা না থা

তাতে কিছু আসে যায় না, আমি শুধু চাই, সে একটা কিছু করে।

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুমের ভাবী গ্রন্থকার একটা কিছু লিখিবার জন্য মাথা খুঁড়িতেছিলেন; তাঁহার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য এই উদ্দেশেই যথাসাধ্য নিয়োগ করিতেছিলেন—ইতিমধ্যে অনেক টাকার একটি ভূসম্পত্তি এবং তার সঙ্গে একটি রূপসী পত্নী যেন আকাশ হইতে ঝপ্ করিয়া তাঁহার পদতলে আসিয়া পড়িল।

এই ক্ষুদ্রকায় সুশ্রী মেয়েটি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল,—এক বৃহৎ গ্রন্থ-রচয়িতার সহিত তাহার বিবাহ হইবে; তখন হইতেই ভাবী পতির প্রতি তাহার ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভাগ্যবান সেই পুরুষ যাহাকে তাহার ভাবী পত্নী বিবাহের পূর্ব্বেই দেবতার ন্যায় ভক্তি করে! তাই, বিবাহের পর, পতির সহিত ঘর করিবার সময়, দাম্পত্য গগনে একটিও কালো মেঘ দেখা দেয় নাই।

তাহার পত্নী তাহার স্বামীকে সংসারের খুঁটিনাটি কিছুই ভাবিতে দিত না। সে নিজেই অতি যত্নের সহিত সে সমস্ত সম্পন্ন করিত। কেননা, সে জানিত, তাহার স্বামীর মস্তিষ্ক এক্ষণে বৃহৎ গ্রন্থরচনারূপ একটা গুরুভার বহন করিতেছে আর কিছু ভাবিবার তাঁহার সময় নাই।

যেদিন তাঁহার মেজাজ খারাপ থাকিত, তখন তাঁহার পত্নী ভাবিত:—তাঁহার ইচ্ছা-মত গ্রন্থের রচনাকার্য্য অগ্রসর হইতেছে না, তাই আজ মেজাজটা খারাপ হইয়াছে।

যদি কখন তাঁহার মাথা ধরিত, তাঁহার স্ত্রী বলিত:—তোমার বড় বেশী খাটুনি হচ্ছে, অতটা পরিশ্রম করা ঠিক্ না।

এই বলিয়া, তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কাগজপত্র ও তাঁহার পুস্তক সকল কাড়িয়া লইত। কেননা, তাঁহার টেবিলটা অসংখ্য কাগজপত্রে আচ্ছন্ন থাকিত,—তাহার চারিধারে পুস্তক সকল ইতস্ততঃ ছড়ান থাকিত। তিনি তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া থাকিতেন এবং প্রহরের পর প্রহর এইরূপ ধ্যানচিন্তায় অতিবাহিত হইত। কোন কাজ হইত না। কিন্তু এই কাজটিকে তিনি একটা প্রহসন বলিয়াও মনে করিতেন না। না—একটুও না। এই বিষয়ে যার-পর-নাই তাঁহার আন্তরিকতা ছিল —ইহাতে লেশমাত্র শঠতা ছিল না।... অন্যদের নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহার নিজেরও একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি একটা বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিজন প্রদেশে কাজটা আরও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে মনে করিয়া তিনি পল্লীগ্রামে একটা বাড়ী ভাড়া করিলেন। সেখানে গিয়া নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়াইতেন; বড় বড় গাছের ছায়া-তলে সটান শুইয়া পড়িয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার স্ত্রী যখন পাড়াপড়সীর বাড়ীতে দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইত সেই সময়ে তাহাদের নিকট সরল-অন্তঃকরণে তাঁহার স্বামীর প্রকাণ্ড গ্রন্থরচনার কথাটাও পাড়িত এবং এইরূপে ভাবী গ্রন্থকারের খ্যাতিটা মুখে মুখে আরও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

যদি কখন তাঁহার পত্নী কোন বাড়ীতে একক সাক্ষাৎ করিতে যাইত, তখন সে এই কথা বলিত:

—মাপ করবেন, আমার স্বামী আস্‌তে পারলেন না,— তিনি একটা কাজে এত ব্যস্ত...

শেষ দুইটি শব্দের উপর একটু বেশী ঝোঁক দিয়া কষ্টের স্বরে বলিতেন।

আর যদি কেহ তাহাকে আহারের জন্য কিংবা দিনটা একসঙ্গে কাটাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিত, তখন সে থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিত :—

—কথা দিতে আমার সাহস হয় না। আমার স্বামীর হাতে একটুও সময় নাই...যে প্রকাণ্ড কাজ হাতে নিয়েছেন!...

শরতের অবসানে, ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুমের ভাবী গ্রন্থকার প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া সুখী হইলেন; কেননা, তাঁহার মনে হইল, প্যারিসেই তাঁর কাজটা ভাল রকম চলিবে। পল্লীগ্রামে যাওয়াটা তাঁহার ভুল হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাকল্পদ্রুমে ফুল ধরিবার পক্ষে পল্লীগ্রামের হাওয়া উপযোগী নহে।

শীতকাল চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে প্যারিসের সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার "কল্পদ্রুম" সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুদের আশঙ্কা হইল, কি জানি যদি আর কেহ ঐ নামে একটা গ্রন্থ আগে-ভাগে ছাপাইয়া তাঁহার ভাবী কীর্ত্তিটাকে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা হইলে তাঁহার এত দিনের শ্রম সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

এই ভীষণ সংকট নিবারণ করিবার জন্য, আমাদের ভাবী গ্রন্থকার প্যারিসের প্রাচীরে প্রাচীরে এই বিজ্ঞাপনটি আঁটিয়া দিলেন।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে :

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুম।

শ্রীঅমুক-কর্ত্তৃক রচিত...

প্রকাণ্ড তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য ২০৲ টাকা

এই দিন হইতে, শুধু তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকটে নহে,—সমস্ত জনসাধারণের নিকট তিনি "কল্পদ্রুমের" গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রাদিতে এইরূপ লেখা বাহির হইত :—"গতকল্য প্যারিস বার্ত্তাবহের সম্পাদককে "শ্রীঅমুকের" বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই "কল্পদ্রুমের" খোঁজখবর লইয়া আসিয়াছেন।"

অথবা :—"এই শীতকালে "কল্পদ্রুম" বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। গ্রন্থকার তাঁহার বৃহৎগ্রন্থ ছাপাখানায় পাঠাইতে যাইতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, আবার আদ্যোপান্ত নূতন করিয়া লিখিতে হইবে, আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ খাঁটি সত্যনিষ্ঠা সাহিত্য-জগতে দুর্লভ।"

অথবা :—"কল্পদ্রুম" গ্রন্থখানার কিয়দংশ সাহিত্য-পরিষদে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গতকল্য পঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "শ্রীঅমুকের" অসুস্থতা বশতঃ উহার পঠন স্থগিত হইল। বলা বাহুল্য, জ্ঞান-পিপাসু শ্রোতৃবর্গ দুর্লভ জ্ঞানামৃতপানে বঞ্চিত হইলেন।"

অথবা :—

"নিউ-ইয়র্কের ব্ল্যাক্‌সন-এণ্ড-সন্ কেতাব-ওয়ালা, "কল্পতত্ত্বদ্রুমের" অনুবাদের স্বত্বাধিকার লাভ করিবার জন্য শ্রী-অমুক" মহাশয়ের নিকট খুব একটা বেশী রকম মূল্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। ফরাসী সংস্কারের সঙ্গে

সঙ্গেই অ্যামেরিকান সংস্করটা বাহির হইবে।"

অথবা :—"তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার একটা বড় দুর্ঘটনা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একটা অম্‌নিবসে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার গাড়ী একটা চৌমাথা-রাস্তার কোণে উল্টাইয়া যায়। তাঁহাকে ও তাঁহার খাস-মুন্‌সীকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করা হয়। ঈশ্বরের কৃপায়, তাঁহার কোন আঘাত লাগে নাই। সাহিত্যের বন্ধুগণ সকলেই তাঁর দ্বার-রক্ষকের ঠিকানায় তাঁহার নামে অভিনন্দন-পত্র পাঠাইয়াছেন এবং তত্ত্বকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না মনে করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছেন।"

অথবা :—তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার শীঘ্রই ইটালিদেশ যাত্রা করিবেন। সেখানে কয়েক মাস অতিবাহিত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। ইটালী দেশের সরকারী দফ্‌তরের দলিল-দস্তাবেজ বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিবেন। যদি আমরা ঠিক সংবাদ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার গ্রন্থের একটা ঐতিহাসিক তথ্যসম্বন্ধে যে একটু সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, ঐ সকল লিপি-প্রমাণের দ্বারা তাহার ভঞ্জন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।"

যশের তুরীটাকে একচেটিয়া করিয়া রাখার একটা শাস্তি আছে। শীঘ্রই পাণ্ডুমুখশ্রী ঈর্ষ্যা অন্ধকারে বসিয়া, তত্ত্বকল্পদ্রুমের বিরুদ্ধে স্বীয় বিষদিগ্ধ বাণ শাণিত করিতে লাগিল। একজন ঈর্ষ্যাপরায়ণ অজ্ঞ সমালোচক সর্ব্বপ্রথমে বলিল, তাঁহার সুখ্যাতিটা হয়ত একটু বেশীমাত্রায় উঠিয়াছে। এই দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া আর এক সমালোচক এই মর্ম্মে ইঙ্গিত করিল যে, উনি একজন উচ্চ দরের লেখক নহেন; আর একজন বলিল, তাঁহার গ্রন্থে সমস্তই পুরাতন কথা; সর্ব্বশেষে একজন বলিল, তত্ত্বকল্পদ্রুম উহার নিজের রচনা নহে।

যাহাদের ঈর্ষ্যা উত্তেজিত হইয়াছিল, এই সব সমালোচনায় তাহারা আনন্দিত হইল; পক্ষান্তরে, যাহারা ন্যায়বিচারের অভিমান রাখে,—এই সব সমালোচনায় তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা উত্তর দিল, —যে গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ভাল কি মন্দ উহারা কি করিয়া জানিল? ইহাতে স্পষ্টই বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে। কিছু অন্যায় দেখিলে যুবকের দল সহিতে পারে না,—ইহা ধরা কথা। নিন্দার ফল এই হইল, যাঁহারা পূর্ব্বে কল্পদ্রুম-গ্রন্থকারের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎমাত্র ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে গ্রন্থকারের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ইহাদের মধ্যে একজন একটা চটি বাহির করিলেন; তাহাতে তত্ত্বকল্পদ্রুমের নিন্দুকদিগের মুখ হইতে মুখসটা টানিয়া ফেলিয়া তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরেই যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। দুই পক্ষের আক্রমণ ও উত্তর প্রত্যুত্তরে মুদ্রাযন্ত্র কয়েকমাস ধরিয়া মুখরিত হইয়া উঠিল।

একজন বলিল,—বর্ত্তমান যুগ-যে অবনতির পথে চলিয়াছে—এই তত্ত্বকল্পদ্রুমই তাহার পূর্ব্বসূচনা। আর একদল বলিল,—তদ্বিপরীতে উহা নবীন সাহিত্যের অরুণালোক সূচিত করিতেছে।

এই প্রকারে, রাম না জন্মাতেই,

রামায়ণের বিভিন্ন সংস্কার বাহির হইয়া গেল। কৌতুকের বিষয় এই—গ্রন্থের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না এই প্রশ্নটা কাহারো মাথায় আসিল না।

সে যাহা হউক, তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার দেখিলেন, তাঁহাকে লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে, এবং তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকগুলি বিদ্বজ্জন-সভায় এইরূপ স্থির হইল যে সভার প্রবেশ-দ্বার উক্ত গ্রন্থকারের প্রতি উদ্ঘাটিত করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমে, ডাকের চিঠির মত তিনি "অ্যাকাডেমি"তেও সহজে প্রবেশ লাভ করিলেন।

এদিকে গভর্ণমেণ্টও ভাবিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার নাম সকলেরই জিহ্বাগ্রে, এবং যিনি ভবিষ্যতে সাহিত্যজগতে সম্মান লাভ করিবেন,—এমন ব্যক্তির জন্য গভর্ণমেণ্ট এখনও কিছুই করিলেন না? গভর্ণমেণ্ট তাঁকে একটা সরকারী পুস্তকাগারে অধ্যক্ষপদ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন এবং সেই সঙ্গে এইরূপ আশাও প্রকাশ করিলেন যে, এই পদটি প্রাপ্ত হইলে, তিনি যে বৃহৎ গ্রন্থরচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন হইবার সুযোগ হইবে। এই পদটি একটা মোটা-বেতনের পদ ও বেশ আরামের পদ। বিশেষ কোন কাজ করিতে হয় না।

প্যারিসের প্রাচীরে প্রাচীরে যখন ব্রহ্মাণ্ড-কল্পদ্রুমের বিজ্ঞাপন প্রথম আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর ১১ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এরূপ গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কাহার হৃদয়ে না স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইবে?—কে না এইরূপ বলিবে?

—ইনি তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার! এই গ্রন্থরচনাকার্য্যে ইন ১১ বৎসর ধরিয়া খাটিতেছেন!

কালসহকারে এই শ্রদ্ধাভক্তি আরও গভীর হইয়া উঠিল। লোকের মুখে নিম্নলিখিত কথা যতই শোনা যাইতে লাগিল, ততই এই শ্রদ্ধাভক্তি আরও বাড়িতে লাগিল:—

—২০ বৎসর ধরিয়া···
—২৫ বৎসর ধরিয়া...
—৩০ বৎসর ধরিয়া...
} ইনি খাটিতেছেন।

তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, যশোগৌরবের গুরুভার আর যেন বহিতে পারিতেছিল না। যে মাথার ভিতর এত তত্ত্ব টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাতে শীঘ্রই টাক্‌ দেখা দিল। তিনি যখন কাফির দোকানে এক পেয়ালা চা পান করিবার জন্য প্রবেশ করিতেন, খান্‌সামা কাফি-ঘরের কর্ত্তার দিকে ঝুঁকিয়া বলিত:—

"উনি সেই "শ্রী-অমুক"...! উনি কৃতিত্বের চরম শিখরে উঠিয়াছেন।" অসংখ্য সাক্ষাৎকারী—আপনাদের সম্বন্ধেই হউক, অথবা তাঁহাদের প্রিয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেই হউক, তাঁহার গ্রন্থের এক পৃষ্ঠায় স্থান পাইবার আশায় আকৃষ্ট হইত। যে গ্রন্থ সাহিত্য-জগতে এত হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে—অন্ততঃ তাহার এক ক্ষুদ্র পাদটীকার মধ্যেও—স্বীয় নামের উল্লেখ দেখিবার আশায়, যে নিতান্ত উদাসীন সেও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বাটী, বহুমূল্য গ্রন্থে ও শিল্পসামগ্রীতে প্লাবিত হইতে লাগিল:—অর্দ্ধকায় মূর্ত্তি, ছাপ-ছবি, চিত্রপট, প্রাচীন মুদ্রা; অতীব দুর্লভ ও কৌতুকাবহ প্রত্নতত্ত্ব ঘটিত গ্রন্থাদি।

মন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু—যিনিও আপনার ম তত্ত্বকল্পদ্রুমের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেখিবার ন্য কম লালায়িত ছিলেন না—তিনি একদা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বলিলেন:—

—যিনি বিদেশীয় রাজাদের নিকট হইতে ৫ খানা সম্মান-উপাধি পাইয়াছেন, তিনি কেনা আজও ফরাসী রাজ্যের সম্মান-উপাধি াইলেন না! মন্ত্রী উত্তর করিলেন:—

—কেন যে পাইলেন না, আমিও বুঝিতে ারিতেছি না। কিন্তু সহজেই এই ত্রুটির তিকার হইতে পারে।

তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার যেমন এক দিকে াতির ভারে ভারাক্রান্ত তেমনি আর এক কে বয়সের ভারেও ভারাক্রান্ত হইয়া ড়িয়াছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র পার্থিব উপাধির ন্য আর লালায়িত ছিলেন না,—তিনি াবিতেন "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি"। অমর কীর্ত্তি াভের আশায় তাঁহার গ্রন্থখানি শীঘ্র প্রকাশ রিবার জন্য এক্ষণে তিনি ব্যস্ত হইয়া ঠিলেন।

কিন্তু যখনই কেহ তাঁহার নিকটে এই থা পাড়িত, তিনি মাথা নাড়িয়া উত্তর তেন:—

"উঁহুঁ, উঁহুঁ! আমার এখনও অনেক রবার আছে!" যাই হোক, অবশেষে তিনি ীকার করিলেন, এই শীতকালের মধ্যেই াঁহার তত্ত্বকল্পদ্রুম নিশ্চয়ই বাহির করিবেন। কন্তু, দেশ যাঁহার নিকট হইতে সাহিত্যের কটা নূতন জিনিস আশা করিতেছিল, সর্ব্বম মৃত্যু আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে হরণ রিয়া লইয়া গেল।

তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইল। সমস্ত সাহিত্য-সভার প্রতিনিধি-গণ উপস্থিত ছিলেন। অন্তিম অনুষ্ঠানের সময় অ্যাকাডেমির একজন সভ্য এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন:—

"মহাশয়গণ!

আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে যদিও তাহা কষ্টকর, কিন্তু ইহার একটা মধুর দিক্‌ও আছে। যে জীবনের ভস্মরাশি এখনও শীতল হয় নাই, সেই জীবন হইতে অক্লান্ত শ্রমের দৃষ্টান্ত আমরা কি গ্রহণ করিতে পারি না?—ইহা অপেক্ষা সান্ত্বনার বিষয় আর কি আছে? যিনি অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন, তিনি কেবল স্বকীয় শ্রমের প্রভাবে, প্রভূত শ্রমের প্রভাবে, অক্লান্ত শ্রমের প্রভাবেই এই উচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

এইস্থলে, তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনাও বিবৃত করা হইল। তাহার পর, মৃত ব্যক্তির প্রধান সাহিত্য কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া এইরূপ স্তুতিবাদ করা হইল:—

"মহাশয়গণ! আমি যে গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি তাহার কি আবার নাম করিতে হইবে? না, তাহার নাম আপনাদের সকলেরই মুখে-মুখে বিরাজ করিতেছে। আপনারা ঐ গ্রন্থ পাঠ না করিলেও, পণ্ডিতের ন্যায়ই উহার সহিত পরিচিত আছেন। কিন্তু হায়! মানুষের জীবন কি ক্ষণস্থায়ী! যে গ্রন্থ, খ্যাতির পটে অক্ষয় নাম মুদ্রিত করিবে, হায়! নির্দ্দয় কাল আসিয়া তাহাতে বাধা দিল। কাল! তুমি কি নিষ্ঠুর! অনন্তের নিকট আমরা নিতান্তই নগণ্য পদার্থ! কিন্তু একটা জীবনের এতটা শ্রম কখনই

একেবারে নষ্ট হইতে পারে না। অন্তত তাহার উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া ভাবী বংশকে উপহার দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। ভবিষ্যদ্‌বংশ ভিন্ন এরূপ গৌরবান্বিত সম্পত্তির আর কে অধিকারী হইতে পারে? আমাদের খ্যাত-নামা ও শোচনীয় সহযোগী স্বয়ং ইহার কোন উপায় করিয়া গিয়াছেন কিনা আমরা জানি না;—তিনি করুন বা না করুন, তাঁহার অন্তিম ইচ্ছার অছিরা, অবশ্য তাঁহার অমর গ্রন্থটিকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না, সাহিত্য-মন্দিরে নিশ্চয়ই তিনি একটা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। যতটা উচ্চে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, হায়! অনিবার্য্য ঘটনাচক্র তাহার প্রতিবন্ধক হইল। ইহা কি ম দুঃখের বিষয়?"

এই বক্তার অভিপ্রায়-অনুসারে, গ্র কারের অছিরা তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলি খানি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল।

অবশেষে তাহারা একখানা সাদা কাগ খুঁজিয়া পাইল; তাহার উপর তিন পংক্তি এই নামটি মাত্র লেখা আছে—তাহাও আবা কলমের আঁচড়ে কাটা।

ব্রহ্মাণ্ড

তত্ত্ব

কল্পদ্রুম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধ-গ্রহের নূতন তথ্য

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ যে, পরে পরে মহাকাশে সজ্জিত থাকিয়া সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা নূতন কথা নয় এবং ইহাদের ভ্রমণ-পথ যে, চিরনির্দ্দিষ্ট তাহাও বহুকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গ্রহগণের গতিবিধি এবং তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে এত অধিক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে যে, এখন জ্যোতিঃশাস্ত্রকে নূতন করিয়া না লিখিলে চলিতেছে না। জ্যোতিষ্ক-পরিদর্শনের উপযোগী এক একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সম্মুখে সত্যই এক একটি নূতন দৃশ্যপট উদ্ঘাটন করিতেছে। আধুনিক জ্যোতিষীগণ সৌরজগতের গ্রহগুলি-সম্বন্ধে যে-সকল নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন আমরা একে একে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

মহাকায় সূর্য্যের ক্রোড়ে অবস্থিত বু গ্রহটির কথা প্রথমে আলোচনা করা যাউক। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। নেপচুন্ নামক গ্রহটি সৌরজগতের সীমান্ত-প্রদেশে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে; সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুইশত আশী কোটি মাইল। কিন্তু বুধের দূরত্ব তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইলের অধিক নয়। এই কারণে বুধকে প্রকৃতই সূর্য্যের ক্রোড়ে অবস্থিত বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের এত নিকটে থাকায় বুধ গ্রহটি

ছদিন আত্মগোপন করিয়া আসিতেছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর আলোকের মধ্যে বুধমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করা প্রাচীনেরা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেন। বুধের আকার ঠিক্ কি প্রকার এবং তাহার গুরুত্বই বা কত, এই সকল ব্যাপার পূর্ব্বে অনেকটা অনুমানের উপরেই নির্ভর করিয়া বলা হইত, ইহার প্রকৃত আকার এবং গুরুত্বাদি অতি অল্প দিন হইল অভ্রান্তরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আধুনিক যুগের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী সিয়াপেরিলির নাম পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন। আমাদের অতি-নিকট জ্যোতিষ্ক মঙ্গল গ্রহটিতে জীব-বাসের সম্ভাবনার কথা ইনিই সর্ব্ব প্রথমে প্রচার করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি নয়। বুধ গ্রহের ন্যায় যে-সকল জ্যোতিষ্ক বৎসরের অধিকাংশ সময়েই সূর্য্যালোকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমাদের দূরবীণের অন্ত-রালে থাকিয়া যায়, তীব্র দিবালোকে সেগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় নির্দ্ধারণই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সূর্য্যালোকে মজ্জমান বুধ গ্রহটির সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি, তাহা সিয়া-পেরিলির প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী যেমন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময়ে নিজের অক্ষ-রেখার চারিদিকে একবার পূর্ণাবর্ত্তন দেয়, বুধও ঠিক সেই সময়ে এক একটা পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করে বলিয়া জ্যোতিষীদের বিশ্বাস ছিল। পুরাতন জ্যোতিষিক গ্রন্থাদিতে বুধের আবর্ত্তন-কাল চব্বিশ ঘণ্টা বলিয়া আজ লিপিবদ্ধ আছে। দিবালোকের মধ্যে বুধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং বুধ-মণ্ডলের উপরে যে কতকগুলির কালো দাগ থাকে সেগুলি ঘুরিয়া আসিতে কত সময় ক্ষেপণ করে, তাহা স্থির করিয়া সিয়াপেরিলি সাহেব, বুধের আবর্ত্তন-কাল চব্বিশ ঘণ্টা দেখিতে পান নাই। তিনি স্পষ্টই দেখিয়াছিলেন, যে চিহ্নটি আজ বুধ-মণ্ডলের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে দেখা যাইতেছে তাহাই ৮৮ দিন পরে বুধের সেই নির্দ্দিষ্ট অংশে ঘুরিয়া আসিয়া দেখা দেয়। কাজেই আধুনিক জ্যোতিষীগণ বুধের আবর্ত্তন-কাল চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৮৮ দিন বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আধুনিক নূতন জ্যোতিষিক গ্রন্থাদিতে বুধের পূর্ণাবর্ত্তন কাল ৮৮ দিন বলিয়াই উল্লেখ করা হইতেছে।

আমাদের চন্দ্রদেব প্রায় সাতাইস্ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। চন্দ্র পৃথিবীরই উপগ্রহ, কাজেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা ইহার কাজ। কিন্তু ইহাই চন্দ্রের এক মাত্র গতি নয়। আমাদের পৃথিবী যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের অক্ষ-রেখার চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খায়, এবং বুধ যেমন ৮৮ দিনে ঐপ্রকার আবর্ত্তন শেষ করে, চন্দ্রও সেই প্রকার ২৭ দিনে এক একটা পূর্ণাবর্ত্তন দেয়। প্রদক্ষিণ-কাল এবং আবর্ত্তন-কালের এই প্রকার একতা থাকায় চন্দ্রের সেই শশলাঞ্ছিত একটা দিকই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে। পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ মনে করিতেন, বুধের প্রদক্ষিণ-কাল ও পরিভ্রমণ-কালের মধ্যে এই প্রকার

একতা নাই, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহার প্রদক্ষিণ ও আবর্ত্তন উভয়ই ৮৮ দিনে শেষ হইতে দেখিতেছেন। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, চন্দ্রের ন্যায় বুধেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠই চিরদিন সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক গঠন যেমন আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে গিয়াছে, বুধেরও অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃষ্ঠদেশ সেই প্রকার চিরদিন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে।

বুধ-গ্রহ আকারে কত বড় জানিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বের জ্যোতিষিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ইহার ব্যাসের পরিমাণ তিন হাজার মাইল বলিয়া জানা যাইত। আধুনিক পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলে ইহাও ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন সকলেই বুধগ্রহের ব্যাস তিন হাজার চারি-শত মাইল বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। জিনিসের ব্যাস বৃদ্ধি পাইলে তাহার আয়তনও বৃদ্ধি পায়। কাজেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বুধ গ্রহের যে আয়তন স্বীকৃত হইয়া আসিতে ছিল, এখন তাহাও ভুল বলিয়া মানিতে হইতেছে। এখনকার হিসাবে, পূর্ব্বের তুলনায় ইহার আয়তন দেড়গুণ অধিক হইয়া পড়িতেছে। বুধ-গ্রহের গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য প্রাচীন জ্যোতিষিকগণ দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। বহু পর্য্যবেক্ষণ এবং হিসাবপত্র করিয়া স্থির হইয়াছিল, আমাদের পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তনের গত-গুরুত্ব যদি ১০০ মণ হয় তবে বুধ-গ্রহের সেই আয়তনের গুরুত্ব ১২১ মণ হইবে। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ এবং নেপ্‌চুন প্রভৃতি বড় বড় গ্রহের গুরুত্ব বহুদিন হই স্থির হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু গুরুত্বে কে গ্রহই বুধের সমান হইতে পারে না এই ক্ষুদ্র গ্রহটির গুরুত্বের যে একটা গো ছিল, সম্প্রতি ইহা তাহা হইতেও স্খ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পৃথিবী শুক্র-গ্রহ বুধের নিকট-প্রতিবেশী; কারণে বুধের টানে পৃথিবী ও শুক্র উ কখন কখন বিচলিত হইয়া পড়ে। বিচলনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াই বু গুরুত্ব নির্ণয় করা হইয়া থাকে। ছাড়া এন্‌কি (Encke) সাহেবের আবি যে ধূমকেতুটি তিন বৎসর তিন মাস কা সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে, তাহা বিচলন পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ বু গুরুত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। গত ১৮ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন জ্যোতিষী নূতন করি বুধের গুরুত্ব নিরূপণের জন্য চেষ্টা করি ছিলেন; ইহার ফলে বুধকে পৃথিবী অপেক্ষা লঘুতর দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি টিসারা (Tisserand) নামক জনৈক বিখ্যা জ্যোতিষী বুধের আকর্ষণে শুক্রগ্রহের বিচল পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীগ সিদ্ধান্তের পোষণ করিয়াছেন। ই হিসাবে বুধের গুরুত্ব পৃথিবীর গুরুত্বের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও অল্প।

যে অক্ষরেখা অবলম্বন করিয়া আমা পৃথিবী দিবারাত্রি লাট্টুর মত ঘুরপাক্ খা তেছে, সেই রেখাটি তাহার ভ্রমণ-পথের উ ঠিক্ খাড়া হইয়া নাই। জ্যোতিষীগণ হি করিয়া বাহির করিয়াছেন, পৃথিবী নি তাহার মেরুদণ্ড এক নির্দ্দিষ্ট দিকে নি

পরিমাণে বাঁকাইয়া আবর্ত্তন করে, অর্থাৎ লাট্টুকে যেমন কখনো কখনো বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিতে দেখা যায় পৃথিবী ঠিক্ সেই প্রকার বাঁকিয়া ঘুরপাক্ খায়। আমাদের শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতির ঋতুর পার্থক্য এবং গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত প্রভৃতিতে দিনরাত্রির অসমতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে পৃথিবীর মেরু-দণ্ডের ঐ বক্রতাকেই একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুধগ্রহের মেরুদণ্ড পৃথিবীর মত হেলিয়া আছে কি সোজা হইয়া দণ্ডায়মান আছে, ইহা আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষীগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে বুধ ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াই ঘুরিতেছে। এই ব্যাপারটিকেও আধুনিক যুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বুধের মেরুদণ্ডের অবস্থান-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারটি এক জন পণ্ডিতের গবেষণায় সম্পন্ন হয় নাই। আজকাল প্রত্যেক মান-মন্দিরেরই জ্যোতিষীগণ উহার সত্যতা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন এবং তাহা লইয়া নানা হিসাব-পত্র আরম্ভ করিতেছেন। কাজেই এখন বলিতে হইতেছে ঋতুবিশেষে আমাদের পৃথিবীতে যেমন দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য কখনো অল্প এবং কখনো অধিক হয়, বুধ গ্রহে তাহা হয় না। বুধের এক অংশ চিরকালই দিবসালোকে উন্মুক্ত থাকে এবং এক দিকে অনন্ত দিবা ও অপর দিকে অনন্ত রাত্রি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ পথটি যেমন প্রায় বৃত্তাকার, বুধের পথ সে প্রকার নয়। বৃত্তের উপর ও নীচে চাপ দিয়া অধিক চেপ্‌টাইয়া দিলে তাহার আকৃতি যে প্রকার হয়, বুধের পথটা সেইপ্রকার চেপ্‌টা ধরণের। সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে একটা দিক্ উন্মুক্ত রাখিয়া বুধ যখন এই পথ অবলম্বনে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে, তখন ইহার চির তমসাচ্ছন্ন পিছন্ দিক্‌টার দুই পার্শ্বের কতক অংশ সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া পড়ে। আমাদের চন্দ্রেরও অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চাৎ ভাগের কিয়দংশ ঠিক ঐ প্রকারে মাঝে মাঝে আলোকিত হয়। সুতরাং বলিতে হয়, বুধ গ্রহের একার্দ্ধ চির-কাল আলোকে এবং অপরার্দ্ধ চিরকাল অন্ধ-কারে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও, আলোক ও অন্ধ-কারের রাজ্যের সন্ধিস্থলে দিবারাত্রির ভেদ আছে। কিন্তু এই সীমান্ত স্থানের দিনগুলি আমাদের দিনের ন্যায় নয়; এবং বুধলোকের দিন আমাদের ৮৮ দিনের সহিত সমান।

সূর্য্য অস্তগত হইলেই পৃথিবী ঘোর অন্ধ-কারে আবৃত হয় না। পৃথিবীতে অতি ধীরে ধীরে দিবসালোক অন্তর্হিত হয়, এবং রাত্রির অন্ধকারও সেইপ্রকার ধীরে ধীরে লঘু হইয়া দিবালোক উৎপন্ন করে। সন্ধ্যা ও ঊষার এই অস্পষ্ট আলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের আকাশের বায়ু রাশিকেই এই আলোকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সূর্য্য অস্তগত হইয়া আমা-দের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলে ইহার রশ্মিগুলি হঠাৎ নিঃশেষে অন্তর্হিত হয় না আমাদের আকাশে যে সকল বায়ুস্তর সজ্জিত আছে তাহাতে ঠেকিয়া অস্তগত সূর্য্যের রশ্মি বাঁকিতে বাঁকিতে কিছুকাল আবার ভূতলে আসিতে আরম্ভ করে। কাজেই সূর্য্য না

থাকিলেও তাহার ঐ বাঁকা রশ্মিগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারকে লঘু করিতে থাকে। বুধের আকাশমণ্ডলে বায়ু বা তাহার মত কোন বায়ব পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। কাজেই সেখানে সূর্য্যের রশ্মি বাঁকিয়া আসিতে পারে না। এই কারণে বুধ-লোকের যে দুই ক্ষুদ্র অংশে দীর্ঘ দিনরাত্রির ভেদ আছে, সেখানে সন্ধ্যা বা উষার মৃদু আলোক কখনই দেখা যায় না। ৮৮ দিন পরে যখন রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্ধকার হঠাৎ আসিয়া দেশটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আমাদের পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে, বুধের নিকটে সেপ্রকার চন্দ্র নাই; সে সহচর-হীন হইয়া সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেই ব্যস্ত। কাজেই আমাদের দশ বারো ঘণ্টার রাত্রিগুলা যেমন চন্দ্রের আলোকে আলোকিত হইয়া মধুর হইয়া দাঁড়ায়, বুধের দীর্ঘ ৮৮ দিনের রাত্রিতে সে মাধুর্য্যটুকুও অনুভব করিবার উপায় নাই। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অমাবস্যা নিশার নিবিড় অন্ধকার ইহাকে ঢাকিয়া ফেলে।

গ্রহদিগের পরিচয় প্রদান করিতে গেলেই তাহাতে জীব বাস কবে কিনা এই প্রশ্নটি অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল তাহা পাঠ করিলে পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন, ভূতলে আমরা যে সকল জীবের সহিত পরিচিত আছি, তাহাদের একটিও বুধলোকে গিয়া এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতে পারে না। জল এবং বায়ু, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-রক্ষার প্রধান উপকরণ, কিন্তু বুধলোকে এই দুই বস্তুর একান্ত অভাব. কাজেই সেখানে কোন জীবই থাকিতে পারে না। তার পর দিবা রাত্রি, মাস সম্বৎসরের যে সকল বৈচিত্র্যে ভূপৃষ্ঠে এই জীবরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, বুধলোকে অধিকাংশ স্থানেই তাহার চিহ্নমাত্র নাই; ইহার একদিকে অনন্ত মহারাত্রি অপর দিকে অনন্ত মহা-দিবা চিরদিন বিরাজ করিতেছে, সুতরাং তাহার কোন অংশে জীব-বাস একবারে অসম্ভব। পৃথিবীর তুলনায় বুধে সূর্য্যের তাপ এবং আলোক উভয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পতিত হইয়া থাকে; বড় দূরবীণের সাহায্যে বুধমণ্ডলে যে সকল সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-রেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে, আধুনিক জ্যোতিষীগণ সেগুলিকে সৌর-তাপেরই উৎপাতের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছেন; জল নাই অথচ যথেষ্ট তাপ আছে, কাজেই বুধের শিলামৃত্তিকা ফাটিয়া গিয়া ঐ সকল চিহ্নের উৎপত্তি করিয়াছে। তাপাধিক্যে এবং জলাভাবে যে-গ্রহের এপ্রকার দুর্দ্দশা তাহা কখনই জীব বাসের উপযোগী নয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।



আয়েষা

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত চিত্র হইতে

বাস্তুকাহিনী

গোড়া থেকেই বলে' রাখচি কিন্তু গল্পটি বড় ভয়ানক। যদি তোমরা ভীতু হও তাহ'লে এ গল্প পোড়ো না। আর নিতান্তই যদি পড়বার লোভ সামলাতে না পার তো খবরদার! রাত্রে শোবার আগে কখ্খনো পোড়ো না।

ব্যাপারটা মিথ্যে নয়—সত্য সত্যই ঘটেছিল।

আমার তখন তরুণ বয়স,—আমি একজন উদীয়মান ঔপন্যাসিক। তখনকার মাসিক পত্রগুলো হাঁটকালে সে খবর পাবে। ভুতুড়ে কাণ্ড, ভৌতিক ব্যাপার এই সব নিয়েই থাকতুম। গোলমেলে রহস্য, মারাত্মক দুর্ঘটনা আর ভয়ের গল্পগুলোই আমার জমত ভালো।

তখন পশ্চিমে থাকি। শীতকালে এক-দিন বেড়াতে বেরিয়ে রাত হয়ে গেল। নিকটে কোথাও থাকবার জায়গা নেই;—ধু ধু মাঠের ওপর থেকে শীতের হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে তুলছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগান-বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলুম। শুনলুম, সেটা জমিদার রমণীবাবুর বাড়ী। সেখানেই রাত কাটাবো ঠিক করে' দরজায় ঘা দিলুম। জমিদার বাবু আমায় সাদরে আহ্বান করে' নিলেন, তাঁর বাড়ীতে অতিথ প্রায়ই এসে থাকে;—কেউ কখনো বিমুখ হয় না।

রমণীবাবুর বিষয় পূর্ব্বেই কিছু কিছু শুনে-ছিলুম। তিনি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশ থেকে এসে এখানেই বস বাস করচেন। লোকটি ভারি অদ্ভুত রকমের—রং তামাসা নিয়েই আছেন। পড়াশুনো বেশ করেচেন, কেতাবও আছে অনেক। একটা ঘর তাঁর শীকারকরা হরেকরকমের মরা পশুপক্ষীতে পূর্ণ;—কেউ যদি কৌতূহলী হয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন—তিনি অমনি গড়গড় করে' তাদের বিবরণ বলতে আরম্ভ করেন। তাঁর মুখে জানোয়ারের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম শুনে লোকের তাক লেগে যায়। তা ছাড়া তাঁর চিত্রশালা আছে; পারিবারিক ঘটনা-লেখা পুঁথিপত্রও আছে বিস্তর। আর এক মস্ত বাতিক ছিল তাঁর কলকব্জার। তাঁর ঘরের দ্বারের কাছে একটা লোহার মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত, কেউ দরজা খুললেই সে বন্দুক উঁচিয়ে আগন্তুকের দিকে টিপ করত, দরজা বন্ধ করলেই আবার সভ্যভব্যের মত বন্দুক নামিয়ে ধরত! নবাগত ভীরু আগন্তু-কেরা তা দেখে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ত। হলের টেবিলের ওপর কেউ কনুইয়ের ভর দিলেই অদৃশ্য বাঁশি বেজে উঠত! একখানা চেয়ার ছিল তা'তে বসলে আর ওঠা অসম্ভব হোত, চেয়ারখানা লোকটিকে এমনই জোরে আঁকড়ে ধরত! এমন কত কি ছিল।

এ সব ব্যাপার আমি আগেই শুনেছিলুম। রমণী বাবু কিন্তু আমার সঙ্গে এ সব কৌতুক কিছুই করলেন না। তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে আমায় নিয়ে গিয়ে পুঁথিপত্র অস্ত্রশস্ত্র পুরাণো শিলমোহর প্রভৃতি দেখাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিষয়ে কত আশ্চর্য্য গল্প,

কত প্রেমের কাহিনী শোনাতে লাগলেন। প্রাচীনকালের সে সব নায়ক নায়িকার সকল স্মৃতি-চিহ্নই লোপ পেয়েছে—আছে কেবল একখানা বর্শা বা একপাটি চটি—এই রকম টুকরো টাকরা জিনিস—কিন্তু সেই গুলোই মনটাকে কখনো ভয়ে আড়ষ্ট, কখনো দুঃখে অভিভূত, কখনো বিস্ময়ে চমকিত করে' তুলছিল! ভালই করেছিলুম এখানে এসে; কত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান, কত গল্পের পোরাক পাওয়া গেল!

কথায় কথায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আহারাদি সেরে একটা বড় ঘরে গিয়ে বসলুম। ঘরের মাঝে একটা চুল্লিতে আগুন জ্বলছিল। তার চারদিকে সোফা, আরামকেদারা—আয়েশের বিবিধ সরঞ্জাম। সামনে তেপায়ার ওপর এক এক পেয়ালা চা নিয়ে সোফায় বসে' গল্পগুজবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেওয়া গেল। রাতও হয়েছিল—সেদিন হেঁটেছিলুমও অনেক;—আগুনের ধারে বসে' বসে' চোখ জড়িয়ে আসছিল

আমার অবস্থা দেখে রমণীবাবু বল্লেন—আপনার ঘুম পেয়েছে, দেখচি।

আমি বল্লুম—হ্যাঁ। শুয়ে পড়লেই হয় এখানে।

রমণীবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন, বল্লেন—এ ঘরে আপনার শোওয়া হতে পারে না। ঘরটা তেমন সুবিধের নয়। নতুন লোক কেউ টেঁকতে পারে না এ ঘরে। কত লোক মারা গেছেন এখানে!

মারা গেছেন! বলেন কি মশাই!—চোখ থেকে ঘুম একেবারে বিদায় নিলে।

"ভুত আসে না কি, এ ঘরে?"

"আসে বল্লে ঠিক হবে না, তাঁরা এই ঘরেই আছেন। দিনই হোক, রাতই হোক—তাঁদের দর্শন দুর্লভ নয়।"

কৌতূহলে আমার ঘুম সে তল্লাট ছেড়ে পালালো। চারিদিকটা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলুম।

রমণীবাবু বল্লেন—ভুতের কথা বল্লুম বলে' ভাববেন না যেন যে তারা পায়ে শিকল বেঁধে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এখানে যা আছে সেটা অতি সামান্যই জিনিস—হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরা যায়। দেখবেন?

আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলুম।

"কই আপনার ভুত? দেখান আমায়!"

তিনি আমায় ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন। সেখানে একখানা সবুজ পর্দা টাঙানো। পর্দাটা তিনি সরিয়ে দিলেন; দেখলুম, একটা গোল কাঁচে ঢাকা দুটো মড়ার খুলি। আশ্চর্য্য এইটুকু যে, খুলি দুটো পিঠে পিঠ দিয়ে রয়েচে।

এর মধ্যে আর ভৌতিক কি আছে? একটা ওপড়ানো দাঁত যেমন নিরীহ এও তো তেমনি! এতে ভয়ের কারণ কি?

রমণীবাবু বল্লেন—তবে শুনুন। এ বাড়ী আগে দুই ভায়ের ছিল—করিম ও রহিম খাঁ। তাদের ইতিহাসটা ভারি দুঃখের। দুই ভাইয়ের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্য ছিল, বাড়ী ও সম্পত্তি কার হবে তাই নিয়ে অবিরাম ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। একবার বিবাদ মেটবার পরই বড় ভাই ছোট ভাইকে নিমন্ত্রণ করে। এবং তাকে মদ খাইয়ে বেহুঁস করে' ফেলে তার মাথায় লম্বা পেরেক বিঁধে মেরে ফেলে। পেরেকটাও আছে এখানে।

[illegible] বেটা চাকর এ কাজে সাহায্য করেছিল, [illegible]য়ে সে সব ফাঁশ করে' দিলে—ফলে বড় [illegible]ইটির গর্দ্দান গেল। বধ্যভূমিতে নিয়ম [illegible]ক্ষিক তাকে গোর দেওয়া হোল, মুণ্ডটি [illegible]বল বাড়ীর পাতাল-কুঠরিতে সমাহিত করা [illegible]ল। যে ভাইটি খুন হয়েছিল তার অস্থিও [illegible]খানে ছিল। এক কোণে দুই ভায়ের মাথা [illegible]কসঙ্গে পাশাপাশি রেখে দেওয়া হোল—এই [illegible]ই শত্রু জীবনে কেউ কা'কেও বরদাস্ত করতে [illegible]রেনি বটে, কিন্তু এখন দিব্যি মুখোমুখি [illegible]রে রইল! তারপর, একবার কি কাজে কে- [illegible]কজন সেখানে গিয়ে দেখলে মাথা দুটো আর [illegible]াগের মত মুখোমুখী করে' নেই—দু দিকে [illegible]খ ফিরিয়ে পিঠাপিঠি করে' রয়েচে। [illegible]াকটা ভাবলে এ ইঁদুরের কাজ, তাই সে [illegible]লি দুটো আবার মুখোমুখি করে' রেখে [illegible]লে। কিন্তু তার পরদিন গিয়ে দেখে [illegible]াবার তারা উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েচে! [illegible] এক সপ্তাহ ধরে' এমনি চলতে লাগলো। [illegible]াকটা রোজ খুলি দুটো ঘুরিয়ে রাখে, আবার [illegible]তি রাত্রে সে গুলো আপনাআপনি ঘুরে [illegible]য়। ভেবে ভেবে লোকটা শুকিয়ে যেতে [illegible]গলো। চেহারাটা তার যেন দিনে দিনে [illegible]তের মত হয়ে গেল। গ্রামের মোল্লা তার [illegible]বস্থা দেখে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে' [illegible]াপারটা জেনে নিলেন। তিনি হেসেই [illegible]ন। চাকরটাকে বল্লেন—খুলির হাত পা [illegible]ছে না কি যে আপনাআপনি ঘুরে থাকবে! [illegible] বুড়ো হচ্ছিস তত যেন ভীমরতি হচ্ছে! [illegible]সব কিছু না, চল দেখি গে।

[illegible]গিয়া দেখেন খুলি দুটো বাস্তবিকই [illegible]পরীত দিকে মুখ করে' রয়েচে!

মোল্লা একটা খুলি ধরে' যেই তোলবার চেষ্টা করেচেন খুলিটা অমনি তাঁর কোড়ে আঙুলে কটাস্ করে' দিলে এক কামড়!

তারপর থেকে কুঠরিটা বন্ধ রইল। চাকরটা দিনকতক বাদে মারা গেল। মোল্লার কোড়ে আঙুলে কামড়ের চিহ্ন তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিল।

ব্যাপারটা এ পর্য্যন্ত এমন গোপন রাখা হয়েছিল যে আমি সম্পত্তিটা কেনবার আগে কেউ এসব কথা জানত না। পুরাণো লাইব্রেরির বই হাতড়াতে হাতড়াতে একদিন সেই মোল্লার লেখা একখানা পুঁথি হাতে পড়ল, তাতে তিনি ব্যাপারটা আগাগোড়া বর্ণনা করে' গেছেন, কোন্ খানে চোরা কুঠরির দরজার সামনে দেওয়াল তোলা হয়েচে সে কথারও উল্লেখ ছিল। কুঠরি খুঁজে পেতে বিলম্ব হোল না, সেখানে গিয়ে দেখি ঠিক তাই—খুলি দুটো পিঠে পিঠ দিয়ে রয়েচে!

ভুত প্রেতে কোনো দিন বিশ্বাস করি নি। কিন্তু কি জানি তবু কেমন খুলি দুটো স্পর্শ করতে সাহস হোল না। তাই যে-পাথরের ওপর সে গুলো বসানো ছিল সেই পাথর শুদ্ধ উঠিয়ে এনে এখানে রেখেচি। সেই থেকে আমার বাড়ীতে যাঁরাই এসেছেন সকলেই পরখ করে' দেখে এ ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েচেন।"

আমার মুখের ভাব দেখে রমণীবাবু হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে আমিও চাক্ষুস পরখ করতে ইচ্ছুক, তাই তিনি কাঁচের আচ্ছাদনটি খুলে খুব সাবধানে খুলি দুটো মুখোমুখি করে' রেখে আবার ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

তারপর, যে ধারটাতে আমার বিছানা

ছিল সেটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে নমস্কার করে' বিদায় নিলেন।

জমিদার বাবু ওপর তালায় থাকতেন। চাকরবাকর থাকতো নীচের তালায়। আমার ঘর আর তাদের ঘরের মাঝে দু তিনটে ছোট বড় দালান।

আমি একেবারে একলা।

মনটা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেও কেউ আমায় না ঠকায় সে দিকে খুব দৃষ্টি ছিল। দেওয়ালগুলো ভালো করে' দেখলুম, ঘরে প্রবেশ করবার কোনো উপায় নেই। তার পর কোণ্‌টা খুব ভালো করে' দেখলুম, সেখানো কারো আসা অসম্ভব। একখানা শক্ত পাথর কুঁদে কোণ্‌টা তৈরি। দরজায় খিল দিয়ে, তার সামনে সোফাটা টেনে নিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়লুম। পর্দ্দা-ঢাকা কোণ্‌টার ঠিক উল্টো দিকে রইলুম আমি।

আর একটা কাজ করলুম। কোণ্‌-ঢাকা রেশমী পর্দ্দাটার একটা নিখুঁত নক্সা আমার নোট-বুকে তুলে নিলুম। কেউ যদি খুলিগুলোর কাছে যায় তো পর্দ্দা ঠেলে যেতে হবে, আর তা হলেই পর্দ্দার ভাঁজ বদলে যাবে, আমার নক্সার সঙ্গে মিলবে না।

আগুন উস্কে দিয়ে তার মধ্যে কতকগুলো কাঠ ফেলে দিলুম। কাছে একটা তেপায়ার ওপর বাতিদানটা রেখে কোনোমতেই ঘুমুনো হবে না স্থির করে' সোফায় শুয়ে পড়লুম।

চা না কি ঘুম তাড়াবার অমোঘ ঔষধ, তাই এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলুম। এক চুমুক দিয়েই বুঝলুম এতে ঠিক হবে না—চাই আরো উগ্র কিছু। এমন সময় তাকের ওপর বোতলের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। ঠিক হয়েছে! থেকে কিঞ্চিৎ পান করা যাক!

তাকের কাছে গিয়ে বোতল থেকে পান করলুম। হাঁ উগ্র বটে—রীতি উগ্র! পুনরায় পেয়ালা ভর্ত্তি করে' নি আমার চায়ের টেবিলের কাছে ফিরে আস লাগলুম।

বাঃ এ আবার কি!

—দেখি, আমার সোফার ওপর দুটি লোক বসে'। বোধ হোল তাদের খুব ভা রকমই চিনি কিন্তু নাম কিছুতেই মনে কর পারলুম না। একজনের ছোট ছোট কোঁকড়া ফ্যাকাশে চুল আর মেহেদি পাতা দি রঙানো এক-মুখ দাড়ি; আর এ জনের কালো চুল, লম্বা লতানে গোঁফ আ মাথার মাঝে একখানি মণ্ডলাকার টা দেখলুম তাঁরা বসে' বসে' দিব্যি আরা আমার চা-টুকু পান করচেন, এক পেয়ালা একবার ইনি একবার উনি চুমুক দিচ্চেন প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, তারপর বুক ধড়াস্ করে' উঠল। সামনে এগো সাহস হোল না। একটা অন্ধকার কো জড়সড় হয়ে বসে' পড়লুম।

উভয়ে উভয়ের দিকে কেমন-একর করে' চাইছিল। শুনতে পেলুম—

"এই যে করিম ভায়া!"

"এই তো রহিম ভায়া!"

"তা হ'লে করিম, আবার এখানে এ জুটেচ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ রহিম ভায়া—স্থির করে এখানেই থাকবো!"

"এখানে তো দুজনের জায়গা হবে না।"

"জায়গা খুব হবে—তবে একজনকে নীচে কতে হবে, এই যা।"

"নীচে? কোথায়? একতালার ঘরে কি?"

"না হে না, আরো নীচে। একেবারে বরের মধ্যে।"

"তা হ'লে করিম একটা হেস্তনেস্ত করে' ফলা যাক।"

"বেশ তো! এখুনি হয়ে যাক, কেউ নেই খন। এই তো উপযুক্ত সময়।"

"তা হ'লে পিস্তল না তলোয়ার? কোনটা ও?"

"দুটো হলেই ভালো হয়—কিন্তু ফাঁশ হয়ে ড়বে যে!"

"তা বটে! পিস্তলে শব্দ হবে আর লোয়ারে রক্তারক্তি হবে।"

"তা হ'লে বিষ। কেমন? যার নাম াগে উঠবে সে-ই খাবে।"

"মন্দ নয়। কিন্তু বিষের চিহ্নও তো মুখে াকে।"

"আমি একটা ভালো মৎলব ঠাউরেচি। ই ত মদ রয়েচে, এস হরদম খাওয়া যাক জনে।"

"তারপর?"

"তারপর যার জ্ঞান থাকবে সে বহুঁসটাকে সাবাড় করবে। এই রয়েচে াতুড়ি আর এই লম্বা পেরেক। খুলিতে বশ করে' বসিয়ে দিলে কেউ কিছু জানতে ারবে না।"

"সেটা তোমার সম্বন্ধে না হয় খাটলো, কারণ তোমার চুল খুব ঘন। কিন্তু আমার াথার মাঝে যে একখানি পূর্ণচন্দ্র!"

"কিচ্ছু ভেবো না দাদা। আমি সব ঠিক করে' দেব'খন।"

তাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। পালাবো যে তারও উপায় নেই—হতভাগারা ঠিক দরজার সামনে বসেচে!

এক পেয়ালা থেকেই তারা পান করতে লাগলো! পেয়ালা এমন পুরোপুরি করে' ভরতে লাগলো যে মদ উপচে টেবিলের ওপর পড়ছিল!

ক্রমে তাদের দম আটকাবার উপক্রম হোল, মাথা একবার সামনে একবার পিছনে দুলতে লাগলো, মুখ বেজায় লাল হয়ে উঠল। রগের শিরাগুলো সবুজ দড়ির মত স্ফীত হয়ে উঠল।

"ভায়া যে একেবারে কাবু!"

জড়িত কণ্ঠে উত্তর হোল—"আমি না তুমি?"

টেবিলের ওপর বাতির আলো মলিন হয়ে এল। মনে হচ্ছিল অগ্নি শিখার চারদিকে যেন একটা রক্তিম বাষ্প জমে উঠচে। দুজনের মুখ হঠাৎ বেজায় বিবর্ণ হয়ে গেল, মাথা ভারি টলতে লাগলো। কে যে আগে পড়ে বলা যায় না।

বাতির শিখা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেচে। সবুজ আলোয় মুখদুখানা ঠিক মড়ার মুখের মত বোধ হচ্ছিল! আর কথা বলবার শক্তি নেই, স্থির চোখে তারা উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে আছে, তখনো এ ওর হাতে মদের পেয়ালা এগিয়ে দিচ্ছে!

সহসা বাতির আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে দপ্ করে' নিবে গেল। লোক দুটো তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হোল।

জানালার মাঝ দিয়ে ঘরের ভিতর চাঁদের আলো এসে পড়েচে। চুল্লির আগুন সেই আধ-আঁধারে গোলাপী আভা ছড়িয়ে দিয়েচে। ঘরের মধ্যে আমি একলা!

হাসি এল। নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলুম আমি। দাঁত কিড়মিড় করছিল, তবুও মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে বারবার বলছিলুম—স্বপ্ন এ! স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়! এই বার গিয়ে শুয়ে পড়ি! কাপড় ছেড়ে আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি! তারপর ওরা সব কবর থেকে উঠে যত খুসি ঘুরে বেড়াক না। সেরেফ দেখবো না। ব্যস!

বাহিরে চাঁদের রূপালী আলো, ভিতরে আগুনের গোলাপী আলো—বাতির প্রয়োজন নেই! বিছানা সহজেই খুঁজে নেব এখন! আস্তে আস্তে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেললুম—ঘড়িতে দম দিলুম—তারপর বিছানার সামনের পর্দ্দা সরিয়ে শুতে গিয়ে দেখি—ও বাবা! বিছানায় দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে—দুটো বীভৎস মড়া। একজন উপুড় হয়ে মুখ নীচু করে' শুয়েছিল—তার টাকের ওপর পেরেকের মাথাটা চাঁদের আলোয় গাঢ় নীল দেখাচ্ছিল। অন্য ভাই তার-ই পাশে ওপরদিকে মুখ করে' শুয়েছিল।

ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে গেল। চীৎকার করতে গেলুম—দেখি স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। পালাতে গেলুম—পাচলে না। বুকে যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপানো রয়েচে! প্রাণপণ শক্তিতে অনেক কষ্টে কি একটা উচ্চারণ করলুম, অমনি ঘুম ভেঙে গেল।

সকাল হয়েচে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ঝিকমিক করছিল। দ্বারের সামনে সোফার ওপর আমি শুয়ে গত রাত্রে যেখানটাতে ঘুমানো হবে না ভি করে' শুয়ে পড়েছিলুম ঠিক সেই খানে।

বাতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, চা বাটিও শূন্য পড়েছিল।

হঠাৎ কোণে দৃষ্টি পড়ল—পর্দ্দাটা যেম নক্সা করেছিলুম ঠিক তেমনি আছে। অ নিশ্চয়ই কেউ পর্দ্দা সরায় নি!

দেখা যাক পর্দ্দার অন্তরালে কি ব্যাপা ঘটেচে। রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল—পর্দ্দায় হাত দেবার সময় হাতটা কেঁপে উঠল।

আরে তাই তো! খুলি দুটো পিঠে পিঠি করে' রয়েচে! রমণীবাবু কাল রাত্রে আমার চোখের সামনে দুটোকে মুখোমুখী করে' দিয়ে গেলেন—এখন দেখচি পিঠোপিঠি! এ তো স্বপ্ন নয়—এযে স্পষ্ট আমি দেখচি দিনের আলোয়!

গা শিউরে উঠল।

কিন্তু দুটো মড়ার খুলি কি এমন করতে পারে? বিশ্বাস করি না, অসম্ভব।

কিন্তু স্পষ্ট দেখচি যে, ভয়ে কাঁপচি যে!

তা হোক, তবুও বিশ্বাস করি না।

তারপর সেই মোল্লার কথা মনে পড়ে গেল—সে-ও অবিশ্বাস করে' মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হাতে কামড়ের দাগ বয়ে বেড়িয়েচে।

কুছ পরওয়া নেই!

আমাকেও নয় কামড়াবে!

কাঁচের আবরণ তুল্লুম। বুকটা দপ্ দপ্ করে' উঠেছিল বোধ হয়—অস্বীকার করব না। হাত বাড়িয়ে খুলিতে হাত দিলুম—তারপর তুলে ধরে' ঘুরিয়ে দেখলুম—

কি হোল? কামড়ালে না কি?

না না কামড়ায় নি—কামড়ালে কি আর হাতে ধরে' রাখতে পারতুম।

ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেছে—খুলি দুটোতে স্প্রীং আঁটা আছে; স্প্রীং ঘুরিয়ে দুটোকে মুখোমুখি করে' রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি স্প্রীং আস্তে আস্তে খুলে যায় আর খুলি দুটোর মুখও ঘুরে যায়!

চা পানের সময় গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন ঘুমোলেন?

—ঘুমের বড় বিঘ্ন হয়েছিল। রাত্রে অনেক চা পান করার দরুণ নানাপ্রকার ভূতপ্রেত দেখেচি।

—খুলিগুলো কি করলে?

—তারা আবার করবে কি? স্প্রীংয়ের তার যেমন করে তাদের নাচিয়েছে তেমনি তারা নেচেছে।

গৃহস্বামী হেসে ফেল্লেন। বল্লেন,

—তা হ'লে আপনি ভিতরটা দেখেচেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এখন আপশোস হচ্ছে না দেখলেই ছিল ভালো।

—কেন?

—তা হ'লে এমন একটা অত্যাশ্চর্য্য বাস্তকাহিনী মাটি হয়ে যেত না!*

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ

নানারূপ গদ্য পদ্য লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশী লোকের মধ্যে আজকাল এদেশে দেখা যায়, তা পূর্ব্বে কখনো দেখা যায়নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্ততঃ একখানি না মাসিক পত্রেরও আবির্ভাব হয়। এবং সে সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু না কিছু নমুনা থাকেই থাকে। সুতরাং এ কথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নব যুগের শিশুসাহিত্য আঁতুরেই মরবে কিম্বা তার একশ বৎসর পরমায়ু হবে, সে কথা বল্‌তে আমি অপারগ। আমার এমন কোনও বিদ্যে নাই যার জোরে আমি পরের কুষ্ঠি কাটতে পারি। আমরা সমুদ্র পার হতে যে সকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নব সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহলে যুগ ধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আস্‌বে। পূর্ব্বোক্ত কারণে, নব্য লেখকরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখবার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল নাও হতে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে এই নব সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌ছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-জগৎ যখন দুচার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন

* Maurus Jokai লিখিত গল্প হইতে।

সাহিত্য-রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ স্তম্ভ, গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব এই জ্ঞানটুকু জন্মালে, আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না, এবং শব্দের কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্য-জগতেরও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দূর থেকে দেখ্‌তে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য নয়।

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করে চলে না, কেননা অত সৌন্দর্য্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্ম্মের পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ান যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোন অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য, এ বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা কিছু গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দুচারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্ত্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্ত্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্য দর্শন আদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায় বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্ততঃ ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখ্‌তে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখ্‌তেই হবে,—নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়, কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্চে, পয়লা বেরনো—কি যে বেরলো তাতে বেশি কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখ্‌তে হয়। নীতির জুতো শেলাই থেকে ধর্ম্মের চণ্ডিপাঠ পর্য্যন্ত, সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদেব নব সাহিত্যে কোনরূপ "শ্রম বিভাগ" নেই—তার কারণ যে ক্ষেত্রে "শ্রম" নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সেস্থলে তার বিভাগ আর কি করে হ'তে পারে?

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোট গল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশ কাল পাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্ম্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়, তাহলে সে জিনিষের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে, গল্প স্বল্প হয়ে আসবে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে থাকবে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চ্চা না করে ব্যায়ামের চর্চ্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই তাতে অন্ততঃ কস (Grip) থাকা আবশ্যক।

২

বর্ত্তমান ইউরোপের সম্যক পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে গণধর্ম্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্ম্মের দিকে, এবং সেই ঝোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মা-সর্ব্বস্ব দেশে লেখকেরা যে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না একথাও জোর করে বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে যে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ "ভ্যালুপেয়েবল্ পোষ্ট" নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নব সাহিত্যের যেন তেন প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তাহলে বঙ্গসরস্বতীকে পথে দাঁড়াতে হবে সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে "বাণিজ্যে বসতি সরস্বতী"। সাহিত্য-সমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে—দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, সেই সঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে। সুতরাং আমাদের নব সাহিত্যে লোভ নামক রিপুর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, কেননা শাস্ত্রে বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩

এ যুগের মাসিক পত্রসকল যে সচিত্র হয়ে উঠেছে, সেটি যেমন আনন্দের কথা তেমনি আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণ-সমাজের যে একটি নাড়ীর টান আছে তার প্রচলিত প্রমান হচ্ছে, মার্কিণ সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্য্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে যাচ্চে। এবং আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকুট জ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলে-ভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোন উন্নতি হবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, কেননা সমাজে গোলাম পাশ করে দেওয়াতেই বণিকবুদ্ধির সার্থকতা; কিন্তু সাহিত্যের যে

অবনতি হবে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। নর্ত্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্য্যাদা বাড়ে না। একজন যা করে অপরে তার দোষগুণ বিচার করে, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিত্যে বাধ্য। এই কারণেই যেদিন থেকে বাঙ্গলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে, সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোন পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস এদেশে একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ্য এবং আলেখ্য ব্যাখ্যানে নিপুণতা অতিশয় বিরল, কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত তা বিচার করবার অধিকার সকলেরই আছে, কেননা সে সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয় সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্যচিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানান ভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ ভুল দৃষ্ট হয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন; যাঁদের চিত্রকর্ম্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে; কিন্তু সে ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশের রাস্তা-ঘাটে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যদিচ ও সকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুর্লভ নয়। আসল কথা হচ্ছে এ শ্রেণীর চিত্রসমালোচকেরা অনুকরণ অর্থে ব্যাকরণ শব্দ ব্যবহার করেন। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এদেশের চিত্রশিল্পীদের কর্ত্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটান কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্ত্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্চে, প্রতিভার চরণে শিকলি পরাণো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনও অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্য-সামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি কিম্বা গণিত-শাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্ব্বোক্ত মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে। একে একে যে দুই হয়, এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগার হয়, বৈজ্ঞানিক হিসাবে এর চাইতে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই

নেই। অথচ একে একে দুই না হয়েও, এবং একের পিঠে একে এগারো না হয়েও, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে।

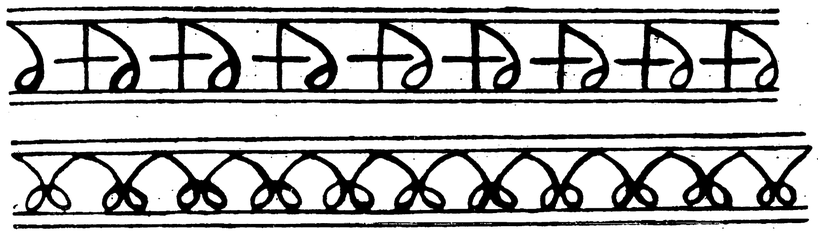

সম্ভবতঃ আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ একথা বল্‌তে পারেন, যে "চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাইনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।" প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আস্‌ছে, তার কারণ অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না,—কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। একটি কোন সুন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্য্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক সত্যটি কখনও ধরাছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে, তার সম্বন্ধে কোনরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে, নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসী-দেহাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন করতুম না। এ কথা বলার অর্থ, তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি, প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ নয়। Anatomy অর্থাৎ অস্থিবিদ্যার সাহায্যে দেখান যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়, এবং উভয়কে একত্রে জুড়িতে যোতা যায় না। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই; কারণ দেহ-তাত্ত্বিকের জ্ঞান-নেত্রে যাই হোক্, আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ কঙ্কালসার নয়। সুতরাং দৃষ্টজগৎকে অদৃষ্টের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়াতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না।—দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ কি পশু, জীবমাত্রেরই দেহ-যন্ত্র-গঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে, ঘোড়া তুরঙ্গম। যে

ঘোড়া দৌড়বে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়্‌বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎ-শক্তিরহিত অশ্ব, অর্থাৎ যাকে চাবুক মারলে ছিঁড়বে কিন্তু নড়্‌বে না, এহেন ঘোটক, অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ করে' চিত্রকর্ম্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দ্দোষ কিম্বা নির্ভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আসবে, এরূপ আশা করাও বৃথা।

শিল্প হিসাবে তার নানা ত্রুটি থাকা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘট্‌ছে, সমালোচকদের তাই দেখিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি নয় বর্ণের সংস্থানে, পেশী নয় রেখার বন্ধনে, যেখানে অসঙ্গতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেই স্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহীভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণ ভ্রমে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহি
চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চি
সনাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলা
বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আম
ও-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অপর একটি কা
হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলা
দোষ বলে গণ্য, তাই আবার আজকা
এদেশে কাব্যকলায় গুণ বলে মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোন
রূপ পরিচয় থাকত, তাহলে শুধু বর্ণের স
বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বা
তাঁদের মনে জন্মাত না, এবং যে বস্তু কখন
তাঁদের চর্ম্মচক্ষুর পথে উদয় হয়নি,
অপরের মনশ্চক্ষুর সুমুখে খাড়া করে দেবা
চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভব
এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বি
হচ্ছে দৃশ্যবস্তু, আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃ
মন,—সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জ্জনী
এবং কাব্যকলায় বর্জ্জনীয়। সাহিত্যে সেই
কলমের কাজ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমে
কালি ঝাড়েন—তাঁরাই কেবল নিজের মনে
প্রবোধ দেবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য
বলে গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান
হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য
অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করা
অর্থ চোখে চাল্‌শে ধরা নয়। দেহের নবদ্বা
বন্ধ করে দিলে মনের ঘর অলৌকিক আলোকে
কিম্বা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠ
বলা কঠিন। কিন্তু সর্ব্বলোকবিদিত সত্য
সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজা
নয়—কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে
অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জন শলাকার অপপ্রয়োগে

দের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে,
রাই কেবল এ সত্য মানতে নারাজ
বন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন
কাচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ
বার, বাছাই করবার, এবং ভাষায়
কার করে তোলবার ক্ষমতার নামই
বিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির
রেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস
লছেন যে "সুনিবিষ্ট লোকের রূপ বিপর্য্যয়"
া অন্ধকারের ধর্ম্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে
তিভার পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ
তিভার ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে
ত্যক্ষ করা, প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়।
ঙ্কার শাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত
ং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা, কাব্যে
ায় হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা
ই ঘটে থাকে তার যথাযথ বর্ণনাও সব
য়ে কাব্য নয়। আলঙ্কারিকেরা উদাহরণ
প দেখান যে "গৌ তৃণং অত্তি" কথাটা
া হলেও, ও কথা বলায় কবিত্ব-শক্তির
শেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে
করা ফুলে ফুলে মধুপান করছে' এরূপ কথা
াতে, কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান কোনরূপ
নের পরিচয় দেওয়া হয় না। এস্থলে বলে
া আবশ্যক যে নিজেদের সকলপ্রকার
টির জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দায়ী করা,
মান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে
ড় পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস এ বিশ্ব নশ্বর
ং মায়াময় বলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা
ই-জগতের কোনরূপ খোঁজ খবর রাখতেন
। কিন্তু এ কথা জোর করে বলা যেতে
র, যে তাঁরা কস্মিনকালেও অবিদ্যাকে
পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি, কিম্বা এক-
লক্ষে যে মনের পূর্ব্বোক্ত প্রথম অবস্থা হতে
দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এরূপ মতও
প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই
পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না
হলে, কারও পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার
জন্মায় না, কেননা বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই
স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা
হচ্ছে মানসিক আলস্যবশতঃই আমরা সাহিত্যে
সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায়
ছবি আঁকতে পারিনে, তার একমাত্র
কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে
মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহ্য বস্তুর প্রতি যেমন
বিরক্ত, অপর দিকে অহংয়ের প্রতি ঠিক
তেমনি অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে
আমাদের মনে যে-সকল চিন্তা ও ভাবের উদয়
হয়, তা এতই অপূর্ব্ব এবং মহার্ঘ্য, যে স্বজাতিকে
তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য
ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে
ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের
অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল
অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনো-
ভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক্
না, অপরের কাছে তার যা কিছু মূল্য সে তার
প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।
অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায়
পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা
মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমা-
দের মনে স্থান পেত তাহলে আমরা সিকি
পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য
আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষ মাত্রেরই

মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ কর্‌বার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনো-বীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখ্‌বেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পার্‌বেন। তখন আর নিজের ভাব বস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে কর্‌বেন না, যে সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলা ক্রমে রচনা করা যে এক জিনিষ নয়, একথা গণধর্ম্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না, এই কারণেই এত কথা বলা। আমার বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকি পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন র রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন করতে হ অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্য এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনো বাহ্য-জগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন কর যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্য্যে দর্শন লাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জন্য অ মনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদে নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁ যেন দেশী বিলাতি কোনরূপ বুলির বশব না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরি লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরে না হোক্ অন্ততঃ নিজের উপকার করা হবে।

বীরবল।

তন্দ্রাপথে

মেঘের পুরীর পর্দ্দা তুলে'
নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে
কোন্ তারকার ইঙ্গিতে আজ,
পৌঁছিব গো কোন্ দেশে?
হাওয়ায়-বাজা বীণার তানে
মন ছোটে আজ কোন্ উজানে?
শূন্য গুহায় নূপুর শুনি'
কোন্ পুঁজিনে যাই ভেসে?

উড়ো পাখীর সুরের সুরায়,
ভূর্জ্জতরুর আব্‌ছায়ে,
প্রবাল-বরণ বৈকালে আজ
কোন্ পাষাণী গান গাহে!
ফুল-পরাগের ঘোম্‌টা টানি'
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী
আল্‌তা পরায় তা'র পায়ে।

বিস্মৃত কোন্ তূর্য্য-ধ্বনি
গর্জ্জে বুকের পঞ্জরে?
পথ হারায়ে ঝঞ্ঝা ফিরে
রুদ্র গহন সুন্দরে—
ছিন্ন কেতু ঊর্দ্ধে ধরি'
উঠ্‌ছি একা শৈল 'পরি,
নীল অশনি ঝল্‌সে গেছে
দ্রাক্ষাবনের অন্তরে!

লো সুষমা, এসেছি আজ,
ছিঁড়িয়া ডোর শৃঙ্খলে—
ডাক্‌ছে আমায় অস্ত-তারা—
প্রাণ যে আজি চঞ্চলে!
কোন্ পথে ওই অচল চলে?—
শান্তিজলের ঝর্ণাতলে
ফুট্‌বে কবে মানস-মৃণাল
ফুল্ল সোণার উৎপলে?

পথকে আজি ঘর ভাবি না—
ঘর যে আমার ঢের দূরে—
কোথায় বাজে বসন্ত-রাগ?
মন মজেছে সেই সুরে—
পৌঁছিব গো কোথায় গিয়া?
উথ্‌লে ওঠে নগ্ন হিয়া—
আঁক্‌ব শোণিত-বিন্দু দিয়ে
শেষ গোধূলির সিন্দূরে!

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা
বৈজয়ন্ত নন্দনে?
স্বপ্ন-চাতক পক্ষ মেলে
মন্ত্রমাখা রঞ্জনে—
মানব-জীবন ঢেউএর মত
কোন্ বেলাতে মর্ম্মাহত?
নয়ন মুদি ঝর্ণাধূমে
কোমল ঘুমের অঞ্জনে।

কোথায় রে শেষ পান্থশালা
কোন্ রূপালির প্রাঙ্গণে?
শঙ্কারে আজ নির্ব্বাসিনু
এই বেলা এই নির্জ্জনে—
মুক্তাহারা শুক্তি তুলে'
কোন্ খেলাতে ছিলাম ভুলে?
নে গেঁথে মন বরণমালা
অনুরাগের রঙ্গণে।

রাত্রিরাণীর আশার বাণী
দিনের হৃদয় দেয় ভরে'—
অনন্ত কাল মৌনী রহে
প্রশ্ন-হারা উত্তরে—
চন্দ্রাতপে ঘুমায় কা'রা?
হাজার ডাকেও দেয় না সাড়া,
নীল আকাশের প্রসার মাপে
রশ্মি-মুকুট ভাস্বরে।

ডুব দিনু আজ ধ্যান-সাগরে,
সব বাসনার সুপ্তিতে,
জান্‌ব তাঁরে মৃত্যু-ভূমি
পারে নি যাঁর রূপ দিতে—
শুকিয়ে গেছে সোণার মাটি,
কোন্ ফসলে বাঁধ্‌ব আটি?
তন্দ্রাপথের অন্ত কোথায়
নিত্য দিনের দীপ্তিতে?

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা ও রাখাল *

প্রথম দিন

[রাজা সলোমানের সুসজ্জিত কক্ষে, জেরুজালেমের সুন্দরী-মণ্ডলী-পরিবৃতা গোপকন্যা। রাজা এই গোপ-কন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উহাকে প্রাসাদে আনিয়া রাখিয়াছেন। গোপকন্যার কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে মন টিঁকিতেছে না। আভীর-পল্লীর জন্য এবং আভীর প্রণয়ীর জন্য তাহার বিরহী-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।]

গোপকন্যা

(ঊর্দ্ধমুখে বন্ধুর উদ্দেশে)

চুম্বন দাও—অধরের চুম্বন,
বন্ধু! আমার বন্ধু অদর্শন!
মদিরা হইতে মদির যে ভালবাসা
তাই দিয়া তুমি পূরাও প্রাণের আশা।
তোমার অঙ্গ সুরভি ফুলের মালা,
নাম-সৌরভ জুড়ায় সকল জ্বালা;
তরুণ-হৃদয়া যতেক তরুণী তাই
তোমারেই চায়; তুমি বিনা কেহ নাই।

* * *

টেনে নাও মোরে কর গো আকর্ষণ,—
তোমারি পিছনে পিছনে ছুটুক মন;
রাজগৃহে আমি বন্দিনী হ'য়ে আছি
তোমারে বারেক নিকটে পাইলে বাঁচি;
মদিরা হইতে মধুর তোমার স্মৃতি
তোমাতে লগন সতী প্রকৃতির প্রীতি।

(পুরন্ধ্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া)

ওগো রূপবতী! ওগো রাজ-সহচরী!
চাহনিতে মোরে বিঁধনা, মিনতি করি;
কালো বলে আমি কুৎসিত নহি খুব,
রবির দৃষ্টি লেগে জ্বলে গেছে রূপ।
কালো আমি ঠিক বেদুইন্ তাঁবু সম
রাজ-গৃহে কালো মখমল নিরুপম।
কালো হ'ল তনু তপ্ত বাতাস লেগে,—
ক্ষেত রাখা কাজ ভাই দিল মোর রেগে;—
আঙুরের ক্ষেতে ক'রেছি চৌকীদারী;
আপনার ক্ষেতে আগাছা কাঁটার সারি।

(বন্ধুর উদ্দেশে)

ওগো প্রাণপ্রিয়! কোথা বাজে তব বেণু,
কোন্ মাঠে তুমি আজিকে চরাও ধেনু,—
কোন্ তরুছায়ে তাদের পিয়াও পানি
আজিকার এই দু'পহরে,—নাহি জানি!
ওগো প্রাণাধিক! যাও তুমি মোরে ক'য়ে
কি দোষে র'য়েছি দূর হ'য়ে পর হ'য়ে?

পুরন্ধ্রী

দুঃখিনী তুমি রূপরাণী সুন্দরী!
আমরা তোমায় আশ্বাস দিতে ডরি।
ফিরে তুমি কেন যাওনা আপন গাঁয়,—
নগরের গরু যে পথে গোষ্ঠে যায়,—
সেই পথে কেন যাও না গা তুমি চ'লে
ভায়ের তাঁবুতে জন্মভূমির কোলে।

(রাজা সলোমানের প্রবেশ ও গোপকন্যার মূর্চ্ছা)

রাজা

প্রেয়সী! প্রেয়সী! তুমি যেন সংগতা
মিশর-রাজের ঘোটকী রথোদ্ধতা!

* রাজা সলোমানের "Song of songs" অবলম্বনে গঠিত। এই কাহিনী লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে।



"চুম্বন দাও—অধরের চুম্বন,—
বন্ধু! আমার বন্ধু অদর্শন!"

কপোলে তোমার মণি-মুকুতার ঝুরি
কণ্ঠে তোমার সাতটি সোনার ডুরি ;
তোমার লাগিয়া আনিয়াছি গরবিনী
স্বর্ণ-মেখলা রজতের কিঙ্কিনী।

গোপকন্যা

(মূর্চ্ছান্তে)

রাজা যবে এসে বসেন আসন 'পরে
মুসব্বরের গন্ধ আমোদ করে।
উশীর হইয়া বঁধু মোর বুকে আছে
দিনে রাতে দুটি পদ্ম-কলির মাঝে ;
বন্ধুর কথা এড়িলে না যায় এড়া,
আঙুরের ক্ষেতে জটামাংসীর বেড়া।

রাজা

চেয়ে দেখ, তুমি অপরূপ সুন্দরী !
কপোতের মত আঁখির দৃষ্টি, মরি !

গোপকন্যা।

(রাজার কথার উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, বন্ধুর উদ্দেশে)

মরি ! মরি ! সখা অপরূপ তব রূপ,
ওগো মনোজ্ঞ ! তুমি অমৃতের কূপ !
শয্যা মোদের শষ্প—সবুজে আঁকা,
ঘরের বর্গা যত দেবদারু শাখা ;
সরল শালের শাখা এ ঘরের কড়ি,
বিনা হাতে মোরা তুলেছি এ ঘর গড়ি' ;
বন্ধু তোমারে গোপন কথাটি বলি
আমিই গোলাপ—আমিই পদ্ম-কলি।

রাজা

পদ্ম যেমন কণ্টক বন মাঝে
প্রিয়াও তেমনি পুরন্ধ্রীদের কাছে।

গোপকন্যা

সহকার যথা কানন-তরুর মাঝে
বঁধুও তেমনি অন্য লোকের কাছে ;
মনের হরিষে তাহারি ছায়ায় থাকি
সে গাছের ফল মধুর,—দেখেছি চাখি'।
সে মোরে এনেছে উৎসব মন্দিরে
প্রেমের ছত্র ধরেছে আমার শিরে।

(অধীর ভাবে)

সুরার পেয়ালা ধর্ গো আমার মুখে,
ব্যথিত পরাণ, প্রেমের বেদনা বুকে ;
এনে দে আমায় এনে দে গো সুধাফল
ভালবাসা-ভা'রে মন হ'ল বিহ্বল।
তার বাম হাত রয়েছে মাথার নীচে,
ডান হাতখানি আমারে আলিঙ্গিছে।

* * *

দোহাই বহিন্, দেখিস্ বঁধু না জাগে,
বনের হরিণীগণের শপথ লাগে ;
পায়ের নূপুর—না হয়—খুলিয়া রাখ,—
যত খুসী আজ ঘুমাক্—সে—বুকে থাক।

দ্বিতীয় দিন

(গোপকন্যা ও পুরন্ধ্রীগণ)

গোপকন্যা

(উন্মাদের ভাবে)

ওই শোনো ওই ! ওই তো কণ্ঠ তার !
আসিছে ! আসিছে মন্দিরে সে আমার !
পাহাড়ের পথে কিশোর মৃগের মত
আসিছে বন্ধু উল্লাস-ভরে কত !
দেখ্ দেখি তোরা সে কি এল আঙিনায় ?
জানালার ফাঁকে কার আঁখি দেখা যায় !

* * *

বন্ধু এসেছে, আমারে কহিছে ডেকে
প্রেয়সী ! রূপসী ! চলে এস ঘর থেকে ;
দেখ চেয়ে ওগো ! হিমের হয়েছে শেষ,
বৃষ্টি থেমেছে, পুষ্পে সেজেছে দেশ ;

পাখী-পাখালির কাকলির এল বেলা,
গাঁয়ে গাঁয়ে আজ কপোত-কূজন-মেলা।

* * *

খোবানির গাছে ধরেছে সবুজ ফল,
সুরভি আঙুরে রস-ধারা চঞ্চল,
প্রেয়সী! রূপসী! ওঠ তুমি এস চলে;
কি করিছ তুমি পাহাড়ের ও ফাটলে?
এস তুমি এস পাহাড়ি সিঁড়ির বাঁকে,—
গোপন-মিলনে মিলিবার মট-চাকে;
এস কাছে, দেখি সুন্দর মুখখানি,—
শুনি আরবার মধুর মুখের বাণী। * *

(গান)

(আমায়) বাদুড় ছুঁতে চায়।
(আমার) আঙুর ক্ষেতে কাল্ বাদুড়ের
পাখা নুয়ে যায়।

* * *

বঁধু সে আমার আমি সে বঁধুর বঁধূ,
পদ্মের বনে বঁধু মোর পিয়ে মধু;
যে অবধি নিশি নাহি হয় অবসান,—
ছায়া না পালায়,—বঁধু করে মধুপান।
বন্ধু! আমার পাহাড়ী হরিণ তুমি,
ফের একবার আঁখির মদিরা চুমি।

* * *

নিশীথ-শয়নে খুঁজেছি তোমারে প্রভু,
খুঁজেছি কেঁদেছি,—পাইনি খুঁজিয়া কভু;
শয্যা ত্যজিয়া নগরে বাহির হব,—
যারে ভালবাসি তার সন্ধান লব।
নগরের বাটে কব কেঁদে অনিবার,—
খুঁজেছি তাহারে, পাইনি নাগাল তার।

* * *

নগর-কোটাল ফিরিছে প্রহর হেঁকে,
থমকি' দাঁড়াল রাজপথে মোরে দেখে
নিশুতি রাত্রে; তাহারে সুধানু হাসি',—
দেখেছ কি তারে?—আমি যারে ভালবাসি!

* * *

তাদের এড়ায়ে সহজে এলাম চ'লে,—
যারে ভালবাসি তাহারে পাইব ব'লে;
পেলাম তাহারে, দেখা হ'য়ে গেল পথে,
ধরিনু দু'হাত; কহিলাম "কোনো মতে
ছাড়িয়া দিব না, বন্ধু! তোমারে আর
আমাদের ঘরে যেতে হবে একবার।"
ভুজ-বন্ধনে বাঁধি আগ্রহ ভরে
এনেছি আমার বঁধুরে মায়ের ঘরে।

* * *

দোহাই বহিন্! দেখিস্, বঁধু না জাগে,
বনের হরিণীগণের শপথ লাগে;
মন্দিরে বঁধু; বহিন্! মিনতি রাখ,
জাগাস্‌নে তোরা; ঘুমাক্ সে বুকে থাক।

তৃতীয় দিন

(প্রাসাদের কক্ষে গোপকন্যা; বাহিরে রাজশিবিকার বাহকগণের কলরব; জানালায় পুরন্ধ্রীগণ)

প্রথমা পুরন্ধ্রী

দাব-দহনের বিপুল ধূমের মত
কারা আসে ওই? কলরব কেন অত?
অঙ্গ-সুবাসে বাতাস হয়েছে 'তর',—
মুসব্বরের এল কি সওদাগর?

দ্বিতীয়া

রাজা এসেছেন,—ওই যে শিবিকা তাঁর,—
তিন কুড়ি লোক সাথে সাথে ফিরে যাঁর,—
হাতিয়ার হাতে—সাহসের অবতার;—
উরু-লম্বিত তলোয়ার খরধার।

তৃতীয়া

রাজা সলোমান—সুন্দর তাঁর রথ,—
সোনার পাতায় মণ্ডিত সুমহৎ!

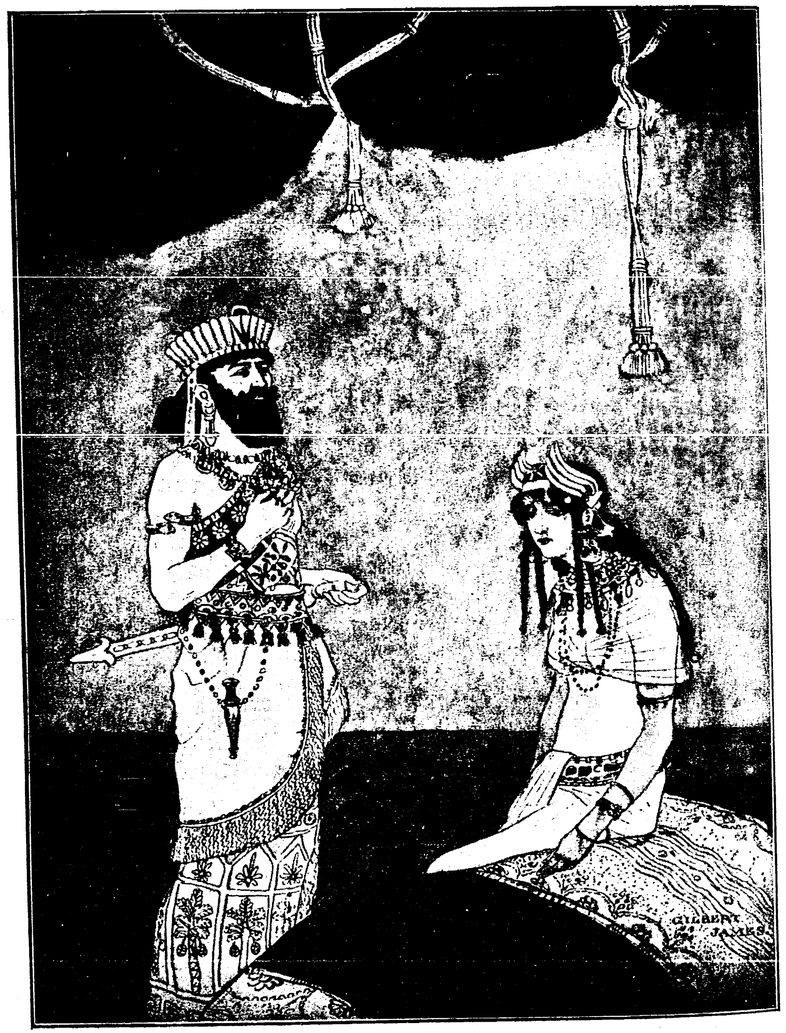

"দেখ, প্রিয়ে, দেখ তুমি কত সুন্দর!"

দির খাম্ভা, চাঁদোয়াটি কিঙ্খাব,
ম-রথ-রথী দুয়ারে আবির্ভাব!
লো পুরনারী! জেরু-জালেমের মেয়ে!
জার শিঙার দেখিবি আয়গো ধেয়ে!
খ, দেখ আজ পরেছে জড়োয়া-তাজ!
ণিময় সাজ!—মনের সুখের সাজ!

(বরবেশে রাজা সলোমানের প্রবেশ)

রাজা।

খ, প্রিয়ে, দেখ তুমি কত সুন্দর!
কপোতাক্ষী! আঁখি তব মনোহর!
কিত কেশ দুলিছে পৃষ্ঠ 'পরে,—
সাঘেঁসি যেন ছাগ-শিশুগুলি চরে।
ন্তের পাঁতি সদ্যস্নাত মেষ,—
তিটি যমজ,—কর্ত্তিত-লোম-লেশ।
াঙা ফিতা ঠোঁট, মনোজ্ঞ তব বাণী,
রবে-ঘেরা ডালিম ললাট-খানি।
াজা দায়ূদের মিনার তোমার গ্রীবা,—
াজার আঁখির ঢাল তাহে শোভে কিবা!
জ হরিণ-শাবক তোমার বুকে,—
পে-শয়নে ঘুমায়ে রয়েছে সুখে।

(নীরবে নিরীক্ষণ; গোপকন্যা নিরুত্তর)

অবধি নিশি না পোহায়,—ছায়া টুটে,—
ন্দন-বন-রেণুতে রহিব লুটে;
বিহরিব আমি কর্পূর-পর্ব্বতে;
নির্ম্মলা তুমি, প্রেয়সী পতিব্রতে।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

গোপকন্যা

(রাখাল-প্রণয়ীর উক্তিসমূহ স্মরণ করিয়া আবৃত্তি করিতেছে)

লিবানন্' ছাড়ি' এস তুমি মোর বঁধু!
ম্রেণীর' পাহাড়ে মৌমাছিদের মধু!
'আমানা' পাহাড়ে এস তুমি মোর কাছে
সিংহের গুহা বাঘ্-থানা করি' পাছে;
তুমি যে মথন করেছ আমার মন,—
বধূটি আমার! দোস্‌র! আপন জন!
সাত-ন'র হার তুমি তো পরেছ গলে,
এক ন'র তার পরালে মোরে কি ছলে!

* * *

"বহিনের বাড়া ভালবাসা তুমি দিলে,
তুলনা তোমার সংসারে নাহি মিলে;
মদের অধিক মদির তোমার প্রীতি,
অঙ্গ-সুরভি—সব সুবাসের স্মৃতি।
মধু ক্ষরে সদা ও অধর-মৌচাকে,
রসনার তলে গোরস গোপনে থাকে।
বসনে তোমার কুসুম-বনের বাস;
দোসর আমার! চিত্তের অভিলাষ!

* * *

"বধূটি আমার বেড়া ঘেরা ফুল-বাগী;
বাঁধ-দেওয়া নদী, 'নিমুখো' জলের ঝারি!
যে ফুল-বাড়ীতে ফোটে ডালিমের ফুল,
ডালিমের ফল দোলে গো দোদুল্-দুল্;
আছে দারু-চিনি আছে তায় জাফরাণ,
মিলেছে তাহাতে মশলা হাজার খান।
কর্পূর-পাতা তুমি সে মুসব্বর,—
বাগানের ঝিল,—অনাবিল নির্ঝর।"

* * *

জাগ্‌রে দখিনা! জাগ্ উত্তুরে হাওয়া!
বন্ধ-বাগানে কর্ তোরা আসা-যাওয়া;
বাহিরের সাথে ক'রে দে 'খুশ্-বূ' যোগ,
মালিক আসুক,—ফসল করুক ভোগ।

* * *

"এসেছি কুঞ্জে, এসেছি হে নিরুপমা!
ফুলের ফসল কুড়ায়ে করেছি জমা;

চাকের মধুতে জিহ্বা করেছে স্নান,
মদিরার সাথে দুগ্ধ করেছি পান।
এস সখা-সখী খেয়ে নাও, পিয়ে নাও,
প্রেয়সী! রূপসী! তুমি নাও, তুমি দাও!"

* * *

আমি নিদ্ যাই হৃদয় আমার জাগে,
হৃদয়-কবাটে ঘা দিয়া বন্ধু ডাকে;
কহে "দ্বার খোলো, ওঠ অনিন্দ্য সতী!
নিশির শিশিরে ভিজে গেছি সম্প্রতি।"
আঙ্ রাখা কোথা? আঁধারে দিয়েছি রেখে;
এখন বাহিরি' কিসে বা অঙ্গ ঢেকে?
পা'দুটি পাখালি' উঠেছি শয্যা 'পরে,
এখন মাটিতে নামি বা কেমন ক'রে!

* * *

দুয়ারের ফাঁকে বাহু সে বাড়ায় ঘরে,
পরাণ আমার 'আথালি-পাথালি' করে;
অবশ অঙ্গে খিল খুলি ত্বরা উঠে
আঙুলে মুসব্বরের গন্ধ ছুটে;
মুসব্বরের গন্ধ সকল গায়,
দুয়ারের খিল্ সৌরভে মূরছায়।

* * *

দুয়ার খুলিনু বন্ধু পশিবে ব'লে,
খুলিনু দুয়ার,—বন্ধু গিয়েছে চ'লে।
সে যবে আমায় ডেকেছিল নাম ধ'রে
বিবশ পরাণ ছিল গো ঘুমের ঘোরে।
খুঁজিলাম কত,—না পেলাম দেখা তার,
ডাকিলাম তারে সাড়া সে দিল না আর।

* * *

নগর-কোটাল রাতে পথে ফেরে খালি,
আমারে তাহারা মারিল গো দিল গালি;
তাহারা কারেও সহজে না দ্যায় ছাড়ি,
তাহারা আমার ঘোম্টা লইল কাড়ি'।

* * *

দোহাই বহিন্! দেখা যদি পাস্ তার,
বলিস্ তাহারে আমার যে সমাচার;
বলিস্ তাহারে ভালবেসে পাই ক্লেশ,—
বলিস্ তাহারে ভালবেসে তনু শেষ।

চতুর্থ দিন

(গোপকন্যা এখনও রাজপ্রাসাদে; রাজার ঐশ্ব
সত্ত্বেও সে রাখালের প্রেম ভুলিতে পারে নাই।)

(রাজপ্রাসাদ—গোপকন্যা ও পুরন্ধ্রীগণ)

পুরন্ধ্রী

অন্য মানুষে—মনের মানুষে তোর—
তফাৎ কোথায়? বল্ তো লক্ষ্মী মোর!
বন্ধু তোমার অন্য বঁধুর চেয়ে—
বড় কিসে? বল 'শূলম্'-দেশের মেয়ে!

গোপকন্যা

আমার বন্ধু হাজার রাজার সেরা,
কাকের পক্ষ কেশে তাঁর মাথা ঘেরা;
শুভ্র-শরীর—তাহাতে অরুণ আভা,
হাতের পায়ের নখগুলি লাল তাঁবা।
নদী কিনারের চকাচকী—আঁখি দুটি
দুধে নেয়ে-ধুয়ে উঠেছে উজলে ফুটি'।
কপোল তাহার ফুলের মতন মিঠা,
ওষ্ঠ-অধরে সুরভি অমিয়-ছিটা;
পানি দুটি রাঙা পদ্মরাগের রাগে,
শ্বেত পাথরের পা দুটি স্মরণে জাগে,
দেবদারু সম শরীর সুঠাম তার,
মুখখানি মধু,—সকল শোভার সার।
সুরূপ সুঠাম এমনি আমার বঁধু;
ওগো পুরনারী! রাজদাসী! রাজবধূ!

পুরন্ধ্রী

বহিন্! তোমার বঁধু গেছে কোন্ দেশে?
তোর সাথে মোরা যাব তার উদ্দেশে।



"খুঁজিলাম কত,—না পেলাম দেখা তার,"

কোন্ দেশে, আহা, হ'ল সে নিরুদ্দেশ ?
বল্, বোন্, বল্, তোর ক্লেশে মানি ক্লেশ।

গোপকন্যা

বন্ধু আমার গেছেন কুঞ্জবনে,—
পুষ্প-চয়নে শতদল আহরণে ;
বঁধু সে আমার, আমি সে বঁধুর বঁধু,
কমলের বনে বঁধু মোর পিয়ে মধু।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা

প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রিয়া ! তুমি কী চমৎকার !
তুমি দেব-সেনা—প্রতিমাটি মহিমার !
তুমিই আমার 'জেরুজালেম্' গো রাণী !
তুমিই 'তির্জ্জা'—দ্বিতীয় সে রাজধানী।
চেয়ো না অমন,—আর নয়, আর নয় ;
ও আঁখির কাছে মানিয়াছি পরাজয়।
তোমার চাঁচর চুল দোলে হাওয়া ভরে,—
গিরি' পরে যেন ছাগশিশুগুলি চরে।
দাঁতগুলি যেন যমজ ফুলের কুঁড়ি
প্রতিটি শুভ্র—প্রতিটির আছে জুড়ি।
ডালিমের মত নিটোল কপাল-খানি
চুলের পাতায় ঢেকেছে, হে মৃদু পাণি !

* *

তিন কুড়ি রাণী, চার কুড়ি আছে দাসী,
আছে অসংখ্য কুমারিকা সুধা-হাসি।
যে পাখীটি তবু ভালবাসি সব চেয়ে
সে তার ম'য়ের একটি মাত্র মেয়ে ;
নিষ্কলঙ্ক সতী সে পতিব্রতা,—
সে যে নিরুপমা,—তার সাথে কার কথা ?

* *

পুরনারী সবে তার সুখ্যাতি করে,
কি রাণী কি দাসী—সবে সুখী অন্তরে।
কে এল গো ঘরে ঊষার মতন মেয়ে !
কে এল, কে এল চাঁদের মতন চেয়ে !
সূর্য্যের মত মহিমায় দিক্ ছেয়ে !

নেপথ্যে রাখাল।

ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি ফসলের 'হাল' দেখে,—
ডালিম ধরে কি আঙুর ওঠে কি পেকে ;
বুঝিতে না পারি মনের কি আজ মতি,—
এ তনু-রথের কোন্ পথে আজ গতি !

* * *

এস, ফিরে এস 'শূলম্' গাঁয়ের মেয়ে !
জুড়াক্ নয়ন ফিরে তোর পানে চেয়ে ;
কি দেখিবি, মন, শূলামীর অন্তরে ?—
দুই মহাসেনা যুঝিছে পরস্পরে।

গোপকন্যা

আমি বন্ধুর—বন্ধু আমায় চায়—
এস প্রিয়তম ! যাই ফিরে দুজনায়
গ্রামের বাথানে মুক্ত মাঠের কোলে
দেখি গে দুজনে আঙুর কোথায় দোলে
ফল ধরে কিনা ডালিমে দেখিগে, বঁধু
সেথায় তোমারে পিয়াব প্রণয়-মধু।

* *

রাজহংসের মদ-ক্ষরণ-বাসে
হাওয়া ভরি' উঠে নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আঙিনায় আর বাগানের চত্বরে
নূতন-পুরাণো সব গাছে ফল ধরে ;
নূতন-পুরাণো জমাই তোমারি লাগি'
হে বন্ধু ! মোর মায়ের স্নেহের ভাগী !
আমার মায়ের স্তন্য পিয়েছ তুমি
তাইতো তোমার মধুর অধর চুমি' ;
ভাই নহ তবু ভায়ের অধিক গণি'
ভালবাসা তব মধুর মধুর খনি।

মার ঘরে যাব তোমায় সঙ্গে ক'রে,
বন্ধু আমার ঠেলিতে নারিবে মোরে ;
ডালিমের রস পিয়াব তোমায় বঁধু
খাওয়াব তোমায় মশালা-গন্ধি মধু।

(তন্ময়ভাবে)

বাম হাতখানি রাখিয়ে মাথার নীচে,
ডান হাতে মোরে বেষ্টন কোরো পিছে।

(পুরন্ধ্রীদিগের প্রতি)

বহিন্! দোহাই করিস্ নে কোলাহল,
দেখিস্! ও যেন হয় নাক' চঞ্চল ;
বন্ধুরে মোর জাগাস্ নে তোরা বোন্,
আপনি জাগিবে ;—শোন্ গো মিনতি শোন্।

পঞ্চম দিন

গ্রাম-পার্শ্বস্থ প্রান্তর। গোপকন্যা, রাখাল, গ্রামবাসীগণ।

(রাজা গোপকন্যাকে মিষ্ট কথায় বশীভূত করিতে না পারায় এবং বলপ্রয়োগে রুচি না হওয়ায় উহাকে গ্রামে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি করিয়াছেন।)

গ্রামবাসী

দূর হ'তে কেও আসিছে গরব-ভরে ?
কে আসে গরবে বন্ধুর হাত ধ'রে ?

রাখাল

(গোপকন্যার প্রতি)

যে গাছের তলে প্রথম প্রেমের দান,—
এই সে আপেল,—রয়েছে বর্ত্তমান।
এই সে তোমার জননী জন্মভূমি,—
এইখানে ওগো প্রসূত হয়েছ তুমি।

গোপকন্যা

চিরসাথী আজি কর মোরে, প্রিয়তম !
প্রেম-দেবতার তপ্তমুদ্রা সম —
ধর মোরে তুমি অঙ্গে ও অন্তরে ;
মৃত্যু অধিক ভালবাসা বল ধরে।
প্রেমের মরণ মরণ-অধিক জানি,
তার জ্বালা, ওগো অঙ্গার-জ্বালা মানি।
প্রলয় প্লাবনে না নিবে প্রেমের ভাতি,
সাগরের গ্রাসে না ডুবে প্রণয় বাতি।

রাখাল

না মিলে প্রণয় ধন জন-বিনিময়ে,
ধূলা হয় সোনা প্রেমীর প্রেমের পয়ে।

গোপকন্যা

মরম জানাই বন্ধু তোমার কাছে,
আমার একটি যমজ বহিন্ আছে ;
যৌবন আজো জাগেনি তাহার বুকে,
লজ্জার রং না ফোটে তাহার মুখে।
তারে নিয়ে আমি না জানি করিব কিবা!
অথচ তাহার সমুখে নূতন দিবা ;
মুখে মুখে যবে ফিরিবে তাহার কথা,—
কি করিব নিয়ে লজ্জাবতী সে লতা ?

রাখাল

ভূমি যদি হয় তুলিব দেউল গড়ি ;
কাঠ যদি হয় হুড়কার কড়াকড়ি।

গোপকন্যা

আমি ভূমি, ওগো দেউল আমার স্তন,
আমি মৃত্তিকা পেয়েছি তোমার মন।

রাখাল।

রাজা সলোমান আঙুরের ক্ষেত রাখে,
টাকা নিয়ে জমী জমা দেয় যাকে তাকে ;
এক এক ক্ষেতে সেলামী হাজার টাকা ;
আমার ক্ষেতটি নিছক্ আমারি রাখা।
আমার ক্ষেতটি আমার সুমুখে আছে,
ফলেছে আঙুর ডালিম ধরেছে গাছে ;



"চিরসাথী আজি কর মোরে, প্রিয়তম !"

রাজার জমীতে লাভ তো ভুষি ও 'ভুসো',
রাজার হাজার, কৃষাণের বেলা দু'শো !

(গোপকন্যার প্রতি)

ওগো ! আমাদের বাগান-গাঁয়ের মেয়ে !
দেখ একবার আঁখি তুলে দেখ চেয়ে ;
বন্ধুরা সব শুনেছে তোমার বাণী !
আমারে শোনাও ! আমারে শোনাও রাণী !

গোপকন্যা

তৎপর হও বন্ধু আমার !
বন্ধু ! মধুব্রত !
দারু-চিনি-বনে কর গো বিহার
কিশোর মৃগের মত ।

যবনিকা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সৌধ-রহস্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার আমি যে সব কথা প্রকাশ করিব, তাহা কুমুবার হলেরই অধিবাসিবর্গের মুখের কথা। জেনারেলের কোচম্যান্ ইজরেল টেক্স স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা সে ষ্টোনি-কার্কের আচার্য্য মিষ্টার মাথু ক্লার্কের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়াছে।

ইজরেল টেক্সের কাহিনী

মাষ্টার ফদারজিল ওয়েষ্ট ও পুরোহিতের অনুরোধ, জেনারেল এবং তাঁর বাড়ীর সমস্ত কথা আমি যতটুকু জানি, প্রকাশ করে বলতে হবে। গরীবের উপর জুলুম, শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, সকল দেশের সকল বড় লোকেরাই চিরকাল ধরে করে আস্‌চেন ! আমি বেচারা ভাল মানুষের ছেলে, লেখা পড়া জানি না—তবু আমাকে দিয়ে পুঁথির কথা লেখাতে হবে ! বেশ, —তাই হোক ! গরিবের ত আর "না" বলবার উপায় নেই !

আমার নিজের সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌তে পারব না। কি জানি, তাহলে অনেকেই হয়ত সময় নষ্ট হচ্চে ভেবে বই বন্ধ করে ফেল্‌বেন ! গরীবের কথা শুন্‌তে কারই বা ভাল লাগে ? কেবল দুঃখের কথা বইত নয় !

আমার কথা শুধু এইটুকু বলি যে, "টেক্" এই বংশটি ভারী নামজাদা,—আর খুব মানী বংশ। এককালে,—এককালেই বা বলি কেন, এখনও এই বংশেই এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা "টাকার গাছ" বলে বড় লোকের দলে ভারী খাতির পেয়ে থাকেন। আমার এখন যে রকম অবস্থা, তাতে এটুকু জানাতেও আমার লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু কি কর্‌ব, মিঃ ওয়েষ্টের কাছে আমার না কি কিছু পাওনা আছে* সেই জন্যই জানিয়ে রাখ্‌লুম। কি জানি, মিষ্টার ওয়েষ্ট

* এই সত্যবাদী মহাসম্মানিত বংশের বংশধর আমার নিকট পুরা মাত্রায় তাহার কার্য্যের মূল্য গ্রহণ করিয়াও আমাকে ঋণী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—আশ্চর্য্য !

আমায় যদি একটা নিতান্ত গরীব হতভাগা বলে জানেন, তাহলে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারেন।

আমি লেখা-পড়া জানি না। আমার বাবা আমায় স্কুলে পাঠাবার চেয়ে কাক-তাড়ানের কাজেই পটুতা জন্মানোটা পছন্দ করেছিলেন! তিনি আমায় স্কুলে পাঠিয়ে একটি অকর্ম্মণ্য "ফুল-বাবু" তৈরি না করে যে খেটে খাবার মত "মানুষ" করেচেন তার জন্য আমি চিরকালই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

অবশ্য লেখা-পড়া বাবা আমায় শেখান্‌নি—কিন্তু তাই বলে যে আমি ধর্ম্ম-কথার কিছুই জানিনে, এমন নয়। আমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ডের যা খাঁটি ধর্ম্ম, তা আমাদের বেশ ভাল করেই শেখানো হয়েছিল। আমরা গরীব বটে কিন্তু কখনও কারো অনিষ্ট করিনি, করবার সাধও রাখিনে। ধর্ম্ম পথে থাকলে অর্দ্ধেক রাত্রেও রুটি মেলে, এ কথাটা আমি খুবই মানি। যখন আমি রবিবার গির্জ্জায় যেতুম,—পথের লোক আমায় "ধার্ম্মিক টেক্" বলে ডেকে কথা কইত। ধর্ম্ম-কথা আমি জানিও বিস্তর।

মে মাসের এক সকাল বেলা পথের ধারে মিষ্টার ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। হাস্‌তে হাস্‌তে সে আমায় জিজ্ঞেসা করলে, "আমি কি চাই,—কোচমানী,—না, মালীর কাজ।" আমার তখন এমন অবস্থা যে কাজ খুঁজে-খুঁজে হায়রান হয়ে গেছি, —কিন্তু সে কথা ওর কাছে ভাঙ্গব কেন? আমি বল্লুম, "তা কোথায় কাজ, কি রকম কাজ, ভেবে দেখি—"আমার কথায় বাধা দিয়ে ছুঁচের মত সরু মুখখানা সিঁটকে সে উত্তর দিলে, "সে তোমার ইচ্ছে,—নিতে পার—না নিতেও পার! কত লোক খুসী হয়ে এই কাজে আস্‌বে। আর যদি নিতে চাও—তাহলে কাল সকাল বেলা আমার আপিসে এসে দেখা করো।"

লোকটা ভারী চাপা—আর কিপ্‌টেও ধাড়ী। তার কাছে থেকে দুপয়সা আদায় করা খুবই শক্ত,—হাত দিয়ে তার জল গলে না! এ আমি দিব্যি গেলে বল্‌তে পারি, —ফিরে জন্মে কখনও ওর ভাল হবে না। তা নাই হোক—এ জন্মটা মোদ্দা কাটালে মন্দ নয়। ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে খুবই পয়সা করে নিয়েচে। একেবারে রূপার আড়ঙ্ করে ফেলেচে। যখন শেষ বিচারের দিন আসবে, প্রভুর সিংহাসনের বাঁ দিকে যখন সাদা-কালো নেড়া মাথার গাঁদি লেগে যাবে, তখন সে দলে ম্যাকলীনকে দেখতে পেলে আমি যে একটুও আশ্চর্য্য হব না, এ কথা ঠিক।

পরদিন সকালে হুকুম-মত আমি তার আপিসে গেলুম। কেন গেলুম? বলেইচি ত, আমার "গরজ" তখন তার চেয়েও বেশী। কদিন থেকে ডান হাত একরকম বন্ধই যাচ্ছিল। আপিসে ঐ পেট-মোটা বুড়োটার সঙ্গে একজন লম্বা, রোগা, সাদা-মাথা ভদ্দর লোককে দেখতে পেলুম! তার মুখখানা এমন কুঁচকে তুবড়ে গেছে যে, দেখে আমার আক্‌রোটের খস্‌খসে গার কথা মনে পড়ছিল। সে তার চক্‌চকে চোখের কট্‌মটে চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লে,—কি বল্লে জান? —"আমার মনে হচ্চে, তুমি এই দেশেই জন্মেচ, না?"

বেটা যেন গণৎকার! আমি বল্লুম, "হুঁ, ঠিক্ ধরেচেন। কিন্তু এখান থেকে আমি এক পা কোথাও কখনো নড়িনি।"

"সত্যি?" অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেসা কল্লে, "বল কি! স্কটল্যাণ্ডের বাইরে কখনও যাওনি?"

"দুবার,—কারমাইলে শুধু দুটিবার গেছলুম! এ কথা কেন বল্লুম, জান? আমি সত্যি কথা বল্‌তে ভালবাসি কি না? আরও আমি শুনেছিলুম যে ম্যাক্‌লীনের দুটো হরিণ আর একটা পেরুর বাচ্ছা চাই। গোলা-বাড়ীতে সে রাখবে। যদি এই সুযোগে দু'পয়সা আসে, কেন না, বলা ত কিছু যায় না আমাকেই যদি সেখানে পাঠায়, আমাদের পুরুৎ মশাই বল্‌ত "করে ভাবার চেয়ে, ভেবে করা ভাল," আমি ত আর সে সব ধর্ম্মের কথা ভুলি না। হুবহু মনে গেঁথে রেখেচি। ভাল কথা, আমি জানি অনেক, তা তোমাদের কি তত শুনতে ভাল লাগবে? যাই হোক, এখন যা বলছিলুম, তাই বলা যাক্।

জেনারেল হিথারষ্টন বল্লে,—জেনারেল ছাড়া আর কেউ নয়, সে বল্লে, "আমি ম্যাক্‌লিনের কাছে শুন্‌লুম, তুমি লেখা-পড়া জান না, না?" তার পর ম্যাক্‌লিনের দিকে চেয়ে বল্লে, "এই ঠিক হবে,—আমি এই রকম লোকই চাই। আজ-কালকার চাকর-বাকরগুলো বেশী বেশী লেখা-পড়া শিখে একদম মাটি হয়ে যাচ্চে।" পরে আমার দিকে ফিরে বল্লে, "বুঝ্‌লে ষ্টেক্, তোমার সঙ্গে আমার বেশ মতের মিল হবে। মাইনে মাসে তিন পাউণ্ড, কি বল? কিন্তু একটি কথা, যখন ইচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে তোমায় জবাব দিতে পারব। এতে কেমন, রাজী ত?"

যতখানি সম্ভব মুখে দুঃখের ভাব এনে আমি জবাব দিলুম, "এ রকম কাজ আমি কখ্‌খনো করিনি মশায়,—এ আবার কি রকম?" কথাটা আমি কিছু মিথ্যা বলিনি। যখন ফারমার কটের কাছে কাজ করেছিলুম, সে আমায় মাসে এক পাউণ্ড করে মাইনে দিত।

তিনি বল্লেন, "ভাল, ভাল! তুমি যদি মেজাজ ঠিক করে থাক্‌তে পার, পরে না হয় মাইনে আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। ম্যাকলীনের কাছে শুনলেম, তোমাদের এখানে বুঝি আগাম "বায়না" কিছু দিতে হয়। তা এই নাও। সোমবার সকালে ক্লুমবারে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

সোমবার ত বেড়াতে বেড়াতে আমি ক্লুমবারে গেলুম। বাড়ীখানা কি প্রকাণ্ড! তার পেটের মধ্যে বোধ হয় আমাদের সহরের সব লোকগুলোকে তোফা ঠেসে রাখা যায়। ঘর, তা বোধ হয় শ'খানেক হবে। কর্‌ব ত মালীর কাজ, তা বাগান-ফাগান বড় কিছু দেখলুম না। ছোট একটু-জায়গা নিয়ে খানিকটা বাগান, তাতে গোটাকতক ফুলের আর বাহারে পাতার গাছ। আর ঘোড়া সেটাও প্রায় হপ্তা-তিন চার আস্তাবলের বারই হয়নি, আর কখনও যে হবে, এমন কিছু লক্ষণও দেখলুম না। তবে আমার খাটুনি খুবই হয়েছিল—সে ঐ বেড়াটা দেবার সময়। তা ছাড়া আর কাজ ছিল—ফাই-ফরমাস্‌টা শোনা—যেমন ধর, ছুরিখানা সাফ করা, জুতায় কালি লাগান, এমনি সব

কাজ আর কি! তা এর জন্যে আমার মত একটা জোয়ান মানুষকে রাখ্‌বার যে কি দরকার, তা ত কিছুই বুঝ্‌লুম না! এ'ত একটা বুড়ী ঝি রাখ্‌লেও কাজ চলে যেত!

আমি ছাড়া আর দুজন লোক ছিল—রান্নাঘরে রাঁধুনী লিজা, আর দাসী বারবারা। এদের দুজনেরই প্রথম জীবনটা লণ্ডনে কেটেছে,—এখন আর তিন কুলে কেউ নেই,—আর পৃথিবীর খোঁজ-খবর? তাও তারা কিছু জানে না, জান্‌তে চায়ও না। আশ্চয্যি মানুষ!

তাদের সঙ্গে আমার যে বেশী কথা বলতে হত না, এইটুকুই ছিল আমার ভাগ্যি! একে ত তাদের সময় নেই, সর্ব্বদাই কাজ নিয়ে আছে—তার উপর ভাল কথা যে কি, কাকে বলে, তা তারা মোটেই জানে না। নিজের উপকারের জন্যে জলার বেঙ্‌গুলোও যেটুকু ভাবে, নিজেদের জন্য তারা ততটুকুও ভাব্‌ত না। রাঁধুনী লিজা যখন বল্লে যে, ছ'পেনী খরচ করে মাষ্টার ডোনাল্ড মাক্‌স্‌নর কথা সে শুন্‌বে না, তখনি আমি বুঝ্‌লুম যে, সব চেয়ে বড় বিচারকের হাতে তাদের ফেলে দিয়ে এখান থেকে আমার সরে পড়্‌বার সময় হয়ে এসেচে!

লোকের মধ্যেও চারজন। জেনারেল, কর্ত্রীঠাকরুণ্, মাষ্টার মরডণ্ড আর কুমারী বেলা! দু-এক দিনের মধ্যেই আমার মন যেন বল্‌ছিল, সংসারটা যেমন হওয়া উচিত ছিল, ঠিক্-যেন তেমনটি নয়। কোথায় একটা কি গোল পাকিয়ে রয়েছে! কর্ত্রীর চেহারা যেন ভূতের মত! সাদা রং, আর কি রোগা! ভয়ানক চেহারা। অনেক সময়,—কেউ কোথাও নেই, আপনা-আপনি বিড়বিড় করে বক্‌চে! বাগানের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াত, তখন মনে হত, বুঝি পাগল হয়ে গেছে। এত যে পয়সার মানুষ, তা একটা ভাল কাপড়, কি সোনা-দানা কিছুই গায়ে নেই। মাথার চুলগুলো অবধি এলো-মেলো, হাত ছুড়ে ছুড়ে বিড়-বিড় করে কি যে মন্তর্ বলে! ভাবে, কেউ বুঝি দেখ্‌তে পাচ্চে না। কিন্তু আমার চোখে কিছুই এড়াত না।

মনিবের ছেলে-মেয়ে দুটির মুখ দিনরাতই যেন ভার ভার! কিন্তু কর্ত্তার কাছে সবাই হার মেনেচেন,—তাঁর মুখখানা দুঃখে একেবারে ঝুলে পড়েচে,—কোন খুনী বদ্‌মায়েসের গলায় ফাঁস্ দিয়ে টান্‌লে তার মুখখানা যেমন হয়, ঠিক সেই রকম! নুনের জাহাজ টাহাজ ছিল, ডুবে গেছে হয় ত! অনেক সময় ঐ রাঁধুনী আর দাসীটাকে জিজ্ঞেস করেচি যে, সংসারের কোন্ খানে আগুন ধরেচে! হয়েচে কি?

তারা নির্ব্বোধ গাধা—তারা বলে কি জান? তারা বলে, "মনিব কোথায় কি কচ্চে না কচ্চে, সে সব খোঁজে আমাদের কি দরকার?" তারা ঠিক সময়ে খেতে পাচ্চে, মাসের প্রথম মাইনে পাচ্চে, ব্যস্!" তারা এমন লোক যে দেখ্‌লেই মনে হবে, পাথরে খোদা দুটো পুতুল,—মন্-টন্ কিছুই নেই ভদ্দরভাবে যতই জিজ্ঞাসা কর, মুখে কথাটি নেই, যেন বোবা! কিন্তু নিজেদের যখন ইচ্ছা হবে, তখন—ওরে বাপ্‌রে! কি চীৎকার—গাছের উপর কাক-পাখীটি পর্য্যন্ত বস্‌তে পার্‌বে না।

এই রকম করে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের

পর মাস কাট্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীটার কিন্তু একটুও ভাল লক্ষণ দেখ্‌তে পেলুম না। খাওয়া-দাওয়া, নাচ্, ভোজ চুলোয় যাক্, বাড়ীতে কেউই আস্‌ত না,—আবার শুধু তাই? বাড়ীর লোকগুলো অবধি বাইরে বেরুত না। কর্ত্তা দিনদিন রোগা আর দুর্ব্বল হতে লাগলেন—কর্ত্রী-ঠাকরুণের মুখে মেঘ ত লেগেই আছে,—অথচ কোন দিন কারো সঙ্গে তাঁকে ঝগড়া-বচসাও করতে শুনিনি। কি করে জান্‌লুম? তারা যখন এক সঙ্গে সবাই খেতে বস্‌ত,—আমি ঠিক্ সেই সময়টিতে জান্‌লার ধারের গোলাপ গাছগুলোকে নিড়তুম,—আর কান খাড়া রাখ্‌তুম, ওদের কথার উপর! ওরা তা জান্‌তেও পার্‌ত না।

যখন ছেলে-মেয়েরা থাক্‌ত—তখন কোন একটা কথা বড় হতই না কিন্তু তারা না থাক্‌লে যেন কি-একটা ভয়ানক ঘটনা ঘট্‌বে এমনি কথা চলত। কি রকম কি ঘটনা, তা অবশ্য কিছু বুঝ্‌তে পারতুম না! আমি জেনারেলকে অনেক সময় বল্‌তে শুনেচি যে মরবার,—কি কোন বিপদের সামনে দাঁড়াবার তার ভয় করে না। কিন্তু এ রকম করে একটু একটু করে মরা—বহুকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকা, আর বিপদটার ঠিক-ঠিকানা না পাওয়া, এ সবে তাঁর শরীর ভেঙ্গে যাচ্চে, সাহসও ফুরোচ্ছে। কর্ত্রী তাঁকে সাহস দিত, ঠাট্টা করবার জন্যে বল্‌ত, "বিপদ নিশ্চয় আস্‌বে না, শেষকালে সব ভালই হবে।" কিন্তু এ সব ভাল কথা কেই বা শুনত?

ছেলে-মেয়েদের কথা আমি সবই জানতুম, সুবিধে পেলেই ওয়েষ্টের সঙ্গে মিশে ওরা ব্রাঙ্কসায়ারে পালিয়ে যেত। কর্ত্তা নিজের দুঃখে এম্‌নি কাতর হয়ে থাকতেন, যে এ সব খবর জান্‌তেও পারতেন না। আমার কথা যদি বল? আমি খাঁটি মানুষ, নিজের কাজের বাইরে একচুলও যাব না,—কেন যাব? কোচম্যান বা মালীর কাজের সঙ্গে তাদের খবর কি? তারা কি কচ্চে না কচ্চে বুড়োকে তা জানানো ত আমার কর্ত্তব্য নয়! আর বুড়োরও ত আক্কেল থাকা দরকার ছিল,—যে যদি একটা ছেলেকে কি মেয়েকে বলা হয় যে, অমুক কাজ তুই করিস্‌নে—তা হলে তারা নিশ্চয়ই আগে সেই কাজ করে বসে।

ভগবান্ এক সময় তাঁর ছেলে-মেয়েকে বলেছিলেন যে ঐ জ্ঞান গাছটির ফল খাসনি, আর সব খা। কিন্তু ছেলে-পিলের স্বভাব, তারা আগে গিয়ে সেই ফলটিই তুলে খেলে। আমার মনে হয়, ভগবানের বাগানের লোকদের সঙ্গে উইগটাউনের এই লোকগুলির যে কোন তফাৎ থাক্‌তে পারে, তার কোন মানে নেই!

এ-ছাড়া আর একটা কথা আছে—সে আমি এখনও বলিনি—কিন্তু সে কথাটাও লিখে রাখতে হবে।

জেনারেল আর তাঁর স্ত্রী এক ঘরে শুতেন না। জেনারেল শুতেন, একেবারে বাড়ীর সব শেষের ঘরটায়। সে ঘরটা অন্য সব সময় চাবি-বন্ধ থাকত। কাকেও সে ঘরে ঢুক্‌তে দিতেন না। বিছানা পাতা,—ঝাড়া ঝোড়া সবই তিনি নিজের হাতে করতেন। আর আমাদের চাকর-বাকরদের ত সে দিকের রাস্তাতেও চলবার হুকুম ছিল না। রাত্রে সমস্ত ঘরে, ঘরের সব জানলায় চারদিকে আলো

ঝোলান হোত। কর্ত্তা নিজে চারদিকে ঘুরে সারা রাত পাহারা দিয়ে বেড়াতেন। সারা রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম—এ সিঁড়ি দিয়ে উঠচেন, ও সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌চেন। মাঝ রাত্রির থেকে যতক্ষণ না সকাল হয়, এই রকমই আনা-গোনার তাঁত বোনা চল্‌ত।

নিশুতি রাতে একা ঘরে বিছানায় পড়ে পড়ে, এই রকম পায়ের শব্দ শুনে শুনে আমার কানদুটিও ঝালাপালা হয়ে যেত। যাই হোক, তিনি পাগলই হোন্, আর ভারতবর্ষ থেকে পুতুল পূজোর তন্তর-মন্তরই শিখে আসুন, তাঁর মাথায় ঘী-টিতে যা কিছু ভাল জিনিষ ছিল, তা কিন্তু পোকায় কুরে খেয়ে ফেলেছেল—একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

বাগ্‌দত্তা

(১৭)

পরদিন প্রভাতীসুরে নহবতের সানাই প্রতিবেশীর ঘরে শিশুদের জাগাইয়া উৎসব গৃহের দ্বারে জড় করিল। নন্দকিশোর নিয়মিত কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ চিকিৎসাগারে আসিয়া স্বল্প পরেই বিমূঢ়ভাবে বাহির হইয়া আসিলেন, উপরে উঠিয়া ডাকিলেন "বিন্ধ্য!" বিন্ধ্যবাসিনী শশব্যস্তে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, "হইয়াছে কি?"

নন্দকিশোর কহিলেন "গৌরী নাম ওর কে রেখেছিল? তোমরা কি?"

সংশয়কম্পিত সভয়কণ্ঠ এমন করিয়া বাধিয়া যাইতেছিল যে যেন তিনি জজের কাছে তাঁহার সর্ব্বস্বপণের মোকর্দ্দমার রায় শুনিতে চাহিতেছেন।

কিছু না বুঝিয়া বিস্মিতা বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন "তাতো জানিনে, বোধহয় দিদিই রেখে থাকবে, যখন ওকে আনায় ওর জামায়, বিছানায় ঐ নাম লেখা ছিল। আমরাও সেই থেকে ওকে গৌরী বলে ডাকি।"

জজের রায়ে হতাশার সংবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল; নন্দকিশোরের মুখ নীল মাড়িয়া গেল, জীবনীশক্তি যেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমনই বোধ হইল। আশাহীনের অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল "রেখা মনে পড়ে?"

"পড়ে বই কি।"

"তবে আমার সব ফুরাল!"

অজানিত ভয়ে সম্মুখবর্ত্তী নারী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন—"লাহিড়ীমশাই!"

"জানোনা বিন্ধ্য, ধারণা করতেও পারনি আমার কি সর্ব্বনাশ আজ হলো, আমার কেউ নেই—"

"লাহিড়ী মশাই! একি পাগল হয়ে গেলেন—"

পাগল, যদি হয়ে থাকি বেশি কিছু হয়নি, আগে তবে শোন। মাকে আমার বলে মনে করেছিলাম, আমার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ভেবেছিলাম, সে আমার কেউ নয়, সে তোমার দিদির কাছে গচ্ছিত ভবানী প্রসাদের মেয়ে।

"এতদিনে সে ভবানীপ্রসাদ এখানে এসেছে—বলচে এ তার মেয়ে আমার কেউ নয়, সে বারেন্দ্র নয় রাঢ়ী। এ বিয়ে হতে পারেনা।"

"সে ভুল কয়েচে গৌরী দিদির মেয়ে, দাদা নিয়ে আসেন। তিনি তাহলে শুনতে পেতেন না, বলেন কি? না না।"

নন্দকিশোরের চারিদিকের ভূমি তখন ভীষণবেগে আবর্ত্তিত হইতেছিল, অচল পৃথ্বীর চলতা অকস্মাৎ ভূমিকম্পের রুদ্রতালে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গৌরী তাঁহার নয়? না মনে না বাহিরে!

তবে এ দুদিনের জন্য অন্ধের দৃষ্টিদান কেন করিলে ভগবন্! চিরঅন্ধকারই তো ভাল ছিল।

স্খলিত চরণে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘূর্ণিত মস্তক দেহভার বহন করিতে পারিতেছিল না তাই আসন গ্রহণ করিতে হইল। গ্রহণ লাগা সূর্য্যের ঝাপসা আলোর মত সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণ তাঁহার দৃষ্টিপটে পুরাতন বাঙ্গালা কালির হরিদ্রা লেখা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল, সে লেখা অবোধ্য অস্পষ্ট। স্নেহপাত্রীর কৃতঘ্নতা, ভাগ্যের বিশ্বাসঘাতকতা একসঙ্গে দুইটা প্রচণ্ড আঘাত; তাহাও এ বয়সে, সহিয়াছে। গত সন্ধ্যার ঘটনা শেলের মত বক্ষঃপঞ্জরে বিঁধিয়া আছে, হতাশ হৃদয় সেই অবধি যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া বলিতেছিল এত করিয়াও কন্যার মন পাইলাম না! তাহাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

কিন্তু এই নবীন আতঙ্ক সহসা সে কথা ভুলাইয়া দিল। শুধু এই মাত্র মনে রহিল তাঁহার গৌরী তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে, সে আর তাঁহার নয়, সে অন্যের, অন্য লোক তাহার পিতা,—তাঁহার কেহ নাই! একটা বুকফাটা তীব্র যন্ত্রণার ক্রন্দন মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার করিয়া উঠিল, মানবের অহং ভিতরে জাগিয়া উঠিয়া পদতল হইতে মস্তকের কেশগুলাশুদ্ধ কাঁপাইয়া আকুলস্বরে কহিল—'আমার কি হইল?'

দ্বারের বাহিরে শব্দ হইল "নন্দকিশোর বাবু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বসিয়ে রাখলেন, উত্তরটাও দিয়ে গেলেন না! আমি ভিতরে যেতে পারি?"

উত্তরের পূর্ব্বেই দ্বার ঠেলিয়া কাশকুসুমসদৃশ শুভ্র মস্তক ও প্রসন্নমুখ লইয়া এক অপরিচিত মূর্ত্তি প্রবেশ করিল। নন্দকিশোর তাহাকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কে যেন তাঁহার হাত-পা গুলা সেই-খানে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল,—উত্থান অসম্ভব হইল, অধর ঈষৎ কম্পিত হইল কি একটা অস্পষ্ট অভিবাদনসূচক ধ্বনি তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল কিন্তু তাহার অর্থবোধ হইল না। বিন্ধ্য তাহার সহসা আগমনে সচেতন হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া

দিলেন। আগন্তুক কহিল "আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার কাছে লজ্জা কি মা? তাহলে ডাক্তারবাবু আমাকেই অনুমান ঠিক তো?" আবার একটা মুমূর্ষু-কণ্ঠের অস্ফুট যন্ত্রণা ধ্বনি নন্দকিশোরের রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল "হ্যাঁ"।

"তার নাম গৌরী আমার স্ত্রী সূতিকাগারেই রাখেন। আপনি জানেন সূতিকাগৃহেই তাঁহার মৃত্যু হয়, আমিও সেই অবধি দেশত্যাগী। দুই বৎসর পরে মিরাটে ফিরে আপনাদের অনেক অনুসন্ধান করি কিন্তু কোন খবর পাই নি, এবার কলকাতায় এসে এই পাড়ায় একটি আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথায় কথায় আপনার কথা, আপনার কন্যার বিবাহের কথা উঠে, তিনি কন্যার নাম উল্লেখ করতেই আমি চমকে উঠি, গৌরী —সে তো আমারই মেয়ে—"

"বাবা!" নন্দকিশোর চমকিয়া দেখিলেন দুখানা বল্লরীকোমল বাহুপাশ তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া একখানা জুঁই ফুলের মত ক্ষুদ্র ও তেমনই সুন্দর মুখ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঐ মধুর নামে সম্বোধন করিতেছে। সহসা সঞ্জীবনী তাড়িত-স্পর্শ তিনি অনুভব করিলেন। নন্দকিশোর পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় অকস্মাৎ যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে তাহাকে দুইহস্তে টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আকুল হৃদয় হইতে স্নেহ বিগলিত আর্ত্তনাদ বাহির হইল "মা, মা আমার," পরক্ষণে দুইবাহু শিথিল হইয়া দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল; অবসাদগ্রস্তভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বাবা আমায় নাকি আবার কে একজন নিতে এসেছে!" গৌরীর মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছায়া, তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী বৃদ্ধকে সে একবারও লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সংবাদটা কেমন করিয়া ইতিমধ্যেই বাড়ীময় রাষ্ট্র ও তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল।

বৃদ্ধ কহিল "হ্যাঁ বাছা আমিই তোমায় দেখতে এসেছি—"গৌরী বিদ্যুৎবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া সভয়ে নন্দকিশোরের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল "ওই বুড়োর সঙ্গেই আবার কি আমায় যেতে হবে?"

কি মর্ম্মভেদী সকরুণ আবেদনের সুর! সে যেন বলিতেছিল এমনই করিয়া কি তোমরা আমায় লইয়া পরিহাসের খেলা খেলিতেছ! নন্দকিশোর উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "উনিই তোমার বাবা গৌরি; উনি হয়তো তোমায় নিয়ে যাবেন, আমি তো তোমার কেউ নই আমি কেমন করে তোমায় ধরে রাখব মা আমার?" হৃদ্‌পিণ্ডটা বোধ হয় এই কথা কয়টার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি তাহার কেহ নন! তাঁহার সর্ব্বস্বধন, জীবনের একমাত্র সুখ যে তাঁহার সে তাঁহার কেহ নয়!

গৌরী ব্যগ্রহস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া উগ্রস্বরে কহিল আমি যাবো না"।

"না মা তোমায় কোথাও যেতে হবে না, তুমি যাঁর সন্তান হয়ে আছ থাক, সুখে থাক, সুখী কর, আমি ভবঘুরে, চালচুলাও রাখিনি; তোমায় আমি কোথায় নিয়ে যাবো? বেশ আছ, কেন তোমায় ভালবাসার লোকেদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করব? না, শুধু দেখে গেলাম, আশীর্ব্বাদ করে গেলাম, বাপের আশীর্ব্বাদে ভাল হবে।—

ডাক্তার বাবু! ভয় নেই আপনার ধন আমি অপহরণ করবো না। শুধু এই বিয়েটা বন্ধ করা আমার দরকার ছিল, তা না হলে আমি শুধু দূরে থেকেই একবার দেখে চলে যেতাম! তবে বিদায়, রাঢ়ী পাত্র দেখে বিবাহ দিও, সুখে থেকো মা, সুখী হও"। এতক্ষণে ঘরের বাতাস যেন লঘু হইয়া আসিল, সূর্য্যের জ্যোতিঃ দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল, পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সহজ সবল অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া নন্দকিশোর স্বাভাবিক-ভাবে দুইপদ অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন "তবে একে আবার আমায় দিলেন?" "ওতো তোমারই"—

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে কোন সাড়া রহিল না, কেবল গৌরীর দ্রুত নিশ্বাসের একটা অস্ফুট শব্দ থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতে লাগিল। সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল তাই আশ্বাস পাইয়াও যেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ কি অদ্ভুত ঘটনা তাহার জীবনে ঘটিতেছে? তাহার এক মাসিমা ভিন্ন কেহ ছিল না হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি গিয়া পিতৃ পরিচয়ে তাহাকে সেই মাসিমার বক্ষঃ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিল, সে বিচ্ছেদ ব্যথা এখনও সে ভুলিতে সক্ষম হইতেছে না, আবার আর একজন হঠাৎ একদিন প্রভাতে আসিয়া বলিল, 'ও নয় আমিই তোমার পিতা! আবার পিতা নিজেও সেই কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, হ্যাঁ উনিই তোমার পিতা, আমি কেহ নই!"

গৌরীর 'পিতা' অবশেষে সেই ভাবোন্মাদনাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "তবে চল্লাম লাহিড়ী মশাই! আর দেখা হয় কি না হয়, এবার বদরিনারায়ণ যাবো ভেবেছি। মা একবার ফিরে দাঁড়াও তোমার মুখখানি একবার দেখে যাই"—গৌরী নন্দকিশোরের বক্ষে মুখ লুকাইল, তিনি সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "যাও গৌরী ওঁকে প্রণাম করে এসো, কাছে যাও—"

সে এ আদেশ পালন করিল না, বরং জোর করিয়া নিজের মুখখানা যথাস্থানে চাপিয়া রাখিল। নন্দকিশোর পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে ঈষৎ অপ্রতিভ ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ইহা বুঝিয়া ভবানীপ্রসাদ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "থাক্, বেটী ভয় করছে পাছে ওর মুখখানা দেখলে এ পাষাণ বুকে প্রাণ সঞ্চার হয়ে যায়, পাছে মায়ার বাঁধনে পড়ে ছেড়ে যেতে না পারি! হয়তো ঠিকই বুঝেছে, কি বলেন ডাক্তার বাবু! আর কাজ নাই—তা হলে নমস্কার মশাই, আপনার মঙ্গল হোক, সুখে থেক মা"। নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সে কি এখনি কেন যাবেন? দু একদিন—না হয় আজকের দিনটা—"

"জানেন তো সবই ডাক্তার বাবু! কেন মিথ্যে আবার জড়াতে চাচ্চেন? কি জানেন মানুষের মন! এ দুনিয়াকে বিশ্বাস করতে নাই। আসি তা হলে।"

অল্প পরেই দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দে

গৌরী বুঝিল সে ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছে। সে মুখ তুলিতেই দুইটি গভীর স্নেহে ভরা উৎকণ্ঠিত উৎসুক নেত্রের সহিত তাহার নেত্র মিলিল, উভয়েই একটু হাসিল, গৌরী অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়োটা চলে গিয়েছে?" "হ্যাঁ, কিন্তু ওরকম করে তাঁকে বলতে নেই গৌরী, তিনি তোমার বাবা, আর কত মহৎ তিনি!" কৃতজ্ঞতায় আনন্দে নন্দকিশোর অবরুদ্ধবাক্ হইয়া গলগ্ন কন্যাকে আরও কাছে সরাইয়া লইলেন। তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে গৌরী কহিল, "রাম বল! সে কেন আমার বাবা হবে! তুমি আমার বাবা।" বিন্ধ্যবাসিনী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছিলেন, এইবার হাসিয়া ফেলিলেন।

পত্র-পরিচয়

পত্র-পথে বারেক দেখা আঙুল চারেক জমীর 'পরে—
মসী-মাখা মোহর-আঁকা চৌকা সাদা খামের ঘরে!
কোকিল নহে—ডাকের ডাকে,
আখর-আঁটা বেড়ার ফাঁকে
একটি কেবল কথার হাওয়ার আভাস শুধু তিলেক তরে;
স্পর্শে যাহার মনের বনে ভাবের গাছে মুকুল ধরে।

বসন্তে নয়, নয় বরিষায়—বৈশাখী এক দ্বিপ্রহরে,
নিম্ব-শাখার পাতায়-ঢাকা কেউ-না-থাকা একলা-ঘরে;
এ পরিচয়—কি পরিচয়?
মিলন-রসের কোন্ অভিনয়!
চম্‌কে-চাওয়া থম্‌কে-যাওয়া কোন্ না-পাওয়া পাবার তরে—
একটি নাম আর একটি কথায় না জানি কোন্ শক্তি ধরে!

মূর্ত্তি কোথায়, রূপটি কি তার—কেমন করে' জান্‌ব তারে?
কল্পগাঙে জালটি ফেলে' কি ধরে' আজ টান্‌ব পারে!
ছত্র দুয়েক পত্র-লেখা—
সেই কি তাহার চিত্ররেখা;
চোখটি তাহার চুলটি তাহার জল্‌ছে যাহার অন্ধকারে?
নামটি তাহার ফুলটি কি সে মুগ্ধ করে গন্ধ-ভারে!

পত্র-পথে সেই সে দেখা, তাও সে শুধু বারেক তরে;
আজো তাহার দাগটি আছে গোপন মনের বিজন ঘরে!
কত জনের কত আলাপ—
হয়ত তাদের নাই কোন ছাপ;
মায়ার মোহের কত বাঁধন কেটেছি এই আপন করে—
তারি মাঝে একটি কোথায় রয়ে গেছে কেমন করে'!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

হকের ধন

কোনমতে নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া আহার শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিপিন উপরে আসিল। ঘরের জানালায় একটা কামিজ হাওয়ায় শুকাইতেছিল। বিপিনচন্দ্র সেটা টানিয়া গায়ে চড়াইল। পরে তাহার উপর কোট উঠাইয়া বোতাম আঁটিতে আঁটিতে হাঁক পাড়িল, "ওগো, আমার জল-খাবারের বাক্সটা দিয়ে যাও—আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। ন'টা বাজে!"

পুস্তকাকৃতি একটা টিনের বাক্স হাতে লইয়া মনোরমা ঘরে আসিল। স্বামীর সম্মুখে বাক্স রাখিয়া মনোরমা অঞ্চল হইতে ছোট একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া বলিল, "কাল-বাদে পরশু অক্ষয়-তৃতীয়া। কাল আবার রবিবার, ছুটি, বেরুবে না ত। বামুন খাওয়াবার জিনিষ-পত্তরগুলো কলকেতা থেকে আজই তাহলে নিয়ে আসা চাই। দেখো, যেন একটিও না ভুল হয়। এতে বাদ দেবার কিছু নেই। ফর্দ্দটা শুনবে?"

জুতা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বিপিন কহিল, "থাক্, আর পড়তে হবে না। বেশী ফ্যাসাদের কিছু নেই ত? দেখো—"

মনোরমা কহিল, "না, না, ক'দিন আমাদের মাস-কাবারের ময়দা ফুরিয়ে গেছে—তা এখানকার ঐ ধূলো-বালি দিয়েই চালাচ্ছি। তুমি বলেছিলে, শনিবার কিনে আনবে। তা আজ এনো। ভুলো না। না হলে সত্যি ত আর ঐ ধূলো-বালিগুলো বামুনদের পাতে দিতে পারব না।"

বিপিন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ফর্দ্দ ও খাবারের বাক্স পকেটে ফেলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। তামাক খাইবারও সেদিন আর অবসর হইল না।

বিপিনের বাড়ী হইতে কাঁকনাড়া ষ্টেশন দশ মিনিটের পথ। কাঁকনাড়া হইতে বিস্তর লোক প্রত্যহ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিয়া কলিকাতার অফিসে চাকুরি বজায় রাখেন। প্রতি ট্রেনেই অফিস-যাত্রীর বিরাম নাই—যাহার অফিস যত কড়া, তাহাকে তত শীঘ্র বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে হয়। বেলা এগারোটায় বিপিনের অফিস হাজিরা লয়।

তাই তাহার নয়টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইলেও চলে। নয়টা সতেরোর ট্রেন দশটা পনেরোয় কলিকাতায় পৌঁছায়। সুতরাং বিপিনের কোন অসুবিধা হয় না।

গাড়ীতেই বিপিন দিবানিদ্রাটুকু সারিয়া লয়। সেদিনও নিত্যকার মত সে নিদ্রার আয়োজন করিল। তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় পত্নী প্রদত্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফর্দ্দের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া সে পড়িতে বসিল। আঁকা বাঁকা অক্ষরে মনোরমা এক দীর্ঘ ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়াছে! ঘি, ময়দা হইতে আরম্ভ করিয়া আনারস, তরমুজ, ছাঁচি ও মিঠা পান অবধি সে ফর্দ্দ হইতে বাদ পড়ে নাই। বিপিন ভাবিল, তাইত! এতগুলা জিনিষ! সারা কলিকাতাটাই আজ ঘুরিতে হইবে, দেখিতেছি। অফিস হইতে বেলা দুইটার সময় সে বাহির হইবে, স্থির করিল। স্ত্রীর উপর একটু রাগও যে না হইল, এমন নহে! পরক্ষণে হাসিও আসিল। সে ভাবিল, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েগুলা সত্যই অদ্ভুত জীব বটে! কলিকাতায় অফিস যাই ত একেবারে হুকুম করিয়া বসিয়াছে, রাজ্যের দ্রব্য-সামগ্রী সেখান হইতে কিনিয়া আনো। এতটুকু ভাবেনা বা বোঝে না, যে, বিশাল সহর কলিকাতার কোথায় কোন্ এক ক্ষুদ্র কোণে অফিস, আর কোথায় থাকে কত দূরে এই সকল ঘি ময়দা ও ফল-মূলের দোকান-গুলা! কলিকাতা কি কাঁকনাড়া যে, একটা অশথতলায় হাট বসাইয়া রাজ্যের দোকানী-পশারী মেলা জমাইয়া দিয়াছে, ছুটিয়া গিয়া এক-নিশ্বাসে জিনিস-পত্র কিনিয়া আনা চলে। না বুঝিয়া সব এমন জিনিষের ফরমাস করিয়া বসে, যে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেই সারা দিন কাটিয়া যায়, কেনা ত দূরের কথা!

গাড়ী ইছাপুর ষ্টেশনে থামিলে ভূপেন, মহীন্, ও হাবুল আসিয়া ট্রেনে উঠিল। হাবুল কহিল, "এই যে বিপিনদা, আজ বড় ঘুমোওনি যে! তা যাক্, ভালই হয়েছে। রতন পৌনে আটটার ডাউনে বেরিয়ে গেছে, আমাদের তাস খেলার সঙ্গী কম পড়বে, ভাবছিলুম। তা তুমি ত ঘুমোওনি—বসতে হবে।"

দুই-চারি বার আপত্তি করিয়া বিপিন দেখিল, না খেলিলে ইহারা কিছুতেই নিষ্কৃতি দিবে না। অগত্যা সে খেলায় যোগ দিল।

২

বেলা দুইটার সময় অফিস হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীর ফর্দ্দ-মাফিক জিনিস-পত্র কিনিয়া বিপিন যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিল, রাণাঘাট লোকাল তখনও প্লাটফর্ম্মে ইন্ হয় নাই। বাহিরের কুলি কহিল, "হামলোককো ভিতর যানেকা হুকুম নেহি, বাবু—"

কয় ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরিয়া-বকিয়া বিপিনের মেজাজের ঠিক ছিল না। সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "হুকুম নেহি ত কেয়া হোগা! এ সব কি হাম বয়েগা?" রেলের এক কেরাণী বাবু নিকটে ছিলেন, বিপিনকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, নিয়ম যখন নাই, তখন উহার সহিত বাদানুবাদ করা বৃথা। বিপিন যে ইহা না জানিত, তাহা নহে, তবে সব-কেমন তাহার গোল হইয়া গিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের এই রৌদ্রে

খুই কি সে ঘুরিয়াছে, পয়সাও আজ বিস্তর রচ হইয়া গিয়াছে। যাক্, এখন বকাবকি রিয়া লাভ নাই। অগত্যা সে রেল-কুলি াকিয়া জিনিস-পত্র তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া গ্রসর হইল। প্লাটফর্ম্মে আসিয়া তাহার নে পড়িল, ঐ যাঃ! ভারী ভুল হইয়া গিয়াছে! তামাক কেনা হয় নাই,—অথচ কেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। বালাখানার ার দিয়া আসিল, তবু তখন হুঁস হইল না! কি আপদ! কাল আবার রবিবার, ছুটির দিন। তাস খেলিতে বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইবে। তখন সে আসর জমিবে কি করিয়া? কুলির নম্বরটা দেখিয়া লইয়া জিনিস-পত্র তাহার চার্জ্জে রাখিয়া তাহাকে খশিসের লোভ দেখাইয়া তামাক আনিবার ন্য বিপিন আবার শিয়ালদহের মোড়ে ছুটিল।

মোড়ে তখন পুতুল-নাচ ও ময়ূর-পঙ্খীর াড়ম্বর করিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরযাত্রী, লাক-লস্কর ও গাড়ী-ঘোড়ায় সমস্ত পথ ুড়িয়া এক বর চলিয়াছে, বিবাহ করিতে। ামুখে বাধা দেখিয়া বিপিন মহা বিরক্ত হইল। প্রোসেশন চলিয়া গেলে রাস্তার অপর পারের মোড় হইতে এক টাকার তামাক কিনিয়া হন্‌হন্ করিয়া প্রফুল্ল মনে সে ষ্টেশনে ফিরিল।

যাত্রী-বোঝাই গাড়ী তখন প্লাটফর্ম্মে াড়াইয়া ছুটিবার জন্য অধীর আগ্রহে ুঁসিতেছিল। কুলিকে জিনিস-পত্র উঠাইতে লিয়া কোনমতে গাড়ীতে ভিড়ের মধ্যে বিপিন একটু স্থান সংগ্রহ করিল; পরে জিনিস-পত্র ুলিয়া গুছাইয়া কুলিকে পয়সা দিয়া নিশ্চিন্ত নে বসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ষৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সহসা সম্মুখস্থ বাঙ্কের উপর তাহার চোখ পড়িল। চোর-কুঠারির মত ট্রেনের কামরা,—অন্ধকারে ভালো নজর চলে না, তবু দেখা গেল, টুকরি-ভরা গোলাপ-জাম ও প্রকাণ্ড একটা তরমুজ বাঙ্কে রহিয়াছে। তাহার তরমুজের চেয়ে এটা বড় কি? অমনি তাহার নিজের তরমুজটার কথা মনে পড়িল! এ-ধার ওধার চারিধারে সে ফিরিয়া দেখিল। কৈ—নাই ত! তবে ভুল হইয়াছে! নিশ্চয়, সেটা প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া আসিয়াছে! সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের দুই-তিন জনকে টপকাইয়া একেবারে কামরার দ্বারের সম্মুখে আসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেনও তাহার দীর্ঘ দেহ-ভার নাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিপিনের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না—হাতল ঘুরাইয়া ঠেলিয়া সে কামরার দ্বার খুলিয়া ফেলিল; খোলা দ্বার-পথে যেমন লাফাইয়া পড়িবে, অমনি তাহার কোমর জড়াইয়া সবলে কে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। সে সুদৃঢ় বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া বিপিন কহিল, "আঃ, কে? আমি তরমুজ ফেলে এসেছি, মশায়, তরমুজ। বিস্তর ঘুরে নগদ দেড় টাকা দাম দিয়ে কেনা—গোয়ালন্দর তরমুজ!"

ভদ্রলোকটি তাহাকে টানিয়া বসাইলেন, কিন্তু তাহার দখল ছাড়িলেন না। পরে ধীরভাবে বুঝাইলেন যে, ট্রেন যখন চলিতে সুরু করিয়াছে, তখন সে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িলে নিশ্চয় জরিমানা হইবে। এবং কোর্টে গিয়া পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেওয়ার চেয়ে দেড় টাকার তরমুজটা খোয়া গেলে ক্ষতি যে কম হইবে, সে বিষয়েও তিনি ইঙ্গিত করিতে ভুলিলেন না।

বিপিন কহিল, "আহা, বুঝচেন না, মশায়—"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "বেশ বুঝচি। ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে শুধু আপনারই ক্ষতি হত, আর সেইজন্যেই যে আপনাকে ধরেছি, তা ভাববেন না। একে ত এই বেজায় গরমে অফিসে গরম সাহেবকে নিয়ে জ্বলে মরছি, এর উপর যদি আপনার মকদ্দমায় রেল-কোম্পানির তরফে সাক্ষী হয়ে শেয়ালদার পুলিশ কোর্টে হাজিরে দিতে হয়, তাহলে প্রাণে ত বাঁচবোই না, মধ্যে থেকে চাকরিটিও খোয়া যাবে! আপনি কি সে বিপদে না ফেলে ছাড়বেন না?"

গ্রীষ্ম-তপ্ত যাত্রীর দল ভদ্রলোকটির কথায় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইল। বিপিন কেমন অপ্রতিভভাবে বাহিরের পানে চাহিল।

ট্রেন তখন গতির বেগ বাড়াইয়া প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া খালের পুল অতিক্রম করিয়াছে। উপায় নাই দেখিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল—ভদ্রলোকটিও নির্ভয়ে তাহাকে বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি দিলেন।

বিপিন ভাবিল, এখন বাড়ী গিয়া তরমুজ-সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? বলিবে কি যে, ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া আসিয়াছে? তাহা হইলে বেকুবির চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া হয় বটে! হুঁসিয়ার ক্রেতা বলিয়া পাড়ায় যে সুনামটুকু সে অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাও নিমেষে হারাইতে হয়! বানাইয়া মিথ্যা কিছু বলিবে কি? কিন্তু মনোরমা কলিকাতার মেয়ে। তাহার তীক্ষ্ণ জেরার মুখে মিথ্যা কৈফিয়ৎ গুলা বন্যাস্রোতে তৃণ-খণ্ডের মতই ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে! সাত বৎসর পূর্ব্বে নৈহাটির কোর্টে সে একবার এক মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিল, সেখানে উকিল মোক্তারের জেরা হইতে অনায়াসে অক্ষত দেহে ফিরিতে পারিয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীর জেরা,—তাহার কাছে আর পরিত্রাণ নাই। তবে গিয়া ফিরিয়া কি বলা যায়? এই তরমুজের জন্য স্ত্রীরও আবার মমতার সীমা নাই! গ্রীষ্মে জন্য তৃতীয়ার ব্রাহ্মণকে তরমুজে তুষ্ট করিতে পারিলে অন্তিমে তাহার স্বর্গলাভে বিষম অন্তরায় ঘটিবে বলিয়াই যে স্ত্রীর হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে! এবং এই ধারণার কথা মাঝে একমাস ধরিয়া নিত্য মনোরমা বিপিনকে শুনাইয়া আসিতেছে!

এমন সময় ট্রেন সহসা থামিয়া গেল। নাড়া পাইয়া বিপিনের হুঁস হইল। সে দেখিল দমদমা জংসন ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। কত লোক উঠিল, নামিল। বিপিন ভাবিল, এখানে নামিয়া সে শিয়ালদায় একবার ফিরিবে কি? কিন্তু এই জিনিসপত্র তাহা হইলে যে আবার বহিতে হয়! তাহার নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে! তাহার উপর সে তরমুজ যে এখনও ষ্টেশনে পড়িয়া আছে, তাহারই বা ঠিক কি! ভাবিয়া একটা মীমাংসা করিয়া লইবার পূর্ব্বেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বিপিন ভাবিল, থাক্, ও আর ভাবিয়া কোন লাভ নাই।

বেলঘরিয়া ষ্টেশনে ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন—নামিবার সময় বিপিনের প্রতি একটি সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়িলেন না। বিপিনের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে সেই তরমুজের কথাই ভাবিতেছিল।

ন হইতে যতই সে চিন্তাকে সে তাড়াইবার চেষ্টা করে, ততই যেন মনের মধ্যে তাহা পিয়া আঁটিয়া বসে!

ট্রেন যখন পল্‌তা ছাড়াইল, কামরা তখন ায় খালি হইয়া গিয়াছে। শুধু বিপিন ও কধারে আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকমাত্র সিয়া ছিলেন। ভদ্রলোকটি কামরার কাণ ঠেসিয়া দিব্য ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার র্ণ গৌর, মাথার সম্মুখে টাক্, গায়ে াগলপুরী বাফ্‌তারচায়না কোট। কোলের উপর একখানা বাঙলা খপরের কাগজ ড়িয়া আছে। বিপিন দেখিল, বাঃ, গোলাপ ামের টুক্‌রি ও তরমুজটা যে বাঙ্কে এখনও হিয়া গিয়াছে। তাহার মতই কেহ ভুল করিয়া ফলিয়া গেল না ত! কিন্তু না, ইহারও ইতে পারে ত! ঠিক তাহাই হইবে!

তবু আশার একটা ক্ষীণ জ্যোতি তাহার বিষণ্ণ আঁধার চিত্তের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। মন্ত ভদ্রলোকটির নিকটে গিয়া তাঁহার ায়ে ঠেলা দিয়া বিপিন ডাকিল, "মশায়, মশায়, শুনছেন?"

ভদ্রলোক ধড়মড়িয়া চক্ষু মেলিলেন। হিলেন, "কি,—হালিসহর এসেছে?"

"না।"

"তবে?" তীব্র দৃষ্টিতে তিনি বিপিনের ানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে বিপিন হঠিল া, কহিল, "এ তরমুজটি কত দিয়ে কিনেছেন?"

"সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন?" লিয়া ভদ্রলোক চক্ষু মুদিলেন।

বিপিন কহিল, "বলি, ঘুমোলেন না ক?" ভদ্রলোক চোখ খুলিলেন না।

বিপিন তাঁহার গা ঠেলিয়া পুনরায় কহিল, "শুনছেন—?"

"কি?"

"তরমুজটা বেচবেন? আমি কিনি তা হলে।" ভদ্রলোক কট্‌মট্ করিয়া বিপিনের পানে চাহিলেন, কঠিন স্বরে কহিলেন, "পাগল না কি, আপনি? বেশী পাগলামি করেন ত ট্রেনের শেকল ধরে টেনে বে—"বলিয়া আবার নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি চক্ষু মুদিলেন।

বিপিন অবাক হইয়া গেল, ভাবিল, এমন অদ্ভুত লোকও দুনিয়ায় থাকে! তাহার মাথার মধ্যে রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। ক্ষোভে নিরাশায় সমস্ত দেহ তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরের মধ্যে চিন্তার ঝড় বহিল।

ট্রেন ক্রমে শ্যামনগর ছাড়াইল। চারিদিক তখন ঈষৎ আঁধারে ঢাকিয়া গিয়াছে। অন্ধকার গাছগুলার গায় জোনাকির দল চুমকির মত জ্বলিতেছে! এবার তাহাকে নামিতে হইবে। যদি কোন উপায় থাকে ত এই বেলা তাহার জোগাড় দেখিতে হইবে! নহিলে আর কোন আশা কোন পথ নাই। বাক্সের দিকে বিপিনের নজর পড়িল। তরমুজটা তখনও তথায় রহিয়াছে। ট্রেণের দোল্ পাইয়া নড়িতেছে! মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বিপিন পকেট হইতে কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া দুই ছত্র পত্র লিখিল,—

"মহাশয়, আপনার তরমুজটি আমি লইয়া চলিলাম। বাড়ীতে আমার তরমুজের বিশেষ প্রয়োজন আছে; না হইলে নয়। তরমুজের দামের দরুণ দুইটি টাকা এই চিঠিতে মুড়িয়া আপনার পকেটের মধ্যে ফেলিয়া গেলাম।"

পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া চিঠির মধ্যে পুরিয়া ভাঁজ করিয়া ভদ্রলোকটির পকেটের মধ্যে সে কাগজের মোড়কটি সন্তর্পণে বিপিন ফেলিয়া দিল। ভদ্রলোকের নাসিকা তখন বিপুল গর্জ্জনে নিদ্রাদেবীর প্রচণ্ড প্রভাব ঘোষণা করিতেছিল। তিনি কিছুই জানিলেন না।

"কান্‌কিনারা—" প্লাটফর্ম্মের কুলির কণ্ঠ হইতে কয়টি কথা বিপিনের কর্ণে আজ যে মধু বর্ষণ করিল, কোন সঙ্গীতের সুরেও বুঝি তেমন মধু কোন দিন ঝরে নাই! বিপিন হাত-ছানি দিয়া ইঙ্গিতে একটা কুলি ডাকিয়া তাহার মাথায় জিনিস-পত্র উঠাইয়া নিঃশব্দে ট্রেণের কামরা ত্যাগ করিল। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে-ছিল, গা ছম-ছম করিতেছিল। নামিবার সময় নিদ্রিত সহযাত্রীর পানে সভয়ে একবার সে চাহিয়া দেখিল। অত্যন্ত সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে প্লাটফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া বিপিন যখন ষ্টেশন-গৃহের বাহিরে আসিল, ট্রেণ তখন বাঁশী বাজাইয়া সরীসৃপের মত দীর্ঘ দেহভার নাড়িতে সুরু করিয়াছে। এঞ্জিনের চিমনি হইতে অগ্নিময় ধূমোদ্গার হইতেছিল। বিপিনের মনে হইল, ট্রেনটা যেন দৈত্যের মত রক্ত বমন করিতেছে! কিছুক্ষণ ট্রেনের পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল। পরে সেখানা দূরে চলিয়া গেলে,তাহার পশ্চাতের লাল আলোগুলা যখন ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে তিনটা রক্ত বিন্দুর মত মনে হইতেছিল, বিপিন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। উঃ—মস্ত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে! যদি সে লোকটার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহা হইলে কি আররক্ষা ছিল! তখনই আসিয়া চোর বলিয়া তাহাকে ধরা দিত! বিপিনের চোখের সম্মুখে এক রা লাল-পাগড়ী-পরা মাথা ও লৌহ গরাদ ক্ষুদ্র একটা অন্ধকার ঘর নিমেষে যেন গ্রহণ করিয়া জাগিয়া উঠিল। কুলি ডা "বাবু—" বিপিনের চমক ভাঙ্গিল। কহিল, "হাঁ, চল্।"

ঝিল্লী-মুখরিত অন্ধকার গলির পথ ধরি বিপিন গৃহে চলিল। সেদিন কুলিটা কা মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে স্থি করিতে পারিল না। সন্ধ্যার পর ছয় পয়সা জায়গায় বিপিন তাহাকে কি না একটা আধু বখ্‌শিস করিয়াছে!

৩

মনোরমা কহিল, "আজ তোমার ফিরতে এত দেরী হল যে? আমি ভাবছিলুম—"

বিপিন কহিল, "বড় ছোট ফর্দ্দখানি দিয়েছিলে কি না! আজ একেবারে কলকেতা সহর প্রদক্ষিণ করে ফেলেছি!"

বাজার দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে মনোরম কহিল, "যাক্, তরমুজ আর আনারস আনতে ভোলনি; এতে আমার খুব আহ্লাদ হয়েছে! তুমি আনবে বলে আমি মনেও করিনি। বোশেখ মাসের দিন, ও দুটি জিনিস বামুনকে দিতে না পারলে কি তৃপ্তি হয়!"

বিপিন সে কথার কোন জবাব দিল না। এই তরমুজের জন্য আজ তাহাকে কত হায়রাণ হইতে গিয়াছে! জেলে অবধি যাইবার যো ঘটিয়াছিল। নেহাৎ অদৃষ্ট গুণে বাঁচিয়া গিয়াছে। লোকটার ঘুম যদি ভাঙ্গিয়া যাইত! ভাবিতে এ গ্রীষ্মের দিনেও

পিনের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এখনও বলিতে পারে, অদৃষ্টে কি আছে! লিসহরে পৌঁছিয়া যখন সে দেখিবে, মুজ নাই—তখন সেই চিঠির টুকরা ও কা দুইটা লইয়াই যদি সন্তুষ্ট না হয়! পিন স্থির করিল, ও পাড়ার যদুবাবুর ছেলেটি াক্তারি পড়িতেছে, কাল সকালে গিয়া াহার সহিত দেখা করিয়া একবার পরামর্শ করিলে ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না! রমুজ লইয়া এ যে বিষম উৎপাতে পড়া গেল! অন্ধকার ঘরে পড়িয়া বিপিন কত কি াকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। মাধব াসিয়া দাবার ছক্ পাতিয়া বসিল। খেলায় পিনের যথেষ্ট সুনাম থাকিলেও আজ সে তান্তই আনাড়ির মত হারিতে লাগিল। াধব কহিল, "যাও, যাও, আর খেলে না। তামার মাথার ঠিক নেই। না হলে এই সব লে—"

মাধবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিপিন হিল, "সারা দিন রোদে ঘুরে মাথাটা ভারী রেছে হে—"

রাত্রেও কি নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়। যেমন কটু তন্দ্রা আসে, অমনই মনে হয়, কে ঐ রের দ্বারে ঘা দেয় না! জানালার ফাঁক য়া অন্ধকার পথে লণ্ঠন হাতে কাহাকেও লিতে দেখিলে, মনে হয়, বুঝি ফাঁড়ির ৌকিদার তাহারই সন্ধানে আসিতেছে! পিনের বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া ফুলিয়া ঠিতেছিল! তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন-বিভীষিকারও ন্ত ছিল না। থানার প্রাঙ্গণ ও কাছারি-ঘরে াসামীর ডক্ চোখের সম্মুখে চাকার মতই ন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে ভয়টাও অতিরিক্ত ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এখন দিনের আলোয় মনের আঁধার অনেকখানি কাটিয়া গেল। কিন্তু না—দিনের আলো যতই তীক্ষ্ণ ফুটিয়া উঠিতেছিল, পাখীর ডাকে, লোকের কোলাহলে কর্ম্ম-চক্র যতই আপনার গতির বেগ বাড়াইয়া চলিল, বিপিনের মনখানা ভয়ে ও ভাবনায় ঠিক সেই অনুপাতেই একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। যদুবাবুর ছেলের কাছে আর যাওয়া হইল না। পথে বাহির হইতেও ভয় করে। কি জানি, রাত্রি বলিয়াই হয় ত পুলিশ আর কাল ততটা চাড় করে নাই, আজ দিনের বেলায় পথে বাহির হইলে যদি ধরিয়া বসে! সারা গ্রামে তাহা হইলে তখনই একটা টী-টী পড়িয়া যাইবে। এ অপবাদের পর কাহারও কাছে কি আর সে কখনও মুখ দেখাইতে পারিবে! আর, মনোরমা? বেচারী মনোরমা! স্বামীর এ লাঞ্ছনার কথা শুনিলে সে কি হায় এক দণ্ড বাঁচিবে? তখনই ত সে বিষ খাইয়া মরিবে! তাই যখন মনোরমা আসিয়া তাহাকে কহিল, "ও কি গো, ঘরের কোণে বসে রইলে যে! কাকে-কাকে বলতে হবে, বলে এস না! এর পর রোদ উঠবে, বেরুবে কি করে? তার পর ত দুপুর বেলা তাসের মাতন চলবে। আজই সব বলে এস গে—", বিপিন তখন শুধু ফ্যালফ্যাল করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিল; মুখে কোন কথা ফুটিল না। আহা, বেচারী মনোরমা! হরিণীর মত স্বচ্ছন্দ লঘু চিত্তে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে! সে জানেও না;

কোথা হইতে ব্যাধের গোপন শর এখনই নিমেষে তাহাকে বিদ্ধ, জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিবে। দুর্ভাবনায় তাহার মনের ভিতরটা একেবারে অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! ভরা মেঘের পিছনে জল যেমন স্তম্ভিত রুদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, একটা দম্‌কা বাতাসের ঘা খাইলে ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহারও চোখের পিছনে অশ্রুর রাশি তেমনই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মনোরমা যদি তাহার সহিত আর দুই-একটা কথা কহিত, তাহা হইলেই বিপিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে অশ্রুর রাশি হু-হু করিয়া ঝরিয়া পড়িত! কিন্তু বিপিনের সৌভাগ্য যে মনোরমা দাঁড়াইল না, ব্যস্তভাবে তখনই রন্ধনশালার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

কিন্তু শুধু ত এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও চলে না। বন্ধু-বান্ধব আসিয়া যে বাহিরে ডাক পাড়ে, স্নানাহারের বেলা হইয়া যায় বলিয়া মনোরমা সঘন তাগিদ দেয়। এ সব-গুলার দিকে মনোযোগ অর্পণ না করিলেও সকলের সন্দেহ জন্মিতে পারে, বুঝি কিছু ঘটিয়াছে! অথচ এ বিপদের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে মাথা একেবারে কাটা যায়! মনোরমাকেও এ কথা খুলিয়া বলা চলে না!

রবিবার তাহার খেলা-ধূলা ও আনন্দ-বিশ্রামের ডালি বিলাইয়া বিদায় লইল। বুকের মধ্যে সারা ক্ষণ আশঙ্কার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করিলেও শুধু লোক দেখাইবার জন্য বিপিন ভারাক্রান্ত চিত্তে সে আনন্দ-বিশ্রাম ও খেলা-ধূলার ডালির অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

৪

সোমবার সকালে আবার নিত্যকার ম
নয়টা বাজিল। ভয়-ভাবনা, বজ্রের ম
মাথার উপর উদ্যত থাকিলেও অফিসে যাইতে
হইবে। সেদিন আবার গৃহে অক্ষয় তৃতীয়া
ব্রাহ্মণ-ভোজন। মনোরমার অনুরোধ-অনুযো
সত্ত্বেও বাড়ীর কাজ-কর্ম্মে বিপিন একবা
উঁকিটি অবধি পাড়িল না।

অফিস যাইবার সময় স্ত্রীর মুখখানি
পানে কতবার যে সে ম্লান দৃষ্টিপাত করিয়াছে
তাহা সে-ই জানে। স্ত্রী কিন্তু কাজের ভিতে
সে করুণ দৃষ্টি লক্ষ্যও করিতে পারে নাই।
শেষে বাড়ী ছাড়িবার সময় তাহার মনে
হইল, একবার ডাকিয়া বলি, "ওগো,
বিদায়, চির-বিদায়! আর বুঝি বাড়ী
ফিরিব না। এখান হইতে একেবারেই জে
চলিলাম!" কিন্তু না, এ কথা বলা চলে না।
বাহিরের লোক বিস্তর আসিয়া বাড়ীকে
জমিয়াছে। খাঁদুর পিসী, রাধির মা, গগির
খুড়ী—সকলে অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া
আসিবে! ফলে ব্যাপারখানার মধ্যে যতটুকু
করুণ রস আছে, তাহা কাহারও নজরে
পড়িবে না, তাহারা শুধু নিঙড়াইয়া ইহার মধ্য
হইতে কৌতুক-রসটুকুই নিঃশেষে আদায়
করিয়া ছাড়িবে! কাজেই আর স্ত্রীকে বলিয়া
কহিয়া বিদায় লওয়া হইল না। কিন্তু যদি
আর গৃহে ফেরা না ঘটে? বিপিনের সারা
প্রাণ একটা আকুল উত্তেজনায় হায়-হায়
করিতে লাগিল।

ট্রেন আসিলে বিপিন তাহতে চড়িয়া বসিল।
সহসা পাশের কামরায় তাহার নজর পড়িল।
ও কি! শনিবারের ট্রেনের সেই ভদ্রলোক—

না? ঠিক! কোন ভুল নাই! সেই মাথায়
টাক, ভাগলপুরী বাফ্‌তার কোট গায়ে—
পাশে সেই চাঁচের তৈয়ারী ছোট ব্যাগ! সে
কামরায় লোকও একেবারে গিস্ গিস্
করিতেছে। ভদ্রলোকটি এক পেণ্ট্‌লেন-পরা
যুবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কি কথা?
বিপিন উদ্‌গ্রীবভাবে কান পাতিল।

ভদ্রলোকটি বলিতেছিলেন, "ভাগ্নেটির
আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, রবিবার—তাই আর কি
শনিবার হালিসহর গেছলাম। শোন,
তারপর মজার কথা। ভগ্নীপতি লিখেছিলেন,
কলকেতা থেকে যেন কতকগুলো ক্ষীরের
খাবার-দাবার আর কিছু ফল-ফুলুরী কিনে
নিয়ে যাই! তা বাড়ী থেকে মেয়েরা তার
ব্যবস্থাও করে দেছল। আমার ছোট ছেলে
ষ্টেশনে এসেছিল, দেখে-শুনে সব উঠিয়ে
দেবার জন্য! তা টিকিট কিনে প্লাটফর্ম্মে
আসবার সময় দেখি, আমার জিনিস-পত্রের
কাছে প্রকাণ্ড এক গোয়ালন্দর তরমুজ পড়ে
আছে। অথচ সেটাকে দাবী করবার কেউ
নেই—আমার সঙ্গে তরমুজ নেওয়া হয়
নি। ছেলে বললে, 'বাবা, তরমুজটা তুলে
নি—কেউ ফেলে চলে গেছে নিশ্চয়। এখানে
পড়ে থাকলে এখনই রেলের কোন্ বেটা
কুলি নিয়ে গিয়ে হয় ত সাবাড় করে দেবে।"
বলে সে সটান্ সেটা নিয়ে আমার গাড়ীতে
তুলে দিলে। বাঙ্কে সব রেখে আমি ত একটি
কোণ জোগাড় করে দিব্যি বসে গেলাম।
আর গাড়ীতে বসলেই, কি জান, আমার
কেমন বদ্ স্বভাব, কেবলই ঘুম আসে। এই
তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, তাই জেগে আছি,
না হলে এতক্ষণ বেশ এক ঘুম হয়ে যেত—"

পাশের কামরা হইতে বিপিন উৎকর্ণভাবে সব কথা শুনিতে লাগিল। যুবা কহিল, "তার পর?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "তার পর ত দিব্যি ঘুমুচ্ছি—ঠেলা দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, "মশায়, তরমুজটা বিক্রী করবেন? আমি কিনব।" ভারী রাগ হল। ঘুম চটে যাওয়ায় মনটা একেবারে খিচড়ে গেল। তাঁকে ধমক দিয়ে ফের ত ঘুমোতে লাগলাম।—কি জবাব দিছলাম, তার কিছুই মনে নেই। তার পর, শোন মজা—হালিসহরে এসে নামবো—দেখি, তরমুজটা নেই। তখন অবশ্য অতখানি খেয়ালও হয়নি। ভগ্নীপতির বাড়ী গিয়ে কুলি ভাড়া দেব বলে পকেটে হাত দিতেই কি একটা মোড়া কাগজ হাতে ঠেকল। বের করে ভাগ্নের হাতে দিলাম। সে পড়লে—এই দেখ, সে চিঠি—"

বলিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া পকেট হইতে একটা কাগজের টুকরা বাহির করিয়া যুবার হাতে দিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে বিপিন সে কাগজটার পানে চাহিল—এ যে সেই চিঠি,—দুইটা টাকা মুড়িয়া যে চিঠি সেদিন সে ভদ্রলোকটির পকেটে ফেলিয়া দিয়া ট্রেন ত্যাগ করিয়াছিল!

পত্রখানা পড়িয়া যুবা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি হাসিয়া কহিলেন, "এখন দেখ একবার গ্রহ। পরের তরমুজ ঘাড়ে করে তার উপর আবার দুটো টাকা খেয়ে পাতক-গ্রস্ত হতে বসেছি! এখন এ টাকা দুটো নিয়ে বিষম বিপদে পড়েছি। ভদ্রলোক এ টাকা না দিয়ে যদি শুধু সে তরমুজটাই নিয়ে যেতেন, তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকত

না। এখন এ টাকা দুটো নিয়ে যে কি করি, তা ত ভেবেই পাচ্ছি না।"

একজন বলিল, "সে লোকটি কোথায় নেমে গেলেন, তা জানেন না?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "তা আর জানব কোথা থেকে? আমার যে তখন মাঝ রাত্রি!"

আর-একজন বলিল, "তাঁর চেহারাখানাও মনে নেই?" বিপিনের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল; নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ভদ্রলোক কহিলেন, "না।"

আবার বিপিন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার বুকের মধ্যে এই কয় ঘণ্টা ধরিয়া যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা যেন কতক শান্ত হইয়া আসিল। হাসিও না পাইল, এমন নহে, কিন্তু অনেক কষ্টে সে হাসি সে চাপিয়া গেল।

যুবা কহিল, "তাই ত! কার টাকা, কি করে সন্ধান পাবেন?"

একজন কহিল, "বঙ্গবাসীতে একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিন না—"

"পাগল!" বলিয়া ভদ্রলোক হাসিলেন পরে কহিলেন, "এক হপ্তা চুপ্‌চাপ্ থে দেখি। তার পর ভাবছি, হালিসহরে এ নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে,—ষ্টেশনে ধারেই একেবারে,—ট্রেন থেকে দেখা যায়-

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া এ ছোকরা কহিল, "ওঃ—ঐ দয়াময়ী দাত চিকিৎসালয়ের কথা বলছেন?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "হাঁ, দয়াম দাতব্য চিকিৎসালয়ই বটে! তা ভাবছি এক হপ্তা পরে ভাগনের হাত দিয়ে টাকা ঐ চিকিৎসালয়েই পাঠিয়ে দেব। কি বল?"

আকাশে মেঘ করিয়া রৌদ্রটুকু চা পড়িয়াছিল। স্নিগ্ধ শীতল বায়ুও বহিতে আর করিয়াছিল। বিপিন কামরার জানালার কা মাথা রাখিল। তপ্ত ললাট বায়ু-স্পর্শে জুড়াই গেল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, আজ যেন তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তামাকু-তত্ত্ব

হুকা-কলিকা বনাম চুরট-সিগরেট

তামাক একটি সর্ব্বজনবিদিত বস্তু। প্রাদেশিক ভাষায় ইহাকে তামুক ও তামকুড়ুও বলে। আবার কলিকাতা অঞ্চলে যখন তামা তাঁবা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তামাকেরও তাঁবাক হইবার কথা।(১) যাহা হউক,

নামে কি করে,
গোলাপে যে নামে ডাক, মধু বিতরে॥

তবে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজী কবিতার ভাষায় যেমন poetic diction বলিয়া একটা স্বতন্ত্র রীতি ছিল, সেইরূপ অস্মদ্দেশেও অনেক মনীষীর মত যে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা আছে। সে ভাষায় তামাকের নাম তামাকু।(২) মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এই নামটি পছন্দ করিয়াছেন। আমরাও "মহাজনো

(১) হইলে বিলাতি tobaccoর ও আদিম মার্কিন নাম tabaccoর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধিও হইত।

(২) তামাকুর শেষে 'কু' দেখিয়া কেহ 'কু' ভাবিবেন না।

যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই নীতির অনুসরণ করিলাম। আবার কেহ কেহ এমন উপাদেয় বস্তুকে গ্রাম্য নামে নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া—বিলাতী tobaccoর সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত করিবার অভিপ্রায়ে?—"তাম্রকূট" এই সংস্কৃতায়িত শব্দটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অবশ্য "তাম্রচূড়ে"র (মোরগ) সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অনুমান হয়, তামরস (পদ্ম) ও কালকূট (বিষ) এই উভয় শব্দের সমন্বয় করিয়া কোন রসিকচূড়ামণি এবংবিধ নামকরণ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ দ্রব্যটি পদ্মমধু নহে, পদ্মবিষ! (৩) যেমন মিঠেকড়া তামাকু সুখসেব্য, তেমনই এই মিঠেকড়া নামটিও সুভব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নহে। তামাক শব্দের অর্থ লইয়াও একটু গোল আছে, গাঁজাখোরেরা গাঁজাকে এই নামে অভিহিত করেন! যাহা হউক, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা বা ব্যাকরণ-বিভীষিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিব না! সে মায়া কাটাইয়াছি, আর সে জালে ধরা দিব না। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

জগতে ধর্ম্মও যেমন বহু, নেশাও তেমনই বহু। সকল ধর্ম্মই যেমন একই আনন্দ-স্বরূপের সন্ধান মিলায়, সকল নেশাও তেমনই একই আনন্দস্বরূপের সন্ধান মিলায়। সকল ধর্ম্মেরই যেমন গোঁড়া আছে, সকল নেশারও তেমনই গোঁড়া আছে। তামাকু-সেবী যেমন বলেন "গুড়ুকে গম্ভীরবুদ্ধি", তেমনই সিদ্ধি-সেবী বলেন 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,' (৪) গুলিখোর বলেন "গুলি খা ডালা", গাঁজাখোর বলেন 'নেশার রাজা গাঁজা' 'গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস।' তাই তিনি আদর করিয়া তাঁহার আরাধ্যদেবকে তুরিতানন্দ নাম দিয়াছেন। আফিংখোর তাঁহার পেয়ারের নেশাকে কালাচাঁদ বলেন। আহা কি মধুর বৈষ্ণব ভাব (অথবা 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গালায় বৈষ্ণবী ভাব)! কোকেনের হাল বড় জানা যায় না, বোধ হয় এতদিন কোন কোকেন খোর কবি ছড়া বাঁধিয়াছেন—

"ফাঁকে ফাঁকে কোকেন ফোকেন।
ধাপে ধাপে সগ্‌গে (স্বর্গে) ঢোকেন॥"

তাহার পর সকলের সেরা সাখরচে নেশার ভক্তগণ নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরের লোককে নিতান্ত কৃপাপাত্র মনে করেন ও "চাষা না জানে মদের স্বাদ", "মদের মর্ম্ম বুঝবি কি রে বাঙ্গাল তোরা" ইত্যাদি বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। তাঁহাদের মতে যাহারা সুরাসেবী নহে তাহারা অ-সুর! কেহ কেহ বা ভক্তির ভান করিয়া রাম-প্রসাদকে ভেঙচাইয়া গান ধরেন—

'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।'

কেহ বা চণ্ডীপাঠ করিয়া শোধন করিয়া লইতেছেন ও অ-সুরগণকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছেন,—

'গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।'

কেহ বা

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণী-তলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা'

'স্বর্গ মোক্ষ' লাভ করিতেছেন, জড়িত-কণ্ঠে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ভৈরবীচক্র ও পঞ্চমকারের

(৩) এইজন্যই কি 'বিষবৃক্ষে' ঘন ঘন তামাকের কথা আছে?

(৪) ভাংখোর ও ভাঙ্গোর কি একই? ভাষাতত্ত্বের কথা।

দোহাই দিতেছেন, এবং কৌল, অঘোরী, বামাচারী বা বীরাচারী সাজিয়া, যাহারা 'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্' বলে তাহাদিগকে 'পশু' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন; আবার কেহ বা বেদোক্ত সোমরসের ভাণ্ডে সুরা রক্ষা করিতেছেন। (ইহাকেই কি বাইবেলে বলে pouring new wine into old bottles ?)

গোঁড়ারা যাহাই বলুন, আমার কিন্তু মনে হয়, অন্যান্য হরেক রকম নেশার তুলনায় তামাকু বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ নেশা। যেমন গোমাংস, নরমাংস, শূকরমাংস, কুক্কুটমাংস প্রভৃতি অমেধ্য মাংসের তুলনায় মৃগমাংস বা ছাগমাংস, সেইরূপ মদ গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু আফিম ভাঙ্গ মাজুম কোকেন প্রভৃতির তুলনায় নস্য ও তামাকু। আবার তামাকু-সেবনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে গুড়ুক টানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মানুষ নানামূর্ত্তিতে 'সর্ব্বশ্রম-সংহারিণী' তামাকুদেবীর ভজনা করে। শুখা দোক্তা খৈনি সূর্ত্তিগুলি চুরট সিগরেট বার্ডসাই তামাকপোড়া গুল মিশি নস্য সবই তামাকুর রূপান্তর। বেদজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদের ন্যায় চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন—তামাকুর্জড়াকু গুর্ড়াকু র্নাসাকুঃ। অস্যার্থঃ—তামাকু অর্থাৎ শুখা দোক্তা খৈনি। জড়াকু অর্থাৎ চুরট সিগরেট বিড়ি বার্ডসাই। গুড়াকু অর্থাৎ গুড় দিয়া মাখা গুড়ুক-তামাক। নাসাকু অর্থাৎ নস্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।' অর্থাৎ কিনা 'যে ভাবে দেখিবে কৃষ্ণে সেই ভাবে পাবে।' কিন্তু যেমন শ্রীভগবানের নানা মূর্ত্তির মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সেইরূপ তামাকুর নানা মূর্ত্তির মধ্যে গুড়ুক-মূর্ত্তি চৈতন্যশীল জীবের সমধিক প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ইংরাজ কবি বায়রণ হুকার গুণগান করিয়াও চুরটের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার উপাদেয় কবিতাটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম। (৫) কিন্তু তাঁহার ন্যায় ম্লেচ্ছের সিদ্ধান্ত আমরা হিন্দুসন্তান ঋষিবাক্য (৬) বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারি না। আমরা

(৫) Sublime tobacco ! which from east to west
Cheers the tar's labour or the Turkman's rest,
Which on the Moslem's Ottoman divides
His hours, and rivals opium and his brides ;
Magnificent in Stamboul, but less grand,
Though not less loved, in Wapping or the Strand ;
Divine in hookas, glorious in a pipe,
When tipped with amber, mellow, rich and ripe ;
Like other charmers, wooing the caress
More dazzlingly when daring in full dress,
Yet thy true lovers more admire by far
Thy naked beauties—Give me a cigar.

(৬) ইদানীং "সনাতনী পন্থাঃ"র জনৈক প্রবীণ হিন্দু দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে ম্লেচ্ছর্ষি আবিষ্কার করিয়াছেন। বোধ হয় দিব্যজ্ঞানের মাত্রা আর একটু চড়িলে তিনি আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ বন্ধ্যাপুত্র—এমন কি ডুমুরের ফুল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

নব্যবঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ে রায় দিয়া হুকার জয়-ঘোষণা করিব।

কেহ কেহ হুকার হুঙ্কার-জনক নাম শুনিয়া হয়ত নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন অর্থাৎ নাক সিট্‌কাইবেন। তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-বিরচিত "হুকার জন্ম" (৭) নামক পৌরাণিক উপাখ্যানটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা হইতে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, এই ধূম-যন্ত্রের অংশত্রয় খোল, নলচে ও কলিকা যথাক্রমে ব্রহ্মার কমণ্ডলু, নারায়ণের বংশী ও মহাদেবের ডমরুর রূপান্তর—অতএব হিন্দুর চক্ষে পরম-পবিত্র।

জানি, তামাকু-সেবনের অপকারিতা-সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ পুস্তক-পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে। তৎপাঠে ধূমপান-বিরত নিরীহ ভদ্রসন্তানগণ যথেষ্ট বুকে বল পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির দাপটে এ পর্য্যন্ত কোন ধূমপায়ী তামাকু ছাড়িয়াছেন, এরূপ কোন রিপোর্ট বা রিটার্ণ পাই নাই। দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেই অবশ্য এ সব যুক্তি-তর্ক মাঠে মারা যাইতেছে। সেই জন্যই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আপামর সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-প্রচার-কল্পে যে ব্যবস্থা করিতে অভিলাষী, তাহা অত্যন্ত সমীচীন মনে করি।

ইহাও জানি যে, অনেকে তামাকুর নিষ্কারণ-শত্রু—এজগতে কোন্ বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধবাদী নাই? যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু ছিল, তখন 'উৎকৃষ্ট' তামাকুরও যে শত্রু থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সুরাপান-নিবারিণী নীলফিতাধারিণী সুনীতি-সঞ্চারিণী নেশা-সংশোধিনী প্রভৃতি সভার সভ্যগণ তামাকুকেও মদ গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু ভাঙ্গ আফিম মাজুম কোকেনের (৮) সঙ্গে একগোত্র (অর্থাৎ এক গোঠের গরু) বলিতে প্রস্তুত।

যাহা হউক, এরূপ লোকনিন্দা সত্ত্বেও তামাকু-সেবনের প্রথা যে কস্মিন্ কালে পরিত্যক্ত হইবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখি না। বহু লোকের বিশ্বাস যে, তামাকু আবহমান কাল এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহা যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মার্কিন মুল্লুক হইতে য়ুরোপে ও য়ুরোপ হইতে এসিয়া-খণ্ডে আমদানী হইয়াছে, আমরা ম্লেচ্ছের ভুক্তাবশিষ্ট মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে খাইতেছি, এই ঐতিহাসিক তথ্য বহু হিন্দু আমলে আনেন না। প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার উপর কি বিকট বিতৃষ্ণা!

বাস্তবিক এই নির্দ্দোষ অথচ আয়েসী নেশার সত্যযুগে সৃষ্টি হইয়াছে,—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইংরেজ কবি কূপার (Cowper) একস্থলে বলিয়াছেন যে তামাকু সত্যযুগে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সে কোন কাযের কথা নহে।

সহৃদয় ইংরাজ-জাতি প্রথম হইতেই তামাকুর গুণগ্রাহী। তামাকু সত্যযুগে সৃষ্ট হউক আর না হউক, ইহা যে স্বর্গীয় বস্তু, এ কথা বহু ইংরেজ লেখক একবাক্যে

(৭) উক্ত লেখকের 'আলপনা' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(৮) কেহ কেহ বা টানের চোটে কাফি কোকো চা এমন কি সোডা-লেমনেড্‌কেও ঐ দলে ফেলেন। গোলের সরবতটা বাকী থাকে কেন?

স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য ইঁহাদিগের দৌড় চুরুট ও পাইপ পর্য্যন্ত, গুড়ক-মাহাত্ম্য ইঁহাদিগের অজ্ঞাত ছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে বিলাতে তামাকুর প্রথম প্রচলন হয়। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি স্পেনসার ('divine tobacco') দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় তামাকু বলিয়া ইহার গুণগান করিয়াছেন। তখনকার নাটক-কারেরাও তামাকুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। (৯) কর্ম্মবীর র‍্যালে, হকিন্‌স্, ড্রেক প্রভৃতি সকলেই তামাকুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। র‍্যালে যখন বধ্যভূমিতে নীত হয়েন তখনও ধূমপান করিয়া 'জরামরণমোক্ষায়' ইত্যাদি গীতার বচন সার্থক করিয়াছেন। বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে রাজবিধি দ্বারা তামাকুসেবীদিগকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভক্তগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে কমলাকান্তের ন্যায় 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ' এই নীতিবাক্য অনুসরণ করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী প্রথম জেম্‌স্ অসূয়া-পরবশ হইয়া তামাকুর অযথা নিন্দাবাদ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে হাতে হাতে ফলও পাইতে হইয়াছিল। প্রজাগণ চক্রান্ত করিয়া সুরঙ্গের মধ্যে বারুদে আগুন লাগাইয়া তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল। মাতৃপুণ্যবলে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁহার পণ্ডিত-মূর্খ (the wisest fool in christendom) অপবাদ ঘুচে নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পরমজ্ঞানী (Burton) বর্টন তামাকুকে সর্ব্বাতিশায়ী সর্ব্বব্যাধিহর সুদুর্লভ (১০) প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কূপর যদিও একটা কাঁচা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তামাকু সত্যযুগে অজ্ঞাত ছিল, তথাপি তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এই ঘোর কলিকালে তামাকুবিহনে জীবনের ভার দুর্ব্বহ হইত।(১১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে বায়রণ তামাকুর গুণগান করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। তাঁহার মতে তামাকু মহতো মহীয়ান্ ('Sublime')। চার্লস্ ল্যাম্ব বায়রণের বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তিনিও তামাকুর অকপট অনুরাগী ছিলেন; চিকিৎসক-কর্ত্তৃক তামাকু সেবনে নিষিদ্ধ হইয়াও তিনি ভক্তির মাত্রা অণুমাত্র কমান নাই। তবে চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। তাই ল্যাম্বের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সুরাপানের কালিমা দৃষ্টিগোচর হয়। একজন অজ্ঞাতনামা কবি ধূমপান করিতে করিতে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তামাকুর ভিতর অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া

(৯) Chapman's *Monsieur d' Olive* Act II Sc. i.
Ben Jonson's *Every Man in his Humour* Act III Sc. v.

(১০) "divine, rare, super-excellent tobacco which goes far beyond all the panaceas is a sovereign remedy in all diseases."—*Burton.*

(১১) "Tobacco was not known in the golden age, so much the worse for the golden age. This age of iron, or lead, would be insupportable without it."—*Cowper.*

ছিলেন। ইংরাজীরসজ্ঞ পাঠককে কবিতাটি উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কবিত্বশক্তির অভাবে কবিতাটির অনুবাদে অক্ষম হইয়াছি।

SMOKING SPIRITUALISED.

I.

This Indian weed, now withered quite,
Though green at noon, cut down at night,
Shows thy decay;
All flesh is hay.
Thus think, and smoke tobacco.

II.

The pipe, so lily-like and weak,
Does thus thy mortal state bespeak;
Thou art e'en such,—
Gone with a touch.
Thus think, and smoke tobacco.

III.

And when the smoke ascends on high,
Then thou behold'st the vanity
Of worldly stuff,
Gone with a puff,
Thus think, and smoke tobacco.

IV.

And when the pipe grows foul within,
Think on thy soul defiled with sin;
For then the fire
It does require
Thus think, and smoke tobacco.

V.

And seest the ashes cast away,
Then to thyself thou mayest say
That to the dust
Return thou must.
Thus think, and smoke tobacco.

কেহ কেহ বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্তর মত, তামাকও খান মদও খান—যেমন গদাধরচন্দ্র দুধও খাইত, তামাকও খাইত। কিন্তু আমরা এই দুই নৌকায় পা দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। কেহ কেহ আবার স্থলপথে জলপথে ও ব্যোমযানে যান। কিন্তু আমরা এরূপ ত্রিপথগামী সর্ব্বদ্বারী স্বভাবের পক্ষপাতী নহি। তামাক যদি নিরীহ ভালমানুষটি না হইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধাইতে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে জলদ-গম্ভীর-স্বরে সকলকে বলিত—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

ফলতঃ অভ্যাসযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগ রাজগুহ্যযোগ জ্ঞানকর্ম্ম-ন্যাসযোগ সব গোলযোগের এখানে নিবৃত্তি। তামাকুপন্থীরা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের সাধনার প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেন। তদ্‌যথা—

তাম্রকূটং মহদ্দ্রব্যং সেবনে চ মহৎ ফলম্।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি ॥

শ্লোকটি কল্কিপুরাণে বা মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে অনুসন্ধেয়। তাঁহারা আরও দেখান যে কলিকা হইতেই কলিকাতা, কল্কী অবতার ও কলিযুগোৎপত্তি। আবার ভাষাতত্ত্ব আনিয়া ফেলিলাম। ও সব বাজে কথা যাক্।



"ধূমপানাসক্ত বৃদ্ধ ধূমপানে রত"
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "আলপনা" হইতে

ফলতঃ তামাকু-সেবন আমাদের দেশে ধাতের সঙ্গে এমন মিশিয়াছে, আমাদে অস্থিমজ্জায় এমন প্রবেশ করিয়াছে কেমন যেন মনে হয় উহা আমাদে নিতান্তই আপনার জিনিস। আমরা পা তামাক (১২) এক কোঠায় বা এক পর্য্যা ফেলি। বরং অবস্থা-বিশেষে পাণ খাওয়া নিষেধ আছে, কি তামাকু-সেবনের কো অবস্থায়ই নিষেধ নাই "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।"

নেশা হইলেও ইহা সাত্ত্বিক নেশা। ভগবা বিভূতিবর্ণনায় যে বলিয়াছেন 'বৃষ্ণীনা বাসুদেবোঽহম্' তেমনই আরও বলিতে পারিতেন নেশানাং তাম্রকূটোঽহম্। কলিতে মানুষ অন্নগতপ্রা নহে, তামাকু-গত-প্রাণ।

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে গুড়ুক টানা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে নস্য লোসা (১৩) নিত্য কর্ম্মপদ্ধতিরই একটি

(১২) এই জন্যই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য পাণের অপর নাম তাম্বূল।
((১৩) নস্য লওয়ার অভ্যাস কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল (নস্যপ্রিয়া পণ্ডিতাঃ, এখন ধীরে ধীরে 'সভ্য' সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে।

অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতিথি-অভ্যাগতকে বা চলিত কথায় এস জন ব'স জনকে তামাক দেওয়া গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন অধ্যয়ন-মধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা, তেমনই তামাক খাওয়া ও খাওয়ান বর্ণাশ্রমীর অবশ্য-কর্ত্তব্য সদাচার।

অধ্যাত্মতত্ত্বের ন্যায় তামাকুতত্ত্বেও অধিকারি-ভেদ আছে। যেমন উপনয়নাদি সংস্কারের পূর্ব্বে বেদে অধিকার জন্মে না, তেমনই সাবালক না হইলে তামাকু-সেবনেও অধিকার নাই। অনধিকার-চর্চ্চায় স্বাস্থ্যনাশ ও ধর্ম্মনাশ হয়। পক্ষান্তরে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধর্ম্মে মতি হয়, তেমনই গুড়ুকেও মতি হয়। বৃদ্ধ বয়সে উভয় প্রবৃত্তিরই গাঢ়তা জন্মে। তাই স্থবিরদিগের এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে হুকা।

স্ত্রীলোকের তামাকু-সেবনে অধিকার নাই, কিন্তু তামাকু সাজার অধিকার আছে—যেমন স্ত্রীজাতির প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া দেবার্চ্চনে অধিকার নাই, কিন্তু পূজার আয়োজন করার অধিকার আছে। তবে যেমন নারীজাতির বেদে অধিকার নাই বলিয়া তাহাদিগকে পুরাণ-পাঠের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষেত্রেও নারীজাতি গুড়ুক খাওয়ার পরিবর্ত্তে তামাক-পোড়া, দোক্তাতামাক, গুল ও মিশি ব্যবহার করিতে পারেন। ব্রহ্মবাদিনীগণের বেদে বিদ্যা ছিল, সেইরূপ মেড়ুয়াবাদিনীগণও গুড়ুক টানে।

লেখক তামাকু সেবনে লোককে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গ শিখাইতে লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি বিলক্ষণ জানেন, মদ্য-মাংসাদির মত, এই বিষয়েও 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' অতএব লেখক সমাজে যেমন যেমন দেখিতেছেন, তেমন তেমন লিপিবদ্ধ করিতেছেন। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকম্।

তবে এখনকার যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একটি কথার অবতারণা না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। আজকাল দেখিতেছি, হুকা-কলিকার বদলে চুরট সিগরেট বিড়িবার্ডসাইএর বেশী বেশী চল হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা কখন হুকায় মুখ দেন না, তাঁহারাও ফ্যাশানের খাতিরে সিগরেট টানিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। যুক্তিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ, তুলনায় সমালোচনা, প্রভৃতিও হইতে দেখি। যথা—

সৌখীন ছোকরা বাবুরা বলেন,—হুকা-কলিকায় ফৈজত ঢের, বড় লেঠা, নানান্ নটখটি, তামাকটিকা চাই, হুকাকলিকা চাই; তামাক হয়ত ভ্যাল্‌সা, টিকা হয়ত ভিজা, হুকার খোল দিয়া হয়ত জল পড়ে, নলচে হয়ত বন্ধ, হুকার জলটা হয়ত ঝাল হইয়া গিয়াছে, কলিকা হয়ত ভাঙ্গা, ঠিকরে হয়ত কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনেক অসুবিধা পোহাইতে হয়, অনেক সময় অপব্যয় হয়, হাত নোংরা হয়, যা'র তা'র হুকায় খাইতে গা ঘিন ঘিন করে, মশারি বিছানা পোড়ে, দাড়িতে আগুন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এক প্যাকেট হাওয়াগাড়ি সিগরেট ও এক বাক্স দুয়ানি-মার্কা দিয়াশালাই পকেটে রাখ, বস্, রাজারও রায়ত নও, মহাজনেরও খাতক নও। তোফা আরাম, যত ইচ্ছা

জাল আর খাও (প্রায় ঢাল আর খাও এর ধাক্কা)। এই সম্বল লইয়া চাই কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে গেলেও আটক নাই।

পক্ষান্তরে, সিগরেটের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। ডাক্তার চুণীবাবু হয়ত বলিবেন, সিগরেটে স্বাস্থ্যের হানিকর অনেক রকম জিনিস থাকে। কিন্তু এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারই মত 'বজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে সিগরেট টানিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি। হুকায় যে ভাবে তামাকু খাওয়া হয়, মাখা তামাকুকে যে ভাবে নরম করিয়া ফেলা হয়, জলের ভিতর দিয়া টানিবার সময় ইহার বিষাক্ত ভাগকে যে ভাবে কাবু করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং মাদকতাশক্তিও অনেকটা নষ্ট হয়, ইত্যাদি যুক্তিও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ হইল বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আমরা অব্যবসায়ী, এ সব কথা আমাদের মুখে ভাল শুনাইবে না। আমাদের সাবেক গুড়ুক খাওয়া ও হালের সিগরেট টানা—এই দুইটি ব্যাপার দর্শক হিসাবে প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানের নজীর তুলিব না, সুনীতির বা সুরুচির দোহাই দিব না। আশা করি, এই মন্তব্য সুধী-সমাজে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমার মনে হয়, এই দুইটি সামান্য ব্যাপারের তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতীয় সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভেদটা বেশ ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানের ন্যায়, এক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজ-তন্ত্রতা ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্রতা স্পষ্টীভূত। ক্রমে বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, সিগরেটে সবই তৈয়ারী থাকে, কিছু করাকর্ম্মার দরকার হয় না—ঠিক যেন হোটেলে খাওয়া। অতএব য়ুরোপীয় সমাজের স্পষ্ট ছায়া। তাহার পর সিগরেট একা একা টানিতে হয়, কাহাকেও ভাগ দেওয়া চলে না। নিজের পকেট হইতে সিগরেট-কেস ও দিয়াশালাই এর বাক্স বহির করিলাম, নিজে দিয়াশালাই জ্বালিলাম, নিজে সিগরেট ধরাইলাম (স্বয়ং-সিদ্ধ যাহাকে বলে), তা'র পর নিজে হুস হুস করিয়া টানিলাম, আর নিঃশেষ করিয়া টানিতে টানিতে যখন ঠোঁটে ঈষৎ উত্তাপ অনুভব করিলাম তখন দূরে ছুড়ে ফেলিয়া দিলাম, বস্ আপৎশান্তি। কাহারও তোয়াক্কা নাই, কাহারও খাতির নাই, কাহারও মুখ-পেক্ষা নাই, দশজনকে ভাগ দেওয়া নাই। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের লাভ—ধূমর যন্ত্রণা, দুর্গন্ধের লাঞ্ছনা ও কচিৎ উড়ো ছাই গায়ে পড়া। [১৪] য়ুরোপীয় সমাজের স্ব স্ব প্রধান ভাবের হুবহু নকল। অবশ্য সিগরেট-কেস হইতে বাহির করিয়া এক একটি সিগরেট পার্শ্বস্থ ভদ্রলোক-দিগকে দিয়াশালাই সমেত offer করা যায় বটে, কিন্তু এক হুকায় বা এক কলিকায় তামাক খাওয়ার মত ইহাতে তেমন হৃদ্যতা

(১৪) কোন কোন স্থলে একটি সিগরেট দুই ইয়ার-কে টানিতে দেখিয়াছি—কিন্তু আশা করি আমার পাঠকবর্গের মধ্যে এমন লোক কেহ নাই।

হয় কি? হুকা বা কলিকা যেমন অসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায়, সিগরেট তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে যেন কেমন একটা দীনতা-প্রকাশ হয়।

আর তামাকু—এক কলিকা তামাকু অনেকক্ষণ পোড়ে, বহু লোক প্রতিপালন হয়, সিগরেট এক মিনিটে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, একজন বই খাইতে পারে না। তামাকু এক কলিকা সাজ, তৈয়ারি তামাকু দশজনকে পরিবেষণ কর, অপরিচিত লোকও চাহিয়া খাইবে, লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবে না, মানের হানি হইবে না। ইতর জাতি হইলে কলিকা খুলিয়া প্রসাদ দাও, জাতিভেদের কঠিন নিয়মও তামাকুর কল্যাণে কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া যায়—যেমন 'কয়লাকো ময়লা ছোটে যব আগ করে পরবশে'। তামাকু সাজিবার সময় কেহ বা হুকার জল ফিরাইল, কেহ বা ছিঁচকে দিল, কেহ বা ঠিকরের চেষ্টায় গেল, কেহ বা টিকে ধরাইল, কেহ বা কড়া ও নরম তামাকু ঠিকমত মিশাইয়া লইল, কেহ বা তামাকু সাজিল, কেহ বা কলিকায় ফুঁ দিল, কেহ বা আমপাতার নল তৈয়ারি করিল, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে—ঠিক হিন্দু পরিবারের তথা হিন্দু সমাজের প্রতিরূপ। ফল কথা, ইহাতে কেমন সৌহার্দ্দ্য-বৃদ্ধি, কেমন হৃদ্যতা, কেমন অন্তরঙ্গ ভাব, কেমন 'বসুধৈব কুটুম্বকং' বলুন দেখি?

তবে দৈবাৎ দুই একজন লোক দেখা যায় বটে, তাঁহারা অপরের উচ্ছিষ্ট হুকায়, এমন কি অপরের টানা কলিকায়, খান না—যেমন অনেকে স্বপাক ছাড়া আহার করেন না। সেটা অবশ্য নিষ্ঠার পরা কাষ্ঠা, স্পর্শদোষ-পরিহারের উৎকট চেষ্টা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ব্যাসিলি-নিবারণের বিধিমত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা নিয়মের ব্যভিচার, অতএব ধর্ত্তব্য নহে। ফরশি গড়গড়া গুড়গুড়ির বেলায় এরূপ বারইয়ারি ভাব থাকে না বটে, ওসব যন্ত্রও নিতান্ত নিজস্ব (বা reserved)—কিন্তু সেটা বড়মানুষি, আমীরি। আমরা সাধারণ গৃহস্থের কথাই বলিতেছি। (১৫)

গুড়ুক-তামাকের এই গুণ থাকাতে কেহ বাড়ী আসিলে আমরা তাহাকে তামাকু সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করি। (ইদানীং চা ও সিগরেট offer করিতেও দেখি।) যাঁহারা তামাকুর গুণমুগ্ধ, আশা করি, তাঁহারা পূজার বাজারে স্বদেশীমেলায় এক আধ সের ফৌজদারী বালাখানার মশলাদার মিঠেকড়া তামাকু কিনিয়া পল্লীভবনে ফিরিবেন ও দশজন প্রতিবেশীকে খাওয়াইয়া হিন্দুগৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, আমার এই অনুরোধ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার—কেননা, 'জনম অবধি হম' 'ও রসবঞ্চিত'।*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

(১৫) ইষ্টমন্ত্রজপ ও পাড়ার বারইয়ারি পূজায় যে প্রভেদ, ফরসী গড়গড়া গুড়গুড়িতে ও হুকায় সেই প্রভেদ। ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

* ওল্ড্ ক্লাবের তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পঠিত (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।

বন্যাদায়

দামোদরের উদরে আজ এ কী ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী!
বাঁধ ভেঙে, হায়, হন্যা হয়ে বন্যা এল সর্ব্বনাশী।
রাঙামাটির মুলুকে আর, রাঙামাটির নেই নিশানা,
চারিদিকে অকূল পাথার—চারিদিকে জলের হানা।
দেউল গুলোর দুয়োর ভেঙে ঢেউ ঢুকেছে হল্লা ক'রে
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুৎ দাঁড়ায় নি কেউ কবাট ধ'রে।
নীচু হওয়ার নানান্ দুঃখ—খুলে কি আর বল্‌ব বেশী
বর্ষা হ'ল কোন্ পাহাড়ে,—ডুবল নাবাল বাংলা দেশই।

* * *

এ দামোদর গোবিন্দ নয়,—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে
হাজার গরু ডুবিয়ে মারে,—ধ্বংস করে হৃষ্ট চিতে!
জগৎ-হিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকূল ধারা,
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা;
এই মহিষের বাঁকা দু'শিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,
ঢুসিয়ে চলে ডাইনে বামে সোনার দেশের পাঁজর খসে।
এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যে জন পালন করে;
লম্বোদরী জন্তুলা এ—গজ গিলেছে দম্ভ ভরে!

* * *

মুছে দেছে গ্রামের চিহ্ন চেটে নেছে ভিটের মাটি,
মরণ টানে টান্‌ছে ডুরি,—সাতটা জেলায় কান্নাহাটি।
ধনে প্রাণে ঢের গিয়েছে,—হিসাব তাহার কেউ জানেনা,
ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—খবর তাদের কেউ আনে না।
আল্‌গা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে
পুড়ছে রোদে উপবাসী ভিজছে মুষল বৃষ্টি ধারে,
হারিয়েছে কেউ পুত্রকন্যা হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়
আজকে আধা-বাংলা দেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়।

* * *

অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায় নি দিশা,
কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা;
কত নারী বিধবা আজ অনাথ কত সদ্য-বধূ,
কত যুবার অস্বাদিত রইল জগৎফুলের মধু।
বর-ক'নেতে ভাস্‌ছে জলে হলুদ্ বরণ সূতা হাতে,
ফুল-শেযে কার কাল এসেছে বান এসেছে বিয়ের রাতে।
জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার ফোঁকর মৌচাকেতে,
ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক' খেতে।

বট-পাকুড়ের কেঁকড়িগুলো অবশ হাতে পাকড়ে ধরে
কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত ক'রে
অবাক হ'য়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,
সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে
'হাল্' পুছিলে,—জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত,
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধি-হত।
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবি,—আজকে এদের বন্যাদায়।

* * *

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে
ভেসে ভেসে একলা এল কোন্ গাঁ হতে জলের তোড়ে!
তুল্‌তে ধরে ঠেক্‌ল ভারি তক্তপোষের একটি পায়া,
আঁক্‌ড়ে পায়া জলের তলে মরা মায়ের অমর মায়া!
লুপ্ত আজি পীযূষ ধারা মৃত্যুহত মায়ের বুকে,
দুধের ছেলের ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুষ্ক মুখে?
এক রাতে কার স্নেহের দুলাল হ'ল পথের কাঙাল হায়,
কে দেবে তায় মায়ের স্নেহ? আজ অভাগার বন্যাদায়।

* * *

বানের মুখে সাঁতার টেনে আতুর স্বামীর প্রাণ বাঁচায়ে,
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাঁঝরে যে ফের ফিরল গাঁয়ে
বাঁধা গরুর খুল্‌তে বাঁধন তুল্‌তে নিজের ক্ষুদ্র পুঁজি;
ফিরতে সে আর পারে নি হায় বন্যাজলের সঙ্গে যুঝি;
নেই বেঁচে সেই চাষার মেয়ে দুঃসাহসী দয়াবতী,
আছে তাহার কোলের ছেলে আছে তাহার আতুর পতি;
তাদের কে আজ পথ্য দেবে আজকে তারা নিঃসহায়,
হাতে হাতে মিলিয়ে নে ভাই, আজ আমাদের বন্যাদায়।

* * *

আসল গেছে ফসল গেছে গেছে দেশের মুখের ভাত,
সাম্‌নে 'পূজো',—নূতন ধুতির সঙ্গে ভাসে তাঁতীর তাঁত।
কোথায় গেছে হালের বলদ কোথায় গেছে দুধের গাই,
কার ভিটেতে কে মরেছে,—কিচ্ছুরই খোঁজ খবর নাই।
উদাসী আজ কাজের মানুষ সকল-শূন্য-হওয়ার শোকে,
শুন্‌ছে না সে কিছুই কানে দেখছে না সে কিছুই চোখে;
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদের পানে চাও,
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও!



বন্যা-পীড়িত দুঃখী পল্লিবাসীর ভিক্ষা

অনুজ-সমান ছাত্রেরা আজ অগ্রজেরি কার্য্য করে,—
দেশের কাজে অগ্রে চলে,—স্বেচ্ছাসেবার দুঃখ বরে।
আজ্‌কে যেন প্রলয়-বুকে সুপ্ত জ্যোতির্লেখা হাসে
ক্ষুদ্র দানের বটের পাতায় ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে;
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,
দুন্দুভি তাঁর উঠ্‌ল বেজে, না যাবে আজ এগিয়ে কেবা?
সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আজ্‌কে শোনো উঠ্‌ছে কেঁদে;—
বধির হ'য়ে থাক্‌বে কে আজ ব্যর্থ জীবন বক্ষে বেঁধে?
এ দায় নহে ব্যক্তিগত,—যেমন ধারা কন্যাদায়,
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্যাদায়।

* * *

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর,
তাঁদের পুণ্যে লক্ষপ্রাণী দেখ্‌বে ফিরে সুবৎসর;
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়,—সপ্তকোটির এদেশটিতে।
ভরতে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে।
শাকান্নের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আমার ঘরে
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে।
তুষ্টিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট দুর্ব্বাসারও ক্ষুধা হরে,
তাঁর নামে দাও মুষ্টি ভিক্ষা জয় হবে দুর্ভিক্ষ'পরে।
গরীব-সেবাই হরির সেবা,—ভারতবাসী ভুল্‌ছ তাও!
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

* * *

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা-জলের দেশে থাকে—
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে ধরম রাখে;
তারাও আজি মর্ত্ত্যে বসি চিত্ত-আরাম স্বর্গ লভে,
দুঃস্থ-শিরে ভগবানের ছত্র ধরে সগৌরবে।
সার্থকতা দ্বারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,
মরম দিয়া মরম বোঝ ঘুচাও মনের দরিদ্রতা;
ঘুচাও কুণ্ঠা ওগো বন্ধু! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,
হিম হ'তে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বন্যা হয়।
যুগে যুগে পুণ্যে খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,
শূন্য হাতে ফিরিয়ো নাগো; রক্ষা কর বন্যাদায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাংলার জলপ্লাবন

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে "A single touch of nature makes the whole world kin" অর্থাৎ প্রকৃতির একটি সামান্য স্পর্শ সমস্ত পৃথিবীকে আত্মীয়তা বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। এ কথার সার্থকতা বাংলার এই জলপ্লাবনে আমরা অনুভব করিতে পারিয়াছি।

এই বন্যাপ্রলয়ে দামোদর ও সুবর্ণ রেখার বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত ঘর বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, কত গ্রাম ভাঙ্গিয়াছে, শত সহস্র লোক আজ অন্নহীন, আচ্ছাদনহীন ও আত্মীয়হীন; সমগ্র বঙ্গদেশ এখন বিষাদের ঘনছায়ায় সমাবৃত। কিন্তু এই বিষাদের মধ্যেই একটা আশার আলো জাগিয়া উঠিয়াছে। সহানুভূতি ও সেবার স্রোত জাতি ধর্ম্ম, পদ ও উপাধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া শুধু যে প্রকৃতির জলোচ্ছ্বাসকে রোধ করিতে ছুটিয়াছে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় জড়তাকেও শিথিলমূল করিয়া দিয়াছে। অবশ্য চিরদিনই আমাদের দেশের ধনী মহোদয়গণ অন্নহীনকে অন্নদান নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান করিয়া আসিতেছেন। দয়া সহানুভূতির দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে কখনই বিরল নহে। দেশে যখনই অকাল উপস্থিত হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উদারহৃদয় বঙ্গজমিদারগণের গৃহে গৃহে বুভুক্ষুদিগের জন্য অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। যাহাদের সে সাধ্য নাই, তাহারাও নিজের গ্রাসান্ন হইতে এক মুষ্টি অন্ন দান করিতে কখনও পরাঙ্মুখ নহে। তবে আজ আর এই সহানুভূতি প্রকাশে নূতনত্ব কি? মুমূর্ষুকে করাল কালগ্রাস হইতে বাঁচাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছাত্রসমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায় এই বিপদ সমরে

যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহাই বৈচিত্র্যহীন বাঙ্গালী জীবনে আজ সম্পূর্ণ নূতন।

স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রগণকে কত প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার অন্ত নাই; কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা বিচলিত হন নাই। তাঁহারা ষ্টেশনে নামিয়া দেখেন এমন লোক নাই যে আহার্য্য দ্রব্যগুলি বহন করিয়া গ্রামের

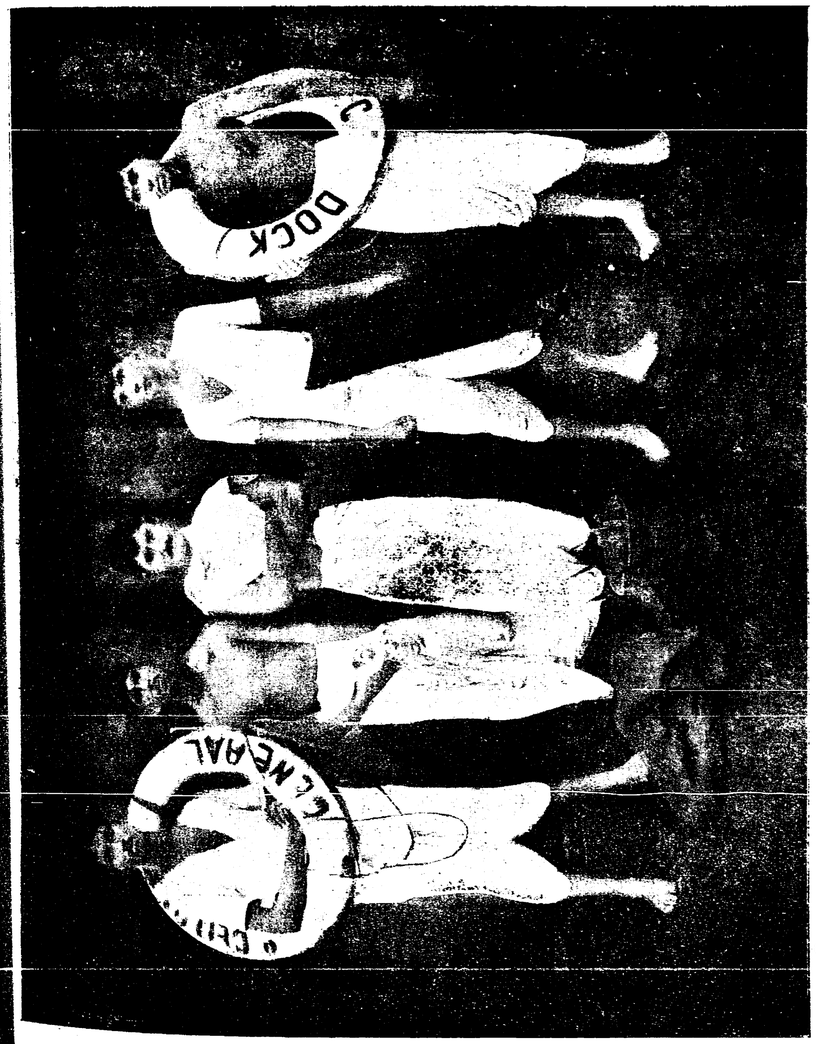

শিবপুর কলেজের ছাত্রকর্ত্তৃক বিপন্নগণের উদ্ধার চেষ্টা।

মধ্যে লইয়া যায়। তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া নিজেরাই আহার্য্য দ্রব্যের বস্তাগুলি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছেন। একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে হইবে কিন্তু চারিদিকে জলস্রোত, —নিকটে কোন নৌকা নাই, শেষে সাঁতার দিয়া গ্রামে উপস্থিত হইতে হইল। গ্রামে গিয়া মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র দান করিতে হইয়াছে। এমনও পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে বস্ত্র দান করিতে করিতে যখন সমস্ত

কাপড় ফুরাইয়া গিয়াছে এমন সময় একটি বস্ত্রহীন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে একজন ছাত্র আপনার বস্ত্রার্দ্ধ তাহাকে দান করিয়াছিলেন। জলপ্লাবনের চারিদিকে অনেক গৃহপালিত পশু মরিয়া ছিল, সেগুলি পচিয়া চারিদিকে রোগের উৎপত্তি হইবে বলিয়া ছাত্রেরা নিজের হাতে সেগুলি পুঁতিয়া ফেলেন।

কেবল ছাত্রগণ নহেন, দেশের অনেক উকীল ব্যারিষ্টারও নিজেদের দৈনিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও সংসারের ভার উপেক্ষা করিয়া উৎসাহের সহিত এই সেবাব্রতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সেবাব্রত কেবলমাত্র নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ প্রদানেই পর্য্যবসিত হয় নাই; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছাত্রদের মতই সঙ্কটকে উপেক্ষা করিয়া দুঃখী ও আর্ত্তকে নিজ হস্তে সাহায্য দান করিয়াছেন।

কেবল ছাত্র বা উকীল ব্যারিষ্টার নহেন, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়, এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

কেবল দেশের পুরুষমণ্ডলী নহে—এই সেবা কার্য্যে অংশ লইবার জন্য নারীসমাজও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের এই দুর্দ্দশার প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবল আপনার গৃহ ও আপনার সুখ লইয়া তাঁহারা তৃপ্ত নহেন। তাই তাঁহারাও এই সৎকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। সেদিন কলিকাতার একটী মহিলাসভায় তাঁহারা অনেক টাকা তুলিয়া এই সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন। এমন কি, সেদিন ইণ্ডিয়ান মিরারে পড়িলাম একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারী শ্রীমতী কামিনীমণি দাসী স্বয়ং বন্যাপীড়িত স্থানে গমন করিয়া দুঃখী ও আর্ত্তকে সেবা এবং অর্থ ও আহার্য্য দান করিয়াছেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

এইখানে একটি কথা। আমরা বন্যাপীড়িতের জন্য যতটা করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট নহে; ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। এরূপ স্থলে ইয়োরোপ কি করিত তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, তাহার তুলনায় আমরা অনেক পশ্চাতে আছি। এখনও গৃহহীনদিগের গৃহ হইয়া উঠে নাই, এখনও এমন দান সংগ্রহ হয় নাই যাহাতে হৃতসর্ব্বস্বদিগের কিছুদিনের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে। আশা করি, সকলে তৎপর হইয়া ইহার দিকে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

ভাঃ সঃ

কুচবিহার-গাইকোয়াড় বিবাহ

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে কুচবিহারাধিপতির ভ্রাতা রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের সহিত গাইকোয়াড়ের কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরার শুভ বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে কোথাও কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে না। আজ একের সঙ্গে বহুর যোগ এত বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে যে, এককে কোন-মতেই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইতে দিতেছে না। ভারতবর্ষে সমাজকে দীর্ঘকাল সংকীর্ণ গণ্ডীতে থাকিতে হইয়াছে বলিয়া সমাজে নানা বিকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের, এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের, এক জাতির সহিত অপর জাতির ঘনিষ্ঠতাসাধন যে কোনও অনুষ্ঠানকেই শুভানুষ্ঠান বলিতে হইবে। সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও যে একদিন সমস্ত অস্বাভাবিক ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া মহামিলনের দিকে যাত্রা করিবে, গাইকোয়াড়ের ন্যায় উদারচেতা, তেজস্বী নৃপতির কন্যার সহিত সমাজ-সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্রের বিবাহ তাহারই ইঙ্গিতমাত্র। বিধাতা ইঁহাদের মিলন সার্থক করুন।

রাজকুমারী ইন্দিরা বোম্বাই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বিলাতী সভ্যতার মধ্যে মানুষ হইয়াও ভারতীয় নারীর আদর্শ ভুলিয়া যান নাই। নিউ ইয়র্কের কোন ধনীর গৃহে একবার তাঁহাকে নৃত্যোৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ইহা ভারতীয় রমণীর আদর্শ নহে বলিয়া রাজকুমারী সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের দান

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাননীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দশ-লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই শুভ সংবাদে আনন্দিত হইবেন, কেননা স্যর তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের এই দান ও দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা-ইতিহাসে এক নবযুগ আনিয়া দিল। বর্ত্তমান যুগে সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক সজাগ চেষ্টা দেখা যাইতেছে; প্রত্যেক জাতিই ইহা অনুভব করিতেছে যে, খাঁটি শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন না করিলে জাতীয় জীবন গঠন সম্ভব হইবে না। এই জন্যেই চীন, জাপান, রুষিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপ ও উত্তর-আমেরিকা হইতে শত শত যুবক মাতৃভূমির শিক্ষাদৈন্য ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে য়ুরোপ ও আমেরিকার এক এক শিক্ষা-কেন্দ্রে সম্মিলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে বীণাপাণির সম্মুখে কত পুরোহিত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেবীর সেবক পদে অভিষিক্ত হইতেছেন। এইরূপ



রাজকুমারী ইন্দিরা

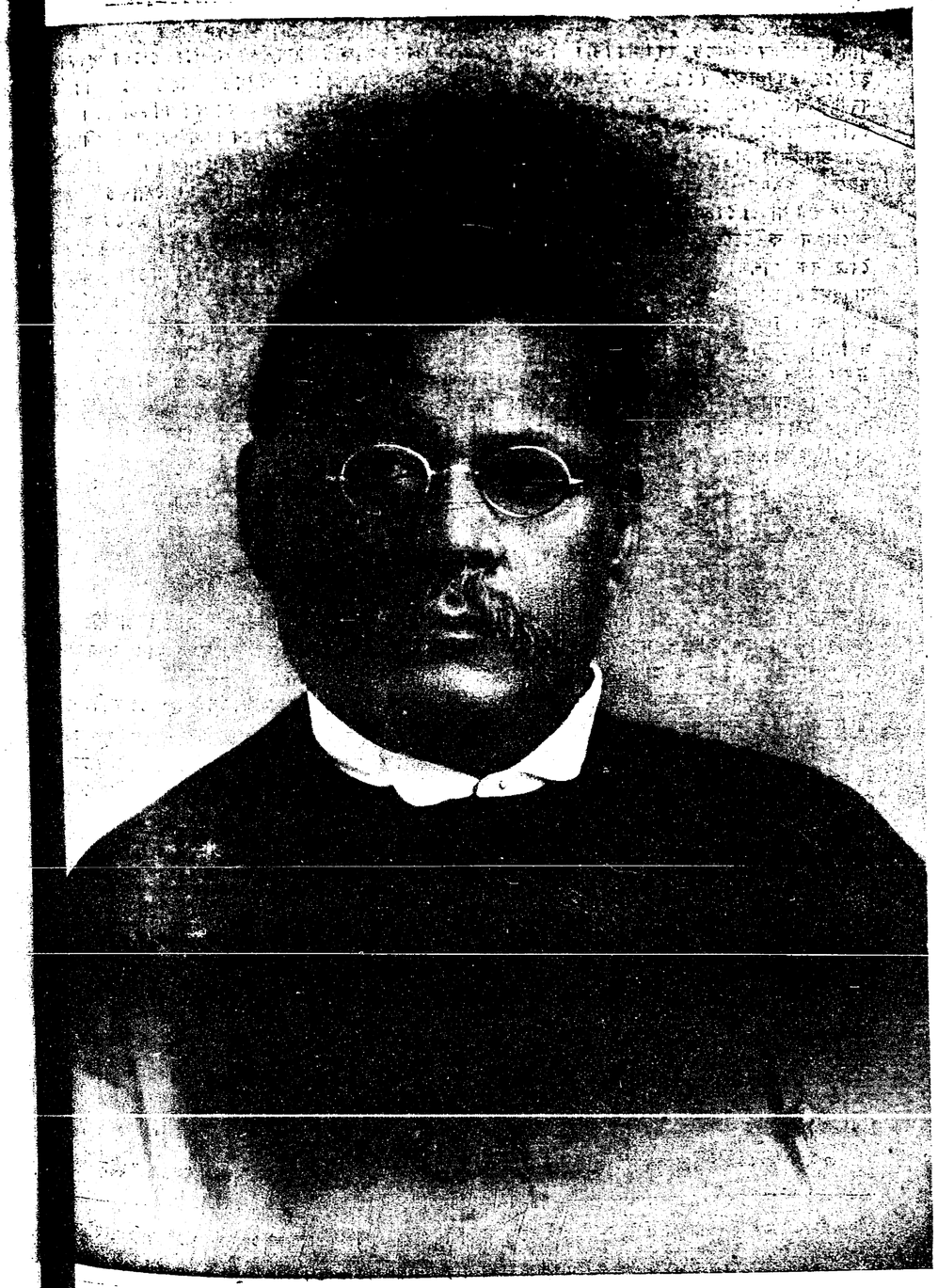

ডাক্তার রাসবিহারি ঘোষ সি, এস, আই

পৃথিবীর চারিদিক হইতে যখন সরস্বতীর বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে বাংলাদেশের দুই মহাপুরুষ বিপুল ধনরাশি-অর্ঘ্য লইয়া দেবীর মন্দির উপস্থিত হইলেন, ইহা কি বঙ্গদেশের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়? মহামান্য স্যর তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মহৎ দৃষ্টান্ত কি বঙ্গদেশ কখনও ভুলিতে পারিবে? বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহার দান পাইয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে যাহাতে এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়, উদ্ভিদবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা দ্বারা যাহাতে দেশে শিল্প বাণিজ্য কৃষি, উৎকর্ষ লাভ করে, এই জন্য মহাপ্রাণ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বিপুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কোনও আয়োজন ইতিপূর্ব্বে ছিল না; ডাক্তার ঘোষ তাঁহার দানপত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বদেশভক্ত ঘোষ মহাশয় নিশ্চয় অনুভব করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের যুবকগণে শিক্ষা ইহাদিগকে অনুসন্ধান-প্রবৃত্ত করে না। তাহাদের শিক্ষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপুরোহিত। ইঁহার প্রতি একদিন বিদ্যালয়-মন্দিরকে আলোকিত করি রাখিয়াছিল। তারপর সেই মন্দির হইতে আশীর্ব লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলে সেখানেও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অসাধা বাগ্মিতার প্রভাবে নিষ্কলঙ্ক যশ অর্জ্জন করিয়াছে আজ স্বোপার্জ্জিত বিপুল অর্থ-রাশির এক অর্ঘ্য লইয়া তিনি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে উপস্থি হইলেন,—মন্দির অভ্যন্তরস্থ দেবী তাঁহাকে আশীর্ব করিলেন—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থাঃ"।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

শোক সংবাদ

আমরা যখন কুচবিহারের রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহ সংবাদে আনন্দে মগ্ন আছি,—তখন সহসা যেন বজ্রাঘাতে সচেতন হইয়া শুনিলাম, কুচবেহারের মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কি নিদারুণ সংবাদ!

অল্পদিন হইল ভঙ্গস্বাস্থ্য পুনর্ল্লাভের জন্য মহারাজ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সকলেরই আশা ছিল সুস্থশরীরে তিনি পুনরায় দেশে ফিরিবেন। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল করিয়া আত্মীয়স্বজন প্রজাবৃন্দ স্বদেশী বিদেশী সকলকেই মর্ম্মাঘাত প্রদানে তিনি অকালমৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হায়! কেবলমাত্র সেদিন যে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! তিনি যে সৌজন্য ও সরলতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন! তিনি সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ও দীনের সহায় হইয়া স্বনাম ও পিতৃনাম সার্থক করিবেন এইরূপ কত না আশা আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীর হৃদয় যে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল হায়! নিষ্ঠুর কাল আসিয়া সকল আশা, সকল আশ অকালে হরণ করিল।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের মৃত্যুতে লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহারাণী সুনীতিদেবীর জীবন একান্ত শূন্য হইয়া গিয়াছে—তাহার উপর প্রিয় পুত্রের এই বিচ্ছেদ। কিরূপে তিনি এ শোক যন্ত্রণা সহ্য করিবেন ভাবিতেও হৃদয়প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু যে মহাপুরুষ মানুষের জীবনমৃত্যু নিয়ে খেলা করেন—তাঁহার করুণাও অনন্ত। মহারাণী ভক্তের কন্যা, নিজেও ভক্ত, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং তাঁহার করুণাবারি সিঞ্চনে ভক্তের অশ্রুজল মোচন করিবেন—অমঙ্গলের মধ্যে যে পূর্ণ মঙ্গল নিহিত আছে—সেই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিয়া তাঁহার শোক প্রশমিত করিবেন—ইহাই আমাদের আশা বিশ্বাস ও প্রার্থনা।

ভ্রম সংশোধন

এ সংখ্যার ৬৪৯ পৃষ্ঠার পঞ্চদশ পংক্তিতে ও ৬৫০ পৃষ্ঠার চতুর্দ্দশ পংক্তিতে "অন্নছত্র" স্থানে "অন্নসত্র" হইবে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



স্বর্গীয় কুচবিহারাধিপতি
মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

g. No C. 523.]

৩৭শ বর্ষ

[All Rights Reserved

কার্ত্তিক ১৩২০





দরিদ্রের কুটীর

হইতে

ধনীর প্রাসাদ

পর্য্যন্ত



কুন্তলীন

অব্যাহত গতিতে ব্যবহৃত। ইহার কারণ, কেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে, শরীর ও মস্তক স্নিগ্ধ রাখিতে এবং মধুর সৌরভে মন প্রফুল্ল করিতে

কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশতৈল।

সুবাসিত—১৲ পদ্মগন্ধ—১৷৷০ গোলাপগন্ধ—২৲ ভায়োলেটগন্ধ—২৷৷০

এইচ বসু, পারফিউমার

দেলখোস হাউস--কলিকাতা

ভারতী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

(১৩২০ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

ভারতী কার্য্যালয়,

১ সানি পার্ক (Sunny Park) ওল্ড বালিগঞ্জ রোড—কলিকাতা।

১৩২০ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়			পৃষ্ঠা
বনত জাতি	...	শ্রীবীরেশ্বর সেন	... ৮৬৭
বনত জাতি (প্রতিবাদ)	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র উপাধ্যায়	... ১০০৩
প্রস্তুত (গল্প)	...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী	... ১৩৪৭
পূর্ণ বাসনা (কবিতা)	...	শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ	... ১০১২
ভূত যাদুঘর (সচিত্র)	...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ	... ১১৭১
ভিজ্ঞান (কবিতা)	...	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি, এ	... ১৩১৪
মার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৭৩৯, ৮৯৭, ৯৬৩, ১০৭০, ১১৮০, ১২৬১
আত্মসমর্পণ (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় বি,এ	... ১৩৫৮
র্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের বৈদিক প্রমাণ		শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ	... ৮৩২
দিম জাতির সংখ্যাগণনা	...	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ এম, এ	... ১১২৬
রব গণিতবেত্তা আবুল ওয়াফা	...	মোহম্মদ কে, চাঁদ	... ১১৬৭
আত্মদানের আকুলতা (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায়, বি এ	... ১১৭০
আত্মা ও মন সম্বন্ধে শারীরবিধান শাস্ত্রের মত		শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ	... ১৩১৭
ত্তিদাদির বৈদিক নাম	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল	... ৮১০
ষি ও ব্রাহ্মণ	...	শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার	... ৯৭৫
কটি গান (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	... ১০০৭
ন্তাদায়	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	... ১৩৬০
াশ-আন্দোলনে (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	... ৭৬০
কল্পা বোকাই নগর (সচিত্র)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	৯৩৭, ৯৭৯
পিলাবস্তু	...	শ্রীতারানাথ রায়	... ১০৪৯
পিলগিটদিগের বিবাহ উৎসব	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা	... ৯১০
পিলগিটদিগের গল্প	...	ঐ	... ১০২৩
ান	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১০৪২

বিষয়			পৃষ্ঠা
গোলাম কাদির ও ইসলাম বেগ	...	শ্রীযতীশগোবিন্দ সেন	১১৮
চিত্র শরৎ (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৭৬
চুড়িওয়ালা (গল্প)	...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	৭৯
চাউক্-ওয়াইঙ্ পাগোদা	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	৮৯
চাঁদিমা (গল্প)	...	শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬
চিত্রোৎপলা (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল	১১৪
চীন-রমণীর প্রেমপত্র	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১১৯৪, ১২১
চেরি-পুষ্প (কবিতা)	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ ; বার-য়্যাট-ল	১৩৫
ছোট ও বড়	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৫
জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহ	...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী	১০৬
জর্ম্মাণসম্রাট কেইসার উইলহেলম (সচিত্র)		শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১১৯
জাতীয় মহাসমিতি	...	...	১১৪
তামাকুতত্ত্বের জের	...	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ	৮৭
দুয়ানি (কবিতা)	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ ; বার-য়্যাট-ল	৮৫
দান (কবিতা)	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৮৮
দাইতোকোরো (সচিত্র)	...	শ্রীযদুনাথ সরকার	১০৪
নোবেল প্রাইজ	...	বীরবল	১১৩
নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম	...	শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী	১১৯
নাগানন্দ ও পার্ব্বতী-পরিণয় নাটক	....	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৯
নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী (গল্প)	...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ, বি, এল স্বরস্বতী, কাব্যতীর্থ, ভারতী	১২৪
	...		
নীহার (কবিতা)	...	শ্রীমতী লীলা দেবী	১৫২
পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়	৮২
প্রবঞ্চিতা (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় বি,এ	৮৫
প্রভাতে (কবিতা)	....	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	৯৪
প্রতিশোধ (গল্প)	..	শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৯
প্রিয়দর্শিকা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৯
প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনার (সচিত্র)	...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ	১১৭
প্রতীক্ষা (কবিতা)	...	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত, বি, এ	১২১
পাটলিপুত্র (সচিত্র)	...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ	১২৩৬, ১৩৫
বরপণ	...	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	১৩৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
বসন্ত-পঞ্চমী (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	১২৫৮
বসন্ত (ঐ)	...	ঐ	১৩২৩
বসন্ত বায়ুর প্রতি (ঐ)	...	ঐ	১৩৫২
বাগ্দত্তা (উপন্যাস)	...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৭৬৩, ৮৫১, ৯৪৭, ১০৫৩, ১২০৪, ১২৭৯
বিক্রমোর্ব্বশী	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৭৬
বিপথে (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৭৮০
বার্ণাড্ শ (সচিত্র)	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৮৮
বিদেশিনী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৩২
বেদেছৌঃ	..	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ	১৩৪৩
বরফ-গলা (কবিতা)	...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ	৮৭৫
বিজয়া-দশমী	...	ঐ	৯৩৫
বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ	...	ডাক্তার নিবারণচন্দ্র সেন রায় সাহেব	৮৫২
বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাণমুক্তি	...	ঐ	৯৫৯
বাউলের গান (কবিতা)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১০৩২
বাঁশী (গল্প)	...	শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪৩
বীরের নারী (কবিতা)	...	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	১১৭০
ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের প্রমাণ		শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ	৯৩১, ১০১৫
ভাষার উৎপত্তি	...	শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	৯৮২
ভারতে অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১১৩৭
ভারতে শিক্ষাবিস্তার	...	...	১৩৩৫
মৃত্যু সংবাদে (কবিতা)	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি, এ	৮০১
মেরুতে আর্য্যদিগের আদিনিবাস	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ	১১৩০
মূল আর্য্যজাতি	...	ঐ	১২২৭
মোগল শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক অবস্থা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩১৮
রাগ ও অনুরাগ (কবিতা)	...	শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৮৮০
রত্নাবলী নাটিকা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৪
রবীন্দ্র (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি,এ	১১৪৯
লাজাঞ্জলি (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৮০৯
লাঞ্ছিতা (কবিতা)	...	শ্রীমতী লীলা দেবী	৮৩০
শোক সংবাদ (সচিত্র)	...	...	১৩৫৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
শরৎ পূর্ণিমা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী ... ৭৪৭
শারীর স্বাস্থ্য-বিধান	...	রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর
	...	এম, বি, এফ, সি, এস ৭৫৪, ৮৭১
শান্তি (গল্প)	...	শ্রীমতী রত্নাবলী দেবী ... ১৩২২
শান্তিনিকেতন (গল্প)	...	শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী ... ৮৭৬
শবরী	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৯৪১
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্করদর্শন (সমালোচনা)		শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ১০৩১
শেষের দিনে (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় বি, এ ... ১১২৫
শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৩২৪
সন্ধ্যা প্রদীপ (কবিতা)	...	শ্রীমতী লীলা দেবী ... ১১৩৬
সৌধ-রহস্য (উপন্যাস)	...	শ্রীমতী সুরূপা দেবী ... ৭৪৮,
	...	৮৫৭, ৯৯০, ১০৯১, ১২১১, ১২২৮
সুখ (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ... ৭৫৩
স্বর্গগত শ্রীমদ্ওকাকুরা	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই ৮০২
সমাপ্তি (গল্প)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮০৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (সচিত্র)	...	৮২৬, ১০৩৩
সন্দেশ-বাহক পারাবত	...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ ... ৮৩৬
সূর্য্যোদয় (কবিতা)	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ... ৮৩৮
স্বামী সত্যদেব সরস্বতী	...	শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯১৩
সুইস্দিগের গার্হস্থ্য-জীবন	...	শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত ... ৯২৭
"সমসাময়িক ভারত" ও "ইংরাজের কথা" (সমালোচনা)		... ৯৪০
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা প্রভৃতি ... ৮১৭,
		৯৪৩, ১০১৯, ১১৪৯, ১৩০৩
সার্দ্দুর নাট্য-রচনা	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ১০০৮
স্বভাব (কবিতা)	...	শ্রীমতী লীলা দেবী ... ১১৯৩
সাক্ষ্য (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ... ১২৩৫
সাহিত্য-প্রসঙ্গ (সচিত্র)	...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল প্রভৃতি ১২৫৪, ১৩২৮
হর্ষবর্দ্ধন	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৯২৬
হিনেমোয়াকুণ্ড	...	শ্রীনন্দলাল সাও ... ১০৮৭

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
আঙুরের ক্ষেতে ...	৭৭৭
আত্মারাম পাণ্ডুরাম ডাক্তার ...	১২৭৫
আফজুল খাঁর বধ	
শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত ...	৯৬৬
আটটি বিড়ালছানা "ক্রকে" খেলিতেছে	১১৭১
একদল ইঁদুর "ডোমিনো" খেলিতেছে	১১৭২
কমলমণি—	
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৮১৬
কাষ্ঠমঞ্চ ...	১৩৩৯
কুবের ও হরিতি	
ডাঃ স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ...	১১১০
কৃষ্ণাষ্টমী (বহুবর্ণ) ...	৮৪০
কতকগুলি কাঠবিড়ালী তাস খেলিতেছে	১১৭২
খরগোসদের গ্রাম্য বিদ্যালয় ...	১১৭৩
গান্ধী ...	১০৩৪
গুজরাটী রমণীর নাচ, গান ...	৭৪৫
গোবিন্দ বিঠ্যল কড়কড়ে ...	৯০০
গৌতম (ছয় বৎসর তপস্যান্তে)	
ডাঃ স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ...	১১১১
চিঠি	
শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৬১
চাঁদের মন্দির—বোকাইনগর ...	৯৩৯
চাঁদবিবি ...	১১৮৯
জগদীশচন্দ্র বসু (ডাক্তার) ...	৮৩১
জাপানীদের রান্নাঘর ...	১০৬৬
জাপানী রমণী তরকারি কুটিতেছে ...	১০৬৮
জাপানী শিশুরা আহার করিতেছে ...	১০৬৯
জর্ম্মানসম্রাট কেইসার উইলহেলম ...	১১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
জে, সি, গুহ ...	৮২৭
ঠিক দুপুরের আরাম	
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত ...	৭৬১
তাণ্ডব নৃত্য ...	৮৯৫
দিলীপের পরীক্ষা (বহুবর্ণ) ...	১০৫৪
নিকুঞ্জে (বহুবর্ণ)	
প্রাচীন চিত্র হইতে ...	৭৩৮
নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর ...	৯৮০
নানা ফর্ণবীস ...	১০৮৪
পুষ্পলক্ষ্মী	
শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯৫
পার্ব্বতী মন্দির ৯০৪,	১১৮৭
পুরাতন রাজবাটী—সাতারা ...	৯০৬
প্রতিচ্ছায়া ...	১০০১
পেশওয়া রঘুনাথ রাও ...	১০৭৮
পুণা দরবারে ব্রিটিশ দূত ...	১০৮২
পেশওয়া মাধব রাও ...	১০৮৩
প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ স্পুনার ...	১১০৯
বসন্ত-ঋতু	১৩১৫, ১৩২৫
বার্ণাড শ ...	৭৮৯
বাঙ্গালার পল্লীদৃশ্য	৮৬৫, ৮৭৩
বাঁধ উদ্যান—পুণা ...	৮৯৮
বোলপুর ষ্টেশন হইতে	
শান্তিনিকেতনে যাত্রা ...	১০৪১
বৌদ্ধ-চৈত্য	
ডাঃ স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ...	১১১২
বিপন্নকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে ...	১১৭৪
বাজীরাও ১ম ...	১১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুলা মুঠা সঙ্গম—পুণা ...	৮৯৭
মহাবলেশ্বর ও শিবাজীর দুর্গ প্রতাপগড়	৯৭১
মহাদাজী সিন্দে ...	১০৮৪
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ...	১৩৫৫
রতন তাতা ...	১২৩৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৩৯
রবীন্দ্রনাথের সভায় আগমন ...	১০৪২
রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ ও রাজকুমারী ইন্দিরা (বিবাহ সজ্জায়)	৮০৮
রাম বালকৃষ্ণ ...	১২৭৬
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (অধ্যাপক) ...	১৩৩১
রেলিং ...	১২৪০
শরৎকুমার লাহিড়ী ...	১৩৫৯
শুক-শুদ্রক পরিচয় (বহুবর্ণ) শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৯৫৬
শিবাজী ...	৯৬৩
শৃঙ্গিরি মঠধারী শঙ্করাচার্য্য ...	১২৭৩
শৈলকুমারী ...	১১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
শৈলেন্দ্রনাথ বসু ঝাঁপ দিতেছেন ...	৮২৮
শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যা (বহুবর্ণ)	১২৬০
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু ...	১২৭১
স্বামীনারায়ণ মন্দির ...	৭৪০
সতীর অগ্নি-সংস্কার ...	১২৯৯
সন্তরণে পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটী যুবক	৮২৯
সাতারার দুর্গ ...	৯০৭
সেতু বোকাইনগর ...	৯৮১
সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি (বহুবর্ণ) ...	১০৫২
সন্ধ্যা প্রদীপ শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত	১১৫৬
স্তম্ভের নিম্নদেশ ...	১৩৪০
স্তম্ভের শীর্ষদেশ ...	১২৪১
স্তম্ভ ...	১২৪৩
স্তম্ভগুলির ভগ্নাবশেষ ...	১২৪৪
হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২৫৫
"হোহেন ভলোরন" বজরায় সম্রাট ও কন্যা লৌসি ...	১১২২



কাল্পিক প্রেস]

নিকুঞ্জে

প্রাচীন চিত্র হইতে

[২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২০ [৭ম সংখ্যা

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১১)

স্বামী নারায়ণ

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সমস্ত অনীতিগর্ভ আচার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বামী নারায়ণ ধর্ম্ম সমুত্থিত হয়। সহজানন্দ স্বামী-এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। গুজরাটে তাঁহার অন্যূন দুই লক্ষ অনুচর। সহজানন্দ রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। (১) যে সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গলাদেশে মূর্ত্তিপূজার স্থানে একেশ্বরবাদের বীজ বপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, সহজানন্দ স্বামীও তখন গুজরাটে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনীতি-কলঙ্ক অপনোদন করিয়া বিশুদ্ধ নীতিমার্গ প্রদর্শন করিতে তৎপর ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, সংযমী উদারচরিত সাধুপুরুষ ছিলেন। সহজানন্দ অযোধ্যার অন্তর্গত চপাই গ্রামে ১৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুজরাটে জুনাগড় নবাবের অধীনস্থ একটি গ্রামে আসিয়া রামানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮০৪ অব্দে স্বামীর সহিত আহমদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কি-এক সরল মাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি ছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অনুরক্ত শিষ্যদলে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে আহমদাবাদের ব্রাহ্মণগণের ও কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি অত্যাচার ভয়ে আহমদাবাদ ছাড়িয়া তাহার ৬ ক্রোশ দক্ষিণ জয়তলপুর গ্রামে চলিয়া যান ও তথায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই সকল উদ্যোগে গোলযোগ আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপুরুষেরা স্বামীকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করেন কিন্তু তাহার ফল উল্‌টা হইল। লোকের হৃদয় তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট ও তাঁহার

(১) রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩

আধিপত্য শতগুণ বৃদ্ধি হইল। শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত হইলেন ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভক্ত বৃন্দ আসিয়া জুটিল। সহজানন্দ তখন 'স্বামী নারায়ণ' নাম গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে বিশপ হীবর গুজরাটে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার Journal নামক গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এইরূপ :—

"এই সাধুপুরুষ মধ্যমাকৃতি, কৃশাঙ্গ, প্রায় আমার সমবয়সী, সাদাসিদে সহজ মানুষের মত বিনীত নম্রস্বভাব—তাঁহার আকার প্রকারে অসাধারণ প্রতিভার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম এক দেখিলাম অন্য দৃশ্য—তিনি প্রায় দুই শত ঘোড়-সোয়ার সঙ্গে মহা ঘটা করিয়া আমার

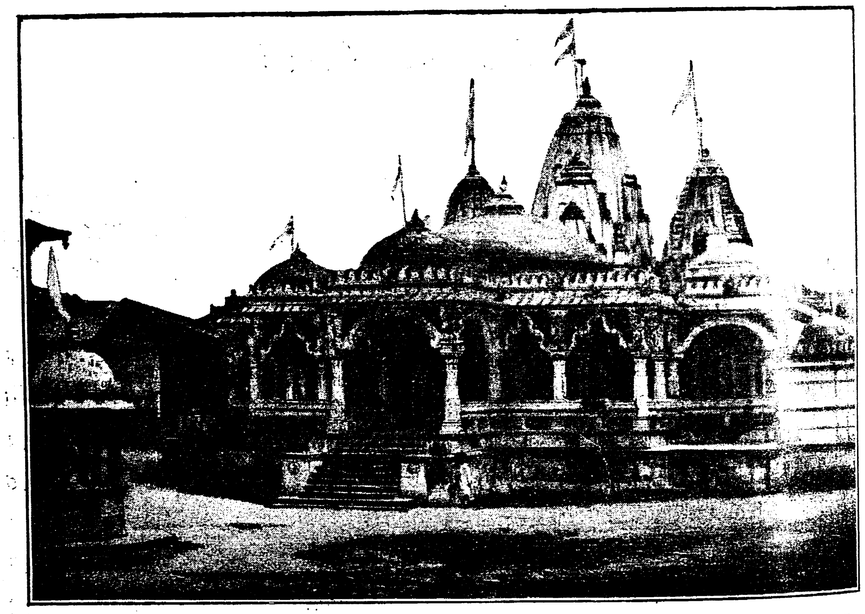

স্বামীনারায়ণ মন্দির।

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুইজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ এইরূপ সৈন্য সামন্ত লইয়া সহর তোলপাড় করিয়া তুলিলেন, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। আমার সৈন্যদল যদিও অল্পসংখ্যক তথাপি শিক্ষা ও শস্ত্রবলে বলবত্তর, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে অন্য হিসাবে কত তফাৎ! আমার সেনাগণ আমাকে জানে না চেনে না, যন্ত্রের ন্যায় আমার কাজ করিয়া যাইতেছে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই। স্বামীর রক্ষকগণ তাঁহার শিষ্য, অনুরক্ত ভক্ত, তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য দূর দূর হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছে, তাঁহার কোন বিপদ হইলে শরীরের রক্ত দিয়া তাঁহার

সংরক্ষণে প্রস্তুত—হায়, খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রতি ভারতবর্ষীয়দের প্রীতি ও অনুরাগ এইরূপ কবে হইবে!" Bishop Heber's Journal—CH.XXV.

সহজানন্দ শীঘ্রই বুঝিলেন যে তাঁহার বিচ্ছিন্ন শিষ্যদের লইয়া একটি দলবন্ধনের প্রয়োজন, এই উদ্দেশে তিনি শিষ্যগণসহ বর্ত্তাল নামক এক বিজন পল্লীতে গিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও তথা হইতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এইক্ষণে বর্ত্তাল গ্রামে স্বামীনারায়ণ পন্থীদের দুইটি মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বামে স্বামী-নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি। কেমন সহজে তিনি কলিকালের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন—আশ্চর্য্য! আমাদের দেশে সাধু পুরুষের দেবাসন অধিকারের জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

এই ধর্ম্মপ্রাণ স্বামী তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীনারায়ণ ধর্ম্ম ক্রমে গুজরাটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামিজী স্বীয় কার্য্য পরিদর্শনার্থে ভ্রমণে বাহির হইতেন—ভ্রমণ পথে অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাঠেয়াড়ে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

স্বামী নারায়ণ পন্থীর দুই শ্রেণী—সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত, গেরুয়া বসন-ধারী সন্ন্যাসী। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০০। ইহারা সমুদায় সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারেই জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছেন। জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি—চাষা কুলি প্রভৃতি হীনজাতীয় লোকের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। স্বামী-নারায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী। ইহা স্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় দুই শত দ্বাদশ শ্লোকে বিরচিত—কতকগুলি তাঁহার নিজের রচনা, অন্যগুলি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানি স্বামী নারায়ণী 'বাইবেল'। ইহার আদ্যোপান্ত ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের কণ্ঠস্থ। ইহার সারকথাগুলি নিম্নে লিখিত হইল ;—

জীবহিংসা করিবেক না।

মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; মদ্য অপেয় অগ্রাহ্য, ঔষধার্থেও সেবন করিবে না।

চৌর্য্য, ব্যভিচার, আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা, অশ্লীলবাক্য পরিহার করিবেক।

স্বধর্ম্ম পালন করিবে—পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। শ্রুতি স্মৃতির বিধানই ধর্ম্ম।

অর্থ লোভে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না।

প্রত্যূষে উঠিয়া কৃষ্ণনাম জপিবে—'শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম,' এই মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করিবে।

সেই অন্তর্যামী পুরুষ যিনি জগতের আদি-কারণ, তাঁহাকে কৃষ্ণ ভগবান্ পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম যে নামেই হোক্ স্মরণ ও ভজনা করিবে। মন্দিরে গিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিবে। তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি ভক্তিতেই আমাদের মুক্তি।

দেবভক্তি ও কর্ত্তব্য পালন—ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সধন গৃহস্থ অর্জনের দশমাংশ এবং নির্ধন বিংশভাগ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে।

আমার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিবেন, চতুর্ব্বর্গফল তাঁহাদের অব্যর্থ পুরস্কার। (২)

কড়ুয়া কণবী

গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লেওয়া কণবী ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়া কণবী একত্রে পানভোজন করিতে পারে কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান প্রদান নাই।

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, এক দিন হরপার্ব্বতী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। মহাদেব উমাকে কহিলেন, প্রিয়ে তুমি এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপস্যা করিতে চলিলাম, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিব। এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহ-বিধুরা উমা কথঞ্চিৎ কালহরণ করিবার জন্য মৃত্তিকার পুত্তলী গড়িয়া পূজা করিতেন। বার বৎসর পরে মহাদেব ফিরিয়া আসিলেন ও উমার অনুরোধে ঐ সকল পুত্তলীকে জীবনদান করত সচেতন করিলেন, তাহা হইতেই কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই হেতু কণবী জাতি উমার বিশেষ ভক্ত। যে স্থানে মহাদেব বার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা গাইকুয়াড় পরগণার উমা নামক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সেখানে একটি দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠিত, এই দেবীর আদেশ ক্রমে কড়ুয়া কণবীদের বিবাহ লগ্ন স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করিলে পূজারীগণ বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকে।

এই বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া সেই একই দিবসে সম্পন্ন হয়। মাসেকের দুগ্ধপোষ্য হইতে যোগ্যবয়স্কা কন্যা পর্য্যন্ত সকলেই এক একটি বরের সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হয়। এই অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং পারত পক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদি কারণ বশতঃ কোন কন্যার পাত্র না পাওয়া যায় ত পুষ্পরাশির সহিত তাহার নাম মাত্র বিবাহ দেওয়া হয়, পর দিবস সেই সকল ফুল কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু সমান পরিগণিত হয় ও তৎপরে সেই কন্যার "নাত্রা" অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ হইবার কোন বাধা হয় না। ঈদৃশ আর একটি প্রথার নাম 'বাহুবর' বিবাহ। অর্থাৎ যদি স্বজাতীয় কোন পুরুষ পূর্ব্ব হইতে অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে এই কন্যার বিবাহের পর আমার কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে বিবাহিত কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্যাদানের অব্যবহিত পরেই

(২) Religious life and thought in India. Monier Williams.

বিবাহবন্ধন হইতে বর কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যে স্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় তাহার "নাত্রা" অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দ্দিষ্ট কাল ভিন্ন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু একবার নামমাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্ব্বিবাহ সম্ভবে ও এইরূপ বিবাহের কোন নিরূপিত সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। 'বাহুবর' বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর-ক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়া হাতের চুড়ি ফেলিয়া দিয়া স্নান করে, যেন তার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মুসলমানদের যেমন নিকা, নীচবর্ণ হিন্দুগণের সেইরূপ নাত্রা। নাত্রাতে বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয় বাহুল্যও নাই। অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্ব্বেই যে রমণীর বৈধব্য হয় অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে নামস্থ বিবাহের পর যে স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধূতির অঞ্চল ও কন্যার সাড়ীর অঞ্চলে গাঁঠ দেওয়া হয়, ও এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী অশ্বারূঢ় হইয়া জনতার মধ্য দিয়া গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহাদিগকে গণপতি পূজা করাইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা।

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন কখন স্থির হইয়া থাকে। দুই প্রতিবেশীর নিজ নিজ পত্নী গর্ভবতী হইলে তাহারা এইরূপ যুক্তি করে যে তোমার পুত্র আমার কন্যা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক স্ত্রীর কন্যা ও অপরের পুত্র জন্মে ত অঙ্গীকার মত উপযুক্ত সময়ে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়।

সকলের কুল সমান নহে। পূর্ব্ব পুরুষের কৃতি ও সুখ্যাতি বশতঃ কোন কোন বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে অনেকটা জন্মভূমির উপর বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। আহমদাবাদের আদিমবাসী কণবীগণ কুলশীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত। কুলীনের সহিত কন্যার কিসে বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য। নীচকুলে কন্যাদান মহা অপমানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগত-যৌবন হয় তথাপি সে প্রার্থণীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে তাঁহারা দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চ কুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন ও বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যয়। এইহেতু কুলাভিমানী নির্ধন কণবী এবং রাজপুতদের মধ্যে কন্যা-হত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতামাতা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, এই প্রথার নাম 'দুগ্ধপীতি'। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথার ন্যায় রাজ শাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর নীচবর্ণ হইলে তাহাকে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে আপন পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্যা পাওয়া যায়। মনে কর রণছোড়ের এক ভগিনী ও দাজীর একটি কন্যা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ দিয়া দাজীর কন্যাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভগিনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপ বিবাহকে সট্টা বিবাহ বলে।

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থলালসায় বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপন অভিলষিত নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে; কিন্তু আইন অনুসারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহার নায়ককেই দণ্ডভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল মোকদ্দমা কোর্টে যাইবার পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জাতীয় শাসন বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। জাতীয় পাঁচজন মিলিয়া যে বিধান করেন তাহা উভয় পক্ষেরই শিরোধার্য্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর এক জনের সংসর্গে বাস করে—স্বামী স্বজাতীয় লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত করেন। জাতির মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, ইহা হইতে গুরুতর দণ্ড আছে কি না সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হইল যে, পর স্ত্রী গ্রহণের দণ্ড স্বরূপ ৩০০ টাকা দণ্ড দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রয় করিতে হইবে ত অগত্যা তাহাই করিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়।

যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রী জাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের বিবাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্যারত্ন পাইবার জন্য তাহাদের প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়, ও অর্থাভাবে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাজে কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল বিবাহার্থী পুরুষদিগের মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক এক এক কন্যা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্যা হয়ত অন্য জাতীয়, অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্যার জন্য বুভুক্ষিত মৎস্যের ন্যায় তাকাইয়া আছেন, টপ্ করিয়া টোপ পড়িল কি অমনি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আটকাইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্য গ্রামের দুই একজন ভদ্রলোক হয়ত জামীন হইল, তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া ছল-বল-কৌশলে তাহাদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্যাকর্ত্তার হাতে টাকা গণিয়া দিয়া মহাউল্লাসে উদ্বাহ শৃঙ্খল গলে পরিলেন

—পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন যে কন্যা নাই, কন্যাকর্ত্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্—পরে সন্ধান পাইলে হয়ত আদালতে এক প্রকাণ্ড মকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মুদিয়া পরস্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিলেন—এদিকে সেই স্ত্রীর যে স্বামী তাহার বাটীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী কোথায় পলায়ন করিল, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে গিয়া কন্যাকর্ত্তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। সত্য নিরূপণ করিতে বিচারপতির মাথা ঘুরিয়া যায়। স্বামী চান তাহার স্ত্রী, উপস্বামী, প্রতারক দল সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন, আমার স্বামী আমায় মা বোন্ বলিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন—এই স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতাম? প্রতারক দল বলিতেছে, আমরা কিছুই জানি না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করিয়াছে, বরকন্যা আমরা কাহাকেও চিনি না—আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে পুলিষের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষী আনিয়া হাজির। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপার?



গুজরাটী রমণীর নাচ, গান

গরবা

গুজরাটী রমণীগণ সুরূপা, মিশুক ও আমোদপ্রিয়। গুজরাটে গরবা বলিয়া একরকম গান নারীমহলে প্রচলিত। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির উৎসবের আরম্ভ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই গরবা গানের ধূম লাগিয়া যায়। আহমদাবাদ বরদা সুরাট প্রভৃতি গুজরাটের প্রধান প্রধান নগরে কুলস্ত্রীগণ মিলিত হইয়া গরবা গানে মাতিয়া যায়। গীতের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বিবাহাদি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে গরবাগান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। নাগর ব্রাহ্মণ রমণীরাই এই গানের ওস্তাদ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁরা সুগায়ক বন্ধুবাটীতে গান গাহিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়। গরবা একজনেও গাহিতে পারে কিন্তু সচরাচর নারীমণ্ডলী মিলিয়া গায়। গরবা গাহিবার রীতি এই। একদল গায়িকা চক্র বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে

গীত আরম্ভ করে। আরম্ভের সময় প্রধান গায়িকা যিনি তিনি দুই এক তান ধরেন, পরে তাহাতে আর সকলে যোগ দেয়। প্রত্যেক চরণ দুইবার করিয়া গীত হয়। এমনও হইতে পারে যে গীতের প্রধান অংশগুলি প্রধানা কর্ত্তৃক গীত হয়, কেবল ধুয়াতে আর সকলে সমস্বরে যোগদান করে। এইরূপ চক্রাকারে তালে তালে করতালি ধ্বনিতে নাগরিকাদের মধুর সঙ্গীত গুজরাট ভিন্ন আর কোথাও শুনি নাই। না শুনিলে ইহার প্রকৃত মাধুর্য্য বোঝা যায় না।

পেশাদারী শোক প্রকাশ

গুজরাটে একটা অদ্ভুত রীতি আছে—শোকের ভান করিয়া বুক চাপড়াইয়া পেশাদারী শোক প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতে হইলে একদল স্ত্রীলোক ভাড়া করিয়া আনা হয়, তাহারা বক্ষাঘাত করিয়া মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে। পথে ঘাটে এইরূপ শোকাভিনয় দেখিতে পাইবে। দেখিলে মনে হয় যেন কাহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই শোককারী নারীদিগের তালে তালে বক্ষাঘাত, অশ্রুহীন বিলাপধ্বনি ও কৃত্রিম ভাবভঙ্গী দেখিয়া শীঘ্রই সে ভ্রম দূর হয়।

ভাঁড়ের যাত্রা

শোকের কাহিনী হইতে একটু আমোদের কথা বলিয়া এই ভাগ শেষ করি। আমি যখন প্রথম আহমদাবাদে যাই তখন সেখানে একটা পার্টি দিয়াছিলাম—তাহাতে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে আমোদের মধ্যে ভাবইয়া নামে ভাঁড়ের যাত্রার দল আনানো হইয়াছিল। ভাবইয়ারা উপস্থিত ঘটনা বর্ণনায় ও লোকজনের চরিত্র নকলে পরম পটু। তাহারা যে সময়কার চিত্রপ্রদর্শন করিতেছিল তখন বোম্বায়ে "সেয়ার মেনিয়া" রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেয়ার কিনিবার জন্য পাগল। নিঃস্ব কাঙ্গাল যাহার ঘরে অন্ন জোটে না সেও একরাত্রির মধ্যে সম্পদবান্ হইয়া উঠিবে—লোকের এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। ইংরাজ মারাঠী গুজরাটী এই সংক্রামক রোগ সকলকেই ধরিয়াছে। সেই ঝোঁকে ইংরাজ ও দেশীয়দের বিলক্ষণ মেলামেশা হইত। নেটিব তখন ইংরাজের অবজ্ঞার পাত্র ছিল না। তখন তাহাদের গলাগলি ভাব দেখে কে? সেয়ার বাজারের রাজা ছিলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ; তাঁর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে সেয়ার বাজারের উত্থান পতন হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার দরবারে গিয়া খোসামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পর্য্যন্ত কখন কখন সেয়ার ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাটি ভাঁড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে লইয়া সেয়ার আবদারের জন্য বাহির হইয়াছেন দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে কি গোলযোগ উপস্থিত! চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ! একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বজাতির ওরূপ উপহাস জনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তম মধ্যম প্রহার আরম্ভ

করিলেন, সেই গোলমালে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঁড়ের খেলা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল। আমরা হাসি কি কাঁদি কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না।

গুজরাট আমার সর্ভিসের প্রথমকালের বিহারক্ষেত্র। সে দেশের লোকের সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয় বন্ধন। সেই নবানুরাগের আভা আমার স্মৃতিমন্দিরে নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎ পূর্ণিমা

১

জ্বাল জ্বাল আরো জ্বাল পূর্ণিমা রূপসী
তোমার ও বিরাট আলোক,
লুপ্ত হোক সে রূপের জ্বলন্ত প্রভায়
বিশ্বলোক—সারা বিশ্বলোক।
সারা বিশ্ব মাতোয়ারা তব পরশনে
অনিমেষ হেরে মধুরিমা,
ও প্রেম-মদিরা পিয়ে ভুলে গেছে ধরা
কোথা তার আপনার সীমা!

২

কোন্ অভিসার-পথে বিমোহিনী বেশে,
চলিয়াছ সুন্দরী শ্রেয়সী?
কোন্ ভাগ্যবান্ আজি বসে আছে কোথা,
তোমারে যে লভিবে প্রেয়সী?
খোল আজি দ্বার তবে, জ্বালাও প্রদীপ
হে প্রমত্ত অধীর অমর,—
উন্মাদ যামিনী আজ ছুটেছে আকুল
চুমিবারে তব ওষ্ঠাধর।

৩

ঢাল তবে ধীরে ধীরে ও রূপের সুধা
ও রূপের অমৃত মদিরা,
ত্রিলোকের অন্ধকার যাক্ আজ ঘুচে
পান করি ও অমিয়া-ধারা!
উদ্দাম উন্মাদ তব ও অনন্ত তৃষা
ঢাল আজ বিশ্বের হৃদয়ে
কোণে কোণে ভরা তার আবর্জ্জনা রাশি
মরুক্ গো চিরধন্য হয়ে!

৪

কোন্ মত্ত তৃষা আজ লইয়া অন্তরে
রাগরক্ত বাসনার রাশি,
জ্যোছনা আঁচলখানি লুটাইয়া গায়
মুখে লয়ে চারু শুভ্র হাসি,—
গোলাপ কমলে আর কেতকী কুমুদে
যত্নে গাঁথি অভিনব মালা
কোথা লয়ে চলিয়াছ কোন ভাগ্যবান?
লভিবে এ পূজা-অর্ঘ্য, বালা?

৫

খেলা কর লো ধরণী আজ আত্মভোলা
সুধাংশুর প্রেম-আলিঙ্গনে—
দেখ চেয়ে প্রিয় রাধা বিহ্বল হৃদয়ে
অপলক নীরব নয়নে!
ছড়াও বহাও আজ তব সীমাহীন
অসীম অনন্ত গভীরতা,
ঘিরে থাক্ চারিধারে অটবীর মত
শুধু স্তব্ধ চির-নীরবতা!

৬

ও প্রমত্ত রাগরক্ত ও মত্ত তৃষায়
ডুবে গেছে বিশ্ব-চরাচর,
তুলিছে আনন্দ-রোল ত্রিদিব হইতে
আত্মভোলা অমরী-অমর!
এত তৃষা এত শোভা লয়ে আজ তব
ও তনুর অতুল গরিমা,
ভুবন চঞ্চল আজ তাই দেখে শশী
হারায়েছে আপনার সীমা!

শ্রীপ্রতিভাকুমারী দেবী।

সৌধ-রহস্য

একদিন সেদিন সকাল বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো ধুয়ে সাফ হয়ে দিব্যি বাহার বেরিয়েচে। ডাল নাড়া পেলে বৃষ্টির জল ঝুরো ফুলের মত তখনও ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছিল,—আমি বাগানের সরু সুরকি-ফেলা লাল রাস্তা থেকে বড় বড় ঘাস্‌গুলো তুলে সাফ্‌ করে ফেল্‌চি, এমন সময় কর্ত্তা এসে আমায় বল্লেন, "ইজ্‌রেল তোমার কি কখনও বন্দুক ছোড়ার সুযোগ হয়েছিল?" সুযোগ!—ভগবান্‌ রক্ষে করুন —ও সব মানুষ-মারার কল-কব্জা আমি কখনও ছুঁই-ওনি। "তবে থাক্‌ এখন আর শিখ্‌তে হবে না,—সবারই নিজের নিজের অস্তর আছে, তুমি বোধ হয়, লাঠি চালাতে ভালই পার?"

আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম, "এঃ তা কর্ত্তা, খুব পারি—এই "বজরে" যত লোক আছে, সবারই সঙ্গে আমি তা খুব লড়্‌তে পারি।"

তিনি বল্লেন, "দেখ, বাড়ীটা ভারী নির্জ্জন। কি জানি, কোন্‌ সময় হয় ত কোন্‌ বদ্‌মায়েসের দল আসতে পারে—তাই বলছি আর কি, সব সময় তৈরী থাকা ভাল। তাহলে তুমি, আমি মরডণ্ট আর ব্রান্দসামের ফদারজিল ওয়েষ্ট, দরকার হলে তাকেও খবর দেব—এই চারজনে যত লোকই আসুক না তাদের হঠাতে পারব—কেমন পারব না কি? তুমি কি বল?"

"সে কথা আবার বল্‌তে? মুদ্ধু-টুদ্ধুর চেয়ে ভোজ-টোজে আরাম আছে বটে, কিন্তু আমার যদি আর এক পাউণ্ড মাইনে বাড়িয়ে দেন ত আমি দুয়েতেই সমান রাজী।"

জেনারেল বল্লেন, "থাক্‌, এ সব কিছু এখনি দরকার নয়। যখনকার কথা, তখন দেখা যাবে।"

আমি যে এক পাউণ্ড মাইনে বাড়ানোর কথা বলে ছিলুম, তাতে তিনি রাজী হলেন! টাকা যেন খোলাম-কুচি! অবশ্য চাকর আমরা, মুনিবের সম্বন্ধে মন্দ ভাবা আমাদের পক্ষে উচিত নয়,—তা বুঝি, কিন্তু যখন একটা মুখের কথায় একদম বার মাসে বার পাউণ্ড মাইনে বেড়ে গেল, তখন আপনা থেকেই মনে হল, "মুনিবের হয়ত ভাল উপায়ে রোজগারের টাকা নয়।" আমি যে ভারী খারাপ লোক্‌, মানুষকে সন্দেহ করাই যে কি গোয়েন্দাগিরি করা কেবল আমার স্বভাব তা নয় কিন্তু তবুও আমি যে এই সব বল্লুম বা করলুম তার কারণ, বুড়ো মানুষের রকম সকম,—সারারাত্তির জেগে তাঁর ঘুরে বেড়ানো—এই সব দেখে শুনে আমার মনে কেমন ভয় লেগেছিল।

আর একদিন সকালে, আমি যখন নীচেকার রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছি, হঠাৎ তখন কর্ত্তার ঘরের সাম্‌নের দালানে চোখ পড়ে গেল। দেখি, এক গাদা পুরোণো ময়লা পর্দ্দা আর ছেঁড়া কার্পেট পড়ে আছে। ধাঁ করে মনে একটা মতলব গজাল! মন বল্লে, "বাহাদুর ইজরেল, তুমি কেন ঐ পর্দ্দাগুলোর ভেতর

রাত্তিরে ঢুকে থেকে দেখ না, বুড় কি কাণ্ড করে? রাত্তিরে যে ঘুরে বেড়ায়, কিছু ত করে!" আমি বল্লুম, "বেশ্‌! চুরিও কচ্চি না—ডাকাতিও কচ্চি না, লোকের মন্দও কিছু কচ্চিনা—চোখ্‌ দিয়ে শুধু দেখ্‌ব বৈ ত নয়, এতে আর দোষ কি? যতই ভাব্‌তে লাগলুম, কাজটা ততই সহজ বলে মনে হতে লাগল। পাপ্‌কে আমার বড় ভয়, পাপ কাজ কিছু যখন কচ্চি না, তখন আবার ভয় কি! নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি এই কাজ কর্‌ব।

রাত্রে কাজ-কর্ম্ম সেরে রাঁধুনীকে গিয়ে বল্লুম, "আমার শরীরটা খারাপ হয়েচে, রাত্তিরে আজ আর ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগাব না, শুতে যাই।" কথাটা কিছু আর মিথ্যা বলিনি। কি দেখ্‌ব? কি রকম করে থাক্‌ব, এই সব ভেবে ভেবে সত্যিই আমার মাথাটা কেমন একটু টিপ্‌টিপ্‌ কচ্ছিল,—হাতে পায়ে অত ঠাণ্ডাতেও ঘাম হচ্ছিল। একবার কোন গর্ত্তিকে ঢুক্‌তে পাল্লে হয়, তার পর আর কেউ আমার নাগাল পাচ্চেন না!

রাত যখন নিশুতি—কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, কেবল বাইরের বাগানে ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোর আওয়াজ আর মাঝে মাঝে দূরে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্চে, তখন আমি জুতো খুলে আস্তে আস্তে সেই পুরোণো পর্দ্দা আর কার্পেটের গাঁদির মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। কেবল দেখ্‌বার মত চোখের কাছে একটু ফাঁক রেখে সর্ব্বাঙ্গ বেশ করে ঢেকে রাখলুম। খানিক বাদেই ঠিক আমার পাশ দিয়ে জেনারেল তার শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, তার পর সব নিস্তব্ধ, চুপ চাপ্‌! একটা আলপিন্‌ পড়্‌লেও সে শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়!

ওঃ! গেছ্‌লুম আর কি! আমায় যদি ব্র্যাঙ্কসামারের ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে, তার সমস্ত সে দিতে চায়, তাহলেও ফের আমি সেখানে যাচ্চি না। ওঃ—সে সব কথা ভাবতে গেলেও পিঠের শির-দাঁড়াটা বরফের মত জমাট বেঁধে যায়! কন্‌কনানি ধরে!

এই একঘেয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে চুপ করে জেগে পড়ে থাকা,—নিশুতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য কোথাও এতটুকু শব্দ নেই,—কি ভয়ানক! কিন্তু না, একটা শব্দ ছিল—কোথায় দূরে রাস্তায় এক ঘড়ির টক্‌টক্‌ আওয়াজ হচ্ছিল, প্রথম আমার মনে হয়েছিল, বুঝি, সে আমার বুকেরই শব্দ, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম, তা নয়। বুকের শব্দ এ শব্দের ঢের উপরে উঠ্‌ছিল, ভাগ্যে সেখানে কেউ ছিল না! তাহলে নিশ্চয় শুন্‌তে পেত। সব চেয়ে কষ্ট হয়েছিল ঐ ধূলোর জন্যে, ছেঁড়া ময়লা অপরিষ্কার পর্দ্দাগুলো—কত জন্মের ধূলো যে তার মধ্যে জড় করা আছে। ওঃ অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে-মুখে-নাকে ধূলোর কাঁড়ি ঢুকে যাচ্ছিল। কাশি বন্ধ করা—কি সে দারুণ কষ্ট! মৃত্যু-যন্ত্রণা যে লোকে বলে, সে বোধ হয় এমনিই! মৃত্যুও তাহলে দেখছি বড় ভয়ঙ্কর!

আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছিল—শীতে কি? বোধ হয়, না। কারণ, কপালে যে ঠাণ্ডা ঘাম জমা হচ্ছিল, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিলুম। মনে করে ছিলুম, আমি যে দালানটায় শুয়ে

আছি, তার অপর দিককার দালানটার দিকে দেখ্‌ব, কিন্তু বাপ্‌, কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার তাল পাকিয়ে রয়েচে!

ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয় আছেন,—তা তোমরা মান,—আর, নাই মান! আমি ভাব্‌তে অবাক্‌ হয়ে যাচ্চি যে তত কষ্টতেও আমার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে যায় নি, কেন! যদি আমায় কেউ "গ্লাসগো"র "লর্ড প্রভষ্ট" করে দেয়, তবুও আর আমি এমন কাজ দ্বিতীয় বার কচ্চি না।

রাত্রি বোধ হয়, বোধ হয় কেন, তখন ঠিক দুটো। কেন বল্‌চি! রাস্তার সেই ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে দুটোর ঘা বাজল। ভাবলুম, বাঁচা গেল! আজ আর তা হলে কিছু বোধ হয় দেখ্‌তে হবে না,—কথাটা মনে হওয়ায় আমার কি কিছু দুঃখ হয়েছিল?—না, একটুও না!

কিন্তু হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা চমৎকার আওয়াজ আমার কানে বাজ্‌তে লাগল।

সেই শব্দটা ভাল করে বর্ণনা করে বোঝাতে হবে? তবেই গেছি আর কি! তোমরা যদি শুন্‌তে, দেখে নিতুম একবার, কে কেমন বর্ণনা করতে পার। এক কথায় যদি বলি, এমন আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি, এর আগে নয়, পরেও নয়, তা হলেই ঠিক বলা হয়, কিন্তু তা হলে ত চলবে না—আমি না পারলেও বল্‌তে হবে! বেশ্‌! মদের গেলাস টেবিলের উপর ঠুন-ঠুন করে বাজালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক্‌ তেমনি শব্দ! না,—তার চেয়েও ঢের মিঠে আওয়াজ! আর ঢের জোরে তার উপর যেন বৃষ্টির জলের একটা ছড়্‌ ছড়্‌, গম গম, টিং টিং, এই গাম্‌লার উপর বৃষ্টির জলের আওয়াজ শুনেচ কি, সেই রকম কি কোন্‌ রকম তা আমি ঠিক জানি না। তবে আওয়াজটা কিন্তু চমৎকার! আমার ভয় হচ্ছিল! ভয়ানক ভয়! তবু কি মিঠে আওয়াজ! আমি ভয়ে উঠে বসে কান খাড়া করে শুনছিলুম—সব আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। না, কেবল সেই ঘড়ীটাই টক্‌ টক্‌ কচ্চে!

হঠাৎ শব্দটা আবার আরম্ভ হল—এবার যেন একটু বেশী জোরে। আমার মনে হল, জেনারেলও এবার শুন্‌তে পেয়েচেন, কেন, বল্লুম? হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে খুব কাহিল মানুষ যেমন গোঁ গোঁ করে, তেমনি একটা আওয়াজ তাঁর ঘরে শোনা যাচ্ছিল।

খাটের ক্যাঁচ্‌-কোঁচ্‌ শব্দে বুঝ্‌তে পারলুম, তিনি বিছানার উপর উঠে বসেচেন,—তার পর পোষাকের খস্‌খসানি, পায়ের শব্দ, এদিকে থেকে ওদিক, উত্তর থেকে দক্ষিণ, বোধ হয় পায়চারি করে বেড়াচ্চেন।

এখন আমার কি হবে! ভাব্‌তে বেশী সময় লাগ্‌ল না। ঝপ্‌ করে শুয়ে পড়লুম,—তার পর প্রার্থনা,—ওঃ! জীবনে যত কিছু প্রার্থনা আমি শুনেচি, সব মনের ভিতর জড় করে এক করেছিলুম। হাঁ ভগবান্‌কে আমি মানি,—দরকার মত ডেকেও থাকি,—ডাক্‌ছিলুমও তাই, কিন্তু চোখদুটোকে রেখে-ছিলুম জেনারেলের ঘরের দরজার দিকে, ইচ্ছা করলেই যে আমি তখন চোখদুটোকে ফেরাতে পারতুম, তা নয়,—বুঝ্‌তেই পারতুম না।

একটু পরেই হাতল ঘোরানোর শব্দ

পেলুম,—কর্ত্তার ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বল্‌ছিল—দেখ্‌তে পেলুম,—সারি সারি লাইন-বন্দী তরোয়াল ঝুল্‌চে। ভাগ্যে আমি সৈনিক হয়ে জন্মাইনি!

কর্ত্তা একটা ঢিলে লম্বা জামা—একটা লাল রংয়ের টুপী, আর একটা গোড়ালি-কাটা, মাথার উপর শিং-উল্টোনো অদ্ভুত রকম চটি জুতো পরে, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একবার আমার মনে হল, কর্ত্তা হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই চল্‌চেন, কিন্তু যখন ঘরের আলোটা তাঁর মুখের উপর পড়্‌ল, তখন আমি দেখ্‌লুম, কোন রকম ভয়ানক দুঃখ হলে মানুষের মুখ যেমন হয়ে যায়, তাঁর মুখও ঠিক্‌ তেমনি হয়ে গেছে। তাঁর সেই চেহারা—আর পাঁশুটে মুখ, সেই গম্ভীর ভাবের চলুনি, এখনও যখন আমার মনে পড়ে, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে, রক্ত জমাট বেঁধে যায়। সে যেন গোর থেকে উঠে মরা মানুষ চলে বেড়াচ্ছে!

তিনি যখন আমার খুব কাছ দিয়ে চল্‌ছিলেন্‌, আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করছিলুম। আর যখন একেবারে আমার পাশে এসেছিলেন, ওঃ,—আমার দম বন্ধ হয়ে গেছল।

টিং—?—জোরে বেশ পরিষ্কার স্বরে মনে হচ্চে—যেন এক গজ তফাতে—সেই আওয়াজ! কোথা থেকে যে এল, আর কেনই যে এল, এইটিই হল বিষম সমিস্যে! হতে পারে কর্ত্তাই এটা কচ্চেন, না, তাও ত নয়, কর্ত্তার হাত-দুখানা অসাড় হয়ে দুদিকে ঝুলছিল, খালি হাত! তাঁর কাছ থেকেই আস্‌ছিল বটে, সরু-চাঁচা তাঁর মাথার উপর থেকে বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল। কি এ? কেউ বল্‌তে পার্‌বে না।

কর্ত্তা কিন্তু কোন খবরই নিলেন না। যেমন আস্‌ছিলেন, অমনি চলে গেলেন।

এর পর আমি কি করলুম—তাও কি আর বলে দিতে হবে! একেবারে এক দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলুম। রক্ত সমুদ্রের ভূতের দল যদি আজ এখানে নিমন্ত্রণ খেতে আসে, তবুও আমি আর দরজার বাইরে মাথা বার কচ্চি না।

মাসে চার পাউণ্ড মাইনে মাইনে মোটা, অস্বীকার কর্‌ব না কিন্তু প্রাণটার দাম চার পাউণ্ডের চেয়ে অ-নেক বেশী। আমার আর ক্লুমবারে চাকরি করা পোষাবে না। চাকরিকে জবাব দেওয়াই স্থির! তারপর, আত্মা? চিরকালের জন্য সে-ও যে উচ্ছন্ন যাবে। শয়তান যখন একবার দেখা দিয়েচে, তখন সে যে কোথা দিয়ে ফের জাল ফেলবে, সে কথা কে-ই বা বল্‌তে পারে! তোমরা বল্‌বে, ভগবানের ক্ষমতা শয়তানের চেয়ে বেশী কিন্তু আমি বলি,—আমি গরিব মানুষ বাড়ীতে পাঁচটাপুষ্য নিয়ে ঘর করি, কখনও কারো মন্দ করিনি,—কে বড়, সে পরীক্ষায় আমার দরকারই বা কি!

আমি বেশ্‌ বুঝ্‌তে পেরেছিলুম যে জেনারেল আর তাঁর এই কোঠাটি অভিশপ্ত। যারা অন্যায় করেচে, তারা তার ফল ভোগ করুক—কিন্তু আমরা নিষ্ঠাবান প্রেস্‌বিটারিয়ান, আমরা কেন তার ভাগ নিতে যাই!

সময় সময় কুমারী বেলের জন্যে আমার মনটা বড় কাতর হত। আমার মনটা ভারী

নরম কি না! আহা মেয়েটি বড় ভালো,—লোককে আমোদ দিতে, খুসী কর্‌তে ভারী মজবুত আর সুন্দরীও কি তেমনি! এই অন্ধকার বাড়ী খানাতে সেই যা একটু আলো জেলে রেখেছে! কিন্তু কি কর্‌ব, এ সবের জন্য ত আর আমার নিজের কোন অন্যায় কর্‌তে পারি না। দয়া অবশ্য ভাল জিনিষ, কিন্তু সকলের আগে নিজেকে ত দয়া করা চাই! সেই ভয়ঙ্কর টিং-টাং-টুং ওরে বাপ্‌রে—সে শব্দ শোন্‌বার জন্য আবার আমি এখানে থাকব? ভুলেও আর সে রাস্তা দিয়ে চলি না। সুযোগ খুঁজ্‌চি, শীঘ্রই জেনারেলকে নোটিশ দেব। আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম, এবার এমন জায়গায় কাজ নেব, যেখান থেকে একটা ঢিল ছুঁড়্‌লেও গির্জ্জের গায়ে গিয়ে ঠেকে!

অক্টোবর মাসের গোড়ায় একদিন সকাল বেলা আমি ঘোড়াটাকে "দানা" দিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আস্‌চি,—বাগানে ঘাস হয়েচে এক হাঁটু,—কেউ যেন দেখে না, বলে না কিছু, তবু আমার নিজের একটা "কর্ত্তব্য-জ্ঞান" আছে ত! ভাবলুম, আজ বাগানটাকে সাফ্ করে ফেলি। দিব্যি কুয়াশা হয়েচে, রোদের তেজও নেই, জলের নামও নেই! আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম সাদা ডানা মেলে পাখীগুলো উড়ে যাচ্চে, সব ঝাঁক্ বেঁধে চলেচে। সবুজ গাছের পাতার উপর কত রঙ্গের প্রজাপতি আর ফড়িং উড়্‌ছিল,—কেন? জল হবে বলে কি? হঠাৎ দেখলুম, একটা লোক সরাসর চলে আস্‌চে, লাফাতে লাফাতে চল্‌চে! খোঁড়া না কি? আমি দাঁড়ালুম। তার দিকে চেয়েই একটা কথা চট্ করে মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, জেনারেল যে সেদিন অত করে একটা বদ্‌মায়েস্ লোকের আস্‌বার কথা বল্‌ছিলেন, ত এ সে-ই নয়! পরীক্ষা করেই দেখা যাক্ না! কথাটি না কয়ে—তাড়াতাড়ি লাঠিগ'ছটা নিয়ে এলুম। আমার ভাব দেখেই হোক' আর লাঠির ভাব দেখেই হোক, লোকটা "ধাঁ" করে পকেট থেকে একখানা মস্ত ছুরি বার করে ফেল্লে। ছুরিখানা বার করেই বলে উঠল, আমি যদি সরে না যাই বা লাঠি তুলি, তা হলে ঐ ছুরিখানা দিয়ে সে আমায় খুন কর্‌তে একটুও ইতস্ততঃ কর্‌বে না। তা পারে সে,—যে দুষমন্ চেহারা! আমার চৈতন্য জন্মে গেল—সে সবই পারে! যখন আমরা ঠিক সোজাসুজি, সে ছুরি হাতে—আর আমি লাঠি হাতে সামনা-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে ভাব্‌চি যে, এর শেষ কি রকম দাঁড়াবে, এমন সময় জেনারেল সেইখানে এলেন। বাড়ীটার সবই আশ্চর্য্য! জেনারেল এসেই যেন কত কালের চেনা জনের মত বল্লেন, "করপোর‍্যাল, ছুরিখানা পকেটে পুরে রাখ। ভয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন ঘটেচে না কি?" অপর ব্যক্তি ছুরিটা পকেটে পুরতে-পুরতে উত্তর দিলে, "আঘাত আর রক্তর ভয়। যে অসভ্য বুনো জানোয়ার ঘরে পুষে রেখেছ।—আমি যদি ছুরি বার না কর্‌তুম, তাহলে এতক্ষণে এই সবুজ ঘাসের উপর আমার মাথার ঘিটুকু ছড়িয়ে পড়ে থাকত, দেখতে।"

প্রভু ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চাইলেন। বেশ্ বোঝা গেল যে, তার কাছে উনি কোন উপদেশ নিতে নারাজ! তার পর

আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ইজরেল,—তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছু বল্‌ছি না, তুমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোক, ভালো চাকরই ছিলে, তুমি। কিন্তু ঘটনাতে করে আমায় ব্যবস্থা বদ্‌লাতে হচ্চে। আজ রাত্রেই তুমি চলে যেয়ো। আমার আর তোমাকে দরকার হবে না। আর এত অল্প সময়ে তোমায় নোটিশ দিতে হল বলে এক মাসের মাইনে তুমি বেশী পাবে'খন।"

কথা শেষ করেই তিনি বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। আর যাকে কত্তা করপোর‍্যাল বল্লেন, সেই খোঁড়াটাও তাঁর সঙ্গে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলে গেল।

সেই রাত্রেই আমি রাঁধুনি আর চাক্‌রাণী বার্বারাকে ধর্ম্মাধর্ম্মের দু-একটা কথা বুঝিয়ে, এখনকার মণি-মুক্তার চেয়ে সেখানকার বড় ঐশ্বর্য্যের কথা তুলে, ক্লুমবারের মাটী আমার জুতোর তলা থেকে ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এলুম।

এর পর আমি তাদের আর কখনও দেখিনি। ফদারজিল ওয়েষ্ট আমায় বলেচেন যে পরে কি হবে, সে কথা কিছু না ভেবে তখন কি হয়েছিল শুধু সেই কথাগুলিই আমায় লিখে দিতে হবে। তা হলেই বুঝ্‌তে পাচ্চ,—এর ভিতর নিশ্চয় কোন ভাল মতলব নেই। পরে যে কি ঘট্‌বে, তা আমি মাষ্টার ডোনাল্ড ম্যাস্কন্‌কে তখনই এক রকম বলে রেখেছিলুম। সেই জন্যেই যা ঘটেছিল তাতে আমার আর আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। গরিবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি লাগে, তখন দেখেও নেবেন।

মাথু ক্লার্কের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলুম। তিনি আমার কথাগুলি যে হুবহু লিখে নিয়েছেন, তা আমায় পড়ে শুনিয়েওচেন,। লেখা ঠিক্ আছে! এর উপরও যদি কেউ কিছু জান্‌তে চান্,—তাহলে উইগটাইনের গোলাবাড়ীর কর্ত্তা মাষ্টার ম্যাক্‌লীনের কাছে গেলে তিনি আমার খবর বলে দিতে পার্‌বেন। তিনি আমায় খুব ভাল রকমই চেনেন। আমি গরিব বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক লোক,—পাপে আমার ভারী ভয়। ক্লুমবারের চাক্‌রি করার জন্যে আমার যে পাপ হয়েছিল, তা আমি পাদরী ম্যাক্‌সনের কাছে স্বীকার করে তার জন্য অনুতাপ করে সে পাপ খণ্ডন করে ফেলেচি। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

সুখ

ওরে সুখ, ওরে সুকুমার,
কচি মুখে ক্ষণিকের খেলা দেয়ালার,
এই কান্না এই হাসি সজল শেফালি রাশি
নিমেষ পরশ ভর সহেনাক যার,
বুকে আলো টলমল শিশির উষার!

ওরে সুখ ওরে অকারণ,
আঁধারে নয়ন মুদি দেবতা বরণ!
খুঁজিয়া কেহ না পায়, নাহি মিলে সাধনায়,
হারালে তখন বুঝি কেমন রতন,
সঙ্গোপন কামচারী, স্বপ্ন সম্মিলন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৭)

সংক্রামক রোগের শুশ্রূষা

রোগীর গৃহের দরজা ও জানালাগুলি সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং প্রত্যেক বায়ু-পথ এক একটী পর্দ্দা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এই পর্দ্দাগুলি কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে * ভিজাইয়া রাখিলে সংক্রামক রোগের বীজ গৃহ হইতে অবাধে বাহিরে আসিবার সুবিধা পায় না এবং বাহির হইতে গৃহের মধ্যে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময়ে রোগীর গৃহে মাছি প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রোগের বীজ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সাধিত হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহের বাহিরে একটা লৌহপাত্রে আগুন রাখিলে সেই স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হয়, রোগীর পথ্য বা জল গরম করিবার প্রয়োজন হইলে সহজেই তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারা যায় এবং যখন রোগীর শ্লেষ্মাদিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দগ্ধ করিবার আবশ্যক হয়, তখন উহা বাটীর অন্যত্র লইয়া না যাইয়া ঐস্থানেই ঐ কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় হস্ত ও পদ যে কোন বিশোধক ঔষধের দ্রাবণ ও সাবানের দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবেন। পরিধেয় বস্ত্র যদি জলে কাচিবার মত হয়, তাহা হইলে কাচিবার পূর্ব্বে কোন পাত্রের মধ্যে উহাকে বিশোধক ঔষধে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান ও উষ্ণ জলে কাচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; এইরূপে ঐ বস্ত্রের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রাদি অধিকক্ষণ রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক সময়ে উহার সংক্রামকতা দূরীভূত হয়। রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি প্রথমতঃ বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে জলে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইলে উহার সংক্রামকতা-দোষ একেবারে বিনষ্ট হয়। অতঃপর ঐ বস্ত্র ধোপার বাটী হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিলে পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্রাদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটীতে পাঠান নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। আমরা সচরাচর রোগীর বস্ত্রাদি তদবস্থায় অথবা শুদ্ধ জলকাচা করিয়া একস্থানে জড় করিয়া রাখি, পরে ধোপা আসিলে উহাদিগকে তাহার হস্তে সমর্পণ করি। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে এরূপ ব্যবস্থায় সমূহ বিপদ

* এক ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্, ৩৯ ভাগ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইলে এই দ্রাবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঘটিবার সম্ভাবনা। সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র কেবল জলে ধৌত করিলে উহার সংক্রামকতা নষ্ট হইয়া যায় না। এরূপ বস্ত্র বাটীর মধ্যে জড় করিয়া রাখিলে উক্ত রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ঐ কাপড় ধোপার বাটী যাইলে অন্য পরিবারের ধৌত বস্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ ধোপারা সচরাচর একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বাস করে এবং তাহার মধ্যেই মলিন ও ধৌত বস্ত্রাদি পাশাপাশি রাখিয়া দেয়। সুতরাং দূষিত মলিন বস্ত্র হইতে ধৌত বস্ত্রে সংক্রামক রোগের বীজ সংলগ্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেক সময়ে হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ বাটীর মধ্যে কোথা হইতে উপস্থিত হইল, স্থির করিতে পারা যায় না। ধোপার বাটীর ফর্সা কাপড়ের সহিত উক্ত রোগের বীজের আমদানি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধোপার বাটী হইতে কাপড় আসিলে ২।৩ ঘণ্টার জন্য উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া পরে ঘরের ভিতর তুলিলে এই দোষ অনেকাংশে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ ধোপার বাটীর কাপড় একবার জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করেন; ইহা দ্বারা কাপড়ের সংক্রামকতা দোষ কাটিয়া যায়।

সংক্রামতা-দুষ্ট কাপড় বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে তাহার পরিজনবর্গের মধ্যেও ঐ রোগের আবির্ভাব হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ইহা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য রোগীর কাপড় ও শয্যাদি পূর্ব্বাহ্নে জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া ধোপার বাটীতে পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হস্পিটালে রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি অত্যুষ্ণ জলের ভাপ্‌রায় অথবা অত্যন্ত গরম বাতাসের দ্বারা বিশুদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহস্থের বাটীতে একটা বড় পাত্রে বস্ত্রাদি জলে অধিকক্ষণ ফুটাইয়া লইলেই শোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রোগীর গৃহ হইতে যে কোন বাসন বাহির করা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিশোধক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। রোগী যে পাত্রে মল, মূত্র বা কফ পরিত্যাগ করিবে, গৃহের মধ্যেই উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া, যতশীঘ্র সম্ভব, উহাকে স্থানান্তরিত করিবে।

যখন রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, তখন তাহাকে কার্ব্বলিক্ সাবান দ্বারা উষ্ণ জলে স্নান এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া বাটীর অন্যত্র গমন করিতে বা অন্যলোকের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত। রোগ-ভেদে উহার সংক্রামকতা-দোষ অল্প বা অধিক দিন রোগীর শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যদি উক্ত রোগী সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে আইসে, তাহা হইলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে রোগীকে কাহারও সহিত মিশিতে না দিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিলে রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা সবিশেষ কমিয়া যায়। অধিকাংশ রোগেরই সংক্রামতা-দোষ প্রায় তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে।

রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, যাঁহাদের

অবস্থা ভাল, তাঁহারা তাহার বস্ত্র ও শয্যাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গদি, লেপ, বালিশ প্রভৃতি বিছানা বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়ে রোগীর শয্যা ব্যবহার করিয়া উপর্য্যুপরি অনেক লোকের হাম, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীর জন্য গদি ব্যবহৃত হইলে একখানি বড় অয়েল্ ক্লথ্ দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক মুড়িয়া দিলে গদির উপর রোগীর মলমূত্র পতিত হইতে পারে না। সুতরাং গদি এইরূপে রক্ষা করিয়া তোষক বালিশ ইত্যাদি অন্যান্য বিছানা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। রোগীর জন্য অল্প ব্যয়ে যদি আমরা এক প্রস্থ বিছানা প্রস্তুত করাইয়া দিই, তাহা হইলে রোগ-মুক্তির পর উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না।

সামান্য অবস্থার লোকে রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের পক্ষে ঐ সকল সামগ্রী ও অন্যান্য গৃহসজ্জা একটা রুদ্ধ গৃহের মধ্যে রাখিয়া ক্লোরিণ্ (Chlorine) গ্যাস্ সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। একটা চীনামাটী বা এনামেলের পাত্রে অধিক পরিমাণ ব্লীচিং পাউডার্ (Bleaching powder) নামক বিশোধক ঔষধের গুঁড়া রাখিয়া তাহার উপর জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric acid) ঢালিয়া দিলে ক্লোরিণ গ্যাস্ উৎপন্ন হইবে এবং উক্ত গৃহের সমস্ত বায়ুপথ কয়েক ঘণ্টা কাল রুদ্ধ করিয়া রাখিলে শয্যা ও বস্ত্রাদিসংলগ্ন রোগের বীজ ক্লোরিণ্ গ্যাস্ সাহায্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে গৃহে রোগী অবস্থান করে, আরোগ্যের পর সেই গৃহের মধ্যেই এই ব্যবস্থা করিলে গৃহ ও গৃহসজ্জা সমস্তই রোগের বীজমুক্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর কয়েক দিন ঐ সকল সামগ্রী প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিলে সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বাতাসের সাহায্যে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে ও পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

সচরাচর গন্ধকের ধূম দ্বারা রোগীর গৃহ বিশোধিত হইয়া থাকে। রোগীর গৃহে খাট, বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতি কাঠের বা লোহের যে সমস্ত সামগ্রী থাকে, তাহাদিগকে এবং ঘরের দরজা, জানালা ও দেওয়াল সমূহ প্রথমতঃ কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঘর রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক পরিমাণ গন্ধক কয়েক ঘণ্টাকাল জ্বালাইলে ঘরের মধ্যে যে কোন স্থানে রোগের বীজ সংলগ্ন থাকিবে, তাহা গন্ধকের ধূম দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অবশেষে ঘরের দেওয়ালের চুণ কিয়দংশ চাঁচিয়া লইয়া উহাতে পুনরায় চুণ ফিরাইয়া দিলে উক্ত গৃহ পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। গৃহের মেঝে ও ছাদের তলদেশও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত করিতে হইবে।

শাল প্রভৃতি পশমী দামী কাপড় যদি রোগীর সংস্পর্শে আইসে বা রোগীর ঘরের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপরি-উক্ত উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে গেলে কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতার কাপড়কে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সহজেই বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়। পশমী ও রেশমী কাপড় বিশুদ্ধ

করিতে হইলে পূর্ব্বে যে যন্ত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট করা উচিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এইরূপ একটী যন্ত্র ইটিলিতে (Entally) স্থাপন করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর অনুমতি লইয়া সাধারণ লোকেও সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র ও শয্যাদি বিশুদ্ধ করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

টীকা লওয়া (Inoculation, Vaccination)—কোন কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে পুনরায় হইতে দেখা যায় না। যাহার একবার বসন্তরোগ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বার বার বসন্ত-রোগীর সংস্পর্শে আসিলেও প্রায় পুনরায় উক্তরোগে আক্রান্ত হয় না। ইহা দ্বারা চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, সংক্রামক রোগ হইলে রক্তের এমন কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় অথবা উক্ত রোগের বীজ হইতে এমন কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া দেহ-মধ্যে অবস্থিত থাকে, যাহা, ঐ ব্যক্তির শরীরে উক্ত রোগের বীজ পুনঃ প্রবিষ্ট হইলে, তাহার ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহা যে শুদ্ধ বসন্ত রোগেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। সংক্রামক রোগ মাত্রেই দেহমধ্যে এইরূপ একটী বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা দেহকে ঐ রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। তবে বসন্তের ন্যায় অন্য সংক্রামক রোগে এই বিষঘ্ন পদার্থের শক্তি সেরূপ প্রবল বা বহুদিন স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যেই উহা হীনশক্তি হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিলে উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। হাম, পানবসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সচরাচর একবারের অধিক হইতে দেখা যায় না, তবে কখন কখন দুই, এমন কি তিনবার পর্য্যন্ত, হাম হইতে দেখা গিয়াছে। বসন্ত যে কখন পুনরায় হয় না, এরূপ নহে। লোকে বসন্ত-রোগে দুইবার আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল এবং ঘটিলেও প্রায় প্রাণহানি হয় না। কলেরা প্রভৃতি রোগেও এই নিবারণী-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহাকে অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অল্প বা অধিক দিন ঐ রোগে পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া প্রায় সকল প্রকার সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার জন্য অধুনা "টীকা" দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে বীজ দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, (১) উহা অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় বা মৃতাবস্থায়, অথবা (২) উহাকে অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া উহার পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, কিম্বা (৩) উহা হইতে উৎপন্ন রস বিশেষ (Antitoxin) মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করাইলে ঐ রোগের 'টীকা' দেওয়া হয়। একটী সূচল পিচকারী দ্বারা অথবা চর্ম্মের উপরি ভাগের ছাল তুলিয়া তদুপরি লাগাইয়া উক্ত পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে উক্ত রোগ অতি মৃদুভাবে শরীরে প্রকাশ পাইয়া এমন একটী বিষঘ্ন পদার্থ দেহের মধ্যে উৎপাদন করে

এবং তাহাতে শরীরের এমন একটী সহগুণ জন্মায় যে, উক্ত রোগের বীজ অধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না, এমন কি, অনেক সময়ে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলে কসৌলি নামক স্থানে যে টীকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বসন্ত-নিবারণের জন্য যে মনুষ্য-বীজের টীকা লওয়া হইত, তাহাতে রোগীর গুটী হইতে রোগের বীজ সংগ্রহ করিয়া অতি সূক্ষ্মমাত্রায় সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করান হইত। ইহা দ্বারা তাহার শরীরে অতি মৃদুভাবে বসন্ত রোগ প্রকাশ পাইত এবং তদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত যে তাহার পুনরায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বসন্তের টীকা লওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে; এইরূপ টীকা লইয়া অনেক সময়ে সাংঘাতিক বসন্ত রোগ হইতে দেখা গিয়াছে এবং উহা বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া কতলোকের জীবন নাশের কারণ হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা বসন্ত-রোগ নিবারণের জন্য গো-বসন্তের (Cow pox) টীকা লইয়া থাকি। মনুষ্যের বসন্ত গরুর শরীরে প্রবেশ করিলে বীজের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে উহা গো জাতির কোন অনিষ্ট সাধন করে না, অথচ গো-দেহ হইতে মনুষ্য শরীরে ঐ বীজ পুনঃপ্রবেশ করাইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে এক প্রকার অব্যাহতি লাভ বলিতে পারা যায়। বিখ্যাত ডাক্তার স্যর উইলিয়ম্ জেনার্ প্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তদবধি এই টীকা বসন্ত প্রতিষেধের জন্য ব্যবহৃত হইয়া অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষার কারণ হইয়াছে এবং পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে বসন্ত রোগ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গো-বীজের টীকাকে ইংরাজিতে Vaccination কহে। শৈশবে একবার এবং ৭ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে আর একবার গো-বীজের টীকা লইলে বসন্ত রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারা যায়। তবে বসন্তরোগ মহামারী রূপে আবির্ভূত হইলে অথবা বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে সকলেরই সেই সময়ে একবার টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। যিনি বসন্তরোগীর সেবা করিবেন, তিনি যেন টীকা নূতন করিয়া লইয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন, নতুবা ঐ রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেও হইতে পারেন। বহুদিনের টীকার উপর এইরূপ অবস্থায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। বসন্ত রোগের ন্যায় প্লেগ্, কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্যও টীকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যদিও এই সকল রোগের টীকার রোগ-নিবারণী শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি যাহাদিগকে সর্ব্বদা এই সকল রোগের সংস্পর্শে আসিতে হয়, যাহাদিগকে এই সকল রোগীর সেবা করিতে হয়, তাহারা টীকা হইলে, বেশী দিন না হউক, অন্ততঃ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় রোগের সংস্পর্শে থাকিয়াও রোগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে টীকা

লওয়া সাতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য; ইহাদ্বারা তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং রোগের বিস্তারও বিশেষভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে টীকা লইলে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, অথবা রোগ হইলেও উহা প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না এবং কদাচ প্রাণ হানি হইয়া থাকে। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগ মহামারী রূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সকলেরই টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগ পল্লীর মধ্যে বিস্তারলাভ করিতে পারে না, অল্পদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

ডিপথিরিয়া, টিটেনাস্ প্রভৃতি রোগে যে টীকা দেওয়া হয়, তাহা রোগ আরোগ্য হইবার জন্য, নিবারণের জন্য নহে। ডিপ্থিরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পর এই টীকা দেওয়া হয় এবং ইহার গুণে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ কমিয়া যায়। পূর্ব্বে ডিপ্থিরিয়া রোগে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, টীকা দেওয়া প্রচলিত হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা সবিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিশোধক ঔষধের তালিকা—সমস্ত বিশোধক ঔষধই বিষাক্ত পদার্থ; অতএব অতি সাবধানে ইহাদিগের ব্যবহার করা উচিত এবং যাহাতে বালকবালিকা বা অপর অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উহাতে হাত দিতে না পারে, তজ্জন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা আলমারির ভিতর চাবিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

করোসিভ্ সাব্লিমেট্ বা পার্ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Perchloride of Mercury) ১ ভাগ ১০০০ ভাগ জল

চিনসল্ (Chinosol)	”	১২০০	”
ফর্ম্মালিন্ (Formalin)	”	৪০	”
কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid)	”	২০ উষ্ণ	”
লাইসল্ (Lysol)	”	২৫	”
ব্লীচিং পাউডার্ বা ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ (Chloride of lime)	”	১০০	”
আইজল্ (Izal)	”	১০০	”
পোট্যাসিয়ম্ পার্ম্যাঙ্গানেট্	”	২০	”
ফেনাইল্ (Phenyle)	”	২০	”
সিলিন্ (Cyllin)	”	২০	”
ক্রীওলিন্ (Creolin)	”	২	”

এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে সাবান দিয়া কাপড় কাচিলে সাবানের মধ্যে যে ক্ষার-পদার্থ থাকে, তদ্দ্বারা সংক্রামক রোগের বীজ অনেক পরিমাণে ধ্বংস হইয়া যায়।

রোগীর গৃহ বীজশূন্য করিতে হইলে কতকগুলি বিশোধক ঔষধের ধূম তন্মধ্যে প্রয়োগ করা উচিত। যে প্রণালী মতে উহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

গন্ধক।—যে ঘরে ১০০০ কিউবিক্ (১০×১০×১০) ফিট্ স্থান থাকে, তাহার জন্য দেড়সের গন্ধক পোড়াইবার প্রয়োজন হয়। গৃহটীর দরজা, জানালা এবং যেখানে যে ছিদ্র আছে তাহা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া গন্ধক তন্মধ্যে পোড়াইতে হইবে।

ক্লোরিণ্ (Chlorine)—এই গ্যাসের বিশোধক গুণ, গন্ধকের ধূম অপেক্ষা অধিকতর

প্রবল। ১ ভাগ ব্লীচিং পাউডার্ (Chloride of lime) ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া চুণ ফিরাইবার মত ঘরের দেওয়ালের সর্ব্বত্র লাগাইয়া দিলে বায়ু-সাহায্যে উহা হইতে ক্লোরিণ্ গ্যাস্ অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া গৃহস্থিত রোগের বীজ নষ্ট করে। ক্লোরিণ্ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে বেশী পরিমাণ ব্লীচিং পাউডার্ রুদ্ধ গৃহমধ্যে এনামেলের পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ ঢালিয়া দিলেই ক্লোরিণ্ গ্যাস্ উদ্গত হইবে। ক্লোরিণ্ দ্বারা সুতার কাপড়ের কোন অনিষ্ট হয় না, তবে গরম কাপড় বা রেশমের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ফর্ম্মাল্ডিহাইড্ (Formaldehyde) —ফর্ম্মালিন্ নামক বিশোধক ঔষধের চাক্তি (Tablets) বিক্রীত হইয়া থাকে। এই চাক্তিগুলি পাত্র বিশেষে রাখিয়া অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই উহা হইতে ফর্ম্মাল্ডিহাইড্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইবে এবং উহা দ্বারা গৃহের ও গৃহসজ্জার সংক্রামকতা-দোষ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পার্ম্মাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ গুঁড়া করিয়া তদুপরি ফর্ম্মালিন্ ঢালিয়া দিলেও এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। ফর্ম্মালিন্ একটী উৎকৃষ্ট বিশোধক ঔষধ; ইহার ব্যবহারে কাপড় নষ্ট হয় না অথচ রোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়।

ঘরে চুন ফিরাইয়া দিলে সংক্রামকতা-দোষ অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

কাশ-আন্দোলনে

(Arthur Symons)

কাশের চামর কাঁপে ওঠে দীর্ঘশ্বাস—
ধূসর সরসী আর শ্যাম তট হতে,
দীর্ঘ তৃণ আন্দোলিয়া সমুদ্র বাতাস
তুলিছে হুতাশ শৈলে দূর সিন্ধু পথে!

কাশের চামরে কাঁপে বিলাপ বেদনা
অনেক দিবস বাহি, বহু রাত্রি ধরে;
মরাল মানস-গামী চলেছে উন্মনা
নীলকণ্ঠ আর্ত্ত গাহি ওঠে আর পড়ে!

কাশের চামর দোলে বিহ্বল ব্যথায়
কত রাত্রি কত দীর্ঘ আকুল দিবসে,
জরা ভুলে গেছি মৃত্যু মনে নাহি হায়,
যৌবন প্রেমের ক্ষয় মনে নাহি পশে!

কাশের চামর শ্বসি' ওঠে বার বার,
তপ্ত মধ্য দিনে আর স্নিগ্ধ গোধূলিতে,
সে কোন বিস্মৃত স্বপ্ন আজিকে আবার
জাগিয়া ব্যাকুল হৃদে কি চাহে বলিতে!

কাশের চামর কহে শ্রান্ত মরমরে,
হায় ব্যর্থ জীবনের বিফল স্বপন,
লুপ্ত শান্তি, স্মৃতি যার পড়েছিল ঝরে
এ বুকে ফিরিতে সেকি করেছি রোদন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।



চিঠি

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে



ঠিক দুপুরের আরাম

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

(৩৮)

মানব অন্তঃকরণের নিভৃত কন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মানসলিপিপাঠ চেষ্টার মত এ সংসারে বোধ হয় অপর কোন কঠিন চেষ্টাই নাই। কি গভীর রহস্যে, কি জটিলতায় পূর্ণ করিয়া বিধাতা এই মানব-চিত্তকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়! যে মানবচিত্ত আত্মচৈতন্যের অবস্থিতি, গৌরবে উজ্জ্বল আনন্দময় ও মহৎ তাহাই নিজের কৃত জটিল পাপান্ধকারে ঘৃণ্য বীভৎস কুৎসিত। এ জগতে সমুদ্রের বিশালতায় আমরা বিস্মিত হই অনন্ত আকাশের বিশালতর মূর্ত্তি আমাদের চিত্তকে স্তম্ভিত করে কিন্তু এই অসীম মানবচিত্তের বিশালতম পরিচয় আমাদের সমস্ত হৃদয়কে এককালে অভিভূত করিয়া দেয়। একটি ক্ষুদ্র হৃদয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা যদি কেহ কাব্য লিখিতে বসেন তবে নিঃসন্দেহ সে কাব্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যকেও পরাভব করিতে সমর্থ হইবে। কেন না মানবচিত্তে যাহা নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শচীকান্ত জীবিত দেহে প্রাণহীনবৎ বহুক্ষণ সেই বেঞ্চের উপরেই বসিয়া রহিল। যে পবিত্র নাম সে সারাজীবনে অবলম্বন করিয়াছিল করালীচরণের মুখে তাহা অকস্মাৎ উচ্চারিত হইবার পর হইতেই সে যেন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানুষের অবস্থা বিশেষে বিষ অমৃত ও অমৃত বিষে পরিণত হইয়া যায়। ট্রেন আসিল, মহাকায় দৈত্যের ন্যায় সে নিজের বিরাট উদরগহ্বরে কতকগুলা লোকজনকে ভরিয়া গর্জ্জনশব্দে বিদায় লইল, সন্ধ্যা ও শুক্রতারা তাহারই কুক্ষিতলে বিলীন হইয়া গেল, তথাপি শচীকান্তের সর্ব্বশরীরের কম্পন থামিল না। একটা যে প্রবল ঝটিকা ভিতর হইতে দুর্ব্বল দেবদারুর মত তাহাকে সঘনে কাঁপাইতেছিল তাহা তাহার বিবেক ও স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ। প্রথম মুহূর্ত্তে সে মনে করিল "এখনই শিবনারায়ণকে গিয়া খবর দিই, তিনি ইহাদের হস্ত হইতে মনীশের বাগ্‌দত্তাকে মুক্ত করিয়া লউন। বুঝিলাম এব্যক্তি অতি নীচ ইহার অভিপ্রায় ভাল নয়, অর্থের জন্য এ সব করিতে পারে!" কিন্তু এ চিন্তা তাহার চিত্তে স্থায়ী হইল না, প্রথমকার এ মহত্বকে চাপা দিয়া ভিতর হইতে স্বার্থ হাঁকিয়া উঠিল "রহ, রহ এত ব্যস্ত কেন? ভাবিয়া দেখা যাক্—সত্যসত্যই ইহা আবশ্যকীয় কি না! এইখানেই দেবদানবে, যমদূতে বিষ্ণুদূতে সমর বাধিল। বিবেক বলিল "ভাবিবে আবার কি? কর্ত্তব্য পালনে বিলম্ব অবিধেয়"। স্বার্থ আবার ঘোর রবে আপত্তি তুলিল "কর্ত্তব্যই তো করিতে চাই, কমলা মনীশের বাগদত্তা কিসের, তাহার যথার্থ অভিভাবক বহুপূর্ব্বে তাহাকে আমায় দিয়াছিলেন, তাহার উপর মনীশের কিসের অধিকার?"

বিবেক এ যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টায় অনেক শরক্ষেপ করিল কিন্তু এ অভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল না, সপ্তরথীতে সেখানে প্রবেশপথ

আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছিল। বিবেকের শাসন মন মানিতে রাজি হয় না, সে প্রবলস্বরে কেবলই বলে 'কেন আমি এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিব? কেন আমি নিজের ধর্ম্মরক্ষা করিব না? আমি তো চেষ্টা করি নাই, যদি'...

এইখানেই একটা খটকা বাধিয়া যায়!...কি বলিবে—যদি ঈশ্বর সুযোগ দিয়াছেন? ঈশ্বর কে? সেতো তাঁহাকে কখনও চিনে নাই ডাকে নাই, আছেন কি না তাহাতেও সংশয় করিয়া আসিয়াছে, তবে এ কি দৈব? অদৃষ্ট? কে তাহাকে আজ এ সুযোগ দান করিল? আচ্ছা সে যেই হউক না কেন তাহাতে কি! কেন সে তাহার দান গ্রহণ করিবে না?

সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হইয়াছিল, রাত্রি গভীরতর হইতে লাগিল। বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া ডেলি-পেসেঞ্জার গুলা আফিসের বাবুদের গৃহে ফিরাইয়া দিয়া গেল। ষ্টেশন ক্রমেই জনশূন্য হইতে হইতে শেষকালে একটা সময়ে একেবারে নিঃসাড়া হইয়া আসিল। বাহিরের গাছের মধ্যে তীব্র স্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে লাগিল। কোয়াসার একখানা পাতলা ওড়না নৈশ প্রকৃতির অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, তাহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষীণ নক্ষত্রালোক সূক্ষ্ম বসনান্তরালে সুন্দরীর অঙ্গলাবণ্যবৎ অর্দ্ধ বিকসিত হইয়া উঠিতেছিল। কেবল গাছপালার অসংখ্য জোনাকীর ঝিকমিকানি যেন তাহারি নিশ্বাস প্রশ্বাসভরে কম্পিত হীরক দুলের মত থাকিয়া থাকিয়া ঝকিয়া উঠিতে লাগিল। সেই প্রবল শীত হিম নিদ্রালস্য উপেক্ষা করিয়া শচীকান্ত তেমনই নিস্তব্ধ বসিয়া রহিল, এবং তাহার মনের মধ্যে তেমনই ভীষণ বেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রবল আক্রমণের বেগে থাকিয়া থাকিয়া মাথার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজিয়া উঠিতেছিল, ধমনী মধ্যস্থ শোণিতে উন্মত্ত তরঙ্গ ছুটিয়া ফিরিতেছিল!

ষ্টেশনের মধ্যে লোকজন অল্পই ছিল, কুলী দুইটা একটা চট মোড়া মাল ঠেলিয়া আনিয়া তাহার গায়ে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিল। আলো গুলা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে কেবল একটি মাত্র ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল, ভোর পর্য্যন্ত আর কোন গাড়ি আসিবার কথা নাই।

শচীকান্ত ভাবিতে ভাবিতে একবার আলোটার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হঠাৎ যেন মনে হইল সেই আলোকে কেহ তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা উলটিয়া দেখিতেছে। সে আলোকের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিল। কিন্তু হায় সেই অদৃশ্য দর্শকের অন্তর্বিদ্ধকারী দৃষ্টি হইতে সে নিজেকে লুকাইতে পারিল কই! এদিকের মৃদু অন্ধকারে তাঁহারই দুই নেত্র অনলউদ্গারণ করিয়া যুক্ততারকার আকারে চোখের উপর দুই ভর্ৎসনা দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। শচীকান্ত শিহরিয়া দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া বেঞ্চের পিঠে মাথা রাখিল। সে দৃষ্টি যেন তাহার পিতার অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নেত্র যুগল স্মরণ করাইয়া দেয়! সে আবার মনে মনে বলিল,—যেন সেই দৃষ্টির উদ্দেশে নিজেকে সাফাই করিতে গিয়া বলিল, আমার দোষ কি? আমিতো পাপ করিতেছি না, কাহারও কোন ক্ষতি করিতেও ইচ্ছুক নই তবে এত সঙ্কোচই বা কিসের?

কিন্তু সঙ্কোচ নাই বলিলেও তো সঙ্কোচ যায় না, দোষ নয় ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও যে অপরাধের ভারে সারা প্রাণ ভারী হইয়া উঠিতেছে। মাথার ভিতরে আগুন জ্বলিতে লাগিল, পাপ নয়, দোষ নয় তবে কেন এ আগুন! তবে কেন এ হত্যাকারীর আতঙ্ক! চোরের মত যন্ত্রণাপূর্ণ সঙ্কোচ! ইহা কি কি তবে?

ধীরেধীরে সে উঠিয়া বলিল, চারিদিকে চাহিয়া ললাটের কেশগুচ্ছ অপসৃত করিল। কোয়াসার আক্রমণে নক্ষত্র দুইটি ঢাকা পড়িয়াছে তথাপি সেই দিকে চক্ষু যাইতেই আবার তাহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। সেই অদৃশ্য তারকাদ্বয় যেন সেইখানে অগ্নিময় অক্ষরে তাহার পিতার হস্ত লিপির অনুকরণে লিখিয়া রাখিয়াছিল "বিশ্বাস ঘাতকতা! বন্ধুদ্রোহ।"

জলন্ত গোলা যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা অকস্মাৎ বিদ্ধ করিয়া তাহার মুখ হইতে আচমকা অস্ফুট কাতরোক্তি বাহির করিয়া লইল! "ওঃ না, না, না।"

সে সেই মুহূর্ত্তে যেন তাহার সম্মুখে অতি নিকটে তাঁহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল, সেই প্রসন্ন মুখ অথচ তেমনই হৃদয়ভেদী দৃষ্টি, তিনি যেন তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, শুধু একটু খানি হাসি—কিন্তু ইহাতেই তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। যেন স্পষ্ট কানের কাছে তাঁহারই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল, "ইহা বিশ্বাসঘাতকতা, মিত্রদ্রোহ ইহাই।" হায় হায়, তবে তাহাকে কি এখনই চাকদায় যাইতে হইবে? মনীশের খুল্লতাতের নিকট করালীচরণের অসদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুর ঋণ শোধ করিতে হইবে! লোকে তাহাকে বন্ধুবৎসল বলিবে কিন্তু তাহার নিজের ইহাতে কি লাভ কি উপকার! দুই বৎসরাধিক সে যাহার অনুসন্ধানে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, যাহার জন্য সংসারের কোন লাভের দিকে চাহিয়া দেখে নাই, বরং করায়ত্ত লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া এই দারিদ্র গ্রহণেও দ্বিধা করে নাই সেই চির ঈপ্সিতকে সে কিসের মূল্যে ত্যাগ করে! বন্ধুত্ব। কর্ত্তব্য। সংসারে ইহাদের স্থানও অল্প নয়। নিজের হৃদয়ের মধ্যে যত আর্ত্তনাদ উঠুক, তাহা চাপা দিয়া জগতের চক্ষে যশলাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইবে। বেশ তাহাই করিব, প্রথম গাড়িতেই আমি চাকদা যাইব। এতক্ষণে যেন মস্তিকের পীড়ন বক্ষের অস্থিরতা কতকটা সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিল। ফুটন্ত শোণিততরঙ্গ উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গ করিয়া শান্তগতি ধরিয়া নিজপথে বহিতে আরম্ভ করিল। এত শীতেও আভ্যন্তরিকতাপে ললাট তলে দুএক বিন্দু ঘর্ম্ম্য জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সে দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিল, ললাটের স্ফীত শিরা অল্পে অল্পে স্থির হইয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ শচীকান্ত যেন একটা বিস্মৃত স্মৃতির উদ্রেকে আশান্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি কি একাই তার বন্ধু! সে তো কই বন্ধু বলিয়া আমার কথা মনে করা আবশ্যক বোধ করে নাই? এত বড় সন্দেহজনক অবস্থায় নাকি কেহ সত্য পরিচয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে? মনীশ নিশ্চয় বুঝিয়াছিল এ কমলা তাহারই

সেই হারাণো কমলা! তবে? সেকি তাহার মুখ চাহিয়াছিল? কেন তবে শচীকান্তই নিজের এই সর্ব্বনাশ করিবে? না ইহা কর্ত্তব্য নয়, সে ভুল বুঝিয়াছিল, সে কিছুই প্রকাশ করিবে না, করালীচরণ যে ইঙ্গিত দিয়া গেল সেই মতই কাজ করিয়া যাহার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে তাহাকে লাভে ধন্য হইবে। কেন সে তাহার একমাত্র সুখের আলোক নিজের অন্ধকার চিত্তে জ্বালাইতে এত দ্বিধা করিতেছে? কোন সঙ্কোচের কারণ বর্ত্তমান নাই, সে-ই বরং তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিল!

এতক্ষণে আসন ছাড়িয়া সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন কোয়াসার সূক্ষ্ম আস্তরণ পুরু হইয়া সুপ্ত জগতের অঙ্গে শীত বস্ত্র বিছাইয়া রাখিয়াছে, আকাশের একটি তারাও দেখা যাইতেছে না। সে মুক্তির নিশ্বাস লইয়া পুনশ্চ নিজের মনকে বল দিবার জন্য, উৎসাহিত করিবার জন্য কহিল,—এই আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন প্রথমে না করিয়া অপরের কথা কেন পূর্ব্বেই ভাবিতেছি!

কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবকেও সে যেন বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না, সেই নৈশ অন্ধকারে চন্দ্রহীন তারাহীন হিমবসনাবৃতা বিধবা নিশীথিনী যেন তাঁহার শীতল অঙ্গুলী তুলিয়া অলঙ্ঘ্য আদেশস্বরে শব্দহীন গম্ভীর ভাষায় উচ্চারণ করিলেন "ব্রহ্মহামুচ্যতে লোকে মিত্রদোহি ন মুচ্যতে!" মহাশূন্যে সেই শাস্ত্রশাসন গম্ভীর ধ্বনিতে শব্দায়মান হইয়া রহিল, দশদিকে সেই নীতিবাক্য শ্রুতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল, শব্দহীনা যামিনীর তৃতীয় প্রহরে, স্তব্ধতার প্রতিকেন্দ্রে সেই ভীষণ বাণী যেন কোন অশরীরি মহাপ্রাণীর অখণ্ডনীয় অভিসম্পাতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া একমাত্র শ্রোতার প্রতি শিরা উপশিরার ভিতরে তুষার শীতলতা সঞ্চালিত করিয়া দিল। বেঞ্চের পিঠে মাথা রাখিয়া ক্রমশ শচীকান্ত ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কয় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সর্ব্ব যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল।

যখন সে জাগিয়া উঠিল, শীতে তাহার সর্ব্ব শরীর জমিয়া আসিয়াছে, খোলা স্থানের ভোরের হাওয়া ছুরীর মত হাড়ের মধ্যে গিয়া বিঁধিতেছিল। প্লাটফরমের একটি মাত্র দেওয়াল-ল্যাম্প অতি ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল, চারিদিকে তখনও একটা অস্পষ্ট অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তৃত, নিস্তব্ধতার মধ্যে কোয়াসাদীর্ণ শিশিরবিন্দু বৃষ্টির মত গাছের পাতা হইতে ঝরিয়া পড়ার টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ যেন কোন শোকার্ত্তা নারীর অশ্রুপাতের ন্যায় নব জাগরিত বায়ু শব্দের সহিত শ্রুত হইতেছিল। ষ্টেশনের মধ্যে আফিস ঘরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে আলো জ্বলিতেছে, বদ্ধ শাসির মধ্য দিয়া সে আলো কাঁকরফেলা পথের উপর পড়িয়া দুঃখীর দীর্ণ পঞ্জরের মত দেখাইতেছিল। দুএকটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়া প্লাট ফরমে প্রবেশ করিল। একটা কুলী জোরে জোরে ঘড়িতে ঘা দিয়া পাঁচটা বাজাইয়া গেল, কোথা হইতে একটা কলের আহ্বান-বাঁশী ঊর্দ্ধ স্বরে বিশ্রামশয়ান কর্ম্মীদলের জাগরণ গীতি গাহিল। শচীকান্ত চোখ রগড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—সে এখানে কেন?

একটা লোক অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল সে আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না কাছে আসিয়া ডাকিল "বাবু!"

শচীকান্ত অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল, এ পৃথিবীতে যে, সে ভিন্ন অপর কোন মানব বাস করিতেছে কাল হইতে সে একথা বিস্মৃত হইয়াছিল। "আপনি সন্ধ্যে থেকে বসে আছেন কোথায় যাবেন!" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ কহিল "এখনি একটা গাড়ি আসবে যান তো তৈরি হয়ে নেন্।"

শচীকান্ত এতক্ষণে কথা কহিল, প্রথমটা নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই যেন বিস্ময় বোধ করিল,—এ যেন আর কাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বর! "কোন দিকের গাড়ি?" "রাণাঘাটের দিকের"। পদতল হইতে মস্তক অবধি সঘনে কাঁপিয়া উঠিল, "রাণাঘাটের দিকের গাড়ি, তা আমার কি?"

আপনি তাহলে কোনদিকে যাবেন?"

"আমি, আমি কোনদিকে যাবো!"

কুলী অবাক্ হইয়া বাবুর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মনে মনে বলিল "বাউরা!"

ঘণ্টা বাজিল, টিকিট ঘরের সম্মুখে কয়েকটা লোক টিকিট কিনিতেছে, শচীকান্ত কলের পুতুলের মত সেইখানে গিয়া হাত পাতিল, মণিব্যাগ খুলিয়া কোন্ সময় যে টাকাটা বাহির করিয়া ছিল কিছুমাত্র স্মরণ হয় না। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিটমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার টিকিট!" শচীকান্তের বক্ষে আবার শোণিত তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ নিঃসাড়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল "চাকদা"।

"কোথা বল্লেন? চাঁদপাড়া"?

"হ্যাঁ, না চাঁদপাড়া নয়।"

"তবে!"

"চাকদা"।

"ওঃ চাকদা এই নেন্।"

সে তেমনি কলের পুতুলের মতই পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, একবার মনে হইল টিকিট খানা হাত হইতে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পারিল না, সেখানা যেন মন্ত্রবলে হাত আঁটিয়া ধরিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কোয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া ঊষালোক জগতে নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিল; ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পথ ঘাট গাছের তলা ভিজাইয়া দিল! অকস্মাৎ শিহরিয়া শচীকান্ত দেখিল দুইটা জ্বলন্ত রক্তনেত্র বিস্তৃত করিয়া একটা বিরাটকায় দানব তাহারি দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, সে আতঙ্কে পিছু হটিয়া গিয়া, দেওয়ালে পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। দৈত্যটা সহসা একখানা ট্রেনের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নম্র মূর্ত্তিতে প্ল্যাট ফরমে প্রবেশ করিতেছিল, অসুর মূর্ত্তির চেয়েও এ ভয়ানক।

৩৯

সোনার রংয়ের পাকাধানে ক্ষেতগুলি ঝল্‌মল করিতেছে। তাহার এক ধার দিয়া শীতের নদী বহিয়া চলিয়াছে। আকাশের অঙ্গে বিবিধ আকারে মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে প্রখর রৌদ্র কিছু পূর্ব্বে তাহাদের অঙ্গে শোণিত ফুটাইয়া তুলিয়াছিল এখন সে রৌদ্রতাপ নাই, কিন্তু এখনও সূর্য্যদেব জলতলে লোহিত রাগে ভক্ত হৃদয়ধারা ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 'জবাকুসুম সঙ্কাশ' যেন জবার

মালা দিয়া জলশায়ী অনন্তের পূজা সমাধা করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, রাশি রাশি খড়ের আঁটি বাঁধিয়া স্তূপাকারে একপ্রান্তে রক্ষিত হইয়াছে, বলদ গাড়িতে কৃষক-পরিবার শস্য বোঝাই দিতে ব্যস্ত। হিম-সঙ্কুচিত বনবিহঙ্গ পক্ষ বিস্তৃত করিয়া দূর পরপার হইতে নীড় লক্ষ্যে ফিরিতেছিল। ক্বচিৎ দু-একটা পক্ষী স্থির বাতাসে পক্ষ ঢালিয়া ইচ্ছাসুখে কোন্ দিগন্তের শেষে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

মনীশ এই শান্ত সন্ধ্যায় মাঠের আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া বট অশ্বত্থের ছায়ানিবিড় তরুপথে ঘাটের কাছ অবধি আসিয়া পড়িল। গ্রাম্য নারীগণ তখন যে যাহার কলস ভরিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। কৃষাণ তখন শ্রমসাঙ্গ করিয়া কাস্তে হাতে রামপ্রসাদী এক তালায় "মন রে কৃষি কাজ জানো না" গাহিয়া ঘরের পানে চলিয়াছে, আকাশের কোলছাড়া পাখীগুলি বহুবিস্তৃতশাখ, প্রাসাদ তুল্য মহাবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে করিতে দিবসের শেষ আলাপ সাঙ্গ করিতেছিল। ভ্রমণক্লান্ত মনীশ একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। এবার এখানে আসিয়া মনীশ আবার তাহার আরব্ধ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীপতি বাবু দরিদ্র সন্তানগণের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া এতদিন যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন সেখানে সে বৃথা ক্ষমতা ব্যয় করিতে যায় নাই। পায়রাডাঙ্গায় এইরূপ একটি দরিদ্র পাঠশালা স্থাপনার্থে সে সেইখানে প্রতিদিন আসা যাওয়া করিতেছিল। অপরাহ্ণে কর্ম্মপরায়ণ চাষাদের মাঝখানে তাহার উদয় যেন জ্যোতিষ্মান্ মঙ্গল গ্রহের অভ্যুদয় পরিকল্পিত হইত। সাগ্রহে মুখ শ্রমজীবীগণ দাদা ঠাকুরের মুখের অমৃতবাণী বিদেশী শ্রমজীবীগণের বিস্ময়কর ত্যাগশীলতা, স্বদেশপ্রেম স্বজাতি-প্রীতি, ধর্ম্মপ্রাণতা শ্রবণ করিত। গৌরবে তখন তাহাদের জ্যোতিঃ-হীন নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, বৃক্ষতলে সুষুপ্ত মানবাত্মা জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের বাহ্যিক ব্যবধান দূর করিয়া দিত, কেহ দন্তে দন্তে চাপিয়া, কেহ সহাস্যে অকস্মাৎ কহিয়া উঠিত "আমরাও তা হলে ভদ্দর লোকদের মতন ভাল ভাল কাজ করতে পারি হ্যাঁ দাদা ঠাকুর?" দাদা ঠাকুরও উৎফুল্ল নেত্র স্নেহে করুণায় ঈষদার্দ্র করিয়া ভারী গলায় উত্তর দিতেন, "স্বভাবে যে বড় সেই প্রকৃত বড় কেন পারবে না তোমরা?" অশিক্ষিত যুবা বৃদ্ধ বালক মুগ্ধ হইয়া ভাবিত "দাদা ঠাকুর দেবতা!"

আজও মনীশ সেই প্রাত্যহিক কার্য্য-ব্যপদেশে এখানে আসিয়াছিল, কর্ম্মশেষে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বিশ্বজগতের দ্বার রাত্রির অন্ধকারে রুদ্ধ হইয়া আসিল, সন্ধ্যাতেই বক্র রেখায় চাঁদ উঠিয়া অভয় হাস্যে বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিলেন, আবার ভীত জগৎ প্রসন্নচিত্তে হাসিয়া উঠিল। মনীশ গৃহে প্রতিগমনার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে এ একটু খানি কালির রেখা কেন? এই সুন্দর, সানন্দ ও বিশাল জগতের মধ্যে সে কেন আর তাহার সকল দীনতা সেই এক অবিচ্ছেদের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারে না! কেন নিজের অক্ষুব্ধ প্রেমের সুধা

ঢালিয়া তৃষিত সংসারের বুভুক্ষা বিদূরিত করিতে না চাহিয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুধা লইয়া অতৃপ্তি উপভোগ করিতেছে? হায় মানুষের সীমাবদ্ধ হৃদয়, উদার হও, সীমা হারাইয়া ফেল, অমৃত লাভ কর। তুমি যে অমৃতের পুত্র! কিন্তু হায়, সে যে মানুষ, সে কেমন করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া দেবতা হইবে? মন দেবপ্রসাদ ভোগ করিতে চাহে, দেবতা হইতে চাহে না!

মনীশ ধীরপদে গৃহে ফিরিল, ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলিতেছে, সত্য দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল "কে এসেছেন বলতে পারো?"

মনীশের বক্ষে সংশয় সজোরে আঘাত করিল, নেত্রপল্লব নত করিয়া সলজ্জ সন্দেহে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে সতু?" উত্তর শুনিবার জন্য নিজেরও অজ্ঞাতে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। "শচী দাদা"।

"শচী!"

"হ্যাঁ এই যে তিনি"—বলিতে বলিতে ঘরের ভিতর হইতে শচীকান্ত বাহির হইয়া আসিল।

"তুমি যে হঠাৎ এ সময়? ভাল আছ তো শচীন্!"

"ভাল, হ্যাঁ আছি তোমায় একবার দেখতে এলাম, তুমি ভাল আছ?"

"হ্যাঁ, আমায় দেখতে এসেছ তবে?"

"হ্যাঁ ভাই তোমাকেই, তুমি বেশ ভাল আছ তো?" মনীশ বন্ধুর এই পুনঃপুনঃ সাগ্রহ কুশল জিজ্ঞাসায় বিগলিত হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, তাহার সহিত সে যে একটু বেখাপ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল তাহারই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত! স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সে কহিল "আমি খুব ভাল আছি শচীন্, এসো বসবে এসো; কতক্ষণ এসেছ?"

"এই একটু হলো এসেছি, এখানে এসেছি সকালের ট্রেণে, দুপুর বেলা শুনলাম তুমি পায়রা ডাঙ্গায় গেছ, বিকালে শুনলাম তুমি এসেই আবার কোথায় বেরিয়েছ, কোথা গেছলে? সত্য বল্লে মাঠে, কেন? একা সন্ধ্যাবেলা মাঠে কি করছিলে?"

ইতিমধ্যে বন্ধুদ্বয় গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া পাশা-পাশি আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সত্য তাহাদের বিশ্রব্ধালাপের অবসর দিয়া সরিয়া গিয়াছে। মনীশ উদ্ভাসিত আলোকে বন্ধুর মুখের দিকে প্রীতিকোমল নেত্রে চাহিয়া বিস্ময় বোধ করিল। বিবর্ণ মুখে দুই চোখ যেন বিদ্যুতের মত তীব্র আলো বিতরণ করিয়া জ্বলিতেছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল, মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা নিদারুণ কশাঘাতের মত গভীর রেখায় আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে-ছিল। মুখচোখের ভাবে খুনী আসামীর ভয়াবহ প্রতিকৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। মনীশ বিমূঢ়ভাবে ডাকিল "শচীন্?" শচীকান্ত মনীশের দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিল, অসহ্য! কি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! সে যদি জানিত, সে যদি বুঝিত তাহার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ঘৃণা, কি বিদ্বেষ সে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া বেড়াইতেছে! তাহার বাহিরটার মত ভিতরটাকে এমনি স্পষ্ট দেখিতে পারিলে সে এতক্ষণ হয় ত তাহার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া যাইত। এখনও তাহারা

সেই আভ্যন্তরিক ঝটিকা নিবৃত্তি হয় নাই। সেই মানসিক অগ্নুৎপাতের গৈরিক নিঃস্রব এখনও সারাপ্রাণ ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে।

সে স্বেচ্ছায় এখানে আসে নাই, কে যেন তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। দুইবার খবর লইয়া যখন সে মনীশের অনুপস্থিতি সংবাদ পাইল, তখন মস্ত বড় একটা যুক্তি তাহার চিত্তে আশার বাণী বহন করিয়া আনিল। তবে সে আর কি করিবে? অগত্যাই মনীশের সহিত বিনা সাক্ষাতেই ফিরিয়া যাইতে হয়। সে ত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই কিন্তু সেই দিনই ফিরিবার কথায় দাদা এমনই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং নিজের মনেই সে এমনই একটা গুরু অপরাধের ভার অনুভব করিল যে যুক্তিটা সম্পূর্ণ অকাট্য হইলেও তাহা নিষ্ফল ব্যর্থ হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যায় আবার সে যখন মনীশের প্রতীক্ষায় তাহার বসিবার ঘরের টেবিলটার সম্মুখে সেই চিরপরিচিত স্থানটি গ্রহণ করিয়া বসিল, তখন একবার তাহার চিত্ত হইতে ভিতরকার রুদ্ধ উত্তাপ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। নিজের গুরু অপরাধ উপলব্ধি করিয়া সে যেন কেমন একটা আকুল চঞ্চলতা অনুভব করিল। তাহাদের সেই আবাল্য প্রীতি-প্রবাহিণীর মন্দীভূত বেগশীলতা সহসা যেন পূর্ব্বগতি ফিরিয়া পাইতেছে এমনি সে অনুভব করিতে লাগিল। মনে হইল সে সেই কলেজের ছাত্র শচীকান্ত, তাহার অকৃত্রিম বন্ধু মনীশের কাছে সে আসিয়াছে, আর কোন কিছু না।

অনেকক্ষণ অবধি মনীশ বাড়ী ফিরিল না জানালার মধ্য দিয়া শচী পুনঃপুন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, গাঢ় মসীবর্ণের আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের জ্যোতি অতিমাত্রায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, তাহারই এক পাশে ক্ষয়প্রাপ্ত চক্রার্দ্ধবৎ চন্দ্র রত্নভূষণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে! গাছের পাতায় পাতায় চন্দ্রকর লেখা মাখামাখি হইয়া গিয়াছিল। কে একজন দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে, শচীকান্ত উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিল, মনীশ সম্মুখীন হইলেই সে তখনি উঠিয়া তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিবে, প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিবে আজ আমি তোমার বন্ধু, তোমার প্রকৃত বন্ধু হইতে আসিয়াছি খোলস ফেলিয়া আসিয়াছি, আমায় কাছে ডাকিয়া লও। কিন্তু তাহার প্রতীক্ষা ব্যর্থ করিয়া আসিল সত্য! আবার সে শুভ মুহূর্ত্তকে বিফল হইতে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। সাময়িক উত্তেজনার মত্ততাও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল।

শেষকালে মনীশ আসিল, তাহার পদধ্বনি কণ্ঠস্বর, হাতের স্পর্শ, শচীকান্তের সর্ব্বশরীরে এককালে সহস্র তাড়িত ছুটাইয়া দিল, গূঢ় আনন্দের আভায় সারা মুখ উজ্জ্বল করিয়া সুখ স্পন্দিত হৃদয়ের আবেগে কম্পিত স্বরে সে যখন তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল তখন তাহার সমস্ত শরীরের স্নায়ু একটা অধীর বেদনার বেগে পীড়িত হইয়া উঠিল, অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় বুকখানা ফাটিয়া পড়িবার মত হইতে লাগিল, কি বন্ধুপ্রেমের কি প্রতিদান সে দিতে বসিয়াছে! সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে গেল, অনুতপ্ত চিত্তের বেদনাশর উৎপাটিত

করিতে চাহিল। কিন্তু আবার সেই কিন্তু' মানবের চির-শত্রু, সর্ব্ব মঙ্গল কর্ম্মের বিঘ্ন-সাধক সেই 'কিন্তু' বলিল,—করিতেছ কি? এত সহজে তোমার আকিঞ্চনের ধনকে ভুলিয়া যাইবে?' ধীরে সে উত্তর করিল "কি মনীশ!" মনীশ বলিল "তুমি আমার শরীরের কথা ভাবচো নিজের চেহারাটা যদি আয়না ধরে দেখ! এমন হয়েচ কেন? মনে হচ্চে যেন কতদিন খাওনি, ঘুমোওনি।" বাস্তবিকই মানসিক সংগ্রামে অনিয়মে শচীকান্তকে চেনা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ নত করিয়া বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "একটু অনিয়ম গেছে কি না। কদিন কলকাতায় ওরা সার্কাস থিয়েটারে, ধরে নিয়ে গেছল,—"

"তুমি কলকাতা গেছলে?"

হ্যাঁ সেখানেই তো জানলাম তুমি বাড়ী এসেছ, হঠাৎ বাড়ী চলে এলে যে?"

মনীশ বন্ধুর সহসা আগমনের গূঢ় কারণ এইবার স্পষ্ট বুঝিয়াছে। মনে করিল কলিকাতায় মনীশের পুরাতন প্রীতির অযুত স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অনুতাপ জাগাইয়া দিয়া আজ আবার তাহার বন্ধুকে তাহার বক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছে। সে মহানগরীর উদ্দেশ্যে তাহার হৃদয়ের শত ধন্যবাদ প্রেরণ করিল। আনন্দে সে অকারণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল "হঠাৎ কই ভাই, ছুটির সময় সত্য এলো আমিও তাই এসেছি! সেখানে আমার নৈশ পাঠশালা চলচে কিছু শুনলে?"

শচীকান্ত আবার যেন একটা স্বস্তি বোধ করিল "হ্যাঁ শুনলাম বই কি, বেশ চলচে। বড় দিনের দুদিন শুধু বন্ধ ছিল, সে দুদিন ওরা ইন্দুভূষণকে শুদ্ধ থিয়েটারে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

মনীশ হাসিতে লাগিল "ওদের সঙ্গে আমি ছাড়া আর কেউ পারে না, তুমি এখন দুদিন থাকবে তো? বেশ বই লিখেচ।"

শচীকান্ত এই কথায় একটু যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপরাধী ভাবে উত্তর করিল "আমি কাল সকালেই যাবো—পাঁচটার ট্রেনে, তোমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না—"

মনীশ সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "ঈস্ যেতে দিলুম বলে, এত তাড়া কেন শুনি?"

শচীকান্তের ললাট হইতে চিবুক অবধি রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে মাথা নীচু করিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে কহিল "সেখানে একটা বড় জরুরী কাজ ছিল, যদি মাসিমা মনে করেন কাজের ভয়ে পালিয়ে রইল—"

মনীশ তাহার হস্ত শিথিল করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল "ওঃ তাহলে তো আর কথাই চলে না।"

শচীকান্ত একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, ছাড়া পাইবার মুহূর্ত্তে তাহার সহসা মনে হইল, মনীশ তাহাকে তাহার মায়াজালে জড়াইয়া নিজের কাছে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল করিত, কেন মুক্তি দিল!

কিন্তু তখন এ চিন্তার অবসর ছিল না এখনও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বাকী আছে। কিন্তু কিসের পরীক্ষা, মনীশের মুখে সেই হাসি, কণ্ঠে সেই অক্ষুণ্ণ প্রসন্নতা, দৃষ্টিতে তেমনি উদার মহত্ত্ব সুব্যক্ত, আহত হৃদয়ের ক্ষত চিহ্ন কোনখানেই শোণিতপঙ্কলিপ্ত

করে নাই! বৃথা ভয়, মিথ্যা এ ভাবনা। সে এ জগতের অনেক উর্দ্ধে, মানবচিত্তের ক্ষুদ্র সুখ কল্পনা আশা নিরাশার দ্বন্দ যুদ্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সে প্রেমিক নহে, নিজেই সে প্রেম!

নিস্পন্দলোচনে সে মনীশের হাস্যোজ্জ্বল মুখের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধাসংযত হৃদয়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মনে মনে মাথা নত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, পুলকিত অঙ্গে তাহাকে আলিঙ্গন কল্পনা করিয়া কণ্টকিত দেহ হইল, এ মহাযোগী মহাদেব আজও ধ্যানাসীন। মনীশ উঠিয়া হাসিমুখে সেল্‌ফের উপর হইতে একখানা অতি পরিপাটি আবরণ-মণ্ডিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া আসিল, সোনার জলের লতাযুক্ত সুন্দর ছাঁদের টানা অক্ষরে বড় বড় করিয়া ইহার উপরে খোদা "ক্ষণিকের দেখা" এবং মলাটের নীচের পাতার উপরে কালীর অক্ষরে লেখা "চিরস্নেহাস্পদ বন্ধু মনীশকে উপহার। অকৃত্রিম বন্ধু শচীকান্ত।" মনীশ পাতা উলটিয়া শচীর চক্ষের সম্মুখে ধরিল "এলেখাটা চিন্‌তে পারো?"

একবার চোখ বুলাইতেই শচীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল "আমার তো মনে হচ্চে না আমি তোমায় এ রকম বই পাঠিয়েছি, কিন্তু লেখা তো আমার হাতেরই?"

"কেমন করে হলো বলো তো?" মনীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আমি নিজে লিখেছি, জাল করা বড় শক্ত, তোমার চিঠিগুলা দেখে এক একটি অক্ষর কত ধরে ধরে লিখেছি, কিন্তু যখন শেষ হলো দেখলাম ঠিক তোমার লেখার সঙ্গে মিলে গ্যাছে শচীন্, তখন মনে বড় আনন্দ হলো, বোধ হ'লো যেন তুমিই এ লেখা আমায় পাঠিয়েছ, আমি রোজ একবার করে লেখাটি দেখি, আর"—

"মনীশ!" আহততন্ত্রী বীণার আকস্মিক ক্রন্দনমূর্চ্ছনার ন্যায় অকস্মাৎ শচীকান্ত ব্যথাকাতর চিত্তে কহিল উঠিল "মনীশ! তুমি তোমার এই পাষণ্ড বন্ধুর কথা এত ভাবো, এত খানি ভালবাসো, তাকে জানো না কত হীন, কত নীচ সে—" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিলাপ ধ্বনির মত আকুল স্বরে পুনরায় সে আরম্ভ করিল "শোন মনীশ, তোমার চির সুহৃদের অধঃপতন কাহিনী তবে তুমি শোন, আর আমি চাপতে পারি না, যা হবে হোক, সব বলি শোন। জেনে যদি ঘৃণা করতে হয় তাও করো তবু এ লুকোচুরি"—বিস্ময়ে মনীশ এ পর্য্যন্ত একটি বাক্য উচ্চারণেও সক্ষম হয় নাই, এতক্ষণে আকস্মিক বিস্ময়ের বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের আসন তাহার আসনের আরও কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার বাহুমূলে সান্ত্বনাহস্ত স্থাপন করিল "শান্ত হও ভাই, আমি কোন কথা শুনতে চাইনে" "না মণি! বাধা দিও না, আমায় বল্‌তে দাও। শোন তুমি কার উপরে এত বড় বিশ্বাস, এ অমর প্রেম স্থাপন করেছ সে তোমার—"

মনীশ ব্যগ্র করে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, তড়িৎ বেগে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত অথচ পূর্ণ বিশ্বস্ত স্বরে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "একটি কথাও না। আমি তোমার এ পাগলামীর প্রশ্রয় দিতে পারবো না শচি;

শোন ভাই আমি বেশি বলতে পারিনে, —কখনও বলিনি আজ বলচি আমি তোমায় যথার্থ ভালবাসি। প্রকৃত ভালবাসার চক্ষে প্রেমাস্পদের অপরাধ অতি নগণ্য, তাতে ব্যথা দিতে পারে কিন্তু ঘৃণা আনতে পারে না। তুমি পাগল তাই ওসব কথা বলচো, কাকে আমি ঘৃণা করবো, তোমায়? অসম্ভব! আমি তো তোমার মহত্ত্বকে ভালবাসিনি, আশৈশব ভালবেসেছি তোমাকে। তোমার দেহ, মন, আত্মা, ভালমন্দ সবটাকে জড়িয়ে যে তুমি সেই তুমিই যে আমার বন্ধু! তোমার মধ্যে যদি কিছু মহিমা থাকে সেও তোমার অংশ, আর যদি কিছু ক্ষুদ্রতা থাকে তাও ত তোমা ছাড়া নয়। ঈশ্বর আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু তিনি তো আমাদের শত ভ্রান্তির জন্য আমাদের ঘৃণা করে ছেড়ে যান না। না, কিছু বলো না,— আমার উপর কোন অবিচার করে থাকো;— সে চুকে গেছে আমি তার কৈফিয়ৎ চাইনে।" মনীশ থামিল তাহার অন্তরের গোপন সমাচার হৃদয়ভারের বিপুলবিভবে পরিপূর্ণ হইয়া মধুর মূর্চ্ছনার মত তাহার বন্ধুর বিহ্বল মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুজনের কেহই কয় মুহূর্ত্ত একটি কথা কহিতে পারিল না, মনীশ সুখতন্ময়ভাবে কেবল চাহিয়া রহিল, আর শচীকান্ত মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গেল।

ঠাণ্ডা বাতাসে জলসেকআর্দ্র মাটির গন্ধের সহিত মনীশের স্বহস্তরোপিত হাসনাহানার সুবাস বহন করিয়া গৃহ-অতিথির অর্ঘ্যরূপে আনিয়া দিল, ক্ষণস্থায়ী চন্দ্রাংশটুকু মসীবর্ণ আকাশের বিশাল উদর গহ্বরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, স্বপ্নোত্থিতবৎ সচকিত শচীকান্ত মাথা তুলিয়া মনীশের মুখের দিকে চাহিল "কিন্তু তুমি আমার পাপের কথা শুনলে ভাল করতে, এখনও উপায়—"

মনীশ সবটা শেষ হইতে দিল না, সে কহিয়া উঠিল "তুমি বাড়াবাড়ি করলে ওই কথা ভিন্ন আর কোন কথাই কইবে না, দাঁড়াও আমি খুড়িমাকে ডেকে আনচি আজ তোমার এখানে খেয়ে যেতে হবে, পুকুরের মাছ ধরা হয়েছে।" মনীশ দ্রুতপদে পাশের একটা দ্বার খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বন্ধুকে সে আবার নিজের কাছে ফিরিয়া পাইয়াছে আর তো তাহার মনে এতটুকু ক্ষোভ নাই, মিথ্যা এই ক্লেশকর প্রসঙ্গ চলিতে দিয়া সে প্রেমাস্পদকে পীড়ানুভব করিতে দিবে কেন? ছাত্রাবাস প্রত্যাগত আত্মীয় মিলিত স্কুলের ছাত্রের মত তাহার বালসরল চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল।

ফিরিয়া সে বন্ধুকে সেখানে দেখিতে পাইল না, ভাবিল বাহিরে গিয়াছে, কই বাহিরেও তো কেহ নাই! অদূরে কামিনী গাছের শাখাপত্র বায়ুভরে স্বনস্বনিয়া উঠিল, সে ভাবিল হয়ত সে তাহার সহিত কৌতুক করিতে উহারই মধ্যে গোপন হইয়া আছে। নিকটে গিয়া ডাকিল "হয়েচে হে হয়েছে অন্ধকারে এখানে কেন?" কই, কাহার প্রতি এ আহ্বান! কেহ কোথাও নাই। বিস্ময়বেদনায় বিমূঢ় মনীশ তখনও সেই নৈশ অন্ধকারের তলে প্রতীক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল, প্রতিক্ষণে পত্রমর্ম্মরে, বায়ুর শব্দে সে সচকিত উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বুঝি কোন গোপনস্থল হইতে তাহার বন্ধু বাহির হইয়া আসিবে!

আততায়ী যেমন অন্ধকারে নিজের শিকারের বুকে ছুরি মারিয়া আতঙ্কস্পন্দিত পদে ঘরে ফেরে তেমনই করিয়া শচীকান্ত নির্জ্জন পথ অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পল্লীগ্রামে অনেক ঘরের দ্বার সন্ধ্যাতেই রুদ্ধ হইয়া যায়, সেই সব রুদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহের কোন একটার মধ্য হইতে কচিছেলের কান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে "আয়রে যাদু আয়" ইত্যাদি ছেলে ভুলানি ছড়ার অংশতর শোনা যাইতেছিল। কোথাও দুই এক্‌কে দুই, দুই দুগুণে চার" প্রভৃতি পাঠশালার নামতা পাঠের বিপুল কলরব শ্রুত হইতেছে, কোন স্থান হইতে আবার মহা কোলাহলে কোন্দলের তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হইতেছিল।

চলন্ত দুইখানা ট্রেনে যেমন সংঘর্ষ হইয়া পড়ে তেমনিই অনেক সময় রাস্তায় চলিতে চলিতে মানুষে মানুষেও সংঘর্ষ বাধে। উভয় স্থলেই উভয়ের পরিচালক এ দোষের জন্য দায়ী। মন যখন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায় মর্ত্ত্যলোকের কথা তখন মনেই থাকে না। বিশেষ দুইখানা আত্মবিস্মৃত গাড়ির চালক যদি এক পথে বাহির হয় তাহা হইলে তো কথাই নাই। প্রবলবেগে শচীকান্ত এইরূপ অন্যমনা একজন পথিকের উপর পতিত হইয়া ক্রুদ্ধ উত্তেজনার সহিত কহিয়া উঠিল "কেরে, কানা নাকি!"

দোষী দুজনেই সমান, অপর ব্যক্তিও এই গালি ফিরাইয়া দিতে পারিত কিন্তু সে তাহা করিল না, আপনাকে পতনবেগ হইতে কোনমতে বাঁচাইয়া সস্মিতভাবে উত্তর করিল "কানা হবার সময় হয়ে এলো বটে কিন্তু বাপু তুমি তো বৃদ্ধ নও বলেই মনে হচ্চে, যা হোক তোমার লাগে নি তো?" "কে শিবুদাদা না?"

"শচীকান্ত কি?" আজ্ঞে হ্যাঁ, মাপ কর্ব্বেন। দাদা আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, এত অন্ধকারে কেন বেড়ান, যদি বেশি ধাক্কাটা লাগতো!"

শিবনারায়ণ কহিলেন "নাহে মনটা বড়ই উৎকণ্ঠিত রয়েছে কি না, যা হোক আছয়ো ভাল?"

"হ্যাঁ ভালই, মন ভাল নেই কেন বললেন?" "নানান্ ঝঞ্ঝট সংসারে, বলো কেন? ইচ্ছা করে ছেলেদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে তোমার বাবার চরণতলে আশ্রয় নিই, আমাদের ওখানে গিয়েছিলে? মনীশের সঙ্গে দেখা হলো? কেমন দেখলে তাকে?" শচীকান্ত মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল "ভালই তো দেখলাম কেন একথা বলচেন?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন না, তিনি যেন কি ভাবিতেছিলেন। "আমায় কিছু বলবেন কি?"

"তোমায়! কই না, কেন বলো দেখি?"

"কে জানে মনে হলো যেন কি বলবেন, কিছু বলবার দরকার নেই তো?—আচ্ছা তা হলে প্রণাম, বড় শীত, আসি তা হলে।"

শচীকান্ত সবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তরল অন্ধকারে ত্বরিতে অদৃশ্য সেই নিশাচরবৎ অকস্মাৎ দৃষ্ট অদৃশ্য মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বিষণ্ণ চিত্তে মস্তক আন্দোলন করিয়া আত্মগত কহিলেন "মদ ধরেচে নাকি? কি পরিতাপ! দেবতার সন্তান ভূত হইল!"

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপ্‌নি-খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশ্‌মিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির 'পরে!

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেল্‌লে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্‌ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন-দিনে।

হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মাদল বাজে,
শাল ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে!

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা সে যাচ্ছে এঁকে!

ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্ ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সাম্‌নে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠ্‌ল জেগে আলোর মেলা।

কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ্ চেয়েছে!
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ রাণী পান খেয়েছে!
মেশামেশি কান্নাহাসি মরম তাহার বুঝ্‌বে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ্ হাস্‌তে থাকে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিক্রমোর্ব্বশী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা জানি না, কালিদাসের শেষ নাটকটি সর্ব্বসাধারণের নিকট কিরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছিল; নাটকের দোষগুলি অপেক্ষা, নাট্যদৃশ্যোপযোগী গুণগুলির প্রতিই সকলের বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সাহিত্যিক গুণের জন্য বিক্রমোর্ব্বশী যে স্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, বিভিন্ন পাঠান্তরের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে, এবং বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-অনুসারে, পণ্ডিতেরা কালিদাসের দুইটি বড় নাটকের উপর একটু কলম চালাইয়াছিলেন। শকুন্তলার চারিটি পাঠান্তর ও বিক্রমোর্ব্বশীর দুইটি পাঠান্তর এখনও বিদ্যমান আছে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর হস্তলিপির মধ্যে সুস্পষ্ট অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কাশ্মীরদেশীয় শকুন্তলার পুঁথিতে, অন্যান্য পুঁথি অপেক্ষা একটা দৃশ্য অধিক দেওয়া হইয়াছে। (ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশক); দেবনাগরী পুঁথিতে ১৯৪টি শ্লোক আছে; বাঙ্গালা পুঁথিতে ২২১টি শ্লোক আছে। রাজা ও শকুন্তলার মধ্যে যেখানে প্রেমের ব্যাপার আছে সেই তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যটি, দেবনাগরী গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, অথবা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে M. Pischel একটু রূঢ়ভাবে এইরূপ বলিয়াছেন :—"Monier Williams-এর ন্যায় কোন "শুচিবাই"গ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে অশ্লীল কল্পনার আভাস আছে বলিয়া সমস্ত দৃশ্যটাই উঠাইয়া দিয়াছেন।" দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থেই দ্রাবিড়ীয় পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থের সহিত এই দ্রাবিড়ীয় গ্রন্থের অনেক প্রভেদ।

অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত চতুর্থ অঙ্কের গীতগুলি, এবং তৎসহ সংগীতের পারিভাষিক বচনগুলি, উহা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি, এই সকল পাঠান্তর হইতে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডার উৎপত্তি হইয়াছে :—যাঁহার যোগ্যতা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত সেই M. Pischel, Weber-এর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও—বিবিধ পাঠান্তরের সমালোচনায়, প্রাকৃতের সংশোধনকল্পে, বররুচির প্রদত্ত ব্যাকরণের নিয়মগুলিকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কালিদাসের মহাকাব্যগুলি হইতে, শুধু যে আমরা তাঁহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ প্রাপ্ত হই তাহা নহে,—তাঁহার যুগের নাট্যকলার অবস্থা সম্বন্ধেও আমরা অনেকটা জ্ঞানলাভ করি। একটি মহাকাব্যে তিনি যে শুধু তাঁহার বিচিত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে,—অন্যান্য শিল্পকলার ন্যায় নাট্যকলাতেও তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। একটি শ্লোকের মধ্যে নাট্যকলার বিবিধ পারিভাষিক সংজ্ঞা একত্রিত করিলে তাহা হইতে যে রচনা-রীতির সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় তাহাকে শাস্ত্রীয়



আঙুরের ক্ষেতে

ভাষায় 'ভরতসমুচ্চয়' বলে! কুমারসম্ভব হইতে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বিবাহ-অনুষ্ঠানের পর, শিব পার্ব্বতী দেবতাদিগের অনুষ্ঠিত উৎসবে উপস্থিত হইলেন। "সরস্বতী স্বকীয় বাক্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দম্পতির গুণকীর্ত্তন করিলেন: পতির গুণকীর্ত্তন সংস্কৃত ভাষায় ও পত্নীর গুণকীর্ত্তন সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় করিলেন। এই দম্পতি কিয়ৎকালের জন্য এমন একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দর্শন করিলেন,—যাহাতে বিবিধ নাট্যরীতি নাট্যসন্ধিগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, যাহাতে বিচিত্র রসের অনুরূপ সঙ্গীত ছিল এবং যাহাতে অপ্সরাগণ শোভন ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছিল।" রঘুবংশে, রাজা অগ্নিবর্ম্মা তাঁহার প্রাসাদে নাট্যকলায় আসক্ত—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "এই নাট্যকলায়-সুশিক্ষিতা রমণীগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তিনি, রসভাব, ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর সহযোগে নাটকাদির অভিনয় করিতেন এবং স্বকীয় বন্ধুগণের সমক্ষে, খ্যাতনামা নটদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন!" পরিশেষে অপ্সরা উর্ব্বশীর সেই নাট্যাভিনয় পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—যে অভিনয়ে উর্ব্বশী ভরত মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছিল। সেই নাটকের রচয়িত্রী—সরস্বতী, এবং সেই নাটকের নাম—"লক্ষ্মীস্বয়ম্বর"! দেবতাদিগের দূত, অপ্সরাগণকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন:—"ভরত মুনি তোমাদিগকে অষ্টরসাত্মক একটি নাটকের অভিনয় শিখাইয়াছেন; মরুৎপতিগণ, দিক্‌পালগণ, সেই সুললিত নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।"

এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, কালিদাসের যুগে, এই সকল নাটকের প্রয়োগ দ্বারা, তৎকালে অনুষ্ঠিত মহোৎসবাদির মহিমা-বর্দ্ধন করা হইত। বিশেষত, তাঁহার রচিত মহাকাব্যাদিতে তিনি যেরূপ নাট্যশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার নাট্যরচনাগুলি কতটা নাট্য শাস্ত্রের নিয়মানুগত।

কালিদাসের সমসাময়িক আর এক নাট্যকারের নাম আমরা অবগত হই:—তিনি ভর্ত্তৃমেন্থ—মাতৃগুপ্তের আশ্রিত ব্যক্তি। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত মহাকাব্য "হয়গ্রীব-বধ" পাঠে পরিতুষ্ট হইয়া মাতৃগুপ্ত তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদান করেন। কহ্লন, রাজতরঙ্গিণীর এক স্থানে এই মহাকাব্যের উল্লেখে যাহা বলিয়াছেন, প্রথম-ব্যাখ্যাকারীগণ তাঁহার সেই বাক্যে প্রতারিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বাক্য নাটকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে এইরূপ তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরে ঐ গ্রন্থের আবিষ্কৃত খণ্ডাংশ হইতে ঐ গ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তথাপি ভর্ত্তৃমেন্থ নাট্যকারেরই শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কবি-রাজশেখর বাল-রামায়ণের প্রস্তাবনায় ভর্ত্তৃমেন্থকে তাঁহার সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"পুরাকালে বাল্মীকির এক গায়ক পুত্র ছিল, সেই পুত্র পরে ভর্ত্তৃমেন্থ নামে এই ধরাধামে পুনরাবির্ভূত হয়; পারে আবার ভবভূতির নাম ধরিয়া এই পৃথিবীতে আগমন করে; আর, আজ সে-ই আবার রাজশেখর নাম ধারণ করিয়াছে।" রামায়ণের গ্রন্থকারের পরেই যে রাজশেখর ভর্ত্তৃমেন্থের নামোল্লেখ

করিয়াছেন এবং তাঁহাকে রাম কথামূলক নাট্য-রচয়িতাদিগের শীর্ষস্থানে বসাইয়াছেন, ইহা ভর্তৃমেন্থের রচিত গ্রন্থের দ্বারা কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে না; কারণ, হয়গ্রীববধ-নাটকের সহিত রামোপাখ্যানের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে, রামের কীর্ত্তিকলাপসম্বন্ধে ভর্তৃমেন্থ পূর্ব্বে একখানি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। ভর্তৃমেন্থ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক; কেননা বিক্রমাদিত্যের প্রিয়পাত্র মাতৃগুপ্তের সহিত মেন্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সুভাষিতাবলী"তে বিশ্বমাদিত্যের নামে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, "শারঙ্গধরপদ্ধতি" উহা ভর্তৃমেন্থের উপর আরোপ করেন। (বিশ্বমাদিত্য=বিক্রমাদিত্য)। আর একটা কৌতুকাবহ কথা আছে:—মৃচ্ছকটিকার একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক—যাহা "সুভাষিতাবলী"তে বিক্রমাদিত্যের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে—"শারঙ্গধরপদ্ধতির" মতে, উহা বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃমেন্থ—এই উভয় কবির সম্মিলিত রচনা। ভর্তৃমেন্থ যে একজন নাট্যকার ছিলেন—এই অনুমানটি সমর্থন করিবার পক্ষে আরও একটি হেতু আছে। তাঁহার আশ্রয়দাতা মাতৃগুপ্ত তাঁহার নাট্যরচনায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তিনি তাহার পর নাট্য-কলার নিয়মাদি নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিপথে

বাড়ীর দ্বিতলের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। ঘরের জানালা খোলা। অন্ধকার পথে দাঁড়াইয়া এক নারী সেই খোলা জানালার পানে চাহিয়াছিল। নিশুতি রাত্রি। পথে জন-মানবের চিহ্ন নাই। শুধু অদূরে থাকিয়া থাকিয়া একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছিল।

চারিধারে অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিতেছিল। কে যেন নেপথ্যে বসিয়া সারা বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে-পিঠে মোটা তুলি দিয়া লেপা কালিটুকুর উপর আরও নিবিড় করিয়া কালি লাগাইতেছিল। শুধু সেই বাড়ীর কাছে বড় তেঁতুল গাছটার ডাল-পালার উপর ঘরের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল, কে যেন এই আঁধার-কালো বিশ্বের ছোট একটি কোণে খানিকটা আবির ঢালিয়া দিয়াছে।

এক অব্যক্ত বেদনায় নারীর বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। পতঙ্গ যেমন আগুন দেখিয়া ছোটে, ঘরের ঐ অস্পষ্ট আলোটুকুর পানে নারীর সারা চিত্ত তেমনই আকুল আগ্রহে ছুটিতেছিল। প্রাণ পুড়িয়া যায় তবু এ ছোটা কিছুতে রোধ করা যায় না।

নারীর ছিন্ন মলিন বেশ, শুষ্ক কেশে জট ধরিয়াছে, মুখে-চোখে কালির দীর্ঘ রেখা!

ঐ আলো-করা ঘরখানি। আলোর

পানে চাহিয়া চাহিয়া নারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বুকটা তাহাতে কতক যেন হাল্কা বোধ হইল। নারী ভাবিল, হায় ঐ ঘর! অমনি আলো-করা ছোট ঘর,—সে ঘরে সে সর্ব্বময়ী ছিল। সে ঘরের মর্য্যাদা সে বুঝে নাই, তাই সে তাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু আদর-গৌরবে পরিপূর্ণ এমন ঘর কিসের প্রলোভনে সে ত্যাগ করিয়া আসিল! আলেয়ার আলোয় মজিয়া বিপথে পড়িয়া সর্ব্বস্ব সে আজ খোয়াইয়া বসিয়াছে! এখন আর তাহা ফিরিয়া পাইবার এতটুকু আশা নাই, সম্ভাবনা নাই! কঠিন উপেক্ষার বাণে সে আজ বিদ্ধ জর্জ্জরিত। মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! শুধু কি তাই? সারা জীবনের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঝড়ের শেষে আশ্রয়-চ্যুতা পাখীর মতই সে আজ নীড়-হারা! এত বড় পৃথিবী—তবু তাহার দাঁড়াইবার জন্য কোথাও আজ তিলমাত্র স্থান নাই!

অতীতের কথা বিরজার মনে পড়িল। এমনই আলো-করা ঘরে বিবাহের পর তাহার ফুলশয্যা হইয়াছিল। আজ কি দিলে সেই অতীত দিন, অতীত মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে! মদের নেশার মতই অতীত স্মৃতির নেশায় তাহার মাথাটা রিম্-ঝিম্ রিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, সে দিন ফিরিবার নয়—কখনও কাহারও ভাগ্যে ফিরে নাই! তাহারও ভাগ্যে ফিরিবে না!

সেই ঘরের পানে চাহিয়াই বিরজার সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার যেন সংজ্ঞা ছিল না। ভোরের পাখী গাহিয়া উঠিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। দিনের আলো দেখিয়া কি-এক দারুণ ভয়ে তাহার বুকটা দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেখানে তাহার আর দাঁড়াইয়া থাকিবারও সাহস হইল না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—কে তুই? এখানে কেন? যদি তাড়াইয়া দেয়! ধীরে ধীরে সে দূরে সরিয়া গেল; কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। মন্ত্র-স্পৃষ্ট সর্পের মতই সে সেই গৃহের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল।

ক্রমে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তিনটি ছেলে গৃহ হইতে পথে বাহির হইল। পশ্চাতে ভৃত্যের হাতে বইয়ের গোছা। ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে—বিরজা ছেলেদের পশ্চাতে চলিল। তিনটি ছেলে! উহার মধ্যে যেটি বড়, তাহার মুখখানি—হাঁ, ঠিক, কোন ভুল নাই! ও মুখে সেই মুখখানিই যেন কে বসাইয়া রাখিয়াছে! এই মুখের ছায়া স্বপ্নে সে কতবার দেখিয়াছে—অস্পষ্ট ছায়া দেখাইয়া স্বপ্ন মিলাইয়া গিয়াছে! ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয় নাই!

বিরজার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ছেলেটিকে একবার সে বুকে তুলিয়া লয়, বুকে চাপিয়া ধরে—কোমল মুখখানি স্নেহের অমৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলে। তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের পাষাণ-স্তূপ ভেদ করিয়া আজ যেন সহসা স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া উঠিয়াছে। সে বিমল স্নিগ্ধ ধারায় বিরজার প্রাণ জুড়াইয়া বাঁচিল।

২

ছেলেরা স্কুলে গেল; বিরজা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। যদি আর একবার দেখা মিলে। ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া সাড়ে দশটার

ঘণ্টা বাজিয়া গেল। স্কুল বসিল। সমস্ত স্কুল-গৃহের বুক চিরিয়া একটা সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল—কর্ম্ম-রত মধুকরের গুঞ্জনের মতই তাহা জীবন্ত, সঙ্গীতময়! ছেলেরা পড়া করিতেছে, পড়া বলিতেছে। বিরজা উন্মাদের মত স্কুলের সম্মুখস্থ পথটায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, বারোটা বাজিয়া বাজিয়া দেড়টার সময় টিফিনের ছুটি হইল। ছেলের দল উল্লাসে মাতিয়া স্কুলের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া বাহির হইল। যেন খাঁচা হইতে পাখীর দল কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তেমনই তাহাদের হর্ষোল্লাস। মার্ব্বেল, কপাটি ও লুকাচুরি খেলার ধুম বাধিয়া গেল। এত ছেলে—কিন্তু সেটি কৈ? কোথায় সে! সে কি খেলিতে আসিবে না? তাহাকে দেখিবার জন্য বিরজার প্রাণ যে তৃষিত হইয়া রহিয়াছে!

ঐ না? ছুটিয়া-ছুটিয়া একবার বাহিরে আসিতেছে, আবার ছুটিয়া ভিতরে পলাইতেছে —পিছনে ছেলের দলও ছুটিয়া চলিয়াছে। সকলে লুকাচুরি খেলিতেছে। ঐ আবার বাহিরে আসিয়াছে। ও কি? দুইটা ছেলে উহাকে ধরিয়া উহার মাথায় চড় মারিতেছে —ছেলে মাথা গুঁজিয়া হাসিয়া সে মার খাইতেছে! ওরে দস্যু, ওরে কঠিন, দে, দে, ছাড়িয়া দে, আহা,—কেন মারিতেছিস! তোদের ও খেলার প্রহারে এখানে বিরজার বুকে যে মুগুরের ঘা পড়িতেছে। ওরে দেখ, দেখ, বাছার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা বাড়ীর পথে ফিরিল; বিরজাও পিছনে চলিল! এ কি আকর্ষণ! এ আকর্ষণের প্রভাব এত দিন বিরজা কেন বুঝে নাই! ছেলে! সে যে কি রত্ন, বিরজা তাহা পূর্ব্বে বুঝে নাই,—আজ বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে বলিয়াই এটিকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখিবার জন্য আজ তাহার এমন আকুলতা, এতখানি অধীর আগ্রহ!

এমনই ভাবে ছেলের পিছনে, বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বিরজার দুই দিন দুই রাত্রি যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সকালে পথে দাঁড়াইয়া বিরজা জানালার ফাঁক দিয়া নীচেকার ঘরের মধ্যে আপনার ক্ষুব্ধ নয়নের আকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বসিয়া পড়িতেছে—আব্দার ধরিতেছে, দুষ্টামি করিতেছে,—বিরজা তাহাই দেখিতেছিল! হায়, এমন স্বর্গ, এমন সুখ, এ ত তাহারও অনায়াস-লব্ধ ছিল, নিজের দোষে ধূলার মতই সে তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আজ শত চেষ্টায়, সহস্র সাধনায় এ স্বর্গের একটি কোণেও আর তাহার দাঁড়াইবার অধিকার নাই!

হঠাৎ একটা কঠিন কণ্ঠ-স্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল, "—কে?" বিরজা চোখ ফিরাইয়া দেখে, গৃহ-দ্বারে ও,—কে ও! ভয়ার্ত্ত শিশুর মত সে দূরে পলাইয়া গেল—সেখানে দাঁড়াইয়া সে মুখের পানে একবার ফিরিয়া চাহিবারও তাহার সামর্থ্য হইল না।

তবুও এ বাড়ীর মায়া, দেখিবার বাসনা কিছুতেই মিটিবার নয়। দৈত্যের মায়া-পুরীর মতই এই বাড়ীখানা বিরজার পায়ে এক দুশ্ছেদ্য নিগড় আঁটিয়া দিয়াছিল। এক-

একবার দারুণ ক্ষোভে যখন দূরে পলাইবার বাসনা হয়, দূরে পলাইবার চেষ্টাও সে করে, তখন এই বাড়ীখানাই আবার সেই অদৃশ্য সুদৃঢ় নিগড় ধরিয়া টানিয়া বিরজাকে ফিরাইয়া আনে! বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল—সে কি পাগল হইবে!

কিন্তু পাগল হইলে সে আজ বাঁচিয়া যায়! অতীত স্মৃতিগুলা সর্পের মত ফণা তুলিয়া তাহার অন্তরে অহরহ দংশন করিতেছে, তীব্র বিষ ঢালিয়া দিতেছে! সে জ্বালা যে আর সহে না! সহিবার শক্তি নাই! ধৈর্য্যও নাই!

৩

পরদিন বাটীর দাসী গিয়াছিল, দোকানে খাবার আনিতে। বিরজা আসিয়া তাহার শরণ লইল। মিষ্ট কথায় তাহার মন ভুলাইয়া সে খবর পাইল, বাবুর দুই সংসার। একটি পুত্র রাখিয়া প্রথমা না-কি মারা গিয়াছে—পাঁচ জনের অনুরোধে বাবু দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। ইহার দুই পুত্র, এক কন্যা। স্ত্রীটিও বড় ভালো। সতীন-পোর উপর যেমন টান, তেমনি ভালোবাসা! ব্যবহার দেখিলে কে বলিবে, সতীন-পো! ভালো জামা, ভালো কাপড়, সবই তাহার। নিজের ছেলেরা আব্দার ধরিলে মা উত্তর দেয়, "ও পাবে না ত কে পাবে রে? ও যে বড়, তোরা ছোট!" আর ছেলেও তেমনই মা-বলিতে অজ্ঞান! এমন একগুঁয়ে ছেলে, পৃথিবীতে যদি সে কাহাকেও মানে, কিন্তু মার কাছে একেবারে জড়-সড়! বাবুও সুশীল-অন্ত প্রাণ! দাসী আরও বলিল, এ সব কথা পাড়ার লোকের মুখেই সে শুনিয়াছে। বাড়ীতে 'সতীন-পো' কথাটি কি কাহারো উচ্চারণ করিবার জো আছে! তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। বৌঠাকরুণের ত অমন মায়ার শরীর, তখন কোথায় থাকে, সে মায়া!

বিরজা মন দিয়া একটি-একটি করিয়া সব কথা শুনিল; শুনিয়া শুধু একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দাসী বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল, কহিল, "ওমা,—তোমার চোখে জল দেখচি যে।" বিরজা আর-একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, চোখে কি-একটা পড়ল!" বলিয়াই সে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল। দাসী গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দোকানী কহিল, "ও একটা পাগলী। আজ ক'দিন থেকে এই পাড়ার মধ্যে ওকে ঘুরতে দেখছি!"

অপরাহ্নে স্কুলের ছুটির পর সুশীল বাড়ী ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল, ছোট ভাই দুইটি ও কয়েকজন সঙ্গী। বিরজা অদূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। সুশীল এ কয়দিন এটুকু লক্ষ্য করিয়াছে যে, এক উন্মাদিনী নারী তাহাদের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়—বাড়ীর ধারেও সর্ব্বদা তাহাকে দেখা যায়! ইহার জন্য প্রাণে সে কেমন একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। রাগও যে হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহাকে তাড়াইতেও সাহস হয় না! কি জানি, একে পাগলী, চট্ করিয়া হাতটাই যদি ধরিয়া ফেলে! গালি দেয়! হাত ধরিয়া ফেলিলে পরিষ্কার জামাটা ত নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার উপর পথের মধ্যে লোকের কাছেও বিষম অপদস্থ হইতে হইবে! সে ভারী লজ্জার কথা।

আজ এই এতগুলা সঙ্গী নিকটে থাকিতে তাহার সাহসের অভাব হইল না। পথ চলিবার সময় বিরজার পানে অলক্ষ্যে সে চাহিতে ভুলে নাই। তবু এ কি আপদ! পাগলীটা যে কিছুতেই সঙ্গ-ছাড়া হয় না! আবার নজর তাহার সুশীলের পানেই! জ্বালাতন! সুশীল একজন সঙ্গীর কানে কানে কহিল, "দেখ্ ভাই, একটা পাগ্‌লী!" কথাটা বিরজার শ্রুতি এড়াইল না। সঙ্গী বালক কহিল, "হ্যাঁ ত রে! ঢিল মারব?" সুশীল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, ঢিল মারে না—তার চেয়ে এক মজা করি, দেখ্।" সঙ্গী কহিল, "কি মজা?"

সুশীল পকেট হইতে লজেঞ্জেস বাহির করিয়া মুখে পুরিল; খানিকক্ষণ সেটা চুষিয়া বিরজার পানে ছুড়িয়া কহিল, "এই নে, পাগ্‌লী, লবঞ্চুস্ খা"—সঙ্গীর দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজেঞ্জেসটা বিরজার গায়ে লাগিয়া পথে পড়িল। তাহার মনে হইল, আকাশের বাজ বুকে পড়িলেও বুঝি তাহার এমন বাজিত না। এই ছেলে—যাহাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য বিরজা পাগলের মত ছটফট করিতেছে, —সে এমন বিদ্রূপ করিল? কৈ, পাষাণ বুক তথাপি ভাঙ্গিল না ত! বিরজার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কিন্তু উপায় নাই! এ বিষ ত তাহারই মন্থন-করা! যে পাপ সে করিয়াছে—এ তাহারই কর্ম্মফল! উচিত শাস্তি! চোখের জল সামলাইয়া সে সেই লজেঞ্জেসটুকু কুড়াইয়া লইল—সেটুকু বুকে চাপিয়া, তাহাতে চুমা দিয়া অন্তরে প্রথম সে আজ যে শান্তি অনুভব করিল, তাহা অপূর্ব্ব! মাণিকের টুকরার মতই সযত্নে সে সেই লজেঞ্জেসটুকু আপনার অঞ্চলে বাঁধিল।

৪

পরদিন—সুশীল তখন স্কুলে গিয়াছে, অভয় গৃহে নাই, বিরজা সাহসে ভর করিয়া অন্দরে ঢুকিল। ভৃত্য তাড়া দিয়া উঠিল,—সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না; একেবারে ছুটিয়া দ্বিতলের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণাল তখন শিশু কন্যার দুধের বাটি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক অপরিচিতা জীর্ণ-মলিন-বেশা শীর্ণা নারীকে একেবারে উপরে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু বিরজার মুখে বিষাদের নিবিড় ছায়া, দুই চোখের কোণে সুগভীর কালির রেখা টানা দেখিয়া তাহার ভয় না হইয়া মায়া হইল। মিষ্ট স্বরে সে কহিল, "তুমি কে গা?"

বিরজার মুখে চট্ করিয়া কোন কথা যোগাইল না! মনের মধ্যে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। এমন ঘর, এমন বারান্দা,—এমন সব—তাহার কিসের অভাব ছিল? আজ ভিখারীর বেশে সে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এখানকার কিছুতে তাহার কোন অধিকার নাই—এখানে আসিয়া দাঁড়াইতে গেলেও পরিচয় দিতে হয়!

মৃণাল কহিল, "তুমি কি চাও,—বল না!"

কি চাই! বিরজার মনে হইল, সে বলে, ওগো কিছু নয়, কিছু চাই না—শুধু তোমার বাড়ীর কোণে এতটুকু স্থান দাও। তোমাদের উচ্ছিষ্ট উঠাইব, বাসন মাজিব,

তোমাদের পদ-সেবা করিব, দিনান্তে একটি বার শুধু তোমাদের ঐ ছেলেটিকে কোলে লইতে দিয়ো। কিন্তু না, সে কথা বলা চলে না—ভালো দেখায় না! এ যে পাগলের কথা! সে ত পাগল নয়! তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিল না।

মৃণালের মনে হইল, বুঝি সে ভড়কাইয়া গিয়াছে। তাই আবার কহিল, "ভয় কি, বল—কি চাও! কিছু খাবে?"

বিরজা ভাবিল, এত গুণ না থাকিলে আর আজ এমন গৃহে লক্ষ্মী তুমি! বিরজা কহিল, "আমি—আমি—"

মৃণাল কহিল, "হ্যাঁ, কিছু খাবে কি?"

"না, না, খাওয়া নয়, খাওয়া নয়—বল, আমার কথা রাখবে?" বলিয়াই সে মৃণালের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। দুধের বাটি রাখিয়া মৃণাল সস্নেহে তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল, কহিল, "ছি, পায়ে হাত দিতে নেই। ওঠ,—কি চাও, বল। যদি রাখবার হয়, কেন তোমার কথা রাখব না?"

বিরজার চোখে জল দেখা দিল। সে কহিল, "আমি বড় অভাগিনী, বোন্। রাজার মত স্বামী, চাঁদের মত ছেলে, অগাধ ঐশ্বর্য্য, আমার সব ছিল,—কিন্তু আজ কিছু নেই—পোড়াকপালী আমি সে সব খুইয়েছি—"

করুণ সমবেদনায় মৃণালের অন্তর ভরিয়া উঠিল, মন ভিজিয়া গেল। একখানা মাদুর বিছাইয়া সে কহিল, "বসো ভাই—বসে বসে বল—"

বিরজা বসিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে কহিল, "তোমার ঐ ছেলে,—বড়টি—তারই মত ছেলে! একেবারে তারই মত! তাই—তাই—"

মৃণাল কহিল, "তাই—কি, বল।"

বিরজা কহিল, "ওকে ক'দিন দেখে অবধি কোথাও আর আমি নড়তে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন আগুন জ্বলছে—এ যে কি জ্বালা, বোন, তা কি বলব!"

মৃণালের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—মধ্যাহ্নের প্রখর আলো তাহার যেন ঝাপসা বোধ হইল। মুখ হইতে অস্ফুট করুণ স্বর ফুটিল, "আহা!"

বিরজা কহিল, "তবু যাব,—আমায় যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে একবার বড় সাধ হচ্ছে, তোমার ঐ ছেলেটিকে বুকে তুলে নি—বুকে চেপে ধরি—ও চাঁদ-মুখে দুটি চুমু খাই! তাহলে এ জ্বালাও জুড়োয়—কতক জুড়োয়!"

মৃণাল কহিল, "তার আর কি! তবে এখন ত ছেলে বাড়ী নেই, স্কুলে গেছে। সে ফিরুক্। তুমি বিকেলে এসো।"

বিরজা কহিল, "কিন্তু তোমার স্বামী যদি আমায় দেখলে বকেন্? বাড়ী ঢুকতে না দেন?"

মৃণাল কহিল, "তাঁকে আমি কিছু বলবো না—তুমি এসো—"

কৃতজ্ঞতায় বিরজার প্রাণ পূর্ণ হইল। চোখের জল মুছিয়া আবার সে মৃণালের পায়ে হাত দিল। মৃণাল শশব্যস্তে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, "ও কি—ছি, ছি, আবার কেন পায়ে হাত দিচ্ছ, ভাই?"

"তাতে কিছু দোষ নেই, দিদি। তুমি সতীলক্ষ্মী, দেবতা! বেশী আর কি বলবো,

দিদি,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও!"

৫

সুশীলের সেদিন স্কুল হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইল। যে ভৃত্য আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া সংবাদ দিল, ছুটির পর স্কুলে ম্যাজিক হইবে। মাষ্টারবাবু বলিয়া দিলেন—খোকাবাবুরা তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গেই গৃহে ফিরিবে।

যথাসময়ে বিরজা আসিয়া মৃণালকে কহিল, "কৈ দিদি, ছেলে ত ফেরেনি এখনো—আমি স্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম,—বেরুতে দেখলুম না ত!"

মৃণাল তখন ম্যাজিকের কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বিরজা বলিল, "তা হলে আমি আবার আসব'খন! এখন যাই।"

মৃণাল কহিল, "কেন, বস না। ওপরে আমার ঘরে ততক্ষণ বসবে চল!"

বিরজা জিব কাটিয়া বলিল, "তোমার ঘরে কি আমি ঢুকতে পারি—দিদি? ও যে লক্ষ্মীর ঘর—আমার বাতাস ও ঘরে লাগা ঠিক নয়!"

মৃণালের অজ্ঞাতে তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর মথিত করিয়া ছোট একটি দীর্ঘ নিশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসে মিলাইয়া গেল। মৃণাল ভাবিল, আহা উন্মাদিনী, অভাগিনী!

মস্ মস্ করিয়া অভয় আসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মৃণালের ডাক পড়িল। মৃণাল স্বামীর কাছে গেল। স্বামী বলিল, "ও কার সঙ্গে অন্ধকারে বসে কথা কচ্ছিলে?"

"আহা, ও একটি মেয়েমানুষ—ছেলের শোকে স্বামীর শোকে মাথা ওর কেমন হয়ে গেছে!"

"তা এখানে কেন? কিছু চায় ত দিয়ে বিদেয় করে দাও না—"

"ও একবার শুধু সুশীলকে দেখতে চায়। আহা, ওর যে ছেলেটি ছিল, সেটি না কি আমাদের সুশীলেরই মত দেখতে!"

অভয়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "না, না, ও সব আব্‌দার শোনে না! কোথাকার কে মাগী—"অভয়ের স্বর শেষের দিকটায় চড়িয়া উঠিল। মৃণাল বাধা দিয়া কহিল, "আহা, অমন কথা বলো না গো,—আজই না হয় ও এমন হয়েছে, তবু ওর মায়ের প্রাণ ত বটে।"

মৃণাল কোন কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিরজা নাই, চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া মৃণাল পূজায় বসিতে যাইবে, এমন সময় মৃদু ভীত কণ্ঠে কে ডাকিল, "দিদি—" মৃণাল মুখ তুলিয়া দেখে, সেই উন্মাদিনী।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল, কহিল, "তুমি এই ঘরে এস ভাই,—আমি সুশীলকে ডাকিয়ে পাঠাচ্চি।"

সুশীল তখন বাহিরে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত গত রাত্রির ম্যাজিক লইয়া বিষম তর্ক তুলিয়াছিল এবং ম্যাজিক শেখাটা যে ভূগোল মুখস্থ করার চেয়ে অনেকখানি প্রয়োজনীয়, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে কিছুতেই ম্যাজিকের অসারতা বুঝাইতে পারিতেছেন না, এমন সময় দাসী আসিয়া

সংবাদ দিল, মা ডাকিতেছেন। তর্কটা সেইখানেই মুলতুবি রাখিয়া সুশীল এক লম্ফে উঠিয়া মাতৃ-সন্নিধানে ছুটিল; কহিল, "কি মা? ডাকছ?"

মৃণাল কহিল, "হ্যাঁ, একবার এ ঘরে এস ত বাবা—"

সুশীল ঘরে ঢুকিয়াই সেই উন্মাদিনীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! এই রে, মাগী বুঝি মার কাছে সেদিনকার লজেঞ্জেস ছোঁড়ার কথা বলিয়া দিয়াছে! বটে! আচ্ছা, পাগলীকে পরে মজা দেখাইব একবার।

বিরজার উপর একেই তাহার রাগ ছিল, আজ আবার মার কাছে তাহাকে দেখিয়া সে রাগ বাড়িয়া গেল। বক্র কটাক্ষে তাহার পানে একবার চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা—? ডাকছিলে কেন? শীগ্‌গির বল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার খুব ইয়ে চলেছে। দেখ মা, মাষ্টার মশাই বলে, ও ম্যাজিক-ট্যাজিক ও সব কিস্যু নয়! আচ্ছা মা, মাষ্টার মশাই ত এত জানেন, কত লেখাপড়া শিখেছেন,—কৈ, কওয়ান দেখি,—কাটা মুণ্ডুকে কথা কওয়ান দেখি, কাটা পায়রাকে জ্যান্ত করে দিন, দেখি। হ্যাঁ, তা আর পারতে হয় না!"

বিরজা স্থির দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া রহিল—আহা, এমন ছেলে! যেমন রূপ, তেমনই বুদ্ধি! তাহার মনে হইল, ছেলেকে ডাকিয়া সে বলে, ওরে বাছা আমার, যাদু আমার, কাহাকে তুই মা বলিয়া ডাকিতেছিস্? কে তোর মা—? ও নয় রে, ও নয়! আমি যে তোর ঐ তপ্ত স্পর্শটুকু পাইবার জন্য কাতর তৃষিত প্রাণে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, আমায় একবার মা বলিয়া ডাক্! ওরে আমি, আমি, আমিই তোর মা!

মৃণাল কহিল, "শোন একবার ছেলের পাগলামির কথা!—হ্যাঁ, ডেকেছি কেন, শোন্! ইনি একবার তোকে দেখতে চান—"

"কে, এই পাগলীটা—যাওঃ—এই বুঝি? আমি বলি, কি!" সুশীল চলিয়া যায় দেখিয়া বিরজা ছুটিয়া তাহাকে ধরিল,—ধরিয়া একেবারে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া তাহাকে বুকে চাপিল, ছোট মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

সুশীল রাগে আগুন হইয়া হাত-পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে, পাগলী কোথাকার। আমি বাবাকে বলে দোব। এ্যাঁ, ছাড় বলচি আমাকে!"

অভয় নীচে নামিতেছিল। সুশীলের চীৎকার শুনিয়া পূজা-গৃহের সম্মুখে আসিল। বিরজা বাহিরে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। মৃণালও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। সুশীল বিরজার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইতেছিল।

অভয় আসিয়া কহিল, "কি! হয়েছে কি? সুশীল অত চেঁচাচ্ছিল কেন?"

অভিমানের সুরে সুশীল কহিল, "দেখ না বাবা, ঐ পাগলীটা আমায় জাপটে ধরেছিল—মা ওকে কিচ্ছু বললে না—"

"কে পাগলী?" বিরজা কি ভাবিয়া মুখ তুলিল—অভয়ের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল। নিমেষের জন্য! তখনই বিরজা

চোখ নামাইল। অভয়ও দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া আসিল। বিরজা অমনি ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অভয় মৃণালকে কহিল, "ওকে এখানে ঢুকতে দিয়েছিলে, কেন?"

মৃণাল ব্যথিত স্বরে কহিল, "আহা, বেচারী বড় দুঃখ পেয়েছে!"

"দুঃখ পেয়েছে! তুমি তা হলে ওকে চিনতে পার নি!"

মৃণাল যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, "কেন, কে ও?"

"দেখবে, এস—" বলিয়া অভয় আপনার শয়ন-কক্ষে গেল; মৃণালও তাহার অনুসরণ করিল।

আর্শির টেবিলের টানা খুলিয়া অভয় একখানা কাগজে-মোড়া ফটোগ্রাফ বাহির করিল। সে এক কিশোরীর প্রতিকৃতি ছবিটা অনেকখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তবু একটা সুশ্রী মুখের ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়! ফটোখানা মৃণালের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অভয় কহিল, "এই দেখ—"

মৃণাল দেখিল, দেখিয়া কহিল, "এ্যাঁ—ও তবে—"

"সে।"

"দিদি!"

"চুপ! দিদি নয়, পাপীয়সী,—পিশাচিনী—! আজ কদিন ধরে ওকে এই বাড়ীর ধারে ঘুরতে দেখছি!"

মৃণাল স্বামীর পানে চাহিল, দেখিল, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারও চোখে জল আসিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বার্ণাড্ শ

"সভ্যতার প্রিয়শত্রু, বার্ণাড শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা থ!
মানুষেতে ভালবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ পায়, যে, করে বিচার,—
অন্যের পায়ের নীচে পড়ে যায় দ!
মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো॥
অপরে বোঝেনা, তাই নাটকেতে হাসো॥
হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্ঘর্ম্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!

সনেট পঞ্চাশৎ।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সনেট পঞ্চাশৎ' নামক নবপ্রকাশিত পুস্তিকায় 'বার্ণাড শ' শীর্ষক গাথাটি পাঠ করে আমার কোনো বন্ধুর এই সুপ্রসিদ্ধ, সুরসিক, আইরিশ সাহিত্যিকের পরিচয় জান্‌বার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মেছিল। যাঁর "চাবুকাঘাতে" "জীবনের মর্ম্ম" বোঝান যায়, তাঁর সম্বন্ধে জান্‌বার জন্যে উৎসাহিত হওয়া ত শিক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাঁরা 'বার্ণাড শ'-এর সাহিত্যের সহিত পরিচিত হন্‌নি, তাঁদের পক্ষে প্রমথবাবুর এই সনেটটি সহজে বোধগম্য হবার কোনো উপায় নেই। 'বার্ণাড শ'-এর গ্রন্থাবলী প'ড়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যে

ভাব মুদ্রিত হ'য়ে আছে, এই প্রবন্ধে আমি তারই একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব মাত্র।

যাঁরা সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাক্‌বেন যে ইংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে কুড়ি বছর পূর্ব্বে যে মত যে ভাব (আইডিয়া) কাজ করছিল আজ তার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে—সেখানে সর্ব্বত্রই যেন একটা নবজীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। নবযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অভ্যর্থনার আয়োজনে বর্ত্তমানযুগের যে কয়েকজন মহাত্মা ও কর্ম্মবীর ব্যাপৃত রয়েছেন, বার্ণাড শ তাঁদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠকর্ম্মী এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই, কেননা তিনি বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাস্রোতকে নূতন পথে প্রবাহিত করবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করেছেন। শ মহাশয়ের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে তাঁর জীবনের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বার্ণাড শএর জন্ম; তিনি তাঁর সাহিত্যে বহু স্থানে নানা ছলে প্রকাশ করেছেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব—এরাই পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়চে ও গড়বে। কথাটি মিথ্যে নয়—সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে কোনো জাতির মেরুদণ্ডটা সেই জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর দিয়েই যেন নির্ম্মিত। সাধারণতঃ ছেলেকে যেমন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে লেখা-পড়া শেখান হয়, শ-এর পিতা ছেলের শিক্ষার জন্য তেমনতর কোনো চেষ্টা করেননি। ছোটবেলা থেকে ছেলেকে তার নিজের পথে নিজেকে চল্‌তে দিয়েছেন—কোনোখানে তাকে বাধাগ্রস্ত করেন নি। এ জন্যেই তাঁর অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি ফুট্‌তে পেরেছিল এবং বাল্যকাল থেকেই শ স্বাধীনচিত্ত ও নির্ভীক হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছিলেন। ছোট বেলা থেকেই বার্ণাড শএর মধ্যে চিন্তার মৌলিকত্ব ও আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে—পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর বয়সে 'Cashel Byrons' Profession' নামক একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। ইংলণ্ডের কোনো কোনো নামজাদা সংবাদপত্র তাঁর এই কিশোর বয়সের লেখা উপন্যাস খানিকে "Novel of



বার্ণাড্ শ

the age" অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে প্রশংসা করেছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি প্রায় দশ বৎসর কাল ইংলণ্ডের বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রে সঙ্গীত, নাট্য ও আর্টের সমালোচনা লিখে কিছু উপার্জ্জনের সংস্থান করলেন। সব জিনিষকে স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখ্‌বার শক্তি তাঁর ছিল তাই "কষ্টিপাথরের" কাজে তিনি অপটু ছিলেন না। শ-এর সমালোচনা কখনও কখনও তীব্র হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর লেখা আদৃত হ'তে লাগ্‌ল। এর কিছু পরেই তিনি নাট্য লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। বার্ণাড্‌ শ socialist দলভুক্ত; যাঁরা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর রাখেন তাঁরা Fabian Socialist দলের নাম শুনে থাকবেন। শ এই দলভুক্ত হ'য়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও উদ্যমে এই সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক পদে ব্রতী হয়েছিলেন; হাইড পার্কে কখনও গরুর গাড়ী কখনও কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন।

বার্ণাড শ-এর সাহিত্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্‌। অবিশ্যি তাঁর লেখা-গুলির পরমায়ু আন্দাজ করে গণনা করা একটু শক্ত—যে কোনো লেখক সম্বন্ধেই একথা খাটে। ভবিষ্যতে শ-এর কোন্‌ কোন্‌ নাটক টিঁকে থাক্‌বে অথবা কতদিনই বা এগুলি মানুষের চিত্তকে উদ্বোধিত করতে পারবে বলা দুরূহ ব্যাপার। তবে লেখার রেখাগুলি দেখে খানিকটা আয়ু অনুমান করা যেতে পারে। যারা সমালোচক তারা বলেন আমাদের চেয়ে ভবিষ্যৎ বংশ শ-এর লেখার মর্ম্ম ভাল করে বুঝ্‌তে পারবে।

শ-এর নাটকে একদিকে যেমন হাসির ছড়িয়ে পড়েছে অপরদিকে লেখার ভিতর দিয়ে তেমনই এক আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য বিকীর্ণ হচ্ছে তাঁর লেখায় হাস্যরসের প্রাচুর্য্য দেখে কেউ কেউ তাঁকে "হাল্কা" মনে করেন, কিন্তু যাঁরা একটু তলিয়ে দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন শ-এর হাসি কি কঠিন! হাসির অন্তরালে যে কঠিন সত্যের তীক্ষ্ণ বাণী লুকোনো থাকে তার আঘাত ত কম নয়! John Bull's other island নাটকে Father Keegan বলছেন, "my way of Joking is to tell the truth" অর্থাৎ হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়েই আমি সত্য কথা বলে থাকি। এই হচ্চে শ-এর নিজের কথা।

তাঁর লেখার এই বিশেষ স্বরূপের জন্য ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা শ-কে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা এঁকে যাত্রাদলের সং মাত্র মনে করেন এবং এঁর সমালোচনার ভিতরে কোনো গাম্ভীর্য্য নেই বলে দোষারোপ করেন।

Mrs. Warrens Profession নামক নাটক খানি যখন বার হয়, সমস্ত পাদ্রী-মহল তখন ক্ষেপে উঠেছিলেন। শ তীব্র বাক্যবাণে সমাজের আবরণ ভেদ করে যে ব্যাধিটি সকলের দৃষ্টির সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, দুর্ব্বলচিত্ত, ধর্ম্মযাজকেরা সেই ভীষণ দৃশ্য সইতে পারলেন না। অথচ ব্যাধিটিকে ত অস্বীকার করবার জো ছিল না। যাই হোক্‌, সহস্র গালি ও তীব্র আক্রমণেও শ-এর অটল বিশ্বাসের ভিত্তি কেউ তিলমাত্র বিচলিত করতে পারে নাই। সুধু তাই নয়, এর সর্ব্বতোমুখী

প্রতিভার কাছে হার মান্‌তেই হয়—এজন্য শ-এর জাতিকে ধর্ম্মযাজকেরাও ম্লান করতে পারেন নি।

অবিশ্যি বিদ্রূপরাগে রঞ্জিত করে সত্যকে মানুষের দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড় করান বড় সহজ নয়। এখানে রঙের এম্‌নি নিপুণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন যাতে সত্যের আকৃতি কোনো প্রকারে অস্পষ্ট থেকে না যায়। এ হিসাবে শ একজন নিপুণ আর্টিষ্ট ছিলেন। আমাদের দেশে যাঁরা এই চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বহুলোকেই সত্যকে হয় বিকৃত না হয় অস্পষ্ট করে তুলেছেন। আধুনিক লেখকদলের মধ্যে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্র-লালের লেখায় অট্ট হাসির কলরব সত্যের বাণী ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারেনি! তাঁর রচিত হাসির গানে কখনকখনও, বিকৃতাবস্থাপন্ন বঙ্গীয় সমাজের ক্রন্দন ধ্বনি বেশ স্পষ্ট শোনা যেত। যেখানে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা সেখানে তিনি আঘাত করেছেন, যেখানে সমাজ ভাঙ্গাগড়ার সংঘর্ষণে আপনার আসন থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে, তিনি বিদ্রূপা-ঘাতে সে কঠিন সত্যকে বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিয়ে দিয়েছেন! য়ুরোপে Moliere, Heine প্রভৃতি সাহিত্যিকের লেখার ভিতরেও এই স্বরূপটি জাগ্রৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বার্ণাড শ-এর কোনো কোনো সমা-লোচক বলেন যে তাঁর লেখায় কবিত্বের মাধুর্য্য আদৌ নেই—সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তীব্র সমালোচনা বিদ্রূপের রঙে রঞ্জিত করে তিনি তাঁর পাঠকের মনে একটা ক্ষণিক আনন্দরসের সৃষ্টি করেন মাত্র। কিন্তু শ-এর নাট্যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না একথা যাঁরা তাঁর বই পড়েছেন তাঁরা বল্‌তে পারেন না। ১৯১১ সালে Getting Married নামক একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। একটি অঙ্কেই নাটকখানি সমাপ্ত করা হয়েছে বলে নাটক খানিতে ভাষার ও চরিত্র বর্ণনের বাঁধন বেশ পরি-পাটি হয়েছে। একদিকে ভাষার লালিত্য অপরদিকে design ও চরিত্র বর্ণনের নিপুণতা নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেছে!

কেউ কেউ বলেন Getting Married নাটকখানিতে কথাবার্ত্তারই ছড়াছড়ি বেশি, সেখানায় কোনো plot নেই। কিন্তু নাটকের বাহিরের আকৃতি দেখে তার বিচার চলে না। নাটকের ভিতরকার কারুকার্য্যেই নাটকের সার্থকতা! মানব চরিত্রের বহু বিচিত্রতা, মানবজীবনের সংগ্রামকাহিনী ও চরিত্র রচনার আশ্চর্য্য নিপুণতা যেখানে ফুটে উঠেছে, সেখানেই নাটক সাহিত্যক্ষেত্রে অমরতা লাভ করেছে। শ-এর এই নাটক-খানিতে মানুষের অন্তরের ইতিহাস গোপন থাকেনি—আমাদের জীবনধারাকে যে পথ দিয়ে প্রবাহিত হ'তে হয় সেই সুখদুঃখ হাসিকান্না, জয় পরাজয়ের পথটিই তিনি তাঁর নাটকের ভিতরে অঙ্কিত করেছেন। এবং ইংরেজি সাহিত্যে নাটকের যেখানে বিশেষত্ব অর্থাৎ ভাষার লালিত্য ও মনোহারিত্ব, শ-এর লেখার ভিতরেও তার অভাব ঘটেনি।

Man and Superman, Candida, প্রভৃতি নাটকের ভাষা সাহিত্যিক মাত্রেই প্রশংসা করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ-এর নাটকে চরিত্র বর্ণন হচ্চে আর একটি বিশেষত্ব। John Bull's other Island-এর চরিত্রগুলি যেমন বিদ্রূপের (irony) তুলিতে অঙ্কিত, 'Doctor's Dilemna' তে তেমনি হাসির পোষাকে (Satire) চরিত্রগুলিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে—এবং দু'টো নাটকেই চরিত্রগুলি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হ'য়েছে।

যাঁরা বার্ণাড শ-এর গ্রন্থ পাঠ করেছেন বা পাঠ করবেন তাঁদের কাছে শ-এর নাট্যভাব (আইডিয়া) কখনও অদ্ভুত, কখনও অস্বাভাবিক এবং কখনও অসম্ভব বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শ-এর নাটকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌লে চল্‌বেনা—বস্তুত তেমন করে কোনো জিনিষেরই সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর সমস্ত রচনার ভিতরেই শ-এর যথার্থ পরিচয়টি লুকোনো আছে এবং সেইটিই তাঁর সত্য পরিচয়।

বার্ণাড শ-এর ব্যক্তিগত বা সামাজিক নৈতিক আদর্শ তাঁর দার্শনিক মতপ্রসূত। নরওয়েতে ইবসেন্, জর্ম্মানিতে নিট্‌চে প্রভৃতি চিন্তাশীল দার্শনিকগণ যে আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় জন্মলাভ এবং যে চিন্তা-স্রোতে অবগাহন করেছিলেন, শ সেই জলবায়ুর স্পর্শ লাভ করেছিলেন! তাঁর আইডিয়ার সঙ্গে এই সকল দার্শনিক মহাপুরুষের মতের যথেষ্ট ঐক্য ছিল। কিন্তু একই সত্য নানা মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে। বার্ণাড শ বলেন, এই দার্শনিকদের আইডিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার বহু পূর্ব্ব থেকেই তিনি তাঁর মত প্রচার করেছেন।

সুবিখ্যাত দার্শনিক বীরণসো Elan vital বলে যে শক্তিতত্ত্ব প্রচার করচেন, সে কথার সঙ্গে বার্ণাড শএর life forceএর কোনো তফাৎ নেই। আমাদের জীবন যে এক মহাযাত্রার পথে চল্‌চে, যতটা পথ সে এগিয়ে যাচ্চে, কখনই আর সে পিছিয়ে পড়বেনা—এ যাত্রা ব্যর্থ নয় এক মহাশক্তির প্রেরণায় নিরন্তরই আমাদের জীবন অনন্তপথের দিকে ছুটে চল্‌চে। আমরা পাপীও নই সাধুও নই, আমরা এই শক্তির হাতে যন্ত্রের মতন—যখন শক্তির আদেশ মেনে চলি সুখ ঘটে, যখন অমান্য করি আমাদের জীবন ব্যর্থতার বেদনা অনুভব করতে থাকে।

শ-এর ধর্ম্মমত তার ক্ষুদ্র নাটক—The Shewing up of Blanco Posnet'-এ বেশ স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। আমেরিকার পশ্চিমভাগে ঘোড়া চুরি করে Blanco Posnet দিন কাটাত—একদিন তার অন্তঃকরণে সে গভীর বেদনানুভব করতে লাগল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে ধরা দিলে। এম্‌নি করে যখন তার ভিতরে যথার্থ পরিবর্ত্তন এল, একে একে তার দলভুক্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলিও পাপের রাস্তা পরিহার করে Posnetএর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে। তারপর Posnet এই নবজীবনের আস্বাদ পেয়ে বুঝ্‌তে পারলে জীবনের সার্থকতা কোথায় এবং এই জীবনের অর্থ ই বা কি!

আমি পূর্ব্বে বলেছি, শ একজন Socialist। কিন্তু সাধারণ Socialist দের মত থেকে এঁর মতের একটু পার্থক্য আছে। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের মতামত অনুসারে দেশের শাসন কার্য্য চল্‌বে, একথা তিনি সঙ্গত বলে মনে করতেন না। এই অর্থে তিনি গণতন্ত্রবাদী ছিলেন না, বরঞ্চ শাসনসংরক্ষণ

কার্য্য অভিজাতবর্গ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় এই বিশ্বাস করতেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতা সমাজের নিম্নস্তরে যে দুঃখ ও দরিদ্রতার বোঝা জমিয়ে তুলচে তার প্রতিকার না হলে সমস্ত সভ্যতার গৌরব নষ্ট হবে শ এ কথা বারম্বার বলেছেন। তিনি Socialistদের দলভুক্ত ছিলেন, কেননা সমাজের এমন অনেক ব্যাধি তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার কাছে এত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে Socialistদের মধ্যেই সে গুলির প্রতিকারের চেষ্টা লক্ষ্য করে, মহাপ্রাণ শ নিরস্ত থাকতে পারেন নাই। Play Unpleasant নাম দিয়ে তিনি যে নাটকাবলী প্রকাশ করেছেন, তাতে সমাজের বিকৃতাবস্থার তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করে ইংলণ্ডের জনসাধারণচিত্তকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

শএর এই তীব্র সমালোচনা, এই চাবুকাঘাতই ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তাঁরা শ-কে অধার্ম্মিক, বাচাল, সয়তান বলে গাল দিয়েছেন। শ নিজেই কিছুদিন পূর্ব্বে গর্ব্ব করে নিজেকে "Specialist in immoral and heretical play" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথার বিপরীত কাজই immoral, কিন্তু যেখানে নিরন্তন পরিবর্ত্তনের স্রোত বইচে, সেখানে ত কোনো জিনিষই স্থির থাকতে পারে না। এই স্রোতের মুখে সব জিনিষকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে দেওয়া আর্টের একটি মস্ত কাজ।

শ-এর সাহিত্যে সংযমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক দুর্গতি সম্বন্ধে লিখ্‌তে গিয়ে অনেকে ভাবরাজ্যের স্বপ্নলোকে গিয়ে উপস্থিত হন্—তাঁরা এক একটা বিষয়কে এত অতিরঞ্জিত করে তোলেন যে তাতে অনিষ্টই হয়। শএর imotional balance অর্থাৎ ভাবের সামঞ্জস্য এম্‌নি সম্পূর্ণ ছিল যে কোনো বিষয়ে তিনি এক চোখো বিচার করেন নি। "Preface on Doctors." প্রবন্ধটি পাঠ করুন সেখানে দেখ্‌বেন ডাক্তারদের কোনো ত্রুটি লেখকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি,—তাঁর লেখনীর সমস্ত বিষ প্রয়োগ করে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনা লিখ্‌লেন, তার পরই লিখ্‌চেন "The true doctor is inspired by a hatred of ill-health, and a divine impatience of any waste of vital forces." অর্থাৎ—দূষিত স্বাস্থ্যের প্রতি খাঁটি চিকিৎসকের তীব্র ঘৃণা থাকবে এবং যেখানেই জীবনী-শক্তির অপচয় দৃষ্টি হবে সেখানেই তিনি বিদ্রোহী হবেন।

এতক্ষণ আমি সাহিত্যিক বলেই শএর পরিচয় দিয়ে আস্‌চি কিন্তু তাঁর মতন কর্ম্মী সাহিত্যিক দলের ভিতর সচরাচর দেখা যায় না। নিজের ঘরটিতে বসে কেবল নাটক লিখে, সমালোচনা করে, কেহ কোনোদিন কাউকে "জীবনের মর্ম্ম" শেখাতে পারেনি।

বার্ণাড শ-এর দৈনন্দিন জীবন যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের বইতে তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত পাঠ করে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়। একদিকে Fabian Society র জন্য তিনি যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, আবার নাটক, সঙ্গীত, ইত্যাদির উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত ইংলণ্ডের বহুস্থলে নানা সভাসমিতির তিনিই প্রধান উদ্যোগী। যেমন তাঁর সবল দেহ, তেমনি

তাঁর উদারপ্রসন্ন নির্ভীক চিত্ত; সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন তাঁর প্রতিভা, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেম্‌নি তাঁর অক্লান্ত উদ্যম। সিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ, সাহিত্যিক বার্ণাড শ যা বলেছিলেন, সেই কথা ওঠে। (ইহার নাম Professor Henderson ইনি সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল এখানে এসেছিলেন।) সে কথা ক'টি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধটি শেষ করব:—

"I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no 'brief Candle' for me. It is a sort of splendid torch, which I have got hold of for the moment; and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations." ভাবার্থ এই:—মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি জীবনের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে কর্ম্ম দেবতার পূজায় উৎসর্গ করতে চাই। আমি জীবনের মাঝেই আনন্দের উৎসব পেয়েছি। জীবনটাকে আমি নির্ব্বাণোন্মুখ একটি প্রদীপ মনে মনে করি না—এ যেঅপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলোক শলাকা! ভবিষ্যৎবংশের হাতে এ আলোক শলাকা তুলে দেবার পূর্ব্বে যেন এর আলো ম্লান না হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চুড়িওয়ালা

(গল্প)

"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।"

দুপুর বেলা যখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, গলির পথে লোক চলিতেছে না, ঘরে ঘরে গৃহিণীরা কাজকর্ম্ম সারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একটু গা-গড়া দিতেছেন, তখন নিজের পসরা মাথায় করিয়া পথে পথে চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া ফিরিতেছিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

গলির ধারের একটি জানলা অল্প একটু খুলিয়া একটি কিশোরী মেয়ে ডাকিল—"অ চুড়িওলা, চুড়িওলা! এই বাড়ীতে এস।"

চুড়িওয়ালা ফিরিয়া দুই হাতে মাথার ঝুড়ি উচুঁ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া উপরে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কনে, কেডা ডাকছ গো?"

কিশোরী বলিল—"এই যে এই বাড়ীতে।"

চুড়িওয়ালা দেখিল একটি তন্বী সুন্দরী কিশোরী একখানি চৌড়া লাল পেড়ে শাড়ীতে মাথায় আধঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শাড়ীর চৌড়া লাল পাড়টি মাথার মাঝখানে সিদুঁরের মতো টকটক করিয়া যেন



পুষ্পলক্ষ্মী
শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

লিতেছে। কিশোরীর নাকে একটি নোলক, নে দুটি দুল—গায়ের রঙের সঙ্গে সেগুলি ন মিশিয়া লুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দখিয়াই বুড়া আলিজানের মনটা খুসি হইয়া ঠিল। এমন মধুর রূপ সে আর কখনো দেখে নাই; অনেক সুন্দরীকে সে চুড়ি বেচিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া তাহার প্রাণ এমন খুসি হইয়া উঠে নাই। সে হাতের ঝুড়ি মাথায় নামাইয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরীটি নামিয়া আসিয়া চুড়িওয়ালার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"লাল চুড়ি আছে চুড়িওলা?"

চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"আছে মা লক্ষ্মী! কার হাতের চাই? তোমার হাতের?"

কিশোরী ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল—"হাঁ।"

বুড়া আলিজান মাথার মোট নীচে নামাইয়া উপরের ঢাকা খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিল—"তা লাল চুড়ি ত তোমার ও লাল হাতে মানাবে না মা লক্ষ্মী! —রঙে রঙে মিশে যাবে যে? ঐ রাঙা হাতে কালো চুড়ি ভালো মানাবে। কালো চুড়ি দেবো?"

কিশোরী লজ্জায় লাল হইয়া হাসিমুখ নত করিয়া বলিল—"না, লাল চুড়ি বা'র কর।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"মা আমার লালির ভক্ত! এস ত মা হাত দেহি।"

কিশোরী লজ্জিত হইয়া বলিল—"না, তুমি চুড়ি দাও, আমি দেখে নিচ্ছি।"

চুড়িওয়ালা বলিল—"তোমার হাতে পরায়ে দেবো না মা?"

কিশোরী বলিল—"না, আমি মার কাছে পরব।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"না মা, তা হবে না; ও রাঙা হাতে রাঙা চুড়ি আমি পরায়ে দিয়ে যাব। তা যদি না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না।"

বুড়া মনে করিতেছিল এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সে ত কত বাড়ীতে কত মেয়ের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চুড়ি পরাইয়া দিয়াছে। কত স্পর্শ তাহাকে ক্ষণিকের জন্য একটু বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কেহই ত মুগ্ধ করিতে পারে নাই। আজ বুড়ার মনে হইতে লাগিল এই সুন্দরী কিশোরীটির হাতে যদি সে চুড়ি পরাইয়া দিতে না পারে, তবে তাহার এই ব্যবসা মিথ্যা পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে; এই হাতখানিরই সন্ধানে সে সমস্ত জীবন রোদে রোদে গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বয়স কাটাইয়াছে, তাহার কাঁচা চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। তাই যখন সেই কিশোরী তাহার কাছে চুড়ি পরিবে না বলিল তখন বুড়া বলিয়া বসিল—"তা যদি পরাতে না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না!"

এই কথায় কিশোরীর ভারি লজ্জা বোধ হইল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিয়া বুড়ার কাছে বসিয়া তাহার সুন্দর সুকোমল হাতখানি বাড়াইয়া দিল—তাহার মুখে লজ্জার আভাস শাড়ীর লাল পাড়ের ছায়ার মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চুড়িওয়ালা মৃণালসংযুক্ত পদ্মের কলির মতো কিশোরীর হাতের মুঠিটিকে নিজের দুই

হাতের মধ্যে ধরিয়া একবার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহের আবেগ দিয়া চাপিয়া চুড়ির মাপ ঠিক করিয়া লইল। বুড়ার মনে হইতেছিল যদি সে এই সুন্দর সুকোমল পদ্মের কলির মতো হাতখানি চোখের জলে ধুইয়া চুমায় চুমায় একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তারপর নিজের পসরাটি উজাড় করিয়া দিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায়, তবেই তাহার উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগ কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা লাভ করিয়া শান্ত হইতে পারে।

চুড়িওয়ালা কিশোরীর হাত দুখানিকে নিজের হাতে ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া লাল চুড়ি একগাছির পর একগাছি করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিল। বেদনায় কিশোরীর মুখ একটু কুঞ্চিত হইলে সে বেদনা সহস্রগুণ হইয়া বুড়ার বুকে গিয়া বাজিতেছিল, আর বুড়া বলিতেছিল—"বড্ড কি লাগতিছে মা? একটু সহ্য কর মা, তা হলি এ চুড়ি তোমার হাতে চাপে বসয়া যাবে, সে যা মানাবে মা!"

কিশোরীর চোখ ছলছল করিতেছিল, তবুও সে বুড়ার কথা শুনিয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়া হাসিল—হাসিতে দুটি গালে দুটি টোল পড়িল।

চুড়ি পরাইয়া দিয়া চুড়িওয়ালা আপনার ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভালো ভালো পুতুল, কড়ি-বসানো বাক্স, খেলনা, ফুলদান বাহির করিল।

কিশোরী তাহা দেখিয়া বলিল—"ওসব আমার কিছু চাইনে।"

বুড়া হাসিয়া বলিল—"তোমার না চাই তোমার খোকাকে দিয়ো।"

কিশোরী লজ্জায় আপাদমস্তক লাল হইয়া উঠিয়া মাথা নত করিল।

তাহার শাশুড়ী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বৌমা, এখনো ত খোকা হয় নি, ওসবের দরকার নেই।"

চুড়িওয়ালা তাহার ঝুড়ির উপর ঢাকা চাপা দিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"তা না হোক, আমার মা-ই ত এখনো খুকি আছে, মা-ই খেলবে।"

কিশোরী বধূর শাশুড়ী বলিলেন—"ওগুলোর কত দাম?"

চুড়িওয়ালা ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ওসব আমি মাকে দেলাম।"

শাশুড়ী বলিলেন—"ওমা, সেকি কথা হয়! ওগো চুড়িওলা, তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও গো, দাঁড়াও, দাম নিয়ে যাও!"

ততক্ষণে চুড়িওয়ালা পথে বাহির হইয়া পড়িয়া খুসি মনে হাসিমুখে হাঁকিতে হাঁকিতে যাইতেছে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

সেই দিন হইতে চুড়িওয়ালা নিত্য দুপ্রহরে সেই গলির মধ্যে চুড়ি বেচিতে আসিতে লাগিল। চুড়ি ত আর নিত্যকারের প্রয়োজনীয় নয়, তাহাকে কেহ আর ডাকিত না। কিন্তু তাহার ডাক শুনিলেই সেই কিশোরী বধূটি একবার জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, আর বুড়া চুড়িওয়ালা দুই হাতে ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লইত; দুজনে চোখোচোখি করিয়া সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়া আপনাদের একটি দিনের ক্ষণিক পরিচয়ের গভীর প্রীতির সম্পর্কটি স্বীকার করিয়া যাইত।

কিশোরী বধূর শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন—কি বৌমা, তোমার খোকা এসেছে বুঝি? আসা তোমার পাকা-দাড়িওলা খোকাটি আছা!"

কিশোরী বধূ আনন্দের লজ্জিত হাসি হাসিয়া জানলা হইতে সরিয়া যাইত।

চুড়িওয়ালা ভাবিত সে যদি চুড়ি বেচা ছাড়িয়া দিয়া আলু পটল কি কেরোসিন তেল বেচিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে রোজ তাহার মায়ের বাড়ীতে যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু চুড়ি না বেচিলে ত সেই পদ্ম-কলির মতো মুঠিটি দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও স্নেহের ধারা মুক্ত করিয়া দিবার সুযোগ ঘটিবে না। সেই সুদূরের সুযোগের প্রত্যাশাতেই বুড়া চুড়ির পসরা মাথায় করিয়া দুপ্রহর রৌদ্রে গলিতে গলিতে হাঁকিয়া ফিরিত—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই কিশোরী জানলায় তাহার নিয়মিত হাজরী বন্ধ করিয়া দিল। বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া হাঁকিয়া ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া যায়, উপরের সেই গরাদে-দেওয়া জানলার ফাঁকে সেই সুন্দর মুখখানি আর লজ্জিত স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঁকি মারে না। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফেরি সারিয়া ফিরিয়া যায়, কিন্তু ফিরিতে তাহার মন চাহে না, পা চলে না।

কিছুদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁকের পর হাঁক দিয়াও যখন আর সেই জানলায় সেই মুখখানি কিছুতেই দেখা দিল না, তখন একদিন চুড়িওয়ালা সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, চুড়ি লেবেন?"

বাড়ীর মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"না গো।"

চুড়িওয়ালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কনে গা?"

ঘরের মধ্য হইতে আবার রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"এখানে নেই গো।"

সহস্র প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইলেও আর তাহার সাহসে কুলাইল না, সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চলিয়া গেল—সে ক্ষীণ, গতি তাহার মন্থর, পথে পথে সে আর "চুড়ি চাই" বলিয়া হাঁকিলও না।

এখানে সে নাই। কিন্তু কবে আসিবে তাহারও ত স্থিরতা নাই। প্রতিদিন আশা বহিয়া চুড়িওয়ালা সেই গলিতে আসিয়া উচ্চস্বরে হাঁকে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!" একবার, দুবার, তিনবার! তারপর সেই শূন্য জানলাটির দিকে ছলছল দৃষ্টি তুলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ফিরিয়া যায়। পরদিন আবার আসে।

এমনি করিয়া কত মাস গেল। পূজা আসিল। আজ ঘরে ঘরে চুড়ি কেনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে—সধবা কুমারী, তরুণী বালিকা, সবাই মনের মতন চুড়ি বাছিয়া বাছিয়া কিনিতেছে; চুড়িওয়ালা তাহাদের মুঠি হাতে লইয়া চুড়ির পর চুড়ি পরাইয়া দিতেছে! কিন্তু তাহার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন

হইতেছে না, প্রবোধ মানিতেছে না। তাহার মায়ের মতন সুন্দর হাত আর কাহারো না, তেমন নরম মুঠি আর কাহারো না, তেমন মধুর হাসি আর মিষ্ট কথা আর কাহারো না।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া বুড়া ক্লান্ত হইয়া আবার একদিন সেই বাড়ীর সামনে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার করিয়া হাঁকিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।" কিন্তু কাহারো সাড়া পাইল না, কেহ তাহাকে জানলা হইতে ডাকিল না—"ও চুড়িওলা, চুড়িওলা, এই বাড়ীতে এস!" সেই জানলা তেমনি শূন্য, তেমনি নিরানন্দ! তখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চুড়িওয়ালা ডাকিল—"চুড়ি লেবেন মাঠাকরুণ?"

একজন ঝি বিরক্ত হইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"না গো না, একশ দিন বলেছি চুড়ি চাই নে, তবু কেন জ্বালাতে আস বল দিকিন? দরকার হয় রাস্তা থেকে ডেকে নেব।"

চুড়িওয়ালা ভয়ে লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে চোরের মতো ফিরিয়া যাইবে, এমন সময় দেখিল সেই কিশোরী বধূর শাশুড়ী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কি এহনো আসে নাই?"

শাশুড়ী ম্লানমুখে উদাস ভাবে চুড়িওলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসেছে।"

চুড়িওলা একমুখ হাসিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে বলিল—"মা ঠাকরুণ, একবার তানাকে দেখতি পাই না? মারে আমার কতকাল দেহিনি—দেখতি আ'স' আসি' ঘুরি যাই, দেখতি পাই না?" শাশুড়ী কিছুক্ষণ [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিয়া ধরি কণ্ঠে বলিলেন—"না বাবা, তার সঙ্গে আ দেখা হবে না।"

বুড়ার আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখ একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যেন নিবিয়া গেল। সে ব্যথিত ছলছল দৃষ্টিতে একবার বধূর শাশুড়ির দিকে চাহিয়া হতাশ মনে গমনে অনিচ্ছুক পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল। এই পূজার সময় বাজার চুঁরিয়া সব চে ভালো এক জোড়া চুড়ি পছন্দ করিয়া আনি ছিল তাহার সুন্দরী মা-টির হাত নিজের হা ধরিয়া পরাইয়া দিবে বলিয়া। কিন্তু যেখানে ভালো বাসিবার অধিকার আছে, পাইবার দাবী করিবার অধিকার নাই, সেখানে কেমন করিয়া জোর করিবে? সেই কিশোরী বধূটি যদি তাহার কন্যা হইত, তবে কি তাহার শাশুড়ী তাহাকে এমন করিয়া বিমুখ করিয়া হতাশ করিয়া ফিরাইতে পারিত? বুড়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পতনোন্মুখ অশ্রু গামছায় মুছিয়া ফেলিল। সদর দরজা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়া চুড়িওয়ালা থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ঘাড় ঘুরাইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল। তার পর আবার ফিরিয়া মন্থর কুণ্ঠিত পদে বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

চুড়িওয়ালা দেখিল বধূর শাশুড়ী তখনো রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। চুড়িওয়ালা গলায় গামছা দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া মিনতি-বিগলিত স্বরে বলিল—"মা

[illegible]করুণ. মুই চুড়ি বেচতি আসি নাই। একডা বার মায়েরে মোর দেহি যাতাম!"

এই বলিতেই বুড়ার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া বেদনা-ভরা মিনতি অশ্রুজলে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বধূকে একজন নিঃসম্পর্ক পথের লোকের সামনে বাহির করিবার পক্ষে যেটুকু আপত্তি ছিল বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা তাহা চোখের জলে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিল। চোখের জল এই বৃদ্ধ মুসলমান চুড়িওয়ালার সহিত কিশোরী বধূর একটি প্রাণের টানের নিকট সম্পর্ক এক নিমেষে প্রমাণ করিয়া দিয়া গেল। বধূর শাশুড়ী এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে তাকাইয়া অক্ষিপল্লব হইতে কম্পমান অশ্রুবিন্দু মুছিয়া, অশ্রুপূর্ণ স্বরে ঝিকে বলিলেন—"মোক্ষদা, বৌমাকে একবার ডেকে দে!"

কিশোরী বধূ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত জড়িত পা ফেলিয়া চুড়িওয়ালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চুড়িওয়ালা এক মুখ হাসিয়া কোঁচার খুঁট হইতে কাগজের বাক্স খুলিয়া এক জোড়া বিচিত্র বর্ণের জড়োয়া কাঁচের চুড়ি বাহির করিয়া বলিল—"মা, হ্যা ছাহ, তোমার জন্যি মুই জুবিলি চুড়ি আন্যাছি!"

চুড়িওয়ালা হাসিমুখ তুলিয়া চুড়ি জোড়া কিশোরী বধূর হাতে দিতে গিয়া দেখিল কিশোরীর হাতে কোনো গহনা নাই! তাহার লাল হাত হইতে তাহার অত সখের লাল চুড়ি সে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে; সিঁথি হইতে সিঁদুর মুছিয়া ফেলিয়াছে; মাথার উপর রুক্ষ-পেড়ে শাড়ীর চৌড়া লাল পাড় আর হাসিতেছে না; পায়ে লাল আলতা নাই; ঠোঁটে লাল পান নাই; নাকে নোলক নাই, কানে সে সুন্দর দুল নাই; মুখে সে ভুবনভুলানো হাসিটুকুও নাই! একখানি শুভ্র থান তাহার যূথির মতো শুভ্র সুন্দর ম্লান মূর্ত্তিখানি কুণ্ঠিত ভাবে জড়াইয়া যেন মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। এই মূর্ত্তিমতী শোকের মূর্ত্তি দেখিয়া চুড়িওয়ালা চুড়ি-জোড়া আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই চূর্ণিত চুড়ির মতোই ভাঙা বুকের মধ্য হইতে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে চোখ চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—মা রে, এ মুই কী ত্যাখলাম! অ্যার আগে মুই মলাম না ক্যান!"

কিশোরী মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া চলিয়া গেল, তাহার শাশুড়ী চোক মুছিতে মুছিতে ঘরে চলিয়া গেলেন। আর বুক-ভাঙা বুড়া চুড়িওয়ালা দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে পসরা মাথায় তুলিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-সংবাদে

দেশ :— তোকিও। কাল :— ২রা সেপ্টঃ ১৯১৩। পাত্র :— ওকাকুরা য়ান। জ্ঞানী, গুণী, ভারতপ্রেমিক ও বন্ধুবৎসল।

দেহ তার নাই,
পুড়ে হ'ল ছাই,—
এই মাত্র জানি।
দেহী কিন্তু রয়,
নাহি তার ক্ষয়,
এই সত্য মানি॥

বিশাল সে মন,
বিশ্ব-আয়তন,—
মরিতে কি পারে ?
বিপুল সে হৃদি,
অগাধ বারিধি,—
শুকাইতে নারে ॥
প্রগাঢ় সে প্রেম,
অগ্নিশুদ্ধ হেম,—
না ফুরায় দানে।
অপার সে জ্ঞান,
দেশের কল্যাণ
সাধিবে সমানে।
জনমান্তরীণ
ছিল কোন ঋণ,
শুধিতে ভারতে।
সাঙ্গ সেই কাজ,
তাই তুমি আজ
ত্যজিলে মরতে ॥
ভিন্ন জাতীয়তা
প্রাণের একতা
নাহি করে রোধ।
ভারত জাপান,
সোদর সমান
করে শোক বোধ ॥
হে সুধী, হে বীর,
হে বন্ধু সুধীর !
—হউক সুগতি।
দূর হতে দূরে
লহ সুরপুরে
মোদের প্রণতি ॥

স্বর্গগত শ্রীমদ্ওকাকুরা

আমাদের দেশে যেমন, জাপানেও তেমনি একদিন পাশ্চাত্য শিল্প জাপানবাসীর সনাতন সভ্যতার পূর্ব্বভাবটুকু ঘুচাইয়া দিয়া জাপান শিল্পকলার যে অবশ্যম্ভাবী পতনের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশের শিল্পকে যথাস্থানে অটল অচল বজ্রাসনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন মহামনা আচার্য্য ওকাকুরা।

কি বিরাট মানসিক শক্তি লইয়া, স্বজাতীয় শিল্পে কি অচলা ভক্তি প্রগাঢ় আস্থা লইয়াই এই মহাপুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন !

জাপানের রাজাপ্রজা যখন শিল্পে পাশ্চাত্য প্রথার বহুল প্রচারে বদ্ধপরিকর, যখন জাপানে ভাবস্রোত নব্যতার একটা প্রবল আকস্মিক আকর্ষণে পশ্চিমের দিকে বিপরীত-মুখী হইয়া প্রলয় কল্লোলে করাল অনির্দ্দিষ্টের দিকেই বহিয়া চলিয়াছে, সেই দুর্দ্দিনে এই মহামনা দৃঢ়চেতা উদ্যমশীল পুরুষ নিজের পদ মান সকলি তুচ্ছ করিয়া বন্যার মুখে অটুট অভেদ্য বাঁধের মত আপনার সমস্ত সংকল্প, সমস্ত উদ্যম আশা বিস্তৃত করিয়া একা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই মহাক্ষণে শিল্পাচার্য্য ওকাকুরাকে অনুসরণ করে এমন সাহস কাহারও হয় নাই। জাপানের সেই কালরাত্রির অন্ধকারপটে ওকাকুরা সেদিন তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র রূপে প্রকাশ পাইলেন।

ওকাকুরা ছিলেন ক্ষত্রিয় সন্তান। বিপুল

বাধা দলিত করিয়া স্বদেশের শিল্পকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষাত্রতেজেরই পরিচয় দিয়া গেলেন।

রাজ-অনুগ্রহ, সম্মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য-পন্থী শিল্পীকুলের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া যেদিন জাপানের সরকারি শিল্পশালা হইতে স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন সেদিন জাপানের পক্ষে শুভদিন বলিতে হইবে। কেননা ইহারই ছয়মাসের মধ্যে শ্রীমদ্-ওকাকুরা প্রমুখ চত্বারিংশ শিল্প-মহারথী তাঁহাদের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-রূপ মহাযজ্ঞে নিজেদের সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিলেন এবং তাহাতেই স্রোত ফিরিয়া গেল ও জাপানে মুহ্যমান শিল্প নবজীবনের মধ্যে আর একবার বিকশিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইল।

আচার্য্য ওকাকুরার যখন প্রথম পরিচয় লাভ করি তখন আমি আমার সারাজীবনের কাযটুকু সবেমাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছি, আর সেই মহাপুরুষ তখন শিল্পজগতে তাঁর হাতের কায সার্থকতার পরিসমাপ্তির মাঝে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া জীবনে দীর্ঘ অবসর লাভ করিয়াছেন এবং ভারত মাতার শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া "Asia is one" এই মহাসত্যের—এই বিরাট প্রেমের বেদধ্বনি জগতে প্রচার করিতেছেন।

ভারত কলালক্ষ্মীর উপর তাঁহার সেদিন যে শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া ছিলাম, মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে আর একবার তাহার পরিচয় তিনি আমাদের দিয়া যাইতেই যেন শেষবার এখানে আসিয়া ছিলেন। ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই কথা বলিয়া আমাদের নিকটে বিদায় লইলেন—দশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া শিল্প দেবতাকে তোমাদের মাঝে দেখি নাই, এবার আসিয়া তাঁহার আবির্ভাবের সূচনা মাত্র দেখিয়া গেলাম, পুনরায় যখন আসিব যেন তাঁহাকেই দেখিতে পাই এই কামনা।

এবার ভারতে আসিয়া প্রবাসের শেষ রাত্রি তিনি ভারত মহাসাগরের তীরে কোণার্ক মন্দিরে যাপন করিয়া অন্ধকারের পারে আলোকের দর্শন পাইয়া সত্যই চলিয়া গেলেন বিরাট আনন্দ সাগরের পরপারে আপনার গৃহে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্তি

(গল্প)

পল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আজ বইখানা লেখা শেষ হইয়াছে। যার জন্য সে দিনে বিশ্রাম করে নাই, রাত্রে ঘুমায় নাই, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই এক চিন্তার মধ্যে ডুবিয়াছিল, সে কাজের আজ অবসান হইল। দীর্ঘ দারুণ পরিশ্রমের পর মুক্তির আনন্দ তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছে।

লেখকের পক্ষে একখানা ভালো বই রচনা করার মত বালাই আর নাই। সেই লেখাটাই তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়—কারণ পরবর্ত্তী সকল লেখাই সেই লেখাটারই কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়।

সাত বৎসর পূর্ব্বে পলের প্রথম রোমান্স প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই লেখাটা তাহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিল। অপরিচিতের ভিড় হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তখনকার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করিল। তারপর প্রলোভন আসিল। প্রকাশকের দল আসিয়া কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিল—কত টাকা পাইলে তিনি বইখানার স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু সে প্রলোভনে ভুলিবার পাত্র নয়—সকলকে হাঁকাইয়া দিল। তাহার দুবেলা দুমুঠা অন্ন তো জুটিতেছে, তবে সে কেন তাহার সাহিত্য সাধনাকে ব্যবসায়ের হীন পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে! সাহিত্য তাহার ভালো লাগে, তাই সাহিত্যসাধনা করে; অর্থলাভের প্রত্যাশায় তো করে না!

তিন বৎসর পরে তাহার দ্বিতীয় বইখানি বাহির হইল। এইবার একাধিক বিজ্ঞ সমালোচক বলিলেন যে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন এই লেখকের উল্লেখ না করিলে চলিবে না। প্রথম উপন্যাস খানি অপেক্ষা এখানি আরো উঁচুদরের হইয়াছে।

অহরহ দুশ্চিন্তার ভারে পীড়িত হইয়া আজ প্রায় দুই বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের পর, সে তাহার তৃতীয় পুস্তকখানি শেষ করিয়াছে। পূর্ব্বপ্রকাশিত বই দুই খানির কোনো খানিই তাহাকে এতটা কা করিয়া ফেলিতে পারে নাই। কোন্ কালেই স্বাস্থ্য তাহার বিশেষ ভালো ছিল না —এখন শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কতবার তাহার বন্ধুরা তাহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়াছে, কোথাও হাওয়া খাইতে যাইতে বলিয়াছে, সে তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করে নাই। এইবার সে দীর্ঘকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবে!

মনে মনে সে বেশ বুঝিতেছিল যে, সে একটা মস্ত বই লিখিয়াছে; কিন্তু তবুও ভয় হইতেছিল এ বিশ্বাস যদি ভুল হয়! মনে আমরা খুব সূক্ষ্ম জিনিস অনুভব করি বটে কিন্তু কাগজে সেটাকে ঠিকমত ফুটাইতে পারি কৈ? হয় তো লেখক নিজে ছাড়া আর কেহ রচনার সে সূক্ষ্মভাব ধরিতেই পারিবে না! সেইজন্য কোনো নিরপেক্ষ সমালোচককে লেখাটা দেখানো প্রয়োজন! এমন একটি লোককে সে জানিত। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—দু'এক পরিচ্ছেদ পড়ে' দেখ তো ভাই।

সমালোচক পড়িতে বসিল। সে আসিয়াছিল বেলা আড়াইটার সময়—উঠিল যখন তখন রাত বারোটা। বইখানা সে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে—এক ছত্রও বাদ দ্যায় নাই।

গ্রন্থকার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলে? সমালোচক দাঁড়াইয়া উঠিয়া পলের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—বেশ ভাই বেশ! খুব কাজটা করলে যাহোক! এ বইএর মার নেই। চমৎকার হয়েচে!

"বাঁচা গেল! আমি তাহ'লে ঠিকই উরেছিলুম।

এ সব কথা গত কল্যকার। আজ রাত্রে শেষ পরিচ্ছেদে একটু আধটু পরিবর্ত্তন রিয়াছে। বইখানা শেষ হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে ছিল। বাহিরে গিয়া খানিকটা না বেড়াইলে র প্রাণ বাঁচে না। সে টুপি পরিল। একবার ভাবিল পাণ্ডুলিপিখানা ডাকে াঠাইয়া দিবে না কি? পরক্ষণে ভাবিল না কাজ নাই, কাল স্বহস্তে সেখানা প্রকাশকের হাতে দিয়া আসিবে। কাজ কি, ডাকে পাঠাইলে যদি হারাইয়া যায়!

বাহিরে আসিয়া সে হাঁটিতে লাগিল। কোথায় যাইতেছে, কতদূর আসিল, সে খেয়াল তাহার একেবারেই ছিল না। সে কেবল বুঝিতে পারিতেছিল তাহার মনের উপর হইতে একটা পাষাণভার নামিয়া গেছে। শরীর এমন হাল্কা বোধ হইতেছিল যেন সে সারারাত হাঁটিলেও ক্লান্ত হইবে না। চলিতে চলিতে এক জায়গায় দমকল ইঞ্জিনের ঘণ্টার শব্দে তাহার চমক ভাঙিল। সে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল—ইঞ্জিনের মধ্য হইতে আগুনের ফুলকি ছিটকাইয়া পড়িতেছে, গাড়ীর আরোহীদের টুপিগুলো ঝকমক করিতেছে, পথের ভিড় চকিতে দুই ধারে সরিয়া গিয়া দমকল-ইঞ্জিনের পথ করিয়া দিতেছে—এ দৃশ্যে তাহার রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। এতদিন শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া গিয়াছিল। আবার সে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক পরে আর একখানা ইঞ্জিন হুস্ করিয়া ছুটিয়া গেল। সে ফিরিয়া আবার দেখিল। আর দেখিল সকলে আকাশের দিকে চাহিতেছে—আকাশের একটা কোণ সোনালী আভায় মণ্ডিত।

একজন কনষ্টেবলকে সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় আগুন লেগেচে?

"আজ্ঞে, আমার বোধ হয় ক্যাম্পডেন্ হিলের দিকে কোথাও লেগে থাকবে।"

পলের মুখ শাদা হইয়া গেল। ক্যাম্প্‌ডেন্ হিলের দিকে! ক্যাম্পডেন হিল! সেইখানেই তো সে থাকে! তার বইখানা যে সেখানে রহিয়াছে! যদি...

সে মনে মনে হাসিল, আবার চলিতে লাগিল। কি অদ্ভুত কথা ভাবিতেছে সে—ক্যাম্প্‌ডেন্ হিলে তাহার বাড়ী ছাড়া তো আরো অনেক বাড়ী আছে! সে ভাবিল অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার চিত্ত বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইল এই ব্যাপার লইয়া বেশ একটা ছোট গল্প লেখা যায়—একজন লোক দমকল ইঞ্জিনের পিছে পিছে আসিয়া দেখিল তাহার নিজের বাড়ীই পুড়িতেছে!·· আর একখানা ইঞ্জিন ছুটিয়া গেল—একখানা মোটরইঞ্জিন্। চমৎকার! ঠিক যেন বিদ্যুতের মত নিমেষে অদৃশ্য হইল।

আকাশ আরো লাল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই সেই দিকে ছুটিতেছিল। তাহার মনে হইল সে কখনো বড় অগ্নিকাণ্ড দেখে নাই। দেখিতে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর! এমন সুযোগ আর না মিলিতেও পারে। আগুনের দিকে একখানা গাড়ী যাইতেছিল, তাহাতে সে লাফাইয়া উঠিল।

খানিকটা আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। সে নামিয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ?

কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। ভিড় ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ভিড়ের পিছনে পিছনে সে চলিল। একজন কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিল – কোথায় আগুন লেগেচে ?

"আজ্ঞে বার্লিংটন্ স্কোয়ার।"

"কি-ই ই ?"

"আজ্ঞে বার্লিংটন্ স্কোয়ার। শুনতে পান না না কি ?"

পলের বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল, পা দুটো কাঁপিতে লাগিল। স্কোয়ারেই যে তাহার বাড়ী! ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া সে অনেকটা অগ্রসর হইল। দমকলের ফট্ ফট্ শব্দ তাহার কানে পৌছিল। সেই দিক হইতে একটা লোক আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কত নম্বরের বাড়ী ?

সে কহিল—জানি না। তিন চারখানা বাড়ীতে আগুন লেগেচে। কোণের সব বাড়ী-গুলোয়।

তার বাড়ীও যে কোণের বাড়ী! সে পাগলের মত ছুটিয়া চলিল। লোকে তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। ধাক্কা দিয়া পুলীশের সারি ভাঙিয়া সে ছুটিয়া গেল। আশ্চর্য্য! একজন পুলীশের সার্জেণ্ট হাঁকিল—ফিরে আসুন মশায়। ছুটিয়া গিয়া সে তাহার হাত ধরিল।

"ছেড়ে দাও ..ছেড়ে দাও বলচি...আমার বাড়ী পুড়চে!"

"কোনটা আপনার বাড়ী ?"

"ঐ বাড়ী। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে!"

"ওখানটায় তো অগ্নিকুণ্ড। ওখানে গিয়ে কি করবেন ?"

"তোমায় কি বোঝাবো ? ওখানে রয়েচে! আমার বই!"—এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়াইয়া পল জ্বলন্ত বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। যাহারা আগুন নিবাইতে আসিয়াছিল তাহাদের একজন তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া গেল।

একজন কর্ম্মচারি হাঁকিল—"ফিরে এস লোকটা উন্মাদ।"

পিছন হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল —কি হয়েচে হ্যা ?

"ও কিছু নয়। একটা পাগলা আগুনের ভিতর ছুটে গেল।"

কয়েক মিনিট পরে যে 'ফায়ারম্যান' পলের পিছন পিছন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গিয়াছিল সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে তাহার কেহ নাই!

তাহাকে দেখিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ইংরাজি হইতে



বিবাহ-সজ্জায় রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ ও রাজকুমারী ইন্দিরা

লাজাঞ্জলি

এস মুকুটের মণি! দেশ-মুখ্য রাজার দুহিতা!
এস সাধ্বী! স্বয়ম্বরা! এস বঙ্গে রাজশ্রী ইন্দিরা!
এস লাবণ্যের লতা! মনস্বিনী! গৌরবে-গম্ভীরা!
এস গো জয়শ্রী এস ভূপ জিতেন্দ্রের প্রেম জিতা!

কেশবের আশীর্ব্বাদ উদ্ভাসিছে অয়ি শুচিস্মিতা!
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ; ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা
মিলিল নর্ম্মদা-ধারা; ধ্যানে ধরি' দেখিল ধ্যানীরা
দেবতার এ ইঙ্গিত;—বঙ্গে মারাঠায় কুটুম্বিতা।

স্বর্গে আজি কোলাকুলি গৌরাঙ্গে ও গুরু রামদাসে,
চণ্ডীদাসে তুকারামে কীর্ত্তিধামে অপূর্ব্ব মিতালি;
বীর-লোকে ছত্রপতি মর্য্যাদায় প্রতাপে সম্ভাষে,
বর্গীরা এনেছে অর্ঘ্য,—সম্মানিত সমস্ত বাঙালী।

বহিছে প্রসাদ বায়ু বাধাহীন চতুর্দ্দিকে শুভ;
এস মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী! বাঙালীর কুলে হও ধ্রুব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তামাকুতত্ত্বের জের

বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া প্রথম একবার টানিবার পর আবার যতবার হাত ঘুরিয়া আসে, ততই তাহা বেশী মজে। সেই হিসাবে তামাকুতত্ত্বের যতই অধিক বার আলোচনা করা যাইবে ততই তাহা মিষ্ট লাগিবে। মূলপ্রবন্ধে বলিয়াছি, অজ্ঞাতনামা ইংরাজ কবি তামাকুসেবনের একজন অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিত্ব-শক্তির অভাব-বশতঃ সেটির অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারি নাই। আমার অক্ষমতার জন্য কৃপাপরবশ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক আমার কর্ম্ম-সহচর (Colleague) শ্রীযুক্ত

পুলিনবিহারী কর এম এ মহাশয় কবিতাটির একটি সুললিত অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পুলিন বাবু গত জুলাই মাসের বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে 'তাম্রকূট-মাহাত্ম্য' শীর্ষক কবিতা লিখিয়া তামাকুসেবীদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ধূমপানের অধ্যাত্মতত্ত্ব

(১)

আজি রসহীন বিশীর্ণ মলিন
যে ছিল যৌবনে সরস নবীন
শুষ্ক পর্ণ হায় হৃদয়ে জাগায়—
নশ্বর এ দেহ ক্ষুদ্র তৃণ-প্রায়!
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(২)

(যেন) নলিনীর দল দুর্ব্বল এ নল—
ভঙ্গুর এ দেহ বলে অবিরল
তোমার (ও) এমতি জীবনের গতি
একটি পরশে ফুরাবে নিয়তি!
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(৩)

ধূমের কুণ্ডল লক্ষি নভস্তল
উঠিবে যখন বুঝিবে সকল—
এ ধরা-বৈভব বৃথায় গৌরব
একই ফুৎকারে বিনষ্ট সে সব।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(৪)

(হেরি) নলের ভিতর ক্লেদ থরে থর
পাপে কলুষিত তোমার (ও) অন্তর
স্মরিও তখন; অনল পাবন
করিতে নির্ম্মল হয় প্রয়োজন।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(৫)

(যবে) ভস্মে পরিণত দূরে নিক্ষেপিত
হেরি, আপনারে বলিবে নিয়ত—
এই সুকুমার দেহ, এ ধূলার,
হবে পরিণত ধূলায় আবার।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

উদ্ভিদাদির বৈদিক নাম

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের কথা শুনিতে সকলেরই আগ্রহ এবং কৌতূহল আছে জানি; কিন্তু সে ইতিহাস মনোহর আখ্যানরূপে না পাইলে অনেকেরই পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। অনেকেই ভুলিয়া যান যে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সংগ্রহ না করিলে ইতিহাস হয় না, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার বিবরণ কেহই উপন্যাসের মত মনোহর করিয়া তুলিতে পারে না। ইতিহাসের প্রতি যদি যথার্থ শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে যে সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ইতিহাসের যথার্থ ভিত্তি, সে গুলির প্রতি মনোযোগ না দিলে

চলে না। অতি প্রাচীন আর্য্যনিবাসে কি কি বৃক্ষলতাদি ছিল, সে সকল কথা জানিতে পারিলে যে প্রাচীন আর্য্যনিবাসের ভৌগোলিক স্থিতি বিষয়ক জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

বৈদিক যুগে উদ্ভিদ জাতি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইত, যথা—(১) "বীরুধ" (plant) এবং (২) "বনস্পতি" (tree)। বীরুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিংবা কোন বিশেষ গুণের জন্য আদৃত হইত, তাহাদের নাম ছিল "ওষধি"। বৃক্ষ বলিলে বীরুধ, বনস্পতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীকেই বুঝাইত। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় plant অর্থে "ক্ষুপ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অন্যান্য নূতন পারিভাষিক শব্দ সাহিত্য-পরিষৎ-সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত করিতেছেন। যোগেশ বাবুর অবলম্বিত নূতন শব্দগুলি যখন ব্যবহৃত শব্দ নহে, এবং ঐ শব্দগুলি যখন লোককে নূতন করিয়া মুখস্থ করিতে হইবে, তখন বৈদিক যুগের শ্রেণীবিভাগ অবলম্বন করিলে ক্ষতি কি?

বৃক্ষ-শরীরের বিভিন্ন অংশের যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই এখনও পর্য্যন্ত ব্যবহৃত থাকিলেও অন্যান্য অপ্রচলিত শব্দের সহিত সে গুলিরও উল্লেখ করিতেছি। শিকড়ের নাম ছিল "মূল"; stem অর্থে "কাণ্ড" শব্দ প্রচলিত ছিল, এবং "শাখা", "পর্ণ", "পুষ্প" এবং "ফল" শব্দগুলিও সে যুগে উহাদের আধুনিক অর্থেই ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এবং একালে যাহাকে "পল্লব" বলে, তাহার নাম পাওয়া যায় "বল্‌শ", এবং বৃক্ষের "স্কন্ধ" corona অর্থজ্ঞাপক। ফলের অন্য নাম "বৃক্ষ্য" হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বড় গাছ হউক, লতা হউক, ওষধি হউক, সকলগুলিই বৃক্ষ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। বট প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষে বায়বীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল বৃক্ষের সেই মূলগুলি শাখা কিংবা মূল নামে অভিহিত হইত না, এবং উহার স্বতন্ত্র নাম ছিল "বয়া"। এই "বয়া" শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত নাই; অথচ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "বয়া" বঙ্গদেশের কোন কোন প্রদেশে এখনও বট গাছের "ঝুরি" অর্থে ব্যবহৃত আছে। বয়া শব্দটি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে "ব" নামেও প্রচলিত আছে।

যে শ্রেণীর উদ্ভিদ ঝোপ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে bush বলে, তাহাদের বৈদিক নাম ছিল "স্তম্বিনীঃ"। বাঁশ, তাল, খেজুর, কচু প্রভৃতি যে সকল গাছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি করিয়া পাতা বাহির হইবার পর সেই পাতাটিরই খাপ বা আবরণের মধ্য হইতে আর একটি পাতা বাহির হয়, কিন্তু একসঙ্গে দুইটি পাতা নির্গত হয় না, তাহাদিগের নাম ছিল "একশুঙ্গাঃ"। "এক-কটিলিডন্" বুঝাইবার পক্ষে এ শব্দটি এখন ব্যবহৃত হইতে পারে কি?

যদি একটি কাণ্ড বিভক্ত হইয়া বহু শাখায় পরিণত হইত, এবং শাখাগুলি আবার বিভক্ত হইয়া অনেক প্রশাখার সৃষ্টি করিত তবে ঐ শ্রেণীর বৃক্ষগুলির নাম হইত "অংশুমতীঃ"। অন্য দিকে আবার

যে গাছগুলির কাণ্ড শাখায় পরিণত না হইয়া ঊর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত সোজা উঠিয়া যাইত, তাহাদিগকে "কাণ্ডিনীঃ" বলিত। উদ্ভিদ বিদ্যা-বিদেরা দেখিতে পাইতেছেন যে Deliquescent এবং Excurrent শব্দদ্বয়ের অনুবাদের জন্য দুইটি চমৎকার শব্দ পাওয়া গেল। আশা করি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে এই শব্দ দুইটি নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে। "কাণ্ডিনী"র মধ্যে যে বৃক্ষগুলিতে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অনেক শাখা থাকিত, তাহাদের নাম ছিল "বিশাখাঃ"।

গাছে ফুল ফুটিলে গাছগুলিকে 'পুষ্পবতীঃ' বলিত বটে, কিন্তু যে সকল গাছে ফুল ফুটে অর্থাৎ যাহারা flowering, তাহাদের নাম ছিল "প্রসূবরীঃ"। হয় ত এখন এ অর্থে "সপুষ্পক" শব্দ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু এই শব্দটি ব্যবহৃত হইলে একটি বিশুদ্ধ শব্দের প্রচলন হয়।

ডাঁটা বাহির হইয়া যখন ডাঁটার উপর ফুল ফুটে, তখন একটি অসংবদ্ধ প্রণালীতে ফুল ফুটিলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে panicle বলে। এই panicleএর খাঁটি বৈদিক নাম "তূল"। শব্দটি এ কালের ব্যবহারে না লাগিলেও আমরা সে কালের শব্দ সম্পদ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

লতা অর্থে সাধারণ শব্দ ছিল "প্রতন্বতীঃ"; এবং যে লতা গাছ বাহিয়া না উঠিলে বাড়িতে পারে না, তাহার নাম ছিল 'ব্রততি' এবং যাহারা সাধারণতঃ মাটিতেই বিস্তার লাভ করে, তাহাদের নাম ছিল "অলসালা"।

আমরা এখন অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের "লতা" শব্দই সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রভেদ রক্ষা করিবার জন্য climber অর্থে 'ব্রততি' এবং creeper অর্থে "অলসালা" ব্যবহৃত হইলে মন্দ হয় না। শেষোক্ত শব্দটি কঠোর মনে হইলে অর্থ রক্ষা করিয়া "অলসা" শব্দ ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি?

কাঠ বুঝাইবার জন্য "কৃমুক", "ক্রমুক" এবং "দারু" শব্দ পাওয়া যায়। "পর্ণ" লিখিবার পাতার অন্য কোন নাম পাওয়া যায় না। বাকলার নাম ছিল "বল্ক",—"বল্কল" নহে। প্রাচীন প্রাকৃতে বর্ণব্যত্যয়ে "বল্ক" "বক্ক" উচ্চারিত হইত, এবং সংস্কৃত ভাষায় ঐ দুইটি শব্দের খিঁচুড়িতে "বল্কল" শব্দ হইয়াছিল। গাছের আঠা, রস প্রভৃতি সকলেরই নাম ছিল "নির্য্যাস"।

এখন বর্ণমালাক্রমে বীরুধ এবং বনস্পতিদিগের নাম দিতেছি। (১) অজশৃঙ্গী (সম্ভবতঃ বাবলা), (২) অপামার্গ (আপাঙ্গ, ঔষধে ব্যবহৃত), (৩) অমলা (আমলা, আমলকী), (৪) অমূলা (গাছে ঝুলিত, শিকড় হইত না এবং শরের মুখ বিষাক্ত করিবার জন্য উহার রস ব্যবহৃত হইত বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে; একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই অমূলাকে Methonica Superba বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন), (৫) অরটু (Colosanthes Indica—ইহার কাঠে গাড়ির চাকার "ধূরো" প্রস্তুত হইত), (৬) অরাটকী (সম্ভবতঃ অজ শৃঙ্গী হইতে অভিন্ন), (৭) অরুন্তুদ (এই ওষধি লতা বা ব্রততি বড় বড় গাছে

ত, এবং উহা "হিরণ্যবর্ণ" ছিল, এবং ার ডাঁটায় ফুল থাকিত অর্থাৎ লামশবক্ষণা" ছিল বলিয়া অথর্ব্ব বেদে লিখিত; ইহাও লিখিত আছে যে, উহার গোরুকে খাওয়াইলে গোরু বেশি দুধ ত, এবং ঐ লতা হইতে লাক্ষা সংগৃহীত ইত) (৮) অর্ক (আকন্দ), (৯) অলাপু বা লাবু (লাউ), (১০) অবকা বা শীপাল ব্রহ্মর্ষিরা নাকি ইহার শাক খাইতেন; ইহা লে জন্মিত। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাকে শৈবল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ ইহাকে Blyxa Octandra সংজ্ঞা য়াছেন), (১১) অশ্বগন্ধা (উহার অর্থ এই যে ওষধি প্রস্তরগন্ধি; পরবর্ত্তী সময়ে ইহারই াম হইয়াছে অশ্বগন্ধা), (১২) অশ্বত্থ, (১৩) শ্বখার (এক শ্রেণীর নলবিশেষ), (১৪) াণ্ডীক (পদ্ম), (১৫) আদার (আমাদের াদা), (১৬) আবয়ু (অন্য নাম সর্ষপ বা রিষা), (১৭) আল (শস্যক্ষেত্রের আগাছা), ১৮) উদুম্বর (ডুমুর), (১৯) উর্বারু (শসা), ২০) উশনা (শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, সামলতা না পাইলে উহা হইতে সোমরস াহির করা হইত), (২১) এরণ্ড (খাঁটি বেদে ল্লেখ নাই; অনেক পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ াহিত্যেই নামটি পাওয়া যায়), (২২) ঔক্ষগন্ধি —ষাঁড়ের গায়ের গন্ধবিশিষ্ট অর্থ হইলেও কোন সুগন্ধি ওষধিবিশেষ; ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(২৩) কিয়াম্বু (কি প্রকারের শাক, তাহা জানা যায় না; তবে যেখানে শব-দাহ হইত, সেখানে জলের মধ্যে লাগাইবার নিয়ম ছিল; মৃতের সৎকারের ইহাও একটি অঙ্গ ছিল যে, কিয়াম্বু এবং (২৪) পাকদূর্ব্বা শ্মশানে লাগাইতে হইত; (পাকদূর্ব্বা এ কালের জোয়ার), (২৫) কুমুদ, (২৬) কুষ্ঠ (ইহার আর এক নাম বিশ্বভেষজ, অর্থাৎ ইহা প্রায় সকল রোগেরই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত; এই বীরুধ হিমালয়ের উপরে পাওয়া যাইত, লেখা আছে), (২৭) জঙ্গিড় (ইহাকে Terminatia Arjuneya বলিয়া কেহ কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন)।

(২৮) কর্কন্ধু (কেহ কেহ ইহাকে রক্তবর্ণ বদর বা কুল বলিতে চাহেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে ইহা লাল কুমড়া; ওড়িয়াতে কুমড়াকে "কথারু" বলে, এবং হয়-ত বা পূর্ব্বে ছাঁচি কুমড়াকে কর্কন্ধু বা কধু বলিত বলিয়াই লাউ ঐ "কধু" নামে আখ্যাত হয়), (২৯) কাকন্বীর (কি বৃক্ষ, জানা যায় না)।

তৃণ এবং নলবর্গে কুশ, কাশ প্রভৃতি ব্যতীত (৩০) "কুশর" নামে একটি বড় নল-তৃণ উল্লিখিত দেখিতে পাই। এক সময়ে আক্‌কে অনেক স্থানে নলের মত তৃণ বলিয়া "কুশর" বলা হইত। এই বৈদিক কুশর শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত নাই; অথচ একদিকে সম্বলপুরে এবং অন্যদিকে যশোহরে, পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে "কুশারি" এবং "কুশর" শব্দ আক্‌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩১) কিংশুক, (৩২) খদির এবং (৩৩) খর্জ্জূর সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, তবে "খর্জ্জূর-"এর দীর্ঘ-ঊকারটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। (৩৪) তিল আমাদের পরিচিত; কিন্তু (৩৫) তিল্বক কি, তাহা জানি না। একজন পণ্ডিত উহাকে Symplocos Racimosa বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক্

বলিয়া মনে হইতেছে না। (৩৬) তৌদী এবং (৩৭) ত্রায়মাণ কি, তাহা জানা যায় না। (৩৮) নারাচী ব'লিয়া যে বিষাক্ত ওষধির নাম জানা যায়, শরে উহার প্রয়োগ হইত বলিয়াই হয়ত "নারাচ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (৩৯) পাটা—এক প্রকারের জলজ শৈবল বলিয়া মনে হয়। এখনও ঐ নামে শৈবল বা শৈবাল চিনি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৪০) পূতীক আমাদের পুঁই।

(৪১) ন্যগ্রোধ আমাদের বটগাছ; (৪২) পলাশও আমাদিগের পরিচিত। বেদে যে (৪৩) পিপ্পল শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ক্ষুদ্র ফল—পিঁপুল নহে। (৪৪) পীতুদারু অথবা পূতুদ্রু হিমালয় জাত সরল বৃক্ষ বা দেবদারু। (৪৫) প্লক্ষ হইল পাকুড়, (৪৬ ও ৪৭) বদর এবং বিল্ব আমাদের পরিচিত। (৪৮) প্রস্থ কোন বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয় না। সায়ণের টীকার অর্থ ধরিলে চারা গাছ বা তেউড় প্রভৃতি অর্থ হয়। ইংরাজি shoot কথাটিকে ওড়িয়ায় "গজা" বলিতে পারা যায়; বাঙ্গলায় কি বলিব?

(৪৯) বজ সম্ভবতঃ আমাদের এ কালের বচ; (৫০) বিম্ব ঠিক্ তেলাকুচ বা তিক্তলকুচ বটে, এবং অথর্ব্ব বেদের (৫১) ভঙ্গ ঠিক্ নেশা করিবার ভাঙ্গ্।

(৫২) মঞ্জিষ্ঠা কি, তাহা আমরা জানি। (৫৩) মধুঘ (মধুঘ নহে) কোন মদ্য উৎপাদক বৃক্ষের নাম ছিল। (৫৪) বিষাঙ্কা কি প্রকার বিষাক্ত গাছ, তাহা জানা যায় না।

(৫৫) শন আমাদের শণ বা hemp; কিন্তু (৫৬) শফক কি, তাহা ধরিতে পারা যে না। (৫৭) শালুক ঠিক পদ্মের গাছ অঙ্কুর বা তেউড়।

(৫৮) শমী বৃক্ষের নাম বেদে যে ভা পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন পণ্ডি নির্দ্দিষ্ট Mimosa Suma বলিয়া উহা বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অথ বেদে উল্লিখিত আছে যে উহার পা চওড়া, এবং নির্য্যাস পান করিলে নেশা হয় ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে আছে যে, উহার র মাখিলে শরীরের কেশ-বহুল স্থান সম্পূর্ণরূপ কেশশূন্য হয়। এই গাছের ডালেই অর্জ্জু তাঁহার গাণ্ডীব ঝুলাইয়া ছিলেন।

(৫৯) শল্মলি (শাল্মলী নহে) বা শিম্বল ঠি আমাদের "শিমূল" বটে। প্রথম নামটির অতিরিক্ত আ-কার যোগ হইয়া সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, এবং দ্বিতীয় নামটি হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের "শিমূল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

বৈদিক যুগে যে সকল বৃক্ষের সহিত পরিচয় ছিল, তাহাদের সকলগুলির নামই হয়ত এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে পারিয়াছি। হয়-ত আরও দুই দশটি নাম পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেগুলির পরিচয় বড় সহজ হইবে মনে হয় না। (৬০) সোমলতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে উহার নাম উল্লেখ করি নাই; কিন্তু উহা যে কি প্রকারের বীরুধ ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

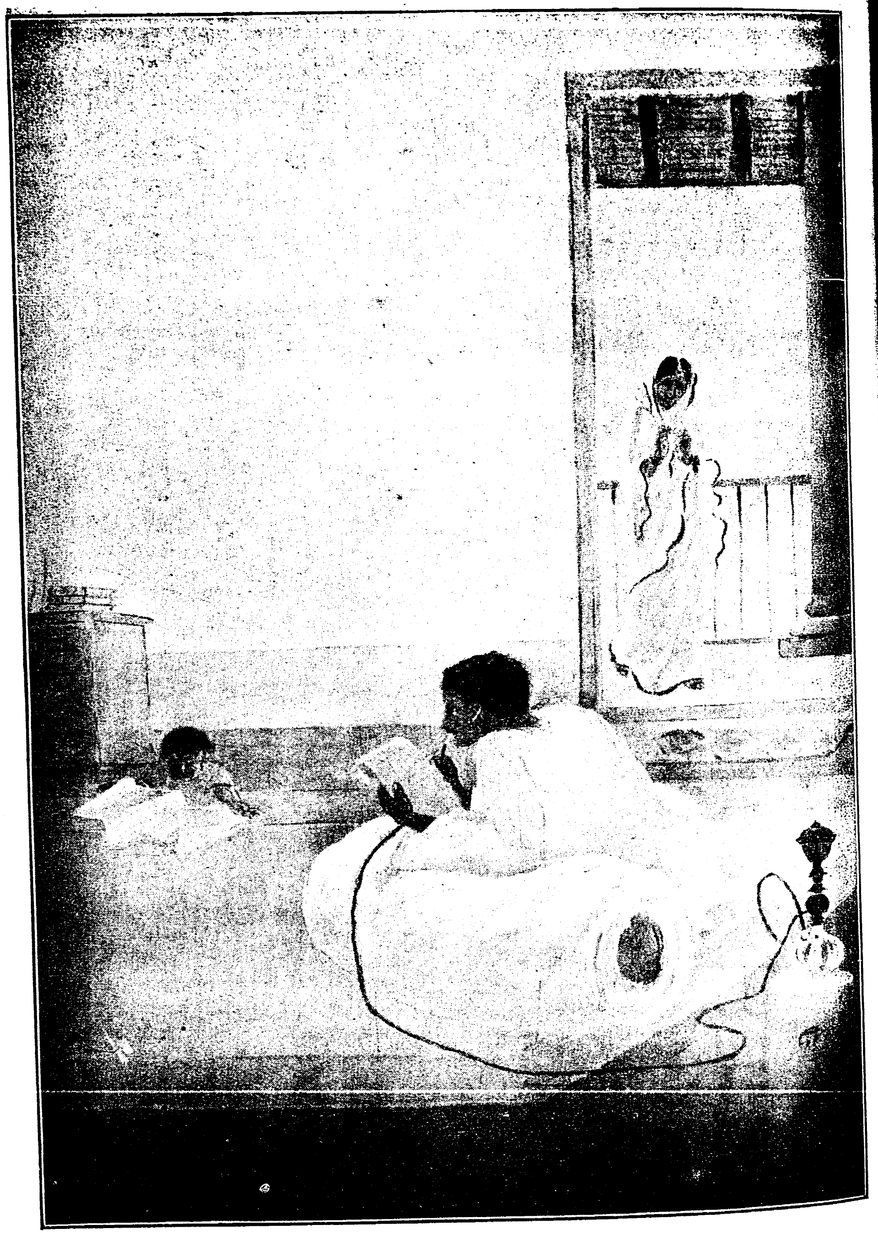

কমলমণি

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

সমালোচনা

বৈজ্ঞানিকী।

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

জগদানন্দ বাবু বঙ্গভাষার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। সম্প্রতি তিনি তাঁহার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিকী নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের বিষয়ও নানাবিধ,—যথা দেহশত্রু ও দেহমিত্র, বংশের উন্নতি বিধান, জৈব রসায়নের উন্নতি, আধুনিক ভূতত্ত্ব, সৌরকলঙ্ক, আলোকের চাপ ইত্যাদি।

পাঠক দেখিতেছেন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখার আলোচনা করা হইয়াছে। কাজেই একটা দোষ দাঁড়াইয়াছে এই যে কোনও বিষয়ই বিশদ করিয়া, বিস্তারিত ভাবে, বলা হয় নাই। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে লেখক তাঁহার প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ভাষার সাহায্যে অবৈজ্ঞানিক পাঠকের মনে বিজ্ঞানের একটী চিন্তাপ্রণালীর আভাস দিতে সক্ষম হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় রীতিমত বিজ্ঞানালোচনা আরম্ভ না হয় ততদিন আমাদের এইরূপ মোটামুটি রকমের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আর একটা দোষ দেখিতেছি লেখক স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের অতি দুরূহ সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। যেমন আলোকের চাপ। আমরা একজন পদার্থবিদ্যার এম, এস সি, ক্লাসের ছাত্রকে প্রশ্ন করিয়া দেখিলাম সেও এ বিষয়ে ভাল বুঝে না। কাজেই অবৈজ্ঞানিক পাঠক ইহার কি বুঝিবেন তাহা বলিতে পারি না।

দুই একটী ত্রুটিও আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে—আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি দূরীকৃত হইবে। Electrolytic Dissociationএর কথায় লেখক কেবল Clausius সাহেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Clausius এই সিদ্ধান্তটীর সূত্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র, স্কাণ্ডিনেভিয়াবাসী পণ্ডিত এর্হিনিয়সই (Arrhinius) প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেইরূপ বংশের উন্নতিবিধান বিষয়ে লিখিবার সময় কেবল মেণ্ডেলের নাম করিয়াছেন কিন্তু এই বিজ্ঞানের পিতৃস্থানীয় পণ্ডিত গ্যাল্টনের নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

যে কয়টী প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে বংশের উন্নতিবিধান নামক প্রবন্ধটীই আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কেন না অন্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু সে জ্ঞান তাঁহার সাধারণ জীবনযাত্রার বিশেষ কোনও সহায়তা করিতে পারিবে না। অপরদিকে বংশের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তগুলি জানা থাকিলে বিবাহে পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে। আরও বোধ হয় ইউরোপ অপেক্ষা আমাদের দেশেই বিজ্ঞানের এই শাখাটীর আলোচনা করিবার অধিকতর সুযোগ আছে কেননা এদেশে যেরূপ কুলগ্রন্থ সমূহে বংশ-বিবরণ পাওয়া যায় ইউরোপে সেরূপ পাওয়া কঠিন। এইজন্য মনে হয় লেখক এই বিষয়টী আরও একটু বিশদ ভাবে বিবৃত করিলে ভাল করিতেন।

এই প্রবন্ধের অন্তর্গত একটা কথায় লেখকের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। যে সকল ব্যক্তি এই পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক উন্নতি বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন লেখক তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন ইহাতে নর-নারীকে পশুবৎ পালন করা হইবে। কিন্তু ধীর ভাবে সমুদায় Eugenics শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে এমন মনে হয় না যে তদ্দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের কোনও ক্ষতি হইবে। বস্তুতঃ আমি একটী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে মনুপ্রচারিত বিবাহ-ব্যবস্থা মূলতঃ Eugenicsএর উপরই প্রতিষ্ঠিত। (১)

(১) See my articles on Hindu Eugenics In Hindu Review, May and June 1913.

এই কথার প্রসঙ্গে জগদানন্দ বাবু একটা কড়া কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "প্রকৃতি যাহাকে নিজের হাতে মূর্ত্তিমান্ করেন, বৈজ্ঞানিক শিল্পীর যন্ত্রের স্পর্শে তাহা কুশ্রী ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়।" (২৩পৃ) এরূপ একটা কথা একজন কবি বলিতে পারেন কিন্তু জগদানন্দ বাবুর ন্যায় একজন বৈজ্ঞানিক শিল্পীর নিকট এরূপ কথা শুনিবার আমরা আশা করি নাই। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়াই ত মানুষ বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতির উপর নিজের প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াই ত মনুষ্য আজ এত শক্তিমান্ ও সুসভ্য। বিজ্ঞান প্রকৃতিবিজয় কার্য্যে মানুষকে সাহায্য করে বলিয়াই ত তাহার এত আদর। বিবাহাদি সামাজিক বিধিব্যবস্থা কোনটীই প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, সকলগুলিই মানুষ নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রণয়ন করিয়াছে। আর এই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিলেই তাহার নাম হইল বিজ্ঞান। তবে আমি এমন কথা বলিতেছি না যে বিজ্ঞানে কোনও ভ্রান্তি নাই; সকলেই জানে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। তাই বলিয়া যেটুকু জ্ঞান আমাদের আছে তাহারও ব্যবহার করিব না! নিজে অন্ধ প্রকৃতির হস্তে অসহায় বালকের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিব! যিনি করেন করুন, আমি ত পারিব না।

এ পর্য্যন্ত আমার বিবেচনায় যাহা দোষ তাহার উল্লেখ করিলাম কিন্তু পুস্তকখানি এমনি সারবান্ মনোরম হইয়াছে যে গুণের তুলনায় দোষগুলি চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়। যাঁহারা বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানালোচ দেখিতে চান তাঁহারা সকলেই জগদানন্দ বাবুর আন্তরিক ধন্যবাদ দিবেন সন্দেহ নাই। পাঠক, পুস্তা বাজারে যখন দুই চারিখানা বাংলা পুস্তক ক্রয় করিবে তখন একখান বৈজ্ঞানিকীও লইবেন এই অনুরো করি। ইহাতে একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানলা করিতে পারিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রেসিডেন্সি কলে

বন্দী

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল প্রণীত; কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি জগতের শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক ভিক্তর হুগোর গ্রন্থ-বিশেষ অবলম্বনে রচিত। "বঙ্গসাহিত্যে এরূপ রচনা নূতন" কি না, সে সংবাদ রাখি না; তবে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রত্যেক সাহিত্যসেবী যে বিমল আনন্দ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বন্দী" বলিলে—আদি গ্রন্থের "Under Sentence of Death" এর গাম্ভীর্য্য থাকে না; মৃত্যুর ভীষণতা এবং সেই মৃত্যু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাত্র—এই ভাবের ছায়া "বন্দী" শব্দ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে না! তবে "বন্দী" এই শ্রুতি-মধুর ধ্বনিতে একটা করুণ সুর কাঁদিয়া উঠে, এবং তাহা সহজেই প্রাণে গলিয়া মিলিয়া, মিশিয়া যায়!

রচনাটির বিশেষত্ব ঃ—ইহাতে উপন্যাসের বাহ্যিক সৌষ্ঠবাদির একান্ত অভাব, অথচ অন্তর্গূঢ় রস ও ভাবের উপাদানে নিতান্তই উপন্যাস! ইতস্ততঃ নাটকত্বের আভাষ এমন করুণ ও সুকুমার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে শিল্পীর চমৎকারিত্বের কল্পনা একেবারে পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

জীবন্ত নায়ক-নায়িকা ইহাতে অভিনয় করে নাই; প্রেম ও অপ্রেমের জটিল গ্রন্থি-মোচনে চেষ্টারও একান্ত অভাব; অথচ ইহার মধ্যে প্রেম, প্রীতি, করুণা ও মনুষ্যত্ব; হত্যা, অবিশ্বাস কর্ত্তব্য-চ্যুতি ও শাঠ্য বিনা-আড়ম্বরে দেখা দিয়া গিয়াছে;—প্রতি দিনের পথ চলিতে তাহাদের সহিত যেমন দেখা হয় তেমনি বিশেষ করিয়া, গায়ে-পড়িয়া কোন ভূমিকার মধ্যে, কেহ বিলম্বিত অভিনয়ে পাঠকের চিত্তটিকে ধৈর্য্য চ্যুতির সীমায় টানিয়া লইয়া যায় নাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যুক্তি বা পৌনঃপুনিক উচ্ছ্বা নাই;—উৎকৃষ্ট রচনার ইহাই লক্ষণ।

উপন্যাস! অথচ পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি নাই তবে দেখা যাক, উপন্যাস-নাটক জিনিসটার মূল কি

না, মানুষের বুক চিরিয়া দেখানো—যেমন ভিষকের শল্য, চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে জীব-দেহের ক্রিয়ার ইতিহাস আবিষ্কার করে, ঔপন্যাসিকের লেখনী মানব-হৃদয়ে ক্রিয়ার উৎপত্তি, পরিণতি ও লয়ের মধ্য দিয়া বাধাহীন ধারাটির অনুসরণ-কাহিনী লিখিয়া যায়! কোন-কোন উপন্যাসে আরো একটু "ফাউ" পাওয়া যায়! সেটা আর-কিছু নয়;—কি-হইতে-পারিত, কি-হওয়া-উচিত ছিল প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত; একটা কিছু-প্রকাশ—কিছু-অপ্রকাশ আভাষ! কেহ-কেহ মনে করেন সেটা একেবারে বাহুল্য নয়। আবার কেহ তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না।

ইহাতে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে লালিত ও বিকশিত হইতে পারে নাই, এমন-একটী তরুণ যৌবনের ইতিহাস; করুণ আখ্যায়িকা অসঙ্কোচে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চলিতে-চলিতে-হঠাৎ-বাধা-পড়ায়-জীবনের আক্ষেপময় অসমাপ্ত কাহিনী ইহাতে কাব্যরসের মধু আহরণ করিয়া দিয়াছে। অভিযুক্ত আসামীর কাঠ-গড়ার বেষ্টনীর মধ্য হইতে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর ফাঁসি-কাঠে যাইবার পথের সকল কথাই বলা আছে;—কিন্তু বলা হয় নাই ত সেই গোপনতম-গোপন একটী কথা—আত্মাপরাধ-স্বীকার! সে কথাটী বলিতে-বলিতে বলা হয় নাই! সহস্র আঘাত-উদ্যত একটী ক্ষুদ্র প্রাণের ভিতর এই যে অবিরাম সংগ্রামের ত্বরিত ছবি—ইহাই না নাটক?

কেন এমন হয়;—কেন সে স্বীকার করিতে চায় না? তরুণ যৌবন বসন্তের উদার আলোক ও বাতাসে স্বচ্ছন্দ-মুকুলিত পুষ্পের মত! সে নিজে সুন্দর; সুন্দর তাহার চোখে চারিদিক সুন্দর! তাহার অজ্ঞাতে, কখন এক কীট তাহার মর্ম্মস্থল কাটিয়া ফেলে,—সহসা জাগিয়া দেখে যে অসীম-আশা-ভরা তাহার জীবন, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে! তখন সেই কীটের প্রতি তাহার ক্রোধ হয় না, বিদ্বেষ হয় না। ধূর্জ্জটির মহাক্রোধের মত, উদ্বেল হইয়া উঠে শুধু ঘৃণা ও করুণা! সেই উচ্ছ্বসিত-ঘৃণার আতিশয্যে চিরসুন্দর পৃথিবী এক নিমেষে তাহার নিকট তিক্ত, শ্রীহীন হইয়া যায়! বিশ্বকে যেন তাহার বিদ্রোহী মনে হয়! সেই বিদ্রোহী চারিপাশের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে, তাহার অন্তরাত্মা আত্মাভিমানের দুর্গে আশ্রয় লয়! চারিধারে বিপুল-এত—আর সে অসীম একেলা—এই ভাবনা তাহার চিত্তকে কিছুতেই হার মানিতে দেয় না—সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না সে দোষী!—মহাকবি এই ভাবটী কেমন নৈপুণ্যের সহিত আভাষে ফুটাইয়া গিয়াছেন! বন্দীর চক্ষে আদালত রহস্য মাত্র, বিচারক কর্ত্তব্য-জ্ঞানমূঢ়! এমন কি তাহার কন্যার নিকটও সে কথা বলিতে পারিল না! প্রাণ-দণ্ড-গ্রহণ-উদ্যত পিতার সহিত তাহার কন্যার শেষ মিলন, এই ঘটনা-সংস্থাপনে মহাকবি কতখানি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন! সেই সত্য,—অপরাধীর নিকট হইতে জগৎ সরিয়া যায়,—কেমন ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। নাটক, কাব্য ও উপন্যাস গুঁড়া করিয়া, গুলিয়া কি উপাদেয় সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন!

প্রাণের মায়া! সে যে মানুষের সহজাত বন্ধু! কোন্ প্রণয়ী তাহার আকর্ষণ তুচ্ছ করিতে পারে? শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সে বলিতে কাতর হয়, "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে!" বিশেষতঃ, যে হৃদয় সহসা-খণ্ডিত, অতৃপ্তির নেশায় সে কখনো সত্যের আলোকের সন্ধান করিতে পারে না—গ্রন্থখানিতে এই সত্য পরম রমণীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

এতক্ষণ আমরা গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহারই সৌন্দর্য্যে অবগাহন করিতে ছিলাম। সমালোচনা করি নাই। অনুবাদে সৌরীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব কত দূর—সেটুকু বলা প্রয়োজন। সৌরীন্দ্রবাবুর রচনা সাধারণতঃ সুললিত, ভাষা মনোহর। ভাষার মধ্যে ভাব কোথাও কুয়াশাচ্ছন্ন হয় না; চাতকের মত একেবারে মেঘলোকে অন্তর্দ্ধান হইয়া যায় না। বরাবর পাঠকের চিত্তটিকে হাত-ধরিয়া লইয়া যায়! অথচ তাঁহার চিন্তা ইংরাজি ভাবে পরিপুষ্ট। পদ-বিন্যাস সুন্দর উপভোগ্য। শব্দ-চয়নেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাই। তাঁহার বর্ণনা-কৌশল ও বাক্‌ভঙ্গী সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। তেজস্বিতার সহিত যুক্তপ্রাণতা ভাবের সহিত ভাষার স্বাভাবিকঃ মিলন তাঁহার রচনাটিকে চিরদিনই সুন্দর

হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলে। রচনার গুণে এখানিকে কোথাও অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রন্থখানি সাহিত্য-সেবীর বিমল আনন্দের আয়োজন করিবে—কারণ ইহাতে সনাতন সত্যের ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে। সে ছবি পুনঃপুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না—উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের ইহাই লক্ষণ। বর্ষাধৌত বনভূমির সবুজ-শ্যাম রূপশ্রী সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের বর্ণ-চাতুরী; পূর্ণিমা-চাঁদের মাধুরী স্বপ্নের মত সৎসাহিত্য চির-সুন্দর, চির-নূতন।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পিতা মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ *

পিতা মাতার প্রকৃতির সহিত সন্তানের প্রকৃতির যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। "বাপ্‌কা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ নেই ত থোড়া থোড়া,।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ না পাইলেও পিতার প্রকৃতি যে পুত্র আংশিক পরিমাণেও লাভ করে ইহা প্রবাদবাক্য। মনুষ্যের সন্তান কখন ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে কি? উদ্ভিদ জগতেও এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে; আমগাছে আমই ফলিয়া থাকে, কখন আমড়া ফলে না। জীবরাজ্যেরও এই নিয়ম। জন্মান্ধ পিতামাতার সন্তান জন্মান্ধই হইয়া থাকে কিন্তু কোন দৈবদুর্ঘটনা-প্রযুক্ত অন্ধ হইলে ঐ ব্যক্তির সন্তান অন্ধ হয় না। যুদ্ধাদিতে বিকলাঙ্গ সৈনিকের সন্তানকে পিতার অনুরূপ বিকলাঙ্গ হইতে দেখা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পিতামাতার কিরূপ প্রকৃতি সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে? উহার বৈজ্ঞানিক কারণই বা কি?

জীব ও উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর বাসস্থান জলবায়ু প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। একই আর্য্যজাতির ভিন্ন শাখা হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও নিম্ন বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় এক্ষণে সম্পূর্ণ ভিন্ন-জাতিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নেপালীর সহিত বাঙ্গালীর শরীরের তুলনাই হয় না। এমন কি পশ্চিমদেশবাসী অনেক দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, মিশ্র এবং রাজপুত বাঙ্গলার ডাল-ভাত ও জল-হাওয়ার প্রভাবে পূর্ণমাত্রায় বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। উপাধির উল্লেখ না করিলে উঁহাদিগকে পশ্চিমদেশবাসী বলিয়া অনুমান করা যায় না। দধি, দুগ্ধ ও মৎস্যের মাত্রা অত্যন্ত কম হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি ক্রমে হীনবীর্য্য ও ক্ষুদ্রকায় হইতেছে; পিতা বা পিতামহের সহিত তুলনা করিলে সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। মনুষ্যের ন্যায় গবাদি পশুদেরও অপকৃষ্ট খাদ্যের দোষে ক্রমে অবনতি হইতেছে! উদ্ভিদ সমাজেও এই নিয়মের অন্যথা দেখা যায় না। যত্নপালিত গোলাপের সহিত বন্য গোলাপের তুলনা হয় না। সিলেটের কমলা বাঙ্গলায় গোঁড়ালেবু এবং কাবুলী বেদানা বাঙ্গলায় টক ডালিমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং খাদ্য ও জল

* ১৯১২ মার্চ্চ নাইন্‌টিন্থ সেন্‌চুরী হইতে

হাওয়ার পরিবর্ত্তনের সহিত জীব ও উদ্ভিদ দেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির এরূপ ক্রমোন্নতি বা পরিণতিকে বিবর্ত্তন (evolution) বলা হয়। এই বিবর্ত্তন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাক-স্থলী, যকৃৎ প্লীহাদি দেহ-যন্ত্রের শারীর কার্য্যের (physiological action) ফল মাত্র।

পারিপার্শ্বিকের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য Virre নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত চিংড়ী জাতীয় কতকগুলি মাছকে ফাঁকা পুষ্করিণী ও নদী হইতে লইয়া পারী (Paris) নগরীর গাঢ় অন্ধকারময় যন্ত্রাগারে রক্ষা করেন। আলোকহীন স্থানে কয়েকমাস বাস করায়, পরিচালনার অভাবে উহাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ঘ্রাণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকলের দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে জলাঙ্গী নদীর স্রোতহীন (বদ্ধজলে) জলে শৈবাল পরিবৃত হইয়া থাকায় একটি ইলিশমাছের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে প্রথমে উহাকে ইলিশমাছ বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই। বর্ষার স্রোতের সহিত আসিয়া উহা পরে আর গঙ্গা বা পদ্মানদীতে ফিরিয়া যাইতে পারে না বলিয়াই হয়ত আবদ্ধজলে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল ও শৈবালের রং পাইয়াছিল। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। গ্রীষ্মদেশীয় আম, জাম, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ, পার্ব্বত্য বা শীতপ্রধান দেশে নীত হইলে তত্রত্য বৃক্ষাদির গুণপ্রাপ্ত হয়। স্বভাবের প্রভাবে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে এইরূপেই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ পরিবর্ত্তন কি সন্তানে স্থায়ীভাবে সংক্রামিত হইতে পারে? আর হইলেও ঐ সকল নূতন গুণ পূর্ব্ব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কতদিন স্থায়ী হইয়া থাকে? পূর্ব্বোক্ত টক গোঁড়ালেবু শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলে তদুৎপন্ন বৃক্ষের ফল পূর্ব্বপুরুষের সুমিষ্টভাব কি পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্বোক্ত অন্ধ চিংড়ি বা কৃষ্ণকায় ইলিশের সন্তানগণ পৈতৃক আলোকময় বাসস্থানে পুনরায় স্থাপিত হইলে পূর্ব্বপুরুষের দৃষ্টিশক্তি বা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ফিরিয়া পাইতে পারে কি?

দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষার ফল এ বিষয়ে সম্যক পরিস্ফুট নহে! নূতন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কোন জীব বা উদ্ভিদের পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি ও গুণাবলী সন্তানে স্থায়ীভাবে সংক্রমিত হইলে বিবর্ত্তন-বাদ অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইয়া যায়। আংশিক পরিবর্ত্তন (voriation) বিবর্ত্তনের প্রথম-স্তর হইয়া উঠে। যাহারা নূতন অবস্থানের সহিত সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র মিল করিয়া লইতে না পারে, তাহারা জীবন-সংগ্রামে ক্রমে পশ্চাদ্‌পদ হইতে থাকে ও পরিশেষে বিলোপ পাইতে বাধ্য হয়; কারণ সংসারে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ও অযোগ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারবিন এবং তাঁহার সমসাময়িক হার্ব্বার্ট স্পেন্সর হক্সলি প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে জীব ও উদ্ভিদের শারীর যন্ত্রের আভ্যন্তরিক বিশেষ পরিবর্ত্তন উহাদের সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে। ডারবিনের মৃত্যুর পর

কীটতত্ত্ববিদ্ A. Weisman এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি ১৫টা ইন্দুরের ২২ পুরুষ ধরিয়া লেজ কাটিয়া দেন কিন্তু তাহাতেও লেজের আকৃতি ছোট হয় নাই বা উহার লোপ হয় নাই। Cope, Rosenthal এবং Ritzema নামক পণ্ডিতগণ এরূপ পরীক্ষা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে কোন এক অঙ্গের বাহ্যিক হানি বা বিনাশ সন্তানে সংক্রমিত হয় না। কিন্তু এ বিষয়টি যে ডারবিনের অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। তিনি জানিতেন যে ভেড়ার লেজ বা কুকুরের কাণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া কাটিয়া দিলেও শাবক কাণ হীন হয় না। সেইজন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে কয়েক পুরুষ ধরিয়া অঙ্গ-বিশেষের আংশিক বিলোপ হইলেও যদি ঐ সময়ে পীড়া দেখা না দেয় তবে বিলুপ্ত অঙ্গ সন্তানে দেখা দিয়া থাকে। এইরূপ বিলুপ্ত না হইবার অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে অধ্যাপক Nussbaum বলেন যে ভ্রূণের এইরূপ ক্ষমতা আছে যে বিলুপ্ত অংশটিকে সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র মেরামত (regenerate) করিয়া লইতে পারে। অধ্যাপক Brown-Sequard গিনি-শূককের মেরুদণ্ড আহত করিয়া দেখেন যে আহত শূকরের সংন্যাস রোগ দেখা দেয় এবং ঐ রোগ শূকর ছানাতে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে কোনরূপ সংক্রামক বীজাণুর সম্পর্ক ছিল না। অন্যরূপে অস্ত্র করিলে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংন্যাস রোগ সন্তানে সংক্রমিত হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে কোন কোন প্রকারের ক্ষত বা আঘাতের ফল সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

অতএব এইরূপ একটা মতবাদের (theory) আবশ্যক যাহা দ্বারা সন্তানে বংশগত গুণাবলীর প্রকাশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে নূতন ভাবের আবির্ভাব উভয়েরই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদ দেখা যায়—একটি ডারবিনের অপরটি Weisman এর। ডারবিন বলেন জীব ও উদ্ভিদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টিমাত্র। এই সমুদায় কোষ হইতে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব অংশ পরিত্যক্ত হয়। উহাদিগকে তিনি কোরকাণু (gemmule) নামে অভিহিত করেন। এই সমস্ত কোরকাণু আবার সময়ে পুষ্ট ও বিভক্ত হইয়া জনন-ক্ষম মাতৃকোষ (mother-cell) উৎপন্ন করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হাওয়ায় কোরকাণু সমূহ জীব ও উদ্ভিদের সমুদায় অঙ্গে চলিয়া বেড়াইতে পারে। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কোষের আবরণ ভেদ করিয়া অবশেষে উৎপাদক কোষ (reproductive calls) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্যই জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের কোষ সমূহের প্রতিনিধি স্বরূপ কোরকাণু সকল উৎপাদক কোষে সংগৃহীত হইতে পারে;—প্রতি যন্ত্র, প্রত্যেক টিসু, অস্থি, পেশী শিরা, ধমনী ইত্যাদি সকলেরই প্রতিনিধি স্বরূপ কোরকাণু উৎপাদক কোষে সমুপস্থিত হয় এবং যখন সন্তান উৎপাদনের সময় উপস্থিত হয় তখন ঐ সকল কোষ কোরকাণু প্রেরণ করে। কাজেই সর্ব্ববিধ কোরকাণুর সমবায়ে উৎপন্ন সন্তান বংশগত

আকৃতি ও প্রকৃতি পাইয়া থাকে। সেই সঙ্গে পিতামাতার উপার্জ্জিত বা অন্যরূপে সংগৃহীত গুণাবলীও প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই রঙ্কের ভারবাহী কোন একটি গর্দ্দভের বাচ্চা বংশগত আকৃতি ও পিতামাতার ভারবহন ক্ষমতা পাইয়া থাকে; দুগ্ধবতী গাভীর বৎস্য উত্তরকালে মাতার ন্যায় দুগ্ধবতী হইতে পারে। এই কারণেই মাতালের ঔরসে মাতাল ও যক্ষ্মাকাশাদি রোগীর সন্তান পৈতৃক-রোগ ভোগ করিয়া থাকে।

ডারবিনের এই প্রতিনিধিমূলক মতবাদ (Pangenesis Hypothesis) দ্বারা জাতিগত আকৃতি ও বংশগত পৈতৃক উপার্জ্জিত গুণ এবং প্রকৃতি কিরূপে সন্তানে সংক্রমিত হয় তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায় বটে কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কিরূপে কোরকাণু সমূহ এক কোষে উৎপন্ন হইয়া উৎপাদক কোষে গমন করে? উপযুক্ত অনুপাতে যাওয়ারই বা কারণ কি? আর পরে যখন বীজটি বৃদ্ধি পাইয়া ভ্রূণে পরিণত হয় তখন কোরকাণু গুলি কি পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য করে—না একসঙ্গে কার্য্য করিয়া থাকে? ডারবিনের এই প্রতিনিধি-মূলক মতবাদ সকলে স্বীকার করেন নাই। অনেকেই weisman এর মতবাদ অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব ও উদ্ভিদের দেহ কতকগুলি কোষের সমষ্টিমাত্র। উহাদিগকে দেহকোষ বলা যায়। উহাদের কতকগুলি একত্র হইয়া সূত্রাকারে পরিণত হয় ও বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপে দলবদ্ধ কোষসমূহকে টিসু বলে। Weisman বলেন পিতামাতা হইতে জীব ও উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় উহা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ঘটে না, ভিতর হইতেই উদ্ভূত হয়—শারীরযন্ত্র সমূহই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। বীজকোষ (germ-cell) যাহা হইতে জীবের জন্ম হইয়া থাকে, উহা টিসু বা দেহ-কোষ হইতে উৎপন্ন হয় না। একটি মাত্র কোষবিশিষ্ট অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ হইতে পুরুষপরম্পরায় জীব উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা 'নিত্য' (immortal) পদার্থ—দেশকালাদি বাহ্যিক কারণের প্রভাবে উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হইয়া জীব আপনাপন সন্তানের জন্য উহাকে যকৃতাদি যন্ত্র, টিসু ও দেহকোষ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থায় রক্ষা করে এবং যথাকালে পুত্রকন্যাকে অবিকৃত অবস্থায় দান করিয়া থাকে।

বীজপক্ষের গঠন সম্বন্ধেও Weismanএর মত ডারবিনের মত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহার মতে বীজপক্ষ কোরকাণুর সমষ্টি নহে এবং কোরকাণু বিভক্ত হইয়া কোষও সৃষ্টি করে না। উহার রাসায়নিক এরূপ স্বতঃপ্রবৃত্তি থাকে যাহার ফলে উহা বিশেষ বিশেষ কোষ, টিসু ও যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে। বীজ যখন পুষ্ট হইয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করে তখন উহার উপাদানের প্রকৃতির তারতম্যানুসারে টিসু ও হস্তপদাদির গঠন নিয়মিত হইয়া থাকে;—কতকগুলি কোষ টিসু প্রস্তুত করে, কতক গুলি হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত

করে। শুধু ইহাই নহে কতকগুলি কোষ বামহস্ত, অপর কতকগুলি দক্ষিণহস্ত, আবার আর কতকগুলি সময়ানুসারে অঙ্গুলি, চুল, নখ ইত্যাদি প্রস্তুত করে। সাধারণ সৈনিকেরা কাপ্তেনের আদেশ অনুসারে যেমন কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা আপনাপন কার্য্যে নিয়োজিত হয় সেইরূপ বীজের উপাদানের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোষগুলি যথা সময়ে হস্তপদ, অঙ্গুলি এবং অন্যান্য অঙ্গ গঠন করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে Weismanএর মতে সাধারণ কোষ ও বীজকোষ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ, বীজপক্ষ বীজকোষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, অন্যত্র উহাকে দেখা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বীজপক্ষ প্রত্যেক কোষের কেন্দ্রস্থলে (nucleus) বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকে সুতরাং সাধারণ দেহ-কোষের ন্যায় বীজকোষ যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে রূপান্তরিত হইতে পারে না তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? Manspas ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রত্যেক জনন-কোষের কেন্দ্র-পঙ্ককে(nucles-plasm) উহার চতুঃপার্শ্বস্থ কোষপঙ্ক সন্তানোৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। যে সময় প্রাণ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে সেই সময় কেন্দ্রপঙ্ক ও কোষপঙ্কের মধ্যে ঘন ঘন আদান প্রদান কার্য্য চলিয়া থাকে। কেন্দ্রপঙ্কের আচরণ এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। আমরাও যখন নিশ্বাস-গ্রহণ করি তখন বায়ুস্থ অক্সিজেন (অম্লজান) নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধমণীসমূহের গাত্র-ভেদ করতঃ রক্তের সহিত মিলিত হয় ও দূষিতরক্তের অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid) গ্যাস ফুসফুস দিয়া প্রশ্বাসের সহিত বহিঃস্থ বায়ুর মধ্যে আশ্রয় লয়। ফুসফুসের বা ধমনীর প্রাচীর গ্যাসদ্বয়ের গমনাগমনে কোনরূপ বাধা দেয় না। এতদ্ভিন্ন এক-কোষবিশিষ্ট জীবের মধ্যে দেখা যায় যে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে রূপান্তরিত কোষপঙ্ক সন্তানে সর্ব্বদাই সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই জন্যই Weismanএর মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা ভিন্ন উদ্ভিদ রাজ্যেও দেখা যায় বট, আম, সজিনা প্রভৃতির কাণ্ড ও পাথরকুচির পাতা হইতেও নূতন নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বসন্তকালে শাল, তাল, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে অপর্য্যাপ্ত রেণুকণা বায়ুস্তরে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে। ঐ কণার প্রত্যেকটিই নূতন নূতন বৃক্ষ উৎপাদন করিবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করে। বিন্দুমাত্র রেণুকণা পিতৃবংশের সম্যক্ অনুরূপ শাল প্রভৃতি মহীরূহ উৎপাদন করে এবং ঐ সকল বৃক্ষ আবার যথাকালে ঐরূপ রেণুকণার উৎপত্তি করিয়া থাকে। জীব-রাজ্যেও এই নিয়মের অন্যথা হয় না। যে পঙ্ককণা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হয় উহাই আবার বিভক্ত হইয়া জীবের যৌবনকালে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি করে। উহাদের এক একটি হইতে এক একটি নূতন জীবের জন্ম হইয়া থাকে। পৈতৃক বীজপঙ্ক দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাবিধ খাদ্যগ্রহণ করতঃ পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ বা জীবে পরিণত হয়। সুতরাং খাদ্যের প্রভাব যে উহাতে

সংক্রমিত হয় না ইহা কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে?

জনন-কোষের সহিত দেহ-কোষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে উহা নপুংসক জীবের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই অনেকটা অনুমান করা যায়। কৃত্রিম নপুংসক বলীবর্দ্দের একটিরও সাধারণ ষাঁড়ের ন্যায় বীর্য্য (কলুষ) হয় না। চেহারারও পার্থক্য দেখা যায়। কষ্টসহিষ্ণু হইলেও নপুংসক জীব সেরূপ তেজস্বী হয় না।

উদ্ভিদ রাজ্যেও যে একটি কোষের পঙ্ক আবরণ ভেদ করিয়া অন্য কোষের পঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া থাকে ইহা অনেকেই অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মুকুল (bud), কাণ্ড, মূল ও পত্র হইতেও কেবলমাত্র অনুরূপ অঙ্গ উৎপাদিত না হইয়া—সমুদায় অঙ্গ এমন কি জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল জীব ও উদ্ভিদ উভয়েরই সর্ব্বগাত্র ব্যাপিয়া বীজপঙ্ক রহিয়াছে এবং এই বীজপঙ্ক শুধু যে স্বজাতীয় নূতন কোষ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় কোষেরও উৎপাদন করিয়া থাকে। Hydra নামক জীবকে সাত অংশে বিভক্ত করিলেও উহার প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটি পূর্ণাঙ্গ Hydra উৎপন্ন হইয়াছিল। Plararia নামক জীবকে ৯ টুক্‌রা করিয়াও দেখা গিয়াছে যে উহাদের ৭ টুক্‌রা হইতে পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে ক্রমে সম্মুখভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে হয় সর্ব্বগাত্রস্থ বীজপঙ্কেরই পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি করিবার শক্তি রহিয়াছে, নতুবা মস্তক, চক্ষু, মুখ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপাদনে সক্ষম বীজপঙ্কের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বীজ-কোষের বাহিরে শরীরের কোন এক স্থানে অবস্থিত থাকে এবং যখন যেখানে উহাদের আবশ্যক হয় তখন সেইস্থানে গমন করতঃ নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। যে মতই স্বীকার করা যাউক না কেন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে শরীরের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের সহিত বীজপঙ্কের নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও গতিবিধি রহিয়াছে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কতকগুলি জীবকে বহু অংশে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক খণ্ড হইতে পূর্ণাঙ্গ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইতস্ততঃ সঞ্চরণক্ষম কতকগুলি কোষ ক্ষতাদির সংস্কারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। এই সময়ে উহারা টিস্যুর ভিতরে সঞ্চিত মালমসলা ও গাত্রবর্ণের উপাদান কণিকা আত্মসাৎ করে এবং যে অংশের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতে থাকে উহার কোষসমূহের খাদ্যরূপে পরিণত হয়। দধীচি মুনির ন্যায় এই সকল সঞ্চরণশীল কোষের আত্মবলিদান প্রশংসার্হ বটে। এখানেও দেখা যায় যে বীজকোষের সহিত দেহ-কোষের অতি ঘনিষ্ঠ —খাদ্যখাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার খাদ্যের উপর খাদকের প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। তৃণভোজী গবাদি পশু অপেক্ষা উত্তেজক মাংস-ভোজী ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জীব অধিকতর তেজস্বী।

পিতৃ বীজ-পঙ্ক মাতৃকোষপঙ্গের সহিত মিলিত হইলে গর্ভস্থ ডিম্বাণু ক্রমে পুষ্ট হইয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের

সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে পিতৃ-মাতৃ পক্ষ প্রথমে মিলিত হইয়া পরে দ্বিধাবিভক্ত হয় ও উহার এক অংশ পুষ্ট হইতে থাকে। এই জন্যই সচরাচর গবাদি পশু ও মানবের একটি মাত্র সন্তান একবারে জন্মগ্রহণ করে। যে স্থলে অপর অংশটিও পুষ্টিলাভ করে সে স্থলে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়। Weisman অনুমান করেন যে ভ্রূণ পিতা হইতে কিছু অংশ ও মাতা হইতে বাকী অংশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতি পিতামাতার অনেকটা অনুরূপ হইয়া থাকে; তবে পক্ষ-দ্বয়ের বিভিন্ন সংমিশ্রন বা ন্যূনাধিক্যই ভ্রাতা ভগিনীদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্য ঘটাইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে সন্তান কেবলমাত্র পিতামাতারই প্রকৃতি পাইলে ভিন্ন প্রকৃতিলাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যাহা নাই তাহা কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু অনেকে যে পিতামাতার আকৃতি না পাইয়া পিতামহ, পিতামহী বা ঊর্দ্ধতন কোন পুরুষের আকৃতি পাইয়া থাকে ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আর এইরূপ অনুসারে চাষ বা চর্চ্চাদ্বারা পুরুষপরম্পরায় বংশের উন্নতি করা সম্ভব হয় না, বন্য গো হইতে উৎকৃষ্ট ওল, বন্য উদ্ভিদ হইতে উৎকৃষ্ট বাঁধাকফিও লাভ করা যাইত না; অমনি মানবের বংশে নিউটন, সেক্ষপিয়র, বেকন প্রভৃতি মনীষীর জন্ম সম্ভব হইত না।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পিতামাতা হইতে জীব বংশের প্রকৃতি লাভ করে এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যাহা নিজে উপার্জ্জন করে তাহাও সন্তানে সংক্রমিত করিয়া দেয়। এই জন্যই উচ্চ বংশ হইতে সাধারণতঃ উন্নত মানবের জন্ম হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্ম, বাসভূমি ও জলবায়ু প্রভৃতি স্বভাবের শক্তির প্রভাবে জীব ও উদ্ভিদের বীজপক্ষের প্রকৃতি অল্পাধিক পরি-বর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনকেই পিতা-মাতা হইতে সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্যের কারণ বুঝিতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালী মল্লযোদ্ধা

যাহারা বলেন বাঙ্গালী ক্রমশঃই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, তাহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে কলিকাতা নিবাসী কোনও পরিবারের একটি যুবক ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইংরেজ দর্শকগণকে বিস্মিত করিয়াছেন। এডিনবরাতে একজন ইংরেজ পালোয়ান ইহাকে অভিভূত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসঙ্গত প্রণালী অবলম্বন করিতেছিল, কিন্তু পরীক্ষকগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া ইংরেজ পালোয়ানকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। পরীক্ষকগণ একবাক্যে গুহ মহাশয়ের প্রশংসা করিয়াছেন, কেন না ইনি ইংরেজ পালোয়ানের অন্যায় ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোনো প্রকার অসঙ্গত কলকৌশল অবলম্বন না করিয়া অসীম ধৈর্য্য-সহকারে বীরের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন। গুহ মহাশয় য়ুরোপ ও আমেরি-কার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করুন এবং স্বদেশে ফিরিয়া যুবকদলকে শক্তিবান্ হইবার জন্য উৎসাহিত করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



শ্রীযুক্ত জে, সি গুহ

স্বদেশী মেলা

স্বদেশের শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি কিরূপ বেগে হইতেছে, স্বদেশীমেলা শিল্পপ্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই বিদেশী-দ্রব্য ভার-গ্রস্ত দেশে স্বদেশী মেলার আয়োজন একান্ত আবশ্যক। এ বৎসর লর্ড কারমাইকেল স্বদেশী মেলার দরজা খুলিবার কালে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, স্বদেশসেবীগণ ইহা স্মরণ রাখিলে স্বদেশী মেলার শৈশবেই মৃত্যু ঘটিবে না। আমাদের দেশে কল্যাণকর আয়োজন ত অনেকই হইয়াছে, কিন্তু কোনটাকেই আমরা শেষপর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি নাই। তীরন্দাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস এই মেলায় তীরবিদ্যায় আশ্চর্য্যরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আশা করি, স্বদেশী মেলা দীর্ঘজীবি হইবে।

সন্তরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বড় রকমের এক একটা আঘাত আসিয়া অনেক সময় যে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়, অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে শিবপুর দুর্ঘটনাতে আমরা ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। কলিকাতার বহু যুবক গঙ্গাতীরে বাস করিয়াও এবং অসংখ্য নদনদীপ্লাবিত বঙ্গদেশে জন্ম লাভ করিয়াও যে সন্তরণ বিদ্যায় অপটু, একদিন গঙ্গাবক্ষে একদল যুবক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া একথা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিয়াছে। সেদিন যখন গোলদীঘিতে সন্তরণপ্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতেছিলাম, তখন তাহাদের কথাই মনে হইতেছিল।

সন্তরণপ্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হয় কলিকাতায় এই সর্ব্ব প্রথম। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছি যে যুবকগণ কেবলমাত্র পুঁথি পড়িয়াই শিক্ষার অধ্যায় শেষ করেন না; মানুষ হইতে হইলে যতগুলি সাধারণ বিদ্যা অর্জ্জন করা প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে সচেষ্ট হন্। সন্তরণ, অশ্বারোহণ, নৌ-পরিচালন, প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য ইহাদের অদম্য উৎসাহ! সর্ব্বপ্রকার খেলা খেলিতে পারা, শিকার করিতে জানা, ইহাদের শিক্ষার এক এক অঙ্গবিশেষ। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই সকলদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু একরূপ ঝাঁপ সাঁতারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সাঁতারে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। আরও কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি।



শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু ঝাঁপ দিতেছেন



সন্তরণে পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটি যুবক

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার

উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ আছে কিনা এই লইয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বহুদিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার আধুনিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদে স্নায়ুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রাণীদেহে স্নায়ু-সূত্র ধরিয়া উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিদে এরূপ প্রবাহ থাকা সম্ভব নয়। স্নায়ুজালের সাহায্যে প্রাণীদেহে বাহিরের উত্তেজনা যে প্রকার একস্থান হইতে অপর-স্থানে চলাচল করে, উদ্ভিদদেহেও তদ্রূপ স্নায়ুজাল বিদ্যমান। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভার নিকট ইহা অপ্রকাশ থাকে নাই—তিনি বহুপূর্ব্বেই ইহার লক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে আচার্য্য বসু তাঁহার নিভৃত পরীক্ষাগারে এই বিষয় আবিষ্কারের জন্য নানা গবেষণা করিতেছিলেন। উদ্ভিদমাত্রই বাহিরের আঘাতের উত্তেজনায় ঠিক প্রাণীর মতই সাড়া দেয়, একথা তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সম্মুখে প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার সাড়া যে স্নায়ুজালের সাহায্যেই সম্ভব উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ এতদিন তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা আণবিক উত্তেজনা, মৃদু ধাক্কা, ইত্যাদিকেই এই প্রকার সাড়ার কারণ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। অধ্যাপক বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদ দেহে স্নায়ু বর্ত্তমান এবং ইহার সাহায্যেই বাহিরের উত্তেজনা ও আঘাতে উদ্ভিদ সাড়া দেয়। তিনি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়; তাঁহার এই আবিষ্কার ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিষৎ রয়েল সোসাইটি ঘোষণা করিয়াছেন। সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনের আশ্চর্য্য একতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতবাসী সমগ্র জগতের সম্মুখে উদ্ভিদ-জীবনের এই অসীম রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া যে সত্য প্রচার করিলেন, উপনিষদের ঋষি এক নিভৃত আশ্রমে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং" এই সত্য সাধনদুর্লভ দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াই বিশ্বদেবতাকে সমগ্র বনস্পতির মাঝে প্রণাম করিয়াছিলেন—"যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

লাঞ্ছিতা

বরষার বারিধারা বহে,
সিক্তপথ জনশূন্য হায়!
পাখীরা গিয়াছে উড়ি গেহে
নীড়ে তারা মাথাটি লুকায়।

বন্ধ সব দোকান পসারি
গৃহস্থের সদর দুয়ার;
কাঠুরীরা ফেলেছে কাটারী
তুমি কেন এ পথের ধার?

নাহি কি বলিতে আপনার
অরণ্যে কি ফুটিয়াছে ফুল!
এ রূপ, এ মাধুরী তোমার
কেহ কি গো বলেনা অতুল!

"আছে সব আছে নিজঘর
ফুটিয়াছি রাজার কাননে,
লভিয়াছি সোহাগ আদর
ছিল সুখ অপার জীবনে।

"হায় বিধি নিদারুণ হ'ল
প্রিয়তম বুঝিলনা মন,
কত ভুল কথা সে কহিল
দোষী হনু সামান্য কারণ!

সে লাঞ্ছনা সে ঘৃণার হাসি
নারিনু গো সহিবারে আর,
তাই আজি চিরবনবাসী
ঘর মোর এ পথের ধার।"

শ্রীমতী লীলা দেবী।

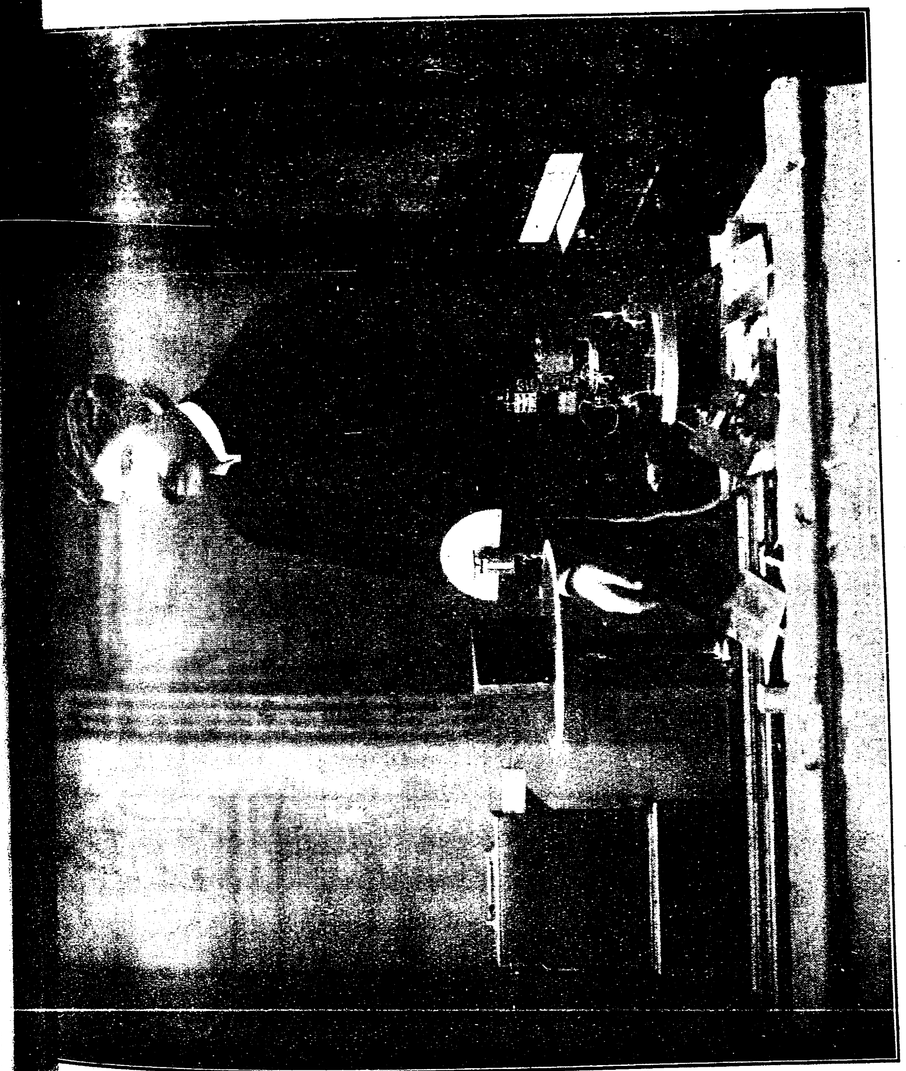

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু
("প্রবাসী" হইতে গৃহীত)

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার

উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ আছে কিনা এই লইয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বহুদিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার আধুনিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদে স্নায়ুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রাণীদেহে স্নায়ু-সূত্র ধরিয়া উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিদে এরূপ প্রবাহ থাকা সম্ভব নয়। স্নায়ুজালের সাহায্যে প্রাণীদেহে বাহিরের উত্তেজনা যে প্রকার একস্থান হইতে অপর-স্থানে চলাচল করে, উদ্ভিদদেহেও তদ্রূপ স্নায়ুজাল বিদ্যমান। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভার নিকট ইহা অপ্রকাশ থাকে নাই—তিনি বহুপূর্ব্বেই ইহার লক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে আচার্য্য বসু তাঁহার নিভৃত পরীক্ষাগারে এই বিষয় আবিষ্কারের জন্য নানা গবেষণা করিতেছিলেন। উদ্ভিদমাত্রই বাহিরের আঘাতের উত্তেজনায় ঠিক প্রাণীর মতই সাড়া দেয়, একথা তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সম্মুখে প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার সাড়া যে স্নায়ুজালের সাহায্যেই সম্ভব উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ এতদিন তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা আণবিক উত্তেজনা, জল ধাক্কা, ইত্যাদিকেই এই প্রকার সাড়ার কারণ স্থির করি নিশ্চিন্ত ছিলেন। অধ্যাপক বসু প্রমাণ করিয়াছেন উদ্ভিদ দেহে স্নায়ু বর্ত্তমান এবং ইহার সাহায্যেই বাহির উত্তেজনা ও আঘাতে উদ্ভিদ সাড়া দেয়। তিনি সকল অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন অখণ্ডনীয়; তাঁহার এই আবিষ্কার ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক পরিষৎ রয়েল সোসাইটি ঘোষণা করিয়াছে সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ উদ্ভিদ ও প্রাণিজীবনের আ একতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতবাসী সমগ্র জগ সম্মুখে উদ্ভিদ-জীবনের এই অসীম রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটি করিয়া যে সত্য প্রচার করিলেন, উপনিষদের ঋষি এক নিভৃত আশ্রমে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং" এই সত্য সাধনদুর্লভ দিব্যদৃষ্টিতে অনু করিয়াই বিশ্বদেবতাকে সমগ্র বনস্পতির মাঝে প্রণা করিয়াছিলেন—"যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দে নমোনমঃ।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

লাঞ্ছিতা

বরষার বারিধারা বহে,
সিক্তপথ জনশূন্য হায়!
পাখীরা গিয়াছে উড়ি গেহে
নীড়ে তারা মাথাটি লুকায়।

বন্ধ সব দোকান পসারি
গৃহস্থের সদর দুয়ার;
কাঠুরীরা ফেলেছে কাটারী
তুমি কেন এ পথের ধার?

নাহি কি বলিতে আপনার
অরণ্যে কি ফুটিয়াছে ফুল!
এ রূপ, এ মাধুরী তোমার
কেহ কি গো বলেনা অতুল!

"আছে সব আছে নিজঘর
ফুটিয়াছি রাজার কাননে,
লভিয়াছি সোহাগ আদর
ছিল সুখ অপার জীবনে।

"হায় বিধি নিদারুণ হ'ল
প্রিয়তম বুঝিলনা মন,
কত ভুল কথা সে কহিল
দোষী হনু সামান্য কারণ!

সে লাঞ্ছনা সে ঘৃণার হাসি
নারিনু গো সহিবারে আর,
তাই আজি চিরবনবাসী
ঘর মোর এ পথের ধার।"

শ্রীমতী লীলা দেবী।

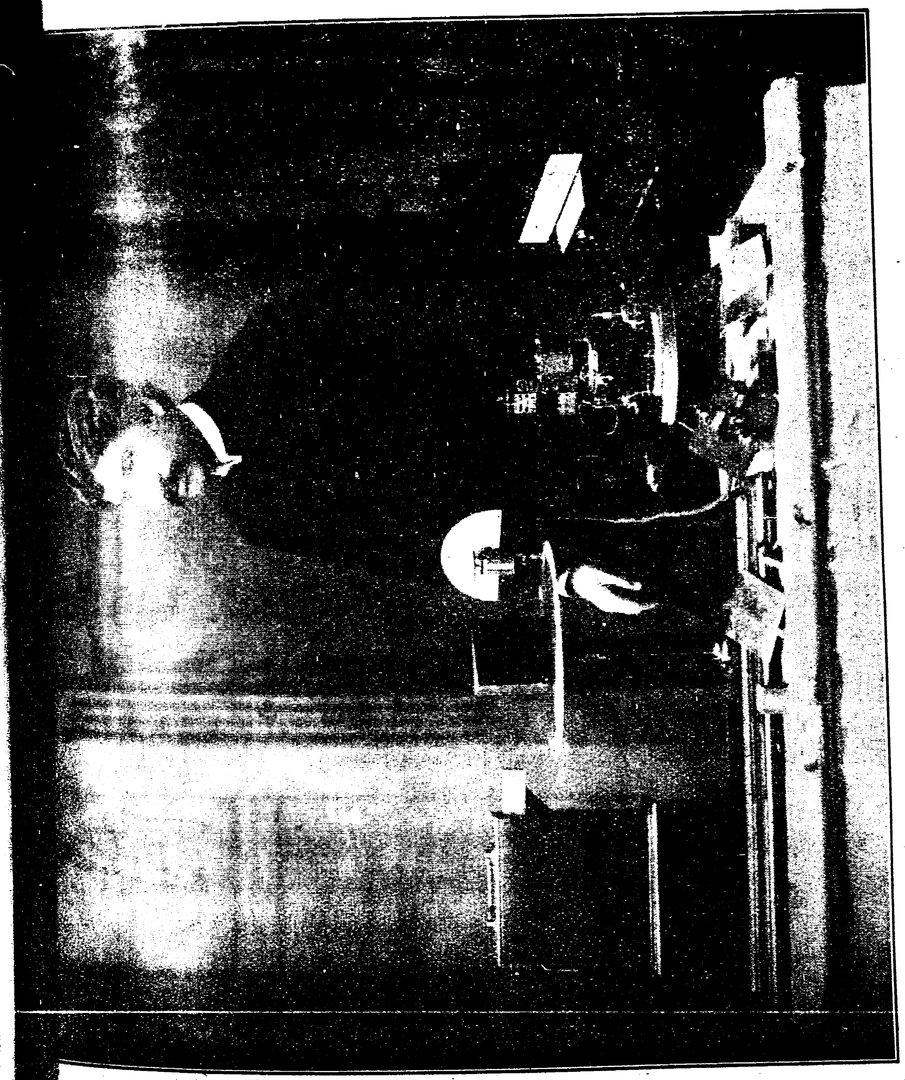

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু
("প্রবাসী" হইতে গৃহীত)

বিদেশিনী

(ফরাসী হইতে)

প্রশান্ত-সাগর-জলে ঢেউ তুলে চলেছে জাহাজ,
গ্রামভারি-সুগম্ভীর যাত্রী তাহে যুবক ইংরাজ।
জাহাজ লাগিল এসে ভেসে ভেসে দ্বীপ সুগন্ধায়,
সে দ্বীপের রাণী 'তীয়া' বসেছিল সৈকতে সন্ধ্যায়।
বিদেশীরে চক্ষে হেরি' মুগ্ধা নারী—ঝিনুকের হার—
কণ্ঠ হ'তে খুলি' দ্রুত,—ছুঁড়ে দিল উদ্দেশ তাহার ;
মেলি' বাহু, মাল্যরূপে প্রেরিল সে যেন আলিঙ্গন,
গ্রামভারি যাত্রীটি সে আমন্ত্রণ করিল গ্রহণ।...
তারপর মাসাবধি মহোৎসব চলিল উল্লাসে
বাঁশের কেল্লার মাঝে ;—বিদেশিনী বিদেশীর পাশে।
পাতিয়া শীতল পাটি তোষে 'তীয়া' অতিথির মন,
আন্দোলিত বক্ষ তার—চক্ষে ধরা পড়িছে স্পন্দন।
তারপর ঘনাইয়া এল যবে বিদায়ের দিন,—
ফুরাল মিলন-মেলা, হাসি খেলা ; তীয়া অশ্রুহীন
সাজাইল ধীরে ধীরে সিন্ধুতীরে চন্দনের চিতা ;
বিদায় লইয়া, হায়, চলে গেল দু'দিনের মিতা।
তারপর হেলে দুলে ঢেউ তুলে চলিল জাহাজ ;
জ্বলিল চন্দন-চিতা,—জল হ'তে দেখিল ইংরাজ,—
দেখিল সে পাংশুমুখে,—মানিল না বিস্ময়ের লেশ ;
সুগন্ধ চন্দন সনে সিন্ধুতীরে তীয়া ভস্মশেষ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের একটী বৈদিক প্রমাণ

বৈদিক আর্য্যদিগের আদিনিবাস যে উত্তর কুরুতে ছিল তৎসম্বন্ধে বেদের একটী বিশেষ নিদর্শনের আলোচনা আমরা উপস্থিত প্রস্তাবে করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমান উত্তর-মেরুমণ্ডলের চিরতুষারাবৃত অবস্থা বিবেচনা করিলে তৎসন্নিকটবর্ত্তী উত্তর-কুরু প্রদেশ যে বিশেষরূপে শীতপ্রধান ছিল তাহা সহজেই আমরা অনুমান করিতে পারি এবং

ইহাও অনুমান করিতে পারি যে উত্তর মেরু-মণ্ডলে যেরূপ বৎসরের অধিকাংশ সময় শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে উত্তর কুরু প্রদেশেও তদ্রূপ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই শীতের প্রাদুর্ভাব থাকিত। বৎসরের সুদীর্ঘকাল শীতের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাদুর্ভাব থাকিত বলিয়াই সুদীর্ঘ শীতকালের নামানুসারেই বেদে বৎসরের প্রথম নাম পরিকল্পিত দেখিতে পাই। শীতের "হিম" নাম হইতে বেদে বৎসর "হিম" নামেই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"ইদংসু মে মরুতো হর্য্যতা বচো যস্ত তরেম তরসা শতং হিমাঃ॥" ১৫

(ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৫৪ সূক্ত)

"হে মরুৎগণ! তোমরা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হও যেন এই স্তোত্রবলে আমরা শত শীতকাল অতিক্রম করিতে পারি। (অর্থাৎ শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারি)"

উদ্ধৃত ঋকে 'তরসা' ও 'তরেম' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া শীতকাল কষ্টকর ছিল বলিয়াই ইহা উত্তীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঋক্‌সকলে শীতের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে শীতকাল অবিমিশ্র কষ্টের সময় ছিল বলিয়া বোধ হয় না ; পরন্তু ইহা সুখের সময় ছিল বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যথা—

"মদেম শতাহিমাঃ সুবীরাঃ।"

(৮—ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪ ঋক্।)

"আমরা যেন শোভন সন্ততি সম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখ ভোগ করি।"

(রমেশ বাবুর অনুবাদ।)

১০ম, ১২শ, ১৩শ, ও ১৭শ ঋকে আমরা এই বর্ণনারই পুনরুক্তি দেখিতে পাই।

শীতকাল কি প্রকার সুখকর হইত নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌টির অর্থালোচনা করিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব ঃ—

"বিশ্বাসাংগৃহপতির্ব্বিশামসিত্বমগ্নে মানুষীণাম্।
শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ পাহ্যং হসঃ সমেদ্ধারং শতং হিমাঃ স্তোতৃভ্যো যেচ দদতি॥" ৮

(ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪৮ সূক্ত।)

"হে অগ্নি! তুমি সমস্ত মনুষ্যের গৃহপতি। হে যুবতম অগ্নি! আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বলিত করিতেছি। তুমি আমাকে শত সংখ্যক রক্ষা দ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর। যাহারা ত্বদীয় স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাহাদিগকেও রক্ষা কর।"

শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে শীতকালের রাত্রি সময়ে গৃহাগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে কিরূপ আমোদ-সভা বসিয়া থাকে তাহার জীবন্ত চিত্র ইংরেজ স্বভাবকবি কাউপারের (Cowper), টাস্ক (Task) নামক সর্ব্বজনপরিচিত কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে। মিসেস্ হিমেন্‌স্ (Mrs. Hemans) তদীয় Homes of England ("ইংলণ্ডের পরিবার") নামক কবিতায় গৃহাগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপবেশনকারী পরিবারমণ্ডলীর শীতকালের রাত্রির সুখ ভোগ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"The merry homes of England
Around their hearths by night,
What gladsome looks of household love
Meet in the ruddy light."

"ইংলণ্ডের আনন্দময় পরিবারসকল রাত্রিতে তথায় গৃহাগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে রক্তি-

মাভ আলোকে কিরূপ পারিবারিক সম্প্রীতির ভাবে হর্ষোৎফুল্লনয়নে সম্মিলিত হয়।'

উত্তর কুরুর আর্য্যগণও এই প্রকারে গৃহাগ্নির সুখোষ্ণ উত্তাপ উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, বেদের উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে এইরূপ বোধ হয়। শীতপ্রধান দেশাধিবাসীদিগের পক্ষে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যত অধিক তত অধিক আর কাহারও পক্ষে হইতে পারে না। আর্য্যগণ শীতপ্রধান উত্তরকুরুবাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অগ্নির প্রয়োজনীয়তা এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে ইহাতে দেবত্ব আরোপ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা হইতেই অগ্নিপূজার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শীতের প্রকোপনিবারণার্থ গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি সঞ্চয়ের আবশ্যকতা হইতেই গৃহে নিত্য যজ্ঞাগ্নি সংরক্ষণের রীতি প্রচলিত হইয়াছে। "অগ্নিহোত্রী" ও "সাগ্নিক" ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মূলে এই ঐতিহাসিক সত্যই বর্ত্তমান।

বৎসরের যে 'হিম' নাম আমরা বেদে পাইয়াছি তাহার অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'হিম' তুষার (বরফ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যেখানে শীতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইত সেইখানেই শীতকাল অর্থে 'হিম' শব্দের প্রথম প্রয়োগ হওয় সম্ভবপর ছিল। হিম ঋতু অর্থে বেদের এই হিমশব্দের প্রয়োগ পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে অতীব বিরল। তৎপরিবর্ত্তে শীত শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে যখন আর্য্যগণ শীত ঋতু বলিয়া শীতকালকে নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা তীব্র শীতের দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত মৃদু শীতের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বৈদিক ঋষিদিগের 'হিম' শব্দ নির্দ্দেশ্য বৎসর কোন্ সময়ে আরম্ভ হইত তাহার আভাস আমরা বেদেই পাইতে পারি। বেদে আমরা যেমন "হিম" শব্দ বৎসর অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই তেমনই "হেমন্ত" শব্দও বৎসর অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই যথা—

"শতং জীব শাদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্॥" ৪

(ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৬১ সূক্ত।)

"হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক; সুখে স্বচ্ছন্দে একশত হেমন্ত, একশত বসন্ত জীবিত থাক।" অভিধানেও 'হেমন্ত' ও "হিম" একই ঋতু বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে হেমন্ত হইতেই হিম ঋতুর আরম্ভ হইত এইরূপই অনুমান হয়। শব্দকল্পদ্রুমে হেমন্তের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদের কথারই সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। সেই ব্যুৎপত্তি এই,—হিমোঽতোঽস্ত্যেতি বা মনীষাদিত্বাৎ হেমন্তঃ। "যাহার শেষে হিম আসে তাহাই হেমন্ত।" উভয় ঋতুরই ব্যাপ্তিকাল অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উল্লিখিত হইয়াছে। হেমন্ত ঋতু হিম বা বৎসরের আদি বলিয়াই যে ইহার প্রথম মাস অগ্রহায়ণ (অর্থাৎ বৎসরের প্রথম) বলিয়া অভিহিত হইবে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। এবং কিজন্য পৌষ মাসে বৎসরের ফলাফল সূচিত হয় বলিয়া সংস্কার প্রচলিত হইয়াছে তাহাও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

উপরে আমরা বেদে শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত

তি নামে যে বৎসরের উল্লেখ পাইয়াছি াতে এই সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারি যে. াগণ উত্তর-কুরু হইতে ক্রমে যতই দক্ষিণ- অগ্রসর হইতেছিলেন ততই নূতন নূতন প্রভাব অনুভব করতঃ তত্তৎ ঋতুর ান্য হইতে ইহাদের নামানুসারেই বৎসরের নূতন নামকরণ করিতে লাগিলেন। বিশেষের প্রাধান্য হইতে যে সেই ঋতুর ানুসারে বৎসরের নাম হয় তাহার পরিষ্কার ান্ত আমাদের বৎসরের বর্ত্তমান "বর্ষ" নামে ওয়া যায়। "বর্ষ" নামটী বর্ষা ঋতুর নামানুরেই যে হইয়াছে তাহা উভয়ের এক রূপ ও ক মূল দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপেই প্রতিপাদিত । বেদে আমরা বৎসরের হিম, শরৎ, ন্ত, বসন্ত প্রভৃতি নাম পাইলেও "বর্ষা" মের কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হই না। ইহা তে আমরা অনুমান করিতে পারি যে র্য্যগণ নূতন দেশের সন্ধানে ভারতবর্ষে নীত হওয়ার পূর্ব্বে এই নামের উৎপত্তি নাই। ভারতবর্ষ বর্ষাপ্রধান দেশ বলিয়া র্ষাঋতুর নূতন প্রভাব ও দীর্ঘকাল ব্যাপীত্ব তু আর্য্যগণ ইহারই নামানুসারে "বর্ষ" মে বৎসরের নূতন নামকরণ করিলেন।

হিম ঋতু যে আর্য্যদিগের প্রথম ও প্রধান তু ছিল, শীতকালের আর্য্যসাধারণ "হিম" াম হইতেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া াইতে পারে। আচার্য্য মোক্ষমূলর পাশ্চাত্য াচীন আর্য্যভাষা সকলে এই "হিম" নামের পভ্রংশ আবিষ্কার করতঃ অনুমান করিয়াছেন আর্য্যগণ অধিক দক্ষিণ দিক হইতে আগমন রেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"That the Aryans did not come from a very southern clime has long been known, since they possessed common names for winter, such as Sanskrit, hima, Latin hiems, Old Slav zima, Irish gam." Biographies of Words by Prof. Maxmuller p. 103.

"আর্য্যগণ যে অধিক দক্ষিণ দেশ হইতে আগমন করেন নাই তাহা বহুকাল হইতেই জানা গিয়াছে, কারণ তাঁহাদের ভাষায় শীতকালের একই সাধারণ নাম পাওয়া যায় যথা—সংস্কৃতে 'হিম'; লাটিনে, 'হায়েম্স্'; প্রাচীন স্লেভ ভাষায় 'যিম' এবং আইরিস্ ভাষায় 'জেম্'।"

এই প্রকারের ভাষা বিজ্ঞানের প্রমাণ হইতে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ফ্রেজার তদীয় "ভারতের সাহিত্যমূলক ইতিহাস" (Literary History of India) নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এরূপ দেশই আর্য্যদিগের মূল-বাসভূমি ছিল যেখানে অধিকাংশ সময়ই শীতের প্রাদুর্ভাব থাকিত। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান হইতে ব্যক্ত হয় যে, তথাকার জল বায়ু অধিকাংশসময় শৈত্যবিশিষ্ট থাকিলে, তথায় গ্রীষ্মও যে অনুভূত না হইত তাহা নহে।"

"Philology can however, tell that the Aryans came from a land where the climate was for the most part, cold, although a summer was known." Literary History of India by R. W. Frazer L.L.B. p. 13.

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সন্দেশবাহক পারাবত

আজকাল ঘোড়দৌড়ের ন্যায় শূন্যমার্গে পায়রার দৌড়ও ইংলণ্ডে বেশ প্রচলিত হইতেছে। সেখানে ইহা একটি বিশেষ আমোদজনক কৌতুক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট জর্জ্জেরও এই ক্রীড়ার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সাণ্ড্রিংহামে তাঁহার পায়রার বাসের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উচ্চ মঞ্চ আছে; সেগুলি বাস্তবিকই দর্শনীয় জিনিস।

এই পত্রবাহক পারাবতগণের স্ব স্ব বাসার প্রতি এক স্বভাবসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সেই জন্যই ইহাদিগকে বাসা হইতে অনেক মাইল দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলেও, ইহারা পথ চিনিয়া বাসায় ঠিক প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই কৌতুকজনক ক্রীড়ায় সম্রাটের অনুরাগ বহুদিন পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। তখন তিনি Duke of York উপাধিধারী। সে সময় দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া নিউ-জিলাণ্ডের অন্তর্গত অকলাণ্ড প্রদেশে পদার্পণ করিলে, গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপের অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদর স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার জন্য কপোতের দ্বারা এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিউ জিলাণ্ড ও গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপ— এই দুই স্থানের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান ৫৮ মাইল। ইহাদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কোনপ্রকার টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত নাই; এবং অতি অল্পসংখ্যক জাহাজই এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত করে। সেইজন্য পত্রবাহক পারা[illegible] সাহায্যেই সংবাদ এবং পত্রাদি প্রেরিত [illegible] থাকে। গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপবাসিগণ তাঁহা[illegible] আন্তরিক রাজভক্তি ও সাম্রাজ্যের [illegible] প্রবল অনুরাগ সম্রাটকে জ্ঞাপন করি[illegible] জন্য পারাবতের দ্বারা পত্র প্রেরণ করি[illegible] ছিলেন। পত্রটি গন্তব্য স্থানে লইয়া যাই[illegible] ৬২ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। মহা[illegible] সম্রাট এই আশ্চর্য্যজনক উপায়ে অভিন[illegible] পত্র প্রাপ্ত হইয়া এতদূর সন্তুষ্ট হ'ন [illegible] তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের ফোটো তুলিয়া ল[illegible] আদেশ করেন।

পত্রবাহক পারাবতের দৌড়ের [illegible] ঠিক নিরূপণ করা সহজ নহে। কয়েক বৎ[illegible] পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত ক্রীড়ানুরক্ত ইংরা[illegible] ব্রাসেলস্ হইতে লণ্ডনে উড়িয়া যাইবার জ[illegible] তাঁহার তিনশত পায়রার ঝাঁক ছাড়ি[illegible] দিয়াছিলেন। এই দুই নগরের মধ্যে দুই[illegible] মাইল দূরত্ব বর্ত্তমান। পায়রাদের [illegible] ছাড়িয়া দিয়াই তিনি তাঁহার ইংরেজ ব[illegible] গণকে ইহাদের যাত্রাবিষয়ে অবগত করাইবা[illegible] জন্য টেলিগ্রাফ-আফিসে উপস্থিত হইলেন[illegible] এবং এই মর্ম্মে তাঁহাদের নিকট তারে সংবা[illegible] প্রেরণ করিলেন যে, 'পায়রাদের ছাড়ি[illegible] দেওয়া হইয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, নির্মেঘ; বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম মুখো।' কিন্তু এ[illegible] টেলিগ্রাম তাঁহার বন্ধুদের হস্তগত হইবা[illegible] পূর্ব্বেই, পূর্ব্বোক্ত উড্ডীয়মান পারাবতগণে[illegible] মধ্যে একটি পায়রা তাঁহাদের সমীপে আসি[illegible]

[illegible]স্থিত হইয়াছিল। ইহার ক্ষিপ্রগতি যথার্থই [illegible]য়জনক।

[illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা [illegible]কূল বাতাস পাইলে এক মিনিটে হাজার [illegible] পথ উড়িয়া যাইতে পারে এবং প্রবল [illegible]ভরে ইহারা মিনিটের মধ্যে আরও [illegible]৭০০ গজ বেশী উড়িতে সমর্থ; কিন্তু [illegible]াসের বিপরীত মুখে ইহারা মিনিটে [illegible]৯০০ গজের বেশি যাইতে পারে না। [illegible] লজের দুইটি ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট বিখ্যাত [illegible]রাবত আছে। তন্মধ্যে একটির নাম [illegible]াডিসন", অপরটি "উইলকিন্স"। প্রথম [illegible]রাটি ৬৯ মিনিটে ১০০ মাইল পথ ভ্রমণ [illegible]রিয়াছিল। বেগের ক্ষিপ্রতায় ইহা পৃথিবীর [illegible]ল প্রাণীকেই পরাভূত করিয়াছে। [illegible]ইলকিন্স" যে পায়রাটির নাম সে ১৩ [illegible]টা ১২ মিনিটে ৭০০ মাইল রাস্তা দৌড়িয়া-[illegible]ল। অপর কোনো পক্ষীকে সূর্য্যোদয় [illegible] সূর্য্যাস্তের মধ্যে এতদূর পথ কখনও ভ্রমণ [illegible]রিতে শুনা যায় নাই।

[illegible] মে মাস হইতে সেপ্টম্বর মাস ইংলণ্ডে [illegible]রা দৌড়ের সময়। সে সময় প্রতি [illegible]ক্রবার রাত্রে একখানি স্বতন্ত্র ট্রেন [illegible]বলমাত্র পায়রার ঝাঁক লইয়া King's [illegible]ross হইতে ইংলণ্ডের উত্তর ও মধ্যবর্ত্তী [illegible]দেশ সমূহে উপস্থিত হয়। সেখানে লইয়া [illegible]য়া পায়রাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়; তাহারা [illegible]ক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বাসায় আবার উড়িয়া [illegible]াসে।

এই পত্রবাহক পারাবতগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে [illegible]শেষ উপকার সাধন করে। অরাতির দ্বারা [illegible]বরুদ্ধ সৈন্যদল এই কপোতের দ্বারাই স্বপক্ষীয় বন্ধুবর্গের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে; সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। অনেকস্থলে ইহারা শত্রুপক্ষের গোপনীয় সংবাদ বহন করিয়া যুদ্ধ-জয়ের পথ সুগম করিয়া দেয়। অনেকগুলি পায়রা এতদূর শিক্ষিত যে, শত্রুহস্তে ধৃত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই সংবাদ পত্রাদি যেমন করিয়া পারে নষ্ট করিয়া ফেলে।

সাধারণ কাজেও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ফলপ্রদ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিব্রেস্কা দেশের ফ্রাঙ্ক মারিস নামক একজন চিকিৎসক রোগী পরিদর্শনের সময় তাঁহার সহিত কতকগুলি পায়রা লইয়া যাইতেন এবং সেগুলিকে তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদিগের বিভিন্ন আবাসে রাখিয়া আসিতেন। তাঁহার কতকগুলি ছাপান কাগজে রোগীর অবস্থার বিষয় লেখা থাকিত; কেবল নাড়ীর অবস্থা এবং দেহের শীতলতা ও উষ্ণতার পরিমাণজ্ঞাপক স্থানগুলি শূন্য থাকিত। সেই স্থানগুলি যথাকালে পরিপূর্ণ করিয়া কাগজখানি পায়রার গলদেশে বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই সে ঠিক ডাক্তারের বাটী ফিরিয়া আসিত। ইহাতে রোগী ও ডাক্তার উভয়েরই বিশেষ সুবিধা ছিল। পায়রার নিকট হইতে রোগীর সংবাদ পাইয়া ডাক্তার তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিতেন— কাজ বেশ সহজে, স্বল্প সময়ে ও সুশৃঙ্খলায় চলিত।

পায়রা দৌত্যকার্য্যে কিরূপ পটু তাহা দেখাইবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একজন যুবতী স্ত্রীলোক এক দরিদ্র যুবকের প্রেমে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যুবতীর পিতা কন্যার এইরূপ দীন অযোগ্যপাত্রে প্রাণ

সমর্পণের বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে ভবিষ্যতে তাঁহার বাসভবনে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তখন গভীর প্রণয়াসক্ত যুবকযুবতী, পরস্পরের মধ্যে প্রেমপত্র আদান প্রদানের জন্য শীঘ্রই এক আশ্চর্য্য কৌশল উদ্ভাবন করিল।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটি পায়রা যুবতীর গৃহের এক উচ্চ মঞ্চে আসিয়া বসিত; এবং অপর একটি পায়রা সন্ধ্যার অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া পত্রের উত্তর লইয়া ঠিক নিয়মিত ভাবে যুবকের আলয়ে উপস্থিত হইত। এইপ্র নির্ব্বিঘ্নে বহুদিন ধরিয়া তাহাদের প্র প্রেরণ চলিয়াছিল। কেহই কোনো প্র সন্দেহ করিতে পারে নাই।

শেষে দৈবক্রমে একদিন যুবতীর পি সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। তখন অ তাঁহার ক্রোধ রহিল না—পরস্পরের প্রগ প্রগাঢ়তা দেখিয়া তাঁহার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিবা সম্মতি প্রদান করিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সূর্য্যোদয়

সূর্য্য যখন উদয় হোল তালী বনের অন্তরালে,
সবুজ গাছের পাতার ভিতর নূতন মাজা সোনার থালে,
উদয় মেরুর শিখর হতে রক্তধারা পড়ল' টুটি,
কমল বনে উঠল' ফুটে ঊষা রাণীর চরণ দুটি,
মহুয়া ফুলের রঙিন কাপড় বিছিয়ে দিলে গাছের তলে,
মৌমাছিদের গুণগুণানি আবির মাখা ডুমুর ফলে।
পারের ঘাটে ভীড় লেগেছে যাত্রীরা সব যাবে নায়ে,
কলমী ডাঁটায় বাজায় বাঁশী রাখাল-ছেলে গাছের ছা'য়ে,
নিভিয়ে দিয়ে নিশার প্রদীপ গন্ধ ধূপে সাজিয়ে ডালা
প্রভাত করে সূর্য্য পূজা বিনি সুতোয় গেঁথে মালা।

পড়ল রবির তরুণ কিরণ মুক্তা-ঝরা দূর্ব্বাদলে,
লক্ষ্মী দেবীর স্বর্ণ আঁচল ঝকিয়ে দিলে খেলার ঘরে।
ছড়িয়ে দিয়ে সোনার আলো শিশির-ঝরা পল্লী পথে
উঠল গিয়ে তরুণ রবি তুষ্ট ঘোড়ার পুষ্প রথে।
বংশ-রন্ধ্রে বাজিয়ে বাঁশী অশথ ডালে দিয়ে নাড়া।
দক্ষিণা বায় গেল বয়ে নদীর বুকে জাগিয়ে সাড়া
পুণ্য লোভী ফিরছে ঘরে সিক্তবাসে সমাপি স্নান
পাখীরা গায় সবুজ শাখে প্রভাত রবির বন্দনা গান।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



কৃষ্ণাষ্টমী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [৮ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

৪০

লাটিমটা যতক্ষণ ঘুরিতে থাকে তাহার উভয়দিকের লাল, কালো রং দুইটাও তাহার সেই ঘূর্ণন বেগের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে একাকার হইয়া যায়। শচীকান্তের চপল চিত্তবৃত্তির মধ্যেও সেইরূপ লাল, কালো অংশ দুইটার সমাবর্ত্তন চলিতেছিল। রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া সে কাগজ কলম লইয়া একখানা দীর্ঘপত্র লিখিল মনীশকে। আর একখানা সংক্ষিপ্ত পত্রে একই ধরণের কথা লিখিয়া লেফাফার উপরে শিরোনামা দিল "পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাপদেষু"।

ইহার পর সে একটু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যূষে ভক্তিনাথ প্রাতঃস্নানার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন, দেখিলেন ভাই ব্যাগ-হাতে বাহির হইয়া যাইতেছে, ডাকিলেন, "শচি যাচ্চো কোথা?"

"আপনি উঠেছেন, তাহলে দিদিকে বলবেন চল্লাম।" ফিরিয়া আসিয়া সে ভাইকে নমস্কার করিল। ভক্তিনাথ কহিলেন "সে কি এখনই কোথা যাবে? দুদিন থাকো, বেলা হোক খাওয়া দাওয়া কর। যেতে হয় তখন যেও; এমন করে কি যায়!"

অপরাধের কালিমা শচীকান্তের ললাট অন্ধকার করিয়া ফেলিল সে ব্যস্ত হইয়া বলিল "কুটুমতো নই, সকাল সকাল যাওয়াই ভাল"। ভক্তিনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কুটুমের যে বাড়া হয়েচ শচি! একখানা চিঠি লিখেও তো খোঁজ নাওনা; আসার পাঠ তো উঠিয়েই দিয়েছ,—এলে যদি তাও একটা দিন বই নয়।"

শচীকান্তের মন একেই অস্থির সে ঈষৎ উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বিরক্তি দমন করিয়া সে উত্তর করিল "এসে তো কত যত্নই পাই, কার জন্য আসবো? বাড়ীর গিন্নিতো দেখি ঠুক্ ঠাক্ কথা শোনাতেই জানেন—"

"সে দোষ কি আমার ভাই? একজন পরের মেয়ে যদি আমাদের না মানে তার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তুমি আমায় করাবে? তুমি আমার সেই স্নেহের শচী,—আমিতো কোন অপরাধ করিনি?"

শচী বিরক্তির হাসি হাসিল "আমিই বা করিচি কি? সুবিধা হলেই আসচি, কখনও আপনাকে অমান্য করিনি, আর কি করবো বলুন।"

ভক্তিনাথ চুপ করিয়া রহিলেন, বলিবার মত এমন সত্যই কিছু ছিল না, কেবল মনের একটু খানি ক্ষোভ মাত্র। যাহাকে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে জীবনের মধ্যে একটা স্নেহাধিকার দিয়া আসিয়াছেন সে যদি সেটা তুচ্ছ বলিয়া প্রত্যাখান করে তাহাতে স্বভাবতঃই মনে ক্লেশ হয়, ইহাতো আইনের দাবী নয় এ যে বুকের টান।

"তবে এখনই আসচো? মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও, কল্যাণী সেখানে আছে বুঝি? আশীর্ব্বাদ করচি তাকে বলো—"

দাদাকে সুর ফিরাইতে দেখিয়া সেও একটু লজ্জানুভব করিল। দাদা আজন্মই এইরূপে নিজেকে সংযত করিতে অভ্যস্ত ইহা তাহার মনে পড়িল।

মৃদু স্বরে সে কহিল "আসি তবে দাদা আবার শীঘ্র একদিন আসবো না হয়। বলেন তো কিছুদিন থাকা যাবে তখন,—এখন একটু কাজ আছে। বাবার চিঠি পেয়েছেন?" চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম পিতার সংবাদ লইবার কথা মনে পড়িল! "পেয়েছি, ভাল আছেন। এসো তাহলে সুবিধা হলেই। দূরে থাক, মন তোমার কাছেই সর্ব্বদা পড়ে আছে, গিয়ে একখানা পত্র দিও।"

"দেবো," এই বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শচীকান্ত ভ্রাতার দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। সেই দিকে কিছুক্ষন চাহিয়া থাকিয়া নেত্র ফিরাইয়া ভক্তিনাথ আবার একটা মৃদুশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শিশু ভ্রাতার সেই সুকুমার মূর্ত্তি, জ্যেষ্ঠের প্রতি অসহায় আত্ম-সমর্পণ মনে পড়িল। মানুষ কত বদলাইয়া যায়! তাঁহার মনের স্নেহ নির্ঝর আজও ঝরিতেছে কিন্তু সে ক্ষীরধারা আর শচীকান্ত স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নয়। নাই হোক, ভাল থাক সুখী হোক, ভাই এর জন্য ভাই আর কি করিতে পারে!

৪১

মধ্যাহ্নে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া করালী-চরণ তাহার সমান দরের একটি বন্ধু লইয়া বড়ে টিপিতেছিল এমন সময় বেড়ার পাশ হইতে একখানা সুন্দর তরুণ মুখ সেখানে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। কলাঝাড়ে কদলীপুষ্প দোদুল্যমান, বেড়ার ধারে পালং বাতাসে মাথা দুলাইতেছে, মাচাতলা লাউশাকের মধ্যে মধ্যে সাদাফুলের বাহার খুলিয়া দিয়া ছোট ছোট লাউ ধরিয়াছিল, খানকত উচ্ছিষ্ট বাসনকোসন লইয়া কমলা সেই ফসল ক্ষেতের মধ্য দিয়া ঘাটের পানে চলিয়াছে, শচীকান্ত তাহা দেখিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।—

পল্লীগ্রামে গৃহস্থগৃহে লক্ষ্মীপূজা হয় সে দেখিয়াছিল; অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজায় তাহার মা "তিল-সোনার" কথা বলিতেন, ছোট বেলায় সে তাহা অনেকবার শুনিয়াছে, সে কাহিনীর মধ্যে তিলফুল তোলার প্রায়শ্চিত্ত হেতু বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীকে দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হইয়াছিল; সেই গল্পটা আজ অকস্মাৎ সার্থকভাবে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। কি পাপে এই লক্ষ্মীস্বরূপা কমলাকে

এ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে? তবু মূর্খ লোকে বলে ঈশ্বর আছেন!

অদূর পুষ্করিণীর ভগ্ন সোপান অবতরণ করিয়া জলের মধ্যে কিশোরী বাসন রাখিল। হাত ধুইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর,—কোথা গেল সে? শচীকান্ত তাহার উৎসুক দৃষ্টি বিস্তৃত করিয়াও আর তাহাকে দেখিতে পাইলনা, জলে অবগাহন করিয়া থাকিবে ভাবিয়া সেখান হইতে অপসৃত হইল। মধুর স্বপ্ন উপভোগান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন মনে একটা বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয় তেমনই একটি প্রসন্নতার আনন্দ লইয়া সে করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ মানসে অগ্রসর হইল। মাঝখানের মানসিক সংগ্রাম, সেই মুহূর্ত্তে যেন যাদু মন্ত্রে তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। করালীচরণ বড়ের চাল ভুলিয়া আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "আসুন, আসুন, কাল থেকে কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। ওহে নৃসিংহ! এখন তা হলে তুমি এসো গিয়ে, খেলাটা এখন ত আর হলো না, রাত্তিরে তখন তোমার গিয়ে শোধ দেওয়া যাবে। তারপর শচীকান্ত বাবু! কি মনে করে?" আবার সেই মনের উপর আক্রমণ! শচীকান্তের আললাটকণ্ঠ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, "বিশেষ কিছু নয়, দেখা হয়েছিল তাই একবার—"

"বটে বটে এমনই আমার সৌভাগ্য, বসুন, বসুন, কমলি কোথা গেল পান এনে দিক্ না,—"

অকস্মাৎ সঙ্কুচিত শ্রোতা এমন করিয়া চমকিয়া উঠিল যে, যেন সে গুপ্ত ঘাতকের ছুরির আঘাত পাইয়াছে, আকস্মিক ক্রোধের উচ্ছ্বাসে তাহার সমুদয় মুখখানা অরুণাচলের মত লোহিত হইয়া গেল, সে দুই পদ পিছাইয়া তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল "ছিঃ—"

করালীচরণ এ অকস্মাৎ ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। বিস্ময়ে সে তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু টানিয়া ডাগর করিল "রাগ করলেন কেন? কিছু অলেহ্য বলেচি? মুখ্য সুক্ষ্যু মানুষ ও সব ধর্ত্তব্য করবেন না, আপনারা ইয়ং ম্যান ইংরিজীশেখা, আমরা সেকেলে;—বেফাঁস বলা রোগ আমাদের। তা যা হোক শচীবাবু যখন দয়া করে পা'র ধূলো দে'ছেন তখন এ গরীবের একটি উপকার করুন। আমি ছা-পোষা কোথা থেকে বাইরের লোক পুষি বলুন? শিবনারাণ বাবু যখন কমলাকে নিতে চান না তখন কাঁহাতক আমি আর তাঁদের পায়ে তেল দিতে থাকবো? একটি যোগ্য পাত্তর খুঁজে দিন, মেয়েও তো বড় সড় হয়েচে, দু হাত এক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

কোথায় বিরক্তি, কোথায় ক্রোধ! হৃদ্‌পিণ্ড হইতে নির্গত শোণিত পুনরায় নিজ স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আছড়াপাছড়ি করিতে লাগিল, সে বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "সেটা কি উচিত!"

"কেন নয় মশাই? ষোল বছরের মেয়ে! তাঁরা জানেন না মাথায় কি ভার? চিঠির উত্তরটাও দেওয়া দরকার বোধ করলেন না তো, সে দিনও তো স্পষ্ট বলেচেন—"

অতি কষ্টে শচীকান্ত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে উচ্চারণ করিল "কি?"

"কেন বলেছেন যার ভাগ্যে যা আছে

কেউ খণ্ডাতে পারে না তোমার ভাগ্নিকে তুমি নে যাও আমরা চাই না।"

শচী ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল "রাগ করেই বলেছেন তো, সেটা" ?

"রাগ! কিসের রাগ? টাকা খসাতে হলে অনেক মশায়েরই রাগ হয় সেটা জানা আছে। কেন নেবো না? দুশোবার নেবো। তোমরা কুলীনেরা চোখের চামড়া খসিয়ে বিয়ের টাকা নিতে পারো, গরীবের ঘর বাড়ী বেচে নাও, মুনিবের ক্যাস ভাঙ্গিয়ে কনের বাপকে জেল খাটাও, আর দোষ হলো গরীব আমাদের বেলায়? উপদেশে মাছ মরে না, জলে নামতে হয়। আমি যেখানে তিন হাজার টাকা পাবো সেইখানে মেয়ে দোব, কেন দোব না, তোমরা বড় মানুষেরা ছান্‌লাতলা থেকে বর ফিরোও না?"

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল, শচীকান্তের চঞ্চল হৃদপিণ্ড পুনর্নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল, মনে একটা অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল; কিন্তু কাহার প্রতি সে ক্রোধ! সে ঈষৎ ঝাঁঝিয়া কহিল "তবে তুমি কি করতে চাও?"

করালী তাহার মুখচক্ষুর শোচনীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে মনে মনে হাসিল, প্রকাশ্যে বিনীত স্বরে উত্তর করিল "যে ও মেয়ের দর বোঝে তেমন লোকের হাতে তাকে দিতে চাই, বংশজের ঘরে কেউ পায়ে ধরে মেয়ে দেয় নি আমিও দেবো না।"

"তা হলে—তা হলে এই মতই স্থির!"

"অবিশ্যি"

"কিন্তু কিন্তু—এটা ভাল হবে কি?"

"কেন মশাই? মেয়ের অভিভাবক আমি, আমার যাকে খুসী মেয়ে দোব, তার মন্দ এতে কি পেলেন শুনি?"

আবার শচীকান্তের বুকের মধ্যে তুমুল তরঙ্গ উঠিল! মনতরী টল্‌মল করিয়া বুঝি এবার অতলে ডুবিয়া যায়। সে কি একটা বলিতে গেল বক্তব্যটা কণ্ঠের মধ্যেই অস্ফুট হইয়া রহিল। বিবেক এবার পরাজিত প্রায়, স্বেচ্ছায় সে স্বার্থকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত, মন বলিতেছিল তবে আর তুমি কি করিবে? তোমার ইহাতে হাত কি? তুমি শুদ্ধ কেন বঞ্চিত হও! বিবেক সায় দিয়া বলিল "না পাপ কি? তোমার আর দোষ কি?"

করালীচরণ দাওয়ার এক পার্শ্বে চকমকির নিকট সজ্জিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে একটা ডিবাভরা পান লইয়া বাহিরে আসিল। স্তব্ধ শচীকান্তের কাছে আসিয়া উপহার বস্তু হস্তে স্থাপনান্তে জিজ্ঞাসা করিল "দোক্তা টোক্তা চলে?" সে নীরবে ঘাড় নাড়িল। ডিবাটা তাহার হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল। তাম্বুল মুখে উঠিল না। "তামাকটাও চলে না? বেশ, বেশ, কতদূর অবধি পড়াশোনা হয়েচে? পাশ কটা?" করালী এবার তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে অপ্রকৃতিস্থমতি অতিথির পাশে বসিয়া বিজ্ঞ কন্যাকর্ত্তার সুরে তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

শচীকান্তের এসব ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের ভাবনাতেই অস্থির তথাপি বাহ্যিক ভদ্রতার খাতিরে কোনমতে জবাব দিয়া গেল "এম্ এ"।

"অ্যাঁ চার চারটে পাশ! আমাদের মুন্সীর তপস্যা ভাল ছিল।"

শচীকান্তের নিশ্চল হৃদ্‌পিণ্ড প্রতিঘাতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল চোখ মুখ লাল করিয়া একটা রক্তের উচ্ছাস মাথার মধ্যে ছুটিয়া গেল "সেকি; সেকি!"

ধূর্ত্ত করালী শান্তভাবে ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল "এই একটা কথার কথা বলছিলাম, বিবাহ হয়েছে?" "না" বলিয়া ডিবাটা নামাইয়া রাখিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল, যেন এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া সে এই মায়াবীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবে! কিন্তু সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই আবার ও কি দৃশ্য!

সজল চরণচিহ্নগুলি ধূলায় অঙ্কিত করিয়া আর্দ্রবসনে ভারাবনত দেহে কে ঐ ঘাটের পথ হইতে ফিরিতেছে! সে প্রভাতের হাস্যময়ী মানসপ্রতিমা নহে, সংসারের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিতা সুকরুণমূর্ত্তি সে। শচীকান্ত তাহার দৃষ্টি বাঁচাইবার চেষ্টায় একটু সরিয়া বসিল, নিজেকে স্থির করিয়া লইবার জন্য একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর ললাটের স্বেদজড়িত কেশগুচ্ছ ধীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আবার সেই দিকে চাহিল। অতি নিকট দিয়া কমলা কোনদিকে না চাহিয়া ধীরপদে খিরকির দিকে চলিয়া গেল। তাহার বিষণ্ণ নত নেত্রের আভাষ দ্রষ্টার সব দ্বিধা ঘুচাইয়া দিয়া গেল, সে অভিভাবকের দিকে অসঙ্কোচে চাহিয়া কহিল "ওখানের সঙ্গে তাহলে মেটাতে চান না?"

"না"।

"তাহলে যদি আর কেউ কমলার কর প্রার্থনা করে তো—"

"যদি তিনহাজার টাকা দেয়, তাহলে তারই সঙ্গে বিয়ে দেবো,—"

একটা ঘৃণাপূর্ণ ক্রোধ কটাক্ষ করিয়া সে কহিল "হ্যাঁ, হ্যাঁ তা আমি জানি। টাকা দিলেই—আপত্তি নাই কিছু?"

"কিছু না। তবে টাকাটা আগাম চাই বুঝলেন?"

"আচ্ছা তাই হবে!"

বক্তার মন বুঝিয়া আবার করালীচরণ মনের মধ্যে হাসিল। টাকা খসাতে হলেই বাবুরা বড় চটেন। প্রকাশ্যে সে কিছু না বলিয়া সজোরে হুঁকার নলে টান দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অতিথির পানে ফিরিয়া না বুঝিবার ভানে বলিল "বর কে?" লোকটার অল্পবুদ্ধির প্রতি অসহায় ভাবে চটিয়া শচীকান্ত নীরবে অধর দংশন করিল, তাহার মনের মধ্যে আবার দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

৪২

"বলি আজ যে বড় খুসী খুসী? বেলাতো আর রেখে এসোনি যে দুটো কথা বার্ত্তা কইব, সত্যি কমল তোকে শুধু ঐ হাসিটুকুতেই আজ এত সুন্দর দেখিয়েছে আমারই মনে হচ্চে নিজেকে বিকিয়ে দিই।"

কমলার নূতন বন্ধু সরোজিনী প্রীতিপূর্ণ নেত্রে তাহার সরমরঞ্জিত মুখে দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলিল। অপরাহ্ণে তখন সায়াহ্ণের ছায়াপাত হইয়াছিল। ম্লান আলোকে সলিলমধ্যবর্ত্তিনী কমলাকে জলদেবীর মতই অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল, তাহার স্থিরদৃষ্টি আজ ক্ষণচঞ্চল, একটা সলজ্জ রাঙ্গা আভা তড়িৎবেগে

শুভ্র ললাটে, গোলাপি গণ্ডে মিলাইয়া যাইতেছে। সে মৃদু হাসিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টি নত করিল, রন্ধনের কালি গামছা দিয়া রগড়াইয়া তুলিতে তুলিতে কহিল "কি যে বলো!"

"নালো সত্যি আমি ঠাট্টা করচিনে। ...কিযে নাম তাওতো কিছুতে বল্লিনে? তবে তোর বরই বলি; তিনি যদি এখানে থাকতেন এখনি পাগল হয়ে রাঙ্গা পায়ে লুটিয়ে পড়তেন,। আচ্ছা ভাই মাঘ মাসতো যায় বিয়ের কি হলো? তাঁরা কিছু বলেন নি?"

কমলার রঞ্জিতমুখ সুখের স্মৃতিতে উজ্জ্বল দেখাইল, আনত মুখখানি অধিক নত করিয়া সে উত্তর করিল "হ্যাঁ ভাই লিখেছেন,"

"কি? কবে বিয়ে ঠিক হয়েচে?"

"পরশু!" "পরশু!" "হ্যাঁ ভাই।" সরোজিনী বিস্ময়ের সহিত আনন্দে চমকিত হইল, "তাই এত আহ্লাদ বটে! বেশ হলো ভাই! যত শীঘ্র এ ঠাঁইখানা ত্যাগ করতে পারিস্ ততই মঙ্গল,। আমার দুদিন ফাঁকা ঠেক্‌বে—বয়ে গ্যাল, তুই তো বত্তাবি। কাল তা হলে গায় হলুদ? কোন সাড়াটিও তো নেই, ঢের ঢের কিপ্‌টে দেখিচি বাবা এমন কিপ্‌টে আমার চৌদ্দ পুরুষেও দেখেনি। তা যাই হোক, কমল তোর বর দেখতে ভাই যাবোই, গলাধাক্কা দিলেও সেদিন নড়চিনে। ভয় নেই পাত পেতে বসচিনে, সেদিন একাদশী ওপাঠ সারাই থাকলো! তোর খুব আনন্দ হচ্চে? মরি, লজ্জায় যে একেবারে গেলেন! বুড় ধাড়ি কনের আবার অত কেন লা! আহা আনন্দ আর হবে না বোন, কি সুখেই এখানে আছ, ঠাকুর মুখ তুলে চান, সুখে থেকো, এসো কমল সন্ধ্যা হয়ে গ্যাছে বাড়ী যাওয়া যাক্। শীতে হিমে অসুখ করবে মুস্কিল, নিজের বিয়েতো তোমায় নিজেকে দিতে হবে। যেমন কালনেমী মামা জুটেচে!"

কলসী ভরিয়া দুই সখীতে জল ছলকি উঠিল, আর্দ্র বসন ত্যাগ করিয়া ভিজা বস্ত্র নিঙড়াইয়া উভয়েই নীরবে গৃহাভিমুখী হইল, দুজনেই নিজ নিজ চিন্তায় তন্ময় ছিল। সখীর বিবাহের কথায় সরোজিনীর নিজের বিবাহের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল। গাত্র হরিদ্রা, আয়ুর্দ্ধ্যন্নভোজন, প্রতিবেশী গৃহে সান্ধ্য নিমন্ত্রণ, সানাইএর বাদ্যে, শঙ্খ রবে, হুলুধ্বনির কোলাহলে কতবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এক অপরিচিত কুণ্ঠিত দৃষ্টির সহিত তাহার তন্দ্রাবিজড়িত চক্ষের ক্ষণিক মিলন, এই সকল কত কথা মনে পড়িতেছিল। সবই ত সেদিনের কথা! শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় মায়ের গলা ধরিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল, পাঁচ জনে জোর করিয়া তাহাকে পাল্কীর ভিতর পুরিয়া দিল, কঠিনচিত্ত বেহারাগুলা তাহার কান্নাকাটি অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ অচেনা পুরীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। সেই অজানা গৃহে সেদিন তাহার কত আদর! শ্বাশুড়ী কোলে লইয়া "লক্ষ্মী" রূপে বরণ করিয়াছিলেন, চারিদিকেই স্নেহ মমতার ছড়াছড়ি!

তারপর অল্পে অল্পে নারী জীবনের সারবস্তু সে যখন চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সব চুকিয়া বুকিয়া গেল। দু চারদিন পরে আলক্ষ্মী অপয়া বধূ পিত্রালয়ে পুনঃপ্রেরিত হইল। বৎসরাধিক পূর্ব্বে যে বেহারা গুলার কাঁধে চাপিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে

গিয়াছিল সেই পথ ধরিয়া তাহারাই তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। মাঝখান হইতে শুধু সমস্ত জীবনটা শ্মশানবহ্নির বুকে আহুতি দিয়া আসিল!

কমলা গৃহকর্ম্মের অবসানে ভাল করিয়া কাপড়খানা গুছাইয়া পরিল, সুগোল মণিবন্ধে করভূষণ দুখানির প্রতি একটা প্রীতিকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নববধূর সরমশঙ্কিত চরণে সে পূর্ব্বের মত বাহিরে গাছের তলায় গিয়া বসিল। নূতন একটা ভাবের আলো নবোন্মেষিত হৃদয়মুকুলে পতিত হইয়া আজ সারাদিনে তাহাকে পূর্ণবিকশিত শতদলে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, আজ শুধু দয়াকৃতজ্ঞতার আদান প্রদান নয়, তাহাদের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যা আজ তাহাদের এক, অছিন্ন মিলনে মিলাইয়াছে! কমলা আজ অনাথা নয়, হীনচিত্ত আত্মীয়ের সংস্পর্শে হেয় নয়, সে অকুণ্ঠ কৌমার প্রেমের বৈজয়ন্তী মাল্য-ধারিণী মহামহিমময়ী নারী, একনিষ্ঠ, সংযত চরিত্র মনীশের হৃদয় রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী সে!

যত বড় কৃপণই হৌক হাজার হউক মেয়ের বিয়ে,—করালীচরণ উত্যক্তচিত্তে দুচারটি প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। সত্য-কালী বিছানা ছাড়িয়া রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছেন; কমলা যে তাঁহার সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছে ইহাতে তাঁহার মন মোটেই ভাল ছিল না। বিমর্ষমুখে চারিদিকে চোক ফিরাইয়া আয়োজনের স্বল্পতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার মৃদুস্বরে বলিলেন "ঐটুকু ঘিয়ে অত ময়দা তো ভাজা যাবে না, আরও সের পাঁচেক লাগবে না!"

"আরও পাঁর সের! চুমুক দিয়ে ঘি খাওয়া হবে না কি? ঐ ঢের হয়েচে।"

সত্যকালী কহিলেন "মিষ্টিতেও কুলবে না, মোটেতো এক রকম ঐ গোল্লাসন্দেশ তাও—"

করালীচরণ মুখ খিঁচাইয়া ধমক দিয়া উঠিল "থাম থাম আর সরফরাজি করতে হবে না, যার কুলবে সে খাবে, না হয় না খাবে, তুই কি আমায় ডুবোতে চাস্ নাকি?"

সন্ধ্যার সময় সরোজিনী আসিয়া স্পন্দিত-বক্ষঃ কমলাকে নির্জ্জন কোণ হইতে বাহির করিল, সে লজ্জায় তাহার গলা ধরিয়া বুকে মুখটা গুঁজিয়া ফেলিল "সরোজ যেখানে থাকি তোকে কখন ভুলব না।"

আসন্ন বিরহাশঙ্কাব্যথিতা সরোজিনী তাহার রক্তিম গণ্ডে অঙ্গুলীর মৃদু আঘাত করিয়া সজলনেত্রে হাসিয়া কহিল "দেখা যাবে ভাই, ওমা চুলটা এখনও বাঁধা হয়নি যে, বোস্"।

সুচারু ছাঁদে কবরী রচনা করিয়া অনেক কষ্টে সরোজিনী চন্দন আল্‌তা সংগ্রহে কনে সাজাইল, খাটো রাঙ্গাচেলিখানা সে অঙ্গের পরিপূর্ণ লাবণ্য একবিন্দু হতশ্রী করিতে পারিল না। গহনা নাই শুনিয়া একবার সে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়াছিল, পরে চন্দন চর্চ্চিত ললাটে প্রভাতগগনে প্রথম চিহ্ন ঊষার রক্তিম ছটার মত নবজীবনের প্রথম মঙ্গল সূচনা স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র সিন্দুর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দুই হাতে সেই মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ-নেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল "তা কিছুই না থাকুক, এম্‌নিতেই এরূপ ভুবন ভোলাতে পারে।"

সুস্নিগ্ধ কালো চোখ দুইটি একবার পূর্ণ প্রীতিভরে সখীর মুখে স্থাপন করিয়া সে নিজের মুখখানা তাহার হস্তমধ্য হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে কহিল "যাও!"

কিন্তু স্তুতির বাণী কয়টা বোধ হয় বড়ই মনের মত হইয়াছিল। কস্তুরী মৃগ যেমন নিজের গন্ধে নিজে মোহিত হয় আজ তাহার মনটাও তেমনি এ খবর টুকুতে মাতিয়া উঠিল।

লগ্নমাথায় করিয়া বর আসিল। বরযাত্রী জনকয়েক মাত্র। বরকর্ত্তা লম্বোদর তুল্য দেহ গরদ উত্তরীয়ে আচ্ছাদন করিয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। বরের পার্শ্বে মোটা চেনপরা মিতবর মৃদুস্বরে রহস্য বাণী বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু এ কি বর! নেপথ্যস্থিতা সরোজিনী নিস্পন্দনেত্রে বরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর পরিকল্পনা লইয়া শিক্ষিত নট যেন রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতেছে! এই কমলার বর! অতি সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি, কিন্তু ভস্মের ন্যায় বিবর্ণ, প্রাণ-হীনের মতই নিস্পন্দ! কে যেন শ্মশান যাত্রার পরিবর্ত্তে তাহাকে বিবাহবেশে সাজাইয়া আনিয়াছে!

(৪৪)

গিরিজাসুন্দরী অবাক্ হইয়াছেন। কালধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ টেঁকেনা; একথা ভাবিয়া তিনি এখনকার কালের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অনেকখানি উদার নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন, শচীকান্তের অনেক অসঙ্গত চালচলন যাহা তাহার পিতৃগৃহেও অনেকে সমালোচনার চক্ষে দেখিত তিনি সে সকল তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, অপর কেহ কিছু বলিলে বরং সেটা চাপা দিবার ইচ্ছায় হাসি কহিতেন "চিরকাল কি সমান যায়রে বাপু যুগধর্ম্ম একটা নেই?"

কিন্তু সেই স্নেহময়ী মাসিমাও এ তাঁহার উদার নীতিকে তেমন করিয়া প্রশ্রয় দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহা জন্মের সাধে ছাই ঢালিয়া বাসন্তীকে সে প্রত্যাখ্যান করিলই—করুক ইহার সত্য কারণও প্রথমটা দেখাইয়াছিল; বি মাঝখানে শোনা গেল সে মেয়ের আ তিন চার বছর ধরিয়া কোন খোঁজখবর নাই। তারপর সে যখন আসিয়া মে নিরুদ্দিষ্টা কন্যার পুনঃপ্রাপ্তি সংবাদ জানাইয়া বলিল, আগত পরশ্ব বিবাহের দি আছে সেই শুভলগ্নেই সে বিবাহ করিতে চাহে, তখন সত্যই তাঁহাকে সে বিস্মিত করিল, আহতও করিল। হউক কলিকাল ত বলিয়া এতখানি স্বাধীনভাব শোভা পায় না! গিরিজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "পরশু কেমন করে হবে? তোমার বাপভাইকেও কি জানাতে হবে না?" বিয়েপাগলা ছেলের আপাদ মস্তক যেন কম্পিত হইল, মুখ এতটুকু করিয়া সে কহিল "তাঁরা পূর্ব্বেই জানতেন, এখনই না-ই বললে বিয়ের পর একবারে লিখা এদিনটা ছাড়া হতেই পারে না; মাসিমা ওরা ফাল্গুন মাসে রাজী নয়।"

"না হয় বৈশাখ মাসেই হবে, এত শীঘ্র কখনও বিয়ে হয় রে বাপু! খেলাঘরের বিয়ে নাকি? পত্র আছে, গায় হলুদ আছে, সামাজিক করতে হবে, নেমন্তন্ন, কুটুম সজ্জন আনা—বলিস্ কি! একি হাড়িডোমের বর!"

শচীকান্তের মুখখানা একেবারে কালি

য়া গেল "পায়ে পড়ি মাসিমা, কিছু করোনা টুকে খবর দিওনা—শুধু"—

ঢের ঢের বেহায়া ছেলেপিলে দেখা যায় তবড় নির্লজ্জ কেহ কখনও দেখে নাই! নের ক্ষোভ বিরক্তি ক্রোধ এক সঙ্গে থলিয়া উঠিল, মুখ রাঙ্গা করিয়া কম্পিত স্বরে হিলেন "বেশ বাছা যা বোঝ করো আমরা ড়োশুড়ো হয়েছি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে াগমন্দ চিনে উঠ্‌তে পারিনে!"

নিগূঢ় অভিমানে স্তব্ধ থাকিয়া যথাসম্ভব য়োজনে মন দিলেন, কাশীতে এবং ভক্তি-াথকে সংবাদ পাঠাইতে বারণ করিয়াছে, াগ করিয়া একটা খবরও দিলেন না, াহিরের লোকের কাছে মান হারাইবার য়ে হরচন্দ্রকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "পরশুর ধ্যে যাতে সামাজিক বিলি হয় তার বন্দোবস্ত র।" বাজনার ফরমাস নিমন্ত্রণের ফর্দ্দও এই সঙ্গে তৈয়ারির আদেশ হইয়া গেল। ায়েব কহিল "যে আজ্ঞে সব হয়ে যাবে, কিন্তু এত শীঘ্র কেন? আগে কনে দেখাই হোক্ তারপর পত্র—

ক্ষোভের সহিত হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন "ওগো না না, সে সব ভাবনায় তোমার কাজ নেই, সে যে ভাববার সেই ভাবচে। পরশু বে'র আগে এগুলো হওয়া চাই নৈলে লোকে বলবে কি?"

অ্যাঁ পরশু বে! দাদাবাবুর বে পরশু! পত্র টত্র হলোনা?"

"সে সব হয়ে গ্যাছে বল্লাম যে, এখন যাও যা বল্লাম কর, হরিপোদ্দারকে একবার ডেকে পাঠাও দেখি, যদি বৌভাত নাগাদ দু একখানা কিছু গড়ে দিতে পারে।"

কল্যাণী মায়ের গম্ভীর মুখে তাঁহার বিরক্তির লেখা পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিল না, তাহার ভালবাসাভরা প্রাণটি দাদার সুখের অংশ ভাগ করিয়া লইয়া বিভোর হইয়াছিল। পরশ্ব তারিখটা যদি নেত্রপল্লবকম্পনে অতীত হইয়া যায় তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই, কমলাকে কতক্ষণে সে দেখিবে সেই উৎসুক্য লইয়াই মনে মনে ছট ফট করিতেছিল।

বিবাহের বেশ পরিয়া বর কনকাঞ্জলি গ্রহণ করিল, বাহিরে হরচন্দ্র সময়ের অল্পতায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, গ্রামের প্রান্ত অবধি বাজনার দল; দেশের বালকগণ বরানুগমন করিবে বলিয়া ভিড় করিতেছিল, সিম্পান, পাল্কি, সালুমোড়া চতুর্দ্দোল কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, অভিমান ভুলিয়া গিরিজা-সুন্দরী পুত্রের চন্দনচর্চ্চিত ললাটে চুম্বন করিয়া ছলছল নেত্রে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, দিদি আজ কোথায়, এমন সময় সে যদি থাকত! সহসা বর স্খলিতকণ্ঠে ডাকিল "মাসিমা!" "বাবা?"

"আমি বিয়ে করবনা ওদের সব সরে যেতে বল!"

"কি বলিস্!"

"সত্যি বলচি আমি যাবোনা, না মাসিমা এখন সব বলতে পারব না পরে বলবো,—আমি বিয়ে করবো না—"

সে কলাতলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপর সিড়ির দিকে ফিরিল। কি যেন একটা ঘোর সংশয়ে তাহার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বেশ বুঝা যাইতেছে চিত্ত সুখলেশহীন। গিরিজা অনুতপ্ত হইয়া ভাবিলেন তিনি রাগ করিয়া আছেন বুঝিয়া সে অভিমান করিতেছে।

মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া তাহার হাত ধরিলেন "পাগল-ছেলে! করিস্ কি?"

"না মাসিমা থাক্ আমি যাবোনা" "তুই সময়ে না পৌছুলে সেখানে কি কাণ্ডটা হবে তা ভাবচিস্? রাত্রের মধ্যে যাকে পাবে তাকে ধরে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে, হয়ত কোন থুড়থুড়ে বুড়োর হাতে মেয়েটি পড়ে আজন্ম জলে খুন হবে, বাপরে! এমন শত্রুও হ'তে আছে!"

বর মুহূর্ত্তে সচেতন হইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে ফিরিল।

জমীদার বাড়ীর বিবাহ, তাহাতে গিরিজা-সুন্দরীর ঘরে কখনও বধূগমন ঘটে নাই, পল্লীগ্রামে উৎসবের গন্ধে একেই ফুলবনে মধু-মক্ষিকাবৎ পাড়া মাতিয়া উঠে তাহার উপর এমন একটা সুযোগ। বড় বড় চুলা বানাইয়া অন্নসত্র খুলা হইয়াছে, সকলের জন্যই এ গৃহের দ্বার অবারিত, গরীব, গৃহস্থ, যে আসিতেছে গিরিজার নিয়োজিত লোকেরা পাত পাতিয়া পরিতোষ ভোজন করাইতেছে। পরিবেশনের যাতায়াতে উঠান কর্দ্দমে দধিতে পিছল হইয়া উঠিয়াছিল। দেরে, আয়রে শব্দের সঙ্গে জয়জয়কার মিশিয়া সর্ব্ব-ক্ষণই একটা কোলাহল জমাইয়া রাখিয়া-ছিল। দাসী চাকর, প্রজা, পড়সী রঙ্গিন কাপড়ে সাজিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে ত্রুটি করিতে-ছিল না। গিরিজার গৃহ অন্নদার যজ্ঞশালা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শারীরিক মানসিক সকল চিন্তা ভুলিয়া বর-বধূর কল্যাণার্থ অকাতরে সকলকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, বাঁধিয়া দিয়া, যে যাহাতে সুখী তাহাই সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

রান্নাবাড়ীর একদিকে যশোহর হই ভিয়ানকর আসিয়া রাশি রাশি মিঠাই মুড়ি ফেনি বাতাসা প্রস্তুত করিতেছে, পাঁচ মা জনে তাহা ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া পিতলের হাঁ ভরিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে; পল্লীগ্রামে প্রথা মত বধূর মুখ দেখিয়া মিষ্টমুখ করি প্রতিজনে একটি করিয়া সমিষ্টান্ন হাঁড়ি ঘ লইয়া যাইবেন। এই দিকেই পাড়ার ছেলে গুলা ও রাজ্যের মাছি ঝাঁক বাঁধিয়াছে গৃহিণী কর্ম্মব্যস্তভাবে এদিক ওদিক করি করিতে মধ্যে মধ্যে আদেশ করিতেছিলে "ওরে ছেলেদের হাতে দুটো দুটো মিষ্টি দি ভিয়েন বন্ধ রেখে ঠাকুরদের একটু জল খে দাও, মতে মাছ এনেছে, ওকে এক ম মুড়কির ওপোর গণ্ডাদুই মেঠাই দি বিদেয় করো।

গ্রামের শেষে বাজনদারগণ ষ্টেশনের নিক অপেক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দোল, মহাপায়া পা লোক লস্কর সবই সেখানে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে হঠাৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল, উৎকর্ণ পুরবাসী মহারোলে চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ ঐ বর আসচে।" চারিদিকে একটা চৈ সোরগোল পড়িয়া গেল, মলের ঝম্ ঝম্, বাজুর ও খোঁপার ওঁজিকাটির ঘুঙ্গুরের ঝিন্‌ঝিনানি তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল। শশব্যস্ত বাটির গৃহিণী হাঁকিলেন "পূর্ণকুম্ভ ঠিক আছে তো? দুধের কড়ায় ভাল করে জাল দিতে থাক, ওরে ও কল্যাণী ধানের কাঠাটা? ধানের কাঠা বরণ পিঁড়ির কাছে দেখচিনে কেন? নিয়ে আয় নিয়ে আয়। ন্যাঠা মাছটা কোথায় রেখেছিস্?" মহাশব্দে যুগল শঙ্খ দেবদত্ত

পাঞ্চজন্য একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, লাজ-ত গন্ধহীন পদ্ম, ও জীবন শূন্য ভ্রমর ঙ্কিত পথের দুইপাশে নারীবাহিনী উন্মুখ য়া বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল, লেরা অসহিষ্ণু হইয়া রাস্তা দিয়া ছুটিয়াছিল। বরকনের যান আসিয়া দ্বারে থামিল!" া একি গো! এ কি কনে! এ যে ত ব্যাটার মা ধেড়ে মাগী—"হরি বলো এই কনে তুলে কোমর ভাঙ্গবে, ওলো ল্যাণি। হাত ধরে নে আয়, কনে তোর তন সাতটাকে চেপে মেরে ফেলতে পারে!" একে তো এই বুড় কন্যে তার ওপর হাঁটু কে বস্তরও জোটেনি!" 'পায়ে দুগাছা লও ছায়নি গা, অবাক—গিরিজা সুন্দরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইয়া হিলেন, এই বধূ ঘরে আসিল! কাহার খে তিনি হাত চাপা দিয়া বেড়াইবেন? চী করিল কি? শুধু কল্যাণীই কোন বাধা ানিল না, একেবারে দ্বিধাশূন্য চিত্তে সে গিয়া ধূর হাত ধরিল। বিলম্ব সহিতে না পারিয়া সেইখানেই সে বধূর মুখের আবরণ তুলিয়া তাহার মুখে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্মিত স্যে কহিল "এসো লক্ষ্মী এসো"। কিন্তু গিরিজা সেই উন্মোচিত অবগুণ্ঠিতা নববধূর মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহার মনে হইল কবর খনন করিয়া শচীকান্ত একটা বহুদিনের মৃত নারীকে কোন যাদুমন্ত্র প্রভাবে তাহার পার্শ্বে উত্তোলন করিয়া আনিয়াছে। কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সুযোগমত শিশির কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল "এ বিয়ের সবই যেন হেঁয়ালি দেখচি; বউ কেমন দেখলে?" কল্যাণী অকপটে উত্তর করিল "কেন চমৎকার। দাদা সাধে পাগল হয়েছিল।"

শিশির এই সরলতার প্রতিমাকে তাহার সংশয়াকুল চিত্তের বৃথাভারে ভারাক্রান্ত করিতে চাহিল না, সে শুধু কহিল "কে জানে এসব কি রকম!"

"কি রকম?"

"না এমন কিছু নয়, মেয়েটির বোধ হয় মৃগী রোগ আছে, সাবধানে রেখ, সম্প্রদান টান সমস্তই মুর্চ্ছার মধ্যে হয়েচে।"

গিরিজাসুন্দরী কন্যাকে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন "শচী কি কাণ্ডটাই করলে এমন লোকের কাছে মুখ পাওয়া দায়, তার ওপোর একটা বদ্ধ পাগল এত সৃষ্টি করে জোটালে! আমার যেন মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে করচে।"

কমলার অসামান্য সৌন্দর্য্য কল্যাণীর সংসার অনভিজ্ঞ কিশোর চিত্তের উপর মায়া যষ্টি স্পর্শ করাইয়াছিল। সে ব্যথিত হইয়া কেবলমাত্র কহিল "না মা বউ খুব ভাল হয়েচে পথের কষ্টে নিশ্চয় আজ ও রকম হয়ে আছে, কাল দেখো বেশ সহজ লোকের মত হয়ে যাবে।"

কিন্তু সে রাত্রির অবসানে পূর্ণ একটা দিন চলিয়া গেল তথাপি নববধূর মধ্যে পরিবর্ত্তনের লেশ দেখা গেল না, সেই একই উদ্‌ভ্রান্তভাব, অর্থহীন দৃষ্টি, বর্ণলালিত্য ঘুচিয়া গিয়া একটা শুভ্র বিবর্ণতা ক্রমেই তাহার ললাট গণ্ডে বিস্তৃত হইতেছিল, পাড়ার ছোট ছোট বধূ ও কন্যাগণ বিবিধ উপায় অবলম্বনেও যখন সেই পাংশু ওষ্ঠ হইতে এক বর্ণাত্মক একটি শব্দও

সংগ্রহ করিতে পারিল না তখন সকলেই বিরক্ত, ক্ষুব্ধ কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীময়, পাড়াময়, দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল জমীদার গৃহিণীর বোনপো রূপসী দেখিয়া একটা বিংশ বর্ষীয়া মূক উন্মাদকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। একালের ছেলেদের রূপতৃষ্ণার শত ধিক্ দিয়া দেশ জুড়িয়া একটা [illegible] সমালোচনা চলিতে লাগিল। শিশির জিজ্ঞা করিল "সত্যি কল্যাণি?" বিবর্ণমুখে কল্যা কহিল "হতেও পারে।"

"তোমার দাদাও এবার বুঝেছেন, তিনি তো এদিকে শয্যাগত"।

"কে জানে, এ আবার কি হলো!"

বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ

পূর্ব্বকালে পরমাণু বস্তুর সূক্ষ্মতর অংশ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু ইদানীং ইহাদের মধ্যেও শত শত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু (কর্পাস্‌কল্ Corpuscle) বিদ্যুৎবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় দুইটি হাইড্রোজেনের (Hydrogen) পরমাণু ও একটি অক্‌সিজেনের (Oxigen) পরমাণু একত্রিত হইয়া যখন একঅণু জলকণিকা প্রস্তুত হয়, তখন এই সকল 'কর্পাসকোলের' কি একটা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। কেবল জলাণু নহে, এইরূপে অন্যান্য নানা জাতীয় পরমাণুর সংমিশ্রণে যখন বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয় তখন কাহার মধ্যে যে সংঘর্ষণ ক্রিয়া চলে, তাহা চিন্তা দ্বারাই মাত্র কথঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে, তাহার এককোটি ভাগের একভাগও প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদের অনুভূত হয় না। যথা চূণ এবং হরিদ্রা মিলিত হইলে সামান্য রকম উত্তপ্ত হইয়া বর্ণ পরিবর্ত্তিত করে,—আমরা কেবলমাত্র সেইটুক উপলব্ধি করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা একটি ভয়ঙ্কর কাণ্ড বলিয়া অনুমিত হইবে। একখানা চলন্ত জাহাজ জলনিমগ্ন [illegible] লাগিয়া নিমেষ মধ্যে চূর্ণীকৃত হইলে যে বিস্ময়-জনক কাণ্ড ঘটে, পূর্ব্ববর্ণিত হরিদ্রা ও চূণে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও প্রায় সেইরূপ। কিন্তু সাধারণ চক্ষে এ সকল কাণ্ড আমরা কিছুই দেখিতে পাই না এইজন্যই চতুর্দ্দিকের পদার্থ দিগকে আমরা নির্জীব নিশ্চেষ্ট মনে করি। কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখিতে গেলে সর্ব্বদাই আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুসমূহে এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রতিমুহূর্ত্তে ঘটিতেছে বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে।

যখন আমরা সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন উহাকে একটা ভয়ানক শক্তিমান্ পদার্থ বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে, এবং সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতিতেও আমরা ঈশ্বরিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকি। সেইজন্যই হিন্দুরা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও অগ্নিদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতির কেহ পূজা করেন না। তাহার কারণ সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার মধ্যে কোন ঐশ্বরিক শক্তি উপলব্ধ হয় না। অথচ

বিতে গেলে সূর্য্যের মধ্যে যে কাণ্ড হইতেছে থিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বস্থানে সকল বস্তুর মধ্যে হরহঃ প্রায় ঐরূপই কাণ্ড ঘটিতেছে।

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে াই তাহার কোন অংশ কোমল, কোন অংশ তরল, কোন অংশ বাষ্পীয়। জীবদেহ ও উদ্ভিদ লতাপাতা প্রভৃতি সমুদয়েরই নির্ম্মাণ এইরূপ। মনুষ্য দেহে অস্থি কঠিন, মাংস কোমল, রক্তরস তরল ও ফুসফুসে বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত যে কতকগুলি জীবন্ত বস্তুর সমষ্টিতে প্রত্যেক দেহ নির্ম্মিত, তাহার প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিতে গেলে পৃথক পৃথক বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যথা দেহ মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষ, রক্তের শ্বেত কণিকা, রক্তকণিকা, আরো সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে শরীরের প্রত্যেক অংশই জীবন্ত পদার্থের সমষ্টি, তাহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন পদার্থ বলিলেও বলা যায়; পক্ষান্তরে আমরা সেই ভিন্ন ভিন্ন জীবন্ত পদার্থের সমষ্টিকে "আমি" বলিয়া মনে করি। এই অনন্ত সৌরজগতেরও নির্ম্মাণ এইরূপ। যথা কোন স্থান কঠিন, কোন স্থান তরল, কোন স্থান বাষ্পীয়, এবং সকল স্থানই সূক্ষ্ম ইথারের অন্তর্গত। যদি আমরা বিদ্যুৎবেগেও উত্তর দিকে চলিতে থাকি তাহা হইলেও অনন্ত কোটি কোটি বৎসরে তাহার অন্ত পাইব না। সেইরূপ দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি সকল দিকই অসীম অনন্ত। তথাপি যেরূপ আমার দেহকে একটি ভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে করি সেইরূপ পূর্ব্ববর্ণিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকেও একটিমাত্র বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণুরই একটা শক্তি আছে, শক্তি ছাড়া পরমাণু হয় না, পরমাণু ছাড়াও শক্তি হইতে পারে না। সুতরাং যদি কেহ পরমাণুকে শক্তি হইতে তফাৎ করিয়া শক্তিকেই বা পরমাণুকেই ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করেন, তবে বিজ্ঞান বলিবে তাহা ভুল। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে হিন্দুরা পরমাণুকে শিব এবং গুণকে শক্তি বলিয়া আদ্যাশক্তি রূপে পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং এহিসাবে সমুদয় অখিল ব্রহ্মাণ্ড শিব ও শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অথবা এক ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় আর কিছুই নাই—অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম, খেচর, ভূচর, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যত কিছু সমুদয়ই ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নহে। এইজন্যই বোধ হয় ঈশ্বরের স্তবে বলা হয়, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি শিব, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি বরুণ, তুমি স্থাবর তুমি জঙ্গম, ইত্যাদি। আবার চণ্ডীতে বলা হইয়াছে "নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।' "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।" এইরূপে ছায়া, লজ্জা, আলো ইত্যাদিকেও উহার মধ্যে স্থানদান করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই অনন্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঈশ্বর ব্যতীত বাকি কি রহিল? মোটামুটি বলিতে গেলে কিছুই রহিল না।

আবার মোসলমান ধর্ম্মের প্রথম কথাই

"কলেমা"। তাহার একইরূপ অর্থ, যথা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রসুলল্লাহ" ইহার অর্থ "ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই।" ইংরাজীতে There is nothing but God : সেইরূপ ভাবে একজন অদ্বৈতবাদী বলিবেন "শিবোহম্" অর্থাৎ আমি ঈশ্বর।

সমুদ্র হইতে এক কলসী জল উঠাইলে উহা একটি ভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু কলসী ভাঙ্গিয়া দিলে পুনরায় সমুদ্রের জল সমুদ্রেই মিলিত হয়, পৃথক ভাব থাকে না, সেইরূপ মনুষ্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদয় বস্তুই যাহা একবার ভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হয়, তাহা আবার সেই অনন্ত ঈশ্বরেই বিলীন হইয়া পড়ে। তাহা হইলে এক্ষণে বলিতে হইবে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বর।

অধিকাংশ লোকে বলেন যে, "ঈশ্বর সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাহা হইলে তিনি কোথায় থাকিয়া কিরূপে এসকল সৃষ্টি করিলেন? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শূন্য স্থান নাই, তাঁহার থাকার স্থান কোথায়? ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তা কে"? ইহার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ঈশ্বরের আর থাকার স্থানের প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। তাহা হইলে প্রকারান্তরে হিন্দুদিগের সেই আদ্যাশক্তিই আসিয়া পড়িল, অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুর অন্তরালে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তিই আদ্যাশক্তি; এবং তাহাই ব্রাহ্মদিগের নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর। বিজ্ঞানের মতে এ শক্তি "পরমাণুর" সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাহা হইলে সেই পূর্ব্বকথা আসিয়া পড়ে, আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। সেই আধাররূপ পরমাণুই তাহা হইলে শিব ও তাহাদের শক্তিই আদ্যাশক্তি অথবা পরমেশ্বর। বস্তুত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিব ও শক্তি পৃথক নহে তাহাই ঈশ্বর। বিশেষ অন্যভাবে বলিতে গেলে অনন্ত, অসীম, অনাদি, অনশ্বর, অপরিমিত শক্তিস্বরূপ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই সর্ব্বশক্তিমান, পরমেশ্বর।

ঈশ্বর "স্বয়ম্ভু" এই কথার উত্তর দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞান-জগতে সৃষ্টি ও লয় বলিয়া কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন বস্তু সৃষ্টিও হইতে পারে না ধ্বংসও হইতে পারে না; অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয় সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবে। যথা এক খণ্ড কাষ্ঠ অগ্নিতে দাহন করিলে উহার কতক অংশ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dyoxcied) রূপে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, কতক অংশ বাষ্পরূপে পরিণত হয় ও অবশিষ্ট ভস্মরূপে অবস্থান করে। ইহার কোন অংশই একবারে ধ্বংস হয় না,—অথবা কোন অংশ ধ্বংস করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেইরূপ কোন বস্তু সৃষ্টি করাও কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে বা সৃষ্টি হওয়াও সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত হইতে পারে যে মাটী দিয়া একটি ঘট প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু বিনা মাটীতে ঘট প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহাকেই সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। এইরূপ সৃষ্টি হওয়া বিজ্ঞানের মতে একেবারেই অসম্ভব। তবে যে সকল বস্তু বর্ত্তমান আছে তাহারই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। তাই বলিতে হয়, ঈশ্বর অনন্তকাল হইতেই আছেন ও থাকিবেন। সৃষ্টিও হয় নাই ধ্বংসও হইবে না।

এস্থলে আর একটি কথা এই যে প্রত্যেক পরমাণুকে আমরা সাধারণ ভাবে যেরূপ নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলিয়া মনে করি বাস্তবিক তাহা নহে। প্রত্যেক পরমাণুরই শক্তি আছে জীবন্ত পদার্থের ন্যায় তাহা কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান। তাহার সহজ দৃষ্টান্ত এই যে, গর্ভের মধ্যে যখন অণু শুক্রকীটের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভৌতিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও গঠিত হয়, তখন তাহাতে একটি চমৎকার বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু সম্বন্ধে দেখ—কোন জীববস্তুরই চক্ষু পায়ের তলায় হয় না; উহা এমন স্থানে রক্ষিত, যাহাতে চতুর্দ্দিকে ভালরূপে দৃষ্টি করা যায়। আবার আরো সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে (Iris) আইরিস নামে একটি পর্দ্দা আছে, যাহার মধ্যস্থিত ছিদ্র দিয়া আলো চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে, যদি এই আলো প্রখর হয়, তাহা হইলে ঐ ছিদ্রটি প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া অতিরিক্ত আলোককে চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। সেইরূপ যখন পাকাশয় শক্ত বস্তু পরিপাক করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই দন্তোদ্গম হয়, এই সকল দন্তের মৌলিক অংশ মাড়ির ভিতর অবস্থান করে, সময় অনুসারে বাহিরে বহির্গত হইয়া উহারা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে মনুষ্য-দেহের প্রত্যেক অংশের কারুকার্য্যেই বুদ্ধির সমাবেশ দেখা যায়। তবে পরমাণু-সমাবেশের তারতম্য অনুসারে বুদ্ধিবিকাশের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা পরমাণু সমাবেশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন মস্তিষ্কে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, ধারণা, মেধা, বিচারশক্তি প্রভৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। আবার যখন মৃত্যুর পর এই সমাবেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন ঐ সকল পরমাণু নির্জ্জীব, বুদ্ধিহীন, মৃত্তিকাবৎ হইয়া মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়। পুনরায় ঐ সকল পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন জীব, জন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতির দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বৃক্ষ লতাদির অনুভব শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি জড় পাথরও একেবারে অনুভব শক্তি-বর্জ্জিত নহে বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

কেহ বলিতে পারেন, আমি একটি ভিন্ন বস্তু, সে আর একটি, ইহারা যদি সকলেই ঈশ্বর হন, তাহা হইলে "আমি" তুমি" এই জ্ঞান কেন? ইহার উত্তর এই, কেবল অল্পকালের জন্য পরমাণু সমাবেশের বিভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে, কিন্তু কালের গতিতে সেই ভিন্নভাব কিছুকাল পরে পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। যেমন সমুদ্র হইতে এক বোতল জল উঠাইয়া আনিলে উহা সমুদ্র হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, আবার বোতল ভাঙ্গিয়া দিলে, সমুদ্রের জল সমুদ্রে গিয়া এক বিস্তীর্ণ জলরাশিতে বিলীন হইয়া এক হইয়া যায়, আমাদের দেহও কিছুকাল পরে সেইরূপ অবস্থাতে পরিণত হয়, তখন আর "আমি" বলিয়া একটি ভিন্ন বস্তু-জ্ঞান থাকে না। আমি যাহাকে "আমি" বলি তাহার মধ্যেও চিন্তা করিয়া দেখিলে আমার ন্যায় অনেক আমির সমষ্টি বোধ হইবে। যথা আমার দেহের কোষ, রক্তকণা, শ্বেতকণা (phaguacyte) ফেগাসাইট, (anti-

body) এণ্টিবডী প্রভৃতি। উহাদের মধ্যে আমিত্ব জ্ঞান আছে কি না সে বিষয় নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মস্তিষ্ক আছে তাহার আমিত্ব জ্ঞান সামান্যই হউক আর অধিকই হউক আছে। কিন্তু (Phaguacyte) ফেগাসাইট (Antibody) এণ্টিবডী প্রভৃতির সেইরূপ জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক তাহারা যে ভাবে কার্য্য করে তাহাতে আপন ও শত্রু বুঝিয়া কাজ করে; সুতরাং তাহাদিগকেও মস্তিষ্কযুক্ত কীটের নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবিত বস্তু বলিলেও হয় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে আমার দেহ বহুসংখ্যক "আমি" গঠিত। আবার পৃথিবী বহুসংখ্যক জীব উদ্ভিদ ইত্যাদির সমষ্টি। আবার গ্রহ, নক্ষত্র চন্দ্র, সূর্য্য এক একটি পৃথিবীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবী। ইহাদের মধ্যে সংযোগ যে (ether) সেই ইথার সহ ধরিতে গেলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আবার এক। সেই অনন্ত এক ব্রহ্মাণ্ডই পরমেশ্বর।

(ডাক্তার) শ্রীনিবারণচন্দ্র সোম।

দুয়ানি

(১)

প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝঙ্কার।
বাণহীন ধনুকের ছিলার টঙ্কার॥

(২)

কেবল কথার রাজ্যে বিস্তারে প্রভাব।
ছোট ছোট হৃদয়ের বড় বড় ভাব॥

(৩)

ডুব দিয়ে অন্তরের অতল সাগরে
কেহ বা মুকুতা তোলে, কেহ ডুবে মরে॥

(৪)

খুঁজোনাকো সৌন্দর্য্যের গোড়াকার অঙ্ক।
ফুলের গাছের মূলে পাবে শুধু পঙ্ক॥

(৫)

শ্রোতা বলে রাগ বাজে শুধু এক তারে।
তবে কেন বাজে তার সাজে ডান্ ধারে॥

(৬)

কাঁদ যদি বসে উচ্চ হিমালয় শিরে।
প্রতি বিন্দু অশ্রু হবে হাস্যোজ্জ্বল হীরে॥

(৭)

অয়স্কান্ত মহাকাশ মনের চুম্বক।
মন যার লোহা, তার সহজ কুম্ভক॥

(৮)

দ্বারে এসে অবশেষে রাখ শ্রান্ত কায়া।
পড়েছে মুখেতে তাই কপালের ছায়া॥

(৯)

বহুকাল তরুতলে আছ ধ্যানে বসি'।
জাননা পড়েছে সব পাতাগুলি খসি॥

(১০)

যদিচ অনন্ত বটে সুমুখের পথ।
শেষের আশার বাষ্পে চলে মনোরথ॥

(১১)

বিশ্বছন্দ গড়ি, দিয়ে পদে পদে যতি।
পদে পদে স্থিতি বিনা নাহি হয় গতি॥

(১২)

পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা।
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৌধ-রহস্য

নবম পরিচ্ছেদ

ইজরেল টেক্সের বিবরণী শেষ হইয়াছে। ইথার ডাক্তার ইষ্টারলিং যিনি আজি পর্য্যন্ত ব্রানরেয়ারে সম্মানের সহিত ডাক্তারি কার্য্যে যুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারই কথা কিছু শুনাইব।

জেনারল হিথারষ্টনের ক্লুমবার হলে আগমন কালের মধ্যে একবার মাত্র ডাক্তার ক্লুমবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই এমন কতকগুলি ঘটনা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যাহা না বলিলে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ডাক্তার তাঁহার বহুমূল্য সময়ের ক্ষতি করিয়াও যে তাহা লিখিয়া দিয়াছেন সে জন্য এই অবসরে আমি তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার লিখিত বিবরণটি তাঁহারই ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।--

"মিঃ জিল ওয়েষ্টের অনুরোধে আমি এই রহস্যময় বৃত্তান্তটি লিখিতে ঈষৎ কৌতুকপূর্ণ আনন্দই অনুভব করিতেছি। মিঃ ওয়েষ্ট যতদিন এখানে আছেন তাঁহাকে আমি ততদিন হইতেই জানি। তাহার শুভ্র সরল সাধু চরিত্র, লোকপ্রিয়তা, বিনয়নম্র ব্যবহার, আর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সুন্দর চেহারা এই সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের জন্য আমি তাঁহাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি।

জেনারেল হিথারষ্টনের বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ কাহিনীটি জন সাধারণকে জানিতে দেওয়াও আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

গতবৎসর সেপ্টেম্বরের প্রথমেই একদিন প্রভাতে ক্লুমবার হলের মিসেস্ হিথারষ্টনের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রে তিনি তাঁহার স্বামীর শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ দিয়া, সেই দিনই আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

যদিও আমার বাহিরের বিষয় লইয়া মস্তিষ্কের পরিচালনার অবসর খুব অল্পই ছিল, তথাপি ঐ খেয়ালি, অদ্ভুত নির্জ্জনতাপ্রিয় জেনারেলের সম্বন্ধে অবসর কালে কখনও কখনও চিন্তা আসিত। জানিতে ইচ্ছা হইত লোকটার ভিতরের প্রচ্ছন্ন কোন গভীর রহস্য আছে কিনা। মিসেস্ হিথারষ্টনের আহ্বান অবিলম্বেই পালন করিতে মনস্থ করিলাম।

ক্লুমবারের পূর্ব্বতন অধিকারী মিষ্টার ম্যাকৃভিতির আমলে এই তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ পথ দিয়া অনেকবার আমি ক্লুমবার হলে যাতায়াত করিয়াছি। কিন্তু এবার সেই চিরপরিচিত ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ রঙ্গের রেলিং ঘেরা প্রকাণ্ড ফটকটার সম্মুখে আসিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। যে উন্নতশীর্ষ সিংহদ্বার তাহার বিরাট বক্ষ মুক্ত করিয়া দিবানিশি অভ্যাগতগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইত, এখন তাহা সামান্য একটা লৌহের কুলুপে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বাড়ীটার চারিদিকের যে সবুজ শোভা দূর হইতে দর্শকের চক্ষুকে আকর্ষণ করিত সেই শ্যামস্নিগ্ধ কোমল চিক্কণতা অপ্রিয়দর্শন কঠোর কাষ্ঠপ্রাচীরের বেষ্টনে বেষ্টিত। দেখিলেই জেলখানার দৃশ্য মনে পড়ে। গাড়ী চলিবার রাস্তাটা—শুষ্ক পত্র ও আগাছায় পরিপূর্ণ। বাড়ীটার চারিদিকেই কেমন একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ নিরানন্দের ভাব, বাতাসটাও যেন দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত।

ফটকে দুই তিন বার ধাক্কা দিবার পর একজন দাসী আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল, এবং দুই তিনটি ঘর পার হইয়া একটি ছোট ঘরের ভিতরে আমায় লইয়া গেল। ঘরের ভিতর একখানা সোফার উপর একটী স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন, ইনিই মিসেস্ হিথারষ্টন্। রমণীর বিবর্ণ ম্লান মুখে, জ্যোতিহীন নেত্রের করুণ কটাক্ষে, অকালপক্ক রজত কেশরাজিতে, এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ বেশভূষায় সেই দুঃখপূর্ণ প্রাসাদটার সহিত সামঞ্জস্যই বিধান করিয়াছিল।

অত্যন্ত মৃদু শান্তস্বরে মিসেস্ হিথারষ্টন কহিলেন "ডাক্তার—আপনি বোধ হয় বুঝ্তে পেরেছেন, আমরা ভারী কষ্টে পড়েচি, কিছুদিন থেকেই আমার স্বামীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে - সেইজন্যে আমরা এই শান্তিপূর্ণ নির্জ্জনতা তাঁর স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী ভেবে এখানে এসেছিলাম,—আমরা ভুল করেচি ডাক্তার,—এখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকা দূরে থাক্ দিন দিন তিনি ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে যাচ্চেন। আজ সকালে তাঁর জ্বর হয়েছে—এমন প্রবল জ্বর—যে আমি ও ছেলেরা ভয় পেয়ে আপনাকে ডাক্তে পাঠাই, —আসুন তাঁকে দেখে যা হয় উপায় [illegible] করুন,—বোধ হয় বিকার হয়েচে।" উ[illegible] ও আশঙ্কায় রমণীর কণ্ঠস্বর ক[illegible] হইতেছিল।

কয়েকটি দালান ও ঘর পার হইয়া আমরা একটা আস্বাবহীন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ ঘরখানি একেবারে বাড়ীর শেষপ্রান্তে অবস্থিত। কক্ষতলে গালিচা নাই। গৃহসজ্জাও যৎসামান্য,—একপাশে একটা চৌকা টেবিল, টেবিলের উপর কতক-গুলা বাঁধান স্বর্ণাক্ষর যুক্ত পুস্তক, কাগজ পত্র, এবং একটা বৃহদাকার বস্ত্রাচ্ছাদিত পদার্থ। টেবিলের অদূরে একখানা কৌচের উপর শয্যায় রোগী শায়িত।

কক্ষ মধ্যে কোন মূল্যবান গৃহসজ্জা না থাকিলেও কক্ষগাত্রে এবং ঘরটির চারি কোণে নানা আকারের নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত ছিল। কতকগুলা ছোরা, কাটারী এবং ভারতীয় ও এসিয়াদেশজাত বহু প্রকারের বহুতর অস্ত্রাদি। কতকগুলি কাটারির বাঁট ও তরবারির খাপ বহুমূল্য প্রস্তর ও সুবর্ণের কারুকার্য্যযুক্ত। এক এক খানি তরবারির খাপে এমন সব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত যে দেখিলেই তাহা কোন উন্নত সৌখীনরুচি সৈনিকপুরুষের দ্রব্য বলিয়া সহজেই অনুমান হয়। কক্ষসজ্জার হীনাবস্থা এবং কক্ষগাত্রের অস্ত্র শস্ত্রাদির মহার্ঘতা, যুগপৎ দর্শকের চিত্তে বিষম বৈষম্যের পরিচয় প্রদান করিতে থাকে।

জেনারলের এই সকল সখের দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার সুযোগ ঘটিল না। জেনারলকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইল

সেই মুহূর্ত্তেই আমার সাহায্য তাঁহার [illegible]য়োজন হইবে। তিনি বাহিরের দিকে [illegible]চাৎ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। নিশ্বাস [illegible]ত্যন্ত দ্রুত পতিত হইতেছিল, খুব সম্ভব [illegible]মাদের আগমন তিনি বুঝিতে পারেন [illegible]ই।

আমি ঘুরিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই-[illegible]াম। চক্ষু মুদ্রিত—মুখের আরক্তিম ভাব [illegible]রের প্রবলতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। [illegible]য্যার নিকট একটুখানি নত হইয়া নাড়ী [illegible]পরীক্ষার জন্য আমি তাঁহার উত্তপ্ত দক্ষিণ হস্ত [illegible]খানি আপনার অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিলাম।

সহসা যেন কোন অতিমানসিক বলে রোগী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া সজোরে আমার ললাটে একটা ঘুসি বসাইয়া দিল। তাঁহার চক্ষে এমন ভয়ের ও উদ্বেগের ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যে আমি আমার ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতায় অপর কোন রোগীর চক্ষে এমন ভয়ানক ভাব কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমায়-ছেড়ে দাও, আমি বল্চি—আমায় ছেড়ে দাও, আর তোমার ঐ ঠাণ্ডা হাত আমার উপর থেকে উঠিয়ে নাও,—ওতে মরণের ছায়া লেগে আছে। সমস্ত জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গ্যাছে - এতেও কি শোধ হয় নি,—একটা জীবন এ কি ঢের নয়,—কবে,—কতদিনে আমার ছুটি হবে, কতদিন—কত—দিন—আমি এম্নি করে সহ্য করে বেঁচে থাক্ব?"

মিসেস হিথারষ্টন্ তাঁহার রুগ্ন স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে—আপনার শীতল, শীর্ণ হস্তখানি জেনারলের তপ্তললাটে মর্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন "চুপ কর,—চুপ কর,—শান্ত হও—দেখ্চ না, ইনি ডাক্তার ইষ্টারলিং, —ইনি তোমার কোন ক্ষতি কর্বেন না—তোমার রোগ আরাম করে, তোমায় সুস্থ করে দেবেন এখুনি!" আকস্মিক অত্যধিক উত্তেজনার পর যেমন অবসাদ আসে জেনারলেরও সেইরূপ ভাব হইল, তিনি অত্যন্ত শ্রান্তভাবে বালিষের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের ভাব ও বর্ণ, যেন রামধনুর বর্ণ পরিবর্ত্তনের মতই দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল বিকারের ঝোঁকটা সম্পূর্ণই কাটিয়া যাইতেছে। এবং পত্নীর বাক্যের অর্থও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

বগলে থারমোমিটার যন্ত্র লাগাইয়া আমি তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন-শব্দ গণনা করিতেছিলাম, স্পন্দনের সংখ্যা ছিল—একশত কুড়ী, জ্বরের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, এটা ম্যালেরিয়া ফিবার! জীবনের ভূরিভাগ যাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাটাইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে—এ রোগ,—তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী!

থারমোমিটারটা 'কেসের' মধ্যে ভরিতে ভরিতে আমি বলিলাম "কিছুই হয় নি, সামান্য মাত্রায় কুইনাইন্ আর আর্সেনিক, দিনেই জ্বর ছেড়ে যাবে, শরীর সার্তেও সময় লাগ্বে না, এম্নি সাধারণ জ্বর।"

একটা দীর্ঘকালস্থায়ী নিশ্বাস ফেলিয়া জেনারল কহিলেন "এঃ,—কোন বিপদ নেই"! কথার সুরে মনে হইল যেন কঠিন রোগ ও

বিপদ নিকটবর্ত্তী শুনিলেই তিনি খুসী হইতেন। "আমি জানি,—আমাকে মারাও যত কঠিন ভবঘুরে নাগা ফকিরগুলোকে মারাও ঠিক্ তাই। মেরী,—আমার মাথাটা বেশ্ সাফ্ হয়ে গেছে,—আমাকে ডাক্তারের কাছে কিছুক্ষণের জন্যে রেখে তুমি বাইরে যাও।"

মিসেস হিথারষ্টন্ স্বামীর বাক্যে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিতই মৃদু পদসঞ্চারে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

আমিও রোগীর বক্তব্য শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার বিছানার আর একটু নিকটে চেয়ার টানিয়া লইলাম।

জেনারল কহিলেন "ডাক্তার, আমি আগে একবার লিবারটা পরীক্ষা করতে অনুরোধ কচ্চি। পূর্ব্বে এই জায়গাটায় ফোড়া হোত। ব্রোডি,—আমাদের পারিবারিক ডাক্তার বলেছিলেন যে, এ জায়গায় ফোড়া হলে শত-করা পাঁচটা রোগীও বাঁচে কি না সন্দেহ? যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ছেড়ে এসেচি—আশ্চর্য্য আমার আর কোন কিছুই হয়নি। এই, এই খানটা—য়, পাঁজরার ঠিক নীচেটা?" আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া কহিলাম "আমি আপ্নাকে খুব আহ্লাদের সঙ্গেই জানাচ্চি, যে সেটা একে-বারে শুখিয়ে গিয়েচে, কোনও অপকার কর্বারই আর ওর শক্তি নেই।"

আমার শুভসংবাদে তিনি যে কিছু খুসী হইলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া এমন কোন ভাবই বুঝিতে পারা গেল না, বরং এ সংবাদে তাঁহাকে যেন একটু বিরক্ত বলিয়াই মনে হইল। হয়ত আমার সেটা ভ্রম!

একটু চিন্তিত ভাবেই তিনি কহিলেন "ঘটনাগুলো চিরদিনই আমার বিরুদ্ধে এমনি করেই ঘটে আস্চে! যদি আমি ছাড়া অন্য কোন লোকের এই রকম জ্বর আর বিকার হোত, আপনারাই বলতেন, লোকটা বাঁচবে না—পীড়া মারাত্মক, অথচ সেই আপনিই বল্চেন আমার সে সব কিছুই ভয় নেই। আচ্ছা, এইটে দেখুন দেখি,—" তিনি তাঁহার বক্ষাবরণ উন্মুক্ত করিয়া ঠিক্ হৃদয়ের উপর কার একটা দাগ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, একটা পাহাড়ীর গোলা এইখান দিয়ে চলে গেছ্ল। আপনি হয়ত মনে কর্বেন এটা এমন জায়গা যেখানে লাগলে মানুষ সেই মুহূর্ত্তেই মারা প'ড়ে, কিন্তু দেখুন,—এতে আমার আর কি হবে—বুক দিয়ে গোলাটা ঢুকে পিঠ্ দিয়ে সোজা চলে গেল। আপনারা, ডাক্তাররা—যাকে "প্লিউরা" বলেন তাতে ঠেক্লাই না—এম্নি আশ্চর্য্য! এমন আর কখনও দেখেচেন?"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তরচ্ছলে কহিলাম "আপনি নিশ্চয়ই কোন শুভগ্রহে জন্মগ্রহণ করেচেন,—তা না হলে—"

মাথা নাড়িয়া জেনারল কহিলেন "না, সে সব মনের সংস্কার! দেখুন ডাক্তার, যদি সাধারণ ভাবে মৃত্যু আসে, আমি—তাকে একটুকুও ভয় করি না,—সৈনিকে মৃত্যু ভয় করে না, কিন্তু আমি স্বীকার কর্ছি—আপনি হয়ত বল্বেন এটা আমার স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, কিন্তু সত্যসত্যই কোন রকম অস্বাভাবিক মৃত্যুভয়ে আমায় স্নায়ুমণ্ডলীকে একেবারে বিকারগ্রস্ত করে তুলেচে, এ কল্পনা নয়, আমি তার বাস্তবছায়া দিন-রাতই যেন চোখের উপর দেখ্তে পাচ্চি।"

একটুখানি বিস্ময়ে থতমত খাইয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম "কেন, আপনি কি অস্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করেন?"

"না আমি ঠিক্ ও ভাবের কথা বলিনি, শীতল ইস্পাৎ বা গুরুভার সীসক, এদের সঙ্গে আমি এত বেশী পরিচিত যে এরা আমার আর ভয়ের জিনিষ নয়। ডাক্তার, আপনি দৈব বলের ক্ষমতা সম্বন্ধে জানেন কিছু?"

"মহাশয়, আমি ও সবের কোন খবর রাখি না।" উত্তরের সহিত দ্রুত কটাক্ষে আমি আমার রোগীর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। কারণ তাঁহার কথার ভাবে আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছিল যে তাঁহার বিকার পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু না—জ্বরের আরক্ত ভাব সম্পূর্ণ রূপেই মিলাইয়া গিয়াছিল। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা দীপ্যমান। "আঃ,—পশ্চিম দেশীয় বিজ্ঞানবিদ্ আপনারা, এ সকল বিষয়ে ঢের পিছনে পড়ে আছেন। পার্থিব শারীরিক সুখবিধানের উপায় যে সব জড় বিজ্ঞানে নিহিত আছে, সে সবে আপ্নারা যে খুব দ্রুত উন্নতি কচ্চেন সে কথা কেউ অস্বীকার কর্তে পার্বে না, কিন্তু, এ ছাড়া প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা—আত্মার যে পার্থিব মহান্ শক্তি—তাতে ভারতবর্ষের একটা সামান্য মুটে মজুরও আমাদের চেয়ে এত বেশী উন্নত, যে বহু শতাব্দির বহু পরিশ্রমেও আমরা তাদের সমকক্ষ হতে পার্ব না। বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকার সূত্রে—গোমাংস ভক্ষণে আর বিলাসব্যসনে দেহসুখ ভোগ করে—আমাদের আত্মা পশুপ্রবৃত্তির কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে পড়েচে। এখন এত নীচে আমরা নেমে গেছি, দেহ যাহা আত্মাচালিত একটি যন্ত্রস্বরূপ হওয়া উচিত, সেই আত্মাকেই দেহ যেন গারদ ঘরে ভরে রেখেচে। ভারত-বাসীর আত্মা ও দেহ এমন ভাবে জড়িত হয় নাই,—সেই জন্যই যখন মৃত্যুতে আত্মার সহিত দেহের বিচ্ছিন্নতা ঘটায়,—তখন তাঁদের এমন বেগ পেতে হয় না, বা এ রকম মোচড় দেয় না।"

আমি অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিলাম "এই পার্থক্যের দরুন, তাদের কিই বা এমন উপকার হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়, কেবল উন্নত জ্ঞানের যে উচ্চফল তাই তাদের লাভ! আপনি যদি কখনও ভারতবর্ষে যান, প্রথমেই একটা সামান্য বিষয়ে নজর পড়্বে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাই—ধরুন, আমোদ আহ্লাদের বিষয়,—মনে করুন একটা লোক আপনার সাম্নে একটি আমের আঁটি পুত্লে, তারপর তার উপর আমাদের অজ্ঞাত কোন রকম মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ কর্তে লাগল, দেখতে দেখ্তে অঙ্কুর-অঙ্কুর থেকে গাছ,—গাছে পাতা, মুকুল, ফল—ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নবজাত বৃক্ষে সুপক্ক আম্রের আবির্ভাব। এসব চালাকী—বা ভেল্কী নয়, এ তাদের একটা বিশেষ শক্তি, এই লোক গুলো আপনা-দের "টিনডেল" বা হাক্সলির চেয়ে প্রকৃতি রহস্যে ঢের বেশী অভিজ্ঞ। তারা ইচ্ছা শক্তির চালনায় প্রকৃতির গতি এমন ভাবে বর্দ্ধিত বা রুদ্ধ কর্তে পারে যে আম্রা সে

কল্পনাও কর্‌তে পারি না। আদি যাদের উদাহরণ দেখালুম এরাত সব নীচ জাতীয় যাদুকরের দল। কিন্তু যাঁরা উচ্চজ্ঞানের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করেচেন তাঁদের সঙ্গে ঐ যাদুকরদের—যেমন আমাদের সঙ্গে হটেনটট্ বা প্যাটাগোনোয়ার-দের তফাৎ তেমনিই তফাৎ।"

একটু হাসিয়া আমি কহিলাম "আপনি যেন তাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত—এম্‌নি ভাবেই কথা বল্‌চেন?"

জেনারল তাঁহার উত্থিত মস্তক ক্লান্তভাবে বালিসের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন "সত্যি, রীতিমত ঠেকেই আমায় শিখ্‌তে হয়েচে কিনা; আমি যেমন ভাবে তাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেম, আমার কোন দুর্ভাগ্য শত্রুও যেন তেমন করে তাঁদের সঙ্গে না মেশে,—সে কথা থাক্—আপনার কিন্তু এ সকল বিষয়ে কতকটা অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। কারণ, আপনার ব্যবসায়ে—ভবিষ্যতের জন্য মস্ত একটা পথ পড়ে রয়েচে। আপনি রিশেনব্যাকের Researches on Magnetism and vital force আর গ্রেগরির Letters on Animal Magnetism বই দুখানা নিশ্চয় পড়বেন। তারপর, মেশমারের Aphorisms আর ডাক্তার জস্তিনাস কার্ণারের বইগুলোও পড়ে ফেলবেন। তাতে আপনার 'আইডিয়া' বেড়ে যাবে কত!"

আমার ব্যবসায় সম্বন্ধে অপরের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণরূপেই অনিচ্ছুক। কিন্তু জেনারলের বাক্যে, প্রতিবাদ মাত্র না করিয়াই আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য হাত দেখিলাম। জ্বর সম্পূর্ণরূপেই ছাড়িয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর এরকম হইয়াই থাকে; কেন হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক এখানে নিরুত্তর! তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়াই আমি দস্তানাটা লইবার জন্য টেবিলের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলাম।

দৃষ্টি, মন এবং কার্য্য যদি পরস্পরের বিপরীত পথে চলে, তাহা হইতে যতটুকু সুফল পাওয়া সম্ভব এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিল। দস্তানাটার সহিত টেবিলের উপর যে আচ্ছাদিত বস্তুটি লোকচক্ষু হইতে আপনার অস্তিত্ব গোপনে রাখিয়াছিল তাহার আচ্ছাদন বস্ত্রখানিও আমার হাতে উঠিয়া আসিল। ব্যাপারটি এমন কিছু মারাত্মক—বা সঙ্গীন নহে হয়ত ইহার ফল আমার অনুভবেও আসিত না, কিন্তু আমার দৃষ্টি জেনারলের উপর থাকায় তাঁহার মুখে চক্ষে যে ভয়ানক ক্রুদ্ধভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং অধীর কণ্ঠস্বরে যে বিরক্তি উচ্ছ্বসিত হইল তাহাতেই বিদ্যুতাহতের ন্যায় আমি টেবিলের দিকে ফিরিলাম—এবং তাড়াতাড়ি আচ্ছাদন বস্ত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। কাজটা এতশীঘ্র করিয়াছিলাম যে আচ্ছাদিত বস্তুটি যে কি, তাহা আমি নিজেই অনুভব করিতে পারিলাম না,— এইটুকু অনুমান হইল যে একটি বিবাহের প্রকাণ্ড 'কেক' বা ঐরূপ কোন কিছু হইবে।

জেনারল যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্যটি সম্পূর্ণ দৈবাধীন, ইহার ভিতর আমার

কোন দুষ্ট অভিপ্রায় লুক্কায়িত নাই, তখন যেন একটু শান্তভাবে সহজস্বরে বলিলেন "থাক্, থাক্, অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এতে আর হয়েচে কি? ডাক্তার তুমি ইচ্ছে কর ত, দেখাতেও বাধা নেই—অনুগ্রহ করে ঐটে এখানে নিয়ে এস দেখি।"

দ্রব্যটির উপরের আবরণবস্ত্রখানি জেনারল খুলিয়া ফেলিলে ভিতরের রহস্যটি বাহির হইয়া পড়িল। আমি যাহাকে কেক্ মনে করিয়াছিলাম তাহা কেক্ নহে অতি সুন্দর মনোরম পর্ব্বত শৃঙ্গের একটি অনুকৃতি। চূড়ার উপরে শুভ্র প্রস্তরবিন্দু গুলি—যাহা তুষারকণার অনুকরণে ঝুরি বাঁধিয়া আছে, সেই গুলিকেই আমার ভ্রান্তচক্ষু পরিচিত কেকের উপরের চিনির দানা স্থির করিয়াছিল।

জেনারল বলিলেন "এটি হচ্চে হিমালয়, না, হিমালয় নয়—সবটা নয়—এ জায়গাটি সুরিনামশাখা, এটি ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্থানে যাবার গিরিবর্ত্ম। অনুকৃতিটি কি সুন্দর!"

বাস্তবিকই তাই! এমন সুন্দর অনুকরণ কম দেখা যায়। আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম, পর্ব্বত গাত্রের তৃণগুল্মগুলিও যেন সজীব।

জেনারল কহিলেন "এই স্থানটির সহিত আমার জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ এইখানেই আমার প্রথম অভিযান সম্পন্ন হয়, ঐ—কালাবাগ—আর থুল উপত্যকার অপর প্রান্তে—গিরিবর্ত্মে আঠার শো এক চল্লিশের গ্রীষ্মকালে—আফ্রিদিদের দমনের জন্য আমি সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেম। এটা যে বড় সঙ্কটহীন বা সহজসাধ্য কাজ ছিল না—আমাকেও তা স্বীকার কর্‌তে হয়েছিল।"

জেনারলকে থামিতে দেখিয়া, তিনি যে স্থানটি দেখাইতেছিলেন তাহারই অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী একটি রক্তের মত লাল চুনির উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমি বলিলাম—"এই বুঝি সেই গিরিবর্ত্ম যেখানে আপনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছিলেন"? "হাঁ, এইখানেই—আমাদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছ্‌ল।" বলিয়া, অত্যন্ত ঝুঁকিয়া তিনি সেই লাল চিহ্নটিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, "আমরা এ—ইখানে—ই আ—ক্রা—ন্ত—" বলিতে বলিতে সহসা তিনি মূর্চ্ছিতের মত বালিসের উপরে পড়িয়া গেলেন। আমি যখন প্রথম এই গৃহে প্রবেশ করি তাঁহার চোখে মুখে যেমন ঘোর বিকারের লক্ষণ দেখিয়াছিলাম—ঠিক্ সেই ভাব আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছিল। আর—ঠিক্ সেই-মুহূর্ত্তেই তাঁহার বিছানার উপর হইতে একটি শব্দ ভাসিয়া আসিল টিং টিং, টিং, শব্দটা যেন বাতাসেই ভাসিতেছিল, তাহার আধার বা উৎপত্তির কোন স্থান দেখা গেল না, শূন্যে যেন হাওয়ার জোরে বাজিতেছিল টিং, টিং, টিং, কি সে শব্দ? তাহা শ্রুতিসুখকর, অথবা শ্রুতিকটু, সে কথা প্রকাশ করিয়া বোঝান যায় না, তবে এরূপ শব্দ আমার জীবনে যে আমি দ্বিতীয় বার শুনি নাই, ইহার পূর্ব্বেও নয়, আর পরেও নয়, এই কথাটিই বলিতে পারি। আর দ্বিতীয় বার না শোনার জন্য যে আমি দুঃখিত হই নাই,—এই টুকুই ইহার বিশেষণ!

বাইসাইকেলের ঘণ্টার এক রকম

আওয়াজ হয় অনেকটা যেন সেই রকম? না, ঠিক্ তা নয়; হৃদ্‌যন্ত্রের উপর দ্রুততালে উত্থান পতনের যে ধ্বনি তাহারই সুস্পষ্টতা, অথবা বৃষ্টির জলের শব্দের সহিত কোন বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রণের অনুরূপ কি? আমার বোধ হয় যদি কোন সঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তি সেই শব্দ শুনিতেন তাহা হইলে সহজে তুলনা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, বাদ্যযন্ত্রে আমি,—যাক্ সব কথা সব সময় খুলিয়া না বলাই ভাল।

বাতাসে ঠিক বিছানার উপরে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি ভাসিতেছিল টিং, টিং, টিং। আমার বিচলিত বিপন্নমুখ বোধ হয় জেনারলের চোখের দৃষ্টি এড়ায় নাই, একটুখানি বিষাদ মিশ্রিত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন "ও ঠিক্‌ই আছে, ডাক্তার ওটা আমার একটা গোপনীয় ঘণ্টার আওয়াজ। আপনি যদি নীচে গিয়ে এইবার আমার প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌টা লিখে দে'ন তাহলে বড়ই ভাল হয়!"

স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল তিনি আমার বিদায় ইচ্ছা করিতেছেন। ঐ অভূতপূর্ব্ব শব্দের উৎপত্তি রহস্য আবিষ্কারে আমার চিত্তে যেটুকু কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল,—এ কথার পর—আমি সেটাকে দমন করিয়া লইয়া, বিদায় লইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম, এবং যথাবিহিত প্রেস্‌ক্রুপসন্ লিখিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল পুনরায় জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কারণ সকালবেলা আমি তাঁহার অবস্থা খারাপই দেখিয়া আসিয়াছি, রোগীর বর্ত্তমান ও অতীত জীবনের সমস্ত বিবরণ জানিবারও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। শুধু সাধারণ কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য নহে, তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সহিত লক্ষণ মিলাইয়া যতটুকু রোগ নিরাকরণ করিতে পারা যায়,—সেইটুকুই আমার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে জেনারলের নিকট হইতে একখানি পত্র এবং বড় রকম একটা "ফি" পাইলাম। পত্রে জেনারল হিথারষ্টন, আপনার সম্পূর্ণ সুস্থ সংবাদ দিয়া জানাইয়াছেন, যে দ্বিতীয়বার আমার সাহায্য তাঁহার আবশ্যক হইল না।

ক্লুমবার হলের সেই অপূর্ব্ব প্রোনি ভদ্রলোকটীর নিকট হইতে এই একখানি মাত্র পত্রই আমার প্রথম ও শেষ!

আমার প্রতিবাসী ও বন্ধু বান্ধবেরা অনেক সময় আমাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে জেনারলে আমি "পাগলের লক্ষণ" কিছু দেখিতে পাইয়াছি কি না?—আমি দ্বিধাশূন্য হইয়াই তাঁহাদের বাক্যের উত্তর দিয়াছিলাম যে "না,"! তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এইটুকু আমি বুঝিয়াছিলাম যে তিনি লেখাপড়ার যথেষ্ট অনুশীলন ও চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি একজন বুদ্ধিমান, এবং বিদ্বান ব্যক্তি। তবে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ধমনীগুলা শক্ত হইয়া গিয়াছে, অনুভবশক্তিও দুর্ব্বল। কি একটা বিপদ ঘটিবে এমনই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই তিনি শঙ্কিত, কাতর!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।



বাঙ্গালার পল্লীদৃশ্য



অবনত জাতি

নূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল প্রথমে যোগী ও সুবর্ণবণিক জাতি আপনাদিগকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। প্রায় সেই সময় হইতেই চণ্ডাল বা চাঁড়ালদিগের নমশূদ্র জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা হয়। বহু চেষ্টার পর গত তিন শতাব্দী হইল তাহাদের নাম নমশূদ্র বলিয়াই জনসংখ্যাকালে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। নমশূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহা জানা যায় না। সঞ্জীবনী সংবাদ পত্রের একজন নমশূদ্র-জাতীয় লেখক দুই তিন বৎসর হইল একবার লিখিয়াছিলেন যে প্রকৃত পক্ষে শব্দটা নমঃশূদ্র এবং তাহার অর্থ নমস্য শূদ্র অর্থাৎ অন্য জাতির লোক নমঃশূদ্রদিগকে দেখিয়া নমস্কার করিবে। এই ব্যুৎপত্তিটার প্রতি কতলোকের শ্রদ্ধা হইবে তাহা বলিতে পারি না। শব্দটার আর একটা ব্যুৎপত্তি আমি গত বৎসর শুনিয়াছি। তাহা এই যে চণ্ডালদিগের আদিপুরুষের নাম লোমশ। শব্দের প্রথমাক্ষর ল হইলে পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক ন উচ্চারণ করে সুতরাং লোমশ স্থলে নোমোশ উচ্চারিত হয়। কিন্তু লোমশ নামে একজন ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন। লোমশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে এই জন্য শূদ্র শব্দ ইহাতে যোগ করা হইয়াছে। এই রূপেই লোমশ শূদ্র, নমঃশূদ্র এবং অবশেষে নমশূদ্র হইয়াছে।

আসামের হাড়ি ও ডোমজাতি পুরাতন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যথাক্রমে বৃত্তিয়ান ও নদিয়াল হইয়াছে। আসামের গ্রহাচার্য্যগণ এতদিন গণক বলিয়া অভিহিত হইতেন কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

কোন কোন জাতি নামের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না করিয়া আভিজাত্যের দাবী করেন। আসামের কাছারীরা বিশেষত সজাই বা হজাই কাছারীরা বলে যে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ তাহাদের আদিপুরুষ ছিলেন। মণিপুরীরা বলেন যে অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। আসামের মিকির জাতির দাবী কিন্তু অন্য সকল দাবীকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও কল্পনার ঔৎকর্ষ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। উত্তর বঙ্গের কোচ জাতি বলেন যে তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। বঙ্গদেশের কৈবর্ত্তেরা বলেন যে তাঁহারা মাহিষ্য। কিছুদিন হইতে সাহা, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞদিগের অনেকে আপনাদিগকে যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও সপ্তশতি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

প্রকৃত পক্ষে যাহারা হীন জাতি, যাহাদের হিন্দুসমাজে কোন উচ্চ অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসামের গণক এবং বঙ্গের কায়স্থ বৈদ্য কেন গোলমাল করেন তাহা বুঝা যায় না। ইঁহারা

সকলেই স্ব স্ব দেশে উচ্চ জাতি। আসামে ব্রাহ্মণদিগের পরেই গণকের পদ। এমন কি তাঁহারা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের প্রায় সমকক্ষ। বঙ্গের গণকেরা ব্রাহ্মণ বৈদ্যের হুঁকা ছুঁইয়া দিলে যেমন হুঁকার জল ফেলিয়া দিতে হয় আসামে সেরূপ নহে। ব্রাহ্মণের যে আচার ব্যবহার গণকেরও তাহাই। গণকেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে নূতন কোন রূপ সংস্কার বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই; নূতন কোন আচার অবলম্বন করিতে হয় না। কেন না কি বঙ্গে কি আসামে গণকেরা চিরকালই উপনয়ন সংস্কারবিশিষ্ট এবং দশাহ অশৌচ পালন করেন। তবে আসামের গণকেরা কেন চীৎকার করিয়া জানাইতেছেন তাঁহারা খাঁটি ব্রাহ্মণ। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেও অন্য ব্রাহ্মণেরা কি কখনও তাঁহাদিগকে লইয়া এক পংক্তিকে আহার করিবেন—না তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিবেন? আর বঙ্গদেশের গণকেরা যে চেষ্টা করিতেছেন সেই চেষ্টা সফল হইলে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিলেও তাঁহারা কি বঙ্গের মহাশক্তিশালী ব্রাহ্মণদিগের কাছে ঘেঁসিতে পারিবেন?

আর বঙ্গের কায়স্থ বৈদ্যেরা? তাঁহারা ত চিরদিনই প্রধান জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। কি বিদ্যাবুদ্ধি, কি ধনমান সর্ব্ববিষয়েই তাঁহারা সমাজের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি কায়স্থবৈদ্যগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা করিতেছেন। দিন্—তাহাতে ক্ষতি নাই বরঞ্চ ভালই, কেননা ইহা প্রমাণ হইয়া গেলে ইহাতে একটা ঐতিহাসিক অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে। কিন্তু বৈদ্যেরা তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দিলেও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া বরণ করিয়া লইবেন কি? আর কায়স্থগণও ঘোড়ায় চড়িয়া কোমরে তরবারি বাঁধিয়া বিবাহ করিতে গেলেও প্রকৃত ক্ষত্রিয়দিগের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিবেন কি। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আমূল সংস্কার না হইলে এরূপটা হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

প্রকৃতপক্ষে, অবনত জাতীয় লোকেরা যে চেষ্টা করিতেছে সেই চেষ্টার পরিণতি তাহাদের নামান্তর গ্রহণ মাত্র। আমি ত ইহাতে প্রকৃত জাগরণের কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। বহুকালের জাতীয় নিদ্রা এইরূপেই অল্পে অল্পে ভাঙ্গে একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা জাপানের কথা স্মরণ করিবেন। গত পঞ্চাশ বৎসরে চণ্ডালেরা নমশূদ্র নাম গ্রহণ ব্যতীত আর কি করিয়াছে? কিন্তু ঠিক সেই পঞ্চাশ বৎসরে জাপানের লোক কি করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

অবনত জাতিসকল নাম পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কি কিছুই করে নাই? করিয়াছে কিন্তু আর যাহা করিয়াছে তাহাতে নিজের এবং দেশের অপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। চণ্ডালেরা পূর্ব্বে বন্য শূকরের মাংস খাইত। এই মাংস আহরণ করিবার জন্য তাহারা দল বাঁধিয়া মৃগয়া করিত। এইরূপে দলবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় বীরভাব (esprit de cops) অনুশীলিত হইত, তাহাদের শৌর্য্য,

উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি পুরুষোচিত সদ্‌গুণের বিকাশ হইত, মাংস ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি হইত, গ্রামাদির শত্রু শূকরকুলেরও হ্রাস হইত। তাহাদের মধ্যে ধনী ছিল না সুতরাং বিনামূল্যে মাংস ভক্ষণ তাহাদের একটা মহা বিলাস ছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল তাহারা বরাহ মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে উচ্চবংশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া জগৎকে জানাইবে যে তাহারাও উচ্চবংশীয়। তাহারা কখনও ধনবান্ ছিল না; সুতরাং ক্ষেত্রকর্ষণ ভিন্ন তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য জাতীয় লোকের চাকরী করিত এবং আরও নানারূপ কাজ করিত। কিন্তু এখন তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির কাজ করে না, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির অন্নও গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণেরাই তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন অথচ ব্রাহ্মণের প্রতি তাহাদের কোনরূপ দ্বেষ নাই—তাহাদের যত আক্রোশ ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি। ধন্য মনুষ্য চরিত্র। পূর্ব্বে চণ্ডালেরা বিনীত ছিল কিন্তু এখন তাহাদের আচরণ দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা ভাবে যে বিনয় দেখাইলেই তাহারা যেন হীন জাতি বলিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এখন তাহারা ভদ্রলোকের প্রতি "আপনি" শব্দ ব্যবহার করে না—সকলকেই "তুমি" বলে। প্রায় এইরূপে অন্য যে সকল অবনত জাতি আপনাদিগকে বড় বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে তাহারাও জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া নিজের অর্থাগমের পথ রোধ করিয়া নিজের ও দেশের ক্ষতি করিতেছে। মালো নামে এক মৎস্যজীবী জাতি আছে—তাহাদের পুরুষেরা মাছ ধরিত, স্ত্রীলোকেরা তাহা হাটে বাজারে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। সম্প্রতি তাহারা এই নিয়ম করিয়াছে যে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা আর বাড়ী বাড়ী মাছ বিক্রয় করিতে যাইবে না। এই নিয়মে তাহাদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহাদেরও কষ্ট হইয়াছে, অন্য জাতীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও অসুবিধা হইয়াছে। উন্নত কায়স্থ জাতি উন্নততর হইতে চেষ্টা করিয়াও অল্প সামাজিক ক্ষতি করেন নাই। তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইবেন হউন, সে ত ভালই, কিন্তু তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল বৈদ্যজাতিকে হীন বলিয়া প্রমাণ করা, বৈদ্যদিগকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া এবং বৈদ্যদের বিরুদ্ধে জাল শাস্ত্রবচন রচনা করা। পণ্ডিতপ্রবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার পুস্তকে কেবল যে সেই জাল ধরিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, গালাগালিরও উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং এরূপ করায় কেবল পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাবই উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া সমাজের শক্তির হ্রাস ও উন্নতির পথ রোধ করে। যদি এইরূপে সর্ব্বত্র উনপঞ্চাশৎ অনিল প্রবাহিত হয় তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কায়স্থ, বৈদ্য, গণক, সাহা প্রভৃতি জাতিকে যথাক্রমে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিরূপে মানিয়া লইতে গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিয়াছেন। তবে যে গবর্ণমেণ্ট কৈবর্ত্ত, হাড়ি, ডোম ও চণ্ডালকে মাহিষ্য, বৃত্তিয়ান, নদীয়াল ও নমশূদ্র রূপে স্বীকার

করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে মাহিষ্য, বৃত্তিয়ান, নদীয়াল ও নমশূদ্র নামে কোন জাতি ভারতবর্ষের কোথাও নাই সুতরাং এই সকল নাম কোন হীন জাতিকে দিলে অন্য কোন উচ্চতর জাতি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে না।

হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপ নূতন আকার ধারণ না করিলে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে এবং তাঁহাদের অঙ্কিত গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে হীন জাতির অবস্থার উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তিন বৎসর হইল একদিন কয়েকটী ভদ্রলোক অবনত জাতির উন্নতি কিরূপে হইতে পারে সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "হীন জাতির জল কখনই চল হইতে পারে না।" আর একজন বলিলেন "হীন জাতিকে আমরা যদি চিরদিনই অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাহারা হিন্দুসমাজে থাকিবে কেন? তাহারা যদি হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া যায় হিন্দু বলিতে মুষ্টিমেয় লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুর অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইবে।" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন "লোপ পায় পাউক। তাহা বলিয়া কি আমি পিতৃশ্রাদ্ধ কালে অস্পৃশ্য জাতির জল ব্যবহার করিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করিব—না নিজের শরীর অপবিত্র করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? মৃত্যু ত অপরিহার্য্য, হিন্দু সমাজকেও একদিন মরিতে হইবে। কিন্তু মরিবার ভয়ে কি পাপাচরণ করা উচিত? হিন্দুশাস্ত্রের শাসন অমান্য করিয়া অস্পৃশ্য-দিগকে সমাজ ভুক্ত করিয়া লওয়াই হিন্দু-সমাজের আসন্ন মৃত্যু। যদি হিন্দু ধর্ম্মে ব্যবস্থাই না মানিলাম তাহা হইলে হিন্দু কোথায় রহিল? হীন জাতিরা হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া গেলে বরং সমাজ বললাভ করিয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ করিবে। বিষদুষ্ট হাত পা কাটিয়া ফেলিলে সমস্ত শরীরের উপকার হয়। হীনজাতিরা অন্যধর্ম্ম অবলম্বন করিবে বলিয়া ভয় দেখায় কেন। একেবারে হিন্দু সমাজ ছাড়িলেই ত পারে।" ইত্যাদি অনেক কথা সেই ভদ্র লোকটি বলিলেন। গোঁড়া হিন্দুমাত্রেরই এই যুক্তি। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা অযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তবে মনুষ্যোচিত যুক্তির কথা ভিন্ন। প্রচলিত হিন্দুত্বও বজায় থাকিবে, হীনজাতিও চল হইবে এরূপ হইতেই পারে না। হয় হিন্দু ধর্ম্মের নূতন সংস্করণ করিতে হইবে নতুবা হীন জাতির মায়া ত্যাগ করিতে হইবে।

কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিত একটী হীন জাতীয় যুবককে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমরা যখন হিন্দুসমাজের অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ কর, যখন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাদিগকে ঘৃণা করেন অথচ তোমরা মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হইলে তোমাদের প্রতি অধিক শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন তখন তোমরা একেবারে এই সমাজ ছাড়িয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হওনা কেন?" যুবকটী বলিল "লোকে ত কেবল ঐহিক বিষয়ের চিন্তা করিয়াই সকল কাজ করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িলে পারত্রিক উদ্ধার সাধন হইবে কি রূপে?" এই কথা শুনিয়া কাঁদিব

হাসিব বুঝিতে পারিলাম না। যে হরীশ বাবু তাঁহার বৈঠকখানা হইতে যদুকে কান ধরিয়া ও চড় মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন তিনিই সেই যদুকে রাজদ্বারে সম্মানিত করিয়া দিবেন এরূপ আশা করা ও যে হিন্দুধর্ম্ম হীন জাতি-দিগকে পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের পারত্রিক মঙ্গলের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এরূপ আশা করা একই রূপ বাতুলতা। যদুর মহত্ত্ব থাকিলে সে হরীশ বাবুকে ক্ষমা করিতে পারে কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র থাকিলেও সে হরীশ বাবুর অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে পারে না।

শূদ্র বেদধ্বনি শুনিলে তাহার কানে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিতে হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে তাহার গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ দিয়া ক্ষত করিয়া দিতে হয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদের ইহাই শাসন। একজন শূদ্র তপস্যা করিতেছিল বলিয়া এক ব্রাহ্মণের কথায় রামের মত একজন রাজাও স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তথাপি আমরা অনেক সুশিক্ষিত শূদ্রকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। ইহা দেখিয়া আমার মনে পড়ে যে উইল্‌বর্ ফোর্সের সময়ে অনেক দাস দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিল।

শাস্ত্রে বলে দাসের মুক্তি নাই। বাস্তবিক অমুক্ত জীবকেই দাস বলে। দাসত্ব দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ইচ্ছানুসারে চলিতে ফিরিতে বা অন্য কোন কার্য্য করিতে না পারিলে শারীরিক দাসত্ব হয়। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের শারীরিক দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। আমরা এখন যেমন স্বাধীন হইয়াছি পূর্ব্বে কখনও তেমন স্বাধীন ছিলাম না। দেশীয় রাজাদের রাজ্যের লোকও তেমন স্বাধীন নহে। মাড়বারীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে রাজপুতানায় এখনও কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ একটা বড় ও ভালবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হয় না। দক্ষিণাপথের কোন কোন জাতিকে এখনও প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে দেওয়া হয় না। পঞ্জাবের হীন জাতিরা ভাল পরিষ্কার কাপড় পরিয়া বাহির হইতে পায় না। এই সমস্তই প্রকৃত শারীরিক দাসত্ব। ইহা হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিয়াছি। এখন যে দাসত্ব আছে তাহা মানসিক এবং সে দাসত্বের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা পুত্রবান্ তাঁহারা উত্তরাস্য হইয়া আহারে বসিতে পারেন না। যাঁহাদের পিতা জীবিত আছেন তাঁহারা দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া খাইতে পারেন না, আমরা দিন বা ক্ষণ বিশেষে বাড়ীর বাহির হইতে পারি বা পারি না, কোন কোন জলাশয় আমাদের পার হইতে নাই, নবমী তিথিতে আমরা লাউ খাইতে পারি না, আমরা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া আমরা টিকটিকির আদেশে চলা ফেরা করি। এইরূপ অশেষ প্রকারে আমরা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার জন্য আমরাই দোষী। সমাজও এখন এই সকল কার্য্যের জন্য আমাদিগকে মারধর করে না। হিন্দু-সমাজ চৈতন্যকে প্রহার করিয়াছিল, রাম-মোহনকে প্রহার করিতে চাহিয়াছিল এবং দয়ানন্দকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে সব অত্যাচারও নাই। তবুও

আমরা ভয়েই মরি। হায়রে! আমাদের আবার জাতীয় জাগরণ!

পঞ্জাবের হিন্দুরা পানীয় জলের কূপ মুসলমানকে স্পর্শ করিতে দেন, কিন্তু হীন-জাতীয় হিন্দুকে স্পর্শ করিতে দেন না। একবার এক গ্রামের তিন চারিশত হীন-জাতীয় লোক জলকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চ হিন্দুদিগের কূপ হইতে জললাভ করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমান হইলেন এবং কূপ স্পর্শ করিতে পাইলেন। সম্প্রতি তাঁহারা শুদ্ধি নামক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর্য্যসমাজে উঠিয়াছেন।

এক চিকিৎসক যখন কোন রোগীকে অসাধ্য বলিয়া প্রকাশ করেন তখন অন্য চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করান যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম যখন চণ্ডাল, মাদ্র দ্বিজবন্ধু প্রভৃতিকে অস্পৃশ্য ও পতিত বলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের উচি যে তাঁহারা বড় বড় জাতীয় সভা আহ্বা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে নির্ম্মম নিগড়ে তাঁহা সংবদ্ধ তাহা ভগ্ন করেন এবং আর্য্য সম্প্রদা ব্রাহ্মসম্প্রদায় প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদা উৎপীড়িত ও সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে, মনুষ্যো প্রাপ্য সর্ব্বপ্রকার ন্যায্য অধিকার দিয়া বক্ষে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করি আছেন সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ইহাতে তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজকেও ত্যা করিতে হইবে না,—তাঁহারা একেবারে অহিন্দু হইবেন না—অথচ গোড়া হিন্দুধর্ম্মে অত্যাচার হইতেও মুক্তি লাভ করিবেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

প্রবঞ্চিতা

কা'দের প্রাণের অর্ঘ্যে সেজে ওগো রাজার নন্দিনী,
রূপ দেখে আর মিষ্ট কথায় হ'লে শঠের বন্দিনী?
যা'তে তা'দের মন ভুলালে,
জান কি কোন্ রাজদুলালে
বুকের রুধির পাঠিয়ে দিল তোমার চরণ রঞ্জনে?
কোন্ নৃপতি ছদ্মবেশে
গড়লো নূপুর হেথায় এসে?
কারিগরের নামটি বাজে তাহার মধুর শিঞ্জনে!

সূক্ষ্ম বুকের স্নায়ু দিয়ে
বসন দিল বিরচিয়ে,
কোন্ যুবরাজ সংগোপনে নাম লিখেছে অঞ্চলে?
তোমার বাগে মালীর কাজে
তরুণ কবি ছদ্মসাজে,
প্রণয় ফুলে গেঁথে মালা গলায় দিল কৌশলে,
সে সব তুমি খোঁজ নিলে না, ওগো রাজার নন্দিনী!
প্রণয়ীজন ফেলে হ'লে অপ্রেমিকের বন্দিনী।

শ্রীকালিদাস রায়।



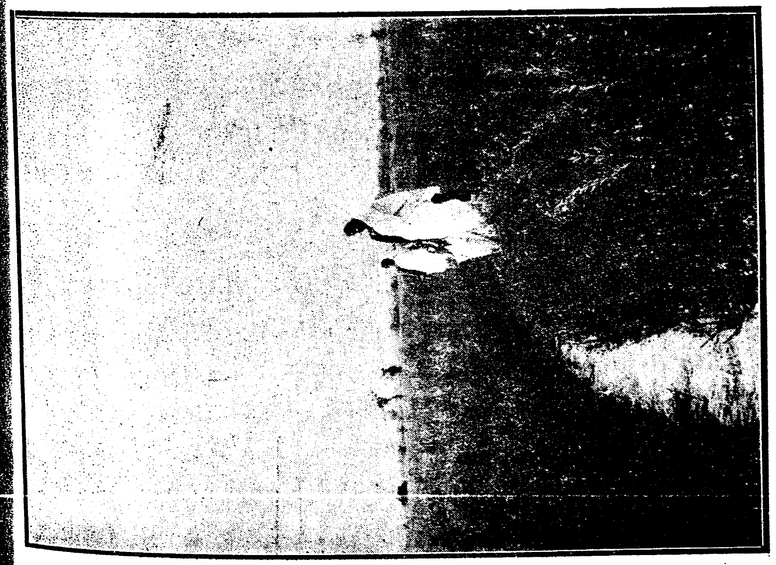

বাঙ্গালার পল্লীদৃশ্য

বরফ-গলা

১

হিমালয়ের শিখর পরে
জমাট তুষার ভরা,
গল্‌বে সেও কোন দিনে
প্লাবিত করে ধরা !
আমারি মন কঠিন রবে,
শক্ত পাষাণ চেয়ে ?
নির্ঝরিণী ঝর্‌বে না তার
হৃদয়-রন্ধ্র বেয়ে ?

শূন্য থেকে শূন্য পরে
লাফিয়ে পড়ে হেসে
গহন বনে, কাঁটায় সেজে
চল্‌তে ভেসে ভেসে,
ললিত ভীম গানের রোলে
কাঁপিয়ে দিগন্তর,
টপ্‌কে' শিলা, উছ্‌লে' ফেণা
পেরিয়ে তেপান্তর
মিশ্‌বে নাক সাথী সনে
সাগর পথের যাত্রী
হরিৎ ভরিৎ দুকূল করে
কি দিবা কি রাত্রি ?

বরফ-গলা হৃদয় আমার
নূতন সুরে 'গা'
একটি শুধু মূর্চ্ছনা তার
নীচেয় নিয়ে যা।

২

পলকে পলকে ছলকে ছলকে
বহিয়া চল্‌রে মন
থ'ম্‌কে থ'ম্‌কে দমকে দমকে
ঠারিস্‌নে এমন !
যদি থরে থরে নিথর পাথরে
বুক চাপে—সরা, সরা !
চল্ চল্ চল্ তরল সচল
কলগানে সদাভরা !

কভু বা নিঝর শুধু ঝর ঝর
অম্বর পটে আঁকা
শুভ্র উজল রূপ ঝলঝল
ভৈরবী গতি বাঁকা !
বিগল তড়িৎ কভু বা সরিৎ
স্নিগ্ধ সরল রেখা,
বনের হিয়ায় আঁধার শিয়ায়
মোহন রজত লেখা !

কান্তারে দেশে আলুথালু বেশে
এলায়িত বেণী নদী
দুকূল ছাপিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া
কেঁদে চল্ নিরবধি !

কভু গল্ গল্ হাসি কল কল
সখি সনে উন্‌মাদ
সাগর মেলায় বহে যা হেলায়
কাকলিয়ে পূরি সাধ।

ছল্ ছল্ ছল্ ছলল্ ছলল্
মনরে উছিয়ে চল,
লীলাময়ী রূপ অতি অপরূপ
ভাবে সদা ঢল ঢল !

শ্রীসরলা দেবী।

শান্তিনিকেতন

(গল্প)

"বসন্তের এই সুন্দর সন্ধ্যায় এই বিজন স্থানে, একাকী যোগাসনে বসিয়া কি করিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি অন্ধ? তোমার চক্ষু নাই? দেখিতে পাইতেছ না যে দেবী পূজা করিতেছি? নারীই সংসারের বিষ মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এক নারীই আমার জীবনের সুধা ও পরিত্রাতা। তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার চিতা পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া এই ঘৃণিত জীবন ধন্য করিতেছি।

কি বলিতেছ? আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ? তোমার হৃদয় মন এক মুহূর্ত্তেই আমাকে সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছ? তোমার হৃদয়ের পূজা, প্রাণের প্রেম, তোমার ধন রত্ন সকলই আমার চরণে ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত আছ? প্রাণের প্রেম? হাঃ হাঃ পুরুষের প্রাণের প্রেম! প্রেম কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান কি? তোমরা জান শুধু শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা। নারীর হৃদয় লইয়া ক্ষণিকের খেলা। মোহের বশে দুদিনের জন্য তাহাকে পৃথিবীর সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া ধরা, তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতেই অবসাদ! তারপর পদাঘাতে তাহার হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিয়া, পদদলিত ভগ্ন হৃদয় লইয়া গর্ব্বভরে বিজয় পতাকা উড়াইয়া আনন্দ করা, এই ত তোমাদের ভালবাসা!

কিন্তু সেই, অটল, গভীর অতলস্পর্শী প্রেম, সেই হৃদয় প্রশস্তকারী আপনা
প্রেম, সেই আপনা ভুলিয়া সর্ব্বস্ব
করা প্রেম, তাহা কাহাকে বলে জান
যে প্রেম ভাল মন্দ জানে না, যে
পাপপুণ্য জানে না, যে প্রেম প্রেমাস্পদ
বিচার জানে না, যে প্রেম শুধু
"আমি ভালবাসি" সে প্রেমের অর্থ
কি?

হাঁ! আজ তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব
করিবার জন্য প্রস্তুত, আজ আমাকে হৃদয়ে
সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থান দিবার জন্য তো
প্রাণ উন্মুখ। কিন্তু কাল—কাল যদি
ভগ্ন হৃদয়ে তোমার দ্বারে ধূলায় লুটি
কাঁদিয়া মরি তাহা হইলে তুমি ফি
চাহিবে কি? না রণজয়ী বীরের
বিজয় পতাকা উড়াইয়া অন্য হৃদয়
করিবার জন্য মহাসমারোহে যাত্রা করিবে!

পুরুষের প্রণয় যে কি তাহা আমা
শিরায় শিরায় লেখা আছে। এই বিংশ
বর্ষ বয়সে আমি যোগিনী কেন? তা
তোমারই মত একজনের জন্য। সে
একদিন তাহার হৃদয়ের পূজা প্রাণের প্রে
আমার চরণে সমর্পণ করিয়াছিল। কে
একটি জিনিষ সে দান করে নাই
শ্রদ্ধা।

আমার জীবনের কাহিনী শু
চাহিতেছ? তবে শোন। বৃথা বাক্যে
বেশী সময় নষ্ট করিবার সময় আমার

সুতরাং সংক্ষেপেই জীবন কাহিনী বলিব। কিন্তু একটু সরিয়া ঐ পাথরের উপর বোস—তোমার ছায়া দেবীর চিতা স্পর্শ করিতেছে।

চাষার মেয়ে ছিলাম। চমকিয়া উঠিলে কেন? চাষার মেয়ের এত রূপ সেই কথা ভাবিতেছ? আর একজনও একদিন ঐ কথা ভাবিয়াছিল। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া ছিলাম। পিতা অনেক বয়সে আমাকে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। তিনি পত্নীশোক ভুলিয়া আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নিতান্ত শৈশবের কথা মনে নাই, কিন্তু জ্ঞানাবধি মনে আছে অত্যন্ত প্রত্যূষে উঠিয়া পিতা রন্ধন করিয়া আমাকে আহার করাইতেন। তারপর নিজে আহার করিয়া ক্ষেতে যাইতেন। আমিও সঙ্গে যাইতাম। সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিয়া পিতা পুনরায় রন্ধন করিতেন। আহারাদি হইলে পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তাঁহার নিকট গল্প শুনিতে শুনিতে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িতাম তাহা জানি না। পিতার স্নেহে মাতার অভাব কখনও বোধ করি নাই। আমার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পিতা বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইলেন। আমরা দরিদ্র হইলেও গৃহে ধান চাউল ও সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল। তাহা দ্বারা কোন ক্রমে সংসার চলিতে লাগিল।

পিতার ব্যাধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে চিকিৎসক ডাকিতে কৃতসংকল্প হইলাম। শুনিয়াছিলাম কলিকাতার একটি বাবু আমাদের গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছেন, তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুদক্ষ। ক্ষেতের একটি বালক দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দিলাম। কি কুক্ষণেই যে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলাম তাহা জানি না। তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

তিনি প্রত্যহই পিতাকে দেখিতে আসিতেন। গৃহে অন্য কেহ না থাকাতে পিতার শয্যাপার্শ্বে আমাকেই উপস্থিত থাকিতে হইত। আমি কখনও গ্রামের বাহিরে যাই নাই, গৃহের বাহিরেও বড় যাই নাই। অপরিচিত পুরুষ দেখা ও বাক্যালাপ করা আমার জীবনে এই প্রথম। ডাক্তার বাবুর সুন্দর চেহারা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তিনিও প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে আমাকে ডাকিয়া সর্ব্বদাই বাক্যালাপ করিতেন।

পিতার ব্যাধি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনিও বুঝিয়াছিলেন তাঁহার রক্ষা নাই। একদিন পথ্য হস্তে পিতার গৃহাভিমুখে যাইতেছি, দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলাম পিতা বলিতেছেন,—"ডাক্তার বাবু! এ যাত্রা আর রক্ষা নাই জানি। মেয়েটার জন্য বড় ভাবনা হয়। তার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আর কোন দুঃখু থাকত না।" পিতার কণ্ঠস্বর বেদনা পূর্ণ! তাহার উত্তরে ডাক্তার বাবু যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি পিতাকে জানাইলেন যে আমার রূপে তিনি মুগ্ধ পিতার সম্মতি পাইলে আমাকে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

সবিস্ময়ে পিতা বলিলেন "আপনি—ভদ্রলোক—চাষার মেয়ে বিয়ে করবেন?" তদুত্তরে তিনি পিতাকে জানাইলেন, তিনিও ত

জাতিতে চাষা; তাঁহার যখন কেহ নাই ও তিনি এই গ্রামেই চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন তখন ইহাতে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আনন্দে বিহ্বল হইয়া পিতা বলিলেন —"পরমেশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি আর গৃহে প্রবেশ করিলাম না। সাবুর বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আপন শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। দুঃখ ও আনন্দ যুগপৎ আমার হৃদয়ে তুফান তুলিয়া দিল।

আনন্দাতিশয্য দুর্ব্বল শরীরে সহ্য হইল না। সহসা রাত্রে পিতার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল। পরদিন সকালে, আমার হৃদয়ের দেবতার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া, আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

এক মাসের মধ্যে শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ প্রভৃতি শেষ হইল। আমাকে তিনি বিবাহ করিলেন। বিবাহ কাহাকে বলে জানি না বিবাহ কখনও দেখি নাই। একদিন তিনি পুরোহিত লইয়া আসিয়া বলিলেন "আজ বিবাহ।" পুরোহিত তাঁহার হাতে আমার হাত দিয়া মন্ত্র পড়াইলেন। দুই বৎসর বড় সুখে কাটিল,—সে সুখের তুলনা নাই। এই দুই বৎসরে তাঁহার নিকট একটু একটু লেখাপড়া শিখিলাম। চাষার মেয়ে ভদ্র গৃহের উপযুক্ত হইলাম। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে নয়নের আনন্দ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তৃতীয় বৎসরের মাঝামাঝি, একদিন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। এক মাসের মধ্যেই ফিরিবেন। বিবাহ হইয়া অবধি তাঁহার কাছ ছাড়া হই নাই। আসন্ন বিরহ কল্পনায় আমি বড়ই কাতর হইলাম। তিনি আমাকে বক্ষে লইয়া, আদর করিয়া, নিদ্রিত পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিলেন। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা! ছয় মাস কোন সংবাদ পাইলাম না। তাঁহার ঠিকানা জানি না— পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে পারিলাম না। ভাবনা চিন্তায় শয্যাশায়ী হইলাম।

ছয় মাস পরে একদিন একখানা পত্র পাইলাম। আনন্দে অধীর হইয়া পত্র খুলিলাম। পড়িয়া বজ্রাহত হইলাম। আমি তাঁহার পরিণীতা পত্নী নহি। যে বিবাহ দিয়াছিল সে পুরোহিত নহে,— তাঁহারই এক বন্ধু,—বিবাহ অসিদ্ধ। তিনি পূর্ব্বেই কোন জমীদারের একমাত্র সন্তানের পাণিগ্রহণ করিয়া জমীদার ভবনেই বাস করিতেন। শ্বশুরের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে এই দুই বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পত্রে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে আমাকে তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না—মধ্যে মধ্যে আমাকে দর্শন দিবেন। এবং আমাদের মাতা পুত্রের ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যয় ভার তাঁহার। পত্রে কিছু অর্থ ছিল। পত্র পড়িয়া বজ্রাহত হইলাম। আমার সমস্ত গর্ব্ব, আনন্দ, সমস্ত আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইল।

শ্রান্তি বোধ করিতেছ কি? না শেষ পর্য্যন্ত শুনিবে? ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে? আচ্ছা তবে শোন,—

পত্র পাইয়া রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত প্রায় হইলাম। তাহাকে ও তাহার পত্নীকে অভিশাপ দিয়া তখনই পত্রের উত্তর দিলাম। তাহার প্রেরিত অর্থ ফিরাইয়া দিয়া জানাইলাম ভবিষ্যতে আর অর্থ প্রেরণ করিয়া বা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া যেন সে আমার অবমাননা না করে।

এক মাস পরে শরতের এক নির্ম্মল প্রভাতে এক শুভ্রবসনা করুণাময়ী রমণী মূর্ত্তি আমার কুটিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা মাতা পুত্রে তখন রোগ শয্যায়, জীবনের আশা মাত্র নাই। সেই করুণাময়ী তাঁহার সমস্ত করুণা ঢালিয়া দিয়া আমাদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম,—"দিদি, তুমি যেই হও এই ঘৃণিতার জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও না— আমার মরণই শ্রেয়!"

আমার হাত দুটি ধরিয়া, কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—

"ভগিনি! মৃত্যু কামনা করা মহাপাপ! দয়াময়ের এই বিপুল বিশ্বে কাহারও জীবন ঘৃণিত নহে। প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সকলকেই তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান দেন।"

এ কি আশার বাণী শুনিলাম! আমার সমস্ত শরীর মন শীতল হইয়া গেল! পাপী তাপী সকলকেই তিনি তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান দেন! তবে আর মৃত্যুকামনা করিব কেন?

তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম "দিদি! তুমি কে? দেবীর মত এই অভাগিনীর কুটিরে কোথা হইতে আগমন করিলে?" মুখ নত করিয়া বিষণ্ণ বদনে তিনি বলিলেন—

"দেবী নই তোমারই মত দুর্ভাগিনী নারী আমি। যাইবার পূর্ব্বে পরিচয় দিব আজ নহে।"

আমরা রোগমুক্ত হইলে তিনি যেদিন বিদায় প্রার্থনা করিলেন, আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলান "দিদি! পরিচয় দিবে বলিয়াছিলে।"

তিনি বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে সজল নয়নে বলিলেন, "ভগিনি! তোমার পুত্রের পিতা যিনি আমি তাঁহারই দাসী ছিলাম।"

আমার মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত! নারীহৃদয় এত মহান! তিনি উচ্চে আর আমি কত নীচে! যাহার চরণ ধূলারও যোগ্য নই তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছি! আমার অভিশাপেই আজ এই করুণাময়ী শুভ্রবসনধারিণী! আমি যাহাকে ক্ষমা করিতে পারি নাই সেই অপরাধী স্বামীকে তো তিনি ক্ষমা করিয়াছেন! শুধু তাই নহে স্বামীর অপরাধের বোঝা আপন স্কন্ধে বহিয়া লইয়াছেন।

আমি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম,—"দেবি! আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল—চিরজীবন তোমার সেবা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

তিনি আমাকে গৃহে আনিয়া ভগিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! কিন্তু পুণ্যাত্মা সতীলক্ষ্মী বেশী দিন এ পাপ পৃথিবীতে থাকিবেন কেন? এক বৎসর যাইতে না

যাইতে তিনি বৈধব্য যন্ত্রণা এড়াইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আমার জীবনের কাহিনী শুনিলে তো? এখন যাও—আমার পূজার ব্যাঘাত হইতেছে। যে কখনও পুরুষের প্রণয় কি তাহা জানে নাই, তাহাকে হৃদয়ের পূজা প্রাণের প্রেম সমর্পণ কর গিয়া, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থের কাঙ্গালিনীও নহি! ঐ যে দাসদাসীপরিপূর্ণ বৃহৎ অট্টালিকা, ফলফুলে শোভিত সুন্দর উদ্যান, পুষ্প বৃক্ষ বেষ্টিত, মর্ম্মরবেদীশোভিত দীর্ঘিকা দেখিতেছ,—ঐ সকল কাহার জান? ঐ সকল আমার ও আমার পুত্রের। দেবী তাঁহার বিষয় সম্পত্তি আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য আমাকে সুখদানে অক্ষম।

এই যে স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিতেছ,—ইহা তাঁহারই স্বর্ণমূর্ত্তি, তাঁহার চিতাপার্শ্বে স্থাপন করিয়াছি। নিত্য দুই সন্ধ্যা এই মূর্ত্তি পূজা করিয়া, এই চিতা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া পরম শান্তি লাভ করি। আর এই যে ক্ষুদ্র কুটির দেখিতেছ, ইহাতেই আমি বাস করি। এই স্থানই আমার শান্তি নিকেতন।

শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী।

দান

সুযশ তব ভুবন হতে গগন নে'ছে হরি,
কীর্ত্তি তোমার বসুমতীর অঙ্গ নিল ভরি,
সুদূর হতে শ্রবণ-পথে পশিল তব নাম,
অনেক আশে তোমার পাশে এসেছি যশধাম।
ত্রিপদ ভূমি আমারে তুমি দিবে কি মহারাজ?
আশীষ করে ফিরিবে ঘরে দ্বিজের সুত আজ।
ইহার সাথে চাহিছ দিতে রত্ন শত দান,
তুষ্ট হ'নু ধন্য তুমি মহৎ তব প্রাণ।
আসন করে পূজার তরে বসিতে চাহি ঠাঁই,
—ব্রাহ্মণের প্রয়োজনের অধিক নিতে নাই।
চরণ মম ক্ষুদ্রতম তাহাতে কিবা ফল,
বৃহৎ হবে ইহাই যদি দানের থাকে বল!

হে রাজা! যদি সময় চাহ—ক্ষান্ত রহ আজ,
দুঃখ নাহি প্রদানে পরে, ভাবিয়া-করা-কাজ;
দ্বিপদে মম পূর্ণ হোল স্বর্গ বসুমতি
তৃতীয় পদ কোথায় রাখি দেখাও মহীপতি!
তৃতীয় পদ হেরিতে চাহ? নাভিতে হে'র অই,
কোথায় তুমি রহিবে যদি পাতালও আমি নই,
ধন্য তুমি, মহৎ প্রাণ ধন্য দানবীর!
ধন্য হোল চরণ মম পরশি পূত শির,
ভক্তি ডোরে বন্দী করে রাখিলে মোরে রাজা
দণ্ড তব লইনু মানি—আসিয়া দিতে সাজা।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

রাগ ও অনুরাগ

ডাগর ডাগর আঁখি, গাল ঘন লাল.
ক্রোধভরে বধূ বলে, বাড়ী যাব কাল।

খুচ্‌কি হাসিয়া ধীরে কহিলেন স্বামী
বিষাদে শ্বশুরালয়ে চলে যাব আমি!

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংক্রামকতা প্রতিষেধের বিশেষ বিধি।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য যে সকল বিশেষ বিধির প্রতিপালন আবশ্যক, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিধির উল্লেখ থাকিলেও একত্রে সন্নিবিষ্ট হইলে সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, এই বিবেচনায় তাহাদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথার পুনরুল্লেখ করা হইল।

কলেরা (Cholera)—১। কলেরা মহামারী-রূপে আবির্ভূত হইলে পেটের অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একবার মাত্র পাতলা দাস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ জল-মিশ্রিত সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Dilute Sulphuric acid) ১০ ফোঁটা এবং ক্লোরোডাইন্ (Chlorodyne) বা টিংচার্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাত্রা; বালকদিগকে বয়সের প্রতি বৎসর হিসাবে আধ ফোঁটা করিয়া উক্ত দুইটী ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তবে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালককে অহিফেন সেবন করিতে দিবে না। প্রয়োজন হইলে অগ্রে ঔষধ সেবন করাইয়া পরে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে।

২। বিকৃত বা দুষ্পাচ্য খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এ সময়ে কোন খাদ্য-দ্রব্য (যেমন ফলমূলাদি) কাঁচা অবস্থায় না খাওয়াই ভাল। তরকারি, মাছ, যাহা কিছু বাজার হইতে আসিবে, পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে উহাদিগকে কুটিতে দিবে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ভক্ষণ করিবে। বাজারের মিষ্টান্ন এ সময়ে ব্যবহার না করাই মঙ্গল। সকল খাদ্য-সামগ্রী এরূপ ভাবে রাখিবে যে তাহাদিগের উপর মাছি বসিতে না পারে।

৩। পানীয় জল ও দুগ্ধ ১৫ মিনিট কাল উত্তম রূপে ফুটাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে, যাহাতে তন্মধ্যে কোন মতে ধূলি পড়িতে বা মাছি বসিতে না পারে। যে জলে মুখ ধুইবে, তাহাও যেন ফুটাইয়া লওয়া হয়। ফিল্টারের উপর এ সময়ে বিশ্বাস করিবে না। তৈজসপত্র সংস্কৃত হইবার পর উহাদিগকে ফুটন্ত জলে পুনরায় ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে।

৪। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কলেরা রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা করিলে কলেরা রোগ হয় না। রোগীর বমি ও মলের মধ্যে ঐ রোগের বীজ অবস্থিতি করে; উহারা কোন রূপে খাদ্য

বা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই রোগে মল ও বমির সহিত তৎক্ষণাৎ কোনরূপ বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহাকে শুষ্ক খড় বা করাতের গুঁড়ার উপর ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য বিশোধক ঔষধের অভাবে উহার সহিত চুণ মিশ্রিত করিয়া কলিকাতা সহরের ন্যায় সে সকল স্থানে বদ্ধ ড্রেন্ আছে, তন্মধ্যে উহা ফেলিয়া দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তবে খোলা ড্রেন্, কাঁচা নর্দ্দামা বা জমির উপর ফেলিয়া দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। রোগীর মলস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি একদিন বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া একঘণ্টা কাল জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে উহারা নির্দ্দোষ হইয়া যায়। বিশোধক ঔষধে ভিজাইবার পর সাবান জলে কাচিয়া লইলেও উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে জলে ফুটাইয়া লইলেই এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। এই সকল বস্ত্রাদি কোন পুষ্করিণীর জলে কাচা উচিত নহে। পল্লীগ্রামে বাটী হইতে বহুদূরে মাঠের মধ্যে গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে সংক্রামক রোগের মলমূত্রাদি প্রোথিত করা যাইতে পারে। তবে নিকটে কোন জলাশয় থাকিলে এরূপ ব্যবস্থায় অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে খড়ের উপর মলমূত্রাদি ঢালিয়া পুড়াইবার দিবার যে ব্যবস্থার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজ-সাধ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্।

৫। যাঁহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিবেন অথবা সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা যেন বিশোধক ঔষধ ও সাবান জলে হা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কোন খাদ্য পানীয় গ্রহণ বা স্পর্শ করেন। রোগী গৃহের মধ্যে কোনরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য বা পা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমি জা যে একজন ডাক্তার কলেরা রোগী দে হাত না ধুইয়া সেই হাতে পান খাই ছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ঐ রো আক্রান্ত হন এবং অনেক কষ্টে তাঁ প্রাণ-রক্ষা হইয়াছিল। যাঁহারা রো পরিবার-ভুক্ত নহেন, তাঁহাদিগের, রো বাটীতে কোনমতেই জল পান বা কোন খা গ্রহণ করা উচিত নহে। যাঁহারা পরিবা ভুক্ত, তাঁহারা রোগীর গৃহ হইতে বা হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া, পরি স্থানে অত্যুষ্ণ জলে ধৌত বাসনে প গ্রহণ করিবেন।

৬। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় "খা পেটে" থাকা উচিত নহে। আমাদে পাকস্থলীতে (Stomach) যে গ্যাষ্ট্রিক (Gastric Juice) নামক অম্লগুণ-স পাচক রস নির্গত হয়, কলেরার বী উহার সংস্পর্শে আসিলে শীঘ্র মরিয়া যা "খালি পেটে" থাকিলে এই রস নিঃসৃ হয় না, কিছু খাদ্য ভক্ষণ করিলেই ঐ র নিঃসারিত হইতে থাকে। সুতরাং তখ ঘটনাক্রমে দুই দশটা কলেরার বীজ উদরে মধ্যে প্রবেশ করিলেও অম্লরস-সংযোগে উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পেট খা থাকিলে ঐ সকল বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের (Small Intestine) ম গমন করে এবং তথায় অনুকূল কার

যোগে উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া রোগ ংপন্ন হয়।

৭। বাটীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে কোনরূপ বর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিতে দিবে না। ইহাতে ছির উপদ্রব হয় এবং মাছি দ্বারা লেরার বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে রিবাহিত ও খাদ্য-দ্রব্যে সংলিপ্ত হইয়া কে।

৮। পয়ঃপ্রণালী, পাইখানা প্রভৃতি স্থান র্ব্বদা ফেনাইল্ দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত াখিবে।

৯। শরীর ও মন সর্ব্বদা সচ্ছন্দ ও ফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে। কলেরা াগীর সেবা করিবার প্রয়োজন হইলে লেরা রোগকে কখন ভয় করিবে না। রোগ বারণের জন্য যে স্বাভাবিক শক্তি আমাদের রীরে নিহিত আছে, শরীর ও মনের বসন্নতা হেতু তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়, তরাং এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

১০। অনেক সময়ে সোডা ওয়াটর্, লমনেড্ প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য দূষিত জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল পানীয় গ্রহণ করিয়া সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বিশ্বস্ত কারখানায় প্রস্তুত হইলে এই সকল পানীয় গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই—তাহা না হইলে এ সময়ে এই শ্রেণীর পানীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক সময়ে অপরিস্কৃত জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ সময়ে বরফ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

১১। কলেরার "টিকা" (Inoculation) লইলে কিছু দিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। ইহাতে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না, সুতরাং মহামারীর সময়ে যাহারা কলেরা রোগীর সংস্রবে আসিবে, অথবা বাটীর মধ্যে কলেরা রোগের আবির্ভাব হইলে সেই পরিবারস্থ লোকেরা, "টিকা" গ্রহণ করিলে, আত্মরক্ষা সম্পাদন ও রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ, উভয় বিষয়েই সুফল লাভ হইতে পারে।

টাইফয়েড্ জ্বর (Typhoid fever)—১। কলেরার ন্যায় টাইফয়েড্ জ্বরেও মল এবং মূত্রের সহিত রোগের বীজ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং কলেরার ন্যায় এই রোগেও মলমূত্রাদির সংক্রামকতা দোষ বিশোধক ঔষধের দ্বারা নষ্ট করিয়া উহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই রোগের পরিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সংক্রামকতা-দুষ্ট জল বা দুগ্ধ পান করিয়াই এই রোগের বিস্তার সংঘটিত হয়, সুতরাং কলেরা রোগে যেমন পানীয় জল, দুগ্ধ প্রভৃতি উত্তমরূপে ফুটাইয়া পান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য। অনেক সময়ে অবিরাম জ্বর হইলে উহা টাইফয়েড্ জ্বর কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা চিকিৎসকের পক্ষেও দুরূহ হইয়া উঠে। অধুনা রক্ত-পরীক্ষা দ্বারা কোন জ্বর প্রকৃত টাইফয়েড্ জ্বর কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে। যাহা হউক, দুই তিন সপ্তাহ স্থায়ী অবিরাম জ্বর হইলেই উহাকে টাইফয়েড্ জ্বর মনে করিয়া উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা

প্রতিপালন করিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না।

২। জ্বর ভাল হইয়া গেলেও কিছু দিন রোগীর মল মূত্রের মধ্যে, এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আরোগ্য হইবার পরেও উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

রক্ত-আমাশয় (Dysentery)—১। এই রোগের বীজ মলের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। বালকবালিকাদিগের রক্ত-আমাশয় রোগ হইলে উহাদিগের মল যথাতথা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং নানা কারণে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় জল উহাদ্বারা দূষিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে রক্ত-আমাশয় সংক্রামক নহে এবং তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই রোগ সম্বন্ধে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন না। কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর সম্বন্ধে মলাদি বিশোধন করিবার এবং পানীয় জল, খাদ্য প্রভৃতি বিশুদ্ধ অবস্থায় গ্রহণ করিবার যে সকল ব্যবস্থাপালন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই রোগ সম্বন্ধেও সেই সকল প্রযোজ্য।

যক্ষ্মা (Phthisis)—১। রোগীকে সর্ব্বদা খোলা জায়গায় রাখিবে। দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া খোলা বারাণ্ডায় বা দালানে রাত্রিকালে শয়নের ব্যবস্থা করিবে এবং দিবাভাগে বাটীর বাহিরে ছায়াযুক্ত মুক্ত স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। [illegible] ঘরের মধ্যে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে।

২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর পরিত্যক্ত কফের সহিত নির্গত হয়। রোগী যথা তথা কফ ফেলিলে উহা শুষ্ক হইয়া ধূলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং রোগ-বীজ-মিশ্রিত ধূলি উড়িয়া নিশ্বাসের সহিত অপরের ফুস্ফুসে অথবা খাদ্যদ্রব্যের সহিত অপরের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এজন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বিশোধক ঔষধ রাখিয়া তন্মধ্যে কফ পরিত্যাগ করা উচিত এবং উহা ভূমিতে না ফেলিয়া ড্রেনের মধ্যে অথবা গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পুতিয়া ফেলিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কফ মুছিবার জন্য যে সকল বস্ত্রখণ্ড রোগী ব্যবহার করিবে, তাহা বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে [illegible] করিয়া ফেলিবে। খবরের কাগজের উপর কফ ফেলিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিলে এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তি কখনই এক বিছানায় শয়ন করিবে না। নিতান্ত অসুবিধা না হইলে রোগীর সহিত এক ঘরেও রাত্রি যাপন করিবে না।

৪। মানুষের ন্যায় গোরুরও যক্ষ্মা হইয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত গোরুর দুগ্ধ পান করিয়া মানুষের যক্ষ্মা হইতে পারে, ইহা অনেকানেক খ্যাতনামা চিকিৎসক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যক্ষ্মাগ্রস্ত দুগ্ধবতী গাভীর বাঁটে ঐ রোগের গুটী অবস্থিত থাকে; দুগ্ধ দোহন করিবার

[illegible]য় গুটী হইতে রোগের বীজ দুগ্ধের সহিত [illegible]শ্রিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্য দুগ্ধবতী [illegible]ভীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্য [illegible]র্ত্তব্য। কলিকাতায় অধিকাংশ লোকেই [illegible]য়ালার দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন; [illegible]তরাং গাভীর স্বাস্থ্যের অবস্থা তাঁহাদের [illegible]নিবার সুবিধা হয় না। যদি দুগ্ধের মধ্যে [illegible]ক্ষ্মার বীজ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে [illegible]হাকে ১৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া লইলেই [illegible]উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব বাজারের [illegible]দুধ একবার উথলিয়া উঠিলেই উহাকে [illegible]নামাইবে না, কিছুক্ষণ উহাকে ফুটিতে দিলে [illegible]উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে।

৫। অনেক সময়ে মাছি দ্বারা এই [illegible]রোগের বীজ খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হইয়া [illegible]থাকে; উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিলে রোগ [illegible]উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং খাদ্য-[illegible]সামগ্রীতে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, [illegible]তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৬। যক্ষ্মা-রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক স্থানে এক সঙ্গে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ। যে সকল ভোজন-পাত্র যক্ষ্মা-রোগী দ্বারা ব্যবহৃত হইবে, তাহা বিশোধক ঔষধ ও উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে। যক্ষ্মা-রোগীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য বা পানীয় অপর কাহারও গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ।

৭। যক্ষ্মা পীড়িতা মাতা শিশু সন্তানকে স্তনপান করাইবেন না। ইহাতে মাতার শরীর শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রুগ্না মাতার দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

৮। পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যাহার যক্ষ্মার সূত্র-পাত হইয়াছে, তাহার বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যক্ষ্মারোগী বিবাহ করিলে তাহার স্বাস্থ্য শীঘ্র ভগ্ন হয় এবং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে! এতদ্ব্যতীত যক্ষ্মারোগীর সন্তান-সন্ততির মধ্যেও ঐ রোগ-প্রবণতা অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও ব্যাধিযুক্তা কন্যার বিবাহ দিলে যে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একত্র সহবাসের জন্য স্ত্রী হইতে স্বামীর বা স্বামী হইতে স্ত্রীর শরীরে যক্ষ্মারোগের সূত্র-পাত হইবার ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে।

ডিপথিরিয়া (Diptheria)—১। যাঁহারা ঐ রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের মুখ বা চোখের মধ্যে রোগীর থুথু বা কফ যাহাতে না প্রবেশ করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই রোগের বীজ কাশিবার সময় রোগীর গলা হইতে কফের সহিত নিঃসৃত হয়। যদি কোন প্রকারে রোগ-বীজ মিশ্রিত কফ সুস্থব্যক্তির চোখে বা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২। এই রোগে রোগীর গলার মধ্যে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হয় এবং ঔষধ লাগাইবার সময়ে রোগী অত্যন্ত কাশিতে থাকে। যিনি ঔষধ লাগাইবেন, তিনি যেন একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা নিজ নাসিকা ও মুখ আবদ্ধ করিয়া গলায় ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করেন, নতুবা ঐ সময়ে তাঁহার

মুখের মধ্যে রোগের বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৩। যে ঘরে রোগী থাকিবে, তাহার সন্নিকটে ছোট ছেলেমেয়েদের কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে। সুস্থ বালক-বালিকাগণকে বাটী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়।

৪। গৃহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। রোগীর গৃহ কখনই বদ্ধ রাখিবে না, কারণ এই রোগের বীজ নিশ্বাস দ্বারা বায়ু মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বায়ুকে দূষিত করে।

৫। ড্রেনের গ্যাস্ যাহাতে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে দূষিত না করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অনেকে অনুমান করেন যে ড্রেন হইতে উত্থিত গ্যাসের মধ্যে এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে।

৬। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের সংস্পর্শ হইতে মনুষ্য শরীরে রোগ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা।

প্লেগ্ (Plague)—১। বাটীর সর্ব্বত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্নাবস্থায় রাখিবে। যাহাতে বাটীর প্রত্যেক গৃহে সমস্ত দিন যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। অব্যবহার্য্য সামগ্রী ও আবর্জ্জনাদি বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে এবং গৃহের মধ্যে ইঁদুরের গর্ত্ত থাকিলে উহা ইট ও সিমেণ্ট্ মাটী দ্বারা শক্ত করিয়া বুজাইয়া দিবে। ইঁদুর মারিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সাধন করিতে বিলম্ব বা আলস্য প্রদর্শন করিবে না।

২। মানুষের প্লেগ্ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরে প্লেগ্ হইতে দেখা যায়। যখন দেখিবে বিনা কারণে বাটীতে ইঁদুর মরিতেছে, তখনই বুঝিবে যে উহারা প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে এবং সমস্ত বাসগৃহ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া ও চুণ ফিরাইয়া সমস্ত দরজা জানালা কিছু দিনের জন্য খুলিয়া রাখিলে পর তবে উহা পুনরায় বাসের যোগ্য হইবে। বাটীতে ইঁদুর মরিতে আরম্ভ হইলে ফাঁকা জায়গায় চালা বাঁধিয়া কয়েক দিন বাস করিলে পরিবারস্থ কাহারো প্লেগ্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু এরূপ অবস্থায় বিলম্ব করিয়া বাটীত্যাগ করিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে।

৩। মৃত ইঁদুর কখনই হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না। অজ্ঞতাবশতঃ মৃত ইঁদুর স্পর্শ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের প্লেগ্ রোগ হইয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে। মৃত ইঁদুর চিম্‌টার দ্বারা ধরিয়া ফাঁকা যায়গায় খড়ের উপর কেরোসিন্ তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। মৃত ইঁদুর কখনই রাস্তা ঘাটে ফেলিয়া দিবে না। যে স্থানে মৃত ইঁদুরের দেহ পতিত থাকে, তাহা ফেনাইল্ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে।

৪। প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিতে বা তাহার সেবা করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত যে সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন, প্লেগ্ সম্বন্ধেও তাহাই প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে লোকের

ধারণা ছিল যে প্লেগ্ রোগীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে অথবা উহাকে স্পর্শ করিলেই, প্লেগ্ হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য বাটিতে কাহারো প্লেগ্ হইলে নিতান্ত আপনার লোক ব্যতীত অপর সকলেই তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিত। এমন কি, মহামারীর প্রথমাবস্থায় অনেক স্থলে কোন কোন চিকিৎসককেও রোগীর চিকিৎসা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতে দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এই ভ্রান্ত ধারণা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ স্থলেই ইঁদুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা মনুষ্য শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইয়া থাকে; প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ না করাই উচিত এবং প্লেগ্ রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষার সময়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে যাহাতে কোনরূপ ক্ষত না হয় বা আঁচড় না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্লেগ্ রোগীর নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে উহার থুথু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এই উপায়ে রোগী হইতে চিকিৎসকের শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইবার ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। নিউমোনিয়াগ্রস্ত প্লেগ্ রোগীর নিশ্বাস ও কফ দ্বারা এই রোগের বীজ বায়ুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পর অন্ততঃ ১ মাস কাল তাহার পৃথক্ গৃহে বাস করা এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে না আসাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, রোগারোগ্যের পর ১০ দিন তাঁহাদের পৃথক্ হইয়া থাকিলে ভাল হয়।

৬। যে সকল স্থানে প্লেগ্ হইতেছে, তথা হইতে আনীত বস্ত্র, শয্যা, পুস্তক বা শস্য রাখিবার থলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। যে পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা এই সকল সামগ্রী দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে।

৭। প্লেগের সময়ে পায়ে মোজা ও জুতা দেওয়া থাকিলে অনেক সময়ে উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য প্লেগের সময়ে কাহারও খালি পায়ে থাকা উচিত নহে।

৮। যাঁহারা প্লেগাক্রান্ত স্থানে থাকিবেন অথবা প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা প্লেগের "টিকা" লইলে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময়ে এক প্রকার নিরাপদ্ থাকিতে পারিবেন। যদিও প্লেগের টিকার রোগনিবারিণীশক্তি অধিক দিন স্থায়ী নহে, তথাপি উহা দ্বারা সেই সময়ের মত আত্মরক্ষা করিতে এবং রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিতে পারা যায়। সুব্যবস্থা পূর্ব্বক এই টীকা লইলে কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ যাঁহারা টিকা লইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ রোগে আক্রান্ত হন না অথবা আক্রান্ত হইলেও সহজে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

সুতরাং প্লেগের টিকা যে সময়োপযোগী ও উপকারী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা ইহার রক্ষণীশক্তি নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। প্লেগের টিকা লইতে সাধারণ লোকে অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

হাম, বসন্ত ইত্যাদি—১। এই সকল রোগ স্পর্শ দ্বারা, অথবা বস্ত্র, শয্যা বা বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও (বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের) কদাচ রোগীর গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে অথবা রোগীর বস্ত্র বা শয্যাদির সংস্পর্শে আসা অকর্ত্তব্য। বাটীতে এই সকল রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সুস্থ বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাঁহারা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা একখানি মোটা চাদর গায়ে মুড়ি দিয়া গৃহের মধ্যে যাইবেন এবং বাহিরে যাইবার সময় ঐ চাদরখানি রোগীর গৃহের বাহিরে রাখিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় হস্তপদ সাবান জলে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত নহে।

২। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে সাবান ও ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে কাচিয়া ধোপার বাটীতে পাঠাইবে, নচেৎ সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। এই সকল রোগ ধোপার বাটীর কাপড় দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে যতদিন না রোগী আরোগ্য লাভ করে, ততদিন ধোপার বাটীতে কাপড় দেওয়া, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং পরিবারস্থ কাহারো কোন স্থানে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গমন করা নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি অনেকাংশে নিবারিত হইত। কিন্তু বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে এই প্রাচীন প্রথার উপকারিতা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়।

৩। যে পরিবারের মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ দেখা দিবে, সেই বাটীর বালক বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই বিষয়ের অনবধানতায় প্রযুক্ত বিদ্যালয় হইতে অনেক সময়ে হাম, পানবসন্ত প্রভৃতি রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। যে বাটীতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, সেই পরিবারের সকলেরই টিকা (Vaccination) লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাটীর মধ্যে যদি ১ মাসের শিশুসন্তানও থাকে, তথাপি তাহারও সেই সময়ে টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে টিকা হইয়াছে বলিয়া এ সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ উচিত নহে। যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে, তাহারা, এমন কি, প্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত টিকা লইলে, রোগের পরিব্যাপ্তি সবিশেষ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। এই সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে থাকে, তখনই উহাদিগের সংক্রামকতা দোষ প্রবল ও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে

থাকে। অতএব সেই সময়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর গৃহের নানা দরজায় কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত পর্দ্দা খাটাইয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর গাত্রে সর্ব্বদা কার্ব্বলিক্ তৈল (১ ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্ ও ৯ভাগ নারিকেল তৈল) উত্তমরূপে লাগাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, শরীরের ব্রণ-ক্ষতাদি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ক্ষতাদির দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রোগবীজও নষ্ট হয়, 'ছাল' দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া বায়ুসাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না এবং ঘায়ে মাছি বসিতে পারে না, সুতরাং রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। রোগ-আরোগ্য হইলে যতদিন না সমস্ত "ছাল" উঠিয়া যায়, ততদিন রোগীকে সুস্থব্যক্তির সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। কয়েক দিন স্নান করিবার পর সুস্থব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৭। বস্ত্র, শয্যাদি, রোগীর গৃহ ও গৃহসজ্জা পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে উত্তমরূপে বিশোধন না করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia)—ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা শৃগালের মুখের লালার মধ্যে এই রোগের বীজ অবস্থিতি করে। দংশন কালে উহা ক্ষত মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পথ দিয়া মস্তিষ্কের দিকে মৃদুগতিতে পরিচালিত হয় এবং অল্পাধিক কাল ব্যবধানে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া ভীষণ রোগলক্ষণ প্রকাশ করে। এই রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশিত হইলে মৃত্যু সুনিশ্চয়—এই রোগ কখন নীরোগ হইতে দেখা যায় নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে বানর, বিড়াল, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগের জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয়; তখন উহাদিগের লালার মধ্যেও ঐ রোগের বিষ বিদ্যমান থাকে এবং তাহারা মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগেরও ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই ভয়ানক রোগের কোন সুচিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, কুক্কুরে কামড়াইলেই জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না; কুক্কুর ক্ষিপ্ত না হইলে এই রোগ জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। পুনশ্চ ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলেই যে জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে অনেক লোককে এক সময়ে দংশন করিলে তাহার বিষ ক্রমে ঝরিয়া যায়, সুতরাং যাহারা প্রথম-দষ্ট হয়, তাহাদেরই ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; যাহাদিগকে পরে কামড়ায়, বিষের অসদ্ভাব হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেক সময়ে উক্ত রোগ প্রকাশ পায় না। বিশেষতঃ দেহ বস্ত্রাদি আবৃত থাকিলে বিষ বস্ত্রের উপর লাগিয়া যায়, দংশন-জনিত ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না, সুতরাং এরূপ স্থলে ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলেও ঐ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয় এইরূপ রোগীর চিকিৎসাদ্বারা দেশীয় ঔষধ বিশেষ আরোগ্য সম্পাদন সম্বন্ধে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রকৃত জলাতঙ্ক রোগ এই ঔষধের দ্বারাই উপশমিত হয় না। লোকে মিথ্যা

আশায় প্রতারিত হইয়া প্রকৃত চিকিৎসার উপায় থাকিতেও উহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র সুচিকিৎসা, স্বনাম-খ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর্ (Pasteur) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা সিমলা শৈলের নিকট কসৌলি নামক স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কন্নুর নামক নগরে গভর্ণমেণ্ট্ সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। একবার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার হয় না, কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই চিকিৎসাধীন থাকিলে ক্ষিপ্ত-কুক্কুর-দংশন-জনিত দেহ-প্রবিষ্ট রোগের বিষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জলাতঙ্ক রোগ একেবারেই প্রকাশ পায় না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা হইলে এই ভীষণ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট্ বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের সাতিশয় কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পুনশ্চ গভর্ণমেণ্ট হীনবস্থ লোকের জন্য কসৌলি যাতায়াতের রেলভাড়া পর্য্যন্ত দিবার এবং তথায় বিনা ব্যয়ে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আহারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ চারি আনা প্রদান করিয়া থাকেন। কসৌলি যাইতে হইলে হাবড়ায় রেলগাড়ীতে উঠিয়া কাল্‌কায় (Kalka) নামিতে হয় এবং তথা হইতে পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা হাত-গাড়ি (Rick-shaw) সাহায্যে ৯ মাইল পথ শৈলারোহণ করিয়া চিকিৎসালয়ে পৌঁছিতে হয়। রাত্রে হাবড়ায় পঞ্জাব মেলে উঠিলে তৎপরদিন রেলে এবং তার পর দিন বেলা ২।৩ টার সময় কসৌলি পৌছান যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্র লোকের তথায় থাকিবার বড় অসুবিধা ছিল, এখন দুই চারিটী বাসা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়কে জানাইলে,

এই সকল বাসাবাড়ী খালি থাকিলে, তিনি তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চাল, ডাল, ঘৃত, আলু, মৎস্য প্রভৃতি সাধারণতঃ যে সকল খাদ্য-দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি, সে সকলই সে স্থানে পাওয়া যায়, তবে চাকর ও রসুইকর ব্রাহ্মণ সেখানে মিলে না, এখান হইতে সঙ্গে না লইয়া গেলে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। শীতকালে সেখানে শীত অধিক হয়, এজন্য ভিতরের ও উপরের গরম কাপড়, জামা ও কম্বলাদি যথা পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। কসৌলি অতি স্বাস্থ্য-প্রদ স্থান, সেখানে অসাবধানতা হেতু ঠাণ্ডা না লাগাইলে কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অতি সহজ। সকল রোগীকেই বেলা দশটার সময় একবার হস্পিটালে যাইতে হয়। সেখানকার সাহেব-ডাক্তার সূচল পিচকারির দ্বারা পেটের ত্বকের মধ্যে একবার মাত্র ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাতে সামান্য সূচ-ফোঁটার অধিক যন্ত্রণা হয় না। দুই একদিন চিকিৎসার পর ছোট ছোট বালকবালিকারাও এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাদের নাম ডাকিলেই আপনাপনি পেটের কাপড় খুলিয়া পিচকারির ঔষধ লইবার জন্য বিনা সঙ্কোচে ডাক্তারের নিকট গমন করে। যে স্থান ফুঁড়িয়া ঔষধ

দেওয়া হয়, তথায় দুই এক দিন অল্প বেদনা থাকে, কিন্তু জ্বরজ্বালা কিছুই হয় না। দুই একদিন পরে রোগী সচ্ছন্দে সকল কার্য্যই করিতে পারে। আমি স্তন্যপায়ী শিশুগণকে এই চিকিৎসাধীন থাকিতে দেখিয়াছি, তাহাদের কোন অসুখ হইতে দেখি নাই। আমি একটী ছয় বৎসরের বালক লইয়া এই চিকিৎসার জন্য কসৌলি গিয়াছিলাম এবং তথায় প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিয়া পাষ্টুর্ মতে চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল বিষয়ই ভালরূপে দেখিবার আমার অবকাশ হইয়াছিল। অনেকে এই চিকিৎসাসম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও স্থানীয় অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন বলিয়া তথায় রোগী লইয়া যাইতে ভয় পাইয়া থাকেন; তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি এস্থলে এই কথাগুলির অবতারণা করিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ হইয়া যায়, তৎপরে রোগী সচ্ছন্দে নামিয়া আসিতে পারেন। যদি দংশন গুরুতর হয়, অথবা মস্তক, মুখ বা মস্তকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দংশন ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে প্রথম প্রথম দুই বেলা ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় এবং চিকিৎসা শেষ হইতে ২। ৪ দিন বেশী সময় লাগে।

এক্ষণে কুক্কুরে দংশন করিলে চিকিৎসার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

১। কুক্কুরে দংশন করিলে উষ্ণ জলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া নাইট্রিক্ এসিড্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Strong Nitric or Carbolic Acid) সরু তুলির সাহায্যে ক্ষত প্রদেশের অভ্যন্তরে ৩।৪ বার প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই সকল ঔষধ লাগাইলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে, কেন না ইহাদিগের প্রয়োগে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সূচল লৌহখণ্ড লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ঐ স্থান পুড়াইয়া দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

২। কিন্তু শুদ্ধ এই ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ২।১ দিনের মধ্যে সুযোগ্য অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা দষ্ট স্থানে যতদূর পর্য্যন্ত দাঁত প্রবেশ করিয়াছে, তত খানি মাংস অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। অস্ত্রজনিত ঘা শুকাইতে দেরী হয় না। দংশনের অব্যবহিত পরে এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে অন্য কোন রূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এই রোগের বিষ কিছু দিন দষ্ট স্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের মাংস তুলিয়া লইলে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

৩। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কুক্কুরে কামড়াইলেই যে জলাতঙ্ক রোগ হইবে, এমন কোন কথা নাই। অধিকাংশ স্থলেই কুক্কুরের ক্ষিপ্ততা থাকে না, সুতরাং কোন চিকিৎসা না হইলেও ঐ ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না। এরূপ স্থলে খরচ পত্র করিয়া কসৌলি যাইয়া চিকিৎসা করিবার কোন আবশ্যকতা হয় না। যে কুক্কুর দংশন করিয়াছে, কামড়াইবার পর ১০ দিন তাহাকে লৌহ-শিকলে আবদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঐ কুক্কুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়

জানিবে যে উহা ক্ষিপ্ত নহে। এরূপ স্থলে কসৌলি যাইয়া পাষ্টুরের মতে চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হয় না, তবে দংশিত স্থান নাইট্রিক্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ প্রয়োগ দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে মৃত কুকুরের মুণ্ডটী বেল্‌গাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠাইবে। তথায় পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে কুকুর ক্ষিপ্ত কি না। কিন্তু এই পরীক্ষা-ফলের অপেক্ষা না করিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব, কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য গমন করিবে। দংশন মস্তকে, মুখে বা শরীরের ঊর্দ্ধভাগে হইলে অতিশয় বিপজ্জনক বলিয়া জানিবে এবং কাল বিলম্ব না করিয়া কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য প্রস্থান করিবে। পদদেশে দংশন হইলে কিছুকাল বিলম্ব লইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ এই রোগের বীজ কিছুদিন ক্ষত স্থানে আবদ্ধ থাকে, তৎপরে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং মস্তক হইতে ক্ষত স্থান যত দূরে অবস্থিত হইবে, ততই রোগের তীক্ষ্ণতার হ্রাস এবং প্রকাশ হইবার বিলম্ব হইয়া থাকে। যাহা হউক, যদি কুকুর ক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, অথবা যে কুকুর কামড়াইয়াছে, তাহার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একদিনও বিলম্ব না করিয়া কসৌলি চলিয়া যাওয়া উচিত।

৪। যে ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়াছে, তাহার নিকট ঐ রোগ সংক্রান্ত কোন গল্প করিবে না। কোনরূপে তাহার মন যাহাতে উত্তেজিত না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যে তাহার হৃদয়ে যাহাতে ভয়ের সঞ্চার না হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। অনেক স্থলে শুদ্ধ ভয় পাইয়া রোগীকে এরূপ উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে যে চিকিৎসক পর্য্যন্ত ঐ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে কুকুর ক্ষিপ্ত নহে এবং রোগের মিথ্যা লক্ষণ ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

(সম্পূর্ণ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

চাউক্-ওয়াইঙ্গ্ পাগোদা

সোয়ে-ডেগন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাগোদা ব্যতীত রেঙ্গুনের নিকটে আরও পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাগোদা আছে। বৎসরে একদিন এই সকল পাগোদার পাদদেশে মেলা বসে এবং সেদিন ব্রহ্মদেশবাসিগণ গো-যান, নৌকা এবং রেলযোগে উৎসবার্থ তথায় সম্মিলিত হয়। উপরোক্ত পাঁচটী পাগোদার মধ্যে চাউক্-ওয়াইঙ্গ্ পাগোদা সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশবাসীদের মধ্যে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

পুরাকালে ইয়ে-গিন্ (১) নামক ক্ষুদ্র নগরের অধিপতির সা সোয়ে বুয়িন্ নামক এক পরম রূপবতী যুবতী কন্যা

(১) জোয়ারের সময় ইরাবতী নদীর স্রোত নগরকে স্পর্শ করিতে পারিত না বলিয়া নগরের নাম ছিল ইয়ে-গিন অর্থাৎ স্রোতঃ-মুক্ত।

ল। বহু যুবক তাহার পাণিপ্রার্থী হইলেও, যুবতী তাহাকেও কোনও প্রকার উৎসাহ প্রদান করিত না। প্রত্যাখ্যাত যুবকগণ নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু কিছুকাল পরে যুবতী এক অপরিচিত সুন্দর যুবককে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। পরিচয় অত্যল্পকাল মধ্যে গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। অবশেষে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। যথা সময়ে যুবতী একটী সন্তান প্রসব করিল। যুবক অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে সূতিকাগৃহে প্রসূতি ও সন্তানের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সুখ বহুদিন স্থায়ী হইল না, কারণ ইতোমধ্যে যুবকের কর্ম্মফলভোগের সময় উপস্থিত হইল। সন্তানজন্মের সপ্তাহকাল মধ্যে একদিন যুবক প্রসূতি ও শিশুকে শুশ্রূষা করিতেছিল। এমন সময় যুবক ক্রমাগত তিন-বার সংজ্ঞাহীন হইয়া আসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল। তখন সহসা অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা একে একে তাহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল, এবং সে বুঝিতে পারিল তাহার কর্ম্মফল ভোগের সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাহার শারীরিক ও মানসিক যাতনা যুবতীর মাতার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। যুবতীর মাতা পুনঃ পুনঃ তাহার আকস্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, যুবক বলিতে লাগিল :—

"ক্ষবি নগরের অনতিদূরবর্ত্তী কোনও গ্রামে পো-টলাবান্ নামক এক বৃদ্ধ ও মে জে নাম্নী তদীয় পত্নী বাস করিত। তাহারা ধীবরবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিত। একদিন বহুমৎস্যসহ একটি জ্যোতির্ম্ময় ডিম্ব তাহাদের জালে পতিত হইল। ডিমটী ধীবরদম্পতি সযত্নে রাখিয়া দিল। কালক্রমে ডিম্ব হইতে একটী কুম্ভীর শাবক নির্গত হইল। তৎকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া কুম্ভীর শাবকের নাম ঙ্গা মো (২) ইয়েইক্ (গগন-ঘনশ্যাম) রাখা হইল। ধীবরদম্পতি কুটীর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় খনন করিয়া তন্মধ্যে শাবকটীকে রাখিয়া দিল। তাহারা সন্তানস্নেহে কুম্ভীর-শাবককে লালন পালন করিতে লাগিল। ক্রমে কুম্ভীর-শাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। ক্ষুদ্র জলাশয়ে এখন আর তাহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। তখন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতে একটী বংশনির্ম্মিত ঘের প্রস্তুত হইল এবং কুম্ভীরশাবককে তথায় স্থানান্তরিত করা হইল। এই ঘের প্রস্তুত করিতে একশত বংশখণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ওয়ং-টইয়া (বংশ-শত) রাখা হইল।

"পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলে কুম্ভীর শাবক বংশ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া মুক্তভাবে নদীজলে বিচরণ করিতে লাগিল। ধীবরদম্পতি তথাপি উহাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিত এবং স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিত।

"একদিন বৃদ্ধ ধীবর খাদ্যদ্রব্য লইয়া কুম্ভীরশাবকের সমীপবর্ত্তী হইলে, কুম্ভীরশাবকের পাশব প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ধীবরকে বধ করিয়া তাহাকে উদরসাৎ করিল। তৎপর সেই অকৃতজ্ঞ কুম্ভীরশাবক ঙ্গা মো ইয়েইক্ তথা হইতে রেঙ্গুন নদীতে গমন করিল। রেঙ্গুন নদীতে তিনটী কুম্ভীরণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কুম্ভীরণীত্রয় ঙ্গা মো ইয়েইক্‌কে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। ঙ্গা মো ইয়েইক্ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাসে নদীমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং নদীর সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিল।

"ঙ্গা মো ইয়েইক্ কুম্ভীর হইলেও কোন পল্লীদেবতার অনুগ্রহে যে কোন জন্তুর রূপ ধারণ করিতে পারিত। যখন সে ইয়ে-গিন নগরের সমীপে উপস্থিত হইল, তখন এক সুন্দর যুবাপুরুষের রূপ ধারণ করিয়া নগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিল। যুবতীর গর্ভে তাহার এক সন্তান জন্মিল—"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া নগরাধিপপত্নী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"বৎস, গল্পটীর সহিত তোমার জীবনের বহুপরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে।"

বিষণ্ণচিত্ত যুবক উত্তর করিল, "মাতঃ, বস্তু ও ব্যক্তি

(২) মো অর্থে আকাশ, বৃষ্টি। সংস্কৃত "মেঘ" শব্দের অপভ্রংশ।

সম্বন্ধীয় ঘটনা-পরম্পরার সাদৃশ্য এ জগতে বিরল নহে।"

"সত্য কথা। যাহা হউক, তোমার গল্প বলিয়া যাও। শেষটা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে।"

যুবক তখন বলিতে লাগিল—

"যখন ঙা মো ইয়েইকের স্ত্রী সূতিকাগৃহে, তখন ডেগন (৩) নগরবাসী মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ তিনবার ঙা মো ইয়েইক্‌কে স্মরণ করিল। প্রতিবার স্মরণমাত্র ঙা মো ইয়েইক্ সংজ্ঞাহীন হইয়া আসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল—"

ভীতিবিজড়িতকণ্ঠে নগরাধিপপত্নী বলিয়া উঠিলেন—

"কি সর্ব্বনাশ! দেখিতেছি এ গল্পের নায়ক স্বয়ং তুমি। কিন্তু উপরোক্ত ডেগনবাসী মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ নামক ব্যক্তিটী কে?"

পূর্ব্ববর্ণিত বুদ্ধ ধীবর অকৃতজ্ঞ কুম্ভীরশাবকের নির্ম্মম করলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন পরজন্মে এই নিদারুণ অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ নিতে পারে। সে ডেগননগরে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিল। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তক্ষঃশীলা নগরে গমন করিয়া "কুম্ভীরকণ্ঠচ্ছেদ" নামক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ডেগনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দৈবক্রমে সে একদা ওয়া-টইয়া গ্রামে গমন করাতে তাহার পূর্ব্বজন্মের কাহিনী স্পষ্টভাবে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সে ঙা মো ইয়েইকের অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল। মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ তিনবার স্বীয় মায়াযষ্টি দ্বারা নদীজলে আঘাত করিয়া ঙা মো ইয়েইক্‌কে তৎসমীপে আহ্বান করিল। তিনবারই ঙা মো ইয়েইক্, যেন অদৃশ্য লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

ঙা মো ইয়েইক্ তদনন্তর তাহার প্রিয়তমা পত্নী ও স্নেহশীলা শ্বশ্রূমাতাকে বলিল যে মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গের আহ্বান পালন করা ব্যতীত তাহার আর গত্যন্তর নাই।

ঙা মো ইয়েইক্ পুনরায় কুম্ভীরের রূপ ধারণ করিয়া মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলে, মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গ জলে ও অর্দ্ধাঙ্গ স্থলে রাখিতে আদেশ করিল এবং তৎপর মন্ত্রবলে তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে ঙা মো ইয়েইকের ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

তদীয় শোকবিহ্বলা পত্নী ও শ্বাশুড়ী তাহার কুম্ভীর-দেহ সমাধিস্থ করিয়া, কর্ম্মফলের সেই নিদারুণ অভিনয় স্থানে, এক প্রস্তর স্তূপ স্থাপন করিল। তজ্জন্য অদ্যাপি সেই স্তূপ চাউক্-ওয়াইঙ্গ্ (৪) বা প্রস্তর-বেষ্টিত স্তূপ নামে পরিচিত এবং অদ্যাপি বৎসরে একদিন তথায় এক মেলা বসিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশবাসীদের বিশ্বাস ইয়ে-গিন্ নগরে এখনও ঙা মো ইয়েইকের বংশধরগণ বাস করিতেছে এবং হরিদ্রা কুম্ভীর জাতির অপ্রিয় বলিয়া, অদ্যাপি তাহারা হরিদ্রা ব্যবহার করে না।

এক সময়ে ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র "ঙা-মো-ইয়েইক্—মা-সোয়ে-বুইন" নামক নাটকের অভিনয় হইত। পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে ব্রহ্মদেশবাসীগণের যে কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস এই গল্পটি তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস।

---

(৩) ডেগন রেঙ্গুনের প্রাচীন নাম। এজন্যই রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ পাগোদার নাম সোয়ে (স্বর্ণ) ডেগন-পাগোদা।

(৪) অনেকে এই পাগোদাকে "চাইক্-ওয়াইঙ্গ্" পাগোদা বলে। তেলেঙ্গ্ ভাষায় চাইক্ অর্থে পাগোদা। সুতরাং "চাইক্-ওয়াইঙ্গ্" অর্থাৎ পাগোদা।

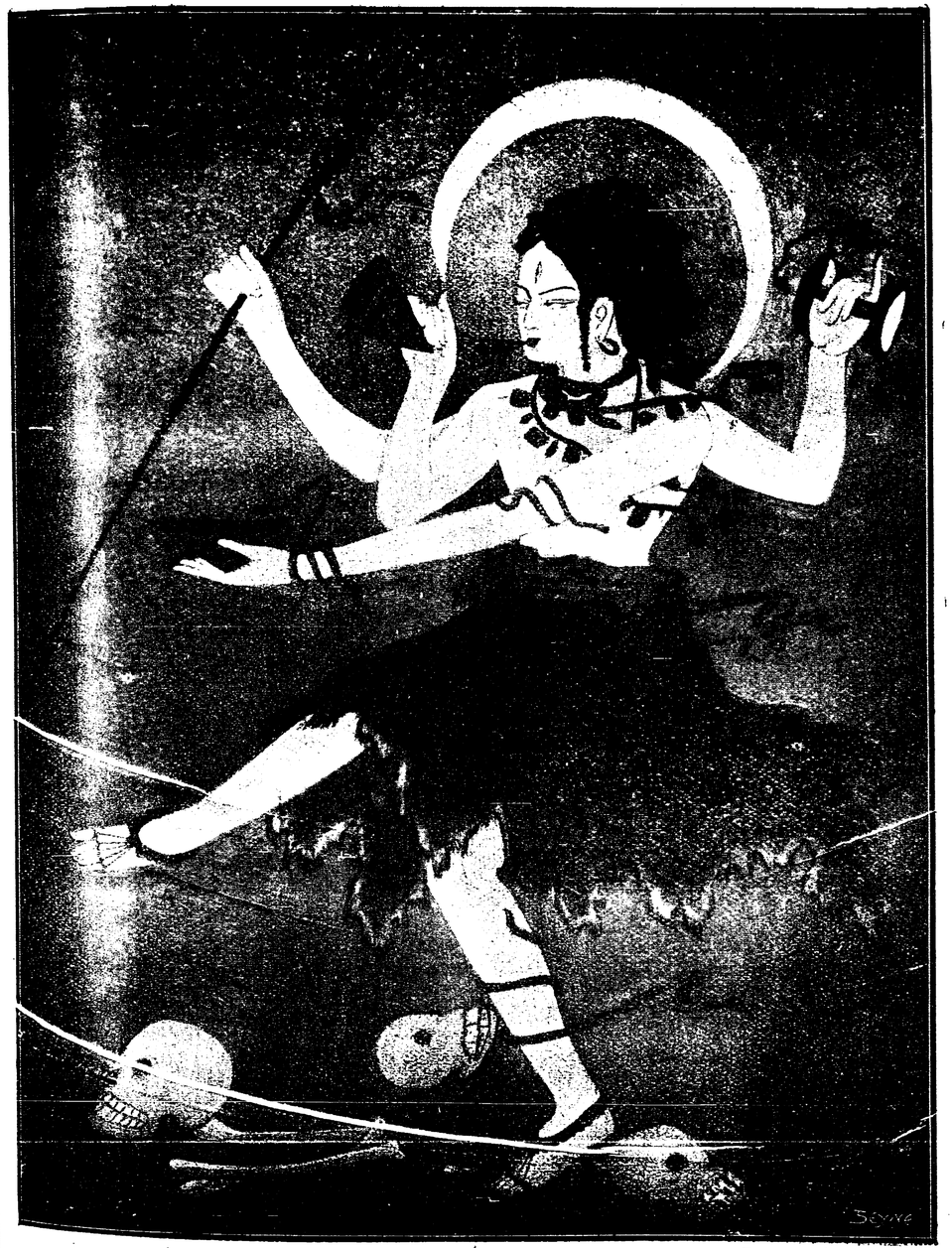

তাণ্ডব-নৃত্য

(১২)

মারাঠাদেশ (দক্ষিণ) ও মারাঠী

গুজরাটের চেয়ে মারাঠাদেশের সঙ্গে আমার সমধিক পরিচয়। আমার সর্ব্বিসের প্রথম ভাগ গুজরাটে কাটানো যায়, অবশিষ্ট ভাগ সিন্ধুদেশ, কানাড়া, কোঙ্কণ ও দক্ষিণে অতিবাহিত হয়। পুণা, আহমদনগর, নাসিক, ধূলিয়া, সোলাপুর, সাতারা এই সকল প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত, কোর্টের ভাষা মারাঠী।

পুণা

পুণানগরী মুলা ও মুটা, এই দুই নদীর সঙ্গমে সংস্থাপিত, এই পুণ্যসঙ্গমে পুণার বিশেষ মাহাত্ম্য। একটি বাঁধ বেঁধে স্রোতের জল আট্‌কে রাখা হয়েছে, তাই নদী দুটি এ অঞ্চলের আর আর নদীর মত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় না, বারমাস পূর্ণ থাকে। বর্ষায় বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জল উথলে পড়ে, দেখতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুন্দর দেখায়। বাঁধের ধারে ছোটখাট একটি সুন্দর বাগান পুরবাসীদের সান্ধ্য সম্মিলনের স্থান। পুণা পেশওয়াদের রাজধানী ছিল, সেই প্রাচীন পেশওয়াই ভাগ সহরের অভ্যন্তরে। সেকালের কতকগুলি ইমারতের মধ্যে আসল যে রাজবাটী (বুধবার বাড়া) তা কোন দুরাত্মার কুচক্রে পড়ে পুড়ে গিয়েছে—ঐ ভাগের আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাতে পুরাণো পেশওয়াই গৌরবের কোন চিহ্ন নেই। প্রশস্ত পথ ঘাট, কালেজ জেল হাঁসপাতাল সার্ব্বজনিক সৌধ



মুলা মুঠা সঙ্গম—পুণা

সমন্বিত যে অঞ্চল তাই নব্য পুণা সহর। ইহার প্রান্তবর্ত্তী ঐতিহাসিক ক্ষেত্র খিড়কী ও পার্ব্বতী-মন্দির উল্লেখযোগ্য। খিড়কী এইক্ষণে ইংরাজ-সেনানিবাস। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের মূলে যে সকল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে খিড়কীর যুদ্ধ তার মধ্যে গণনীয়। এই যুদ্ধে পেশওয়ার পতন ও পুণা ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। যে স্থান হতে পেশওয়া বাজিরাও এই শেষ যুদ্ধের বাজী সোৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করছিলেন সে এই পার্ব্বতী-মন্দির। বাজী হেরে পেশওয়ার চির বনবাস!

পুণার বিদ্যামন্দির—ফরগুসন কালেজ

পুণার ভূষণাস্পদ অনেক জিনিস আছে, আর সব ছেড়ে দিলেও এই বিদ্যালয়গুলি তার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ বলা যেতে পারে। পুণায় কালেজ চারিটি—দক্ষিণ, ফরগুসন, কৃষি ও এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ।

দক্ষিণ কালেজ ভারতের অপরাপর ইংরাজি কালেজের ছাঁচে গঠিত, ফরগুসন কালেজই এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ অনেকটা আমাদের বোলপুর বিদ্যালয়ের প্রতিচ্ছবি ব'লে আমার মনে হয়; গুরুকুলে অধ্যয়নের যে উপকারিতা এর ভিতরে তা কতক অংশে লাভ করা যায়। এই কালেজের বিশেষত্ব এই যে, এর যে ২০ জন অধ্যাপক আছেন তাঁরা সবাই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত, অথচ প্রত্যেকে আপনার যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য বেতনেই সন্তুষ্ট। এঁরা সকলেই ২০ বৎসর কাল স্বল্প বেতনে অধ্যাপন কার্য্যে প্রতিশ্রুত। কালেজটি প্রেসিডেন্সির অন্যান্য কালেজের তুলনায় কোন অংশেই হেয় নয়—এর ছাত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৯৫০। অনেকানেক ছাত্র কালেজ

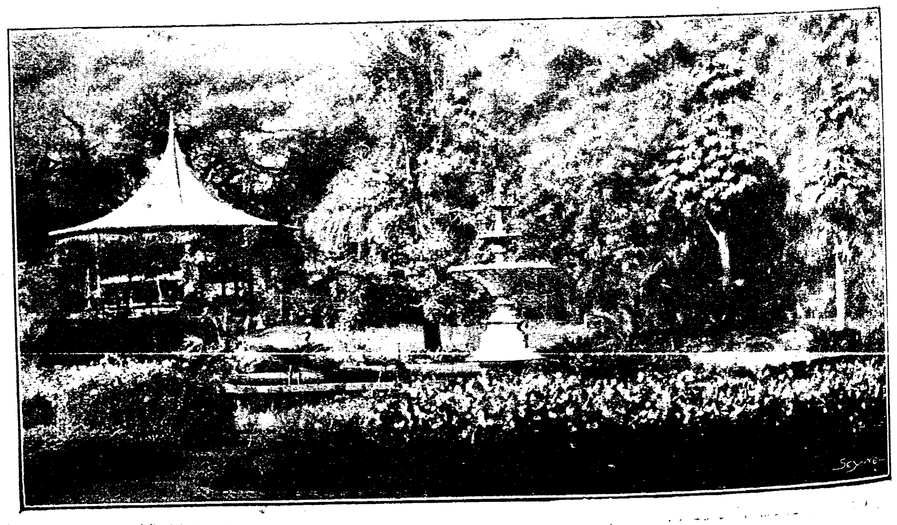

বাঁধ উদ্যান—পুণা

সংলগ্ন হোষ্টেলে বাস করে—অধ্যাপক কানিটকর তাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। আশপাশে ভূমির অভাব নাই। তাতে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার জন্যে ক্রীড়াক্ষেত্র রয়েছে—তা ছাড়া বাকী জায়গায় ছয়জন অধ্যাপকের বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শেখবার জন্যে একটি ছোটখাট বাগান আছে। এই সকল পবিত্র চরিত্র সদ্‌গুরুর সহবাসলাভ বিদ্যার্থীদের সামান্য লাভ নহে। অধ্যাপকদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ কার্য্যকর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ছাত্রগণ যাতে সংযম অভ্যাস করতে পারে, আত্মনির্ভর শিক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে অধ্যাপকদের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। ছাত্রজীবনের যা কিছু প্রয়োজন তা যোগাবার ভার তাদের নিজেদের হাতেই অর্পিত—তাদের আপন আপন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা আপনাদেরই ক'রে নিতে হয়। একটি ব্যায়াম-সভা তাদের হাতে ভালরূপই চলছে। তাদের পুস্তকালয়, পাঠগৃহ তারা নিজেদের ভিতরেই দেখে শুনে পরিচালন করছে। বোলপুর বিদ্যালয়ের কার্য্যব্যবস্থাও কতকটা এইরূপ। Times of India পত্রের পুণার সংবাদদাতা এই কালেজ সম্বন্ধে লিখছেন—

"য়ুরোপে শিক্ষাশাস্ত্রের যেমন উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির আদর্শে ফরগুসন কালেজে শিক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ক্ষুদ্র স্কুল নহে কিন্তু বাস্তবিক একটা বড় কালেজ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করা ইহার লক্ষ্য নহে; কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতি অধ্যাপকদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয়। এই কালেজ পরিদর্শন করিলে মনে হয় যেন পাশ্চাত্য বড় বড় য়ুনিবর্সিটির উচ্চ-শিক্ষার বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে এই কালেজে এইক্ষণে ১৫ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র হোষ্টেলের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।"

এঞ্জিনিয়রিং কালেজ

ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়রিং শিক্ষার যে সকল স্থান আছে তার মধ্যে পুণা-এঞ্জিনিয়রিং কালেজ একটি প্রসিদ্ধ। এই কালেজের অধীনে ছুতার, কামার ও আর আর বড় বড় কলকারখানার দোকান আছে, তাহাতে ছাত্রগণ নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করে এবং তাদের হাতের কাজ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। দেখতাম অনেক বাঙ্গালী ছাত্র এখানে এসে অধ্যয়ন করছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমাদের একটি আত্মীয়কে সেই কালেজে দেবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে তাকে ভর্ত্তি করে দেওয়া গেল, পুণায় থাকবার এমন সুবিধা করে দিলাম যা অন্য কোন বিদেশী ছাত্রের সহজে হয় না—স্বয়ং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছেলেটিকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হলেন। সবই হল কিন্তু দৈব প্রতিকূল। তাকে কি একটা রোগে ধরলে, বৈদ্যশাস্ত্রে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শেষে জানা গেল সে রোগের নাম Home Sickness, কিছুতেই ওদেশে তার মন টিঁকলো না। মার কোলে ফিরে এসে ছেলে তবে নিস্তার পায়। পৃথিবীতে দু রকম লোক আছে, কেউ কেউ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে

উজান বয়ে যেতে অক্ষম। কেহ বা অবস্থা যেমনই হোক্ তাকে আপনার মনের মতন করে গড়ে নিতে পারেন, যিনি আত্মবলে আপনি আপনার ভাগ্যবিধাতা। প্রকৃতি ও আত্মশক্তি, দৈব ও পুরুষকার, মানুষের এই দুই ভাগ্য-সূত্রধার। এদের মধ্যে আত্মবান্ পুরুষই ধন্য।

"দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"

এই উপদেশ মত কার্য্য কর, কৃতী হবে—মানুষ হবে।

গোবিন্দ বিঠ্যল কড়কড়ে

গোবিন্দ কড্‌কড়ে পুণা দক্ষিণ) কালেজে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের অনেক কালের বন্ধু। যখন প্রথম বিলাতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের



গোবিন্দ বিঠ্যল কড়কড়ে

বাড়ীতে বাস করি তখন তাঁর সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হত—সে ত ৫০ বৎসরেরও আগেকার কথা। আমার বোম্বাই প্রবাস কালে আমরা বরাবর বন্ধুত্বসূত্রে বাঁধা ছিলাম—আজ পর্য্যন্ত তা অটুট রয়েছে।

মারাঠী জাতির অনেক পদবীই বাঙ্গালীর পক্ষে কৌতুকাবহ কিন্তু নাম ছাড়াও গোবিন্দ কড়কড়ের অনেকগুলি ভাবসাব হাস্যরসাত্মক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খৃষ্টান, ব্যবসায়ে অধ্যাপক, এবং স্বভাবে কিঞ্চিৎ পাগল। এমন কি, চাকর ও ছেলেদের মহলে তিনি "পাগলা সাহেব" বলেই খ্যাত ছিলেন। "ছিলেন" শুনে যেন কেউ না মনে করেন যে বেচারা গোবিন্দ ইহলোকে নাই। আশা করি আমাদের এই পুরাণো বন্ধুটি সুস্থ শরীরে ও শান্তচিত্তে তাঁর নির্জ্জন অবসর-প্রাপ্ত জীবন যাপন করছেন। তবে বহুদিন তাঁর কোন খবর পাই নি। এক একবার তাঁর সহাস্য গৌরবদন দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে পরিবারের নবাগতগুলিকে পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বয়সে তাঁর খিড়কিস্থিত কোটর থেকে তাঁকে কলকাতায় টেনে আনা শক্ত ব্যাপার।

গোবিন্দের জীবনী একটু নতুন রকমের। তাঁর পিতা বোম্বাই প্রদেশের কোন আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন কিন্তু এক সময়ে তহবিলের কিছু গোলযোগ হওয়ায় তিনি ফেরার হন। সেই সময়ে বালক গোবিন্দ সহরের কলেক্টর সাহেবের নিকট যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। এই সুদর্শন বালকটিকে দেখে কলেক্টর Tucker সাহেবের মমতা হয় এবং তিনি ওঁর শিক্ষার

বন্দোবস্ত করে দেন ও অর্থের সাহায্য করেন। পরে ছুটিতে বিলাত যাবার সময় বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে যান—বিলাত গিয়ে গোবিন্দ কেম্ব্রিজ য়ুনিবসিটিতে অধ্যয়ন করেন। সেখানে সম্মানের সহিত অঙ্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে এসে অনেক চেষ্টার পর তিনি পুণার দক্ষিণ কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং সেই পদেই জীবনের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি বিপত্নীক হন ও পুনরায় কখনো দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করলে ছেলেদের বলতেন—"সে খবর পেয়ে আমি মূর্চ্ছা যাই!" আর তাঁর গুটিকয়েক দাঁতের অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বলতেন স্ত্রী ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর সেই বাল্য-সঙ্গিনীকে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় মনে আছে মাত্র, তা অন্য সময় স্বীকার করতেন। পরে এক সময়ে কোন স্বদেশিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন। সেই সূত্রে বলেন "I had a narrow escape—The girl was so volatile and changeable."

বিলাতে সাহেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই হোক্ কিম্বা যে কারণেই হোক্, তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস কি জানি না কিন্তু পোষাক ও আচার অভ্যাসে সাহেব হলেও তিনি মনে মনে অনেক বিষয়ে স্বদেশী, এবং পুণার হিন্দুসমাজের অনেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশেষতঃ স্বদেশী সঙ্গীতের তিনি যথার্থ অনুরাগী ভক্ত। তাঁর উদ্যোগে আমরা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক ভাল গাইয়ের গান শুনেছি। গান শুনতে শুনতে তিনি যেরূপ উৎসাহে মত্ত হয়ে বাহবা দিতেন, এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করতেন, তা দেখে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হ'য়ে পড়ত। তাঁর নিজের বেশ সুর-জ্ঞান আছে, গলাও ভাল। কিন্তু হলে কি হবে, কোন গানের দুলাইন, কোন গানের আস্থায়ী মাত্র গেয়ে হুঙ্কার দিয়ে শেষ করে দেন, অর্থাৎ তাঁর বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত। এক একটা তান কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁর মুখে লেগে থাকত, তার পরে থেমে যেত। আমাদের একেলে বাঙ্গলা গান বা গলা তাঁর পছন্দ হত না এবং আমাদের মধ্যে যাদের ভাল গাইয়ে মনে করি তাদেরও গান শুনে তিনি ব্যঙ্গ সহ-কারে নকল করতেন, ও বলতেন "সপ্ত সুরের" তোমরা কিছুই জান না। আমাদের পরিবারকে তিনি আরো নানা প্রকার ঠাট্টা করতেন। যথা "Just like the Tagore family they make ten different engagements at the same time." ইত্যাদি।

তাঁর নিকট-আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে, তাদের কাউকে আমরা দেখিনি, তবে শুনেছি বটে যে বিপদ আপদে তাদের সাহায্য করেন। নিজেই বলতেন যে তাদের আমি নিয়মিত টাকা পাঠাই, বলে দিয়েছি যে আমার কাছে এসে কেউ জ্বালাতন করো না! মুখে যাই বলুন পরদুঃখে তিনি কাতর আর দানে মুক্তহস্ত, আমাদের কোন জামাতাকে নতুন বিবাহের পর দেখে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন এই করলেন যে

"তোমার গরীব আত্মীয়দের সাহায্য করতে হয় কি না?—" বোধ হয় নিজে সে বিষয়ে ভুক্তভোগী!—বহুকাল একক জীবন যাপন করায় ইংরাজসমাজ-খ্যাত চিরকুমারীর ন্যায় তাঁর কতকগুলি পারিপাট্যের অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। ঘরের আসবাবগুলি একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে যার বিয়ে আগে হবে তাকে অমুক আসবাবটি দেবেন বলে লোভ দেখাতেন। তাদের সঙ্গে কতরকম মুখভঙ্গী করে ঠাট্টাতামাসা করতেন তা বলে শেষ করা যায় না। পঞ্চাশোর্দ্ধেও কতকগুলি বিষয়ে তিনি যেন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন। কতবার আমরা তাঁর আতিথ্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গ উপভোগে আমোদে দিন কাটিয়েছি। তাঁর ঘর দুয়ার, খাবার বন্দোবস্ত সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। "আজ্ না" (অর্জ্জুনা) একটি পুরাতন ভৃত্য কথায় কথায় তার ডাক পড়ে। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সাজটিও দেখবার জিনিস! গায়ে কোট নেই, মাথায় একটি লম্বা রাজটুপী, পায়ে চটিজুতা, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য নাটেকর নামক তাঁর সুগায়ক বন্ধু গৃহে উপস্থিত; গায়কের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহও সপ্তমে চড়ে উঠেছে। আমরা এক একবার মনে করতেম এ পাগল কালেজে গম্ভীরভাবে অধ্যাপনা করেন কিরূপে! কিন্তু মস্তিষ্কের গোলে তাঁর কাজের কোন প্রকার গোল হয়েছে বলে ত কখন শুনি নি। ছাত্রেরা তাঁকে খুব ভালবাসত দেখতুম। তাঁর সংসারে ভালবাসার জিনিসের মধ্যে ছিল কতকগুলি গরু বাছুর। বারান্দায় দরমার ব্যাড়ার জানালার মধ্য দিয়ে তারা কখনো কখনো মুখ বাড়িয়ে দিত আর তিনি তাদের কত আদর করতেন—আর ছেলেদের বলতেন "এই দেখ, একেই ত বলে সংসার!" বাস্তবিক, এ ভিন্ন তিনি অপর কোন সংসার কখনো করেন নি। কোন একটি বন্ধুর ছোট ছেলের মৃত্যু হওয়ায় বড় ছেলেটিকে তার বাপ মা সিবিল সার্ব্বিস ছাড়িয়ে কাছে রাখবার জন্য ব্যস্ত শুনে গোবিন্দ্ "বলেছিলেন এ আবার কি পাগলামি। ছেলে ত মানুষের গিয়েই থাকে।" তার পরে যখন তাঁকে বোঝানো হল যে তাঁর গরু বাছুরের মধ্যে একটি সবে ধন নীলমণি! বাছা যদি মারা যায় তাঁর কি রকম কষ্ট হয়, তখন যেন পুত্র শোকের মর্ম্ম কতকটা উপলব্ধি করতে পারলেন।

আমাদের কাছে তিনি মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন, বিশেষতঃ কোন স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে হাওয়া বদল করতে যাবার সময় সানন্দে সঙ্গ ধরতেন। এইরূপে একবার সিমলা পাহাড়ে অবস্থান কালে তাঁর গাল রক্তবর্ণ হয়েছিল। তাঁর গাল লাল হয়েছে বলে তাঁর মহাভাবনা উপস্থিত এবং আয়নায় মুখ দেখে আমাদের গাল দেখিয়ে ক্রমাগত বলতেন "I say why are my cheeks so red"—যেন ভারি একটা অসুখের চিহ্ন! আমরা তাঁর সঙ্গে ইংরাজিতেই বাক্যালাপ করতেম, আর আমাদের বাঙ্গলা কথা শুনে তিনি "হচ্ছ কচ্ছ" বলে ঠাট্টা করতেন। আপনার মনে বকা তাঁর এক পাগলের অভ্যাস। বেঁটেখাট সুন্দর মানুষটি, হ্যাট কোট পরে, লাঠিটি দুই হাত দিয়ে আড়াভাবে কোমরের পিছনে এঁটে ধরে যখন আমাদের সঙ্গে ব্যাড়াতে বেরতেন, তখন পাহাড়ে রাস্তার

বাঁদরগুলি দেখে তাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হতেন "আরে, কায়সা হ্যায়, তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায়" ইত্যাদি। না হয় একলাই অগ্রসর হয়ে মাথা নীচু করে অন্য মনস্কভাবে বকে যেতেন—কখনো সেকালের কোন নামজাদা সাহেবের গালভরা নাম, যথা Sir Alexander Coburn কিম্বা নিজের জীবনের ঘটনা স্মরণে I owe every thing I have in this world to Mr Tucker." সেই যে টকার সাহেব তাঁর সাহায্য করেছিলেন, সে কথা তিনি জীবনে ভোলেন নি, এবং চিরকাল তাঁর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা পোষণ করেছেন। এ বড় সাধারণ সদ্‌গুণ নয়। তাঁর টাকা শোধ করে দিয়েছেন, শুধু তা নয় তাছাড়া টকারের ছেলেমেয়ে যার যখন কোন টাকার দরকার, জানবামাত্র অকাতরে তাদের সাহায্য করেছেন। এরূপ যাবজ্জীবন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আজ-কালকার দিনে বিরল। পাওনাদার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে উল্টো তার উপরেই ঋণীর তম্বী, উপকারের প্রত্যুপকার অনেক স্থলে এইরূপই দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কেউ কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করলে তিনি বলতেন, "কৈ, আমিত ওর কখনো কোন উপকার করেছি ব'লে মনে পড়ে না, তবে আমার পরে চটেছে কেন?"

গোবিন্দ কড়কড়ের জীবন, মন, ধরণ ধারণ সবই একটু অসাধারণ। তাঁর মজার রকম সকম দেখে আমরা মুখে তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা করি বটে, কিন্তু সে পাগল বেহারী চক্রবর্ত্তীর গানের 'পাগল মানুষ' স্মরণ করিয়ে দেয়—

পাগল মানুষ চেনা যায়—
ও তার হাসি হাসি মুখশশী.
খুসী ফোটে চেহারায়।(১)

সাতারা

সোলাপুর হইতে সাতারায় আমার বদলি হয়। সাতারা শিবাজী ও তাঁহার বংশধর রাজগণের বাসস্থান। এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আমার সর্ব্বিসের শেষ তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। সেখানেই আমি কার্য্য শেষ করে ১৮৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করি। শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ঐ দেশে কাটাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভগবানের মর্জী অন্যরূপ। নানা কারণে কর্ম্মত্যাগ করে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেম। গৃহে আমার জীবনস্রোত অন্য দিকে ফিরে গেল, সেই স্রোতে আমার এখনকার এই বয়সে এসে পৌছেছি!

আহার প্রণালী

সাতারায় মারাঠীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা শুনা ও বন্ধুভাবে মেলামেশা হত। কখনো বা কোন মারাঠী বন্ধুর বাড়ী ভোজনের নেমন্তণে যেতে হত। এদেশের ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিরামিষ ভোজী, মাছ মাংসের কোন পাঠই নেই। সামান্যতঃ বলতে গেলে বোম্বাইবাসীরা রুটিখোর, বাঙ্গালীদের মত ভাতজীবী নয়। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোঙ্কন, কানাড়া প্রভৃতি স্থানে

(১) গোবিন্দ কড়কড়ের এই জীবনচিত্র আমার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

যেখানে বর্ষার প্রাচুর্য্য বশতঃ প্রচুর ধান জন্মে ভাতই সেখানকার লোকদের প্রধান আহার। তদ্ব্যতীত, বাজরী, জোয়ারী, গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্য জন্মে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তবে এটা মানতে হবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ভদ্র লোকদের ভাত ও 'বরণ' (ডাল) ভিন্ন চলে না। রান্না অনেকটা আমাদের ধরণ, কেবল তরকারিগুলি ঝালপ্রধান আর আমাদের মত ওদের কোন মিশ্র তরকারী রান্না হয় না। আহারের সময় কার পর কি খেতে হয় এমন বিশেষ কোন নিয়ম নেই। আমাদের যেমন তিক্ত হতে আরম্ভ করে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা নিয়ম আছে, ওদেশে মিষ্টি ঝাল লোন্তা যখন যাতে অভিরুচি তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই। মিষ্টে অরুচি হলে টক ঝাল, ঝালে অরুচি হলে আবার মিষ্ট, ঝালের মুখ মিষ্ট করে আবার লোন্তায় এসে পড়া যায়। কোন মারাঠী কিম্বা গুজরাটী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে কখন্ কোন্ জিনিস খেতে হবে—কোথা হতে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমস্যা। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে তরকারী আর নানা রকম চাট্‌নী, অম্বলের জায়গায় 'পঞ্চামৃত,' (এক রকম পাঁচ মেশালো অম্ল মধুর ঝোল), আর 'কড়ি' একরকম মসলামাখা টক দধির পাক। মিষ্টান্নের মধ্যে 'শ্রীখণ্ড' মারাঠীদের পরম উপাদেয় সামগ্রী, জাফরাণ যুক্ত মিষ্ট দধি দিয়ে প্রস্তুত। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল ওদেশে ছানার চলন নেই, সুতরাং ওরা সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল ভাল মিষ্টান্ন হতে

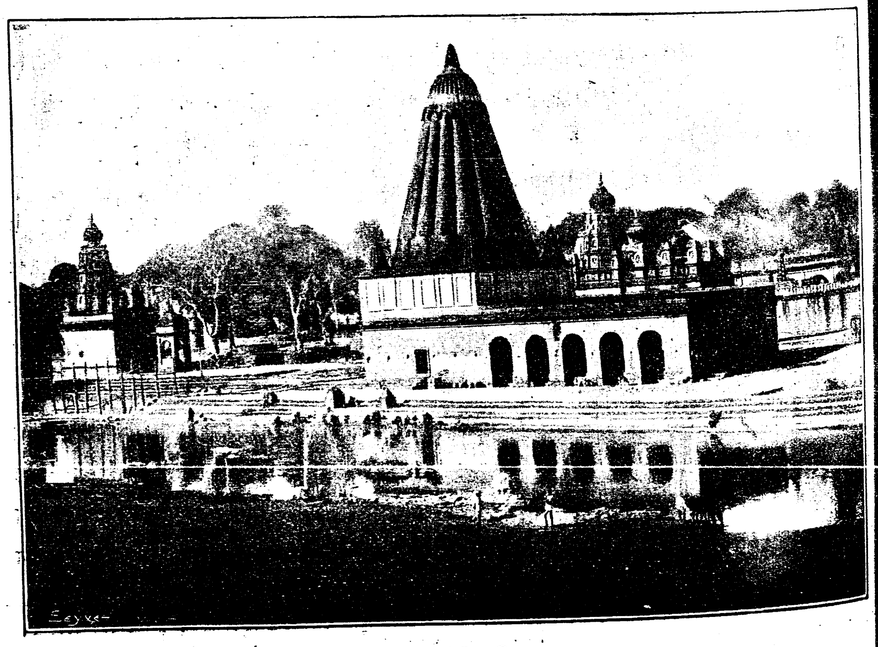

০ পার্ব্বতী মন্দির

বঞ্চিত। কোন বাঙ্গালী ময়রা ও অঞ্চলে মিষ্টান্নের দোকান খুল্লে বোধ করি বিলক্ষণ এক হাত লাভ করতে পারে। আহারের সময় মারাঠী গৃহস্থ রেশমের পট্টবস্ত্র (সোলা) পরিধান করেন। আহারান্তে ইংরাজী ভোজের After dinner Speech-এর ধরণে কিছু বলা একটা মারাঠী রীতি আছে সেটা আমার খুব ভাল লাগত। বক্তৃতা না হোক্ কোন সংস্কৃত বা মারাঠী শ্লোক কিম্বা গীতের একচরণ—এইরূপ যাঁর যা ইচ্ছা আবৃত্তি করেন, তাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতমণ্ডলীর বেশ আমোদ হয়। ডাক্তারে বলে যে আহারের সময় হাসিখুসি মিষ্টালাপে পরিপাকের সাহায্য হয়; অতএব উক্ত নিয়ম বৈদ্যশাস্ত্রসম্মত বলতে হবে।

বিবাহ ও ভোজনবিচার হিন্দুয়ানীর এই দুই দুর্গপাল। বাঙ্গালাদেশে ভোজন বিচারের নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে মনে হয়—অন্ততঃ কলকাতায়। আমরা সহুরে মানুষ কলকাতার কথাই বলতে পারি। কিন্তু বোম্বায়ে দেখতে পাই এই অন্তর্জাতিক ভোজনের সবে মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। "আর্য্যসঙ্ঘ" (Aryan Brotherhood) নামে ওদেশে মাননীয় জষ্টিস চন্দবারকরের নেতৃত্বে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা জাতভাঙ্গা পণে কার্য্যারম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে সম্প্রতি ঐরূপ একটা মিশ্রভোজ দেওয়া হয়—"প্রীতিভোজন"। কিন্তু এই প্রীতি ভোজন তাঁদের জাতভাইদের অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। তারা সভাসমিতি ডেকে তিলকে তাল করতে উদ্যত হয়েছে। মজা এই যে, দুজন মাহার জাতীয় ভদ্রলোক এই ভোজনে যোগ দিয়েছিল, শুনছি নাকি তাদের নিজের জাত থেকে বহিষ্কৃত করবার হুকুম জারী হয়েছে, অথচ মাহার জাত অন্ত্যজ বলে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য। যা হোক্ মারাঠীদের মধ্যে এই জাতিভেদের বাধা অতিক্রম করবার এক সহজ উপায় আছে। আমি দেখেছি যে বিভিন্ন জাতের মিশ্রভোজনে তাদের কোন আপত্তি নেই, কেবল স্বতন্ত্র পংক্তিতে আসন দেওয়া চাই। এই নিয়মে কোন মুসলমানও হিন্দুভোজে যোগ দিতে পারেন, থালি পংক্তিভেদের ব্যবস্থা করলেই হ'ল। এই নিয়ম আমাদের orthodox হিন্দুসমাজে প্রচলিত হলে মন্দ হয় না। এই সামান্য রাস্তাটুকু খুলে গেলেও যথালাভ মনে করা যায়।

মিশ্রভোজন থেকে স্ত্রীপুরুষের একত্র ভোজন মনে পড়ল। আমরা ইংরাজদের ভোজনগৃহে নরনারীর মেলা দেখতে পাই। য়ুরোপীয় সভ্যজগতের এই সাধারণ রীতি। পারসী বিদ্বন্মণ্ডলী এই রীতি অবলম্বন করেছেন। মারাঠীসমাজ এখনো অতদূর এগোতে পারে নি, তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিণীর আগমনেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। আমাদের মত নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্ত্রী পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাঁর হাতের বালাগাছটি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না।

সাতারায় এখনকার রাজা যিনি (শিবাজী রাজার বংশধর) শুনতেম তিনি দুর্ব্যসনরত নিতান্ত অপদার্থ জীব, নেশার ঘোরে কোথায় পড়ে আছেন তাঁর দেখা পাওয়া ভার।



পুরাতন রাজবাটী—সাতারা

তাঁর বসবাটী দেখতে যেতেম, সেখানে এক জলপ্রাসাদ আছে আর একস্থানে শিবাজীর বাঘনখ ও পরিধেয় বর্ম্ম যত্নের সহিত রক্ষিত হয়েছে। অতীত গৌরবের সেই একটি মাত্র নিশান সাতারায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সাতারার পুরাতন রাজভবন এখন আদালত গৃহে পরিণত হয়েছে।

সাতারায় আমরা মাঝে মাঝে পার্টি দিতেম, তাতে প্রাচীন ও নব্যদলের আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হ'ত। নিমন্ত্রিতের মধ্যে উকিল, সবজজ আর কোন কোন বাহিরের লোকও থাকতেন। উকিল প্রধান দুইজন ছিলেন—করন্দেকর ও সহস্র বুদ্ধি। "সহস্রবুদ্ধি" যেমন নাম কাজেও তেমনি পটু। মক্কেল জাহাজের এই দুই মাঝি। এমন মকদ্দমা নেই যাতে এই দুজনের সাহচর্য্য না থাকত। সবজজ বৃদ্ধ মারাঠী (২) ছিলেন তাঁকে বেশ মনে পড়ে। মতে তিনি ব্রাহ্ম, প্রার্থনা সমাজে বক্তৃতাদি দিতেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলে গণ্য নন। তিনি ও তাঁর তিন কন্যা আমাদের কাছে সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করতেন। ছোটটি এমন চুলবুলে যে ল্যাজ ধরে হাতীর পীঠের উপর চড়ে বসা তার এক মুহূর্ত্তের মামলা। আমাদের সাতারা প্রবাস বেশ সুখে কাটানো গিয়েছিল। তখন সেখানে

(২) ইনি মারাঠী ভাষায় বালকদের জন্যে Science Series রচনা করেছেন। বাঙ্গালায় স্কুলপাঠ্য এমন ভাল Series নাই, হওয়া আবশ্যক।

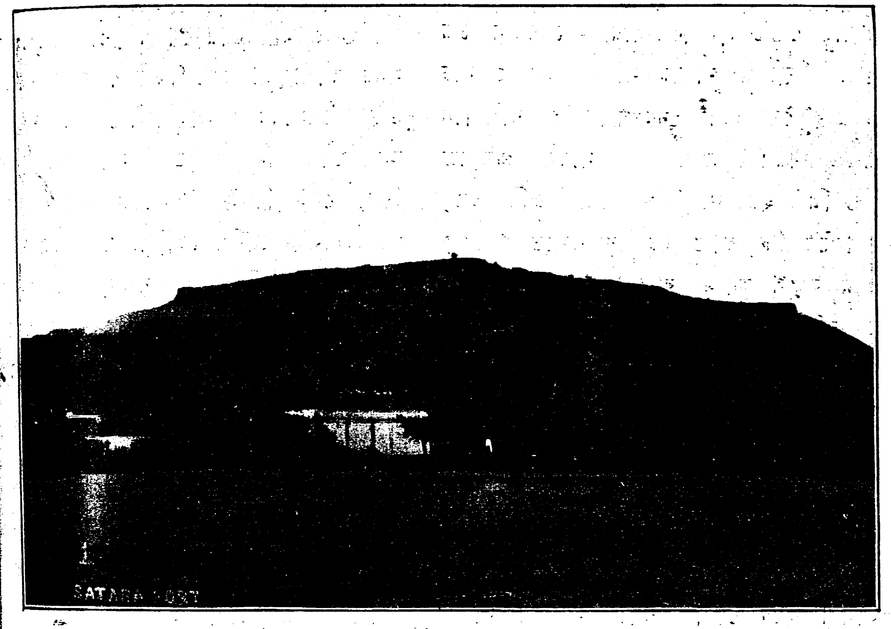

সাতারার দুর্গ

প্লেগও ছিল না আর "সিডিস্যান" মকদ্দমারও সূত্রপাত হয় নি—এ সব উৎপাত আমি চলে আসবার পরে হয়েছে। সাতারা একটি ঐতিহাসিক শোভনপুরী। দূরে পাহাড়ের দৃশ্য, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর, আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে মহাবলেশ্বর পাহাড় হাতের কাছে, যখন ইচ্ছা যাওয়া যেত। Union Club ও সঙ্গীতসমাজ, এই দুইটি জায়গা দেশী লোকদের মিলনের স্থান ছিল। সঙ্গীতসমাজে মাটঙ্গে বাওয়া নামক একটি অন্ধ গায়ক গান শেখাতে যেতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতেও শেখাতে আসতেন।

উৎসব

মহারাষ্ট্র দেশে পূজাপার্ব্বণ উৎসবাদি আমাদেরই মত, কেবল উৎসব বিশেষের মাহাত্ম্য গণনায় তারতম্য দেখা যায়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব এদেশে নাই। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষে কোন কোন হিন্দুগৃহে দুর্গাপূজা হয়, তথাপি বোম্বাইবাসীদের মধ্যে ইহার তেমন মাহাত্ম্য নাই। বিজয়াদশমীই (দশারা) শারদোৎসবের বিশেষ দিন। সে দিন হিন্দুগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমী-পত্রের আদান প্রদান হয়। কথিত আছে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশ কালে এই দিনে শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে শমীপূজা করেছিলেন। তা থেকে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমীপূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধু দেশেও এই প্রথা দেখেছি। মারাঠী দেশে দশারার বিশেষ মাহাত্ম্য কেন না এই সময়ে

বর্গীরা শস্ত্রার্চ্চনা করে মহাসমারোহে যুদ্ধ যাত্রায় বেরতো। দশারায় অশ্ব সকল চিত্র বিচিত্র ফুলের মালায় সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেষ মহিষাদি বলিদানে মেতে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রকাশ্যে পশুবলি হয় না কিন্তু দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলতে পারে? তার নমুনা আমি যা কারওয়ারে পেয়েছি তা যদি সত্যি হয় তার থেকে অনুমান অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে। কারওয়ারে আমার একটি পরিচিত ব্রাহ্মণের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়েছিল। উৎসবের পর সেই বাটীর এক ভৃত্য বালহত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ্দ হয়। বিচারস্থানে বালহত্যার কারণ এই বলা হয় যে গৃহিণী পুত্রসন্তান কামনা করে দেবীর কাছে নরবলি মানৎ করেছিলেন সেই মানৎরক্ষা মানসে ভৃত্যকে দিয়ে এই কাণ্ড করান হয়। প্রমাণ হ'ল যে আরতির সময় বালকটীকে দেবীর সম্মুখে ধরা হয়েছিল, পরদিন প্রভাতে গৃহপ্রাঙ্গণে বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। খুনের উদ্দেশ্য চুরি নয়, কেন না বালকটির অঙ্গের আভরণ যেমন তেমনি ছিল, তা হরণ করবার কোন চেষ্টা করা হয় নি; অপর কোন উদ্দেশ্যও প্রকাশ পায় নি·—বলি অনুমান নিতান্ত অমূলক বলে বোধ হ'ল না।

দশারার পর দেওয়ালী। ইহাই বোম্বাই বাসীদের প্রধান উৎসব। সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ দিয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহে রোসনাই দিয়ে উৎসবে মত্ত হয়। ধনত্রয়োদশী হতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অমাবস্যায় শেষ। বাঙ্গালাদেশে এ সময় কালীপূজা হয়, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা লক্ষ্মী। অমাবস্যার দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। সেই দিনই চারিদিকে রোসনাইয়ের ঘটা। সেই দিন বণিকদের বহিপূজনের দিন। তারা তাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটিয়ে দানধ্যান দেবার্চ্চনায় উৎসব সম্পাদন করে, ও নবোৎসাহে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভক্ত-চূড়ামণি পবননন্দনের পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু মারাঠীদের মধ্যে খুবই চলিত; এমন কি, মারুতি-মন্দির মারাঠী পল্লীচিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। গণেশ ঠাকুরেরও মানমর্য্যাদা সামান্য নহে। আমাদের দেশে গণেশ ঠাকুরের জন্যে স্বতন্ত্র উৎসব নাই, ওদিকে গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পূজা ও বিসর্জ্জন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দোলযাত্রার সময় (হোলী) আবীর খেলা আমোদ প্রমোদ সর্ব্বত্রই সমান। মহ্লাররাও গাইকওয়াড় এই খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি একবার এক হাতীর উপর ক্ষুদ্র কামান বসিয়ে সেখান থেকে একদল নর্ত্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর স্রোতে এক বেচারী প্রাণসঙ্কটে পড়েছিল!

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে বোম্বায়ে যমদ্বিতীয়া কহে। ভাই বোনের মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ভাই ভগিনী-গৃহে ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়। ভগ্নী ভায়ের কপালে

তিলক দিয়ে তাকে বরণ করে, অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগ্নীর স্নেহের প্রতিদান ও পরিতোষ সাধন করতে হয়।

গানবাজনা

বাঙ্গালীরা যেমন গানবাজনাভক্ত আমি যতদূর দেখেছি মারাঠীরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় সৌখীন জাতি, মারাঠীদের প্রকৃতি অন্যতর। তারা ব্যবসায়ী Practical লোক, কলাবিদ্যার প্রতি তাদের ততটা অনুরাগ নাই। আমার একজন মারাঠী বন্ধু বলেছিলেন—তিনি কলকাতায় গিয়ে দেখলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক ও সঙ্গীত প্রিয়, যে বাড়ীতে যাও একটি হুকা ও তানপুরা। তাই ব'লে ওদেশে গীতবাদ্যের চর্চ্চা বা আদর নেই তা নয়। তবে আমার মনে হয় যে, সঙ্গীতবিদ্যা প্রায়ই পেশাদার লোকেদের মধ্যে বদ্ধ, ভদ্রলোকের মধ্যে গীতবাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্প লোকই দেখা যায়।

সামান্যত বলা যেতে পারে এ দেশের গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেয়াল ধ্রুপদ। এই সাধারণ নিয়ম, স্থানে স্থানে রূপান্তরও দৃষ্ট হয়। মারাঠীদের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি দিশী ছন্দে নূতন ধরণের গান ও তান শুনা যায় আর 'লার্ডনী' নামক একপ্রকার টপ্পা আছে তাহাই খাঁটী প্রাদেশিক জিনিস। আমাদের দেশের খোল কর্ত্তাল সমেত সঙ্কীর্ত্তনের মত সমবেত ধর্ম্মসঙ্গীত ওদেশে শুনি নাই। ওদেশের 'কথা' কতকটা আমাদের কথকতার অনুরূপ। কিন্তু এ দুয়ে একটু প্রভেদও আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হতে হৃদয়-গ্রাহী উপন্যাস বিবৃত করে বলা বাঙ্গলা দেশের কথকতা; আর এদেশের কথা আদ্যোপান্ত একটি ভাবসূত্রে গাঁথা, সেইটি বিস্তার করে শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করা কথার উদ্দেশ্য। একটি নীতিসূত্র অবলম্বন করে গান ও উপন্যাসচ্ছলে তার ব্যাখ্যা করার নামই কথা। এই প্রসঙ্গে যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তা তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যখনি হইতে সংগৃহীত। আমি একবার এক জায়গায় কথা শুনেছিলাম, তাতে বিনয়ের মাহাত্ম্য, অবিনয়ের অনর্থ সুন্দররূপে দেখানো হয়েছিল; যে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছিল তা তুকারামের এই অভঙ্গ:—

লহান পণ দে গা দেবা
মুঁগী সাখরেচা রবা।
ঐরাবতী রত্ন থোর
ত্যাশী অঙ্কুশাচা মার॥
জ্যাচে অঙ্গী মোঠেপণ
তয়া যাতনা কঠিন॥
তুকা হ্মণে জান্
হ্বাবেঁ লহানাহুনি লহান॥

দেহ দেব নম্রপনা,
মুগী (৩) পায় মিষ্ট কণা।
ঐরাবত হস্তীরাজে
অঙ্কুশের মার বাজে।
যার দেহে অহঙ্কার
কঠিন যাতনা তার।
তুকা কহে জান সবে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হবে॥

(৩) পিঁপড়া।

এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে উপন্যাস ও গান থাকে, ধূয়ায় শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেয়। অতঃপর কথকঠাকুরের বন্দনাদির পর সভাভঙ্গ হয়। মারাঠী দেশে কথা ও কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গীণ অস্ত্র। কীর্ত্তন-সভায় আমোদ ও শিক্ষা দুইই একত্রে সংসাধিত হয়। সাধু তুকারাম স্বয়ং কীর্ত্তনকলায় পরিপক্ক ছিলেন। তাঁর মাধুরীময় সঙ্কীর্ত্তন শুনতে লোকেরা দেশ দেশান্তর হতে আসত। শিবাজী রাজাও অবসরক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হতেন। মহীপতিকৃত ভক্তলীলামৃত গ্রন্থে আছে যে তুকারামের উপদেশ ও সংসর্গগুণে মহারাজের বৈরাগ্যোদয় হয়েছিল; এমন কি, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকতেন। তুকারাম আবার সদুপদেশ দিয়ে তাঁকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

এক্ষণকার কালে রুচির পরিবর্ত্তন যেমন বাঙ্গালাদেশে দেখা যায় ওদিকেও তেমনি। এখন সর্ব্বত্র নাটকের পালা পড়েছে, যাত্রা কথা কীর্ত্তন এ সব কারো ভাল লাগে না। মারাঠীদের মধ্যেও ভাল ভাল নাটকমণ্ডলী আছে, তারা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটী, নারায়ণরাও পেশওয়া বধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে। ওদেশে সে সব নাট্যকারদের পশার ভারী। এই সকল নাট্যে গণপতি সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্যগীত হবার পর রীতিমত কথারম্ভ হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে ময়ূরবাহনা বীণাপাণি নৃত্য করতে করতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। ওদেশে সরস্বতীর বাহন—ময়ূর।

গিলগিটদিগের বিবাহ উৎসব

গিলগিটদিগের বিবাহপ্রণালী অত্যন্ত কৌতুকজনক। বালকগণ ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে পিতামাতারা পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হন। তাঁহারা কোন পাত্রীর সন্ধান পাইলে গ্রামের প্রধানগণকে সংবাদ দিয়া এবং পাণ্ডাদিগকে ভোজ্যদ্রব্যে পরিতুষ্ট করিয়া কন্যার পিতামাতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উথাপন করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। প্রধানমহাশয়েরা এই প্রীতিকর সংবাদ লইয়া কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হন। কন্যার পিতা তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ২।৩ দিন ভোজন করান এবং স্বীয় গ্রামের প্রধানদিগকে ও আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করিয়া একটী মজলিসে এই বিষয়ের মীমাংসা করেন। পরে কন্যার পিতার সম্মতি পাইলে উভয়পক্ষ তাহাদের রীতি অনুসারে একখানি প্রার্থনাপত্র পাঠ করে। এইরূপে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। এই নূতন আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ বরের পিতা কন্যার পিতাকে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি উপঢৌকন প্রদান করে—

ধুতি—৫ গজ। সূচ ১টী,
ছুরি—১ খানা। দড়ি ১ গাছি।

তৎপর বিবাহউৎসবের দিন স্থির হইলে বরের পিতা গৃহে ফিরিয়া আইসেন। বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবসের একপক্ষ পূর্ব্বে বরের পিতা বা অভিভাবক তিন তুলু (১তুলু—৮মাসার সমান) স্বর্ণ লইয়া পাত্রীপক্ষের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এই স্বর্ণ কন্যার পিতাকে

প্রদান করেন এবং শোভাযাত্রায় কতজন লোক সঙ্গে করিয়া কবে উপস্থিত হইতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লন। বাড়ী আসিয়া বরের পিতা আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ শেষ করিয়া চারিসের পরিমিত ঘৃত কন্যার আলয়ে পাঠাইয়া দেন। এই 'ঘি' কে তাওয়াই ঘৃত বলে। এই ঘৃত না পৌছান পর্য্যন্ত বিবাহের এক অঙ্গ "তাও" (Pan) উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে না; এবং বিলম্বে পৌছিলে বরপক্ষকে ১তুলু স্বর্ণ দণ্ডস্বরূপ দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস রজনীতে সমস্ত গ্রামবাসীগণের সম্মুখে ৮টার সময় এই উৎসব সম্পন্ন হয়। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ লৌহকটাহ স্থাপন করিয়া "কাছারী" কিম্বা 'বাবুসী'বংশীয় কোন ব্যক্তি ঘৃত, আটা এবং চিলিবৃক্ষের বীজ ও পাতা লইয়া ছুটিয়া আইসে এবং দ্রব্য গুলি কটাহে রাখিয়া অল্প অগ্নি দ্বারা উত্তাপ দিতে থাকে, কটাহস্থ দ্রব্যগুলি হইতে ধূম নির্গত হইলে পর লোকটি উভয় হস্তে কটাহের হাতনি ধরিয়া কটাহটি মস্তকোপরি উত্তোলন করে, এই সময় অদ্ভূত রবে বাদ্য বাজিয়া উঠে এবং বাজনায় তালে তালে নৃত্য করিয়া কটাহধারী ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়। নৃত্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোক সকল করতালি দিয়া সমস্বরে নিম্নলিখিত গানটি গাহিতে থাকে—

ইহা 'বাইর গুলের' তাও
(ক) দিবনা রাখিতে মাটীতে, কাউকে নিজেই রাখিব তাও।
(খ) ইহা 'মালিক' প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(গ) ইহা রাজোপযুক্ত তাও দিবনা, রাখিতে ইত্যাদি
(ঘ) ইহা সংসার উপযোগী তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(ঙ) ইহা 'শামীর' প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(চ)ইহা 'ম্যাকপান' প্রধানের তাও,দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(ছ) ইহা"মাঘলট"প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(জ) ইহা "খানা" রাজার তাও, দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি
(ঝ) ইহা ধার্ম্মিক 'গীরখির' তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(ঞ) ইহা 'মারিও'প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি
(ট) যদিও"নীলু"তাওয়ের কর্ত্তা, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি।

পুরুষগণ যখন এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে মত্ত থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোকগণ নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে থাকে—

(ক) এই 'রক্ত প্রবাল' বাইর গুলের
দিবনা গাঁথিতে অন্য কাউকে,
নিজেই গাঁথিব আমি।
(খ) এই 'প্রবাল ভাণ্ডার' মালিকা প্রধানের
দিবনা গাঁথিতে অন্য কাউকে,
নিজেই গাঁথিব আমি।

এই গানটী শেষ হইলে 'কটাহধারী' এক

(ক) (খ) Bairgul and Malik—Chief of Kashmir.
(ঙ) Shameer—The chief of Kashmir.
(চ) Magpan—The chief of Skardu.
(ছ) Mughlot—The chief of Nagir.
(জ) Khana—The Raja of Yasein.
(ঝ) Girkhi—The Ruller of Hunza.
(ঞ) Maryo—The son of Machat.
(a celebrated person of Rono Family)

মুহূর্ত্তের জন্য কটাহখানি চুল্লির উপর স্থাপন করে, এবং পুনরায় তাহা দুই হস্তে মাথার উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া নৃত্যগীতে মত্ত হয়। তৎপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে একজন কুমারীকে বাহির করিয়া আনিয়া, সেই কটাহটীর ভার অর্পণ করিয়া অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত তাহাকে ৫খানি পিষ্টক ভাজিতে অনুরোধ করে। পাঁচখানি পিষ্টক প্রস্তুত হইলে কুমারী অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের উপর সমবেত লোকগণের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করে; এবং তাহারাও আহ্লাদের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। স্ত্রীলোকগণ রন্ধনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে পর, তাহারা অন্য একটী গৃহে গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করে! এই রাত্রিকে "তাওয়াই রাত" বলে।

যদি বরকে কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে কন্যার বাড়াতে যাইতে হয়, তাহা হইলে শোভা-যাত্রার দিবস প্রত্যূষে বর স্নান করিয়া যতদূর সম্ভব ভাল পোষাক পরিধান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গীতটী একবার উচ্চারণ করিলে পর, তাহার অনুচরগণ সমস্বরে সেই পংক্তিটী পুনরাবৃত্তি করে—

"প্রণমিব আগে মায়ের চরণে স্তন্য দিয়েছেন যিনি।"

তৎপর বর তাহার মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া আসিলে পর বরযাত্রীগণ নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করে—

ওরে পাথর তুই ভারী হ, শুভদিন আজ এসেছে,
ওরে পাথর তুই ভারী হ, সোনার সঙ্গে তোর ওজন হবে।

সন্ধ্যার সময় যখন বরযাত্রীগণ তাহাদের গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন বিকটস্বরে উল্লাস ধ্বনি করিয়া আপনাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। কন্যাপক্ষও সেই রাসভ-বিনিন্দিত আনন্দ ধ্বনির একটী অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া, বরপক্ষকে সম্ভাষণ করিবার মানসে বাহির হইয়া আইসে। পরে উভয় পক্ষ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সেই সকল গানে কেবলমাত্র তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এবং গ্রামের প্রধান-গণের মহত্ত্ব ও বীর্য্যকাহিনী থাকে। অতিগর্ব্বের সহিত এইরূপ গান গাহিয়া একে অন্যকে পরা-জিত করিবার অভিলাষে, কন্যাকর্ত্তার বাড়ী খানি মুখরিত করিয়া তোলে। তৎপর আহা-রাদি সম্পন্ন হইলে নৃত্যগীতাদিতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটায়। একজন মল্ল শোভাযাত্রার সময় বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; পরদিন প্রাতঃকালে সেই মল্ল বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে। কন্যার পিতা সেই সময় কন্যার জন্য গহনা কাপড় চোপড় এবং থালা বাসন ইত্যাদি লইয়া আইসে। কন্যার পিতা সঙ্গতিপন্ন হইলে কন্যাকে এই সকল বস্তু প্রদান করিবার জন্য বরের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া লয় না। কিন্তু মূল্য না দিলে স্বামীর আর স্ত্রীর সম্পত্তির উপর কোন প্রকার দাবী থাকে না, তখন স্বামীর সম্পত্তি স্ত্রীর বলিয়া গণ্য হয়, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইচ্ছানুসারে পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে।

কোন দরিদ্র পিতা বিবাহের উপকরণাদি অর্থাৎ থালা, ঘটী, বাটী ইত্যাদি কন্যার সহিত প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, বরের পিতা কন্যার পিতার নির্দ্দেশ মত সেই মূল্যের কোন জিনিষ কন্যার পিতাকে দান

করে, এবং সেই দানের জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সম্মতি ভিন্ন অন্য বিবাহ করিতে পারে না। এই প্রথাকে "কালকমালক" বলে।

উৎসব সমাপনান্তে বরযাত্রীগণ গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পাত্রীকে বরের ঘরে যাইতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত এই সঙ্গীতটী গাহিয়া থাকে—

ওগো মায়ের হৃদয়-নন্দা, বাহির হয়ে এস গো,
ওগো জলের অধীশ্বরী, কেন দেরী করগো,
এস ওগো স্বর্ণ কুন্তলা, কেন দেরী করগো,
মুক্তাদন্ত-চন্দ্রাননী কেন দেরী করগো।

গান শেষ হইলে উচ্চরবে ক্রন্দনপরায়ণা কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে, এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সকলে মিলিয়া পুনরায় নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে থাকে—

কেঁদোনা কেঁদোনা ফুলকুমারী,
গায়ের বরণ মলিন হবে,
পাহাড়ের উপর যাইবে তুমি
গায়ের বরণ মলিন হবে।
কাঁদিলে তোমার পুড়িবে হৃদয়
গায়ের বরণ মলিন হবে!"

গিলগিটে সিনাকি নামক স্থানে "কাও" নামক আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে। কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পড়িলে যদি যুবকের পিতা মাতা সেই যুবতীর সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হন, তবে যুবক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া বলে—"যদি আমার সহিত অমুক বালিকার বিবাহ দেওয়া না হয় তবে আমি কাণ্ড করিব। সকলকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার অভিলাষে সে গ্রামের বাহিরে গিয়া একটী বন্দুকের আওয়াজ করে। তৎপর সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে পুনরায় সেই 'কাণ্ড' করিবার কথা বলে, এবং সুযোগ পাইলে কয়েকজন লোকের সম্মুখে সেই কন্যাটীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার জামার বা কাপড়ের একটু অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া বলে—'তুমি আমার'।

এই 'কাণ্ড' করিতে পারিলে যুবকের পিতামাতা বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এস্থলে কন্যার পিতা বরের অবস্থানুসারে ইচ্ছানুরূপ অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে। 'কাণ্ড' হইয়া গেলে পর যদি সেই কন্যার সহিত অপর কাহারও বিবাহ হয় তবে যুবক সেই বালিকার ও তাহার স্বামীর প্রাণবধ করিতে সতত চেষ্টিত থাকে এবং অনেক সময়েই কৃতকার্য্য হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্বামী সত্যদেব সরস্বতী

১

কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা ৺সত্যদেব সরস্বতী বঙ্গদেশে আগমন করেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুশীলন ইচ্ছায় কাশীধামে উপস্থিত হন। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, ঠিক জানা যায় না, তবে অনেকে

অনুমান করেন, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশবর্ষীয় এই সুন্দর বালককে দেখিয়া বারাণসীর এক শাস্ত্রবিশারদ সন্ন্যাসী বুঝিতে পারেন, যে এই বালক কালে অদ্বিতীয় জ্ঞানী হইবেন। তিনি বালককে নিজ শিষ্যরূপে গ্রহণ করতঃ শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। অতি অল্পকাল মধ্যে বালকের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। বালকের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অচিরে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জ্ঞানী পুরুষরূপে বারাণসী ধামে পরিচিত হইলেন।

ক্রমে তিনি গুরুদেবের নিকট হইতে নানারূপ যোগ অভ্যাস শিক্ষা করেন ও উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুদেব তাঁহার নাম রাখেন—"স্বামী সত্যদেব সরস্বতী"।

পাঠ সমাপনান্তে সত্যদেব গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণান্তর দেশ পর্য্যটনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। আশীর্ব্বচনে অভিষিক্ত করিয়া গুরুদেব সত্যদেবকে বিদায় দান করিলে পর সত্যদেব নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হুগলী জেলার সুবিখ্যাত গুপ্তিপাড়া গ্রামে উপস্থিত হন।

গুপ্তিপাড়ার বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু চিরকাল এই গ্রামের এরূপ অবস্থা ছিল না। তৎকালে নদীয়া জেলার উলা (বর্ত্তমান বীর নগর) ও হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম ছিল। দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন উদ্দেশ্যে তথায় সমবেত হইতেন। সে সময় গুপ্তিপাড়ায় অন্যূন ৪০খানি টোল ও প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র নরনারীর বসতি ছিল। সুদূর বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ শিক্ষালাভার্থে এইস্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এবং অদূরবর্ত্তী নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও শান্তিপুরেরও অনেক বিদ্যার্থী এই স্থানে অধ্যয়ন করিতেন। ৺বানেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহানুভবগণ কর্ত্তৃক টোলের পরিচালনা কার্য্য সম্পাদিত হইত। মহামতি হাণ্টার তাঁহার "গেজেটিয়ার" মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন "Guptipara was a seat of learning.....।

কালের বিচিত্র গতির আবর্ত্তনে—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ও ভীষণ মহামারীতে * গুপ্তিপাড়া ধ্বংসোন্মুখ। দেশ জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া পরিপূর্ণ। বহু অট্টালিকা জনশূন্য অবস্থায় বনমধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও দক্ষিণদিকে ক্ষুদ্রকায়া বেহুলা নদী—লক্ষ্মীন্দরের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কুলুকুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে।

সত্যদেব গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণপুর নামক পল্লীতে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। এই পল্লী,—গ্রামের পূর্ব্ব সীমায়, গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা কিছু দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন এবং কৃষ্ণপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠাকুরপাড়া হইয়াছে।

যে স্থানে সত্যদেব কুটীর নির্ম্মাণ করেন তথায় আম্র, কাঁঠাল ইত্যাদি কতকগুলি বৃক্ষ ছিল। লোকালয় তথা হইতে কিছু

* ১৭৬৯ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ

দূরে। সত্যদেব অধিকাংশ কালই বৃক্ষতলে যাপন করিতেন। অনেকেই তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণার্থে আগমন করিতেন। সন্ন্যাসী সকলের সহিত সমভাবে বাক্যালাপ করিতেন। যে বৃক্ষতলে তিনি অবস্থান করিতেন তাহার অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পথ ছিল। সেই পথে বহু নরনারী ভাগীরথী তটে গমনাগমন করিত। পথের অপর পার্শ্বে একখণ্ড কর্ষিত ভূমি ছিল, বীজ তখনও রোপিত হয় নাই। একদিন সত্যদেব সেই কর্ষিত ভূমিতে একখণ্ড কঠিন মৃত্তিকায় মস্তক রক্ষা করিয়া ও আর একখণ্ড মৃত্তিকা, দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। হেনকালে দুইটী স্ত্রীলোক কক্ষে কলসী লইয়া জলার্থে সেই পথে যাইতেছিল। সন্ন্যাসীকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া, একজন অন্য জনকে বলিল—দেখ, ঠাকুর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু "আয়েস"টুকু এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

স্ত্রীলোকের এইকথা শুনিয়া সত্যদেব মনে মনে বলিলেন—কথা ঠিক। বাস্তবিক তিনি ঐরূপ অবস্থায় শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ সুখবোধ করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি সুখান্বেষী, এ কথা স্মরণ করিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। স্ত্রীলোক দুইটী চলিয়া গেলে মাটির চাপ দুইখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কর্ষিত ভূমিতে শয়ন করিলেন। জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে সন্ন্যাসীর শয্যার পরিবর্ত্তন দেখিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক প্রথমাকে বলিল—সন্ন্যাসী যে 'আয়েষী' শুধু তাহাই নহে, ইঁহার আবার বিলক্ষণ রাগও আছে। কারণ 'আয়েষী' বলা হইয়াছিল বলিয়া ইনি 'মাটীর চাপ দুইটী' ফেলিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রীলোক দুইটীর ব্যবহারে সত্যদেব বিশেষ চমৎকৃত হইলেন ও স্থির করিলেন যে ঐ স্থানই তাঁহার সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। কারণ যে স্থানে সাধারণ স্ত্রীলোকও কার্য্যের সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারে, সে স্থানে নিশ্চয়ই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। তথায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তদবধি সত্যদেব ঐ স্থানে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

২

গুপ্তিপাড়ার ৺ বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সুবিখ্যাত। প্রবাদ এই, দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র স্বেচ্ছায় সত্যদেবের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। প্রবাদটি নিম্নে বিবৃত হইল।

শান্তিপুরের "গড়" নামক পল্লীতে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ সপরিবারে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ পরম ভক্ত, শুদ্ধাচারী, ক্রিয়া কর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্। গৃহে শালগ্রাম শিলা নিত্য পূজিত হইত। অতিথি কখন তাঁহার গৃহে বিমুখ হইতেন না। সপরিবারে উপবাসী থাকিয়াও অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন। পরিবারবর্গের মধ্যে, তিনি নিজে, ব্রাহ্মণী, একটী পুত্র ও একটী বিবাহিতা কন্যা।

একদা নিশীথে নিদ্রাবস্থায় ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার গৃহে এক দিব্য-কান্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন—তুমি আমাকে নিত্য পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমি তোমার পূজায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। গুপ্তিপাড়ায় আমার পরম ভক্ত সত্যদেব

সরস্বতী অবস্থান করিতেছেন। আমার শিলামূর্ত্তি তাঁহার নিকট রাখিয়া আইস।

ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বহু মিনতি করিলেন ও যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তজ্জন্য নানারূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পূজা কালীন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল,—ঠাকুর ঘরে যেন কেহ বলিতেছেন—আমাকে এই স্থান হইতে সত্যদেবের নিকটে রাখিয়া আইস। পূজা সাঙ্গ করিয়া, ব্রাহ্মণ ভক্তি-ভাবে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—দেবতা, আমি তোমাকে কখনই ছাড়িয়া দিব না। তুমি যখন দয়া করিয়া আমার সহিত কথা কহিতেছ, তখন আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি যতদিন বাঁচিব তোমাকে আমার গৃহে রাখিব। দুই তিন দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা গৃহ হইতে বাহির করিলেন না। পরদিবস যখন তিনি গভীর পূজায় মগ্ন তখন শুনিলেন, কেহ যেন বলিতেছেন—যদি তুই আমার আজ্ঞা পালন না করিস্, তাহা হইলে তোর সর্ব্বনাশ হইবে। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়, হউক, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে কখনই ছাড়িব না। পূজাকালীন ২।৩ দিন পুনরায় তিনি এইরূপ স্বর শ্রবণ করিলেন, কিন্তু একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁহার পুত্রের পীড়া হইল ও সেই পীড়াতেই অল্পদিন মধ্যে তাহার জীবন শেষ হইল। ব্রাহ্মণ ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। ভক্তের হৃদয় ইহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি যথাবিধি ঠাকুরের পূজা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন মধ্যে ব্রাহ্মণীর ও তৎপরে জামাতার মৃত্যু হইল। সংসারে তিনি ও একমাত্র বিধবা কন্যা দেবসেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কন্যাকে নানারূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে বিশেষ ভক্তির সহিত দেবসেবা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ব্রাহ্মণও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কন্যাকে বলিলেন—দেখিও মা আমি আজীবন দেবসেবা করিয়া আসিয়াছি, এখন যাইবার সময় তোমাকে বলিতেছি যে আমার গৃহ-দেবতা যেন তোমার জীবন থাকিতে কখনও গৃহ-ছাড়া না হন। তুমি বিধবা, নিজে দেবতার পূজা করিবে ও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবে।

কন্যা পিতার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। একদা তিনিও স্বপ্ন দেখিলেন যে ঠাকুর তাঁহাকে সত্যদেবের নিকট রাখিয়া আসিতে আদেশ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—আমার পিতা আজীবন আমাকে তোমার সেবা করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি কোন মতেই তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। কন্যা তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। যাহাতে পূজার কোনরূপ ত্রুটি না হয় এজন্য তিনি বিশেষ সাবধান হইলেন। দেব-সেবা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

৩

এদিকে সত্যদেব একদা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন—ভগবান তাঁহাকে বলিতেছেন—শান্তিপুরের "গড়" নামক পল্লীতে ব্রাহ্মণ বাটীতে যে শিলামূর্ত্তি আছেন তাহা যেন তিনি লইয়া আসিয়া নিজ কুটীরে প্রতিষ্ঠা করেন।

পরদিবস প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সত্যদেব শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শুপ্তিপাড়া হইতে ঠিক উত্তরে শান্তিপুর এবং ভাগীরথী উভয় গ্রামের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। গঙ্গা পার হইয়া সত্যদেব দ্বিপ্রহরকালে স্বপ্নাদিষ্ট গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। গৃহে সন্ন্যাসী অতিথি সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকন্যা কিছু চিন্তিতা হইলেন। সত্যদেব তাঁহার চিন্তা দূর করিয়া কহিলেন তিনি ঐ দিবস তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিবেন।

দেবতার ভোগ-নিবেদন-কার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণকন্যা সন্ন্যাসীকে আহার্য্য প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করিয়া হস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া ব্রাহ্মণকন্যাকে বলিলেন—মা, আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী; তোমার গৃহে আমি আজ অতিথি, কিন্তু দক্ষিণা না লইয়া ভোজন করিতে পারি না।

ব্রাহ্মণকন্যা বলিলেন—বাবা, আমি দরিদ্র, কিন্তু তুমি আমার গৃহে অতিথি। অতিথিসেবা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। তুমি কিরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করিতেছ তাহা জানিতে পারিলে ও আমার অবস্থানুযায়ী হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রদান করিব।

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—মা, তোমার গৃহের শালগ্রাম শিলা আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। অন্য কোন দক্ষিণা আমার প্রার্থনীয় নহে।

ব্রাহ্মণকন্যা কিয়ৎকাল নির্ব্বাক রহিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতার স্বপ্নকথা ও শেষ অনুরোধ বর্ণনা করিয়া কহিলেন—দেব, তুমি শালগ্রাম শিলার পরিবর্ত্তে অন্য দক্ষিণা প্রার্থনা কর। আমি প্রাণপাত করিয়াও তোমার প্রার্থনা পূরণ করিব।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিলা ব্যতিরেকে অপর কিছুর জন্য গৃহীর গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দান করিয়া, তাঁহার দক্ষিণা মঞ্জুর করিতে বলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যা তখন গভীরচিন্তায় মগ্ন।

তখন সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন—দেখ মা, যদি আমার প্রার্থনা মত দক্ষিণা দান করিতে তোমার আপত্তি থাকে তবে তুমি তাহা না দিতে পার। আমি তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব না বা তজ্জন্য তোমার কোন প্রকার বিরক্তি উৎপাদন করিব না। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র, তোমার গৃহে অতিথি। যদি আমার ঈপ্সিত দক্ষিণা প্রাপ্ত না হই তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না, কিন্তু অভুক্ত অবস্থায় আমাকে এইস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

এখন আমরা অতিথিকে অর্দ্ধচন্দ্র দানে বিদায় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু সে সময় নরনারীর চিত্তবৃত্তি এরূপ ছিল না। অতিথি-সেবা তৎকালে হিন্দুর পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। অতিথি উপবাসী অবস্থায়

গৃহ হইতে চলিয়া গেলে গৃহী ঘোর অমঙ্গল আশঙ্কা করিত ও মহাপাপে পতিত হইবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিত।

একদিকে পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে আহার্য্য সমীপে উপবিষ্ট অতিথি ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীর অভুক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন—এই দুই চিন্তা ব্রাহ্মণকন্যাকে নিরতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, হিন্দুর গৃহ হইতে অভুক্ত অবস্থায় অতিথি ফিরিয়া যাইবে—ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন—তুমি আহার কর আমি অতিথিসেবাব্রত পালন করিব। সন্ন্যাসী আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণকন্যা তখন অতিথিকে দক্ষিণা প্রদানের উদ্যোগউদ্দেশ্যে দেব-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমনাদি সাঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার দক্ষিণা লইয়া আসিল না। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যার অনুসন্ধানে দেব-গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কেহ দ্বার মুক্ত করিল না। তিনি দ্বার ঠেলিলেন। ঠেলিবামাত্র তাহা মুক্ত হইল। গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন—যোগাসনে উপবিষ্টা ব্রাহ্মণকন্যার করদ্বয় বক্ষে নিবদ্ধ, চক্ষু মুদ্রিত—এই অবস্থায় তাঁহার উৎক্রান্তি ঘটিয়াছে।—সম্মুখে শিলা-মূর্ত্তি বিদ্যমান। এইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে বিহ্বল হইয়া মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ও পরে পল্লীর কয়েক ব্যক্তিকে তথায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণকন্যার দেহ সৎকারার্থে লইয়া গেল। সন্ন্যাসী শিলা-মূর্ত্তি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সত্যদেব কতদূর ভক্তপুরুষ ছিলেন, এই প্রবাদবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৪

শান্তিপুর হইতে আসিয়া সত্যদেব গুপ্তিপাড়ায় নিজ আশ্রমে শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, আর্ত্তের সাহায্য, পীড়িতের শুশ্রূষা তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল। গ্রামের নরনারী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত ও তাঁহার আশ্রমদেবতার পূজার নিমিত্ত রাশি রাশি দ্রব্য সামগ্রী তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত। তিনি ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রামবাসী ও দীনদুঃখীগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। আজীবন তিনি দেবসেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার আশ্রম দেবতা শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ নামে পরিচিত হইলেন।

যে স্থানে স্বামী সত্যদেবের কুটীর ছিল তাহার অনতিদূরে এখন শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্রের সুবৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। এইস্থানে আরও কয়েকটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। মন্দিরের অভ্যন্তর দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর সুন্দরভাবে চিত্রিত। মন্দিরটী এরূপ নিপুণতার সহিত চিত্রিত যে দেখিলে মনে হয় সবেমাত্র ইহার চিত্রাঙ্কণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তন্মধ্যে মর্ম্মর বেদী, তদুপরি শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণের অপরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত।

অন্য মন্দিরগুলির মধ্যে একটীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, অন্যটীতে কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের ও শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত শ্রীরাধার মূর্ত্তি। এই মন্দির কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির বলিয়া অভিহিত। অপর একটীতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের এক পার্শ্বে হনুমান ও অপর পার্শ্বে জানুবান করযোড়ে দণ্ডায়মান। আর একটী মন্দিরে গৌর ও নিতাই অধিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও সুচিত্রিত। এতদ্ভিন্ন একটী কক্ষে বহু শালগ্রাম শিলা ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন মূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে একটীর বহির্ভাগ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত।

৺বৃন্দাবনচন্দ্র এখন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। স্বামী সত্যদেব তাঁহার প্রথম মোহান্ত। অনেকে অনুমান করেন এই সকল সুদৃশ্য মন্দিরাদি তাঁহার পরবর্ত্তী মোহান্তদিগের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের সে শিলামূর্ত্তি এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে ও তৎ পরিবর্ত্তে তাঁহার পরবর্ত্তী মোহান্ত কর্ত্তৃক, এই ভোগমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া আজও—নরনারী ভক্তিভাবে স্বামী সত্যদেব সরস্বতীর বিষয় চিন্তা করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ

(ইংরাজি হইতে)

ফস্‌টাইনের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ভিনিসে। প্রথম আমি তাহার একখানি ক্ষুদ্র হস্ত দেখিতে পাই। সেই সুন্দর হস্তের চম্পক কলির ন্যায় সুগঠিত অঙ্গুলি-গুলি জলের উপর ন্যস্ত ছিল। আমি মনে মনে সেই সুগঠিত হস্তের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; ক্রমে আমার বজরা-খানি তাহার বজরার পার্শ্বে আসিবামাত্র চকিতের মত হস্তখানি অপসৃত হইল; সঙ্গে সঙ্গে জানালার পরদাখানিও সরিয়া গেল; কি দেখিলাম? দেখিলাম পরীর মত সুন্দরী ফসটাইন্ ঈষৎ হাস্যে রঞ্জিত মুখে আমারই দিকে চাহিয়া আছে? এমন রূপ বুঝি স্বর্গের অপ্সরারও বাঞ্ছনীয়। কুঞ্চিত স্বর্ণকেশদাম সেই সুন্দর মুখখানির চারিদিক বেড়িয়া আছে; কুটিল ভঙ্গিমা-পূর্ণ সুনীলনয়ন দুইটি হাস্যোজ্জ্বল। সৌর-চুম্বিত পদ্মরাগ তুল্য লজ্জারক্তিম সুপুষ্ট কপোল; পক্কবিম্বাধর হাস্যরঞ্জিত! আমি মাঝিদিগকে বজরা বাঁধিতে বলিলাম; ধীরে ধীরে তাহার বজরাখানি আমার বজরার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

জানালার সম্মুখে তাহার বদনখানি একটী প্রস্ফুটিত কমলের মত শোভা পাইতে ছিল। আমি অনিমেষ লোচনে সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলাম। কি উন্মাদনা, কি উত্তেজনাপূর্ণ সে রূপ! কিন্তু এত সৌন্দর্য্যেও তাহার একটী দোষ মোচন

করিতে পারে নাই,—সেটী তাহার নয়নের কুটিল ভাব! আমি তাহার সহিত কথা কহিলাম, অভিবাদন করিয়া বলিলাম—"মাদাম—আমি কি—"

"মাদাম নহি—আমি কুমারী, ২৫বৎসর বয়সেও কুমারী—আজীবন কুমারীই থাকিব।" এই কথা বলিয়াই সে মাঝিদিগকে বজরা চালাইতে বলিল; চকিত চমকের ন্যায় বজরাখানি আমার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে চলিয়া গেল। আমিও বজরা ছুটাইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার তাহার বজরার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ফস্‌টাইন্ আবার হাসিল।

"আবার কি চাও তুমি?"

"আলাপ করতে চাই"

"আলাপ ত আগেই হয়েছে?"

"আমি জানতে চাই তুমি কে?"

"আমি ফস্‌টাইন্।"

তাহার নামটী শুনিয়া আমার একটী পুরাতন ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। ততক্ষণে তাহার বজরাখানি আবার চলিতে লাগিল।

আমার নাম এন্‌টোনিনাস্। প্রাচীন ঘটনায় এন্‌টোনিনাস্ আর ফসটাইনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। সে কথা মনে হওয়ায় আমার একটু হাসি পাইল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ফস্‌টাইন্! এত তাড়া কিসের? দাঁড়াও না, আমিও ত যাব।"

আবার দুখানা বোট পাশাপাশি লাগিল, সে হাসিয়া বলিল, "আমি কে জান্‌তে চাও? আমি একজন সাপুড়িয়া;—লোকের কাছে আমি এতেই বিখ্যাত! আপাততঃ আমি রোম থেকে আসছি, আবার এক পক্ষের মধ্যেই সেখানে ফিরব। তারপর একবার প্যারী, পরে একবার লণ্ডন যাবারও ইচ্ছে আছে। তুমি দেখ্‌চি ইংরেজ!"

আমি তাহাকে আমার নাম ও ঠিকানা বলিলাম, সেও আমায় তাহার পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিল। শুনিলাম সে গ্রাণ্ড কেনেলের পরপারে একটী বাসা ভাড়া লইয়াছে। আরও শুনিলাম ভিনিসে সে দিনকয়েক বিশ্রাম লাভের জন্যই আসিয়াছে; কাজ কর্ম্মের জন্য মাত্র দুইজন ভৃত্য তাহার সহিত আসিয়াছে। ভিনিসে আমার দিনগুলা নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটিতেছিল; তাহাকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করিলে সে সানন্দে তাহা গ্রহণ করিল। শুনিলাম তাহাকেও তেমনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতে হয়। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমরা দুইজনে একত্রে আহারে বসিলাম।

আমি বলিলাম,—"একটা কোন হোটেলে থাকলে তোমার বেশ সুবিধে হ'ত ত' ফস্‌টাইন্!"

"তা' হ'ত বটে কিন্তু তারা আমার বন্ধুদের সেখানে জায়গা দিতে বড় নারাজ! বিশেষতঃ ষ্টিফেনোকে। বন্ধুরা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়। আমার যা কিছু অর্থ সম্পদ সকলই তাদের জন্য। আমার সঙ্গে থাকতে না পেলে তারা মনে বড় কষ্ট পায়। আমি যদি একবার তাদের ছেড়ে যাই তা' হ'লে আর পাব না; তখন আমার দুর্দ্দশা কি হবে?

"কারা তোমার বন্ধু ফস্‌টাইন্?"

"তারা আমার সমব্যবসায়ী, আমার

তারাই আমার ভৃত্য! আমার প্রত্যেক আদেশ তারা নতশিরে পালন করে। তারাই আমার যশ তারাই আমার অর্থ; আমি সাধারণ রমণীর মত থাকি বটে কিন্তু আমার মত ধনী খুব কমই আছে! বন্ধুরা আমার, যা কিছু উপার্জ্জন করে সবই আমার হাতে দেয়; আর তার পরিবর্ত্তে আমি তাদের স্নেহ করি, ভরণ পোষণ করি।"

আমি তাহার এ কুহেলিকাপূর্ণ আত্ম-পরিচয়ের কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কুমারী ফস্‌টাইন্ আর কিছু বলিল না। আমার মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল; তাহাকে আরও ভালরূপে জানিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। আমি তাহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে স্পষ্ট অসম্মতি জানাইয়া বলিল,—"তাতে আমার বন্ধুরা বড় অসন্তুষ্ট হবে; তা ছাড়া—" কুমারীর নেত্রে ভয়ের ছায়াপাত হইল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল,—"তা' ছাড়া তাতে তোমারও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে!"

"তা হ'ক আমি বিপদকে ভয় করিনা।"

"আমারও একটু বাধা আছে; ষ্টিফেনো আমার পুরুষ বন্ধুদের বড় একটা পছন্দ করে না।"

"এই অদ্ভুত ষ্টিফেনোটী কে কুমারি!"

সে কোন উত্তর দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল,—"কিন্তু বোধ হয় আমি মধ্যে মধ্যে তোমার এখানে এসে দেখা ক'ত্তে পারি, কিন্তু একটা কথা আছে।" কুমারী একবার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"তুমি কিন্তু আমায় প্রণয়ের চোক্ষে দেখো না।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া হাস্য দমন করিতে পারিলাম না। সহাস্যে বলিলাম, —"কিন্তু মনে কর, তা' যদি অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তাতে বিপদটা কি শুনি।"

"আমিও হয়ত তাতে অভিভূত হ'য়ে প'ড়তে পারি!"

"বেশত তাতেই বা এমন দোষটা কি?"

কুমারী অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল,—"ষ্টিফেনো।"

আমি বাধ্য হইয়া এ বিষয়ের তর্ক ত্যাগ করিলাম। তাহাকে বলিলাম,—"তুমি আমার কথায় বিশ্বাস ক'ত্তে পার। যখন তোমার ইচ্ছে হ'বে তখুনি আমার এখানে আসতে পার তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

সেও প্রতিদিন আসিত। বালকের ন্যায় নিষ্পাপ আমোদে আমাদিগের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত। ফস্‌টাইন্ নৃত্য গীতে বেশ পারদর্শী ছিল। নির্দ্দোষ আমোদে সর্ব্বদা আমায় সে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। অবশেষে একদিন শুনিলাম, পরদিবস সে রোমনগরীতে যাইবে। অন্য দিবস বৈকালে সে বেশ প্রফুল্ল থাকিত কিন্তু এই বিদায় উপলক্ষে সেদিন তাহার মন অবসাদগ্রস্ত দেখিলাম।

আমি স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, —"আমায় ছেড়ে যেতে হ'বে ব'লে কি তোমার কষ্ট হ'চ্চে?"

"হৃদয়ে আমার যেটুকু নারীত্ব আছে সেটুকু হাহাকার ক'রে কাঁদছে, কিন্তু বাকি

যেটুকু সাপ সেটুকু সাগ্রহে বাধা দিচ্চে তাতে।" বলিতে বলিতে কুমারী নেত্রাসারে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কুমারীর সহজ জ্ঞান আছে ত'? কিন্তু তাহার সেই সাপের কথা শুনিয়া তাহার জ্ঞান আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। কুমারী চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিল,--

"শোন এন্‌টনিয়ো! তুমি একদিন আমায় সাপ ব'লে ঠাট্টা ক'রেছিলে মনে আছে?" সে কথা আমার বেশ স্মরণ ছিল; তাহার সেই সর্পের ন্যায় বক্র গতি, অদ্ভুত প্রকারে মস্তক আন্দোলন করিবার অভ্যাস, মধ্যে মধ্যে সেইসুন্দর চক্ষুর কুটিল অথচ ভাবহীন দৃষ্টি প্রভৃতি দেখিলে তাহাকে সর্প বলিয়াই মনে হইত। কুমারী তাহার বক্ষের একস্থানের বস্ত্র কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া বলিল,—"এই দেখ সাপের চিহ্ন!"

আমি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই সর্পাকৃতিটী দেখিতে লাগিলাম। সেটি ঠিক একটী নিপুণ চিত্রকরের তুলিকানিঃসৃত নিখুঁত গোখুরা সর্পের চিত্র; তাহা এতই স্বাভাবিক যে চিত্র বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব। কোন উপায়ে যে সেটি কুমারীর দেহ হইতে অপসৃত করা যাইতে পারে তাহা মনে হইল না। দগ্ধ করিলেও সে চিহ্ন মুছিবার নহে।

সে বলিতে লাগিল,—"আমার জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মা একটি গোখুরা সাপের ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়েন। স্বপ্নে জাগরণে তাহার হাত হতে তিনি নিস্তার পান নাই। অবশেষে যখন আমি মাতৃহারা হ'য়ে পৃথিবীতে এলাম সেইক্ষণ থেকেই এই সাপের ছবি আমার বুকে অঙ্কিত; এ কৃত্রিম নয়, আজন্ম আমি এই ছবি ব'য়ে আসচি; এ ছবির চিত্রকর প্রকৃতি! ক্রমে আমি বড় হ'তে লাগলুম কিন্তু কোন দিন সাপকে ভয় করিনি।—আর সাপও আমার কাছে আসতে অসম্মত হয়নি। ডাকলেই তারা আমার কাছে আসতো, আমিও তাদের পালন ক'রে আসছি। আমার কাছে অনেকগুলি সাপ আছে, তাদের মধ্যে একজন রাজাও আছে সেটি গোখুরা! আমার পিতা বল্লেন "সাধারণের কাছে তুমি সাপের খেলা কর।" আমি তাঁর ইচ্ছাতেই কাজ ক'রলুম; সাফল্যও যথেষ্ট লাভ ক'রলুম। অনেক টাকাও উপার্জ্জন হ'ল। প্রায় দু'বছর হ'ল পিতা মারা গেছেন আমিও সেই থেকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি।

এ পর্য্যন্ত আমি কাকেও প্রণয়ের চোখে দেখিনি, কিন্তু—কিন্তু এখন——!" কুমারী হস্তের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ফস্‌টাইন্! কাল তবে তোমার যাওয়া স্থির?" সে মস্তক আন্দোলন করিয়া সম্মতি জানাইল। আমি বলিলাম—"বেশ যতক্ষণ এখানে আছ আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। তোমার বন্ধুদের যদি ছেড়ে থাকতে না চাও ত' এইখানে নিয়ে এস। আমার ঘরে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে তারা অনায়াসেই থাকতে পারে। আর চাই কি আজ রাত্রে আমায় একবার খেলাও দেখতে পার।"

সে তাহাতে সম্মত হইল। তাহার পর বলিল,—"কিন্তু ষ্টিফেনো সর্ব্বজ্ঞ; বড় হিংসুকেও

বটে। একবার একটা লোক আমায় চুম্বন ক'ত্তে চাওয়াতে সে তাকে হত্যা ক'রে ছিল।"

বরাবরই আমার ধারণা ছিল ষ্টিফেনো আলাপ করিবার উপযুক্ত লোক নহে। কিন্তু তবু আমি তাহার প্রতিহিংসা সহ্য করিব স্থির করিলাম। বোধ হয় ফস্‌টাইনও সেইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় ফস্‌টাইন্ তাহার ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিল। একে একে তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স হইতে সর্প বাহির করিতে লাগিল। দেখিলাম সকলেরই এক একটী নাম আছে, সেই নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্রই তাহারা নত শিরে তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। তাহার কথায় তাহারা ফস্‌টাইনের মস্তকে উঠিয়া সজীব গহনার মত ফণা বিস্তার করিয়া রহিল; অপরগুলি তাহার বাহু বেষ্টন করিয়া নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার পর সে গান গাহিতে আরম্ভ করিলে তালে তালে সর্পগুলি নৃত্য করিতে লাগিল।

দেখিলাম সকল সর্পগুলিই তীব্র বিষধর। সকল সর্পের আমি নাম জানি না, কিন্তু তন্মধ্যে গোখুরা ও অন্যান্য জাতীয় ভীষণ বিষধর সর্পেরও অভাব ছিল না। মানবের ক্ষণভঙ্গুর দেহের নিপাত করিতে তাহাদিগের একটি স্পর্শনই যথেষ্ট। তাহাদিগের ক্রীড়া-ভঙ্গী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইলেও তাহাতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ ছিল, কারণ কোন সর্পেরই বিষদন্ত ভঙ্গ করা হয় নাই।—সকল গুলিই তাজা, সকল গুলিই ভয়াবহ। খেলা শেষ হইলে ফস্‌টাইন্ তাহাদিগকে পুনরায় বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করিল। মানুষের সহিত লোকে যেরূপ কথা কহে ফস্‌টাইন তেমনি ভাবে সর্পের সহিত আলাপ করিতে লাগিল; তাহার পর একটি সুবৃহৎ গোখুরা সর্পকে লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সহকারে ব্রততী যেরূপ জড়াইয়া থাকে সেই বিষময় গোখুরাটি তেমনি ভাবে কুমারীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল।

সে দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—"এইটি রাজা।"

সর্পটী আমায় দর্শন করিবা মাত্র ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে করিতে লাগিল এবং স্বভাব সিদ্ধ বক্র গমনে আমার দিকে অগ্রসর হইল।

সে উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাকিল,—"ষ্টিফেনো!"

তবু ভাল, ষ্টিফেনো তবে শাপের নাম!

ষ্টিফেনো একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, ফণাবিস্তার করিয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়া একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কুমারীর দিকে অগ্রসর হইল। কুমারী সাগ্রহে তাহাকে তুলিয়া লইল। ভয়ে তখন তাহার মুখ খানি শবের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

"কোনটা বন্ধুর বাড়ী আর কোনটা শত্রুর বাড়ী তা তোমার বোঝা উচিত ষ্টিফেনো! তোমার হিংসারও একটা সীমা থাকা উচিত। ওগো আমার প্রভু! ওগো শাপের রাজা! কোথায় তোমার রাজার মত উদার হৃদয়?" বড় আগ্রহ ভরে, বড় একাগ্রতার সহিত কুমারী ষ্টিফেনোকে কথা গুলি বলিতেছিল। আমি তাহার দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া

বলিলাম,—তোমার ও অসভ্য বন্ধুটীকে রেখে এস।"

কুমারী হস্তের ইঙ্গিতে আমায় দূরে সরিয়া যাইতে বলিয়া বলিতে লাগিল,—"এর কাছে এস না; আগে থেকেই এ রেগে আছে আর একটু রাগলেই তোমার প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হ'য়ে প'ড়বে।" তাহার পর সর্পকে বলিতে লাগিল,—"ষ্টিফেনো, প্রভু আমার! কেন তুমি মিছে সন্দেহ কচ্চ? তুমি ভিন্ন আমি জগতের আর কাকেও ভাল বাসি না। সে কথা এখন থাক, একবার নাচ, ঐ এক জন বন্ধু তোমার নাচ দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।"

কুমারী মাটিতে বসিয়া একটী চাবি বাজাইতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ সর্প অত্যদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিল।—এমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই।

নৃত্য শেষ হইলে কুমারী ষ্টিফেনোকে বলিল,—"এই বার আমায় বল, তুমি আমায় কত ভাল বাস!"

সর্পটী তাহার সুবিস্তৃত ফণাটী কুমারীর লজ্জা রক্তিম কপোলে স্থাপন করিল। কুমারী সেটি মুখের অতি সন্নিকটে ধরিয়া বলিল,—"চুম্বন ক'রবে কি প্রিয়তম! তোমার একটী চুম্বনেই কিন্তু আমি ম'রে যাব।"

প্রণয়িনীর ন্যায় সে সর্পের সহিত নানারূপ আলাপ করিতে লাগিল। কি ভয়াবহ সে স্বয়ম্প্রণয়! বহুবার আমার অন্তরাত্মা ভয় ও বিস্ময়ে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যতক্ষণ না সেটী বাক্সের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল ততক্ষণ আমি স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারি নাই। অবশেষে সেটী বাক্সে অবরুদ্ধ হইল, আমরা সন্ধ্যাভোজনে নিযুক্ত হইলাম।

ভোজন শেষে আমি সর্পের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। আমি তখন ফস্‌টাইনের কথা ভাবিতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। দীর্ঘ কাল সর্পের সহিত বাস করায় সে কি আমার মত সর্পের কথা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আমার সে কথা মনে না থাকার আরও কারণ ছিল। কুমারী তখন তাহার সেই সুকোমল দেহযষ্টি আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া কপোলে কপোল স্থাপন করিয়া বসিয়া ছিল কাজেই জগৎ তখন আমার দৃষ্টির বহির্ভূত। কক্ষের বহির্ভাগে সর্পগুলি তখন বাক্সের মধ্যে সুখে নিদ্রা ভোগ করিতেছিল।

কুমারী অনুচ্চ স্বরে বলিল,—"আমি যে এমন ক'রে তোমার কাছে ব'সে আছি এ কথা একবার জানতে পারলে ষ্টিফেনো কি ক'রবে জান? খুব সম্ভব কাল সকালে সে সব কথা জানতে পারবে, আর তখন তোমায় মারবার সুযোগ খুঁজবে। আমি কিন্তু রোমে না পৌঁছে ওকে আর বার ক'রব না।"

"কি পাগলের মত বোকচ তুমি?"

"না প্রিয়তম! তুমি জাননা ওকে। আমার বুকের সেই সাপের ছবির কথা মনে নেই? আমি জন্মাবার আগে ষ্টিফেনোই ছিলুম;—একথা কল্পনা মনে ক'রনা, মা এক দিন রাত্রে নিজে এসে আমায় ব'লে গেছেন। ষ্টিফেনোই আমার সতীত্বের একমাত্র রক্ষক। তোমার মনে আছে বোধ হয় যে মা একদা সাপের ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন?—সেটী মেদি সাপ; শেষে মা একদিন সেটাকে

মেরে ফেলেন। সেটা ষ্টিফেনোর অর্দ্ধাঙ্গী ছিল; মৃত্যুর পর তার আত্মা আমার শরীরে প্রবেশ করে। আমি একদিন একটা বনের ভিতর বেড়াচ্ছিলুম এমন সময় ষ্টিফেনো এসে আমার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ল। আমি তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। সেই রাত্রেই মা আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে সকল কথা ব'লে যান। ষ্টিফেনোর বংশ খুব প্রাচীন ও পূজ্য। ওর পূর্ব্বপুরুষরা পাঁচফণা সাপ। এত দিনে আমি তার বিশ্বাস হারিয়েছি; কি জানি কি প্রতিশোধ সে নেবে!"

আমি অজস্র চুম্বন দানে তাহার ভয় ও উদ্বেগ দূর করিলাম। সে কি পাগল?—কিন্তু তাহা হইলেও সে যে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের প্রণয়িনী হইতে পারিত;—এমনি নিখুঁত তাহার রূপ! আর সে পাগল হইলেও প্রণয়ের বলে যে তাহাকে আমি আরোগ্য করিতে পারিব তাহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রাতে আমি তাহার জন্য কিছু ফল আনিতে যাইতেছিলাম, কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাহার নয়ন পল্লব উন্মুক্ত হইল; দেখিলাম তাহাতে ভাবহীন অদ্ভুত দৃষ্টি খেলিয়া বেড়াইতেছে; বদন কষ্ট-ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যময়। অঙ্গুলিগুলিও দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ!

আমি নিরাশ ব্যাকুল স্বরে ডাকিলাম,—"ফস্‌টাইন্!"

কোন উত্তর পাইলাম না; তাহার দেহে একটু স্পন্দনও অনুভূত হইল না। তাহার বক্ষের উন্মুক্ত অংশে সেই সর্পের চিত্র লক্ষিত হইল। ক্ষণমধ্যে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম সেই চিত্র বাস্তবে পরিণত হইল। তাহার হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে সর্পের সুবিস্তৃত ফণা উত্থিত হইতেছিল। তাহার ক্রোধ রঞ্জিত ভীষণ দৃষ্টি তখন আমারই উপর সংবদ্ধ!

"সে সেই সর্পরাজ—ষ্টিফেনো!"

উদ্বেগআকুলিত স্বরে আমি আবার ডাকিলাম,—"ফস্‌টাইন্!"

প্রত্যুত্তরস্বরূপ সেই ভয়াবহ সর্প ভূমে অবতরণ করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দ্রুতপদে আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

আমার শয়ন কক্ষে একটী পিস্তল ছিল ক্ষিপ্র হস্তে সেইটী লইয়া পুনরায় সর্পের সম্মুখীন্ হইলাম। পিস্তলের ধূম ও অগ্নি উদ্গীরণের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিফেনোর প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। দ্রুতপদে ফস্‌টাইনের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাহার দেহ তখন তুষারশীতল; প্রাণপক্ষী বহুক্ষণ সে দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছিল। ষ্টিফেনো তাহার জাতীয় স্বভাবসুলভ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হর্ষবর্দ্ধন

(সিলভ্যা লেভির ফরাসী হইতে)

খুব সম্ভব বড় বড় রাজাদের রাজসভায়, কালিদাসের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীস্বরূপ কতকগুলি কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সঠিক্ কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না এইরূপ যে কয়েকটি কবির নাম আমাদের কাল-পর্য্যন্ত কোনপ্রকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বোধ হয় তাঁহাদিগকে ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু যে কবির আবির্ভাবকাল সঠিক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাঁহার পরিচয় লাভ করিতে হইলে একেবারে শতবর্ষকাল অতিক্রম করিতে হয়। রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবাদির ফলে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য শিপ্রা নদীর তীর হইতে গঙ্গাতীরে —উজ্জয়িনী হইতে কান্যকুব্জে, চলিয়া গিয়াছিল। তখনকার কবি শুধু একজন রাজার সভাকবি ছিলেন না, পরন্তু একজন পরাক্রান্ত রাজার সভাকবি—সমস্ত উত্তর-ভারতের একছত্র-অধিপতির সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন —যিনি শীলাদিত্য নামেও পরিচিত—তিনি ধর্ম্মবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, সেই যুগের তাবৎ মনীষীগণকে আপনার সমীপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরম ভক্ত বাণ ও ময়ুর, এবং জৈন আচার্য্য মাতঙ্গদিবাকর—উঁহাদের উভয়ের প্রতিই তিনি সমান আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হিউএন্-সাং যখন তাঁহার পুণ্য-ভ্রমণপথে বাহির হইয়া কনৌজে আসিয়া থামিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রভূত সম্মান-সহকারে গৃহীত হন। সাহিত্যিক অনুরাগ বশতঃ শ্রীহর্ষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কেন না, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পুলিকেশী তাঁহাকে পরাভূত করেন। কিন্তু তাঁহার বিজেতার নাম ইতিহাসে বিলুপ্তপ্রায়—পক্ষান্তরে সাহিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষের নাম সাহিত্যগ্রন্থে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বাণ কবি কবিত্বময় গদ্যে আখ্যায়িকার আকারে হর্ষচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের অষ্টঅধ্যায়মাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হয়ত গ্রন্থকার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অথবা কালপ্রভাবে শেষাংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। ইতিহাস এই গ্রন্থ হইতে বড় একটা লাভবান হইতে পারে নাই। ভাগ্য-ক্রমে, চীনীয় পরিব্রাজক হিউএন-সাং তাঁহার স্মৃতিলিপি-গ্রন্থে কনৌজ রাজ্যের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে, আমরা জানিতে পারিয়াছি —শ্রীহর্ষদেব ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এবং ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

শ্রীহর্ষ বুদ্ধের সম্মানার্থে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন (অষ্টমহাশ্রীচৈত্য স্তোত্র)। দশম শতাব্দীতে লিখিত উহার একটি চীনীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত তিনখানি নাটক আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে: রত্নাবলী, প্রিয়দর্শী, ও নাগানন্দ।

উহা যে রাজ লেখনী-প্রসূত তাহার প্রমাণ প্রস্তাবনার এক-একটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি...ইত্যাদি" (রত্নাবলী প্রিয়দর্শী, নাগানন্দ) কিন্তু বহুদিন হইতে একটা কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে, এবং বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক উহা সমর্থিত হইয়াছে যে রাজা শ্রীহর্ষ উক্ত নাটকগুলির রচয়িতা নহেন। "কাব্য প্রকাশ" শুধু রাজার দাতব্যতার কথা স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন,— "রাজা বাণ কবিকে প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন" ইত্যাদি...;" কিন্তু ভাষ্যকারেরা সকলেই উক্ত বাক্যটির সম্বন্ধে একটি কাহিনী বিবৃত করিয়া থাকেন:—শ্রীহর্ষ বাণ কবির নিকট হইতে মূল্য দিয়া "রত্নাবলী" নাটক খানি ক্রয় করেন। ভাষ্যকারদিগের ঐকমত্য সত্ত্বেও উহা হইতে কিছুই সপ্রমাণ হয় না। খুব সম্ভব উহারা পরস্পরের অবিকল নকল করিয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে হর্ষের নাম নাট্য-অঙ্গ "নাটিকার" সহিত জড়িত। রত্নাবলীও প্রিয়দর্শিকা উভয়ই উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এই দুই নাটিকার আখ্যান-বস্তুটি রাজা বৎস-উদয়নের যুগ হইতে গৃহীত। এই চপলচিত্ত নৃপতির প্রেম-লীলা উক্ত দুই নাটিকাতেই বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভাস-কবিও উহা নাট্যাকারে প্রদর্শন করেন। কালিদাসের নাটকে, বিশেষত মালবিকাগ্নিমিত্রে যে সকল অবস্থা, যে সকল ঘটনা, বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল নাট্য-কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে, হর্ষ অসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু মৌলিক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকারদিগের রচনাবলীর —বিশেষত ভাস-কবির রচনাবলীর অনুসরণে বা অনুকরণে লিখিত। যেমন মনে কর, অগ্নিদাহের চিত্রটি। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে নাটকীয় উদ্‌ভাবনা-শক্তি সাধারণের নিকট তেমন সমাদৃত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এবং সেইজন্য হর্ষও ঘটনার বিচিত্র সম্মিলন প্রদর্শন করিয়া দর্শনকগুলীকে বিস্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই। মালবিকার আখ্যানবস্তুর অবিকল পুনরাবৃত্তি রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়। কেবল নামগুলিই পৃথক। (ক্রমশঃ)

শ্রীজোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুইস্‌দিগের গার্হস্থ্য জীবন

আল্পসের (Alps) বরফপ্রাচীরঘেরা ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ড য়ুরোপের নক্সায় বাস্তবিকই এইটুকু এক টুক্‌রা স্থান ব'লেই মনে হয়। কারণ হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ড সমতল এবং নিম্নভূমি না হওয়ায় সাধারণ নক্সায় ইহার আয়তন এবং জমির পরিমাণ ঠিক বোঝা যায় না। তার পর, ইহার আকাশভেদী পর্ব্বতমালা, অনন্ত তুষার ক্ষেত্র, বরফগলা নদী, হিম-ভরা অন্ধকার গিরিকন্দর, পাহাড়ের কোণে আধ ঘুমন্ত হ্রদ, কুয়াসাচ্ছন্ন ফার (Fir) পাইনের জঙ্গল, সুন্দর ঝরণা, জলপ্রপাত

প্রভৃতি এ'কে প্রকৃতির এক রম্য কানন আর কবির দেশ করে রেখেছে।

বসন্তকালে যখন মাঠ-আলো-করা, আঙুর ভরা ক্ষেত থেকে দক্ষিণা পবন তার সুরভি টুকু চুরি করে' নিয়ে বেড়ায়, যখন সুইস্‌রা জাঁকাল পোষাক প'রে, মেয়ে পুরুষে দলে দলে, নেচে গেয়ে, ডালা ভ'রে ভ'রে আঙুর তুলে বেড়ায়, তখন কে বিশ্বাস করবে যে আর কিছুদিন পরেই এ সব জায়গা শীত, কুয়াসা, অন্ধকার, বৃষ্টিতে ডুবে যাবে! এখানকার কৃষকদিগের প্রধান ফসল হোচ্চে—আঙুর। সমস্ত পাহাড়ময় আঙুরের ক্ষেত। সে এক দৃশ্যই চমৎকার! বিশেষতঃ যখন গাছ ভরে' ভরে' লাল লাল গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফুল ধরে! ভাল আঙুর ক্ষেতের এক একর (Acre প্রায় ৩ বিঘা) জমির দাম প্রায় ৭৫০০৲। কিন্তু সে আঙুর মোটে ।৵০ আনায় সের বিক্রয় হয়। একে ত মজুরি এদেশে সস্তা, তার উপর এরা এত মিতব্যয়ী যে কোনও জিনিষ টুকু বৃথা নষ্ট করে না। আঙুরের পাতা, ডাঁটা, বোঁটা, গরুদের খেতে দেয় আর তার রস বার করবার পর যে শিটা গুলো থাকে, সে গুলো শুকিয়ে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করে। কোথাও কোথাও আঙুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে, অল্প মকাইএরও চাষ করে। এদের বিখ্যাত মদ এই আঙুরের রস থেকেই হয়। কখনকখনও ক্ষেতের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত ক'রে, তার মধ্যে মদ তৈয়ারী করবার জন্য আঙুর গুলোকে পচতে দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে, তারা প্রাণ ভ'রে এই আঙুর রস পান করে। এক বর্গ ফুট্ জমিতে বছরে প্রায় দু' বোতল মদ হয়। মদ তৈয়ারী ক'রে তারা সে মদ বোতলে পুরে মাটির ভিতরে এক ছোট কুট্‌রীর মধ্যে বোঝাই করে' রাখে। তাতে মদ ভাল থাকে এবং শীঘ্র নষ্ট হয় না। ওরূপ এক বোতল মদ অনায়াসে ৫০।৬০ বছর থাকে। সুইস্‌দের বিশ্বাস যে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ এই মদ খেতে পারলে যক্ষ্মা রোগীরা অনায়াসে ব্যাধিমুক্ত হতে পারে। সুইস্ কৃষকদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই দারিদ্র্য রাক্ষসীর হাত হ'তে দূরে বাস করে। হাটবারে, তারা স্ত্রী পুরুষে গাড়ী বোঝাই হ'য়ে, নানা রকম ভাল ভাল পোষাক প'রে বেচা কেনা কর্ত্তে যায়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল; শরীর স্বাস্থ্যবান্। ফার আর পাইন্ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পাহাড়ে রাস্তা বেয়ে সুইস্‌দের গ্রাম্য কুটির গুলাতে পঁহুছান যায়। পাহাড়ের উপরে আশে পাশে চারদিকে জমীতে লতান ছোট সবুজ গাছে লাল লাল ষ্ট্রবেরী ফল (Strawberry) আর নীচে পাহাড়ের গায়ে ধব্‌ধবে সাদা নারসিসাস্ (Narsisus) ফুল ফুটে হাওয়ায় ঢেউ খেল্‌তে থাকে। তাদের কুটির গুলি পাইন্ কাটের তৈয়ারী; উপরে খুব পাতলা, পাতলা, তক্তা দিয়া ছাওয়া। পাছে, সে গুলা ঝড়ে উড়ে যায় সেইজন্য তার উপর ভারী ভারী পাথর চাপান। সুইস্‌দের বাড়ীর প্রধান সৌন্দর্য্য হোচ্চে তা'দের কারুকার্য্য খচিত সুন্দর সুন্দর জানালায়। তা'দের গৃহ পালিত পশুদের মধ্যে গরু আর ছাগলই প্রধান। এক একটা রাখাল বালক প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী থেকে সমস্ত গরু গুলি নিয়ে দূর পাহাড়ের উপরে চরে

যায়। সারা দিন তা'র উপরে গরু চরিয়ে বেড়ায়, আর সূর্য্যাস্তের আগেই ভেঁপু বাজাতে বাজাতে পল্লী অঞ্চলে নেমে আসে। অনেক দূর হতে গৃহস্থের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সে বাঁশীর রব শুনে বুঝতে পারে, যে তাদের গরুরা ফিরে আস্‌ছে। তারা ফিরলে ছেলে মেয়েরা বাছুরদের গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে আদর করে। এই রাখালবালকেরা দুধ আর আলু খেয়েই প্রায় দুবেলা কাটিয়ে দেয়। গ্রীষ্মকালের ক' মাসের মধ্যে এক একটা গরুর দুধ থেকে প্রায় ১ মণ ১।০ মণ করে পনীর উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে, বিবাহের সময় বর এবং কনের বন্ধু বান্ধবেরা সকলে মিলিত হোয়ে একটা প্রকাণ্ড পনীর স্তূপ তাদের উপহার দিত। এবং সেই জমাট পনীর-পিণ্ড বংশানুক্রমে পিতা হ'তে পুত্র ভোগ দখল করত। তাতেই তাদের সন্তান সন্ততি প্রভৃতির, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি স্মরণীয় ঘটনা সকল লেখা থাকত। ১৬৬০ খৃঃ অব্দের কোনকোনও পুরাতন পনীরপিণ্ড এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এ দেশের কোন কোন স্থানে এই পনীরই লোকদের প্রধান খাদ্য। এবং সেখানে মজুরদের পারিশ্রমিকের জন্য পয়সার পরিবর্ত্তে পনীরই দেওয়া হয়। যখন টাট্‌কা পনীর বেশী পরিমাণে খেয়ে কারও পেটের পীড়া হয়—তখন তাকে খানিকটা পুরাতন পনীর দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস যে, এতেই তার অসুখ সেরে যাবে। পনীর পিণ্ড যত বড় হয়, ততই ভাল এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। কাউকে কাউকে ২ মণ ২।০ মণ ওজনের এক একটি পিণ্ড কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এক মাত্র ফ্রান্সই, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের নিকট থেকে বৎসরে প্রায় ৩৮০০০ মণ পনীর ক্রয় করে। গৃহস্থবাটিতে কোনও অতিথি অভ্যাগত এলে গৃহস্বামী তাকে যত্ন করে অতি পুরাতন পনীরের প্রস্তুত খাদ্য খেতে দেয়। মান্ধাতার আমলের গমের রুটি আর বহু কালের শুষ্ক শূকরের মাংসও তাদের প্রিয় খাদ্য। সুইস্‌রা মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য (Confection) খুব বিখ্যাত। এ জন্য য়ুরোপ ময় তাদের একটা সুনাম আছে। য়ুরোপের বড় বড় সহরের ধনী লোকের গৃহে এবং হোটেলে সুইস্ হালুইকার (Pastry Cooks) নিযুক্ত আছে। ভাল ভাল কেক্, নানা রকম ফলের উৎকৃষ্ট পিটে তারা সারা দিনই খায়। এবং দিনের মধ্যে অনেকবার কফি পান করে। সুইস্‌রা খুব ভাল শীকারী। তারা বন্দুক নিয়ে অ্যাল্পস্ পাহাড়ে শ্যাময় হরিণের (Chamois) অনুসন্ধানে বেড়ায়। একবার, একটি সুইস্ যুবা একটা শ্যাময় লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ গভীর 'খদের' মধ্যে পড়ে যায়। এবং সেখানে উপরে বা নীচে কোনও দিকে পা' বাড়ান সম্ভব না হওয়ায় তিন দিন তিন রাত্রি সেইরূপ অবস্থায় সেইখানে পড়ে থাকে। চতুর্থ দিনে সৌভাগ্য ক্রমে, একদল শিকারী সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে দড়ির সাহায্যে টেনে উপরে তোলে।

আর একবার আর একজন শিকারী পদস্খলিত হয়ে হঠাৎ প্রায় ১৩০০ ফুট নীচে এক পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যায়।

সন্ধ্যার সময়ও পুত্র গৃহে ফিরল না দেখে তার পিতা পুত্রের খোঁজে বার হয়ে দেখেন যে পাহাড় থেকে নীচে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করে শোকার্ত্ত পিতা প্রায় ৬ ক্রোশ পথ বয়ে গৃহে ফিরলেন। অ্যাল্পস্ দূর হতে দেখতে শুধু শোভার ভাণ্ডার! তথায় শুধু তুষার স্তূপ, আলোর খেলা, মেঘের লীলা আর কুয়াসা বৃষ্টির ছড়াছড়ি। কিন্তু প্রতিদিন এর কোলে ঐরূপ কত ভীষণ আকস্মিক ঘটনা ঘটছে তার নির্ণয় কে করে!

সুইস্‌রা লাভের আশাতেই শ্যাময় শিকারের জন্য প্রাণপণ করে না। এটা তাদের জাতীয় ক্রীড়া। এতে প্রচুর আনন্দ পায় ও যথেষ্ট সাহস দেখাতে পারে। গরুছাগল ছাড়া সুইস্‌দিগের গৃহে অশ্বতর (mules) একটা সম্পত্তি বিশেষ। পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ খাড়াই পথের উপর দিয়ে জিনিষপত্র বহন করতে এরকম প্রাণী আর দ্বিতীয় নেই। সুইসদিগের প্রধান খাদ্য হচ্ছে দুধ। প্রায় সকলের গৃহেই দুগ্ধবতী কোনও না কোন রকম পশু আছে। যারা নিতান্তই গরীব এবং হতভাগা তাদেরই গোয়াল এই শ্রেণীর পশু শূন্য। এইরূপ মন্দভাগ্যদের জন্য আগষ্ট মাসের প্রতি তৃতীয় রবিবারে বিনামূল্যে দুধের ননি (cream) বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

নির্জ্জন আল্পসের গ্রাম্য কুটিরের মধ্যেই কেবল খাঁটি সুইস্ ভাব দেখতে পাওয়া যায়। সহরে, বিজাতীয় সভ্যতা এবং কৃত্রিমতা-পূর্ণ সুইজারল্যাণ্ডে অভাব বা দারিদ্র্য অতি অল্প লোকেই অনুভব করে। কারণ, তারা স্বাধীন, কষ্টসহিষ্ণু, মিতব্যয়ী এবং অল্পে সন্তুষ্ট। গগনস্পর্শী আল্পস্ এবং তার বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাস তাদের শরীর ও মনকে দৃঢ় করেছে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতীয় সমর তাদের আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়েছে। তাদের জাতীয় চরিত্র হতেই তাদের দেশের আইন কানুন রচিত হয়েছে। কোন লোকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা না হওয়া তার নিজের ইচ্ছা এবং সাধ্যের উপর নির্ভর করে। যদি তার কোনরূপ বিষয় সম্পত্তি না থাকে, অথবা যদি সে মনে করে, যে তার নিজের বাসগৃহ, আগুন এবং দস্যু তস্করের হাত হতে রক্ষা করবার যথেষ্ট শক্তি তার নাই তা হলে সমাজ তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে না। প্রত্যেক পুরুষেরই নিজের এক দফা সৈনিক পোষাক (uniform) এবং অস্ত্র, একগাছি কুঠারী, একটি বাল্‌তি এবং একটি মই থাকা চাই-ই-চাই। এইরূপে প্রত্যেকেরই বাল্যকাল হতে দায়িত্ব জ্ঞান জন্মে। সুইস্ মহিলারা সূচী কার্য্যে এবং অন্যান্য শিল্পকার্য্যে বেশ সুনিপুণ। নানারূপ গৃহকার্য্যেও তাদের বেশ দক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিকট এক এক খানি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ না থাকলে পুরোহিত মহাশয় তাদের বিবাহ দিতে আইন অনুসারে অসমর্থ। সুইজারল্যাণ্ডে পুত্রকন্যারা পিতার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিরই সমান ভাগ পায়। এমন কি

কোন একটি গাছের ফলও তারা সমান অংশে ভাগ ক'রে নেয়। পিতার একখানি চেয়ার বা একটি টেবিলও তারা করাতে কেটে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না। সাধারণ কলহ বিবাদ যে সুইস্‌দের মধ্যে নাই, এমন কথা বলা যায় না। প্রয়োজন হলেই তারা উকীলের শরণাপন্ন হয়। সুইস্‌রা যদিও বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান্ তথাপি তারা রোগ পীড়া হতে একেবারে মুক্ত নয়। গলগণ্ড জাতীয় রোগই এখানে বেশী প্রবল। এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যেই সাধারণত গলগণ্ড বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

ইহারা কাঠের খোদাই কার্য্যে, নানারূপ সুন্দর সুন্দর জরীর কার্য্যে এবং ঘড়ীপ্রস্তুত কার্য্যে খুব সুনিপুণ। প্রত্যেক বৎসরেই জিনাভা (Geneva) এবং বার্ণনগরে (Berne) প্রকাণ্ড শিল্প প্রদর্শনী হয়; তাতে সুইস্-জারল্যাণ্ডের প্রতি প্রদেশ থেকে নানারূপ উৎকৃষ্ট জিনিষের আমদানি হয়ে থাকে। অধিকাংশ সুইস্ প্রাপ্তবয়স্ক হলেই কোনরূপ শিল্প শিক্ষার জন্য কিছুকাল বিদেশে গিয়ে অতিবাহিত করে এবং শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করে স্বদেশে ফিরে আসে। তখন তারা নিজের কারখানা খুলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে, উপার্জ্জিত অর্থ কিরূপে সঞ্চয় করে রাখতে হয় তাও সুইসরা বিলক্ষণ জানে। সুইসদের মধ্যে একটি প্রবাদ চলিত আছে যে "একজন সুইস্‌কে ঠকাতে দশটা ইহুদীর (Jew) দরকার" এবং যেহেতু সুইস্‌দের মধ্যে জেনেভার লোকেরা বেশী চালাক সেইজন্য "একজন জেনেভিয়কে ঠকাতে দশটা সুইসের দরকার।"

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত

ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের একটী ঐতিহাসিক প্রমাণ

স্বদেশের ন্যায় মনুষ্যের আর কোন স্থানই অধিক প্রিয় নহে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই সুপ্রচলিত প্রবাদ বাক্যে স্বদেশ স্বর্গেরও উপরে স্থান পাইয়াছে। আর্য্যগণ আপনাদের অধিবাসস্থান হইতে যখন অন্যত্র বাসের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মনে যে জন্মভূমির মধুর স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহাদের অগ্রগতিতে তাঁহারা এই স্মৃতিই বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। এই অগ্রগতিতে তাঁহারা স্বদেশ হইতে যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন ততই স্বদেশ-স্মৃতি তাঁহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা স্বদেশের স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া আপনাদের স্বদেশবিচ্ছেদকষ্টের লাঘব করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই স্মৃতি-চিহ্ন এরূপই অক্ষয়াক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে

প্রস্তরাঙ্কিত লিপি অপেক্ষাও এই লিপি এখনও স্পষ্টতর দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়টী স্মৃতিচিহ্ন—কুরুজাঙ্গল, কুরাম্ (গিরিশঙ্কট) ও কারাকুরাম্ (পর্ব্বত মালা) নামে পরিচিত। কুরুজাঙ্গলের আদিতে আমরা যে কুরুশব্দের যোগ দেখিতে পাই—তাহা হইতেই বুঝিতে পারি যে কুরুনাম হইতেই ইহার উৎপত্তি। এই কুরুনাম আবার আর্য্যদিগের আদিনিবাস উত্তরকুরু নাম হইতেই আসিয়াছে। কুরাম্ ও কারাকুরাম্ যে কুরু শব্দেরই অপভ্রংশ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হয়। পুরাণে আমরা উত্তরকুরুকে কুরু নামেও উল্লিখিত দেখিতে পাই। উভয়ই জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উভয়ই যে অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব উত্তরকুরু নাম হইতেই যে, কুরুজাঙ্গল, কুরাম্ ও কারাকুরাম্ প্রভৃতি নাম হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়। গ্রীক্‌দিগের দ্বারা কুরুশব্দের বিকৃতিতেই কুরাম্ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—কারণ প্লিনির লেখায় উত্তরকুরু 'অত্তকোরম্' রূপে বিকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে! "প্লিনি 'অত্তকোরম্' নামে একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহার সহিত সংস্কৃত উত্তরকুরুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়॥"

এই প্রকারে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইলে পর যথায় তাঁহাদের নিষ্কণ্টক উপনিবেশ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহার নামও তাঁহারা স্বদেশের নামানুসারে 'কুরু' দেশ রাখেন। সুপ্রসিদ্ধ 'কুরুক্ষেত্র' এই কুরুদেশেরই বিভাগ বিশেষ। এই কুরুক্ষেত্র নামেও আর্য্যদিগের আদিনিবাস উত্তরকুরু বা কুরুর যোগই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণে 'কুরুক্ষেত্র' নামের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহাতে ইহা কুরুবংশীয়দিগের আদি পুরুষ কুরুনামক রাজকর্ত্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়াই এই নাম হইয়াছে জানিতে পারা যায়। ইহাতে অপর একটী ঐতিহাসিক সত্যেরও সন্ধান আমরা পাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আর্য্যগণ আপনাদের নবাবিষ্কৃত স্থান সকলেরই কেবল স্বদেশের নামে নামকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু উত্তরকুরু বা কুরুর নামে তাঁহারা নিজেদের পরিচয় দিয়া তবেই সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উত্তরকুরুবাসীদিগেরই বংশধর তাহারই পরিচয় দিবার জন্যই তাঁহারা আপনাদিগকে কুরুনামে আখ্যাত করিলেন। কুরুনামক রাজাকে কুরুবংশের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করা হয়—তাহা অনুমানমূলক বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন (Ragozin) এ সম্বন্ধে তদীয় 'বৈদিক ভারত' (Vedic India) নামক গ্রন্থে "এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন করিতেছে। এখানে আমরা সেই মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিতেছি;—

"তাঁহার (ত্রসদস্যুর) বংশীয় লোকেরা ক্রমে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কুরুনামে পরিচিত হইল। এই কুরুগণ দেশে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাকাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। এই নাম পরিবর্ত্তন যথারীতি

বংশ সম্বন্ধীয় একটী উপকথা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কুরু, কুৎসের প্রদৌহিত্র ছিলেন এবং তিনি এরূপই মহীয়ান্ রাজা ছিলেন যে সমগ্র জাতিই তাঁহার নামেই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল"।(১)

ত্রসদস্যু কুৎসের দৌহিত্র ছিলেন। কুরু তাহা হইলে ত্রসদস্যুরই পুত্র হন। কুৎস ও ত্রসদস্যু উভয়ই বৈদিক নাম। কিন্তু কুরু-নামের কোন উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না। অথচ ইহার স্বজাতীয় লোকসকলকে, মহাভারতে কুরু নামে অভিহিত দেখা যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে 'কুরু' নামটী ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না; সম্ভবতঃ উত্তরকুরুবাসী বলিয়া ইহা আর্য্যদিগের জাতীয় নামই ছিল। জাতীয় নাম বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে আর কোন পূর্ণ বিবরণ দেখা যায় না।

এই কুরুগণ এরূপই প্রসিদ্ধিলাভ করেন যে বিদেশেও, ইহাদেরই নামানুসারে প্রাচীন ভারতবর্ষ 'কুরুদেশ' বলিয়া পরিচিত হয়। তাহাতেই আসিরিয়ার ইতিহাসে ভারতবর্ষকে আমরা কুর বা কুঢ় (Kur-kurra) নামে উল্লিখিত দেখিতে পাই। (২) প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমিও উত্তরকুরুকে ওত্তরকোর্হ লিখিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) আসিরীয়দিগের 'কুঢ়' ও টলেমির 'কোর্হ' এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্যই লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমানে আমরা যেমন পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকদিগের স্বদেশের নামানুসারে নিউ ইংলণ্ড (New England), নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌স্ (New South Wales) প্রভৃতি উপনিবেশ স্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই; কুরুদেশও তদ্রূপ আর্য্যদিগের আদি জন্ম-ভূমি উত্তরকুরু বা কুরুর নামে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ।

"উত্তর কুরু" নামে পরিজ্ঞাত আর্য্যদিগের আদি নিবাস প্রথম "কুরু" নামেই কথিত হইত বলিয়া বোধ হয়। আমরা উত্তরকুরুর উল্লেখ পুরাণাদিতে যেখানে যেখানে পাই সেখানে সেখানেই 'উত্তর' বিশেষণটী কুরুর সঙ্গে একত্র যুক্ত না থাকিয়া ইহা হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, এবং কোনস্থানে আমরা 'উত্তর' বিশেষণ ছাড়া কেবল 'কুরু' শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাই। এখানে আমরা এক মৎস্য পুরাণেরই দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিব।

আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার এক

---

(১) "But his people gradually changed its name, and become known as the kurus, who take such a prominent position in the country as depicted in the great epics. This change of name is explained as usnal by a geneological fiction. Kuru, we are told, was a great-grandson of Kutsa and was so great a king that his entire people was hence forth named after him." Vedic India p. 333.

(২) See The Ruling races of Prehistoric times by J. F. Hewitt Vol. I Index p 596.

(৩) বিশ্বকোষ—"টলেমি ওত্তর কোর্হ (Ottaro Korrha) নামক একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সংস্কৃত উত্তরকুরু শব্দের রূপান্তর মাত্র।" (Ptolemy Geog Vi. 16).

স্থত্রে পৃথক্‌ভূক্ত বিশেষণের সহিত কুরু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—অপর স্থলে বিশেষণ নিরপেক্ষ হইয়া কেবল 'কুরু' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে যথা :—

"ভদ্রাশ্বং ভারতঞ্চৈব কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥" ৪৪

মৎস্যপুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

"উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণাদিক্রমে ভারত, ভদ্রশ্ব, কেতুমাল, ও পুণ্যাত্মা জনগণের বাস ভূমি উত্তর কুরুপ্রদেশ অবস্থিত।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

"উত্তরে চাস্য শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥" ৬৯

মৎস্যপুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

'ইহার শৃঙ্গের উত্তরে দক্ষিণে সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত 'কুরু'বর্ষ ইহা পুণ্যসিদ্ধজনে নিষেবিত।"

ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আর্য্যদিগের মূলস্থান 'কুরু' নামেই প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ ছিল। পরে ভারতবর্ষে আর্য্যগণ তাঁহাদের মূল স্থানেরই নামানুসারে 'কুরুদেশ নামক উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেই তাহা হইতে তাঁহাদের মূল স্থানকে পৃথক্‌ভূত করিবার জন্যই তাঁহাদের উপনিবেশ হইতে ইহার অবস্থান উত্তরদিগ্বর্ত্তী বলিয়া উত্তর-দিগ্বাচী 'উত্তর' বিশেষণের যোগে ইহাকে 'উত্তরকুরু' আখ্যা দ্বারা বিশেষিত করা হয়। কোশলরাজ্যের 'উত্তর কোশল' আখ্যাও এই প্রকারেই উৎপন্ন দেখিতে পাই।

কুরুগণ যে ভারতীয় আর্য্য ঔপনিবেশিক-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন, বেদে আমরা কুরুবংশীয় যযাতির বংশধর যদু, অনু, তুর্ব্বসু প্রভৃতির উল্লেখ হইতেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। অপর কোন বংশীয় কাহারও আমরা এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য্য উপনিবেশ সকলের সন্নিবেশক্রম দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে "কুরু"দেশই প্রথম উপনিবেশ। ভারত-বর্ষের উত্তর পশ্চিম হইতেই যে আর্য্যগণ প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক সত্য।

মহর্ষি মনু তদীয় সংহিতায় আর্য্যাধিকারের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সত্যেরই পোষকতা পাওয়া যায়। তিনি যে প্রথম দুইটী আর্য্যাধিকারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥১৭
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ" ॥ ১৯

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

'সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেব নদীর মধ্যস্থলে যে দেবনির্ম্মিত দেশ তাহা 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া কথিত হয়।'

'কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, (কান্যকুব্জ), মথুরা এই কয়টী 'ব্রহ্মর্ষি'দেশ। ইহা ব্রহ্মা-বর্ত্তেরই সন্নিধানবর্ত্তী।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণের 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' ও 'ব্রহ্মর্ষি' এই নামসাদৃশ্য এবং উভয়ের সবিশেষ নৈকট্য হইতে উভয়টিই যে মূলে একই উপনিবেশ ছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ শেষোক্ত শ্লোকের পর আমরা যে একটি

শ্লোক প্রাপ্ত হই তাহা হইতে ইহার যথেষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায় যথা—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং
সর্ব্বমানবাঃ" ॥২০

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

'এই দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবস্থার শিক্ষা করিবে।'

এস্থলে ব্রহ্মর্ষি দেশকে যে সকলদেশেরই আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতেও ইহা সর্ব্বাদি আর্য্যোপনিবেশ না হইলেও যে সর্ব্বপ্রধান আর্য্যোপনিবেশ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে আর্য্যদিগের উপনিবেশ অন্যত্র যেখানেই থাকুক্ না কেন ভারতবর্ষে কুরুদেশেই ইহা প্রথম দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ বেদ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে বা পঞ্জাবে বাসকালে আপনাদের অধিকার লইয়া প্রবল কলহে মত্ত ছিলেন—কেহই নিষ্কণ্টক অধিকার স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৈদিক পঞ্চজাতি ও দশ জাতির যুদ্ধের বর্ণনাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ।

প্রথম উপনিবেশেরই প্রতি যে একটা উচ্চ চিরশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা হইবে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কুরুক্ষেত্র আর্য্য-দিগের কেবল প্রথম উপনিবেশ ছিল তাহা নহে—পরন্তু ইহার নামের দ্বারা তাঁহাদিগের মাতৃভূমি উত্তরকুরুর সহিত সংযুক্ত থাকাতে ইহার প্রতি আরও অধিক শ্রদ্ধার ভাব পোষিত হইত; তাহাতেই ইহা তাঁহাদিগের নিকট পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই তাঁহাদিগের নিত্য জপনীয় স্নানমন্ত্রে তাঁহারা ইহাকে তাঁহাদের প্রথম পরমতীর্থরূপে স্মরণ করিয়া থাকেন যথাঃ—

"কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণিচ।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি স্নানকালে ভবন্তীহ॥"

এই প্রকারে আর্য্যগণ তাঁহাদিগের আদি জন্মভূমির ইতিহাসের সহিত ভারতোপ-নিবেশের ইতিহাস আশ্চর্য্যরূপে সংগ্রথিত করতঃ ইহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় করিয়া রাখিবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিজয়া দশমী *

এ কোন্ দশমীর তিথি? তাহা পূর্ব্ব সন্নিবিষ্ট বিশেষণেই প্রকাশ—বিজয়া দশমী। বার মাসে চব্বিশটি দশমী আসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তেইশটি নির্ব্বিশেষণ—একটি দশমী মাত্র জয়সঙ্কেতে পূর্ণ। পুষ্পবিকাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরোদ্গম হয় বসন্তানিল বহে; বৃষ্টি-বর্ষণের পূর্ব্বে মেঘরাশি আকাশে পুঞ্জীভূত হয়, বিদ্যুৎ চমকায়; ধূমোদ্গমের পূর্ব্বে

* মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে তাঁহার 'মর্য্যাদা' নামক হিন্দী মাসিক পত্রিকার জন্য ইহা লিখিত হয়। 'হিন্দী' পত্রিকার পাঠক ও বাঙ্গলা পত্রিকার পাঠক এক নহে, সেইজন্য ইহা ভারতীতেও প্রকাশিত হইতেছে।

অরণিতে অগ্নির আবির্ভাব হয়। এইরূপে কার্য্যকারণ প্রায়শঃ ঘটনাপারম্পর্য্যে আত্ম-বিকাশ করে। বিজয়াদশমী উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন্ জাতীয় অনুষ্ঠান দেখা যায়? কাহার পশ্চাতে এই জয়দায়িনী দশমীর অভ্যুদয়—তাহার দিকে ফিরিয়া দেখ। মহালয়া—অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃ-তর্পণই বিজয়ার পূর্ব্বগামী মহানুষ্ঠান।

হে হিন্দু এ তথ্যের গভীরতা ও সার্থকতা-বিষয়ে ধ্যানশূন্য হইও না। যদি বিজয় চাও, যদি তেইশবার নিষ্ফল হইয়াও চব্বিশ বারের বারও অন্ততঃ সফলতা কামনা কর তবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তির ধ্যানে অবগাহিত হও, সেই সকল মহৎকার্য্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হও, বিশ্বাস কর যে সে সকল তোমার আমার মত রক্তমাংসের শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাঁহাদের পদাঙ্কানু-সরণের দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ কর। কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, কেবলমাত্র ভৌতিক পিণ্ড ও জলদান করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিও না। তদপেক্ষা কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনা গ্রহণ কর। প্রথমতঃ জান তাঁহাদের কীর্ত্তিমার্গ কোন্ কোন্ দিশায় রেখা কাটিয়া গিয়াছে, জাতীয় ইতিহাসের অনুশীলন, অনুসন্ধান ও গঠন কর। তারপর সেই ঐতিহাসিক অতীতকে বর্ত্তমানে সত্য করিয়া তোল। তেমনি সাহসিক, তেমনি বাণিজ্যদক্ষ, তেমনি সুনাবিক, তেমনি দিগ্বিজয়ী, তেমনি সহিষ্ণু, তেমনি জ্ঞানী, তেমনি কর্ম্মী হও। তাঁহাদের মার্গানুসরণ—তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহাদের প্রকৃত উপাসনা, তাঁহাদের প্রতি প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা।

জানিও এই পিতৃপূজার প্রভাবেই জাপানীরা এত বড় স্বদেশভক্ত, সফলপ্রয়াস ও বিজয়শালী জাতি হইয়াছে। তোমরাও পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণের মরা কাঠামোখানা ফেলিয়া তাঁর জীবন্ত প্রাণের ভিতর পৌঁছাও। এই পূর্ব্বপুরুষ প্রীতি ও পূর্ব্বপুরুষ তর্পণেচ্ছা তোমাদের মাতৃভূমির জন্য সমস্ত কার্য্যে প্রেরণা দান করুক্। যে সকল বড় বড় মহাপুরুষেরা এই ভারতভূমে লয় পাইয়াছেন—রাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌতম, কৌটিল্য, অশোক প্রভৃতি —তাঁহাদের তেজের অংশ আবার তোমার শরীরে ও আত্মায়, তোমার কার্য্যে ও ভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে এই তোমার উচ্চ অভিলাষ হউক, তাঁহাদের আদর্শে পরিক্ষীণ হইবে না—এই মহা লক্ষ্য হউক। পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পার, কিন্তু যতবার পড়িবে আবার উঠিবে, আবার সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি উৎপতিত করিবে—এই চেষ্টা, এই দুরূহ বাসনাই তোমাকে জাতীয় মৃতকল্প অবস্থায় সঞ্জীবিত রাখুক্। তাঁহাদের তর্পণ, তাঁহাদের প্রসন্নতা, তাঁহাদের অভিনন্দন মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হও; যদি ইহা পার তবে এই পুণ্য দশমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় বিজয়শ্রী তোমারও করতলগত হইবেন। বৎসরান্তে একবার ভাবিও, কি করিলাম? তাঁহাদের পথে চলিয়াছি কি? কি কেবল নিজেরই সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চক্রে ঘুরিয়া মরিয়াছি? বিজয়পথের যাত্রী হইয়াছি কি পরাজয় কোটরে আবদ্ধ আছি?

শ্রীসরলা দেবী।

কেল্লা বোকাই নগর

(১)

ময়মনসিংহ জিলায় বোকাই নগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ সহর হইতে উহা ১৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। একদিন যে স্থান ধনে, জনে, ঐশ্বর্য্যে ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিল এক্ষণে তাহার সে শোভা সমৃদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে। শত শত লোকের কোলাহলে যে স্থান সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত এখন তাহা সম্পূর্ণ নীরব। সেই প্রাচীনতার নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীর, গৃহভিত্তি, সেতু, বুরুজ প্রভৃতি দুর্গের কঙ্কাল চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যে স্থানে বহুতর শিল্পী, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারীর আবাস ছিল এক্ষণে তথায় কতিপয় দূরবস্থ মুসলমান মাত্র বাস করিতেছে। কালের গতি এইরূপই পরি-বর্ত্তনশীল।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেলের ১৭৭৯খ্রীঃ অঙ্কিত মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটে বোকাই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালের আবর্ত্তনে এক্ষণে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। কোন্ সময়ে বোকাইনগর স্থাপিত হয় তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। ইতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইক্তার উদ্দিন উজবেগ তুগ্রল খাঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলে কামরূপরাজ পলায়ন করেন। এই সময় কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গারো পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে সুসঙ্গ, মদনপুর ও বোকাই নগর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রিণত হয়। পলায়মান কাম-রূপাধিপতি পরে তুগ্রল খাঁকে হত্যা করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু গারো পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগ আর শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি তখন ভুক্রা নামে অভিহিত হইত। অসভ্য কোচ গারো, হাজং প্রভৃতিই এই সমস্ত স্থানের অধীশ্বর ছিল। বোকাই নগরে প্রতাপশালী অধীশ্বরের নাম বোকা কোচ ছিল। তাঁহারই নামানু-সারে এই স্থানের নাম বোকাইনগর হইয়াছে। সেই জ্ঞানালোক শূন্য অসভ্য ভূপতির হৃদয়ে যে মহত্ত্ব বিরাজিত ছিল, বর্ত্তমান কালে অনেক জ্ঞানগর্ব্বিত সভ্যতা-ভিমানীরও তাহা দেখা যায় না। বোকা কোচের পর কোচ বংশীয় আরও কেহ রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে ভালরূপ অবগত হওয়া যায় না।

বোকাইনগর ময়মনসিংহ পরগণার অন্তর্গত খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকেরা বঙ্গদেশে শাসন বিস্তার আরম্ভ করেন। এই সময় খিজিরপুরের দেওয়ান ঈশা খাঁ পরগণা ময়মনসিংহ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে এতদ্ অঞ্চল কম্পিত থাকিত। ঈশা খাঁ কখনও স্বাধীন ভাবে কখনও মোগলের অধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা

করিতেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সময় বঙ্গীয় ভূক্রাগণের বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠে। জনপ্রবাদে জানা যায় যে এই সময় খাজে ওসমান নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ একদল সৈন্য লইয়া ব্রহ্মপুত্রের উপকণ্ঠ বোকাইনগরে ছাউনী স্থাপন করে। শত্রুর দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্য ক্রমে এই স্থান দুর্গরূপে নির্ম্মিত হয়। খাজে ওসমানই এই দুর্গের স্থাপয়িতা। সৈন্যাবাস স্থাপিত হইলে পর একটী কাননগুর কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। বোধ হয় ভুক্রাগণের কার্য্য-কলাপ দর্শন ও ক্রমে এতদ্দেশ অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিবার মানসেই মোগলরাজ এইরূপ একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণ লইয়া ঈশাখাঁর সহিত মোগল রাজের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। গ্রামটির দৈর্ঘ্য অনুমান একক্রোশ ও প্রস্থ অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবে। তন্মধ্যে কেল্লার স্থানটী অর্দ্ধবর্গ মাইলের কম হইবে না। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত উচ্চ মৃৎ প্রাচীর ও সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিন্তু পরিখার নিম্ন ভূমি শুষ্ক হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদ বোকাই নগরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এখনও এমন পল্লীবৃদ্ধ জীবিত আছেন, যাঁহারা ময়মনসিংহ নগরের ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রাজগঞ্জ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত দেখিয়াছেন। অতএব এইরূপ গতি পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। সে সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এক ক্ষুদ্র শাখা কেল্লার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা এখন বড় বিলা নামে পরিচিত। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহাতে জল থাকে না। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পারে দুইটী করিয়া চারিটী মাটীর স্তূপ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা ঐ গুলিকে বুরুজ বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উহাদের উপরিভাগে স্থাপিত কামান শ্রেণীর মধ্যে কালু ও ফতু নামক অতি বৃহৎ দুইটী তোপ ছিল। দুর্গের আরও কয়েকটী বুরুজের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। দুর্গের পার্শ্বে যে একটী উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে ঐ স্থানে কেল্লাদারের আবাস ও দেওয়ানখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উলুবনে আবৃত কিন্তু তবুও স্থানটীর বিশেষত্ব বুঝা যায়।

বাদসাহ সাজাহানের রাজত্ব সময়ে সাহিন খাঁ নামক জনৈক কেল্লাদার দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। কেল্লাদার সেকালের ফৌজ-দারের ন্যায় রাজ সম্মান পাইত। কেল্লা হইতে বহির্গত হইবার সময় তাঁহার সম্মানার্থ আড়ানী, ছাতা ও তুরিভেরী প্রভৃতিও সঙ্গে যাইত। কেল্লাদার সাহিন খাঁর প্রতিষ্ঠিত একটী মস্‌জিদ অদ্যাপি অতীত কালের সাক্ষ্য দিতেছে। মস্‌জিদটী বহুকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে পার্শ্বের একটী দেওয়াল ব্যতীত সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে। প্রাচীন ইষ্টক গুলি অতীব দৃঢ়। দেওয়ালের বহির্দ্দেশে ইষ্টক গুলির গাত্রে এক প্রকার প্রলেপ আছে। ইহা ঠিক চীনে মাটির প্রলেপের মত দেখা যায়। বোধ হয় ইহাই

কোন স্থানের আস্তর ছিল। এইরূপ সুন্দর ইট ২।১ খানি ময়মনসিংহের সাহিত্যপরিষদে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মস্‌জিদটীর দ্বারদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে "লা এলাহা ইলাল্লাহ্ মহম্মেদো রসুল উল্লাহ ..... দরজমানে বাদশা সাজাহান" এই কথাগুলি পারস্য অক্ষরে ক্ষোদিত ছিল। অধিবাসীগণ প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক কতক দূর সংস্কৃত করেন। কিন্তু বর্ষার প্রাবল্যে নূতন নির্ম্মিত স্থান পুনরার ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটী প্রাচীন দেওয়াল ও কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ মাত্র রহিয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখস্থ বৃহৎ দীর্ঘিকাটীর জল



চাঁদের মন্দির—বোকাই নগর
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক গৃহীত।

বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ব্যবহারোপযোগী হয় না। সাধারণের নিকট ইহা "সাহিন খাঁর তালাও" বলিয়া পরিচিত। সাহিন খাঁ মুসলমান রীতি অতিক্রম করিয়া মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে এই জলাশয় খনন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মাতা ও সহধর্ম্মিণীগণ এই ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে আরও একটী পুষ্করিণী খনন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুইটি দীর্ঘিকাই একরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মস্‌জিদের পশ্চিম দিকের পুষ্করিণীর পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মঠ কালের কঠোর হস্ত হইতে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার গঠনপারিপাট্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর। বটবৃক্ষের তাণ্ডবে মন্দিরটি ফাটিয়াছে কিন্তু তবুও ইষ্টকগুলি জমাট অবস্থায় আছে। "চান্দের তালাও" নামে আর একটি পুষ্করিণী এই মন্দির পার্শ্বে রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায় নামে কোন এক হিন্দু সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। আবার কাহারও মতে পরগণা ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র চান্দ রায় এই মঠ স্থাপিত করেন। ইহাতে কোন বিগ্রহ ছিল কি না তৎ সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

ছিল। এই মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৮ হাত। মুসলমান অধিকার সময়ে যে বোকাই নগরে এইটি স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ সম্ভব মনে হয় না। বোধ হয় তাহার পরবর্ত্তী সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল।

(কুমার) শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

'সমসাময়িক ভারত' ও 'ইংরাজের কথা'

(সমালোচনা)

ইতিহাস, অর্থনীতি ও প্রত্নতত্ত্বের লেখকগণের মধ্যে অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি পঞ্চবিংশ খণ্ডে সমাপ্য 'সমসাময়িক ভারত' নামক এক বৃহৎ গ্রন্থাবলী প্রণয়নে ব্রতী হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

এই গ্রন্থাবলী চারিটী কল্পে বিভক্ত হইবে। প্রথম কল্প সাতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া মেগস্থেনিস প্রমুখ গ্রীক ও রোমান লেখকগণ প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যে সকল মূল্যবান বৃত্তান্ত বলিয়া গিয়াছেন, উপযুক্ত পাদটীকা ও মানচিত্র প্রভৃতিসহ তাহাই বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয় কল্পে বহুচিত্র সুশোভিত চৈনিক পরিব্রাজকগণের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত ও তৃতীয় কল্পে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের এবং চতুর্থ কল্পে ইউরোপীয়ান পর্য্যটকগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইবে। মাননীয় কাশিম বাজারাধিপতি দ্বিতীয় কল্পের ছবির ব্যয়ভার বহন করিবেন। ব্যাপার প্রকৃতই বিরাট।

আমরা আপাততঃ সমালোচনার্থ দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিশ্বকোষপ্রণেতা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। প্রথম খণ্ডে ৩৭জন গ্রীক ও রোমান লেখকগণের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথাযথ পাদটীকা দ্বারা গ্রন্থখানি সুশোভিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিবেদনে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মেগস্থেনিসের মূল্যবান বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতের একখানি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সুদীর্ঘ ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবতারিত হইয়াছে।

প্রথম দুইখণ্ড দেখিয়া আমাদের স্পষ্টই মনে হয় যে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইলে লেখক বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত পুষ্টিসাধনে সক্ষম হইবেন। আমরা কায়মনোবাক্যে গ্রন্থকারের সফলতা প্রার্থনা করি এবং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই গ্রন্থাবলী ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

দুইখণ্ড সমসাময়িক ভারতের সহিত আমরা গ্রন্থকারের ইংরাজের কথা নামক একখানি গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজীতে যেমন Readings from History আছে—এই গ্রন্থ সেই অনুকরণে ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের সমাবেশ হইয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ ও সাধারণ পাঠক উভয়েই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিবেন। রচনাগুলির মধ্যে গ্রন্থকারের পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য ইহার দ্বাদশ খানি ছবি। ছবিগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। ইহার কয়েকখানি ভারতীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ছবিগুলির সংগ্রহে যে গ্রন্থকারকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

গ্রন্থখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত।

শবরী

(রামায়ণী কথা)

শবরী চণ্ডালকন্যা। সে যে কি করিয়া ঋষিদের আশ্রম তপোবনে আশ্রয় পাইল, সে কথা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আশ্রমবাসী ঋষিরা, কুমারী-কুমাররা, অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীরা, কেহই তাহার দিকে চাহিয়া দেখিত না, ডাকিয়া শুধাইত না।

সদ্যঃস্নাত শুভ্রপূত ঋষিকুমারগণ মধুর মন্ত্রগাথা গাহিতে গাহিতে পম্পাতীরে কাশস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে আশ্রম-ধেনু চরাইতে যাইত; কোন দিন পথে, কোন দিন বা মাঠেই শবরীর সঙ্গে দেখা হইত। শুধু দেখাই মাত্র, তাহারা হেলাভরে চলিয়া যাইত। শবরী পথের পাশে সন্তর্পণে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। হোমের ইন্ধন বহিয়া, কাশের গুচ্ছ বাঁধিয়া যখন তাহারা আশ্রম কুটীরে ফিরিত, শবরী তখন আরও দূরে তমালের আড়ালে আপনাকে লুকাইত। আশ্রম কুমারীরা সখীতে সখীতে তরু-আলবালে সলিল সিঞ্চন করিত, শবরী শুধু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। স্নানের সময় কুমারীদল পম্পাপথ মুখর করিয়া মৃণ্ময় কলসী বহিয়া চলিয়া যাইত। তাহাদের শিথিল কবরী হইতে পথে পথে কোমল শিরীশগুচ্ছ ঝরিয়া পড়িত, বাহু যুগল বল্কলবাস মাঝে মাঝে খসাইয়া দিত, ইঙ্গুদি-তৈল গন্ধবিধুর পথের আকাশ বারেক মূর্চ্ছনাবিভোর হইয়া পড়িত, শবরী ধীরে ধীরে পর্ণকুটীরখানির দ্বার অর্দ্ধমুক্ত করিয়া অলক্ষ্যে শুধু দেখিত। আপনার মৃৎকলসীটি টানিয়া কোলে তুলিয়া লইত। কলসীর সাধ পূর্ণ হইত, নয়নজলে ভরিয়া সে আবার আপন স্থানে আসিয়া বসিত।

এমনি করিয়া মানবপ্রকৃতি শবরীর বাল্য-জীবনের উপর আপনার কঠিন দণ্ড প্রচার করিল।

কৃত্রিমতা শবরীকে যতই দূরে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল, অন্তরের দেবতা ততই তাহাকে আপনার শুভ্র কোলে টানিয়া লইতে লাগিলেন।

আকাশে ঢাকা শব্দময়ী ধরণী যে সঙ্গতির মাঝারে আপনার বিশ্রামবাসর রচনা করিয়াছে, সেই সঙ্গতির অনাহত রাগিনীর ঝঙ্কার শবরীর কণ্ঠ পূর্ণ করিয়া দিল। শবরী দিন দিন সেই আশ্রম-প্রকৃতির অন্তরে আপন পুণ্যগীতির ধারা ছড়াইতে লাগিল।

মানুষের গড়া শাসন, গড়া বন্ধন শবরীকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে আপন গীতি-তরঙ্গে আপনি ভাসিয়া চলিল; অন্যকেও ভাসাইবার জন্য ব্যাকুল হইল।

যে ঋষিকুমারদের দেখিয়া সে একদিন সন্তর্পণে পথপ্রান্তে তৃণটি হইয়া সরিয়া দাঁড়াইত, শবরী আজ আর তাহা করিল না, সকলকে আপন কুটীরে আহ্বান করিতে ছুটিল। যে তমালের আড়াল একদিন তাহাকে আশ্রম-কুমারীদের চকিত নয়নের আড়ালে লুকাইয়া রাখিত, আজ আর সে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। শবরী তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিল।

কিন্তু বন্ধুত্ব অনাদৃত হইয়া ফিরিল।

শবরী তখন গোপনে আশ্রম-পিতা ঋষিদের নীরব সেবায় রত হইল। সে সেবা দূর হইতে—কেন না সে যে চণ্ডাল!

নিশার পাখী পম্পাপথে শালতমালের শাখে বসিয়া বনফল ভক্ষণ করিত। ভোজনের শেষ পথের মাঝে ভুক্তাবশেষ ছড়াইয়া যাইত। ঊষার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে শবরী কুটীর ত্যাগ করিয়া আপন হাতে পম্পাপথ পরিষ্কার করিত। কেহ জানিত না, দেখিত না, দেখিয়াছিলেন একজন, চিনিয়াছিলেন একজন, ঋষি মতঙ্গ। তিনি শবরীর দীক্ষাগুরু হইলেন। শবরীর প্রিয় দর্শনের পথ তিনি দেখাইয়া দিলেন।

দেওয়ার সার্থকতা পাওয়াতে নয়, দেওয়াতেই। শবরী সেই মন্ত্রেরই ত সাধক। এই মন্ত্রেই তাহার আসন পাতা হইয়াছে। বাসরের ফুল ফুটিয়াছে, প্রিয়তম আসিবেন।

প্রিয়তম আসিলেন, চণ্ডাল শবরীর চণ্ডালত্ব ঘুচিয়া গেল। পম্পায় পাপের রক্তিমস্পর্শ শ্যামতনুর অবগাহনে আবার পবিত্র হইল। মানুষের গড়া অনার্য্যত্ব—ভেদের শৃঙ্খল, ভেদের বেড়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই অধর্ম্ম নাশের জন্যই ত দেবীর চণ্ডালত্বের অভিনয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রভাতে *

গড়িয়ে যায় গো হৃদয় আমার
নীল আকাশের গায়
সকল ফেলে', পাগল সে আজ
কোথায়—কি ধন চায়?
সাগর আসে লহর তুলি'
আমার কোলের কাছে,
কিরণমাখা ঢেউগুলি, মোর
জ্বল্‌ছে বুকের মাঝে;
অমল ঊষা হিরণ আভা
ঢাল্‌ছে জগৎ ব্যেপে';
পাল ফুলিয়ে মনের তরী
চল্‌ল কোথায় কেঁপে'?

স্নিগ্ধ মধুর বইছে বাতাস;
স্বচ্ছ গগন-গায়
এমন করে' উধাও হ'য়ে
এ মন কোথায় ধায়?

* * *

আজকে তৃষার পাইনা সীমা!—
আপন-বিভোর আমি,
সোনার ঊষার সুখ-সায়রে
তলিয়ে যাইরে নামি'!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

---

* পুরী, পাখার প্রান্তে রচিত।

সমালোচনা

আকাশের গল্প। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থে আকাশস্থিত জ্যোতিষ্কাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষা স্পষ্ট, সহজ ও সরল। পুস্তকখানি রচনার গুণে সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, "গ্রন্থকার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অভাব দূর করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র।" তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসার্হ। লঘু সাহিত্য লইয়া মজিয়া থাকা জাতীয়তার পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া বিজ্ঞান বা দর্শনাদি বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গসাহিত্য চিরদিন ঋণী থাকিবে। বালকগণের জন্য রচিত হইলেও সাধারণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জগতের বহু অজ্ঞাত কাহিনীর পরিচয় লাভ করিবেন। গ্রন্থকার এক অজানা লোকের চাবি খুলিয়া দিয়া একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে; সেগুলি যে বিষয়-বোধে যথেষ্ট সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরব জাতির ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শেখ মফিজ উদ্দিন আহমদ, দলগ্রাম, পোঃ তুষভাণ্ডার, রংপুর। কলিকাতা ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৸০ মাত্র! এখানি সৈয়দ আমির আলি রচিত History of the Saracens গ্রন্থের অনুবাদ—প্রথম খণ্ডের সমালোচনা পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ড পরে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। এই খণ্ডে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের ইতিবৃত্ত, তাঁহাদের শাসননীতি প্রভৃতি সঙ্কলিত হইয়াছে। অনুবাদকের সাহিত্যানুরাগ প্রশংসার্হ। তাঁহার ভাষাও ভাল, অনুবাদ বলিয়া কোথাও মনে হয় না। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্দিরা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। চট্টগ্রাম, চট্টেশ্বরী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক।

নারী পঞ্চ-চত্বারিংশ। শ্রীমতী শরৎকুমারী সিংহ কর্ত্তৃক বিরচিত। কানপুর, মলরোড, শান্তি-আশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কয়েকটি উপদেশ গদ্যে-পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখিকার উদ্দেশ্য সাধু। এ গ্রন্থ বালিকাদিগের পাঠ্যস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি।

আদর্শ লিপিমালা। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, বণিক প্রেসে মুদ্রিত মূল্য এক টাকা। পত্র-লিখন-প্রণালী শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজী Letter-Writerএর আদর্শে এই গ্রন্থখানি রচিত। এই গ্রন্থে "পত্রলেখন-প্রণালীর" যে ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে—সেটুকু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও উপভোগ্য হইয়াছে। তবে "পারিবারিক পত্রের আদর্শ" বিভাগে যে সকল পত্রের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। সরলতা ও সহজ মুক্ত-প্রাণতাই পত্রের জান, বিশেষতঃ পারিবারিক সম্পর্কে। সেখানেও যদি পণ্ডিতী ভাষার প্রচলন হয়, তবে আর দুঃখের সীমা থাকে না। স্ত্রীকে যদি এ কালে "ভবদীয় প্রণয়াভিমানিনী" "মমাশ্রয়েষু" বলিয়া স্বামীর নিকট পত্র লিখিতে হয়, তাহা হইলে অভিধান খুলিয়া লেখা ভিন্ন উপায় নাই। লেখক মহাশয় কি তাহারই সমর্থন করেন? গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে বঙ্গের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির পত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, সরল ভাবই তাঁহাদের পত্রের জান। পরস্পরের

মধ্যে বঙ্গভাষায় চিঠিপত্র লিখিবার প্রথার তেমন প্রচলন নাই বলিয়া লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পিতা পুত্রের নিকট পত্র লিখিতেও মাতৃভাষা বর্জ্জন করেন। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের কথা কি হইতে পারে?" কথাটা ঠিক—খুবই ঠিক! গ্রন্থের ছাপা কাগজ বেশ হইয়াছে।

সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীয়সের আত্মচিন্তা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা। ভারতমহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। প্রাচীন রোমের সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীয়স আদর্শ নৃপতি ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক রেণাঁর মতে "তিনি মানব প্রকৃতির গৌরবস্বরূপ ছিলেন; কোনও বিপ্লব, কোনও উন্নতি কোনও আবিষ্ক্রিয়াই তাঁহার ধর্ম্মকে পরিম্লান করিতে পারিবে না।" তাঁহার ধর্ম্মও ছিল বিশ্বজনীন। ভারতীয় মহাজনপ্রোক্ত অনুশাসনের সহিত তাঁহার উক্তির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। মূল গ্রন্থ গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। রজনী বাবু মূল গ্রীক্ হইতে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সূচনাতে রজনীবাবু সম্রাটের জীবনী ও ষ্টয়িক দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন; পরে সম্রাটের উক্তিগুলির অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সাধু বিষয়ের গাম্ভীর্য্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরিশিষ্টের ভারতীয় সাহিত্য হইতে সম্রাটের উক্তির অনুরূপ শ্লোকাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা রজনী বাবুর সাহিত্যানুরাগের যেমন পরিচয় পাইয়াছি, তেমনই তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভালো। এ গ্রন্থের সমাদর বাঞ্ছনীয়।

কবিতা-প্রসূন। শ্রীযুক্ত বলহরি ঘোষ প্রণীত। কাটোয়া এডওয়ার্ড প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীসুধাহরি ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। ইহা কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতার না আছে ভাব, ছন্দে না আছে সুর,—তবু কবিতা লিখিতে হইবে! এ বিড়ম্বনা কেন?

আমার অশ্রুমালা। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। হাওড়া কর্ম্মযোগ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-পুস্তক। পত্নীবিয়োগ-বেদনায় অধীর কবির মর্ম্মোচ্ছ্বাস! এইরূপ অসংযত হা-হুতাশ ও শোকাতুর প্রলাপ দরবারে বাহির না করিলেই ভাল হইত। শোক পবিত্র; তাই এ গ্রন্থের অধিক আলোচনা করিলাম না। ভগবান লেখককে প্রকৃতিস্থ করুন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

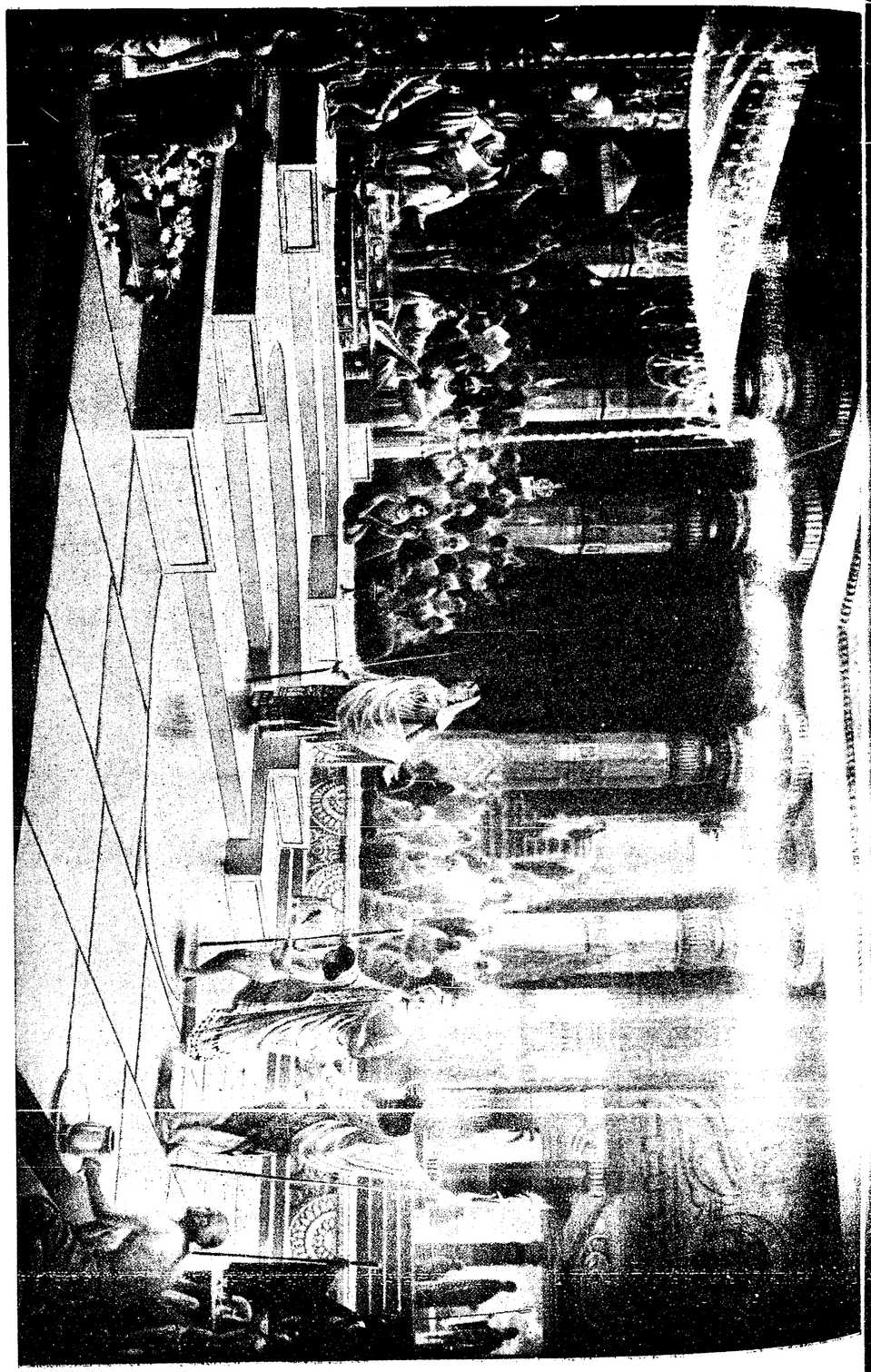

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

শুক-শূদ্রক-পরিচয়।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২০ [৯ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(৪৪)

অত্যন্ত উত্তেজনার পরেই একটা গভীর অবসাদের আক্রমণ অনিবার্য্য। যুদ্ধের সময় যতটুকু উদ্দীপনা সৈনিক হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে যুদ্ধ জয়ের পর সেরূপ থাকে না, তখন হয়ত শোণিত-প্লাবিত রণভূমের ভয়ানক দৃশ্য তাহার কম্পিত জয়োল্লাসের মধ্যে একটা অতি তীব্র অনুশোচনা জাগাইয়া তোলে। শচীকান্তের অবস্থা প্রায় এইরূপই দাঁড়াইয়াছে।

বরবেশে গাড়িতে বসিয়া সে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে গতিশীল বহিজগতের দিকে চাহিয়া রহিল। পৃথিবীটা যেন প্রলয়ের সূচনা লইয়া মহাবেগে ছুটিতেছে;—পথঘাট, গাছ ধূমাস্পষ্ট জলাভূমি সব সেই বেগের সহিত ছুটিয়া চলিয়াছে! সে চমকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, নিজেও যেন সে কাহার কঠিন মুষ্টি মধ্যে ধৃত হইয়া তেমনই বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল,—থামিবার শক্তি নাই! গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে দুইটা পুলিসের লোককে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে সহসা কাঁপিয়া উঠিল,—তাহারা যেন তাহাকে ধরিবার জন্যই কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে—এইরূপ যেন সহসা তাহার মনে হইল। গোশকটমাত্র বরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—সে গাড়িতে না উঠিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া ষ্টেশনের একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইল। হিমে থামটা শীতল হইয়া রহিয়াছে, তাহার ললাটের ঘর্ম্ম যেন অকস্মাৎ সেই শীতলস্পর্শে জমিয়া আসিল, শিশির ডাকিল "এসো হে বর!" শচীকান্ত তাহার অসহায় দৃষ্টি কোনমতে তাহার দিকে ফিরাইল "এখনও এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না শিশির?"

"পাগল!"

"শোন শিশির,—না ভাই চেষ্টা কর, কাজ নাই—কি জানি কি উচিত ঠিক বুঝতে পারচিনে যে।"

শিশির একটা তামাসা করিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইল, সবিস্ময়ে শুধু তাহার হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল "অসুস্থ বোধ কর তো এসে গাড়িতে একটু শুয়ে পড়ো—সেরে যাবে।"

দুর্ব্বল শিশুর মত সে নীরবে আজ্ঞা পালন করিল, শরীরে বা মনে এতটুকু বল ছিল না যে যদ্দারা ইহার বিপরীত কিছু করিতে পারে।

শিশির পাশে বসিয়া কত কথা বলিল, সভয় প্রশ্নে বারম্বার কুশল জিজ্ঞাসা করিল সে কোন জবাব করিতেও সক্ষম হইল না, কেবলই তাহার মনে হইতেছিল কে যেন তাহাকে সেই অন্ধকারের ছায়ায় ছায়ায় অনুসরণ করিতে চলিয়াছে, সেই অদৃশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার অন্তঃস্থল ভেদ করিতে লাগিল এবং একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

তারপর সমুদয় বাধা বিপত্তি একদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টি হয় নাই, কনের সলজ্জ নেত্র পিপাসু বরের নেত্রে তড়িৎস্ফুরণ করিল না। এতই বুঝি সে আত্মহারা হইয়াছিল যে পাছে তাহার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া যায় তাই সাহস করিয়া চাহিতে পারে নাই! কিন্তু বিবাহ মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইতেই সর্পদংষ্ট্রবৎ কন্যা অকস্মাৎ ঝড়মড়িয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিল, পার্শ্ববর্ত্তীর পানে দুইনেত্র বিস্তৃত করিয়া চাহিল, তারপর সহসা তাহার মস্তক সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, সে পতনোন্মুখ হইল।

যখন বিবাহ হইল তখন লগ্নের কোন চিহ্নই ছিল না, শুক্রতারা তখন নিবিয়া গিয়াছে, এবং সোনায় মেশানো শ্বেত বসনের ঘোমটাপরা ঊষা তাঁহার বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া রক্তবসনা কনের চন্দন চর্চ্চিত মুখের মৃত্যুবিবর্ণতা সন্দর্শন করিয়া সহানুভূতির শিশিরাশ্রু মোচন করিতেছিলেন। যখন করালীচরণ বীতসংজ্ঞ, কমলার হিম হস্ত টানিয়া আনিয়া বরের শিথিল করে স্থাপন পূর্ব্বক সম্প্রদানমন্ত্র পাঠ করিল, তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ শিহরিয়া বর সেই হাত খানা নিজের হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়া ডাকিল "শিশির!"

ছিঃ, কি করচো শচি!"

"না ভাই না, আমায় রক্ষা কর, তোমরা জানোনা আমি—"

"ক্ষেপে গেলে নাকি! বসো বসো আর সময় নাই, সূর্য্য ওঠে বলে।" প্রায় তাহাকে চাপিয়া বসাইয়া শিশির তাহার পার্শ্বে বসিল, অস্ফুট স্বরে সে আত্মগত কহিল "কি পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে! মেয়ের চিরকালে হিষ্টিরিয়া আছে, ভয় কি!"

গৃহে ফিরিয়াও সে দ্বিধা সে সঙ্কোচ কাটিল না, নববধূর কথা ভাবিতে গেলেই কেবল সেই রক্তহীন অচেতন মুখ ও তাহার হিমশীতল স্পর্শ মনে পড়িয়া একটা অশান্তির সঞ্চার করে, তথাপি মনের নিভৃতে একটা সুখের আলোও ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাধনার ধন আজ প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে।

সেদিন প্রথম ফাল্গুনের ঈষৎ শীতোষ্ণ বাতাসে মুকুলদাম শিহরিয়া উঠিতেছে, আম্রমুকুলের মদগন্ধলুব্ধ মধুকর গুন্‌গুনিয়া ফিরিতেছিল, বসন্তের চিরসখাও সেদিন নীরব ছিল না, উদ্যানের সর্ব্বত্র একটা হাসিখেলা মাতামাতিরই চিহ্ন; আকাশের নীলটাও সেদিন রূপালি কাজ করা পুঞ্জমেঘে বারাণসী সাড়ীর মত দেখাইতেছিল। জানালার নিকট বসিয়া

শচীকান্ত একদৃষ্টে সেই শোভাময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়াছিল, বহুদিন পরে আজ যেন আবার প্রাণের মধ্যে এই কুহকিনীর উন্মাদনকারী মূর্ত্তি ছায়াপাত করিয়াছে। বাহিরে মাঠে মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিতেছে, বাতাসে বিবিধ ফুলফলের গন্ধ ভাসিতেছে, অন্যমনে সে গুণগুণ করিয়া একটা সঙ্গীতের একটা চরণ ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল "জনম জনম হম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল!"

ক্রমে জানালার মধ্য দিয়া তরল রজত ধারা ঢালিয়া চাঁদ উঠিলেন, জানালার ঠিক সম্মুখেই একটা বড় নক্ষত্র কাহার দীপ্ত নেত্রের মত জ্বলজ্বলিয়া উঠিল, অল্প শীতানুভব করিয়া শচীকান্ত একখানা র‍্যাপার টানিয়া গায়ে দিল, তারপর আবার সেই জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুবর্ণোজ্জ্বল হরিৎক্ষেত্র জ্যোৎস্নাতরঙ্গে ঈষৎ তরঙ্গিত হইতেছে, চাঁপা গাছের ডাল নাড়া দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল, অগণ্য নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রালোকে ম্লানায়মান,—আজ প্রলোভন অদম্য হইল।

শচীকান্ত ধীরে ধীরে দুইটা ঘর পার হইল, সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে দেখিল কল্যাণী উপরে উঠিতেছে, সে দাঁড়াইল, "তোকেই খুঁজছিলাম।"

"ওঃ," কল্যাণী যেন আর কিছু কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, এইমাত্র সে মায়ের কাছে কতগুলা বকুনি খাইয়া আসিয়াছে। গিরিজা সুন্দরী আজকাল বড়ই চটিয়া আছেন কাজেই কারণে অকারণে তিরস্কৃত হওয়া এখন এ বাড়ীতে অনিবার্য্য, বিশেষতঃ কল্যাণীর পক্ষে।

শচীকান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল তাই সে নিজে হইতে কিছু বলিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া রহিল, তখন হঠাৎ কল্যাণীর মনে হইল হয়ত দাদার কিছু বলিবার আছে। সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দাদা!"

"এমন কিছু না ফুলশয্যার দিন বদলানর জন্য মাসিমা চটেচেন—না?"

"তা একটু চটেচেন বৈকি, সে ভুলে যাবেন এখন—"

"কেন তাহলে আর তাঁকে বিরক্ত করা—আজই না হয়—" কল্যাণী গালভরা হাসির সহিত তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল "বেশ তো মাকে বলিগে"।

শচীকান্ত জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে চাহিল। এই পাঁচদিন ধরিয়া সে কেবলই মনে মনে পিছাইয়াছে; আজ সবলে সমস্ত বাধা কাটাইয়া নিজের চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তুলিল, সেই হিমহস্ত আর তেমন করিয়া তাহার পা দুখানা চাপিয়া ধরিল না, সহজ ভাবেই সে জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার নববধূর সম্মুখে দাঁড়াইল, নূতন ভাবের আলোড়নে বক্ষ শুধু তখন বেগমান্ হইতেছিল।

কমলা কোনদিকে চাহিয়া দেখে নাই, মাটির গড়া প্রতিমার মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, জীবনী শক্তি যেন তাহার মধ্যে নাই, প্রচণ্ড আঘাতে এইবার তাহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

জানালার ঠিক সম্মুখেই সবুজ বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া শিশুচন্দ্র প্রসন্নমুখে উঠিয়াছেন।

সেই আলোটা কমলার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে যেন দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিল।

শচীকান্ত অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "কমলা!" কমলা তড়িতাহতের মত একবার চমকিয়া আশাপূর্ণ যুগলনেত্র পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল, পরক্ষণে ঘোর হতাশার বজ্র যেন তাহার মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে এমনই অসহায় তাহাকে দেখাইল, বুঝি শেষ সংশয় টুকুর এই সঙ্গে সমাধি হইয়া গেল।

"কমল, এ জীবনে যে এদিন ফিরে পাবো সে আশা আমার ফুরিয়েই ছিল, এ সুখের ঋণ কার কাছে শোধ করবো? কখনও ঈশ্বর মানিনি কিন্তু আজ তাঁর কথা ভাবতে ইচ্ছে হচ্চে, মনে হচ্চে বোধ হয় তাঁরই অসীম দয়া তোমাকে আমার পার্শ্বে এনে দিলে। তিন বৎসর প্রায় গত হলো, কত খুঁজেচি, কত কেঁদেছি কোন্ অতলে তলিয়ে ছিলে কোথাও খুঁজে পাইনি—"

আবেগ ভরে সে আরও কত কথা বলিয়া গেল, কিন্তু নববধূ বোধ হয় ইহার একটাও বুঝিতে পারিল না, সে যেমন তেমনি নিস্পন্দ লোচনে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি বর্দ্ধিত হইতেছিল, কর্ম্মগৃহের কোলাহল মন্দীভূত হইতে লাগিল, বাতাস শীতল হইয়া আসিল, বিশ্ববিস্মৃত শচীকান্ত মুগ্ধনেত্রে অবগুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল—কোথায় ক্ষোভ, কিসের লজ্জা এ মুখের তুলনা নাই!

চেতনা লাভে যেন আর একটু সরিয়া গিয়া মুগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "কমলা!" সাদরে হাতখানি হাতে তুলিয়া লইল "আমার কমল!"

আগ্নেয় গিরির ধাতু নিঃস্রববৎ জ্বালাদিগ্ধ কঠিন স্বরে কমলা সহসা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি আমার কেউ নও!" সবেগে হাত টানিয়া লইয়া সে বিদ্যুৎবেগে সরিয়া গেল।

ভোরের বেলা বাহিরে আসিতেই কৌতুকময়ী কল্যাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বউ কথা কয়েচে দাদা?" শচীকান্ত এ প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ হাসিয়া "তোদের বউকে জিজ্ঞাসা করিস্" বলিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল, কাহারও কাছে তাহার যেন মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

কল্যাণী অনেক অনুসন্ধানে পাশের স্নানাগার হইতে বধূকে টানিয়া বাহির করিল, সেই দৃষ্টি, সেই একই ভাব! বুঝিল তাহার দাদা এইজন্য তেমন বিষাদের হাসি হাসিয়াছিলেন, একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "কি তোমার রকম সকম ভাই।" কমলা অর্থহীন দৃষ্টিতে কেবল একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। সে দৃষ্টিতে কিছুই ছিলনা—তথাপি যেন অনেক ছিল! কল্যাণী দুই পদ পিছাইয়া গেল।

মনের ঝাল মনে মারিয়া গিরিজাসুন্দরী যথাকৃত্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন এই জন্যই শচী বাপ ভাইকে জানাতে দেয়নি—বুঝেছি, একে 'ডোমের চুপড়ি' ধুয়ে তোলা—তায় অমন ধেড়ে মেয়ে! ওঁরা কি এ অনাচার ঘটতে দিতে পারেন! তা যা হোক যা হবার হয়েই গেছে তা বলে আমি কেন ওদের একটা খবর অবধি না দিই; মনেই বা করবে কি?

ভক্তিনাথকে পত্রে যথাসম্ভব সংবাদ পাঠাইয়া বৌভাতের মধ্যে সপরিবারে আসিতে লিখিলেন। বলিলেন,

"আমার তো দুজনেই সমান আমি কেন তার সঙ্গে এতটা তফাৎ করি।"

বড় বধূ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, মাসির এতখানি দৌলত ভোগ করিতে লাগিল ছোটবাবু আর তাহাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথাপরম্! মনে মনে গস্‌গসিয়া কাহারও সহিত ভালরূপে একটা কথাও কহিতে পারিলেন না, ভাবিলেন এ'কেই বলে কলিকাল, যে দেবতা বামুন মানলে না সেই হলো রাজেশ্বর আর আমরা যে ভিটেয় সাঁজ জ্বালচি, বার মাসে তের পার্ব্বণটি বাদ দিচ্চিনে একচোখো ঠাকুর কি চোখের মাথা খেয়েচে এসব দেখতে পায় না?"

কল্যাণীর কাছে পরিচয়ের আবশ্যক করে না; সে হাসি মুখে ভ্রাতৃজায়াকে প্রণামপূর্ব্বক হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল "কেমন জা হয়েচে দেখ্‌সে বৌদি, এমন কখনও দেখনি।"

বড় বধূর কাণে শচীকান্তের স্ত্রীর এতটা প্রশংসা সহিল না, তিনি মুখ টিপিয়া একটু খানি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলেন "রূপ যদি বল্লে তো বলি, আমাদের ওখানে মনীশ ঠাকুরপোর সঙ্গে বাক্‌দত্তা একটি মেয়ের যেমন রূপ দেখেচি এমন আর কোথাও দেখব না, মেয়েটির নাম কমলা, তা নামেও যা কাজেও তেমনি একেবারে যেন লক্ষ্মী—'ওমা এ কে?' এই কি বউ নাকি? অ্যাঁ! সেকি! এই তো সেই কমলা!"

(৪৫)

মস্ত বড় একটা ফাঁড়া আসিয়া যখন কাটিয়া যায় তাহার পর কিছুক্ষণ মনের মধ্যে বড় একটা উদারতার হাওয়া বহিতে থাকে। ছোট খাট অশান্তি সেই বড় বিপদের ভিতর লীন হইয়া যায়, নূতন স্বাস্থ্য লাভের মত হৃদয়ে নবীন শান্তির উদ্বোধন করিয়া নবজীবন গঠিত করে, মনে আর কোন বিক্ষোভ যেন সে সময়ে স্থান পায় না।

নন্দকিশোর প্রবল ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পূর্ব্বের সকল আঘাত ভুলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে ইন্দুভূষণের কাছ হইতে বোঝা পড়া চুকাইয়া তাহাকে যথাসম্ভব প্রসন্ন মুখে বিদায় গ্রহণ করিতে দেখিয়া ঈষৎ লঘু চিত্তে বিন্ধ্যবাসিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন "ইন্দু ছেলেটির জন্য মনটা খারাপ হয়ে গ্যালো, বড় চমৎকার ছেলেটি। যাহোক যা হবার নয় তার জন্য আপশোষ বৃথা, তা আমি তাকে একেবারে ছেড়ে দেবোনা; তার সকল সাহায্যের ভার নেবো। এখন তুমি কি বলো বিন্ধ্য? গৌরীর বিবাহ বন্ধ হবে—না, এই সময় দিয়ে ফেলাই যাবে?" বিন্ধ্যবাসিনী একথাটা বার বার ভাবিয়াছিলেন তাই চট্ করিয়া বলিলেন "এখনি বর কোথায় পাবেন?" নন্দকিশোর কহিলেন "তা ঠিকই আছে, তোমায় একটি কাজ করতে হবে, সত্যর মাকে একখানি চিঠি লিখে সব কথা জানাও, ও তাঁদের মত জিজ্ঞাসা কর, এই দিনেই বিয়ে হলে বাইরে অতটা গোল হবে না, আর দিতেই তো হবে একদিন।" বিন্ধ্যর মনেও এই ইচ্ছাটা একবার উঁকি মারিয়াছিল কিন্তু তিনি ইহাকে আমল দিতে সাহসী হন

নাই। এখন ভগিনীপতির কথার উত্তরে কহিলেন "সত্যর সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

"ক্ষতি কি? তারা যদি দেয়।"

"তা দিলেও দিতে পারে, শিবনারাণ্ বাবু চমৎকার লোক,—ধরলে 'না' বল্‌তে পারবেন মনে হয় না, কিন্তু"

"কি?"

"তাঁরা যে বউকে বাপের বাড়ী রাখেন এমন তো মনে হয় না, অবস্থাপন্ন লোক তাঁরা — তাতে পাঁচটা নয়।"

"বেশ তো কার না সাধ মেয়ে শ্বশুর ঘর করে?"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু বিস্ময় বোধ করিলেন "আপনার যখন আর কোন অবলম্বন নেই তখন—"

অন্ধকার রাত্রে ঘনমেঘের বুক চিবিয়া যেমন ক্ষণপ্রভা চমকিত হয় তেম্নি এক ফোঁটা শুষ্ক হাসি নন্দকিশোরের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়াই মিলাইল, তিনি কহিলেন "আমি কে বিন্ধ্য! চির আবর্ত্তনশীল সংসার চক্রের আবর্ত্তনবেগের বিরুদ্ধে বাধা দেবার আমার কি শক্তি আছে? কারই বা আছে? দেখ কোথা থেকে কোথায় ব্যাপার গড়াল, বিধাতার খেলা তুমি আমি উপলক্ষ্য হয়ে খেলে যাই বই তো নয়, কেন খেলি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন যাই! কে নিয়ে যায়? আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হস্ত আমাদের টেনে নিয়ে যায় তবে না যাই! তবে? কি হবে তটশায়ী তরঙ্গের বেগে বাধা দিয়ে? যা বিধাতার বিধান তারই সাহায্য করতে যাওয়া ভাল। ঐশী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে নিজের ধ্বংস অনিবার্য্য।"

নন্দকিশোর চুপ করিলেন; তাঁহার কণ্ঠের মৃদু কম্পনে মনের আঘাত ব্যক্ত হইল,—গৌরী যে তাঁহার কন্যা নয় এ আকস্মিক সংবাদের বিহ্বলতা ও ব্যথা এখনও তাঁহার মন হইতে ঠিক কাটিয়া যায় নাই। নিজের মনকে তিনি নিজেই কত বার প্রশ্ন করিতেছিলেন আমি যে তার মুখে কাদম্বিনীর পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিতে পাই তাও কি আমার ভ্রান্তি! হইবে, মরীচিকা বোধ হয় ইহাই!

গৌরীর মনে যে তাঁহার প্রতি ভালবাসার একটা কোথায় অভাব রহিয়া গিয়াছে আর তাহার প্রকৃত কারণ তাঁহাদের নিঃসম্পর্কতা ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত দ্বিগুণ বেদনা বোধ করিল। শেষে নিজেকে তাহার সুখের কাছে উৎসর্গ করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। বিন্ধ্যও কি এ ঘটনায় ব্যথা পায় নাই? পাইয়াছিল বই কি, কিন্তু তথাপি তাহার ব্রহ্মচর্য্যপুত নিষ্কাম চিত্তে যে বাৎসল্য এই অনাথার জন্য আজীবন সঞ্চিত রহিয়াছে সেখানে তো কোন প্রতিদানের আশা সে কোন দিন রাখে নাই, তাই তাহার স্নেহউৎসের বেগ যেমন তেমনই রহিল, সে মনে মনে বলিল "নাই হউক সে আমার বোন ঝি, তবু সে আমার সেই গৌরীই ত।"

একটু নীরব থাকিয়া নন্দকিশোর পুনশ্চ বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিলেন "অন্তর্যামী বুঝি এই অন্তরেব অপরাধের দণ্ড পাঠিয়ে ছিলেন। 'আমার' বলে আমি একেবারে মোহে অন্ধ হচ্ছিলাম তাই বুঝিয়ে দিলেন যাকে নিজের বলে কাছছাড়া করতে ভয় পাচ্ছ সে তোমারই নয়। আর না বিন্ধ্য, যা জড়িয়ে ফেলচি সে আর খুলতে পারবো না কিন্তু এর বেশি আর কাজ নেই। আমি কে? আমার সুখ দুঃখ এ জগতের নিয়মের কাছে কতটুকু? নিজেকে আর বাড়াতে চাইনে।"

কথা কয়টার মধ্যে ত্যাগশীল পিতৃহৃদয়ের মর্ম্মব্যথা স্নেহময়ী বিধবার বক্ষে বাজিল, তিনি একটা অছিলায় নিজেকে দমনের প্রয়াসে উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু গৌরী খবরটা পাইয়া তেমন সুখী হইতে পারিল না, সে ভাবিল এ কি রকম! সত্যদা আমার—ওমা সে যে বড় বিশ্রা! ছি ছিঃ না,—সে ভাল হবে না। বরকে সবাই লজ্জা করে, ঘোমটা দেয়, আমি ত সে সব কিছুই পারব না, আমার ওরকম করতেই লজ্জা করবে, আর হাসি পাবে। কি যে ওঁরা সব ঠিক করেন! মাসিমাকে গিয়া বলিল "বিয়ে না হলেই তো হয় মাসিমা, হয় না?"

বিন্ধ্য তাহাকে কোলে টানিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া মনের ঈষৎ ভারটুকু লাঘব করিয়া ফেলিলেন, হাসিয়া কহিলেন "তাকি হয় রে পাগলি হিন্দুর ঘরে বিয়ে না হলে হয় না।" আর কিছু বলা যেন কঠিন হইয়া উঠিল, বিশেষ সত্যর নামটা মুখে বাধিতেছিল।

(৪৬)

পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, দেড় বৎসরে শিবনারায়ণের সংসারে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তনে শিবনারায়ণকে বৃদ্ধ করিয়া করুণাময়ীকে পেষিত করিয়া ও সত্যকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল, 'কেবল একমাত্র

মনীষের কোমল চিত্তের উপরেই সেই ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল কাল তাহার বর্ণতুলিকার টান টানিতে কাতর হইয়াছিল, তাই সে এখনও তেমনি অপরিবর্ত্তিত। সেই পঠনপাঠন, সেই গুরুসেবা, স্নেহাস্পদে প্রীতি, সেই হাসিমুখ, সবই যেন সেই। এত বড় একটা ভাগ্য পরিবর্ত্তনে তাহাকে এতটুকু বদল করিতে পারে নাই যেন। তাহাকে দেখিয়া শিবনারায়ণ নিজের অনুতাপকষায়িত জর্জ্জর হৃদয়ে গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে করিতে মুগ্ধচিত্তে ভাবিতেন "ধন্য তুমি মনীশ, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ" সে তোমাকেই দেখিলাম!"

কমলার দুর্দিনের স্মৃতি করুণাময়ীকে সব চেয়ে কাতর করিয়াছিল। কোন কোন মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা তাহাকে দুইটা দিনেই একজনের কাছে চিরপরিচিত করিয়া তুলে, আবার চির-পরিচিতের মধ্যেও দুজনে একটা এমন কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায় যদ্দ্বারা আজন্মের সহবাসেও তাহাদের পরস্পরের নৈকট্য অনুভূত হয় না। ইহাকেই প্রাচ্যজ্ঞানীগণ কর্ম্মবন্ধন কহিয়া থাকেন। পতিপত্নীর সম্বন্ধে বহুস্থলে এ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোথাও পিতা পুত্রে মাতাকন্যায়, সহোদরে সহোদরায় এই ভাব সুব্যক্ত। করুণাময়ী অনাথা সখী-পুত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বধূরূপে কন্যাহীনগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া এমনই সুখ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্তানাপেক্ষাও অধিক স্নেহাস্পদ মনীশের বধূরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে এতখানি ভালবাসিয়াছিলেন যে করালীচরণের হীনতায় স্বামীর উচিত কোপকেও তিনি

সেই জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিতে না পারিয়া গোপনে তাহার সহিত রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়ে-মানুষের কথা বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব সে কানেও তুলিল না কমলাকে তাঁহার কক্ষচ্যুত করিয়া লইয়া গেল। রমণীর আর সাধ্য কি ক্রন্দনের বন্যায় বুক ভাসিল মাত্র।

শিবনারায়ণ নিজেও বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হীনচিত্ততার সংস্রব মহৎ হৃদয় সহিতে পারে ন', তাই এতবড় একটা ঘৃণিত অভিনয়ের অভিঘাতে তাঁহাকে উত্তপ্ত কয়িয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সাধু লোকের ক্রোধ কাগজে লাগা আগুনের মত যেমনই জ্বলে তেমনই শীঘ্র নিবিয়া যায়, তাহার আঁচে একটা ফোস্কা লাগিতে পারে, কিন্তু দগ্ধ করে না। ঘণ্টা দুই চার পরেই ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন "মেয়েটাকে যথার্থই নিয়ে যেতে দিলেম এতো ভাল হ'লনা একবার যাব নাকি? করুণাময়ীর প্রাণ ত ইহাই চাহিতেছিল, তিনি সহর্ষে কহিয়া উঠিলেন "গেলে হতোনা, কি জানি যে রকম লোক হয় ত টাকা পেলে আর কোথাও মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

"সে ভয় আমি করিনে, তাতে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বংশজের ঘরে কে অত বড় খাঁই মেটাতে পারবে? অবস্থাপন্ন ঘরে কেউ আর টাকা দিয়ে ছেলের বিয়ে দেয় না, যত সুন্দরী মেয়ে হোক, টাকাই খোঁজে। তা ছাড়া মেয়েও ত ছোট নয় আর বোধ হয় খুর সেয়ানাও আছে সে কি সে রকম দেখলে তোমায় খবর না দেবে ভেবেচ?"

পরদিন শিবনারায়ণ ত্রিবেণী গিয়া করালী-চরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন, "যাহা চাহিয়াছিলে দিব কমলাকে পাঠাইয়া দাও।"

করালীচরণের ক্রমেই চোখ ফুটিতেছিল লোভেই লোভ বাড়াইয়া চলে সে তৎক্ষণাৎ কহিল "তিনটি হাজার টাকা চাই, তাছাড়া আমার বাড়ীতেই বিয়ে হবে খরচাটাও আগাম দেবেন, এর এককড়া কমে চলবে না।"

অতি ক্রোধে আবার শিবনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন, তিনি বুঝিলেন দর ক্রমে বাড়িতেই থাকিবে, মনে মনে বলিলেন "তবে দেখ আমিও তোমায় জব্দ করব, দিন কত চুপচাপ থাকবো—গরজ না দেখলে তখন সেধে এসে যা বলবো তাই নিয়েই মেয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের বলিয়া আসিলেন সেখান হইতে সর্ব্বদাই কমলার তত্ত্ব লইয়া সংবাদ পাঠাইবে। কিন্তু একদিন যখন খবর আসিল করালীচরণ সপরিবারে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে তখনই তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, প্রথম কয়দিন করুণা-ময়ীকে খবরটা জানাইতে পারিলেন না, নিজেই চারিদিকে সংবাদ লইতে লাগিলেন, শেষে ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল,—কিন্তু কোন ফলই ফলিল না, করালী আসিল না শিব-নারায়ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে সহসা একেবারে সকল সংবাদই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভক্তিনাথ মর্ম্মাহত চিত্তে রত্নপুকুর হইতে ফিরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের তক্তোপোষে অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন।

আর বড়বধূ ছেলে কাঁখে করিয়া পাড়ার প্রতি গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ছোট কর্ত্তার অপূর্ব্ব-কীর্ত্তি দেশরাষ্ট্র করিয়া মনের বিষ মিটাইতে লাগিলেন। শেষে যোগ করিলেন, "কেমন এখন মুখে চুণকালি পড়েচে তো? ভাই বল্‌তে ঠাকুর একবারে দিশেহারা হন যে! মনে করেন কুঁদুলে মাগীরই যত দোষ, ওর লক্ষণ ভাই পাকা ফলটি ধরেই থাকেন, মুখে ছোঁয়ান না। দর্পহারী মধুসূদন কেমন দর্পচূর্ণ করেচেন? ভাই কত বড় ভাল এখন দেখুক!"

সংবাদটা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই গাঙ্গুলীপরিবারের উপর পড়িয়াছিল। করুণা-ময়ী এ দুর্দ্দৈবে এককালে স্তম্ভিত হইলেন, শিবনারায়ণ মর্ম্মের মাঝখানে একেবারেই যেন মরিয়া গিয়াছিলেন। এ কি হইল! সহস্রবার তাঁহার মন নীরববিস্ময়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল কাহার দোষে এরূপ হইল! নিজেকে মনীশের প্রতি কমলার প্রতি অবিচারী বোধ করিয়া আত্মধিক্কারে তাঁহার চিত্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। কেন তিনি করালীচরণের উপর রাগ করিয়া কমলাকে ছাড়িয়া দিলেন। মনীশ যদি ভাবে—যদি সে পলকের জন্যেও মনে করে কাকার টাকাটাই বড় হইল?

সাপে ছুঁচা ধরার যে উপমাটা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এপরিবারের অবস্থা এখন ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যেই সবটা চাপা থাকিল, ওগরাইবার, ফোক্‌রাই-বার সাধ্য যেন কাহারও ছিল না। এই অভূতপূর্ব্ব-অদ্ভুত নাটকের নায়ক এপরিবারের ইষ্টগুরু সার্ব্বভৌমমহাশয়ের আত্মজ!

তাই চাকদার প্রতি গৃহে যে সময় সেই ঋষিসন্তানের উদ্দেশ্যে কুৎসাগ্লানি বিদ্রূপ অভিশম্পাত বর্ষণ চলিতেছিল, এ গৃহের মধ্যে ঝটিকাপূর্ব্বের স্তব্ধ সমুদ্রের মত একটা ভীতিসঞ্চারী স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সত্য শুদ্ধ এ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছে।

যেদিন নন্দকিশোর কন্যার বিবাহের উমেদারী লইয়া গাঙ্গুলী গৃহে আগমন করিলেন সেদিন সদ্যবর্ষণের সজীবতায় দেশটা যেন তাজা হইয়া উঠিয়াছিল। মেঘযুক্ত আকাশখানা অনন্তের বিশাল বক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, ফুল বাগানের জলধৌত শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল কে যেন এখনই রং ফলাইয়া ইহা চিত্রিত করিয়া গেল, সার্সির উপর মুক্তা বিন্দুর মত বারিবিন্দু শোভমান, আম বাগানের ছায়াস্নিগ্ধ স্নেহরাশি মাখিয়া বাতাস সজল শীতল ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এবং সেই চির পরিচিত গৃহে শাদা আস্তরণ বিছান টেবিলটির নিকট নিজের কেদারাখানি দখল করিয়া পূর্ব্বের মতনই মনীশ প্রীতিপূর্ণ কৌতূহলে সেই ধৌতধূলি গৃহোদ্যানের দিকে চাহিয়াছিল। আজ ইহার প্রতি ধূসর কাণ্ডটি হইতে গাঢ় সবুজ পত্ররাজি পর্য্যন্ত যেন একটি নয়নলোভন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সারি সারি জুঁয়ের গাছের আপ্রান্ত আধফোটা শ্বেত মুকুলে খচিত, ভক্তহৃদয়ের রক্তরাগে রাঙ্গাজবা বিশ্বলক্ষ্মীর পদতলে আত্মনিবেদন করিয়াছিল। মনীশ সেইদিকে চাহিতেই একটা অতি সুন্দর

উপমা স্মরণে আসিল। একদিন এমনই বর্ষণক্ষান্ত মেঘের স্তিমিত আলোকে এক মহাকবি লিখিয়া গিয়াছেন "বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজবন নদীতীর জাতানি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈ র্যূথিকাজালকানি।

বিশ্ব রচনার আগাগোড়াই সৌন্দর্য্যপূর্ণ, ইহার কোথাও যেন দৈন্য নাই, তবে যত অভাব দিয়াই কি বিধাতা মানব চিত্ত গড়িয়াছেন! এই সামান্য বৃষ্টিটুকু জগতের কতখানি তৃপ্তি সাধন করিয়া গেল, কতখানি শোভা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিল, কিন্তু এ জীবনের মধ্যে উহার ক্ষীণধারা তো কই কোন পরিতৃপ্তি প্রদান করিল না! মনীশ আপনার মধ্যে অন্বেষণ করিল মনে তাহার কোন ক্ষোভ নাই সত্য কিন্তু আনন্দই বা কোথায়? ওই ছোট পাখীটীর মত, ওই জলধারাধৌত সবুজ লতাটির মত নম্রশান্ত চিত্ত তাঁহারই জয় গানে তো আগাগোড়া ভরিয়া নাই। কেন থাকে না? কিসের এ অতৃপ্তি! অমনই নির্ম্মল অম্লান হৃদয় লইয়া সে তো এ সংসারে এতদিন কাটাইয়া দিয়াছে তবে এতদিনে মনের মধ্যে এই কুয়াসার সূক্ষ্মজাল কোন সুযোগে প্রবেশ করিতে আসে? সে মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কপিসবর্ণ আকাশের পানে চাহিল, অসীম বিশ্বেশ্বরের সন্তান হইয়া হৃদয়ে এই অসীম সঙ্কীর্ণতা বহন করিয়া বেড়ান মানব জীবের পক্ষে একান্তই লজ্জাস্কর! কিসের দৈন্য! আপনার সত্ত্বাকে সেই সত্য মঙ্গলে শান্ত সুন্দরে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই তো সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র স্ব বিশাল হইয়া উঠিবে, তবে কেন মুহূর্ত্তের তরেও মনে সঙ্কীর্ণ চিন্তার বিষণ্ণতা স্থান পায়? না না এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সে তৃপ্ত হইবে, আনন্দপূর্ণ রহিবে, মনের কোণেও অভাবকে স্থান দিবে না।

ধীরপদে কেহ কক্ষে প্রবেশ করিল, ডাকিল "মনীশ!"

"আজ্ঞে!" মনীশ ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া খুল্লতাতের সম্মুখীন্ হইল। শিবনারায়ণের মুখ অত্যন্ত ম্লান, মনের মধ্যে বোধ হয় একটা তুমুল ঝটিকা বহিতে ছিল। প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিতে বাধিয়া গেল, শেষে ঈষৎ আত্মদমন করিয়া কহিলেন নন্দবাবুর পালিতা কন্যার সঙ্গে সত্যর বিয়েতে তুমি মত দিলে মনীশ, তুমি যাতে খুসী হবে তাতে বাধা দিতে আমার সাধ্য নাই, কিন্তু এ আমার মহা প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে জেন মনীশ, তোমার চিরকৌমার্য্য আমার বুকে শেল বিঁধবে, সতুর বউএর দিকে আমি চেয়ে দেখতে পারব না।"

মনীশ কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কাকাবাবু!"

"না মনীশ তুমি আমায় কি বলবে? আমি কি জানিনে আমি কি করেছি! তোমার বাগ্দত্তা বধূকে কেন আমি তুচ্ছ মানে গর্ব্বে অন্ধ হয়ে পাষণ্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় নিতে হবে না! তুমি বলবে তোমার মনে তার জন্য এক বিন্দু ক্ষোভ নাই! তাতেই কি আমি কিছু সান্তনা পাবো? না না—সে আরও যন্ত্রণা! তোমায় আমি নিখুঁত দেখতে চাই যে, মনীশের হৃদয় মমতাহীন একথা আমার

বিশ্বাস কে করাবে? আমার এ যন্ত্রণা যাবার নয়—এ পাপের ফল আমাকে ভুগতে হবেই।

মনীশ কি বলিবে কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না, কমলার জন্য তাহার যে ক্ষোভ কাকার মানসিক অবস্থার জন্য তাহা প্রায় চাপাই পড়িয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে সুযোগ পাইলেই একবার উঁকি দিতে চাহে মাত্র। কিন্তু এ কথা সে কেমন করিয়া এই স্নেহময় পিতৃব্যকে বুঝাইবে? নারী, বালক, অজ্ঞকে কতগুলো কথা সাজাইয়া বুঝান যায়, বিজ্ঞ প্রবীণকে কে বুঝাইবে? সে কতবার খুড়িমাকে বলিয়াছে হয় ত ভালই হইয়াছে; শচীর বাগ্দত্তার তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়াই উচিত ছিল। সে নিখিলনাথের নাম যদি শুনিত তাহা হইলেই গোড়া হইতে এত বড় ভুলটা ঘটিতে পারিত না! সে এই কথাটা দিয়া নিজের মনকেও ভাল করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল, নিজেকে বলিতেছিল তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিলে সে নয়—সে ঠিকই করিয়াছে! কিন্তু তথাপি কি যেন একটা সংশয় জাগিয়া থাকে! কিন্তু তাহার এ সব কথা বেশিক্ষণ ভাবিবার অবসর নাই, যে চারিটি চোখের অনিমেষ স্নেহসজাগ দৃষ্টি তাহার মুখে চাহিয়া আছে তাহারা তাহার হাসি মুখে এতটুকু ছায়া পাত দেখিলে এখনি শিহরিয়া উঠিবে, তাই নিজেকে এতটুকু আমল দিতে সাহস করে নাই। তথাপি হায়! প্রকৃত স্নেহের কাছে কণামাত্র ফাঁকিও চলে না। সে কহিল "আমায় কি আদেশ করবেন বলুন আমি তো কখনও আপনার অবাধ্য হই নি।"

শিবনারায়ণ আর্ত্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন "সেইজন্যই ত এত কষ্ট আমার মনীশ! যদি তুমি আধুনিক কালের ছেলেদের মতন হতে, যদি আমার পরে তোমায় বিরক্তির ভাব দেখতেম তাহলে হয়ত আমার পক্ষেও কৈফিয়ৎ খুঁজে পাবার ছিল, কিন্তু তা নও বলেই যে এ কষ্ট অসহ্য হয়েচে। তুমি সংসারী হবে না, ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাবে, কেমন করে আমি, তা দেখব মনীশ?"

"তবে আমায় আদেশ করুন—যাতে আপনি সুখী হন তাই বলুন।"

শিবনারায়ণ এতক্ষণে এ কথায় যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তার পর একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ শান্তস্বরে কহিলেন "তাই বা কেমন করে বল্‌বো মনীশ? সেদিন কাশীতে সার্ব্বভৌম মশাই যা বল্লেন তারপর তোমায় আর আমি কি বল্‌ব? একবার আমাদেরই জন্য তুমি নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন করেছিলে, তার ফলে এই মনস্তাপ, আবার জোর করে পাছে তোমায় অধিক অসুখের মধ্যে টেনে আনি তাই ভয় হয়। তাঁর কাছে তুমি বলেছ তুমি আমাদের আদেশে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ কিন্তু যদি সে আদেশ না পেতে হয় তাহলেই প্রকৃত সুখী হও! আমি তোমায় প্রকৃত সুখী দেখতেই ত চাই, আমার সুখ কিসে সে কথায় কাজ কি, তুমি কিসে সুখী হবে তাই আমার প্রয়োজন। লোকে এতে আমায় আরও নিন্দা করবে জানি, কিন্তু লোকের কথা বড় নয় তোমার সুখই আমার

সব চেয়ে বড়, সত্য কি মনীশ বিবাহে তুমি সুখী হবে না। কৌমারব্রত গ্রহণেই সুখী হবে মনে কর? বলো আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে ত কেউ কারুকে কোন দিন সঙ্কোচ করিনি, শুধু তুমি আমার সন্তান নও, উপযুক্ত সন্তান শাস্ত্রে বন্ধু নামে উক্ত হয়।"

মনীশ তখন নত নেত্র তুলিয়া চাহিল, তাহার সমস্ত হৃদয় স্থিরগাম্ভীর্য্যে যেন অকস্মাৎ সম্মোহিত হইয়া পড়িল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে অকপটে কহিল "যখন অনুমতি করচেন তখন বলাই সঙ্গত, যদি আপনি ও খুড়িমা মনে মনে কোনও ক্ষোভ না রাখেন তা হলে আমি চিরকৌমার ব্রত নিতেই চাই, সত্যর সন্তান আমাদের বংশ রক্ষা করবে। শুনেছি শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মচারী যদি বহু সন্তান স্থানীয় শিষ্যের শিক্ষকতা দ্বারা তাদের উন্নত করতে পারেন তবে তাঁদের গৃহস্থ ধর্ম্ম পালনও ঘটে। আমার ইচ্ছা আমি এইরূপেই গৃহধর্ম্ম রক্ষা করব, তবে আপনার ইচ্ছাই আমার সব।"

"তবে তাই হোক, তোমার সুখে ব্যাঘাত দেবো না, কিন্তু তোমার খুড়িমা যে কখনও এ দুঃখ ভুলতে পারবেন তা মনে হয় না। সত্যর বিয়ের কথা শুনে অবধি সে আরও কাতর হয়ে উঠেচে।"

শিবনারায়ণ চলিয়া যাইতে না যাইতে সত্য আসিয়া কহিয়া উঠিল "দাদা আমার পরে এ কি অবিচার করচো তুমি—সে হবেনা।"

মনীশ মুখ ফিরাইল "কি করেছি?"

"এই এই, তুমি ত জানো? সে হবে টবে না বলে রাখলাম; বেশ মজা ত নিজে আইবড় থাকবে আর আমার বুঝি এমনই করে, না যাও, কক্ষণো আমি তা শুনচি নে।"

মনীশ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া সত্যকে কাছে টানিয়া লইল হাসিতে হাসিতে বলিল "বলিস কিরে! গৌরী সেই গৌ: গাবৌ"—

"হোগ্‌গে হোগ্‌গে আমার দরকার নেই তাকে, আমি বিয়ে করবোনা। তুমি যা করবে আমি কি জন্যে তা করতে পাবনা বলত?"

সত্যর চোখ দুইটা আর্দ্র হইতে ও ঠোঁট কাঁপিতে আরম্ভ হইয়াছিল, সে সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল। মনীশেরও দুই চোখে সহসা হুহু করিয়া একটা বন্যার বেগ ছুটিয়া আসিতে চাহিল; সে তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়া ভাইএর আরক্ত মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আমরা বল্‌চি বলে।"

"তোমায় কি কেউ কিছু বলেনি? বেশ ত আমিত আর তোমায় বিয়ে করতে বলচিনে তুমি আমি দুজনেই এক রকমে জীবন কাটাব, আমি কি এখন তেমনি অবাধ্য অমনোযোগী আছি যে তোমার কোন কাজেই লাগতে পারিনে?"

আর সামলান গেল না, এবার দুজনের রুদ্ধ অশ্রুই দুইদিক হইতে ঝর ঝর করিয়া একসঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। অবরুদ্ধবাষ্প সত্য কাঁদিয়া দাদার কোলে মুখ গুঁজিল "দাদা আমি কি শুধু তোমার পড়ানর ছাত্র দুঃখের অংশী কি নই? তবে কেন তুমি যে পথ নিজের জন্য ঠিক করেচ তার মধ্যে আমায় স্থান দিচ্চো না?"

গভীর আনন্দে মনীশের চিত্ত জোয়ারের সমুদ্রবৎ স্ফীত হইয়া উঠিল, সে পরম আনন্দে ভাইটির মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সকরুণ স্নেহে রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে কহিল, "তা যে হতে পারে না সতি! তুমি যদি এ দায়িত্ব বহন কর তবেই আমার মুক্তি ঘটে, কেননা পিতৃপুরুষের কথা ত ভুললে চল্‌বে না, নিজেই ত সবটা নই। তুমি তোমার দাদাকে সুখী করবার জন্য তার আদেশ পালন করবে কি বল?" ক্ষণপরে অস্ফুটস্বরে সেই ঔদ্ধত অবাধ্য বালক উত্তর করিল "তুমি যদি তাতেই সুখী হও দাদা তা হলে কি আমি না বল্‌তে পারি?"

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাণমুক্তি

বৌদ্ধেরা বলেন যে পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ফলিবে, কর্ম্মান্তে মৃত্যুর পর পুনরায় ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইব। ইহা সঙ্গত বিশ্বাস। এই প্রকাণ্ড কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তব্য সাধনই উপাসনা—ইহা ছাড়া অন্য উপাসনা নিষ্ফল।

হিন্দুশাস্ত্রে বলা হইয়াছে মনুষ্য হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই নিয়তির অধীন, আবার সেই নিয়তি কর্ম্মের অধীন সুতরাং দেবগণের উপাসনা না করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কাজ করাকেই কর্ত্তব্যের উপাসনা বলে, তাহা করিলেই আমাদের ঈশ্বর হইতে পৃথক আমিত্বজ্ঞান যুক্ত জীবরূপে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সাধন হইল। কর্ত্তব্য কর্ম্মে লোকদিগকে চালিত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে—তাহাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজ সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হইবার হেতু।

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালন করেন ঈশ্বর তাহাদিগকে ভৌতিক নিয়মের অধীনে রাখিয়াই সাহায্য করেন। যথা একটা ভূমিকম্পে কতকগুলি বাড়ী পড়িয়া গিয়া বহুলোক চাপা পড়িয়া মারা গেল, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি এমন ভাবে রক্ষিত হইল যে তাহার গায়ে একটা আঁচরও লাগিল না। এরূপ ঘটনা ত আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। আবার একজন পাপী অত্যাচারী যিনি অন্যায় রূপে বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন হয়ত তাহার একটি সন্তানও জীবিত থাকিল না অথবা জীবিত থাকিলেও একটা ভয়ানক বদমাইস বা গুণ্ডা হইয়া সেই পিতার উপরই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল অথবা অন্যায় রূপে লব্ধ অর্থ কোন না কোন প্রকারে নিঃশেষ হইয়া গিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইল। কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়াও

অনেককে কষ্ট পাইতে দেখা যায় বটে কিন্তু প্রায় স্থলেই সে কষ্ট অন্য বহুলোকের সুখ আনয়ন করে সেইজন্য সে কষ্টেও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির আত্মপ্রসাদ জন্মে; এবং তাহা জগতে পুণ্যাদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকে।

হিন্দুরা বলিয়াছেন যে যেদিন তুমি অভ্যাসের দ্বারা আত্মপরের বিভিন্নতা ত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তোমাতে বিভিন্নতা জ্ঞান থাকিবে না অর্থাৎ ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর যখন জীবদেহ মৃত্তিকায় বিলীন হয়, তখন আমরা উহাকে নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলিয়া থাকি, বৌদ্ধেরা ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলেন আর বিজ্ঞান ইহাকেই ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাওয়া বলিবে।

এইরূপে সর্ব্বদাই কোটি কোটি জীব জন্তু, বৃক্ষ গুল্ম, লতা পাতা প্রভৃতির জন্ম মৃত্যু হইতেছে। এই জন্ম মৃত্যু ও বৃদ্ধি ক্ষয় ঈশ্বরেরই দেহাভ্যন্তরে ঘটিতেছে। যেমন আমাদের দেহের রক্তমধ্যস্থ শ্বেত-কণিকা যাহাকে ফেগাসাইট (Phagacyte) বলে তাহাদের কার্য্য দেখিলে পৃথক পৃথক জীবন্ত বস্তু বলিয়া বোধ হয়। তাহারা আমাদের রক্তে কোন প্রকার জীবাণু শত্রু প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে উদরস্থ করে, এবং এইরূপে আমরা অনেক রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করি। আবার আমাদের দেহনির্ম্মাণক কোষসমূহও ভিন্ন ভিন্ন জীবের ন্যায় হাত বাড়াইয়া রক্ত হইতে নিজ নিজ দেহপরিপোষক পদার্থ গ্রহণ করে এবং রক্তে শত্রু প্রবেশ করিলে এই সব হস্তগুলি ছিন্ন হইয়া যায় এবং ঐ একখানা ছিন্ন হস্তের পরিবর্ত্তে দুই তিনখানা নূতন হস্ত প্রস্তুত হইয়া তাহাদের অধিকাংশ পুনরায় ঐরূপে কর্ত্তিত হইয়া শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধের রক্তবীজের ন্যায় বলবান সৈন্য প্রস্তুত হইয়া শত্রু বিনাশ করে। এইরূপ অহরহঃ আমাদের দেহাভ্যন্তরে ক্রমাগত যুদ্ধ হইতেছে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি না। যখন আমাদের দেহাভ্যন্তরের সৈন্যেরা এইরূপ যুদ্ধে পরাস্ত হয় তখনই আমরা পীড়িত হই; এই সকল সৈন্যগণ আমাদের দেহের অংশবিশেষ। এক সময়ে মনে করা যায় যে আমরা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আবার মৃত্যুর পরে (ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে) সে বিভিন্ন ভাব আর থাকে না। অনেকেই মনে করেন যে আমাদের একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে মৃত্যুর পরে তাহা পৃথক হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, অথবা ঈশ্বরের শেষ বিচারের সময় পর্য্যন্ত কোথাও অবস্থান করে ও পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা ঘড়ীর আত্মা থাকায় ন্যায় কল্পনা মাত্র। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে তিনি তাঁহার মৃত বন্ধু বা স্ত্রীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কখনই একথা বলিবেন না যে ঐ সকল মৃত ব্যক্তিরা উলঙ্গ অবস্থায় তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত দেহের সূক্ষ্ম দেহ থাকা অনুমান করা যাইতে পারে কিন্তু বস্ত্রালঙ্কারাদি জড় পদার্থের সূক্ষ্ম দেহ বা

আত্মা থাকা কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং সে অবস্থায় তাহাদের ঐরূপ দর্শন ভ্রম মাত্র তাঁহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বস্তুদর্শন দুই রকমে ঘটিয়া থাকে; এক প্রকার চক্ষুর মধ্যে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহার উপলব্ধি স্নায়ু দ্বারা চালিত হইয়া মস্তিষ্কের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন ঘটায়; আর একপ্রকার চক্ষুর মধ্যে দিয়া প্রতিফলিত না হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে কোন কারণে ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইলে চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও সেই বস্তু বা ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত বলিয়া মনে হয়। ইহাকেই খেয়াল দেখা বলে। যাহার মস্তিষ্ক নাই তাহার আমিত্বজ্ঞান, কি দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ আস্বাদ প্রভৃতি কিছুই অনুভূত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তিকে ক্লোরোফরম "Chloroform" আঘ্রান করাইলে ক্রমে তাহার আমিত্বজ্ঞান লোপ হইয়া যায়। যদি তাহার উপরে আরো ক্লোরোফরম দেওয়া হয় তাহা হইলে এই আমিত্বজ্ঞান বা সর্ব্ব-প্রকার অনুভব শক্তি একেবারে লোপ হইয়া যায়, তদুপরি আরো ক্লোরোফরম দিলে তাহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ এই সকল অনুভব শক্তি চিরকালের মত লোপ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি এমন পরিমাণে ক্লোরোফরম দেওয়া হয় যাহাতে মৃত্যু না ঘটে তাহা হইলে মস্তিষ্ক পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলে আমিত্বজ্ঞান ফিরিয়া আসে। কিন্তু অপরিমিত ক্লোরোফরম আঘ্রাণে একবার মৃত্যু ঘটিলে কোন দেহবিযুক্ত আত্মা যে আমিত্বজ্ঞান সহ আকাশে পরিভ্রমণ করিবে ইহা অসম্ভবপর নহে। বিজ্ঞানাচার্য্য "Metchni-koff" তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন জ্ঞানযুক্ত আত্মা থাকা "Concious Soul" অসম্ভব অর্থাৎ আত্মার মস্তিষ্ক না থাকাতে তাহার আত্মজ্ঞান, "Conciousness" থাকা অসম্ভব। কেহ বলিতে পারেন সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় সূক্ষ্ম মস্তিষ্কও আছে, সুতরাং সেই সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের আমিত্বজ্ঞান থাকা কেন অসম্ভব হইবে? তাহার উত্তর এই যে, আমিত্বজ্ঞান স্থূল মস্তিষ্কেরই আছে। সুতরাং সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের আমিত্বজ্ঞান থাকা বা সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক বা সূক্ষ্মদেহ থাকা কল্পনা মাত্র।

কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত একটী কুকুরের মস্তক ধারাল অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে অপর কুকুরের ধমনির পরিষ্কার রক্ত সঞ্চালন করিয়া সেই মস্তককে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছিলেন। অথচ উহার দেহ অনেক পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ ঐ মস্তকের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত সঞ্চালন করা হইয়াছিল ততক্ষণ উহা জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকাতে সে সেই দিকে তাকাইয়াছিল, পুনরায় অপর দিকে দাঁড়াইয়া উহার নাম ধরিয়া ডাকাতে সে সেই দিকে চক্ষু ঘুরাইয়াছিল। কিন্তু যখন ঐরূপ রক্তচালন কার্য্য বন্ধ করা হইল তখন সে মরিয়া গেল। ইহা দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্কই আমাদের আমিত্ব জ্ঞানের আধার, উহার ক্রিয়া লোপ হইলে কিম্বা কোন রকমে নষ্ট হইলে আর আমিত্ব জ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক পচিয়া গলিয়া মৃত্তিকাতে

মিশিয়া গেলে আমিত্ব জ্ঞান কি প্রকারে থাকিতে পারে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং যদি মৃতব্যক্তির কোন রূপ সূক্ষ্ম দেহ থাকে তাহা হইলেও ঐ সূক্ষ্মদেহের আমিত্ব-জ্ঞান কিম্বা সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় ঐরূপ সূক্ষ্মদেহ বা আত্মা থাকা বা না থাকা একই কথা। আমি অমুক ব্যক্তি ছিলাম ও মরিয়া গিয়া আমার আত্মা শূন্যে বিচরণ করিতেছে যদি এই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে সেই আত্মা আমারই হউক বা অপরেরই হউক তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা দ্বারা কি এই প্রমাণ হইল যে সমুদয় কার্য্যই ভৌতিক নিয়মে হয় ও ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই? এরূপ অনুমান করিলে তাহাও ভুল, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, যে ভৌতিক নিয়মে সকল কার্য্য হইতেছে সেই নিয়ম বুদ্ধিমান। যাহারা নিরীশ্বরবাদী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যদি সমুদয়ই ভৌতিক নিয়ম তবে ইহার মধ্যে বুদ্ধি ও উদ্দেশ্য কোথা হইতে আসিল? ভ্রূণ দেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাক যন্ত্র এমন কৌশলে প্রস্তুত হয় যাহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমাবেশ দেখা যায়, হৃৎপিণ্ডের কপাটসমূহের ও পরিপাক যন্ত্র সমূহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদের নির্ম্মাণকৌশল ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয়। পরমাণুমধ্যস্থ এই বুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষমতাই ঈশ্বর।

অনেকে ঈশ্বরেতে স্নায়ব গুণ (যথা দয়া ইত্যাদি) আরোপ করেন, যাহা দেহী ব্যতীত অর্থাৎ মস্তিষ্কশূন্য কোন পদার্থে আরোপ করা সঙ্গত নহে। সেইরূপ করিতে গেলে একটি দেহ, যে আকারেরই হউক, কল্পনা করিতে হইবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার আবাস স্থানও নির্ণয় করিতে হইবে, সে অবস্থায় এই অনন্ত সৌর জগতের এক কোণে পরমেশ্বরকে রাখিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্রভাবে কল্পনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মূল বিষয় তদ্বিপরীত, অর্থাৎ ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, জন্মলয়বিবর্জ্জিত মহাশক্তিশালী।

যত রকমের ধর্ম্ম দেখা যায় তন্মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখিলে হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চিন্তার ফল বলিয়া বোধ হয়। কোন ধর্ম্মে, এত গভীর গবেষণা দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদের মধ্যে অনেক কথা পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল গুলিই সমাজ বন্ধনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে; কোন শাস্ত্রোক্তিই ঈশ্বর ও সমাজ বন্ধনের সহিত বিরুদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত নহে।

(ডাক্তার) শ্রীনিবারণচন্দ্র সোম।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৩)

মহারাষ্ট্র রাজ্যস্থাপন—শিবাজী রাজা

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগলসম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনও মোগল-যূপ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ-ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আল্লা-উদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। তাহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল-পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর, আহমদনগর, গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমানরাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়-নগরের হিন্দুরাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মসলিম একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আক-বরের সময় হইতেই তাহাদের বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল-রাজ্য ভুক্ত হয়।

বোম্বায়ে যখন ইংরাজ-



শিবাজী

ইংরাজেরা মারাঠা দেশে অল্পে অল্পে কিরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল সে এক কৌতূহলপূর্ণ অপূর্ব্ব কাহিনী; তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে মারাঠীরাজ্যের গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। অন্য সকল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, কিন্তু হাজার সংক্ষেপ করিলেও তাহা দুই তিন অধ্যায়ের কমে সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। পাঠকদের যদি ভাল না লাগে, তবে এ ভাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন।

অধিকার স্থাপন হয়, বিজাপুর ও গলকণ্ডা তখনও স্বাধীন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাদের বশীকরণ মন্ত্রণা করিয়া অনেক চেষ্টায় সেই রাজ্যদ্বয়কে দিল্লীসাৎ করেন। ১৫ই অক্টোবর ১৬১৫ সালে বিজাপুর, বর্ষেক পরে গলকণ্ডা মোগলরাজ্যভুক্ত হয়, এইরূপ রাজ্যবিস্তারই মোগলরাজের অধঃপতনের কারণ হইল। মুসলমানদের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্ট্রীরা মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধান পাইল। যদি দক্ষিণে মুসলমান রাজ্য সকল অক্ষুণ্ণ থাকিত তাহা হইলে হিন্দুরাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ—ভারতের ইতিহাস হয়ত আর এক ধরণে সংগঠিত হইত। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-সাম্রাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মোগলসূর্য্য অস্তোন্মুখ, ওদিকে কোথা হইতে কালমেঘ উঠিয়া অল্পকাল মধ্যে দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শিবাজী ভোঁসলে

ঐ কালমেঘ শিবাজী ভোঁসলে। শিবাজী একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত উপন্যাসের মত মনোহারী। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁহাকে দেখিতে মধ্যমাকৃতি কিন্তু সুগঠন ও গৌরবর্ণ—লক্ষ্যভেদী জ্বল জ্বল চক্ষু, কলম ধরিতে জানেন না কিন্তু সকল প্রকার শস্ত্রচালনায় বিলক্ষণ মজবুত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়পূর্ণ, উপায়ের খনি, ধূর্ত্তচূড়ামণি। তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল, জননীর চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া কোন মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তাঁহার পিতা সাজাহী বিজাপুর সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। পুণায় তাঁহার জায়গীর, তথায় দাদাজী কোণ্ডু নামক আচার্য্যের হস্তে শিবাজীর শিক্ষার ভার সন্ন্যস্ত হইল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বালকের উপর দ্রোণাচার্য্যের শাসন কতদিন খাটে? মাওলী বংশীয় চাষার দল তাঁহার সঙ্গী—লুটপাট ডাকাতি শিকার এই সকল কাজেই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ। খর্ব্বকায় অথচ দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মাওলীদের হস্তে অস্ত্র দিয়া শিবাজী তাহাদের মধ্য হইতে রামের বানরসৈন্যবৎ সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। পাহাড়ে দেশে তাঁহার জন্ম—পশ্চিমঘাট অঞ্চলে যে সকল প্রকৃতিগঠিত দুর্গ আছে তাহা একে একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। পাহাড় দুর্গে তাঁহার বাস, লুটের মাল হইতে তাঁহার ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। যখন যেমন সুবিধা—কখন বিজাপুরের পক্ষ হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে, কখন মোগলসম্রাটের অধীনে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজকার্য্য সাধিয়া লইতেন। অবশেষে যখন নিজের বল বুঝিলেন—যখন দেখিলেন "পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে" (ডোঙ্গরাস্ লাবিলে দিবা) সকলি প্রস্তুত—তখন মুখোষ ফেলিয়া দিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

আফজুল খাঁ

ক্রমে শিবাজীর দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল, বিজাপুর-সুলতান আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। শিবাজীকে দমন না করিলে সে সর্ব্বদমন হইয়া উঠিবে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য

প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আফজুল খাঁ কোমর বাঁধিয়া শিবাজীকে ধরিয়া আনিতে বাহির হইলেন।

সে সময়ে শিবাজী মহাবলেশ্বর হইতে অনতিদূরে প্রতাপগড়ের পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া প্রকৃতির বলের উপর কৃত্রিম বল যোজিত হইয়াছে। শিবাজী এই দুর্গে ব্যাঘ্রের ন্যায় বসিয়া শিকার নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে তুলজাপুরের মন্দির আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। ম্লেচ্ছদের উপর হিন্দুদিগের জাতিবৈর দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শিবাজী চরমুখে সকল সংবাদ পাইতেছেন। আফজুল খাঁ অনেক সৈন্যসামন্তে পরিবৃত, তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, ছলে ও কৌশলে তাঁহাকে মারিতে হইবে। শিবাজী নবাব সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন ও ভয়ের ভান করিয়া এই রূপ দেখাইতে লাগিলেন যে তিনি নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতে এখনি প্রস্তুত, কেবল প্রাণভয়ে ধরা দিতে নারাজ। খাঁ সাহেব যদি প্রতাপগড়ে অধীনের সাক্ষাৎকারে সম্মত হন তাহা হইলে মুখে সকল কথা হইবে! অবশেষে তাহাই সাব্যস্ত হইল। নবাব কোন দুরভিসন্ধি মনে না আনিয়া শিবাজীর সহিত সহজভাবে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন—একজন মাত্র সঙ্গী, পরিচ্ছদের মধ্যে এক পাতলা মসলিনের কাপড়, আর একটি সোজা তলবার—সে শুধু অলঙ্কারের জন্য,—ব্যবহারের মানসে নয়। বেহারাগণ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে পাল্‌কী নামাইল কিন্তু শিবাজী সেখানে নাই। দূর হইতে দুজন মানুষ দেখা যাইতেছে—ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে তাহাদের পদক্ষেপ। বাহিরে দেখিতে শিবাজী নিরস্ত্র কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি 'ভবানী' তলবার ও 'বাঘনখ' গুপ্তাস্ত্রে সুসজ্জিত। বাহিরে সামান্য শুভ্র বেশ কিন্তু ভিতরে তিনি লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত। শিবাজী ক্রমে অগ্রসর হইলেন—খাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্গে দস্তুর মত কোলাকুলি করিতে গেলেন। কিন্তু শিবাজীর সে ভাল্লুকের আলিঙ্গন—তাঁহার হস্তে প্রচ্ছন্ন 'বাঘনখ' ছিল তাহার আঘাতে নবাবের উদর বিদীর্ণ হইল। বাঘনখে যাহা হইবার বাকী ছিল ভবানী খড়্গে তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন। (১)

এদিকে পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। কামানের শব্দে পাঁচবার দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত হইল। নীচে মুসলমান সেনা অপ্রস্তুত ভাবে ছিল, শিবাজীর মাওলীরা চারিদিক্ হইতে তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। প্রত্যূষে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা সদর্পে কুচ করিয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই দুর্দ্দশার কাহিনী বলিবার জন্য যে

(১) সুবিখ্যাত মারাঠী ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফের এইরূপ বর্ণনা। অন্য লেখকেরা বলেন যে উভয় পক্ষেরই মনে মনে দুরভিসন্ধি ছিল—কে কাহাকে ধরিতে পারে উভয়েরই এই মনোভাব। কেহ কেহ বলেন শিবাজীর উপর নবাবেরই প্রথম আক্রমণ—শিবাজীর আত্মরক্ষার্থে নবাবকে মারিতে হইল। কিন্তু গুপ্তাস্ত্রের ব্যবহার ও পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে সৈন্যের আক্রমণ—এই সকল দেখিয়া প্রচলিত প্রবাদই সমূলক বলিয়া অনুমান হয়।

ফিরিয়া যাইবে এমন অল্প লোকই অবশিষ্ট রহিল।

এই জয়লাভে শিবাজী সৌভাগ্য সোপানে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। শিবাজী এই জয়লাভের পর নিদ্রিত রহিলেন না। গিরিদুর্গ সকল হস্তগত করা তাঁহার যে সাধ তাহা অবাধে মিটাইতে পারিলেন।

আফজুল খাঁর পতনের পর পন্হালার দক্ষিণ কৃষ্ণানদী তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ



আফজুল খাঁর বধ
(শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত)

শিবাজী রাজ্যসাৎ করিয়া লন। বিজাপুর হইতে দ্বিতীয়বার যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল তাহাও পরাস্ত হইল। তৃতীয় যুদ্ধে শিবাজী বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া পন্হালা দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিজাপুরের প্রবল সৈন্য সেই দুর্গ আক্রমণ করিল—পলায়ন ভিন্ন রক্ষা নাই। শিবাজী কৌশলক্রমে শত্রুহস্ত এড়াইয়া রঙ্গাণায় সরিয়া পড়িলেন। বিজাপুর সৈন্য তাঁহাকে ধরিতে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। সেই সঙ্কটে সেনানী বাজি প্রভু এক সহস্র মাওলী লইয়া আগম নিগমের পার্ব্বত্য সুঁড়ী পথ আগলাইয়া রহিলেন। ৯ ঘণ্টা কাল তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার তৃতীয়াংশ সেনা মারা পড়িল তবুও তিনি অটল। অবশেষে তোপধ্বনিতে রঙ্গাণায় শিবাজীর নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবার সংবাদ পাইয়া নিরস্ত হইলেন। কিছু পরে তিনি নিজেও আহত হইয়া সহাস্য বদনে প্রাণত্যাগ করেন। বাজি প্রভুর এই বীরত্ব কাহিনী প্রাচীন গ্রীসের Thermopylæ রক্ষণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রঙ্গাণা পথের এই দুর্গম স্থান মারাঠা সমরের Thermopylæ থর্ম্মাপিলি।

ইহার পরেও কতবার বিজাপুর রাজা শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল, পরিশেষে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি বন্ধনে পরিত্রাণ পাইলেন। ফলে কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় কোঙ্কণ প্রদেশ এবং ভীমা হইতে বারণা নদী পর্য্যন্ত ঘাট-শ্রেণীর প্রদেশ সমূহ, দক্ষিণে ১৬০ মাইল পূর্ব্বে ১০০ মাইল ব্যাপিয়া শিবাজীর অধিকারভুক্ত হইল।

এখনো কিন্তু সকল শঙ্কট দূর হয় নাই—বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার মোগলের কোপচক্রে পতিত হইলেন। এক ফাঁড়া গিয়া আর এক ঘোরতর ফাঁড়া উপস্থিত। এই বিষম শঙ্কট হইতে শিবাজী কি কৌশলে উদ্ধার পাইলেন তাহা বর্ণনাযোগ্য।

১৬৬২ সালে মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হয়। অতঃপর দক্ষিণের মোগল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে শাসন করিতে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন। শিবাজীর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নবাব পুণায় আসিয়া আড্ডা করিলে শিবাজী তাঁহার সিংহগড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নবাব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান—"তুমি মর্কট বানরের মত পাহাড়ের উপর বসে থাক—যুদ্ধের বেলায় কেল্লায় বন্ধ থেকে এগোতে সাহস কর না, এবার আমি তোমাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।" শিবাজী উত্তর করিলেন—"আমি বানর সত্য কিন্তু সেই রামসৈন্য বানরের জাত যারা রাবণ বধ করে লঙ্কা জয় করেছিল। আমি তোমাকে এমন জব্দ করব যে পালাবার পথ পাবে না।" বাস্তবিক তাঁহার কথাই ঠিক হইল। নবাব যে বাড়ীতে ছিলেন তাহা এক সময়ে শিবাজীর বাসগৃহ ছিল, নাম লালমহল, তিনি তাহার অন্তর বাহির অন্ধি সন্ধি সকলি ভাল করিয়া জানিতেন। সায়েস্তা খাঁ সেনা-পরিবৃত—বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য

যাহা কিছু করা যাইতে পারে কিছুই ত্রুটি করেন নাই। শিবাজী একরাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ তাঁহার দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথি-মধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্যদল স্থাপন করিয়া ২৫ জন মাওলীর সঙ্গে এক বিবাহের বরযাত্রী দলে মিশিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে পিছনের এক দ্বার দিয়া নবাবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ এইরূপ আকস্মিক বিপদ দেখিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। শেষে আপনার শয়ন গৃহের গবাক্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়া খড়্গাঘাতে দুইটি মাত্র অঙ্গুলি হারাইয়া কোনমতে পার পাইলেন। এই উপপ্লবে নবাবের পুত্র ও অনুচরবর্গ মারা পড়ে। শিবাজীর চকিতের ন্যায় উদয়—চকিতের ন্যায় অন্তর্ধান। তাঁহার অনুচরগণের জয়ধ্বনি ও মসালের আলোকের মধ্যে তিনি মহাসমারোহে স্বীয় দুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত সাহসিক কার্য্যের আশাতীত ফললাভ হইল। মোগল সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া ছড়িভঙ্গী হইয়া পড়িল। ইহার পর সায়েস্তা খাঁ আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।

শিবাজীর সাহস এমনি বাড়িয়া উঠিল যে কিছুকাল পরেই তিনি চতুঃসহস্র অশ্বারোহী-সহ হঠাৎ সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট তখন বিদেশীয়দের বাণিজ্য ক্ষেত্র ছিল। ছয় দিন ধরিয়া ইচ্ছামত নগর লুণ্ঠন করিয়া অগাধ ধনরত্নে তিনি তাঁহার রায়গড় কেল্লার ধনাগার পূর্ণ করিলেন। এই আক্রমণকালে ইংরাজেরা অতুল বিক্রম ও সাহসের সহিত আপনাদের কুঠী রক্ষা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ব্রিটিষ সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে!

আশ্চর্য্য পলায়ন

এই সকল ঘটনার কিছু পরেই দেখিতে পাই যে শিবাজী মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজীবের কুহকে পড়িয়া দিল্লীতে বন্দীকৃত হইয়াছেন। মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সহিত মিলিয়া তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন। এই ব্যাপারে মারাঠীরা এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে স্বহস্তে অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শিবাজী স্বীয় পুত্র শম্ভোজীকে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। গিয়া দেখেন, যাহা ভাবিয়া-ছিলেন তাহা কিছুই নয়, যেরূপ মানমর্য্যাদা পাইবার আশা ছিল তাহা পাইলেন না। রাজদরবারে তৃতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারদের সহিত একাসনে বসিতে হইল, বাদসা তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, এইরূপ ব্যবহারে শিবাজীর মনে এমনি মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল যে তিনি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাসায় গিয়া দেখেন তাঁহার গৃহের চারিদিকে সিপাই সান্ত্রীর পাহারা, পলাইবার পথ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন দিল্লী আসিয়া ভাল কাজ করেন নাই, পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। তিনি পীড়ায় ছল করিয়া শয্যাগত রহিলেন। কয়েকজন বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসিত, তাহাদের দিয়া বাহিরের মিত্রবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ হইল। তিনি

আর একটা ফন্দী করিলেন। ফকীর কাঙ্গালীদের মিষ্টান্ন ও আর আর দ্রব্য বিতরণ করা, নিত্য কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার এক কাজ হইল, ঐ সকল সামগ্রী বড় বড় চুবড়ী করিয়া পাঠান হইত। এইরূপে কিছুদিন যায়, একরাত্রে তিনি নিজে একটা চুবড়ীর মধ্যে লুকাইয়া পুত্রটিকে আর একটায় পুরিয়া দুই বাহকের স্কন্ধে বাহির হইলেন, দ্বারপালেরা অভ্যাসবশতঃ ওদিকে বড় লক্ষ্য করিল না। তাঁহার শয্যায় একজন ভৃত্যকে রাখিয়া দিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়ন কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। তাঁহার জন্য একস্থানে অশ্ব প্রস্তুত ছিল তাহাতে চড়িয়া পুত্রকে সঙ্গে বসাইয়া লইয়া সেই যে একটানা চলিলেন আর কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। মথুরায় আসিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ভস্মলেপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। পুত্রকে সেখানেই রাখিয়া গেলেন, বেচারা এমন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে আর নড়িবার শক্তি ছিল না। তথা হইতে আলাহাবাদ, আলাহাবাদ হইতে কাশী, কাশী হইতে গয়াতীর্থ, গয়া হইতে কটক, কটক হইতে হাইদ্রাবাদ, এইরূপে ৮ মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রাজ-গড়ের কেল্লায় তাঁহার মাতা জীজাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। একদিন হঠাৎ দুই জন বৈরাগী জীজাবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। জীজাবা তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলে, একজন গুরুর মত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অন্যজন পাগড়ী খুলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। মাথায় চিহ্ন দর্শনে আপনার পুত্রকে চিনিতে পারিয়া জীজাবা তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া জিজাবার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেদিন কাঙ্গালীদিগকে অন্নদান, তোপধ্বনি ও বাদ্যোদ্যমের ধূম পড়িয়া গেল, নরনারী ছোট বড় সকলেই আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল।

এই প্রকারে অশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শিবাজী অল্পে অল্পে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইল। 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' এই দ্বিবিধ কর আদায় করিবার পরওয়ানা প্রথম দাক্ষি-ণাত্যের রাজাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, পরে রীতিমত বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করিলেন। ৬ই জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা পদবী গ্রহণ করিয়া রাজগড়ে মহা ধুমধাম করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই উপলক্ষে আপনাকে স্বর্ণস্তূপে ওজন করিয়া স্বীয় দেহভার পরিমাণ স্বর্ণরাশি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করত অতুল খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ৫ই এপ্রেল ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়েসে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যাধিকার সামান্য ছিল না। গুণ্ডাবী হইতে পাণ্ডা পর্য্যন্ত (ইংরাজ ও পোর্ত্তুগীস্‌দের কোন কোন স্থান বাদে) কোঙ্কণের সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ; ওদিকে আবার পুণা হইতে জুনের পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত মারাঠা প্রদেশ—কত গিরি দুর্গ সমেত তাঁহার অধিকারভুক্ত; কারওয়ার অঙ্কোলা প্রভৃতি কতকগুলি সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে তাঁহার থানা; তাহা ছাড়া দ্রাবিড় তাঞ্জোর, কর্ণাটক, খানদেশ ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার বিজিত ভূখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত। দস্যুবৃত্তি

হইতে শিবাজীর জীবনের আরম্ভ—অসীম রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তিনি জীবনযাত্রা শেষ করেন।

শিবাজীর শাসন প্রণালী

শিবাজী রাজার অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের আয়তন কতটুকু ছিল অল্পকালের মধ্যে সেই রাজ্য যে কি বিপুল বিস্তার লাভ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শিবাজীর শেষাবস্থায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার প্রতাপ অতুলন, তাপ্তীনদী হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল রাজার রাজেশ্বররূপে তিনি একবাক্যে গৃহীত হইলেন।

শিবাজী রাজার রাজ্যলাভে যেমন চাতুর্য্য, রাজ্যসংগঠন ও শাসনকার্য্যেও তেমনি তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অর্জন ও রক্ষণ ক্ষমতা যাঁর একাধারে এইরূপ যোগক্ষেমসম্পন্ন মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শিবাজীকে সেই মহাপুরুষদের আসনে স্থান দিতে হয়। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী বিচার যোগ্য, অধুনাতন সভ্যজগতের মাপদণ্ড দিয়া মাপিয়া দেখিলেও তাহাকে হেয় জ্ঞান করা যায় না। সংক্ষেপে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রথম। এক একটি গিরিদুর্গ এক এক প্রদেশের কেন্দ্রস্থল

মারাঠী ইতিহাস (বখর) লেখকেরা বলেন শিবাজী রাজা ক্রমশঃ ২৮০ সংখ্যক গিরিদুর্গ হস্তগত করেন। এই সকল দুর্গ নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্যে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তাহাতে যত পরিশ্রম যতই অর্থব্যয় হউক না কেন কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতেন না। শত্রু আক্রমণ বল, আত্মরক্ষাই বল, মারাঠী রাজ্য স্থাপনের সময় প্রথম প্রথম দুয়েতেই এই সকল দুর্গের বিশেষ উপযোগিতা ছিল। এই সকল বন্ধনী মারাঠী সাম্রাজ্যের বন্ধন, বিপদের সময় ইহারাই রক্ষা-কবচরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সকল দুর্গ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে শিবাজী তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দুর্গরক্ষণে একজন মারাঠা হাওয়ালদার ও তাহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত ছিল। তাহার দেওয়ানী ও রেবেন্যু কার্য্যভার একজন ব্রাহ্মণ সুবেদারের হাতে—দুর্গের অধীনস্থ গ্রাম সমূহের কার্য্য তাহার অন্তর্গত। আর একজন প্রভুজাতীয় কর্ম্মচারী ধান্য ও রসদ যোগাইবার ও জীর্ণসংস্কারের কাজে নিযুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন তিনবর্ণের লোক এক কর্ম্মসূত্রে বাঁধা, পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য চলিত। নীচে রামোসী প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতীয় লোকের প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। দুর্গের আয়তন ও উপকারিতা অনুসারে দুর্গপালের সংখ্যা। এক একজন নায়কের অধীনে নয় জন সিপাই; বন্দুক, তলবার, বর্ষা পট্টা—এই সকল অস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত। ইহারা সকলে আপন আপন পদ ও কর্ম্মানুসারে বেতনভোগ করিত। গিরিদুর্গ হইতে নীচে সমান জমিতে আসিলে তার অন্য প্রকার ব্যবস্থা।

শিবাজীর পদাতিক ও অশ্বারোহ সৈনিকদের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলি ছিল উল্লিখিত নিয়মাবলী তাহার নকল মাত্র পদাতিক সৈন্যদলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই



মহাবলেশ্বর ও শিবাজীর দুর্গ প্রতাপগড়।

একজন নায়কের অধীনে ১০ জন সিপাই —নায়কের উপর হাওয়ালদার তার উপর জুমালেদার—একসহস্র সিপাইয়ের অধিনায়ক একজন 'হাজারী'—৭০০০ সেনানায়ক যিনি তাঁহার নাম সর্ণোবৎ। এই গেল মাওলী পদাতিক। ঘোড়সোওয়ার দলের নিম্ন-শ্রেণীর নায়ক সিলেদার, ২৫ সিলেদারের উপর একজন হাওয়ালদার, হাওয়ালদারের উপর জুমালেদার, দশ জুমালায় এক হাজারী, ৫ হাজারীর অধিনায়ক একজন সর্ণোবৎ। উচ্চশ্রেণীর মারাঠা সৈনিকের অধীনে এক একজন ব্রাহ্মণ সুবেদার ও অন্য জাতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। সৈনিকের উচ্চনীচ সকলেরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন জায়গীর বা জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি পুরস্কারস্বরূপ তাহাদের ভোগে আসিত না—ধান্য অথবা নগদ টাকাই তাহাদের বেতন। এই সকল কড়াকড় নিয়ম সত্ত্বেও শিবাজীর সৈন্যসংগ্রহে কোন বাধা ছিল না। আর আর সকল কাজের মধ্যে সৈনিকের কাজে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। দশারার দিনে মাওলী, হেতকরী, সিলেদার প্রভৃতি লোকেরা দলে দলে জাতীয় পতাকা তলে মিলিত হইয়া শিবাজীর সৈন্যদল ভুক্ত হইত। দশারার উৎসব সৈন্যসংগ্রহের কাল,—শিবাজী রাজা ঐ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন।

দ্বিতীয়। অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা

সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা সংগঠন করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আটজন কর্ম্মচারী সেই সভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

১। পেশওয়া প্রধান মন্ত্রী (Prime minister)। রাজ্যের মুলকী, দেওয়ানী ফৌজদারী প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যভার তাঁহার হাতে, রাজার নীচেই তাঁর আসন।

২। সেনাপতি (সর্ণোবৎ) (Commnader-in-chief) সেনা বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন স্বতন্ত্র ছিল।

৩। অমাত্য (মজুমদার) (Finance minister)। ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা। ইঁহাকে রাজ্যের সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইহার কার্য্যভার গুরুতর।

৪। সুর্ণীস (Minister of public records and correspondence) ইনি রাজ্যের পত্রব্যবহার বিভাগের কর্ত্তা। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত।

৫। ব্যঙ্কানিস (Private Secretary) ইঁহাকে শিবাজীর নিজস্ব দৈনন্দিন হিসাব ও কাগজপত্র রাখিতে হইত। রাজার গৃহরক্ষক সৈন্যদলের, তথা গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ভার ইঁহার উপর।

৬। সুমন্ত (ডবীর) Foreign minister) বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও অপরাপর বিদেশীয় রাজকার্য্য ইনি নির্ব্বাহ করিতেন।

৭। পণ্ডিতরাও (Minister of Education) স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ধর্ম্ম দণ্ড বিজ্ঞান বিভাগ ও রাজ্যসম্বন্ধীয় ফলাফল গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল।

৮। ন্যায়াধীশ (Chief Justice) অন্য হিসাবে (Law member) পণ্ডিতরাও এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক সভাসদকেই সেনানায়কতা করিতে হইত। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে যথোচিত সময় দিতে পারিতেন না। এইহেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। আবার প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত—যথা

১। দেওয়ান অথবা কারবারী
২। মজুমদার হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষক
৩। ফর্ণবীস সহকারী হিসাব পরীক্ষক
৪। সবনিস্ (দফতরদার)
৫। কর্কনিস (Commissary)
৬। চিটনিস্ (Secretary)
৭। জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ইহার হাতে থাকিত।
৮। পোটনিস্ খাতাঞ্চি

এই অষ্ট প্রধান সভা, শিবাজীর উদ্ভাবনী শক্তির ফল, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ধুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। এই শাসন প্রণালী পেশওয়ার আমলে রক্ষিত হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যভার পেশওয়ার হস্তেই গিয়া পড়িল। পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার পদ বংশানুগামী হইল। সেনাপতি সচিব সুমন্ত, পেশওয়া নিজেই সকলি একাধারে, সে সকল পদ নামমাত্র। পদগুলি বংশগত হইল সত্য, তার আনুসঙ্গিক মানমর্য্যাদা রহিল কিন্তু কাজের বেলায় শূন্য। অন্যান্য বীরেরাও পেশওয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। সিন্দে, হোলকার, গাইকওয়াড়, ভোঁসলে ইহারা সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদির রাজ্যভোগের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রণালী-বদ্ধ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। ভাল মন্দ রাজার উপর প্রজার সুখ দুঃখ, রাজ্যের শ্রীসম্পদ সকলি নির্ভর। পেশওয়ার বংশধর রাজগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী যোগ্যপুরুষ তাঁহাদের হস্তে যতদিন রাজ্যভার ছিল ততদিন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌভাগ্য, পরে পেশওয়া বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেরও দুর্গতি হইল। কালক্রমে মারাঠী সাম্রাজ্যের একতা নষ্ট হইল, রাজ্যের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল!

তৃতীয়। যাহাতে বড় বড় পদ বংশানুগামী হইয়া বিকার প্রাপ্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য। বড় বড় পদ বংশগত করা শিবাজীর মনঃপুত ছিল না—স্বাভাবিক গুণ ও কর্ম্মযোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা এই তাঁর রাজনীতি। উচ্চপদ বংশগামী হইবার দরুণ রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটিল শিবাজীর পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যোগ্যতা অনুসারে কার্য্যভার অর্পণ ইহাই যথার্থ রাজধর্ম্ম।

চতুর্থ। বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা।

রাজকীয় কর্ম্মচারীদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের হাতে জায়গীর জমিদারী সঁপিয়া দেওয়া, ইহা শিবাজীর মতবিরুদ্ধ

ছিল। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষের পারিতোষিক স্বরূপ জায়গীর ইনাম দিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শিবাজীর বিধানে পেশওয়া সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাই কারকুন পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাজকোষ কিম্বা ধান্যভাণ্ডার হইতে বেতন পাইত। নির্দ্দিষ্ট বেতন নিয়মিত সময়ে দেওয়া হইত। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী জায়গীরদার জমিদার সৃষ্টি করা রাজ্যের হিতকর নহে, শিবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আমাদের দেশে কেন্দ্রবর্জ্জনী শক্তি কেন্দ্রমুখী শক্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া উঠে—শিবাজী এই গতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কার্য্য করিতেন। এই কারণে জায়গীরদারী প্রথার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি, জমিদারদের দুর্গনির্ম্মাণেরও নিষেধ ছিল। অন্যান্য রায়তের ন্যায় অরক্ষিত গৃহে বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। শিবাজী যে জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে তাঁহার সময় যে সকল বড় বড় লোক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই উত্তরাধিকারী-দের জন্য বৃহদায়তন ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভূসম্পত্তিশালী বৃহৎ-পরিবার পত্তন শিবাজীর পরবর্ত্তী কালের প্রথা। শিবাজী যাহা কিছু ভূমিদানের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মক্ষেত্রে—মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দান ধর্ম্মের কার্য্যে নিয়োজিত হইত।

বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজনার জন্য দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। শিবাজীর রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চা বড় একটা ছিল না কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত দক্ষিণাদি দানব্যবস্থার দরুণ ছাত্রগণ কাশী হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া আসিত, এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার হইল। পেশওয়ারাও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

পঞ্চম। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা। রাজা প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জমিদারের মধ্যবর্ত্তিতা নাই, শিবাজীর এই নিয়ম ছিল। তাঁহার বিশ্বাস এই যে খাজনা আদায়ের কাজে মধ্যবর্ত্তী জমিদার নিয়োগ করা যত অনর্থের মূল। তাহার ফল এই হয় যে জমিদার বেশীর ভাগ খাজনা আত্মসাৎ করে, সরকারী তহবিলে অল্পই আসে, এইহেতু তিনি জমিদারী প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তিনি যোগ্য বেতন দিয়া কমাবিসদার মহলকারী সুবেদার প্রভৃতি রেবেন্যু কর্ম্মচারী রাখিতেন—রায়তদের যাহার যাহা দেয় তাহার জন্য কবুলায়ৎ লওয়া হইত। ফসলের দ্বিতীয় পঞ্চম অংশ সরকারী খাজনার হার অবশিষ্ট রায়তের নিজস্ব থাকিত। তখন আদালতের কাজ বেশী ছিল না—সুবেদার দেওয়ানী ফৌজদারী দুই কাজই করিতেন। তেমন কিছু বড় মকদ্দমা উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তের হাতে সমর্পিত হইত।

ষষ্ঠ। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট বা ইজারা দেওয়া রহিত করা। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট দিয়া জমিদার বা ইজারাদার নিয়োগ শিবাজীর নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। পেশওয়াই আমলেও এই নিয়ম অনেককাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বাজিরাওএর রাজ্যে যখন অরাজকতার একশেষ তখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। ইজারদারী নিয়মে রায়তের উপর অত্যাচারের সীমা রহিল না। ইজারদারেরা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ন্যায্য দেনার উপর যতটা আদায় করিতে পারে সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিত না।

সপ্তম। সিবিল বিভাগের অধীনে সেনা বিভাগ রক্ষা করা। এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, নহিলে সৈন্যপ্রতাপ রাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়ে।

অষ্টম। জাতিনির্ব্বিশেষে কর্ম্মবিভাগ। ব্রাহ্মণ প্রভু মারাঠা উচ্চনীচ বর্ণের সম্মিশ্রণে রাজকার্য্য পরিচালন করা শিবাজীর নিয়ম ছিল; যাহাতে কোন এক বিশেষ জাতির প্রাধান্য নিবারিত হয়, স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধ হয়, পরস্পরের একটা শাসন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাই উদ্দেশ্য। শিবাজীর পরে এই নিয়মটী রক্ষিত হয় নাই। পেশওয়াই অমালে ব্রাহ্মণেরই আধিপত্য দেখা যায়।

শিবাজীর যে শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইল ব্রিটিশ রাজ্য শাসনপ্রণালী তাহার প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে। দেওয়ানী ও সৈনিক ভাগের পার্থক্য সাধন, সৈনিকের উপর দেওয়ানীর প্রভুত্ব স্থাপন, নির্দ্দিষ্ট বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ, বড় বড় পদ বংশগত না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে নিয়োগ, রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, সভাপতির মন্ত্রণায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা, এই সমস্ত সুশাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে একছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিবাজীনির্দ্দিষ্ট শাসন-প্রণালীর অন্যথাচরণ করিয়াই পেশওয়া রাজ্য স্বীয় অধঃপতনের সোপান প্রস্তুত করিল! (২)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঋষি ও ব্রাহ্মণ

ঋষি ও ব্রাহ্মণ এক জাতি আমরা চিরকাল এই কথাই শুনিয়া আসিতেছি—কিন্তু এ প্রবন্ধে আমি দেখাইব যে ঋষি আর্য্যবংশসম্ভূত আর ব্রাহ্মণ মেজাই হইতে উৎপন্ন। ইরাণীগণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রাচীনকালে মেজাই বলিত। এই মেজাই জাতি পারস্য দেশের পশ্চিমভাগস্থ মিডিয়া দেশ হইতে আসিয়া ইরাণে বসবাস আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণে ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

"অথর্ব্বণদিগের আগমন" আবেস্তায় প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে ইরাণে ঈশ্বরভক্তি ছিল না; কিন্তু আবেস্তালিখিত

(২) Rise of the Mahratta Power
by M. G. Ranade
Grant Duff's History of the Mahrattas.

ধর্ম্মের বিপরীত একটা ধর্ম্ম তথায় বর্ত্তমান ছিল। লোকেরা তখনও প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক ছিলেন।

এই ঘটনা কারসেনি সংঘটিত কিংবদন্তিতে উক্ত হইয়া থাকে। কারসেনি বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগকে অথর্ব্বণদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দিবেন না। কারসেনি একজন পৌরাণিক নৃপতি, অথর্ব্বণদের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য তিনি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। হোম (সোম) তাঁহাকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার শক্তি হরণ করিয়া লন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, এই ব্রাহ্মণেরা কোনরূপ ঐশ্বরিক বলে তাঁহার প্রতিরোধ নষ্ট করিয়া লোকদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

আবেস্তা গ্রন্থে ইঁহারা "দেশ পর্য্যটক" নামে উক্ত হইয়াছেন এবং এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, রাঘ, অর্থাৎ মিডিয়াদেশে, অথর্ব্বণদের বাস ছিল। এখানে তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্ম লইয়া থাকিতেন না, তাঁহারা বিষয় কর্ম্মেও লিপ্ত থাকিতেন।*

অথর্ব্ববেদ বহুকাল আর্য্যসমাজে গৃহীত হয় নাই। কালক্রমে অথর্ব্ববেদ বেদ মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িল ও অথর্ব্বণগণ "অথর্ব্বণ" নাম ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিলেন। তখনকার ইরাণী ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার বিশেষ প্রভেদ ছিল না; সুতরাং অথর্ব্বণগণ সহজে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। ইহা সত্বেও এই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বরং ক্ষত্রিয়গণের নিকটে ইঁহারা প্রথমে জ্ঞান শিক্ষা করেন। তাঁহারা কিসে নিজেদের প্রভুত্ব,

* "The coming of the Athravans" is celebrated in the Avesta. They came from afar bringing piety into the countries. Before they emigrated from their distant homes into Eastern Iran piety had not dwelt there, but a creed different from that which is taught by the Avesta. The people still followed the old Arian religion of nature.

"The same fact is implied in the tradition which puts into the mouth of Kursani these words :—

"No more shall an Athravan come into my country to make proselytes." Kursani is apparently a legendary prince, who counteracts the missionary works of Athravans. It is further on related that Hauma vanquished him and deprived him of his power. This evidently means that the priest succeeded through Divine aid in breaking the resistance of that prince and gaining over his people to their new doctrine."

That the priests in the very epoch of Avesta were still in an unsettled condition and wandered through the country may perhaps be inferred from their appellation "wandering through the country," by which its seems the Athravans are designated in the test."

In Ragha, that is in Media, the Athravons had their homes. There resided the Zaralhushtrotema, and hence the priests had evidently emigrated to the east. In Ragha they had not only spiritual but even secular power." "Civilization of the Eastern Iran in ancient time" by Dr. W. Geiger.

ব্রাহ্মণত্ব, আর্য্যদের মধ্যে দৃঢ়ীভূত করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অথর্ব্বণগণ ক্রমশঃ ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমত এ দেশে প্রচলিত করেন। আর্য্যেরা বরাবরই বৈদিকধর্ম্ম মানিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ একটা নূতনধর্ম্ম, একটা নূতন সামাজিক প্রথা আসিয়া পড়িল। এই নূতন ধর্ম্ম, এই নূতন সামাজিক প্রথা আর্য্যগণ প্রথমে সহজে গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে প্রথমে অথর্ব্বণদিগের সহিত তাঁহাদের মহাবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। পরশুরাম নামে একজন অথর্ব্বণ নিজ দলবল সহ আর্য্যদের সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই জয় লাভ হয়। অথর্ব্বণেরা একটি নূতন বেদ রচনা করেন। ইহার নাম অথর্ব্ববেদ। বিদেশী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া তখনকার ভারতবাসীর মধ্যে শূদ্রগণের উপর এই ব্রাহ্মণগণের কোপানল অতি নৃশংস ভাবে নিপতিত হইয়াছিল। কারণ ব্রাহ্মণগণ দেখিল লোক সংখ্যায় শূদ্রজাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জাতি। ইহারা যদি লেখাপড়া শিখিতে পায়, যদি ইহারা আর্য্যদের সমকক্ষ হইবার জন্য আর্য্য ভাবে শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব তাঁহাদের প্রভুত্ব এই শূদ্র জাতির দ্বারা লোপ পাইবে। এই ভয়ে তাঁহারা শূদ্র জাতির প্রতি এত নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং শূদ্র জাতিকে এত কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু এক সময়ে এই শূদ্র জাতির দ্বারা ইঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব ও প্রভুত্ব নির্ম্মূল হইয়াছিল।

আর্য্যরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, অনার্য্যের সহিত তাঁহাদের বিশেষ শত্রুভাব ছিল। কিন্তু যখন অনার্য্যগণ শান্তভাব ধারণ করিলেন, আর্য্যরাও তাঁহাদের প্রতি শত্রুতাচরণে বিরত হইলেন। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যরা অনার্য্য কন্যা বিবাহ করিতেন। আর্য্যের ঔরসে দাসকন্যার গর্ভের সন্তানসন্ততিগণ আর্য্য ভাবে আর্য্য সমাজে গৃহীত হইতেন! এমন কি বেদ-মন্ত্র পর্য্যন্ত শূদ্র দ্বারা রচিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আর্য্যগণ শূদ্রগণের প্রতি কোনরূপ কঠোর ভাব দেখান নাই, বরং তাহাদিগের আর্য্য ভাবে শিক্ষিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পরে তাহাদিগকে আর্য্যদের সহিত একেবারে পৃথক করিয়া দিয়া, তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমরা ঋষির নাম শুনিয়া মনে করিয়া লই যে, ঋষিগণ গায়ে ভস্ম মাখিয়া, জটা বল্কল পরিয়া বনে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। এই ঋষিগণ অতি উগ্র স্বভাবাপন্ন, যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন, অমনি তাহাকে শাপ দিতেন, শাপ প্রভাবে সে কখনও পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত, কখনও বা নানাপ্রকার জন্তুর আকার ধারণ করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারাও সামাজিক জীব ছিলেন, আর্য্যঋষিরা বিবাহ করিতেন, তাঁহাদের পুত্র কন্যা হইত। যাঁহারা আর্য্যদের মধ্যে শিক্ষিত ও জ্ঞানী, তাঁহারা অতুল পরিশ্রমে ও

অতুল অধ্যবসায়ে নিবিড় অরণ্য মধ্যে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, তাঁহারা সরলপ্রকৃতির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আর্য্য ঋষিরা আর্য্য ও অনার্য্য মিশাইয়া একটি প্রকাণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে এই অথর্ব্বণগণ আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত আশা অকালে নির্ম্মূল করিয়া দিল।

আমাদের ব্রাহ্মণগণের সহিত মেজাইদের নিম্নলিখিত বিষয় সকলে মিল দেখিতে পাওয়া যায়।—

প্রথম। নামে, ইরাণে এই মেজাইদিগকে অথ্রবণ বলিত এবং আমাদের দেশে প্রথমে ইঁহারা অথর্ব্বণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অথর্ব্ববেদই ইহার প্রমাণ। অথর্ব্ববেদ অর্থাৎ অথর্ব্বণদের বেদ। অথর্ব্বণ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ (মেদিনীকোষ)।

দ্বিতীয়। অথর্ব্ববেদের সহিত মেজাইদের Yashts এবং Vendidad-এর অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে অর্থাৎ অথর্ব্ববেদে যাদু, শাপ, শত্রু বধ করিবার মন্ত্র প্রভৃতির কথা লিখিত থাকায়, এবং অন্যান্য বেদের সহিত কোনরূপ মিল না থাকায়, আর্য্যগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহাকে মানেন নাই। অন্যান্য বেদগুলি প্রথমতঃ যাগযজ্ঞ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। * *

তৃতীয়। ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষার ভার এই ব্রাহ্মণগণ নিজহস্তে লইয়াছিলেন। শূদ্রগণ একেবারে বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইল। বৈশ্যগণ ক্রমে ক্রমে শূদ্র হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহাদেরও মধ্যে সকলেই লেখাপড়া শিখিতেন না, কেবল মাত্র কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সীমা বদ্ধ ছিল। প্রাচীন ইরাণেও এরূপ ভাবে বিদ্যাশিক্ষা প্রদত্ত হইত। ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, ও তাঁহাদের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন রূপ সুবিধাজনক নীতি বাক্য অতি যত্নপূর্ব্বক যুবকদের কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। কারণ পারস্য দেশে মেজাইদের হাতে শিক্ষাভার ন্যস্ত ছিল, এমন কি রাজবংশের বালকেরাও তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষিত হইতেন। †

চতুর্থ। জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করা অথ্রবণেরা পারস্য দেশের লোকদিগকে চারি জাতিতে বিরক্ত করিয়াছিলেন। যথা (১) Athrova(ব্রাহ্মণ) (২) Rathaistes (ক্ষত্রিয়)

* * "This work (Atharva Veda) was for a long time not acknowledged as a proper Veda * * because its contents, which consist chiefly of spell, charms curses, mantras for killing enemies, &c, were mostly foreign to their other Vedas which were originally required for sacrifices. On comparing its contents with some passages in the Yashts and Vendidad, we discover great similarity" (Hang Essays.)

† "These convenient maxims of reverence and implicit faith. were doubtless imprinted with care on the tender minds of youths : since the Magi were the masters of education in Persia, and to their hands the children of the royal family were entrusted." (Gibbon's Decline and Fall of Roman Empire).

(৩) Vastriyo faluyant বৈশ্য, (৪) Huits (শূদ্র)। এই জাতি ভেদ আমাদের মতন। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্যতীত অন্য কাহারও ব্রাহ্মণহইবার অধিকার ছিল না এবং ব্রাহ্মণকন্যাকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ করিতে পারিত না। এই নিয়ম এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে ‡ অথর্ব্বণেরা আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্যান্য জাতির সহিত বিবাহাদি করা একেবারে বন্ধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ঋষিরা ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতেন। অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বগণ (religious mendicants) ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী বলিয়া উক্ত। আবেস্তায় অথ্‌বণগণ দেশ পর্য্যটক উপাধিভূষিত। এ সব দেখিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মেজাইরা আমাদের দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার।

কেল্লা বোকাই নগর

(২)

প্রাচীনতার নিদর্শন স্বরূপ কেল্লা বোকাই নগরে নিজামুদ্দীন আউলিয়া নামক এক সিদ্ধ পুরুষের সমাধি অবস্থিত। স্থানীয় লোকমুখে অবগত হওয়া যায় যে, নিজামুদ্দীন আউলিয়া ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে আগমন করিলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী আশ্রম স্থাপিত হয়। উহাই নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা নামে পরিচিত। সিদ্ধ পুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়া পরে দিল্লী অঞ্চলে গমন করেন এবং তথায় সমাধিস্থ হন। আমরা যে কবরটী দেখিতে পাই তাহাতে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দেহ স্থাপিত নাই। কেবল তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থই শিষ্যবর্গ এই কবরটী প্রতিষ্ঠিত করেন।

দিল্লীতে সমাধিস্থ নিজামুদ্দীন আউলিয়া একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বদাউন জেলায় ১২৩৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সকরগঞ্জের সেখ ফকিরউদ্দিনের শিষ্য এবং সৈয়দ আহম্মদের পুত্র। মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া শ্রদ্ধাভাজন এবং বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খস্রুর গুরু বলিয়াও নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জনসমাজে খ্যাতি আছে। আমীর খস্রু বাহলীক দেশ হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিমে পাতিয়ালা নগরে আসিয়া বাস করেন। যখন গায়েসউদ্দীন তোগলক ভারতের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন সেই সময় আমীর খস্রু "তোগলক নামা" ইতিহাস প্রণয়ণ করেন। সর্ব্ব সমেত খস্রু ৯৯ খানা গ্রন্থ লিখেন এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। শিষ্যের মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বে ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দে গয়াস

‡ "No one but the son of a priest may be priest, and the daughter of the members of the priestly caste may only be given in marriage within the caste, a custom which continues to this day" [Spiegels Avesta, iii 148].

পুরে (পুরাতন দিল্লী) নিজামুদ্দীন আউলিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। এই ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্য লইয়া বোকাই নগরে আসা অসম্ভব নহে।

অতঃপর দিল্লীনগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে নিজামবাদ নামক স্থানে আর এক নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর দৃষ্ট হয়। এই কবরের উপর পারস্য ভাষায় খোদিত ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের শিলা লিপি দেখা যায়। এরূপ প্রবাদ যে ঐ নিজামুদ্দীন হইতেই এই নগরের নাম 'নিজামবাদ' হইয়াছে। এই ব্যক্তিই বোকাই নগরে আসিয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কিম্বা মধ্যবর্ত্তী সময়ে ৩৬০ জন আউলিয়া (সাধু) পদ্মানদী পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে আগমন করেন। শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের প্রায় পরগণায় এক একজন আউলিয়ার সমাধি দেখা যায়। ইঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থই এতদঞ্চলে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সহিত শেষোক্ত নিজামুদ্দীনের অনেক বিষয়ের পার্থক্য হইয়া পড়ে। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি বোকাইনগরে আসেন তাহা অনুমানের উপর স্থির করা কঠিন। অধিবাসিগণ এই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ দিতে পারেন না। আমরা বোকাই নগরের সন্নিকটে একটী নিজামাবাদ গ্রামও দেখিতে পাই। বোধ হয় দিল্লীর নিকটস্থ নিজামাবাদের অনুকরণে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। ইহা হইতে শেষোক্ত

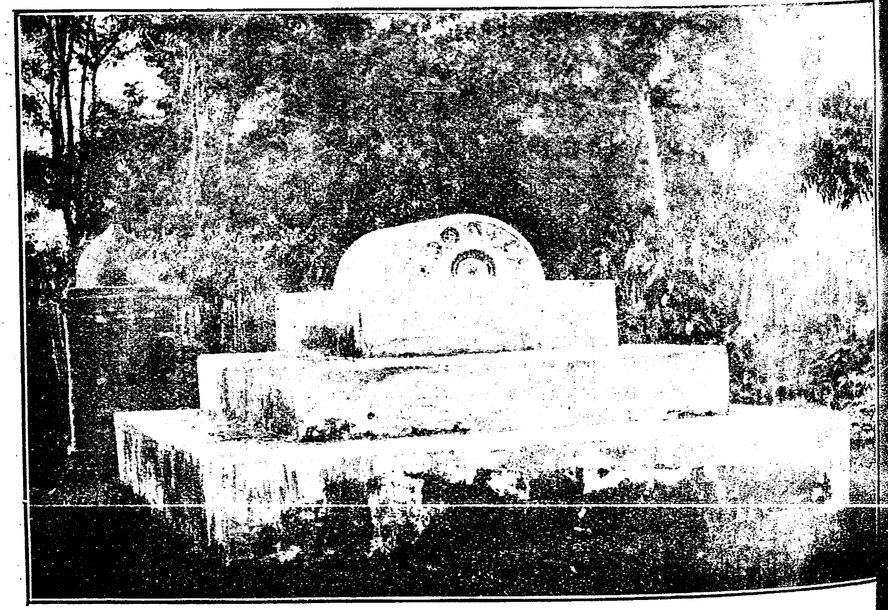

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর—বোকাই নগর
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক গৃহীত।

ব্যক্তিকে বোকাইনগরের সিদ্ধপুরুষ ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। এতদঞ্চলের অন্যান্য দরগার নিয়মপ্রণালীর সহিত ইহার ঐক্য হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত দরগারই ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। কাজেই আমরা কেবল কিংবদন্তির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বোকাই নগরের সমাধিক্ষেত্র এ অঞ্চলে একটী পবিত্র স্থান বলিয়া খ্যাত। কালের আবর্ত্তনে সমাধিটী নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় ইহার পুনঃসংস্কার হইয়াছে। সমাধিটী প্রাচীর বেষ্টিত, প্রাচীন প্রাচীরের কতকাংশ ও আলো দিবার প্রাচীন পাকা স্তম্ভটী এখনও বিদ্যমান আছে। প্রতিদিন দরগার জন্য নিযুক্ত ফকির সন্ধ্যার সময় আলো দিয়া থাকে। ইহার বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য ১৫হাত এবং প্রস্থ ১০ হাত। এই দরগাটীকে যে কেবল মুসলমানগণই সম্মান করিয়া থাকেন এমত নহে হিন্দুগণও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। বেষ্টনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলেই সম্মানার্থ কুর্ণিশ (অভিবাদন) করিয়া থাকেন। সমাধির দক্ষিণ ভাগে বহুকালের একটী কূপ আছে। উহার জল এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রেণীবদ্ধভাবে বটবৃক্ষগুলি স্থানটীকে ছায়াসুশীতল ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। দরগার সম্মুখস্থ ভূমিতে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের বৃহস্পতিবার ও রবিবারে মেলা বসে।

কেল্লার ভিতর দিয়া যে নদী প্রবাহিত



সেতু—বোকাই নগর
কুমার শ্রীমান্ হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক গৃহীত।

হইত তাহার উপরিস্থ একটী পাকা সেতুর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নদীর চিহ্ন এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। সেতুটীর গঠন অতি সুদৃঢ়। উহার কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। তৃণ গুল্মের অত্যাচারে এই প্রাচীন কীর্ত্তিটী ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

মুসলমানাধিকারে আসিয়া বোকাই নগর শ্রীসম্পন্ন হয়। কেল্লাদার ও স্থানীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণের উৎসাহে নানাবিধ শিল্পেরও বহুল উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে ঐ স্থানের বস্ত্র, বেত্রের কারুকার্য্য ও নানাবিধ সূচীকার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখনও খলিফাপটি, বেনেপটি, তামাকপটি, প্রভৃতি নাম পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। কয়েকঘর তন্তুবায় অদ্যাপি এখানে বস্ত্রবয়ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে! বর্ত্তমানে পূর্ব্ব শিল্পগৌরব ও নগরবৈভব পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে বোকাই নগরের অবনতি আরম্ভ হয় তাহা জানা যায় না। বোকাইনগর গ্রাম জমিদারের অধীন নহে, ইহা কালেক্টরীর খাস্ মহালভুক্ত। কিছু দিন পূর্ব্বে যে স্থান ভীষণ হিংস্র জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এক্ষণে আবার তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। অধিবাসিগণ সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া স্থানটীকে চাষাবাদের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। গ্রামের অভ্যন্তরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯টী কূপ ও ১৫টী পুষ্করিণীর চিহ্ন পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ময়মনসিংহ পরগণার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী কেল্লা বোকাই নগরের মধ্যে স্বীয় বাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর এক বংশধর আজও বাস করিতেছেন। বোকাই নগরের গোঁসাইবাটী বহুদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলোকপুর, ভবানীপুর, বাসাবাড়ী ও কালীপুর প্রভৃতি জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণের বৃত্তি দ্বারা গোঁসাইদিগের ভরণ পোষণ ও স্থাপিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা চলিতেছে। ৺রাজরাজেশ্বরী কালীমূর্ত্তি ১৭০৭ শকাব্দে গৌরীপুরের স্বর্গীয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বহু অতিথি এই দেবালয়ে আশ্রয় পাইয়া সেই স্বর্গগত মহাত্মার পুণ্যপ্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছে।

(কুমার) শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

ভাষার উৎপত্তি

অভিব্যক্তিই (evolution) যদি সৃষ্টির নিয়ম হয়, তাহা হইলে বাক্‌শক্তি মানুষ অকস্মাৎ লাভ করে নাই। গ্রামোফোন্ রেকর্ডে যেমন ইচ্ছামত কতকগুলা কথা কৌশলে পুঞ্জীভূত করা থাকে এবং যখন ইচ্ছা তখনই উহাকে ঐ সকল কথা বলাইয়া লইতে পারা যায়, মানুষের মনটা ঠিক সেরূপ নহে। বাক্‌শক্তিশালী মানুষ জন্মাইবার পূর্ব্বে যে মূক মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যে মানুষটি কথার

সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে প্রথমে ইঙ্গিত ইসারা হইতে আরম্ভ করিয়া, যেমন কোষের সমবায়ে জীবদেহ প্রস্তুত হয়, সেইরূপে এক একটি কথা নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং পরে তাহার সন্তানেরা সমস্ত ভাষাটাকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

কেহ কেহ (১) বলিয়া থাকেন বাক্‌শক্তি মানুষ এককালেই লাভ করিয়াছিল। প্রকৃত বিজ্ঞানের সহিত এই মতের যে সম্পর্ক, এই পৃথিবী ঈশ্বরের আদেশে ছয়দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, এ মতেরও সেই সম্পর্ক। কবিতার হিসাবে দুইই বেশ। কিন্তু বিশ্বনিয়মের যথার্থ মার্গানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানের নিকট উক্ত মতের কোন বস্তুত্ব নাই। যে অনুসন্ধানের দ্বারা বিজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত কবিত্বসুলভ মতকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে, সেই অনুসন্ধানের দ্বারা উহা ভাষা সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন মতকেও ক্রমশঃ বিদূরিত করিতেছে। ভাষা যে বিশ্বনিয়মের বহির্ভূত ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে। অভিব্যক্তি যেমন কোন জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনই সে তাহার একটু না একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই যাদুকর ভাষাতত্ত্বকে যখনই স্পর্শ করিয়াছে, তখনই উহা একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে মানুষের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদের আবশ্যক। কোন্ অবস্থার অধীনে পড়িয়া মানুষকে কথা বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, কোন্ নিয়মে মানুষ তাহার প্রথম বাক্যাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিল এবং কিরূপে মানুষ তাহার সেই আদিম ভাষাকে সংস্কৃত করিয়াছিল, এই সমস্ত আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবসকল জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার্থ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই হরিণ, বানর, পক্ষী এবং এমন কি মৌমাছি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলেই দলবদ্ধ হইয়া, সমাজ প্রস্তুত করিয়া বাস করে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে জীবন-সংগ্রামে সামাজিক জীবনই শ্রেয়ঃ। এই যে সমবায়, ইহা দৈহিক শক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত। কিন্তু মানসিক বল সংগ্রহ ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার প্রকৃষ্ট উপায় অন্যতর। মনে কর, কতকগুলা হরিণ এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃতভাবে ঘাস খাইতেছে। ইহাদের সকলেরই দৈহিক বল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা সমস্তই আছে। প্রত্যেকেরই দেখা শুনা প্রভৃতি স্ব স্ব জীবনরক্ষার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই আছে। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে শুধু এরূপ শক্তিই যথেষ্ট নহে। কারণ যখন শত্রু উপস্থিত হইবে, তখন অন্যান্য সঙ্গীরা আপনাপন জীবন রক্ষার্থ পলায়ন করিবে এবং আক্রান্ত হরিণকে তখন আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরন্তু যদি তাহারা সকলে অনর্থ দূর করিবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করে, তবেই সেই

(১) "Our first parents received it by immediate inspiration."—Encyclopœdia Britannica, 8th. Edition.

সামাজিকতা জীবন সংগ্রামের উপযোগী। এইরূপ সামবায়িক নিয়মবিশিষ্ট সামাজিক জীবের কতকগুলি অক্ষম হইলেও তাহারা জয়ী হইয়া থাকে।

এই সামবায়িকতা জীবের একটা শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। এই শক্তি সমাজস্থ জীবসমূহের পরস্পরের নিকট স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিবার শক্তি। এই শক্তি ব্যতীত সামাজিকত্বের কোন মূল্য নাই। যে সৈন্যদলে ইঙ্গিতের দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, সে সৈন্যদল শক্তিহীন। সংখ্যাই শক্তি, যদি কোন দলে ঐ শক্তির সহিত হস্তপদাদি সঞ্চালন, কোন শব্দ করণ, প্রভৃতি যে কোন উপায়েই হউক পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা থাকে এবং অন্যদলে তাহা না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দলের জয় অধিকতর সম্ভব। এইজন্য ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাপন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অধীনে ইহার ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কালে প্রত্যেক জীবসম্প্রদায় তাহার জীবনের পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল।

ঐ সকল ইঙ্গিতই ভাষা এবং ঐ সকলই জীবের বাক্‌শক্তির অভিব্যক্তির প্রথম স্তর। যে উপায়ে এক মন হইতে অন্য মনে সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহারই নাম ভাষা। পৃথিবীতে যে দিন হইতে জীব একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইদিন হইতে ভাষার সৃষ্টি। জীবসকল একসঙ্গে বাস করে ও ভ্রমণ করে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহারা পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে। ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে পিপীলিকার জীবন অত্যন্ত সামাজিক। তাহারা যে কয়েকটা অল্পসংখ্যক ইঙ্গিতের সাহায্যে তাহাদের কতকগুলা সাধারণ মনোভাব জ্ঞাপন করে, এমন নহে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাদের যথেষ্ট শক্তি আছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে দুইটি পিপীলিকা যখন একত্র হয়, তখন তাহারা একটু দাঁড়ায় এবং তাহাদের সম্মুখের পদাদির দ্বারা পরস্পর একটু সম্ভাষণ করিয়া থাকে। এই হস্তপদাদি আস্ফালনে যে কি ভাষা ব্যক্ত হয়, তাহা এখনও অনুধাবনের বিষয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পৃথিবীতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভাষার অস্তিত্ব আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবগণের মনোভাবজ্ঞাপক অনেক প্রকার বাহ্যিক ইঙ্গিত আছে। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, গর্দ্দভের রাসভ, ময়ূরের কেকা প্রভৃতি রব সহজেই অন্য জীবে বুঝিতে পারে। একটি বানর তাহার মনোভাব প্রকাশের জন্য অন্ততঃ সাত প্রকার বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। পণ্ডিত ডারউইন কুকুরের স্বরে চারি কিম্বা পাঁচটি গ্রাম লক্ষ্য করিয়াছেন; যথা, শিকারকালে ব্যগ্রতাসূচক, ক্রোধসূচক, নিরাশাসূচক, আনন্দসূচক এবং রাত্রিকালীন চীৎকার। আবার যখন কোন দ্বার অথবা জানালা খুলিবার জন্য প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কুকুর একপ্রকার বিচিত্র শব্দ করিয়া থাকে।

এই সকল সঙ্কেত কথিত ভাষার তুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংবাদ জ্ঞাপনের যে কোন উপায়ই ভাষা। কিন্তু এই ভাষাই কথা নহে।

কথা দ্বারা ভাষা প্রচারিত হয় মাত্র। যখন দলের মধ্যে একটা হরিণ হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করে, তখন অন্য হরিণেরাও ঐরূপ করিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা। এই সঙ্কেতের অর্থ "শ্রবণ কর"। আবার যদি কোন হরিণ এমন কোন বস্তু দর্শন করে, যাহা তাহার পক্ষে সন্দেহজনক, সে তখন ঈষৎ অস্ফুট শব্দ করে। ইহা একটি কথা। এই কথার অর্থ "সাবধান"। কোন বিপদজনক বস্তু নিরীক্ষণ করিলে সে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার অর্থ "দৌড়িয়া পলাও"। এখানে তিন প্রকারের ভাষা দেখা গেল—সাঙ্কেতিক, অস্ফুট শব্দজনিত এবং চীৎকারজনিত।

বর্ত্তমান যুগের ভাষারও এই তিন উপাদান। এই তিনই ভাষার কেবল প্রধান উপাদান নহে, উহাই একমাত্র উপাদান। যে ভাষার বলে বাগ্মী ডিমস্থিনীসের নাম আজও সজীব—যে সাম গীতধ্বনিতে আজও ভারতবর্ষের আকাশ তরঙ্গিত, সে ভাষা বনবাসী জীবের অস্ফুট বাক্‌শক্তি হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বাক্যাবলী সৃষ্টির পূর্ব্বে মানুষ অঙ্গ সঞ্চালনাদির দ্বারা সাঙ্কেতিক উপায়ে মনোভাব জ্ঞাপন করিত। ইহার তিনটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যে মানুষ আজন্ম সম্পূর্ণরূপে বধির, কথা বলিবার উপযোগী সমস্ত অঙ্গাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, সে মূক হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা, মানুষ বোবা হইলেই কালা হয়। কিন্তু ঠিক তাহা নয়, কালা বলিয়াই সে বোবা। যদি ভাষা মানুষের সহজ শক্তি হইত, তাহা হইলে বাক্‌যন্ত্রাদির অনাভাব সত্ত্বেও বধিরের মূক হইবার কোনই কারণ নাই। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতার জন্য তাহার বাক্‌যন্ত্রও নীরব। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, ভাষাটা কেবল অনুকরণের বিষয়—সমস্তটা শুনিয়া শেখামাত্র। কথার ভাষা শিখিতে পারে নাই বলিয়া মূকব্যক্তি সাঙ্কেতিক ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহার দ্বারা তাহার মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। মূকের নিকট সাঙ্কেতিক ভাষা চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণ অসভ্য মনুষ্য। মূক ব্যক্তি অপেক্ষা ইহাদের ভাষা আর একটু বিস্তৃত। মূক-বধিরের সাঙ্কেতিক ভাষার সঙ্গে কতকগুলি শব্দ (sound) যোজনা করিয়া ইহাদের ভাষা গঠিত হইয়াছে। মনের সব কথা ইহারা মুখে বলিতে পারে না। কতকটা ইঙ্গিতে ও কতকটা শব্দের সাহায্যে ইহাদের মনোভাব জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

শিশুর ভাষা আমাদের তৃতীয় প্রমাণ। সাধারণতঃ ইঙ্গিত ইসারা এবং কতকগুলি শব্দের সাহায্যে শিশু প্রথমে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। শিশুর এই চেষ্টা সহজাত এবং স্বাভাবিক। ক্রমশঃ সে সমস্ত ভাষাটা শুনিয়া ও দেখিয়া অনুকরণ করে। কথার ভাষা কৃত্রিম কিন্তু ইঙ্গিতের ভাষা স্বাভাবিক।

পরিণত বয়স্ক মনুষ্যের ভাষাতে শিশুর এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের ভাষা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। চিন্তার বিষয়টি যখন উন্নত নহে এবং বক্তব্য বিষয় বাগ্মিতার প্রত্যাশী নহে

তখন উহা প্রধানতঃ ইঙ্গিতের সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। বক্তা তাকালে বাগ্মী যতই উন্নত চিন্তার বিষয় বলিতে থাকেন, তাঁহার হস্তপদাদি ততই নিশ্চল হয়। ইঙ্গিতের ভাষা তখন মনোভাব জ্ঞাপন করিবার উপযুক্ত নহে। তখন তাঁহার সমস্ত চিন্তার বিষয়টা বাক্যের (word) ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার যতই তিনি চিন্তার নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার হস্তপদাদিও ক্রমে সঞ্চালিত হইতে থাকে। বাক্যের ভাষায় যাঁহার যত বেশী অধিকার, তিনি ততই উৎকৃষ্ট বক্তা। ইঙ্গিতের ভাষা অনেকটা বিষয় (objective) চিন্তার কথা প্রকাশ করে। কিন্তু বিষয়ী (subjective) চিন্তা ব্যক্ত করিতে বাক্যের ভাষার প্রয়োজন।

শৈশবাবস্থায় ভাষা কতকগুলি ইঙ্গিতের সমষ্টি ছিল। পরে ঐ সকল ইঙ্গিতের সহিত কতকগুলি শব্দ (sound) যোজিত হইল। কিন্তু এই ভাষার বিস্তার অত্যন্ত কম। এক সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন উক্ত ভাষার দ্বারা সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর দুইজন অসভ্য মনুষ্য অন্ধকার রাত্রে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিতে চায়। তখন সে কি করিবে? সে সময় ইঙ্গিতের ভাষা নিষ্ফল। সুতরাং তখন সে নিশ্চয় কোন প্রকারে কয়েক প্রকার শব্দ একত্র করিয়া এক একটি কথার (word) সৃষ্টি করিল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কথার সৃষ্টি সে কেমন করিয়া করিল? মনে কর একদল গরু বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে। এমন সময় অগ্রবর্ত্তী গরু দূরে সিংহের গর্জ্জন শুনিতে পাইল। সিংহের সেই শব্দ একটি ভাষা। 'সিংহ' এই কথা বলিলে আমরা যে দ্রংষ্ট্রা নখরযুক্ত কেশরী বুঝিয়া থাকি, উহার ঐ গর্জ্জন হইতে গরুটি তাহাই বুঝিল। এখন সেই গরু একটা কোনরূপ শব্দ করিয়া তাহার দলস্থ অন্য গরুগুলিকে জানাইল যে সম্মুখে কোন একটা বিপদ উপস্থিত। কিন্তু ইহা যে সিংহসম্ভূত বিপদ, না অপর কোন বিপদ, তাহা অবশ্য সে জানাইতে পারিল না। এরূপ জানাইতে হইলে সেই সিংহের শব্দটি তাহাকে অনুকরণ করিতে হইত। কিন্তু সেরূপ করা এ জন্তুর ক্ষমতার বহির্ভূত। এই গরুগুলি যদি গরু না হইয়া সে কালের মানুষ হইত, তাহা হইলে এ অবস্থায় অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি নিশ্চয় সেই সিংহের শব্দ অনুকরণ করিয়া সহচর দিগকে জানাইত যে সিংহ উপস্থিত। বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি, প্রবহমান স্রোতের শব্দ, মধুকরের গুঞ্জন, পক্ষীর কাকলি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ এই গুলিকে বুঝাইত। যে সকল বস্তুর সহিত কোন না কোন একটা শব্দ যে কোন প্রকারেই হউক সম্পর্কিত হইয়া আছে তাহাদের বিষয় এইরূপে ভাষামধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

একটি শিশুর ভাষা-শিক্ষা গোড়া হইতে অনুধাবন করিলে উক্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিশু প্রথমে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করে। এ সময় যদি সে কোন বস্তু হইতে কোনপ্রকার শব্দ শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ

সেই শব্দকেই ঐ বস্তুর নাম স্থানীয় করিয়া লয়। সে ঘড়িকে বলে টিক্ টিক্, হংসকে বলে পাঁক্ পাঁক্, কুকুরকে বলে ঘেউ ঘেউ, ছাগলকে বলে ভ্যা ভ্যা ইত্যাদি। মানুষের সভ্যতাক্রমে যতই বাড়িতেছে, জীবন-সংগ্রামের ব্যাপার ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং নিয়তই নূতন কথার সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপে শব্দ হইতে কথার সৃষ্টি হয়। আদিম মানবও ঐরূপে শব্দ হইতে কথার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ এক একটা শব্দের মধ্যে যে কতখানি ভাষা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ জানেন। এখন শত শত কথার জন্মের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে মরাইকে "হি হি হাউস" বলে—অর্থাৎ হাসির ঘর অথবা আমোদের স্থান। অদ্যাপি অনেক স্থলে দেখা যায় যে বহুবচন বুঝাইতে হইলে একই কথা দুইবার বলা হয়; যথা—পুনঃ পুনঃ, বার বার শত শত, হাজার হাজার ইত্যাদি। বহুবচন বুঝাইবার এরূপ নিয়ম বোধ হয়, সংখ্যাবাচক শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে হইয়াছিল। বিশেষ্যের ন্যায় অনেক ক্রিয়াপদও ঐ একই নিয়মে শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; যথা, নাসিকার মধ্যে একপ্রকার সুড়সুড়ি উপস্থিত হইলে আমরা 'হ্যাঁচ্' করিয়া শব্দ করিয়া থাকি। সেইজন্য ঐ কার্য্যকে আমরা হাঁচি বলিয়া থাকি।

ভাষার সব কথাই যে এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এমন নহে। শব্দ হইতে উৎপন্ন কথা বা নামগুলি ব্যতীত ভাষায় হাজার হাজার কথা বর্ত্তমান আছে। যিনি ঘড়ি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি উহাকে 'টিক্ টিক্' না বলিয়া ঘড়ি বলিয়াছেন। এই সকল আধুনিক কথা মানুষের জ্ঞানের যুগে হইয়াছে। ইহাদের আবিষ্কর্ত্তারা তাঁহাদের পিতামহগণ অপেক্ষা আরও একটু তলাইয়া বুঝিতেন ও দেখিতেন। তাহা না হইলে যদি দুইটা বিভিন্ন বস্তু একই প্রকার শব্দ করিত, তাহা হইলেই গোল বাধিয়া যাইত। কিন্তু পুরাকালে শব্দজনিত কথা ভিন্ন অন্য কথাগুলি কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা চিন্তার বিষয়। হয়ত ঐ কথা সমূহের মধ্যে অনেকগুলি শব্দোৎপন্নই বটে এবং এক্ষণে ঐ সকল কথার শব্দ-সম্পর্ক হারাইয়া গিয়াছে। অথবা ঐ সম্পর্ক তখন এরূপভাবে ঘুরাইয়া ধরা হইয়াছিল যে, এখন উহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সভ্যতা যতই উন্নত হইতে লাগিল, পুরাতন কথাগুলিকে ততই নূতন কথার সহিত সংযুক্ত করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া তাহাদিগকে নূতন আকার প্রদান করা হইল। তদ্ব্যতীত অনেকানেক কথা লোকে ইচ্ছামত সৃষ্টি করিয়াছে। এই কথা সৃষ্টি কোন বাঁধা নিয়মের অন্তর্গত নহে। দেখা যায় যে, এক এক দেশের ছেলেরা এক এক প্রকার খেলার জন্য নানারূপ কথার সৃষ্টি করে। ঐ কথায় একটা ভাষা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের অর্থের সহিত ঐ কথাগুলির কোন ধাতুগত সম্বন্ধ নাই। যদি সকলেরই এইরূপ নূতন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার অধিকার থাকে এবং যখন সময় সময় নূতন কথা প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয়, তখন মানুষ যে ইচ্ছামত কতকগুলা কথা ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভাষাতত্ত্ববিদের এত

বিপদ—এই জন্যই তিনি নিয়ত খেই হারাইয়া ফেলেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা কেন বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কথা অনুসারে তাহার কতকটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, একটা লোক অদৃষ্টক্রমে কোন কারণে তাহার স্ত্রী ও শিশু-সন্তানগুলির সহিত এক নির্জ্জন বনে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ঐ শিশুসন্তানেরা পিতৃমাতৃহীন হইল। তার-পর তাহারা বনের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। পিতামাতার নিকট যে অল্পসংখ্যক কয়েকটা কথা শিখিয়া-ছিল, সে সময় তাহারা তাহাদের জীবনযাপন করিবার জন্য কিছুদিন সেই কথা কয়টা ব্যবহার করিল। কিন্তু ক্রমে তাহারা যতই বড় হইতে লাগিল, ততই তাহাদের নূতন কথার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন তাহারা ইচ্ছামত নূতন কথার সৃষ্টি করিল। এই কয়টি শিশুর সংসার ক্রমে যখন বৃদ্ধি পাইয়া একটি জাতিতে পরিণত হইল, তখন আরও বেশী কথার প্রয়োজন হইল এবং আরও কতকগুলি কথার ইচ্ছামত সৃজন হইল। এইরূপে একটি নূতন ভাষা জন্মগ্রহণ করিল।

ভাষার বিভিন্নতা আবার দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপর কতকটা নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত গল্পটি ধরা যাইতে পারে। উক্ত শিশুগণ অরণ্যে বাস করিত। যদি তথায় আহারীয় দুষ্প্রাপ্য হইত, অথবা তথাকার জলবায়ু তাহাদের পক্ষে দুঃসহ হইত, তাহা হইলে শৈশবকালে পিতৃমাতৃবিচ্ছেদের পর তাহাদের বাঁচিয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব হইত। তাহা হইলে সে স্থানে আর নূতন জাতি অথবা নূতন ভাষার সৃষ্টি হইত না। পরন্তু যদি ঐ স্থান সর্ব্বতোভাবে বাসের পক্ষে উপযুক্ত হইত এবং আহার্য্য অনায়াস-লভ্য হইত, তাহা হইলে তথায় ঐরূপে একটা নূতন ভাষার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন ইউরোপে আহার্য্য যখন বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন কোন বিশেষ সুবিধা নহিলে ঐরূপ নিঃসহায় শিশু কয়টি বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। সেই জন্যই সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে মোটের উপর প্রায় কেবল চারি পাঁচ প্রকারের ভাষা বর্ত্তমান। কিন্তু আমেরিকার কালিফোর্নিয়া দেশের জলবায়ু অতি চমৎকার। সেখানে অর্দ্ধেক বৎসর বৃষ্টি হয় না। তুষার কিম্বা বরফ তথায় নাই বলিলেই হয়। বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই শত দিন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। তথায় ফলফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সেখানে অন্ততঃ উনিশটি বিভিন্ন ভাষী জাতি বাস করে। তাই বলিতেছিলাম ভাষার সংখ্যার উপর দেশের ভৌগোলিক অবস্থার একটা মস্ত সম্পর্ক আছে।

মানুষ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুসমূহের সম্বন্ধে যতই বেশী জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল, অন্যান্য মনুষ্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, তাহার জীবন যাত্রা যতই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই সে নূতন কথা সংগ্রহ করিয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিল্প, প্রত্যেক বিজ্ঞান, প্রত্যেক

দর্শন তাহার নিজের কথায় ভাষার ভাণ্ডারের এক একটা কক্ষ পূর্ণ করিয়া তুলিল। ভাষার এইরূপ অভিব্যক্তি নিয়তই চলিতেছে এবং চিরকালই চলিতে থাকিবে। ঈশ্বরই মানুষকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে সমাজস্থ সকলের সহিত মনোভাব প্রকাশ করিবার কৌশল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সেইজন্য ঈশ্বর মানুষকে ভাষাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে কথা প্রদান করেন নাই—কথা গড়িয়া ভাষা সৃষ্টি করিবার সমস্ত শক্তিগুলি দান করিয়াছেন। তিনি মানুষকে কথা বলিবার যন্ত্র বিশেষ করেন নাই। মানুষ নিজে তাহার প্রয়োজনীয় ভাষা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে।

ভাষার ন্যায় লিখনপ্রণালীও ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ইজিপ্ট্ দেশে "মানুষ" এই কথা লিখিতে হইলে, একটা মানুষের ছবি আঁকা হইত। উচ্চারিত শব্দ অনুসারে বস্তুর নাম-করণ এবং আকৃতি চিত্রিত করিয়া কথা লেখা দুইই ঠিক একই প্রণালী। পরে সময় বাঁচাইবার জন্য ঐ লিখন প্রণালীকে সংক্ষিপ্ত করা হইল। তখন চিত্রগুলি কতকগুলা সরল রেখাপাতের দ্বারা বুঝান হইত। চীনদেশে একখণ্ড জমি লিখিতে হইলে একটি সমবাহু চতুর্ভুজ আঁকা হইত। দুইটি সরল রেখা স্থূল কোণে মিলিত হইলে ঘর বা ঘরের ছাদ বুঝাইত। কিন্তু এ উপায়ে কেবল বস্তুবাচক বিশেষ্য পদগুলি বুঝান যাইতে পারে মাত্র। পরে এই সকল উপায় হইতে কৌশলে গুণবাচক বিশেষ্য পদও লেখা হইত। একত্র একটি মানুষ ও একখণ্ড জমির চিত্রে সম্পত্তি বা ধন বুঝাইত। ধনশালী হইলেই সুখী হয়। সুতরাং ঐ চিত্রের অর্থ সন্তুষ্টি। আবার একজন স্ত্রীলোকের ছবির উপর ছাদের চিত্র অঙ্কিত করিলে বুঝাইত, গৃহস্থ স্ত্রীলোক—শান্তিময়ী স্ত্রীলোক। অতএব উক্ত চিত্রের অর্থ শান্তি বা বিশ্রাম।

মানুষের জ্ঞান যতই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, লিপিশিল্প ততই উন্নতি লাভ করিল। অল্প দূরস্থিত বন্ধুর নিকট মনোভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য মানুষ কথা কহিতে শিখিয়া-ছিল। সভ্যতার দিনে যখন সমস্ত পৃথিবীর সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তখন এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংবাদ প্রেরণের জন্য আর এক প্রকার ইঙ্গিতের ভাষা—টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হইল। টেলিগ্রাফের ভাষা শব্দ-সাঙ্কেতিক ভাষা। সুতরাং উক্ত ভাষা এখন উহার আদিম অবস্থায়। ঐ ভাষা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া বাক্যের ভাষায় পরিণত হইল—টেলিফোনের সৃষ্টি হইল। এখনও মানুষ টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষার সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যগ্র। তাই ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত এক মন যাহাতে অপর মনকে সাড়া দিতে পারে—তাহার ভাব জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। এই ভাষাকে টেলিপ্যাথি নাম দেওয়া হই-য়াছে। পাশ্চাত্য সমাজে এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। বর্ত্তমান ভাষার অভি-ব্যক্তির পরবর্ত্তী স্তর খুব সম্ভব টেলিপ্যাথি।

জগতে বাক্যের সৃষ্টি অতি ধীরে ধীরে হইয়াছিল। জগতে উহার সৃষ্টির সম্ভাবনা

ছিল না বলিয়া এ বিলম্ব নহে। ইহার কারণ কথা কহিবার যন্ত্রের অভাব ছিল বলিয়া। অভিব্যক্তির সাহায্যে ক্রমে বাক্‌যন্ত্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন মানুষ কথা কহিতে আরম্ভ করিল। জগতে তড়িতের অভাব ছিল বলিয়া টেলিগ্রাফ এতদিন পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এমন নহে। এ বিলম্বের কারণ, টেলিগ্রাফ যন্ত্রের অভাব। টেলিফোনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, যে বিধি অনুসারে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই বিধি যে জগতে বর্ত্তমান ছিল না, এমন নহে। ইহার কারণ, ঐ যন্ত্রের অভাব। ইহা হইতে বুঝা যায় যে টেলিপ্যাথি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া মানুষের কাযে আসিতেছে না, ইহার কারণ যে জগতে ইহার সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই, এমন নহে। ইহার কারণ, সেই সময়টি এখনও উপস্থিত হয় নাই —সেই যন্ত্রটি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ ক্রমোন্নতির অন্তে মনুষ্যের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, এ সমস্যার উত্তরদান-কালে বিজ্ঞান মূক। প্রকৃতির অঞ্চলান্তরালে প্রচ্ছন্ন ব্যাপারগুলি দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে, মানুষের মন এবং জ্ঞান প্রতি-মুহূর্ত্তেই উন্নতি লাভ করিতেছে, জড় জগৎ নিয়তই পরাজিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্ব-শেষের বিধান কি? বোধ হয় "I am the tadpole of an archangel" এই বচনই সত্য।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

সৌধ-রহস্য

দশম পরিচ্ছেদ

এই কাহিনীর যতটুকু অপরের সাহায্যে আমায় সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহা তাহাদের লিখিত বিবরণেই আমি প্রকাশ করিয়াছি, আবার এইবার আমার বক্তব্যের "খেই" আমি নিজের হাতেই তুলিয়া লইলাম।

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে—সেই মানব-নামধারী জানোয়ার,—কর্ণেল রুফাস্-স্মিথের ক্লুমবারে আগমন সংবাদ দিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। রুফাস্ আসিয়া-ছিল অক্টোবরের প্রথম ভাগে,—আর ডক্তার ইষ্টারলিংয়ের ক্লুমবার-গমনের তারিখ মিলাইয়া দেখিলাম যে তিনি ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্লুমবারে গিয়াছিলেন। এই সময়টা আমার পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবার একটু কারণও ছিল, যেহেতু ডাক্তারের ক্লুমবারে আগমনের কিছুদিন পূর্ব্বেই, গেব্রিয়েল ও আমার মধ্যে জেনারলের সহসা অভ্যুদয় হয়। ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা বলাই হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই দিন হইতে গেব্রিয়েল বা মরডণ্টের আর কোন সংবাদ আমি পাই নাই,—তাহাদের ছায়াটুকুও আর চোখে পড়ে নাই,—অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই।

অনেক সময় আমার মনে সন্দেহ হইত, বুঝি বা তাহারা বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। তখন তাহাদের এই দুর্দ্দশার মূল যে আমরাই এই কথা চিন্তা করিয়া আমাদের

ভ্রাতা-ভগিনীর চিত্ত আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। এইরূপ অযথা কল্পনা জল্পনা ও জটিল বিভীষিকার ছায়ায় শঙ্কিত চিত্ত, উত্তরোত্তর কণ্টক গুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া পথ হারাইয়া অন্ধের মতই ফিরিতেছিল।

জেনারলের সহিত শেষ সাক্ষাতের দুই দিন পরে একদিন সকালবেলা, একটি ধীবর বালক একখানি পত্র আনিয়া দিল, বলিল, গাছের মধ্যে যে মস্ত কোঠাটা আছে, সেই কোঠারই একটি বৃদ্ধা নারী তাহাকে পত্রখানি, আমাকে দিবার জন্য দিয়াছে। রমণীর বর্ণনা যতটুকু জানিয়া লইলাম, তাহাতে আন্দাজ করিলাম সে জেনারলের রন্ধনকর্ত্রী ছাড়া অপর কেহ নহে! পত্রখানি এই—

আমার প্রিয়তম বন্ধুগণ!

আমাদের সাক্ষাৎ বা সংবাদ না পাইয়া তোমরা যে আমাদের কথা ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত রহিয়াছ, এই ভাবনায় গেব্রিয়েল ও আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমরা এখন বন্দী! বন্দী বলিতে যে সাধারণ অর্থ বুঝায়—আমরা সেরূপ কোন শারীরিক শাসনের সহিত বন্দী নহি। আমাদের সুখ শান্তি-হীন দুর্ভাগ্য পিতার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দিন-দিন এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে তিনি আমাদের নিকট,—সন্তান আমরা, তাঁহার শাসনের পাত্র,—তথাপি তিনি সকরুণ মিনতির সহিত আমাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন যে, ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আমরা যেন কাহারও সহিত মেলা-মেশা না করি,—তাঁহাকে ভয় হইতে মুক্ত রাখি!" নতজানু হইয়া, তাঁহার নিকট আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার আদেশ আমরা সম্পূর্ণরূপেই পালন করিব। ওয়েষ্ট,—অকৃতজ্ঞ সন্তান আমরা, তাই এমন স্নেহময় করুণ-হৃদয় পিতারও আশঙ্কার কারণ হইয়াছি। হায়, যদি তাঁহার মানসিক যাতনার এতটুকুও লাঘব করিতে পারিতাম!

বাবা বলিয়াছেন, ৫ই অক্টোবর কাটিয়া গেলে তাহার পরদিনই তিনি আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সহিত মুক্তি দিবেন, বাতাসের মতই স্বাধীন জীবন; কিন্তু কে জানে কেন আজ আর সে কথা মনে করিয়া যতখানি আনন্দ উপভোগ করা আমাদের উচিত ছিল, সে আনন্দ মনে আসিতেছে না। স্বাধীনতা? কে জানে—এ মুক্তি প্রার্থনীয় কি না! আমরা আশঙ্কিত হইতেছি।

৫ই অক্টোবর যে বাবার ভয় চরম সীমায় দাঁড়াইবে গেব্রিয়েল বলিল, সে কথা, সে ইতি-পূর্ব্বেই তোমায় জানাইয়াছে। বাবার ভাব দেখিয়া মনে হয়—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—এবারকার ৫ই অক্টোবর তাঁহার দুর্ভাগ্য পরিবারের কল্পিত বা বাস্তব বিপদ বহন করিয়া আনিতেছে। এবার আর প্রতি বৎসরের মত শূন্য হস্তে সে ফিরিয়া যাইবে না। সেই জন্যই এবারকার রক্ষার আয়োজনও এত অধিক। তিনি যেন উন্মাদের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই জীবন্মৃত অবস্থা দেখিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে।

তাঁহার এখনকার এই কম্পিত বক্র দেহ, সভয় দৃষ্টি দেখিয়া কে মনে করিতে পারিবে,—এই মানুষই কিছুদিন পূর্ব্বে তরাইয়ের জঙ্গলে পদব্রজে সাক্ষাৎ মৃত্যু-তুল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছেন,

এবং তাঁহার সহযাত্রী হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় সঙ্গীদের ভয়াতুর দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া সান্ত্বনার মৃদু হাসি হাসিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

তুমি জান—দিল্লীর রাজপথে সম্মানের বিজয়-নিশান-স্বরূপ তিনি ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ করিয়াছিলেন। আর তোমরাই ত দেখিয়াছ—সেই তিনিই আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন পল্লীর প্রান্তে প্রাচীর বেষ্টনের রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া দারুণ ভয়ে কম্পিত হইতেছেন। ভাগ্যের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস, —কি এ নির্ম্মমতা! আমরা তোমাদের যে কথা জানাইয়াছি তাহা স্মরণ করিয়ো,—এ একটা কল্পিত মানসিক ব্যাধির ফল নহে,—আমাদের অন্তরাত্মা আজ বলিতেছে, সত্য, সত্য, সব সত্য! সত্যই আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে,—এই যে বিপদ—এ এমন ভাবের—যে ইহাকে ঠেকাইয়া রাখাও যায় না, অথবা টানিয়া ফেলিয়া দেওয়াও চলে না। আর বুঝাইয়া বলিবারও কিছু নাই।

তোমরা কি মনে কর, ৫ই অক্টোবর রিক্ত হস্তে আমাদের দুর্ভাগ্য পরিবারে কোন ভীষণ নাটকের যবনিকা নিক্ষেপ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবে? যদি তাহাই হয়, ৫ই অক্টোবর কাটিয়াই যদি যায়, ৬ই অক্টোবর প্রাতে ব্রাঙ্কসামারে আবার আমরা মিলিত হইব। তোমরা উভয়ে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা জানিয়ো।" ইতি তোমাদেরই "মরডণ্ট"

এই চিঠিখানা আমাদের মনে সুখ না দিলেও সান্ত্বনা দিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাহারা স্বেচ্ছা-বন্দী হইলেও অত্যাচারিত নহে। কিন্তু যাহারা আমাদের প্রাণাধিক, তাহারা যে সত্যই কোন ভীষণ বিপদের সম্মুখে অবস্থিত, এ চিন্তায় এত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, যে কেবল উন্মাদ হইতেই বাকি ছিল!

দিনের ভিতর পঞ্চাশ বার আমরা কেবলই ভাবিতে ছিলাম—যে বিপদটা কি প্রকারের? কোথা হইতে উহার উৎপত্তি সম্ভব? সে প্রশ্নের উত্তর ছিল না। চিন্তার সূত্রে উত্তরোত্তর গ্রন্থি বাঁধিয়াই চলিয়াছিল। অমীমাংসিত প্রশ্ন, অন্তর মধ্যে বেদনার দোলা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, পথ নাই, পথ নাই!

ক্লমবারের লোকগুলির নিকট যখন যতটুকু যাহা শুনিয়াছি, সমস্ত মিলাইয়া যদি সেই জটিল রহস্যের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাই, তাহারই নিষ্ফল চেষ্টায় অনেক সময় মস্তিষ্ক ঘৃতের অনেকখানি অপচয় করিয়াছি। কত বিনিদ্র রজনী এই একই চিন্তায় কোমল শয্যা কণ্টক-শয্যায় পরিণত করিয়া তুলিয়া, এ পাশ, ও পাশ ছট্‌ফট করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি, তথাপি কোন কূল-কিনারার সন্ধান মিলে নাই। মাথার উপর যে ঘোরতর দুর্দ্দিন আকস্মিক বজ্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল, তাহার ছায়া যেন আমাদের চিত্তেও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ কল্পনা-বলে একটা দুর্গম জটিল পথ তৈয়ার করিয়া লয়। কখনও কখনও ঘটনা চক্রের সংঘর্ষণে সেই সহস্র নির্ম্মিত পথই প্রশস্ত হইয়া তাহারই দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিয়া সফলতা আনয়ন করে। আমাদের বন্ধুদের কল্পিত দুঃখের দিন বুঝি বা সত্যই আসে যে কাল্পনিক চিত্র সুদূর আকাশের গায়ে ছিল, তাহাই বুঝি শরীর ধরিয়া ভূতলে নামে

যে বিপদের সম্ভাবনা এক সময় আমি অলীক বলিয়া তুমুল তর্কের মুখে উড়াইয়া দিতে চাহিয়া ছিলাম, আজ কি না তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্বেলিত বক্ষে পথ চাহিয়া ভয়ে সারা হইতেছি! অনেক সময় হাসিবার চেষ্টা করিয়া অকারণে ভাবিয়াছি, আমি প্রকৃতিস্থ কি না! সঙ্গ ও সংস্কারের কি অদ্ভুত মাদকতা-শক্তি,—আমি এখন একজন ঘোর অদৃষ্টবাদী! আমার অন্তরের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এমন ধীরে ধীরে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল, যে, আমি অনেক সময় অবাক হইয়া ভাবিয়া থাকি, —যে কিরূপে, কখন, ইহা ঘটিল?

চিন্তা যেখানে পথ পায় না, যুক্তি সেখানে পথ গড়িয়া লয়। আমরা ভাই-বোনে যখন কোন সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তখন স্থির করিলাম, চুপ করিয়া ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুদের নিজ মুখ হইতে সব কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করাই এখানে সদ্‌যুক্তি। এখন মধ্যকার এই সুদীর্ঘ দিন কয়টাকে কাটাইয়া দেওয়া যায় কিরূপে? কিন্তু এ বিষয়েও বড় অধিক চিন্তা করিতে হয় নাই। দৈব সহসা এমন একটা অচিন্তিত ঘটনা আনিয়া আমাদের সারা চিত্তকে তাহারই করতলে ন্যস্ত করিয়া দিল, যে অপর চিন্তার আর কোন অবসরও রহিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

৩রা অক্টোবরের প্রভাত বেশ মনোহর মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছিল। সূর্য্যের রশ্মিতে তীক্ষ্ণতা নাই! লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণে রঞ্জিত হইয়া বিহঙ্গের মতই ডানা মেলিয়া আকাশের-গায়ে ভাসিয়া চলিয়াছে। বাতাসে শীতলতা ছিল, শৈত্য ছিল না। কাননে সদ্য জাগরিত পাখীর কল-কুজনে চতুর্দ্দিকে মধুরতার ফোয়ারা ছুটিতেছিল। আমরা মনের অবস্থা লইয়া জড় প্রকৃতিকে বিচার করি, তাই আমার মনে হইল, সেদিনকার প্রভাত বুঝি কোন আগত শুভ ঘটনারই আভাষ বহন করিয়া অতিথির বেশে দেখা দিয়াছে।

প্রকৃতির এই মধুর ভাব অধিকক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হইল না। যেমন বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যের তেজও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতেছিল। নাতিশীতোষ্ণ বাতাস, যাহা কিছু পূর্ব্বে দেহ, মনের ক্লান্তি হরণ করিয়া হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিতেছিল, তাহাই একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়া চারিদিকে একটা অসহ্য গুমটের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। যদিও শীত ঋতু তখন মধ্য পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সেদিনকার মেঘহীন সূর্য্যোত্তাপে অসহ্য অনলবর্ষী জ্বালা বর্ষিত হইতেছিল। এবং চ্যানেলের অপর প্রান্তে দূর আয়র্লণ্ডের ধূসর পর্ব্বতগুলির উপর কেহ যেন একখানা তরল কুয়াশার আচ্ছাদন বিছাইয়া দিয়াছিল।

তরঙ্গের উপর মৎস্য-লোলুপ পক্ষীর দল ক্রীড়া না করিয়া উড়িয়া গিয়াছে! সৈকত ভূমে টিট্টিভরাও ক্রীড়া ছাড়িয়া লুক্কায়িত। সমুদ্রের সফেন ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে গভীর গর্জ্জনে বেলাভূমে আছাড়িয়া পড়িতেছিল, তাহার সেই গম্ভীর, গগন-পূরিত ধীর গর্জ্জন-ধ্বনি, কর্ণে

যেন অসহায়ের আর্ত্ত ক্রন্দনের মতই আঘাত দিয়া বাজিতেছিল। প্রকৃতির অসীম রহস্য ভাণ্ডারের অনভিজ্ঞ অন্ধজীব, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে করিবে, সিন্ধু তাহার নিয়মেই বদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির রহস্য যাহারা জ্ঞাত আছে, তাহারা পরিবর্ত্তনশীল পুস্তকের যে কোন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া মনের দৃষ্টিতে পাঠ করিয়াছে, তাহারা প্রকৃতির এই নিষেধ-বাণী সম্পূর্ণ রূপেই পাঠ করিতে পারিবে।

আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রে তাললয়হীন যে অশান্ত নৃত্য চলিতেছিল—তাহা যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট দুর্ঘটনারই পূর্ব্বাভাষ মৃত্যু-দোলার অশ্রান্ত দোল!

বৈকালে এসথার ও আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অত্যধিক গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ সেদিন আর বেশী দূরে না গিয়া নিকটের একটা বালুকাময় স্তূপ, যেখানে একটা ঘাসের প্রকাণ্ড চাপ্‌ড়া, সমুদ্রের জল তীরে আসিবার পথে বাধারূপে বিরাজিত ছিল, তাহারই উপর আমরা উপবেশন করিলাম।

অপরাহ্ণের লোহিত তপন তরল মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া পদতলের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহাসমুদ্রের সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত সহস্র বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া অস্তাচলে চলিয়াছে, তীরাহত সমুদ্রের গর্জ্জন-ধ্বনি যেন বেদনাময় রাগিণীর মত অজস্র সুরের মূর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। নীলফেনকিরীটি লবনাম্বুরাশি যোজনান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত! আমরা তন্ময় হইয়া প্রকৃতির সেই অপরূপ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, সহসা পার্শ্বে ভারী জুতার মস্‌মস্ শব্দে চকিত হইয়া আমরা মুখ ফিরাইলাম "কে—ও—জেমিসন্?"

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে—যেদিন প্রথম ক্লুমবারে আলো দেখিয়া আমি তথ্য জানিতে যাই,—সেদিন এই বুড়া জেমিসনই আমার সঙ্গী হইয়াছিল। পিঠের উপর প্রকাণ্ড ভারী, একটা গোলাকৃতি জালের বোঝা চাপাইয়া এক মুখ হাসি লইয়া বৃদ্ধ আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। "সমুদ্রের কি চমৎকার রূপই খুলেচে,—মিঃ ওয়েষ্ট কুমারী এস্‌থার, তোমাদের রাত্রের খাবারের টেবিলের জন্য যদি এক ডিস্ তাজা মাছ পাঠিয়ে দিই—বোধ হয় তোমরা বিরক্ত হবে না?—এই ঝড়টা ওঠ্‌বার আগেই একটা বড় রকম মাছ ধর্‌তে পারব, এম্‌নি ত আশা কচ্চি।" বৃদ্ধ তাহার সরল হাসি হাসিয়া মন্তব্য শেষ করিল। বৃদ্ধের সরল স্নেহ-প্রকাশের সপক্ষে একটুখানি হাসিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন, তুমি কি ঝড়ের আশা কচ্চ না কি?"

একটা প্রকাণ্ড মোটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ-পূর্ব্বক সেটা মুখে গুঁজিতে গুঁজিতে জেমিসন উত্তর দিল "সকল নাবিকেই ত তা বুঝ্‌তে পার্‌বে - ঐ দেখ না কেন, ক্লুমবারের ধারে—ঐ জলাটায় সাদা ডানাওয়ালা "গ্যল" আর 'বকে' একবারে ঝাঁক বেঁধে গ্যাছে। ঝড়ে ডানা খসে ঠুঁটো হয়ে যাবার ভয়েই শুধু তারা এমন ভয় পেয়ে তাল পাকিয়ে জড় হয়নি কি? আমার ঠিক্ এম্‌নিই,—আর একটা দিনের কথা মনে পড়্‌চে,—সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন চার্লী নেপিয়ারের সঙ্গে ক্রন্‌ষ্টাটের একটু দূরে ছিলুম সে কি

ভয়ানক ঝড়। সবগুলো হাল আর সমস্ত এঞ্জিনের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে আমাদের যেন একেবারে দুর্গের কামানের উপর ছুড়ে ফেলে দেয়, এম্‌নি চেষ্টা। জীবন-মরণের ভীষণ যুদ্ধ—সে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এদিকে কখনও জাহাজ-টাহাজ ভেঙ্গেচে কি ডুবেচে শোনা যায়?"

"ও মশায়, ভগবান রক্ষে করুন। এই যে জায়গাটি এটিত ধ্বংসের একটি বড় রকম আস্তানা। কেন, ঐ যে উপসাগরটা দেখা যাচ্চে—স্পেন যুদ্ধে রাজা ফিলিপের দু-দুখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাল জাহাজ তার পেটভর্ত্তি লোকলস্কর নিয়ে ঐ খানটায় একেবারে তলিয়ে গেছল। এই জলের চাদরখানা দেখ্‌চেন—এ যদি বোবা না হোত,আর ঐ বাঁকের ডান দিকে যে নিউজ উপসাগরটা দেখা যাচ্চে—ওরা যদি নিজের নিজের গল্প বল্‌তে পারত, তাহলে হাজার হাজার ঝুড়ি বোঝাই হয়ে যেত। যখন শেষ বিচারের দিন আস্‌বে, আমার বোধ হয় ঐ ঠাণ্ডা নোনা জলটা টগবগ করে ফুট্‌তে থাক্‌বে, ওর তলায় যে অগুণ্‌তি হতভাগা ঘুমিয়ে রয়েচে—তাদের নিশ্বাসে সেদিন সারা সমুদ্রের জল তপ্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌বে।"

সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো এস্‌থারের ঘন চুলে ঢাকা ছোট মুখখানির উপর পতিত হইয়া তাহার পরদুঃখকাতর মুখখানিকে জেমিসন-বর্ণিত হতভাগ্যদিগের জন্য রুদ্ধ বেদনায় পাণ্ডুর করিয়া দিল। প্রকৃতির ম্লানিমার অংশ তাহার বহিঃপ্রকৃতির নয়,—অন্তঃপ্রকৃতিকে শুদ্ধ যেন—তাহার ম্লান ছায়ালোকে মলিন করিয়া সুনীল নেত্রে ব্যথিত বেদনায় সজল করিয়া দিল,—যেন আলোক-দীপ্ত সুনীল তরল মেঘে সমাচ্ছন্ন—একটু বাতাস উঠিলেই এখনি ঝরঝর করিয়া তাহার রুদ্ধ বক্ষের পাষাণভার বিদীর্ণ করিয়া শীতল স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিবে। একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া এস্‌থার কহিল, "আহা,—আমরা যত দিন এখানে থাক্‌ব—আর যেন কখনও এমন দুর্ঘটনা না হয়।"

যেখানে আকাশের সহিত সমুদ্র মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, সেই দিগন্ত সীমায় চক্ষু রাখিয়া, চিন্তিত মুখে, মস্তকের সাদা চুলের ভিতর ঘন ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বৃদ্ধ জেমিসন্ কহিল, "যদি পশ্চিম দিক্ থেকে বাতাসটা ওঠে—তাহলে ঐ যে পাল খাটিয়ে জাহাজগুলো যাচ্চে,—ওদের লোকেরা বড় আমাদের বিষয় মনে কর্‌বে না। উত্তর চ্যানেলে কোথাও একটু মাথা রাখ্‌বার জায়গা নেই ত? দূরে—ঐ যে জাহাজখানা যাচ্চে, যদি ঝড়ের আগে, এই 'ক্লাইডে'র মধ্যে ওকে ঢোকাতে পারে, তবেই ওর কাপ্তেন খুব খুসী হয়ে যাবে।"

আমি জেমিসন-কথিত জাহাজ খানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তিতভাবে কহিলাম, "আমার ত মনে হচ্চে, জাহাজখানা দাঁড়িয়েই আছে, ও কি চল্‌তে পার্‌বে?" সমুদ্রের নাড়ী যেমন দ্রুত তালে কম্পিত হইতেছিল,—জাহাজখানার কালো রঙের হাল, আর রৌদ্রমাখা চক্‌মকে পালগুলিও তেমনি দ্রুত কম্পনে নাচিতেছিল। আমি পুনরায় কহিলাম, "জেমিসন্, আমাদেরই বোধ হয়

ভুল হয়েছে, আজ আর ঝড়-টড় কিছু উঠ্‌বে না?”

বৃদ্ধ নাবিক তাহার ভূয়োদর্শন-জ্ঞানের অভিজ্ঞতাসূচক একটুখানি তাচ্ছল্যপূর্ণ মৃদু হাসি হাসিয়া জালের বোঝা বহিয়া অভীষ্ট কার্য্যে চলিয়া গেলে আমিও এস্‌থারকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

প্রথমেই আমি বাবার লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করিলাম, কাকার জমিদারী-সংক্রান্ত একটা গোলযোগে কয়দিন হইতে মাথা ঘামাইয়াও কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই। বাবা বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তিনি আমায় কতকগুলি লিখিত উপদেশ দিবেন এবং কিছু বুঝাইয়াও দিবেন। জমিদারী পরিদর্শনের ভার প্রধানতঃ বাবার উপরে ন্যস্ত থাকিলেও ক্রমশ এখন তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া আমারই স্কন্ধদেশে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া বসিয়াছে। কারণ সাহিত্য-চর্চ্চায় বাবা আজকাল—এমনি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন—যে সংসারের এই সকল ছোটখাট খুঁটিনাটি কাযের সেখানে আর স্থান ছিল না।

আমি যখন বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম—তিনি তখন এসিয়ার কোন অদ্ভুত সাহিত্যরসে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

চৌকা টেবিলটার নিকট চেয়ারের উপর তিনি বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপর পুস্তক ও কাগজের স্তূপ এমন উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, যে দরজার নিকট হইতে আমি তাঁহার কোমল কেশের উপরিভাগ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাবা পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া চশমাটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। তাহার পর একটু গম্ভীর ভাবে, ব্যথিতস্বরে কহিলেন, “আমার ভারী দুঃখ হয় জ্যাক্ যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তুমি একেবারেই অপরিচিত রয়ে গেলে। তোমার বয়সে—আমি সে মহান্ দেবভাষায় কথা বল্‌তে ত পারতামই, তা ছাড়া লোহিতী গঞ্জেলী মালব তামিল তৈ এ গুলকেও দখল করে নিয়েছিলাম,—এ সবই টুরেণীয় শাখার উপশাখা।” বাবার মুখের ভাব দেখিয়া আমি দুঃখিতভাবে কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, “সে আমার দুর্ভাগ্য বাবা—উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি আপনার এই আশ্চর্য্য বহুভাষাতত্ত্বের এতটুকুও পেলেম না।”

বাবা কহিলেন, তিনি এখন এমন একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যদি বংশপরম্পরা ক্রমে সেই কার্য্যটি শুধু নিজেদের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ওয়েষ্টের নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কথাটা তিনি খুলিয়াই বলিলেন। বাবা কহিলেন, “আমি বৌদ্ধধর্ম্মের সার সংগ্রহ করে একখানি ইংরাজী পুস্তক সঙ্কলন কর্‌ব, এবং তার ভূমিকায় শাক্যমুনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কি অবস্থা ছিল, তারই বিশদ ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস যদি রীতিমত পরিশ্রম করি—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ভূমিকার কতক অংশ আমি শেষ করে যেতে পারব।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কত দিনে এর শেষ হওয়া সম্ভব?” বাবা কহিলেন, “এর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ পিকিনের রাজকীয়

লাইব্রেরীতে আছে,—সেটা হচ্ছে, তিন শো পঁচিশ খণ্ডে বিভক্ত—আর তার প্রত্যেক খণ্ডের ওজন প্রায় পাঁচ পাউণ্ড। আমি ভাবচি—তার ভূমিকাতে সাম, ঋক্, যজু অথর্ব্ববেদ—এবং ব্রাহ্মণ এইগুলির বিষয় যদি ব্যাখ্যার সঙ্গে দেওয়া যায়, তাহলে ভূমিকাটি মোট দশ খণ্ডে বিভক্ত হবে। এখন যদি ধরা যায়, আমরা প্রত্যেক খণ্ডের জন্য এক বৎসর করে সময় দিই ২২৫০ খৃষ্টাব্দে আমাদের বংশে প্রায় বারো পুরুষ পরে এই কাজটি শেষ হবার সম্ভাবনা। আর তের পুরুষ বোধ হয় সূচীটা শেষ করতে পারবে।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “আমাদের নিম্নতম পুরুষেরা যদি সারা জীবন এই কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে—তাহলে তারা খাবে কি? আমাদের ত জমিদারীটারি কিছু নেই।”

বাবা ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিলেন, “ঐ তোমার মহৎ দোষ। কাজের কথায় তোমার কখনই মনোযোগ নেই। আমার এই মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হবে, তা না ভেবে—কোথা দিয়ে কি রকম করে কি কি বাধা-বিপত্তি আস্‌তে পারে, সেই ভাবনাই আগে ভাবতে বস্‌লে। যতদিন আমার বংশের উত্তর পুরুষেরা এই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে কাটাবে,—বেঁচে তারা থাক্‌বে নিশ্চয়ই। খাবে কি? সে তখন দেখা যাবে। ভগবান্ তাঁর সৃষ্ট কোন জীবকেই অনাহারে রাখেন না।”

এ সম্বন্ধে ভগবানের প্রতি তাঁহার যে কতখানি নির্ভরতা, তাহা, এই উইগটাউনের ব্যাঙ্কসামারে আসিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমরা অস্থিমজ্জায় যথেষ্ট অনুভব করিয়াছি। অভাব, অনাহার, দরিদ্রতায় তাঁহার স্বভাব-প্রফুল্ল চিত্তে এতটুকু উদ্বিগ্নতা আনিতে পারে নাই। সাহিত্যের আনন্দময় সিংহাসন হইতে, জ্ঞানের রাজ্য হইতে এতটুকুও টলাইতে পারে নাই। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া বাবা কহিলেন, “আচ্ছা! তুমি এখন যাও—ফারগাস্ ম্যাক্ ডোনাণ্ডের ঘরটা ছাওয়া হয়েচে কি না দেখ। ঝড়-জল হলে বেচারা কষ্ট পাবে, আর উইলি ফুলারটন লিখেচে, তার দুধ-ওয়ালী গাইটার কি অসুখ হয়েচে, সেই সব খোঁজ নাওগে,—এই সবই ত তুমি বোঝ ভাল। ইতিহাসের উপর তোমার কখনও শ্রদ্ধা নেই, যাও।” তিনি চশমা তুলিয়া লইয়া অধীত পুস্তকে মনোযোগ দিলেন। জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাবার ঈষৎ হতাশা-ব্যঞ্জক সকরুণ মুখের প্রতি চাহিয়া আমার ভাষা-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য মনে মনে আত্ম-গ্লানি জন্মিয়াছিল, স্থির করিলাম—আর আলস্য না করিয়া এ বিষয়ে এইবার হইতে মনোযোগ দিব। সংকল্প যে আজ এই প্রথমই করিলাম, তাহা নয়—এ ইচ্ছা ইতি পূর্ব্বে আরো অনেকবার করিয়াছি—কিন্তু সাধু ইচ্ছা মানুষের বড় দুর্ব্বল, ইহার দৃঢ়তাও বড় ক্ষণস্থায়ী, দুই-চারি দিন সেই জটিল পথে পদ-চারণা না করিতেই ক্লান্তিতে মন কেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাজ কিছুই অগ্রসর হয় না!

বাবার আদেশ-পালনের জন্য আমি যখন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, তখন কক্ষগাত্র বিলম্বিত ব্যারোমিটারটার প্রতি

একবার চাহিয়া দেখিলাম, তাপমানে পারা রেখা প্রায় ২৮ ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। সেই বহুদর্শী নাবিক বৃদ্ধ জেমিসন, সে যে প্রকৃতির ভাষা-পাঠে ভ্রমে পতিত হয় নাই—বিস্ময়ের সহিত সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই আমি পথ চলিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রজাদের সামান্য কাজ-কর্ম্ম সারিয়া যখন আমি জলার ধার দিয়া ফিরিতেছিলাম, বাতাস তখন বেগে বহিতেছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘে নীল আকাশ ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে সেই খণ্ড খণ্ড মেঘগুলা জমাট বাঁধিয়া যেন রেল গাড়ীর লাইন তৈয়ার করিতেছিল। সমুদ্রের বক্ষে পারদের উজ্জল আস্তরণের ন্যায় যে ঝক্‌মকানি ছিল—এখন সেখানে যেন এক-খানা ঘষা কাঁচের চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সমুদ্রের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া শ্রবণ-ভৈরব জলোচ্ছ্বাসের শব্দকে প্রতিহত করিয়া যে একটি ক্ষীণ করুণ ক্রন্দনের সুর উত্থিত হইতেছিল, সে যেন তাহারই ললাট-নিহিত কোন আসন্ন রোগ-বেদনারই মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ করুণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন-ধ্বনি!

চ্যানেলের বহুদূরে একখানা বেলফাষ্ট গামী ছোট জাহাজ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট শীকারীর করচ্যুত আহত পক্ষীর মত ডানা মেলিয়া শ্রান্ত দেহে প্রাণান্ত চেষ্টায় অগ্রসর হইবার জন্য বৃথা পরিশ্রম করিতেছিল। বাতাসের বেগ এবং সমুদ্রের তরঙ্গ তাহাকে কোন মতেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, বরং বাধা দিয়া প্রতিহতই করিতেছিল। বৈকালে বেড়াইতে আসিয়া আমরা যে প্রকাণ্ড পালতোলা জাহাজখানাকে দেখিয়া গিয়াছিলাম—সেখানা এখনও দৃষ্টি-পথের মধ্যেই রহিয়াছে, বাহির হইয়া যাইতে পারে নাই। এখন কেবল ঝড়ের মুখে আত্মরক্ষার উপায়-চেষ্টায় উত্তর দিকে জলের ধারে লইয়া যাইবার জন্য তাহার তরফ হইতেও অক্লান্ত পরিশ্রম চলিতেছিল।

সুদূর আকাশের প্রান্তে ধূমপুঞ্জবৎ মেঘ শ্রেণী যেখানে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুতের লোল-জিহ্বা মেলিয়া নক্ষত্রপুঞ্জশোভী নীলাকাশকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম সমস্ত আকাশ সজল মেঘে ভরিয়া গিয়াছে, ভীত সমুদ্র-পক্ষীর দল, ঝাঁক বাঁধিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। আসন্ন ঝটিকার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানব-শিশুর মতই লক্ষ্যহীন তাহাদের চঞ্চল গতি! বকের দল শাদা ডানা মেলিয়া ক্লান্তভাবে জলার ধারেই জটলা পাকাইতেছিল, সেই তাহাদের নিরাপদ আশ্রয়! পশ্চিম আকাশের প্রান্তে তখনও সূর্য্যাস্তের ম্লান আভাটুকু সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। বৃক্ষপত্রে করুণ মর্ম্মর-ধ্বনি, এবং দেবদারু ও পনস্ বৃক্ষের শিরে বাতাসের রুদ্ধ আস্ফালন শুনিতে শুনিতে আমি সোজা পথ ছাড়িয়া, আগের পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি নয় ঘটিকা! বাতাসের বেগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল! বাহিরে গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জন! দশটার সময় ঝটিকা আরম্ভ হইল।

মধ্য রাত্রি! এমন প্রলয়-ঝটিকা আমার জীবনে আমি এই প্রথম দেখিলাম!

ওকের জানালা দেওয়া আমার ছোট ঘর খানিতে বসিয়া প্রলয় রজনীর তাণ্ডব নৃত্য

আমি দুরুদুরু বক্ষে অনুভব করিতেছিলাম। জানালা সার্শীর উপর চটপট্ শব্দে পাথরের কুচা ও কঙ্কর উড়িয়া পড়িতেছিল। বাতাসের সোঁ সোঁ, গোঁ গোঁ শব্দ যেন শরবিদ্ধ উন্মত্ত বন্য জন্তুর গর্জ্জন ধ্বনির মতই শুনাইতেছিল। সৈকতোপবিষ্ট ভয় কাতর নিশাচরী পক্ষীর দল ঝট্‌পট করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, বজ্রের ভীষণ শব্দের সহিত ভীত সমুদ্র-পক্ষীর সকরুণ ক্ষীণ ক্রন্দন-ধ্বনি মিশিয়া, জগতে এক বিষম বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

বাহিরে প্রকৃতির অনাবৃত প্রাঙ্গণ-তলে নিত্যকালের যে মহান ধ্বনি অনাদি-কাল হইতে মানব-অন্তরে বাজিতেছিল, আজ মৃত্যু নিশার বিচিত্র সমবেত বাদ্য-ধ্বনিতে মিশ্রিত হইয়া তাহাও যেন ডুবিয়া গিয়াছে।

জানালাটা খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিলাম, সজোর বাতাসে কতকগুলা সমুদ্রের গাঁজলা আর একটা ভগ্ন ঝাউয়ের শাখা বেগে কক্ষ-নিম্নে আসিয়া পড়িল। কঙ্করাঘাতে আহত চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই প্রাণপণ শক্তিতে আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জনের সহিত মধ্যে মধ্যে তখন বিদ্যুৎ হানিতেছিল। ঝড়ের গর্জ্জনে তরঙ্গের আস্ফালনে বাহিরের সকল শব্দই ডুবিয়া যাইতেছিল।

বাবা ও এস্‌থার তাঁহাদের নিজ নিজ শয়ন-কক্ষে! ঘুমাইয়াছেন কি? আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকটে চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে দেখিতেছিলাম,—প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য,—আর ভাবিতেছিলাম এই মৃত্যু-রজনীর ভীষণতার দিকে চাহিয়া এ সময় গেব্রিয়েল কি করিতেছে? আর সেই বৃদ্ধ,—অকারণ-ভীত সংশয়াকুল চিত্ত ক্লুমবার-স্বামী? প্রকৃতির এই সৃষ্টি-সংহারক ভীষণতাকে কি তিনি আপনার অন্তরের বিপদ সম্ভাবনার সহিত মিলাইয়া কোন আসন্ন বিপৎপাতের কল্পনায় একেবারে দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পড়েন নাই? মধ্যস্থলে আর দুইটি দিবা-রাত্রি আটচল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধান, তাহার পরেই নবীন সূর্য্যালোকে আবার নব জগতে প্রবেশ-লাভ। এই ঝটিকার অবসানে আবার সূর্য্যোদয় হইবে, আবার ধরণী বর্ণে গন্ধে হাস্যে উৎসবে মুখরিত পুলকিত হইয়া উঠিবে, অন্ধকারের পর আলোক, জীবনের পর মৃত্যু, দুঃখের পর সুখ কি বিচিত্র এই লীলা, আর কি বৈচিত্র্যপূর্ণ এই সৃষ্টি!

জেনারেল আশঙ্কা করিয়াছেন, ৫ই অক্টোবর তাঁহার অনিশ্চিত ভাগ্য-রহস্যের নিশ্চিৎ সিদ্ধান্ত ঘটিয়া যাইবে! এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ তাঁহার অন্তরাত্মাকে কতখানি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কি ভাবিতেছেন—এই সহসা-আগত ঝটিকার সহিত তাঁহার জটিল ভাগ্য সূত্রের কোন্ সূক্ষ্ম অংশ জড়িত হইয়া রহিয়াছে!

এই সব সত্য মিথ্যা বাস্তব অবাস্তব বিষয়, এবং আরও অনেক অবান্তর বিষয়ের চিন্তা আমার আলোড়িত মস্তিষ্কের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। অগ্নিকুণ্ডের কাষ্ঠ-খণ্ডগুলা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল,—সেই নির্ব্বাপিত বহ্নি-পীতধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর ভগ্নাবশেষ সিগারটা—নিক্ষেপ করিয়া

আলস্য ত্যাগ করিয়া শয়নের জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা বা তাহারও কম সময় আমি ঘুমাইয়াছিলাম। সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কে যেন সজোরে আমার ঘাড়ে ঠেলা দিয়া ডাকিতেছিল "জ্যাক্! জ্যাক্!"

রাত্রির অন্ধকারে, ঘুমের ঘোরেও বুঝিতে পারিলাম, বাবা নিজেই ডাকিতেছিলেন। তাঁহার স্খলিত বেশ-বাসে এবং উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বিশেষ কোন দুর্ঘটনারই আভাষ পাইলাম। তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বাবা ব্যস্তভাবে ত্বরিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "জ্যাক্, চল, চল, একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ ঐ উপসাগরের চড়ায় এসে আট্‌কে গেছে—লোকগুলা বোধ হয় সব মারা যাবে। এস এস! আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি তাদের কোন কাজে লাগ্‌তে পারি।"

অন্ধকারে হাতড়াইয়া যতগুলা পাইলাম শুষ্ক বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ধড়াস্ করিয়া একটা ভয়ানক শব্দ হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের সহিত সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনা গেল। বাবা ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঐ শোন গো, ঐ —ঐ—আবার তারা সাহায্য প্রার্থনার জন্য কামান ছুড়্‌চে—হায়, হায়—হতভাগারা!—জেমিসন আর এক দল নাবিকেরা নীচে রয়েচে। তোমার ওয়াটার প্রুফ্?—গ্লেন-গারী টুপিটা? এ সব—হাতের কাছে গুছিয়ে রাখ্‌তে হয়—? চল, চল, আমাদের এক মিনিটের দেরীর জন্য তাদের কত—অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

উত্তেজনা ও অধীরতায় বাবা যেন সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাকে শান্ত করিবার প্রয়াস বৃথা—বরং গণ্ডগোলে সময় নষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা ছুটিয়াই চলিয়া ছিলাম। ব্রাঙ্কসামারের অপর চারজন দয়ালু লোকও আমাদের সাহায্যের জন্য সঙ্গে আসিয়াছিল।

ঝড় না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। বাতাসের সহিত তটাহত সমুদ্র-তরঙ্গের গর্জ্জন-ধ্বনি মিলিত হইয়া যেন একটা পৈশাচিক চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। বাতাসের বেগ এত বেশী যে আমরা স্কন্ধ গুটাইয়া তাহার বেগ সহ্য করিয়া দৌড়িতেছিলাম, বালুকা ও কঙ্করাঘাতে অনেক সময় দৃষ্টি-শক্তি অবধি হারাইয়া যাইতেছিল।

আকাশে ছিন্নমেঘ অস্পষ্ট নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে আমরা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ সফেন তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। বাতাসের ঝট্‌কায় হাঁটু পর্য্যন্ত ঠিকরাণো লতা-পাতায় জড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পতন অনিবার্য্য করিয়া তুলিতেছিল।

একটা সকরুণ সাহায্য-প্রার্থনার সহিত ভয়-মিশ্রিত ক্ষীণ ক্রন্দন আমার কর্ণে যেন বহুদূর হইতে বায়ুস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছিল। ঝড়ের, সমুদ্রের, মেঘের,—সমস্ত প্রকৃতির সেই বিশ্বব্যাপী সংহার কোলাহলের ভিতর দিয়া মানবের ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ,—কত টুকুই বা তাহার বল! (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সুরূপা দেবী।



প্রতিচ্ছায়া
(ফটোগ্রাফ হইতে)

অবনত জাতি

(প্রতিবাদ)

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় তাঁহার অবনত জাতি শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রহাচার্য্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক কথার অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণেতর-জাতিরা শুধু দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ কেন, যে কোন ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকারী নহেন। তিনি যে উল্লিখিত প্রবন্ধে কেবল শাস্ত্রবিধির অমর্য্যাদা করিয়াছেন তাহা নহে, বিবেচনা না করিয়া কোন কোন কথা লেখায় ভব্যতারও সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আসাম প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারস্থ প্রদেশ সমূহে যে আমাদের সমশ্রেণীস্থ কোন ব্রাহ্মণের বাস আছে তাহা আমাদের পরিজ্ঞাত নাই। তবে বাঙ্গালা দেশে গ্রহাচার্য্য-গণ চিরকালই এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত। বাঙ্গালার দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায় অনন্তকাল হইতে বংশপরম্পরাক্রমে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনা, শিবপূজা, নারায়ণ পূজা এবং দৈব-পৈত্র্য যে সকল কর্ম্ম আছে যথাবিধি তৎসমস্তেরই অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। জ্যোতিষী পণ্ডিতরূপে ইঁহারা হিন্দুসমাজের যাবতীয় বৈধকার্য্যের বিধিব্যবস্থা প্রদান করেন। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণ গৃহে গ্রহযাগাদি বেদোক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। এই বাঙ্গালা দেশের এক চতুর্থাংশ গ্রহাচার্য্য প্রাচীন রাজা ভূম্যধিকারীদের প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ভূমি ভোগ করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় বৈধ ব্যাপারে নিমন্ত্রিত ও সম্মানিত হন। বিহার প্রদেশে এই শ্রেণীর যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহারা কনৌজিয়া, গৌড় প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণের পুরোহিত।

সেনমহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন "সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গণকদিগকে গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণরূপে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।" এই কথাটী সম্পূর্ণ অসত্য। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন যে গবর্ণমেণ্ট "ভারতে মনুষ্যগণনার" সৃষ্টি হইতে বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রহাচার্য্যসম্প্রদায়কে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করিয়া আসিতেছেন। এবং বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে গ্রহাচার্য্যদিগকে চতুর্থস্থান প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক (পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য) গ্রহাচার্য্য, অগ্রদানী, বর্ণ-যাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা গ্রহণ করা হইত। গত মনুষ্যগণনায় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যগণনায় সেরূপ সংখ্যা গ্রহণ করা হয় নাই। বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই "ব্রাহ্মণ" এই শিরোনাম দিয়া একত্র গণনা করা হইয়াছে।

তার পর সেনমহাশয়ের আর একটী ভ্রম এই যে, তিনি লিখিয়াছেন "গ্রহাচার্য্যগণ খাঁটী ব্রাহ্মণ হইবার জন্য চীৎকার করিতেছেন।" একথা তিনি কি প্রমাণ-বলে জানিলেন? কই বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রহাচার্য্য যে কাহারও কাছে গিয়া ঐরূপ চীৎকার করিয়াছেন এ সংবাদ ত আমরা পাই নাই। তিনি "খাঁটী ব্রাহ্মণ" কাহাকে বলেন? শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে যিনি যথাবিধি উপনয়ন সংস্কারের পর বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সমাবর্ত্তনান্তে যথাশাস্ত্র দারপরিগ্রহ করিয়া প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই "খাঁটী ব্রাহ্মণ"। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ যেরূপ পালন করেন, গ্রহাচার্য্যগণও তদ্রূপই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে শাস্ত্রে কোন বিশেষ নামযুক্ত ব্রাহ্মণ "খাঁটী ব্রাহ্মণ" বলিয়া উক্ত হন নাই। বেদোক্ত নিষেকাদি শ্মশানান্ত বিধি যাঁহার সম্বন্ধে যথাযথ প্রতিপালিত হয় তিনিই খাঁটী ব্রাহ্মণ।

তার পর সেনমহাশয় আচার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া যে অশ্রুতপূর্ব্ব বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন উহা আলোচনার অযোগ্য। তিনি জানেন

না যে বাঙ্গালাদেশে যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই তখন গ্রহাচার্য্যগণই প্রাণপাত করিয়া এদেশে বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার ও রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই এদেশের গুরু ও পুরোহিত ছিলেন। কালক্রমে গ্রহাচার্য্যগণের পৃষ্ঠপোষক শশাঙ্কবংশীয় রাজগণের শাসন বিলুপ্ত হইল, ইঁহারাও হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। নবাগত রাজার রাজ্যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিলে বাঙ্গালীর দানগ্রহণে প্রত্যবায়গ্রস্ত বলিয়া স্বদেশে স্বজাতীয়দের মধ্যে স্থান পাইলেন না। ফিরিয়া-আসিয়া বাঙ্গালাদেশে বাস করিলেন। রাজার সমাদরে তাঁহারা বাঙ্গালার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। সেই ক্ষমতাপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও এই হীনপ্রভ সম্প্রদায়ের গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং ইহাদিগেরই অধিকাংশকে কুক্ষিগত করিয়া সমাজ বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা রাজার নিকট নিজের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এদেশের হীনপ্রভ ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত দূরে রাখিলেন। সুতরাং "যাহারে দেবতায় করে হেলা তাহারে রাখালে মারে ঢেলা" এই নীতি-বলে ইঁহাদিগের শিষ্য, যজমান সমস্তই হস্তচ্যুত হইল। সুতরাং ইঁহারা ক্রমে নিস্তেজ ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। কাজেই এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এখন দীনদশাপন্ন। গ্রহাচার্য্যগণ অর্থহীন হইয়াছেন তজ্জন্য বড় কাজ করিতে পারেন না। যাঁহারা পারেন, তাঁহাদিগকে কেহ উপেক্ষা করেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের তোষাখানার প্রথম দেওয়ান বেলুড়নিবাসী ৺ রামচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে প্রায় ৫০০ শত (পাঁচ শত) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমবেত হন এবং তিনি সমাজ শুদ্ধ সমস্ত ব্রাহ্মণকে ফলাহার ও ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহার পরও অনেক ক্রিয়া কর্ম্মাদিতে অধ্যাপকগণ ও সামাজিক ব্রাহ্মণগণ যোগদান করিয়া আসিতেছেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহিত আমাদের যে কোনও পার্থক্য আছে, তাহা ব্যবহার দ্বারা বুঝিতে দেন না। তবে সমাজে ঈর্ষাপরায়ণ নষ্টবুদ্ধি লোকেরও অভাব নাই। তাহারা শুধু আমাদের সহিত কেন অনেকের প্রতিই কোনও না কোন প্রসঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত সেনমহাশয় গ্রহাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে যেন অকারণ লেখনী পরিচালনা না করেন। আমরা অযথা কলহের পক্ষপাতী নহি, তজ্জন্য সরলভাবে সত্যঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র উপাধ্যায়।

রত্নাবলী নাটিকা

(সিলভ্যাঁ লেভির ফরাসী হইতে)

১। বৎস-রাজার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, একটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অবগত হইলেন যে, সিংহলরাজ-দুহিতা রত্নাবলী যাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন তিনি সার্ব্বভৌম নৃপতি হইবেন; কিন্তু বৎস-রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার পক্ষে একটা বিষম বাধা আছে। বৎস-রাজা স্বীয় মহিষী বাসবদত্তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত; তাই মন্ত্রীর ভয় হইল পাছে এই বাঞ্ছনীয় বিবাহে মহিষী বিরোধী হন। মন্ত্রী একটা ফিকির ঠাওরাইলেন। ফিকিরটিতে যেমন বেশ একটু নিপুণতা আছে, তেমনি একটু জটিল ধরণের। তিনি বৎস-রাজার জন্য রত্নাবলীর পিতার নিকট, রত্নাবলীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ে সিংহল-রাজ এই বিবাহে সম্মতি দিলেন এবং

বৎস-রাজার নিকট স্বীয় দুহিতাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রার সময় একটা ঝড় উঠিল এবং কূলের সন্নিকটে অর্ণবপোত ভগ্ন হইল। কোন অপরিচিতের হস্তে, জলমগ্না রাজকুমারী উদ্ধার পাইয়া বৎস-রাজার অন্তঃপুরে নীত হইলেন এবং একজন সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা কুমারী বলিয়া পরিচিত হইয়া সেখানে "সাগরিকা" নাম প্রাপ্ত হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও ও উচ্চকুলোচিত ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে রাজার দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্তোৎসব সমাগত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গেল। অন্তঃপুরের ক্রীড়ামোদে যোগ দিবার জন্য বৎস-রাজা বিদূষক বসন্তককে সঙ্গে লইয়া মদনোদ্যানে অবতরণ করিলেন। মহিষীর দুই পরিচারিকা বসন্তঋতুর গান ও প্রেমের গান গায়িতে গায়িতে প্রবেশ করিল। তাহার পর তাহারা রাজাকে জ্ঞাপন করিল যে, কন্দর্পদেবের পূজার জন্য মহিষী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৎস-রাজ আসিয়া বাসবদত্তার সহিত মিলিত হইলেন। পরিচারিকাদিগের মধ্যে সাগরিকাকে দেখিতে পাইয়া একটা উড়িয়া-যাওয়া সারিকার সন্ধান করিবার ছুতা করিয়া মহিষী তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইলেন। রাজদম্পতি যথাবিধানে কামদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাগরিকা বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাদের পূজার্চ্চনা দেখিতেছিল; সে রাজাকে সাক্ষাৎ কন্দর্প মনে করিয়া দূর হইতে মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিল। এমন সময় একজন বৈতালিক সন্ধ্যার সমাগম জ্ঞাপন করিল, তখন সাগরিকা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল, সে উদয়ন রাজাকেই দেখিয়াছে,—যে-উদয়ন-রাজার সহিত পিতা তাহার বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

২। দুইজন পরিচারিকা রাজবাড়ীর কথা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতেছিল। তাহা হইতে দর্শকবৃন্দ জানিতে পারিল, বৎস-রাজ অকালে ফুল ফুটাইবার কৌশল একজন সন্ন্যাসীর নিকট শিখিয়াছেন, এবং তাহা কাজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরে সাগরিকা প্রবেশ করিল। সাগরিকা রাজার চিত্র আঁকিতে ব্যাপৃত। তাহার সখি সুসঙ্গতা আসিয়া সেই চিত্রপটে রাজার পাশে সাগরিকার চিত্র আঁকিল। সাগরিকা তাহার অন্তরের গোপনীয় প্রেমের কথা তাহার সখির নিকট খুলিয়া বলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটা তুমুল কোলাহল শুনিয়া তাহারা পলায়ন করিল। একটা বানর পিঞ্জর হইতে পলায়ন করায়, অন্তঃপুরিকাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বসুলক্ষ্মী ভয় পাইয়াছে। যে সারিকাকে মহিষী সাগরিকার হাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সারিকা এই গোলযোগে উড়িয়া গিয়া কদলী-কুঞ্জের এক বৃক্ষের উপর বসিয়াছে। ঠিক্ এই সময় রাজা বিদূষককে সঙ্গে হইয়া কদলী-কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। সারিকা দুই সখীর কথাবার্ত্তা আবৃত্তি করিতেছে শুনিতে পাইলেন এবং একটি চিত্রপট দেখিতে পাইলেন, তাহাতে দুই ব্যক্তির চিত্র পাশা-পাশি চিত্রিত রহিয়াছে। সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সেই চিত্রপটটি লইয়া যাইবার জন্য

সেখানে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল। অপরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অন্তরালে থাকিয়া রাজার মদনপীড়িত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসবাক্য সকল শুনিতে লাগিল। রাজা সাগরিকার নিকটে গিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার জ্বলন্ত বাসনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ প্রেমালাপ চলিতেছে এমন সময়ে বাসবদত্তা প্রবেশ করিয়া সেই প্রেমালাপে ব্যাঘাত জন্মাইলেন। মহিষী চিত্রপটটি দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে সাগরিকার চিত্রটি চিনিতে পারিয়া, মুখে রোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া, এবং রাজার সান্ত্বনাবাক্যে কোন উত্তর না দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ("মালাবিকা"র তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।)

৩। সাগরিকার সহিত যাহাতে আর একবার সাক্ষাৎকার ঘটে তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য রাজা বিদূষকের উপর ভার দিয়াছেন। বসন্তক সুসঙ্গতার সহিত মিলিয়া এমন একটা ফন্দি করিল যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না হয়। সাগরিকা রাণীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং সুসঙ্গতা রাণীর পরিচারিকার বেশ পরিধান করিয়া রাজার নিকট আসিবে স্থির হইল। কিন্তু তাহাদের এই ফন্দিটা কাজে পরিণত না হইতে হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং রাণী ইহা জানিতে পারিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে বাসবদত্তা সঙ্কেত-স্থানে গমন করিয়া সাগরিকার সহিত রাজার প্রেমালাপ শুনিতে পাইলেন। রাণী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া রাজাকে যার-পর-নাই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রাণী ক্ষমা করিলেন না। রাজা একাকী থাকিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সাগরিকা প্রবেশ করিল। রাজাকে দর্শন করিবার পূর্ব্বেই সাগরিকা রাজার বিলাপ শুনিতে পাইয়াছিল। চির বিষাদময় হতভাগ্য জীবনে ক্লান্ত হইয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে বিদূষক তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বেশসাদৃশ্যে প্রতারিত হইয়া তাহাকে বাসবদত্তা ঠাওরাইল। রাজা স্বকীয় চপলতাই রাণীর মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া, রাণীকে বাঁচাইবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু সাগরিকাকে চিনিতে পারিয়া আবার সেই নূতন প্রেমে গা ঢালিয়া দিলেন। এদিকে বাসবদত্তা, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, সাগরিকার সহিত রাজার প্রেমালাপ চলিতেছে। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি সাগরিকা ও বিদূষককে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। ("মালবিকার" তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

৪। রাণী বিদূষককে ছাড়িয়া দিলেন। সমস্ত দণ্ড সাগরিকাই ভোগ করিবে। সাগরিকা কারাগার হইতে বিদূষককে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনার মূল্যবান কণ্ঠমালাটি পাঠাইয়া দিল। রাজা বাসবদত্তার দয়া উদ্রেক করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হইল। এই সময়ে রাজা একটা বিজয়-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রুমণ্বৎ কোশলদিগের উপর জয়লাভ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন।

এই সময়ে একজন যাদুকর আসিয়া রাজ

দর্শন প্রার্থনা করিল এবং রাজদম্পতীর নিকট তাহার গুণপনা দেখাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। রাজা ও রাণীর সমক্ষে যাদুকরের ক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে এমন সময়ে সিংহল-রাজের ভৃত্যদ্বয় বাভ্রব্য ও বসুমতীর আগমনে ক্রীড়া থামিয়া গেল। রত্নাবলী ভগ্নপোত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে তাহারা এই সংবাদ রাজাকে নিবেদন করিল। এই সংবাদে সকলে যার-পর-নাই শোকগ্রস্ত হইয়াছে, এমন সময়ে আর একদিক হইতে দারুণ হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হওয়ায় সকলের আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হইল। অন্তঃপুরে আগুন লাগিয়াছে। বাসবদত্তা স্বকীয় নিষ্ঠুরতার জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন এবং সাগরিকাকে বাঁচাইবার জন্য রাজাকে অনুনয় করিলেন। বৎস-রাজ জ্বলন্ত প্রাসাদে প্রবেশ করিরা মূর্চ্ছিতা সাগরিকাকে লইয়া আসিলেন। সহসা আগুন নিবিয়া গেল। ইহা যাদুকরের একটা ভোজবাজি বই আর কিছুই নহে। বাভ্রব্য ও বসুমতী প্রথমে রত্নাবলীর কণ্ঠমালা চিনিতে পারিল, তাহার পর রত্নাবলীকেও চিনিল। বাসবদত্তা সাগরিকাকে ভগিনী বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং তাহার সহিত রাজার বিবাহ দিলেন। রাজা যৌগন্ধরায়ণকে জিজ্ঞাসা করায়, সৌগন্ধরায়ণ সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। রত্নাবলীর জলমগ্ন হইবার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, যাদুকরের গৃহদাহ-ক্রীড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তাঁহারই কৌশল। এই মহৎ উপকারের জন্য বৎস-রাজ স্বীয় মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং নিজ শুভ অদৃষ্টকেও ধন্যবাদ দিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটি গান

(রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি হইতে)

পাখী গাইত নিতি হৃদয়-খোলা খেয়ালে খুসী,
ও সে মেল্‌ত পাখা মেঘের সীমানায়;
আহা কোন্ ক্ষণে প্রেম সঙ্গ নিলে কোন্ আশা পুষি'
পাখী জান্‌লে নাক' হায়!
আজ সে পাখীর স্বস্তি নাহি আর,—
হারিয়েছে নীড়,—হিয়ায় হাহাকার।
আর সে খেয়াল নাইগো উড়িবার,—
গগন-বিহার বন্ধ আজি তার।
বন্দী সে আজ প্রেমের বন্ধনে,
তবে চরম কথা মরণ-ক্রন্দনে
নিক্ সে ক'য়ে, হায়!
আজ ফুরিয়েছে তার গগন-বিহার
হারিয়েছে কুলায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সার্দ্দুর নাট্য রচনা

[জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার সার্দ্দুর মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে নাট্য এবং নাট্যশালা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই এ স্থলে সঙ্কলিত হইল। সার্দ্দু একাধারে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, উত্তম রঙ্গভূমি সজ্জাকর, এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন।]

যাঁহার নাট্যাভিনয় দর্শনে পুরাতন ও নূতন ভূমণ্ডলের সহস্র সহস্র দর্শক বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান বোধ হয় শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক হইবে। বহু চিত্রকর সার্দ্দুর কোমল মধুর ভাবব্যঞ্জক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নয়নদ্বয়কে চিত্রিত করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহাকে একাদশ লুই হইতে ভলটেয়ার পর্য্যন্ত বহু বিখ্যাত লোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গ্রীষ্মের কয়েকমাস ফ্রান্সের একটী অতি মনোহর অথচ অজ্ঞাত পল্লীভবনে বাস করিতেন। উজ্জ্বল বিচিত্র ভাবে সজ্জিত কক্ষে বসিয়া সার্দ্দু তাঁহার নাটকাবলী রচনা করিতেন। বিগত ৫৪ বৎসর মধ্যে ইনি নাটক এবং অন্যান্য প্রকারের প্রায় ৭০ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ইনি কি প্রকার পরিশ্রম করিতেন।

এখন সার্দ্দুর নিজের কথাতেই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এবং কিরূপ ভাবে নাটক সমূহ রচিত হইত তাহা বলা যাউক।

"কেমন করিয়া আমি নাটক রচনা করি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। হাস্যরসাত্মক নাট্য এবং সাধারণ নাট্য রচনায় সাধারণতঃ এই ভাবে অগ্রসর হই। প্রথমতঃ আমি ছোট গল্পাকারে নাট্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করি। যদিও আমি নাট্য সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছি তথাপি আমি উপন্যাসরচয়িতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। Balzac আমার নিকট সেক্সপিয়ারের ন্যায় প্রিয়। আমি সাধারণতঃ একাসনে বসিয়া এক অঙ্ক লিখিয়া ফেলি। পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় সমস্ত দৃশ্যই লিখিয়া সেক্রেটারীর নিকট দিই। কখনও যতবার সন্তুষ্ট না হই ততবার এমন কি দশবারও একটী অঙ্ককে পরিবর্ত্তিত করি। যখন আমি লিখি তখন প্রত্যেক চরিত্র এবং তাহাদের সামান্য কার্য্যপ্রণালীও আমার নয়ন সমক্ষে ভাসিতে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক নাট্যকারই তাঁহাদের নিজ নিজ মতানুসারে নাট্য রচনা করিয়া থাকেন। আমার নিকট প্রতিদৃশ্যই একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান্ হয় এবং আমার প্রতি চরিত্রই মানসে ভাসিতে থাকে।"

"দিবসের কোন্ সময়ে কার্য্য করা আপনি ভাল বিবেচনা করেন?"

"আমি সর্ব্বদাই প্রাতে লিখিয়া থাকি। রজনীর কার্য্যে আমি বিশ্বাস করি না, মস্তিষ্ক সে সময় অতিরিক্ত উত্তেজিত কিম্বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। একখানি নাটক রচনা করিতে আমার তিন মাস হইতে চারিমাস সময় লাগে। এই প্রকার পরিশ্রমের কাজ আমি কেবল পল্লীতেই করিতে পারি। কারণ সে স্থানেই আমি প্রকৃত শান্তি পাই। যখন মার্লিতে বাস করি তখন তিনটা পর্য্যন্ত আমি কোন দর্শকের সহিত সাক্ষাৎ করি না, সেই সময় কিছু দিনের মত আমার রচনা একরূপ শেষ হইয়া যায়। তার পরে বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ আহ্লাদে রত হই।"

"আপনি কি নাটকের ঘটনাবলী ইতিহাস ও বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করেন—না সাধারণতঃ যাহা আপনার মনে উদিত হয় তাহারই সাহায্যে রচনা করেন?"

"ইতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনা এবং আমার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ একটী ঘটনা সমস্ত বিষয় হইতেই আমি আমার রচনার উপাদান সংগ্রহ করি। কার্য্যপরম্পরা ঘটনাবৈচিত্র্য এ সমুদায়ই আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি, একমাত্র প্রতিভার উপর আমার তেমন বিশ্বাস নাই। কারণ শুধু প্রতিভা দ্বারাই এমন জিনিস প্রস্তুত হয় না যাহা চিরকাল লোকমনোরঞ্জনে সমর্থ হইতে পারে। যখনই আমি একটা সুন্দর কল্পনা করি তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তৎপরে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতে—ক্রমে ক্রমে আমার অজ্ঞাতসারে নাট্যরচনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আইসে। অবশ্য এরূপ ঘটনা শুধু ঐতিহাসিক রচনাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। মনে করুন আজ আমি একটী সুন্দর নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া লইলাম। নামটা টুকিয়া রাখিয়া দিলাম। তার পর ক্রমে ক্রমে কেবল নায়কের বিষয় নহে,—তাহার বাসস্থান, কাহিনী সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পরে কার্য্যে ব্রতী হইলাম।"

"আপনি কি রচনায় ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন—না কবিস্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া থাকেন?"

"আমি সামান্য ঘটনাতেও ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করি না, এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকি। আমার মনে হয় আমি প্রকৃতিগত ঐতিহাসিক নাটককার নহি। বাল্যকাল হইতেই আমি অসীম আগ্রহ সহকারে ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি। অতীতের ঘটনাবলী আমার নিকট সজীব ভাবেই প্রতিভাত হয়।

ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবার পূর্ব্বে আমি সেই সময়ের সমস্ত পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করি। আমার উত্তম স্মৃতিশক্তি আছে। তজ্জন্য আমি সৌভাগ্যবান্। নাটক প্রকাশিত হওয়ার বহুদিন পরেও কোথা হইতে কোন্ ঘটনা গৃহীত ও পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি। মৎপ্রণীত 'Theodora' অভিনীত হইলে সমালোচক বর্গ আমার অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া আপত্তি করিলেন যে সেকালে এখনকার সভ্যযুগের অস্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হইত না। আমি যখন বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের এই ভুলের প্রতিবাদ করিলাম তখন সমালোচকগণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।"

"আপনার নাটক অভিনয় হওয়া সম্বন্ধে

আপনিই বোধ হয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন?"

"নিশ্চয়ই। সমস্ত দৃশ্যই আমি নিজে কিম্বা আমার বিশেষ তত্ত্বাবধানে সজ্জিত করাই।—আমি প্রথম নেপোলিয়ানের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, সমস্ত জীবন ভরিয়া তাহার জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছি।"

"আপনি বোধ হয় বিপ্লব সময়ের ইতিহাস বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন?"

"পুরাতন প্যারিসের ও বিপ্লব সময়ের ইতিহাস আমি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছি। স্থাপত্য শিল্পের উপরও আমার খুব অনুরাগ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি 'রবাণ পিয়ার্সের' আবাসস্থান আবিষ্কার করি।"

"আমার বোধ হয় আপনি সাধারণ তন্ত্রকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, নিজেকেও বোধ হয় সাধারণতন্ত্রী মনে করেন?"

"না মহাশয়, আমি সাধারণতন্ত্র এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখি না।"

"রঙ্গমঞ্চের বাস্তবপ্রণালী সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"এই সম্বন্ধে বহু বাজে কথা শোনা যায়। আধুনিক নাটককারগণ মনে করেন তাঁহারাই একথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমি একজন Stage Realist ছিলাম, Nos Intimes এ আমিই প্রথমে রঙ্গমঞ্চের উপরে (Love scene) প্রেমদৃশ্যের অভিনয় প্রদর্শন করাই। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সমালোচক আপত্তি করিলেন; আমি তাহাকে বলিলাম—আপনি দেখুন কেমন ভাবে আমি ইহার অভিনয় করাই। সমস্ত প্যারিসব্যাপী একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল, অভিনয় দিনে রঙ্গমঞ্চে তিলধারণেরও স্থান রহিল না—আজকাল ইহা অতি সাধারণ ঘটনা বলিয়াই প্রতীয়মান্ হয়। বাস্তবিকই তৎকালে রঙ্গমঞ্চে ঘটনাবলী অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে সজ্জিত হইত। এখন আর হত্যাদ্বারা নাট্যশালাকে কলঙ্কিত করা হয় না, সে প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা দৃশ্যান্তরালে সংঘটিত হয়। Racine অথবা Corneille কখনও রঙ্গমঞ্চে হত্যা দেখান নাই। যখন 'Thermidor' অভিনীত হইতেছিল তখন রঙ্গমঞ্চে—গিলোটিনে মৃত ব্যক্তি বহনের গাড়ী ব্যবহৃত হয় নাই।

আমি নাট্যশালার বহুক্ষুদ্র অপ্রীতিকর ঘটনাবলী অপসারিত করিয়াছি। আমিই প্রথমে প্রকৃত আসবার পত্রাদি রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করি, এবং আমারই অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে তামাক ও চুরুট পান করে।"

"আপনি বোধ হয় পোষাকপরিচ্ছদ ও দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন?"

"নিশ্চয়ই, এ সমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার নাটকের প্রত্যেক চরিত্রঅভিনেতার পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখি। রঙ্গমঞ্চের উপর আমি যেমন জিনিস রাখিতে চাহি—পূর্ব্ব হইতেই তাহার পরিকল্পনা করিয়া রাখি। প্রত্যেক দৃশ্য কেমন হইবে এমন কি চেয়ার ও সোফাখানি পর্য্যন্ত কেমনভাবে বসিবে তাহা স্থির করিয়া রাখি। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে এ সমস্ত ঠিক করা অত্যন্ত কষ্টকর।"

এস্থলে বলা আবশ্যক, সার্দ্দু জগদ্বিখ্যাত ষ্টেজ্ম্যানেজার ছিলেন। কোন প্রসিদ্ধ নাট্যকারই রঙ্গমঞ্চের কার্য্যে ইঁহার সমান ছিলেন না।

"যখন আমার নাটকের রিহার্সেল আরম্ভ হয়—তখন আমি থিয়েটারেই বাস করি। যাহাতে নাটকখানি উত্তমরূপে অভিনীত হইতে পারে মনে প্রাণে তাহারই চিন্তা করি। নাট্যের প্রত্যেক অভিনেতার কার্য্যপ্রণালী, স্বরভঙ্গিমা এ সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই আমি স্থির করিয়া দিই। যত বড় অভিনেতাই হোন্ না কেন, কেমন করিয়া কোন্কথা বলিতে হইবে আমি সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। নাটককার নিজে সঙ্গে থাকিয়া যদি অভিনেতাকে শিক্ষা দেন তবে অভিনয় অতি সুচারুভাবে নির্ব্বাহিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক নাটককারই জন্মগত সুদক্ষ ষ্টেজম্যানেজার নহেন। বহু বড় নাটককার জানেন না কেমনভাবে তাহাদের নাটক ষ্টেজে নামাইতে হয়, সে কার্য্য তাঁহারা অপরের সাহায্যে সম্পাদন করেন। আমার বন্ধুগণ বলিয়া থাকেন যে আমি প্রকৃতিগত একজন অভিনেতা। আমি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে কোন্ দৃশ্য কেমন ভাবে অভিনীত হইবে, কোন্ কথা কেমনভাবে উচ্চারিত হইবে তাহা দেখাইতে ভীত হই না।"

"আপনি বোধ করি কোন হাস্যরসিক অভিনেতাকে তাহাদের স্বেচ্ছা অনুসারে আপনার চরিত্রের অভিনয় করিতে দেন না?"

"সে আমি যেরূপ অভিনেতার সহিত কার্য্য করি তাহার উপরেই নির্ভর করে। তবে আমার কথার সহিত অতিরিক্ত ফাজলামি সংযুক্ত হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। ম্যাঃ রেজানি অথবা সারা বার্ণার্ড তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কিছু করিলে নাটকীয় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হওয়া ব্যতীত ক্ষুণ্ণ হয় না।"

"আপনি কোন নূতন নাটক রচনার সময় কোন অভিনেতার জন্য বিশেষভাবে কোন চরিত্রের সৃষ্টি করেন কি? যখন আপনি La Tosca লেখেন তখন কি সারা বার্ণার্ডের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিয়াছিলেন।

"না সেরূপভাবে আমি কোনও চরিত্র সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঠিক যে একজন ভাল অভিনেতার সাহায্যে নাটক খুব উৎড়াইয়া যায়। কিন্তু আমি সামান্য অভিনেতার প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখি—সমবেত শক্তি ব্যতিরেকে একখানি নাটক কখনও ভালরূপে অভিনীত হইতে পারে না। La Tosca এবং Fedora উভয় চরিত্রই আমি কোন বিশেষ অভিনেত্রীর জন্য লিখি নাই—তবে অভিনেত্রীগণই এ দুই চরিত্রকে তাঁহাদের নিজের করিয়া লইয়াছেন।"

"রমণী এবং পুরুষ—কমেডিয়ান হিসাবে কাহাকে আপনি উচ্চ স্থান প্রদান করেন?"

"রমণীকে নিশ্চয়ই। আমার ধারণা কমেডি অভিনয়ে তাঁহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

"আপনি বোধ হয় ফরাসী দেশীয় Conservatoire সঙ্গীতালয় সমূহকে ভাল বিবেচনা করেন?"

তদুত্তরে সার্দ্দু বলিলেন, "না আমি বরঞ্চ উহাকে ঘৃণা করি। ইহাতে অভিনেতা অভিনেত্রীর কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না, ফরাসী-

দেশের বিখ্যাত অভিনেতাগণের মধ্যে অনেকেই Conservatoire এ শিক্ষিত হন নাই। সেখানে কেহ সামান্য কিছু শিখিতে পারে, কিন্তু বাহির হইয়া দেখে তাহার শিখিবার অনেক বাকী রহিয়া গিয়াছে। শুধু রঙ্গমঞ্চেই প্রকৃত অভিনয় শিক্ষা করা যাইতে পারে। আমি বিশ্বাস করি হাস্যরসের অভিনেতা প্রকৃতিগত, তাহারা তৈরী হয় না।"

"আপনি ইতঃপূর্ব্বে Ballzacএর প্রতি আপনার শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন, আপনি নিজে কি কখনও উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিয়াছেন?"

"না আমি একবার একখানা নভেল লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, উপন্যাস রচনায় ও নাটক রচনায় বেশ প্রভেদ আছে। নাট্যে করুণ, হাস্য, ভয়ানক সমস্ত রসেরই একটা কেন্দ্র আছে। পৃথিবীর যে দৃশ্যসমুদায় মলিন এবং অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহা দেখাইতেই আনন্দ বোধ করি। আমার নাটকে বর্ণিত ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের চিত্রাদি পাইতে আমি সর্ব্বদাই যত্ন লইয়া থাকি। Fedora র প্রত্যেক চরিত্রই এক দিন জীবিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন নাট্য রচনা সামান্য পরিশ্রমেই সম্পাদিত হইতে পারে—এটা তাঁহাদের ভুল। নাটককারকে বহু পরিশ্রমে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়—এই পরিশ্রমের পুরস্কার সহস্র সহস্র দর্শকের হৃদয়োত্থিত আনন্দ কোলাহল।"

সার্দ্দুর নিজের কথাতেই তাঁহার রচনা প্রণালীর সামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম, ভবিষ্যতে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটক সমূহেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা রহিল। সুপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তাঁহার নাট্য ও অভিনয় নামক সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে সর্ব্ব দেশের নাট্য, নাট্যশালা, নাট্যকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতেছেন, তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, আশা আছে তিনিও বিদেশীয় নাট্যকার সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু নূতন কথা শুনাইবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপূর্ণ বাসনা

আসিছে জীবন সন্ধ্যা নিঃশব্দ চরণে
জুড়াইতে অভাগার অনন্ত যাতনা ;—
শুঞ্জনি বিদায় গীতি উঠিছে সঘনে
বক্ষঃ মাঝে ; থেমে গেছে পুলকের বীণা !
ছেয়ে আসে ধীরে ধীরে প্রলয় তিমির
সাঙ্গ কর্ম্ম ; কোলাহল নাহিক ধরায় ;—
চতুর্দ্দিকে নীরবতা উদাস গম্ভীর
ভেঙ্গে আসে আঁখি দুটী অনন্ত নিদ্রায় !
এখনি নিবিবে দীপ, ফুরাইবে সব
কিন্তু হায় ! এখনো যে অপূর্ণ বাসনা ;
অনন্ত তিয়াসা হৃদে, হে প্রাণবল্লভ !
আর কবে অভাগার পূরিবে কামনা।

শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ।

জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহ

(Mark Twainএর বর্ণনা হইতে)

জর্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় সম্মান। ছাত্র কোনও অপরাধ করিলে সাধারণ বিচারালয়ে তাহার বিচার হয় না,—সে বিচার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ। সহরে হয়ত কোনও ছাত্র শান্তিভঙ্গ করিবার অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শান্তি-রক্ষক জানিতে পারিল তাহার গ্রেপ্তারী আসামীটী বিদ্যালয়ের ছাত্র অমনি সে সসম্মানে তাহাকে তিনবার নমস্কার করিয়া—তাহার নাম ধাম বিনীত ভাবে জানিয়া লইয়া অন্যমুখী হইল। জর্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এত সম্মান।

যথাসময়ে ঘটনাটী অবশ্য বিদ্যালয়ে কর্ত্তৃপক্ষদের গোচরীভূত করা হয়—তাঁহারাও অপরাধীকে বিচারানুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন। অপরাধীকে বিচার স্থলে উপস্থিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় না—তাহার অনুপস্থিতিতেই সাধারণতঃ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তারপর বিদ্যালয়ের পুলিশ একদিন হয়ত অপরাধীর দরজায় গিয়া উপস্থিত। সম্মতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া—সে সস্মিত-বদনে বিনয়ের সহিত নিবেদন করে—

"আমি এসেছি—আপনাকে কারাগারে নিয়ে যেতে। অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে এলে বাধিত হ'ব।"

"বটে, তা আমি ত এরূপ প্রত্যাশা করি নাই—আমি কি করেছি বল ত?"

"দু সপ্তাহের কথা—আপনি শহরে শান্তি ভঙ্গ করেছিলেন।"

"ওঃ, মনে হয়েছে। তা সেজন্য আমি বুঝি অভিযুক্ত হয়েছিলাম—আমার বিচার হয়েছে—আমি দণ্ড পেয়েছি?"

"আজ্ঞে, তাই। আপনার দু'দিনের—নির্জ্জন কারাবাস দণ্ড হুকুম হয়েছে।"

"কিন্তু—আমি ত আজ যেতে পারছি না?"

"কেন—তা' কি বলবেন দয়া করে।"

"আমার আজ Engagement আছে একটা।"

"তা হ'লে কাল যেতে পারবেন—বোধ হয়?"

"না, কাল আমার "অপেরা" দেখ্‌তে যাওয়ার কথা আছে।"

"শুক্রবার কি আস্‌তে পারবেন তা হলে।"

"(চিন্তিত ভাবে) শুক্রবার—শুক্রবার রোস, দেখ্‌ছি। বোধ হয়—সেদিন আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই।"

"তবে—সেদিন আপনাকে প্রত্যাশা ক'রতে পারি বোধ হয়?"

"আচ্ছা—তাই হবে।"

"ধন্যবাদ—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

তারপর স্বেচ্ছায় অপরাধী নির্দ্ধারিত দিবসে কারাদণ্ড গ্রহণ করিল।

কোনও এক ভদ্রলোকের নিকট একটী ছাত্র একদিন বলিতেছিল—সামান্য একটু অপরাধে তাহার ১২ ঘণ্টা কারাবাস হুকুম হইয়াছে—সে বিদ্যালয়ের পুলিশের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে শীঘ্রই একটা সুবিধামত দিন দেখিয়া কারাগারে যাইবে। এ ছাত্রটী যেদিন কারাদণ্ড গ্রহণ করে—ভদ্রলোকটী সেদিন—তাহার সঙ্গে দেখা করিতে—কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি কারাগারের যে বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা এইরূপ।—

কারাগৃহটী বেশী বড় নয়—সাধারণ কারাগার অপেক্ষা সামান্য একটু বড়। জানালাটী বেশই বড় এবং লোহার জালে ঢাকা। গৃহে হাওয়া খেলে বেশ। সে গৃহে ছিল—একটী ষ্টোভ্—কাঠের দুইখানি চেয়ার—বহুদিনের পুরাতন দুইটী টেবিল এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধাম—নানারূপ মূর্ত্তি—ছবি, উক্তি (motto) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—কাজের কথা—বাজে কথা—প্রেমের কথা—আশ্বাস—হতাশ্বাস—ইত্যাদি টেবিলের গায়ে খোদা। একটী স্বল্পপরিসর কাঠের তক্তাপোষ—তাহার উপর শতছিন্ন একটি মাদুর। বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি ছিল না—আসামী আবশ্যক বোধ করিলে এ সব নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারে।

গৃহচ্ছাদটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। বাতির শিষ দিয়া নাম, তারিখ কবিতা ইত্যাদি কত কথাই না সেখানে লিখিত হইয়াছে। দেওয়ালের গায়েও নানা চিত্র অঙ্কিত—কোনটী বা কালিতে আঁকা—কোনটি বা বাতির শিষে, কোনটি পেন্সিলে;—আবার কতকগুলি চিত্র লাল নীল ইত্যাদি নানা রঙের খড়ি মাটীতে অঙ্কিত। ছবিগুলির ফাঁকে ফাঁকে যে ২।১ ইঞ্চি স্থান খালি কারা-প্রবাসী সে স্থান নানা গদ্য পদ্য রচনায় ও নাম তারিখ ইত্যাদিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

দেওয়ালের গায় একখানা বোর্ডে—কারাগারের নিয়মাবলী টাঙ্গান।—দু' একটি নিয়ম এই। অপরাধীকে কারাগৃহে প্রবেশ করিবার সময় ২০ সেণ্ট দক্ষিণা এবং কারাত্যাগ কালীনও সেই পরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। এ ছাড়াও দৈনিক ১২ সেণ্ট করিয়া কারাগৃহের ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে। সামান্য কিছু মূল্য লইয়া কারাগার হইতে কাফি এবং প্রাতরাশ যোগান হয়—কিন্তু মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে ভোজনের ব্যয় কারাপ্রবাসীকে বহন করিতে হয়।

দেওয়ালের গায় যে সব বহুমূল্য রচনা অঙ্কিত আছে—তাহার দু'একটির নিদর্শন।

"পরের অভিযোগে আমাকে এখানে আসিতে হইল—পশ্চাৎবর্ত্তীগণ সাবধান হইবেন।"

"কারাজীবনটা কেমন তাহার স্বাদ গ্রহণ কামনায় আমি স্বেচ্ছায় শান্তিভঙ্গ করিয়া এখানে আসিয়াছি।"

সম্ভবতঃ এরূপ কৌতূহল আর তাঁহার হয় নাই।

"R, Diengandt—ভালবাসার পরিণাম — চারিদিন কারাবাস। অন্যায় শাস্তি!"

"বিচার কর্ত্তার বুঝিবার ভুল—সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য চারি সপ্তাহ।"

এ কারাগারে এত দীর্ঘকালের কয়েদী আর দেখা যায় না। অপরাধটী ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিলে বুঝিতে সুবিধা হইত।

স্থানে স্থানে ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিয়াও কত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থলে সে সব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছেন। অধ্যাপক Dr. K কে অভিবাদন না করিবার অপরাধে একব্যক্তির তিনদিনের কারাদণ্ড হয়—এই অপরাধেই অপর একজন "দুইদিন তিন রাত্রি, নির্জ্জন প্রবাস" করিয়াছেন। তাই এক স্থানে চিত্রে Dr. K কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নির্জ্জন কারাগারে সময় কাটাইবার জন্য—কয়েদীরা অনেক স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের লেখা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া আমোদ উপভোগ করে। হয়ত কোন কারা-প্রবাসীর লিখিত নাম ধাম ও দণ্ড প্রাপ্তির তারিখ ঠিকই রহিয়াছে—পরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—

"চুরির অভিযোগে" "হত্যা অপরাধে" ইত্যাদি।

একস্থানে ক্ষুব্ধ চিত্তের বিপ্লব—কেবলমাত্র "প্রতিশোধ" বাক্যটীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেন যে কারাবাসী এত প্রতিহিংসা বুকে পুরিয়াছিলেন—সে কৌতূহল নিবারিত হওয়ার উপায় নাই।

এক স্থানে ব্রাণ্ডির বোতল হাতে একটী ছাত্রের ছবি অঙ্কিত আছে। নীচে লেখা—"সকল ভাবনা হইতে একমাত্র ইহাই পরিত্রাণ করিতে পারে।"

আরও কত অদ্ভুত—কত আশ্চর্য্য—কত করুণ—কত হাস্যোদ্দীপক লিপি অঙ্কিত আছে—সকল কথা বলিবার স্থান কোথায়?

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

উপনয়ন সংস্কারে ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের প্রমাণ

(উত্তর কুরুবাসের শাস্ত্র প্রমাণ)

উপনয়ন সংস্কার ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় সংস্কার। কারণ, ইহাদ্বারাই তাঁহাদের দ্বিজত্ব জন্মিয়া তাঁহারা বেদপাঠের অধিকারী হন। এই পাঠের অবস্থা বেদে 'ব্রহ্ম' * নাম অনুসারে 'ব্রহ্মচর্য্য' নামে অভিহিত এবং বেদ-পাঠার্থী ছাত্রও ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হইতেন। উপনয়ন সংস্কারটী এইরূপে শ্রেষ্ঠ বৈদিকসংস্কার বলিয়া, বৈদিক ইতিহাসের বিশেষ নিদর্শন যে ইহার মধ্যে নিহিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই ঐতিহাসিক নিদর্শন কি?

উপনয়ন সংস্কারের কাল সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান দৃষ্ট হয় তাহাতে ভারতীয় আর্য্য-পুরাতত্ত্বের অতি মূল্যবান্ প্রমাণই পাওয়া যাইতে পারে।

উপনয়নের কালসম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, উত্তরায়ণেই উপনয়ন বিধেয়, দক্ষিণা-

* "বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম" ইত্যমর।

য়নে কখনও বিধেয় নহে। আর্য্যদিগের ভারতবাসের ইতিহাসে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাইবার আশা করা যায় না কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর কুরুবাসের ইতিহাসে ইহার অতি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উত্তর মেরুর সন্নিহিত বলিয়া উত্তর কুরুবাসিদিগের নিকট উত্তরায়ণের ছয়মাস দিবা ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি থাকিবে তাহা সকলেরই নিকট সহজবোধ্য। রাত্রিতে আমরা সাধারণতঃ দৈব ও পৈত্রকার্য্য নিষিদ্ধ দেখিতে পাই। সুতরাং দক্ষিণায়নের সময় উত্তরকুরুতে রাত্রিকাল থাকিত বলিয়া যজ্ঞাদি দৈব-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না এবং উত্তরায়ণের সময় দিবস থাকিত বলিয়া তাহা উপ নয়নের যজ্ঞাদি দৈবকার্য্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি। উত্তর কুরুতে উত্তরায়ণ ও দাক্ষণায়ন কাল সম্পর্কে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল ভারত-বর্ষের শাস্ত্রকারগণ তাহার অনুসরণ করতঃ তাহাই ব্যবস্থারূপে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের উপরি উক্ত ঐতিহাসিকতত্ত্ব যে শাস্ত্রকারদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না, শাস্ত্রের আলোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। এখানে আমরা উপনয়নের মাসফল সম্বন্ধে একটী শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইবে।

মাঘে দ্রবিণাশীলাঢ্যঃ ফাল্গুনেচ দৃঢ়ব্রতঃ।
চৈত্রে ভবতি মেধাবী বৈশাখে কোবিদোভবেৎ॥
জ্যৈষ্ঠে গহননীতিজ্ঞঃ আষাঢ়ে ক্রতুভোজনঃ।
শেষেষন্যেষু রাত্রিঃস্যাদ্গর্হিতং নিশিব্রতম্।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত কৃত্য চিন্তামণিঃ।

মাঘ মাসে উপনয়ন হইলে ধনচরিত্র সম্পন্ন, ফাল্গুনে দৃঢ়সঙ্কল্প, চৈত্রে মেধাবিশিষ্ট, বৈশাখে শাস্ত্রবেত্তা, জ্যৈষ্ঠে গূঢ়নীতিবিৎ, আষাঢ়ে যজ্ঞভোজী হয়। অবশিষ্টকাল রাত্রি থাকে। রাত্রিতে ব্রত (দৈবকার্য্য, নিষিদ্ধ।

এখানে উত্তরায়ণের ছয়মাস ব্যতীত (দক্ষিণায়নের) সকল মাসকেই রাত্রিরূপে উল্লেখ করায়—উত্তরায়ণের ছয়মাস যে দিবস তাহা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে, এবং উত্তর কুরুতে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে দিবা ও রাত্রির আদিভেদ হইতেই যে ভারতেও এই দুইটী কালের দিবারাত্রি ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও বুঝা যাইতেছে।

কেবল যে উত্তরকুরুর প্রথার অনুকরণেই উপনয়নের কাল সম্বন্ধে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের বিধিনিষেধ ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—ইহার একটী বলবত্তর প্রমাণ আমরা নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন হইতে প্রাপ্ত হই!

"বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়াস্যাপি মৌঞ্জীস্যাদুত্তরায়ণে।
দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যং নানধ্যায়ে নসংক্রমে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত গর্গঃ।

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন উত্তরায়ণে হইবে। বৈশ্যের দক্ষিণায়নেও হইতে পারে কিন্তু অনধ্যায়ে ও সংক্রান্তিতে কখনও উপনয়ন কর্ত্তব্য নয়।"

এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই কেবল উত্তরায়ণে উপনয়ন অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু বৈশ্যের পক্ষে বিকল্পে দক্ষিণা-য়নেও উপনয়ন বিহিত হইয়াছে। ইহার

তাৎপর্য্য আমাদের নিকট এই বলিয়াই বোধ হয় যে, আর্য্যগণ উত্তরকুরু ছাড়িয়া প্রথমে যে দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন সেই স্থানটী আমাদের নিকট মধ্য-আসিয়া প্রদেশ বলিয়াই অনুমিত হয়। মধ্য আসিয়াতে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের সময় ছয়মাসব্যাপী নিরন্তর দিবারাত্রি বর্ত্তমান থাকেনা কিন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিদিনই দিবারাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং এইস্থানে উত্তরকুরুর ন্যায় দক্ষিণায়ন কালে দৈবকার্য্যের কোন বাধা হওয়ার কারণ ছিলনা। বৈশ্যদিগের উপবীত গ্রহণের স্থান আমরা মধ্য আসিয়াতে কেন নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহার অপর একটী প্রমাণ আমরা তাঁহাদের উপবীতের উপাদান ও উপনয়ন পরিধেয়ের উপাদানে প্রাপ্ত হই। মনুসংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্রহ্মচারীর উপবীত ও পরিধেয়ের উপাদান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

"কার্ষ্ণ রৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেন শাণ ক্ষৌমাবিকানিচ॥ ৪১
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমাশ্লক্ষ্ণা কার্য্যাবিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্যতু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতাণ্ডকী॥ ৪২

২য় অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় ও শণবস্ত্রের অধোবসন পরিধান করিবে; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রুরু নামক মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌমবসন এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী ছাগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবসন পরিধান করিবে।"৪১

"ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত, মুখপৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়, ক্ষত্রিয়-দিগের মুর্ব্বাময়ী ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়।"৪২

এখানে বৈশ্যদিগের ছাগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবসনের উল্লেখ দ্বারা ইঁহারা যে পশুপাল জাতি ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মধ্য আসিয়াতেই আমরা পশুপাল যাযাবর (nomadic) জাতির বাসের বিবরণ জানিতে পারি। মধ্য আসিয়ার সুবিশাল তৃণক্ষেত্র পশুচারণের উপযোগী বলিয়া তাহা পশুপাল জাতির পক্ষে বিশেষ অনুকূলই হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের একটী স্তোত্রে আর্য্যগণ তাঁহা-দিগকে তৃণময় দেশে লইয়া যাইবার জন্য পূষার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন. এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"অভি সুখবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥"৮

৪২ সূক্ত ১ম মণ্ডল।

"শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তান না হয়, হে পূষা! তুমি (পথে) আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।"

এস্থলে রমেশবাবু টীকায় লিখিয়াছেন:—"এই সূক্তের কোন কোন ঋক্, বিশেষ ৮ ঋক্ হইতে প্রতীয়মান, হয় যে সে সময়ের হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন অংশ মেষ-পালক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সুন্দর তৃণ অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিত। পূষা বিশেষরূপে তাহাদিগেরই রক্ষক, অতএব তিনি ভ্রমণে পথপ্রদর্শক। সেকালে ভ্রমণে কিরূপ বিপদ্ আপদ্ ছিল তাহাও এই সূক্ত হইতে জানা যায়।" "ঋগ্বেদানুবাদ ১০৪ পৃঃ।

ছাগ ও মেষই পশুপাল জাতির প্রধান পালিত পশু। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে আর্য্যদিগের একশাখা মেষপালক (shepherd) ছিল এবং তাহারা আফ্‌গানিস্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানে আমরা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটী মন্তব্য প্রদান করিতেছি :"—and on the other, the expulsion of the bulk of the shepherd tribe from Afganistan with their pantheon headed by Indra and the cultus which required animal sacrifies and of fermented liquers. These later are the ancesters of the Brahmanic Aryans. In India they found a congenial peaceful home." Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans. article XX Primitive Aryans.

"পক্ষান্তরে আফ্‌গানিস্থান হইতে বিতাড়িত অধিকাংশ মেষপালক জাতি তাঁহাদের ইন্দ্র প্রধান দেবগণ এবং পশুবলি ও মাদকদ্রব্যের আহুতিবিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান সহ এদেশে আগমন করেন। ইহারাই ব্রাহ্মণ আর্য্যদিগের আদিপুরুষ। ভারতবর্ষে তাঁহারা সুখকর শান্তিপূর্ণ বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

বৈদিক গান্ধার বা বর্ত্তমান কান্দাহার যে রোমপ্রচুর মেষের জন্য বিখ্যাত ছিল ঋগ্বেদের সূক্ত হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

"সর্ব্বামাস্মি রোমশা গঙ্গারীণামিবাবিকা ॥"৭
১২৬ সূক্ত ১ম মণ্ডল।

"আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা।"
রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ৫৫ পৃঃ।

মধ্য আসিয়ার তৃণক্ষেত্রে বৈশ্যদিগের আদিবাস ছিল বলিয়াই তৃণজাতীয় শণের সূত্রদ্বারা তাহাদের যজ্ঞোপবীত নির্ম্মিত হইত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সম্বন্ধে মনুসংহিতার বিবরণ হইতে কোন ঐতিহাসিক সত্য লাভ করা যায় কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর যে মৃগচর্ম্ম উত্তরীয়রূপে ব্যবহৃত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা তাঁহাদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ প্রাপ্ত হই বলিয়াই মনে করিতে পারি। বর্ত্তমানে যেমন আমরা উত্তর মেরুতে মৃগজাতি বিশেষের (Reindeer) বাসের কথা জানিতে পারি অতি পুরাকালেও যে তথায় তদ্রূপ মৃগজাতির বাস ছিল তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপরই বোধ হয়। বর্ত্তমান উত্তরমেরুবাসিগণ যেমন পশুচর্ম্ম বস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন— উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণও তদ্রূপ মৃগচর্ম্ম পরিতেন এবং উত্তরমেরুবাসিদিগেরই ন্যায় তাঁহারা মৃগ মাংসও ভোজন করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই মৃগমাংস আমাদের শাস্ত্রে এরূপ পবিত্র ও প্রশস্ত মাংস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভূগোলে আমরা মধ্য-আসিয়ার যে সমস্ত পশুজাতির উল্লেখ পাই—তাহাদের মধ্যেও হরিণ, ছাগ ও মেষের স্পষ্ট উল্লেখই দেখা যায়।

"on the plateau of the interior

ruminating animals, such as camel, ox, deer, goat, sheep &c. are chiefly found, yak is used as a beast of burden". Longmans "The World with further treatment of India." P, 62.

"মধ্য-আসিয়ার সমতলক্ষেত্রে প্রধানতঃ উষ্ট্র, বৃষ, মৃগ, মেষ প্রভৃতি জাতীয় রোমন্থক জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। চমরী গাই ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হয়॥"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর যজ্ঞোপবীতের উপাদানে যে মূঞ্জা ও মুর্ব্বা তৃণের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা আমরা উত্তরকুরুজাত উদ্ভিদবিশেষ বলিয়াই মনে করি। আধুনিক ভূগোলেও আমরা উত্তরমেরুতে (Artic zone) ক্ষুদ্র গুল্ম ও অপুষ্প উদ্ভিদের (dwarf shrubs, liehens) উল্লেখ দেখিতে পাই। †

উপনয়নের ন্যায় চূড়াকরণ গোদান ও বিবাহও বৈদিক সংস্কার। সুতরাং উপনয়নের সম্বন্ধেও আমরা যেরূপ উত্তরায়ণের বিধি প্রাপ্ত হই পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সংস্কারসমূহের সম্বন্ধেও আমরা তদ্রূপ বিধি পাওয়ায় আশা করিতে পারি। শাস্ত্রে এই সমস্ত সংস্কারের কাল সম্বন্ধে অতি সুস্পষ্টরূপেই উত্তরায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে। "উদগায়নে আপূর্য্যমাণে-পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চূড়োপনয়ন গোদান বিবাহাঃ॥"

আপূর্য্যমাণে পক্ষে শুক্লপক্ষে। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত আশ্বলায়ন। "উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভনক্ষত্রে চূড়া, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ কর্ত্তব্য॥"

এই প্রকার বৈদিক সংস্কারের সহিত উত্তরায়ণের যোগ ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসেরই যে ইতিহাস আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

† The World with fuller treatment of India."
Longmans, Green and Co. p. 5.

সমালোচনা

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।—শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, বণিক প্রেসে মুদ্রিত। ষষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে বঙ্গীয় রমণীগণের গৃহধর্ম্ম-শিক্ষোপযোগী দশটি উপদেশ বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। মহিলাগণ যাহাতে গৃহধর্ম্মের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে, পতি, পরিবারবর্গ, অতিথি-অভ্যাগত প্রভৃতিদিগের প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য,—মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়, রন্ধন ও পরিবেষণ, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য, সন্তানপালন ও স্বাস্থ্যবিধান, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন—এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি-সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইলাম, আলোচনার পদ্ধতিটিও বেশ সুশৃঙ্খল। লেখকের ভাষাও সহজ, সাধু হইয়াছে। অল্প-শিক্ষিতা রমণীগণের পক্ষে কোথাও জটিল বা

দুর্ব্বোধ্য নহে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব।" সে বিষয়ে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের মতদ্বৈধ না থাকিলেও স্ত্রী-শিক্ষার যে আশানুরূপ প্রচলন এখনও হয় নাই, ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে। 'কন্যা ও পুত্রকে একই ভাবে শিক্ষা দিবে' ইহাই শাস্ত্র-বচন। শিক্ষা মনের সঙ্কীর্ণতা নাশ করে এবং এই শিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই বহু গৃহ অশান্তি-কলহে উৎসন্ন যাইতেছে, সন্তানেরও সুশিক্ষা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কারণ নারীই গৃহের সম্রাজ্ঞী—নারীর প্রভাব অল্প নহে। সুমাতা না হইলে সুপুত্রের আশা সুদূর-পরাহত! সেই মাতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে কন্যার সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই শিক্ষা আবার সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া আবশ্যক। এ গ্রন্থে সেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষারই আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহধর্ম্মের আলোচনা-বিষয়ে এমন সুন্দর আর-একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাঙ্গালী-গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য।

বানান-সমস্যা।—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ প্রণীত। কলিকাতা কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। বঙ্গবাসী কলেজ-স্কুল বুক্‌ষ্টল হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থকার পুস্তিকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন, "আজকাল বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা একটা বিষম কাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আইনের ভয় ত আছেই, তাহার উপর আবার ঘরের বিভীষণদের তাড়া, গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ।" তাই তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বানান-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। বহু প্রচলিত অশুদ্ধ-বানান-পদের তালিকা দিয়া ভুলটা কোথা দিয়া প্রবেশ করিল, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিতে ছাড়েন নাই। তবে তিনি সমস্যার সমাধান করেন নাই। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত, আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় কৌতুক-রসে স্নিগ্ধ করিয়া, 'সকল দিক বাঁচাইয়া, সকল পক্ষকে খুসি রাখিয়া' বাণান-সমস্যার কথা-মাত্র তুলিয়াছেন, এবং 'বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ ও পরামর্শ' চাহিয়াছেন। এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভুল বাণানের সমর্থন কিছুতেই করা যায় না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ইহার এক খণ্ড করিয়া কাছে রাখিলে যে বহু উদ্ভট ও হাস্যকর বাণান-ভুলের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

অনুপ্রাস।—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ প্রণীত। কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। বাঙ্গালায় ধর্ম্ম-কর্ম্মে, সাহিত্যে, নর-নারীর নাম-নির্ব্বাচনে প্রবাদ-বাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাসের ঘোর ঘটা প্রদর্শন-কল্পে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অনুপ্রাসের তরফে ওকালতি করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। ভাষাতত্ত্বের একটি কৌতুকাবহ রহস্য প্রদর্শন করাই" তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, "পরিমিত প্রয়োগে অনুপ্রাস রচনার সৌন্দর্য্য সাধন করে, ভূরি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে কর্ণ পীড়া উৎপাদন করে। জোর-জবরদস্তি করিয়া, কষ্ট-কল্পনা করিয়া অনুপ্রাসের অজস্র সৃষ্টি করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে!" গ্রন্থকারের আশঙ্কা-সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি আমরা একটানে পড়িয়া শেষ করিয়াছি, অথচ কোথায়ও এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তি ধরে নাই। লেখকের সরস ভাষায়, সরল বর্ণনা-ভঙ্গিমায় ও সংগ্রহের বিপুলতায় অজস্র হাস্যধারা মণিমুক্তার মতই ঝরিয়া পড়িয়াছে। সানন্দে ও সাগ্রহে আমরা তাহা দুই হাতে করিয়া কুড়াইয়াছি। গ্রন্থখানি যেন বঙ্গ সাহিত্যের এক অজানা লোকের চাবি খুলিয়া দিয়াছে। একাধারে তথ্য ও হাসির ভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছে। এ গ্রন্থ ভাষার সম্পদ-স্বরূপ। ছাপা কাগজ সুন্দর। গ্রন্থের মুখপত্রে ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হর-পার্ব্বতীর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

উপমন্যু।—শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত। মূল্য দুই আনা। মহাভারতোক্ত উপমন্যুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানি ক্ষুদ্র একটি নাটিকা। বালক-বালিকাগণের অভিনয়োপযোগী করিয়াই রচিত। রচনায় মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় পাই; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র একই ধারায় বহিয়া চলে নাই,—কোথাও বেশ

মুক্ত, সরল, আবার পরক্ষণেই গম্ভীর, জটিল। তবে তাহার মধ্য দিয়া তপোবনের প্রাচীন চিত্রের যেটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহা স্নিগ্ধ ও মনোরম। বহিখানির ছাপা-কাগজ আরও উঁচু দরের হওয়া উচিত ছিল।

আধুনিক সভ্যতা।—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বাহিরের আদব-কায়দা, বেশভূষা প্রভৃতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতির সহিত আলাপ-পরিচয়ে কিরূপ 'আদব-কায়দা' মানিতে হইবে, নিজেদের মধ্যে বা মুসলমান-ইংরাজকে চিঠি-পত্র লিখিতে কিরূপ পাঠ লেখা শোভন ও আবশ্যক, তাহারও আলোচনা গ্রন্থকার বাদ দেন নাই। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল; গ্রন্থ-কার তাহা দূর করায় আমাদিগের একান্ত কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

রাঢ়ীয় কুলদ্রুমঃ।—প্রথম খণ্ডঃ। মুখ-বংশঃ। ঢাকা, বিক্রমপুর, পুরাপাড়া নিবাসিনা শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘটক বিদ্যানিধিনা সংগৃহীতঃ প্রকাশিতশ্চ। মূল্য দুই টাকা। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের ভূমিকায় সংগ্রহ-কার বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, "বিধাতার সৃষ্ট জগতে যাহারা যে জাতি বলিয়া সমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন; তাহাদের সেই জাতির আদিম বিবরণ ও পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক বংশ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। * * পূর্ব্বকালে পরিবারস্থ প্রাচীন কর্ত্তারা তাঁহাদের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে বাল্যকালে নাম-শ্লোক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন পিতা হইতে উর্দ্ধতম পঞ্চম পুরুষের ও মাতামহ-কুলের চারি পুরুষের নাম, গোত্র গাঁই এবং বংশ-কুল শিক্ষা করাইতেন।" কিন্তু এক্ষণে এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; তাহার ফলে আমরা বিলাতের টিউডর বংশ, ষ্টুয়ার্ট বংশের ধারাবাহিক তালিকা অনায়াসে তৈয়ার করিতে পারিলেও নিজেদের পিতামহ বা মাতা-মহের উর্দ্ধতম পুরুষগণের নাম জানি না—ইহা যে আমাদের পক্ষে বিষম লজ্জার কথা, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। পূর্ব্বে ঘটকগণের নিকট বংশ-তালিকা থাকিত; বিবাহাদি সময়ে উভয় পক্ষের বংশাবলীর আবৃত্তির প্রথাও প্রচলিত ছিল, এবং এই সকল কারণে উচ্চ নীচ বর্ণ সমূহের পূর্ব্বপুরুষগণের তালিকাও ঠিক থাকিত। এখন ঘটকগণের মধ্যেও বংশ-তালিকা-রক্ষণের বিধি নাই, সেরূপ ঘটকও বিরল—অন্নদায়ে উদ্‌ভ্রান্ত কয়েকটি বেচারা জীবই অধিকাংশ স্থলে বিবাহের ঘটকালি করিয়া বেড়ায়। আমাদেরও এদিকে লক্ষ্য নাই, কাজেই পূর্ব্বপুরুষগণের নামের তালিকা সংগ্রহ বা সংরক্ষণে আমরা একান্তই উদাসীন! ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় বিস্তর শ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া প্রাচীন ঘটকগণের সংগৃহীত 'কুলপঞ্জিকা' "কুল-কল্পলতিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ, রাজা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক সমীকরণ বা সূত্রাদি ও আরও বিস্তর প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে বঙ্গীয় কুলবংশ প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান খণ্ডে ভরদ্বাজ গোত্রজ মুখোপাধ্যায় দিগের কুশীনামা সংগৃহীত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায়-বংশীয়গণ, উর্দ্ধতন চারি-পাঁচ পুরুষের নাম জানা থাকিলে,—এই গ্রন্থ অব-লম্বনে অনায়াসে শ্রীহর্ষ হইতে আপনাদিনের কুল-ধারা-নির্ণয়ে সক্ষম হইবেন। এ কার্য্য বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য তথাপি বিদ্যানিধি মহাশয় যে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই, সেজন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে তিনি অপরাপর বংশাবলীও প্রকাশিত করিবেন। আশা করি, বাঙ্গালী সে উৎসাহ ও সহানুভূতি-প্রদানে কার্পণ্য করিবেন না। ইহার অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে শুধু যে ব্রাহ্মণ বংশের বংশ-তালিকাই সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে, বাঙ্গালার ইতিহাসও সমধিক সমৃদ্ধি লাভ করিবে, সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় নাই। গ্রন্থখানি বেশ সুশৃঙ্খল ধারায় সজ্জিত। ছাপা বেশ ঝরঝরে ও বড় অক্ষরে হওয়ার দরুণ কোন নাম দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। কাগজও ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

ত্রিস্রোতা—কবিতা-রেণু রচয়িত্রী; দিনাজপুর, গণেশতলা হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

এখানি গ্রন্থকর্ত্রীর দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখিয়া না দিলে লেখিকাকে হয়ত কোন কঠিন সমলোচকের তীব্র আঘাত সহ্য করিতে হইত, কেন না আধুনিক সমালোচকেরা নাকি "কষ্টিপাথরের" উপর সাহিত্যকে পরীক্ষা করিয়া লন। কোকিলেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন "নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদে বঞ্চিত হইয়া এই পবিত্রা বিধবা রমণী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বর্গগত ইহার হৃদয় দেবতার সতত অনুধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।" বাংলা-দেশের একজন বিধবা নারীর করুণরাগরচিত এই কবিতাগুলি স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক কোন শিক্ষিত বঙ্গীয় পাঠক অনাদর করিবেন না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার একবিংশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী—বৌদ্ধধর্ম্মালোচনা প্রচার এই সভার উদ্দেশ্য। পালিগ্রন্থের মূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য এই সভা উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। "পরের মুখের ঝাল খাওয়ার মতন" এতদিন পালিভাষাবিদ্ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। এই সভার বিবরণীতে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রভৃতি পালিভাষাবিদের নাম দেখিলাম। আশা করি সভা ইহাদের সাহায্যে পালিগ্রন্থের মূলবঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীনঃ—

স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রথম ভাগ—এই সঙ্গীতপুস্তকখানি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত,এবং ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক ৮।২ নং ডালহাউসি স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সঙ্গীতের উন্নতিসাধনার্থে আজীবন যে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, এই গ্রন্থ খানি তাহারই অন্যতম পরিচয়। ইহার এই নূতন সংস্করণ দেখিয়া আমারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৮টি গানের স্বরলিপি আছে, সুতরাং সাধারণের নিকট ইহার আদর অবশ্যম্ভাবী। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপির বিশদ ব্যাখ্যা প্রথমেই দেওয়াতে শিক্ষার্থীর পক্ষে গানগুলি আয়ত্ত করা সহজ। এতদ্ভিন্ন তাল লয় প্রভৃতি দুরূহ অথচ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যেরূপ পরিস্কারভাবে বুঝানো হইয়াছে, তাহাতে পাঠক-মাত্রেরই সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ নিশ্চয়ই হইবে। তালের বোলের সঙ্গে সঙ্গে যে সাঙ্কেতিক ছড়া বসানো হইয়াছে, তাহা ছেলেবুড়ো সকলেরই পক্ষে অতীব কৌতুকাবহ এবং সেই জন্যই স্মরণযোগ্য। আজকালকার দিনে যখন পুরাতন ওস্তাদ-সাক্রেদ সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়াছে,এবং গ্রামোফোণ ঘরে ঘরে গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে তখন বিশুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতের এইপ্রকার সরল সংক্ষেপ ব্যাখ্যা বালকদের শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। হারমোনিয়মে গানের সঙ্গত শিখানো বইখানির মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, স্বরলিপি দৃষ্টে গানগুলি এস্রাজ বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রেও বাজাইতে পারা যায় এবং বাজাইলেই ভাল হয়। এই যন্ত্রগুলির সুবিধা এই যে সহজেই সব জায়গায় বহা যায়, এবং গায়কের কণ্ঠস্বর ছাপাইয়া তাহারা নিজের প্রভুত্ব জ্ঞাপন করেনা। সঙ্গীত সম্মিলনীতে, সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এবং ডোয়ার্কিন কোং সেই প্রচারের এরূপ সুলভ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভূমিকায় সামান্য দুই একটী ছাপার ভুল লক্ষ্য করিয়াছি, এবং শুদ্ধিপত্রও কিছু বেশি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। মন্ত্রের ন্যায় স্বরলিপিতেও একটি অক্ষর বা চিহ্নের ভুলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; পাঠ্য পুস্তকের মত ইহাতে সাত খুন মাফ করা যাইতে পারে না, সুতরাং আশা করি আগামী সংস্করণ যাহাতে নির্ভুল হয় প্রকাশকগণ সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

শ্রী.....দেবী।

গিলগিটের গল্প

ইয়াসীনের শাসন কর্ত্তা 'বাদসার' সময়ে পুনিয়াল জেলায় গুলাপুরে থাসু নামক একজন শক্তিশালী ধনবান ব্যক্তি বাস করিত। থাসু সোনার লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিয়াছিল,—ধনসম্পত্তি ও রত্নাদি নিকটবর্ত্তী নালার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিত। স্থানীয় লোকেরা বলে যে আজও পর্য্যন্ত তাহার বহু-মূল্য রত্নাদি সেই সকল 'নালাতে' লুক্কায়িত রহিয়াছে কিন্তু কেহই নির্দ্দিষ্ট স্থানের বিষয় বলিতে পারে না! ইয়াসীনের 'বাদসা' এক সময়ে তাহাকে খেলাত প্রেরণ করেন। দূত যখন খেলাত লইয়া গুলাপুরে পৌছিল,—থাসু তখন ইয়াসীনের পথের ধারে ভূমি-কর্ষণে মত্ত ছিল, বাদসার প্রেরিত দূত থাসুকে কখনও দেখে নাই—তাহার বাড়ীও চিনিত না—পথের ধারে থাসুকে দেখিয়া—'থাসুর বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিল। থাসু একটী ঘুরপথ দেখাইয়া আপন গৃহের সন্ধান বলিয়া দিল এবং স্বয়ং সোজা পথে দূতের আসিবার বহু পূর্ব্বেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কৃষকের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া থাসু ভাল পোষাক পরিল। দূত আসিয়া আর তাহাকে চিনিতে পারিল না। দূত থাসুকে 'খেলাত প্রদান করিলে পর, থাসু আপন দুর্গের (১) দিকে মুখ ফিরাইয়া তিন বার সেলাম করিল। সেই সেলামের অর্থ এই যে,—আমার বাহুবল ও দুর্গ বাদসার মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে বলিয়াই তিনি আমাকে খেলাত পাঠাইয়াছেন।

দূতগণ দেশে ফিরিয়া বাদসার নিকট সকল বিবরণ ব্যক্ত করিলে বাদসা অতি-মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বহু সৈন্যসহ থাসুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। থাসু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'খুসাহাল বেগকে' শত্রুসৈন্যের গতি-রোধ করিতে পাঠাইল, কিন্তু শত্রুপক্ষ তখন গুলাপুরে আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খুসাহালবেগ শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া বাদসার সম্মুখে উপস্থিত হইলে পর বাদসা উপর্য্যুপরি তাহাকে তিন বার তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু খুসাহালবেগ তিন বারই কৌশলের সহিত বাদসার আঘাত ব্যর্থ করিয়া বলিল—"এক্ষণে আমার পালা—আমি আপনাকে আক্রমণ করিব।" বাদসা বলিলেন—"আচ্ছা, আমার একটা কথার উত্তর দাও। আমাদের মধ্যে কাহার লেজ গুটান উচিত?"

খুসাহাল বেগ বলিল—

"আপনি হইলেন বাজপক্ষীর রাজা, আর আমি হইলাম ককুটের রাজা আমি কি আর আপনার নিকট দাঁড়াইতে পারি!"

বাদসা তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইয়াসীনে ফিরিয়া গেলেন। থাসু খুসাহাল-বেগের পরাজয় স্বীকারে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং এরূপ সুযোগ পাইয়াও বাদসার মাথা আনে নাই বলিয়া তাহাকে ইস্কে-মানের 'চাখুনখান' নামক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল।

এদিকে এই সংবাদ যথাসময়ে বাদসার নিকট পৌছিল। তিনি পুনরায় থাসুর

(১) এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও গুলাপুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং 'গাকুর' নামক স্থানে 'থাসুর পুত্র 'হাকিম বেগকে' ধৃত করিলেন। বাদসা হাকিম বেগের সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে বহুমূল্য উপহারাদি প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকার উৎসবের আয়োজন করিয়া নিজের মহত্ব প্রদর্শন করিলেন। বাদসা, হাকিম বেগকে প্রচুর সৈন্যসহ তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া হীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন। হাকিম বেগ পিতাকে বাদসার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলে পর থাসু পুত্রের প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু বাদসা প্রেরিত সৈন্যবলের নিকট থাসুর উন্নত মস্তক অবনত হইয়া গেল। থাসু বশ্যতা স্বীকার করিল এবং গ্রামের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সকল সর্ব্বসমক্ষে বাদসাকে সেলাম করিল। বাদশা তখন থাসুকে নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিলেন—বাদসার আজ্ঞানুসারে থাসু নৃত্য আরম্ভ করিল। কিন্তু নৃত্য সময়ে বাদসাকে সেলাম করিবার পরিবর্ত্তে থাসু আপন দুর্গের দিকে যাইয়া সেলাম করিল, তাহাতে বাদসা ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে থাসুকে তাহার দ্বাদশ পুত্রসহ হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। বাদসার আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত ইহার পর থাসু ও তাহার দ্বাদশ পুত্রের মৃতদেহ সেইস্থানে প্রোথিত করা হইল।

এই কবরকে "থাসু আই—বোমবাট" (Thashu—I—Bomb—bat) বলে। কবরটী চতুষ্কোণ, উচ্চতায় ৯ ফুট, এবং পরিধিতে ৫ গজ হইবে। দেখিতে একটী ছোট ঘরের মত। ইহারই মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করা হইয়াছিল। একটী ডুমুর গাছ ছাদের উপর জন্মিয়াছিল এবং তাহাতেই ছাতটী পড়িয়া গিয়াছে। থাসুর মৃত্যুর পর থাসুর ভ্রাতা খুসহাল বেগকে বাদসা গুলাপুরে উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

চেমোগা গ্রাম ধ্বংসের গল্প।

স্কারদুর প্রধানের—সের সা, আলি সা, সামুরাদ, সা-সুলতান নামক চারি পুত্র ছিল। চিত্রলাভিমুখে যাত্রা করিলে পর তাহারা পথিমধ্যে গিলগিট হইতে ১৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত চেমোগা নামক গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাহারা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে এবং কর্ণবধির অসংখ্য ঢাকের শব্দে গ্রামবাসীদিগকে বিব্রত করিয়া তোলেন। গ্রামবাসীগণ একে একে রাজপুত্রগণকে সম্মান দেখাইতে আসিল কিন্তু চেমোগার একজন ধনবান ব্যক্তি আসিল না। রাজপুত্রগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ করিলেন এবং সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পর সে কেন সম্মান প্রদর্শনে এত বিলম্ব করিয়াছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধনী ব্যক্তিটী বলিলেন—হুজুর আমি আমার পশুশালায় দুগ্ধদোহনে ব্যস্ত ছিলাম। পশুদের চীৎকারে আমি আপনাদের ঢাকের শব্দ শুনিতে পাই নাই এবং আপনারা যে গ্রামে আসিয়াছেন তাহাও জানিতে পারি নাই—তজ্জন্যই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ ক্রুদ্ধ হইলেন

এবং একজন কর্ম্মচারীকে এই ঘটনা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য সেই ব্যক্তির পশুশালায় প্রেরণ করিয়া;—ঢাকীদিগকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে বাস্তবিকই তাহার পশুশালায় পশুদিগের বিকট চীৎকারে ঢাকের শব্দ শোনা যায় না। রাজপুত্রগণ তখন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন যে চেমোগা গ্রামের সমস্ত ভূমি পতিত অবস্থায় থাকিবে—আর কেহই যেন চাষ আবাদ না করে। কারণ ধনী হইলেই ইহারা আমাদের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিলম্ব করিবে—হয়ত কালে আমাদের সম্মুখে মাথা অবনত করিতেই চাহিবে না। সুতরাং দ্বাদশ থলি পারা (quick silver) চেমোগা নদীর মুখে ঢালিয়া দেওয়া হউক। এরূপ করিলে কৃষিকার্য্যের জন্য আর তাহারা জল পাইবে না।

রাজপুত্রগণের আদেশ মত কার্য্য করা হইল। চেমোগা গ্রাম অনাবাদে পতিত অবস্থায় রহিয়া গেল।

রাজপুত্রেরা তাহাদিগের সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একদল আসতর পথে অপর দল "হারমোসের" পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গিলগিটের উত্তর পশ্চিমাংশে সাত মাইল দূরে অবস্থিত "হিনজিল্" নামক স্থানে উভয় দল মিলিত হইলে পর রাজপুত্রগণ সমস্ত সৈন্য গণনা করিতে মানস করিলেন। কিন্তু এত অধিক সৈন্য একদিনে গণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা আদেশ করিলেন যে "প্রত্যেক সৈন্য এক একটি ঢিল একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যাউক।"

তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালিত হইল। দেখিতে দেখিতে স্থানটী একটী ইষ্টক স্তূপে পরিণত হইল।

হিন্‌জিলে যে কয়েকটী স্তূপ দেখা যায় তাহা নাকি সেই সৈন্য সংখ্যা নির্ব্বাচনের স্তূপ। বস্তুত এই স্তূপ গুলি খুব সম্ভবত "বৌদ্ধ স্তূপের" ধ্বংসাবশেষ। রাজপুত্রগণ চিত্রল পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে একটী চিনার বৃক্ষের নিম্নে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরও রাখিয়াছিলেন। প্রবাদ এই তাঁহাদের আহার্য্য নাকি ৪০০ শত মাইল দূর স্কারদুর হইতে প্রস্তুত হইয়া গরম গরমই তাঁহাদের নিকট পৌঁছিত! ডাকের বন্দোবস্তও তাহা হইলে খুব ভাল ছিল বলিতে হইবে!

নিম্ন লিখিত গানটী গিলগিটবাসীগণের মুখে এখনও শোনা যায়—

ওভাই! সের, আলি, মোরাদ তারা
পুল বেঁধেছে জলের তলে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলে তারা
পুল বেঁধেছে নদীর জলে!
ওভাই! ঝক্‌মকান তাম্বু তাদের
জ্বল্‌ছেরে ঐ জলের তলে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলের তাম্বু
পুকুর পারে ঘাসের দলে।
ওভাই! বচ্ছে নদী হাতুর (২)নীচে
হোসীর [৩]কল ঐ জলে ঘোরে,
ওরে! মেক্‌পুনের ঐ ছেলে তারা
করলে এমন মাথার জোরে।

(২) Hatu—mountain,
(৩) Hoshi—a place near Ramghat.

ওভাই! চেমোগরের নদী জমীর
ফসল তারা এম্নি করে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলে তারা
কর্‌ল নষ্ট জীবন ভরে!
ওভাই। চিলি গাছের নীচে তারা
রাক্ষসেরে নাচিয়ে ছিল,
ওভাই! চিলি গাছের নীচে তারা
ঢাকের বাজনা বাজিয়ে ছিল।
ওরে! মেক্‌পুনের তিনটী ছেলে
ঢাক বাজিয়ে গাছের নীচে,
ওভাই! জয় করেছে নদী পাহাড়
স্ত্রীজাতিরা তাই কেঁদেছে।
ওভাই! সের, আলি, মোরাদ তারা
চিত্রলে পাথর পুতেছে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলে তারা
সে চিহ্ন...যে জয় করেছে।
ওভাই! চিত্রলের অধিপতি
সাবাকতুরের [৪]মান গিয়েছে,
ওরে! তিন ভাইতে জয় করিয়ে
ছাগল যত বিলায়েছে।
ওভাই। সের, আলি, মোরাদ তারা
ইয়াসীনে খেললে পোলো,
ওরে। গিলগিটের লোহার কবাট
তারাই খুলে ভেঙ্গে গেলো!

নদী বক্ষে রাজপুত্র

বহুকাল পূর্ব্বে ত্রা—ত্রাখান (Tra—Trakhan) নামে গিলগিটে একজন প্রধান ছিলেন। তিনি দারেল নিবাসী একজন ধনাঢ্যর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 'রা' পাশা খেলিতে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং প্রতি সপ্তাহেই তাহার শ্যালকদের সহিত খেলিবার জন্য দারেলে যাইতেন। একদিন তাঁহারা জীবন পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। নিয়ম হইল যে—যে দল হারিবে তাহাদের মাথা অপর দল কাটিয়া লইবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা চলিতে লাগিল। পরিশেষে রা অতি কৌশলের সহিত প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া পণানুসারে তাঁহার শ্যালকদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্ত্রী—"সোণী" ভাইদের মৃত্যু সংবাদে শোকে অভিভূত হইয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য একদিন তাহার স্বামীর খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশাইয়া দিলেন। বিষাক্ত দ্রব্যে স্বামীর মৃত্যু হইলে পর রাণী রাজ্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। স্বামীর মৃত্যুর একমাস পরে রাণীর একটি পুত্র সন্তান জন্মিল এবং তাহার নাম হইল "ত্রাখান"। কিন্তু রাণীর মনে তখনও ভ্রাতৃহত্যার প্রবল প্রতিহিংসা জাগিতেছিল তিনি ভ্রাতৃহত্যাকারীর সন্তানের মুখ দর্শন করিতেও ইচ্ছুক হইলেন না এবং একটী ছোট কাঠের বাক্সে শিশুটিকে আবদ্ধ করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। বাক্সটী ভাসিতে ভাসিতে চিলাস জেলার 'হোদার' নামক স্থানে পৌঁছিল। হোদারের একটী সংসারে দুইটী ভাই বাস করিত, তাহারা বড়ই দরিদ্র ছিল। একদিন কাঠ কাটিতে কাটিতে দেখিতে পাইল যে একটী কাঠের বাক্স নদীতে ভাসিয়া যাইতেছে, ক্রমে বাক্সটী কিনারায় আসিয়া ঠেকিলে পর দুই ভাই মনে করিল হয়ত ইহার মধ্যে টাকা কড়ি আছে। ইহা মনে করিয়া একজন নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাক্সটীকে তীরে তুলিয়া আনিল, কেহ দেখিতে পাইবে ভয়ে

(৪) Shabkatur—a ruler of Chitral.

তাহারা সেখানে আর বাক্সটী খুলিল না—কাঠের বোঝার মধ্যে লুকাইয়া বাক্সটী বাড়ী লইয়া আসিল, বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সহিত বাক্সটী খুলিয়া দেখিল বাক্সের মধ্যে একটী সুন্দর জীবিত শিশু! দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী শিশুটিকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল কিন্তু শিশুটীকে পাওয়ার পর হইতে যেন তাহাদের অবস্থা ফিরিয়া গেল। দিনে দিনে তাহাদের অভাব দূর হইতে লাগিল; সকলেই মনে করিল শিশুটী দেবতা, তাহারই আগমনে তাহাদের সৌভাগ্য ফিরিল।

শিশুটীর বয়স যখন ৬ বৎসর তখন একদিন কাঠুরিয়ার স্ত্রী তাহার প্রাপ্তিবিবরণ তাহাকে খুলিয়া বলিল।

শিশুটী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে পর একদিন সে গিলগিটে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। গিলগিটের সুখসম্পদ ও ভূমির উর্ব্বরতা প্রভৃতির বিষয় সে পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়া আসিতেছিল। কাঠুরিয়া পত্নী তাহাতে বাধা না দিয়া আপন পুত্রটীকেও তাহার সঙ্গে দিল। দুটী ভাই বেড়াইতে বেড়াইতে "হাবালী" পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গিলগিটের উত্তর ধারে অবস্থিত এই পাহাড়ের উপরটা বেশ সমতল ছিল। এই স্থানে তাহারা দুই ভাই কিছুদিন অতিবাহিত করিল, এই সমতল স্থানটীর নাম 'বলদাস'।

এদিকে গিলগিটের রাণী তখন সঙ্কটাপন্ন পীড়িত। গ্রামবাসীগণ 'রা' বংশের আর কেহই নাই বলিয়া 'রা' পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত একজন দক্ষ ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে ছিল।

একদিন প্রত্যূষে মুরগীর ডাক শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। সাধারণত মুরগী যেমন—কোঁকোর কোঁ কোঁ বলিয়া ডাকে সেদিন নাকি মুরগী সেরূপ ডাকিল না; সেদিন মুরগী "বেলদাস-আম-বাই" অর্থাৎ বেলদাস নামক স্থানে একজন 'রা' বংশের লোক এখনও আছে—এই বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে দলে দলে লোক ছুটিল এবং সকলে গিয়া দেখিল যে ২টি বালক বেড়াইতেছে। তখন তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাণীর নিকট হাজির করিল।

'ত্রাখান' দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল—রাণী তাহাকে ডাকিয়া—তাহারা কেন আসিয়াছে—পিতা মাতার নাম কি—কোথায় থাকে ইত্যাদি সকল বিষয় খুলিয়া বলিতে আদেশ করিলেন। ত্রাখান তাহার জীবনের সকল ঘটনা রাণীকে খুলিয়া বলিলে পর রাণী তাহার নিজ সন্তানকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। মনে মনে কতই দুঃখ করিলেন—এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কিনা তিনি নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। রাণী তখন ত্রাখানকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সেই দিনই 'ত্রাখান' গিলগিটের 'রা' বলিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া গেল।

ত্রাখান ও দাঁড়কাক

কথিত আছে যে গিলগিটের 'রা' ত্রাখান অতিশয় গর্ব্বিত ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। একদিন তিনি আপন অনুচরগণ সহ নদী-

তীরে বসিয়া বলিলেন—"আমার মত সাহসী ও শক্তিশালী 'রা' আর পৃথিবীতে কেহ নাই।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা কাক তাহার মাথার উপর মলত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে বেয়াদপ কাকটার উপর তিনি বড়ই চটিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ কাকটাকে যেরূপেই হউক ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন, রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ কাকের পশ্চাতে লোক ছুটিল।—বহুলোকের তাড়া খাইয়া কাকটা প্রথমত মনোওয়ার, পরে নদী পার হইয়া দানিয়ার গ্রামে উপস্থিত হইল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত লোক তাড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া কাকটা দানিওর নালাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় 'রা'এর অনুচরগণ দেখিল যে একটি স্ত্রীলোক মার্কহোর পশুর মাংস জলে ধুইতেছে, তাহার নিকট হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া তাহার প্রলোভনে বশ করিয়া হতভাগ্য কাকটাকে ধরিয়া ফেলিল।

'রা'এর নিকট কাকটাকে আনা হইলে, কি জন্য সে গিলগিটের প্রবল পরাক্রান্ত 'রা'এর মাথায় মলত্যাগ করিয়াছে' এই প্রশ্ন পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। কাকটা উত্তর করিল—যে তোমার গর্ব্বে আমায় হাসি পাইয়াছিল। কারণ তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া এরূপ গর্ব্ব করিতেছিলে সেই স্থানেই একজন তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী বীরের সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সেই স্থানটী খুঁড়িয়া দেখিলে একটি অঙ্গুরী পাইবে, অঙ্গুরীটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে সে তোমার অপেক্ষা কত অধিক শক্তিশালী ছিল।

রা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটি খুঁড়িতে আদেশ দিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি আঙটি পাওয়া গেল; সেই অঙ্গুরী দেখিয়া 'রা' অবাক হইয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন যে, তাহার সর্ব্বশরীরটী অঙ্গুরীটির মধ্য দিয়া অনায়াসে গলিয়া যাইতে পারে। 'রা' তখন সন্তুষ্ট হইয়া সুপাচ্য আহার্য্যে কাকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন।

সুমালিকের সাহস

কথিত আছে যে 'সুমালিক' নামক একজন 'রা' গিলগিটে ছিলেন, তিনি তাহার ভগিনীর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ইয়াসীনের শাসনকর্ত্তা ফরমাইসকে একটী কুকুর প্রদান করেন। বাদখাসানের 'রা' তাজমোগল, যখন গিলগিট আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে 'দারকোট' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন তখন ফরমাইস একখানি পত্র লিখিয়া সেই কুকুরটীর গলায় বাঁধিয়া গিলগিট অভিমুখে কুকুরটীকে ছাড়িয়া দেন। পাঁচঘণ্টার মধ্যে কুকুর আসিয়া গিলগিটে হাজির হইল। সুমালিক সেই পত্রপাঠ করিয়া ভগিনীপতির সাহায্যের নিমিত্ত একদল দক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন, উভয় পক্ষের সৈন্য সমূহ একই সময়ে ইয়াসিনে উপস্থিত হইয়া নদীর উভয় পারে শিবির সন্নিবেশ করিল।

"মঙ্গলের" সৈন্যগণ পথশ্রমে কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই সুতরাং অনতিবিলম্বে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে তাহারা ব্যস্ত হইল। এদিকে গিলগিট হইতে ইয়াসীনের সৈন্যগণ কেবলমাত্র সেইদিন ইয়াসীনে

পৌঁছিয়াছিল। মঙ্গলসৈন্য গিলগিটের প্রধানকে সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধে আহ্বান করিলে পর গিলগিট 'রা' স্বীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত বলিয়া দুএকদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন এবং সেইসঙ্গে মঙ্গল সৈন্যগণের মধ্যে কেহ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী থাকিলে তাহার কৌশল দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 'রা'এর অনুরোধে তাজমোগল তাহার একজন বিখ্যাত যোদ্ধাকে তাহার শক্তি ও যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ পাইয়া সেই ব্যক্তি একটী বৃহৎ ছাগল ধরিয়া এরূপ বলের সহিত নিক্ষেপ করিল যে ছাগলটী নদীর অপর পারে গিলগিট 'রা'এর তাম্বুর নিকটে আসিয়া পড়িল।

সুমালিক অতিশয় বলবান ছিলেন। মঙ্গল সেনার শক্তি দর্শন করিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। নিকটে একটী প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল তিনি তাহা ধরিয়া অবলীলা ক্রমে নদীর পর পারে মঙ্গলদের শিবিরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সুমালিকের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া মঙ্গলগণ অত্যন্ত ভীত হইল এবং সেই রাত্রেই ইয়াসীন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রত্যূষে সুমালিক দেখিলেন যে নদীর পরপারে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই—শত্রুসৈন্য পলায়ন করিয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুসরণ করিলেন এবং দারকোট নামক স্থানে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন কিন্তু দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করায় দৈবক্রমে অশ্বের পদস্খলন হওয়ায় তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। মঙ্গলগণ সেই সুযোগে তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দীভাবে বাদখাসানে উপস্থিত করিল।

মঙ্গলসৈন্য গিলগিটের 'রা' কে চিনিত না—তাহারা মনে করিয়াছিল যে একজন পথিক হয়ত ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছে; আর গিলগিটের 'রা' যে তাহাদের অনুসরণ করিবে ইহাই বা তাহারা কি প্রকারে জানিবে, সুতরাং কেহই গিলগিটের 'রা' কে চিনিতে পারিল না।

যাহা হউক রা বন্দী হইয়া মীরের রান্নার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। একদিন বনে কাষ্ঠ সংগ্রহ কালে 'রা' একটা জন্তুর মাথার হাড় হাতে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সংবাদ 'বাদখাসানের মীরের কর্ণে পৌঁছিল, মীর তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর 'রা' বলিলেন যে—ইহা একটী উৎকৃষ্ট 'তালিকার' অশ্বের মাথা। দ্রুত গতিতে ইহার সমান ঘোড়া পৃথিবীতে আর নাই।

তাজমোগল জন্তুর সম্বন্ধে বন্দীর এরূপ অভিজ্ঞতা দেখিয়া তাহাকে স্বীয় অশ্বশালার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পশুশালায় এরূপ অশ্ব আছে কিনা পরীক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে একটী ঘোড়ার পেটে একটী 'তালিকার' বাচ্ছা হইয়াছে, কিছু সেই ঘোড়ার পেট কাটিয়া বাচ্ছাটীকে বাহির করিতে হইবে নচেৎ অল্প দিনের মধ্যেই ঘোড়াটী মারা পড়িবে।

মীরের অনুমতি লইয়া রা সেই ঘোড়ার

পেট কাটিয়া বাচ্ছাটী বাহির করিলেন। মীর এই তালিকার ঘোড়া লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিয়া তৎসঙ্গে একটী উপাধি প্রদান করিলেন। ক্রমে 'রা' এর যত্নে ঘোড়াটী বড় হইতে লাগিল। রা ঘোড়াটীকে লইয়া ময়দানে শিক্ষা দিতেন এবং ক্রমে শিক্ষার গুণে ঘোড়াটী এরূপ হইল যে 'রা' তাহাতে চড়িয়া চার ঘণ্টায় ১০০ মাইল ঘুরিয়া আসিতে সমর্থ হইতেন।

একদিন সুমালিক মীরকে বলিলেন যে ঘোড়াটী এখন চড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে সুতরাং শুভদিন দেখিয়া একটী সভা করুন এবং নূতন ঘোড়ার উপর উঠিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। দরবারের জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট হইল,—দেশের যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজ-কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—লোকে লোকারণ্য হইল। সেই দিন ঘোড়াটীকে উত্তম রূপে স্নান করাইয়া স্বর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দরবারে আনয়ন করা হইল। সুমালিকও সেদিন একটী উৎকৃষ্ট পোষাক পরিলেন। দরবার স্থলে ঘোড়াটীকে আনিলে পর সুমালিক ঘোড়াটীর দ্রুত গমন শক্তি সর্ব্বসমক্ষে দেখাইবার জন্য মীরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক মীরকে কহিলেন—

"যাহাকে তোমরা বন্দী করিয়া আনিয়াছিলে সেই আমিই গিলগিটের রা সুমালিক; এক্ষণে তোমার ঘোড়ায় চড়িয়া আমি পুনরায় দেশে ফিরিয়া চলিলাম। তোমার সাধ্য থাকে আমাকে ধর; বিদায়-বিদায়।"

এই কথা বলিয়া সুমালিক অশ্বসহ দরবার হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! মীরের সৈন্যগণ চারিদিকে ছুটিয়া চলিল কিন্তু 'রা'কে ধরে কার সাধ্য! কেবল এক ব্যক্তি সুমালিকের পশ্চাৎ ত্যাগ করিল না। তাহা দেখিয়া সুমালিক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সেই ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন। মীরের সৈনিক নিকটে আসিলে রা কহিলেন—

"তোমার মত একজন লোকের পক্ষে আমাকে বন্দী করা অসম্ভব, কেন বৃথা প্রাণ হারাইবে, ফিরিয়া যাও। তবে তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে তোমার ঘোড়াও যদি তালিকার ঘোড়া হয় তবেই আমাকে ধরিতে পারে। নচেৎ অন্য কোন অশ্বের সাধ্য নাই যে আমার অনুসরণ করে।

মীরের সৈন্য তাহার কথায় অত্যন্ত সুখী হইয়া ফিরিয়া গেল এবং মীরের নিকট গিয়া আপন অক্ষমতা জানাইল।

দারকোট পথে সুমালিক পৌঁছিয়া দেখিলেন যে ফরমাইস তাঁহার ভগিনীর উপর অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। কারণ ফরমাইস্ মনে করিয়াছিল যে সুমালিক আর আসিতে পারিবে না সুতরাং তাহার আর কোন ভয় নাই। সুমালিক ফরমাইসকে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিয়া গিলগিট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক তাঁহাকে কয়েকটী উপদেশ দান করিলেন। কারণ সুমালিক ক্রুদ্ধ হইলে বুদ্ধিহারা হইতেন ইহা সেই বৃদ্ধ লোকটীর জানা ছিল। বৃদ্ধ তাহাকে বলিয়া দিলেন যে—তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত অস্ত্রদ্বারা কাহাকেও আঘাত করিও না—অপর অস্ত্র অন্বেষণ করিয়া তাহা দ্বারা আঘাত করিও। সুমালিক সেই বৃদ্ধের উপদেশ মত চলিতে স্বীকৃত হইলেন।

সুমালিক গিলগিটে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন যে তাহার স্ত্রী একটী অপরিচিত পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে! তাহা দেখিয়া সুমালিক অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া মারিতে উদ্যত হইবামাত্র সেই বৃদ্ধের উপদেশ তাহার স্মরণ হইল। তিনি অন্য অস্ত্রের অন্বেষণে গমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে অপর পুরুষটী আর কেহই নহে—সেটী তাহারই প্রিয়তম পুত্র —খিস্‌রা খান।

সুমালিক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সেই অহিতকর কর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার উপদেশদাতা বৃদ্ধকে বহু অর্থ উপ-ঢৌকন প্রদান করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন

(প্রথম ভাগ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম, এ, মূল্য দুই টাকা—প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। পৃষ্ঠ ২২৬।

তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে একদা যিনি আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ প্রতিভা বিকাশে সমগ্র দেশের চিত্তকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, যাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য প্রভাবে ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাকৃতজনের বোধগম্য হওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং যিনি এইদেশে ব্রহ্মবিদ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ দার্শনিক ঋষি শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত ও তাঁহার দার্শনিক মত অতি সংক্ষেপে গ্রন্থকার এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া লেখা কোন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে পাঠ করি নাই; দ্বিজদাস বাবু এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া প্রকৃতই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শঙ্করের জন্ম ও বালচরিত অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে মনে হইতেছিল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষকে ঈশ্বরের অবতার প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্ম ও বালচরিত ঘেরিয়া নানা অলৌকিক ঘটনার ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে। শঙ্কর যে মহাদেবের অবতার তাঁহার শিষ্যগণ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কত কাহিনীই না প্রচার করিয়াছেন। আবার একস্থলে পড়িলাম মহাদেব একদিন শঙ্করের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাদেব কয়টি?

শঙ্করের দার্শনিক মত সম্বন্ধে দ্বিজদাস বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া মনে অনেক তর্ক উঠিয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে গোবিন্দলাল শঙ্করকে উপনিষদের যে যে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল শ্লোকের পূর্ব্বাপর পাঠ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহারা সমাধিস্থ জীবের সমাধি অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করের মতে আত্মা এক এবং তাহার মতকে মায়াবাদ বলা চলে, ইহা নূতন বলিয়া ঠেকিল।

ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার ইতিহাসে শঙ্করের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক সাঙ্খ্যকার কপিলমুনির দর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র বলিয়াছেন। যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়া এই মত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহার পূর্ব্বাপর অর্থাৎ Context পাঠ করিলে কপিলমুনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এ বাক্যে কি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে ইহা লইয়া আলোচনা

আরম্ভ হইয়াছে। সাংখ্য বলিতেছেন "যত সম্বন্ধং সতং তদাকারোলেমি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্" তারপর প্রশ্ন উঠিল যোগীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা অতীত অনাগত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়; উক্ত লক্ষণ যোগীর প্রত্যক্ষে ঘটিতে পারে না। ইহার উত্তর "যোগীনাম্‌বাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ" অর্থাৎ যোগীর অতীত অনাগত সমীপস্থ অথচ পুরস্থ বস্তু যোগজসামর্থ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। ইহাদের ইন্দ্রিয় যোগবল দ্বারা দিব্য শক্তি প্রাপ্ত হয়; অতএব যোগীর প্রত্যক্ষে কোন দোষ হয় না। প্রশ্ন হইল ঈশ্বরের ত স্থূল ও সূক্ষ্ম কোনই ইন্দ্রিয় নাই তবে উক্তরূপ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের হইতে পারে না। ইহার উত্তরে কপিল বলিতেছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধে" ঈশ্বরে এ দোষ অসিদ্ধ অর্থাৎ ঘটিতে পারে না; কেন না জীব বিষয় (object) হইতে দূরে থাকে বলিয়া বিষয় লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় আবশ্যক হয় (জন্য প্রত্যক্ষ)! ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ। তাহাকে কিছু লাভ করিতে হয় না। প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার ইন্দ্রিয় আবশ্যক হয় না। সমস্ত পদার্থের মধ্যেও বাহিরে তিনি ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। অতএব ইন্দ্রিয় না থাকিলেও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে কোন দোষ ঘটিতে পারে না সাঙ্খ্যকার একথাই বলিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৫ সূত্রে প্রশ্ন হইল, অনন্ত শক্তি সম্পন্ন প্রকৃত পরমাত্মার অধীন কি করিয়া হইতে পারে। ৫৬ সূত্রে ঋষি উত্তর দিতেছেন "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" আবার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রে কপিলাচার্য্য বলিলেন "বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার পর প্রশ্ন হইল "বৈদিক কর্ম্মের দ্বারাই যদি ফলসিদ্ধি হয় তবে ঈশ্বর থাকিবার প্রয়োজন কি?" তদুত্তরে কপিলমুনি বলিলেন "ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফল নিষ্পত্তি কর্ম্মণাতৎসিদ্ধি"। এই প্রশ্নোত্তর হইতে সাংখ্য-দর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার হেতু কি তাহা বুঝিলাম না।

মায়া সম্বন্ধেও দ্বিজদাস বাবু শঙ্করের মতামত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই।

ছোটখাট ভ্রমপ্রমাদ বইখানিতে বিরল নহে। দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইলে বইখানি অধিকতর সুপাঠ্য ও সুগম্য হইবে।

দ্বিজদাস বাবু আজীবন শাস্ত্রালোচনা করিয়া আসিতেছেন—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয়। বহুকাল হইতে ভারতী প্রমুখ অন্যান্য মাসিক পত্রিকাতে এই বিষয়ে তিনি লিখিতেছেন। এই বৃদ্ধবয়সে নানা শোক দুঃখের আঘাত পাইয়াও তিনি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমে, ধৈর্য্য করিয়া বহু অধ্যায়ে প্রথমভাগ শেষ করিয়াছেন। এই নির্লিপ্ত ভাব পণ্ডিত জনেরই উপযুক্ত। এতদ্বারা তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। গ্রন্থখানি পাঠে সেই শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া যায়।

গ্রন্থখানি বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরের বস্তু,—ইহা পাঠে যে সকলেই অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বস্তুত আমার মত লোকের পক্ষে ইহার সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র, তাহা আমি করিও নাই। বইখানির যে যে স্থলে আমার মনে প্রশ্নোদয় হইয়াছে, যে স্থান সুবোধগম্য বা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে পারি নাই তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। আশাকরি দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার এই বিষয়গুলি বিশদরূপে মীমাংসা করিয়া দিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাউলের গান

হে গুরু, হে স্বামি তুমি এই দীনজনে,
শিখালে বাজাতে বীণা অতি সযতনে।
সুর বাঁধিবারে কিন্তু শিক্ষা দাও নাই,
সে কষ্ট সে শ্রম নিজে লয়েছ সদাই।

আজ তুমি নাহি কাছে, গেছ চলি দূরে;—
ছিন্ন ডোর বীণা তাই বাজিছে বেসুরে।
নীরব ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল সুতান,
একতারে বাজে শুধু বাউলের গান।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্য্যাতনসহিষ্ণু ভারতবাসী

এই কলিকাতা নগরীতে সাত আটটি মহিলাসমিতি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারপীড়িত ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সমিতিসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগে বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ ২০ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ভবনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভাস্থলে প্রায় দেড় হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়া গিয়াছিল। এখানে শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র যাহা পাঠ করিয়া ছিলেন—তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অন্যান্য নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে তাহার সংবাদ আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে পড়িয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাঁহারা অকুতোভয়ে যেরূপ আত্মত্যাগ করিতেছেন তাহার পুণ্য সুরভি সুদূর সমুদ্রের উপর দিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে ভারতবাসী স্বদেশ ছাড়িয়া সেই সুদূর আফ্রিকায় গিয়া বাস করিতেছে কেন? তাহাদের উপর অত্যাচারই বা কেন হইতেছে? সে অত্যাচার কিরূপ? এমন অত্যাচার সহিয়া ভারতবাসীর সেখানে থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? দেশে ফিরিয়া আসিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়।

কেপকলনি, নেটাল, অরেঞ্জিয়া, ও ট্রান্সভাল, এই চারিটি প্রদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত। এই সকল স্থানেই ভারতবাসীগণ বাস করিতেছেন এবং অত্যাচারে পীড়িত হইতেছেন। বুয়ারদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের পূর্ব্বে কেপকলনি ও নেটাল ইংরাজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। বুয়ারগণ পরাজিত হইলে উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ লইয়া বুয়ার এবং ইংরাজের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। কানাডা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা এক্ষণে ইংলণ্ডের একটি উপনিবেশ। ইহার শাসনভার বুয়ার এবং ইংরাজের মিলিত পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত। বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ এবং ইংলণ্ড হইতে গভর্ণর প্রেরণ, এই তিনটি বিষয় ইংলণ্ড কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় এবং কেবলমাত্র এই তিনটি বিষয় লইয়াই দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ। অন্যান্য সকল বিষয়েই ইহা স্বাধীন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত এই সকল প্রদেশে বহু সোণার, কয়লার এবং হীরকের খনি আছে। সেখানে চিনির কারবার সুবিস্তৃত। চিনি প্রস্তুতের জন্য বহু আকের ক্ষেত, চায়ের ক্ষেত্র এবং কয়লার কারখানা আছে। বুয়ার যুদ্ধের বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানের দুইটি প্রদেশ (কেপকলনি ও নেটাল) যখন ইংরাজ অধিকার ভুক্ত ছিল তখন এই সকল খনির ও কারখানার মালিকগণ এবং চা-কর ও চিনিকরগণ ব্যবসা বাণিজ্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে পরিশ্রমী, মিতাচারী এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন মজুর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানি করিবার জন্য ইংলণ্ডকে অনুরোধ করেন। এতদিন তাঁহারা কাফ্রি কুলি লইয়া এই সকল কাজ চালাইতেন। কিন্তু কাফ্রিগণ তাঁহাদের ব্যবসা ক্রমশই অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছিল। এই সকল ব্যবসায়ীগণের স্বার্থের উন্নতির জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে একদল মজুর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত নেটালে প্রেরণ করেন। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষ হইতে কুলি চালান হইতেছিল।

বিদেশে ধনোপার্জ্জনের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, আপনাদিগকে দারিদ্র্য রাক্ষসীর ভীষণ গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া দীন দুঃখী ভারতবাসী সেই কোন্ অজানা, অচেনা রাজ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিল।



শ্রীযুক্ত গান্ধি

সম্মুখে যে কি উত্তালতরঙ্গ, কি ভীষণ সংগ্রাম, কি শোচনীয় ভবিষ্যৎ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তাহাদের জানা ছিল না। তাহারা তখন ভবিষ্যৎ সুখের আশায় মোহমুগ্ধ। আর তাহাদের মালিকগণও তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের এক মোহন ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত যে বড় ভীষণ। ভারতবর্ষে ভারতবাসী দরিদ্র, কিন্তু বিদেশী আসিয়া এই ভারতবর্ষ হইতেই মণিমুক্তা খুঁড়িয়া লইয়া সম্পদশালী হইতেছে। ভারতবাসী "নিজ বাসভূমে পরবাসী," তাই আহার অন্বেষণে তাহাকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল।

নেটাল তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত। খনির ইংরাজ মালিকগণ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ মজুরদিগের বসবাসের নানা প্রকার সুবিধা করিয়া দিলেন। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহারা স্বাধীনভাবে জমিজমা লইতে পারিবে, চাসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে এই অধিকার প্রদান করিলেন। ক্রমে মজুরদিগের সহিত বণিক ভারতবাসী স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নেটালে গমন করিতে লাগিলেন। নেটালে এই শ্রেণীর ভারতবাসীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহারা তত দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য দেশে গিয়া ব্যবসা করিতে উৎসুক হইলেন। একদল ভারতবাসী স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নেটালের সীমা অতিক্রম করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন। ট্রান্সভাল নেটালের নিকটবর্ত্তী আর একটি প্রদেশ। ইহা তখন বুয়ারের অধীন উপনিবেশ ছিল। মিতাচারী, পরিশ্রমী, শান্ত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া ভারতবাসীগণ ঐ সকল প্রদেশে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের কুড়ি বৎসরের মধ্যে নেটালের ইংরাজ ও ট্রান্সভালের বুয়ারগণ দেখিলেন ভারতবাসীর সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁহারা পরাজিত হইয়া যাইতেছেন। তখন তাঁহাদের স্বার্থে প্রবল আঘাত লাগিল। বণিক জাতি পকেটে টান পড়িলেই ক্ষেপিয়া উঠে। সেই সময় হইতে আজিকার এই ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। ভারতবাসী যাহাতে স্বাধীনভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কলকারখানা চালাইতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহারা নানারূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁহারা ভারতবাসীকে কেবল মাত্র কুলিরূপেই চাহেন,—কেননা ভারতবর্ষীয় কুলি না হইলে তাঁহাদের ব্যবসাবাণিজ্য অচল—কিন্তু সেখানে স্বাধীন ভারতবাসীর অস্তিত্ব তাঁহাদের অসহ্য। স্বাধীন ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাড়াইবার জন্য তাঁহারা নানা প্রকার ঘৃণ্য আইন করিয়া যে অত্যাচার সুরু করিয়া দিলেন তাহারই দূরীকরণ চেষ্টা ইংরাজের সহিত বুয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ। অনেকেই একথা জানেন যে বুয়ার যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ এই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভারতবাসীর প্রতি বুয়ারগণ যে অত্যাচার করিতেছেন তাহা দূর করাই আমাদের এই যুদ্ধের প্রধান কারণ। ভারতবাসী আমাদের প্রজা, তাহাদের প্রতি অত্যাচার কি আমরা সহ্য করিতে পারি? বুয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যে শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিব তাহা ভারতবাসীর সকল দুঃখ দূর করিবে, ভারতবাসীর প্রতি সুশাসনে তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া অগণ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিজের দেশের বাছা বাছা বীর পাঠাইয়া আমাদেরই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বুয়ারদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে রত হইয়াছিলেন। এই সংগ্রামে ভারতবাসী নানা প্রকার অসুবিধার জন্য যদিও যুদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই কিন্তু মিঃ গান্ধির নেতৃত্বাধীনে প্রায় এক হাজার ভারতবাসী ইংরাজদিগের পক্ষে থাকিয়া আহতদের সেবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্বলন্ত গোলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কালান্তক অগ্নিবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া রণক্ষেত্র হইতে আহত যোদ্ধাদিগকে খাটিয়াতে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সে সময় তাঁহাদের অকুতোভয়তা, অক্লান্ত উৎসাহ, অকুণ্ঠ সাহস দেখিয়া ইংরাজগণ চমকিত হইয়াছিলেন এবং এই আত্মত্যাগের ফলে যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ভারতবাসীগণের

অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা ভারতবাসীর এ উপকার বিস্মৃত হইলেন। বুয়ারগণ পরাজিত হইবার পর সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা যখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন পার্লামেণ্ট গঠিত হইল তখন ভারতবাসীর সকল আশা নির্ম্মূল হইল। উপকারের প্রত্যুপকার যে ধর্ম্মসঙ্গত তাহা কাহারও মনে হইল না। বুয়ারদের অধীনে বাস করিবার সময় ভারতবাসীর প্রতি যত অত্যাচার হইত, ইংরাজ ও বুয়ারে মিলিত পার্লামেণ্টের অধীনে ততোধিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। জানিনা ইংরাজদের মত ন্যায়পরায়ণ জাতির ন্যায়নিষ্ঠতা, শুভ কামনা কোন্ দেবতার অভিশাপে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে সকল অত্যাচার-মূলক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি আইন প্রধান :—

(১) ইমিগ্রেসন আইন। এই আইন অনুসারে আসিয়ার কোন অধিবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নামিতে হইলে এমন কয়েকটি সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় যাহা মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ধর্ম্মের বিরোধী। কোন ইউরোপীয়কে এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় না।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কেপ কলোনিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদের এই অধিকার ছিল।

(৩) নেটালের ভারতবাসী মজুরগণ চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাৎসরিক ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিবার পর তথায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে তাহাদের বাস করিবার অধিকার নাই।

(৪) ভারতবর্ষ হইতে মজুরদিগকে চুক্তি বদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। আইন করা হইল প্রত্যেক চুক্তি-মুক্ত ষোল বর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষ এবং তের বৎসরের ও তদূর্দ্ধ বয়সের নারী বৎসরে ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিতে বাধ্য। এই আইনের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, স্বাধীন ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বহিষ্কৃত করা, কারণ ট্যাক্স দিতে না পারিলে তাহারা জেলে যাইবার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ চুক্তি মুক্ত হইবার পর ট্যাক্স দিতে অসমর্থ হইলে তাহারা পুনরায় চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কেন না স্বাধীন ভাবে বসবাস করিতে গেলেই এই ট্যাক্স দিতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান নেতাগণ বলিয়াছেন, "আমরা ভারতবাসীকে এদেশে যে চাই না এমন নহে, কিন্তু তাহাদিগকে কুলিরূপে চাই, তাহারা আমাদের দাস হইয়া আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া দিবে। নিজেরা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আপনাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তাহাদের দেশকে সম্পদশালী করিবে কেন? আমাদের দেশে যখন আসিয়াছে তখন চিরকাল আমাদের দাস হইয়া থাকুক। স্বাধীন ভাবে আমাদেরই মত প্রজাস্বত্ব ভোগ করিয়া, কারখানা খনির মালিক হইয়া, জমিদার হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে, একি তাহাদের স্পর্দ্ধা? কৃষ্ণবর্ণ জাতির এ স্পর্দ্ধা কখনও বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। অতএব স্বাধীন ভারতবাসীর অস্তিত্বের মূলোচ্ছেদের জন্য এই ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইল। এই রক্তশোষণকারী ট্যাক্স কত পরিবারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, কত পুরুষকে পাপে ডুবাইয়া দিতেছে, কত রমণীকে অধর্ম্মের পথে দাঁড় করাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাবিয়া দেখুন, একটি পরিবারে পিতা, মাতা, একটি ষোল বর্ষ বয়স্ক পুত্র এবং একটি তের বর্ষের কন্যা থাকিলে প্রত্যেককেই বৎসরে ৪৮ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। কোন দরিদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রতি বৎসর এত টাকা ট্যাক্স দেওয়া কি ভয়ানক ক্লেশকর!

(৫) দক্ষিণ আফ্রিকায় কিংবা তাহার বাহিরের কোথাও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে যে বিবাহ হইয়াছে তাহা অবৈধ। এই আইন অনুসারে কোন হিন্দু কিংবা মুসলমান স্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ স্ত্রী বলিয়া গণ্য নহেন। সুতরাং কোন বিবাহিতা হিন্দু কিংবা মুসলমান রমণী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ প্রবেশ করিতে পারেন না। কিংবা দেশে থাকিলে স্বামীর নিকট যাইতে অথবা অল্পদিনের জন্য দেশে ফিরিয়া আসিতে আইনতঃ অক্ষম। তাঁহাদের বিবাহ অবৈধ বলিয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও অসিদ্ধ। এই জঘন্য,

জঘন্য আইন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীকে উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া এই আইন দূর করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত। সমগ্র ভারতনারী-সমাজের প্রতি একি ঘোর অবমাননা! ভারতবর্ষের নারীত্বের প্রতি একি ঘৃণা অত্যাচার! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনীর জন্মভূমির কন্যাগণের প্রতি একি নিদারুণ, নিষ্ঠুর অপমান! ভগিনীগণ! আমরা মৃত, আমরা কুসুমশয্যায় শুইয়া আরামে, আয়াসে দিন কাটাইয়া দিই বলিয়া নারীর এই অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া আছি। বিদেশে আমাদের ভগিনীগণের মস্তকে যে অপমানের জ্বালা পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, আমরা কি তাহার এক বিন্দুও অন্তরে অনুভব করিতে পারি? কিন্তু সেই সুদূর বিদেশে অত্যাচারে পীড়িত, অপমানে জর্জ্জরিত, আমাদেরই ভগিনীগণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন তাহা অতুলনীয়।

মিঃ গান্ধির জেলে যাইবার পূর্ব্বে মিসেস গান্ধির সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয় তাহা একান্তই হৃদয় বিদারক। মিসেস গান্ধি রোষে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ দেশের আইনানুসারে আমরা ত স্বামী স্ত্রী নই। আমাদের সন্তানেরাও অবৈধ। যে দেশের এমন ঘৃণ্য আইন, চল সে দেশ হইতে চলিয়া যাই।"

মিঃ গান্ধি বলিলেন, "না, তাহাত হইবে না। এই আইন রহিত করিয়া ভারতবাসীর অপমান দূর করিতে আমাদিগকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

মিসেস গান্ধি বলিলেন, "তুমি জেলে গেলে, আমার জীবন ধারণের সার্থকতা কি?" ইহার পরই মিসেস গান্ধিও সংগ্রামের রক্ত পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন, আর দলে দলে নারীগণ আপনাদের মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহার তলে মিলিত হইলেন। উপরি উক্ত পশুজনোচিত আইন অমান্য করাতে মিসেস গান্ধি, তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং অন্যান্য কত রমণী আজ কারাগারের নিষ্ঠুর পীড়নে জর্জ্জরিত হইতেছেন। উল্লিখিত আইন ব্যতীত ভারতবাসী সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার অপমানসূচক আইন বিধিবদ্ধ আছে। ভারতবাসীকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে হইলে দশ আঙ্গুলের দশটি ছাপ এবং দুই হাতের দুইটি ছাপ এই বারটি ছাপ দিতে হয়, আইনে ভারতবাসীকে সর্ব্বত্রই কুলি বলিয়া লিখিত আছে। যাহারা কুলি স্বরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন নাই এমন সব স্বাধীন ব্যবসায়ী ভারতবাসীয় কুলি বলিয়া আইনে আখ্যাত হইয়াছেন। ভারতবাসী হইলেই তাঁহারা কুলি, আর তাঁহাদের চোর, ডাকাত প্রভৃতির সামিল করা হইয়াছে। ভারতবাসীর ফুটপথে হাঁটিবার অধিকার নাই। যে ট্রামে, ট্রেনের যে কক্ষে কোন ইউরোপীয় যাইতেছেন তাহাতে ভারতবাসীর চড়িবার অধিকার নাই। ব্যবসা করিবার জন্য ভারতবাসীকে প্রায়ই লাইসেন্স দেওয়া হয় না। শতবার আবেদন নিবেদনে পরিশ্রান্ত হইয়া মিঃ গান্ধি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মহতী সভায় ভারত প্রবাসীদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, এই ঘৃণ্য অপমানজনক পাশব আইন মান্য করা অপেক্ষা আমরা কারাগারের যাতনা সহ্য করিব। যতদিন না এই দুঃসহ অত্যাচার নিবারিত হয়, যতদিন না ভারতবাসীর ইজ্জত রক্ষিত হয় ততদিন আমরা এই দেশের বে-আইন মানিব না এবং তাহার ফল স্বরূপ যে দণ্ড ভোগ করিতে হয় করিব। ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকার passive resistance—ধর্ম্মঘট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কারণ। এই সংগ্রামের ফলে এ পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ ৩ হাজার ৫ শত বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এক শত লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, শত শত পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং সমগ্র সম্প্রদায় আজ পথের ভিখারী। আজ কত পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ কারাগারে আবদ্ধ বলিয়া রমণীগণ অসহায়া, শিশু সন্তান অনাহারে মৃতপ্রায়। খনির মালিকগণ খনিগুলিকে জেলখানায় পরিণত করিয়াছেন, আর তাঁহারা হইয়াছেন জেলার। কুলিদিগকে সেইখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জেলের আইনানুসারে কোন কয়েদী অবাধ্য হইলে জেলার তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে এবং ইচ্ছামত বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে পারে। খনিগুলি জেলখানায় পরিণত করাতে এই ফল হইয়াছে যে খনির মালিকগণ ইচ্ছামত কুলি-

দিগকে গুলি করিয়া মারিতে কিংবা বেত্রাঘত করিতে পারেন। অনেক স্থলে খনির কুলিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে তাহাদিগকে কাজে আনিবার জন্য খনির মালিকগণ তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে মৃতপ্রায় করিতেছেন। ব্যবসা করিবার জন্য ভারতবাসীকে অনেকস্থলে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কতবার এইরূপ ঘটিয়াছে যে এই আইনের প্রতিবাদ কল্পে ভারতবাসিগণ বিনা লাইসেন্সেই রাস্তায় জিনিষ ফেরী করিয়াছেন। পুলিস আসিয়া যেই তাঁহাদের ধরিয়া কারাগারে লইয়া গেল, অমনি একদল নারী আসিয়া জিনিষ ফেরী করিতে আরম্ভ করিলেন, পুলিস ইহাদিগকেও ধরিয়া লইয়া গেল, আবার আর একদল আসিলেন। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একাগ্র নিষ্ঠা, ও আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁহারা আজ ভারতবর্ষের নরনারীর বীরত্ব জগৎসমক্ষে ঘোষিত করিতেছেন। এখন এই সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা বহন করিয়া অবনত মস্তকে যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তবে তাঁহারা অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন বটে কিন্তু বিদেশে ভারতবাসীর গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের এই যে প্রাণপণ সংগ্রাম ইহার অক্ষয় ফল হইতে তাহা হইলে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়। তাঁহারা ভারতবাসীর অপমান সূচক এই সকল আইন রহিত করিয়াই ভারতবাসীর মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদের সহিত ভারতবাসীকে সমান আসনে বসাইয়া ভারতবর্ষের মহিমা ও গৌরব জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই সংগ্রাম আরো পাঁচমাস কাল অব্যাহত রাখিতে পারিলে তবে সুবিচারের আশা আছে। এই পাঁচ মাস তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিতে হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রতিমাসে অন্ততঃ ৭০ হাজার টাকা পাঠাইতে হইবে।

আজিকার এই সহানুভূতি জ্ঞাপন কেবল কাগজে কলমে না থাকিয়া, কেবল প্রস্তাবের মধ্যে আবদ্ধ না রহিয়া প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হউক! আমাদের অত্যাচার পীড়িত লাঞ্ছিত ভাইভগিনীদিগের দুঃখে অন্তরের দুঃখ ঢালিয়া দিয়া, তাঁহাদের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া তাঁহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথের যাতনা প্রাণে বিন্দুমাত্রও অনুভব করিবার জন্য আজ আমরা প্রস্তাব করি যে সমগ্র বঙ্গনারীসমাজ এক প্রাণে মিলিত হইয়া একটি দিন নির্দ্ধারণ করিয়া উপবাস করুন। সে দিনের আহার্য্যের ব্যয় প্রত্যেক নারী, লাঞ্ছিত ভাই ভগিনীদিগের জন্য প্রেরণ করুন। সমগ্র বঙ্গের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থানের রমণীসমাজকে পত্র লিখিয়া ঐ দিনে উপবাস করিতে অনুরোধ করুন। একটি দিনের এই সামান্য ত্যাগ সমগ্র দেশের নারীসমাজের অন্তরে যে শক্তির তরঙ্গ উত্থিত করিবে তাহা হয়ত আমাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক জড়তা, আরামপ্রিয়তা, ও নিশ্চেষ্টতা হইতে তুলিয়া ধরিয়া মনুষ্যত্বের ভাবে জাগরিত করিতে সক্ষম করিবে।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র।

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিং দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয়তার জন্য আমরা ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ

সকলেই জানেন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতের শ্রেষ্ঠ সম্মান—নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সম্মানকে আমরা ব্যক্তিবিশেষের সম্মান বলিয়া মনে করিতে পারি না—আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যে জগতের সমক্ষে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন ইহা আমাদের দেশেরই গৌরব। এই গৌরব-আনন্দে পূর্ণ হইয়া কবিবরকে অভিনন্দন করিবার মানসে গত ২৩ শে নভেম্বর প্রায় পাঁচশত লোক কলিকাতা হইতে স্পেশল ট্রেণে বোলপুর শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। তাহার বিশদ বিবরণ এখানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—কারণ সে সংবাদ প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা কেবল সেই দিনের সংগৃহীত কয়েকখানি ছবি এইস্থানে প্রকাশিত করিলাম।



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এত সম্মানেও রবীন্দ্রনাথকে গর্ব্বিত করিয়া তুলে নাই। আমরা নিম্নে এই উপলক্ষে রচিত তাঁহার একটি গান প্রকাশিত করিলাম। ইহা হইতে তাঁহার অন্তরের প্রকৃত ভাব সকলে বুঝিতে পারিবেন।



বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতনে যাত্রা



রবীন্দ্রনাথের সভায় আগমন

গান

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
এরে পর্‌তে গেলে লাগে,
এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে
সুর নাহি যে সরে,
তাই ত ব'সে আছি
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।
ফুলের মালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে
ওরই পরে মন দিতে যাই মন লাগে না কাজে॥ তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঁশী

বৃদ্ধ নান্নি ছোট ছোট নাতি নাতিনী-গুলিকে লইয়া একটা মাদার গাছের তলে বসিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছিল। বহুদিন বিদেশে কাটাইয়া সে সেই মাত্র কয়দিবস দেশে ফিরিয়াছিল;—ইচ্ছা জীবনের শেষ দিন কয়টা এমনি আমোদে সে কাটাইয়া দিবে। সারা জীবনটা যুদ্ধ ব্যবসায়ে কাটাইয়া সে তখন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—হিংসা, দ্বেষ আর তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। যৌবনের সে উদ্যম আর নাই—বাহুতে সে অসুরের বল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত দেহ জরাজীর্ণ; ভীলপুত্র নান্নি আজ শিশুর মতই দুর্ব্বল।

শরতের নির্ম্মল রাত্রি। উপরে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান্। সারা পৃথিবী তাহার স্নিগ্ধ কিরণ মাখিয়া একখানি লাবণ্যময়ী রমণীপ্রতিমার মত দেখাইতেছিল।

"দাদা! তুই বাজা আমরা শুনি - হ্যাঁ দাদা বাজা!" ছয় বৎসর বয়স্কা পৌত্রী ভুটির হঠাৎ বাজনা শুনিবার ইচ্ছা হইল। সে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধ নান্নিকে 'বাজা, বাজা' বলিয়া উত্যক্ত করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ভুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল,—"কি বাজাব দিদি?"

"সেই তোর বাঁশিটা—হ্যাঁ দাদা বাজা!"

বৃদ্ধের সহিত সর্ব্বদাই একটী বংশ নির্ম্মিত বাঁশি ফিরিত—এক দণ্ডও সে সেটীকে কাছ ছাড়া করিত না। কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে সেটি বাজাইতে দেখে নাই!

বৃদ্ধ আবার হাসিয়া বলিল,—"ছি দিদি! ও কথা ব'ল না আমি কি বাজাতে জানি যে বাঁশি বাজাব?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক বলিল,—"না, জানিস্ না বই কি! ইঃ! তুই মিছে কথা ব'লছিস্। যদি বাজাতেই না জানবি তবে তোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিটা সর্ব্বদা ফেরে কেন?"

বৃদ্ধ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বের মত কেবল বলিল,—"নারে দাদা—সত্যি ব'লচি আমি বাজাতে জানিনা।"

বালক বালিকারা কিন্তু তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। ভুটি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—"আচ্ছা দাদা এত ক'রে বল্লুম তুই তবু একবার বাঁশিটা বাজালিনে আমিও আর তোর পাকা চুল তুলে দেব না। বেশ, বেশ!"

বৃদ্ধ বালকের মত সরল প্রাণে একবার হাসিয়া উঠিল তাহার পর বলিল,—"না দিদি রাগ করিস নি। আমি ত বাঁশি বাজাতে জানি না—আচ্ছা তার চেয়ে বরং একটা গল্প বলি শোন! কেমন? তা হ'লে ত' আর রাগ থাকবে না?"

বালক বালিকারা সোৎসাহে তাহাকে ঘেরিয়া বসিল, বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা তাই বল, সেই বেশ হবে। কিন্তু যুদ্ধুর কথা—ভুতের গল্প হ'লে হবে না।"

বৃদ্ধ বলিল,—"আচ্ছা তাই ব'লচি শোন!"

বৃদ্ধ যে গল্পটি বলিল তাহা এই:—

সে আজ প্রায় ষোল সতের বৎসর পূর্ব্বের

কথা। আমি তখন সৈন্যদলের সহকারী সেনাপতি। সেই বৎসর একটা খুব বড় যুদ্ধ হয়,—সারা দেশটায় হাহাকার পড়িয়া যায়; কত লোক যে সে যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল তাহা গণনা করা কঠিন।

সেই সৈন্যদলের মধ্যে আমার একটী বন্ধু ছিল,—সে রামদীন্। আমি তাহাকে ঠিক ভায়ের মতই ভাল বাসিতাম, স্নেহ করিতাম; সেও যে আমায় তেমনি ভাবে স্নেহ করিত সে কথা আমায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রামদীন্ আমার অকপট মিত্র ছিল।

আমাদের দলের যিনি সেনাপতি ছিলেন রামদীনের সহিত তাঁহার কোন দিনই মনের মিল ছিল না। কি জানি কেন তিনি তাহাকে একবারেই দেখিতে পারিতেন না—মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার নাম ছিল সেনাপতি আদভ। লোকটা ভারী বিলাসী ও কুচরিত্র। রামদীনও কখন তাঁহাকে সুনজরে দেখে নাই—তাঁহার ছায়া মাড়াইতেও সে ঘৃণা বোধ করিত।

আমরা যখন গুপ্তচরের মুখে শুনিলাম, শত্রু আমাদের গ্রামের প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে ছাউনী ফেলিয়াছে তখন আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরাও যথা সম্ভব যুদ্ধের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলাম। যে রূপেই হউক শত্রুকে পরাজিত করাই তখন আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য;—আমরা সংকল্প করিলাম প্রাণ দিয়াও আমরা আমাদিগের এ উদ্দেশ্য সাধন করিব,—দেশের ও প্রভুর মান রক্ষা করিব। কিন্তু তখন জানিতাম না যে ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগের প্রতিকূল!

রাত্রি তখন ঠিক কত আমি জানি না। হঠাৎ আমার বস্ত্রাবাসের মধ্যে কাহার পদশব্দ হইল। সেইমাত্র আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—সে শব্দে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; দৃঢ় মুষ্টিতে পিস্তলটা চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে?"

স্পষ্টস্বরে উত্তর হইল,—"আমি রামদীন?"

আমার একটু উৎকণ্ঠা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রামদীন্ তুমি? এত রাত্রে হঠাৎ আমার কাছে—ব্যাপার কি? শত্রুরা শিবির আক্রমণ ক'রেছে নাকি?"

"না ভাই সে রকম কিছু নয়, আলোটা জ্বাল আমি ব'লচি।"

আমার যথেষ্ট কৌতূহল জন্মিল। আমি আলো জ্বালিয়া রামদীনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কি দেখিলাম? দেখিলাম তাহার মুখ দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ! আমি সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি বল দেখি?"

"আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"বিদায় নিতে এসেছ? এত রাত্রে? কেন, কেন, হঠাৎ তোমার হ'ল কি? আমি যে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। হ'য়েছে কি বল দেখি?"

"নতুন কিছুই নয়, সেই পুরাণ ঝগড়া। আজ হঠাৎ সেনাপতির সঙ্গে আমার বচসা হয় তাতে তিনি আমায় বাঁদির বাচ্চা ব'লেছেন আমি কিন্তু এর জন্যে তাঁকে কখনও ক্ষমা ক'রব না। প্রতিজ্ঞা ক'রেচি তাঁরই রক্তে মা'র এ মিথ্যা কলঙ্ক মুছব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রব।"

আমি তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলাম, "প্রকৃত মানুষের কাজই ত এই! তা হ'লে এখুনি তুমি যাচ্চ?"

"হ্যাঁ—এখুনি, এখুনি। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে না। আর দেখ, আমার ত' মনে হয় খুব সম্ভব কালই তোমাদের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ বাধবে।"

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সে যাই হোক তুমি এখান থেকে চ'লে যাচ্চ ব'লে আমাদের বন্ধুত্ব বোধ হয় যাবে না! অন্ততঃ আমার ত' এই ইচ্ছে যে যেখানেই তুমি থাক আজীবন আমরা পরস্পরকে বন্ধু ব'লে মনে ক'রব।"

"এ কথা না ব'ল্লেও চ'লত। আমি তোমায় ঠিক ভাইয়ের মতই ভাল বাসি। আমার বিশ্বাস এই যুদ্ধে আমরা দু'জনেই ম'রব। কিন্তু মরবার আগে আমায় একটা কাজ ক'ত্তেই হবে!"

"কি কাজ রামদীন?"

"সেনাপতি আদভের মাথা কাটা—এ কাজটা আমি নিজের হাতেই ক'রব।"

আমরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম। তাহার পর রামদীন অন্ধকারে মিশাইয়া গেল আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমাদের পূর্ব্ব অনুমান সত্যে পরিণত হইল। দেখিলাম শত্রুসৈন্য আমাদিগের শিবিরের অদূরে সজ্জিত হইয়া আমাদেরই অপেক্ষা করিতেছে! বেলা প্রায় নয়টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় একদল মুসলমান সৈন্য আমাদিগের অধীনস্থ সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। দেখিলাম রামদীনের অধীনে সে দল পরিচালিত হইতেছে,—তাহার পরিধানে তখন মুসলমান সেনানায়কের পরিচ্ছেদ!

কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর রামদীনের অধীনস্থ সেনাদল পরাজিত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল,—আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলাম। কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে রামদীন তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিল,—স্বহস্তে গুলির আঘাতে সেনাপতি আদভকে নিহত করিল।

তাহার পর আরও বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। ভাগ্যদেবী ক্রমেই আমাদিগের বিপক্ষ পক্ষকে অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শেষে আমি সদলবলে বন্দী হইলাম। সে রাত্রির মত আমরা নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে আবদ্ধ রহিলাম। সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন প্রাতে আমাদের গুলি করিয়া মারা হইবে।

কতক্ষণ পরে মৃত্যুর দূতরূপে প্রভাত আসিয়া আমাদিগের কক্ষে দেখা দিল।

আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

একজন রক্ষী আসিয়া আমাদিগের পরিচ্ছেদ খুলিয়া লইয়া এক একটা কৌপিন পরাইয়া দিল। আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এইবার বুঝি গুলি করা হবে?"

কি জানি কেন রক্ষী একটু নম্রস্বরে বলিল,—"না, এখনও তিন ঘণ্টা বাকি!"

আমার মন তখন রামদীনকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া আমাদিগকে বধ্যভূমে লইয়া চলিল।

তখন প্রায় শেষ মুহূর্ত্ত! মুসলমান

সেনাপতি আমার দলের একজন সৈন্যকে মুক্তি দিলেন। সে লোকটা দামামা বাজাইত—এই জন্যই তাহাকে ক্ষমা করা হইল। শুনিলাম সুলতানের আদেশ, বাদকদের হত্যা করা না হয়!

আমার তখন মুহূর্ত্তের জন্য একবার মনে হইল,—"হায়! হায়! আমি যদি কোন রকম বাজনাও বাজাতে জানতাম!" অবশ্য মুক্তি লাভ করিলে শত্রুদলে যোগ দিতে হইবে। তাহাতে কি? প্রাণটাত' রক্ষা পাইত! কিন্তু সে কথা ভাবিয়া ফল কি? আমিত গান বাজনার কিছুই জানিনা!

আমাদিগকে এক সারিতে দাঁড় করাইয়া আমাদের চোখ বাঁধিয়া দিল।

লক্ষ্য করিয়াছিলাম দশজন হত হইলে আমায় গুলি করা হইবে। অন্তিম কাল সন্নিকট বুঝিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া একে একে আমার পত্নী, পুত্র ও রামদীনের মূর্ত্তি ভাসিয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তেই গুলি করিতে আরম্ভ করিল।

এক! দুই!.....

আর শুনিতে পাইলাম না। আমার শরীরের মধ্য দিয়া রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমার সহজ জ্ঞান লোপ পাইয়া আসিল। অতি কষ্টে আমি দণ্ডায়মান রহিলাম। আবার বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। ওঃ! সে কি শব্দ! জীবনে আমি তাহা ভুলিতে পারিব না।—আমি কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না, কিন্তু তবু আমার মনে হইল গুলিতে আহত হইয়াছি! ঠিক সেই সময়ে কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। * * *

চক্ষু চাহিলাম!

কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল—"তবে বোধ হয় এখনও চোখ বাঁধা আছে।" চোখে হাত দিলাম; হস্ত আমার মুক্তচক্ষু স্পর্শ করিল। অদূরে একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। বুঝিলাম রাত্রি নয়টা আমি তখন একটী অন্ধকার ঘরে অবস্থিত। কাহার একটী ছায়ামূর্ত্তি আমার দিকে সরিয়া আসিল।

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার লোকেরা? কোথায় তারা?"

উত্তর হইল,—"কবরে।"

স্বর আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না;—সে রামদীন্!

রামদীন বলিতে লাগিল,—"তোমার সাম্‌নেই সেনাপতিকে গুলি করি তা তুমি দেখেচ। তারপর ক্রমান্বয়ে লোক মারতে লাগলুম। ক্রমে অনেক রাত্রি হ'ল;—আকাশে চাঁদ উঠল। কিন্তু তোমায় কোথাও খুঁজে পেলুম না। শিবিরে ফিরে তোমার সন্ধান কল্লুম কিন্তু তোমায় দেখতে পেলুম না। খুঁজে খুঁজে শেষে হায়রাণ হ'য়ে পড়লুম;—ক্লান্তিতে শরীর অবশ হ'য়ে এল—ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আজ যখন তোমার সঙ্গীদের গুলি করা হয় তখন আমার ঘুম ভাঙ্গল'। তার আগে আমি মনেও করিনি যে তুমি বন্দী হ'য়েছ। ছুটে বধ্য ভূমিতে এসে হাজির হলুম—দেখলুম আর দু'জনের পরই তোমায় গুলি ক'রবে। আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তোমায় সেখান থেকে সরিয়ে আনলুম।

উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে বল্লুম,—

"এ লোক নয় সেনাপতি সাহেব এ লোক নয়।"

"কেন? ও কি একজন বাজিয়ে নাকি?

"সত্যি কথা ব'লতে কি নান্নি! কাণায় চোখ পেলে যেমন আহ্লাদিত হয় 'বাজিয়ে' কথাটা শুনে আমার ঠিক তেমনি আহ্লাদ হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বল্লুম,—"হ্যাঁ সাহেব এ খুব একজন ভাল বাজিয়ে—ওদের দলের মধ্যে সেরা!"

"সেনাপতি গম্ভীর মুখে বল্লেন,—হুঁ, ও কি বাজায়?"

"ও—ও—ও—হ্যাঁ—ও বাঁশী, বাঁশী বাজায়।"

"সেনাপতি পিছনে ফিরে কাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, বাঁশীবাজিয়ে লোক আমাদের দরকার আছে কি?"

"লোকটা পাঁচ সেকেণ্ড নিরুত্তর রইল—সেই পাঁচ সেকেণ্ড আমার কাছে পাঁচ যুগ ব'লে বোধ হ'তে লাগল!

"সে লোকটা ব'ল্লে—'হ্যাঁ সাহেব, আমাদের বাঁশী বাজন্দার কাল মরে গেছে।'

"আমার দিকে ফিরে সেনাপতি বল্লেন,—'তবে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

"মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে আমি তোমায় এখানে নিয়ে এলুম।"

রামদীনের কথা শেষ হইল।

আমি বলিলাম—ভাই রামদীন্! তুমিই এ যাত্রায় আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেচ।"

"সে কথা এখন থাক—এখন বল দেখি তুমি বাঁশী বাজাতে জান?

"জানি বটে, খুব সামান্য! সে কি আজকের কথা! সেই ছেলে বেলায় একবার একটু শিখেছিলুম। এখন তা আর মনে নেই ব'ল্লেই হয়।"

"তবে সত্যি কথা বলতে গেলে তুমি বাঁশী বাজাতে মোটেই জান না! হা অদৃষ্ট! এত ক'রেও তোমায় বাঁচাতে পারলুম না! যে মুহূর্ত্তে সুলতানের কাণে এ কথা পৌছবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমায় গুলি ক'রে মেরে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক ব'লে আমারও প্রাণ যাবে।"

ইতিপূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যে আশার বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল রামদীনের কথা শুনিয়া সে ক্ষীণ শিখাও নিভিয়া গেল। বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, আমার ডাক ক'দিন পরে প'ড়বে? আন্দাজ?"

"প্রায় এক পক্ষের ভিতর তোমায় ডাক প'ড়বে।"

"এক পক্ষ? ঠিক জান?"

"হ্যাঁ ঠিক এক পক্ষ পরে। তুমি ত' মোটেই বাজাতে জাননা আর এ সত্য যুগও নয় যে গাছের কাছে বর নিয়ে তুমি একেবারে হঠাৎ ওস্তাদ হ'য়ে প'ড়বে! কাজেই আমি বেশ দেখতে পাচ্চি আমাদের দু'জনকেই অবিলম্বে মরতে হবে।"

আমি বলিলাম,—"না ভাই রামদীন! আমি চৌদ্দ দিনের মধ্যেই বাঁশীতে ওস্তাদ হব—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখো তুমি!

রামদীন বালকের মত সরল প্রাণে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

* * *

মানুষের মনের জোরের উপর তোমাদের

বিশ্বাস আছে কিনা জানি না কিন্তু আমার ঐকান্তিক আগ্রহে আমি সেই চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যেই বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। কেবল চতুর্দ্দশ দিবসে বলিলে ভুল হয়—চতুর্দ্দশ দিবারাত্রির মধ্যে আমি বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার আহার নিদ্রা ছিলনা,—শুধু বাঁশী, বাঁশী আর বাঁশী।

কি করিয়া শিখিলাম শুনিবে?

প্রথম যেদিন রামদীন আমায় নিরাশ সাগরে ভাসাইয়া দিল তাহার পরদিন প্রাতে আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতে করিতে অদূরে এক কৃষক যুবককে দেখিতে পাইলাম। সে গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া এক মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম! সেই আমার গুরু। তাহার নিকট সেই দিবস কয়েকটী কৌশল শিখিয়া লইলাম। তাহার পর একটী নির্জ্জন উৎসের ধারে বসিয়া ক্রমাগত সাধনা করিতে লাগিলাম।

বাঁশী বাজাইতে শিখিলাম বটে কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারিলাম না;—বিকৃতি ঘটিল।

বাঁশী বাজানই আমার বাতুলতার প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িল। পূর্ণ তিন বৎসর কাল —অহরহ আমি বাঁশী বাজাইতাম।

রামদীন আমায় ত্যাগ করে নাই। যুদ্ধের অবসান লইলে আমরা রাজধানীতে গমন করিলাম। বাঁশী বাজাইয়া সেখানে আমি জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলাম।

বাঁশীই তখন আমার আত্মা। আমার মনে হইত আমি এবং আমার বাঁশী উভয়ের মধ্যে কেবল দৈহিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাহার প্রতি অংশ আমারই অস্তিমজ্জা বলিয়া মনে হইত।

একদিন রাজসভায় আমার ডাক পড়িল।

সুসজ্জিত সভাগৃহে দেশের গণ্যমান্য সকল লোকই উপস্থিত ছিলেন। আমি বাজাইতে লাগিলাম। কখনও করুণ কখনও হাস্য কখনও রুদ্ররসে সভাগৃহ বিচলিত করিয়া তুলিলাম। সমবেত কণ্ঠে আমার যশঘোষিত হইল। এই ভাবে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

সেই দুই বৎসর পরে রামদীন আমায় ত্যাগ করিয়া একাকী পরলোকের পথে যাত্রা করিল। তাহার মৃত মুখ দেখিয়া আমি যেন ঘোর নিদ্রার পর সহসা সচেতন হইয়া উঠিলাম।

শবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাঁশীটা একবার করুণ সুরে বাজাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা পারিলাম না। কোথায় ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ফুৎকার দিতে হয়, কোন স্থান টিপিয়া ধরিতে হয়, কখন কোন অঙ্গুলি তুলিতে হয় শত চেষ্টাতেও তাহা আর আমি মনে আনিতে পারিলাম না।

এখন আমি গীতবাদ্যে একেবারেই অজ্ঞ, অক্ষম!

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কপিলাবস্তু

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধদেব শাক্যমুনির জন্ম হইয়াছিল। এই কপিলাবস্তুকে মঙ্গোলগণ, "কাবিলিক্" এবং চীনগণ "কে-সিলো-ফা-সাটো" বলিয়া থাকেন। পালিভাষায় ইহাকে "কপেলা ভান্নু," ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় "কপিলা-ভাট," শ্যামভাষায় "কপিলাপাৎ," সিংহলীয় ভাষায় কিম্বৌলভাট্" ও নেপালী ভাষায় ইহাকে "কপিলপুর" বলে। তিব্বতীয়গণ "সের-স্কাই- ঘ্রোং" রূপে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদের অর্থ, "যে দেশের ভূমি কপিল বর্ণ।"

চৈন বিবরণ অনুসারে এই নগর ভারতের উত্তরে, অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত। তিব্বতীয় গ্রন্থমতে কপিলনগর বা কপিলাবস্তু কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই কৌশলই অযোধ্যা। শাক্যসিংহের জন্মের সময় মধ্য-ভারতের অধিকাংশ স্থানই মগধরাজ্যের অধীন ছিল; কৌশলও সেই সকল রাজ্যের অন্যতম ছিল। তাই অনেকে বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুকে মগধের অন্তর্গত বলিয়াছেন। মগধ আবার বুদ্ধদেবের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, সেইজন্য বহু বৌদ্ধ তাঁহাদের বিধানকর্ত্তার জন্মস্থান মগধই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১)

তিব্বতবাসী বলেন, কপিলাবস্তু কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে ভাগীরথীর তীরপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। এ ভাগীরথী আধুনিক বঙ্গ-মধ্যে প্রবাহিতা ভাগীরথী নহে; আধুনিক রোহিনী নদীকে পূর্ব্বে ভাগীরথী বলিত। জাপানী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে (Encyclopedia) ইহা নেপালের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া লিখিত। একটী বৌদ্ধগ্রন্থ কাশী সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া ইহাকে কপিলাবস্তুর দক্ষিণে বলিয়াছেন, এবং জাপানী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া প্রদত্ত হিন্দুস্থানের মানচিত্রে "কিয়াপিলো" (কপিল) কাশীর এবং "অযুথো" (অযোধ্যা) বা "কি উশালো" (কোশল) রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী "ফা-হিয়ান" "কিজাও" (কান্যকুব্জ) হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে গমন করিয়া "কি উশালো" (কোশল) রাজ্যে উপস্থিত হইলেন ও তথা হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া তিনি—"কে-ওয়ে-লো-ওয়ে" (কপিলাবস্তু) নগরে আগমন করিলেন।

এই কথা অবলম্বন করিলে কপিলপুর নেপালস্থিত পর্ব্বতোদ্ভূত মহানন্দ সহযুক্তা রোহিনী নদীর তীরবর্ত্তী। রোহিনী গোরক্ষপুরের নিম্নে বাপ্তি নদীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে।

Hodgson নামক জনৈক ইংরেজ তাঁহার কৃত Essay on Buddhism প্রবন্ধে বলেন,—"Kapilavastu was situated near Ganga Sagar."

পাঠক উপযুক্ত উত্তর পাইয়াছেন ত? কোথায় বা সে বঙ্গদেশান্তর্গত গঙ্গাসাগর আর কোথায় বা কোশল রাজ্যের কপিলাবস্তু! সাহেব বোধ হয় রামায়ণে বর্ণিত কপিলাশ্রমকেই কপিলাবস্তু বলিতেছেন।

---

(১) See Journal Asiatic Society, vol. I. P. 27.

আমরা যদি ফা-হিয়ানের "সে-ওয়ে" (Fyzabad) হইতে ভ্রমণ অনুসরণ করি তাহা হইলে আমাদিগের গমনের দিক হইবে দক্ষিণপূর্ব্ব। এই স্থান হইতে বোধ হয় আমরা গোরক্ষপুরের উত্তরে আসিতে সমর্থ হই না, আমাদিগকে গোরক্ষপুরের দক্ষিণেই অবস্থিতি করিতে হইবে। অতএব কপিলাবস্তু ঘর্ঘরা বা গঙ্গার তীরদেশে বলিতে হয়।

কপিলাবস্তু সংস্থাপন সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শ্রুত হয়। প্রবাদটী এই,—

"এক সময় চারিজন রাজপুত্র বহু ব্রাহ্মণ, ধনী প্রভৃতি সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অবশেষে বারাণসীর এক দিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারি ভ্রাতা তথায় মন্ত্রণা করিতে বসিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যদি বলপূর্ব্বক পরের রাজ্য গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদিগের যশের যথেষ্ট অপমান করা হইবে।" তাঁহারা পরস্পরের যুক্তি মত একটী নগরের প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কতিপয় ব্যক্তি সহ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অপর তিনজন অবশিষ্ট ব্যক্তি সহ যোগ্যস্থান নির্ব্বাচনার্থ গমন করিলেন। অবশেষে তাঁহারা কপিল নামক একজন ঋষিকে হ্রদ সম্মুখবর্ত্তী প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের তলে নিরীক্ষণ করিলেন। ঋষিবর রাজকুমারত্রয়কে তাঁহাদের অভিসন্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন মুনিবর তাঁহার সেই তপোবন নগরে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, "যখন শৃগাল শশকের দিকে ধাবিত হয়, তখন সেই শশক এই তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র শৃগাল প্রতিগমন করে। যদি কোন ব্যক্তি এইস্থানে বাস করেন, তিনি দেব ব্রাহ্মণের সুচক্ষে পতিত হন; তিনি যুদ্ধ সময়ে বিপক্ষকে শীঘ্রই পরাজিত করিতে সমর্থ।"

রাজকুমারগণ ঐ স্থানেই নগর সংস্থাপন করিলেন এবং উহা শেষ হইলে মুনিবরের নামানুকরণে উহার নামকরণ করিলেন। সেই জন্য ঐ স্থান "কপিলাবস্তু" বা "কপিলপুর" বলিয়া কথিত।"

Mr. Turnour সাহেব বলেন, শাক্যমুনি রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তু দর্শনার্থ গমন করিলেন ও প্রতি দিবস এক যোজন পথ ভ্রমণ করিয়া দুইমাসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণের পরিমাণ হয় ৬০ যোজন। (২)

যদি আমরা ৪ মাইলে একযোজন ধরি তাহা হইলে রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তু ২৪০ মাইল হয় এবং ইহা ফাহিয়ানের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। অতএব কপিলাবস্তু ঘর্ঘরা নদীর তীরে ও গোরক্ষপুর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে।

ফাহিয়ানের বর্ণনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় কপিলাবস্তু কুশি নগর হইতে ২৪ যোজন পূর্ব্বে ও ঘর্ঘরা নদীর তীরদেশে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীতারানাথ রায়।

(২) Journal Asiatic Society, vol. VII p. 791.

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি।

ভিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২০ [১০ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(৪৭)

সত্যর বিবাহ, বিবাহে সমারোহ যথেষ্ট হইল, কিন্তু সুখ হইল না। শিবনারায়ণ চেষ্টা করিয়াও মানসিক গ্লানির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। কমলার প্রত্যেক স্মৃতিটি আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়া করুণাময়ীকেও যেন পোড়াইতে লাগিল, সকল উদ্যোগ আয়োজন যেন শোভাহীন নিরানন্দ ঠেকিতে লাগিল; কেবলই মনে হইতেছিল, কাহাকে না আনিয়া এ কাহাকে আনা হইতেছে? গভীর নিশ্বাস উঠিতে বসিতে বুকের মধ্য হইতে যন্ত্রণাকাতরধ্বনি করিয়া বলিতেছিল "মা কমল! আমার এ'কি করে গেলি মা! আমায় এ কি শাস্তি দিতে এসেছিলি?"

কিন্তু যাহার জন্য এ পরিবারের সকলে অসুখী তাহার আজ সুখের সীমা নাই, সে আজ যেন দশটা হইয়া খাটিতেছে। যেখানের যত চাষাভূষা, দরিদ্র, আতুর আজ সে তাহাদের সকলেরই অভিভাবক। কলিকাতা হইতে নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আসিয়াছে, পায়রা-ডাঙ্গার ছেলেগুলা জড় হইয়াছে, এখানকার পাড়াপ্রতিবাসীদের তো কথাই নাই; এই প্রকাণ্ড দলটি খাইতেছে যত খাটিতেছেও ততোধিক। মনীশের একটি অঙ্গুলি হেলনে ইহারা বোধ হয় আগুনে জলে ঝাঁপ দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। সকলেই কত বিষয়ে তাহার কাছে ঋণী তাহার ঠিক নাই। বিবাহের বরটিও কোমর বাঁধিয়া সকলের পরিচর্য্যায় লাগিয়া গিয়াছিল। কেহ তামাসা বিদ্রূপ করিলে বলিতেছিল, কি করব, দাদা খাটবেন, আর আমি বসে থাকবো?"

দাদার সুখ দুঃখে এখন সত্য নিজের সকল সুখদুঃখ নিমজ্জন করিয়াছে, নদী আসিয়া পারাবারে মিলিয়াছে।

এ বিবাহে ব্রাহ্মণ সজ্জন অনাথ অতিথের উপর যতটা খবর করা হইল, বাহ্যিক ধূমধাম ততটা কিছুই হইল না।

গাত্র হরিদ্রা হইয়া গেল, বরানুগমনের সকল উদ্যোগ প্রস্তুত, রাত্রিশেষে নান্দিমুখ, —সহসা অপরাহ্ণে নন্দকিশোর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখে ঘোর অপরাধ সূচিত হইতেছিল, আদর

আপ্যায়নের সহিত ভাবী বৈবাহিক বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে এ সময় ?

নন্দকিশোরের কণ্ঠ শুখাইয়া গিয়াছিল মৃদুস্বরে তিনি কোন মতে কহিলেন "কি আর বলবো, আপনাদের নিকট আমার মুখ বার করতে লজ্জা হচ্চে—এই দেখুন আজই এই পত্র পেলাম—"

সে পত্র এইরূপ :—"সবিনয় নিবেদন, আপনার নিকট হইতে আসিয়া আমি বৈদ্যনাথ, কাশী হইয়া কানপুরে দুই দিবস যাপন করিয়া অবশেষে এইখানে আসিয়াছি। প্রথমে মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু এখানে আসিবার পর সহসা একটা কৌতূহল জন্মিল। যে মেয়েটিকে আপনার নিকট দেখিলাম সেটি অসামান্য সুন্দরী, কিন্তু আমার পত্নী শ্যামাঙ্গিনী ছিলেন হয়ত কিছু ভ্রমও ঘটিতে পারে, এই সন্দেহে আমি আপনার গৃহের দাসদাসীগণের অনুসন্ধান আরম্ভ করি। রুক্‌নীয়া' নামে একটা দাসীকে আমি চিনিতাম সেই আমার মেয়েটিকে পালন করিতেছিল। অনেক অনুসন্ধানে তাহার খবর পাই, সে এখন কাজ ছাড়িয়া এখান হইতে সাতক্রোশ দূরে 'দেহাদে' ঘরে বসিয়া আছে, সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, এখন লিখিতেও লজ্জা পাইতেছি অথচ না জানাইলেও নয়। গৌরী বলিয়া যাহাকে আপনারা জানেন সে যথার্থ গৌরী নয়, সে বাস্তবিকই আপনার কন্যা, আমার কন্যা গৌরী মারা গিয়াছিল। কাপড় গুলা বোধ হয় তাহারই তাই এই ভয়ঙ্কর ভ্রমে আমি আপনার শান্তগৃহে বিপ্লব বাধাইয়া আসিলাম। কি আর বলিব আপনি সুধীব্যক্তি এ ঘটনায় নীরত্যাগ করিবেন। কুশলাকাঙ্ক্ষী, শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষাল।"

পত্র পাঠান্তে শিবনারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞ হইয়া কহিলেন "এখন উপায় ?"

নন্দকিশোর হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন, লজ্জায় তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। কি বিশ্রী কাণ্ডটাই তিনি হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় আচ্‌কা ঘটাইয়া বসিলেন, দুদিন ভাল করিয়া ভাবিলেও তো হইত।

কিন্তু বিধাতা আপনি যেখানে ঘটক সেখানে বিবাহ বন্ধ হয় না। ভোরের সময় যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হইতে সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম আসিল তখন কর্ত্তব্যবিমূঢ় বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তার মুখে রক্ত ফিরিয়া আসিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ না চলিত থাকায় সমাজের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। আপনি প্রজাপতি সেই বাধা সমাজ হইতে বিদূরিত করিবার জন্যই এই নাট্যাভিনয় করিলেন। এ দেখিয়াও কি তোমরা এখনও দ্বিধা করিবে ? ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া ঈশ্বরের আদেশ কোন্ বিষয়ে কবে প্রচারিত হইয়াছিল ? গৌরী সত্য পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট, ইহাদের পবিত্র বন্ধনে সামাজিক অকল্যাণ দূর হউক, হিন্দু সমাজ প্রকৃত মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাক্।"

এ যেন অলঙ্ঘ্য দেবাদেশ ! শিবনারায়ণ কহিলেন "কি বলো বৈবাহিক !"

"আমার তো কোনই দ্বিধা নাই।" নন্দকিশোরের উত্তরে প্রসন্নচিত্তে শিবনারায়ণ উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, "আমারও বিন্দুমাত্র না। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চেয়ে শাস্ত্রাচার আমরা কি বেশী বুঝি ? ঋষি প্রতিষ্ঠিত সমাজধর্ম্ম ঋষিদ্বারা সংস্কৃত হবে, আমরা এ'কে গড়িনি, আমাদের হাতে ভাঙ্গবেও না।

"তুমি সম্মত আছ মনীশ ?" মনীশ সাগ্রহে উত্তর করিল "সর্ব্বান্তঃকরণে।"

বিবাহ হইয়া গেল, নন্দকিশোর অবশ্য তেমন করিয়া মেয়েলি কান্না কাঁদিতে পারিলেন না কিন্তু তাঁহার মন তেমনিই মুখে দুঃখে একটা অব্যক্ত কান্না কাঁদিতেছিল। মনীশকে ডাকাইয়া বলিলেন "মেয়েটি আমার একটু চঞ্চল তুমি ওর সব ত্রুটি শুধরে নিও।"

মনীশ মৃদু হাসিয়া কহিল "আপনাকে কিছুই বলতে হবে না আমরা ওঁকে আপনার চেয়েও বেশি চিনি।" কত দিন ছিপ কাড়িয়া লইয়া ভৎর্সনা করিয়াছে, কতদিন অপক্ক ফল হাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, সেই সব স্মরণ করিয়া, সে নবদম্পতির পানে চাহিয়া একটু খানি স্নেহের হাসি হাসিল। সেই দুরন্ত বাল্যসঙ্গী দুইটী আজ নম্রশিরে লজ্জাবনত মুখে চিরসঙ্গী রূপে আবদ্ধকরে দাঁড়াইয়া। মনীশের দৃষ্টি গভীর আনন্দের জলে ঈষৎ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

ফুলশয্যার গভীররাত্রে নিদ্রিতা বধূকে জাগাইয়া সত্য কহিল "তোমায় একটা কথা বলি গৌরি, সবচেয়ে দরকারী কথা, তাই সব আগে বলচি। আমার দাদাকে তুমি খুব ভক্তি করো, তিনি যেন কখন তোমার পরে ঈষৎ মাত্র অসন্তুষ্ট না হতে পারেন।" গৌরী অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু কথাগুলার ভাবে ও স্বরে যেন একটু থমকিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ অনুভব করিল, যে সত্যর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া ফিরিতেছিল এ সত্য যেন সে সত্য নয়। একটু ভীত হইল বিস্ময়ও বোধ করিল—মানুষ এত বদল হয় ! নিজেও যে সে অনেকটা বদলাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এ গম্ভীর প্রতিজ্ঞার অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলেও ইহা দ্বারা সম্মোহিত হইয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল "আচ্ছা !"

মনীশের ত্যাগ মনীশের মহত্ত্ব মনীশের স্নেহ তাহার স্নেহাধার ভাইয়ের মনে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। পুত্রের মধ্যে শিবনারায়ণ পুনর্জ্জাত হইয়াছিলেন। এমনি করিয়াই মানুষ অমরত্ব লাভ করে, ইহাই বংশ গৌরব !

(৪৮)

বৃক্ষরোপণান্তে সারা বৎসর ধরিয়া জলসেকাদি দ্বারা তাহাতে একটি দুইটি করিয়া কতকগুলি ফুল ফুটিলে সেই কুসুমচয়নে গাঁথা মালাগাছি কণ্ঠে ধারণ মাত্রে যদি তাহার মধ্য হইতে একটা অতি বিষাক্ত কীট বাহির হইয়া বক্ষে দংশন করে তাহা হইলে মনে যেমন একটা বিস্ময়বিমূঢ় ভাবের সহিত ক্ষোভের ধিক্কার উঠে ফুলশয্যার রাত্রে নবপরিণীতার ব্যবহারে শচীকান্তের চিত্তেও ঠিক সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। বাহিরের ঘরে চৌকিতে বসিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া যতই সে এ ভাবনাকে

প্রতিকূল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিতেছিল, ততই যেন সেগুলাকে ক্ষুরধারে কাটিয়া এই মর্ম্মদাহকারী দুশ্চিন্তা আপনাকে অক্ষয় কবচে আঁটিয়া তুলিতেছিল। পাষাণে প্রাণ সঁপিয়াছিল এমন মূর্খ সে! এই কল্পনার স্বর্গ! এই কমলা! হায় সুন্দর! তোমার অন্তরে বাহিরে কি সকল সময়ই এমনি ভেদ!

মনকে বাঁধিবার কোন সূত্র ছিল না তথাপি হাল ছাড়িলেও চলে না, অপ্রিয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা সংবাদ পত্র টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু হায় মনকে কে ফিরাইবে! সে যে দেশের ছোটলাট, বড়লাট এমন কি সমন্ত্রিসভা সসাগরা ভারতের একছত্রা অধীশ্বরীর কোন সংবাদই আমলে না আনিয়া নিজের কান্নাই কাঁদিতে চাহে। সহসা—একি! একি সংবাদ! সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এও একটা ইন্দ্রজাল, না অপর সকল ঘটনারই মত বাস্তব! বড় বড় অক্ষরে ভিতর দিকে শেষ কলমে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে—"করালীচরণ! কমলাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনো, যাহা চাহ অঙ্গীকার করিলাম।" নীচে সাঙ্কেতিক অক্ষর যাহা আছে তাহাতে শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আন্দাজ করা অসঙ্গত হয় না।

কাগজখানা ভূমিতে ফেলিয়া শচীকান্ত আনত কাতরদৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল, এমন সময় ভৃত্য জানাইল, মাঠাকুরাণী ডাকিতেছেন। এখন! অসময়ে! কেন!

গিরিজাসুন্দরী গৃহমধ্যে একাই ছিলেন, প্রবেশপথে অধো দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিনাথ! বজ্রপাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এ সময় একদিন যে নিশ্চিত আসিবে ইহা সে জানিত এবং এই সময়টা যত বিলম্বে আগমন করে ততই মঙ্গল, মনে মনে ক্রমাগত এই প্রার্থনা থাকিলেও যতক্ষণ না আসিতেছিল তাহাতেও যেন শান্তি পাইতে ছিল না।

ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশে বাতাসে নদীতে যে ভাব ব্যক্ত হয় মানুষের মনের মধ্যে যখন ঝড় আসন্ন তখন তাহার বাহিরটাকে ঠিক তেমনি নির্ব্বাতনিষ্কম্প দেখায়। মাসিমা কহিলেন "তুমি যাকে বিয়ে করেছ সে মেয়ে চাকদায় থাকত?" তাঁহার স্বর স্থির গম্ভীর। অপরাধী কহিল "হ্যাঁ"।

"সে গাঙ্গুলীদের মনীশের বাগ্দত্তা?"

"না, সে বাক্‌দান যথার্থ বাক্‌দান নয়, তার বহু পূর্ব্বে এর ভাই আমার সঙ্গে বাক্‌দত্ত হয়েছিলেন!"

তবে যথার্থই ও মেয়ে রাঢ়ীশ্রেণীর, তুমি স্বীকার করলে?"

পতনোন্মুখ অশনি এবার গর্জ্জিয়া উঠিল "হতভাগা ছেলে এই করতে তুই আমার কাছে এসেছিলি! সভার মাঝখানে আমার মুখখানা একেবারে পুড়িয়ে দিলি!"

আত্মসম্মানে পূর্ণদৃষ্টি জমিদার গৃহিণীর দুই নেত্রে আগুনের হলকা ছুটিয়া গেল "কত বড় বংশের বংশধর তুই—কি মহা পুরুষের সন্তান একবার ভাবলি নে। এত বড় একটা দাগ মহাপাতক একটা ছেলেখেলার মতন অনায়াসে করে গেলি! তুই আমাদের শচি? দুধের ছেলে তুই, তোর মধ্যে এত বড় প্রবঞ্চনা একি ভাবতে পারা যায়!—"

রুদ্ধকণ্ঠে সহসা তিনি থামিয়া গেলেন মাতৃহৃদয়ের নারীহৃদয়ের সমস্ত বেদনা হতা

এক কালীন্ ব্যাকুল বেগে তাঁহার রোষানল উদ্দীপ্ত বক্ষের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। নির্ব্বাক্ অভিমানে তিনি তখনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন রত্নপুকুরের অবস্থা বলিবায় নয়। পল্লীগ্রামের দলাদলি যাঁহার জানা আছে এমন একটা কাণ্ডে সেখানকার অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে কেবল তাঁহারাই তাহা ধারণা করিতে পারিবেন। বৌভাতের যজ্ঞ দেখিতে দেখিতে দক্ষযজ্ঞের আকার ধারণ করিল। গৃহিণীর বহু যত্নেও এ ঘটনা শত কর্ণ সহস্র কর্ণ হইতে মুহূর্ত্তাধিক কালব্যয় হয় নাই।

তখন ভোজনশীলগণ ভোজ্য দ্রব্য সকল চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া ঘোর রোলে উঠিয়া পড়িল। রান্না ঘরে বড় বড় হাণ্ডায় ডাল ভাত পুড়িয়া তীব্রগন্ধে দশদিক ভরাইয়া তুলিলেও নামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হইল না। অনেকে সহর্ষে লুণ্ঠন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল,—বারণ করিবার কেহই নাই। ভদ্র, অভদ্র, বালক, বৃদ্ধ, মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে মিলিয়া কেবল একই ঘোঁট, ঐ একই কথা। দেখিতে দেখিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে কমিটী বসিল, ছড়া বাঁধা হইল, রাস্তায় রাস্তায় এই অপূর্ব্ব মিলন সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল, জমিদার বাড়ী ও সে বাড়ীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এক ঘরে করা এক বাক্যে সাব্যস্ত হইয়া গেল।

দেশটা যখন হাস্যে রহস্যে কুৎসায় ভাসিতেছিল কর্ম্মগৃহের মধ্যে তখন অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতার তালে এক মহাবিচ্ছেদের সূচনা জাগিয়া উঠিতেছিল। ক্ষীর, দধি, মৎস, পায়স, ব্যঞ্জন টকিয়া একটা অসহনীয় গন্ধ নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছিল। যাদুমন্ত্রে পাষাণে পরিণতবৎ উৎসবানন্দময় গৃহ গভীর নিস্তব্ধ। যে যেখানে আছে যেন গঠিত মূর্ত্তিবৎ জমিয়া আছে। প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে, অথচ শরীরে যেন প্রাণের কার্য্য নাই। সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে কাহার মৃত্যুশয্যা ঘেরিয়া তাহার শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

গিরিজাসুন্দরী হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন "দোষ সবারি শুধু এখন ওকে দুষলেই বা হবে কেন? বিয়ে দিয়ে আনলে কোন বাড়ী থেকে, তার খবরটুকুও কেউ নিলে না, এইজন্যই বলে বুড় হলে সংসারে থাকতে নেই। এখন এর বিহিত কি স্থির করলে কেউ?"

এই বিষয়েই এত পরামর্শ চলিতেছিল, উপায় স্থির না করিয়াও কেহ স্থির ছিল না, কেবল মুখ ফুটিতেই একটু বাধিতেছিল। এখন ভরসা পাইয়া পুরাতন ভৃত্য মাথা চুলকাইয়া বলিল "ব্যাপারটিতো বড় সোজা নয় গড়িয়েও গেল অনেকখানি—"

"ভূমিকায় দরকার নাই, যা হয়েচে তা তুমিও দেখছ, আমিও দেখতে পাচ্চি; যা হবে সেইটেই এখন সবাই ভাবো।"

"হবে,—হ্যাঁ তাই তো ভাবা হচ্চে—তা আমি ওদের ঘরে ডেকে আনচি"

হরচন্দ্র সরিয়া পড়িল। পরক্ষণে বাসন্তীর মাতামহ, শিশিরের পিতা ও দেশের গণ্যমান্য দলপতি ও পরামর্শদাতাগণ অনেক ছন্দোবন্দে অন্তরালে সমাগত গৃহিণীকে জানাইলেন যে তাঁহার ঘরের কলঙ্ক নিজেদেরই মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহারা চুপ করিয়া

আছেন কিন্তু এত বড় কাণ্ডটাকে তো তাই বলিয়া চাপিয়া যাওয়া চলে না, তাহাতে সমাজ একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এখন অবহিত হইয়া যতশীঘ্র সম্ভব এ কলঙ্কের দাগ ধুইয়া নির্ম্মল হইতে হইবে। বিধান জিজ্ঞাসায় কহিলেন, যা সব চেয়ে সোজা, ঐ কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া শচীকান্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক স্বঘরে বিবাহ করুন্, সকল গোল মিটিয়া যাক্।"

গিরিজা একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়েটির দশা কি হইবে?"

"ঐ রাঢ়ীর মেয়ের! কি হইবে? বাপের ঘরে গিয়া থাকুক। কোন্ ভাল কুলীনের ঘরের মেয়ে রাঢ়ী বারেন্দ্রের ঘরে শ্বশুর ঘর করিয়াছে!" মাসিমা ভাবিলেন হায় শচি! অভাগিনীর জন্মটা খোয়াইয়া দিলি, কি করিলি রে! কিন্তু এ ভিন্ন উপায়ই বা কি? গোপনে উহার খোরপোষের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিব, কিন্তু ঘরে লওয়াও তো চলে না, সমাজ তো আগে।

বাসন্তীর মাতামহ এ দলের অগ্রণী, শচীকান্তর উপর ক্রুদ্ধ হইবার তাঁহার কারণও আছে। মনের মত বর যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন এই বর্জ্জন কার্য্যটা সমাধা করাইয়া ছন্‌লা তলার বন্দীশালায় এই অবাধ্য যুবককে বাঁধিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রস্তাব করিলেন এ সকল কার্য্যে বিলম্ব অবিধেয়, প্রত্যূষেই রাঢ়ী কন্যাকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, শচীকে একবার ডাকাইয়া কথাবার্ত্তা স্থির করা হউক।"

এ যুক্তিতে সকলেই সায় দিলেন।

পাশের ঘরে পদশব্দ শোনা গেল, শচী প্রবেশ করিল, না জানি ঘৃণায় লজ্জায় তাহার মনের মধ্যে কি রকমই হইতেছে। গিরিজা কবাটের কাছে একটু সরিয়া আসিলেন।

বিজ্ঞ বিচারপতিগণ যথেষ্ট ভূমিকা সহ বক্তব্য বিষয়টি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন যা করেছ এমন কেউ কখনও করেনি, কানেও কখনও শোনা যায় না! কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি; হায় হতোস্মি করলেও আর যা হয়েছে তার বদল হবে না। এখন এর একমাত্র উপায়—ভ্রান্তি মিটিয়ে নেওয়া। ঐ কন্যাটিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত সহ্যান্তর পুনর্ব্বার দ্বার গ্রহণ করিলেই সকল দোষ খণ্ডন হয়ে যায় আর সে ঘটনা যত শীঘ্র ঘটে ততই পাপ কম। আগত ভোরের ট্রেণে হরচন্দ্র ঐ রাঢ়ী কন্যাকে যথাস্থানে রাখিয়া আসুন। পঞ্জিকায় প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহের দিন দেখা যাক্। এ পুণ্যাহ মাস ভালদিনের অভাব হবে না, কি হবে ছেলেমানুষ বয়সের গরমে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে, তা এক রকম করে শুধরে দেওয়া যাবে। এ ত আর পরের ঘরের কথা নয়—।"

গিরিজা উত্তর শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন—সংক্ষিপ্ত উত্তর "না"।

চমকিয়া উঠিয়া তিনি গৃহভিত্তির উপর দেহভার রক্ষা করিলেন। সকলে কহিল, "কি? না! ত্যাগ করবে না?"

"না" আবার শচীকান্ত কহিল "কি অপরাধে ত্যাগ করব বলে দিন?"

"অপরাধ? প্রথম সে রাঢ়ীশ্রেণী, দ্বিতীয় অন্যের বাগ্দত্তা, তৃতীয় উন্মাদগ্রস্তা, ইহার প্রত্যেকটিই ত্যাগের প্রকৃষ্ট কারণ, শাস্ত্র ও আইন সঙ্গত।"

"সে উন্মাদ নয়, দ্বিতীয়তঃ সে আমারই বাগ্দত্তা—ইহার প্রমাণ আমার বাবাকে পত্র লিখিলেই পাইবেন। তৃতীয়তঃ রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। পথের দুর্গমতার ভেদবাধা ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে এ ভেদ বাধা কেন না দূর হবে?"

"তুমি চালাইবে না কি? ভট্টনারায়ণই পারিলেন না তুমি তো তুমি! শাস্ত্রে ও দেশাচারে মিল থাকে না, শাস্ত্রাপেক্ষাও কুল-প্রথাকে এদেশে বড় করে দেখা হয়। রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ দোষের না হতে পারে কিন্তু অপ্রচলিত।"

তর্ক চড়িতেছে দেখিয়া শচীর জেদও চড়িল, সে কহিল "প্রথম ইংরেজি শিক্ষার আমলে কেহ ছেলেকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে চাহিত না, ট্রেণে চাপিত না, কলিকাতায় যাইত না, ডাক্তারি শিখিত না, এখন এ সকল দেশাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, পাপ নহে বরং সমাজের পক্ষে শুভ। তাহা প্রচলিত করিবার জন্য প্রথম দুএক জনেই চেষ্টা করে তাহার জন্য পীড়িতও হয়, ইহা অনিবার্য্য, আমি জানি আমি ঠিকই করিয়াছি। কমলা আমার প্রথম বাগ্দত্তা।" কি নির্লজ্জ! হা রে শিক্ষাগর্ব্বিত আধুনিক ছেলে! গুরু লঘু জ্ঞানও বিধাতা তোদের নিকট হইতে হরিয়া লইয়াছেন। বুড়াদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতে সঙ্কোচও বোধ হয় না! বিরক্ত ও ক্ষুণ্নচিত্তে বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তা হলে তুমি তোমার এই অসিদ্ধ বিবাহের পত্নীকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নও?" "সে আমার ধর্ম্মপত্নী।"

"বেশ ধর্ম্মের অর্থটা ভালই হৃদয়ঙ্গম করেচ!" গৃহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। "আমাকে আর কিছু বলবার আছে?" "তোমায়? কি বলব! তোমার মাসিমাকে এই বলবার আছে যে যদি তিনি তোমার ধর্ম্মপত্নী সমেত তোমার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন তাহলে এ ঘরের সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত! আমরা শাস্ত্র সমাজ লোকাচার সবই মেনে থাকি এখনও এতদূর আলোক পাইনি তো! আহত বক্ষ ফাটিয়া বাহির হইল "তাই হোক্"।

রাত্রি হইয়া আসিল বাহিরের ও ভিতরের গোলমাল কিছুই কমিল না আপন গৃহের মধ্যে বহুক্ষণ পদচারণ করিয়া শচীকান্ত এই কিছুক্ষণ মাত্র বিছানায় আসিয়া শুইয়াছে। ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল না, চলিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল! যে প্রতীক্ষিত কালের জন্য প্রভাতে মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সে ব্যাকুলতা আর নাই। মন এখন জ্যোৎস্নামধুরা যামিনীর সুখশয়ন ছাড়িয়া বন্ধুহীন প্রবাসের অসহায় অবস্থা স্মরণে শুকাইয়া উঠিতেছে।

ইহার মধ্যে অনেকখানি ঘটিয়া গিয়াছে। মাসীমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কথাবার্ত্তাও হইয়াছে, উপসংহার ভালরূপ হয় নাই। কমলাকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভব নয় একথা সেও বুঝে, কিন্তু ইহার মীমাংসা মাসিমাও ঐ একইরূপ করিতে চাহেন! শুধু ভরণ-পোষণ ভার!—হরি তাঁহারা যদি বুঝিতেন! শেষকালে তিনি কাঁদিয়া উঠিয়া গেলেন, বলিলেন "তুই যদি এমন করে আমার মায়া কাটাতে পারিস্ তবে আমিই কি আর পারিনে! যা ধর্ম্ম হয় কর!"

সে এ বেদনাদগ্ধ অভিযোগের উত্তর

দিতে পারে নাই। বড়ই বাজিয়াছে। মাসিমার স্নেহ তাঁহার অপরিসীম করুণা মঙ্গল কবচের মতই তাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছে। এতখানি সে আর কোথায় পাইত! সেই মাসিমা আজ কাঁদিয়া বুকে টানিতে চাহিতেছেন, সে বাহুপাশ তবু কাটিতেই হইবে। বড় পাষাণের কাজ!

অতি ধীরে কে গৃহে প্রবেশ করিল, শচী দেখিল কল্যাণী! "দাদা!" মুহূর্ত্তে সে আসিয়া তাহার কোলে মুখ লুকাইল "দাদা আমাদের সব মায়া কাটাবে দাদা?" এবার পাষাণ টলিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রুঝরিয়া তাহার মস্তকে পতিত হইল। সহানুভূতিহীন এ সংসারে এই একটি করুণার উৎস কঠোর বিচার দৃষ্টির বাহিরে একটিমাত্র স্নেহশীতল দৃষ্টি। এ যে অপার্থিব ধন! ছোট বেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কথা তাহার ঝটিকা-উদ্বেল বক্ষের মধ্যে উঠিতে পড়িতে লাগিল। "দাদা সত্যি যাবে?" "কি করি কল্যাণ! বলে দেনা?"

"দাদা!"

"কলি তুইও তো ওই কথা বলবি? ও ছাড়া আর কোন দণ্ড তোরা দিতে পারিসনে?" কল্যাণী মুখ তুলিল "না দাদা ওকথা আমি বলি না, কিন্তু কেন এমন হলো দাদা! এ কি করলে?"

"আমায় আর বকিসনে কল্যাণী! আমি আর বরদাস্ত করতে পারচিনে। সবাই মিলে আর বলিসনে আমি পাপ করেচি। এর আর একটা দিক হচ্ছে, সমাজের কুপ্রথাচ্ছেদ, সত্যপালন, অনাথার প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিকার! এগুলো কি সত্যই এত তুচ্ছ? আর যে যা বলে বলুক শুধু তুই বল্ যে, না, তুমি পাপ করনি, তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ তোমারি।"

(৪৯)

আকস্মিক বজ্রাঘাতে বিহ্বলতা জন্মায়, কিন্তু সেই বিদ্যুদগ্নি যখন লোলরসনা বিস্তৃত করিয়া গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে তখন মুহূর্ত্তেই জড়ত্ব ঘুচিয়া যায়। কমলা চুপ করিয়া বসিয়া সবই দেখিল, কানের কাছে যাহা পৌঁছিল সকল কথাই শুনিল কিন্তু ইহাতে তাহার মধ্যে বড় একটা ভাবান্তর ঘটিল না, সে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে কোন বিষয়ে ভালমন্দ বিচার শক্তি তাহার কোথায়? এ বাড়ীতে এই রহস্যময় অভিনয়ের অভিনেত্রীরূপে আজ সে সংস্র কৌতুক দৃষ্টি ও শত ব্যঙ্গপূর্ণ রসনার লক্ষ্য! বিদ্রূপ, কুৎসা, অভিশাপ ধারাকারে তাহার মস্তকোদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

কিন্তু যখন আশপাশের লোকেরা ঘটনার পরিচয় দান করিতেছিল তখন সহসা সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কি যে ঘটিয়া গিয়াছে এতদিনের পর আজই সে যেন ইহা প্রথম অনুভব করিল। তাহার লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া বহু পূর্ব্বের কি যেন একটা ঘটনা স্মৃতিপথে টানিয়া আনিতেছিল, আবার ভক্তিনাথের গৃহে, নৈহাটি ষ্টেশনে—সেই অর্দ্ধোচারিত তাহারই নাম—এ সবই যেন একটা ধারাবাহিক ঘটনার সামঞ্জস্য রাখিয়া আসিয়াছে! আর কে এই তাহার জীবনের শনিগ্রহ! দুষ্ট ধূমকেতু! সে নাকি কাশীর সেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের,—তাহার

আরাধ্য দেবতার আত্মজ! বিশ্বনাথ! এর চেয়ে অঘটন ঘটনা আর কি কিছু ছিল না!

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে কল্যাণী আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল "বউ!" একি সম্বোধন! সে কোন্ গৃহের বধূ? উত্তর না পাইয়া ননন্দা অধিকতর স্নেহে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল "বুঝেছি বউ তুই কেন অমন আজ বুঝেছি, তোর জন্য আমারও প্রাণ কাঁদচে ভাই"।

এবার আর সহিল না সেই সহানুভূতিপূর্ণ বক্ষে পড়িয়া সে প্রাণফাটা কান্না কাঁদিল।

গভীর রজনীর অন্ধকারে উষ্ণ প্রস্রবণের বন্যাধারায় জড়ত্ব কাটাইয়া লুপ্তচেতনা লুপ্ত স্মৃতিকে লইয়া জীবনব্যাপী হাহাকার মাত্র সম্বলে আবার জীবন জাগিয়া উঠিল।

দিনের আলো না জাগিতে বিজয়ার আয়োজন হইয়াছিল, নহবতের সানাই সারাদিনই বন্ধ আছে, গাছের পাখী তখনও ডাকে নাই, কল্যাণী ডাকিল "বউ"! কি জানি সহানুভূতিপূর্ণ নারী চিত্তে কি আছে তাহা পাষাণকেও প্রাণ দিতে পারে, পাষাণী কহিল "আর কিছু বলো, আমি কমলা—" "না তুমি আমার বড় আদরের বউ। ভাই অনেক তো বুঝলাম; হিন্দুর মেয়ের স্বামীই সব স্বামীদ্বেষিণী হয়ো না; অতীত ভুলে যাও, ঈশ্বর সাক্ষ্যে যাঁকে বরণ করেছ তাঁকে কায়মনে গ্রহণ কর।"

ঠিক কথাই বলিয়াছ কল্যাণি! ঈশ্বর সাক্ষ্যে যাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে স্থান দিয়াছি তাঁহাকে কে দূরে সরাইতে পারিবে! হিন্দু মেয়ের দুবার বিবাহ হয় কি?

বিদায়ের অশুভ মুহূর্ত্ত দেখা দিল। কমলা যখন শুনিল সে এখানেও স্থান পাইবে না, যাহার সঙ্গ তাহার পক্ষে হিংস্র শ্বাপদাপেক্ষা ভয়াবহ এ বিশ্বে একমাত্র তাহারই বাহু তাহার অবলম্বন! তখন তাহার বজ্রাহত প্রাণও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কল্যাণী অজস্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে যখন গাড়িতে তুলিয়া দিতে লইয়া চলিল, সে তখন আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, সব ভুলিয়া তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিল—"তোমার মনে দয়া মায়া আছে আমায় এমন করে তোমরা তাড়িয়ে দিও না, তোমার মাকে ডাকো, তাঁর পায়ে ধরে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করবো দেবেন না কি? কল্যাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে স্তব্ধগম্ভীর মুখে গিরিজা সুন্দরী আসিলেন। কমলা তাঁহার পা ধরিয়া বলিল "আমায় তোমার এই বাড়ীর একটা কোণে পড়ে থাকতে দাও মা, তোমার পায়ে ধরচি আমায় বিদায় করোনা, আমার এ জগতে আর স্থান নেই।"

গিরিজার স্ফীতনাসা, আরক্ত নেত্র, সজল জলদ তুল্য মুখ তাঁহাকে যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কোন মতে পা সরাইয়া লইয়া পরুষ কণ্ঠে কহিলেন "কেন বাছা মায়া বাড়াও! তোমার স্থানের অভাব কি! মূর্খের হাতে ত পড়নি আমারই যাহোক সর্ব্বনাশটা করলে। বাছাকে আমার—" বলিতে বলিতে অশ্রুজলের কম্পনে গলা ধরিয়া ক্ষোভে ক্রোধে হতাশায় অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন "এমন করে তোকে বিদায় দিতে হলো বাবা আমার!"

দাসী আসিয়া সহানুভূতিহীন কঠিন হস্তে একপ্রকার টানিয়া আনিয়া গাড়ির মধ্যে তাহাকে পুরিয়া দিতেই গাড়ির কবাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। সেই রুদ্ধ কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া গেল। সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে কমলার শ্রুতিশক্তিহীনপ্রায় কর্ণে প্রবেশ করিল "তোমারও কেহ নাই; আমিও আজ নির্ব্বান্ধব। আজ থেকে শুধু আমরা পরস্পরের, আর সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট!"

৪৯

বিবাহের সাত আট মাস পরে শচীকান্ত ডেপুটি কলেক্টরের পদ লইয়া সদর হইতে দরিয়াপুর সবডিবিসনে বদলি হইয়া আসিল। এ পদটুকু পাইতে তাহাকে এ কয়মাস ধরিয়া বড় অল্প শ্রম করিতে হয় নাই। সমস্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিয়া সে খাটিয়াছে, নিজের প্রতিও তিলমাত্র মমতা ছিল না। সে শ্রমের ফলও ব্যর্থ হয় নাই ইহার বলে অতি অল্পদিনেই সে ঊর্দ্ধে স্থান লাভ করিয়াছে।

এতদিনে অবসর মিলিল, এইবার আঃ! রণশ্রান্ত জীবনকে অনাবিল শান্তি বারি পান করাইয়া জীবনটা শুধু উপভোগ করিতে চায়! রত্নপুকুর ত্যাগ করিয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় বন্ধু নলিনাক্ষের সাহায্য না পাইলে বোধ হয় এই উচ্চ পদ প্রাপ্তি ঘটিত না। এতদিন তাহার মায়ের কাছে কমলাকে রক্ষা করিয়া সে সংসার ক্ষেত্রে যুঝিতে দাঁড়াইয়াছিল। আজ সফলপ্রযত্ন হইয়া গচ্ছিতধন ফিরাইয়া আনিল। এপর্য্যন্ত কমলার সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই, বন্ধুগৃহে কোনদিন সে তাহার সহিত দেখা করিতে সাহসও করে নাই, পাছে বন্ধুর সাক্ষাতে কমলার অনাগ্রহ সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু ভক্ত বন্ধু ইহাকে খুব বৃহৎ করিয়াই দেখিয়াছিল; তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল "কর্ত্তব্যের কাছে কমলাও কিছু নয় এমন মনের বল তোমার!" এই বলিয়া সে তাহাকে প্রণাম করিল।

দরিয়াপুরের সাবডিবিসন অফিসারের বাংলা খানি ঠিক বাংলা নয়, তাহা একখানি অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। চারিদিকে সবুজ শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে শুভ্র গৃহটী চিত্র হিসাবে অতিসুন্দর। এ গৃহের সাজসজ্জাতেও কোন ত্রুটি ছিল না। সাধ্যাতীত ব্যয়ে গৃহস্বামী তাহার যথাস্থানে যাহা থাকা উচিত তাহাই সাজাইয়া ছিলেন। এই নূতন সজ্জিত নবীন সংসারে শচীকান্ত তাহার বধূ আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিল। তার পর এত দিনকার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল "এই তোমার ঘর সংসার দেখে নাও, আর আজ থেকে আমাকেও তোমার কাছে টেনে নাও,—কমল কাছে নাও বড় দূরে রয়েছি, অনেক তফাতে রেখেছ, আর না সরে এস!"

তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নবীন গৃহস্বামী গৃহে ফিরিল। সিঁড়ির পথে, বারান্দায়, ঘরে কেহ কোথাও নাই। ছাদে,—না ছাদের সিঁড়ি ত নাই? ওই যে একটা ঘরের কবাট রুদ্ধ! কমল! খোল কমলা! ঘর নিঃসাড়, দ্বার ছিদ্রহীন। তাহার শরীর মন ভয়ে অবসন্ন হইয়া আসিল। নীচে আসিয়া নব-নিযুক্তা দাসীকে জিজ্ঞাসায় জানিল দ্বিপ্রহর হইতেই দ্বাররুদ্ধ, অভুক্ত আহার্য্য

নীচেই পড়িয়া আছে। তবে বিষ খাইয়াছে নাকি? গলায় দড়ি দেয় নাই তো? দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল "কমলা, কমল দরজা খোল, শোন?"

পুনঃপুনঃ আহত হইয়া দ্বারের খিল ভাঙ্গিয়া খুলিয়া গেল। ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকিয়া সে ভীত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—ওই না কমল খাটের দাণ্ডা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ছুটিয়া কাছে আসিল—কই কিছু তো পরিবর্ত্তন দেখা যায় না! উদ্বেলিত বক্ষে কহিল "কিছু করনি তো?" উত্তর না পাইয়া সবলে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল "বলো বলো বলো।"

হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় কমলা স্থির কণ্ঠে কহিল "না।" —যথেষ্ট। "কমল! এ রকম কেন করচো?" কমলা সরিয়া দাঁড়াইল, সে নেত্রে একটা স্থূল না হোক্ সূক্ষ্ম দাহিকা শক্তি বিদ্যমান ছিল শচীকান্ত হাত ছাড়িয়া কিছু হটিয়া গেল। ক্ষোভের সহিত সে কহিল "কমলা আমার সঙ্গে তুমি কিন্তু অন্যায় ব্যবহার করচো, বলে দাও তোমার কাছে আমার কি অপরাধ? নিষ্ঠুর মায়ার কাছ থেকে উদ্ধার করায় কৃতজ্ঞতাও কি একটু নাই? একদিন তো তুমি এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলে?—সেদিন ওই জড় বালা দুগাছা যে আদর পেয়েছিল তার একটু কণাও কি আজ আমি পেতে পারি না? শুধু অবহেলা করবে? কেন. তোমার তো আমি কোন ক্ষতি করিনি!"

এত কথা বুঝি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, সাপে কামড়াইলে যে অবস্থা হয় কমলাকে ঠিক সেই অবস্থাপন্ন দেখাইল। সে যে এতদিন কি ভুল স্বপ্ন দেখিতেছিল,—কি মন্ত্রে কাহাকে পূজা করিয়াছে তাহা আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে সে হস্তস্থ কঙ্কন দুগাছা খুলিয়া সবেগে ভূমে নিক্ষেপ করিল। সেই সঙ্গে এমনি করিয়া আছড়াইয়া নিজেকে চূর্ণ করিবার প্রবল ইচ্ছাটাই শুধু জোর করিয়া চাপিয়া রখিল। হায় আশা! হায় প্রতীক্ষা! সবই ব্যর্থ হইয়াছে! আগাগোড়া সবই ভুল! মনীশের প্রতিও একটা অসহায় ক্রোধে বুকের মধ্যে ধূধূ করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! এতটুকু শেষ স্মৃতির সুখও তুমি তাহাকে দিলে না!

শচীকান্ত এ ব্যবহার দেখিল—তাহার মর্ম্মে ঘা পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ সেই অনাদৃত উপহারের পানে তাকাইয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল—"বুঝেছি তুমি ভুল বুঝেছিলে,—মনে করেছিলে মনীশের এই উপহার! তাই তার অত সম্মান! তখন আমি নিজের স্বপ্নেই ভোর তাই ভাবিও নাই এরও অপর অর্থ থাকা সম্ভব! হরি হরি মনীশ কিনা সেই রকম! সে যাই হোক তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি জিজ্ঞাসা করি? তোমার দাদা আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরে মনীশের কাকা আমার সঙ্গে ঝগড়ায় তাঁদের বাক্‌দান ফিরিয়ে নেন,—তুমি ধর্ম্মতঃ আর এখন লোকতঃ আমারই কমলা। কমলা! অতীত ডুবে যাক্ ভুলভ্রান্তি মিটিয়ে ফেল, বারে বারে আর আঘাত করোনা। অনেক প্রাণের জ্বালা আছে তুমি যদি একটা মিষ্ট কথা বল সব জুড়িয়ে যায়—।"

কে কোথায়? পাষাণী উপেক্ষার বাণে সব ব্যাকুলতা কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন শচীকান্ত কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"আমায় দেখে ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় কোন অপ্রিয় কথা বলতে আসিনি। আমার মধ্যেও একটা মানুষের প্রাণ আছে, তুমি সেইখানে আঘাত করেছ। আমি বলতে এসেছি তোমার অনাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পাবার দরকার নেই, আমি তোমার পরে সকল দাবী ছেড়ে দিলাম। যেদিন তুমি নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হবে সেই দিন আবার তোমার কাছে এসে দাঁড়াব। সেদিন যত দেরিতেই আসুক,—একদিন আসবে এ আমি তোমায় বলে রাখচি। আর আমিও সে জন্য প্রতীক্ষা করতে অসহিষ্ণু হবো না। একদিন তোমার এই ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, সেদিন তুমি বুঝতে পারবে তুমি মনীশের নও আমার।"

মানুষের সুখ দুঃখ দিয়া নিয়মের কোন ব্যত্যয় করা যায় না। এই আকর্ষণহীন, নিরানন্দ নির্ব্বান্ধব গৃহে কমলার দিন কাটিতে লাগিল। আশাহীন, প্রতীক্ষাহীন, কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসর, যদিও কাটিতে বাকি থাকে না, তথাপি যেন ক্রমেই তাহা অসহ্যাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। মানুষের একটা কিছু চাই, কিন্তু তাহার কোথায় কি! ঘর সংসার আছে, তাহার কর্ম্মকাজও নাই এমন নয়, করিলে সবই আছে কিন্তু করিবার ইচ্ছাই যে নাই, তাই জগতে কিছুই নাই। আছে শুধু অনন্ত চিন্তাসমুদ্র! সীমাহীন ভাবনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া অব্যক্ত বুকটা যন্ত্রণায় কেবলমাত্র লুণ্ঠিত হওয়া ভিন্ন আর কিছু নাই। গভীর অভিমানে সারা প্রাণ ঘুরিতে থাকে, বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলে এই তোমার দয়া! এই বিচার তোমার! কে বলে তুমি দয়াময়! নিষ্ঠুর, পাষাণ তুমি! কি পাপে আমার এ দুর্গতি করিলে! আবার মধ্যে মধ্যে কুহকিনী আশা আশাহীন চিত্তে কুহকের আলোক জ্বালাইয়া তুলে, নিরাশান্ধকার বর্ত্তমানের মাঝখানে অতীত আসিয়া দেখা দেয়। সেই আশ্বাসবাণী কাণে বাজিয়া উঠে, মনের মধ্যে আশ্বাস সংগ্রহ করিয়া সে দৃঢ়চিত্তে ভাবে, নাই পাইলাম, এ জীবনের শেষে আর কি কিছুই নাই? সারাজীবনের পূজায় কি সেখানেও পাইব না? এ সম্বন্ধ কখনও ভাঙ্গিবে না। গৃহিণীর কথা মনে পড়িয়া যায়, সেই একটি সাধনার সঙ্কেত মনে জাগে, আকুল অশ্রুজলের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে করযোড়ে বলে "যেন পাই ঠাকুর, আর যেন বঞ্চিত হইতে না হয়,—সেখানে যেন পাই।" দিনের পর দিন কাটিতে থাকে, রাত্রি নীরবে চলিয়া যায়।

শচীকান্তেরও দিন কাটে। সমস্ত দিন আফিসের কাজে হাঁফ লইবার অবসর সে রাখে না। চারিদিকের উদ্দীপনার মধ্যে সুখ দুঃখ ডুবাইয়া কেবল কাজ করে! টেবিলের উপর বামবাহু স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অবিশ্রান্ত কলম চালাইয়া গাদা গাদা তাড়াবন্ধী কাগজ লেখা হইলে সে যখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কেদারা ছাড়িয়া উঠে তখন মাতালের মত পা দুখানা টলিয়া পড়িতে থাকে। তার পর ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া টমটমে চড়িয়া যখন বাড়ীর দিকে ঘোড়ার বল্গাটা টানিয়া ধরে তখন ঠিক তাহার মনের

রাশখানাও তেমনি করিয়া সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়! পরিশ্রমের সকল ক্লান্তি অপনীত হইয়া হৃদয় যেন একটা উৎসাহের হাওয়ায় তাজা হইয়া উঠে। কোনমতে পথটা কাটাইয়া বাড়ীর যত নিকটবর্ত্তী হয় মনটা আবার ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। প্রতিদিন নিরাশ হইয়াও প্রত্যহ একবার উপরের ঝিলমিলির দিকে চাহিয়া দেখার লোভ সম্বরণ অনিবার্য্য হয়, কিন্তু সেখান হইতে কেবলমাত্র একটা তীব্র ব্যর্থতার লেখা চোখের উপরে জ্বলজ্বলিয়া উঠে, আর কিছুই না। নীচের ঘরে কাপড় ছাড়িয়া একখানা আরাম চৌকির উপর হাত পা মেলিয়া শুইয়া পড়ে। তার পর? হায় তাহার বুঝি আর পর নাই। অজস্র চিন্তা, তীব্র অনুতাপ, আত্মগ্লানি, আরো কত কি তাহা বলিবার নয়। তবুও সেখানে একটা আশা ছিল, একটা মুগ্ধ প্রতীক্ষা ছিল। একদিন যে এই নীরব সহিষ্ণুতা কমলার বিমুখ চিত্ত তাহার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে এ সম্বন্ধে সে দৃঢ় নিশ্চিন্ত। কিন্তু সেদিন কবে আসিবে? ওগো কবে? কত দূরে—কত দূরে সে ভবিষ্যৎ? জীবনের এ পারে না ও পারে? হে ঈপ্সিত হে প্রার্থিত! এসো এসো, আর যে পারা যায় না, দেখা দাও ওগো দেখা দাও!

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

দাইতোকোরো

জাপানী ভাষার দাই অর্থ প্রধান এবং তোকোরো অর্থ স্থান। দাইতোকোরো অর্থাৎ রান্নাঘর। বাস্তবিক রান্নাঘর যে গৃহের প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ কি। রান্নাঘরের ক্রিয়া দুই একদিন বন্ধ রাখিলেই জগতে প্রলয় উপস্থিত হয়। জাপানীদের আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অনেকের ধারণা জাপানীরা নিরামিষভোজী। আবার কেহ কেহ নিরামিষ আহার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে কখন কখন সংবাদ পত্রে লিখিয়া থাকেন— নিরামিষভোজী জাপানীরা প্রবল পরাক্রান্ত রুষকে জলে স্থলে পরাভূত করিয়াছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আজ উহাদের রান্নাঘর ও আহার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। জাপানীগণের সুদৃঢ় গঠন এবং পোষাক পরিচ্ছদের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, না জানি উহারা ক্ষীর সর নবনী কত কি খায়, কিন্তু রান্নাঘর এবং আহার্য্য দেখিলে মনে হয় কি করিয়া উহারা এত হৃষ্টপুষ্ট। ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলেরই রান্নাঘরে একইপ্রকারের আসবাব, বাসনপাত্র। ঢালাই লোহার একটি চুলা একটি মাটির ক্ষুদ্র চুলা (শিচিরিণ), এবং ভাত রাঁধিবার পাত্র, এবং দুই একটা কাঠের বাল্‌তি ইহা ছাড়া রান্নাঘরের মেজের উপর অন্য কোন আসবাব দেখিতে পাওয়া



জাপানীদের রান্নাঘর।

যায় না। ঘরের এক পাশে এক তাকের উপর কয়েকটি চীনা মাটির পেয়ালা, ভাত তুলিয়া খাওয়ার জন্য কয়েকটা কাষ্ঠ ফলক (হাসি), ছোট ছোট কয়েক খানা প্লেট, এবং চীনা মাটির কেটলি (দোবিন্য) এতদ্ব্যতীত সব্জী কাটিবার জন্য ছোট একখানা কাঠের পিঁড়ি এবং একখানা কাটারি। এই হইল উহাদের রান্নাঘরের সমস্ত সরঞ্জাম।

প্রতি প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা, রান্না করিতে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কাঠ কয়লা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক দিন হইতেই ধূম নির্গমের জন্য বিজ্ঞানসম্মত চিমনি উহাদের রান্নাঘরে সংযোজিত। বড় বড় সহরে যেখানে জলের কল আছে সেখানে রান্নাঘরের ভিতরেই পাইপে জল নেওয়ার বন্দোবস্ত রাখা হয়। এমন কি অনেক জায়গায় গ্রামের ভিতরও বাঁশের পাইপের সাহায্যে রান্নাঘরে জল লইতে দেখিয়াছি।

ভাত উহাদের প্রধান খাদ্য। সকলেই আতপ তণ্ডুলের ভাত খাইয়া থাকে। উহাদের ভাত অতি সুস্বাদু। উহারা ফেন গালে না। উহাতে আমাদের ভাতের চেয়ে শ্বেতসার অধিক থাকিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোকিও কৃষিকলেজের এক অধ্যাপক ভারতে ধান্যকৃষি পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন, সে সময়ে আমি ঐ কলেজেই ছিলাম। তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর একদিন আমাদের ক্লাশেই ভারতের ভাত ও চাপাটি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতাকালে যে সময় তিনি বলিলেন যে, ভারতবাসী চাউলের সহজ পাচ্য সারফল নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয়। তখন ক্লাশের সমস্ত ছাত্রই আমার দিকে তাকাইয়া হাততালি দিতে লাগিল। আমি হয়ত কিছু মনে করিতে পারি—অধ্যাপকমহাশয় তাই বিষয়টা অন্য-ভাবে চালাইতে প্রয়াস পাইয়া আমাকেই ভাত রান্নার প্রণালী বর্ণনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "সম্ভবত অধ্যাপক মহাশয়

রাস্তা ঘাটে ষ্টেশনে, এখানে ওখানে সাধারণ লোকের ভিতর ভাত রান্না দেখিয়া আসিয়াছেন, ভদ্র পরিবারের ভিতর দেখিবার সুযোগ পান নাই।" যাহা হউক এই উত্তরে সেদিন সহাধ্যায়ীর হাত হইতে কোনরকমে নিস্তার পাই। বাস্তবিক আমাদের ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই লঘুপাক এবং পুষ্টিকর খাদ্য ভাতের ফেনটা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ভাতের পরই মুলা। মুলা ২।৪ টুকরা না খাইলে উহাদের খাওয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় বলিয়া মনে করে। পোষ বার মাসই মুলা পাওয়া যায়। চালের কুঁড়া এবং লবণের সাহায্যে প্রকাণ্ড কাঠের পিপাতে মুলা পচাইয়া রাখা হয়। সে মুলার গন্ধে ভারতবাসীকে নাকে কাপড় দিতে হয়। গরীব লোকের প্রধান আহার্য্য ভাত, সবুজ চার জল এবং কয়েক টুকরা মুলা। এর উপর যদি কখন ঘটিয়া উঠে উহারা মাঝে মাঝে ডালের কোন জিনিস কিম্বা মাছ খাইয়া থাকে। জাপানে ডালে অনেক রকম জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিষ্টক, মিঠাই এবং উহার শ্বেতসারে অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর তোকু নামক খাদ্য প্রস্তুত হয়।

জাপানে অনেক রকম মাছ পাওয়া যায়। সে দেশে ছোট ছোট নদীর সংখ্যা বিস্তর। আমরা সামুদ্রিক মাছ আদৌ পছন্দ করিতাম না। জাপানীরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ কাঁচাই খায়। এই মাছ পাতলা পাতলা টুকরার আকারে কাটিয়া কেকের মতন সাজাইয়া রাখা হয়। ইহাকে ছাসিমি বলে। কোন কোন ভোজে ইউরোপ এবং আমেরিকাবাসীকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত ছাসিমি খাইতে দেখিয়াছি। এ মাছ অতি নরম এবং জাপানের একটি উপাদেয় খাদ্য। আমরা অনেকেই উহা স্পর্শ করিতেও সাহসী হই নাই। এক প্রকার সুবৃহৎ সামুদ্রিক মাছ আছে তাহার নাম মাগুড় জাপানের কই মৎস্য অতি সুস্বাদু। কইএর ন্যায় অন্যান্য নদীর মাছ আমরা সকলেই বেশ পছন্দ করিতাম। আমাদের জাপান জীবনের প্রথম অবস্থায় আমরা একদিন চাকরাণীকে কি কি মাছ পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় কই, মাগুড়, তাই প্রভৃতি অনেক মাছের সে নাম করিল। আমরা তখন এগার জন ভারতবাসী এক সঙ্গে থাকিতাম।

আমাদের একজন বন্ধু, চাকরাণীকে, প্রত্যেকের ২টি হিসাবে ২২টি কই মাছ আনিতে আদেশ দিলেন। চাকরাণী কই মাছওয়ালাকে ডাকিয়া আনিলে সকলেই উৎসুক হইয়া কই মাছ দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম। মাছ দেখিয়া সকলেই অবাক। রুই মাছের মতন বড় ২২টি মাছ আনিয়া হাজির। জাপানী কই আস্বাদনেও রুই মাছের মতনই। যাহা হউক ২টি মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ২০টি ফেরৎ দেওয়া গেল।

শুষ্ক মাছ জাপানীদের আর একটি উপাদেয় খাদ্য। উত্তর প্রদেশ হইতে তোকিও প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শুষ্ক মাছ আমদানী হইয়া থাকে। শব্জী রাঁধিবার বেলায় প্রায়ই উহারা শুষ্ক মাছ চাঁচিয়া চাঁচিয়া উহার কণা তরকারীতে মিশাইয়া দেয়। আলু, কপি, বেগুন, রাঙালু প্রভৃতি সকল রকম শব্জীই বিস্তর জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য মাছ এবং সব্জী জাপানে বেশ সস্তা।

মসলা উহাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

কোন কোন গাছপালার রস উহাদের মসলা। সে মসলার গন্ধ আমাদের নিকট বিটকেল। এমন কি প্রথম অবস্থায় জাপানী কলেজ বোর্ডিংয়ে ঢুকিয়া খাবার ঘরে গেলেই দুর্গন্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। প্রথম দুই তিন দিন কেবল নিজের ঘরে ফিরিয়া চা বিস্কুটে উদর পূর্ত্তি করিতাম। আমরা ক্রমে চাকর চাকরাণীদের আমাদের ধরণে রান্না শিখাইয়া লইলাম। ডাল তরকারী, চর্চ্চরী প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় ধরণেই রাঁধিয়া দিত। জাপানীরা আমাদের মত তেল, ঘি, এবং লঙ্কা পছন্দ করে না। ঘিয়ের গন্ধে অনেকেরই বমির ভাব হয়। দুধ আজ পর্য্যন্তও সাধারণ লোকে অতি কষ্টে পান করিতে পারে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের এক ডাক্তার জার্ম্মানিতে ডাক্তারি



জাপানী রমণী তরকারি কুটিতেছে।

শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া দুধের উপকারিতা দেশবাসীর ভিতর প্রচার করেন। তদবধি অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঔষধের ন্যায় দুধ পান করিতে প্রয়াস পায়। আজকাল নব্যধরণের যাঁহারা তাঁহাদের দুধ ঘিয়ে ততটা অরুচি দেখা যায় না।

আমরা একদিন আমাদের ভাষাশিক্ষককে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। দেশের কয়েক রকম ডাল এবং ঘি মসলা আমাদের কাছে ছিল। জলযোগে লুচি, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় লুচি দেখিয়াই অবাক। তিনি বলিলেন এই

গোলাকার স্ফীত এবং ফাঁপা জিনিসটির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার কোনই রাস্তা নাই, কি উপায়ে এ বলের ন্যায় ফাঁপা জিনিস প্রস্তুত হইল। মোহন ভোগ মুখে দিয়া ঘিয়ের গন্ধে তিনি অস্থির। কাজেই এসকল আর তাঁহার খাওয়া হইল না। এলাচি, লবঙ্গ, মুগ এবং মুসুরের ডালের নমুনা দেখিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণ করিলেন।

আমাদের তোকিওস্থ বাড়ীতে এবং কাউণ্ট ওকুমার বাড়ীতে অনেক গণ্যমান্য জাপানী ভদ্রলোক ভারতীয় ভোজে যোগদান করিয়াছেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রভৃতি সকলের নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে, পোলাও এবং পায়স সর্ব্বসাধারণের নিকট তেমন প্রীতিকর হয় নাই যেহেতু ঘি এবং দুধের গন্ধ সকলে সহ্য করিতে পারেন না।

সই (Soy) এবং সস্ (Sauce) উহাদের অতি প্রিয়। উহাদের দেশীয় ঐ দুই জিনিসের গন্ধ যেন বিশেষ ধরণের। আমরা অনেকেই উহা তেমন পছন্দ করিতাম না। পিয়াজ এবং শাকশব্জীর পাতা কাটিয়া সই এবং সস্ মিশাইয়া সালাদ (Salad) খাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক বলিয়া মনে হয়। উহাদিগকে জল খাইতে বড় একটা দেখা যায় না। প্রায় সর্ব্বদাই উহারা গরম জলে সবুজ চা পান করিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় এই চা আমাদের নিকট পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় বিটকেল লাগিলেও ক্রমে বেশ তৃপ্তিদায়ক মনে হইত। বিয়ার এবং মদ্য পানেও উহাদের বেশ আনন্দ হয়।

ভারতের অনেকেই মনে করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র অহিংসা পরম ধর্ম্ম; তাই বুঝি উহারা নিরামিষভোজী। কিন্তু তাহা নয়, জাপানীরা অতি মাত্রায় মাংসলোভী। শূকর, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি সকল রকম জন্তুর মাংসই উহাদের নিকট অতি উপাদেয়।



জাপানী শিশুরা আহার করিতেছে।

অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে যে উহাদের দেশে জীব জন্তুর সংখ্যা কম।

জাপানীদের প্রধান ভোজন দিনে তিনবার। সাধারণ জাপানীরা এই তিন বারই ভাত খাইয়া থাকে। আর নব্য ধরণের জাপানী মধ্যাহ্নে পাউরুটি খাওয়া পছন্দ করে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উহারা আহার করে। প্রাতে ছয়টা বা সাড়ে ছয়টায় দুপুরে বারটা বা সাড়ে বারটায় এবং সন্ধ্যায় ছয়টা সাড়ে ছয়টায় আহার করে। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে চা পিষ্টক প্রভৃতি খায়। দুখানা কাষ্ঠফলকের সাহায্যে আহার করিলেও আমাদের চেয়ে অল্প সময়ে অধিক অন্ন ইহারা উদরসাৎ করিয়া ফেলে। উহারা বড় মিষ্টান্নভক্ত। বিলাতী ধরণের কেক ছাড়া চিনি এবং চাল ডাল চূর্ণ দ্বারা জাপানে একরূপ পিষ্টক প্রস্তুত হয় উহা সাধারণ সকলেই খায়।

জাপানে ফল প্রচুর জন্মে। এবং সকলেই ফল খাইতে বড় ভাল বাসে। অন্য দেশের লোকের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহারা এক সময়ে এক রকম জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে খায়। ফল খাইতে বসিলে হয় তো ছোট খাট এক ডালা ফলই একা নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে আবার মিঠাই খাইতে বসিয়া এক কাঁড়ি মেঠাই খাইয়া ফেলিবে।

জাপানীরা যেরূপ খাদ্যই গ্রহণ করুক আর যে পরিমাণেই গ্রহণ করুক উহাতে কোন অসুখ হইতে দেখি নাই। উহাদের স্বাস্থ্য দেখিয়া আমরা ঈর্ষা না করিয়া পারিতাম না।

শ্রীযদুনাথ সরকার

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৪)

তুকারাম ও রামদাস

তুকারাম ও রামদাস শিবাজী রাজার সমকালবর্ত্তী দুই মহাপুরুষ। তাঁহারা মহারাষ্ট্রের সাধু ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত। তাঁহারা সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মারাঠা জনপদ অনেককাল মুসলমান আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। যে দুইশত বৎসর মারাঠীগণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভকালের জাতীয় ধর্ম্মভাব এই দুই সাধুর জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়। রামদাস শিবাজীর গুরু ছিলেন, তাঁহার উপদেশ না লইয়া মহারাজ কোন মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তুকারামের সাধু জীবনীও শিবাজীর জীবনে সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

তুকারামের পবিত্র চরিত্র ও অলৌকি-

সামান্য গুণরাশি শিবাজীর শ্রুতিগোচর হওয়াতে মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তুকারামকে রাজবাটীতে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোকজন অশ্ব রথ রাজছত্র প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম প্রেরিত হইল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না। তিনি সেই সকল উপকরণ সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে যে উপদেশপূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম এই :—

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল,
ইথে কেন জড়াইছ আমাকে ভূপাল!
ধনমান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি,
এ বিপদ হতে মোরে রক্ষা কর হরি!
ভাল যা না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন বল ফেলিছ আমারে।
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর রহিব একাকী।
মান দম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এ সব তোমারই থাক্, হে পাণ্ডরিপতি।

* * *

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্য করিয়া প্রকাশ,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র প'ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়—
সুচতুর, বুদ্ধিমান, গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে
"শিব" এই পুণ্যনাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান আরাধন, যাগ যজ্ঞ আর,
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন্,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তি-বিহীন,
বস্ত্রাভাবে ম্লানকায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ।
জীর্ণ হস্তপদ অতি, দেখিতে কুৎসিত,
আমারে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।

* * *

আমি হে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিহ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র নহে দীন হীন।
পাণ্ড রঙ্গ রক্ষাকর্ত্তা, সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর।
তোমার দর্শনে তবে কি হইবে ফল,
সংসার বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জ্জন করি দিয়া সব বাসনায়
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজনায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।
বিঠ্‌ঠলই সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যে ত তাঁরে দেখিবারে পাই।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মনস্থির একমাত্র কর তাঁর প্রতি।
তুকা কহে "শুন ওগো বুদ্ধির আগার,
ভক্তি একমাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার।"

* * *

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।
খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা ক'রে,
বস্ত্র চাই, ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে প'ড়ে।
শয্যা মোর প'ড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস।
রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায়?
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা মান্য নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আড়ম্বর যত
দেখ সে আমার পক্ষে মরণের মত।

এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে রবেন সদয়।
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস
যত দিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে লোক মাঝে তোমাদের মান—
আমরা যে হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান।

* * *

এই একমাত্র যোগ করিও সাধন,
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা করো না কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন;
এমন কাজেতে মন দিও না রাজন্।
দুর্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তিদান,
তাহার কথায় কভু দিও নাক কাণ।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার।
পরীক্ষায় দোষ গুণ করিয়া বিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
দুই এক কাজ মাত্র মোর ব'লে জানি,
আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি।
এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্যগুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা বলে "ধন্য ধন্য তুমি হে ভূপতি,
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি ভাতি।"

* * *

চতুর মান রক্ষক তুমি প্রতিনিধি,
সত্বগুণনিধি তোমা করেছেন বিধি।
শুনহে মজুমদার লেখনী নিপুণ,
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।
পেশওয়া, সুনিস আর চিটনীস, ডবীর,
রাজজ্ঞ সুমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিত রায় ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতিরে।
সাত্বিক প্রণয় ভরা, দৃষ্টান্তের কথা,
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'য়ো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে "নমস্কার অধিকারীগণ,
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।"

তুকারামের পত্র পাঠে রাজা কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন—এমন কি, তিনি স্বয়ং সেই সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। কথিত আছে যে, বীরবর সেকন্দর বাদসা প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক দায়োজিনিসের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দায়োজিনিস তাঁহার নিকট গমনে অস্বীকৃত হইলে সেকন্দর নিজেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুকারাম ও শিবাজী সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। ঐ সময়ে তুকারাম দেহুর নিকটবর্ত্তী লোহ-গ্রামে বাস করিতেছিলেন—মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্য রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন "মহারাজ! সোনা রূপা আমার চক্ষে মাটির তুল্য, এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে, আমি হরির দাস, হরিই আমার আশা ভরসা। মহারাজ, তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজী তুকারামের নিস্পৃহতা ও অচলা দেবভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতা ঠাকুরাণী জিজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার পুত্রটিকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সঙ্কীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম্ম তাহার তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। প্রজাপালন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অতএব মহারাজ তাহাই অনুষ্ঠান করুন। সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা মহারাজের পক্ষে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই উপদেশ গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুযায়ী 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে যেমন অর্জ্জুনের, ইহাতে সেইরূপ শিবাজীর চৈতন্য হইল। তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য দূর হইল, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

শিবাজীর প্রতিভাবলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন হয়, তাহা অনতিকাল মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার পুত্র শম্ভোজী ব্যসনাসক্ত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সর্দ্দার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে। শম্ভোজীর প্রাণ রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন, "তোর জীবন মরণ তোর আপনারই হাতে। যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিস তবেই তোর প্রাণ রক্ষা, নতুবা জল্লাদের হাতে তোর প্রাণ দণ্ড হইবে।" শম্ভোজী উত্তর করিলেন, "বাদসা যদি আপনার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন, তাহলে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শম্ভোজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন।

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪

শম্ভোজীর পুত্র সাহু শৈশবকালে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পড়িয়া অনেক বৎসর কারাবাস ভোগ করেন। বাদসার মৃত্যুর পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্য ফিরিয়া পান কিন্তু মোগলদের মধ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাঁহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। নিজে রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম, সুতরাং ক্রমে সমস্ত রাজ্যভার সচিব প্রধান পেশওয়ার হস্তে সন্ন্যস্ত হইল। প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪ সালে বালাজী প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নৃপতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। পেশওয়া পদ তাঁহার বংশানুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্রপতি, পেশওয়াই আসল রাজা।

শেষে এমন হইল সাতারার রাজা সাতারায় বন্দী, পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা। নূতন পেশওয়ার অভিষেক কালে অভিষেক বসন মহারাজের নিকট হইতে আনান হইত এই যা রাজমর্য্যাদার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮ সালে বালাজী পেশওয়া সইয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পোষকতায় সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তার বৎসর দুই পরে দাক্ষিণাত্য রাজস্বের চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করেন, তাঁহার প্রযত্নে পুণা ও সাতারার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে মহারাষ্ট্র রাজপতাকা বিধিমত বদ্ধমূল হইল।

বাজিরাও ১৭২১

বালাজীর পুত্র বাজিরাও দ্বিতীয় পেশওয়া। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতর সন্তান। হাইদ্রাবাদে নিজাম রাজ্য সংস্থাপক নিজাম আলি ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—ইহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত বাজিরাওএর দ্বন্দযুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু পেশওরার প্রধান লক্ষ্য ছিল উত্তর হিন্দুস্থান। মোগল রাজ্যের ভস্ম স্তূপের মধ্যে মহারাষ্ট্র জয়স্তম্ভ নিখাত করাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। একদা তিনি মন্ত্রীসভায় সাহু রাজাকে বলেন "এই আমাদের সময়। ভারতভূমি হইতে বিদেশীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জনের এই অবসর। শুষ্ক তরুমূলে কুঠারাঘাত কর, শাখা সকল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।" তাঁহার উৎসাহ বাক্যে সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জলন্ত উৎসাহে ক্ষণকালের নিমিত্ত উত্তেজিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন, "পিতার তুমি যোগ্য পুত্র, তুমিই স্বহস্তে মহারাষ্ট্র জয়ধ্বজা হিমালয় বক্ষে নিখাত করিবে। বাজিরাওয়ের বলবীর্য্যে মারাঠা রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল। ১৫ বৎসরের মধ্যে তিনি বাদসাহী মুলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন ও বিন্ধ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্ম্মদা হইতে চম্বল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯ সালে পোর্ত্তুগীসদের নিকট হইতে বাসীন অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানন্তর ইংরাজেরা সাহু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রতি উপদেশ এই "রাজসভায় বাজিরাওয়ের শত্রু আছে কি না সন্ধান নিবে। তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুদলের ঈর্ষা জ্বালাইয়া দিবার সুযোগ পাইলে অমন সুবিধা যেন ছাড়া না হয়, কিন্তু সাবধান, দেখিবে তিনি যেন আমাদের শত্রু হইয়া না দাঁড়ান।" সে যাহা হউক, দৌত্য সফল হইল। ১৭৩৯ সালে পেশওয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রমুক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর পরে বাজিরাওয়ের মৃত্যু।

বাজিরাও রূপবান্, বীর্য্যবান্, অমায়িক, সরলান্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি বীরোচিত কঠোর ব্রত পালন পূর্ব্বক আড়ম্বরশূন্য সহজ ভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। তাঁহার সহিত নিজাম-উল্-মুলকের প্রথম যুদ্ধারম্ভে নিজাম একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন, "বাজিরাওকে গিয়াই যে ভাবে দেখিবে সেই ভাবে তাঁহার ছবি তুলিয়া আনিবে।" চিত্রকর

দেখিলেন, বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে দুই হাতে জুয়ারীর দানা ভাঙ্গিয়া চিবাইতে চিবাইতে অশ্বপৃষ্ঠে সামান্য সেনার মত চলিয়াছেন, এই ভাবে তাঁহার ছবি তোলা হইল।

বাজিরাওয়ের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাঁহার উত্তরাধিকারী। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথরাও (রাঘোবা) মহারাষ্ট্রে যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহাই রাজ্যনাশের মূল। রাঘোবার পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও পিতার কার্য্য শেষ করিয়া রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন।

নানা সাহেব

বালাজীর অপর নাম নানা সাহেব। নানার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবল মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃৎকম্প উৎপাদন করে। ১৭৪১—৪২ সালে নাগপুর শাখার সেনাপতি ভোঁসলা বাঙলায় মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমাদের শিশু ঘুমপাড়ানী গান আর "মারাঠা ডিচ" নামক নগর সংরক্ষণী বর্গীদের উৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দ্দির নিকট হইতে তাঁহারা বাঙ্গলার চৌথ ও উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন।

জলদস্যু আঙ্গ্রে

নানার শাসন কালে ইংরাজেরা জলদস্যু আঙ্গ্রে দমনে পেশওয়ার সহযোগিতা করেন। পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিরা নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর মারাঠী সর্দ্দার আঙ্গ্রে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কানোজী হইতে রাঘোজী পর্য্যন্ত, আঙ্গ্রে বংশের আধিপত্য কাল। রাঘোজীর মরণানন্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া ডালহৌসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্গ্রে রাজ্য ইংরাজ হস্তগত হয়। আঙ্গ্রের হস্তে ইংরাজদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৫৪ মধ্যে দুই ইংরাজ রণতরী আঙ্গ্রে কর্ত্তৃক ধৃত হয়। কলিকাতাবাসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে সহরের চারি দিকে গর্ত্ত খনন করিয়া সুরক্ষিত হন, বম্বের বণিকগণও আঙ্গ্রের আক্রমণ শঙ্কায় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ সালে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে দমন করিবার জন্য ইংরাজেরা পেশওয়ার সহিত যোগ দেন; পর বৎসরে সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ তাঁহার প্রধান দুই দুর্গ বিজিত হয়। সুবর্ণদুর্গ হারাইয়া তুলাজী সাগরপরিরক্ষিত বিজয়দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আডমিরল ওয়াটসন ও কর্ণল ক্লাইব মিলিয়া, ওয়াটসন জলে ক্লাইব স্থলে, আক্রমণকরত দুর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্ণর বিজয়দুর্গ লাভ লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাঙ্কোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপার্জ্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলেন। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে ওলন্দাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি পাইবে না তাহাদের বাণিজ্য পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন। পোর্ত্তুগীসের পতন ও মারাঠীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধি স্থাপনবশতঃ

অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী য়ুরোপীয়জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভুত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

নানা সাহেবের শেষদশা শোচনীয়। তিনি পাণিপতের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন —ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। ইহার পর নানা সাহেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই পার্ব্বতী মন্দিরে দেহত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পেশওয়া বড় মাধবরাও

১৭৬১—৭২

নানার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাণিপতের যুদ্ধে মারা পড়েন; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধবরাও পেশওয়ার পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর। তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা পেশওয়াকে হাতে রাখিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার প্রয়াসী ছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাধবরাও স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক অসামান্য চাতুর্য্যের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মারাঠীদের দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি দর্শনে ইংরাজেরা সশঙ্কিত কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে সমুৎসুক। হাইদর দমনে মারাঠীদের সহিত সদ্ভাব বন্ধন প্রয়োজন সুতরাং তাঁহাদের মনোভাব যাহাই হউক সদ্ভাবব্যঞ্জক দৌত্য পাঠাইয়া পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়া রাখিলেন। যাহাতে হাইদরের বলপুষ্টি নিবারিত হয় সেই তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা। ইংরাজ দৌত্যের পাঁচ বৎসর পরে মাধবরাও লোকান্তর গমন করেন। তিনি সন্তান সন্ততি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার স্ত্রী রমাবাই অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মৃতপতির অনুমৃতা হইয়া চিতানলে দেহত্যাগ করেন। মাধবরাও পেশওয়া ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত; বলবানের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সহায় ছিলেন। এই ন্যায়ী সাহসী প্রজাবল্লভ দৃঢ়মতি নৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পাণিপতের যুদ্ধেও তেমন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

নারায়ণরাও হত্যা

পঞ্চম পেশওয়া নারায়ণরাও, মাধবরাও এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাঘোবা কাকা তাঁহার অভিভাবক। মাধবরাও মৃত্যুকালে অনেক বলিয়া কহিয়া ভাইটিকে রাঘোবার হস্তে সঁপিয়া যান। কতককাল খুড়া ভাইপোর মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব বজায় ছিল কিন্তু নারায়ণরাওয়ের মাতা গোপিকাবাই ও রাঘোবার পত্নী আনন্দীবাই এই দুজনে বনিবনাও ছিল না। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঘোবার মনান্তর; এই সকল কারণে তিনি প্রাসাদে বন্দীকৃত হইয়া রহিলেন। তদবধি তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। সেনাদের ঘুস দিয়া বশ করা তাঁহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল পেশওয়ার সৈন্যদল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। নারায়ণরাও তখন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন।

দ্রোহী দলের নেতা সমরসিংহ, তুলাজী শওয়ার নামক রাঘোবার অনুচর সমরংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সম্মুখের দ্বার ড়িয়া অন্য দ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ রত পেশওয়ার শয়ন গৃহের দিকে ধাবিত ল। নারায়ণরাও তাহাদের গোলমাল ণে ভীত হইয়া কাকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ রিলেন—সমরসিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লি। যুবক কাকাব পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া াতর স্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। রাঘোবা রসিংহকে ক্ষান্ত হও বলিয়া অনুরোধ রিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে? ককে বোতল হইতে ছাড়িয়া দিয়া এখন তাকে শান্ত রাখা যায়; সমরসিং উত্তর রিল "এতদূর আসিয়া কি আমি নিজেই রিতে যাইব? ছাড়িয়া দেও নতুবা তুমিও রা পড়িবে।" রাঘোবা ছাড়াইয়া ছাতে য়া লুকাইয়া রহিলেন। নারায়ণরাও ায়নোদ্যত কিন্তু পাষণ্ড তুলাজী তাঁহার া টানিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। এমন য় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী াহভৃত্যের প্রবেশ। তাহার হাতে যদিও ান অস্ত্রশস্ত্র নাই—সে দৌড়িয়া গিয়া াহার প্রভু ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান ইল। তাহাকে দেখিয়া নারায়ণরাও তাহার লা জড়াইয়া ধরিলেন—চাকর মুনিব দুজনেই রাধম নিষ্ঠুর হন্তারকদ্বয় কর্ত্তৃক নিহত ইল।

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত কিনা তাহার কোন প্রমাণ ছিল না—রামশাস্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। রামশাস্ত্রী ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ সুবিজ্ঞ বিচারপতি-পুণাদরবারে বশিষ্ঠ স্বরূপ ছিলেন। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন যে রাঘোবা নারায়ণরায়ের বধের আদেশ দেন নাই—তাঁহাকে ধরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপত্রে "ধরিবে" এই কথা বদলাইয়া "মারিবে" কথা কে একজন বসাইয়া দিয়াছে। রাঘোবাপত্নী (Lady Macbeth) আনন্দীবাই এই কাণ্ডের মূল কারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই ঘটনার কতকদিন পরে রাঘোবা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?" শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন "তোমার নিজের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর সুখ নাই—তোমার এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্ত্তা থাকিবে ততদিন আমি এ সরকারে চাকুরী করিব না—আর এমুখো হইব না।" শাস্ত্রী তাঁহার বচন রক্ষা করিলেন। সেই অবধি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

"ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটীরে, চলি গেলা ধীরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।" *

* কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ষষ্ঠ পেশওয়া রঘুনাথরাও
(রাঘোবা)

রঘুনাথরাও পেশওয়াপদে আরূঢ় হইলেন কিন্তু বিস্তর দিন টিঁকিতে পারেন নাই। তিনিও যেমন যুদ্ধ যাত্রায় পুণার বাহির হইলেন, তাঁহার বিপক্ষদলও মাথা তুলিল।



(পেশওয়া রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা)

মন্ত্রী প্রধান খ্যাতনামা নানা ফর্ণবীস সে দলের নেতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ একে একে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোবা বেগতিক দেখিয়া সিন্দে হোলকার ও ইংরাজদের শরণভিক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পেশওয়া বংশের অবনতি

এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যখন রাজিরাও রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখন সেনাপতি রাঘোজী ভোঁসলা বহাড় প্রান্তের জায়গীরদা ছিলেন। তিনিও পেশওয়ার দৃষ্টান্তে স্বা রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশও অধীনস্থ অপরাপর কর্ম্মচারীরাও প্রভুর দৃ অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে ম রাষ্ট্র রাজ্যে পঞ্চ শাখা বিস্তৃত হইল।

পঞ্চ শাখা

পেশওয়া তাহার মধ্যস্থিত, তাঁ রাজধানী পুণা। ভোঁসলার রাজ নাগপুর। সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধি পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গা কওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলে পেশওয়া চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ, অন্যান্য সর্দার শূদ্রজাতীয় মারাঠা। মহদ্দাররাও হোল হীনবর্ণ সৈনিক ছিলেন; রাণোজী সি পেশওয়ার পাদুকাধারী; পিলোজী গাইক গোরক্ষক রাখালরাজ। ইহারা সকলেই দীন সামান্য শ্রমজীবির জীবিকা হইতে স্বভুজ রাজসিংহাসন উপার্জ্জন করেন, নীচ জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবংশ পত্তন করিয়া পেশওয়া প্রথমত এই সকল বীরদিগকে বিজয়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর যোগাইবার ভার। তাঁহারা দূরে দূরে থা কার্য্য করিতেছেন, পেশওয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব খাটাইবার সুবিধা পাইলেন না। ওয়ার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছানুসারে তাঁ সন্ধি বিগ্রহ করিতে লাগিলেন ও র রক্ষার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া সিদ্ধিতেই নিযুক্ত করিতেন। কাল তাঁহারা নিজে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠি —পেশওয়ার অধিকার নাম মাত্র। সাতা

রাজা সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়ার সম্বন্ধে তদ্রূপ তাঁহার ভৃত্যবর্গ।

পুণায় দলাদলি

পুণা দরবার দুই দলে বিভক্ত। একদল রাঘোবার পক্ষ—অপর দল মৃত নারায়ণ-রাওয়ের পত্নী গঙ্গাবাইয়ের পক্ষ। গঙ্গাবাই তখন গর্ভবতী, সুরক্ষিত ভাবে পুরন্দর দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোবা সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বপক্ষ সমর্থনে যত্নশীল হইলেন; প্রথম প্রথম কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিপক্ষ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিলেন কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল। পুণার সিংহাসন স্পর্শ করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় বজ্রপাত সদৃশ সংবাদ আসিল যে রাণীর পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে;—৪০ দিন গত হইলে শিশু রাজার রীতিমত রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জ্যেঠা অপেক্ষাও বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধবরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই সঙ্কটে হোলকর সিন্দিয়ার সাহায্য লাভে নিরাশ্বাস হইয়া রাঘোবা ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লালসায় তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট

১৭৭৫ সালে রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয় তাহার নাম সুরাটসন্ধি; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইংরাজেরা রাঘোবাকে সসৈন্য পুণায় পৌঁছাইয়া দিয়া পেশওয়া সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবেন—রাঘোবা ইংরাজদের পুরস্কার স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন।

রাঘোবার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। সুরাট সন্ধির পর পুরন্দর সন্ধি, এই প্রকার নানা পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর সবশেষে ১৪ই নবেম্বর ১৭৭৮ সালে রাঘোবার সহিত নূতন সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজ ও মারাঠীদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হয়।

প্রথম মারাঠা যুদ্ধ

গবর্ণমেণ্ট বম্বের সাহায্যে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষা না করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বম্বের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল এজর্টন। তাঁহার যে একাধিপত্য তাহা নহে, তাঁহার উপর আবার এক যুদ্ধ কমিটির অধিকার। এই অল্প সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র গর্ভে প্রবেশ করা যত সহজ মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিষ সৈন্য যত অগ্রসর হয়, মারাঠীরা আশপাশ প্রদেশ অগ্নিসাৎ করত তত পিছু হটে। ইংরাজ সৈন্য তলেগাম গিয়া দেখে সকলি ভস্মরাশি—লোকজন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। দুদিন পরে কমিটি হইতে সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের হুকুম আসে। যদিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশ মত কার্য্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তোপ-সকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর ভাগ জিনিসপত্র অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া ব্রিটিষ সৈন্য ফিরিল। কমিটি ভাবিয়াছিলেন সৈন্যেরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে, কেহ কিছু

জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে না হইতেই শত্রুদলের গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজ সৈন্যের স্বপ্নভঙ্গ হইল, সন্ধ্যার সময় সে সৈন্য অনেক কষ্টে বড়গাম পৌছে। পরদিন প্রভাত হইতে তাহাদের উপর পুনর্ব্বার গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল—অবশেষে ব্রিটিষ সেনা হার মানিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইংরাজদের এমন হার আর কখন হয় নাই। মারাঠীরা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন, ইংরাজেরা সালসেট প্রভৃতি তাঁহাদের কতকগুলি অধিকৃত প্রদেশ ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্দের ভোগে ভরুচ অর্পণ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধিত হইল।

ইংরাজদের দর্প চুর্ণ।—এই কলঙ্কপূর্ণ বড়গাম সন্ধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন না। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তাহা মারাঠীদের অগ্রাহ্য হইল। পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ।

জেনেরল গডার্ড

এই সঙ্কটে জেনেরল গডার্ড বম্বে সৈন্যের সাহায্যে আগমন করেন। তিনি তখন বন্দেলখণ্ডে ছিলেন। তথা হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০০ মাইল কুচ করিয়া সুরাটে আসিয়া পৌছিলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কোঙ্কন তাঁহার রণক্ষেত্র। ১৭৮০ সালে তিনি মারাঠীদের উপর জয়লাভ করিয়া বাসীন অধিকার করেন।

হাইদর আলি

এই সময়ে হাইদর আলির কর্ণাটক আক্রমণ সংবাদ বম্বে পৌছে, হাইদর দমনে ইংরাজদের সমুদয় বল প্রয়োগ করা চাই, মারাঠীদের সঙ্গে বিবাদভঞ্জন তখন প্রয়োজন। সেনাপতির প্রতি মারাঠিদের সহিত সন্ধি বন্ধনের অনুমতি হইল। মনোমত কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পেশওয়াকে ভয় দেখান আবশ্যক এই বিবেচনায় গডার্ড সৈন্য সামন্ত লইয়া বরঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা উপরে খণ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মারাঠীরা তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বোম্বাই ও গডার্ড সৈন্যের মাঝখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। পলায়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড ফিরিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বরং অল্প সৈন্য লইয়া সম্মুখ যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা কিন্তু মারাঠীদের কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গডার্ড তাহাই ঠেকিয়া শিখিলেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনে ব্রিটিষ সৈন্যের সমূহ ক্ষতি। দেশী য়ুরোপীয় সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬১ সেনা হত—কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র শত্রু হস্তে পতিত হইল।

সালবাই সন্ধি

এই দুই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাজ মারাঠীদের মধ্যে দেশের আদান প্রদান হইল। ইংরাজেরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন—তিনি অতঃপর পেন্সনভোগী হইয়া গোদাবরীতীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তন্য য়ুরোপীয় জাতির সহিত মিত্রতা বন্ধন করিবেন না, পেশওয়া এইরূপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা হাইদরের বিপক্ষে অবাধে অস্ত্রচালনা করিবার সুযোগ পাইলেন।

মহাদাজী সিন্দে

সালবাই সন্ধিসাধনে মারাঠী পক্ষে সিন্দে প্রধান উদ্যোগী—মহাদাজী সিন্দে এই সন্ধিসূত্রে সিন্দিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মহাদাজী প্রথমে সামন্ত পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মোড়ল বৈ নয়—পেশওয়া সরকারে চাকর; এই ক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মারাঠী সর্দ্দারদের অধিনায়ক হইয়া দাড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদ বৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য বিস্তার হইতে চলিল। এই মহাদাজী সিন্দে মহারাষ্ট্রে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—জাতীয় বীরের মধ্যে ইনি শিবাজীর নীচেই গণনীয়।

মহাদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করত পানিপতের কলঙ্ক মোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অনুকূল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্নচূর্ণ, চতুর্দ্দিকে অরাজকতা—যার বল তারই জয়, জোর যার মুলুক তার। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও দিল্লী সিংহাসনের উপর লোকের অটল অনুরাগ। দিল্লীশ্বর বীর্য্যহীন ঐশ্বর্য্যহীন কিন্তু তাঁহার নামে সকলেই মোহিত, তাঁহার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে লোকে উৎসাহিত, তাঁহার প্রদত্ত মানার্জ্জনে মহা মহা আমীরও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সিন্দিয়াও অবসর বুঝিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম। তাঁহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, এই ঘটনায় উজীর পদের জন্য মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। নজফের উত্তরাধিকারী আফ্রাসিয়াব। মহম্মদবেগ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, এই প্রতিদ্বন্দ্বী দমন মানসে আফ্রাসিয়াব সিন্ধিয়াকে ডাকিয়া পাঠান। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আগ্রায় গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরে আফ্রাসিয়াব শত্রুহস্তে নিহত হওয়ায় রাজ্যবিপ্লব দ্বিগুণতর জলিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ার দিকে তাকাইয়া, সিন্দিয়ার সাহায্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দিয়া দিল্লী প্রয়াণ করিয়া পেশওয়ার জন্য "বাদসাহী উজীর" পদবী আদায় করিলেন,—স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরূপে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোআব প্রদেশ তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। বাদসাসৈন্য মাঝে সঙের মত এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিলেন—সিন্দিয়া মথুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন করিলেন।

সিন্দিয়ার মথুরা প্রবাসকালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট পুণা দরবারে একজন রেসিডেণ্ট বসাইবার চেষ্টায় মহারাজা সিন্দে সন্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। ব্রিটিষ দূত ম্যালেট সাহেব মথুরায় সিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোগল সম্রাট সা আলম তখন সিন্দের ক্যাম্পে, তাঁহার সহিত ও সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ পরিবর্ত্তন! ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মারাঠী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া ভারত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন দিল্লীশ্বরের মহিমা মিহিরে দিক্‌বিদিক্ ঝলসিত। সেকাল আর একাল! এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সমস্ত মহিমা অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিল্লীসম্রাট এখন বর্গীদের অনুগ্রহ ভিখারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আবদার করিতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, সিন্দের প্রসাদে ব্রিটিষ দৌত্য সফল হইল।

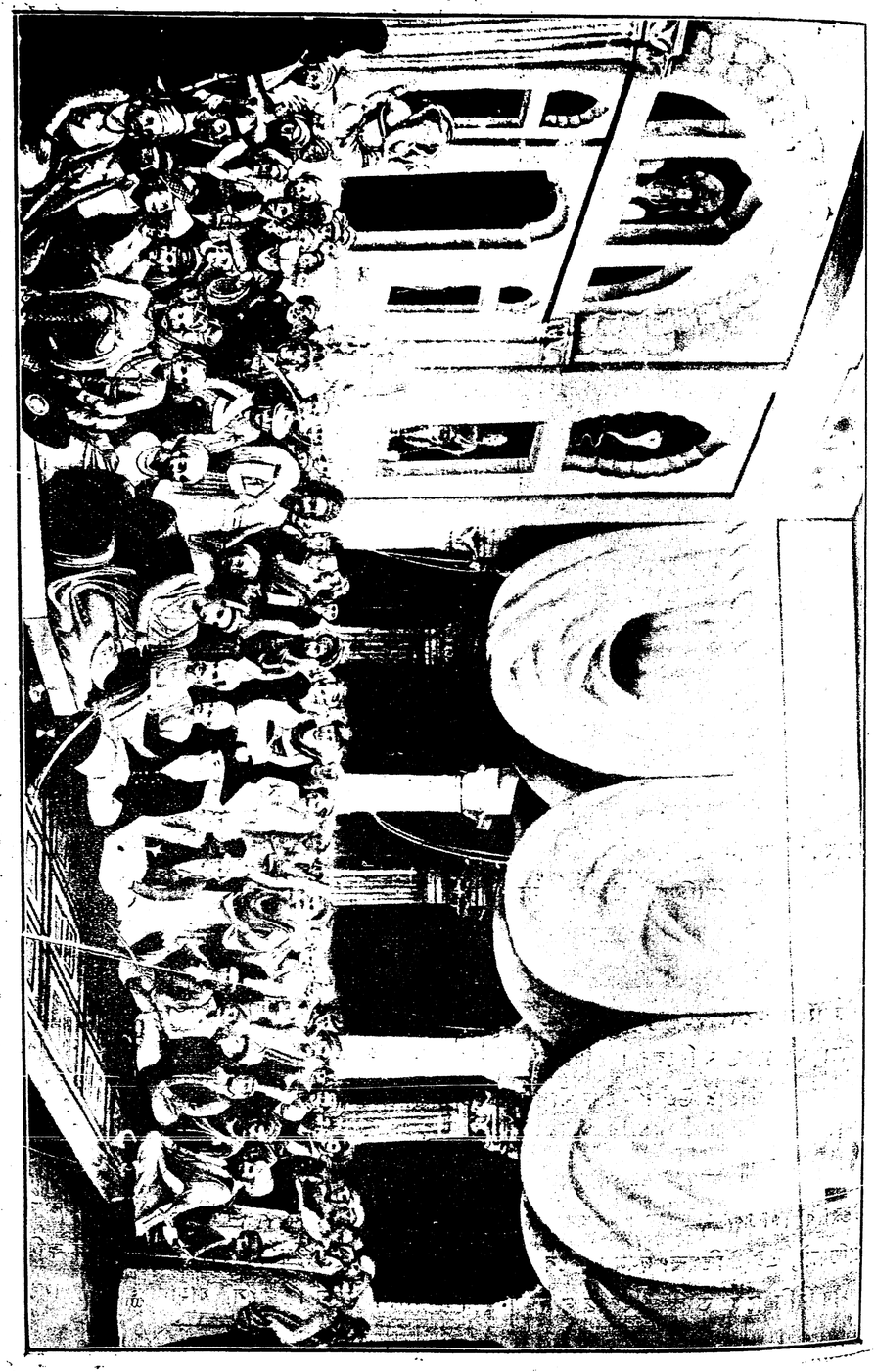

পুণা দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট

পুণার রেসিডেণ্ট সার জন ম্যালেট

১৭৭৫ সালে ম্যালেট সাহেব ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট হইয়া পুণার প্রবেশ করেন ও কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত দৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "ছুঁচ হইয়া প্রবেশ ফাল হইয়া বাহির হওয়া" ইংরাজ নয়-কৌশলের এই যে পরিণতি, পুণার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

উত্তর হিন্দুস্থানে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনানন্তর মহাদাজী সিন্দে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি পেশওয়ার হস্তে দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত নূতন পদমর্য্যাদা প্রদান উপলক্ষে পুণায় পদার্পণ করেন। তখন পেশওয়া সওয়াই মাধবরাও। তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। পুণায় এমন ধুমধাম আর কখনো হয় নাই। প্রথমে পেশওয়ার "বাদসাহী উজীর" পদবী গ্রহণ। উৎসবের জন্য সারি সারি তাম্বু পড়িয়াছে। প্রান্তবর্ত্তী তাম্বুতে এক স্বর্ণ সিংহাসন প্রস্তুত, তৎসমীপে বাদসাহী সনন্দ, বসন ভূষণ উপহার সামগ্রী সকল বিরচিত। পেশওয়া সিংহাসনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনবার সেলাম করিয়া শতৈক স্বর্ণ মোহর নজরাণা দিয়া বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। পরে বাদসাহী পরওয়ানা পঠিত হইল। ইহার শেষ ভাগে হিন্দুস্থানে গোহত্যা নিষেধসূচক অনুজ্ঞা ছিল তাহা শ্রবণ মাত্র সভাসদ্‌জনের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তৎপরে আড়ালে গিয়া অভিষেক বসন ভূষণ সাজ সজ্জা করিয়া দরবারে পেশওয়ার পুনঃ প্রবেশ, সভাস্থ সর্দ্দারের



পেশওয়া মাধব রাও

অভিবাদন ও দস্তুর মত নজরদান। অনন্তর তিনি দিল্লীশ্বর প্রেরিত অশ্ব, রথ, গজ, ঢাল, তলবার, বসন, ভূষণ, চামর, নিশান প্রভৃতি বিবিধ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সভাভঙ্গ করিয়া পেশাওয়া যখন সহরে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, বাদ্যধ্বনি, তোপধ্বনি, পৌরজনের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি গগনভেদী গভীর নাদ সমুত্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে সিন্দের বরণ। এই প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় অভিনয় অতীব কৌতুকজনক। পাত্রমিত্র সভাসদ্ সমস্ত লোকে তাঁহার সম্মানার্থে যেমন ব্যগ্র, সিন্দিয়া নিজ পদলাঘব বজায় রাখিতে



মহাজাদী সিন্দে

তেমনি তৎপর। সমবেত আমীর ওমরাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করা, স্বভুজার্জ্জিত উচ্চপদবী সকল তুচ্ছ করিয়া আপনার পাটেল নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা, মোরচল (ময়ূর পুচ্ছের চামর) ধরিয়া পেশওয়ার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে চলা, পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওয়ার পার্শ্বে পাদুকা ধরিয়া দাঁড়ানো, ইত্যাদি বিনয় ভানে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল।

নানা ফর্ণবীস

এই সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড সমাপ্ত হইবার পর সিন্দে ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।



নানা ফর্ণবীস

পুণা দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। পুণায় থাকিয়া প্রধান মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এই তাঁর ভিতরকার মতলব। এই সময়ে নানা ফর্ণবীস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মাথা তুলিলেন। পুণা দরবারে নানা একমাত্র দূরদর্শী চতুর মন্ত্রী ছিলেন, সিন্দের অতিভক্তির তলে যে স্বার্থসাধন অভিসন্ধি ছিল তাহা তলাইয়া বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। নানা ও সিন্দের মধ্যে মহা রেষারেষি, পেশওয়া বেচারা ভাবিয়া পান না কোন দিক্ রক্ষা করেন। দুইজন তাঁহার দুই বাহু। মহাদাজীর প্রভুত্ব নানার অসহ্য

হইয়া উঠিল—এমন কি, তিনি রাজ্য কারবার ছাড়িয়া কাশীবাসের সঙ্কল্প জানাইলেন। এমন সময় যমদূত আসিয়া নানার পক্ষ অবলম্বন করিল। সিন্দিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নানার এক মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার প্রভুত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

খর্ডার যুদ্ধ

মহাদাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে পেশওয়া ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম। নিজাম আলি ব্রিটিষ সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। শীঘ্রই যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রীয় মহা মহা বীরেরা পেশওয়ার পতাকাতলে এই শেষবার সম্মিলিত হইলেন। মহাদাজীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্দে তথা তুকাজী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা ভোঁসলাও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন। গোবিন্দরাও গাইকওয়াড গুজরাট হইতে ফৌজ পাঠাইলেন। রাস্তে ও পটবর্দ্ধন, মালেগাম ও বিঞ্চুরপতি, পন্ত্ প্রতিনিধি, পন্ত্ সচিব, নিম্বালকর, পাটনকর, ঘাটগে, ডমালে, থোরাত, পত্তওয়ার প্রভৃতি বড় বড় শূর সর্দ্দার জায়গীরদার স্ব স্ব দলবল লইয়া রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। অশ্বপদাতিক সর্ব্বসমেত প্রায় দেড় লক্ষ সেনা একত্রিত। পরশুরাম ভাউ সেনাপতি। আহমদনগর জিলার অন্তর্গত খর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বড় একটা রক্তপাতের প্রসঙ্গ আসে নাই। যেমন গর্জ্জন তেমন বর্ষণ নয়। কোন পক্ষের বিশেষ রণচাতুরীও প্রকাশ পায় নাই। নিজামের অকারণ ভীরুতা ও ভয়ে পলায়ন বশত মারাঠীরা সুভলমূল্যে জয় ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। মারাঠীগণ এই যুদ্ধে নিজাম সরকার হইতে দৌলতাবাদ ভূমিখণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয়া বিলক্ষণ এককামড় আদায় করিয়া লইল। নানার গৌরবের আর সীমা রহিল না। কোন বিদেশী রাজার সাহায্য বিনা অমন প্রবল শত্রুর পরাভব, ধন্য নানার নয়কৌশল! দৌলতরাও সিন্দিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তুকাজী হোলকর তাঁহার বাধ্য, রঘুজী ভোঁসলা ও অপরাপর সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। পেশওয়ার রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অনুকূল। এই সমস্ত শুভলক্ষণ সত্ত্বেও কোথা হইতে আচম্বিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া নানার আশা ভরসা বন্যায় ভাসাইয়া দিল।

পেশওয়ার আত্মহত্যা

যে অনর্থ পাতের কথা সূচিত হইল তাহা মাধবরাও পেশওয়ার আত্মহত্যা। তাঁহার বয়স যদিও বিংশতি বৎসর, তথাপি নানা তাঁহার সহিত নাবালকের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিতেন না। ইচ্ছামত তাঁহাকে আপনার ভাইদের সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। —নানার ষড়চক্রে রাঘোবার তিন পুত্র কয়েদ ছিলেন, বাজিরাও তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। এই বাজিরাও শাস্ত্রালাপ, শস্ত্রনৈপুণ্য রূপে গুণে বিখ্যাত ছিলেন। মাধবরাও সর্ব্বদাই তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতে পাইতেন। কিসে

তাঁহার কারামুক্তি হয়, তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়, পেশওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত অনর্থের মূল—তাঁহার পুত্রদের প্রশ্রয় দিলে রাজ্যের অনিষ্ট বই ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি এই ভাবে পেশওয়াকে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ তাঁহার ততই আরো বৃদ্ধি হয়। মাধবরাও অবসর বুঝিয়া বাজিরাওকে চরের হাত দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান, এইরূপে গোপনে তাঁহাদের পত্রব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। এক পত্রে বাজিরাও লেখেন "আমরা দুজনেই বন্দী, তুমি পুণায় আমি জুনরে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন—ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। যদি আমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অটল থাকে, আমরা যদি আমাদের পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব।" নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, বাজিরাওয়ের বন্ধন দ্বিগুণিত করিলেন, মাধবরাওকে নানা প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ করিয়া ঘরে বন্ধ হইয়া রহিলেন। দশ বার দিন দস্তর মত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও বাধ্য হইয়া সে উৎসবে যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের কষ্ট নিবারণ হইল না। তিনি জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য উদাস হইয়া উৎসবের দুদিন পরে প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

পেশওয়া বাজিরাও
১৭৯৬—১৮১৭

এই ঘটনায় পুণায় হুলস্থুল বাধিয়া গেল। রাজ-সিংহাসনে কে বসিবে এই এক বিষম সমস্যা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তাঁহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত মাধবরাওয়ের পত্নী যশোদাবাই বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠ চিমনাজীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং চিমনাজীকে পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করা হয়। নানা এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। এদিকে আবার দৌলতরাও সিন্দে বাজিরাওয়ের পক্ষ গ্রহণ করায় অবশেষে সেই পক্ষেরই জয় হইল। এইরূপে অশেষ উৎপাতের হস্ত এড়াইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৬ সালে বাজিরাও পেশওয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। নানাও বিস্তর ফাঁড়া কাটাইয়া পরিশেষে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া—নানা ফর্ণবীস তাঁহার দেওয়ান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিনেমোয়া কুণ্ড

দেশটা তখন ছিল মেয়োরীদের। উমুকেরীয়া ছিলেন দেশের রাজা। রাজকন্যা হিনেমোয়া খুব সুন্দরী। পৃথিবীর নন্দন কানন—নিউ-জিলাণ্ডের চারিদিকে তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন; হইলে কি হয় কানাঠাকুর পুষ্পশর নিজের তূণ থেকে বাহির করেন নাই। রাজকুমারী বয়স্থা দেখে রাজা অধিক দিন চুপ করে থাকতে পারলেন না, ভাল দিন দেখে রাজবাড়িতে স্বয়ম্বর সভা ডাকা হোল। দেশ দেশান্তরের অনেক রাজকুমার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য রাজার দেশে রটোরুয়া-হ্রদের তীরে ছাউনি পাতলেন। তাঁদের দামী পোষাক পরিচ্ছদ ও লোকলস্করে হ্রদের কিনারা আলোকিত হয়ে উঠলো। বাছা বাছা উপঢৌকন সামগ্রী আগে থেকেই রাজকন্যাকে পাঠান হ'তে লাগল। আজ রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। সে দেশের রীতি অনুযায়ী যিনি নাচের কায়দায় সকলকে পরাজয় করবেন, সুন্দরী লাভ তাঁরই ভাগ্যে ঘটবে। নাচের নাম হাকা,—যুবক যুবতীরা এক সঙ্গে হাতে হাত ধরে নাচ গান করে থাকেন। হাকার হাসি ঠাট্টা আমোদ ইসারা ইত্যাদির মধ্যে অনেকেই ভবিষ্য জীবনের সাথী বেছে লন। এটী দেশের প্রথা; এখানে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

(২)

রটোরুয়া হ্রদের মাঝখানে মোকোইয়া দ্বীপ। সেখানকার রাজা হোয়াকেযুবির পুত্র টুটেনিকাইও স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। টুটেনিকাইএর মাতা খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন না, সেই জন্য রাজপুত্র হিনেমোয়ার হস্ত প্রার্থনা করতে সাহস পান নাই। তবে তিনি গোপনে ভৃত্য টিকির সঙ্গে অনেক দিন থেকে হাকা তালিম দিয়ে খুব পাকা হয়েছিলেন। নাচ গান আরম্ভ হ'ল, দূরস্থিত পাহাড় গুলি তার প্রতি-ধ্বনিতে জেগে উঠল; গ্রামবাসীরা রাজ কুমারীকে সামনে রেখে নাচের প্রত্যেক তালে তালে আমোদ পেতে লাগলেন; এমন সময় হঠাৎ টুটেনিকাই সঙ্গীদিগকে দূরে ফেলে একেবারে হিনেমোয়ার কাছে এসে এধার থেকে ওধারে ঘুরে নাচতে লাগলেন। দেখাদেখি অনেকে সেই রকম ক'রে নাচলেও কেহই তাঁকে পরাস্ত করতে পারলেন না। অজানিত ভাবে হিনোমোয়ার গর্ব্বিত হৃদয় বিনা পণে টুটে-নিকাইয়ের কাছে বিকিয়ে গেল। নাচ শেষ হলে রাজকুমারেরা সকলেই মনে করতে লাগলেন তিনিই হিনেমোয়ার হৃদয় অধিকার করেছেন। ইতিমধ্যে দেশের নিয়ম অনুযায়ী হিনেমোয়া দাসীকে টিকির কাছে পাঠিয়ে বলে দিলেন, যেন তার প্রভু গোপনে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করেন। আমোদ প্রমোদ ফুরিয়ে গেল; অতিথিরা বিদায় নিয়ে নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

(৩)

দু'জনে দেখা হ'ল, দুটী প্রাণ পরস্পরের

কাছে অনন্তকাল মিলিত থাকতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। বিশুদ্ধ ভালবাসার পথে অনেক কাঁটা খোঁচা, অনেক বাধা বিঘ্ন। হিনেমোয়া রাজার কাছে নিজের মনের অবস্থা জানালে রাজা তো চটেই আগুন। যা মুখে এল তাই ব'লে গাল দিলেন "অকৃতজ্ঞ, নীচমনা, আমার পবিত্র বংশের কলঙ্ক! এত উচ্চবংশীয় রাজকুমার থাকতে কোথাকার একজন হীনজনকে নিজের প্রণয়ী ব'লতে ঘৃণা হ'ল না। আচ্ছা, দেখব কি করে সে আমার রাজ্যে আবার আসতে সাহস করে।" হিনেমোয়া ভয় পেলেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা স্থির রইল। রাজা হুকুম দিলেন, হ্রদের মধ্য হতে সব ডিঙ্গি টেনে ডাঙ্গার উপর তুলে রাখ, আর সাবধান কেহ যেন দ্বীপ থেকে কিনারায় আসতে না পারে। ভালবাসা বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তিন মাইল জলের ব্যবধানও হিনেমোয়াকে টুটেনিকাইয়ের নিকট থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হোল না।

(৪)

সন্ধ্যাবেলা আকাশে দু'একখানি পাতলা মেঘ কাস্তের মত চাঁদকে একবার ঢাকছে আবার একটু পরেই খুলে দিচ্ছে। হিনেমোয়া রোজ যেমন জলের ধারে বসে টুটেনিকাইএর বাঁশীর করুণ গান শোনেন আজও সেইরূপ শুনছেন। আজ সেই স্বর ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন বড় বেশী করুণ হয়ে তাঁর কাণে পৌঁছচ্ছে। আজ বাঁশীর সুরে তাকে পাগল করে তুলেছে। নারী সুলভ লজ্জা আর তাঁকে আট্‌কে রাখতে পারছে না, বিপদসঙ্কুল জলরাশি পার হয়ে প্রিয়তমের নিকট যাবার জন্য তিনি একান্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। সব ভুলে গিয়ে তুষার শীতল জলে তিনি গা ঢেলে দিলেন। এদিকে মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেল্‌তে খেল্‌তে চাঁদ অস্ত গেল। একটী গভীর অন্ধকারের ছায়া হ্রদের জলের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তৃত করে ফেল্লে। বাইরের কোন নির্দ্দেশ আর চক্ষে পড়ে না, অন্ধকারে বাঁশীর স্বর অনুসরণ করে তিনি সাঁতার দিতে লাগলেন। একবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন "হায়, প্রিয়তম তুমি কোথায়! যদি নিকটে থাক ত এসে আমাকে তুলে নাও।" তখনও বাঁশীর আওয়াজ অনেক দূরে। একটী নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তিনি বলে উঠলেন "বিহঙ্গবর একবার তোমার পাখা দুখানি ধার দাও, আমি নিমেষের মধ্যে টুটেনিকাইয়ের কাছ থেকে ফিরে এসে তোমার পাখা তোমায় ফেরত দেব।" ক্রমেই সাঁতারের বেগ কমে আসতে লাগল, তবুও দেহের সমস্ত সামর্থ্যটুকু একত্র করে প্রাণ পণে জল কাটতে লাগলেন। বার বার ভূমি অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথায় ভূমি! সবই গভীর জল! অবশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তাঁর পা মাটিতে ঠেকল'। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, শরীর ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে পড়েছিল, দুই তিন বার পড়ে যাবার পর হঠাৎ একস্থানে গরম জলের মাঝখানে এসে পড়লেন। তখন সহসা তিনি লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলেন।

(৫)

মেয়োরীদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে সন্ধ্যাবেলা কোন স্ত্রীলোক কারও বাড়ী

পৌঁছলে গৃহস্বামী তাকে নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করেন। হিনেমোয়া মহা মুস্কিলে পড়লেন। আর ত বাঁশীর স্বর শোনা যাচ্ছে না, কার বাড়ী যাবেন কার দখলে পড়বেন, তিনি ভাবনায় আকুল হয়ে উঠলেন। এদিকে টুটেনিকাই বাঁশী বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে টিকিকে জল আনতে বললেন। টিকি যেখানে হিনেমোয়া গরম জলের মধ্যে বসে আছেন তার পাশে শীতল প্রস্রবণের নিকট গেল। মানুষের পদশব্দ শুনে হিনেমোয়া পরুষ স্বরে বললেন "তুই কে, কে তোকে এখানে পাঠিয়েছে।" বেচারা টিকি যথাযথ পরিচয় দিল। কিন্তু হিনেমোয়া ত টিকিকে চিনতেন না। তাঁর সন্দেহ হ'ল পাছে তাঁকে কেউ প্রতারণা করে। তিনি মতলব খাটিয়ে টিকির কাছ থেকে জলপূর্ণ পাত্রটী চেয়ে নিয়ে পানশেষে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন। ভৃত্যের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে টুটেনিকাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য যে কুণ্ডে হিনেমোয়া লুক্কায়িত আছেন তার কাছে এসে আততায়ীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

"সে আমি" এই উত্তর দিয়ে হিনেমোয়া জল থেকে তীরে এসে দাঁড়ালেন।

"তুমি হিনেমোয়া" আনন্দে ও বিস্ময়ে এই কথা বলে রাজপুত্র তাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন। রাজপুত্রের পালকের গাত্রাবরণে সুন্দরী প্রণয়িনীর শীত নিবারিত হোল।

তারপর তাঁরা রাজবাড়ীতে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে মহাসমারোহে উভয়ের বিবাহ হয়ে গেল।

যেখানে হিনেমোয়া শীতল জল থেকে হঠাৎ গরম জলে গিয়ে পড়েছিলেন, বটোরুয়া হ্রদের সেই অংশটীকে হিনেমোয়া কুণ্ড বলে। সে স্থানের জল অত্যন্ত উপকারী; দেশ দেশান্তর হতে অনেক লোক স্নানের জন্য বৎসর বৎসর বটোরুয়ায় আসে।

শ্রীনন্দলাল সাও

প্রিয়দর্শিকা

১। প্রিয়দর্শিকা রত্নাবলীরই ন্যায় একটি নাটিকার নায়িকা। প্রিয়দর্শিকার পিতা দৃঢ়বর্ম্ম, কলিঙ্গরাজের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনাসত্ত্বেও বৎসরাজের সহিত প্রিয়দর্শিকার বিবাহ দিলেন। কলিঙ্গরাজ, বৎসরাজের একটা ক্ষণিক পরাভবে সুযোগ পাইয়া দৃঢ়বর্ম্মের উপর প্রতিশোধ লইলেন; দৃঢ়বর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। প্রিয়দর্শিকার পিতৃমিত্র রাজা বিন্ধ্যকেতু প্রিয়দর্শিকাকে হস্তগত করিলেন। ইহাতে বৎসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বিন্ধ্যকেতুকে শাস্তি দিবার জন্য স্বীয় সেনাপতি বিজয়-সেনকে আদেশ করিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে এই নাটিকার কার্য্যারম্ভ। বিজয় সেন, বিন্ধ্যকেতুর পরাভব ও মৃত্যুর সংবাদ স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন; বিন্ধ্যকেতুর প্রাসাদে একটি রোরুদ্যমানা নবযুবতীকে পাওয়া যায়; মনে হইল তিনিই বিজিত

রাজার দুহিতা। এই কন্যাটিকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণী বাসবদত্তার পরিচারিকার পদে নিযুক্ত করিবার জন্য বৎসরাজ আদেশ করিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হইল—আরণ্যকা।

২। রাজা আরণ্যকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মদনপীড়ায় পীড়িত হইয়া তিনি বিদূষকের সহিত আত্মবিনোদনার্থ প্রমোদ-উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে আরণ্যকা মহিষীর আদেশে পুষ্পচয়ন করিবার জন্য উদ্যানে অবতরণ করিল। আরণ্যকার সখী মনোরমা তাহার সাহায্যার্থ আসিল, এবং তাহার বিশ্বাস উদ্দীপন করিয়া তাহার মনের কথা অবগত হইল। রাজা তাহার নিকটেই তরুকুঞ্জের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি এইরূপে জানিতে পারিলেন যে তিনি যেরূপ প্রিয়দর্শিকার প্রতি—প্রিয়দর্শিকাও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। মনোরমা প্রিয়দর্শিকাকে সেইখানে রাখিয়া দূরে চলিয়া গেল। যে সকল ভ্রমর পদ্মের চতুষ্পার্শ্বে গুঞ্জন করিতেছিল তাহারা প্রিয়দর্শিকাকে আক্রমণ করিল। প্রিয়দর্শিকা আত্মরক্ষার্থ উচ্চৈঃস্বরে সখীকে আহ্বান করিল। বৎসরাজ দৌড়িয়া আসিয়া ভ্রমরের আক্রমণ নিবারণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন।

মনোরমা সখীর চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া আসিল। বৎসরাজ আবার বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইলেন। আরণ্যকা মনোরমার সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। (শকুন্তলা—প্রথম অঙ্ক—ভ্রমর দৃশ্য দ্রষ্টব্য)

৩। বাসবদত্তার পুরাতন সখী সংকৃত্যায়নী বৎস ও বাসবদত্তার প্রেম-কাহিনী সংক্রান্ত একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। রাণীর সম্মুখে উহার অভিনয় হইবে। আরণ্যকা বাসবদত্তার ভূমিকা এবং মনোরমা রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মনোরমা ও বিদূষক—দুজনে মিলিয়া এই ফন্দি করিয়াছে—প্রণয়ীযুগল প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের নিকট স্বকীয় প্রেম ব্যক্ত করিবে। মনোরমার পরিবর্ত্তে স্বয়ং রাজা নিজের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয়-প্রদর্শিত ঘটনার বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া বাসবদত্তার চিত্ত অনেকবার বিচলিত হইল। কিন্তু সংকৃত্যায়নী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে উহা নিছক্ বিভ্রমমাত্র; তথাপি নাট্য-দৃশ্যের ছোট-খাট ঘটনায় ব্যথিত হইয়া রাণী রঙ্গশালা হইতে প্রস্থান করিলেন। চিত্রশালা দিয়া যাত্রাকালে দেখিতে পাইলেন, বিদূষক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, নিদ্রাবিহ্বল বিদূষক গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল (মালবিকা, চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। বাসবদত্তা ক্রোধান্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও, তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিলেন।

৪। রাণীর আদেশক্রমে আরণ্যকা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা তাহার মুক্তির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। বিজয়সেন আসিয়া রাজাকে একটা অভিনব বিজয়সম্বাদ জ্ঞাপন করিল,—কলিঙ্গরাজ পরাভূত এবং দৃঢ়বর্ম্ম স্বকীয় সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। দৃঢ়বর্ম্মের কৌঞ্চুকী সেই সময় তাঁহার প্রভুর

পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আগমন করিল। কেবল একটি মাত্র মেঘখণ্ডে তাঁহার প্রভুর সৌভাগ্যগগন পরিম্লান।—তাঁহার দুহিতা প্রিয়-দর্শিকাকে তিনি হারাইয়াছেন। এই সময়ে হঠাৎ মনোরমা ভয়বিহ্বল হইয়া প্রবেশ করিল—আরণ্যকা বিষ খাইয়াছে। মুমূর্ষু আরণ্যিকাকে আনা হইল। কঞ্চুকী উহাকে দেখিয়া রাজার দুহিতা বলিয়া চিনিল। সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত কিন্তু বৎসরাজ প্রতীকারার্থ ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করিলেন (মালবিকা—চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য); আরণ্যিকা ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিল। বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকাকে ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং রাজার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা—এই দুই নাটিকারই কার্য্যপরিসর অতীব সংকীর্ণ; ভারতীয় রাজপ্রাসাদে যেরূপ সচরাচর দেখা যায়—এই দুই নাটিকাতে সেই অন্তঃপুরের প্রেম-লীলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঘটনাসন্নিবেশ না তেমন জটিল ধরণের, না তেমন মর্ম্মস্পর্শী; উহা ঠিক নাট্যশাস্ত্রের সূত্রানুরূপ। পাত্রগণ নাট্য-শাস্ত্রাদিষ্ট আদর্শ-পাত্র, উহাতে কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই। বৎস, উদারচিত্ত ও আমোদপ্রিয় নায়কের দৃষ্টান্ত, এবং সাগরিকা ও আরণ্যিকা মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টান্ত। সপত্নী বাসবদত্তা বর্ষীয়সী ও উন্নত চরিত্র রমণী। সুসংগতা ও মনোরমা উভয়ই মামুলী ধরণের সখী। বিদূষক, কঞ্চুকী, সেনাপতি, সকলই ভরতের বর্ণিত সূত্রানুরূপ। এই জন্যই রত্নাবলীর এত মান। সূত্রাদির ব্যাখ্যাকালে "দশরূপ" ইহা হইতে অনেকবার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণও ঐরূপ করিয়াছেন। তবে ঐ দুই রচনায় কোন গুণ নাই এরূপও বলা যায় না। উহাতে আখ্যানবস্তুটি বেশ নিপুণভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে; এবং নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসে হর্ষের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও উহার প্রয়োগে যে তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৎসের নিকট, সারিকাকর্ত্তৃক সাগরিকার গোপনীয় উক্তিসমূহের আবৃত্তি, দুই পরিচারিকার ছদ্মবেশ ধারণ, একজনকে আর একজন বলিয়া ভুল করা; রত্নাবলীতে, যাদুকর-প্রদর্শিত অন্তঃপুরের গৃহ দাহ; প্রিয়-দর্শিকার ভ্রমরের দৃশ্য, দ্বিধারায় নাট্যকার্য্যের যুগল-ধারা—এই যে-সকল উদ্ভাবনা, অন্তত এই যে-সকল নাটকীয় কৌশল,—ইহাতে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই-নাটিকার সৌন্দর্য্য, সহকারী ললিতকলা কবিতার দ্বারা বেশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভাঁড়ামি, নৃত্য, গীত, বাদ্য—সমস্তই নাটকীয় কার্য্যের অনুযায়ী। এই আদিরসের কবিতাতে কতকগুলি বাস্তব দৃশ্যের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে:—যথা,—বসন্ত ঋতু (রত্নাবলী ১ অঙ্ক), উদ্যান (৩ ও প্রিয়দর্শী ২), প্রাসাদ (৪) যুদ্ধ (৪ ও প্রিয়দর্শী ১)। হর্ষের কবিতাতে না-আছে কালিদাসের সরসতা, না আছে কালিদাসের সৌন্দর্য্য, না-আছে কালিদাসের কল্পনা-সম্পদ। ইতিপূর্ব্বে রত্নাবলী হইতে আমরা যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইবে। যাহাই হউক, ইহার কতক-গুলি নিজস্ব গুণ আছে যাহাতে করিয়া এই নাটিকাটী একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া

আছে। বিশেষত একটি গুণে ইহা সকলের চিত্তরঞ্জন করে। ভাবার্থের সরলতা ও ভাব প্রকাশের সরলতা; ভাষা বেশ বিশদ, পরিপাটী ও বিশুদ্ধ; কল্পনার রূপগুলি নূতন না হইলেও, বেশ সত্যানুযায়ী ও সুকুমার। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌধ-রহস্য

সেই সংক্ষুব্ধ সাগর বক্ষে একটা উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সেটা জাহাজেরই একটা সাঙ্কেতিক আলোক। আমরা দেখিলাম সর্ব্বনাশ! চোরা পাহাড় হ্যানশেল শৃঙ্গের উপর জাহাজ খানা কাত হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিবা মাত্রই চিনিলাম এ—সেই—জাহাজ, যেখানাকে আমি বৈকালে দেখিয়া গিয়াছি, যে তাহার সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া সমস্ত হালের শক্তিতেও,—আপনার গুরুভার দেহ স্রোতের প্রতিকূলে টানিয়া আনিতে পারিতেছিল না।

সাঙ্কেতিক আলোকের সাহায্যে জাহাজ খানার পশ্চাতে ইউনিয়ান জ্যাকের পতাকা চিহ্ন দেখিয়া এখানা যে কাহাদের জাহাজ তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কম্পিত আলোকের মধ্য দিয়া আমরা এ জাহাজ খানার প্রত্যেক মাস্তল, কাছি সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলা ফেনপুঞ্জের কিরীট ধারণ করিয়া যেন পাতাল পুরী হইতে রুদ্ধ দৈত্যদলের ন্যায় সৃষ্টি সংহারোদ্দেশে অক্লান্ত অশ্রান্ত তেজে ছুটিয়া আসিতেছিল। আলোটা যখন তাহাদের উপর পতিত হইতেছিল তখন মনে হইতেছিল—সেই হতভাগ্য দারুময় জাহাজখানা, তাহাদের সেদিনকার বুভুক্ষু উদরের একমাত্র শীকার। জাহাজের গাত্রে পর্ব্বতের মত সফেন তরঙ্গাঘাত—তাহাদের যেন গগনপূরিত ভৈরব নৃত্য!

জাহাজের মাস্তুল ধরিয়া প্রায় ছয় দশ বারো নাবিক বাদুড়ের মত ঝুলিতেছিল। তাহাদের মুখ কি ভয়ানক বিবর্ণ,—নৈরাশ্য কাতর! তাহারা যখন আমাদের আগমন বুঝিতে পারিল তখন সাহায্যের আশায় এমন সকরুণ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল যে, তাহা অবর্ণনীয়! আহা! হতভাগ্য বেচারারা আমাদের আগমনে যেন কোন অভিনব আশার বাণী শুনিতে পাইল। তাহাদের জাহাজের ছোট বোটখানা তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে,—মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া—আর গত্যন্তর নাই,—কি ভয়ানক সেই মৃত্যু চিন্তা!

মাস্তুলের উপর যাহারা বাদুড়ের মত ঝুলিতেছিল,—তাহারা ছাড়া, ভাগ্যসূত্রে জড়িত অপর আরোহীও জাহাজে ছিল।

সে অবস্থাতেও আমরা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, জাহাজের পশ্চাতের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া রেলীংএ ভর রাখিয়া যে তিনটি যাত্রী পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল—তাহারা যেন ভিন্ন জগতের জীব। পরিচ্ছদেও তাহাদের ভিন্নজাতিত্বের ও ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। তাহাদের মুখে চোখে শান্ত ঔদাসিন্যের ভাব

প্রকাশ পাইতেছিল। সম্মুখে যে আসন্ন মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—তাহারা যেন সে বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ। আলোটা যখন ঘুরিয়া তাহাদের মুখের উপর পতিত হইল—আমরা তীর হইতে লক্ষ্য করিলাম সেই পাথরে কোঁদা মূর্ত্তিগুলির মাথায় প্রকাণ্ড হরিদ্রাভ বস্ত্রের পাগড়ী এবং তাহাদের উন্নতদেহ, সুদীর্ঘ নাসিকা, কৃষ্ণতার চক্ষু, উজ্জ্বলবর্ণ সমস্তই প্রাচ্য দেশীয়ের পরিচয়-জ্ঞাপক। অবশ্য আমাদের তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না—শুধু চকিত দৃষ্টিপাতে যতটুকু দেখিয়া লওয়া সম্ভব,—কেবল ততটুকুই আমরা দেখিয়া লইয়াছিলাম।

জাহাজখানা চূর্ণ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। অর্দ্ধমৃত আরোহীগণের রক্ষার জন্যই আমরা মনোযোগী হইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে যে লাইফ্ বোট্ খানা আছে—সেও—এখান হইতে দশ মাইল দূরে বেঅফ্‌লিউমে? কিন্তু ঐ সমুদ্রের বেলাভূমে বন্দরের উপর যে প্রকাণ্ড জেলেবোটখানা পড়িয়া আছে—ইহাকে ইচ্ছা করিলে কাজে লাগাইয়া লওয়া যায়। আমরা ছয় জনে দাঁড় লইয়া নৌকাখানার উপর চাপিয়া বসিলাম—বাকী কয়জনে তাহাকে ঠেলিয়া জলে নামাইয়া দিল। ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ের সহিত প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিতে করিতে আমরা বিপন্ন জাহাজ খানার দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমরা যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গের মাথার উপর আসিয়া পড়িলাম মনে হইল বুঝি সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়া যায়। দেখিলাম—যেমন মেষপালক তাহার মেষ বৃন্দকে তাড়াইয়া আসে তেমনি করিয়া বহু-উজ্জ্বল তরঙ্গস্রোতকে তাড়াইয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ডকায় দৈত্যের মত পর্ব্বতাকৃতি উত্তাল তরঙ্গ সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপপ্রদাতা বোতলবদ্ধ দৈত্যটা বুঝি মুক্তি পাইয়া আজ তাহার দীর্ঘ জীবনের বন্দীত্বের রুদ্ধ রোষ এক মুহূর্ত্তে মিটাইয়া দিয়া সৃষ্টির চিহ্ন লোপ করিয়া দিবে! দেখিতে দেখিতে তরঙ্গটা ঘোর শব্দে জাহাজের উপর আছাড়িয়া পড়িল। তার পর অনন্ত ঊর্ম্মিরাশি;—তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাত জাহাজ খানাকে একেবারে আক্রমণ করিল। চোরা পাহাড়ের শৃঙ্গের মুখগুলা তীক্ষ্ণধার, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কাটা। জাহাজ খানা—দুই ধারের দুই খানা করাতের ন্যায় শৃঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়াছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের আঘাতসংঘর্ষে শৃঙ্গগাত্রে চিরিয়া সেখানা একেবারে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। পশ্চাতের খণ্ডটা তাহার পতাকা চিহ্নিত মাস্তুল আর সেই তিন অসাধারণ বিদেশী আরোহীকে লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর জলতলে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আর সম্মুখ ভাগটা মৃতকল্প আরোহীদের লইয়া মৃত্যু প্রতীক্ষায় পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন রহিল। জাহাজ ভাঙ্গার শব্দের সহিত তরঙ্গের ও হতভাগ্য আরোহীদের হৃদয় বিদারক যে হাহাকার ধ্বনি মিলিত হইল তাহা মর্ম্ম বিদারক; তীরে তীরে তাহার প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল। আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে অবর্ণনীয় বেদনার সহিত তাহা শুনিতে লাগিলাম।

ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ! আমরা নিরাপদে জাহাজের পাল তুলিবার দণ্ডটার নীচে পৌঁছিয়া মরণাপন্ন ভয়াতুর প্রত্যেক আরোহীকে আপনাদের জেলে বোটে উঠাইয়া লইতে পারিলাম।

ফিরিবার মুখে যখন আমরা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছি দেখিতে পাইলাম আবার একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া জাহাজের ভগ্নঅংশে আঘাত করিল। সিগনাল লাইটটা নিবিয়া গেল—অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে সমুদ্র বক্ষ ঝাপ্সা দেখাইতেছিল, সঙ্কুচিত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—কিছু নাই,—জাহাজের চিহ্ন মাত্র নাই—প্রকৃতির সেই ধ্বংস দৃশ্যের উপর একখানা গাঢ়কৃষ্ণ বর্ণের যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে মাত্র।

আমরা নিরাপদে তীরে উঠিলাম;—আমাদের তীরস্থিত বন্ধুরা আমাদের প্রশংসা করিতে করিতে আমাদের বিপন্ন সঙ্গীদের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। জাহাজের আরোহীর সংখ্যা মোট তেরটি, তাহারা ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কাপ্তেন মেডোজ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি যেমন বলিষ্ঠ—তেমনি সাহসী! ঘটনাটিকে তিনি যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। আশ্রয়হীন লোকগুলির মধ্যে দুই চারিজনকে এখানে ওখানে স্থান করিয়া দিয়া, অবশিষ্ট কয়েকজনকে লইয়া আমরা বাটী ফিরিয়া আসিলাম। প্রথমেই শুষ্ক বস্ত্র দিয়া তাহাদের শীত নিবারণ করিয়া, রন্ধন গৃহের অগ্নিকুণ্ডের নিকটে তাহাদের আনিয়া কিছু মদ্য ও মাংস দিয়া সুস্থ করিলাম।

কাপ্তেন মেডোজ তাঁহার স্থূলদেহ আমার পরিচ্ছদে টানিয়া বুনিয়া যথাসাধ্য আবরিত করিয়া আমাদের বসিবার ঘরে বাবার খুব নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। আমার দিকে চাহিয়া একটুখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "মিঃ ওয়েষ্ট, আপনি আর আপনার ঐ সাহসী সঙ্গীগুলির সাহায্য না পেলে আমরা এতক্ষণ চল্লিশ হাত জলের নীচে ঘুমিয়ে থাকতেম। বেলিণ্ডারের কথা যদি বলেন?—বেচারা জীর্ণ পুরোণ তক্তা মাত্র—ওর জন্যে ওর মালিকরা বা আমাদের কারুই অন্তঃকরণে আঘাত লাগেনি, জাহাজ খানা ভাল রকম ইনসিওর করাও ছিল। আর কতকদিন বাদে জ্বালানি কাঠ ছাড়া ওখানা আর কোনই উপকারে আসত না।"

বাবা করুণার্দ্র ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু কাপ্তেন তোমার সেই তিনটী বিদেশী সহযাত্রীকে আমরা হয়ত হয়ত কেন নিশ্চয়ই আর কখনও দেখতে পাবনা? সমুদ্রের ধারে ধারে লোক রেখেচি যদি তাদের কোন খোঁজ পায়। কিন্তু সে বৃথা আশা, আমি তাঁদের ভাঙ্গা মাস্তুলের সঙ্গে জলের নীচে তলিয়ে যেতে নিজের চোখে দেখেচি, ভগবান্ যদি হাত ধরে তাদের তীরে তুলে দেন এ ছাড়া ত বাঁচবার তাঁদের কোন আশাই নেই। নাঃ, বাঁচতে তাঁরা কিছুতেই পারেন না।"

কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তাঁরা কে? কোন মানুষ যে নিশ্চিত মৃত্যুর সাম্নে এমন অবিচল

নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে,—এর পূর্ব্বে আমার সে জ্ঞানই ছিল না?"

ধূমপান করিতে করিতে চিন্তিত মুখে কাপ্তেন কহিলেন "তাঁরা কে? বা তাঁরা কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। আমরা ভারতবর্ষের উত্তর করাচি থেকে শেষ জাহাজ ছাড়ি,—আর তাঁরা গ্লাসগোর যাত্রী বলায় তাঁদের তুলে নেই। তাঁদের মধ্যে ছোটটির নাম শনৎসুন। আমি এর সঙ্গেই একটু আধটু আলাপ সালাপ করেছিলুম। সবার সঙ্গে আলাপ না হলেও আমি তাঁদের নিরীহ শান্ত প্রকৃতি ভদ্রলোক বলেই মনে করেছিলেম। তাঁরা কি কাজ কর্ত্তেন? না, সেকথা আমি তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু আমি আন্দাজ করেছিলেম যে তাঁরা পার্শী ব্যবসাদার! ভারতবর্ষে এত রকম জাত বাস করে যে ওদের কে যে কি তা বোঝাই দায়। ব্যবসায়ের—জন্যই হায়দ্রাবাদ থেকে আস্‌ছিলেন অবশ্য। এটা আমি আমার নিজের অনুমানের কথা বল্‌চি। আমি ত ভেবেই পেতেম না—যে এই নিরীহ নম্র-প্রকৃতির যাত্রী তিনটীকে,—আমাদের জাহাজ শুদ্ধ লোক এমন কি জাহাজের মেট্ পর্য্যন্ত, এত ভয় করত কেন? তার কিন্তু এর চেয়ে একটু উন্নত জ্ঞান থাকা উচিত ছিল?" আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম "ভয় করত? তাঁদের ভয় করত?"

"হাঁ, সবারই তাঁদের উপর কেমন একটা সংশয়ের ভাব ছিল। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি,—আপনি যদি এখন রান্নাঘরে যান শুন্‌তে পাবেন সেখানে এই কথারই আলোচনা চল্‌চে! এই যে অতর্কিত বিপদটা ঘটে গেল,—এর জন্যে দেখবেন যে সেই বেচারা ভালমানুষ যাত্রী তিনটিকে সর্ব্ববাদী বিচারে অপরাধী হতে হয়েচে?"

কাপ্তেনের কথা শেষ হইবামাত্র একজন দীর্ঘাকার লাল দাড়ীওয়ালা ব্যক্তি ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনি কাপ্তেনের সহকারী, আমাদের কোন দয়ালু প্রতিবাসীর নিকট একসেট পোষাক আর চর্ব্বি-লাগান এক জোড়া চকচকে জুতা উপহার পাইয়াছিলেন। আমাদের আতিথ্যের ছোট রকম একটু প্রশংসা করিয়া তিনি অগ্নিকুণ্ডের নিকটে চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, তার পর বড় বড় খস্‌খসে হাত দুখানা আগুনের তাপে গরম করিয়া লইতে লইতে তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কি বলেন—কাপ্তেন মেডোজ এখন কেমন মনে হচ্ছে? বেলিণ্ডারে ঐ হতভাগাগুলোকে তুল্লে যে কি ফল হবে, আমি তা আপনাকে অনেক আগেই গুণে বলিনি কি?

কাপ্তেন মেডোজ তাঁহার স্থূলবাহুর ভর চেয়ারের হাতের উপর রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হো হো শব্দে প্রাণ খুলিয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইলেন। হাসি থামিলে, সস্মিত অর্থযুক্ত কটাক্ষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখুন; আমিও কি এই কথাই বলিনি,—গুণ্‌তে শুধু উনিই জানেন তা নয়—আমিও কিছু কিছু শিখেছি?" কথার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই হো হো হাসি আরম্ভ হইল। সহকারী তাহার মদ্যপানে আরক্ত মুখখানার বিরক্তি ভাব গোপন না করিয়াই

ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—"আপ্‌নি হাস্‌বেন্ না কেন? আপনার কি? ও ইন্‌সিওর করা ছেঁড়া জাহাজ বইত নয়? কিন্তু আমার—তেমন যে চমৎকার—সমুদ্রে বেড়াবার সুট্‌টা—সেই সব চমৎকার চমৎকার বাসন পত্র আহা—সে সব আর ফিরে পাবনা!

পূর্ব্বস্মৃতির উদয়ে, প্রিয় জিনিষগুলির বিয়োগবেদনায় তাহার মুখে যে সকরুণ ভাব জাগিয়া উঠিল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আমি কহিলাম—আপনার কথা থেকে তাহলে কি আমরা বুঝ্‌ব যে, ঐ যাত্রী তিনটির জন্যই এই বিপদ ঘটেছে,—এই আপনার বিশ্বাস?"

সহকারী কাপ্তেন আমার বিশেষণটির প্রতি জোর দিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হতভাগ্য কেন?"

"কারণ—নিশ্চয়ই—তাঁরা জলে ডুবে মরেচেন?"

একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া—অচঞ্চল স্বরে—তিনি উত্তর দিলেন "হুঁ, তারা মর্‌বার—ছেলেই বটে? কখোনো তারা মরেনি, তাদের বাপ সয়তান—নিশ্চয়ই তাদের বাঁচবার উপায় টুপায় করে রেখেছিল;—আপনি কি দেখেছিলেন—যখন মাস্তলটা ভেঙে বেরিয়ে যায়—তারা তখন পেছনদিকে দাঁড়িয়ে কেমন হাসিমুখে কথা কচ্ছিল?—আপনারা ডাঙ্গার মানুষ—এসবে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন না,—আমার পক্ষে—এ—ই—ঢের? এই যে—কাপ্তেন—সমুদ্রে ইনি কালোচুল সাদা কল্লেন ইনি-ই কি, জানেন না যে "বেরাল" আর "পুরুত" জাহাজের পক্ষে সব চেয়ে খারাপ যাত্রী! কৃশ্চান পুরুত যদি "অযাত্রা" হয়—তা হলে পৌত্তলিক পুরুত তার পঞ্চাশ গুণ বেশী মন্দ হবে না কেন,—বলুন দেখি? আমি আমার পুরোণ ধর্ম্ম বিশ্বাস করি—আর—এই বিশ্বাস নিয়েই মর্‌ব।"

সেই কর্কশভাষী নাবিকের আস্তিকতায় আস্থা দেখাইবার চেষ্টায়—নাস্তিকতা প্রচারে—বাবা ও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি পুনরায় তাহার কথার প্রমাণ দেখাইবার জন্য, মোটা খস্‌খসে আঙুলে সংখ্যা গণনা করিয়া বিষয় গুলির বর্ণনা আরম্ভ করিলেন "ধর—যখন করাচিতে এসেছিল তখনই আপনাকে আমি ওদের নিতে বারণ করেচি কি না?" প্রতি বাক্যের সহিত কাপ্তেনের দিকে ভর্ৎসনা সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া—আবার আরম্ভ করিলেন, "আমাদের জাহাজে তিনজন বৌদ্ধ খালাসী ছিল,—বরাবর আমি তাদের দিকে নজর রেখে আস্‌চি!—ঐ পুরুত তিনটে যখন জাহাজে এলো—মাঝি গুলো কি করেছিল তাও—আমি দেখেচি। জাহাজের কাঠের উপর পেট্ ঠেকিয়ে,—তারা নাক দিয়ে জমী ঘস্‌ছিল। যদি রাজকীয়—নৌসেনাপতি নিজে আস্‌ত—তাহলেও ব্যাটারা কখোনো এ রকম করত না! কে, কি রকম লোক তা ঐ হতভাগাগুলো ঠিক্ চিন্‌তে পারে—। আমি ত সেই পুরুত তিনটেকে যে মুহূর্ত্তে দেখেচি—সেই মুহূর্ত্তে বুঝতে পেরেচি—যে তারা আমাদের জন্যে অনেক দুঃখ কষ্ট—বয়ে নিয়ে আস্‌চে।" ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে নৈরাশ্যে সহকারীর কণ্ঠ অনেক সময় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি তাঁহার ক্ষণে

ক্ষণে পরিবর্ত্তিত মুখভাবের প্রতি সকৌতুক কটাক্ষে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। তিনি কহিলেন "কাপ্তেন! আমি আপনার সাম্‌নেই মাঝিদের জিজ্ঞাসা করেছিলুম—কেন তারা ও রকম কল্লে? তাতে—তারা উত্তর দিয়েছিল যে "ওনারা, সাধু সন্ন্যাসী?" তারা যে "সাধু সন্ন্যাসী" এ কথা বোধ হয় আপনি নিজের কানেই শুনেছিলেন?"

কাপ্তেন মেডোজ সহাস্য মুখে চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে উত্তর দিলেন "ভাল!—আমি ত অস্বীকার কচ্চি না, কিন্তু সেজন্য ক্ষতিটা কি হয়েছে শুনি?

"কি—যে হয়েচে তা আমি কেমন করে বল্‌ব? সবচেয়ে সাধু কৃশ্চান যে, সে ভগবানের সবচেয়ে কাছে যায়—আর সবচেয়ে' সাধু নীগার সয়তানের কোলের কাছে দাঁড়ায়,—আমার ত এই বিশ্বাস।—তার পর কাপ্তেন মেডোজ, আপনি দেখেচেন তারা বই পড়ত—কিন্তু সে কাঠের বই—? মাঝ রাত্তির পর্য্যন্ত বাইরে ডেকের উপর হিমে বসে কি সব বিড় বিড় করে উচ্চারণ কর্‌ত, মন্ত্র-তন্ত্র কিছু হবে। তার পর তাদের ম্যাপ? জাহাজ কোথা দিয়ে যাচ্চে, কি কচ্চে—সে খবরে তাদের দরকার? তারা রোজ রোজ ম্যাপে দাগ দিত কেন?"

কাপ্তেন মুখ ফিরাইয়া সিগারেটের ধূম ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন "নাঃ,—এসব তারা কিছু কর্‌ত না।"

"হ্যাঁ,—আলবৎ কর্‌ত,—আপনাকে কেন এ সব কথা বলিনি? বল্লে আপনি বিশ্বাস কর্‌তেন কিনা? তর্ক করে উড়িয়ে দিতেন,—বরাবরই ত তাদের উপর আপনার অকারণ স্নেহ দেখে আস্‌চি!"

অভিমানে তাহার কণ্ঠস্বর বুজিয়া আসিতেছিল "তাদের—নিজেদের সব যন্ত্রপাতি ছিল—আর কখন্ যে সে সব তারা ব্যবহার কর্‌ত—তা যদিও আমি জানি না,—চোখেত কিছু দেখিনি, কিন্তু প্রতি দিন দুপুর বেলা "ল্যাটিচুড্" "লংগীচুড" ঠিক্ করে তাদের কেবিনের টেবিলের উপরকার পিন্ আঁটা ম্যাপখানাতে দাগ টেনে টেনে জাহাজের গতি নিরুপণ যে কর্‌ত, আমি ঠিক্ ধরেছিলুম।

কাপ্তেন একটু চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন, "বেশ! আমি স্বীকার কচ্চি—এ সব খুব আশ্চর্য্য, কিন্তু এ থেকে তুমি কি যে প্রমাণ কর্‌তে চাচ্চ,—তাত বুঝতে পাচ্চি না।"

সহকারী একটু বেগের সহিত কহিলেন, "আর একটি কথা আমি বল্‌ব—এই যে উপসাগরটার উপর আমরা এসে পড়েচি এর নাম কি জানেন?" কাপ্তেন সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "না"।

সহকারী তাঁহার মেঘাবৃত মুখখানাকে আরো গম্ভীর করিয়া কাপ্তেনের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট গম্ভীর করিয়া তুলিয়া পরিষ্কার ভাষায় উচ্চারণ করিলেন "কার্ক-মেডেন-উপ—সাগর"!

যদি কাপ্তেনকে আশ্চর্য্য করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপেই সিদ্ধ হইয়াছিল। সুগভীর বিস্ময়ে ধীরে ধীরে মেডোজ কহিলেন "বাস্তবিকই ঘটনাটি যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক

সে কথা অস্বীকার করবার আমারও উপায় নেই? ঐ যাত্রীগুলি যেদিন প্রথম আসে—সেই দিন থেকে অনেকবার আমাদের জেরা করেছিল—যে কার্ক মেডেন "নামে কোন উপসাগর আছে,—কিনা"? এই হকিংস্—আর আমি নিজে বলেছিলুম যে আমরা সে সব কিছু জানি না। নূতন উপসাগরটা উপসাগরের মধ্যে ম্যাপেই ধরা আছে—কিন্তু এর ভিতর যে কখনও জাহাজ এসে ঢুকবে—আর ধ্বংস হবে—একথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? আমরা ত উপসাগরের নামেরই খবর রাখ্‌তুম না!"

সহকারী চীৎকার করিয়া কহিলেন আমি দেখেচি কাল সকাল বেলা যখন বাতাস একদম ঠাণ্ডা ছিল, তারা আঙুল বাড়িয়ে ঠিক্ জায়গাটাকেই দেখাচ্ছিল; তারা খুব ভাল রকমই জান্‌ত যে কোন জায়গায়টায়—তারা এসে পৌঁছবে?"

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে বিস্ময় কাপ্তেনের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া ক্রমশই তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে,—অত্যন্ত ম্লান উৎকণ্ঠিত স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন "হকিংস্,—এ থেকে তুমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েচ?"

"আমার কি মনে হয়েছে, জিজ্ঞেস্ কচ্চেন? আমার মনে হয় ঐ টেবিলের উপরকার—গ্লাসপূর্ণ পানীয়টা তুলে ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাওয়ায়, আমাদের যতটুকু মেহনৎ, তাদের পক্ষে সমুদ্রে ঝড় তোলাও ততটুকু মেহনতের কাজ? তাদের নিজেদেরই হয়ত এই ভগবান্ বর্জ্জিত দেশে"—সহকারী আমার ও বাবার প্রতি যুগপৎ সস্মিত দৃষ্টিপাত করিলেন, "মাপ করবেন মশায়, এদেশে যে আপনারা বাস করেন এই টুকুই দেশের পক্ষে সাফাই—আর আশ্চর্য্যি" বলিয়া পুনরায় পূর্ব্ব কথার অবতারণা করিলেন, "এদেশে আস্‌বার তাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, আর তাই জন্যেই তারা জাহাজখানাকে ভেঙে এই "আঘাটা"য় নামবার সহজ পন্থা বার করে নিয়েচে,—এই ত আমার বিশ্বাস,—আর আমার আন্দাজ আমি বরাবর দেখে আসছি, কক্ষণো প্রায় ভুল হয় না। কিন্তু ঐ তিনটে সাধু বা সন্ন্যাসীর—এই কর্ক মেডেন উপসাগরে কী যে এমন দরকারী কাজ পড়ে আছে—সেই টুকুই কেবল আমার বুদ্ধিতে আস্‌ছে না?"

উভয় ভদ্রলোকের এই অপ্রীতিকর মতামতের বিরুদ্ধে বাবার মনে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাক্যে তাহার আভাষ মাত্র প্রকাশ না করিয়াই, ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন "এই আকস্মিক্ দুর্ঘটনাটায় আপনাদের দুজনেরই শরীর মন যে রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েচে, তাতে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া খুব দরকার, চলুন আপনাদের—আমি বিশ্রামের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি?"

অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য জমিদার-বাটীর যে প্রশস্ত কক্ষটি নির্দ্ধারিত ছিল, বাবা তাঁহার নূতন অতিথিদ্বয়কে সেই গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "জ্যাক্, চল, আমরা একবার সমুদ্রের ধারটা একটু ঘুরে আসি যদি কোন নূতন ঘটনা আবার ঘটে থাকে?"

সেই ভগ্ন জাহাজখানার দুঃখপূর্ণ স্মৃতি-চিহ্নিত স্থানে আমরা আবার যখন ফিরিয়া

আসিলাম তখন উষার ক্ষীণ আলোক, রোগীর মুখের পাণ্ডুর হাসিটুকুর মতই, ধীরে ধীরে পূর্ব্বগগনে ফুটিয়া উঠিতেছিল। চন্দ্র ডুবিয়া যাইতেছে, বহুদূরব্যাপী মরুময় বাহু ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্ষীণ জ্যোৎস্না শুভ্র বসনের মত সমুদ্র তীরে বিছাইয়া রহিয়াছে। ঝড় থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু সমুদ্র এখনও শান্ত হয় নাই, তটপ্রহত ঊর্ম্মিভঙ্গের গর্জ্জন কল্লোল বাতাসের শব্দে মিশিয়া ভৈরব রাগিণীতে বিচিত্র সুরে বাজিতেছিল। ফেন-কিরীটশীর্ষ তরঙ্গগুলা ক্রোধোন্মত্ত শিকারীর ন্যায় পলাতক শীকারের সন্ধানে তখনও যেন ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিল। বায়ুর তাড়নে ও তরঙ্গাঘাতে যে সকল ভগ্ন মাস্তুল, ছিন্নপাল প্রভৃতি তীরাভিমুখে ভাসিয়া আসিতেছিল জেলেরা তাহাই একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিল। ছোট ছোট ডিঙ্গিতে সমুদ্র তীর ভরিয়া উঠিয়াছিল, ভাসমান নষ্ট দ্রব্যাদির উদ্ধার সাধনে সকলেই মনোযোগী!

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন মৃতদেহ তাহারা দেখিয়াছে কিনা?" তাহারা উত্তর দিল "না কর্ত্তা, যে সব হাল্কা জিনিষ ভাস্‌তে পারে তারাই ঢেউয়ের চোটে ডাঙ্গায় এসে ছিট্‌কে পড়্‌চে,—কিন্তু যে সব ভারী জিনিষ নীচের টানে তলিয়ে যাচ্চে, তাদের সমুদ্রের পেটের ভিতরে ছাড়া আর জায়গা কোথায়?"

যে হতভাগ্য বিদেশী তিন জন সমুদ্র গর্ভে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত যদি তাহারা সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত না হইত তাহা হইলেও স্রোতের টানে পর্ব্বত গাত্রে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইত, যেদিক দিয়াই যাউক মৃত্যু তাহাদের অনিবার্য্য?

বাড়ী ফিরিবার সময় বাবা অত্যন্ত দুঃখ পূর্ণ স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র,—শক্তি কত হীন তবু তাই নিয়ে তারা ঈশ্বরের কাযের উপর বিচার চালাতে চায়? আহা, বেচারা সহকারী কাপ্তেনটির হঠাৎ বিপদে মাথাটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! তুমি কি শুনেছিলে জ্যাক? তিনি বলছিলেন যে সেই তিন জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই—সমুদ্রে এই ঝড় তুলেছিল? আমার বোধ হয় তাঁর কানের নীচে শরষের পুলটিস্ লাগালে কিছু উপকার হতে পারে। কিন্তু—তার চেয়ে আর এক কাজ কল্লে সহজে হয়—আমার ঘুমের সেই বড়ী দুটা তাঁকে খাইয়ে দিলে হয় না?"

ক্লান্তিতে আমার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিল, ঘুমে চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছিল, হকিংসের বা কাপ্তেনের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করা তখন আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। আমি ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিলাম, আমার বোধ হয় আজ রাত্রিটা তাদের চুপ্ চাপ্ করে ঘুমুতে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল। তার পর কাল সকালে উঠে ওষুধপত্র ব্লিষ্টার পীল যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

এ কথার পর বাবা আর কিছু না বলায় তাঁহাকে শয়ন গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আমি টলিতে টলিতে শয্যা গ্রহণ করিলাম, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না। শয্যা গ্রহণের পর মুহূর্ত্তেই গভীর নিদ্রায় চৈতন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় ৮টা। কক্ষ মধ্যে সূর্য্যের যে সুবর্ণ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল সেই ঝিলমিলে রোদে গতরজনীর ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি যেন দূরস্মৃত স্বপ্নের মতই ভাসাভাসা মনে পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে প্রবল বাতাস আমাদের গৃহের ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত নাড়াইয়া দিতেছিল—সেই বাতাসই এখন আইভিলতার সবুজ পাতার ভিতর দিয়া মৃদু মধুর গান গাহিতে গাহিতে বহিয়া চলিয়াছে। এ যেন আরব্য রজনীর স্বপ্নকথার মতই অবিশ্বাস্য! প্রকৃতিরাণী তাঁহার আকস্মিক ক্রোধোপশমে অনুতপ্ত লজ্জায় যেন কুণ্ঠিত হইয়াই এখন অম্লান সূর্য্যকরে, মৃদু বাতাসে গত রজনীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেছিলেন। বাগানে সলিলধৌত গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতার ভিতর লুকাইয়া কলকণ্ঠ বিহঙ্গেরাও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। নাইটিংগেলের মিষ্টস্বর হারমোনিয়মের মতই সুমধুর। মেঘান্ত প্রভাতের কোমল আলোকে গত রজনীর শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ভুলাইয়া দিয়া প্রাণে একটি মধুর প্রসন্নতা জাগাইয়া তুলিল।

আমি যখন হলঘরে প্রবেশ করিলাম তখন রাত্রির বিশ্রামের পর জলমগ্ন নাবিকেরা সকলে একত্র হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া তাহাদের ভিতর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধূম পড়িয়া গেল। বাবা কহিলেন তিনি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন—তাঁহারা উইগটাউন সহরে গিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে গ্লাস্‌গো যাইতে পারিবেন। পথে যাহাতে তাঁহাদের আহারের ক্লেশ না হয়—সে জন্য বাবা প্রত্যেক নাবিকের জন্য প্রচুর খাদ্য সামগ্রীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাপ্তেন মেডোজ্ কর্ত্তৃপক্ষদের তরফ হইতে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম সেই কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখে তিনি ও তাঁহার নাবিকেরা আমাদের ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জার রাগে রাঙাইয়া তুলিলেন।

প্রাতরাশের পর কাপ্তেনের সহিত সহকারী কাপ্তেন ও আমি একবার সমুদ্র-তীরে গমন করিলাম। শোচনীয় ঘটনা স্থলটির শেষ চিহ্ন একবার দেখিয়া যাইবার জন্য কাপ্তেনের ইচ্ছা হইয়াছিল। সহসা বক্ষ তখনও থাকিয়া থাকিয়া যেন অভিমানী নায়িকার মর্ম্ম বেদনার মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল সমুদ্র গর্জ্জন মন্দীভূত! তীরস্থ পর্ব্বত গাত্রে ঢেউগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আছাড় খাইতেছিল সে শব্দ বড় মৃদু, বড় করুণ রাগিণীপূর্ণ গত রজনীর বিশ্ব-সংহারোদ্যত ভাবের চিহ্ন টুকুও নাই। দিগন্তব্যাপী সুনীল বীচিমালা ফেনপুঞ্জের কিরীট ধারণ করিয়া ধীরে গম্ভীরে তালে তালে সমুদ্র বেলায় আছড়াইয়া ফিরিতেছিল। বেলা ভূমের অনতি দূরে—তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে জাহাজের বড় মাস্তুলটা ভাসিতেছে। স্থানে স্থানে ধীবর ও কৃষকেরা ভগ্নখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকৃতি করিয়াছে। জাহাজখানি যেখানে জলমগ্ন হইয়াছিল ঠিক সেইখানে সমুদ্রের উপর দুইটা 'গাংচিল পাখা ঝাড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে

ছিল। মনে হইতেছিল তাহারা বুঝি জলের ভিতর সেই শোচনীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান পাইয়াছে।

সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে কাপ্তেন কহিলেন, "জাহাজ খানা খুব পুরণ বটে,—তবু সে আমাদের অনেক দিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী, রোদ-বৃষ্টি ঝড়ঝঞ্ঝায় অকূল সমুদ্রের আশ্রয় গৃহ!"

কাপ্তেনের ব্যথিত স্মৃতিকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আমি কহিলাম "কি সুন্দর মনো-মুগ্ধকর দৃশ্য—এখনকার এই সৌম্য শান্ত গাম্ভীর্য্যময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে কে মনে করতে পারে যে এই খানেই তিনটি অমূল্য মানব-জীবন হারিয়ে গেছে?"

একটু আবেগের সহিত মেডোজ্ কহিলেন "আহা বেচারারা? যদি আমরা চলে যাবার পর তাদের মৃত দেহ তীরে ভেসে আসে তাহলে মিঃ ওয়েষ্ট আপনি তাঁদের দেহের উপযুক্ত সংকার করবেন ত?"

কাপ্তেনের কথার উত্তর দিতে যাইব এমন সময় সহকারী সহাস্য চীৎকার স্বরে কহিলেন "যদি তাদের গোর দিতে চান একটু শীঘ্র শীঘ্র সে কাজটা সেরে ফেল্‌বেন। তা না হলে তারা হয়ত আবার এদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে। কাল আমি কি বলেছিলুম মনে আছে ত? একবার ঐ চিবিটার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি কি রকম মনে হয়—!"

আমরা চাহিয়া দেখিলাম তীরে অনতি-দূরে একটা কঠিন মৃত্তিকা ও নুড়ীর স্তূপের উপর এক জন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সহকারীর বদ্ধদৃষ্টি সেই লোকটির প্রতিই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত আকৃষ্ট হইয়াছিল। কাপ্তেন সেই দিকে চাহিয়া যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কি আশ্চর্য্য! তাইত—এ যে দেখ্‌চি শনৎসুন নিজে? চল আমরা ওঁর কাছে এগিয়ে যাই—" অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দ্রুতপদে কাপ্তেনকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

স্তূপারূঢ় ব্যক্তি নামিয়া ধীর মৃদুমন্দ গমনে আমাদের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মস্তক ঈষৎ অবনত, —ওষ্ঠে কোমল স্নিগ্ধ সহাস্য ভাব! জগতের কর্ম্ম কোলাহলে ব্যস্ত, আত্ম অহঙ্কারে পরিপূর্ণ মানব আমরা—আমাদের মাথা সেই সৌম্য শান্ত গাম্ভীর্য্যের নিকট যেন আপনা হইতে নত হইয়া গেল। তাঁহার স্থির অকম্পিত কৃষ্ণতার চক্ষুর চিন্তাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যময় দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন আমাদের শিক্ষাদাতা—আর আমরা যেন এক দল স্কুলের বালক—!

আমার জ্ঞানে আমি এমন মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই! এমনতর দিব্য কান্তি মানুষের যে থাকিতে পারে তাহা কখন চিন্তাও করি নাই! প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ ক্ষোদিত মূর্ত্তির মতই মনোজ্ঞ মনোহর! সম্ভ্রমে ভক্তিপূর্ণ বিস্ময়ে আমি অবাক হইয়া তাঁহারই পানে চাহিয়া রহিলাম। স্থৈর্য্য এবং ক্ষমতা-জ্ঞাপক একটি ভাব তাঁহার মুখে ব্যাপ্ত থাকিলেও বাহিরের প্রশান্ততার তাহা বিরোধী নহে। তাঁহার জানু পর্য্যন্ত ঢাকা একটি গেরুয়া

রঙ্গের রেশমী আলখাল্লা, মাথায় একটা গেরুয়া রঙ্গের সুবৃহৎ পাগড়ী, পায়ে শিং-উল্টান অদ্ভুত দর্শনের পশ্চিম দেশীয় নাগরা নামধারী এক প্রকার জুতা। তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, গত রাত্রির জলে ভেজার কোন চিহ্নই তাঁহার পোষাকে ছিলনা, একটি কুণ্ঠিত রেখা, এতটুকু বর্ণহীনতা, জলের দাগ কিছুই না।

সুমিষ্ট সহাস্য স্বরে মেডোজ্ ও তাঁহার সহকারীর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কালকের চুবন খেয়েও তাহলে আপনাদের বিশেষ কষ্ট হয়নি দেখ্‌চি, আপনার অনুগত গরীব খালাসীরা, তারা সব থাক্‌বার ভাল জায়গা পেয়েচে ত?"

কাপ্তেন বলিলেন "আমরা সকলেই নিরাপদে আশ্রয় পেয়েচি, কিন্তু আপনার আর আপনার বন্ধু দুজনের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা মনে না আসায় এইমাত্র আমি মিঃ ওয়েষ্টকে আপনাদের দেহের উপযুক্ত সৎকার কর্‌বার জন্যে অনুরোধ কচ্ছিলেম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, তিনি আপনাদের আশ্চর্য্য উপায়ে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

সন্ন্যাসী উন্নত মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটু খানি ঔদাসিন্যের মৃদু হাসি তাঁহার আরক্ত ওষ্ঠের মধ্যেই বদ্ধ রহিল। "এখন কিছু কালের জন্য আমরা মিঃ ওয়েষ্টকে সে বিষয়ে কোন কষ্ট দেব না? আমি আর আমার সঙ্গী দুজন এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা নির্জ্জন ভাঙা কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েচি। জায়গাটি খুবই নির্জ্জন, কিন্তু আমাদের তুজনের পক্ষে ভারী চমৎকার স্থান।"

কাপ্তেন কহিলেন, আমরা আজ সন্ধ্যার ট্রেনে গ্লাসগো যাচ্চি, আপনারা যদি আমাদের সঙ্গী হন তাহলে আমরা অত্যন্ত সুখী হব। আমার বোধ হয় এর আগে আপনারা আর কখনও ইংলণ্ডে আসেন্‌নি তাহলে কিন্তু একা সহরে বেড়ান আপনাদের পক্ষে ভারী কষ্টকর হবে।"

সন্ন্যাসী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে উত্তর দিলেন "ধন্যবাদ মিঃ মেডোজ! আপনার সহৃদয়তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ! কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন আমরা এইখানেই থাক্‌ব মনে করেচি। প্রকৃতি মাতা আমাদের স্বেচ্ছায় যেখানে এনে ফেলেছেন আমরা সেইখানটিকেই একটু ভাল করে দেখতে ইচ্ছে কর্‌চি, সেইজন্যই আপনার স্নেহের আহ্বান নিতে পাল্লেম না, মাপ করবেন।"

কাপ্তেন স্কন্ধ শুটাইয়া একটু তাচ্ছিল্য ভঙ্গিতে কহিলেন "যা ভাল বোঝেন,—এ জায়গাটাতে বিশেষ কিছু যে দেখবার শোনবার আছে তাত আমার মনে হচ্চে না,—আমার মনে হয় এটা যেন ঈশ্বর বর্জ্জিত দেশ।।"

শনৎসুন হাসিতে লাগিলেন, "আমার কিন্তু উল্টো মত। আপনার হয়ত মিল্‌টনের সেই লাইনটা মনে আছে "স্বর্গ ও নরক মানুষের নিজের মনে।" আমার বোধ হয় আমরা এখানে দিন কতক বেশ আনন্দেই কাটাতে পারব। তা ছাড়া এটা যে কেবল অসভ্যদেরই দেশ, আমার ত এমন বোধ হচ্চে না। তার কারণ আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে এই যুবাপুরুষের পিতা, জন হাণ্টার ওয়েষ্ট

—যাঁর নাম আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও খুব সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন—তিনি ত এই প্রদেশেই বাস কচ্চেন?"

আমি একটুখানি বিস্মিত ভাবে কহিলাম "সত্য সত্যই বাবা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।" সন্ন্যাসী অত্যন্ত ধীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন "এ রকম একজন মহানুভব ব্যক্তির অবস্থানে বন প্রদেশকেও সহরে পরিণত করে, অসংখ্য ইষ্টককাষ্ঠবেষ্টিত অট্টালিকার চেয়ে—একটি মহান আত্মা—সভ্যতার ঢের বেশী উচ্চ নিদর্শন! যদিও স্যার উইলিয়াম কোন্‌স্—কিম্বা ব্যাধণ ভন্‌হ্যামার পার্গষ্টনের ন্যায়—অমন গভীর ভাবে প্রাচ্যভাষায় তাঁর দখল নেই তবু ঐ দুজনের অনেক গুলি গুণ তাঁতে বিদ্যমান আছে। আমার হয়ে মিঃ ওয়েষ্ট আপনি আপনার পিতাকে বল্‌তে পারেন যে তিনি তামুলিক ও দৈদীধাতুর মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেচেন—সেটা কিন্তু তাঁর ভ্রম!"

আমি উত্তর দিলাম "আপনি যখন এই জলাভূমিতে কিছুদিন বাস করে আমাদের সম্মানিত করতে ইচ্ছা করেছেন তখন বাবার সঙ্গে আলাপ না কল্লে তিনি ভারী দুঃখিত হবেন। তিনি এ দেশের জমিদারের প্রতিনিধি—আর আমাদের স্কটল্যাণ্ডের নিয়ম এই যে, কোন বৈদেশিক বিখ্যাত লোক এদেশে এলে জমিদারগৃহই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মুক্ত থাকে।" আমার আতিথ্যপ্রিয়তাই তাঁহাকে আমাদের গৃহে অভ্যর্থনার প্রধান কারণ, ইহার অপর কোন নূতন কারণ ছিল না, কিন্তু সহকারী আমার কথায় এমন ভাবে আমার জামার হাতা ধরিয়া টানিয়া চক্ষুর কটাক্ষে ইশারা করিলেন, যাহাতে বুঝিলাম যে সন্ন্যাসীদের আতিথ্য প্রদান করি ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। তাঁহার আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া শনৎসুন আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন "আপনার নিমন্ত্রণে আমি ও আমার বন্ধুরা বিশেষ সম্মানিত হলেম, কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেইখানেই আমরা থাক্‌তে ইচ্ছে কচ্চি। তার একটু বিশেষ কারণও আছে, যে কুটীরটিতে আমরা এখন বাস কচ্চি সেটি যদিও নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত, আর স্থানে স্থানে ভগ্ন তবু আমাদের বেশ ভালই লেগেচে। ইউরোপীয়ানদের যে সকল জিনিষ না হলে চলে না—ভারতবাসী আমরা—আমাদের সেগুলো অনাবশ্যক ভার বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের বিশ্বাস যার যত আছে সেই অনুপাতে সে ধনী নয়—যে যত ত্যাগ করতে পারে—প্রকৃত পক্ষে সেই তত ধনী। একজন দয়ালু জেলে আমাদের কিছু কিছু শাক আর রুটি দিয়ে যাচ্চে, —শয়নের জন্য প্রচুর শুষ্ক খড় আছে—মানুষের এর চেয়ে বেশী প্রয়োজনই বা কি?"

কাপ্তেন কহিলেন "আপনাদের উষ্ণপ্রধান দেশে ওতে চল্‌তে পারে—কিন্তু এখানকার ঠাণ্ডায় আপনাদের কষ্ট হচ্চে না ত?"

জলধিবক্ষনিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "হতে পারে সময় সময় আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়—কিন্তু আমরা সেটা কৈ লক্ষ্য করিনি, আমরা বহুকাল চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের অধিত্যকায় কাটিয়েচি —ঠাণ্ডায় আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না।"

রঙ্গের রেশমী আলখাল্লা, মাথায় একটা গেরুয়া রঙ্গের সুবৃহৎ পাগড়ী, পায়ে শিং-উল্টান অদ্ভুত দর্শনের পশ্চিম দেশীয় নাগরা নামধারী এক প্রকার জুতা। তাঁহার অত্যন্ত নিকট-বর্ত্তী হইয়া আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, গত রাত্রির জলে ভেজার কোন চিহ্নই তাঁহার পোষাকে ছিলনা, একটি কুঞ্চিত রেখা, এতটুকু বর্ণহীনতা, জলের দাগ কিছুই না।

সুমিষ্ট সহাস্য স্বরে মেডোজ্ ও তাঁহার সহকারীর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কালকের চুবন খেয়েও তাহলে আপনাদের বিশেষ কষ্ট হয়নি দেখ্‌চি, আপনার অনুগত গরীব খালাসীরা, তারা সব থাক্‌বার ভাল জায়গা পেয়েচে ত?"

কাপ্তেন বলিলেন "আমরা সকলেই নিরাপদে আশ্রয় পেয়েচি, কিন্তু আপনার আর আপনার বন্ধু দুজনের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা মনে না আসায় এইমাত্র আমি মিঃ ওয়েষ্টকে আপনাদের দেহের উপযুক্ত সৎকার কর্‌বার জন্যে অনুরোধ কচ্ছিলেম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, তিনি আপনাদের আশ্চর্য্য উপায়ে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

সন্ন্যাসী উন্নত মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটু খানি ঔদাসিন্যের মৃদু হাসি তাঁহার আরক্ত ওষ্ঠের মধ্যেই বদ্ধ রহিল। "এখন কিছু কালের জন্য আমরা মিঃ ওয়েষ্টকে সে বিষয়ে কোন কষ্ট দেব না? আমি আর আমার সঙ্গী দুজন এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা নির্জ্জন ভাঙা কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েচি। জায়গাটি খুবই নির্জ্জন, কিন্তু আমাদের দুজনের পক্ষে ভারী চমৎকার স্থান।"

কাপ্তেন কহিলেন, আমরা আজ সন্ধ্যার ট্রেনে গ্লাসগো যাচ্চি, আপনারা যদি আমাদের সঙ্গী হন তাহলে আমরা অত্যন্ত সুখী হব। আমার বোধ হয় এর আগে আপনারা আর কখনও ইংলণ্ডে আসেন্‌নি তাহলে কিন্তু একা সহরে বেড়ান আপনাদের পক্ষে ভারী কষ্টকর হবে।"

সন্ন্যাসী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে উত্তর দিলেন "ধন্যবাদ মিঃ মেডোজ! আপনার সহৃদয়তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ! কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন আমরা এইখানেই থাক্‌ব মনে করেচি। প্রকৃতি মাতা আমাদের স্বেচ্ছায় যেখানে এনে ফেলেছেন আমরা সেইখানটিকেই একটু ভাল করে দেখতে ইচ্ছে কর্‌চি, সেইজন্যই আপনার স্নেহের আহ্বান নিতে পাল্লেম না, মাপ করবেন।"

কাপ্তেন স্কন্ধ গুটাইয়া একটু তাচ্ছিল্য ভঙ্গিতে কহিলেন "যা ভাল বোঝেন,—এ জায়গাটাতে বিশেষ কিছু যে দেখবার শোনবার আছে তাত আমার মনে হচ্চে না,—আমার মনে হয় এটা যেন ঈশ্বর বর্জ্জিত দেশ।।"

শনৎসুন হাসিতে লাগিলেন, "আমার কিন্তু উল্টো মত। আপনার হয়ত মিলটনের সেই লাইনটা মনে আছে "স্বর্গ ও নরক মানুষের নিজের মনে।" আমার বোধ হয় আমরা এখানে দিন কতক বেশ আনন্দেই কাটাতে পারব। তা ছাড়া এটা যে কেবল অসভ্যদেরই দেশ, আমার ত এমন বোধ হচ্চে না। তার কারণ আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে এই যুবাপুরুষের পিতা, জন হাণ্টার ওয়েষ্ট

—যাঁর নাম আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও খুব সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন—তিনি ত এই প্রদেশেই বাস কচ্চেন?"

আমি একটুখানি বিস্মিত ভাবে কহিলাম "সত্য সত্যই বাবা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।" সন্ন্যাসী অত্যন্ত ধীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন "এ রকম একজন মহানুভব ব্যক্তির অবস্থানে বন প্রদেশকেও সহরে পরিণত করে, অসংখ্য ইষ্টককাষ্ঠবেষ্টিত অট্টালিকার চেয়ে—একটি মহান আত্মা—সভ্যতার ঢের বেশী উচ্চনিদর্শন! যদিও স্যার উইলিয়াম কোন্‌স্—কিম্বা ব্যারণ ভন্‌হ্যামার পার্গষ্টলের ন্যায়—অমন গভীর ভাবে প্রাচ্যভাষায় তাঁর দখল নেই তবু ঐ দুজনের অনেক গুলি গুণ তাঁতে বিদ্যমান আছে। আমার হয়ে মিঃ ওয়েষ্ট আপনি আপনার পিতাকে বল্‌তে পারেন যে তিনি তামুলিক ও সৈদীধাতুর মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেচেন—সেটা কিন্তু তাঁর ভ্রম!"

আমি উত্তর দিলাম "আপনি যখন এই জলাভূমিতে কিছুদিন বাস করে আমাদের সম্মানিত করতে ইচ্ছা করেছেন তখন বাবার সঙ্গে আলাপ না কল্লে তিনি ভারী দুঃখিত হবেন। তিনি এ দেশের জমিদারের প্রতিনিধি—আর আমাদের স্কটল্যাণ্ডের নিয়ম এই যে, কোন বৈদেশিক বিখ্যাত লোক এদেশে এলে জমিদারগৃহই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মুক্ত থাকে।" আমার আতিথ্যপ্রিয়তাই তাঁহাকে আমাদের গৃহে অভ্যর্থনার প্রধান কারণ, ইহার অপর কোন নূতন কারণ ছিল না, কিন্তু সহকারী আমার কথায় এমন ভাবে আমার জামার হাতা ধরিয়া টানিয়া চক্ষুর কটাক্ষে ইশারা করিলেন, যাহাতে বুঝিলাম যে সন্ন্যাসীদের আতিথ্য প্রদান করি ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। তাঁহার আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া শনৎসুন আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন "আপনার নিমন্ত্রণে আমি ও আমার বন্ধুরা বিশেষ সম্মানিত হলেম, কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেইখানেই আমরা থাক্‌তে ইচ্ছে কচ্চি। তার একটু বিশেষ কারণও আছে, যে কুটীরটিতে আমরা এখন বাস কচ্চি সেটি যদিও নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত, আর স্থানে স্থানে ভগ্ন তবু আমাদের বেশ ভালই লেগেচে। ইউরোপীয়ানদের যে সকল জিনিষ না হলে চলে না—ভারতবাসী আমরা—আমাদের সেগুলো অনাবশ্যক ভার বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের বিশ্বাস যার যত আছে সেই অনুপাতে সে ধনী নয়—যে যত ত্যাগ করতে পারে—প্রকৃত পক্ষে সেই তত ধনী। একজন দয়ালু জেলে আমাদের কিছু কিছু শাক আর রুটি দিয়ে যাচ্চে,—শয়নের জন্য প্রচুর শুষ্ক খড় আছে—মানুষের এর চেয়ে বেশী প্রয়োজনই বা কি?"

কাপ্তেন কহিলেন "আপনাদের উষ্ণপ্রধান দেশে ওতে চল্‌তে পারে—কিন্তু এখানকার ঠাণ্ডায় আপনাদের কষ্ট হচ্চে না ত?"

জলধিবক্ষনিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "হতে পারে সময় সময় আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়—কিন্তু আমরা সেটা কৈ লক্ষ্য করিনি, আমরা বহুকাল চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের অধিত্যকায় কাটিয়েচি—ঠাণ্ডায় আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না।"

আমি কহিলাম "যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি করেন তাহলে আমরা কিছু মাছ মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আপনাদের জন্যে উপহার পাঠিয়ে দিই।" সন্ন্যাসী হাসিলেন, কহিলেন, "আমরা ত কৃশ্চান নই—আমরা উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ,—আমাদের শাস্ত্র অহিংসা ব্রত গ্রহণ করতে উপদেশ দেন, নিজের দেহ রক্ষার জন্য মানুষের জীবহত্যা করবার যে কোন অধিকার আছে তা আমরা মনে করি নে, মানুষ যে জিনিষ, যে দুর্ল্লভ জীবন ধন, দান করতে পারেনা বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত সে জীবন গ্রহণ করবার ভগবদ্দত্ত তার কোন অধিকারই নেই। মাপ করবেন আপনার দেওয়া উপহার আমরা গ্রহণ করতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম।"

এ কথার এইখানেই শেষ করিয়া দিয়া কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন "কাপ্তেন মোডোজ্ বিদায়,—জাহাজে আপনি আমাদের সঙ্গে যে রকম অসাধারণ সদ্ব্যবহার করেছেন তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন্, ভগবান আপনাকে আনন্দ দিন,—আর সহকারী মহাশয় আপনাকেও বিদায় জানাচ্চি —এক বৎসরের মধ্যে আপনি আপনার নিজের জাহাজ নিয়ে বেরুতে পারবেন।—মিষ্টার ওয়েষ্ট, এদেশ ত্যাগ করে যাবার পূর্ব্বে—আমার বিশ্বাস আবার আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে—নমস্কার।" মস্তক ঈষৎ নমিত করিয়া আমাদের অভিবাদন জানাইয়া ধীর গাম্ভীর্য্যময় পদ বিক্ষেপে তিনি যেদিক হইতে আসিয়াছিলেন সেই দিকেই চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর পথে ফিরিবার সময় কাপ্তেন মোডোজ স্মিতমুখে কহিলেন "হকিংস্ এক বছরের মধ্যেই তুমি ত জাহাজের মালিক হচ্চ? আমি তোমায় অভিনন্দন কচ্চি?"

সন্তোষের হাসি হাসিয়া সহকারী উত্তর দিলেন, "সে সব কি—আর এসব কপালে হবে? কিন্তু বলাও যায় না কিছু। কি থেকে কি হয়—বিশেষ ওসব লোকের কথা?"—কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু বিশেষ বাহাদুরি-ব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে যুগপৎ কাপ্তেন ও আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "মিঃ ওয়েষ্ট লোকটিকে দেখ্লেন ত, কি মনে হয়?"

সন্ন্যাসীর অপরিবর্ত্তিত প্রশান্ত কোমল কণ্ঠস্বর তখনও আমার কর্ণে সুমধুর বাদ্যযন্ত্রের মত বাজিতেছিল, অপরূপ সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি তখনও আমার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, বুকের ভিতরটা যেন দুলিতে-ছিল—তাহা আশ্চর্য্যে কি আনন্দে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তখন অম্লান রৌদ্রে সমস্ত আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, সমুদ্রের গর্জ্জনধ্বনি যেন আমার হৃদয়ের শান্তভাবের সহিত সুর মিলাইয়া বাজিতেছিল, স্নিগ্ধ বাতাসে জড় ও চেতনের মর্ম্মে মর্ম্মে একটা আনন্দের উজ্জ্বল রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। স্বপ্নপূর্ণ দৃষ্টি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সচকিত হইয়া সহকারীর প্রশ্নে উত্তর দিলাম "চমৎকার! সত্য সত্যই লোকটিকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়েচি। কি সুন্দর মাথার গড়ন, কি মহিমাব্যঞ্জক ধরণধারণ, সাধারণ যুবাপুরুষদের মধ্যে এমন উন্নত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব আমি আর কখনও দেখিনি। আচ্ছা এঁর বয়স কত

হবে? তিরিশ হবে কি? আমার বোধ হয় তিরিশের চেয়ে কম?" সহকারী সবজান্তা ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওঁ হুঁ চল্লিশ।" কাপ্তেন একটু গম্ভীর ভাবে হাসিয়া কহিলেন "না, ষাটের একটি দিনও কম নয়—দু চার বছর বেশী হতে পাবে? মিঃ ওয়েষ্ট আপ্নি হাস্চেন, কিন্তু আমি প্রমাণ দিচ্চি। আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে এঁদের আমি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কথা বার্ত্তা কইতে শুনেচি; তখন ইনি যুবাপুরুষ,—আর আফগান যুদ্ধ,—আজ চল্লিশ বছরের উপর হয়ে গ্যাছে।

আমি আশ্চর্য্য ভাবে কহিলাম "ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু! ওঁর চোখের উজ্জলতা আমার চোখের চেয়েও বেশী, গায়ের চর্ম্ম আমার চেয়েও মসৃণ, মাথার চুল যতটুকু দেখাগেল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলেই ত অনুমান হোল;—এঁদের কয়জনের মধ্যে ইনিই বোধহয় সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ?" কাপ্তেন হাসিতে লাগিলেন, "না সবচেয়ে ছোট,—সেই জন্যেই যখন কথাবার্ত্তা কবার দরকার হয় ইনিই কয়ে থাকেন। এঁর আর দুজন যে সঙ্গী তাঁরা—বহু উচ্চে। পার্থিব বিষয়ে তাঁরা কখনও কোন আলোচনা করেন না।" আমি কহিলাম 'আমাদের এই সমুদ্রের ধারে এ পর্য্যন্ত যত রকম মানুষ বা জিনিষ এসেছে তার মধ্যে এঁরাই সব চেয়ে চমৎকার! বাবা এঁদের দেখ্লে এত সুখী হবেন,—" বাধা দিয়া সহকারী কহিলেন, "খুসী একটু কম হলেও চল্বে। আমার পরামর্শ নিন, ওদের সঙ্গে যতটা পারেন কম করে মিশবেন। আমি যদি কখন নিজের জাহাজ চালাই—আপনাদের বলে রাখছি ও রকম যাত্রী কখনো নেব না।—আসুন এখন আমরা নঙ্গর, টঙ্গর তুলে তৈরী, আপনাদের কাছে বিদায়।"

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম দরজার কাছে তাঁহাদের জন্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। মাল ও মানুষে গাড়ী খানা বোঝাই। কোচ-ম্যানের দুই পার্শ্বে কাপ্তেন ও তাঁহার সহ-কারীর স্থান ছিল, তাঁহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া আবার আমাদের জয়ধ্বনি তুলিলেন তাহার পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উইগ টাউনের তরুচ্ছায়াঘেরা ক্লুমবারের পথে তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া গেল—ততক্ষণ আমরা হাত নাড়িয়া, রুমাল নাড়িয়া তাঁহাদের বিদায় জানাইয়া ছিলাম। কিন্তু অতিশীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র সীমা নির্দ্দিষ্ট পৃথিবী হইতে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। কেবল আমাদের বেলাভূমিকে জাহাজের ভগ্নাংশে এবং তাহার শোচনীয় পরিণামের করুণ কাহি-নীতে প্রকৃতির পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা ভরাইয়া রাখিয়া, আমাদের স্মৃতির মন্দিরে একটি সুকরুণ সহানুভূতির যোগ করিয়া দিয়া গেলেন।

শ্রীসুরূপা দেবী।

নোবেল প্রাইজ

সব জিনিষেরই দুটি দিক আছে—একটি সদর আর একটি মফস্বল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Nobel Prize পেয়েছেন বলে বহুলোক যে খুসি হয়েছেন তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সকলে যে সমান খুসি হন্‌নি এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। এই বাঙ্গলাদেশের একদল লোকের, অর্থাৎ লেখক সম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিষে বিষাদ ঘটেছে। আমি একজন লেখক সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সেই কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ যখন একজন বাঙ্গালীলেখক এই পুরস্কার লাভ করছেন, তখন আর একজনও যে পেতে পারে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে তা উপড়ে ফেল্‌তে গেলে আমাদের বুক ফেটে যাবে! অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নই, বড় জোর তাঁর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ, তাই বলে' পড়্‌তাটা যখন এদিকে পড়েছে তখন আমরা যে Nobel Prize পাব না এ হতে পারে না। সাহিত্যের রাজটীকা লাভ করা যায়—কপালে। তাই বল্‌ছি আশার আকাশে দোদুল্যমান এই টাকার থলিটি চোখের সুমুখে থাকাতে লেখা জিনিষটে আমাদের কাছে অতি সুকঠিন হয়ে উঠেছে।

স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয়, আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চলাফেরা দূরে থাক্, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়, এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি। তেমনি Nobel Prizeএর সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি, লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে আমরা আর হাল্‌কা ভাবে কলম ধর্‌তে পারি নে।

এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র Swedish Academyর মুখ চেয়ে লিখ্‌তে বাধ্য। অথচ যে দেশে ছমাস দিন আর ছমাস রাত সে দেশের লোকের মন যে কি করে' পাব তাও বুঝতে পারি নে। এইটুকু মাত্র জানি যে আমাদের রচনায় অর্দ্ধেক আলো আর অর্দ্ধেক ছায়া দিতে হবে, কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তার হিসেব কে বলে দেয়? Sweden যদি বারোমাস রাতের দেশ হত, তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালির পোঁচড়া দিয়ে যেতে পার্‌তুম; আর যদি বারোমাস দিনের দেশ হত, তাহলেও নয় ভরসা করে সাদা কাগজ পাঠাতে পারতুম। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হওয়াতেই আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি।

দ্বিতীয় মুস্কিলের কথা এই যে, অদ্যাবধি বাঙ্গলা আর বাঙ্গালী ভাবে লেখা চল্‌বে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি তর্জমার দিকে এক নজর রেখে,—এক নজর কেন পূরোনজর রেখেই —আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য গড়্‌তে হবে। অবশ্য আমরা সকলেই দোভাষী, আর আমাদের নিত্য কাজই হচ্ছে তর্জমা করা। কিন্তু সব্যসাচী হলেও এক তীরে দুই পাখী মেরে উঠতে পারি নে। আমরা যখন বাঙ্গলা লিখি তখন ইংরেজির তর্জমা করি, কিন্তু সে না জেনে; আর যখন ইংরেজি লিখি তখন বাঙ্গলার তর্জমা করি, সেও না জেনে। কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে করতে হবে মুস্কিল ত ঐ খানেই। মনোভাবকে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোষাক পরিয়ে Swedish Academyর সুমুখে উপস্থিত করতে হবে। এবং এর দরুণ মনোভাবটীর চেহারাও এমনি ত'য়ের করতে হবে, যে শাড়ীতেও মানায় Gownএও মানায়।

এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে, যুগপৎ, দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্য সাধন করতেই হবে। একটি বাঙ্গালী আর একটি বিলাতি এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন। তা ছাড়া এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাক্‌লে এ দুই সংসার করাও মিছে। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি চাইকি মানুষের হতেও পারে, কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া অসম্ভব, কেননা মানুষের চোখ দুটি হলেও হৃদয় শুধু একটি। ত্রৈণ হতে হলে একটি মাত্র স্ত্রী চাই। এমন কি, দুই দেবীকে পূজা করতে হলেও পালা করে করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্দ্ধেক সময় আমাদের বাঙ্গলা লিখ্‌তে হবে, আর অর্দ্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই Swedenএর কথাই এল। অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছমাস রাত আর ছমাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই।

তৃতীয় মুস্কিল এই যে, সে তর্জমার ভাষা চল্‌তি হলে চল্‌বে না। সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই অথচ ইংরেজের ইংরেজি হলেও হবে না। দেশী আত্মা এমনি ভাবে বিলাতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে। ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুঁড়ির। প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি কিন্তু তার গায়ে রং থাকা চাই দেশী পোকার। এক কথায় আমাদের পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে! এহেন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই।

কাজেই যে কার্য্য আমরা একদিন বাঙ্গলায় করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছি—রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ—তাই আবার দোকর করে ইংরাজিতে করতে হবে। ইউরোপে আসল জিনিষটি গ্রাহ্য হচ্ছে বলে নকল জিনিষটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায় বলে', আমরাও যে সে দেশে মেকি চালাতে পার্‌ব এমন ভরসা আমার নেই।

ফলে আমরা সাদাকে কালো, আর কালোকে সাদা যতই কেন করি না,—

আমাদের পক্ষে Nobel Prize সিকেয় তোলা রইল। কিন্তু যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে শিকে যদি ছেঁড়ে! সেও আবার বিপদের কথা হবে। Nobel Prize পাওয়ার অর্থ শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে অনেকখানি সম্মান পাওয়া। অনর্থ এ ক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু তৎসংসৃষ্ট গৌরব টুকু। বাঙ্গলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মো'ষ তাড়াই এবং পুরস্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাট্ টুকু। স্বদেশের শুভইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে' ইউরোপ যদি উপযাচী হয়ে, আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা পরিয়ে দেয়, তাহলে তার ফলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

প্রথমেই দেখুন, যে, Nobel Prizeএর তারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শত শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়্তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে, সাহিত্য পড়্বার কিম্বা গড়্বার অবসর আর আমাদের থাক্বে না। এক কথায় সমাজের খাতিরে, ভদ্রতার খাতিরে, আমাদের সাহিত্যের ফুলফল ছেড়ে শুধু শুষ্কপত্রের রচনা কর্তে হবে। এই কারণেই বোধ হয় লোকে বলে যে Nobel Prize লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যজীবনের মোক্ষ লাভ করা।

আর এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিব্য আরামে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব জিনিষটে ওভাবে আত্মসাৎ করা চলে না। দেশশুদ্ধ লোক যে গৌরবে গৌরবান্বিত হতে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে "গৌরবে বহুবচন।" কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে কোন একটা নজির নেই বলে', এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে, একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অপর পক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটি লোক যদি আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাহলে নররূপধারী একাধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাকুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এই কথা বেরিয়ে যায় যে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" এবং ও কথা একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলে, তার ফলে, কবিকে কেঁদে মরতে হবে।

তাই বলি, আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে Nobel Prize হচ্ছে দিল্লির লাড্ডু— যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া।

বীরবল।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনার

ডাক্তার স্পুনার কেবল মাত্র আট বৎসর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করিয়াছেন; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অল্প নহে। সম্প্রতি তিনি পাটলিপুত্রের খনন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনার ১৮৯৯ সনে আমেরিকায় কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ পরীক্ষায় সম্মান লাভ করেন। জাপানের রাজধানী টকিও নগরে তিনি কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া পরে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে ১৯০১



প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ স্পুনার।

হইতে ১৯০৪ সন পর্য্যন্ত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া "মধ্যম" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাশীবাসকালে তিনি আমেরিকার হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ লাভ করেন। হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে সাধারণতঃ একব্যক্তি একাধিকবার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। কিন্তু, মিঃ স্পুনারকে দুইবার সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্বকীয় গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

১৯০৪ সনেই স্পুনার সাহেব গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ অধ্যাপক কিলহর্ণের নিকটে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে গমন করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে পুনর্ব্বার হার্ব্বার্ডে গমন করিয়া পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রে ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সম্মানসূচক "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯০৬ সনে ডাক্তার স্পুনার "সীমান্ত প্রদেশীয়" প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ লাভ করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯০৭ সনে তিনি মর্দ্দান জিলার সারিবাহল নামক স্থানে খননে নিযুক্ত থাকিয়া কারুকার্য্য শোভিত অনেকগুলি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার আবিষ্কৃত কুবের ও হরিতির চিত্র আমরা এই স্থানে প্রদান করিলাম। এই সকল মূল্যবান দ্রব্যাদি পেশোয়ার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। এই সময়ে স্পুনার সাহেব যে সকল দ্রব্যাদি

প্রাপ্ত লইয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত যাদুঘরের এক অংশ পূর্ণ হইলেও অতি অল্প ব্যয়ে,—মাত্র সাত শত টাকায় উক্ত বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

১৯০৭ সনে পেশোয়ারের সন্নিকটস্থ সা-জি-কি ঢেরী নামক স্থানে ডাক্তার স্পুনারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পুনরায় খননকার্য্য আরম্ভ করা হয়। ঐ বৎসরেই সারিবাহলের উত্তর



কুবের ও হরিতি
(ডাক্তার স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।)

পূর্ব্বদিকস্থ তাকৎ-ই-বাহি নামক সঙ্ঘারামের খননকার্য্যও তিনি পরিদর্শন করেন। এই স্থানে তিনি শাক্যমুনির ছয় বৎসর কঠোর তপস্যাকালীন যে অস্থিকঙ্কালসার প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতীর পাঠকবর্গের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলাম।

১৯০৮ হইতে ১৯০৯ সা-জিকা ঢেরীর খনন কার্য্য চলিতে থাকে এবং ১৯০৯ সনের মার্চ্চ মাসে কণিষ্করাজনির্ম্মিত আধার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আধারেই বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই আধার ও দেহাবশেষ বর্ম্মার বৌদ্ধগণকে প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা মান্দালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।



গৌতম (ছয় বৎসর তপস্যান্তে)
(ডাক্তার স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত)

১৯০৯—১৯১০ এ ডাক্তার স্পুনার সারিবাহলে অনেকগুলি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ বৃহদাকারের বুদ্ধমূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৯১১ ও ১৯১২ সনে মজঃফরপুরের অন্তঃপাতি বাসারা নামক স্থান খনন করিয়া তিনি অনেকগুলি মোহর প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয়-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে এই মোহরগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে প্রাচীন বৈশালী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল।

১৯১৩ সনে বোম্বাইয়ের কোটিপতি রতন টাটা মহোদয় প্রাচীন স্থানসমূহ খননের জন্য

গবর্ণমেণ্টের হস্তে বাৎসরিক ২০,০০০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার স্পুনারের হস্তে আপাততঃ পাটলিপুত্র খননের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

আমরা "ভারতীর" আগামী সংখ্যায় গত বৎসরে পাটলিপুত্রে যে সকল দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে প্রতিকৃতি সহ তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

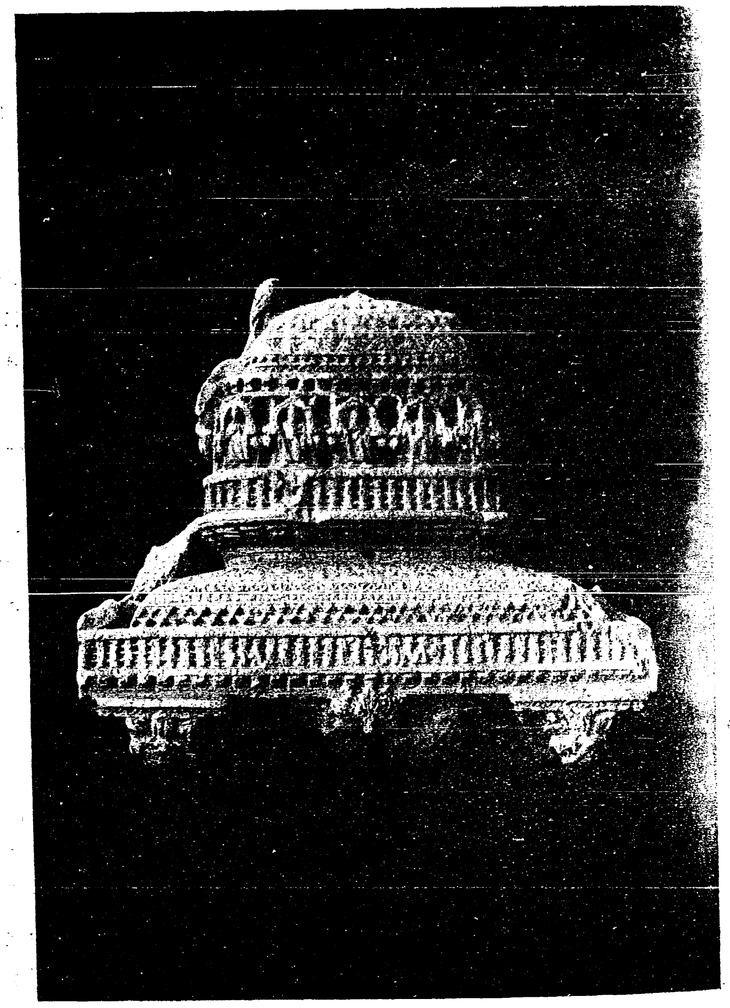

বৌদ্ধ-চৈত্য
(ডাক্তার স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত)

চাঁদিমা *

'ম্যারিগন্যান'—এই সৈনিকোচিত নামটী মঠাধ্যক্ষের বেশ উপযোগী হইয়াছিল। সন্ন্যাসী দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত, ধর্ম্মের ভাবে বিভোর ও শুদ্ধাত্মা। তাঁহার বিশ্বাস স্থির, অচল, অটল! তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ঈশ্বরকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার অভিসন্ধি, ইচ্ছা ও কার্য্য তাঁহার অজ্ঞাত নাই।

যখন তিনি গির্জ্জার অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথে দীর্ঘ পাদক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেন তখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে প্রশ্নের উদয় হইত, —"ঈশ্বর এটা এমন ক'রলেন কেন?" এবং এই প্রশ্ন মনে উদিত হইবার পরই তিনি নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইতেন; এবং মীমাংসাও করিয়া ফেলিতেন। তিনি সাধারণ ধার্ম্মিক লোকের মত কখনও বলিতেন না যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই। পরন্তু তিনি বলিতেন,—"আমি ঈশ্বরের দাস; তাঁর সৃষ্টির কারণ আমার জানা উচিত; যেটা না জানি সেটা জানতে চেষ্টা করাও উচিত।"

তাঁহার মনে হইত প্রকৃতির সমস্ত বস্তুরই একটা অকাট্য ও প্রশংসনীয় কারণ আছে, আর সেই উদ্দেশ্যেই তাহার সৃষ্টি। "কেন" এবং "কারণ" এ দু'টো কথা তাঁহার নিকট প্রায় সমানই হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন আমাদের জাগরণকে আনন্দময় করিবার জন্য উষা, শস্য পাকাইবার জন্য দিন; তাহার উপর জলসেচনার্থ বৃষ্টি, বিশ্রামের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত জানাইবার জন্য সন্ধ্যা এবং নিদ্রার জন্যই কৃষ্ণরাত্রির সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ষড় ঋতুর সৃজন হইয়াছে কেবল চাষের কাজের সারা বছরের আবশ্যক পূর্ণ করিবার জন্য। প্রকৃতির তাবৎ পদার্থের যে একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই এবং পদার্থনিয়মের দারুণ আবশ্যকতাই যে সৃষ্টির প্রধান কারণ এরূপ সন্দেহের ছায়াপাত তাঁহার হৃদয়ে কখনও হইত না।

তিনি রমণীকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এবং নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের ঘৃণাও করিতেন;—এটা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। "রমণী, তোমাকে আমার প্রয়োজন কি?"—খৃষ্টের এই উক্তিটী তিনি আপনার মনে মনে প্রায়ই বলিতেন; আবার বলিতেন,—"বোধ হয় ভগবানও তাঁর এই সৃষ্ট জীবটী সৃজন ক'রে সন্তোষ লাভ ক'রতে পারেন নি! কবিরা কন্দর্প শিশুকে যে অপবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার মনে হইত, রমণী তাহা অপেক্ষাও অপবিত্র,—তার সবটুকুই অপবিত্র। জগতের প্রথম পুরুষকে ত রমণীই প্রলোভন দেখাইয়া পতনের পথে লইয়া গিয়াছিল! এখনও সে প্রলোভন দেখান ছাড়ে নাই; সকল বিপদ,

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বিখ্যাত ফরাসী গল্পলেখক Guy De Maupassant এর গল্পের অনুবাদক Mrs Ada Galsworthy আমাকে এই গল্পটি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

মানবের অকারণ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় বিরক্তি এ সকলের মূলেই ঐ রমণী! আবার তাহাদের পাপ দেহের অপেক্ষা প্রেমপ্রবল আত্মা অধিকতর ঘৃণ্য।

অনেক সময় তাঁহার মনে হইত, রমণীর স্নেহময় ব্যবহার বুঝি তাঁহার মনকে টলাইতে প্রয়াস পাইতেছে; আপনাকে প্রেমজয়ী বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও চির-প্রেম-বিক্ষোভিত রমণী হৃদয়ের আকর্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্তকেও বিক্ষুব্ধ করিত। তিনি ভাবিতেন, পুরুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে প্রলোভিত করিবার জন্যই ভগবান রমণীর সৃজন করিয়াছেন। রমণীর নিকট যাইতে হইলে অতি সাবধানে যাওয়া উচিত। কি জানি সে পুরুষ ধরিবার জন্য কি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে! পুরুষের পক্ষে রমণী বাস্তবিকই ফাঁদ বিশেষ। পুরুষকে ধরিবার জন্যই যেন তাহাদের বাহু সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে।

তাঁহার মন একমাত্র সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের উপর প্রসন্ন ছিল, কারণ তাহারা ব্রতধারিণী, পবিত্রা! তাহাদের উপরেও তিনি সমভাবে রূঢ় ব্যবহার করিতেন, তাহার কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে তাহারা শুদ্ধচারিণী হইলেও অন্তরে অন্তরে তাহাদের প্রণয়ের স্রোত বহিতেছে; আর তাঁহার ন্যায় সংযমী পুরোহিতও কখন কখন তাহার আভাষ অনুভব করিয়া থাকেন।

তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেন যে, সন্ন্যাসিনীর নেত্রে যে পরিমাণ কোমলতা, চাহনীতে যে পরিমাণ স্নেহ থাকা উচিত তাহাদের দৃষ্টিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কোমলতা, অধিক স্নেহ আছে; তাহাদের খ্রীষ্টের প্রতি প্রেমোচ্ছাসও তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইত না, কারণ সে প্রেম দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত হইলেও তাহা রমণীর প্রেম, পার্থিব প্রণয়োচ্ছাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সন্ন্যাসিনীদিগের দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ, তাহাদের কোমল স্বরে তাঁহার সহিত কথা কহা, তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইলে অশ্রুসজল নেত্রে বিদায় প্রার্থনা এ সকলের মধ্যেও তিনি তাহাদের পঙ্কিল পার্থিব প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন।

মঠ দ্বার হইতে বাহির হইয়াই তিনি তাঁহার পরিচ্ছদটী ঝাড়িয়া ফেলিতেন, তাহার পর দীর্ঘপাদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে দ্রুত-প্রস্থান করিতেন—যেন কি একটা বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন!

তাঁহার একটী ভাগিনেয়ী ছিল। সে তাহার মাতার সহিত নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিত। পুরোহিত তাহাকে সন্ন্যাসিনী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

মেয়েটী দিব্য সুন্দরী, একটু পাগলাটে ধরণের; পুরোহিত তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে সে হাসিতে থাকিত; তিনি ক্রমে রাগিয়া যাইতেন; বালিকা তখন তাঁহাকে উভয় বাহুতে বেষ্টন করিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন দানে বিব্রত করিয়া তুলিত; তিনি অন্তরে ইহাতে আনন্দ পাইলেও এবং পুরুষ হৃদয়ের সুপ্ত পিতৃভাব জাগিয়া উঠিলেও অনিচ্ছার সহিত আপনাকে সে স্নেহালিঙ্গন হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন।

তিনি যখন কুমারীকে সঙ্গে লইয়া মাঠের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ঈশ্বরের

কথা—তাঁহার বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা ঈশ্বরের কথা বলিতেন, সে তখন সেদিকে মন না দিয়া বিশেষ একাগ্রতা সহকারে আকাশ তৃণ ও পুষ্পের দিকে চাহিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে পতঙ্গের অনুসরণে ছুটিয়া যাইত, তাহার পর পতঙ্গ হাতে ধরিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিত,—"কেমন সুন্দর এটি দেখ মামা! আহা, আমার ইচ্ছে করে একটা চুম খাই!" পতঙ্গ বা পুষ্পকে এই চুম্বন দানের আকাঙ্ক্ষা পুরোহিতকে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিত। রমণীহৃদয়ের যে প্রেমের ফল্গু চিরদিন বহিয়া যাইতেছে পুরোহিতের নিকট প্রকারান্তরে ইহা তাহাই প্রমাণ করিয়া দিত।

তাঁহার গৃহকর্ত্রী, মঠের ধনরক্ষকের পত্নী একদিন অকস্মাৎ অতি গোপনে তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে তাঁহার ভাগিনেয়ীর একজন প্রণয়ী আছে! একথা শুনিয়া তাঁহার মন ভয়ানক ব্যগ্র হইয়া উঠিল বটে কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার দাড়ির উপর দিয়া ক্ষুর চলিতেছিল বলিয়া সে রাগটা তেমন করিয়া প্রকাশ পাইতে পারিল না।

কথাটা শুনিয়া প্রথমে তাঁহার রাগে কণ্ঠ রোধ হইল; পরে কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিলে তীব্র স্বরে তিনি বলিলেন, —"এও কি কখন হ'তে পারে?—মিলেনী, তুই মিথ্যা কথা ব'লছিস।"

কৃষকরমণী আপনার বক্ষে হাত রাখিয়া বলিল,—"না পাদ্রী সাহেব, আমি মিথ্যা বলিনি, তা যদি ব'লে থাকি তবে পরমেশ্বর যেন তার বিচার করেন। নদীর ধারে তাদের মিলন হয়। রাত দশটা থেকে দুপুরের ভেতর সেখানে গেলেই, স্বচক্ষে সব দেখতে পাবেন।

তিনি ক্ষৌরকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ঘরের মধ্যে ক্রমাগত প্রচণ্ড বেগে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একটা কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইলে তিনি এইরূপ করিতেন। তাহার পর আবার যখন ক্ষুর ধরিয়া কামাইতে গেলেন তখন নাক হইতে কাণের মধ্যে তিন স্থানে ক্ষুর বসাইয়া ফেলিলেন।

ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির গম্ভীর থাকে সেই ভাবে তিনি সারা দিনটা কাটাইয়া দিলেন। এই সর্ব্বজয়ী প্রেমের উপর তাঁহার ধর্ম্মযাজক-সুলভ কোপের সহিত, পিতৃ-সুলভ কোপ ও আত্মার-রক্ষক ও অভিভাবক-সুলভ কোপ মুক্ত হইল; তিনি যে প্রতারিত, ব্যর্থমনোরথ এবং বালিকার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন এ চিন্তায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বৃদ্ধ মাতাপিতারা যখন কন্যার নিকট শুনেন যে তাঁহাদের অজ্ঞাতে, তাঁহাদের সাহায্য না লইয়াই তাঁহাদের কন্যা আপনার স্বামী নির্ব্বাচন করিয়াছে তখন তাঁহাদের স্বার্থে ও আত্মসম্মানে যেরূপ আঘাত লাগে পুরোহিতমহাশয়ের আত্ম-সম্মানও এই সংবাদে সেইরূপ আহত হইল।

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি পাঠে একটু মন দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাগ তাঁহার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রি দশটা বাজিলে তিনি আপনার ছড়িগাছটি

তুলিয়া লইলেন; রাত্রিকালে রোগী দেখিতে যাইতে হইলে তিনি এই ওক কাঠের সুন্দর ছড়িটী না লইয়া যাইতেন না। তাঁহার দৃঢ়-মুষ্টিগত ছড়িটীর দিকে চাহিয়া একবার ঈষৎ হাস্য করিলেন তাহার পর সেটী ঘুরাইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সজোরে ছড়ি দিয়া একখানি চেয়ারে আঘাত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেটী ভগ্নাবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

দ্বার খুলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু চন্দ্রকিরণ উদ্ভাসিত আকাশের পানে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ সুন্দর চন্দ্রালোক তিনি বহুদিন দেখেন নাই।

তাঁহার প্রাণ,—সেই শান্ত রজনীর বিরাট সৌম্য চন্দ্রালোক দেখিয়া প্রাচীন ঋষি ও কবিদিগের ন্যায় ভাববিভোর, চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল।

তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানখানির সারবন্ধী ফলের গাছগুলি স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে স্নাত হইয়া তাহাদিগের সরু দীর্ঘশাখা বাহুগুলির ছায়া পথের উপর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তখন আর সে গুলি তেমন সবুজ দেখাইতে ছিল না। অন্যদিকে গৃহপ্রাচীর গাত্র বাহিয়া যে পুষ্পলতা তাঁহার ঘরের ছাদের উপর উঠিয়াছিল তাহার স্নিগ্ধ মিষ্টগন্ধ বায়ু পথে সৌগন্ধের একটী বিমল আত্মার ন্যায় ভাসিয়া আসিতেছিল।

মাতাল যেমন আগ্রহে মদ্য পান করে তিনি ঠিক তেমনি আগ্রহে বায়ু পথে ফুলের আঘ্রাণ লইতেছিলেন। সেই ভাবে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন; বিস্মিত, বিমুগ্ধ তিনি আপন ভাগিনেয়ীর কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।

মাঠের পথে আসিয়া পড়িতেই তিনি সেই চন্দ্রালোক পরিস্নাত নিশীথের নিস্তব্ধ শুভ্র প্রান্তরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কি সুন্দর সে দৃশ্য! স্নিগ্ধশান্ত রজনীতে ঝিল্লিরব ও চক্রবাক বঁধুর গীতের মূর্চ্ছনা বায়ুপথে ভাসিয়া আসিতেছিল।

পুরোহিত আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার হৃদয় যেন অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ এরূপ হইবার কোন কারণ তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। ক্রমেই তিনি যেন অধিকতর শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল যেন সেইখানেই থাকিয়া যান, একটু বিশ্রাম করেন, ভগবানের এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বসিয়াই তাঁহার পূজা ও মহিমা কীর্ত্তন করেন—এইং এইখানেই—এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার জীবন অবসর লাভ করে!

অল্প দূরে নদীর বক্র পাড়ে পপ্‌লার বৃক্ষের সারি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একটা পাতলা কুয়াসা, অস্বচ্ছ শুভ্র বাষ্পজাল চন্দ্রালোকে ঈষৎ দীপ্তিশালী হইয়া ক্ষুদ্র নদীটির ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাহাতে বঙ্কিমগতি নদীটির জলস্রোত ঈষৎ দীপ্তিময় স্বচ্ছ পশমী বস্ত্রখণ্ডে আবৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

পুরোহিত আবার থামিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে পর্য্যন্ত একটা অদম্য, ক্রম-বর্দ্ধনশীল স্নিগ্ধ চঞ্চলতার প্রবাহ ছুটিয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে একটা সন্দেহ, একটা অজ্ঞাত অস্বচ্ছন্দতা তাঁহাতে বিকশিত হইল। সময়ে সময়ে তিনি আপন মনে যে সকল প্রশ্নের সমাধান করেন তখন তাঁহার মন সেইরূপ প্রশ্নে ভরিয়া উঠিল।

ভগবান এমনটা করিলেন কেন? রাত্রি যদি নিদ্রার জন্য, বিশ্রামের জন্যই সৃষ্ট তবে তিনি ইহাকে দিনের চেয়ে এত রমণীয়, প্রভাত ও সূর্য্যাস্ত অপেক্ষা এত মধুর, এত সুন্দর করিলেন কেন? কেন এ নির্জ্জনবিহারী অদ্ভুত উপগ্রহটীকে তিনি সূর্য্যাপেক্ষা এত অধিক কবিত্বময় করিয়া গড়িলেন, দিনের পূর্ণ আলোক যে সকল দ্রব্যকে রহস্যময়, সুকুমার বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহে না—চন্দ্রালোক যে তাহাকেও প্রকাশ করিয়াছে! ছায়াগুলিকে স্বচ্ছ তরল করিয়া চাঁদ ওখানে উঠিল কেন?

অন্যান্য পাখীর মত শ্রেষ্ঠকলাবিদ্ বিহগেরা এ সময় বিশ্রাম করে না কেন?—তাহার পরিবর্ত্তে রজনীকালে তাহারা বায়ুর উপর গানের মূর্চ্ছনাই বা ছড়াইতে থাকে কেন?

মানুষ যদি রাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল তবে কাহার চিত্ত হরণের জন্য এ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি? কাহার জন্য এ উদার উন্মুক্ত দৃশ্য, স্বর্গের নন্দন হইতে মর্ত্ত্যের উপর এ কবিত্ব-পারিজাত বৃষ্টি?

সন্ন্যাসী কোনমতেই এ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিলেন না।

হঠাৎ যেন তাঁহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন অদূরে তৃণাচ্ছাদিত মাঠের প্রান্ত ভাগে বিমল-চন্দ্রকর-স্নাত তরুমণ্ডপের নিম্ন দিয়া দুইটি ছায়ামূর্ত্তি পাশাপাশি চলিতেছে!

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মূর্ত্তিটি পুরুষের;—তাহার হাতখানি প্রণয়িনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রশান্ত ভূমিখণ্ড যেন তাহাদিগের পদস্পর্শে সজীব হইয়া দৈবপ্রেরিত দুর্ভেদ্য আবরণের মত তাহাদিগকে বহির্জ্জগৎ হইতে রক্ষা করিতেছে। তাহারা দুইটিতে যেন এক আত্মা;—আর তাহাদের জন্যই যেন এই শান্ত সুন্দর রজনীর সৃষ্টি!

তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বক্ষের স্পন্দন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন কোন একটা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার নয়নের সম্মুখ দিয়া এ যেন সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ক্রমে সেই পবিত্র বাইবেল-বর্ণিত রুথ ও বুজের প্রেমাভিনয় চলিতেছে। তাঁহার সারা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বাইবেলের পবিত্র গাথা, সেই জ্বলন্ত কবিতাস্রোত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বুঝি মানবের প্রেম মায়াচ্ছাদনে আবৃত করিবার জন্যই ভগবান এমন সুন্দর রজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন!"

এই প্রেমিক যুগলকে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। তাহার পরই তিনি চিনিতে পারিলেন যুবতী তাঁহারই ভাগিনেয়ী! এইবার তাঁহার মনে হইল, বুঝি তিনি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন। কারণ যে প্রেমকে তিনি এমন মহিমময় আবরণে বহির্জগতের নিকট হইতে আবৃত

করিয়া রাখিয়াছেন সে প্রেম কি তাঁহার অনভিপ্রেত হইতে পারে।

কর্ত্তব্যবিমূঢ় লজ্জিত পুরোহিত তখনি সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিলেন! তাঁহার মনে হইল আজ যে পবিত্র দেবমন্দিরের দ্বার অবধি গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন তাহার ভিতরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়।

জর্ম্মান্‌সম্রাট কেইসার উইলহেল্‌ম্‌

(সম্রাটের কোন বিশিষ্ট বন্ধুর রচনা হইতে সঙ্কলিত)

পরলোকগত মাকু য়েস্‌ সেলিস্‌বারি কথা প্রসঙ্গে একদা কেইসারকে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ অবিবেচক বলিয়াছিলেন। এরূপ নিরপেক্ষ ভাবে একজনের প্রতি ব্যক্তিগত মতের অভিব্যক্তি করা সহজ বটে, অনেকেই বোধ হয় বিনা আয়াসে এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া দেখা উচিত প্রত্যেক লোকেরই সাধারণতঃ দুইটী প্রকৃতি বর্ত্তমান। যাহা সাধারণের পরিজ্ঞাত তাহাই কোন ব্যক্তির স্বভাবের বাহ্যাভিব্যক্তি; আর যাহা গুপ্তভাবে পরোক্ষে তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিয়া, ঐ ব্যক্তির পারিবারিক ব্যক্তিবর্গ ও কর্ত্তব্যনিচয়ের প্রতি আবদ্ধ থাকে, উহাই তাঁহার আভ্যন্তরীন্‌ চরিত্রের দ্বিতীয় বিকাশ বলিয়া ধরা যায়। কাজেই কাহারও সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত প্রচার করিতে হইলে, চরিত্রের উভয় দিকই আলোচনা করা দরকার।

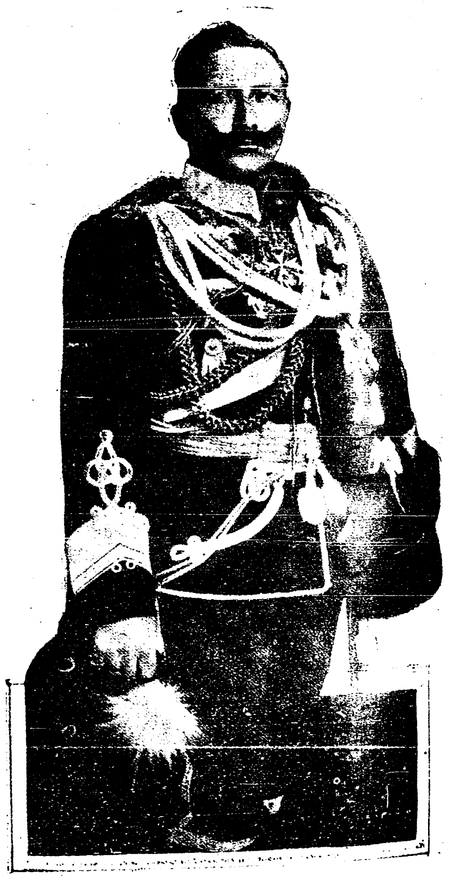

জর্ম্মানসম্রাট কেইসার উইলহেলম্‌

জর্ম্মান্‌ সম্রাট কেইসারের চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন, সম্রাটের মধ্যে কোন্‌খানে কতটুকু ভাল বা কতটুকু মন্দ

রহিয়াছে। কেবল তাঁহারাই সদম্ভে পূর্ব্বকৃত অপবাদের নিরাকরণে হস্তপ্রসারণ করিতে সাহস পান। জর্ম্মান্‌ সম্রাটের নৈতিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণে যাঁহারা প্রচুর অবকাশ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে—বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকও একজন। প্রবন্ধের অন্তর্গত রোমান্স (Romance) গুলি লেখকের মৌলিক চিন্তাশক্তির ফল নহে—বা কাব্য কল্পনাও নহে পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ দর্শনে তাঁহার আভ্যন্তরীন্‌ চরিত্রের যথার্থ অনুবর্ত্তন মাত্র!

পৃথিবীতে বিশ্রামবিমুখ যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তবে জর্ম্মান সম্রাটই সেই লোক,—এই আখ্যা একমাত্র তাঁহাকেই সাজে! অপরাপর রমণীয় সামগ্রীপুঞ্জের মধ্যে, তাঁহার অতি প্রিয় একটী মাত্র বজরাই প্রাতঃসন্ধ্যায় তাঁহার বাহন স্বরূপ হইয়া থাকে। এই সুদৃশ্যমান্‌ সুরভিসম্ভারে সজ্জিত ক্ষুদ্র তরণীর আরাম কুঞ্জেও তাঁর বিশ্রাম নাই! কোন্‌ দেশে কখন কোন্‌ বিষয়ের কতদূর উন্নতি সাধিত হইল ও কোন্‌ সাম্রাজ্যের শাসননীতি কতদূর উন্নতিশালী হইল এইরূপ আলোচনাই সম্রাটের নিকট বিশ্রাম সুখের প্রকৃত উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ আলোচনা ছাড়াও বজরাখানি নানাবিধ জটিল বিষয়ের মন্ত্রণালয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সময়ের অল্পতা যতই কেন হউক না, বিষয়টীর গুরুত্ববোধক ও সমস্যাসূচক কূটস্থান তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, অদ্ভুত মেধাবীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রত্যুত্তরে সকল জটিলতা "জলবৎতরলম্‌" করিয়া তবে ক্ষান্ত হন।

সম্রাটের ইংলণ্ডপ্রীতি তাঁহার পুত-চরিত্রের আর একটী নির্ম্মল চিত্র। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ইনি দেবীজ্ঞানে মনোমন্দিরে পূজা করিয়া থাকেন এবং সেই হেতু কোন ইংরেজকে দেখিবামাত্রই তাঁহার আরাধ্যা মহীয়সী নারীর স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়া সমাদরে তাহাকে আতিথ্য দান করেন। সমবেত কর্ম্মচারী সমক্ষে, একদা তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর জ্ঞানী ও উৎকৃষ্ট নৃপতির আসরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার মত মাত্র দুইটী লোকের নাম করা যায়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ও সম্রাট পিতামহ উইলহেলম্‌ অন্যতম। এইরূপ কথোপকথনের পর সম্রাট, হাস্যপরিহাসচ্ছলে বলিলেন—"অবশ্য আমিও ইহাঁদের পরবর্ত্তী আসন পাইতে ইচ্ছুক, কি বল?" বাস্তবিক তিনি একটী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! মন্ত্রীসমক্ষে সভাস্থলে—বিদ্বান ব্যক্তি সঙ্গমে এমন কি সাধারণ রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সম্মুখেও, বিশেষ বিনয়তৎপরতার সহিত আত্মদৈন্যতা জানাইয়া,—তিনি যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পিতামহের শাসননীতির অনুসরণ বৃত্তির আশ্রয় অবলম্বনে কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন না! বাস্তবিক যখনই কোন অঘটন ঘটিবার উপক্রম হয়, কি কোন প্রকার দুর্ঘটনার অভিনয় সুরু হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যায় সম্রাট একান্ত অনুগতের ন্যায় ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের কার্য্যাবলীর আলোচনা দ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করেন। এইরূপ গুণগ্রাহিতায় জর্ম্মান্‌ সম্রাটের উদারতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত, কেইসারের বেশ মাখামাখি আছে। অবকাশ কালে এই দুই শাসন কর্ত্তার মধ্যে চিঠি পত্রের বিনিময়ও ঘটিয়া থাকে। মামা এডওয়ার্ড থাকিতে ভাগিনেয় আপন প্রিয় বজরায় করিয়া বৎসরান্তে একবার ইংলণ্ডে বেড়াইতে যাইতেন; এই উপলক্ষে আমোদ প্রমোদে লণ্ডন নগরী মুখরিত হইয়া উঠিত। কিন্তু এখন? এখন ইচ্ছা থাকিলেও জর্ম্মান্ সম্রাট ইচ্ছার পূর্ণতাসাধনে যত্নবান্ হইতে পারেন না। সে গিয়াছে এক শান্তির যুগ যখন এডওয়ার্ড জীবিত ছিলেন! আর আজ? চতুর্দ্দিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—গোপনে সমরানলের আয়োজন—যাহার এক অধ্যায়ের অভিনয় বলকান্ ক্ষেত্রেই অভিনীত হইতেছে। আরো কি হইবে কে জানে? এই সব কারণেই জর্ম্মান সম্রাট, নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও তথায় যাইতে পারিতেছেন না। লোকে কি বলিবে? উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, কানাকানি হাঁকাহাঁকি ত চলিবে!

পাশ্চাত্য সুধীসমাজ জর্ম্মান্‌সম্রাট কেইসারকে ইউরোপের মধ্যে "শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই উক্তি যে সর্ব্বাংশেই তাহার প্রাপ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের রাজশক্তির সহিত পরিচয় লাভ তিনি একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তদুদ্দেশ্যে ইনি কয়েক বৎসর হইল, বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য নৃপতিদিগের সহিত কিয়দ্দিবস একত্রে বাস ও গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার ফলে তাঁহাদের চরিত্র ও আন্তর্জাতিক ভাবের আভাষ উপলব্ধি করা! আমরা জানি একদিন পরলোকগত সম্রাট এডওয়ার্ড সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া! শক্তির পসরা যাহাতে ইউরোপ অধিক দিন বহন করিতে পারে, এ কেবল তাহারি জন্য! কিন্তু হায়, সম্রাটের চুক্তিপত্রের বন্ধনও যেন এইবার শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

জর্ম্মান্‌রাজ বহু ভাষাবিদ্। ইংরেজী ভাষা ঠিক যেন মাতৃভাষারই ন্যায় অনর্গল বলিয়া যাইতে পারেন। বিদেশী ভাষায় তাঁহার এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি ইংরেজী ও জর্ম্মান ভাষার মধ্যে কোনটী আগে শিখিয়াছি, মনে নাই।"

সম্রাট কেইসার অতি প্রত্যূষেই শয্যা-ত্যাগ করেন। কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে এমনও বলেন যে, তিনি মোটেই ঘুমান না। সারা রাত জাগিয়া কেবল কাজের বোঝা লাঘব করিতে থাকেন। রাজপ্রসাদের প্রত্যেক শয়ন কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে একটী করিয়া অধ্যয়নাগার নির্দ্দিষ্ট আছে—এইরূপে দ্বাদশটী কক্ষে দ্বাদশটি পাঠাগার সংযুক্ত। সন্ধ্যা হইলেই সম্রাট প্রথমটীতে গমন করেন ও ঘণ্টাকাল কাটাইয়া দ্বিতীয়টীতে প্রবিষ্ট হন, এইরূপে সারা রাতে দ্বাদশটী প্রকোষ্ঠ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া থাকেন। ইহার মধ্যেও অন্য কাজ আছে,—এইরূপ কাজকর্ম্ম পড়াশুনার মাঝে তিনি কখন্ আহার ও নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন তাহাই আশ্চর্য্য! পাশ্চাত্য সুধীসমাজ হয় ত এই জন্যই তাঁহাকে সমগ্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইউরোপ

কেন,—সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ কর্ম্মাসক্ত পুরুষ দুইটী আছে কি না সন্দেহ। কার্য্যের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত হইলেও মাঝে মাঝে এরূপ শুনা যায় যে, স্থানীয় থিয়েটারেও ইনি যোগ দিয়া থাকেন। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ধূম চলিতেছে, রহস্য বেশ জটিল হইয়া আসিয়াছে, রাত্রিও প্রায় দুই প্রহর,—হয়ত এমন সময়েই সম্রাট নাচ গান, হাসি তামাসা ফেলিয়া কর্ম্মের টানে বার্লিন রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর অমনি পূর্ব্বকৃত অসমাপ্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া উহার বাকী অংশ শেষ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যখন নগরীর লোকসকল একবার ঘুমাইয়া আবার দিবালোক প্রকাশের বাকী দুই ঘণ্টার জন্য দ্বিতীয় বার নিদ্রার ক্রোড়ে শ্রমসন্তপ্ত দেহ ঢালিয়া দেয়, তখনও জার্ম্মান্ সম্রাটের কক্ষস্থিত আলোক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না।

এই ত গেল রাত্রির কথা। দিবাভাগে যে পরিমাণ কার্য্য তিনি করিয়া থাকেন, উহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। প্রত্যেক কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই বহু সংখ্যক সেক্রেটারী তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, সম্রাটকে অনুসরণ করিতেই বেচারাদের সময় চলিয়া যায়। আর যদি তাঁহারা কোন কাজে হাতই দেন ত তাহা অর্দ্ধেক শেষ করিতে না করিতেই আবার সম্রাটের নূতন তাগিদ তাঁহাদের ব্যস্ত করিয়া তুলে। সময়ের অনাবশ্যক পরিক্ষেপ যিনি আদৌ পসন্দ করেন না।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সুশৃঙ্খল কার্য্য-প্রণালী বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন জার্ম্মান্ সম্রাটের কার্য্য কলাপে শৃঙ্খলার লেশ মাত্রও নাই। যদি এতদূর অনুযোগ তাঁহাকে দিতেই হয়, তবে জানা উচিত যে উহা দ্রুত কার্য্য-প্রিয়তার আনুসঙ্গিক দোষ। এই যেমন ধরা যাক্, মন্ত্রীর নিকট তিনি এক জরুরী পত্র লিখিতেছেন, এমন সময়ে সৈন্য বিভাগের এক অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সে চিঠি লেখা ফেলিয়া, প্রাপ্ত অভিযোগের যথার্থ উত্তর প্রদানে নিযুক্ত হইলেন! ইহাতেই বেশ বুঝা যায় সম্রাট কখনও ভিড়ে চাপা পড়েন না; সকল সময়েই কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত সজাগ ও সচকিত থাকে।

সম্রাটের একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া লুসি আশৈশব পিতার সঙ্গী; যখন কার্য্যব্যপদেশে তিনি ইউরোপের প্রত্যেক রাজশক্তির সহিত পরিচিত হইতেছিলেন, প্রাণাধিকা কন্যা তখনো পিতার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। জীবনের প্রতিপদ বিক্ষেপে,—আলোড়ন বিলোড়নের মাঝে সম্রাটের একনিষ্ঠ সাধক—একমাত্র সঙ্গী তাঁহার এই কন্যা! প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুযায়ী বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে সম্রাট প্রায়ই বজরায় কাল কাটাইয়া থাকেন—কন্যা লুসিও পিতার আমোদ প্রমোদে যোগ দান করেন।

কোন কোন পাঠক হয়ত কেইসারকে বেরসিক ঠাওরাইয়াছেন। কিন্তু আসলে তা নয়, শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয় যে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মাসক্ত পুরুষও গীত-

বাদ্যাদিতে সুনিপুণ! তিনি কেবল উত্তম যন্ত্র-বাদক নহেন, একজন উৎকৃষ্ট গায়ক। তাঁহার রচিত অনেক গান জাতীয় উৎসবে ও সভাসমিতিতে গীত হইয়া থাকে। সম্রাটের সাধের বজরাটির নাম 'হহেন ভলোরন্'। গানের আসর এইখানেই সাধারণতঃ জমে, অনেক হাসি তামাসাও হইয়া থাকে। একদিন গ্রামোফন চলিতেছে সম্রাট আনমনা হইয়া সামরিক কার্য্যের আলোচনায় প্রবিষ্ট আছেন। এমন সময় অলক্ষ্যে এক জেনারেল রেকর্ড বদলাইয়া দিলেন। হঠাৎ যখন সেই গানের স্বর বাহির হইল তখন সম্রাট বলিয়া উঠিলেন, "What a horrible noise"; সম্রাট কর্ম্মচারীকে রচয়িতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। হাসি চাপিয়া অনুচর জানাইল যে, গানটি সম্রাটেরই রচনা! সম্রাট খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া রেকর্ডটি টানিয়া ফেলিয়া দিলেন।

জর্ম্মান্ সম্রাটের পৌরুষেয় ভাব বা ব্যক্তিত্ব জগৎবিদিত। সত্য বলিতে কি তাঁহার মধ্যে এমন কোন খুঁৎ নাই, যাহা না কি মন্ত্রী অথবা সেক্রেটারীবর্গের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা দ্বারা সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক চর্চ্চায় আপন ভ্রাতা প্রুসিয়াধিপতি হেনরী সময় সময় সে সকল বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন সম্রাট তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া নীর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার সার গ্রহণে যত্নবান হন।



'হোহেন ভলোরন্' বজরায় সম্রাট ও কন্যা লৌসি।

সুদূরে পাশ্চাত্য প্রদেশে রমণীর প্রভূত ক্ষমতা! কিন্তু কেইসার ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী! জর্ম্মান্ দেশে সেই জন্যই রমণীর ক্ষমতা লণ্ডন অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কঠোর স্বরে সম্রাট বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রী স্বাধীনতা তাঁহার অসহ্য, বিশেষ রাজনৈতিক আলোচনায়! বলা বাহুল্য এ বিষয়ে অনেক সময় সাম্রাজ্ঞী এবং প্রাণপ্রিয়া কন্যাও অনুরোধ করিতে যাইয়া নিরাশ হন। বাকিংহাম রাজপ্রসাদে

একবার কেইসারের সহিত রাজ্ঞী মেরীর এ বিষয়ে বেশ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। তাঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রয়োজনীয় অংশটুকুই উদ্ধৃত হইল।

কেইসার প্রশ্ন করিলেন—"What can women know of politics?"

শান্তস্নিগ্ধ স্বরে মেরী প্রত্যুত্তর করিলেন—

Just about as much as a man knows of the organization of a nursery and the rearing of a family.

কেইসার চুপ করিয়া রহিলেন। প্রতিবাদের দ্বিতীয় শব্দ না করিয়া কথার সুর বদলাইয়া দিলেন।

ভাগিনেয় কেইসারের মাতুলপ্রীতি তাঁহার চরিত্রের আর একটী মধুর দিক। এডওয়ার্ডকে তিনি কতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন—কতদূর অন্তরতম ভাবিতেন, জনসমাজ সে কথার একাংশও বিদিত নহে। একটী ঘটনা হইতেই তাঁহার আন্তরিক ভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তিনি মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণায় নিযুক্ত, খবর আসিল, ইংলণ্ডের রাজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত! অমনি জর্ম্মানসম্রাট দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন; শোকবিজয়ীর হৃদয় কোন অভূতপূর্ব্ব বেদনায় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। কেইসার কাঁদিয়া ফেলিলেন।.....সাম্রাজ্যের প্রতি শত কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই লণ্ডনাভিমুখে যাত্রার জন্য যথোপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রচারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যেন কেহই তাহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে জীবনবাহী চির অভিশাপ অর্জ্জন না করেন! এইরূপে —নানাপ্রকারে—যাবতীয় কার্য্যের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের প্রতি তাঁহার গভীর আসক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! আমরা জানি ইউরোপের পঞ্চ শক্তির মধ্যে ইংরেজ ও জার্ম্মান্ শক্তি ক্ষমতার তৌলদণ্ডে সম-ওজনে বিরাজমান্—কিন্তু এই সমতাই আবার উভয়ের বিরোধের কারণ। ইংরেজ শক্তির কার্য্যকলাপ একটু চাপা ধরণের। এইরূপ চাপা ভাব প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজশক্তির মধ্যেই হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জর্ম্মান্ সম্রাট ইহার অনুকরণে এখন পর্য্যন্তও অনুপ্রাণিত হন নাই। আত্মগোপন তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য—গোপনে বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার মত বিরুদ্ধ।

নববর্ষে জর্ম্মান দেশে "Mock Fight"এর প্রবল ধূম পড়িয়া যায়—প্রায় সপ্তাহ খানিক ব্যাপিয়া "ছল যুদ্ধ" চলিতে থাকে। জর্ম্মান্ রণসম্ভারের রণনৈপুণ্য পরিদর্শক শুধু সম্রাট একক নহেন—পরন্তু নানাদেশীয় যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিবর্গ এই রণক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সেনাপতি নিমন্ত্রিত হইয়া সম্রাট কর্ত্তৃক মহোৎসাহে অভ্যর্থিত হন এবং বার্লিন রাজপ্রাসাদে একত্র পানাহারে রাজ-সম্মান ভোগ করিয়া থাকেন। জর্ম্মান্ সম্রাটের এবম্বিধ শিশুসারল্য বৈদেশিক সেনানায়কের মন বিস্ময়ে কৌতূহলে স্তম্ভিত করিয়া দেয়!

এইবার সম্রাট চরিত্রের একটী অদ্ভুত কাহিনী বলিব, সেটী এই যে, ইনি বহুল পোষাক পরিবর্ত্তন বড়ই পছন্দ করেন! তাঁহার ১২টি সজ্জাগৃহ এবং বারটি লাইব্রেরি এই চতুর্ব্বিংশ প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে কত

হরেক রকমের পোষাক ঝুলান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কষ্টসাধ্য। পৃথিবীতে এত অধিক ফ্যাসানের পরিচ্ছদের আধিক্য কোনও রাজার ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। নূতন কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হয়, এইরূপে দিনমানেই কত পোষাক যে তিনি পরেন আর ছাড়েন তাহা বলা যায় না। ব্রাকেটের হ্যাণ্ডলের অগ্রভাগে এমন করিয়া পোষাকগুলিকে আটকাইয়া রাখা হয় যেন টান দিলেই অনতিবিলম্বে খসিয়া আসে। একমুহূর্ত্ত খুলিতে বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ! বিরক্তির বিকট ছায়া তাঁহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠে। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর করিয়াছেন—"পোষাকের মৌলিকত্ব মনের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে! তা' বুঝি জান না?"

কলাবিদ্যা সম্রাটের অতি প্রিয় বস্তু। সমুদ্র ভ্রমণে নির্গত হইলে তাঁহার অধিকাংশ সময় শোভা সন্দর্শনে কাটিয়া যায়। সমুদ্রের কোন্‌খানে কি আলোকের কিরূপ রং, কোন্‌খানে জলমগ্ন শৈলের অস্পষ্ট ছায়া, এই সব খুঁটিনাটি উপকরণ ইঙ্গিতে সংগৃহীত হইলে ছবি আঁকিতে বসিয়া যান্। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে তৎকর্ত্তৃক অঙ্কিত অনেক ছবি আছে যাহা নাকি সম্রাট নিজের জন্য একখানি পর্য্যন্ত না রাখিয়া মাতুলপুত্রকে উপহার দিয়াছিলেন। বিনিময়ে বার্লিন রাজপ্রাসাদের পাঠাগারে ইংলণ্ডের অনেক সুরম্য স্থানের ফটো সংযুক্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের অভিষেক উৎসবে গৃহীত অনেক ফটোগ্রাফই জার্ম্মান্ সম্রাটকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। মাননীয় ফোটেস্কু প্রণীত নবপ্রকাশিত "Visit to India" নামক সুলিখিত গ্রন্থে পাঠকেরা সেই সমুদয় ফটোর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

কলাবিদ্যাকে জার্ম্মানসম্রাট ক্রীড়ার সামিল করিয়া লইয়াছেন। শীকার করিতেও তিনি খুব ভালবাসেন। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ খেলা জড়তার সাহায্যকারক বলিয়া বাল্যকাল হইতেই ইহাদের ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন।

পুস্তক পাঠে তাঁর অনেক সময় কাটিয়া যায়। কেবল যে এক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন এমন নহে; পরন্তু প্রধান দেশ সমূহের সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসমূলক নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। বক্তব্য বিষয় যতই কেন জটিল হউক না, গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যটী সম্রাটের বুঝিতে বাকী থাকে না। বিগত বর্ষের প্রারম্ভেই চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থপাঠ তাঁহার একরূপ শেষ হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যখন যে কোন অভিনব পুস্তকের সৃষ্টি হয়, গভীর তত্ত্বদর্শিতার সহিত পাঠ করিয়া সম্রাট উহার সারমর্ম্ম আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠাগারে এক একটী স্বতন্ত্র পুস্তকালয় স্থাপিত আছে, ইহাদের মধ্যে কত প্রাচীনতম পুস্তক জরাজীর্ণ ভাবে সাক্ষ্য স্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে;—এই সব প্রাচীন পুস্তক কোন্ যুগের তাহাই বা কে বলিবে?—নব সংস্করণের যে সমুদয় পুস্তক পাঠাগারে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে,

তাহাদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু আক্ষেপ করিয়াছিলেন। মৃদু হাসিয়া সম্রাট নাকি বলিয়াছিলেন—"সখা আপ্‌শোষ করিও না, জানইত কীট পুস্তকের পরম শত্রু।"

প্রকৃত কর্ম্মীর স্বাস্থ্যসুখ অনেক সময় হারাইতে হয়, সুখের বিষয় জার্ম্মান্‌সম্রাট প্রকৃত কর্ম্মী হইয়াও এখন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য সুখ হারান নাই। এত কাজের চাপেও এক ঘণ্টা করিয়া বৈকালে ও প্রাতে ব্যায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অশ্বচালনায় তিনি বেশ স্ফূর্ত্তিবোধ করেন।

সংক্ষেপে জর্ম্মান্ সম্রাটের জীবন কাহিনীর অনেক কথাই বিবৃত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নাম ও যশ যেরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তিনি বর্ত্তমান যুগের পরাক্রান্ত রাজশক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইতে পারেন, এ কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। যিনি ঐহিক সুখভোগের আশায় পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, যিনি নিজেকে ক্ষমতাপন্ন ভাবিয়াও সাধারণের অভিলষিত ছাঁচে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার জীবনবাহী একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জার্ম্মানশক্তির পরিপূর্ণ জাগরণ, জাতীয় উত্থানের জন্য যাঁহার মূল্যবান জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তিনি যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে, তাঁহাদের পাশে আপন স্থান করিয়া লইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শেষের দিনে

(জালালুদ্দীন রুমী হইতে)

অন্তিম শয়নে হেরি' ক'রো নাক হাহাকার
ওগো বন্ধুগণ!
চিতাগ্নি জ্বলিতে দেখি মিছা মিছি মায়া-ভ্রমে
ক'রোনা রোদন!
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায় তাই ব'লে কে কোথায়
করে হাহাকার?
এ কলুষ রাজ্য হ'তে অস্ত গিয়ে' পুণ্যরাজ্যে
উদয় তাহার।

আমার প্রিয়ের সহ মনোরম মিলনের
হবে নাট্যলীলা
অনধিকারীর লাগি' বিরচিবে যবনিকা
সমাধির শিলা!
যখন প্রিয়ের গৃহে বিজয় মঙ্গল গান
হইবে আমার,
সে কেমন হ'বে বন্ধু, তখন তোমরা যদি
ক'রো হাহাকার?

শ্রীকালিদাস রায়।

আদিম জাতির সংখ্যাগণনা।*

মানব মাত্রেই কিছু না কিছু গণনাশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। মানব সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত সুসভ্য জাতিদিগের গণনাশক্তি যেরূপ বিকশিত এবং গণনাকার্য্য যেরূপ বিস্তৃত অসভ্য বা আদিম জাতি দিগের সেরূপ নহে। এই শেষোক্ত জাতি দিগের গণনাশক্তি অনুশীলনার অভাবে একরূপ সুপ্তাবস্থায় অবস্থিত এবং তাহাদিগের গণনাও মাত্র দুইএকটি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। এই সকল অসভ্যজাতি যখন পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে সভ্যতার উচ্চতর স্তরে অধিরোহণ করিতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিস্তৃত গণনার প্রয়োজন বোধ করে তখন তাহাদের সুপ্ত গণনা-শক্তি প্রবুদ্ধ ও বিকশিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ আমেরিকার চিকিটা (Chiquita) জাতির শব্দকোষে সংখ্যাদ্যোতক কোন শব্দ আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'এক' এই সংখ্যা ব্যক্ত করিতে যে কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে অভিধানে তাহার অর্থ 'একাকী'। ইহাদের গণনাশক্তি লুপ্তপ্রায় প্রতীয়মান হইলেও ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হওয়া যায় না। এরূপ জাতিও বিরল নহে যাহারা মাত্র '২' পর্য্যন্ত গণিতে পারে। পৃথিবীর অনেক আদিমজাতির গণনার ঊর্দ্ধসংখ্যা মাত্র ১০।

সংখ্যা প্রকাশের উপায়—ভাবপ্রকাশক শব্দের নাম ভাষা। এই ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বে নানারূপ সাঙ্কেতিক উপায়ে ভাব ব্যক্ত হইত। আজও আমরা অনেক সময় নয়নে নয়নে বার্ত্তাবিনিময় করিয়া থাকি। অনেকেই সময় বিশেষে "মরম-কথা নয়ন কোণে" কহিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই শিশু অঙ্গুলির সাহায্যে প্রথমে গণনা করিতে শিক্ষা করে। সেইরূপ জাতির শৈশবাবস্থাতেও আদিম জাতিরা অঙ্গুলি সঙ্কেতে গণনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আজও এস্কিমোজাতি, দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপ-পুঞ্জবাসীরা হস্তের দশ অঙ্গুলির সাহায্যে গণনা করিয়া থাকে। এই অঙ্গুলিসঙ্কেতে গণনা পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এমন কি, ১০,০০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত অঙ্গুলিগুলির নানাপ্রকার সন্নিবেশে ব্যক্ত হইত। শুনিতে পাই চীনবাসীদিগের মধ্যে কিঞ্চিন্ন্যূন একলক্ষ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনার জন্য একপ্রকার অঙ্গুলিসঙ্কেতরীতি প্রচলিত আছে, এই সাঙ্কেতিক গণনার এতই প্রচলন যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে আড়তদারেরা অন্যের অজ্ঞাতে কোন দ্রব্যের দর ব্যক্ত করিতে হইলে কাপড়ের মধ্যে হস্ত স্থাপন করিয়া পরস্পরের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া থাকে। এই অঙ্গুলি সাহায্যে গণনা মানবের এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে সুসভ্য জাতিরাও এখনও অনেক সময় অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনাসাধন করিয়া থাকে।

হিসাব রক্ষার উপায়। এই আদিম-

* Dr. Levi L. Conant রচিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

জাতিরা হিসাব রক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, কখন বা উপলখণ্ডের সাহায্যে, কখন বা কড়ির সহায়ে, কখন বা মুষ্টির দ্বারা, কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে হিসাব রাখিয়া থাকে। আজও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে আমাদের দেশে নানা উপায় প্রচলিত আছে। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যে গোপরমণীগণ গৃহস্থকে দৈনিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া গৃহস্থের বাটীর দেওয়ালে প্রত্যহ একটি করিয়া গোবরের টিপ দিয়া রাখে। মাসান্তে এই গোবরের টিপের সাহায্যে হিসাব বুঝিয়া লয়। আজও অনেক স্থানে দেখা যায় যে তৈলকার প্রত্যহ তৈল "রোজান" দিয়া একটি কাটিতে দাগ কাটিয়া রাখে।

গণনার ঊর্দ্ধসীমা। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের সুবিশাল ক্ষেত্রে হলচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের হলাগ্রভাগে উত্থিত নূতন নূতন তথ্য হইতে যে সকল অসভ্য ও আদিম জাতির সংখ্যা গণনার ঊর্দ্ধসীমা জানিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা নির্দ্দর্শনে অনেক জাতিই ১০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। কিন্তু এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা ২, ৩, বা ৪ সংখ্যার অধিক গণনা করিতে পারে না। বোটোকুডো জাতির 'এক' এর বেশী আর সংখ্যা নাই। '২' প্রকাশ করিতে তাহারা 'উরাহু' বলিয়া থাকে—যাহার অর্থ 'অনেক'। পুরি এবং ওয়াচান্দা জাতির '২' পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে। পুরি জাতি 'পৃকা' (অনেক) এই কথার দ্বারা এবং ওয়াচান্দিজাতি ২, ১ দ্বারা '৩' সংখ্যা ব্যক্ত করে। (১) আন্দামন-বাসীদিগের মাত্র দুইটী সংখ্যাবাচক শব্দ আছে কিন্তু তাহারা অঙ্গুলি সাহায্যে ১০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। 'সকল' অর্থবোধক শব্দ দ্বারা তাহারা '১০' সংখ্যা ব্যক্ত করিয়া থাকে। বুশম্যানদিগেরও গণনার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। ইহারা '২' এর বেশী কোন সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে 'অনেক' অর্থ-বোধক শব্দ ব্যবহার করে।

সিংহলের ভেদ্দাগণ (Veddas) এইরূপে গণনা করিয়া থাকে যথা :—একামাই—১, দেক্কামাই—২ এবং তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা ব্যক্ত করিতে হইলে 'ওতামিকাই'—অর্থাৎ 'আর এক বেশী' এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া থাকে। (২)

পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিগুলির গণনার ঊর্দ্ধ-সীমা ২। আবার অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা মাত্র তিন পর্য্যন্ত গণিতে পারে। নব হল্যাণ্ডবাসীদিগের তিনের অধিক সংখ্যা নাই। (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার দামারা জাতি মাত্র তিন পর্য্যন্ত গণিতে পারে। গল্টন সাহেব এইরূপ একজন দামারার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। একজন দামারা দুইটি মেষ বিক্রয় করে, প্রত্যেকটির মূল্য ২ গোছা তামাক। ২টী মেষের মূল্যস্বরূপ তাহাকে

(১) Tylor : Primitive Culture.
(২) Dechamp's L' Anthropologie, 1891.
(৩) Tylor : Primitive Culture.

৪ গোছা তামাক দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এই হিসাবটুকু প্রবেশ করে না। তৎপরে একটি মেষ লইয়া তাহার মূল্যস্বরূপ ২ গোছা তামাক দিয়া পুনরায় আর একটি মেষ লইয়া তাহার মূল্যস্বরূপ ২ গোছা তামাক দেওয়া হয়। এই প্রকারে সে তখন হিসাব বুঝিতে পারে। (৪) ব্রেজিলের কয়েকটী আরণ্যক জাতি তিনের কোন ঊর্দ্ধসংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে 'অনেক' অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করে। হার্ব্বার্ট নদবাসী অষ্ট্রেলিয়েরাও ঐরূপ করিয়া থাকে। ফিউগান জাতিদিগের গণনা মাত্র তিনটি বাক্যে পর্য্যবসিত, যথা—কাওনক্লি—১, কম্‌পাইপি—২; মাতেন—৩। পেরুর কাম্পাস্ জাতি এইরূপে গণনা করিয়া থাকে, যথা:—পেত্রিয়ো—১, পিত্তেম—২, মাহুইমি—৩; এতদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা ব্যক্ত করিতে হইলে তাহারা ১, ৩; ১, ১, ৩ এইরূপ ভাবে এবং মোট সংখ্যা অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে দশের বেশী কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা তাহাদের ধারণাতীত, এবং দশকে 'অনেক' অর্থবোধক বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করে। (৫) 'বিরাদরোই'র অষ্ট্রেলিয়ান জাতির তিনের বেশী সংখ্যা-দ্যোতক কোন শব্দ নাই। '৪' এই জাতির নিকট 'অনেক' এবং ৫ 'খুব বেশী'। দিপ্পিল, কামিলরোই, আদিলেদ, তারাবুল, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া তাসমানিয়া ইত্যাদি জাতিগুলিও প্রায় ঐরূপ। ইহার মধ্যে অনেকে '৪' এই সংখ্যা '২-২' বা '২ জোড়া' এবং ৫ '২-৩' কিম্বা '২-২-১' এই ভাবে প্রকাশ করে। Encounter Bay জাতি '৬' সংখ্যা 'কুকো কুরো – কুকো' অর্থাৎ '২-২-২' এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করে। Amazonবাসী ইয়কো জাতি তিন সংখ্যা ব্যক্ত করিতে এক বিকট দংষ্ট্রাভেদী শব্দ উচ্চারণ করে, যথা "পোয়েত্-তার্‌রারোরিনকোয়ারোয়াক"; এই সম্বন্ধে La Condemaine যথার্থই বলিয়াছেন "Happily for those who have dealings with them, their arithmetic goes no further." (৬)

এইরূপে দেখা যায় যে, যে সকল অসভ্য জাতি মানব সম্প্রদায়ের সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত তাহাদের সংখ্যাদ্যোতক শব্দ একটি বা দুইটি আছে; তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা তাহাদের নিকট 'অনেক'। এই সকল জাতি অপেক্ষা যাহারা একটু উন্নত হইয়াছে তাহাদের শব্দকোষে মাত্র তিনটি সংখ্যাবাচক শব্দ পাওয়া যায়। যাহারা সভ্যতার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছে তাহারা প্রায় পাঁচ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল জাতি সংখ্যাগণনায় '৩' এর সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহারা হস্তের অঙ্গুলির সংখ্যানির্দ্দর্শনে পাঁচ পর্য্যন্ত গণনা করিতে সক্ষম হয়। তবে এরূপ কতিপয় জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের গণনার ঊর্দ্ধসীমা '৪' (৫ পর্য্যন্ত পৌছায় নাই)। দক্ষিণ আমেরিকার টুপিদিগের ৪টি সংখ্যাবাচক

(৪) Wallace: Darwinism.
(৫) Wiener: Perou et Bolivie.
(৬) Voyage de la Riviere des Amazons.

শব্দ আছে যথা;—ওয়িপি—১, মোকোই—২, মোসাপিরা—৩, এবং এরান্দি ৪। (৭) ম্যাকারে হ্রদবাসী অষ্ট্রেলিয় জাতির 'ওরান'এর বেশী সংখ্যা নাই (ওরান—৪); তবে তাহাদের মধ্যে একটি বাক্য ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ "বহুৎ বহুৎ" অর্থাৎ অসংখ্য। সেই বাক্যটি "কাঁঙোল—কাঁঙোল" এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তাস্‌মানিয়াবাসীদিগের '৪'এর অধিক কোন সংখ্যা নাই, তবে '৫' এর জন্য একটা যৌগিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা:—"পাগান—আ—মারা"—৪+১।

কতিপয় অসভ্যজাতি হস্তের অঙ্গুলি সাহায্যে ১০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। জুলুগণ দশ পর্য্যন্ত গণিতে সমর্থ। উত্তর পশ্চিম আমেরিকাবাসী আহ্‌টজাতি এবং দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি জাতি ঐ দশ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। ঈষদুন্নত কতিপয় জাতি, যথা এস্কুইমাক্সজাতি, হস্তপদাদির অঙ্গুলি সাহায্যে বিংশতি পর্য্যন্ত গণনা করিতে সক্ষম। (৮)

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ অসভ্য জাতিদিগের গণনার তিনটি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যথা:—৫, ১০, ১০০। কোন অসভ্য সহজেই এক হস্তের অঙ্গুলির নিদর্শনে ৫ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। যাহাদিগের বুদ্ধি একটু বিকশিত হইয়াছে এবং যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে একটু বিস্তৃত গণনার আবশ্যক বোধ করে, তাহারা দুই হস্তের অঙ্গুলি সাহায্যে দশ গণিয়া থাকে। যে সকল জাতি হস্ত পদাদির অঙ্গুলির সংখ্যা নিদর্শনে ২০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে তাহারা প্রায়ই ১০০ পর্য্যন্ত গণিতে সমর্থ হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অসভ্যতারও একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কোন জাতি অসভ্যাবস্থায় কখনও এক সহস্রের অধিক সংখ্যা গণনা করিতে সক্ষম হয় না।

আধুনিক সুসভ্যজাতিদিগের গণনারীতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের অসভ্যাবস্থায় তাহারা এক সহস্রের অধিক সংখ্যা গণিতে পারিত না। ইংরাজি গণনা পদ্ধতির million, billion, trillion, ইত্যাদি শব্দগুলি বিশুদ্ধ Saxon নহে। ভাষান্তর হইতে গৃহীত হইয়াছে। Thousand —শব্দটী, One, Two, Thaee, Ten, hundredএর ন্যায় বিশুদ্ধ Saxon। জর্ম্মান, স্কান্দিনেভিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য। কিন্তু চীন, সংস্কৃত, আজটেক্ ভাষার সমস্ত সংখ্যাদ্যোতক শব্দগুলি নিজস্ব। পূর্ব্বে লাটিনদিগের ঊর্দ্ধসংখ্যা mille (১,০০০) এবং গ্রীকদিগের ১০,০০০ ছিল। অধুনা মলয়বাসীদিগের সংখ্যাগণনার ঊর্দ্ধসীমা 'রিবু' অর্থাৎ ১,০০০ পর্য্যন্ত। ল্যাপল্যাণ্ড-বাসীদিগের গণনায় সর্ব্বোর্দ্ধসংখ্যা "ঝিওয়েট্" এবং আর্স্‌জাতির 'সিয়াদ' অর্থাৎ একশত। আবিসিনিয়েরা, উত্তর আফ্রিকার কতিপয় জাতি ১,০০০ পর্য্যন্ত গণনা করিতে পারে। সাধারণতঃ জাতির আদিমাবস্থায় গণনাশক্তি লুপ্তকল্প হইলেও বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত এবং নানা সভ্যজাতির সংস্পর্শ হেতু অবস্থার পরিবর্ত্তনে গণনাশক্তি প্রবুদ্ধ হইতে থাকে এবং বিস্তৃত গণনার প্রয়োজনে শব্দকোষও নানা সংখ্যাদ্যোতক শব্দ দ্বারা সম্পদশালী হইয়া উঠে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ।

(৭) Muller. (৮) Lubbock: Origin of Civilisation and Wallace: Darwinism.

মেরুতে আর্য্যদিগের আদিনিবাস

বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে কেবল উত্তরকুরুতেই আর্য্যদিগের আদিনিবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নহে—কিন্তু মেরুতেও আদিনিবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের জন্মভূমি যে কিরূপে ভূ-স্বর্গে পরিণত হয় ইংরেজ কবি মণ্টগোমরীর (Mont Gomery) "Home" (গৃহ) নামক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি হইতেই তাহা উপলব্ধি হইবে,—

'There is a land of every land the pride,
Beloved by Heaven o'er all the world beside,
Where brighter suns dispense serener light,
And milder moons emparadise the night
A land of beauty, virtue, valour, and truth,
Time-tutored age and love-exalted youth.'

'সর্ব্বদেশের গৌরব, অপর সমগ্র পৃথিবীর অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয় এরূপ একটী স্থান আছে, যেখানে উজ্জ্বলতর সূর্য্য স্নিগ্ধতর আলো বিকিরণ করে—সৌম্যতর চন্দ্র রাত্রিতে স্বর্গের শোভা সৃষ্টি করে। এই স্থান সৌন্দর্য্য, পুণ্য শক্তি ও সত্যের আকর। এখানে বার্দ্ধক্য অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত, যৌবন প্রীতির দ্বারা সমুন্নত।'

অপর একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন :—

'A charm from the skies seems to hallow all there.

John Howard Payne,

'আকাশ হইতে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব তথাকার সমস্তই পুণ্যময় করিয়া থাকে।'

আমরা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গমন করিলে আমাদের স্বদেশের প্রিয় স্মৃতি জাগরিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্বর্গের ভাবকে যে আরও বাড়াইয়া তোলে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় এই ভাবের অভিব্যক্তি হইতেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যগণ তাঁহাদের আদিনিবাস মেরুপ্রদেশ হইতে যখন চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন দেশের সন্ধানে বহির্গত হইলেন; তখন তাঁহারা যতই জন্মভূমি হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই ইহার স্মৃতি তাঁহাদের মনকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর রূপে অধিকার করিতে লাগিল।

তাঁহাদের জন্মভূমির প্রিয় ও পবিত্র স্মৃতি এইরূপে চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্মভূমিকে প্রথমতঃ পৃথিবীতে আদর্শ সুখের স্থান ও অপার দিব্য সুখের স্থানরূপে কল্পনা করিয়া লইল। অভিধানে মেরু শব্দের যে পর্য্যায় শব্দ পাওয়া যায় তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত সত্যের উদ্ধার হইতে পারে। অমরকোষে মেরু শব্দের পর্য্যায় শব্দসকলের এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়—

'মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রীরত্নসানুঃ সুরালয়ঃ।'

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে মেরু যেমন 'সুমেরু' বা 'হিমাদ্রি' নামে অভিহিত হইয়াছে, তেমনিই 'সুরালয়' নামেও অভিহিত হইয়াছে। 'সুরালয়' ও 'দেবালয়' বা স্বর্গকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মেরু বা মেরুস্থিত সুমেরু পর্ব্বতই 'সুরালয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে সুমেরু শব্দের জটাধর ধৃত যে পর্য্যায় শব্দ সকল প্রদত্ত

হইয়াছে, তাহাতে আমরা 'অমরাদ্রি' 'ভূস্বর্গ' এই দুইটী শব্দ প্রাপ্ত হই। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে সুমেরু প্রথমতঃ ভূস্বর্গ রূপে কল্পিত হইয়াই পরে 'অমরাদ্রি' ও 'সুরালয়' রূপে কল্পিত হইয়াছে।

মেরু আমাদের নিকট মরু শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। মরু শব্দ আমরা অমর কোষে পর্ব্বত ও নির্জ্জন দেশ উভয়েরই বাচক দেখিতে পাই। যথা,—

'মরু ধন্ব ধরা ধরের্ত্রী।'

'মেরু'ও * আমরা অভিধানে পর্ব্বতার্থকই দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের বোধ হয় মেরু প্রদেশের তুষারময় পার্ব্বত্যদেশ, উদ্ভিজ্জাদির অভাব বশতঃ প্রথমতঃ মরু নামেই অভিহিত হইত। পরে মধ্যআসিয়া অতিক্রম করিয়া আর্য্যগণ বালুকাময় প্রকৃত মরুদেশে উপস্থিত হইলেই তাহার সহিত তুলনায় পূর্ব্ব মরুদেশের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনার্থ সেই তুষারময় আদিস্থানকে তাঁহারা 'মেরু' 'সুমেরু' নামের দ্বারা বিশেষিত করেন।

মেরুর সহিত আর্য্যদিগের সংযোগের নিদর্শন আমরা মানবের আদি পিতা মনুর নামেও প্রাপ্ত হই। পুরাণে আমরা এক মনুর নাম 'মেরুসাবর্ণ' দেখিতে পাই। যথা—

'ততঃস্তু মেরুসাবর্ণো ব্রহ্মসূনুর্মনুঃস্মৃতঃ।
ঋতুশ্চ ঋতুধামা বিশ্বক্ সেনোমনুস্তথা।
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মাৎস্যে ৯ম অধ্যায়ঃ।

বেদেও আমরা মনুকে 'সাবর্ণ্য' ও 'সাবর্ণি' বিশেষণে আখ্যাত দেখি। যথা—

'প্রনূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্ষেব রোহতু
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যোদানায় মংহতে ॥ ৮
নতমশ্নোতি কশ্চন্ দিবইব আস্বারভম্
সাবর্ণ্যস্য দক্ষিণা বি সিন্ধুরিব পপ্রথে ॥ ৯.
'সাবর্ণের্দেবাঃ প্রতিরংস্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রান্তা অসনাম বাজম্ ॥১১
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৬২ সূক্ত।

'এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জল সংযুক্ত আর্দ্র বৃক্ষবীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্র গাভী এখনই দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহার তুল্য কার্য্য করিতে কাহার(ও) সাধ্য নাই। সাবর্ণ মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ু বৃদ্ধি করুন। তাঁহার নিকটে আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।'

রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ।

বেদের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে মেরুসাবর্ণ ও মনুসাবর্ণ্য যে অভিন্ন তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মনু মেরুরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'মেরুসাবর্ণ' নামে সেই স্মৃতি রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। মনু সর্ব্ববর্ণের আদি পিতা বলিয়াই তাঁহার নাম সাবর্ণি হইয়াছে ইহাই আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত —

"For some reason or other Manu the Mythic ancester of the race of man was called Savarni meaning possibly the Manu of all colours i.e. of all tribes and castes."

——Science of Language (1882) Vol II. page 357,

'যে কোন কারণেই হউক মানবের পৌরাণিক আদি পূর্ব্বপুরুষ মনু 'সাবর্ণি' বলিয়া কথিত হইয়াছিল। ইহার অর্থ যে মনু, সর্ব্ব বর্ণের অর্থাৎ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ।

* শব্দকল্প দ্রুম দ্রষ্টব্য।

যিনি মানবের আদি পিতা তিনি যে মানবের আদিবাসরূপ মেরুবাসী হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। তাহা হইতেই তদীয় আদি পিতৃত্বের নিদর্শন-রূপ 'সাবর্ণ' নাম তদীয় আদিবাসের নিদর্শন-রূপ মেরু নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার মেরুসাবর্ণ নামে উভয়েরই স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের নিত্য নারায়ণ পূজায় আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের মেরু বাসের অতীব কৌতুকাবহ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণ পূজার আসন শুদ্ধির বিনিয়োগ মন্ত্রেই সেই নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বিনিয়োগ মন্ত্রটী এই—"মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনি-য়োগঃ।" এস্থলে 'মেরুপৃষ্ঠ' প্রকৃত ঋষি হউক বা না হউক আসনে মেরুতলের আরোপ করিয়া আদি নিবাসভূত মেরুদেশের পবিত্রতা আসনে সংক্রামিত করাই যে 'মেরুপৃষ্ঠ ঋষি' কল্পনার মূল তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

আর্য্যদিগের আদিনিবাসরূপে মেরু তাঁহাদিগের নিকট এরূপই পবিত্রতার আধার হইয়াছে যে জপমালার অগ্রমালায় ও অঙ্গুলি পর্ব্বেও তাঁহারা মেরু কল্পনা করিয়াছেন,—

'মালামেকৈকমাদায় সূত্রে সম্পাতয়েৎ সুধীঃ।
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতোন্যসেৎ॥'
—ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত উৎপত্তিতন্ত্র ৬০ পটলঃ।

'তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমাচৈক পর্ব্বিকা
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ॥'
—ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসারঃ।

পাশ্চাত্য ভাষায় মেরুবোধক যে শব্দ পাওয়া যায় তাহাতেও আমরা আর্য্যদিগের আদি মেরুনিবাসেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্য ভাষায় মেরুকে Arctic region বলে। এই আর্টিক (Arctic) শব্দ গ্রীক্ Arktos শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। গ্রীক্ ভাষায় এই আর্কটস্ (Arktos) শব্দের অর্থ ভল্লুক। Arktos শব্দের অর্থ ভল্লুক হইলেও তাহা কিন্তু সপ্তর্ষি নক্ষত্র মণ্ডলকেই বুঝাইত। তাহা হইতেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাধারণ নাম ইংরাজীতে Great Bear হইয়াছে। এই Arktos বা সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজিত বলিয়াই মেরুর পাশ্চাত্য নাম Arctic হইয়াছে। এই Arctic নামে নক্ষত্রের সহিত ভল্লুকের যোগ একটী অতীব জটিল সমস্যা বলিয়াই প্রতীয়মান্ হয়। পাশ্চাত্য ভাষাসকলের দ্বারা ইহার কোন সমাধানই হয় না কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ইহার আশ্চর্য্য সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতে ভল্লুকবাচী যে 'ঋক্ষ' শব্দ পাওয়া যায়—গ্রীক্ Arktos শব্দটীকে ঠিক্ ইহারই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতে এই ঋক্ষ শব্দটীকে নক্ষত্রবাচীও দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঋক্ষ' শব্দের এই নক্ষত্র অর্থ নূতন অর্থ নহে ইহা বৈদিক কালের পুরাতন অর্থ। বেদে উক্ত অর্থে আমরা ইহার স্পষ্ট প্রয়োগই দেখিতে পাই। যথা,—

অমীষ ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহুচিদ্দিবেয়ুঃ।
ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল ২৪ সূক্ত।

'ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রি যোগে দৃষ্ট হয় দিবা যোগে কোথায় চলিয়া যায়?' রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এস্থলে ঋক্ শব্দের টীকার সায়ণ 'ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ।' 'যদ্বা ঋক্ষাঃ সর্ব্বেঽপি নক্ষত্র বিশেষাঃ।' এইরূপ লিখিয়া সপ্তর্ষি ও নক্ষত্র সাধারণ উভয়ার্থে ঋক্ষ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। এইখানেই আমরা পাশ্চাত্য ভাষার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেছি। গ্রীক্‌গণ তাঁহাদের আর্য্য ভ্রাতৃগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবার সময় 'ঋক্ষ' শব্দটী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহার নক্ষত্র অর্থটী বিস্মৃত হইয়া কেবল ভল্লুক অর্থটী স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তাহাতেই নক্ষত্রকে তাঁহারা ভল্লুক নামে আখ্যাত করিয়া বিষম গোলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

রমেশ বাবু এতৎ সম্বন্ধে যে মন্তব্য তদীয় অনুবাদে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি—

সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ (ভল্লুক) এবং ইউরোপীয় ভাষায় Great Bear বলে কেন? ইহার একটী অতি রহস্যজনক কারণ আছে। ঋচ্ বা অর্চ্চ উজ্জ্বল হওয়া বা অর্চ্চনা করা। উজ্জ্বল হওয়া অর্থে এই ধাতু হইতে উজ্জ্বল লোমধারী ভল্লুকের নাম ঋক্ষ হয় এবং উজ্জ্বল সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নামও ঋক্ষ হয়। কালক্রমে লোকে ঋক্ষ শব্দের নক্ষত্র অর্থটী ভুলিয়া গেল এবং যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ কহিত তাহার অর্থ ভল্লুক নক্ষত্র করিল। এইরূপে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নাম ভল্লুক নক্ষত্র; সুতরাং ইউরোপে Great Bear নাম হইল।

Riksha in the sense of hight has become the name of the bear so called either his bright eyes or from his brilliant tawny fur.....from The same name in the sense of the bright ones, has been applied by the Vedic poets to the stars in general, and more particularly to that constellatian which in northern parts of India was the most prominent..... .....And thus it happened that when the Greeks had left their central home and settled in Europe, they retained the name of Arktos for the same unchanging stars.....Thus the name of the Arctic regions rests on a misunder-standing of a name framed thousands of years ago in Central Asia, and the surprise with which many a thoughtfull observer has looked at these seven bright stars, wandering why they were ever called the Bear, is removed by a referance to the early annals of human speech,

Maxmuller's Science of Languago (1882) Vol II page 395 to 399,

রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ।—২৫ পৃষ্ঠা

নিম্নে আমরা মোক্ষমূলরের মন্তব্যের অনুবাদ প্রদান করিতেছি;—

'উজ্জ্বল অর্থে ঋক্ষ, ভল্লুকের নাম হইয়াছে। চক্ষুর উজ্জ্বল্য বা লোমের উজ্জ্বল কপিল বর্ণ হইতেই ভল্লুক এই নামে কথিত হইত। এই নামই বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক উজ্জ্বল অর্থে সাধারণ ভাবে নক্ষত্রের প্রতি এবং যে নক্ষত্রমণ্ডল ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ সকলে সবিশেষ লক্ষিত হয় সেই নক্ষত্রমণ্ডলের প্রতি বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রীক্‌গণ মধ্য আসিয়ার অধিবাস পরিত্যাগ করতঃ ইউরোপে উপনিবিষ্ট হইলে তাঁহারা এই স্থির নক্ষত্ররাশির আর্কটস্ নামটী যে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা এই প্রকারেই সম্ঘটিত হইয়াছে। এই প্রকারেই Arctic Region (সুমেরু) নাম মধ্য আসিয়াতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নাম গঠিত হইয়াছিল তাহারই ভ্রমাত্মক অর্থ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। বহু চিন্তাশীল পর্য্যবেক্ষক যে আশ্চর্য্য ভাবের সহিত এই সপ্তর্ষি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ ইহারা কেন কখনও ভল্লুক নামে অভিহিত হইত ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন সেই আশ্চর্য্য ভাব মনুষ্য ভাষার আদি ইতিহাসের নির্দ্দেশের দ্বারাই দূরীভূত হইয়াছে।"

এস্থলে যে সাদৃশ্যমূলে নক্ষত্রের 'ঋক্ষ' নাম ভল্লুকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আচার্য্য মোক্ষমূলর মন্তব্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ চক্ষুর সাদৃশ্যের জন্য সমগ্র দেহ নক্ষত্রের সহিত

তুলিত হইবে ইহা তেমন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি আমরা সমস্ত চক্ষুটীও নক্ষত্রের সহিত তুলিত দেখিতে পাই না, কেবল ইহার জ্যোতিষ্মান্ গোলাকার অংশ-টীকেই নক্ষত্রের সহিত তুলিত দেখি। 'চক্ষু-তারকা' কথাতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ভল্লুকের কপিল বর্ণের উজ্জ্বল লোমের সহিতও নক্ষত্রের ঔজ্জ্বলের সাদৃশ্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না কারণ নক্ষত্রের উজ্জ্বল্য শ্বেতবর্ণ আর ভল্লুকের লোমের বর্ণ কটা। তাহা হইলে এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে ভল্লুকের সহিত আর কোন্ প্রকারে নক্ষত্রের সাদৃশ্য হইতে পারে? আমরা অনুমান করি, যে ভল্লুকের সহিত নক্ষত্রের সাদৃশ্য পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা আমাদের সাধারণ কটা রঙের ভল্লুক নহে পরন্তু তাহা শীতপ্রধান মেরুমণ্ডলের শ্বেতভল্লুক। তাহাদের উজ্জ্বল শ্বেত লোমের সহিত নক্ষত্রের উজ্জ্বল শ্বেতরশ্মির তুলনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। আচার্য্য মোক্ষমূলর মধ্য আসিয়াতে ঋক্ষ নামটী প্রথম গঠিত হইয়াছিল বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভল্লুক মধ্য-আসিয়ার স্বভাবজাত পশু বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বর্ত্তমান ভৌগোলিক গ্রন্থেও মধ্য আসিয়ার স্বভাবজাত পশুর মধ্যে আমরা ভল্লুকের নাম দেখিতে পাই না। তাহাতে আমরা রোম-হনকারী জন্তু যেমন উষ্ট্র, বৃষ, হরিণ, ছাগ, মেষ, চমরী গাই প্রভৃতিরই উল্লেখ দেখিতে পাই।* মধ্য আসিয়ার সুবিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের উপযোগী তৃণভোজী জন্তুর বাসই তথায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে উত্তর আসিয়ার জন্তুদিগের যে নাম আমরা ভূগোলে দেখিতে পাই, তন্মধ্যে ভল্লুকের নাম আমরা প্রথমেই উল্লিখিত দেখি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শীত-প্রধানদেশের বাসোপযোগী অপর কোন জন্তুর উল্লেখ দেখিতে পাই যথাঃ—

In the Northern Region the forest furnish shelter for numerous wild animals, which are hunted for the sake of their furs. Bears, foxes, sables and martens are among the most commons. The rein-deer ls almost the sole-support of the inhabitants of the Far North,

Longman's, The World with fuller treatment of India page 62.

লোমের জন্য যে সকল জন্তুকে শীকার করা হয় উত্তরভাগের অরণ্যসকল তৎসমস্তকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে। ভল্লুক, ছাগল ও নকুল জাতীয় জন্তু সকলই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বল্গাহরিণকেই সুদূর উত্তর প্রদেশাধিবাসীদিগের একমাত্র অবলম্বন বলা যায়।

ইহা হইতে আর্য্যদিগের সুমেরুতে বাস কালেই যে ভল্লুকের ঋক্ষ নামটী গঠিত হওয়া সম্ভব কিন্তু মধ্য আসিয়াতে বাসকালে গঠিত হওয়া সম্ভব নহে তাহাই আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি।

এই প্রকারে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকারের পুরাতত্ত্বের দ্বারাই আর্য্যদিগের আদিনিবাস যে 'মেরু' বা 'সুমেরু'তে ছিল তাহা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* On the plateaux of the interior, ruminating animals such as the camal, ox, dear goat sheep etc are chiefly found ; the yak is used as a beast of burden,

Longman's The world with fuller treatment of India.



সন্ধ্যা প্রদীপ

বেলা চলি যায় পাংশুবরণ মুখে
সন্ধ্যা আসিল অবগুণ্ঠন টানি,
আবাহনী গীত বাজিল করুণ শাঁখে
কুবলধূ ঘরে প্রদীপ জ্বালিল আনি'।

লীলা।

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ভারতে অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি

দক্ষিণ ভারতে অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে অনেক প্রকার অদ্ভুত বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সকল শ্রেণীর মধ্যেই 'তলু' 'বট্টু' (এক প্রকার হাঁসুলি বা গলার হার) জিনিষটি বিবাহ কর্ম্মের অপরিহার্য্য উপাদান বলিয়া গণ্য। অনেক ইয়ুরোপবাসী হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে তাঁহাদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও নববিবাহিত যুগলের পশ্চাতে চাউল ছড়াইবার রীতি প্রচলিত। কুরুম্বা (kurumba) বা রাখাল জাতির মধ্যে বিবাহ কালে কন্যা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রাখে। চাষারা যেরূপ শারীরিক সুচিহ্ন দেখিয়া পশু ক্রয় করে ইহারাও সেইরূপ কন্যার অঙ্গের কোন সৌভাগ্য চিহ্ন দেখিলে তাহাকে পত্নীরূপে মনোনীত করে। যানদীস্ (yanadis) নামে নেলোরের এক বন্য জাতির মধ্যে পুরুষ বা নারী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পায় না। বর ক'নের ডান পা'র উপর তাহার ডান পা রাখিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করে এবং ক'নের কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দেয়। তাহারা দুইজনে পরস্পরের মাথার উপর চাউল নিক্ষেপ করে। ইহার পর দেবতার পূজা সমাপ্ত হইলেই বিবাহ কর্ম্ম সমাধা হইল।

'কোরাবার নামে আর এক অর্দ্ধসভ্য চোর জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত। কাহারও পত্নী ইচ্ছামাত্রেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে কোন নিন্দা নাই। বর কন্যার পিতার নিকট এক ভাঁড় 'তাড়ি' উপঢৌকন দিতে পারিলেই কন্যার পাণিগ্রহণ সিদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহ বন্ধন ইহাদের মধ্যে বড়ই শিথিল।

'সাগালি' নামে আর এক জাতি আছে তাহারা পাখী ধরিয়া খায়। ইহাদের মধ্যে বর তাহার ভাবী শ্বশুরকে দুই একটি গো মেষ ও কিছু টাকা দিতে পারিলেই তাঁহার কন্যার কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দিতে পারে অর্থাৎ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে। বিবাহের পর তৃতীয় দিনে ক'নে তাহার স্বামীর বাটীতে গমন করে। যাইবার সময়ে সম্মুখে একটি ষাঁড় রাখিয়া চলে।

যোগী নামে আর এক বন্যজাতি বিবাহ কালে ১২টি খুঁটি পুঁতিয়া একটি খোঁয়াড় প্রস্তুত করে। বর কনে উভয় পক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে একটি করিয়া মেষ ও মাটির ভাঁড় উপহার দেয়। যে এরূপ উপহার দিতে অক্ষম হয় তাহার হাতের চেটোয় তিন ঘা করিয়া বেত্রাঘাত করা হয়। পরে তাহার কিছু অর্থ দণ্ড করিয়া তাহার মাথার উপর ময়লা জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কনের কণ্ঠে 'বট্টু' বাঁধিবার পূর্ব্বে বর একটী বিড়ালীর কণ্ঠে বট্টু বাঁধিয়া দেয়। এরূপ করার যে উদ্দেশ্য কি তাহা তাহারা নিজেই জানে না। তামিল চামারেরা 'অভরম্' গাছকে বিশেষ ভক্তি করে। এই গাছের ছালে তাহারা চামড়া পরিষ্কার করে। ইহারা

প্রথমে 'অভরম্' গাছের ডালে একটি 'বট্' বাঁধিয়া পরে কনের কণ্ঠে 'বট্' পরাইয়া দেয়। 'পলয়ক্করণ' নামে এক প্রকার ব্যাধ জাতি জম্বু বৃক্ষকে বিশেষ ভক্তি করে। বিবাহের প্রথম দিনে ইহারা একটি জম্বু শাখাকে ধূপ ধুনা, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা পূজা করে। অবশেষে এই বৃক্ষজড়িত লতা লইয়া বর বিবাহ মঞ্চের প্রত্যেক খুঁটিতে তাহা জড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালে বিবাহিত যুগল গ্রামের বাহিরে কোন পিঁপড়ার ঢিবির নিকট যাত্রা করে। তাহার উপর দুধ ও ঘি ঢালিয়া ঝুড়ি করিয়া সেই কাদা গৃহে লইয়া আসে। বর সেই কাদায় ১২টি প্রদীপ গড়িয়া ১২টি স্তম্ভের উপর জ্বালিয়া দেয়। তৃতীয় দিনে বর তাহার আত্মীয়গণের সহিত গ্রামের বাহিরে এক মাঠে গিয়া কতকটা ভূমি লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া সেইস্থানে শস্যের বীজ বপন করে। 'কাম্মাভারো' নামে এক প্রকার তেলেগু কৃষকজাতি পুরাকালে শত্রুগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া 'ঢল' বনের ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহারা সেই জন্য এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ কালে সামিয়ানার উত্তর দিকের খুঁটিতে 'ঢল' গাছের পাতা বাঁধিয়া রাখে।

'মলয়ালি' নামে এক প্রকার পার্ব্বত্য জাতি পশ্চিম ঘাটের 'জবাদি' পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা অতি অদ্ভুত। পুরোহিত কনের কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দিবার পর বিবাহিত যুগলের কোলের উপর একখানি তরবারি রাখিয়া দেওয়া হয়। কনের পিতার নিকট কন্যাদানের সম্মতি গ্রহণের পূর্ব্বে বরকে অন্ততঃ এক বৎসর কনের বাড়ীতে কর্ম্ম করিতে হয়। অনেক সময়ে যুবতী পিতার সম্মতি লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যুবকের সহিত পলাইয়া যায় বা যুবক যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। বর এরূপ করিলে তাহার এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়, যথা মুখে রঙ মাখিয়া, ভাঙ্গা হাঁড়ি, জঞ্জাল বোঝাই ঝুড়ি বা ভাঙ্গা জানালা মাথার উপর রাখিয়া তাহার পথে চলিতে হয়। ইহাদের মধ্যেও বিবাহবন্ধন অতি শিথিল। ইহারা পর্ব্বতের গুহ্যতম প্রদেশে একটি প্রস্তরের কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করে। তথায় বাহিরের কাহারও ত' যাইবার সম্ভাবনা নাইই, তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত তথায় প্রবেশ করিতে পায় না।

'বয়া' নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। তাহারা পূর্ব্বে ব্যাধ ছিল। বিবাহ-কালে ইহারা বর কনের হাতে লোহার বালা পরাইয়া দিয়া কৃষ্ণ মেষের লোমে দুই জনের হাত বাঁধিয়া দেয়। কন্যার কণ্ঠে 'তলু' পরান ত' আছেই। ইহাদের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই কাল রঙ্গের বালা পরে।

দক্ষিণ ভারতে 'দেবদাসী' নামপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকগণ আমরণ অবিবাহিতা থাকে ও দেবালয়ে নর্ত্তকীর কার্য্য করে। ইহাদের একটি তরবারির সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। যে দেবতাকে ইহারা দাসীরূপে সেবা করে তাঁহারই পত্নীরূপে ইহারা গণ্য হয়। বিবাহিতার চিহ্নস্বরূপ ইহারা কণ্ঠে 'বট্' ব্যবহার করে।

চট্টগ্রামে চাক্‌মাজাতির বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস তাঁহার চাক্‌মা-জাতির ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতিশয় কৌতুকাবহ। ইহাদের মধ্যে মামাত পিসতুত ভাইভগিনীর মধ্যে পাণিগ্রহণ প্রচলিত, কিন্তু শ্যালিকার সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে।

বিবাহ ইহাদিগের সচরাচর পঞ্চবিধ যথা,—অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে—১। বল-পূর্ব্বক বিবাহ ২। বড় বিবাহ, ৩। গৃহজামাতা আনয়ন ৪। এবং মনোমিলনে পরিণয় ৫। এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহ সমধিক প্রচলিত।

* * *

পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতামাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইন্‌মাং" (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে।

তাহাদের মনোমত কন্যার সমাচার পাইলে কোন কোন সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত কন্যার পিত্রালয়ে বরের পিতাকে যাইতে হয়। পিতা না থাকিলে অন্য কোন অভিভাবক গমন করেন। প্রথম বারে মদ, পানসুপারী এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। পরন্তু কখনই কন্যা লইয়া যাইতে নাই; তাহাতে বিফল মনোরথ সর্ব্ববাদীসম্মত। নিতান্ত সাবধানে বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত করা হয়। পাত্রের পিতা বলে—"তোমার ঘরের নিকট একটি মনোহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি।" ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূলকথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে, অথবা কোন কাক যদি বামপার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনও জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়, তবে আর একপদমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়।

* * *

এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, "ছাদং"এর সময় অর্থাৎ আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের ন্যায় অধিকন্তু পিষ্টক, মোরগ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। অনন্তর তৃতীয়-বারে পণ ধার্য্য করা হয়। সাধারণতঃ ৫০।৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০।১২০ টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া

থাকে; সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্যাপণের প্রচলন নাই। এই সময়ে কন্যা তুলিয়া আনা হইবে, কি বরকে তুলিয়া নিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, এই প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া নিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহার তেমন প্রচলন নাই।

* * *

উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে, শুভদিন ধার্য্য হইয়া যায়। ফসলের কার্য্য হইতে অবসর কালই বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

* * *

কথাবার্ত্তা সাব্যস্ত হইবার পর কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে একটি অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে বিবাহের নিমিত্ত মণ্ড প্রস্তুত করিবার অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বদিন যে সকল বাদ্যকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাদ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাদ্যকে "খোলা আননি" (১) বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কলাপাতায় পান সুপারীর দুইটি "পুঁটুলি" করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুঁটুলি' দুইটি মিলিত হইয়া ভাসে তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়, অন্যথা তাহারা বরকন্যার মনোমালিন্যের আশঙ্কা করে। বরের বাড়ীতে বিবাহ হইবার কথা হইলে, বরপক্ষীয় কোন মহিলা পক্ষান্তরে কন্যাপক্ষের কেহ নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; এই জলে, বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করান হয়। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহ-সম্মুখীন্ দুইধারে সপল্লব মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

১। পাত্রী বরের গৃহে তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব্বদিন, পথ যদি দূরবর্ত্তী হয় তবে তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়ীতে উপনীত হইতে পারা যায় সেই হিসাবে, বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদিসহ কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে।

* * *

পরদিন প্রত্যূষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে "সাঁকো"র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। বর-পক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিবার সময় কন্যার মাতা সূতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়, ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, কন্যার সহিত তাহার পিতা কি পিতামাতা উভয়েই বরগৃহে গমন করে।

* * *

কোন কোন পরিবারে গণৎকার

(১) এ সময় প্রাঙ্গণে একটি জায়গা করিয়া তাহাতে পান সুপারী, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে; এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে হয়।

নির্দ্ধারিত লগ্নে বরকন্যাকে উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদীর উপরে উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনও আত্মীয় এবং আত্মীয়া বর-কন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাকালে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে ছাঁয়লা" এবং "ছাঁয়লী" বলা হয়। ইহারা একখানি শুভ্রবস্ত্র লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "জোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে ত?" সকলে বলিয়া উঠে—"আছে" "আছে" "আছে"। সম্মতি পাইবা মাত্রই "ছায়লা—ছায়লী" উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে বদ্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে "বদা-গুল্যা ভাত" অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ তাহার মুখমধ্যে উল্লিখিত ভক্ষ্য প্রদান করে।

* * *

এইরূপে খাদ্য বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধ নবীন দম্পতির মস্তকে শুভাশীষ বাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করেন। ইহাই স্বস্তিবাচন—পক্ষান্তরে কর্ম্মের সাফল্য ঘোষণা। অনন্তর দম্পতি আচম্বিতে উঠিয়া পড়ে। এতন্মধ্যে যদি নবোঢ়া পূর্ব্বে উঠে, তবে সে সর্ব্বদা স্বামীর অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সংস্কারের আশ্বাস আছে। পরে স্বামী স্ত্রী পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটায়।

পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক "ওঝার" সহিত নদীকূলে যায়, এবং তথায় দুইটী মোরগের রুধিরে "ঘিলা" ও কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোনারূপার জলে "মাথা ধুইয়া শুদ্ধ" হয়। ইহাকে বিবাহের "বুরপারণ" বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই তাহারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজাতি সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে! তখন নবদম্পতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়; এবং যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবন-সিক্ত সতগুল-তুলা শুভনির্ম্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতির কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে।

* * *

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানা-বিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়া সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহার নাম বিবাহের "ছুইদ্ ভাঙ্গান" অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতির একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে, এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও উঠিতে পারে না।

* * *

বর তুলিয়া নিয়া বিবাহ এবং উপরি বর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ কোন তারতম্য নাই; কেবল বরগৃহের কর্ম্ম-গুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র।

* * *

ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক যুবতীর মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়াসক্তি জন্মিলে তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পায় যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া সমাজকর্ত্তার সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ জানায়। উপায়াভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতীর পিতামাতার নিকট তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক যুবতী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমাজকর্ত্তার কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্ম্মতি যুবকের ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। কোন কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলেও যদি যুবক যুবতীর সঙ্কল্প প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। এইরূপে চারিবার পর্য্যন্ত পলাইতে পারিলে কন্যার পিতা আর কুলমর্য্যাদাহানির দাবি করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে "চুপ্তুলাং" পূজা এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুসঙ্গিক কার্য্য না করিলেও চলে, হয়ও না।

চিত্রোৎপলা

১

নহে সিন্ধু, কাবেরী, যমুনা, গঙ্গা,
নর্ম্মদা, গোদাবরী সে ;
সে ত আর্য্য-কীর্ত্তি-স্মৃতি-তরঙ্গা
গাথা নাহি হেথা বরিষে।

২

এ যে শবরভবনে বিজনবাহিনী
শৈলমঞ্চে নটিনী,
গাহে ফেনিল লাস্যে স্বচ্ছ কাহিনী
চিত্রোৎপলা তটিনী।

৩

ঐ পাষাণ গলায়ে শিলায় শিলায়
বিষম পন্থা দলিয়া
ছোটে চঞ্চলা; ফোটে লহরী লীলায়
সৌর কিরণ ঝলিয়া।

৪

নাহি তীরভূমে তার হর্ম্ম্যমালায়
খচিত রম্য নগরী,
আছে পর্ণকুটীরে বনের তলায়
বিজনে শবর-শবরী।

৫

হেথা স্ফটিক স্বচ্ছ নীল তরঙ্গ
অম্বর প্রতিবিম্বিয়া,
ধায় উপলকৃষ্ণ যুবতি-অঙ্গ
গলায় গলায় চুম্বিয়া।

৬

হেথা ধৌত, স্নিগ্ধ, ভূতল, গগন,
কানন, শৈল, শবরী ;
হেথা অমল, সবল সচল স্বপন,
বিরাজে চেতনা আবরি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।



শৈলকুমারী।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

জাতীয় মহাসমিতি

করাচীতে এবারকার জাতীয় মহাসভার অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় বিষণদাস বিভিন্ন প্রদেশের সমাগত ডেলিগেটদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার সময় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন যে সখ্য ভাব দেখা যাইতেছে তাহা সমগ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলেরই সূচনা করিয়া দিতেছে। গত বৎসর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যে আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশ সাফল্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। পঁয়ত্রিশ কোটি মানব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একপ্রাণে, একত্রে শান্তিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ;—সকলেরি উদ্দেশ্য, চেষ্টা, সাধনা, আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায় সেই এক মাতৃভূমির সেবা—এ অপূর্ব্ব দৃশ্য কবিকল্পনা নয়, স্বপ্নমুগ্ধের মানসছবি নয়, ইহা বাস্তব ঘটনা।

মুসলমানদিগের মধ্যে নব জাগরণের প্রকাশ সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমরা ভায়ে ভায়ে একত্র মিলিয়া জ্ঞাতিবিরোধ ও তুচ্ছ স্বার্থের প্ররোচনা ভুলিতে পারিলে, তবেই না মাতৃভূমির উন্নতি সাধিত হইবে? মুসলমানগণ দেশধর্ম্মের উদারতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যতই গভীর রূপে অনুভব করিবেন—ততই না ভারতীয় জাতি সুদৃঢ় রূপে গঠিত হইবে? কেবলমাত্র হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, পার্সি জৈন নয়, প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক জাতিরই উন্নতিতে—জাতীয়জীবনের সম্পূর্ণতা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিণতি।

মোসলেম লীগের পরিচালকসমিতি গত বৎসর H. H. Aga Khanএর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশরাজের আশ্রয়ে স্বায়ত্তশাসনই যে আদর্শ শাসনপ্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই জানা যাইতেছে—জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের আর কোন মতভেদ নাই। আমরা সকলেই আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া একই লক্ষ্যের অভিমুখে স্থির ভাবে অগ্রসর হইতেছি। কাব্য সাহিত্য দর্শন এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিয়া হিন্দুর বিংশতি বৎসর পরে মুসলমানও সেই পথের যাত্রী হইয়াছে। আমাদের সকলেরই এক স্বার্থ মাতৃভূমির দুঃখ নিরাকরণ ; আমাদের সকলেরই হৃদয় সমস্বরে বলিতেছে "নমো হিন্দুস্থান।"

জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদের বক্তৃতা সুদীর্ঘ। তাহাতে তিনি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াই এস্থলে ক্ষান্ত হইব। হিন্দু মুসলমান-দিগের ঐক্য সম্বন্ধে সভাপতি বলিয়াছেন ;—

"আজ বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৭ সালে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসভার তৃতীয় অধিবেশনের

সভাপতি বদরুদ্দিন তায়াবজি বলিয়াছিলেন, 'অনেকে আমাদের এ সম্মিলনীকে জাতীয় মহাসভা বলিতে সম্মত নহেন। কেননা ভারতীয় জাতির এক প্রধানতম অংশ মুসলমানসম্প্রদায় ইহার পূর্ব্ব দুই অধিবেশনে সম্পূর্ণ ভাবে ইহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্তু হে ভদ্রমণ্ডলি এ কথা ঠিকনহে। ক্ষণিক এবং স্থানীয় কোন কারণ বশতঃ সম্ভবত এইরূপ ঘটিয়াছে—ইত্যাদি।' বস্তুতঃই—সে ক্ষণিক কারণসকল ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে—শিক্ষা বিস্তারের সহিত দিন দিন হিন্দু মুসলমানের হৃদ্যতা যে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা কেহ আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। সম্মানীয় আগাখান সাহেবের বক্তৃতায় এই বন্ধুত্বের চরম পরিণতির আনন্দ বার্ত্তা আমরা জানিতে পারিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন ;—

হিন্দু মুসলমান প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, একাগ্র মনে, একত্রে, উভয়ে উভয়ের সহায়তায় সাহসী এবং উৎসাহী হইয়া কার্য্য করিতে পারিলেই অচিরে ভারতবাসীর উন্নতি সুন্দররূপে সাধিত হইবে ; ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ মধ্যে মধ্যে একত্র সম্মিলিত হইয়া সাধারণের মঙ্গলজনক বিষয়-সকল কিরূপে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেশভক্ত মাতৃসেবী সন্তানগণ কখনই এ অনুষ্ঠানে পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই একপ্রাণতাই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। ইহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া মঙ্গলপ্রসূ হউক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।'

রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে হইলে —জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একপ্রাণ হওয়াই যে তাহার একমাত্র উপায় তাহার আর সন্দেহ কি ?—সহানুভূতি দ্বারা অর্থাৎ নাড়ীর টানেই দূর দূরান্তর হইতেও আমরা মিলনের প্রীতি অনুভব করি। কোনও বহিঃশত্রু যাহাতে আমাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিতে না পারে সে জন্য সকলেরই সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ দলিত করিয়া মহৎ উদার সহানুভূতিতে, মাতৃভূমির স্বার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্মুখের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আগে যেমন যাইতে হইবে, তেমনি একত্রেও যাইতে হইবে একথা যেন আর আমরা না ভুলিয়া যাই।"

দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারের সম্বন্ধে সভাপতি বলিয়াছেন ;—

"এই নাড়ীর টানেই ব্যথা অনুভব করিয়াছি বলিয়া আমরা আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী ভারতীয় ভ্রাতাভগ্নিদিগের দুঃখে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারি নাই।—এই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী একশত পঞ্চাশ সহস্র ভারতবাসীর দুঃখ আমাদের হৃদয়কে কাতর ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—এই জন্যই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা যে আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ কোনরূপেই এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন। যে অশেষ বীরত্বের সহিত তাহারা বিপুল অসমশক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় সম্মান রক্ষার্থ এবং ভবিষ্যতের মঙ্গল সাধন চেষ্টায় যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে তাহাতে আমাদের মনে যেমন তাহাদের নিমিত্ত গভীর সমবেদনার সৃষ্টি করিতেছে তেমনি তাহাদিগের বিরোধী অত্যাচারীদিগের প্রতি তীব্রক্রোধের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু এ সহানুভূতি বা ক্রোধে অত্যাচারীর পীড়নদণ্ড প্রতিরোধ করিবার

কোন শক্তিই আমাদের নাই। ইংলণ্ডের রাজ-তন্ত্রই এই প্রতিবিধানের মহামন্ত্র প্রচার করিতে পারেন। সেখানকার শাসনকর্ত্তাগণ এখনও কেন এ সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ—এখনও কেন ভারতীয় প্রজা উৎপীড়িত হইতেছে ? সহানুভূতিসূচক বার্ত্তা, উৎসাহের অভয়বাণী অনেক শুনিতেছি—কিন্তু কথা কেন কার্য্যে পরিণত হইতেছে না-? যে মহা সাম্রাজ্যের অধীনে ৫০ কোটী প্রজার বাস—যে রাজার রাজ্যে সূর্য্যদেবের অস্ত নাই—সেই সাম্রাজ্যের অধিনায়কগণ মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিকের বিরুদ্ধে ন্যায়ের শাসনদণ্ড উত্তোলন করিতে অক্ষম ইহা অপেক্ষা অবোধ্য এবং ভয়ানক ব্যাপার কি হইতে পারে ?—এ ব্যাপারে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হইতেছে।

যে মহা সাম্রাজ্যাধীনে আমরা সকলেই বসবাস করিতেছি তাহারি প্রধান বর্গ উদাসীন ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন—আর আঘাতের পর নির্ম্মমতর আঘাত বর্ষিত হইয়া ভারতীয়দিগকে ধূলিশায়ী করিতেছে। এই উদাসিন্য উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে দারুণ বিরূপতার সৃষ্টি করিতেছে—ব্রিটিশ রাজ্য-চালকদিগের উন্নত, দৃঢ়, চরিত্রবলের প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে। এই ঔদাসিন্যের বলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান মনে করিতেছে যে তাহাদিগের কার্য্য প্রণালীর সহিত ব্রিটিশ হোমগভর্ণমেণ্টের কোন বিরোধ নাই—তাঁহারা ইউনিয়ানেরই স্বপক্ষ। আমি বলি ইউনিয়ানকে উপেক্ষা কর—অন্য উপায় নাই—বুয়ারগণ কখনই ন্যায়ত সদ্ব্যবহারের দাবী গ্রাহ্য করিবে না,—তাহারা জানে ভারতবাসীদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্যই যুদ্ধের অবতারণা হয়,—তাহারি ফলে, তাহাদিগের পূর্ব্বের স্বাধীনতা যায়। ভারতীয় প্রজাদিগের এ দুর্গতির জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে দায়ী। ইহা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন ; পূর্ব্বেই আইনের দ্বারা ইহার সম্ভাবনা দূর করিতে পারিতেন। বুয়ারদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দান করিবার সময়ই তাহা করা উচিত ছিল—কিন্তু করা হয় নাই, এখন আর উপায় নাই। প্রতিশোধ পন্থা অবলম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইবে আমার ধারণা। নেটাল হইতে যাহাতে আমাদের দেশে আর কয়লা না আসিতে পারে—এবং সেখানকার শ্বেত বর্ণ প্রজা যাহাতে এ দেশের সিভিল সার্ব্বিসে কার্য্য না পায় তাহা করিলে তবেই কতক প্রতিবিধান হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই অস্ত্র ধারণ করিলেই সেখানকার দম্ভবল অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই। অবিলম্বে এ অস্ত্র ধারণ করা আবশ্যক। হয় ত ইহাতে স্থায়ী ফল হইবে না, ক্ষণিকের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হইবে মাত্র, কিন্তু ইহার নৈতিক ফল ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই—এবং ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট যে এ অস্ত্রপাতে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিতে পারিবে তাহাও মনে হয় না। এইরূপ শাস্তিবিধান-নীতি অনুসরণ করিলে আর কিছু না হউক সমগ্র পৃথিবী জানিতে পারিবে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাদিগের দুঃখ কষ্টে উদাসীন নহে—প্রজার অত্যাচার তাঁহারা কখনই মানিয়া লইবেন না। শাস্তি বিধান

করিতে বলিতেছি কেননা অন্য উপায় আর দেখি না, তবুও আশা করিতেছি বিচার-আলোচনার পথ সম্পূর্ণ রোধ হয় নাই, ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্টের ন্যায়বিচার-শক্তি এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।"

ভারতীয় সেক্রেটারি অব্ কাউনসিল পুনর্গঠন সম্বন্ধে সভাপতি বলিতেছেন, "আজ কালকার দিনে সভ্যদিগকে সাধারণে নির্ব্বাচন করিয়া দিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কাউনসিল সংস্কার কালে যাহাতে ভবিষ্যতে এক তৃতীয়াংশ ভারতীয় সভ্য হয়েন—এবং তাঁহারা যাহাতে রাজকর্ম্মচারী না হয়েন সে বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।"

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন যে বিশেষ আবশ্যক তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন—"অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত জড়মূঢ় সাধারণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার একমাত্র মহামন্ত্র শিক্ষা,—তাহাদিগের নৈরাশ্য দূরীকরণের, মানব নামের শ্রেষ্ঠতা অনুভূত করাইবার একমাত্র উপায় শিক্ষা, সাহিত্য দেশবার্ত্তা, কৃষিউন্নতির নিয়মাবলি ও নূতন বিজ্ঞানানুযায়ী কৃষিচেষ্টা বিস্তার করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা। দেশের প্রধান জন কয়েক শিক্ষিত হইলে জাতি গঠিত হয় না প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা আবশ্যক,—বালক বালিকা, সমভাবে শিক্ষা লাভ করিলে তবে দেশের সুদিন ফিরিয়া আসিবে।"

সভাপতি বলিয়াছেন,—"উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে শান্তির প্রয়োজন,—চারিদিকে পরিপূর্ণ শান্তির বিস্তার অতি অবশ্যকীয়; মুসলমান কবি হাফিজ বলিয়াছেন,—যদি উন্নতি তোমার অভিপ্রেত হয় তবে বিশ্বে সকলের সহিত শান্তি, প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর। বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতায় কেবল মাত্র শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়,—আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি।"

সভাপতি বলেন, "মহম্মদের ধর্ম্ম বিরোধ প্রচার করে না; অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ তাহার যথার্থ মর্ম্মকথা নয়।—ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন মহম্মদের ধর্ম্ম উদার নীতি এবং গণতন্ত্রের প্রসার প্রচার করিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা তাহার উদ্দেশ্য নয়। তবে আসুন মুসলমান, হিন্দু পার্সি, খ্রীষ্টান আমরা সকলে ভ্রাতৃত্বের সখ্য বন্ধনে দৃঢ় হইয়া অগ্রসর হই। হৃদয়ে বিশ্বাস জীবনে দেশপ্রীতি আমাদের অটল থাকুক। মুসলমান যদি এতদিন দূরে ছিল আজ সে নিকটে আসিয়াছে, হিন্দু ভ্রাতাগণ তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে অভিনন্দন করিয়া লউন—তাহাদের সহিত একত্র কাজ করিবার বাসনায় বিশ্বাস স্থাপন করুন! ঐক্যের মাহেন্দ্রক্ষণ আমাদের নিকট মঙ্গল লইয়া সমাগত, তাহা যেন ব্যর্থ হইয়া না যায়! এ ঐক্যের জন্য আমাদিগকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হইবে, অনেক ছাড়িয়া হয় ত অল্প সঞ্চয় করিতে হইবে,—তবুও এই সম্মিলনই দেশের মঙ্গলের চরম পন্থা। ক্ষুদ্রতা বর্জ্জন করিয়া, সম্পূর্ণতার আদর্শ বরণ করিয়া একত্রে, সখ্যে, আনন্দে, আসুন আমরা অগ্রসর হই।"

"রবীন্দ্র"

কবীন্দ্র রবীন্দ্র তুমি আকাশ সম্রাট,
একাধারে ইন্দ্র আর রবি,
আলোছায়া বৃষ্টিধারা ইন্দ্র ধনু খেলা
ইচ্ছামত রচিতেছ সবি!

সপ্ত বরণের তব তুলিকা পরশে
বিশ্ব হয় চিত্তপটে আঁকা,
নেত্রে যার ছায়া ভাসে চিত্তে তারি আলো
তাই নিয়ে চিরদিন থাকা!

তুমি ঘুচাইয়া দাও কুহেলি আড়াল
নয়নে নূতন দৃষ্টি দিয়ে,
বসুধা সহসা হাসে গুঞ্জে মধুকর
পুষ্পশত ওঠে মুঞ্জরিয়ে!

বসন্তের দিগ্বিজয় কে জানিতে পেত
তুমি যদি না দিতে চেতনা,
কোকিলের কলতান চাতক-বিলাপ
কর্ণে কারো প্রবেশ পেতনা।

তরুণ নবীন দিনে অরুণ কিরণে
অশোকের আশীষ বর্ষণ,
করুণ জলদ ছায়া প্রকাশ অম্বরে
বিশ্বে যবে অসহ্য দহন!

রুদ্র নিদাঘের তাপ, বাদলের ধারা
সফল করিয়া এক সাথে,
ভরিছ সোনার ধানে দরিদ্র কুটীর
শরতের উদার প্রভাতে!

মেঘ মুক্ত নীলিমায় অপার আকাশে
দিনে দিনে পূর্ণ শশধরে,
অজানা উত্তর হতে বার্ত্তা যবে আসে
দীপ্তি তব তৃপ্তি হয়ে ঝরে!

সমালোচনা

বিবাহ ও তাহার আদর্শ। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি, এ প্রণীত। ঢাকা, আলবার্ট লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও আলেকজান্দ্রা ষ্টীম মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাল্যবিবাহ বিধি শাস্ত্রশাসিত নহে এবং হিন্দুবিবাহের আদর্শ উচ্চ ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থখানি সুচিন্তিত, আমাদিগের সুকঠিন জীবন-সমস্যার দিনে পরম উপাদেয় সামগ্রী; দিক্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে সুপথ দেখাইবার পক্ষেও সুনিপুণ 'গাইড্'-স্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থকার 'উপক্রমে' বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহের আদর্শ কত উচ্চ, তাহা বিবাহমন্ত্রাদির মধ্যেই সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। * * * বিবাহের আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, এই আদর্শের অনুযায়ী সমাজকে উন্নত করিতে হইলে কিরূপ বিবাহ এদেশে সর্ব্বাদৌ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। তজ্জন্য বিবাহ-সংস্কারের সমগ্র অনুষ্ঠানের আলোচনা আবশ্যক। এই গ্রন্থে তাহাই কিয়ৎপরিমাণ চেষ্টা করা গিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "এক দিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, এই দুই কারণেই সমাজ উত্তরোত্তর অধঃপতিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল যেমন অপ্রাপ্তরজস্কার বিবাহ সর্ব্বদা অনুসৃত হয়, তেমনি ঊনচতুর্ব্বিংশবর্ষীয় পুরুষের বিবাহও নিত্য প্রচলিত। ইহার পরিণাম কি? অন্যান্য সভ্য দেশে ১৮৮১-৯০ অব্দের তালিকায় ১৫ হইতে ৫০

বৎসরের হাজার-করা স্ত্রীতে সন্তানের বার্ষিক জন্ম ২৫০; আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হাজার-করা স্ত্রীতে জন্ম-সংখ্যা ৪৯ হইতে ৫১ পর্য্যন্ত। আমাদের দেশের মৃত্যুসংখ্যায় শতকরা ৪৩ জন পাঁচ বৎসরের শিশু থাকে; ১৫ জন পাঁচ হইতে চব্বিশ বৎসরের; ২৬ জন পঁচিশ হইতে ৫৪ বৎসরের; অবশিষ্ট ১৬ জন তদূর্দ্ধ বৎসরের। এইরূপ মৃত্যু সংখ্যা অন্য কোনও জাতিতে দেখা যায় না। স্ত্রীদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়; ১০ হইতে ৩৪ বৎসরের স্ত্রীদিগের মধ্যে সূতিকাগৃহেই প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ প্রসূতি দেহত্যাগ করে।" প্রসিদ্ধ ডাক্তারদিগের মত এই যে, কন্যার বিবাহ যত অল্প বয়সে হয়, তত শীঘ্রই তাহার সন্তানোৎপাদন-শক্তি চলিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাল্য-বিবাহের মধ্যে কবিত্ব ও সেন্টিমেন্টের প্রাচুর্য্য থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা ক্ষতিকর। সেইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যবিবাহের আদর্শ কিরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা বিশদ ও নিরপেক্ষ হইয়াছে। যুক্তি ও সত্যের উপর তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ঋষিদিগের মতাদি ঘটনাবিপর্য্যয়ে কিরূপে বিকৃত অবস্থায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও তিনি নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ্ জগতীচ্ছন্দের পরিচ্ছদ পরিয়া কত অনাচার লোকসমাজে সদাচাররূপে পূজা আদায় করিতেছে, কত দানব ভদ্রবেশে দেবতার ভোগ অপহরণ করিয়া লইতেছে * * * কেবল টীকাকার বা অন্যের উদ্ধৃত শ্লোকাদির উপর নির্ভর করিয়া মূল গ্রন্থের অধ্যয়ন না করিলে দুই একটি বিচ্ছিন্ন বচন হইতে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের আশা করা বিড়ম্বনা।" এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বার্দ্ধ-ভাগে তিনি বাল্যবিবাহ-সমর্থক শাস্ত্রবচনের বিচার ও উত্তর ভাগে বিবাহের মন্ত্র ও আদর্শের আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে শাস্ত্রাদির অনুশাসন প্রভৃতির জন্য স্মৃতিশক্তির উপরই সকলকে অধিকতর নির্ভর করিতে হইত। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদির অবতারণা একান্তই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুধু মনে করিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নাই—তিনি দৃঢ় ও নিপুণ যুক্তি-তর্কে এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদি-নির্দ্ধারণেও সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বিচার-নিপুণতা, অনুশীলন ও গবেষণার পরিচয় আমরা সর্ব্বত্র পাইয়াছি। অথচ বিচারে গ্রন্থকার কোথাও সংযম হারান নাই—বেশ সশ্রদ্ধ গম্ভীরভাবেই মতাদির আলোচনা করিয়াছেন, ইহা বিচারকের পক্ষে খুবই সঙ্গত ও যোগ্য হইয়াছে। দুই-একখানি গ্রন্থ পড়িয়াই তিনি স্বমত খাড়া করেন নাই, সমস্ত সংহিতা গ্রন্থাদিরই পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কেমন করিয়া বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইল, তাহাও তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ পাঠ করিয়া যৌনবিবাহের অনুকূল বচনগুলির আলোচনায় তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন আর্য্যেরা বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধীই ছিলেন। শাস্ত্রাদি গ্রন্থে এমন একটি বচন পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা ঊনচতুর্ব্বিংশবর্ষীয় বয়স্ক পুরুষের বিবাহের সমর্থন করা যায়। অথচ হিন্দুসমাজে ২৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সওয়া তিন কোটিরও অধিক। এই সওয়া তিনকোটি যুবক অকাল ভোগ-সুখের দুর্ভর বন্ধনে জড়িত ও শৃঙ্খলিত হওয়ায় তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার-ময়—বিবাহের আনুসঙ্গিক দুর্ভর ভারে উত্তরোত্তর জড়িত হওয়ায় তাহাদের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আশাও যে সুদূর-পরাহত, ইহা কি যথেষ্ট ভাবনার কথা নহে? কন্যা সম্বন্ধেও শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছে, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাই বিবাহযোগ্যা—বিবাহের মন্ত্রাদিও ইহার সমর্থক। প্রাচীন সাহিত্যও এই মতের সমর্থন করে। ভারতের আদর্শ নারী সাবিত্রী, গৌরী প্রভৃতির প্রাপ্ত বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বৈদিক বিধিই সর্ব্বত্র অনুসরণীয়। বেদে বাল্যবিবাহ-সমর্থক কোনও বিধির স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, পরন্তু বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্ট-রজস্কার বিবাহের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা যেরূপ কঠিন জীবন-সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ে আমাদিগের বিশেষরূপে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নহিলে অন্ধ আচারের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া আমরা যে অচিরে উৎসন্ন যাইব, সে

বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার এদিকে আমাদিগের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি বঙ্গবাসী-মাত্রেরই প্রভূত কৃতজ্ঞতার পাত্র। গ্রন্থখানি প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। বহির ছাপা কাগজ সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও অত্যন্ত সুলভ হওয়ায় প্রত্যেকেই অনায়াসে ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

আক্ষেপ। স্বর্গীয়া তিলোত্তমা দাসী লিখিত। কলিকাতা, দাস যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-পুস্তক। কোন বিশেষত্ব নাই।

সেবা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-শাখা, বরিশাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। পরিষদের বরিশাল-শাখার প্রথম বর্ষের মাসিক অধিবেশন সমূহে পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া কতকগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগের সম্পত্তি; দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যালোচনা-বিষয়ক। সংগ্রহটি উপাদেয় হইয়াছে। "কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটিতে ভাষার দোষ বহু স্থলে লক্ষিত হইল,—আলোচনাটুকুও গভীর নহে, ভাসা-ভাসা ধরণের।

অভিধানপ্রদীপিকা বা পালি শব্দকোষ। সদ্ধর্ম্মবিশারদ মুনির শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। চৈতন্য প্রসাদ বিহার, শিলক, চট্টগ্রাম। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। পালি সাহিত্য ভাণ্ডারের মণিস্বরূপ অভিধানপ্রদীপিকা বঙ্গাক্ষরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। পালি-শিক্ষার্থিগণের পক্ষে মহাসুযোগের ব্যবস্থা করিয়া সংগ্রহকার ও প্রকাশক উভয়েই পালি-শিক্ষার্থী ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দের সবিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান 'অভিধানপ্রদীপিকা' গ্রন্থ ছাত্রগণের কণ্ঠস্থ করিবার সৌকর্য্যসাধনার্থ কেবল ছন্দে অথচ পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইয়াছে। "অমরকোষ' যেমন সংস্কৃত-শিক্ষার্থিগণের অবশ্য-পাঠ্য, তদ্রূপ পালি-শিক্ষার্থিগণের পক্ষেও 'অভিধানপ্রদীপিকা' অত্যাবশ্যক।" গ্রন্থের ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে—বাঁধাইও চমৎকার।

কমলিনী। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল প্রণীত। কলিকাতা, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উপন্যাস। প্লট সেই মামুলি ধরণের, নিতান্তই আজগুবি। চরিত্র জড়পিণ্ড মাত্র, রচনা-ভঙ্গীও নীরস, প্রাণহীন।

কবিতা-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত রচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। নামেই বুঝা যাইতেছে; এখানি কবিতা-পুস্তক। গ্রন্থকার মুখবন্ধে বিনীত নিবেদন করিয়াছেন, "গুণজ্ঞ হংসেরা যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জলাংশ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধাংশ পান করে, তদ্রূপ হে সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ, আপনারাও দোষ-গুণ-বিমিশ্রিত কবিতা মঞ্জরীর গুণ-সৌরভ গ্রহণ করিলে" ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যক্রমে আয়াস-সত্ত্বেও আমরা ইহার "গুণ সৌরভে"র আভাস পাইলাম না।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন-চন্দ্র পৃততুণ্ড প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখার উৎসাহ ও অনুমোদনে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। ছাত্রদের জন্য অর্দ্ধ মূল্য আট আনা। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগস্থ বর্ত্তমান বরিশাল, ফরিদপুর এবং নোয়া-খালী জিলা এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উহা এককালে বঙ্গের অতি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে উক্ত প্রদেশের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি-বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল অবধি বিবরণী গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহ হৃদয়গ্রাহী ও বহুল হইয়াছে, তথ্য-সমাবেশে শৃঙ্খলার পারিপাট্যও প্রশংসনীয়। চন্দ্র-দ্বীপের রাজ্যশাসন-প্রণালী ও শিল্প বাণিজ্য, সামাজিক বিধান, বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্বের কাহিনী, বারভুঞার পরিচয়, দুর্গ, গড়, কামান, ভাষা প্রভৃতির কথা কিছুই ইহাতে বাদ পড়ে নাই। প্রাদেশিক ইতিহাস-সাহিত্য বিভাগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালার চারিদিকে প্রাদেশিক ইতিহাস-সংগ্রহ ও সঙ্কলনের যে বিপুল

উদ্যম দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হয়, অথও বঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাস অচিরেই লিখিত হইয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন করিয়া জাতি-স্বরূপে তাহাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। এ বিষয়ে যাঁহারা সহায়তা করিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে, বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের কথা বলিবার সময় বৃন্দাবন বাবু টিপ্পনী কাটিয়াছেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ 'তৎকৃত বউঠাকুরাণীর হাট নামক গ্রন্থে "রাজা রামচন্দ্র রায়ের যে কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই।" বৃন্দাবন বাবুর এ কথা মনে রাখা উচিত ছিল যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ ছিলেন না, এবং তৎকালে ঐতিহাসিক উপকরণাদিরও এতখানি উদ্ধার হয় নাই। তদ্ভিন্ন উপন্যাস উপন্যাস, তাহা ইতিহাস নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'জেবউন্নিসা' 'তকি খাঁ' প্রভৃতি চরিত্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রামচন্দ্র'-চরিত্রও সুতরাং মার্জ্জনীয়।

মাল্য ও নির্ম্মাল্য।—আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত। কলিকাতা, একৃমি প্রেসে মুদ্রিত। ৩৯৮ বেলতলা রোড, শ্রীসুধীর কুমার সেন, বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। বহুকাল পরে 'আলো ও ছায়া' প্রণেতৃর নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহার কবিযশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আগ্রহের সহিত আমরা তাঁহার নূতন গ্রন্থ "মাল্য ও নির্ম্মাল্য" পাঠ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে তাঁহার উজ্জ্বল কবিযশঃ কোথাও ম্লান দেখিলাম না, বরং স্থানে স্থানে তাহা দীপ্ততরই ফুটিয়াছে। "মাল্য ও নির্ম্মাল্যে"র কবিতাগুলি স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ,—তাহাতে অধিকতর শক্তিশালী কবিগণের ভাবের ছাপ পড়ে নাই, সেগুলি আপনার ভাবেই ফুটিয়াছে, আপনার বেগেই ছুটিয়াছে, আপনার ভারেই লুটিয়াছে। কবিতাগুলির ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল, সর্ব্বত্রই ভাবের অনুগামিনী হইয়াছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১১০টি কবিতা আছে, তন্মধ্যে ৪৯টি পূর্ব্বে 'নির্ম্মাল্য' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যের' কবিতাগুলি ভাবে কোথাও গম্ভীর, আবার কোথাও একান্তই কোমল। "আশীর্ব্বাদ," "আকাঙ্ক্ষা," "মিলন-মহত্ত্ব," "স্মৃতিচিহ্ন," "প্রাচীন কীর্ত্তি-দর্শন," "নারীর অভিমান," "অযোগ্য ও যোগ্য প্রেম," "নিরুপায়," "হিসাব", "দীনের বাসনা" প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাবসম্পদে অমর হইয়া থাকিবে। কবিতাগুলিতে কোথাও এতটুকু অসংযম নাই—আগাগোড়াই বেশ একটি শান্ত সুরের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কাব্য-রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাও যে তৃপ্ত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম, বি, এফ, সি, এস প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এই গ্রন্থের বহু অংশই ভারতীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ,—আলোচনা যে সুনিপুণ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আলোচনা করিবার সময় দেশকাল-পাত্রের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়াই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলে বাঙ্গলা গৃহের বহু অকল্যাণ ও বহু অশান্তি দূর হইবে, বাঙ্গলার গৃহে স্বাস্থ্যের হাওয়া সঞ্চারিত হইবে, বাঙ্গালী আরামে বাস করিতে পারিবে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত দেশ-হিতৈষণা ও জাতি-প্রীতির কার্য্যই করিয়াছেন। বাঙ্গালী তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আবালবৃদ্ধ-বনিতার হাতে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক্,—বাঙ্গালার শ্মশান শান্তিময় গৃহে রূপান্তরিত হইবে, সংসার হইতে রোগ, শোক, অর্থনাশ ও মনস্তাপ যে অনেকাংশে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ আশা আছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি চমৎকার, আকার ছোট হওয়ায় পকেটেও অনায়াসে রাখা যায়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



দিলীপের পরীক্ষা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২০ [১১শ সংখ্যা

ছোট ও বড়

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই তার উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে একটি চিরজীবনের উদ্যম প্রকাশ পায়, সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মত সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে মানুষ একথা সমস্ত মনের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে ভোগী আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক পোকার মত আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করচে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চির-রাত্রি রচনা করে পড়ে আছে কিন্তু তবু সমস্ত মত্ততা, অহঙ্কার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে যে আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়। সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখ্‌লুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসার বুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়া ঘের দিয়ে রাখ্‌লুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বল্লেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ, সর্ব্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব কিছু হতেই প্রিয়, তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখ্‌লুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে মধুময় করে বিকশিত করচেন, যখন তাঁর সেবককে

দেখ্‌লুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ অপমানকে গলার হার করে তুল্‌চেন তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বল্লুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষ বিদ্বেষ ভাগ বিভাগের মাঝখানে এইটি ঘট্‌চে; কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই যে অনন্তের বিশ্বাস, এই যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মত রয়েছে বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এ যে মর্ম্মের জিনিষ, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্র-স্থল থেকে এ যে অনির্ব্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। তাইত ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ত, সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠ্‌চে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটা গাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের জায়গাটি ঘন করে জুড়ে বসে, আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য যোগায় না, তখন খর রৌদ্রের দিনই শুভদিন —তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনি যখন আমরা মরব; যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে—মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃত লোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ছে আজ আমাদের উৎসব সেই-খানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে, মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দ্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করচে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্চে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করচে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করচে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করচে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রস-স্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব—এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই ত আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে, সেইদিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেইদিন বোঝা যায় এতদিনকার

পাতা-ধরা এবং পাতা-ঝরার ভিতরে ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আস্‌ছিল, সেইজন্যই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি? আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্ম্মজাল বুনে বুনে চলা নয়—তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য্য পরম কল্যাণ পূজার অঞ্জলির মত ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উঠ্‌চে?

না, সে কথা ত আমরা সকলে মানিনে। আমাদের জীবনের মর্ম্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয় ত আসেনি, আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগেনি;—কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্য-মনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক্। কেন না, এ ত আমাদের কারো একলাকার সামগ্রী নয়। আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তব সঙ্গীত উঠ্‌বে সেত কারো একলা-কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডাকছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে, আমরা সেই সকল-মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি —কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে যে, তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাক্‌তে শিখেছি মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মত আহার বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারি মধ্যেই "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি, সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি তাই আনন্দ করচি তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়েই বলেছে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্ত-মাখা পায়ে তাকে চল্‌তে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে এবং রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ সেই মুখ মানুষ দেখ্‌তে

পেয়েছে। সে দেখা ত সহজ দেখা নয়, সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই ত তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে, তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ-সম্মিলন। একদিকে মানুষেরা কত ক্ষুদ্রতায় চারিদিকে বদ্ধ কিন্তু "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" তারাই সেই সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বত্র হতে পেয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে আপনাকে মিলিত করে সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করেছে—এ সংবাদটি গোপন থাকবার নয়, এই কথাটি স্মরণ করবার জন্যে মানুষ তার সকল কাজের দিনের মাঝখানে একটি উৎসবের দিন করবে।

কিন্তু বিমুখ চিত্ত ত আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ সম্পৎ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাস-কুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে ত আমরা উৎসব করতে পারিনে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্ব কথামাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখ্‌ব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোক-ধারার আবর্ত্তন হতে কত শত শত বৎসর কেটে যায় সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাইত সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করিনে, যখন সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করিনে তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তাহলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত। কিন্তু যে সূর্য্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এই জন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশ-বেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই ত ঐ বাণী উঠেছে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। এ ত তর্কযুক্তির কথা হলনা—চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে, এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা। সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন—এষঃ, এই যে তিনি, সেখানে ত কোনো কথা বলা চলে না। সীমা শব্দটার সঙ্গে একটা "না" লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম" শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম

ত "না" নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন "হাঁ"—তাই ত তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়—ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যাহা কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিষটি যেমন—কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্ত্তেই তার ধ্বংস হচ্চে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখ্‌তে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্ত্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে, মৃত্যুর "না" দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্চে "হাঁ"। সীমার মধ্যে অসীম হচ্চেন তেমনি ওঁ;—তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখ্‌লেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্চে সমস্ত স্খলিত হয়ে যাচ্চে বটে কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্চে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন সমস্ত গতায়াত সত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানচি। নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করচে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখচি, কখনো আজ, কখনো পাঁচ দিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়, তার সম্বন্ধে আমাদের বাইরের ইন্দ্রিয়-বোধটাকে জড়ো করে দেখ্‌লে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে; যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখেনি, যে কাল অনাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখেনি, এমন কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করেনি। বরঞ্চ বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই দেখাগুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে মনে আন্‌তে চাইলে মন হার মানে কিন্তু সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন, তাঁরাই বলেছেন, এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এ ত জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এযে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই যে ইনি, এই যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমাগতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ;—তিনি একদিকে যেমন গতি আর একদিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন, আর একদিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করচি বটে, তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকৃত না। অতএব অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মত

গড়ে নিতে হবে তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চল্‌তে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ,—তেমনি অনন্ত স্বরূপের প্রকাশও ত আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করেনি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করচেন। যখনি তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করচেন তখনি তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাৎ তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ আভা ত আমারই, বনের শ্যামল শোভা ত আমারই, ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে, ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সঙ্গীত উঠেছে সে সঙ্গীত কার জন্যে? আর এই ত রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর দক্ষিণহস্ত-ধরা বন্ধু, এইত ঘরে বাহিরে যাদের ভালো বেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্চে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতে পাতা আসন; এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আলপনা-আঁকা বরণ-বেদীটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ রূপে অমৃত রূপে বিরাজ করচেন। এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগ্‌লনা, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কি ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে ত বল্‌তে হয় বিশ্ব-সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্চেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বল্‌তে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচেনা; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধূলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেচে তাতেই তার পেট ভরবে। না, এ কেবল সেই সকল দুর্ব্বল উদাসীনদের কথা, যারা পথে চল্‌বেনা এবং দূরে বসে বসে বল্‌বে পথে চলাই যায় না।

একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কি বলেছে, তার থেকে তুমি কি বুঝলে? সে

বল্লে সে কথা ত আমাদের মাষ্টার মশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টার মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয় মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর একটা কথা বসানো, "সুশীতল" শব্দের জায়গায় "সুস্নিগ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্য্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে, যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানে ও নবুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয়নি; এই জন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না—সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ সহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নদী জিনিষটা কি তুমি কখনো দেখেছ? সে বল্লে, না। ভূগোলের নদী জিনিষটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে, এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয়নি যে, যে নদী দুই বেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোল বিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগজামিন পাসের নদী। তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টার মশায়রা কোনো-মতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এই জন্য অনন্ত-স্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারিনি, দেখ্‌তে পেলুম না। ওরে বোঝবার আছে কি? এই যে এষঃ, এই যে এই। এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়-বীণায় তাঁর হাত পড়চে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠ্‌চে; এই যে দুঃখ রূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করচেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠ্‌চে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎ শিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠ্‌চে—এই ত এষঃ, এই ত এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে নিজের কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীর ভাবে পূর্ণ করচেন, সেই যে অন্তহীন, জগতের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, সেই যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতা মাতা বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোট করে আপন হাতে আপনার মত করে গড়েছি তখন কি যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না? যখন আমরা বলেছি আমাদের পরম ধনকে সহজ করবার জন্যে ছোট করব তখনি আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি; তখন টুক্‌রো কেবলি হাজার টুক্‌রো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থাম্‌তে চায়নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্ম্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে, আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মত স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরতে কেবলি ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখ্‌লে নয়; আমাদের সীমাই হচ্চে আমাদের মৃত্যু, আরোর পরে আরোই হচ্চে আমাদের প্রাণ—সেই আমাদের ভূমার দিক্‌টি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়ত সাধনার দিক্—সেই মুক্তির দিক্‌কে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্ব্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোট করতে গিয়ে আপনার পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর এক বিপদে গিয়ে পড়ে, আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতেই পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবল মাত্র ছোট করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবল মাত্র বড় করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তাঁকে শুধু ছোট করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড় করে আমাদের শুষ্কতা। অনন্তং ব্রহ্ম অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড়, এবং বড় হয়েও ছোট। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এই জন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে ত তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতা মাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করচেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করচেন, আমাদের কথা শুন্‌চেন এবং শোনাচ্চেন, এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গ লোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে।

অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত

মানব-সম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনি একথা সত্য হয়েছে তখনি একথাও সত্য, যে, অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এই জন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর একদিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্ম্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক্ এবং নিকটের দিক্ দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয় তা অকল্যাণ হয়েছে। এই জন্যেই মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্চে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্য্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্ম্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্ম্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে; মানুষ যখন বড় বড় দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানব-জন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মত হয় কোনো পূর্ব্ব পিতামহের নয় নিজের জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্ম্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে, এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু তবু এই সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্ম্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে' কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করচে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে,

অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয় মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।

অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্যদিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলি রসে মজে থাকতে হবে না; জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্ম্মে পেতে হবে; তাঁকে আমার মধ্যে যেমন জানতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু-সমস্ত সৃষ্টি করচেন আবার আর একদিকে বলেছে স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যার দ্বারা যা-কিছু-সমস্ত সৃষ্টি করচেন। এ দুই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করচেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরচি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে!" সে আরো গেঁয়েছিল "আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে।" তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয় কিম্বা একথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে, যারা গাচ্চে তারা সাম্প্রদায়িক-ভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে। কেন না, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্য-ভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই ত, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠ্‌চে? ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন, স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক্ গভীরভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েইত মানুষকে তৈরি করে তুলেচেন; সেই জন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় একটি কাকে অনুভব করচে। সেই জন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে "খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কমনে আসে যায়!" আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জান্‌তে পারচি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যেরে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রেরণ ও সর্ব্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করচে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে। অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের

ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ ত আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে ত কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে, ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌তে হচ্চে, "আমার মনের মানুষ কেরে, আমি কোথায় পাব তারে?" সে যে কে তা ত আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূলরকম করে ভুলিয়ে রাখলে জান্‌তে পারবনা—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলি জানা, সে জানা কোনো-খানে এসে বদ্ধ হবে না। "কোথায় পাব তারে?" কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ত পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া। মানুষ এমনি করেই ত আপন মনের মানুষের সন্ধান করছে—এমনি করেই ত তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌চে, যতই তাকে সে পাচ্চে, ততই বল্‌চে, "আমি কোথায় পাব তারে"। সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য-টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই যে একটি চির-বিরহ আছে এ বিরহ ত কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই ত এর পূর্ণতা হতে পারে না; জ্ঞানে কর্ম্মেও এই বিরহ ডাক দিয়েছে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে যে দিকেই মানুষ বলেছে আমি চিরকালের মত পৌঁচেছি, আমি পেয়ে বসে আছি, এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই গান যে তার চিরকালের গান, "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে?" এই প্রশ্ন যে তার চির-দিনের প্রশ্ন—"মনের মানুষ যেখানে, বল কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?" কেননা সন্ধান ও পেতে থাকা একসঙ্গে; যখনি সন্ধানের অবসান তখনি উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর-এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ—কোনো অনন্ত তত্ত্বকে ত পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল; এতে কি কোনো অপরাধ হল, এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল? কিছু মাত্র না। কেননা আমার ঘর ছেড়ে তিনি ত শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি

যে সকলরকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনা-গোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক এক ভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘরভরা অসীমকে, আমার সেই জীবনভরা অসীমকে আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, সেইটেই আমার চরম ডাক, সেই জন্যেই আমার ঘর, সেই জন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, সেই জন্যেই আমার জীবনের যত কিছু জানা, যত কিছু পাওয়া। তাই ত মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক—কিন্তু এই ডাকই মানুষ একেবারেই মিথ্যা করে তোলে, যখন এই ছোট অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড় অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা বলে পিতা বলে কেবলমাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না—যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফল লাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু এ ত কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্ব্বলতাকে লালন করবার জন্যে তাকে পিতা বলা নয়। সেই জন্যেই বলা হয়েছে পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার মধ্যে উদ্বোধিত করতে থাক। এ বোধ ত সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে ত চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে দেশ থেকে দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্যই প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে, পিতা। সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠ্‌বে, সমস্ত লুব্ধ স্বার্থকে লজ্জিত করে ডেকে উঠ্‌বে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু, পিতার বোধকে উদ্বোধিত কর যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, দেশের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে উঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণ-কীর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে সেই সমগ্র-মানবের সমস্ত-কালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসব-দেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায়চ ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিব-তরায় চ, তুমি সুখরূপে আনন্দকর তোমাকে নমস্কার তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার, তুমি নব নবতর কল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরব গণিতবেত্তা আবু'ল-ওয়াফা

মধ্যযুগে মোসলেম জগতে যে সকল প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল, তন্মধ্যে আবু'ল-ওয়াফা একজন বিখ্যাত জ্যামিতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইনি 'ত্রিকোণমিতি' শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য গণিত-বেত্তারা গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহাঁকে উচ্চ-স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই গণিতবিশারদ পণ্ডিতের পূর্ণ নাম আবু'ল-ওয়াফা মোহম্মদ এবে মোহম্মদ এবে এহিয়া এবে ইস্‌মায়েল এবে আব্বাস অল-বজ্জানী। ইহা খুব সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় যে, ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্য দেশবাসী ছিলেন। আবু'ল-ওয়াফা ৩২৮ হিঃ সনের রমাদান মাসের ১লা তারিখে (৯৪০ খৃঃ, অঃ ১০ই জুন) খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত নেশাপুরের নিকটবর্ত্তী একটি বৃহৎ পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর পিতৃব্য আবু আম্‌র্ অল্ মোঘাজিলী ও আবু আব্দ আল্লাহ্ মোহম্মদ বিন আন্-বাসাই ইহাঁকে প্রথমে গণিতশাস্ত্র শিখাইয়া-ছিলেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিত (আবু আমর্ অল্-মোঘাজিলী) আবার এহিয়া'ল মেরওয়াজী (বা মাওয়ার্দ্দী) ও আবুল আলা'বিন কর্ণিবের নিকটেই রেখাগণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। হিঃ ৩৬৮ (৯৫০ খৃঃ অঃ) সালে আবু'ল-ওয়াফা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এরাকে গিয়া বাস করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বোগদাদেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এইখানেই হিঃ ৩৮৮ রজব মাসে (জুলাই, ৯৯৮ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এবে-অল্-আসির ও এবে খল্লিকান (এবে-অল্-আসিরের মত অনুসরণ করিয়া) লিখিয়াছেন যে, তিনি হিঃ ৩৮৭ (বুধবার, ৯৯৭ খৃঃ) মৃত্যুলাভ করেন।

গণিতবেত্তা আবু'ল-ওয়াফা 'ফি এস্তেখ্-রাজ অল-আওতার' নামে বৃত্তাংশ সমূহের জ্যাগুলির ফল বাহির করিবার প্রণালী (the manner of finding the value of the chords of arcs) সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন।

এবে-অল-কিফ্‌তীর 'তারিখ-অল্-হোক-মা'তে ইহাঁর গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্ট হয়ঃ—

(১) 'মনাজীল',—একখানি উৎকৃষ্ট পাটীগণিত বিষয়ক গ্রন্থ।

(২) অল-খোয়ারিজ্‌মীর—বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থের টীকা।

(৩) ডাওফেণ্টসের বীজগণিতের টীকা।

(৪) এবে এহিয়ার—বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থের টীকা।

(৫) 'মোদ্‌খীল'—পাটীগণিত সূত্র।

(৬) 'কেতাব অল-বরাহিন ফি'ল-কদায়া ফিমাস্তমালাহু দাওফেন্তস্ ফি কেতাবিহী' (ডাওফেণ্টস্ কর্ত্তৃক তাঁহার গ্রন্থে প্রযুক্ত (বা ব্যবহৃত) নিয়মাবলীর প্রমাণ।

(৭) 'কেতাব এস্তেখ্‌রাজ মবলঘ্‌ ইল কা'ব বি-মাল মাল ওয়া মা এয়াতরক্কাব মিনহা' (the obtaining of the amount of the cube by a double multiplication and of the other combinations effected by the operation)

(৮) ষষ্টিতম সংখ্যার তালিকা বিষয়ক (on the sexagesimal table) একখানি গ্রন্থ।

এই সকল গণিতগ্রন্থ ব্যতীত আবু'ল-ওয়াফা জ্যোতিষশাস্ত্র ও ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুই তিনখানি আজও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে :—

১। 'কেতাব ফি মা এহতাজী এলাহী অল-কোত্তাব ওয়া'ল আম্মল মিন এল্‌ম্‌ অল-হেসাব' নামক একখানি পাটীগণিত বিষয়ক পুস্তক। এবে-অল-কিফ্‌তী কর্ত্তৃক 'কেতাব অল মনাজীল ফি'ল হেসাব' নামক যে পাটীগণিতক গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ইহাও সেই একই গ্রন্থ।

২। 'অল কেতাব অল কামিল', ইহার কতকাংশ ক্যারা ডি ভো (Carra de Vaux) কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

৩। 'কেতাব-অল্‌-হেন্দেসা' (একখানি জ্যামিতিক গ্রন্থ), কনষ্টান্টিনোপালে (আইয়া সোফিয়ায় আরবী ও পার্শী রক্ষিত গ্রন্থ, আর Woepcke কর্ত্তৃক সমালোচিত পারিস লাইব্রেরীর জ্যামিতিক অঙ্কন বিষয়ক পার্শীগ্রন্থ, এই দুইই সম্ভবতঃ একই বলিয়া বোধ হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ইউক্লিড, ডাওফেণ্টস ও অল-খোয়ারিজ্‌মীর টীকাগুলির, বা 'আল-ওয়াজীহ' নামক তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রমূলক তালিকারও কিছুই পাওয়া যায় না। তবুও ইহা অতি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, ফ্লোরেন্স (লরেণ্ট), পারিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কোন এক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত 'অল-জিজ-অল-শামিল' নামক জ্যোতিষিক তালিকামালা আবু'ল ওয়াফার তালিকাবলী হইতেই সংগৃহীত।

অতএব পণ্ডিতপ্রবর আবু'ল ওয়াফা যে কেবল গণিত-শাস্ত্রেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনিই টাইকোব্রাহীর (Tycho Brahé) পূর্ব্বে চন্দ্রকলার তৃতীয় অসামঞ্জস্যতা (বা গতি) (third inequality on the moon's surface) আবিষ্কার ও পৃথিবীর বৃত্তাভাস পথের মধ্যভাগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তজ্জন্য একজন অতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ নামে পরিচিত এবং পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের অজ্ঞাত কতকগুলি সিদ্ধান্তের (corollary) প্রমাণ করায় একজন প্রসিদ্ধ জ্যামিতিজ্ঞ পণ্ডিতের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। আবু'ল-ওয়াফা জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার্থ, হিঃ ৩৭৬ (৯৮৬ খ্রীঃ) 'মোরসদ-ই-বুজ্জানী' বা বুজ্জানীর মানমন্দির নামে একটি পর্য্যবেক্ষণিকা স্থাপিত করিয়া খগোল মণ্ডলের বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

যাহা হউক, তিনি কি জন্য পাশ্চাত্য গণিতবেত্তা-গণের নিকট পরিচিত ও কি জন্যই বা পাশ্চাত্য গণিতবেত্তারা তাঁহার নিকট ঋণী আছেন, তাহা আধুনিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও গভীর গবেষণাকারী—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত

মুঁসো সুতের (M. Suter) কর্ত্তৃক লিখিত ও 'এন্সাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম' গ্রন্থে প্রকাশিত 'আবু'ল-ওয়াফা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"ত্রিকোণমিতিকে অধিকতর উন্নত করাতেই আবু'ল-ওয়াফার বিশেষ যোগ্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ত্তুলিক ত্রিকোণমিতি, এরূপ কথিত 'চতুর্ব্বিধ নিয়ম' ('rule of the four magnitudes') (Sine a : Sine c = Sine A : 1) এর ও ট্যানজেণ্ট উপপাদ্যের (tan. a : tan. A = Sine b : 1) সাহায্যে ম্যানিলসের প্রতিজ্ঞার সহিত একটি পূর্ণ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের সমকোণী ত্রিভুজের পরিবর্ত্তন করায় আমরা তাঁহারই নিকট ঋণী আছি; এই চারিটি সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে তিনি আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;—Cos. c = Cos. a Cos. b. সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে বক্রকোণ বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের নিমিত্ত সাইন প্রতিজ্ঞা স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাইন ৩০´ অংশ সংক্রান্ত অঙ্কের প্রণালীর জন্যও (যাহার ফল ইহার প্রকৃত উত্তরসহ ৮ দশমিক পর্য্যন্ত মিল হয়) আমরা তাঁহারই নিকট ঋণী আছি। তাঁহার জ্যামিতিক অঙ্কন গুলিও অতি প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে, ত্রিকোণমিতিতে ট্যানজেণ্ট, কো-ট্যানজেণ্ট, সেক্যাণ্ট, কো-সেক্যাণ্ট প্রবর্ত্তিত (বা প্রথম ব্যবহার) করার নিমিত্ত প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে; যেহেতু এই সকল প্রক্রিয়া (functions) ইতিপূর্ব্বেই হাবাশ অল-হাসিব নামে পরিচিত আহম্মদ বিন আব্দ আল্লাহেরও জানা ছিল।"

কিন্তু অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনিই প্রথমে ট্যানজেণ্ট, কো-ট্যানজেণ্ট, সেক্যাণ্ট ও কো-সেক্যাণ্টের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই এই সকল প্রক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কারক। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌ গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করিতেছেন যে, এই সকল ত্রিকোণমিতিমূলক প্রক্রিয়া ইহাঁর পূর্ব্বে আরব গণিতজ্ঞ আহম্মদ বিন আব্দ আল্লাহ্‌ই জ্ঞাত ছিলেন। যাহা হউক, ইনিও একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 'অল-হাসিব' ('গণিতবেত্তা') এই উপাধি-সূচক নামেই পণ্ডিত সমাজে পরিচিত।*

মোহম্মদ কে, চাঁদ।

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল—

(1) Rt. Hon. Syed Ameer Ali, P. C., LLD, *The Spirit of Islam.*
(2) Ibn Khallikan, *Biographical Dictionary*, (De Slane's Translation Vol. III).
(3) Rouse Ball, W. W, *History of Mathematics.*
(4) Clement Huart, *A Short History of Arabic Literature.*
(5) M. Suter, 'Abu'l Wafa' in the *Encyclopædia of Islam.*
(6) M. Sedillot, 'খোলাসাতে তারিখ-অল-আরব', ইত্যাদি।

বীরের নারী

উঠানে শুধু পা দিয়েছে
ঘোড়ায় থেকে নামি'
সোয়ার পরে সোয়ার এল,
চরণ গেল থামি'।
রাজার কড়া হুকুম হ'ল,
'যুদ্ধে চল যুদ্ধে চল'
যেমন এল তেম্‌নি গেল—
রইনু চেয়ে আমি।

কপাল বেয়ে ঘামের ঝোরা
ঝর্‌তেছিল যে,
সোজা হ'য়েও দাঁড়াইতে
পারছিল না সে।
সাধ্যবিহীন নয়ন দু'টি
মুখের পানে রইল ফুটি',
বুকের ব্যথা বক্ষে লুটি
গুম্‌রে গেল রে!

রাজদ্রোহী নই ত আমি,
বিরোধ নাহি জানা,
রাজার কাজে জীবন দেবে—
করিনে তায় মানা।
আমি শুধু ভাব্‌ছি রাজা,
নির্দ্দোষীরে এ কোন্ সাজা?
যুগান্তরের পরে দেখা—
এই কি দেনা পা'না!

হয়ত তারে শুতে হবে
দূরে—অনেক দূরে,
রাঙা হবে সেথার মাটী
তারি শোণিত ঝুরে।
গেল—একটা চুমার আঁকো,
গণ্ডে তবু পড়্‌ল নাকো!—
এরি গর্ব্বে বীরের নারী,
বেড়াস্ তোরা ঘুরে!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

আত্মদানের আকুলতা

(জালালুদ্দিন রুমী হইতে)

ওগো সুন্দর রথী,—ওগো সুন্দর শিকারী,
আঁখি বাণে বিঁধ' হৃদয় হরিণ, মানসকাননবিহারী॥
ওগো—নিশি নিশি তোমা লাগিয়া
চাঁদের মতন জাগিয়া,
তনু মন ক্ষীণ হয় দিন দিন তব পথপানে নেহারি,
হারাইয়া দাও তোমার আলোকে হে রবি গগনবিহারী॥

প্রভু—তব পথপানে ছুটিয়া,
ভূতলে উপলে লুটিয়া,
এ নদী, কান্ত, হয়েছে শ্রান্ত তোমার চরণ ভিখারী
উচ্ছল চল জোয়ারে টান গো উত্তাল কলবিহারী॥
ওগো সুন্দর রথী—ওগো সুন্দর শিকারী,
তব প্রেমজালে বন্ধন কর চঞ্চল চিত আমারি।

শ্রীকালিদাস রায়।

অদ্ভুত যাদুঘর

সাসেক্সের (Sussex) অন্তর্গত ব্রামবার (Brambar) নামক স্থানে এক পুরাতন প্রাসাদদুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি নূতন ধরণের চিত্তাকর্ষক যাদুঘর আছে। সেখানে ইতর প্রাণীদিগকে নানাপ্রকার সুচারু বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া এক একটি হাস্যজনক দৃশ্য রচনা করা হইয়াছে। এরূপ যাদুঘর ইংলণ্ডের মধ্যে আর কোথাও নাই। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের নিকট ইহা একটি আশ্চর্য্যজনক পরীর রাজত্ব বিশেষ। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও ইহার দর্শনীয় বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হন এবং রচয়িতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মৌলিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ইতরপ্রাণীদিগের দ্বারা এরূপ নীরব কৌতুক দৃশ্যের অভিনয় প্রদর্শিত করিবার মতলব এই যাদুঘরের বৃদ্ধ সত্ত্বাধিকারী Mr. W. Patterএর মস্তকে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইহা-দিগকে লইয়া প্রথম "Death and burial of Cock Robin" সংক্রান্ত বিষয়টির দৃশ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অবসর সময়ে তিনি ইহা করিতেন এবং ইহা সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার সাত বৎসর লাগিয়া-ছিল। এই বিষয়টি একটি ছেলে ভুলান ইংরেজী ছড়া মাত্র। এই গল্পস্থিত সমস্ত দৃশ্য গুলি এরূপ চমৎকার ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলেই রচয়িতার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একশত রকমের বিলাতী পাখী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আগাগোড়া সকল বন্দোবস্তই মৌলিকতাব্যঞ্জক!

প্রথম বারে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগের সহিত ব্রতী হইলেন। ১নং ছবিতে "The Kittens' croquet Party" রচিত হইয়াছে। আটটি বিড়াল ছানা croquet খেলিতেছে। প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে দর্শকগণ আনন্দের সহিত খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। এই



আটটি বিড়াল ছানা 'ক্রকে' খেলিতেছে

সঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত যে এই সকল বিভিন্ন দৃশ্য রচনায় চেয়ার টেবিল প্রভৃতি যাহা কিছু সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হয়

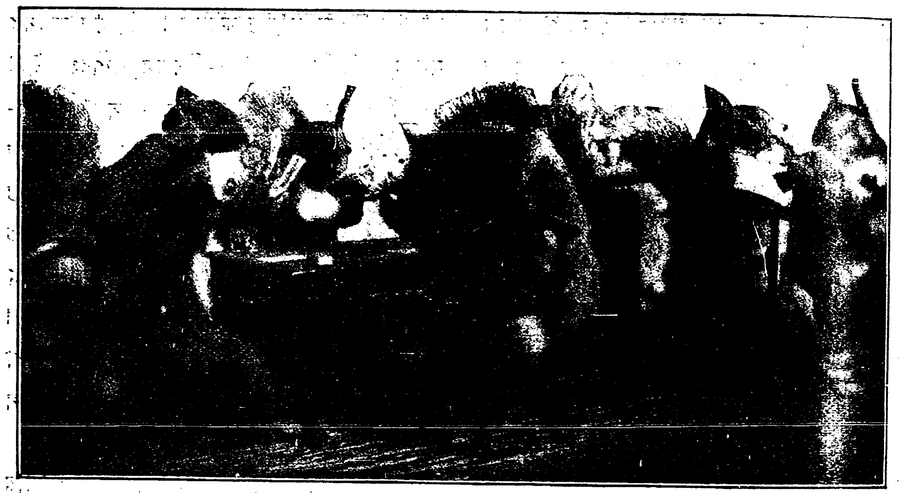

কতকগুলি কাঠবিড়ালী তাস খেলিতেছে

অপরাপর সভ্যগণ সংবাদপত্র পড়িতেছে, ধূমপান করিতেছে কিংবা মদ্যপান করিতেছে। অপর দৃশ্যে (৩নং ছবি দ্রষ্টব্য) একদল ইঁদুর dominoe খেলিয়া ও ধূমপান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে।

৪নং ছবিতে খরগোসের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের



একদল ইঁদুর 'ডোমিনো' খেলিতেছে

Mr. Patter স্বহস্তে সে সব প্রস্তুত করিয়া লন। ২নং ছবিতে কতকগুলি কাঠবিড়ালী তাস খেলিতেছে; ক্লাবের



খরগোসদের গ্রাম্য বিদ্যালয়

একটি দৃশ্য রচিত হইয়াছে। আমাদের বিদ্যালয়ের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্য আছে। এই ছবির সমস্ত খরগোস ৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিল। কেহ খাতায় হাতের লেখা পাকাইতেছে, কেহ অঙ্ক কষিতেছে, কেহ বা পাঠে মনোনিবেশ করিতেছে। একজন পড়া না করায় বা কোন অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য শাস্তি পাইয়া পশ্চাতে বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আর শিক্ষক মহাশয় সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্লাসের কার্য্যসমূহ তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত এই যাদুঘরে আরও অনেক গুলি হাস্যোদ্দীপক মনোরঞ্জক দৃশ্য আছে। তাহাদের মধ্যে "The House that Jack built" শীর্ষক সর্ব্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ গল্প "The Guinea Pig's cricket match" এবং "The Kittens' Wedding" এই তিনটি বিষয় লইয়া রচিত দৃশ্যাবলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দৃশ্যে, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, মোরগ, প্রভৃতির বেশভূষা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও রমণীয় হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে cricket ম্যাচে খেলোয়াড়গণই যে কেবল খেলিতেছে তাহা নহে, বাজনদারগণ সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজাইতেছে, দর্শকগণ বিশ্রামাগার হইতে অতীব কৌতুহলজনক দৃষ্টিতে খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাদের মুখের ভাবভঙ্গী সবই ঠিক মনুষ্যের ন্যায়। বিবাহোৎসব সংক্রান্ত দৃশ্যটি অতীব সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে ২০ জন সুন্দরাকৃতি বিড়ালশিশু যোগদান করিতেছে।

যাদুঘরের অবশিষ্ট দর্শনীয় দ্রব্যসমূহ বিবিধ প্রকারের। একটি মাছরাঙ্গা পাখীর



বিপন্নকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে

সাতটি ডিম রহিয়াছে। একটি ছাগলের পৃষ্ঠদেশে একটি বানর চড়িয়া রহিয়াছে; এবং একটি ইঁদুর তাহার সঙ্গীকে কল হইতে উদ্ধার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। (৫নং ছবি দ্রষ্টব্য)

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গোলাম কাদির ও ইসলাম বেগ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে যাঁহারা হিন্দুস্থানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য দুইটি ব্যক্তির নামেই এই প্রবন্ধটীর নামকরণ করা গেল। ইঁহাদের মধ্যে ইসলাম বেগ পারস্য জাতীয় ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত সেনাপতি মহম্মদ বেগ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসের শেষে লালসাউত যুদ্ধে নিহত হন। অপর জন জলিত খাঁ নামক দুর্দ্দান্ত রোহিলার পুত্র। তিনি দোয়াবে পিতার ক্ষুদ্র সর্দ্দারগিরিটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা ইঁহাকে রোহিলা-নবাব নামে অভিহিত করিব। এই রোহিলা-নবাব একজন বুদ্ধিমান ও কষ্টসহিষ্ণু যুবাপুরুষ এবং ইসলাম বেগ সৈন্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভীক সাহসী এবং তৎকালিক অশ্বারোহী সেনাগণের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্ম শেষে এই নেতাদ্বয় মারাঠাগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল্লি আক্রমণে ধাবিত হইলেন। সিন্ধিয়াও এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। তিনি পুণারাজশক্তি-প্রেরিত নূতন সৈন্যের বলে শক্তিমান হইবেন, এই ভরসায় বুক বাঁধিলেন; এবং সেই নূতন সৈন্যদলের

আগমন প্রতীক্ষায় নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মারাঠানেতাগণের সমবেত শক্তির প্রকৃত পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। মারাঠাদলন এবং যে সমস্ত প্রদেশ তখনও রাজশক্তিকে এক আধটু মান্য করিত, সেই সব স্থানে ইসলামীয় ক্ষমতার পুনঃস্থাপন করাই রোহিলা-নবাব এবং ইসলাম বেগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইসলাম-সৈন্য আগ্রা ও মথুরা জয় করিয়া বসিল, এবং রোহিলা-নবাব বীরদর্পে দিল্লি নগরীতে পদার্পণ করিলেন ও তথা হইতে ক্ষুদ্র মারাঠা সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। পারিষারিক হিসাবের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রোহিলা-নবাব সম্রাট-দরবারে পরিচিত হইলেন। তিনি "আমির-উল-ওমরা" বা প্রধান মন্ত্রীত্বের প্রার্থনা করিলেন; এবং প্রাসাদে প্রধান মন্ত্রীর জন্য যে স্বতন্ত্র আবাস নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, যখন বেগম সমরু ইউরোপীয় সেনাপতিগণ পরিচালিত সৈন্যদল সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি নদীর অপর পারে আপনার সেনানিবাস 'শাদরে' প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং দিন কয়েক কোনরূপ সাড়া শব্দ দিলেন না।

যুদ্ধ বিগ্রহ ও ব্রিটিসঅধিকারের দাবী রাজপ্রাসাদকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রাসাদের ঠিক সম্মুখে এক অতি বিস্তৃত আঙ্গিনা; তাহারই একপ্রান্তে কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য সম্রাট উপবেশন করিতেন। ইহারই পশ্চাতে আর একটী প্রাঙ্গণ, যে প্রাঙ্গণের উপর নয়নপ্রীতিকর বিখ্যাত দেওয়ানী খাস আদালত। চুণবালি-নির্ম্মিত অট্টালিকাটী নানা কারুকার্য্য-খচিত হইয়া আরও মনোরম আরও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। আর এই অট্টালিকার বাহিরের অংশে উপরের এক-স্থানে লালা রুক্ষের সেই চিরপরিচিত সংক্ষিপ্ত প্রশংসালিপি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে,—

স্বর্গ ব'লে কোন কিছু যদি থাকে ভবে,
এই সেই এই সেই এই সেই তবে।

কিন্তু এই স্বর্গ, এই আনন্দধাম ইতঃপূর্ব্বেই নিরানন্দে ভরিয়া গিয়াছে; সেই সুন্দর ময়ূর-সিংহাসন, ইহার অমূল্য মণি-মরকত সে সময় পারসিকগণের হস্তগত; আর সেই পৃথিবী-বিখ্যাত, ভারত-পূজিত মোগল-পাদসা তখন তাঁহারই প্রদত্ত ক্ষমতায় স্ফীত হৃদয় রাজকর্ম্মচারীগণের অনুগ্রহের পাত্রমাত্র! হায়, কালের কি ভীষণ পরিণাম! কাল যে ছিল রাজা আজ সে ভিখারী!!

বর্ণিত প্রাসাদ অংশকে রোহিলা-নবাব আপনার বাসস্থানে পরিণত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু অম্বজি নামক মারাঠা কর্ম্মচারীর সহিত বেগম সমরুর প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহার এইরূপ ক্রমিক অনধিকার প্রবেশ এই স্থানেই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোহিলা-নবাব যখন দেখিলেন যে, সমরু আর একটী প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে তখন তিনি এই গোলযোগ আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলেন। ফলে, তাঁহার ঈপ্সিত পদটী তিনিই প্রাপ্ত হইলেন। উভয় সেনাদলকে তুলিয়া লওয়া হইল। শাহ ধাতুময় তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন, তদ্দ্বারা নিজের শরীররক্ষক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন—এবং কেবল মাত্র

এই সৈন্যের উপরই তাঁহার দেহ রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। এই সময় ইসলাম বেগ বলিষ্ঠ মারাঠা রক্ষী সেনাদলের দ্বারা রক্ষিত আগ্রানগরী অবরোধের চেষ্টা করিলেন। রোহিলাও তাঁহার সহিত মিলিবার আশায় অগ্রসর হইলেন। দুরন্ত হিমানী শেষে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের মধু মার্চ্চ মাসে নূতন সৈন্যাদির সমাবেশের পর, সিন্ধিয়া বাহ্য ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করতঃ চম্বল নদী পার হইয়া ঢোলপুরে আসিলেন। তিনি আগ্রা প্রবেশের পূর্ব্বেই সম্মিলিত মসলেম শক্তি তাঁহাকে ২৪শে এপ্রিল তারিখে ভরতপুর হইতে এগার মাইল দূরে চক্ষণ নামক স্থানে আক্রমণ করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ বৈগ্‌নের উপস্থিতি সত্ত্বেও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে সিন্ধিয়ার জীবন রক্ষক রাণ খাঁ এ সংগ্রামে রাজপক্ষের সেনাচালনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। মোস্‌লেম অশ্বারোহী সেনাগণ যেন একটা অজ্ঞাত শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিল; মারাঠা সৈন্যদিগের দ্বারা গঠিত তিনদল পদাতিক, শত্রুর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। এমন কি জাট্ অশ্বারোহীগণও কিছু করিতে পারিল না।

এইরূপে পরাজিত হইয়া রাণ খাঁ গোয়ালিয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রোহিলা নবাবও আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। শিখগণ রোহিলারাজ্যের উত্তর পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দেশকর্ত্তাকে ভয় দেখাইলেও ফলে কিন্তু শিখেরাই পশ্চাৎ তাড়িত হইয়াছিল,—যদিও এই আক্রমণফলে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত শরণপুর জেলাকে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে দুইপুরুষেরও বেশী সময় আবশ্যক হইয়াছিল। রোহিলা এবং বেগ পুনরায় তাঁহাদের সৈন্য একত্রিত করিলেন। এই নবগঠিত সৈন্যদলের এক অংশ আগ্রায় রাখিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তাঁহারা মহানগরীতে পৌঁছিলেন। এই সময়ে শাহ রাজপুত রাজন্যবর্গকে স্বীয় করতলগত করিবার জন্য রাজপুতানায় গমন করেন, কিন্তু তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য হইতে আগত নূতন সেনাবলে বলীয়ান হইয়া সিন্ধিয়া আগ্রা অবরোধ করিলেন। এই সম্মুখযুদ্ধে ফতেপুরসিক্রির জীর্ণ প্রাসাদ সমীপে ইস্‌মাইল বেগ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; এবং গোলাম কাদিরের সঙ্গে দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। সিন্ধিয়ারাজ তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি লক্ষদাদকে আগ্রা রক্ষণের ভার দিলেন; এবং তাঁহার পল্টনের ক্ষুদ্র এক অংশ সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লিতে পাঠাইয়া দিয়া মথুরার সেনানিবাসে অবশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোস্‌লেম নেতাগণ 'শাদরে' শিবির সন্নিবেশ করিল। শিবিরে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে নেতৃযুগল শাহের সেনাপতিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। ফলে মোগলসেনাদলও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিল; গোঁসাঞিদের নেতা হিম্মত আপন সেনাদলকে ফিরাইয়া লইলেন। এইরূপে সম্রাট সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে, মিত্রদ্বয় নদী পার হইয়া দিল্লিতে প্রবেশ করিলেন; এবং নগররক্ষণ দুর্গ ও রাজকীয় প্রাসাদ জয় করিয়া বসিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মৌসুম প্রারম্ভে

তাঁহারা পৃথক হইলেন। রাজধানীর দক্ষিণে পুরাতন সহরটীতে বেগ তাঁবু ফেলিলেন। রোহিলা এই মহানগরীর পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র দরিয়াগঞ্জে আপনার দলবল রাখিয়া, জীর্ণ রাজপ্রাসাদে স্বয়ং বাস করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ কার্য্য নির্ব্বাহের সমস্ত ভার নিজেদের উপর গ্রহণ এবং মারাঠাশক্রর হস্ত হইতে নিজেদের মুক্তির জন্য তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রোহিলা-নবাবের প্রসাদের বাসের আর একটুকু মৎলব ছিল। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, রাজপ্রাসাদে নিশ্চয়ই লুক্কায়িত ধনরাশি আছে, এবং একটু চেষ্টা করিলেই তিনি তাহার অধিকারী হইতে পারিবেন।

২৯শে জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং অট্টালিকা সমূহের তলদেশ খনন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত ধনরাশি মিলিল না। তখন তিনি শাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মহিলাগণকে বিরলবাস হইতে টানিয়া বাহির করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে ছাড়িয়া দেওয়া হইল,—অপমানের চূড়ান্ত আরম্ভ হইল। ১০ই আগষ্ট তারিখে অপমানিত, নিপীড়িত সম্রাটকে রাজসিংহাসনস্থিত রোহিলানবাবের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। সম্রাটকে গুপ্তধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্পষ্ট বাক্যে কহিলেন, সম্রাট কখনও মিথ্যা কহিতে জানে না, তাঁহার প্রাসাদে কোনও লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার নাই। শাহের একথায় সন্দেহ করিবার কিছু না থাকিলেও, রোহিলা-নবাব এই উত্তরে সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার দলের কয়েকজনের সাহায্যে সম্রাটকে ভূতলে পতিত এবং ছুরিকাঘাতে পার্থিব সম্পদের শ্রেষ্ঠ উপাদান চক্ষু হইতে তাঁহাকে চির জীবনের মত বঞ্চিত করিলেন। হায়, কি শোচনীয় পরিণাম!

তারপর একটী অসহায় সাহাজাদাকে নামে মাত্র বাদসাহ করা হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোহিলাই সম্রাট হইলেন। সময়ে তাঁহার স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, দিল্লিসিংহাসনে উপবেশন করিয়া নিজের মুখস্থিত তাম্রকূটের ধূম্ররাশি ঘৃণাভরে তাঁহার হস্তের ক্রীড়াকুন্দকস্বরূপ নব সম্রাটের মুখে দিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার শাস্তি গ্রহণের সময়ও ক্রমে নিকটতর হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার বিস্তৃত সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগস্থিত সাধু সেনাপতিটি এক্ষণে তাঁহার ঘৃণিত সমরসাথীকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং বেগের প্রস্থানান্তর আগ্রা ও মথুরার মারাঠাগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। এদিকেও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাজপ্রাসাদ বিলাসভোগের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল।

ক্রমে ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিল। অনশনে লোক মরিতে আরম্ভ করিল। তবুও অত্যাচারের বিরাম নাই। অবশেষে যখন আর জীবন রক্ষার উপায় থাকিল না, তখন তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে—সদলবলে যমুনার পারে প্রস্থান করিলেন।

সাধু সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রোহিলা-নবাব আর রাণ-খাঁ এবং বৈগ্‌নের শিক্ষিত পদাতিক সৈন্যদলের সম্মুখীন্ হইতে

সাহসী হইলেন না। ১১ই আক্টোবর তারিখে তিনি রাজপ্রসাদে অগ্নি সংযোগ করিলেন, এবং হস্তীপৃষ্ঠে নদীপার হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার কার্য্য নিষ্ফল হইল। যথা সময়ে রাণ খাঁ এবং তাঁহার অগ্রবর্ত্তী রক্ষিসেনা উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করত, শাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। 'পুতুল' সম্রাট এবং প্রাসাদের খাস অধ্যক্ষ রোহিলার অসদভিপ্রায় নির্ব্বাহ করিবার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। রাণ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রোহিলার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু রোহিলা নবাব ইতঃপূর্ব্বেই নিমাট দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই দুর্গ তাঁহার রাজ্য-প্রবেশের প্রধান দ্বার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নয়টী সপ্তাহ ধরিয়া তিনি বীরপুরুষের ন্যায় দুর্গ রক্ষা করিলেন। যদিও এক পক্ষে তিনি অত্যন্ত হীনপ্রকৃতির ছিলেন, তবুও তাঁহাতে সাহসের অভাব ছিলনা। কিন্তু রোহিলা-নবাব দুর্গটী আর রক্ষা করিতে পারিলেন না; এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া শিখদেশে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই শিখদেশেই ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহোদরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। একদিন রজনী যোগে খিড়কীর দ্বার পথে মণিমরকত পরিপূর্ণ জিন্‌থলি-আঁটা অশ্বের উপর চড়িয়া তিনি পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। তিনি পথভ্রান্ত হইয়া অশ্ব সহিত একটী গর্ত্তে পতিত হইলেন। কতিপয় গ্রামবাসী তাঁহাকে ধরিয়া রাণ খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। সিন্ধিয়ার আদেশ ক্রমে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইবার পর তাঁহার ছিন্ন ভিন্ন দেহখানি দিল্লিতে পাঠান হইল; এবং অন্ধ সম্রাটের সম্মুখে দেহখানি স্থাপিত হইল। বৈগ্‌নের একজন কর্ম্মচারী মণি-মরকতগুলি পাইয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাকুরী ছাড়িলেন, এবং সম্ভবতঃ ঐ ধন-সম্ভার লইয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া গেলেন।

রাজদ্রোহিতা, লোভপরায়ণতা এবং নিষ্ঠুরতা এই তিনটী অপরাধের সংমিশ্রণে রোহিলা-নবাব দোষী ছিলেন। তাঁহার ভীষণ অত্যাচার যে কোন যুগের ধর্ম্মজ্ঞানকে আহত করে। একদিন কোরাণ স্পর্শ করত প্রতিজ্ঞা করিয়া এই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির রোহিলা নবাব বলিয়াছিলেন যে, তিনি চিরকালই অসহায় দিল্লীশ্বরকে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার সেবা করিবেন। তাই দীর্ঘকাল পরে যখন কঠোর উপহাসে বিদ্ধ করিবার জন্য রোহিলা নবাব অন্ধ শাহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি এক্ষণে কি দেখিতেছেন, তখন শাহ উত্তর করিয়াছিলেন,—"তোমার আর আমার মধ্যে সেই ঐশ-সাক্ষ্যের ব্যবধান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এই হেয় বিশ্বাসঘাতকতার উপরেও রোহিলা নবাব আরও অনেক নির্দ্দোষীকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সম্রাটকে সবংশে নির্ব্বংশ করিবার জন্য পলায়নের পূর্ব্বে প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। এইনিষ্ঠুর কার্য্য সমুদয় সম্পাদন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক-মতে, এগার বৎসর পূর্ব্বে ইহার পিতা জলিত খাঁ দুর্দ্দান্ত রাজদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া পলায়ন কালে নিজ পরিবারবর্গকে এক দুর্গে রাখিয়া যান। দুর্গ পরহস্তগত হইল। তাঁহার পুত্র

রোহিলানবাব রাজকীয় প্রাসাদে নীত, এবং জেনানার বালকভৃত্য নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত হইতে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই যাতনাই নাকি শেষকালে তাহাকে ভীষণ প্রতিশোধ লইতে বাধ্য করিয়াছিল। অপর মতে, তাঁহার ধীশক্তি চিরকালই অসংযত ছিল, এবং ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শেষ অবস্থায় একদিন তিনি সম্রাট পরিবারবর্গকে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহারা নাচিতে লাগিলেন। কিছু পরে তিনি নিদ্রা যাইবার ভাণ করিয়া সিংহাসনে হেলিয়া পড়িলেন। আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নর্ত্তন-শীল রাজপরিবারবর্গকে এরূপ সুবিধা দেখিয়াও তাঁহার জীবনের উপর লক্ষ্য না করায় কাপুরুষ বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অপর এক সময়ে, তিনি দেবতার প্রত্যাদেশের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া আপনার পাপের বোঝা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম-কালে আগ্রা হইতে আসিবার সময় যখন প্রখর সূর্য্যতাপ অসহনীয় হইয়া পড়িল, তিনি পথিপার্শ্ববর্ত্তী কোন উপবনে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটী স্বর্গদূত তাঁহার অন্তর্ব্বিদ্ধ করিয়া কহিতেছেন, "উঠ, দিল্লিতে যাও এবং প্রাসাদটী আপনার জন্য অধিকার করিয়া লও।" যাহা হউক, শাহ রোহিলা-নবাবকে নির্দ্দয় শঠতার প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি সময় সময় একটী কবিতার আবৃত্তি করিয়া তাঁহার কারাদুঃখ কথঞ্চিৎ লাঘব করিতেন।—

যে স্তন্যে সাপের দেহ করে পুষ্টি লাভ,
তারেই আঘাত করা সাপের স্বভাব।

রোহিলা নবাবের তুলনায় তাহার সহকারী ইস্‌লাম বেগের পরিণাম অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় এবং কম ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। তিনি সিন্ধিয়ার সেনাধ্যক্ষ রাণ খাঁর সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দিল্লি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ বেগের ন্যায় স্বাধীনচেতা একজন বীরের পক্ষে মারাঠা সেনাবিভাগে আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার খুল্লতাতের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মারাঠা সেনাদলে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পর আর কেহ কখন তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখে নাই। ইহার পর দশ মাস কাল তিনি মধ্য যুগের সাহসী সেনাচালক-দিগের ন্যায় জীবনের আর একটী বীরত্ব-পূর্ণ অধ্যায় অতিবাহিত করেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন মোগল অশ্বারোহী সেনাগণকে তিনি আপনার পতাকা তলে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সৈন্য বলে বলীয়ান হইয়া বেগ্‌ আবার একটী নূতন বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন, এবং শক্তিমান্ মারাঠাশক্তি তাঁহার নিকট হইতে রাজ-করের দাবী করিলে তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

দেশ কাল এবং পাত্র বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার বিদ্রোহের পতাকা কিছু দিনের জন্য আবার অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে পুলক স্পন্দনে কম্পিত হইয়া উঠিল। দামামা

দুন্দুভির উত্তেজনাপূর্ণ জয়ধ্বনিতে বহু-ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ডকে ধ্বনিত করিয়া যুদ্ধবর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়া বেগ সসৈন্যে সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য-দলের উপরে পতিত হইলেন। সিন্ধিয়াসৈন্য প্রথমে এই প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু পরক্ষণে বেগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শেষযুদ্ধে সিন্ধিয়াই জয়লাভ করিল। বেগের অবশ্যম্ভাবী শেষ দশা নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি আত্মরক্ষার জন্য কনৌন্দ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। দুর্গস্বামিনী, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সঙ্গী গোলাম কাদিরের বিধবা ভগিনী, দুর্গটী অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই মহিলাটি এই সময়ে সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ পেরণ রণবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে না আসা পর্য্যন্ত তিনি দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেগের সাহায্যে তাঁহার উৎসাহও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই শত্রুদিগের ভীষণ আক্রমণে তিনি রণক্ষেত্রে বীর রমণীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করেন।

বেগেরও আর যুদ্ধ চালাইবার ইচ্ছা ছিল না। জনৈক য়ুরোপীয়ের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষা করা হইবে এই অঙ্গীকারে ইসলাম বেগ আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে বন্দীরূপে আগ্রায় লইয়া আসা হইল। সেখানে দুর্গের উচ্চতম স্থানে একটী জীর্ণ অট্টালিকাতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অট্টালিকাটী দানসাহ নামক একজন জাঠের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিত। এই অট্টালিকাতেই ইসলাম বেগের স্বল্পকালস্থায়ী শেষ জীবনটুকু অতিবাহিত হইয়াছিল। যদিও তিনি বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইতেন না, তবুও এই বন্দী অবস্থা, এই নির্জ্জীবতা তাঁহার ন্যায় চঞ্চল কর্ম্মঠ জীবনের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় ছিল।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ অজ্ঞাত।

শ্রীযতীশগোবিন্দ সেন।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৫)

বাজিরাও পুণার শেষ পেশওয়া। নানা ফর্ণবীস যতদিন মন্ত্রীরূপে রাজ্যের হাল ধরিয়াছিলেন ততদিন রাজ্যতরী নানা সঙ্কটের মধ্যে একপ্রকার নিরাপদে চলিয়াছিল। পুণা দরবারে তিনি একমাত্র বিচক্ষণ কর্ণধার ছিলেন। ইংরাজদের প্রতাপ ও সত্যনিষ্ঠার উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অতবড় প্রবল শত্রুকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংরাজদিগকে সাধ্যমত দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাজিরাওএর আমলে নানা ফর্ণবীস রাজ্যের হিতকামনায় পেশওয়াকে নিঃস্বার্থ ভাবে সৎপরামর্শ দিতে সর্ব্বদাই



বাজীরাও ১ম

তৎপর ছিলেন। কিন্তু রাজা যখন অব্যবস্থিত ব্যসনাসক্ত দুর্ব্বুদ্ধি, তখন মন্ত্রী আর কত পারিয়া উঠিবেন?

যশবন্তরাও হোলকর

১৮০০ সালে নানার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর অরাজকতা উৎপন্ন হইল। পেশওয়ার শাসন নির্জ্জীব ও অন্তঃসারশূন্য, চতুর্দ্দিকে বিপ্লব, যে যেখানে পারে সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা সাধিয়া লইতে তৎপর। বৎসরেক পরে আর এক নূতন বীর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—যশবন্তরাও হোলকর। সিন্ধিয়া এতদিন হোলকরকে বশে রাখিয়াছিলেন, যশবন্তরাও সহসা স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে সমুত্থান পূর্ব্বক সিন্ধের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবন্তের রণকাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এইস্থলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি।

হোলকর বংশ

হোলকর বংশ আসলে ধনসর (গয়লা) জাতীয় মারাঠা। পুণাসন্নিহিত নীরানদী তীরবর্ত্তী হোলগ্রামে তাঁহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের কুলনামের উৎপত্তি। হোলকর বংশের মুখোজ্জ্বলকারী মহ্লার রাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে খান্দেশে তাঁহার মামার মেষপালক ছিলেন।

মহ্লার রাও ১৬৯৩—১৭৬৯

একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় এক বৃহৎ অজগর সর্প তাঁহার মুখের উপর আতপত্ররূপে ফণা ধরিয়া থাকে। এই শুভলক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া তিনি অশ্ব চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি একজন মারাঠী সর্দ্দারের নিকট ঘোড়সোয়ারের কর্ম্ম পান। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ১৭২৪ সালে বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বের অশ্বপতি, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমি সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। ১৭৩২ সালে তিনি পেশওয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে মালবের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাভব করেন। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মালব বিজয়াস্তর সিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়া লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। এইরূপে তাঁহার রাজ্য ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল। পাণিপতের যুদ্ধে যে অল্প কয়েকজন মারাঠী বীর ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, মহ্লাররাও তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি ঐ যুদ্ধে বড় একটা যোগ দেন নাই—তাহার কারণ এইরূপ রাষ্ট্র যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ পরামর্শ দেন মারাঠী সেনাপতি সদাশিব ভাউ "গয়লার কথা কে মানে" এই বলিয়া সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার পরামর্শ এই—পাঠানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের দলবলকে বিবিধ উপায়ে হায়রাণ করা—বল অপেক্ষা কৌশলে তাহাদের দমন করা—পলায়নচ্ছলে অরিদল আকর্ষণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাহাদের উপর হল্লা করা; "ত্বরায় অনর্থ, বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি" এই তাঁহার উপদেশ। এই সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি তাড়াতাড়ি রণে মাতিয়া গেলেন, শীঘ্রই তাহার বিষম ফলভোগও করিলেন। পাণিপতের যুদ্ধের পর মহ্লাররাও মধ্যহিন্দুস্থানে স্বরাজ্যের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করেন—তাঁহার তাহাতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেন না মহ্লার রাও উদারচেতা, বিনয়ী অথচ দৃঢ়মতি, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব, রাজ্য শাসনেও সেইরূপ তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অহল্যাবাই

মহ্লাররাওএর পুত্র খণ্ডেরাও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার পৌত্র মালিরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী। মালিরাও নির্ব্বুদ্ধি ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। মালিরাওএর মৃত্যুর পর তাহার মাতা খ্যাতনামা অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকাজিরাও তাঁহার সেনাপতি। উভয়ে মিলিয়া অশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতা সহকারে ৩০ বৎসর কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তুকাজীর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে মাণ্ডপুরা শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশের তত্ত্বাবধান করা, করদ রাজ্য সকল হইতে কর আদায় করা, এ সকল অহল্যাবাই করিতেন। যখন তুকাজী উত্তর হিন্দুস্থান পরিদর্শনে গমন করিতেন, তখন মালব নিমার প্রভৃতি প্রদেশের সমগ্র কার্য্যভার রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত—সমুদায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শাসন বিস্তৃত। রাজকোষ তাঁহার হস্তাধীন—রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব নিয়ম পূর্ব্বক রক্ষিত হইত। কোন গুরুতর রাজকার্য্য উপস্থিত হইলে তুকাজী রাজ্ঞীর পরামর্শ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না এবং পররাজ্যে যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিতে হইত, তাহা অহল্যাবাই স্বয়ং করিতেন। তাঁহার অনুপম নয়কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা-গ্রন্থির কোন শৈথিল্য ঘটে নাই। এদিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের সুখশান্তিবর্দ্ধনেও তাঁহার অশেষ যত্ন। একদিকে অতিরিক্ত করভার হইতে রায়ৎদের অব্যাহতি দান, অন্যদিকে জমিদারদের স্বত্বরক্ষণ, এই দুইদিক রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্ঞী যেরূপ প্রজাবৎসলা, প্রজারাও তাঁহাকে নীতিপ্রজ্ঞা-মূর্ত্তিমতী জননী সমান শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে আদালত পঞ্চায়ৎ অথবা মন্ত্রীবর্গের বিচারে সঁপিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য দরবারে ন্যায় বিতরণ করিতেন—যাহার যে কোন আবেদন তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন, শক্তের ভক্ত হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় পীড়ন অনুমোদন করিতেন না, স্ত্রীজন-চিত্ততোষী তোষামোদও তাঁহাকে ন্যায়মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজ্ঞী মহারাষ্ট্র দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৭৯৫ অব্দে ষাট বৎসর বয়সে সংসার যাত্রা হইতে অপসৃত হন। সেনাপতি তুকাজিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু কি করেন—

সে বয়সে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না, কিন্তু তাহা না হইলেও তাহাকে মহ্লাররাওএর পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। প্রথম মারাঠী সমরে তুকাজী হোলকর ও মহাদাজী সিন্দে উভয়ে মিলিয়া একমনে কার্য্য করেন। শেষাশেষি তাঁহাদের পরস্পর বৈমনস্য ও বৈরভাব সংঘটন হন। মহাদাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তুকাজী পরলোকগত হয়েন।

তুকাজীর চারি পুত্র। কাশীরাও ও মহ্লাররাও দুই পত্নী-গর্ভজাত—যশবন্ত ও বিঠোজী দুই দাসী পুত্র। কাশীরাও মহ্লাররাও দুই ভায়ে রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি; জ্যেষ্ঠের সহায় দৌলতরাও সিন্দে, কনিষ্ঠের পক্ষে নানা-ফর্গরীশ। একবার দুই ভায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয় কিন্তু সে চেষ্টার, কোন ফল হইল না। যে দিনে দুই ভ্রাতা তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধন স্থাপন করিলেন তার পরদিনেই মহ্লাররাও সিন্দিয়ার সৈন্য হস্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহ্লাররাওএর পক্ষ ছিলেন, তিনি এই গোলযোগে পলায়ন করিয়া নাসপুর রাজার শরণাপন্ন হইলেন। সেখানে শরণ লাভ দূরে থাকুক তাঁহার ভাগ্যে কারা লাভ ঘটিল—দেড় বৎসর পরে বহুকষ্টে পলায়নে মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওএর নামে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মারাঠা, রাজপুত, পাঠান, ভিল, পিণ্ডারী প্রভৃতি লোক হইতে ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ইউরোপীয় রণপণ্ডিতদের সাহায্যে এই ফৌজ হইতে রণদক্ষ শিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। আমীর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সর্দ্দারের সাহায্য পাইয়া তাঁহার বল পুষ্ট হইল; দুইজনে মিলিয়া সিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর লুটপাট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরিশেষে ১৮০২ সালে পুণাগগনে ধূমকেতুর ন্যায় সহসা সসৈন্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পুণা আক্রমণের এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বিঠোজী কোন এক বিদ্রোহাচরণে ধরা পড়িয়া দণ্ডনীয় হন, বাজীরাও তাঁহাকে হাতীর পায়ে বাঁধিয়া নির্দ্দয়রূপে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। সিন্ধিয়ার রাজ্য লুণ্ঠন স্থগিত রাখিয়া যশবন্তরাও প্রতিশোধ তুলিবার মানসে পুণার দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য পেশওয়া ও সিন্ধে উভয়ে আলিবেল ঘাটে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তিনি আর একদিক দিয়া ঘুরিয়া সৈন্য হস্ত এড়াইয়া পুণার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে আসিয়া তাম্বু গাড়িলেন। দুই দিন পরে দুই সৈন্যের সংঘর্ষণ। ঘোরতর সংগ্রামের পর যশবন্ত জয়ী হইলেন। সিন্ধিয়া কামান ও অন্যান্য জিনিষপত্র ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুণার পথ উন্মুক্ত। পরদিন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণল ক্লোজ সাহেব হোলকরের সহিত সাক্ষৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন কর্দ্দমাক্ত ক্ষত বিক্ষত শরীরে অন্ধবীর * এক ক্ষুদ্র তাম্বুতে শয়ান, ঠিক যেন শরশয্যাগত ভীষ্মদেব। হোলকর কর্ণল সাহেবকে পুণায় থাকিবার জন্য বিস্তর

* ইতিপূর্ব্বে ঘটনা ক্রমে দৈবাৎ বন্দুক ছুটিয়া যাওয়াতে একচক্ষু হারাইয়া ছিলেন।

অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিবার ঔৎসুক্য দেখাইলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ না মানিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। হোলকর তখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ণ অবকাশ পাইলেন ও মনের সাধে নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।

বাজিরাও হোলকরের বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে সিংহগড়, সিংহগড় হইতে রায়গড়, রায়গড় হইতে রত্নগিরির সমীপস্থ সুবর্ণদুর্গ, পরিশেষে ব্রিটিষ পোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে বাসীনসন্ধি।

বাসীনসন্ধি ৩১ ডিসেম্বর ১৮০২

এই সন্ধিযোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল। সন্ধির মর্ম্ম এই, ইংরাজেরা পেশওয়াকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া দিবেন, —পেশওয়া স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিষ সৈন্য পোষণ করিবেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহাতে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হয় এমন ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সন্ধি বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরূপে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া বাজিরাও পুণায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মসনদ প্রাপ্তি ঘোষণার্থে ১৯ তোপধ্বনি হইল। প্রকৃত-পক্ষে এ তাঁহার সম্মানার্থে নহে, ইহা ইংরাজ-দের রাজ্যলাভসূচক জয়ধ্বনি।

বাজিরাও সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়া যে বিশেষ কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। কায়দা নাই, কানুন নাই, কোন প্রকার শাসন নাই—প্রজাদের যে ভয়ানক দুর্দ্দশা তাহা কহতব্য নয়, পুণার আশপাশ পল্লীগ্রাম সকল দস্যু তস্করের আবাস —রাজপুরুষেরা তাহাদের লুটের ভাগী ও প্রশ্রয় দাতা। পেশওয়ার নিজের রাজ্য শাসনের ক্ষমতা নাই। পুণা দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্ত্তারও নাম গন্ধ নাই। বাজিরাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসী ছিলেন, তাঁহার নিজের আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। আদালত নাম মাত্র—যাহার পয়সা তাহারই জয়।

ত্রিম্বকজী

দুর্ভাগ্য ক্রমে ত্রিম্বকজী জাঙলিয়া নামক এক ব্যক্তি আবার তাঁহার মোসাহেব ও দুর্ম্মন্ত্রী আসিয়া জুটিল। যেমন রাজা তার উপযুক্ত মন্ত্রী। যেমনটি চাই বাজীরাও তেমনি ভৃত্য পাইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়াড় সরকারের মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিবাদভঞ্জন কার্য্যে পুণায় আগমন করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রীর আগমন পেশওয়ার মনঃপূত হয় নাই। তাই বাহিরে যতই ভদ্রতাচারণ করুন ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। বাজীরাওয়ের নিমন্ত্রণে শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই দুজনের একত্রে পান-ভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় শাস্ত্রী বিঠোরা

মন্দিরে পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পেশওয়ার মধুরালাপে প্রীত হইয়া যেমন মন্দিরের বাহির হইলেন অমনি জল্লাদের খড়্গাঘাতে ব্রাহ্মণের অপঘাত মৃত্যু। এই ব্রহ্মহত্যার মূল প্রবর্ত্তক ত্রিম্বকজী। কিন্তু পেশওয়া যে নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন তাহা নহে—তাঁহাকেও সত্বর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিরাওয়ের রাজ্যে শাসন ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট এলফিনিষ্টন

সুবিচক্ষণ এলফিনিষ্টন সাহেব তখন পুণায় ব্রিটিষ কার্য্যকর্ত্তা। ত্রিম্বকজী এই হত্যা-কাণ্ডের মূলপ্রবর্ত্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এলফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠান। বাজিরাও প্রথমত ইতস্তত করেন, পরে তাড়া পাইয়া অগত্যা প্রিয়তম ত্রিম্বকজীকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন—ত্রিম্বকজী থানার দুর্গে বন্দী রহিলেন। তাহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকি পাহারা। কতকদিন পরে তিনি ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক পাহাড় পর্ব্বতে অদৃশ্য ভাবে ফিরিতে লাগিলেন।

বাজিরাও এইক্ষণে ইংরাজদের তাড়াইবার নানান্ পন্থা দেখিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে সিন্দে হোলকর নাগপুর রাজা পিণ্ডারী দস্যুদল, এই সকল লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্য জাতীর মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ উদ্দেশে ত্রিম্বকজীকে অর্থ সাহায্য জন্য পাঠানো হইল। এলফিনিষ্টন সাহেব চর-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন, বাজিরাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতেছেন—রাজ্যকে কি ঘোর সঙ্কটে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। তাহাতে যখন কোন ফল হইল না তখন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল "ত্রিম্বকজীকে দেশান্তরিত করিতে হইবে যদি না কর তাহা হইলে ইংরাজদের সঙ্গেই নিশ্চয় যুদ্ধ বাধিবে। এই বেলা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেও এবং এই করারের বন্ধক স্বরূপ দুর্গত্রয় আমাদের হস্তে রাখিয়া দেও নইলে পুণা এখনি সৈন্য বেষ্টিত হইবে।" পরে পেশওয়াকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো কঠোর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। অবশেষে গবর্ণর জেনেরালের আদেশ ক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে নির্ম্মূল।

পুণার সন্ধি ১৮১৭

বাজিরাও ইংরেজদের সঙ্গে বলে পারিয়া উঠিবেন না বিলক্ষণ জানিতেন; তাই প্রকাশ্যে কোন শত্রুতাচরণ করিতে পারেন না, গোপনে সৈন্য সংগ্রহে নিরস্ত হইলেন না। বাজিরাও যে মতলবে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া এলফিনিষ্টন তাড়াতাড়ি বোম্বাই হইতে একদল ইউরোপীয় ফৌজ আনাইয়া পুণার ক্রোশ দুই দূরে খিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারম্ভ।

খিড়কী যুদ্ধ ৫ই নবেম্বর ১৮১৭

ইংরাজদের সৈন্যবল সবশুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তন্মধ্যে ৮০০ ইউরোপীয় সেনা। মারাঠীদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০, পুণা হইতে খিড়কীর পথ পর্য্যন্ত সেনায় সেনায় আচ্ছাদিত। বাপু গোখ্‌লে মারাঠী সেনাপতি। গোখলে একদল সিপাহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছাবাছা অশ্বচালনা করিলেন—সওয়ারেরা মহারোখে হল্লা করিয়া চলিল—সেই সঙ্গে নয়মুখী কামান-ব্যাটারি হইতে গুলিগোলা বর্ষিত হইল। এই অশ্বচাল চালনে আশানুরূপ ফললাভ হইল না, বরং উল্টোৎপত্তি হইল। দুই সৈন্যের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মতন ছিল, কতকজন সোয়ার প্রথম ঝোঁকে তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল, কতক বা গুলি খাইয়া ধরাশায়ী হইল—অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটিয়া গেল। সওয়ারদের পরাভবে মারাঠী সেনারা এমন দমিয়া গেল যে আর কেহই এগোইতে সাহস করিল না। সন্ধ্যার মধ্যে এই বিপুল সৈন্য সশরীরে অন্তর্ধান। ইংরাজেরা রিপু-শূন্য সমরক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্য ক্ষতি, মারাঠীদের ৫০০ লোক মারা পড়ে। পেশওয়া সেনা-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পার্ব্বতী মন্দির হইতে খিড়কীর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সূর্য্যোদয়ে তাঁহার সৈন্যদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশপূর্ণ—সূর্য্যাস্তের মধ্যে সে সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

He counted them at break of day,
And when the sun set where were they?

প্রভাতে গণিয়া সেনা হরষে বিহ্বল,
ভানু যবে অস্তাচলে কোথায় সে বল?

বাজিরাও-এর গ্রহ মন্দ। ইংরাজদের প্রসাদে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন—ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন।



পার্ব্বতী মন্দির

১৫ই নবেম্বর ব্রিটিষ সৈন্যের পুণা অধিকার, তখন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদের করতলন্যস্ত হইল। নববর্ষারম্ভে পুণার অনতিদূর কোরেগামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজপ্রতাপের দ্বিতীয় বার পরিচয় পাইয়া বাজীরাও সেই যে স্বদেশ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন, আর ফিরিলেন না। দেশ দেশান্তরে তাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি সরজন

মালকমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং অতঃপর উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত বিঠুরে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রধার দুরাচার নানা সাহেব এই বাজিরাও-এর পোষ্যপুত্র। শতবর্ষায়ত পেশওয়া বংশ তাঁহাতেই বিলীন হইল। পুণা ও পুণার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল।

আহমদনগর

আহমদনগর দক্ষিণ প্রদেশের একটি নামাঙ্কিত নগর। মোগল যুগে ইহার পত্তন হয়। বিপ্লবের মধ্যেই ইহার জন্ম ও বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া কিরূপে ইহা ব্রিটিষ্ রাজ্যের অধীন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনো মোগল যূপ স্কন্ধে বহন করে-নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে আল্লাউদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। ইহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল পরাক্রান্ত 'বামন্' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর আহমদ-নগর গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান রাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু-রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহার বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র সাহাজি-হানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল-রাজ্য ভুক্ত হয়।

সুলতান বহ্মান নিজাম সার মৃত্যুর পর আহমদ নগর দুই দলে বিভক্ত হয়; সুবিখ্যাত চাঁদবিবি তন্মধ্যে একদলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল-সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র দুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেক-কাল খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নন। সম্রাটের আদেশ ক্রমে মোরাদ আহমদ নগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন।

চাঁদবিবি

আহমেদনগর আক্রমণ কালে সুলতানা চাঁদবিবি যে অসাধারণ বীরত্ব ও দেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাতে তাঁহার নাম ও অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার আত্মীয় বিজাপুর সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু সুলতান সময় মত আসিতে পারিলেন না। চাঁদবিবি একলাই তাঁর বিচ্ছিন্ন সৈন্যবল একত্রিত করিয়া মোগলবলের বিপক্ষে কটীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে যুবরাজ মুরাদ সৈন্য-সামন্তে নগর বেষ্টন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত, কিন্তু রাণী কিছুতেই বিচলিত হইবার নন। প্রত্যহ অশেষ সঙ্কটের মধ্যে

কেল্লা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বলাধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন। মোগলখণিত দুইটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহা প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৃতীয় আর একটা সুড়ঙ্গ ছিল তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালাইবার পূর্ব্বেই শত্রুগণ তাহা উড়াইয়া দেওয়াতে সেই সঙ্গে অনেক দুর্গপালবিনষ্ট হইল, প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখা গেল, লোকেরা প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত চাঁদবিবি কবচ ধারণ পূর্ব্বক মুখের উপর একটা ঘোমটা ফেলিয়া খোলা তরবারে সেই স্থানে গিয়া উৎসাহ বাক্যে সকলকে ডাকিয়া আনেন—তাঁহার দৃষ্টান্তে ভীরুও সাহস পাইল, গুলি গোলা তীর যাহা কিছু ছিল শত্রুদের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য পিছু হটিয়া গিয়া সেদিনকার মত নিরস্ত হইল। চাঁদবিবি সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছেন। পরদিন প্রাতে মোগলেরা দেখিতে পাইল প্রাচীরের ছিদ্র অনেকটা বুজিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ, নূতন সুড়ঙ্গ না করিলে আর প্রবেশের পথ নাই। যুবরাজ ভাবিলেন গতিক বড় ভাল নয়, প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যদি বহ্রাড় (Berar) প্রান্ত দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদবিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। যুবরাজ ও অল্পস্বল্প ফললাভে সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে, ফিরিয়া গেলেন। সুলতানা সেবারকার মত যেন কোনপ্রকারে নিস্তার পাইলেন কিন্তু সে অল্পকালের জন্য। তাহার দুই বৎসর পরে মোগলেরা ফিরিয়া আসিয়া আবার নগরের উপর হল্লা করিল। এবার রাজ্ঞী আর শত্রু-হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। তিনি দেশ-রক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু তাহার উপর আবার গৃহ বিচ্ছেদ; চাঁদবিবি দেখিলেন এবার আর রক্ষা নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই গোলযোগে একজন বিদ্রোহী সৈনিকের হস্তে রাণী প্রাণ হারাইলেন; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রু হস্তে নিপতিত হইল।

চাঁদবিবি ভারতবীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের



চাঁদবিবি

সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী—তাঁহার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি সুলতানার নামে যে একটি স্তুতিগীত রচনা করেন তাহা এই স্থলে ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। †

সুরকাননে অপ্সরা—আছে নানা,
নরভবনে রূপবতী—কত আছে।
বিজাপুরের রাণা চাঁদ—সুলতানা,
রূপে সবাই হার মানে—তাঁর কাছে॥
সদা সাহস ধ্রুব তাঁর—ঘোর রণে,
গৃহে শান্তি দয়া যেন—শোভমানা।
আহা, করুণা কত তাঁর—দীনজনে,
বিজাপুরের রাণী চাঁদ—সুলতানা॥
যথা ফুলের মাঝে চাঁপা—সেরা মানি,
তরু মাঝারে সহকার—সবে জিতে।
তথা রাণীর মাঝে রাণী—চাঁদ রাণী,
কেবা পারে গো তাঁর গুণ—বাখানিতে॥
যিনি জননী সম স্নেহে—স্বভবনে,
মোরে বিদেশে পালিলেন—সযতনে।
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম—স্মরি সে কথা,
তাঁর চরণে সঁপিলাম—স্মরণ গাথা॥

আহমদনগর মোগল রাজ্য ভুক্ত হইল কিন্তু তাহা দিল্লীশ্বরের হস্তে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। দিল্লীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। মোগল হইতে মারাঠী অধিকার, পরে যখন পেশওয়াকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরাজেরা পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন, তখন আহমদনগরও ইংরাজরাজ্যে আসিয়া মিলিত হইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† বোম্বাই চিত্র পৃঃ ৩৩৯—৩৪৩।

নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম

সে আজ কত দিনের কথা—একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তিনজনে তেতালার ঘরের খাটের উপর কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া গল্প করিতেছিলাম। শ্রীমতী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী বলিলেন যে "দেখ আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করিলে দেশের ও জনসাধারণের অনেক কায করিতে ও করাইতে পারি। মনে কর তোমার স্বামী ডাক্তার,—কোন দরিদ্র বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাইতেছে তুমি স্বামীকে বলিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলে। কাহারও স্বামী ব্যারিষ্টার—স্বামীকে বলিয়া সুবিচারের প্রার্থী কোন দরিদ্রের তিনি কাযটী উদ্ধার করিয়া দিলেন।" সকল কথা মনে নাই কিন্তু বেশ মনে পড়ে সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে আমরা এই কথাবার্ত্তায় এমন নিমগ্ন ছিলাম যে কখন সে ঘর চাঁদের আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই। সে দিনের আর সব কথা ভুলিয়া

গিয়াছি কেবল সেই চাঁদের আলো মনে আছে আর মনে আছে তাহার অল্পদিন পরেই শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সখি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের কথোপকথন স্থলে সেদিন স্বর্ণকুমারী দেবী উপস্থিত ছিলেন না,—অথচ এই একই সময়ে এই স্ত্রীশক্তির ভাবটি তাঁহার মনে স্বতঃ জাগরিত হইয়া উঠে—এবং আমাদের কল্পনা জল্পনা তাঁহার যত্নে কার্য্যে পরিণতি লাভ করে। সখিসমিতি স্থাপিত হয়—১২৯৩ সালের বৈশাখে;—ইহার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েতে মেয়েতে আলাপ পরিচয় দেখাশুনা মেলামেশা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা—বিধবা রমণীকে সাহায্য করা, অনাথাকে আশ্রয়দান, ইত্যাদি।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। সে সময় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী কয়েকটী অনাথা বালিকাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়া সযত্নে তাহাদের লালনপালন ও লেখা পড়া শেখানর ভার লইয়া মাতাকে সাহায্য করিতেন। সে সব অনেক দিনের অনেক কথা, বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। সকল কথা মনেও নাই; কেবল মনে আছে শিল্প মেলার কথা—সে কি আনন্দ সে কি উৎসাহ! নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে অটল ধৈর্য্যের সহিত কায করিয়া কয়েক বৎসর পরে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন, আর সখি-সমিতি লোপ পাইল।

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী সখি-সমিতির একটী উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া মহিলাশিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এই আশ্রম হিন্দু বিধবা নারীর উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ কাল ৩০ জন হিন্দু বিধবা বালিকা ও রমণী হিন্দু আচার ব্যবহারে পালিত হইয়া লেখা পড়া ও শিল্পাদি শিক্ষা করিতেছে। ঝাড়ন গামছা সাড়ী রেশমী কাপড় মোজা গেঞ্জি লেস্ ও সদাসর্ব্বদা ব্যবহারের বস্ত্রাদি তাহারা নিজেরা প্রস্তুত করিতেছে।

একালে আমাদের দেশেও ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র যে কেহ জামা মোজা গেঞ্জি কোর্ত্তা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দোকানে দৌড়িতে হয়, যাঁহাদের ঘরে ছেলে পিলে আছে যাঁহারা সর্ব্বদা দর্জ্জির সহিত কারবার করেন, তাঁহারা জানেন সে কি বিষম ঝঞ্ঝাট! প্রথম ত দর্জ্জি কাপড় না চুরি করিতে পারে এ জন্য খরদৃষ্টি রাখা দরকার,—দ্বিতীয়তঃ অসম্ভব রকম মজুরী হাঁকিলে তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয়, সবশেষ ও শ্রেষ্ঠ ভাবনা দর্জ্জি কি যে তৈয়ার করিয়া আনিয়া তারিফ্ করিয়া দেখাইবে তার ঠিক নাই। যখন জ্যাকেট করিতে গিয়া বালিসের খোলটি হাতে ঝুলাইয়া ভারি প্রশংসায় চক্ষে সে দেখে ও দেখায় তখন হাড় শুদ্ধ জ্বালা করে। অনেকে বলিবেন, ওসব "বিলাসিতা" ছাড়িয়া দিলেই জ্বালা ঘোচে।—মেয়েদের বেলায় তা যেন হইল—আমরা যেন মাতামহী পিতামহীদের পরিচ্ছদের দৃষ্টান্ত অনুকরণের জন্য "ফিরে চল ফিরে

চল ভাই" বলিয়া গাইতে গাইতে ফিরিয়া যাইব; কিন্তু মোজা গেঞ্জি পাঞ্জাবী কামিজ চাপকান্ কোট প্যাণ্ট পুরুষদের নিত্য ব্যবহার্য্য সকলই ত চাহি। সুতরাং দেখা যাইতেছে মেয়েরা সেলাইএ অভ্যস্ত হইলে সংসারের বিস্তর ঝঞ্ঝাট কমিয়া যায়। ধনী দরিদ্র প্রত্যেক রমণীরই সেলাইএ দক্ষতা থাকা যে উচিত এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন।

শিল্পাশ্রমে যে কেবল বিধবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নহে, সধবা বালিকাগণও ইচ্ছা করিলে সেখানে গিয়া প্রত্যহ লেখাপড়া এবং শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন। মহিলাশিল্পাশ্রমের ছাত্রীগণ তাঁত বোনা হইতে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত জ্যাকেট ফ্রক রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে।

এমন যে আবশ্যকীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে তাহার আদর কই?

চিরদিন কল্যাণময়ী নারীর সুকোমল হস্ত ও স্নেহপ্রবণ হৃদয় সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের দেশে বিধবা হইলেই আর সে নারীর আদর থাকে না —তখন সেই কল্যাণময়ী সকলের চক্ষে চির অকল্যাণী বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যখন বিধাতার নির্ব্বন্ধে কল্যাণী নারী দৃঢ় বন্ধন মুক্ত হইয়া দশজনের সেবার জন্য নিজের হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পায়, তখন সেই বিধবা অকল্যাণী বলিয়া আত্মীয় জনের গলগ্রহ ও হতাদরের হইয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ জীবন মনে করিয়া কোনমতে দিন যাপন করিতে থাকে। এই সকল বিধবাদের জীবন যে ব্যর্থ নহে ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের যে কতখানি মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এইজন্য অর্থাভাবে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। সামান্য ।৹ মাসিক চাঁদা আদায় করিতে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয় তাহা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও কর্ম্মকর্ত্রীগণ বিলক্ষণ জানেন। এই পতি-পুত্রহীনা বিধবাগুলি যেন তাঁহাদেরি অবশ্য পোষ্য, দেশের আর দশজনের সহিত যেন কোন সংশ্রব নাই। এ যে দশজনের কায —তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? একটী ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে সে যে তোমাদের দশজনের কায করিয়া নিজে ধন্য হইবে—এই মাতৃস্বরূপিণী বালিকারা যে দেশের দশজনের সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে ইহা যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন তবে ইহার উন্নতি বিধানে মুক্ত হস্ত হইতে কি কুণ্ঠিত হইতে পারেন? আমরা অবরোধে বাস করি—নিজ নিজ পিতা পুত্র ভ্রাতা ও স্বামীর সংসারই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র,—তদভাবে নিকট আত্মীয় যদি স্থান দান করেন তবে কোনমতে মান রক্ষা হয় বটে, কিন্তু প্রাণ রক্ষা হয় অনেক কষ্টে!—এই পরের গলগ্রহ আপদকে কি কেহ স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে? এ দৃশ্য যে ঘরে ঘরে! এই জন্য এদানী অনেক ভদ্রঘরের দরিদ্র বিধবাকে হীনকার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতে দেখা যায়। আত্মীয়গণের নিকট দাসী বৃত্তি করিয়াও যখন অনেক স্থলে

মিষ্টভাবে আধপেটা জোটে না তখন অগত্যা পরের ঘরে দাস্যবৃত্তি করিতে যাওয়া ভাল বলিয়া মনে হয়।

পরের ঘরে দাসী বৃত্তি করিতে গেলে ভদ্র অভদ্র বিচার থাকে না, দরিদ্রতা অভদ্রতা নামে অভিহিত হয়, কাযেই হীন ব্যবহারে হীন বৃত্তিতে মনটাও কেমন নীচ হইয়া পড়ে। যে রমণী আজ ভ্রাতৃগৃহে স্থান পাইলে একাহারে অক্লান্ত পরিশ্রমে হাস্যমুখে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত—সে রাঁধুনি বৃত্তি গ্রহণে কেমন করিয়া তেলটুকু সরাইব কেমন করিয়া নুনটুকু সরাইব এই চেষ্টায় বিব্রত থাকে। বিলাতের কত শত নারী আজীবন কুমারী থাকিয়া নিজ উপার্জ্জনে ধর্ম্ম কর্ম্ম, পরের সেবা, কত কত কায করিয়া থাকে। কত মহীয়সী নারীর কথা শুনা যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কুমারী। আমাদের দেশে তাহা হইবার যো নাই। কিন্তু নাম মাত্র বিবাহ হইয়াছে—বালিকার সে দিনটার কথাও হয়ত মনে নাই এখন বিধবাও আছে, তবুও তাহারা কুমারী নহে বিধবা। এই সকল বালিকারা স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় এই জন্য বিশেষ করিয়া এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রায় ১৯।২০ জন সধবা বালিকাও প্রত্যহ আসিয়া শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া যাইত, তাহাদের জন্য তখন গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যেখানে প্রত্যহ সহস্রাধিক ছাত্রী আসা উচিত সেখানে এই ১৯।২০টি মাত্র ছাত্রী! ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এখনও কেহই তদ্দূর চিন্তা করেন না। যখন উন্নতি উন্নতি করিয়া দেশের আবাল বৃদ্ধ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন তখনও ইহারা বুঝিতে পারেন নাই যে প্রথমে গাছটির যত্ন করিলে তবে ফলটি ভাল পাওয়া যাইবে। এত অল্প ছাত্রীর জন্য যে ব্যয় হইত তাহা সমিতির পক্ষে সাধ্যাতীত হওয়াতে এখন আর দৈনিক ছাত্রী লইবার গাড়ী নাই। তবে ইচ্ছা করিলে কেহ নিজের গাড়ীতে গিয়া শিল্পশিক্ষা করিতে পারেন। পূর্ব্বে শিল্পাশ্রম কলিকাতার মধ্যেই ছিল,—এখন ল্যান্সডাউন রোডে উঠিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সকলেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী

স্বভাব

জানি যাবে কুসুম শুকায়ে,
তাপ গেলে হইবে শীতল,
সুখ আছে দুঃখ পিছে লয়ে,
বলীও সে হবে দুরবল।

জানি আছে জীবন মাঝারে
আমরণ বিরহ মিলন;
তবু বলি হাসি বারে বারে
তুমি আমি রব অনুক্ষণ।

শ্রীলীলাদেবী

চীনরমণীর প্রেমপত্র

একজন চীনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "চীনে রমণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না কেন?" তিনি কিছুকাল হতবুদ্ধি হয়ে থেকে বলেছিলেন "চীনের রমণী! তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেই না—তারা কেবল চীনেদের মাতা, সম্ভবতঃ এ ছাড়া তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু চিন্তাই করে না।"

সত্যই চীনের নারীসমাজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত—তারা তাদের স্বামীর ও পুত্রের পিছনে লুকিয়ে থাকতেই ভালবাসে, তবু প্রাচ্য জাতির পিতা মাতার প্রতি অগাধ ভক্তি আছে ব'লে তারা পুরুষের উপর অগাধ আধিপত্য বিস্তার করে আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশের রমণীর চেয়ে চীনের রমণীদের সম্বন্ধে খুবই সামান্য কথা জানা যায়। অন্য দেশীয় সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে তাদের কথা জানা একপ্রকার অসম্ভব। চীন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সাধারণত নীচজাতীয় চীনেদিগকে লইয়াই—কারণ ভ্রমণকারী অথবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত যাহাদিগের মেলা মেশা হয় তাহারা প্রায়ই সামান্য লোক। ভ্রমণকারীরা কুলী রমণী দেখেন অথবা নৌবিহারিণী নারীদের সম্বন্ধে কিছু শোনেন ও দেখেন—কিম্বা চা'র দোকানে শোভন পরিচ্ছদপরিহিতা নর্ত্তকী বালিকার অঙ্গসঞ্চালনে মুগ্ধ হন। কিন্তু প্রকৃত চীনে রমণী—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সংসার ধর্ম্ম এ সমস্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস নিম্নের পত্রগুলি চীনে রমণীর জীবনের কিছু পরিচয় দিতে পারবে। এগুলি চীনের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যখন প্রিন্স চুংএর সহিত ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পত্নী কুই-লি তাঁকে লেখেন।

চীনেও আমাদের ন্যায় ছেলেরা বিয়ে ক'রে পত্নীকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে আসে—সেখানে তাদের স্বামীর মাতার ইচ্ছানুসারে চলতে হয়। এঁরা ইচ্ছে করলে পুত্রবধূর পক্ষে স্বামীগৃহ নন্দন বা নরক দু'ই করে তুলতে পারেন। কুই-লির পিতা chihli'র শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইনি চীনের নবভাবের শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগী,—ইনি কন্যা ও পুত্রকে সমভাবে শিক্ষিত করেন। কুই-লি তাঁহাদের প্রদেশের বিখ্যাত কবি Ling-wing-pu'র নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এঁর নিকটেই ইনি কল্পনা ও ভাব বিকাশের ক্ষমতা লাভ করেন।

(১)

প্রিয়তম আমার!

পাহাড়ের উপরের বাড়ীখানি যেন তার সকল সৌন্দর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। আমার কাছে সবই শূন্য বোধ হচ্ছে, ছাদে উঠে অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের কনকরশ্মির পানে চেয়ে থাকি—তখন মনে পড়ে তুমি কাছে নাই—উদয়াস্ত এখন সবই আমার সমান, কিছুতেই আনন্দ পাই না।

তুমি কিন্তু ভেবো না আমি অসুখে আছি। তুমি এখানে থাকতেও যেমন কাজ কর্ম্ম করতুম—এখনও তেমনই করি—শুধু মনে হয় তোমার কথা,—তুমি কাজগুলো সুনির্ব্বাহিত দেখলে কত সুখী হতে! 'মে-কি' তোমার চেয়ারখানা সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কারণ সেটা নাকি বড্ডো ভারী—আমি তা বারণ করেছি, ঐ চেয়ারে তুমি বসতে—ঐখানে বসে ধূম পান করতে, বই পড়তে, আমি সব সময়ই তাই দেখতে পাই—ওখানা আমার নিকট কত প্রিয়—কত মধুর। 'মে-কি' ছাদের উপর সেই সরু ছোট্ট পাইন গাছটী এনেছিল—আমি সেটা

তাকে নীচে উঠানে রাখ্‌তে বলেছি। তুমি বলেছিলে—'ওগুলো যেন বাল্যেই ঘুণে ধরে বৃদ্ধের মত দেখায়। আমিও এক সময়ে টবের গাছগুলোকে বড় ভাল বাসতুম—কিন্তু এখন তোমার চোখে দেখতে শিখেছি। প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত তরুর চেয়ে মানুষের চেষ্টাকৃত কৃত্রিম অর্দ্ধাঙ্গ তরুর শোভা কিছুই নয়।

খুব বড় চিঠি লিখে ফেল্‌ছি যে তোমাকে! তুমি আমায় ৭ দিন পর পর চিঠি লিখতে বার বার বলে গিয়েছ—সংসারের কথা আমার কথা সবই জানতে চেয়েছ। তোমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী যেন এটা পছন্দ করেন না—যে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখি—তিনি বলেন তাঁদের সময়ে এ কেউ কল্পনাতেও আন্‌তে পারত না—আজকালকার মেয়েরা লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছে। প্রিয়তম—তোমার আফিসের খামগুলি যেমন নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেল তেমনই ভাবে এ চিঠি খুলো না—এ চিঠির এক একটা অক্ষরের সঙ্গে আমার হৃদয়ের এক একটা অংশ তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।

তোমারই—'কুই-লি।'

(২)

প্রিয়তম আমার!

প্রথম পত্রখানিতে শুধু দুঃখ নৈরাশ্যের কথাই ছিল; নূতন নূতন তোমাকে ছেড়ে মন কেমন হয়েছিল বুঝতেই পার? এক সপ্তাহ কেটে গেছে—অন্তরের দুঃখ শুধু আমিই জানি। তোমার মা ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে দিয়েছেন, পূর্ব্বে তিনি আমায় যেমন বালিকা ভাব্‌তেন—এখন আর তেমনটী ভাবেন না—এই ভেবে আমি বড় সুখী হয়েছি।

প্রথম যেদিন আমি স্বামীর সংসারে আসি সে দিনের কথা সদাই আমার মনে জাগে। আমার পক্ষে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে পিতা মাতা শুধু হাতে আমায় অন্যত্র পাঠাচ্ছেন না। বিবাহের মিছিল প্রায় ১ লি* দীর্ঘ হয়েছিল। আমি দেখ্‌ছিলাম—বহু কুলী আমার নূতন সংসারের জিনিস-পত্র বয়ে আন্‌ছে। ভারবাহীরা যখন বহু বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত রেশমী চাদর, বহুমূল্য আসবার পত্র নিয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল—আমি ভাবলুম সব আমার নূতন গৃহে যাচ্ছে—ভগবান করুন যেন আমিও সেখানে সকলের ভাল চোখে পড়ি। যথা-সাধ্য সাহস সঞ্চয় কোরে তোমার সম্মুখে দাঁড়ালেম—কেমন বেশ ছিল আমার মনে পড়ে—সোনার কাজকরা রেশমের পোষাক পরে—মুক্তাবাঁধা চুলগুলি নিয়ে ব্রেসলেট্‌ ও আংটি ভারাক্রান্ত হাতখানি নিয়ে এই বালিকা তোমার সম্মুখে তার সকল সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়াল বটে—কিন্তু ভয়ে সে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্‌ছিল। এই মাত্র সে পিতা মাতা—তার সব ভালবাসার জন ছেড়ে এসেছে—জানে না সে এখানে কেমন ব্যবহার পাবে—যদি সুনজরে না পড়ে তবে কত দিন অসহ্য যাতনা ভোগ করতে হবে?

আমরা যখন তোমার পিতামাতার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসেছিলাম—তখনই

* ১ লি প্রায় ⅓ মাইল।

সর্ব্ব প্রথম আমি স্বামীর মুখ দেখলাম—। তোমার কি মনে পড়ে—যখন ঘোমটা খুলে তুমি একদৃষ্টে আমার চোখের পানে চেয়ে ছিলে? আমি ভাবছিলাম্ "সে কি আমায় সুন্দরী দেখবে?" ভয়ে আমি তোমার দিকে ভাল কোরে চাইতেও পারি নি, এক মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়ে দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল আর তাকাতে পাল্লুম না—। সেই মুহূর্ত্তেই দেখেছিলেম—তুমি সুন্দর সুপুরুষ—চক্ষু দু'টী সুন্দর—বর্ণ উজ্জ্বল—দন্তপাঁতি মুক্তার মতো—আমি অন্তরে বড় সুখী হয়েছিলাম,—কারণ অনেক কনের কথা জানি যাদের বরের মুখ দেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয়েছে—কারণ—তারা বুড়ো এবং বড় কুৎসিত-স্বামী পেয়েছে। ভেবেছিলাম যদি এঁর সুনজরে পড়ি তবে কত সুখী হতে পার্ব্বো।—আমার বিশ্বাস যাঁদের ছেড়ে এসেছি—তাঁদের ভুলবার জন্যই তোমার পূজনীয়া মাতৃদেবী—আমার হাতে ভাঁড়ারের চাবি দিয়েছেন, তিনি বলেন, "যে সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকে সে দুঃখ করবার অবসর পায় না"—আমি সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকি। ভোরে উঠে—দেখি চুল ঠিক আছে কি না—তার পর এক পেয়ালা চা নিয়ে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। ভোরের ভোজন ব্যাপার মিটলে আমি পাচক ও চাকরকে সব জিজ্ঞাসা করি। মাছ তরকারী সব নিজে দেখে নি—এবং সব জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করি।

আমি চাবির গোছা নিয়ে ঘুরে বেড়াই—আর যখন ভাঁড়ারের দ্বার খুলি তখন আমার মনে ভারী আনন্দ হয়—কেন জানি না—বোধ হয় এইটা ভেবেই যে, এই গৃহের আমিই কর্ত্রী। চাকর বা ঝি কারো অসুখ হলে আমি সব কাজের বন্দোবস্ত ঠিক করে দেই—তার পর মালীর সঙ্গে বাগানে গিয়ে ফুল গাছ সব দেখি। পাহাড়ের গায়ে যে ফুলগুলি জড়িয়ে থাকে ঐগুলি আমি বড় ভালবাসি—। তুমি যে পথে গিয়েছিলে সেই পথের পানে একদৃষ্টে আমি চেয়ে থাকি।—সেই ভোরে তুমি সহরের দিকে যাত্রা কোরেছ—এই পথ দিয়ে আবার এই পথেই ফিরে আসবে—সেই আশায় চেয়ে থাকি।

তোমারই আশায় আছি—

তোমার ভালবাসার

আমি তোমারই——পত্নী—

(৩)

প্রিয়তম আমার!

দিনগুলি একই ভাবে কাটছে। তোমায় বলবার মতো নূতন খবর কিছুই নাই। সকাল বেলাটা সব গৃহস্থের মতো সাংসারিক কাজেই কেটে যায়। তার পর তোমার মা ঘুমুলে আমি ও তোমার ছোট বোন ছাদে যাই। মা-লি ও আমি সেখানে বহুক্ষণ সেলাইয়ের কাজ নিয়ে থাকি, আমরা কৃষাণদের খালের ভিতর থেকে কাদা উঠিয়ে জমিতে ছড়াতে দেখি—হংস-পালককে হাঁসের পাল নিয়ে লম্বা বংশদণ্ড হাতে কর্কশ কণ্ঠে হাঁসের পাল তাড়াতে দেখি। কখনও বা বিবাহের মিছিল যেতে দেখি—আবরণে ঢাকা কনের আসনখানি থেকে কনেটীকে দেখবার প্রয়াস অনেক সময়ই

ব্যর্থ হয়। কখনও বা শবযাত্রী দর্শন করি—মৃতের সঙ্গে কেউ হয় তো পয়সা ছড়াতে ছড়াতে চলেছে—মৃতের আত্মা তৃপ্তি লাভ কোরবে এই উদ্দেশ্যেই এ দান।

এস্থান এখন বড়ই সুন্দর। শরতের প্রকৃতি একটা নূতন সৌন্দর্য্যে দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে—এখনই শীতের ভয়ে ভীত হয়ে পতঙ্গকুল যেন তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সঙ্গীতটুকু শেষ কোরে নিচ্ছে। বন্য হংসীরা দক্ষিণাভিমুখে যাচ্ছে। কিছুই যেন ভাল লাগে না—চক্ষু আমার অজ্ঞাতসারে জলে ভরে আসে,—কেন বুঝি না—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সকাল সন্ধ্যা তোমার বিহনে কিছু ভাল লাগে না আমার,—এ দীর্ঘ দিন কি ফুরাবে না—

তোমারই—সেই।

(৪)

প্রিয় আমার!

তোমায় অনেক কথা বলতে যাচ্ছি। এর পূর্ব্বের পত্র পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অসুখী হয়েছ—এ পত্রে আশা করি তুমি সুখী হবে। তোমার ভাই সি-পের বিবাহ শীঘ্রই হবে। তুমি জান chih-lea শাসনকর্ত্তার কন্যা লি-টির সঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার ভ্রাতার বিবাহ স্থির হয়ে রয়েছে—কনে শীঘ্রই এখানে আসছে। আমরা তার সব বন্দোবস্ত কচ্ছি। জানিনা তার সঙ্গে কতটী দাস দাসী আস্‌বে, বেশী কিছু না এলেই ভাল—ভিন্ন দেশের লোক—কিসে কি হবে—সংসারের শান্তি নষ্ট শুধু। আমরা শুনেছি—সে নাকি খুব সুন্দরী—বিদুষী। তোমার মা—তার এ বৌ লেখা পড়া জানে শুনে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি বলেছেন "বেশী লেখাপড়াটা মেয়ে লোকের পক্ষে কিছু নয়" আমি আর তোমার বোন মা-লি খুব সুখী হয়েছি। আমরা মনে মনে ভেবে ভারী সুখী হয়েছি—অবশ্য একথা—নৈশ বায়ুরও কাণ আছে বলে প্রকাশ করিনি—এখন দু'জনার পরিবর্ত্তে তোমার মা'র কথা শোনার তিনজন লোক হলো। তুমি বুঝতে পাচ্ছ—তিনি বেশী কথা বলেন বলে নয়—তবে তিনি কথা বল্‌লেই আমাদের শুনতে হবে বলে।—আরো খবর আছে—একজন নূতন ক্রীতদাসী—আমাদের বাড়ী এসেছে—তুমি বোধ হয় জান আমাদের উত্তর দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কতকগুলো নৌকা এনে আমাদের খাল ধারেই বেঁধে ছিল। তার ভেতর থেকে একজন বালিকা আমাদের এখানে এসেছে। তার চেহারা বড় সুন্দর, কোঁকড়ান চুলের রাশি—তার মাথা ভরা। নয়নদ্বয় কোমল মধুর। তাকে দেখে আমি ভাল বেসেছি—এমন বন্ধুহীনা সহায়হীনা সে।

সে আমায় বল্লে তারা একবাড়ীতে বহু স্বজন ছিল; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—আত্মীয় সবই ছিল। অন্ন মেলা ভার হয়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসেরই মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হলো, মৃত্যু তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো—অন্নাভাবে মৃত্যু এর চেয়ে আর যা কিছু হয় তাই ভালো! এমন সময় বালিকাদের কেনবার জন্য লোক এল—একজন বালিকা বিক্রী করলে সেই অর্থেই তারা সমস্ত শীত কাটাতে পার্ব্বে—এদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপও অনেক কমে আসবে, একজনকে দিলে সব

বাঁচতে পারে; বালিকার মাতাকে একথা বলাতে মাতা নিজ কন্যাকে বেচতে সম্মতা হলেন না, নিশা তার কাঁদতে কাঁদতে ভোর হতো দিবসে কন্যাকে সব সময় চোখে চোখে রাখ্‌তেন। অবশেষ হতাশ হয়ে একদিন মাতা 'কোরাণ-ইস্'এর পূজো দিতে দূরবর্ত্তী মন্দিরে যান। মা গেলে পিতাকে বহু মুদ্রা দিয়ে এই কন্যাটিকে ক্রেতারা নৌকায় তুলে নেয়, পেট যখন শূন্য, গর্ব্ব তখন দূরে পালায়, আর কত শিশু অনাহারে কাঁদছে—একজনের ত্যাগে যদি সকলের অভাব পূর্ণ হয়। আমি এখন তার মা'র স্থান অধিকার করেছি। বড় ভাল বেসেছি তাকে আমি। এমন উজ্জ্বল দিবস—এই স্বর্ণবর্ণ বিচিত্র সূর্য্যরশ্মি—নিশীথে মধুর চন্দ্রালোক—কত ভাবি—তোমার কথা। এমন দিনে তোমার কি একবারও মনে পড়ে না আমায়? সমস্ত নিশা তোমার অপেক্ষায় থাকি আমার বাহু তোমার উপাধান হোক এই আশায় থাকি কিন্তু তুমি কোথায়?

তোমারই অপেক্ষায় আছি প্রিয়তম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাগানন্দ ও পার্ব্বতী-পরিণয় নাটক

শ্রীহর্ষের তৃতীয় নাটক "নাগানন্দে" একই প্রকার দোষগুণ পরিলক্ষিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত দুই নাটিকা হইতে উহার প্রভূত প্রভেদ থাকিলেও, ঐ কারণে উহা পৃথক গ্রন্থকারকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া আদৌ সন্দেহ হয় না। মনে হয় যেন কবি নিজ রচনার পিতৃত্ব নিঃসংশয় করিবার অভিপ্রায়ে, স্বরচিত তিন নাটকের প্রত্যেক নাটকে একই প্রস্তাবনা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং একটি নাটকের শ্লোক অপর নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াই ভারতীয় কবিগণ নিজ রচনাদির প্রামাণ্য ও তদাত্ম্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পান।

রত্নাবলীর ষষ্ঠ শ্লোকটি, প্রিয়দর্শিকার প্রথম অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে, ও নাগানন্দের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এবং প্রিয়দর্শিকার তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকটি নাগানন্দের চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম শ্লোকে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। নাগানন্দ—বৌদ্ধধর্ম্মানুপ্রাণিত একখানি নাটক। এবং অন্য দুই নাটকের নান্দীতে যেরূপ শিব-গৌরীকে আহ্বান করা হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে নাগানন্দের নান্দীতে বুদ্ধকে আহ্বান করা হইয়াছে। একথা সত্য, নাগানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মকে একটু খাটো করা হইয়াছে,—এমন-কি শেষ অঙ্কে নায়ককে পুরস্কার দিবার জন্য দেবী গৌরী আবির্ভূত হইয়াছেন। নাগানন্দের প্রথম অভিনয় কোন্ বৎসরে ও কোন্ দিনে হইয়াছিল, cowell সাহেব তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিউয়েন-সাং একটা মহোৎসবের উল্লেখ করেন; এই মহোৎসব গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসবে শ্রীহর্ষ

ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে মুক্তহস্তে দান করেন। এই মহোৎসব বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। শ্রীহর্ষ, একটি প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধের উদ্দেশে, একটি প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্যের উদ্দেশে ও আর-একটি প্রতিমূর্ত্তি শিবের উদ্দেশে, উৎসর্গ করেন। হর্ষের ১৮ জন সামন্ত রাজা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। cowell সাহেবের এইরূপ বিশ্বাস যে, উৎসবের প্রথম দিনে নাগানন্দের অভিনয় হয় এবং তৃতীয় দিনে রত্নাবলীর অভিনয় হয়। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি প্রস্তাবনার এই উক্তিটির উল্লেখ করেন;—"এই নূতন নাটকখানি শুনিবার জন্য রাজারা সমাগত হয়েছেন।" এই অনুমানটি বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচায়ক হইলেও কোন যুক্তির দ্বারা ইহার সমর্থন করাও যায় না, প্রতিবাদও করা যায় না। তথাপি হিউয়েন সাং-এর ৫০ বৎসর পরে যে তীর্থ-যাত্রী ভারতে আসিয়াছিলেন,—সেই ইৎ সিং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে রাজা হর্ষ গীত-বাদ্য ও নৃত্য-সহকারে নাগানন্দের অভিনয় করাইয়াছিলেন। উক্ত তীর্থযাত্রী এই নাটকের উল্লেখ করিতেন না—যদি ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব না থাকিত।

দানধর্ম্ম ও আত্মবিসর্জ্জন মনুষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল শিক্ষাপ্রদ কাহিনী রচনা করিয়াছে বা প্রচার করিয়াছে তন্মধ্যে বোধিসত্ত্ব জিমূতবাহনের কাহিনী একটি। এই উপাখ্যান "অবদান"-গ্রন্থ হইতে কথা-সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বৃহৎ কথায় ইহার দুইটি বিবরণ আছে (ক্ষেমেন্দ্র—৪র্থ ও ৯ম অধ্যায় ও সোমদেবের ৪র্থ ও ১২শ অধ্যায়); সর্ব্বজনপ্রিয় "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র মধ্যে এই উপাখ্যানটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে—এমন কি, মোগোলিয়া পর্য্যন্ত ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নাট্যাভিনয়ের উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে হর্ষ এই উপাখ্যানের মূল-উপাদানগুলির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। "বেতাল পঞ্চবিংশতি"তে যেমনটি আছে তিনি ঠিক্ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। রাজকুমার জিমূতবাহন, বৃদ্ধ রাজা জিমূতকেতুকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনগমনে পরামর্শ দিলেন। প্রজাগণের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিয়া, রাজা স্বীয় সিংহাসন তাঁহার উচ্চাভিলাষী আত্মীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া মলয়পর্ব্বতে গিয়া বাস স্থাপন করিলেন। সেখানে জিমূতবাহন সিদ্ধদিগের অধিপতি মিত্রবসুর সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন। একদা তাঁহার বন্ধুর ভগিনী মলয়াবতী বীণা বাজাইয়া গান গাইতেছিলেন; সেই গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অগ্রসর হইয়া, সেই অপরিচিতা রমণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। মলয়াবতীও তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল। তাঁহাদের প্রথম মিলনে হঠাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল; কিন্তু পরে অন্বেষণ করিয়া শীঘ্রই আবার পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইল। দেবী গৌরী স্বপ্নে দৈববাণী করিলেন, জিমূতবাহন মলয়াবতীর পতি হইবেন। মিত্রবসু বিদ্যাধরের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন—বিদ্যাধর জিমূতবাহনের পিতা

মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন, আনন্দের সহিত বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু একদিন জিমূতবাহন মিত্রবসুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে একটা অস্থিময় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন; বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—উহা নাগদিগের দেহাবশেষ।

পূর্ব্ব-অঙ্গীকারসূত্রে, প্রতিদিন এক একটি নাগকে পক্ষিরাজ গরুড়ের আহারার্থ উৎসর্গ করা হইত। সেদিন যে নাগের বলি হইবার কথা, জিমূতবাহন নিজ প্রাণ বিনিময়ে তাহাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মিত্রাবসু হইতে দূরে চলিয়া গিয়া সেই বধ্যস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে একটা ক্রন্দন ও বিলাপ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। আজ নাগ শঙ্খচূড়ের বলি হইবে—তাহার মাতা তাহাকে লইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়াছে। জিমূতবাহন তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন এবং স্বীয় সঙ্কল্প তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অসাধারণ ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সে অস্বীকৃত হইল। এমন কি, এই কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। যখন শঙ্খচূড় দেবারাধনার নিমিত্ত তাহার মাতার সহিত গোকর্ণ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে—সেই সুযোগে জিমূতবাহন গরুড়ের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন,—গরুড় তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার মুকুট হইতে একটা রত্ন আকাশ হইতে ভূতলে স্খলিত হইয়া ঠিক মলয়াবতীর পদতলে আসিয়া পড়িল; ভয়ত্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া মলয়াবতী ঐ রত্নটি তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট পাঠাইয়া দিল। জিমূতবাহনের পিতা মাতা পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। শঙ্খ-চূড় মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল, বলির কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন সে গরুড়ের উদ্দেশে ধাবিত হইল। গরুড় বধ্যজনের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। শঙ্খচূড় গরুড়ের ভ্রম গরুড়কে জানাইয়া দিল এবং নিজ মৃত্যু-অধিকারের দাবী করিল। তখন সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। যখন জিমূতবাহনের পিতামাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন জিমূতবাহন মৃত্যুমুখে পতিত। গরুড় নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই সময়ে গৌরী আবির্ভূত হইয়া জিমূতবাহনকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন, এবং স্বর্গ হইতে অমৃতবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। অমৃতবর্ষণে গরুড়-ভক্ষিত সমস্ত নাগ আবার জীবিত হইয়া উঠিল। এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করিল ওরূপ নিষ্ঠুর বৈরনির্য্যাতন সে আর কখন করিবে না।

রাজা হর্ষের এতটা ভক্তির আবেগ ছিল না যে সেই ভক্তির আবেগে, তিনি স্বপ্রণীত নাটকের পঞ্চ অঙ্ক শুধু বৌদ্ধপ্রবর্ত্তিত মৈত্রী-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শনেই নিয়োগ করিবেন; এবং নাট্যশাস্ত্রের নিয়মের প্রতি তাঁহার এতটা আস্থা ছিল যে, ভরত-আদিষ্ট কোন রস ছাড়া আর কোন রসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার তাঁহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নাগানন্দের তিন অঙ্ক নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানু-

সারেই রচিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে, উপন্যাসের অনুরূপ জিমূতবাহন ও মলয়াবতীর পরস্পর মিলন হইল। নায়ক অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মলয়াবতীর প্রেমঘটিত বিশ্রম্ভালাপ এবং গৌরী স্বপ্নে যে ভাবীপতির কথা বলিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন-বিবরণ শুনিতে পাইলেন। বিদূষক হঠাৎ নায়ক নায়িকার মধ্যে মিলন ঘটাইল। তাঁহারা ভয়ে ভয়ে স্বকীয় অনুরাগ পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন এমন সময় একজন তাপস আসিয়া মলয়াবতীকে আশ্রমে লইয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কে, মলয়াবতী মদন-তাপে সন্তাপিত হইয়া, তাপ-প্রশমনের জন্য একটী নিকুঞ্জে আসিয়াছেন, এবং সেইখানে একটী মণি শিলায় শয়ন করিয়াছেন; তাপ-প্রশমনের জন্য সখিদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। একটা পদশব্দ শুনিতে পাইয়া মলয়াবতী পলায়ন করিল। জিমূতবাহন এই সময়ে নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া মদনপীড়িত হৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিলেন এবং মণিশিলার উপর উক্ত মলয়াবতীর ছবি চিত্রিত করিলেন। মিত্রাবসু স্বীয় ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে চাহিলেন। জিমূতবাহন তাঁহার নাম জানিতেন না এবং যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাঁরও প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মলয়াবতী তাঁহার কথা শুনিয়া আপনাকে অবমানিত মনে করিলেন এবং আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (রত্নাবলীর ৩য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য) মলয়াবতীর সখিরা রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জিমূতবাহন সত্বর আসিয়া মলয়াবতীকে সচেতন করিলেন, আশ্বস্ত করিলেন, এবং নিজ অনুরাগের প্রমাণস্বরূপ তিনি মলয়াবতীর যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন সেই চিত্র মলয়-বতীকে দেখাইলেন। তখন নায়ক নায়িকা শপথ বিনিময় করিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তৃতীয় অঙ্কে, বিবাহের পর তাঁহারা কুসুমাকর উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নাটকের দ্বিতীয় অংশ, বিদ্যাধরের বলিদান ব্যাপারে পরিপূরিত। আখ্যানবস্তুর মধ্যে এইটি মৌলিক উপাদান। এইখানে করুণ ভয়ানক ও শান্তিরস, আদিরসের স্থান অধিকার করিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের ৬টি দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কের ৭টি দৃশ্য, মূলকাহিনী হইতে সাক্ষাৎ ভাবে গৃহীত। উহার বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভে জিমূতবাহনের সহিত মিত্রাবসুর বিচরণ; এবং গরুড় যখন আত্মবলিদানেচ্ছু বধ্যজনকে লইয়া চলিয়া গেল, সেখানে চতুর্থ অঙ্কের শেষ হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে জিমূত-বাহনের পিতামাতার উৎকণ্ঠা, শঙ্খচূড়ের দুঃখ, জিমূতবাহনের মৃত্যু, পুনর্মিলন, গরুড়ের অনুতাপ ও গৌরীর অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শিত হইয়াছে।

নাট্যবিষয়াতিরিক্ত কবিতায় নাগানন্দের অধিকাংশ স্থান অধিকৃত হইয়াছে। উহাতে বর্ণনার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। মলয় পর্ব্বত, আশ্রম, মধ্যাহ্নকাল, (প্রথম অঙ্ক), স্নানের সময় (দ্বিতীয় অঙ্ক), ধারাযন্ত্র সমন্বিত উদ্যান (প্রিয়দর্শী,—দ্বিতীয় অঙ্ক ও রত্নাবলী তৃতীয় অঙ্ক দ্রষ্টব্য), বিবাহ-উৎসব, সূর্য্যাস্ত, (তৃতীয় অঙ্ক), অরণ্য, সাগরের জলোচ্ছ্বাস,

(চতুর্থ অঙ্ক)—এই সমস্ত, পাত্রগণকর্ত্তৃক নহে পরন্তু গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম তিন অঙ্কে নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিবিধ দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকগুলি স্থান উদ্ধৃত হইতে পারে। নায়ক নায়িকা সাধারণ ধরণের প্রেমিক, তাহাদের চরিত্রগত কোন বিশেষত্ব নাই। তাছাড়া, আখ্যানবস্তু দুই অংশে বিভক্ত হওয়ায় এবং প্রথম অংশটি অতি-পরিপুষ্ট হওয়ায় সমগ্রের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। নায়ক নায়িকার সাদামাটা দৃশ্যগুলির মধ্যেও দর্শকের ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও আদিরসের দৃশ্যগুলিতে কোন মৌলিকতা নাই, নাটকীয় কার্য্য-পরম্পরার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই, তথাপি বলিতে হইবে, দৃশ্যগুলি বেশ গুণপনা ও নিপুণতার সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। কবি আদিরস ছাড়াও যোগ্যতাসহকারে এরূপ রসেরও অবতারণা করিয়াছেন—যাহা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে অতীব বিরল। মৈত্রীভাব, আত্মত্যাগের তৃষা, জলন্ত ভক্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা, মাতৃদুঃখ,—এই সকল ভাব শ্রীহর্ষ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মূল-কাহিনীর রূপগুলিতে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়া, তাহাতে একটা মৌলিকতার ছাপ দিয়াছেন। জিমূতবাহন একটি বিশেষ চরিত্রের লোক। এই চরিত্রসম্বন্ধে আলঙ্কারিক-সম্প্রদায়দিগের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এই চরিত্র-সৃষ্টি-সম্বন্ধে, ইহা অপেক্ষা প্রশংসা আর কি হইতে পারে? যেমন ভালবাসায় তৎপর, তেমনি আত্মত্যাগে সতত প্রস্তুত,—এরূপ পুরুষরত্নের চরিত্র আলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে আলঙ্কারিকগণের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বৈচিত্র্যসম্পাদন ও আমোদ প্রদানের অভিপ্রায়ে শ্রীহর্ষ নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত দুইটি চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বিদূষক আত্রেয়ী ও বিট্ শেখরক। সকল বিদূষকেরই ন্যায়, আত্রেয়ী জাতিতে ব্রাহ্মণ, নির্ব্বোধ, স্থূলবুদ্ধি, ঔদরিক,—সর্ব্বসাধারণের উপহাসের পাত্র। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রাণনায় গ্রন্থকার এই উদ্ভট চরিত্রকে আরও উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে প্রহসনসম্বন্ধে সাধারণতঃ দৈন্য লক্ষিত হইলেও অন্ততঃ নাগানন্দে, ভাঁড়ামী ধরণের প্রহসনের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। বিট শেখরক সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া বিবাহ-উৎসব হইতে বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়া বিদূষককে দেখিতে পাইল। বিদূষক ভ্রমরের আক্রমণ নিবারণার্থে একটা অবগুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছে। শেখরক, অবগুণ্ঠিত বিদূষককে স্বীয় প্রিয়তমা নবমল্লিকা মনে করিয়া, তাহাকে চুম্বন করিল, তাহার সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে নবমল্লিকা আসিয়া পড়িল। বিট তাহার ভ্রম জানিতে পারিল, সেই দাসীর চরণে ভূমিষ্ঠ-প্রণিপাত করিতে বিদূষককে বাধ্য করিল এবং জোর করিয়া তাহাকে সুরাপান করাইল। (তৃতীয় অঙ্ক) একটু পরে, বেচারা বিদূষক আর

একটা ফাঁদে জড়াইয়া পড়িল। নবমল্লিকা, নবদম্পতির সম্মুখে, বিদূষকের মুখে তমাল-পত্রের রস মাখাইয়া, মুখ কালো করিয়া দিল। এই ধরণের প্রহসনের দৃষ্টান্ত একমাত্র মৃচ্ছকটিকাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহার উপর শ্রীহর্ষের নাটকগুলি আরোপিত হইয়াছে—সেই শ্রীহর্ষের আশ্রিত কবি ভান নিজ নামেও কতকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন। একজন ভাষ্য-কার (নলকম্পু সম্বন্ধে গুণবিনয়গণি; peterson-এর কাদম্বরীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) "মুকুটাড়িতক" নামক একটি নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পার্ব্বতীপরিণয়" নামক আর একটি নাটক বানের রচনা বলিয়া পাঠকের নিকট অর্পিত হইয়াছে। যে কাদম্বরীর প্রামাণিকতা অবিসম্বাদিত, সেই কাদম্বরীর একটি শ্লোকের সহিত, পার্ব্বতীপরিণয়-নাটকের প্রস্তাবনার একটি শ্লোক অভিন্ন; সুতরাং উভয়ের গ্রন্থকার যে একই ব্যক্তি,—এই অনুমানটি কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বান যদি বাস্তবিকই, হর্ষচরিত, কাদম্বরী ও চণ্ডিশতকের গ্রন্থকার হয়েন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার উক্ত নাটকটি অল্পবয়সের রচনা—কেননা ঐ নাটকে কল্পনা ও উদ্‌ভাবনাশক্তির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। উহার মতন ঔৎসুক্য-বিহীন নাটক কল্পনা করাও অসম্ভব। উহার পঞ্চম অঙ্ক একেবারে ঘটনাশূন্য; উহা কেবলই কথোপকথন, সংবাদ ও বর্ণনাদিতেই পূর্ণ। তথাপি একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, উহা চিত্তাকর্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে হয়। হিন্দু নাট্যসাহিত্যের অন্তর্ভূত আর কোন রচনায় মহাকাব্যের সহিত অতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে শুধু যে আখ্যানবস্তু গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে, কবি পদেপদে কালিদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। ঐ মহাকাব্যের সর্গগুলিকে কবি অঙ্কে-অঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন মাত্র। Mr. Glaser স্বপ্রণীত সংস্করণের পরিশিষ্টে, কুমারসম্ভবের সহিত পদেপদে তুলনা করিয়া উক্ত নাটকের একটি অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ দিয়াছেন। নাটকের প্রথম অঙ্ক মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অবিকল অনুরূপ। উহাতে তিনটি মাত্র পাত্র:—নারদ, হিমবৎ ও মেনা; ইঁহারা সম্মিলিত হইয়া শিব পার্ব্বতীর বিবাহ ঘটাইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কটি, দ্বিতীয় সর্গ ও তৃতীয় সর্গের প্রথম অংশের অনুরূপ (২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত); তারকার ভয়ে ভীত দেবতারা একটা সভা করিয়া কামকে তাঁহাদের কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিলেন। কাম শিবকে প্রেমাসক্ত করিয়া তুলিয়া, তাঁহার সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিয়া দিবেন। কেননা, এই মিলনে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে সেই তারকাসুরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। তৃতীয় অঙ্কটি, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গকে অনুসরণ করিয়াছে। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইলেন। নারদ ও রম্ভা আসিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, শিব স্বীয় নেত্রানলে কামকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কটি, চতুর্থ সর্গের অনুরূপ। শিব, নন্দীর দ্বারা পার্ব্বতীর সখীদ্বয় জয়া বিজয়ার নিকট বার্ত্তা পাঠাইলেন, পরে স্বয়ং পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন।

তাঁহাদের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পঞ্চম অঙ্কে বিবাহ হইয়া গেল। (কুমার সম্ভব ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গ) রঙ্গমঞ্চে বিবাহের অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হইল। এই দীন চিত্রপটের উপর কবি জগতের ছবি আঁকিয়াছেন, হিমালয়ের ছবি আঁকিয়াছেন, দিব্য আশ্রমের ছবি আঁকিয়াছেন এবং নাট্যশাস্ত্রসুলভ সমস্ত স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। পাত্রগুলি জড়-পুত্তলিকা মাত্র। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রে কবির অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল—তিনি তাই মনে করিয়াছিলেন, আগাগোড়া নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিলেই বুঝি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করা যাইবে। শুধু ইনি নহেন, তাঁহার পরে অন্যান্য গ্রন্থকারও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগ্‌দত্তা

(৫০)

তাল পল্লবের মর্ম্মর তুলিয়া ঝড়ের হাওয়া বহিতেছিল। আকাশের ইতস্ততঃ কোথাও খণ্ড মেঘ অন্ধকারে চলন্ত পর্ব্বতের মত উদ্দেশ্য বিহীন পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছে, বর্ষণের আয়োজনে ব্যস্ত নহে তাহা তাহাদের গতি হইতেই জানা যাইতেছিল। কমলা নিজের বদ্ধগৃহ হইতে সম্মুখের খোলা ছাদে আসিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া পরিম্লান নক্ষত্র পুঞ্জের পানে একবার তাহাদেরই ন্যায় নিষ্প্রভ দৃষ্টি উন্নমিত করিল, তারপর একটা ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারের দিকে অনির্দ্দেশ্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অবসাদে হৃদয়প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে, উঠিতে বসিতে বুকের মধ্য হইতে কে যেন দারুণ নিপীড়নে নিপীড়িত করিয়া ক্রমাগত বলিতেছে, 'আর আমি পারি না, আর আমি সহিতে পারি না।' এ প্রবল অস্বীকারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই, সান্ত্বনা নাই; সমস্ত চিত্ত এ বিদ্রোহের তাপে তাতিয়া উঠিয়াছে, শরীর শুদ্ধ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া যেন সমান তালে কহিতেছিল "আমিও আর এ ভার বহিতে পারিতেছি না।" নিদ্রাহীন কণ্টকশয্যা ত্যাগ করিয়া তাই সে এইখানে মুক্ত আকাশের তলে উদার প্রকৃতির মধ্যে একটু হাঁফ লইতে আসিয়াছে।

কিন্তু অভাগার ভাগ্যের মত এত বড় অভিশপ্ত বস্তু বুঝি জগতে আর কোথাও কিছু নাই। কমলা দুদণ্ড জুড়াইতে আসিল, সেটুকু যেন ভাগ্যবিধাতার প্রাণে সহিল না, সেই ঘন অন্ধকারের একটা প্রান্তকে বিদারণ করিয়া অকস্মাৎ ঊষা প্রকাশের আলো আকাশ প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু—না এ আলো ত দিবাগমনের সুসমাচার ঘোষণা নহে! এ যেন ঘোরতর অমঙ্গল বার্ত্তা প্রেরণকারী নিশানের মত সুললিত আভায় দক্ষিণে পশ্চিমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আতসবাজির মত ইহার বিচিত্র ফুলঝরি ঊর্দ্ধে তারকা ফুটাইয়া

ঐযে আবার কেন্দ্রবিচ্যুত গ্রহের ন্যায় মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যের দিকে ঝরিয়া পড়িল। কমলা শিহরিয়া উঠিল, ঐশ্মশান চিতাবহ্নি নাজানি এই নিষুঁতি রাত্রে কত দগ্ধ গৃহে চিতাশয্যা সাজাইতে আসিয়াছে। হায় সে যদি আজ ঐঘরগুলার একখানায় থাকিতে পারিত!

অগ্নি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অন্ধকার সভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর হইতে দূরে সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল; বজ্র শব্দে বাঁশ ফাটিতে লাগিল, অকস্মাৎ নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া সদ্যঃ জাগরিত ভীত নরনারীশিশুপশুর আর্ত্তকণ্ঠের তীব্র হাহাকার আকাশে বাতাসে দিকে দিকে একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, 'আগুন' 'জল,' 'হায় হায়!' রবে ঘুমন্ত প্রকৃতি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

মানুষের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া বাতাস অট্টহাস্যে পুনঃপুনঃ সেই দক্ষিণের পথেই আনাগোনা করিতেছিল, গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মাথা নাড়িয়া প্রলয়ের গর্জ্জনগান গাহিতেছে, এতক্ষণকার সুষুপ্ত রাজপথ এক মুহূর্ত্তে বন্যা-তাড়িত জলস্রোতের মত জনস্রোতে ভরিয়া গিয়াছে। কলরব কোলাহলে সকলেই সেই সর্ব্বনাশিনী অগ্নিক্রীড়া দেখিতে ছুটিয়াছে। সর্ব্বনাশের মধ্যেও বোধহয় একটা সুতীব্র আনন্দের স্বাদ আছে। বজ্রধ্বনিতে যখন মুহুর্মুহু বিদ্যুতের তীব্র আলো ভরিয়া উঠে তখন গুরু গুরু কম্পিত গৃহের মধ্যে ভীত শিশু সভয় আনন্দে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই ধ্বনির দিকেই কান পাতিয়া রাখে। কমলার অন্তরের মধ্যেও যেন নৈশ মৃত্যুৎসব তেমনি একটি সর্ব্বনাশী আনন্দের দোলা দিতেছিল। মুগ্ধ পতঙ্গের মত তাহার সমস্ত হৃদয়টা সেই অনল পর্ব্বতের দিকে ক্ষণে ক্ষণে উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, পিপাসী যেন শীতল নির্ঝরের পানে তাকাইয়া আছে,—এমনি ভাবে তাহার দুই লুব্ধ লোচন সেইদিকে নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

নীচে রাজপথে লোকের ভিড় বর্দ্ধিত হইতেছিল, একজন লোক তামাসা দেখিয়া নিজের ঘর সামলাইতে ফিরিয়া যাইতেছে, যাত্রীর দল তাহার নিকট সংবাদ চাহিল, সে ঔদাস্যের সহিত কহিল, বাজারের প্রায় সকল ঘরই ধরিয়াছে, দ্বিতলঘরেও অগ্নিদেবতার অকৃপা নাই! আর একটা খবর সে অতি সহজ কণ্ঠেই বলিয়া গেল। যাহার নির্ঘাত ধ্বনি কমলাকে বিঁধিতে ছাড়িল না। সে শুনিল, সেই দ্বিতল গৃহে ডাক্তার বাবুর নব-প্রসূত শিশু ও শিশুজননী অনলবেষ্টিত। গৃহস্বামী গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছেন, দাসদাসীরা কে কোথায় কে বলিতে পারে, কাঠের সিঁড়ি প্রথমেই জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এতক্ষণ হয়ত ভস্মসাৎ হইয়া গেল, উপরের ঘরে অসহায়া জননীর আর্ত্তকণ্ঠধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকের তুমুল শব্দ ডুবাইয়া ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিতেছে, শিশুকে বুকে লইয়া তিনি পাশবদ্ধ কুরঙ্গিণীর মর্ত গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, এক কথা "আমার ছেলেটীকে বাঁচাও গো বাঁচাও।" কিন্তু কে এতবড় দুঃসাহসিক আছে যে মৃত্যুর রাজ্য হইতে মাতাপুত্রকে উদ্ধার করিতে আসিবে?

কমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, পুত্রস্নেহাতুরা মাতার কম্পিত আর্ত্তনাদ যেন

তাহার দুই কর্ণে সহস্র কামান গর্জ্জনের চেয়েও প্রবল শব্দে জাগিয়া উঠিল,—কেহ কি ইহাদের রক্ষা করিবার নাই? ওগো কেহ কি বাঁচাইতে পারে না? দূরে অগ্নি ও বায়ুর আস্ফালন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্যবৎ সে ছুটিয়া শচীকান্তের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। তখন তাহার আর কোন কথাই মনে ছিল না, শুধু সেই অগ্নিবেষ্টিত গৃহের শিশুকক্ষা জননীর মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণায় তাহার নারীচিত্তে করুণার হাকাকার উঠিয়াছিল। প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণে অকস্মাৎ জমাটবাঁধা বরফ গলিয়া প্রেমের মন্দাকিনী বহিয়াছে।

শব্দহীন রুদ্ধকক্ষে অতল অন্ধকারের আশ্রয়ে শচীকান্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল, শান্তিহীনের পরমারাধ্যা দেবী আজ যেন তাহাকে বহুদিন-প্রবাসিনী মায়ের মত গভীর স্নেহে কোলে লইয়া শুইয়া আছেন। সুখস্বপ্নে অধর প্রান্ত ঈষৎ হাস্যে বিকশিত। এমন সুখে, আরামে সে বুঝি রতনপুকুর হইতে আসিবার পর আর একদিনও ঘুমায় নাই।

মনের আকস্মিক উত্তেজনার বশে কমলা যখন এই ঘরের দ্বার ঠেলিয়া স্বহস্তঘাতী আত্মার মত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন একবারের জন্য অর্দ্ধ অন্ধকারে সমস্ত ঘরখানার দৃশ্য তাহার চক্ষে মৃত্যুপুরীর ছায়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ঐ অদূরে মরণের নির্দ্দয় ভেরী সঘনে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বুঝি অভাগিনী জননীর সর্ব্বস্বধন তাঁহারই বক্ষতলে অসহায় ক্ষীণকণ্ঠের যন্ত্রণারোদনে জ্বালা বাড়াইয়া জ্বলিয়া গেল। কমলার সর্ব্বশরীরের মধ্যে আগুনের শিখা ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, সেই আগুনে পুড়িয়া মনটাও বুঝি লোহা হইয়া গিয়াছিল, সে সমুদয় দ্বিধা ভয় ভুলিয়া শয্যাতলে শায়িত শচীকান্তের নিকটে ছুটিয়া আসিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "শোন, একবার ওটো"। নিদ্রিত তখন বড় মধুর সুখে বিভোর ছিল। স্বপ্নে সে অপ্সরাসেবিত নন্দনের চারু উপবনে দাঁড়াইয়া। অদূরে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র শোভা, পারিজাতের অপূর্ব্ব গন্ধসম্ভার, কিন্নরী ললিতরাগিণীতে চিরবসন্তের বন্দনা গাহিতেছিল, সার্থক প্রেমের পুলক বাতাসে আকাশে স্বর্ণসলিলকম্পিত সরসীর বক্ষে এবং শচীকান্তের সর্ব্বশরীরের মধ্যে শিহরণ আনয়ন করিতেছিল। মুগ্ধ প্রেমিক প্রীতি-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উদ্যানের দ্বাররুদ্ধ, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না। এমন সময় কোথা হইতে কোন্ সুরে নারীর কণ্ঠ তাহার কর্ণ কুহরে সমস্ত সঙ্গীতের তাল মান খর্ব্ব করিয়া বাজিয়া উঠিল, পুলকস্পন্দিত বক্ষে সে শুনিল দিব্যাঙ্গনা বলিতেছে "এসো, আমি তোমায় দ্বার খুলিয়া দিতেছি।" আর সে কমলা! ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মুক্ত-দ্বার পথে নক্ষত্রালোক গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার ঝহু ঠেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কে ডাকিতেছে "ওঠো, ওঠো শোন একবার শোন।"

ও কে ডাকে? এ কাহার স্বর? দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সে সেই অস্ফুট আলোকে সবেগে চাহিয়া দেখিল, অমরালয় হইতে কি দেবকন্যা এই অন্ধকার মর্ত্ত্যগৃহে

আবির্ভূত হইয়াছে। গভীর বিস্ময়ে তাহার রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল "কমলা?"

কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে অধীরতর হইয়া উঠিতেছিল, পলে পলে মরণের রুদ্রহস্ত তাহাদের মধ্যের পাশ কঠিনতর করিতেছিল সে কহিয়া উঠিল "হাঁ আমি কমলা, তুমি ওদের রক্ষাকর।"

শচীকান্ত ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, "কাদের? কাদের কমলা?"

কমলা জানালার নিকট ছুটিয়া গিয়া সশব্দে তাহার কবাট দুখানা খুলিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল নেত্রে বাহিরে চাহিল, অন্ধকার ঘর মুহূর্ত্তে দিবালোকিত কক্ষের মতই তীব্র আলোকে ভরিয়া উঠিল। শচীকান্ত ইহার ভিতর উঠিয়া গিয়া জানালার নিকট কমলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সেই ভীষণ অগ্নি-পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া শিহরিত ভাবে কহিল "বাজারে আগুন লেগেছে!"

কমলা তাহার কম্পিত অধরের মধ্য হইতে আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল "ওই আগুনে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাঁর ছেলে নিয়ে উপরের ঘরে আছেন, ডাক্তার বাবু বাড়ী নাই, তাদের কি বাঁচান যায় না?"

শচীকান্ত অগ্নির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল "সম্ভব নয়।" বায়ু গর্জ্জিতেছিল, অগ্নি সাগরতরঙ্গের মত লহরে লহরে গর্জ্জিয়া শূন্য পথে ছুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। কমলার বক্ষশোণিত শীতল হইয়া গেল, রুদ্ধশ্বাসে সে তাহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী শচীকান্তের একখানা হাত সবলে চাপিয়া ধরিল "তুমি ওদের বাঁচাও, ওদের বাঁচাও,—বাঁচাও!"

এই যে ব্যাকুল আবেদনের নির্ভর আত্মনিবেদন ইহার যে কতবড় তাড়িৎ শক্তি তাহা সেই লাঞ্ছিত হৃদয়ই শুধু জানে। ব্যথাজড়তায় যে চিত্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুমূর্ষুর মত শীতল গৃহকোণের মলিন শয্যায় লুটাইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই অন্তের সূর্য্যে যেন উদয়ের আলোক আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নেত্রে সে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় কমলার দিকে ফিরিল, তাহার সর্ব্ব-শরীরের মধ্যে পুলকের বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইতে ছিল। "তুমি যখন আদেশ করেচ তখন যাবো কমলা? যে অধিকার এক মুহূর্ত্তের তরেও গ্রহণ করেচ, যে দাবী এক মুহূর্ত্তের তরেও তোমার মনে আমার কথা জাগিয়ে দিয়েছে সে আমার অধিকার আমি রক্ষা করতে চেষ্টা করবো কমলা।" তাহার স্বর সঘনে কম্পিত হইতেছিল। একটা উদ্দাম আনন্দে যুদ্ধাভিমুখী বীরের ন্যায় তাহার সারাচিত্ত নাচিয়া উঠিতে লাগিল। কি আনন্দ! আজ এই নৈশ নরমেধ যজ্ঞে কি আনন্দ! মৃত্যুর এই আকস্মিক আবাহনে আজ কি বিপুল পুলক! কি অসীম তৃপ্তি! সে সেই দহনের আলো দিয়া পূর্ণ নেত্রে অকথ্য ভয়ে বিবর্ণ কমলার মুখের পরে চাহিয়া দেখিল, কমলাও সেই সময় অগ্নিরাশি সহিতে অসমর্থ চক্ষু সরাইয়া আনিয়া তাহার দিকে চাহিল, চারিচক্ষে মিলিত হইল, শচীকান্তের হস্ত ত্যাগ করিয়া সে মিনতি পূর্ণ আদেশের সহিত কহিল "তবে যাও—।"

"যাই কমলা"। শচীকান্ত কমলার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ছিনাইয়া আনিল, একটা গভীর সাধকে অতৃপ্ত রাখিয়াই সে নিজেকে

সবলে টানিয়া সরাইয়া লইল, না ছি! ভীত পক্ষীটি যখন আশ্রয় বোধে তাহার বক্ষনীড়ে উড়িয়া আসিয়াছে তখন তাহাকে পিঁজরায় পুরিবার কথা, মনের কোণেও আনা কাপুরুষতা। সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। "কমলা একটা কথা, হয় ত এই শেষ কথা বলে যেতে চাই—" শচীকান্ত কমলার দিকে আবার দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। "আমি যাচ্চি তুমি যাদের বাঁচাতে আদেশ দিয়েছ, তাদের রক্ষা করবার জন্য ঐ আগুণের হাপরের মধ্যে প্রবেশ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবোনা জেনো, তবু যদি না পারি, ক্ষমা করো! এই যে যাচ্চি হয় ত আর ফিরে নাও আসতে পারি, যদি আসি? ফুরিয়ে গেল, কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যদি নাই আসি যদি এই আমাদের শেষ হয় আমায় একটু দয়ার সঙ্গে বিচার করো। ঐ অগ্নিবেষ্টিত গৃহের প্রাণীদের জন্য তোমার প্রাণে যে অসীম করুণা আছে, তার একটি বিন্দুমাত্র আমার পরে খরচ করো। এইটুকু শুধু মনে করো আমি যা করেচি যা সয়েচি সব তোমার জন্য; তোমায় ভালবেসে, তোমায় আমার বাক্‌দত্তা পত্নী জেনে। তোমায় ভাল না বাসলে আমার আজ এ দশা হতো না, তুমি আমার নও আমার হবে না জান্‌লে এ পাপ আমি কর্‌তেম না। আমি বন্ধুর কাছে বিশ্বাসঘাতক কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার বুঝবার ভুলই পাপ।" অদূরে ভীষণ রবে গৃহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইল, অগ্নি গর্জ্জিল, হু হু হু! শচীকান্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

(৫১)

কমলার শরীরে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল অর্থাৎ তাহার বোধ শক্তি, স্মৃতি ধৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তি স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সর্ব্ব প্রথম তাহার মনে পড়িল সে এই গৃহে কোন অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে? তারপর এ গৃহের অধিকারী নিশ্চিন্ত নিদ্রিত ছিল, তাহাকে কিসের অধিকারে সে ডাকিয়া তুলিয়া কঠিন কণ্ঠে মৃত্যু গহনে ঝাঁপিয়া পড়িতে আদেশ করিল? ঠেলিয়া পাঠাইল? কে দিল এ ক্ষমতা তাহাকে? কে দিয়াছে? কেন সে এমন কাজ করিল? যাহাকে এ পর্য্যন্ত এত দিনের তরেও সে নেত্রাঙ্গিতের এতটুকু কম্পনে বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন করে নাই, যাহার সাজান অর্ঘ্য পা দিয়া ঘৃণায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার জীবনের উপরে তাহার এতবড় জোর? একটা সম্বন্ধের দাবী পর্য্যন্ত যাহার সহিত সে কোনমতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় তাহাকেই অনায়াসে সে নিতান্ত আপনার মত করিয়া মৃত্যুপণে বিদায় দিল? এ কি করিল? কেন এমন করিল? সে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ডাকিল "যেওনা ফিরে এসো, শুনে যাও" কিন্তু হায়! কাহাকে এ বৃথা আহ্বান! বহির্দ্বারের কবাট সজোরে বন্ধ হইবার শব্দ পাওয়া গেল, জনহীন গৃহ উচ্চ গম্ভীর নাদে প্রতিধ্বনি করিল "ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে—"

কমলা পাগলের মত খোলাছাদে ছুটিয়া গেল, এখনও হয় ত সে তাহাকে ফিরাইতে পারে! স্পন্দিত নর্ত্তিত আলোকে দূরে চঞ্চল-গতি পরিচিত মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এখন ডাকা বৃথা, চেষ্টা বৃথা, ফিরাইবার আর উপায় নাই।

সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরক্ষণে সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া গেল, বহির্দ্বার খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ফিরাইবে! কিন্তু পরক্ষণেই চেষ্টা বাতুলের চেষ্টা মাত্র বুঝিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। জানালায় দাঁড়াইয়া নিস্পন্দলোচনে কিছুক্ষণ সেই অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদজলে অঙ্গ বস্ত্র ভিজিয়া সবেগে ভূমে বসিয়া পড়িয়া সে অধীর উচ্ছাসে কহিল "ওকে ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো।"

সারারাত্রি প্রবল বেগে ঝড় বহিল, প্রকাণ্ড তালগাছগুলার প্রকাণ্ড মাথা সে বাতাসে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, দূরে অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তি সে বাতাসে ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছিল। আকাশে সাঁ সাঁ করিয়া মেঘের দল ছুটিয়া চলিয়াছে, ধ্বংসালোকের পশ্চাতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ভীষণাকার যমদূতের মত উদ্যতদণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। কমলার বুকের ভিতরেও এমনি প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল। আগুণের হল্কাগুলা এমনি বেগে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, চারি দিকে যেন একই প্রবল ভূমিকম্প হইতেছিল, আর্ত্তস্বরে তাহার সমুদয় প্রাণটা কাঁপিয়া বলিতেছিল, "এ আমি কি করেছি, এ কি করেছি।"

ভোরের আলো না ফুটিতে চলন্ত মেঘ স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আকাশ পথের কোনখানে ফাঁক নাই দেখিয়া বজ্রানল মেঘপর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া দেখিতে দেখিতে ধরণী বক্ষে অজস্র ধারায় নামিয়া আসিল। ঊর্দ্ধশিখ অগ্নি নিম্নমুখে মাথা নত করিল, ধূমরাশি সবেগে আকাশের মেঘে মিশিতে ছুটিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বাতাসের কাতর আর্ত্তনাদ রহিয়া রহিয়া যন্ত্রণা কাতর চিত্তের হাহাকারের ন্যায় হাহা করিয়া উঠিতেছিল। সহৃদয় দর্শকের অশ্রুধারা যেন অশ্রান্ত বর্ষণের আকারে পৃথিবীর তপ্তগণ্ডে ঝরিতেছিল। কাল এই বর্ষণের গোটাকত ধারা পাইলে হয় ত কতলোক বাঁচিয়া যাইত, কত হতভাগ্য গৃহহীন হইত না, কিন্তু জগতে সময়ে সহানুভূতি লাভ বড় বিরল।

ঝিয়ের সহিত নীচে রাঁধুনী বামুনের ঘোরতর কোন্দল বাঁধিয়া গিয়াছে, ভৃত্য মধ্যস্থতা করিতে গিয়া গালি খাইয়া তাহা প্রত্যর্পণের বৃথা চেষ্টায় কোলাহল বর্দ্ধিত করিতেছিল। কাহার পদশব্দ শুনিয়া সকলেই একসঙ্গে চুপ করিল, কমলার বক্ষ শোণিত নিশ্চল হইয়া আসিল—সে কি এইবার নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবে? উঠিতে যেন পা উঠিল না, গতরাত্রির ঘটনা একটা বিরাট ভারের মত তাহার সর্ব্বশরীরকে যেন এই ঘরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়াছিল। হয়ত এতক্ষণ সে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দালান পার হইল, এইবার বুঝি এই ঘরেই প্রবেশ করিতেছে এখনি সে শুনিবে "কমলা আমি এসেছি।" সে কি করিবে,—ওগো কেহ বলিয়া দাও সে কি করিবে? বলিবে কি "তুমি যাও, তুমি কেন এলে—তুমি যাও!" যদি সে তেমনি করিয়া আজও বলিতে আসে "আমার কমল!" সে উদ্ধত রোষে বজ্র দৃষ্টি হানিয়া

আজও বলিবে কি "তুমি আমার কেউ নও!" হরি এ কি হইল?

কেহ কক্ষে প্রবেশ করিল না, জল স্থল কম্পিত করিয়া বজ্র ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুতের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়া আকাশের বক্ষ চিরিয়া দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল, বায়ু কাঁদিয়া উঠিল হা, হা, হা।"

পাশের ঘরে কে ওই না দাঁড়াইয়া? এখনই ত সে এই ঘরেই ঢুকিবে? স্বেদজলে সর্ব্বশরীর ভিজিয়া উঠিল, হৃদ্‌পিণ্ড দমফুরান ঘড়ির মত অকস্মাৎ চলিতে গিয়া চলিল না। কেহ প্রবেশ করিল না, খোলা দরজার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র কক্ষ দৃষ্ট হইতেছিল, আনলায় ঝুলান সার্ট, কোট, কলার, টাই, বাতাসে ফুলিয়া দুলিয়া স্থানচ্যুত হইতেছিল। বস্ত্র-মধ্য হইতে একটা অস্ফুট চামেলি গন্ধ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অমনি কমলা অকস্মাৎ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে।

এইবার নীচে একসঙ্গে অনেক লোকের জুতার শব্দ শোনা গেল, কমলা চমকিয়া উঠিয়া পড়িল,—এবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একবার অসহায় নেত্রে লৌহ গরাদেঘেরা জানালার দিকে চাহিল, পাশের ঘরের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, আবার কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে চাহিতে সাহস হইতেছিল না, প্রতি মুহূর্ত্তেই সেখান দিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে।

শ্রীঅনুরূপা দেবী

প্রতীক্ষা

শ্রান্ত নিদ্রাতুর দেহে বসি আছি আজ!
দূরান্তের বার্ত্তা আসে বাতায়ন-পথে!
নির্ম্মল মধ্যাহ্নদীপ্ত গহন আকাশে
হৃদয় উড়িয়া গেছে অজানা জগতে!
হেরিতেছি সুবিজন নীলিমার পারে
ক্ষীরোদ সরসীজলে ওগো প্রিয়তম,
সুবর্ণ সোপানে কভু কভু ধারাগৃহে
অপার আনন্দে তুমি করিছ গাহন!
পড়িয়াছে গৌরদেহে সৌর রশ্মিমালা
দিগন্ত ঝলসি যায় তার প্রতিচ্ছায়;
আমি পান্থ সে বিদেশে, সেই কল্পপুরে
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি গো তোমার বিভায়;
বাসনা কামনা মোর শরীর-ধূলির
স্খলিত হইয়া গেছে যেন জীর্ণ-চীর!
অনন্ত আলোক ঘাতে অন্ধ নেত্র-তলে
নাহি জাগে সংসারের সহস্র কুহক;
ভোগের, সুখের শত মরীচিকা রাগে
উদ্‌ভ্রান্ত নাহি হয় প্রাণ অপলক!
মানস অম্বর মোর গিয়াছে খুলিয়া
সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ল'য়ে শান্ত স্থির সার,
হে দেবি, যোগিনি মোর, অতি সন্তর্পণে
খুলি দিলে তব পুণ্য দেবালয় দ্বার!
তোমারি নূপুর রবে কিঙ্কিণি কঙ্কন
শতমুখে উঠে বাজি দেবতা-আরতি;
তোমারি নয়ন হ'তে স্বর্গের ইঙ্গিত
ডাকিছে নিখিল বিশ্ব দেবতার প্রতি!
খুঁজেনা তোমার মাঝে যারা দেবতারে—
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তারা মরে তব দ্বারে!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

সৌধ-রহস্য

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিকালে আহারাদির পর আমি সেই তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বাবার নিকট গল্প করিলাম। শনৎসুন তাঁহার সম্বন্ধে যে সব উচ্চ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেই সব কথা শুনিয়া বাবা ত সেই রাত্রেই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক বুঝাইয়া আমরা দুই ভাই বোনে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম।

রাত্রি প্রায় বারটা! কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বক্ররেখায় পশ্চিম আকাশের গায় গড়াইয়া পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে বাগানের শিশুগাছ ও ঝাউগাছের ছায়া দীর্ঘতর হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, দূরে কোথাও কুকুর ডাকিয়া স্তব্ধ রজনীর সুপ্ততাকে সজাগ করিয়া দিয়া গেল; আমি বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে বসিয়া মনে মনে গত রজনীর ঘটনাবলির আলোচনা করিতেছিলাম, রাত্রি যেমন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল—আমার অন্তরের চিন্তাও তেমনি গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল! সহসা কোমল-মৃদু করস্পর্শে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, এসথার আমার নিকটে কখন যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমি অনুভব করিতেও পারি নাই।

কম্পিত শীতল হাত দিয়া আমার বাহু বেষ্টন করিয়া অত্যন্ত মৃদু কোমল স্বরে সে কহিল, "দাদা, আমাদের ক্লুমবারের বন্ধুদের উপর আমরা কি অন্যায় কচ্চি, তাঁদের কি আমরা ভুলে যাচ্চি না? গত রাত্রির উত্তেজনায় তাঁদের ভয় ও বিপদের কথা আমাদের মাথা থেকে সরে যায়নি কি; দাদা?"

আমি হাসিয়া তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিতে করিতে কহিলাম "ঠিক বলেছ এসথার? এই সব বাইরের ঘটনায় তাঁদের কথা—অনেকখানি ভুলিয়ে দিয়েচে বই কি? কাল সকাল বেলাই আমি ক্লুমবারে গিয়ে তাঁদের খবর নিয়ে আসব—এখন,—কিন্তু—কালই—৫ই অক্টোবর নয়? মধ্যে আর একটি দিন—তা হলেই সব বিপদ কেটে যায়?"

ভগিনী ম্লান গম্ভীর মুখে, ব্যথিত শ্বাসে উত্তর দিলেন "কিম্বা সব বিপদটাই ঘটে যায়!" বৃক্ষপত্রের অবসরপথ দিয়া ম্লান জ্যোৎস্না তাহার মলিন মুখে পতিত হইয়া মুখখানাকে একেবারে বিবর্ণ পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার বেদনাব্যথিত কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব দুঃখ অনুভব করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "হয়েছে কি এস্‌থার? তুমি এমন করে কথা বলচ কেন?" এস্‌থার আমার আর একটু নিকটে আসিয়া লজ্জিত কুণ্ঠার সহিত উত্তর দিল "কি জানি, আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে, কেমন যেন মনে হচ্চে—যারা আমাদের ভালবাসার পাত্র তাদের মস্ত একটা বিপদ এগিয়ে এসেচে। আচ্ছা ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা? ওরা আমাদের

এখানে কিছুদিন থাকতে ইচ্ছে কচ্চে কেন?

আমি উদাসীন ভাবে কহিলাম "সন্ন্যাসীরা?—ওদের কত রকম ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, নিয়ম আছে, তারি জন্যে নির্জ্জন জায়গা দেখে পছন্দ হয়ে গেল,—কোন বিশেষ কারণের জন্যেই কি রয়ে গেল—তা না?"

অত্যন্ত ভীত জড়িত স্বরে সে আস্তে আস্তে উত্তর দিল "না দাদা তা নয়? আচ্ছা তোমার কি মনে হচ্চে না যে জেনারলের বিপদ সম্ভাবনা ভারতবর্ষ বা ঐ ভারতবর্ষীয়দেরই থেকেই?" এসথারের সন্দেহ আমায় ভাবাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু মনের চিন্তাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না দিয়াই—আমি হাসিয়া কহিলাম "তোমার বিচার করবার ক্ষমতা দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি এসথার! হতে পারে জেনারেলের বিপদ বা ভয়, ভারতবর্ষ থেকেই—কিন্তু শনৎসুনের সম্বন্ধে তুমি যা ভাবচ—তাঁকে যদি দেখ তাহলে এই ভাবনার কথা মনে করে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়বে। শুকন রুটি, আর ঘাসের বিছানাই যাঁদের যথেষ্ট বলে মনে হয় সেই সব ত্যাগী মহাপুরুষদের কাছে তুমি কি অনিষ্টের আশঙ্কা করতে পার এসথার?

যেন একটু সাহস পাইয়া লজ্জিত ম্লান হাস্যের সহিত সে উত্তর দিল "তাহলে আমার এমন বিচলিত হওয়া বা তাঁদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব মনে আনা ভাল হয়নি, দাদা! কিন্তু তুমি আমায় কথা দাও—বল, কাল সকালেই তুমি ক্রুমবারে যাবে? আর যদি জেনারলের সঙ্গে দেখা হয় তা হলে এই নবাগত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কথা তাঁকে বল্‌বে? এঁরা কেন এলেন—সত্যিই কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা আমাদের চেয়ে তিনিই বেশী বুঝ্‌তে পারবেন।"

বাহিরে ঠাণ্ডা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছিল। চাঁদ আমাদের সম্মুখ ছাড়িয়া ছাদের মাথায় উঠিয়া পড়ায় জ্যোৎস্নাও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। আমি কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে কহিলাম, চল ঘরে যাওয়া যাক্—শীত লাগ্‌চে।—তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখ্‌ব—সকালে উঠে প্রথমেই আমি ক্রুমবারে যাব,—আর জেনারলের সঙ্গে দেখা করে এই সন্ন্যাসীদের কথা সব বল্‌ব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমারও একটা কথা আছে,—বাকী রাতটুকু তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমিয়ে নাও—কোন ভয় নেই।" এসথার চলিয়া গেল কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে তাহার মুখের ভাব যতটুকু আমার দৃষ্টিগোচর হইল—তাহাতে মনে হইল বালিকা সান্ত্বনা পায় নাই—গভীর বেদনায় সে মুখ পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছে! চোখের দৃষ্টি কি নৈরাশ্যময়!—আমার মনে হইল সরলা এসথার যদি একবার সন্ন্যাসীকে দেখিত!

এসথারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার ভয় ভাঙ্গাইবার অভিপ্রায়েই আমি তাহার ইচ্ছা পালনে সম্মতি দিয়াছিলাম। নতুবা সকাল বেলার অম্লান সূর্য্যালোকে যে উন্নত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছি সেই অহিংসাধর্ম্মাবলম্বী তিনটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আমার আত্মা একান্ত অনিচ্ছুক। ইঁহাদের মনে যে কোন দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে অথবা ক্রুমবারের সহিত কোন শুভাশুভ

ঘটনায় তাঁহাদের সংযোগ আছে—এ কথা ভাবিতেও আমি নিজে নিজে লজ্জিত হইলাম।

* * *

পরদিন প্রাতরাশের পর এসথারের নিকট অঙ্গীকৃত বাক্য পালনের ইচ্ছায় আমি ক্রুমবারের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বিশেষতঃ আজ আমার সঞ্চয়ের অভাব ছিল না নিতান্ত দীন দর্শনপ্রার্থীর ন্যায় আমায় রিক্ত হস্তে দাঁড়াইতে হইবে না। আজও সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন কৌতূহলের লেশমাত্রও বর্জ্জিত ক্রুমরারবাসী, গতপূর্ব্ব রজনীর ঘটনা সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ, ইহাতে আমার মনে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

ক্রুমবার প্রতিদিনের মতই অচল গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ধ্যানাসীন। পরশ্ব রাত্রে বিশ্বধ্বংসী বিদ্রোহের চেষ্টা তাহার গাম্ভীর্য্যের ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিলেও—তাহার ছাপ মারিয়া দিয়া গিয়াছে। সৌধের স্থানে স্থানে চূণ সুরকি খসিয়া গিয়া ইষ্টক বাহির হইয়াছে। রাস্তার ধারের বড় বড় গাছগুলার কতক কতক অর্দ্ধভগ্ন!

বেড়ার ছিদ্র দিয়া যত দূর দেখিতে পাওয়া যায় পথে, বাগানে, জানালায়, কোথাও মনুষ্য বা মনুষ্যবাসের চিহ্নটিও দেখিতে পাওয়া গেল না। বেড়ার ধারে যে প্রকাণ্ড দেবদারু গাছটা ঝড়ে উৎপাটিত হইয়া রণাহত সৈনিকের মত ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা তেমনিই পড়িয়া আছে, সরাইয়া ফেলিবার কোন বন্দোবস্ত করাও হয় নাই। চারি ধারের উঁচু বেড়াটা ছাড়া আর কোথাও এতটুকু পরিপাট্য বা যত্ন লওয়ার চিহ্নই নাই। স্তব্ধ নির্জ্জনতা মৃত্যুর বিভীষিকার মতই আমার মনে ধীরে ধীরে কোন অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল। সকাল বেলার ঠাণ্ডা বাতাস রাস্তার ধারের ঝরা পাতায় মর্ম্মর রব তুলিয়া যেন কে প্রিয়বিয়োগ বেদনাতুরের ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি বহিয়া আনিতেছিল। সেই দুর্গপ্রাকারের আদর্শ অনুকৃতি প্রাচীরটা ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় কি না? এই উন্মত্ত দুরাশা মুহূর্ত্তের জন্য আমার চিত্তে স্থান পাইয়াছিল। এসথারের নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জেনারলের সংবাদ পাইতেই হইবে, বাটীর কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় কি? পথের ধারের পাইন গাছের তলায় হস্তস্থ সংবাদ পত্রখানা বিছাইয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া, ক্রুমবারের দিকেই বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দূরে যেন একটা চাবি খোলার আওয়াজ হইল। উঠিয়া বেড়ার ছিদ্রে চক্ষু সংলগ্ন করিতেই দেখিতে পাইলাম জেনারল হিথারষ্টন অত্যন্ত বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে বাহির হইয়া আসিতেছেন, আমি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার সৈনিকের বেশ। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্ কোম্পানির যে ফ্যাসানের পোষাক ক্যাটলগে দেখা যায়, তেমনি ফ্যাসনের বেশ আধুনিক সৈনিকদের মত নহে; বহুকালের ব্যবহারে লাল কোট্‌টার বর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ট্রাউজারটা পূর্ব্বে বোধ হয় সাদাই ছিল, এখন কেমন ঘোলাটে হল্‌দে রঙ্গের দেখাইতেছিল। বক্ষদেশে পদস্থ সৈনিকের সম্মানচিহ্ন সুবর্ণ ষ্টারমেডেল ঝুলান। খাপখোলা চক্‌চকে তরোয়ালখানা কোমরবন্ধ

হইতে ঝুলিতেছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার জন কোম্পানির একটি অফিসের জীবন্ত চিত্র।

আশ্চর্য্য! সেই ভিক্ষুক রুফাস্‌স্মিথও সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর পশ্চাদ্‌গামী অধঃস্তন কর্ম্মচারীর ন্যায় সম্ভ্রমের সহিত পদচারণা করিতেছিল। তাঁহারা কথাবার্ত্তায় তন্ময় হইয়া ভিতরের ময়দানটা পরিক্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম সে অবস্থাতেও তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি বার বার দক্ষিণে ও বামে পতিত হইতেছিল।

জেনারলের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু এখন তাঁহাকে একা পাইবার কোন আশাই নাই দেখিয়া আমি বেড়ার গায়ে জোরে জোরে আঘাত করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহারা যেন তাড়িতাহতের মতই দরজার দিকে ফিরিলেন, তাঁহাদের মুখে ভয় ও বিরক্তি সমভাবেই ফুটিয়া উঠিল। আমি আমার পিচের ছড়ী গাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলাম, যাহাতে তাঁহারা শব্দের উৎপত্তি স্থানটা সহজে বুঝিতে পারেন। চমকিয়া জেনারল সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাঁহার মুখে চোখে ভয়ানক দুঃখের ভাব প্রকাশ পইতেছিল, তিনি যেন অত্যন্ত চেষ্টার সহিত সে আবেগ গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, হাত ধরিয়া রুফাস্ তাঁহাকে গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিল। তাঁহাদের ভয়াতুর দেখিয়া আমি একটু জোরের সহিত জানাইলাম যে আমি ওয়েষ্ট আর একাকী!"

আমার কথার ফল ফলিল, তাঁহার মুখের ক্লিষ্ট বিবর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া আনন্দ ও উৎসাহের সজীবতা দেখা দিল। একটু আগ্রহের সহিত জেলারল আমায় অভ্যর্থনা করিয়া, স্নেহব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "ওয়েষ্ট, সত্য সত্যই তোমার ভারী দয়া, বিপদের দিনেই আত্মীয় অনাত্মীয় বেশী চেনা যায়, তোমায় এখন আমার বাড়ীর ভিতর আসতে বল্লে তোমার উপর কিছু অন্যায় করা হবে, কিন্তু তোমায় দেখে সত্যই আমি ভারি খুসী হয়েচি।" তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ কথাগুলিতে আমি অন্তরের মধ্যে একটি আনন্দ অনুভব করিয়া কহিলাম "আপনাদের কদিন কোন খবর না পেয়ে আমরা ভারী ভাবিত হয়ে পড়েছিলুম। কেমন ছিলেন আপনারা ঝড়ের রাত্তিরে?"

"যেমন থাকা উচিত—কিন্তু কালথেকে আমরা সম্পূর্ণরূপেই ভাল থাকব।—করপোর‍্যাল কাল থেকে আমরা নতুন লোক হয়ে যাব—না?"

করপোর‍্যাল সামরিক প্রথায় সেলাম করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ হুজুর কাল আমরা ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকের মতই নিরাপদ হয়ে যাব।" জেনারল কহিলেন আমাদের দুজনের মনই আজ অন্য দিকে রয়েচে, কিন্তু তার দরকার নেই; আমার বিশ্বাস সবই ঠিক আছে, আর ঈশ্বর ত আছেন তাঁর কাজের উপর ত কারু হাত দেবার ক্ষমতা নেই, সবই তাঁর ইচ্ছা! তোমরা কেমন ছিলে?" আমার বক্তব্য বিষয়টি জানাইবার এই শুভ অবসর! আমি কহিলাম "আমরা একটা বিষয় নিয়ে ভারী ব্যস্ত ছিলুম—পরশু রাতে

যে প্রকাণ্ড জাহাজখানা ভেঙ্গে গ্যাছে আপনারা বোধ হয় তার কোন খবরই শোনেন্ নি?"

অনাগ্রহ ভাবে যোদ্ধা পুরুষ উত্তর দিলেন "কিচ্ছুনা।" যুদ্ধ যাঁহাদের ব্যবসায়, বিপদ এবং মৃত্যু যাঁহাদের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত এ সব ছোট খাট সংবাদে তাঁহাদের চিত্তকে সহজে টলাইতে পারে না! আমি পুনশ্চ কহিলাম "ঝড়ের শব্দে আপনারা বোধ হয় জাহাজের সিগনালের জন্যে যে কামান ছোঁড়া হয়েছিল তার শব্দ শুনতে পান্ নি। ঝড়ের রাত্রে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ আমাদের উপসাগরে এসে চোরা পাহাড়ে ধ্বংস হয়ে গ্যাছে। ইণ্ডিয়া থেকে জাহাজখানা আস্‌ছিল"—

"ইণ্ডিয়া থেকে!" একটা আশ্চর্য্য রকম চীৎকারের সঙ্গে জেনারল এইরূপ প্রতিধ্বনি করলেন।

"হাঁ—সৌভাগ্য ক্রমে তার যাত্রীগুলি সবই বেঁচে গ্যাছে। আর কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে তাঁদের গ্লাসগোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে।" মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখে সংশয়পূর্ণ স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন "সবাইকে? তাদের সবাইকে ওঠান হয়ে গ্যাছে?" তাঁহার কণ্ঠে যে হতাশার স্বর ধ্বনিত হইল সে স্বর শুনিয়া আমার বক্তব্য বিষয় জানাইতে আমি যেন কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এখন আর কথা ফেরান চলে না, যেন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত বিস্ময়ের সহিতই আমি কহিলাম, কেবল তিন জন তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী—তাঁরাই কেবল কিছু দিন এখানকার নির্জ্জনতা ভোগ করবার জন্যে রয়ে গেলেন?" আমি বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম ঝটিকাহত বৃক্ষের মত জেনারলের সুদীর্ঘ দেহ কম্পিত হইতেছে, হঠাৎ আবেগতাড়িত কণ্ঠে যেন তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া আর্ত্তনাদের মত ধ্বনিত হইল "ওঃ ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' পরক্ষণেই আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলিত করিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসিয়া পড়িলেন।

বেড়ার ছিদ্র দিয়া দেখিতে পাইলাম করপোরলের কুৎসিৎ মুখখানার সমস্ত রক্তটা যেন মাথায় উঠিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে হল্‌দে করিয়া দিয়াছে। হেমন্ত কালের ঠাণ্ডাতেও তাহার ললাটে ঘাম ঝরিতেছিল তবুও সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; জেনারলের মত অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। হাতে হাতে ঘসিয়া অত্যন্ত সকরুণ বিলাপোক্তির মত করপোরল বলিতেছিল—"আমার কপাল! সবই আমার কপাল! এতকালের কষ্টের পর যাই একটু আরামের জায়গা ও পেট ভরে খাবার পেয়েচি—অমনি—!"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি এই আকস্মিক ব্যাপারের মর্ম্ম অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ধীরে ধীরে জেনারল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গভীর নিশ্বাসটা সজোরে চাপিয়া ফেলিয়া একটু থামিয়া বলিলেন "ভয় পেওনা বৎস, যাই হোক, যা আসে আসুক আমরা সাহসী সৈনিক, সৈনিকের মতই বিপদের সাম্‌নে দাঁড়াব। তোমার কি চিলেনওয়ালার কথা মনে পড়ে? যখন তোমাকে কামান ছেড়ে আমাদের ব্যূহের মধ্যে

ছুকতে হয়েছিল? যখন শিখ অশ্বারোহীর দল বজ্রের মত আমাদের উপর এসে পড়েছিল, তখনও আমরা নড়িনি আর এখনও আমরা নড়বনা। ওঃ, নিজেকে আজ আমার শৃঙ্খলমুক্ত হাল্‌কা বলে মনে হচ্চে। এই অনিশ্চিততাই আমায় পলে পলে হত্যা করছিল, নিশ্চিৎ বিপদ যাই হোকনা কেন তবুও সে মুক্তি!" করপোরাল কম্পিত হাত দুই-খানা বক্ষে বদ্ধ রাখিয়া অস্ফুট স্বরে উত্তর করিল—"আর সেই শব্দ? সেই ভূতের শব্দ? একা যে যাবনা এই টুকুই আমার এখন ভরসা।" দুই স্নেহপূর্ণ চোক্ষের করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মৃদু গম্ভীর স্নেহপূর্ণ স্বরে জেনারল কহিলেন, "বিদায় প্রিয়তম ওয়েষ্ট; গেব্রিয়েলের খুব ভাল স্বামী হোয়ো, তার বাপের অভাব যেন সে তোমার স্নেহে ভুলে যেতে পারে, আর আমার অভাগিনী স্ত্রীকে—" এইখানে জেনারলের স্বর কম্পিত হইল,—"জায়গা দিও—আমার বিশ্বাস কষ্ট ভোগ করবার জন্যে সেও আর বেশী দিন এ সংসারে বেঁচে থাকবেনা। আর মরডণ্ট? সে সোলজারের ছেলে,—সে নিজের পথ খুঁজে নিতে পারবে;—এখন বিদায় বাছা আমার! ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখবেন। আমার জীবনের অন্ধকারের ছায়াও যেন তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ না করে। আবার বলি বাছা আমার দুঃখিনী গেব্রিয়েলের খুব ভাল স্বামী হোয়ো!"

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া জোর করিয়া আমি খানিকটা তক্তা ভাঙ্গিয়া একটু ফাঁক বাড়াইয়া লইলাম। এ সুযোগ হারাইলে আর হয়ত কখনও মিলিবে না। আমি দ্রুত কণ্ঠে কহিলাম "শুনুন মহাশয় শুনুন? মানবরক্ষনতাতীত বিপদের এই যে সম্ভাবনার ভয়—এ আমি আর সহ্য করতে পাচ্চিনা! এইবার বোধহয় আমাদের মাঝখানকার পর্দা কেটে ফেলে দিয়ে সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াবার সময় এসেচে। মুখ ফেরাবেন না। যে অধিকার এইমাত্র আমায় দিলেন—সেই সম্মানিত অধিকারের বলেই আমি জোর করে বল্‌চি স্পষ্ট করে সব কথা আমায় বলুন। বিশ্বাস করুন আমি প্রাণ দিয়েও আপনার জন্য লড়ব, ও সব ভয় মন থেকে তাড়িয়ে দিন, আর কেনই বা ভয়? কিসেরই বা ভয়? আপনি কি ঐ তিব্বতীয় সন্ন্যাসীদের ভয় কচ্চেন—তা যদি হয় আমি আমার বাবার ক্ষমতা নিয়ে এখুনি তাদের নিষ্কর্ম্মা অকেজো বলে গ্রেপ্তার করাতে পারি—বলুন তাই কি? ওদেরই কি আপনি ভয় কচ্চেন?" জেনারলের মুখে দুঃখের সহিত কৌতুকের অতি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অতি দুঃখেও মানুষ হাসে, "না বাছা না,—তা হতে পারে না—এইটুকুই তোমায় অনুরোধ; পাগলের মত ঐ কাজটিই কোরনা কেবল! এ শোচনীয় নাটকের শীঘ্রই শেষ দেখ্‌তে পাবে। এই সব বিষ-য়ের কাগজ পত্র আছে। কোথায় আছে মরডণ্ট জানে, কাল তুমি সব দেখ্‌তে পাবে।"

বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া আমি কহি-লাম—"না, এমন ভাবে আমি আপনাকে কখনই যেতে দেবনা। বিপদ যদি সত্যই কিছু এসে থাকে আমায় এতটুকু আভাষ দিন, যা থেকে আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে পারি। আমার বিবেকের কাছে—ঈশ্বরের কাছে আমায় অপরাধী করে

রাখবেন না, বলুন কিসের ভয় কচ্চেন?" জেনারল একটু ম্লান হাস্যের সহিত ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, "প্রিয় ওয়েষ্ট তোমার কিছুই করবার নেই। ঈশ্বর জানেন সত্য সত্যই কিছু করবার নেই। যা ঘট্‌বে তা ঘট্‌তে দাও—ঘটনাস্রোতকে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ তার কোন্‌দিকে গতি। এমন কোরে কাঠ-কাঠ্‌রার বেড়া দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করাই আমার পাগলামী হয়েছিল। কিন্তু কথা কি জান—একেবারে নিরীহ অদৃষ্টবাদীর মত নিজেকে ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয় না, তাই যতটুকু পেরেছিলুম সাবধানতা নিয়েছিলুম। আমার এই দুর্ভাগাবন্ধু আর আমি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছি যা কেহই কখন কল্পনাও করেনি। এখানে মানুষের হাত নেই, তাই আমি এখন অসীম ক্ষমতাপন্নের উপর আত্ম নির্ভর করেচি, মানুষের সাহা-য্যের আর আমার আবশ্যকই নেই। আমার বিশ্বাস জীবনে যে কষ্ট পেয়ে গেলুম পর জীব-নের জন্য আমার আর কিছুই সঞ্চয় রইল না। এইবার তোমার আমাকে ছেড়ে যেতে হবে কারণ আমার অনেক কাজ বাকী আছে,—কতকগুলি কাগজ পত্র পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে কতক গুলি লিখ্‌তে হবে, অনেক গুলি জিনিষ গুছিয়ে রাখতে হবে। প্রিয় বৎস ক্ষুণ্ণ হোয়োনা, মানুষ অবস্থার দাস, পুরুষকার সব সময় জয়ী হয় না, আমার জন্য দুঃখ কোর না মুক্তিতে আমি শান্তিলাভই করব। বিদায়, সুখী হোয়ো বাছা!"—তক্তা ভাঙ্গিয়া আমি যে পথটুকু করিয়াছিলাম তাহারই ভিতর দিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমার করমর্দ্দন করিলেন। তাহার পর অত্যন্ত সহজ ভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে হলের দিকে গম্ভীর মুখে চলিয়া গেলেন। নতশিরে দুর্ব্বল পদ-ক্ষেপে করপোরাল খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার অনুগমন করিল। জেনারল হিথার-ষ্টনের সেই ভীত সন্দিগ্ধ দুর্ব্বলতার এতটুকুও চিহ্ন এখন নাই। কি এ বিপদ? যাহার সম্ভাবনার ভয়ে অতবড় সাহসী সেনাপতিকে আসনতাড়িত বালকের মত ভয়াতুর করিয়া তুলিয়াছিল এবং যাহার উপস্থিতি অনুভব মাত্রেই তিনি সাহসী সৈনিকের ন্যায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন?

শ্লথ গতিতে ঘরের পথে ফিরিতে আমার প্রথম চিন্তার বিষয় হইল আমি এখন কি করিব? সহসা এসথারের কথা মনে পড়িয়া গেল, বালিকা সন্দেহ করিয়াছিল যে সেই তিনটি পশ্চিম দেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আগ-মনের সহিত জেনারলের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের সূত্র জড়িত? বুদ্ধিমতী বালিকা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা যে অমূলক নহে এই চিন্তা আমার মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শনৎসুনের সেই মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক প্রশান্ত, সহাস্য, জ্ঞানদীপ্ত মুখচ্ছবি আমার অন্তরে উদিত হইল। তাঁহার মুখের সেই উদার কথাগুলির সহিত মিলাইয়া আমি কোন অপ্রিয় ঘটনারই কল্পনা করিতে পারিতেছিলাম না। তেমন লোকের দ্বারা কাহারও কি ক্ষতি হওয়া সম্ভব? আমি ভাবিতেছিলাম সেই কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশ জালের অন্তরালে তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভিতরে কি কখন ভয়ঙ্কর ক্রোধ আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে পারে? তবে এই-টুকু বলিতে পারি যে, আমি ভাবিয়া দেখিলাম

সমস্ত জগৎ সংসার যদি আমার উপর রাগ করে আমি হয়ত অনায়াসেই তা সহ্য করিতে পারি কিন্তু সে মুখের ক্রোধ আমি কল্পনা করিতেও ভয় পাই—সহ্য করা ত পরের কথা!

আরও একটা কথা ভাবিতেছিলাম সেই মনুষ্য নামের কলঙ্ক রুফাসস্মিথ্ আর এই বিখ্যাত যোদ্ধা উচ্চপদস্থ জেনারেল একত্র মিলিত হইয়া ঝটিকাকংচ্যুত এই তিনটী ফকিরের নিকট কি এমন গুরুতর অপরাধ করিলেন বা করিয়াছেন এও একটা জটিল প্রশ্ন? যদি স্বীকার করিয়া লওয়াই যায় যে সেই অর্থ, অস্ত্র এবং লোকবলহীন সাধুদের দ্বারা জেনারেল হিথারষ্টনের শারীরিক কোনরূপ অনিষ্ট ঘটা বাস্তবিকই সম্ভব তবে উহাদের বিরুদ্ধে পুলিষ বা মাজিষ্টেটের নিকট সাহায্য গ্রহণে আপত্তি কেন? আমাকে যদি সেই উদারতার প্রতিমূর্ত্তি সৌম্যসুন্দর শনৎসুনের বিরুদ্ধে কোন উপায় দেখিতে হইত—তাহা হইলে যে আন্তরিক সদ্ভাবের সহিত তাহা দেখিতাম না, একথা অস্বীকার করি না; তবু উপায় ত ছিল!! জেনারেল বিশেষভাবে এইটুকুই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন—তবে? পুলিষের নিকট উঁহাদের সংবাদ জানাইতেই কি তাঁহার আপত্তি? ঈশ্বর জানেন কি! জেনারলের সহিত আলাপে আমি তাঁহাকে যতটুকু বুঝিয়াছি, আমার বিশ্বাস কোন গর্হিত অসৎকার্য্য তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

এ সকল আত্মগত প্রশ্নের কোন সদুত্তর মিলিল না, সেই দুইজন সাহসী যোদ্ধার ভাব ও ভাষা আমায় ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সভয়চিন্তা যে একেবারেই ভিত্তিহীন বা সম্পূর্ণ অমূলক তাহা আর আমার মনে হইতেছিল না। সমস্তটাই প্রহেলিকা!—এ প্রহেলিকার উত্তর নাই। আমি এখন কি করিব? কেবল প্রার্থনা ও চিন্তা করা ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে। জেনারলের কথা হইতে যতটুকু বুঝিয়াছিলাম তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়—যে, যে ঝড় উঠিয়াছে তাহা কেবল উঁহাদের দুইজনেরই জন্য। গেব্রিয়েল বা তাহাদের দুঃখিনী মা সে ঝড়ের লক্ষ্য নহেন।

চিন্তামন্থর গতিতে গৃহের পথে চলিতে ছিলাম। কোথায় যাইতেছি কেন যাইতেছি তাহাও স্মরণ ছিল না। সহসা বাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া চিন্তা হইতে বিরত হইলাম। কি আশ্চর্য্য অন্য মনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে যে একেবারে আমাদের বাড়ীর গেটের ধারে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছি।

পৃথিবীর কাজ কর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়া বাবা আজ কাল তাঁহার শরীরমন জ্ঞানের রাজ্যে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সংসারের কোলাহল সেখানে প্রবেশ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাঁহার শান্তি ও আনন্দ অব্যাহত রাখিবার জন্য আমরাও ভাই বোনে যথাসাধ্য যত্ন লইয়া থাকি। কি এমন অদ্ভুত আকর্ষণে তাঁহাকে সাহিত্য জগৎ হইতে এতদূরে বাহিরের সংসারে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইল অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঝাউগাছের অন্তরাল দিয়া ধীরে

ধীরে আমি অগ্রসর হইতে ছিলাম। সহসা অতিমাত্র বিস্ময়ানন্দে আমার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়া আমাকে গতিহীন করিয়া দিল। আমার মনের চিন্তা শনৎসুনের সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া বাবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। বাগানের একখানা লৌহ বেঞ্চতে বসিয়া দুইজনে কোন বিষয়ে তর্ক চলিতেছিল। অঙ্গুলির আঘাতে প্রত্যেক কথার উপর জোর রাখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছিলেন। টেবিলের হাতার উপর দুই হস্তের ভার রাখিয়া সন্ন্যাসীর দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বাবা অত্যন্ত প্রবল প্রমাণ প্রয়োগে তাঁহার বিপক্ষমত খণ্ডন করিতেছিলেন। তর্কের হার জিত বুঝা যাইতেছিল না। দুজনেই পণ্ডিত দুজনেই স্বমতের যথার্থতা প্রমাণে সচেষ্ট। তাঁহারা তর্কে এমনি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে আমি প্রায় দুই তিন মিনিট তাঁহাদের ঠিক পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম তথাপি তাঁহারা আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

প্রথমে সন্ন্যাসী আমায় দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম দর্শনে যেমন ভাবে অভিবাদন করিয়াছিলেন—ঠিক তেমনি করিয়া অভিবাদন করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন "আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌ব স্বীকার করেছিলেম তাই আজ দেখা কর্‌তে এসেচি। দেখুন আমি কথা রেখেচি। হিন্দুধর্ম্ম, সংস্কৃত শাস্ত্র নিয়ে আমাদের প্রায় একঘণ্টা তর্ক চল্‌চে—এখন আমরা এমন একটা স্থানে এসে পৌছেচি—যে কেউ কারু মত বদলাতে পার্‌চিনা। জেমস্ হাণ্টার ওয়েষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ব'লে যাঁর নাম প্রতিগৃহে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রতর্কে আমি সমকক্ষ হতেই পারি না। কিন্তু এই একটি বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা করেচি আর তার দ্বারা যতটুকু বুঝেচি সেই অভিজ্ঞতার বলেই বল্‌চি ওঁর মত অভ্রান্ত নয়।" বাবার দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিলেন "আমি আপনাকে জোর করে বল্‌তে পারি যে খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দিতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের ভাষাই ছিল সংস্কৃত।" বাবা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন "কিন্তু আমও জোর করে বল্‌তে পারি সে সময়ে বিশিষ্ট বিদ্বৎসমাজ ভিন্ন সংস্কৃত ভাষা অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন। আমি প্রমাণ দেখাব। কেবল ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান শাস্ত্র লেখবার সময় সংস্কৃতের ব্যবহার হোত। ইউরোপের মধ্যযুগেও ঠিক্ এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—জনসাধারণ লাটিনভাষা ভুলে গেলেন, কেবল ভাল ভাল বই লাটিনে লেখা হোত, তা ভিন্ন তার চলন ছিল না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "আপনি যদি বিশেষ ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—তাহলে দেখ্‌তে পাবেন আপনার মত অভ্রান্ত নয়।" বাবা কহিলেন "আপনি যদি রামায়ণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র মন্থন করেন তাহলে দেখ্‌বেন কার ভুল"। সন্ন্যাসী কহিলেন "আচ্ছা কুল্লুভট্ট দেখুন?" বাবা বিজয়োল্লাসে উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "বেশ তাহলে অশোকের কথাই হউক। খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে —পরে নয়—এটা যেন মনে থাকে,—অশোক

বৌদ্ধ ধর্ম্মসূত্র প্রচারের জন্য স্তম্ভে শিলা লিপিতে কি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, সংস্কৃত কি?" "না"—

"আচ্ছা সংস্কৃত নয় কেন? কারণ তাঁর সময়ের প্রজাবৃন্দ ও ভাষার একবর্ণও বুঝ্‌তে পারত না। অশোকের শিলালিপি সম্বন্ধে আপনি কি অনুমান করেছেন?" শনৎসুন কহিলেন "আমার বিশ্বাস নানা ভাষায় শিলালিপি লেখা হয়েছিল,—যা হো'ক আমরা বাজে কথায় আমাদের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট কচ্চি, আমাদের এ তর্কের শেষ হওয়া খুব শীঘ্র সম্ভব নয়। আজ এইখানেই থাক।" বাবা একটু দুঃখিত ভাবে কহিলেন "আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বড় সুখ পেয়েছিলেম—এখানে এসে কথা কইবার লোক পর্য্যন্ত পাইনে, তবে এই নির্জ্জন স্থান পাঠের পক্ষে আমায় খুব সাহায্য করেচে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "সূর্য্যদেব মধ্যগগন অতিক্রম করে যাচ্চেন আমি আর বিলম্ব করবনা, আমায় সঙ্গীদের সঙ্গে মিলতে হবে।" বাবা নম্রস্বরে কহিলেন "ভারী দুঃখের বিষয় আমি তাঁদের দর্শন পেলুম না।" বাবার মুখে ঈষৎ দুঃখিত ও কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে বাবা তাঁহার অতিথির সহিত তর্কে পাছে আতিথ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া থাকেন সেই ভাবনায় যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ন্যাসী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "তাঁরা এখন সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছেন—পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের কোন খোঁজ নেই, পাছে লোকসঙ্গ মনের চাঞ্চল্য আনয়ন করে সেই জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। ছয় মাস সমাধিতে থেকে তৃতীয় অবতারের রহস্য জানবার প্রতীক্ষায় আছেন। হিমালয় থেকে নামবার পূর্ব্বেই তাঁরা এই সাধনা আরম্ভ করেচেন। মিঃ হাণ্টার ওয়েষ্ট বিদায়,—আর কখনও আপনার সঙ্গে দেখা হবে না; বড় আনন্দ পেলেম আপনার সঙ্গে কথা কয়ে। আপনার শেষ জীবন আনন্দেই কাট্‌বে, শান্তি ও আনন্দ লাভের যথার্থই আপনি উপযুক্ত অধিকারী। আপনার ভারতবর্ষীয় জ্ঞানচর্চ্চা আপনার দেশের ও সমাজের উপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে। নমস্কার!" একটুখানি সঙ্কোচের সহিত আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার সঙ্গেও কি আপনার আর দেখা হবে না?"

"আমার সঙ্গে যদি সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যান তবেই—কিন্তু বোধ হয় আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, সকালে কোথায় বেরিয়েছিলেন না?" আমি আন্তরিক আনন্দের সহিত উত্তর দিলাম "তা হোক্, আপনার সঙ্গ আমাকে খুবই আনন্দ দান করবে।" সন্ন্যাসী আপত্তি না করায় আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। বাবাও খানিক দূর আমাদের সহিত আসিয়াছিলেন। আমার মনে হইল সেই অমীমাংসিত সংস্কৃত তর্ক আরো খানিকটা চালাইতে তাঁহার মনে মনে খুব ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু পথ চলা ও ও কথা কহা—এই দ্বিবিধ ব্যায়ামের শক্তি তাঁহার শরীরে না থাকায় তিনি নীরবে চলিতেছিলেন। বাবা ফিরিয়া গেলে সন্ন্যাসী কহিলেন "উনি, মিঃ হাণ্টার ওয়েষ্ট মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি,—কিন্তু এমন অনেক লোক

আছেন যাঁরা নিজের ধারণাকেই অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন। জ্ঞানের সর্ব্বতোমুখী বিকাশে এ ভাবটা সহজেই কেটে যায়।"

নীরবে নতশিরে সমুদ্রবেলায় বালুকার উপর দিয়া আমি তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলাম; তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর দিলাম না। সমুদ্রের ধারে উচ্চ বালুকাতীর যেন পর্ব্বতের অনুকরণে যোজনব্যাপী হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণদিকে রৌপ্যের মত চক্‌চকে জলরাশি;—সেই রূপার পাতখানা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কোন জাহাজ বা কিছুই নাই, জনহীন সমুদ্রতীরে—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর আমি! প্রকৃতির সেই নির্জ্জন পথে দুইটিমাত্র যাত্রী পাশাপাশি চলিতেছিলাম, সহকারী কাপ্তেন হকিংস এই সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যে সব ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, জেনারল হিথারষ্টনের সভয় উক্তি হইতে ইঁহাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থিত,—এখন এই সুগভীর নির্জ্জনতার ভিতর সেই চিন্তা আমার মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। মনে হইল স্বেচ্ছায় নিজেকে সেই অসীম ক্ষমতাশালীর হস্তে শিশুর করধৃত ক্রীড়নকের মতই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া দিয়া হয়ত ভাল কাজ করি নাই। তথাপি সেই মহত্ত্বব্যঞ্জক উন্নত মূর্ত্তির কালো চোখের শান্ত করুণকোমল দৃষ্টির বিরুদ্ধে আমার অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী করিতে আমি একান্তই অক্ষম। সমুদ্রের জলকণশিক্ত বাতাস আমার মাথার চুলগুলি দোলাইয়া দিয়া মৃদু-গুঞ্জন-মর্ম্মর ধ্বনিতে যেমন ক্ষণভাবে বহিয়া গেল, আমার অন্তরের অপ্রিয় চিন্তাও তেমনি অস্পষ্টভাবে মনের কোণে ছায়া ফেলিয়াই মিলাইয়া গিয়াছিল। সে মুখ হয়ত কাহারও কাহারও নিকট ভীতিপ্রদ হইতে পারে—কিন্তু সে হৃদয়ে অন্যায়ের স্থান থাকিতে পারে না। সে হস্তে নির্দ্দোষীর প্রতি অন্যায়দণ্ড বর্ষিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। ঘনকুঞ্চিত সুপ্রচুর শ্মশ্রুরাজিমণ্ডিত অতি সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই সঙ্গে তাঁহার পরিহিত পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া আমার মনে হইল এ মুখে এ শরীরে সে বেশ মানায় নাই। আমি তাঁহাকে মনে মনে যে সুদৃশ্য ছাঁটকাটওয়ালা রাজার পোষাক পরাইয়া দিলাম সে অঙ্গে তাহাই শোভনীয়। ইহাতে তাঁহার মধুরতা আর সৌন্দর্য্য যেন সবটুকু অন্তরের ভিতর অনুভব করা যায় না। এ যেন গল্পকথার রাজপুত্র ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন।

আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম সেও একটি নির্জ্জন স্থান; একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর।—বোধ হয় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে সেই গৃহের অধিকারী তাহার সমস্ত স্বত্ব নিস্বার্থভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাম্‌নের দরজাখানা হয় ত ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে—নতুবা কোন দরিদ্র লোক লইয়া গিয়া জ্বালানি করিয়াছে। ঘরখানা অহিফেনসেবী পুরাতন রোগীর ন্যায়—এখনও তাহার জীর্ণ পঞ্জর কয়খানার জোরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই অদ্ভুত প্রকৃতির মানবেরা জমীদারের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ, সুখপূর্ণ প্রাসাদবাস ত্যাগ করিয়া এইখানেই নিজেদের বাসস্থান স্থির করিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভিখারী যে সেও সম্ভবতঃ এই গৃহে বাস করিতে ঘৃণা বোধ

করিত। একখানি ছোট বাগান, গৃহস্বামীর সৌখীনত্বের পরিচায়করূপে কোন সময় তাহার সবুজ শোভায় সাদা রাঙ্গা পত্রপুষ্পে অথবা দরিদ্রগৃহের অভাবমোচক শাক্‌সবজীতে পূর্ণ করিয়া স্নেহবাহুবেষ্টনে তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে বাগান—কতকগুলি শুষ্ক এবং সতেজ কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন। আমার সঙ্গী সেই কণ্টক বনের মধ্য দিয়া লঘু চরণ ক্ষেপে ধীরে ধীরে দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভিতরের দিকে চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, তিনি অত্যন্ত নম্র অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে কহিলেন। "মিঃ ওয়েষ্ট তুমি এমন একটি সুযোগ পেয়েচ—যা অল্প ইউরোপ-বাসীর ভাগ্যে ঘটে থাকে। ভিতরে চেয়ে দেখ—দুটি যোগী—যাঁরা সাধনার চরম অবস্থার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। এঁরা এখন অন্তরচিন্তায় সমাধিগ্রস্ত। নতুবা তোমায় এখানে আন্‌তে আমি সাহসই করতেম না। তিব্বতের "রডকের" পবিত্র মঠে এখন এঁদের মুক্ত আত্মা বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এই দেহ এখন আত্মাশূন্য।

ধীরে ধীরে পা ফেল, দেখ' যেন মানবের সান্নিধ্যে সাধনার ব্যাঘাত হয়ে যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়ে না যায়; তাঁদের আত্মা যেন অতৃপ্ত হয়ে ফিরে না আসে। আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দেহের ভর রাখিয়া কণ্টক গুল্মের হাত বাঁচাইয়া দরজার উপর উঁকি মারিয়া দেখিলাম। বহুকাল মানববর্জ্জিত ক্ষীণালোক গৃহে কোন গৃহ সজ্জাই বিদ্যমান ছিলনা। এক কোণে কতকগুলি শুষ্ক খড় শয্যারূপে পড়িয়া রহিয়াছে। অসমতল স্যাঁৎসেতে মেজে ঢাকিবার জন্য কোন আচ্ছাদন নাই। মৃত্তিকা-আসনে যোগী দুই জন বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বসিবার ভঙ্গিও অদ্ভুত। দুই পদ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত—ক্রোড়দেশে সংস্থাপিত। এবং তদুপরি যুগলহস্ত বদ্ধাঞ্জলিরূপে ন্যস্ত। মস্তক ও মুখমণ্ডল নত হইয়া বক্ষদেশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুই জনের আকৃতিরও বিভিন্নতা ছিল। একজন ক্ষুদ্রাকার শুষ্কদেহ; অপরজন দীর্ঘাকৃতি, তাঁহার আস্থিগুলি মোটা; এককালে বোধ হয় খুব লম্বা চৌড়া চেহারা ছিল ইঁহার। এখন তাঁহাদের দেহ কান্তিহীন, সূক্ষ্ম চর্ম্মখণ্ড মাত্র অস্থি গুলি আচ্ছাদিত,—বর্ণের উজ্জ্বল গৌরাভা এ অবস্থাতেও লুপ্ত হয় নাই। তাঁহারা এমনি স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন যে দুইটি প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তির মতই দেখাইতেছিল। কেবল নিয়মিত ধীর শ্বাস প্রশ্বাসই তাঁহাদের দেহে জীবনের চিহ্ন প্রমাণ করিতেছিল। মুখের বর্ণ অত্যধিক পাণ্ডুর, নত মস্তকের তলদেশ হইতে যে নেত্র দুইটি দেখা যাইতেছিল তাহা উন্মীলিত থাকিলেও ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষুতারকা দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না।

একটি কানাভাঙ্গা মৃৎ কলসীতে খানিকটা পানীয় জল এবং একখানা বৃক্ষপত্রে আধখানা রুটি,—তাহারই সম্মুখে একটুকরা কাগজ পড়িয়াছিল। কাগজে বিজাতীয় ভাষায় কোন কথা লিখিত ছিল। শনৎসুন দূর হইতে সেইদিকে চাহিয়া দেখিয়া আমার পানে ফিরিয়া কহিলেন "তুমি বোধ হয় আজ একটা নূতন জিনিষ দেখিলে—? দেহ হইতে আত্মার বিচ্যুতি খুব সম্ভব

আর কখনও দেখ নাই?" আমি কহিলাম "না আমার ভাগ্যে এ সুযোগ আর কখনও ঘটে নাই।" তিনি কহিলেন "এই যে ধর্ম্মবীরেরা শুধু যে এঁদের আত্মাই এখান থেকে বার হয়ে হিমালয়দেশে বিচরণ করে বেড়াচ্চে তা নন—এঁরা যে পোষাকে যে মূর্ত্তিতে এখানে রয়েচেন সুদূর ভিন্ন দেশে শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে ঠিক সেই অবস্থাতেই এঁদের মুক্ত আত্মা আনন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্চে। মহাত্মা যে স্থূলদেহে সেখানে উপস্থিত নাই—তাঁর অত্যন্ত স্নেহপাত্রেরাও তা অনুভব করতে পারবে না।

"কি করে এ ব্যাপার হয়?" সন্ন্যাসী হাসিতে লাগিলেন—"আচ্ছা আমি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। যোগীরা সূক্ষ্ম আত্মার পরমাণুকে তড়িৎবেগে ইচ্ছানুরূপ স্থানে নিয়ে যাবার ক্ষমতা অভ্যাস করেন। সেখানে গিয়ে ইচ্ছাবিলে তাহা স্থূলদেহের আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হতে পারে। পূর্ব্বকালে যখন তাঁদের জ্ঞানের সংকীর্ণতা অধিক ছিল তখন স্থূল দেহকেই এমনি ভাবে প্রেরণ করা হত। কিন্তু সেটা কষ্টকর! সাধনার প্রসারতার সহিত জ্ঞানেরও প্রসারতা বৃদ্ধি হয়েছে। এখন স্থূলদেহবিচ্যুত সূক্ষ্ম আত্মাকেই যোগ বলে যোগীরা যথেচ্ছা প্রেরণ করতে পারেন। এই যোগবল কি সে কথা বোঝান অনেক সময়-সাপেক্ষ,—আমার বিশ্বাস যদি যথার্থ জিজ্ঞাসু হতে ইচ্ছা কর—তোমার বাবার কাছেই অনেক বিষয় জান্‌তে পারবে। তবে পঠিত বিদ্যা ও অনুশীলনের জ্ঞানের যে তফাৎ এক্ষেত্রেও তাহাই। যাই হোক্ তিনি মহাপুরুষ, উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই।" আমি কহিলাম "আচ্ছা আপনারা সূক্ষ্ম দেহে যখন সর্ব্বত্র বিচরণ করতে পারেন তখন অস্থিমজ্জাময় ক্লেদপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাতুর ভারবহ দেহটাকে বহন করে বেড়াবার আবশ্যকই বা কি?"

"জ্ঞানী সমাজে তার কোন প্রয়োজনই নেই, সূক্ষ্মাত্মা দ্বারাই কার্য্য সাধন হতে পারে,—কিন্তু সমাজেরও ত স্তর আছে? সাধারণের সহিত মিলিত হবার জন্য সাধারণ দেহের আবশ্যক নতুবা তারা এঁদের বুঝতে বা দেখ্‌তে পাননা। সূক্ষ্ম আত্মাকে দর্শনের জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও ত প্রয়োজন; সকলেই কিছু সাধু বা দিব্য দৃষ্টির অধিকারী নহেন। মিঃ ওয়েষ্ট—তোমার জ্ঞান স্পৃহা ও সারল্যে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি—এখন বিদায়—"

শনৎসুন বিদায় অভিবাদনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমি তাহা গ্রহণ করিয়া ব্যগ্রতাপূর্ণ স্বরে কহিলাম "আপনার নিকট যে জ্ঞানের কথা শুনলেম তাতে আমি ভারী আনন্দ পেয়েচি। আমাদের এই অল্পক্ষণস্থায়ী পরিচয়ের কথা আমি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌ব।" আমার মুখের পানে দুঃখিত ভাবে চাহিয়া শনৎসুন ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন "তুমি তাতে যথেষ্ট উপকারই পাবে। হয়ত ভবিষ্যতে যা ঘটবে—সাধারণ দৃষ্টিতে তা ভাল মনে হবে না—কিন্তু কোন বিষয়ে সহসা বিচার করো না—মানুষের পক্ষে যতই কঠোর হোক এমন কতকগুলি আইন জগতে আছে—যার কার্য্য পালন করতেই হবে। হয়ত তার ফল লোকচক্ষে নিষ্ঠুর বা নিন্দনীয় হতে পারে কিন্তু তবু আইন অলঙ্ঘ্য; তাকে লঙ্ঘন করবার শক্তি মানব শক্তির

অতীত। তোমাদের দেশের গো বা মেষের নিকটও আমরা ভয়ের পাত্র নহি—কিন্তু যে পাষণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্তপাত করেচে—মানবের আইন তাকে রক্ষা করতে পারে কিনা তা আইনকর্ত্তাই বলতে পারেন। বিদায়—মিঃ ওয়েষ্ট—বিদায়,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—।"

শেষ কথা কয়টী বলিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর মুখে যেরূপ ঘৃণা ও ক্রোধের ছায়া তীব্র রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজিও আমার মনে মুদ্রিত হইয়া আছে। সন্ন্যাসী দ্রুতপদে ভাঙ্গা কুঁড়ে খানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল আমি সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিলাম। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল মথিত করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল, "হায় অভাগা জেনারল! এমন লোকেরও তুমি ক্রোধের পাত্র! নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর নিয়তি!" দূরে আমার দক্ষিণে মেঘমণ্ডিত আকাশের গায়ে সুনিপুন চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি খানির ন্যায় শ্বেত প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছিল। ঐ সুদৃশ্য সুবৃহৎ অট্টালিকার দিকে চাহিয়া যে সকল পথিক ঈর্ষাকুল চিত্তে অট্টালিকাস্বামীর সুখ সৌভাগ্যের আলোচনা করিয়াছে তাহারা কি জানিত যে ঐ একটি মাত্র শুভ্রশির কোন অলঙ্ঘ্য হস্তের উত্তোলিত শাসন দণ্ডের নিম্নে প্রতি মুহূর্ত্তে নত হইয়া রহিয়াছে। আমার মনে হইতেছিল—ঐ যে ধূসর আকাশের গায়ে কালো মেঘ ঘন হইতে ঘনতর রূপে জমা হইতেছিল ও বুঝি তাঁহারই মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশের ছায়ামাত্র। সন্ন্যাসীর কথার ভাবে কোন অশুভ বার্ত্তার আভাষ দিয়াছিল। আমার মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবল ভাবে তোলপাড় করিতেছিল। কাহাকে কহি, কে পরামর্শ দিবে, কিসেরই বা পরামর্শ,—জেনারল সম্বন্ধে কোন কথাই ত হয় নাই, তিনি ইহাদের পরিচিত অথবা অপরিচিত তাহারত কোন নিদর্শন পাই নাই—তবে?

আমি যখন বাড়ী ফিরিলাম তখনও বাবা তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকৃত স্থানটিতেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার যে তর্ক হইয়াছিল মনে মনে তখনও যেন তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া চিন্তিত মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্যাক্, সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার ব্যবহারটা কি বেশী অভদ্রের মত দেখায়নি? আমার বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন অভ্যাগতের সঙ্গে তেমন ভাবে তর্কটা আমার উচিত হয়নি—কিন্তু তিনি এমনি একগুঁয়ের মত তর্ক কর্‌ছিলেন যে চুপ্ করে থাকাও সম্ভব হোল না। তর্কে যে আমি হেরে যাইনি তা বোধহয় তুমি বুঝ্‌তে পেরে থাকবে? এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু বোঝ্‌বার জন্যে নিশ্চয়ই তোমরা মাথা খরচ কর্‌বেনা, তবু অশোকের শিলালিপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই তাঁকে যে বিদায় নিতে হয়েছিল এই সহজ তত্ত্বটুকু বোধহয় বুঝ্‌তে পেরেচ?" আমি কহিলাম, "না আপনার তর্ক বেশ ভালই হয়েছিল; আচ্ছা বাবা তাঁর সম্বন্ধে আপনার মত কি রকম?" বাবা প্রফুল্ল মুখে উত্তর দিলেন "বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী যোগী ভিক্ষু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিও একজন। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে জীবন

উৎসর্গ করে সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করেছেন, খুব মহৎ অন্তঃকরণ তাতে সন্দেহ কি? আমার অনুমান ইনি একজন ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎ জ্ঞানের উপাসক। কিন্তু আমার মনে হয় ইনি এবং এঁর সঙ্গীরা এখনও সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করবার যোগ্যতা লাভ করেননি। কেন না যে মহাত্মা মহানন্দময় মহদৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছেন তিনি কি এমন বিপথ ধরে সমুদ্র পার হতেন? আমার মনে হয় এঁরা কোন শিক্ষিত যোগীর শিষ্য। শীঘ্রই এঁরা সাধনার উচ্চ অবস্থায় উপনীত হবেন। আমি ত এই রকম আন্দাজ কচ্চি?" এসথার সিঁড়ীর উপরকার গোলাপ গাছের শুষ্ক পাতাগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল, বাবার পানে ফিরিয়া বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল "এত ভাল ভাল জায়গা থাক্‌তে এই সব সাধু মহাত্মাদের এই অনুর্ব্বর স্কটল্যাণ্ডের জলাভূমি কেন পছন্দ হোল বাবা?" তাহার কণ্ঠের কাতরতার সুর আমাদের মনেও বেদনার দোলা দিয়া গেল। বাবা বিচলিত ভাবে মাথার চুল গুলা ঘন ঘন কণ্ডূয়ন করিতে করিতে চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন "তাইত এ কথাটা আমি ভেবে দেখিনি, এ সম্বন্ধে তুমি আমায় পেরিয়ে গেছ বাছা! তবে অনুমান যে করা যায় না এমন নয়—সহরের কাছে থেকেও নির্জ্জন তাই পছন্দ করেচেন—আর কি কারণ থাক্‌তে পারে? যতক্ষণ এঁরা আমাদের দেশের শান্তি ভঙ্গ না কচ্চেন ততক্ষণ ত আমাদের ভাব্‌নার কোন দরকারও নেই।" আমি কহিলাম "আপ্‌নি শুনেচেন কি যে এই সব উন্নত সাধকদের এমন সব অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যা আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারি না।" "কেন প্রাচ্য পুস্তকাবলী এই সব কথাতেই ত পরিপূর্ণ। বাইবেলও একখানা প্রাচ্য পুস্তক। এর প্রত্যেক পৃষ্ঠাইত এই সকল ক্ষমতার কথা প্রকাশ কচ্চে। এটা খুব সত্যি যে আমরা যে শক্তি যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচি প্রাচ্যেরা সেই বিষয়ে অনেক উচ্চে আরোহণ করেচেন। অবশ্য আধুনিক সাধকেরা সেই মহান শক্তির অধিকারী কিনা সে সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, আমি বল্‌চিও না কিছু।" আমি চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা—এঁরা কি প্রতিহিংসাপরায়ণ? এঁদের ভিতর কি এমন কোন অপরাধ আছে যার দণ্ড মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নেই?" বাবা বিস্মিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া উত্তর দিলেন "আমি ত কিছু জানি না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই যাঁদের নীতি তাঁদের মধ্যে এমন ব্যবস্থা না থাকাই অন্তত উচিত। কিন্তু ওয়েষ্ট, এসথার আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনা তোমাদের হয়েচে কি? আজ যেন বড় উৎকণ্ঠিত মনে হচ্চে? তোমার এ রকম প্রশ্নের মানে কি? আমাদের প্রাচ্য আগন্তুকেরা তোমাদের মনে কোন রকম কৌতূহল বা ভয় জাগিয়ে তুলেছেন কি?"

মনে মনে লজ্জিত অনুতপ্ত হইলেও বাবার কাছে কোন কথা খুলিয়া বলা সঙ্গত মনে হইল না। এ সংবাদে তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলা ছাড়া অপর কোন ফল হইবে না। তাঁহার শরীর ও বয়স এখন বিশ্রাম লাভের অবসর চাহিতেছিল

চিন্তা বা দুর্ভাবনার ভার চাপাইয়া তাঁহাকে কষ্ট দিয়া লাভ নাই। তাছাড়া যে বিষয় আমি নিজেই বুঝি নাই সে সম্বন্ধে তাঁহাকে বুঝাইবই বা কি? কৌশলে উত্থাপিত প্রশ্ন এড়াইয়া অন্য কথার অবতারণা করিলাম। বাবাও আর সে বিষয়ে কোন কথা তুলিলেন না।

আমার জীবনে এই ৫ই অক্টোবরের ন্যায় এত বড় সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল দিবস আর কখনও আসিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। এই প্রকাণ্ড দিনটাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিবার যদি কোন উপায় থাকিত!

বাগানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়ীর আঘাতে অনেকগুলা সযত্নবর্দ্ধিত ক্রোটন ও ডাল ভাঙ্গিয়া অন্য মনে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঈষৎ পীতাভ অনুজ্জল মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্রে মাঠে মাঠে লক্ষ্যশূন্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমুদ্র তীরে মাছ ধরিতে গেলাম। জলে ছিপ ফেলিয়া উদ্দেশ্যহীন নেত্রে একদিকে চাহিয়া রহিলাম—বিদ্ধমৎস্য ফাৎনা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া লইয়া কখন চলিয়া গিয়াছে অনুভবও করিতে পারি নাই।

বাবার লাইব্রেরী ঘরে গিয়া তাঁহার আরব্ধ প্রিয় পুস্তকের সূচীপত্রে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিলাম; সংশয়ের ভার আর বহন করিতে পারা যায় না, নিজেকে কার্য্য-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া মুক্তির চেষ্টাই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হইলে কি হয়—মন ত কাজ করিতেছিল না, চিন্তার স্রোত বাধা প্রাপ্ত জলস্রোতের ন্যায় তীব্র ভাবে সেই একই পথে বহিতেছিল। এসথারও ঠিক আমার মতই সংশয়োদ্বিগ্ন অস্থির চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার উৎকণ্ঠিত সচকিতদৃষ্টি, ম্লানমুখ, বিষণ্ণ হাসি মনের চিন্তাকে বাহিরেও স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। জেনারল ঠিক বলিয়াছিলেন "মৃত্যুতে মুক্তি আনয়ন করে—অনিশ্চিন্ততাই মৃত্যুর অধিক ভয়ানক।"

মনের চাঞ্চল্যে সেদিন বাবার কাজেরও আমরা অনেক গোলমাল করিয়া ফেলিতেছিলাম। চশমা আনিয়া দিতে, টুপি আনিয়া দেই—হাঁ বলিতে গিয়া না বলিয়া বসি। এসথার সার্টের হাতার বোতাম গলায়,—গলারটা হাতায় লাগাইয়া প্রতিপদে লজ্জায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। অবশেষে সুদীর্ঘ দিনটা ঠেলিয়া দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল ধূসর মেঘের স্তরের মধ্যে চুমকির টিপের মত দুই একটি তারা দেখা দিল। বাহিরের বাতাস রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে যেন কেমন একটা কষ্টকর কুহেলিকার আবরণ জড়াইয়া দিল।

রাত্রিকালের আহারাদির পর আমরা শয়নের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বাবার নিকট হল ঘরে একত্র বসিয়া থাকি। এই সময়টা বাবা আমাদের সহিত সাহিত্য আলোচনা করেন, পড়া শোনা দেখেন—এসথারের বাজনা শোনেন—তাঁহার সহিত সাংসারিক ভাবে মিশিবার জন্য এইটুকু সময়ই আমরা পাইয়া থাকি। বাকী সময় তিনি নিজের পড়াশুনার মধ্যেই ডুবিয়া থাকেন। তাই এই সময়টুকু আমাদের কাজে অত্যন্ত লোভনীয়; আজও আমরা অন্যদিনের ন্যায় তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম। এসথার পিয়ানোর নিকটে গিয়া গৎ বাজাইতে সুরু করিল। কিন্তু আজ তাহার প্রতি অঙ্গুলি-ক্ষেপে ভুল হইতেছিল।

বাবা বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"এসথার তোমার বাজ্‌না বন্ধ রাখ, আজ নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু হইয়াছে। শয়নের পূর্ব্বে সুনিদ্রার জন্য প্রার্থনা করিও—একটা ব্যায়াম না করিয়া তোমরা ছাড়িবে না দেখিতেছি।" মৌনবিবর্ণ নতমুখে এসথার বাজনা বন্ধ করিয়া দিল।

শ্রীসুরূপা দেবী।

মূল-আর্য্যজাতি

(উত্তর-কুরুবাসের প্রমাণ)

আর্য্যজাতির শাখা প্রশাখা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূভাগেই প্রসারিত দেখা যায়। সুতরাং মূলআর্য্যজাতি কোথায় ছিল এবং কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের যেরূপ সন্ধান পাওয়া যায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

বেদই ভারতীয় আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য। বেদের এই প্রাচীনত্ব হেতুই সর্ব্বশাস্ত্রের উপর ইহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা বেদ হইতে যে তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব অপর সকল তথ্যের অপেক্ষা উহা অধিক প্রামাণ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বেদের বহুস্থলেই আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্পষ্টাক্ষরেই "আর্য্য" নামে অভিহিত দেখিতে পাই; যথা:—

"সসানাত্যা উত সূর্য্যং সসানেন্দ্র সসান পুরুভোজসংগাম্।
হিরণ্যয় মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যুং প্রার্য্যং
বর্ণমাবৎ॥"৯॥

ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৩৪ সূক্ত।

"ইন্দ্র অশ্বদান করিয়াছেন, সূর্য্যদান করিয়াছেন, বহুলোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করিয়াছেন, সুবর্ণময় ধনদান করিয়াছেন, দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ॥"

(অথর্ব্ববেদ সংহিতা ৪ কাণ্ড ১২০।৪)

'আর্য্য ও শূদ্র সকলকেই আমি সেই একই ভাবে দর্শন করি।'

এই আর্য্যদিগের আদিনিবাস স্থান আমরা ঋগ্বেদে "পঞ্চক্ষিতি" নামে উল্লিখিত দেখিতে পাই; যথা:—

"য একশ্চর্ষণীনাং বসূনা মিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চক্ষিতিনাম্॥" ৯

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৭ম সূক্ত।

"যে ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদিগের ধনসমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির উপর শাসন করেন।"

'ক্ষি' ধাতুর এক অর্থ বাস করাও আছে সুতরাং ক্ষিতি শব্দের অর্থ বাসস্থানই হয়। এই অর্থে 'পঞ্চক্ষিতি' শব্দের অর্থ বাসস্থানভূত পঞ্চভূভাগকে বুঝায়।

এই পঞ্চ ভূভাগে আর্য্যগণ কর্ষণ করিয়া বাস করিতেন। তাহাতেই 'পঞ্চক্ষিতির' ন্যায় আমরা 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দেরও উল্লেখ বেদে প্রাপ্ত হই; যথা—

"বরমগ্নে অর্ব্বতা বা সুবীর্য্যং ব্রহ্মণা বা চিতয়ে মা
জনাং অতি।
অস্মাকং দ্যুমমধি পঞ্চকৃষ্টি ষূ ষ্ঠাম্বর্ণ শুশুচিত দুষ্টরম্॥" ১০
ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ২য় সূক্ত।

"হে অগ্নি! আমরা তোমার প্রদত্ত অশ্ব ও অন্ন দ্বারা প্রভূত সামর্থ্য লাভ করতঃ সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া উঠিব; এবং আমাদিগের অতি প্রভূত ও অন্যের অপ্রাপ্য ধনরাশি সূর্য্যের ন্যায় পঞ্চকৃষ্টির উপরে দীপ্যমান হইবে।"

"আদধিক্রাঃ শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ সূর্য্যইব
জ্যোতিষাপস্ততান॥"১০
ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩য় সূক্ত।

"সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে বিস্তৃত করিয়াছেন।"

"কৃষ্টি" সম্বন্ধে রমেশবাবু এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"কৃষধাতু অর্থে কর্ষণ করা বা চাষ করা, কৃষ্টি অর্থে চাষকার্য্য, অতএব পঞ্চকৃষ্টি অর্থে পাঁচ প্রকার চাষ, কিংবা পাঁচটী কৃষিপ্রধান জনপদ বা প্রদেশ হওয়া সম্ভব। ঋগ্বেদানুবাদ ৪১৭ পৃঃ।

আর্য্যদিগের বাসভূমির সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ কর্ষণের যে যোগ আমরা দেখিতে পাইয়াছি পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'আর্য্য' নামের মধ্যে যে কর্ষণার্থক অর্ ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আর্য্য শব্দের মূলার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অর্ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ করেন। অর্ ধাতুর অর্থ ভূমি কর্ষণ। লাটিন্, গ্রীক্, এংলোসেক্সন্, ইংরেজী, রুষ, আয়রিশ, কর্ণিশ, ওয়েলস্, প্রাচীন নর্স, লিথুয়েণিক, প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষার হল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহাদের মতে এই জাতি কৃষি কার্য্য করিত বলিয়া আর্য্য নাম হইয়াছে॥"
বিশ্বকোষ॥

আর্য্যনামের পূর্ব্বোক্ত 'কৃষিজীবী' অর্থের সহিত কৃষ্টির কর্ষণার্থের যোগের দ্বারা "পঞ্চকৃষ্টি" যে আর্য্যদিগেরই অধ্যুষিতভূভাগ ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

বেদে যেমন আমরা আর্য্যদিগের পঞ্চভূভাগের উল্লেখ—'পঞ্চক্ষিতি' ও 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দে প্রাপ্ত হই—তেমনই তাহাদিগের পঞ্চজনভাগেরও উল্লেখ 'পঞ্চজন' শব্দে প্রাপ্ত হই। এস্থলে আমরা পঞ্চজন সম্বন্ধে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বিশ্বদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাত
মদিতির্জনিত্বম্॥" ১০
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত।

"অদিতি সকল দেব; অদিতি পঞ্চশ্রেণী লোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।"

"অদিদ্যুতৎস্বপাকো বিভাবাগ্নে যজস্বরোদসী উরূচী।
আয়ুং নযংনমসা রাতহব্যা অংজংতি সুপ্রয়সং পঞ্চজনাঃ॥"৪
ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ১১ সূক্ত।

"পরিপক্ক বুদ্ধি, দীপ্তিমান্ অগ্নি সম্যক্‌রূপে শোভা পাইতেছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পঞ্চ প্রকার মনুষ্য হব্য প্রদানপূর্ব্বক মর্ত্ত্য অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্য দ্বারা পূজা কর।"

"ইহি তিস্রঃপরাবত ইহি পঞ্চজনা অতি।
ধেনাইন্দ্রাবচাকশৎ॥" ২২
ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৩২ সূক্ত।

"হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ. তুমি দূরদেশ হইতে তিন (দিকে) আগমন কর, তুমি পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আগমন কর।"

আচার্য্যমোক্ষমূলর এই পঞ্চজনকে "Five nations" (১) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চজন শব্দে যে পঞ্চজাতিকে বুঝাইতেছে তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিউর (Muir) পঞ্চজনের অনুবাদ (Five tribes) (২) লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ পঞ্চজাতি হয়। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে মূল আর্য্য জাতি প্রথম পাঁচ শাখায় বিভক্ত ছিল।

যেমন পঞ্চজনের উল্লেখ বেদে দেখা যায় তেমনই 'সপ্ত মনুষ্যের' উল্লেখও তাহাতে দেখা যায়; যথা:—

"যো অগ্নি সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু॥"
তমাগন্ন। ৮ ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৩৯ সূক্ত।

"যে অগ্নি সপ্তমনুষ্য বিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাহার নিকট গমন করি।"

পূর্ব্বে আমরা 'পঞ্চজন' ও পরে যে 'সপ্ত মানুষের' উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার তাৎপর্য্য আমরা ইহাই মনে করি যে পূর্ব্বে আর্য্যগণ কেবল জন অর্থাৎ জাত বলিয়াই আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। এই জন্যই বেদের অপর একস্থলে (৬.৬১।১২) আমরা 'পঞ্চজাত' বলিয়াও তাহাদিগকে বর্ণিত দেখিতে পাই। পরে যখন মনুর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ তাঁহার সন্ততি বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন—তখনই তাঁহারা 'মানুষ' বলিয়া কথিত হইতে লাগিলেন। আর্য্যগণ মনুর পূর্ব্বে পঞ্চজাতিতে বিভক্ত ছিল—মনুর সময় তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা—সপ্তজাতিতে বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন—তাহাতেই তাঁহারা তখন 'সপ্ত মানুষ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়ে এই বংশবিস্তার দ্বারা স্থানাভাব ঘটাতেই সম্ভবতঃ আর্য্যগণ নূতন বাসস্থানের সন্ধানের জন্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাদিকে গমন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে আমরা মনুষ্য বাচক যে 'man' শব্দ দেখিতে পাই—তাহাতে তাঁহারা যে মনুরই বংশধর তাহারই নিদর্শন যেন দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ মনু শব্দ যেমন মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে—'man' শব্দও তদ্রূপ মন্ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভাষা-বিজ্ঞানে মূল আর্য্যজাতির আদি বিভাগও তাঁহাদিগের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উপনিবেশ বিস্তারের এইরূপ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

"The Aryan settlement seems to have separated into two main divisions, one of which marched towards the west and the other towards the south-east. The former division kept together till it reached the neighbourhood of the Caspian sea, when it broke up into various detachments, which advanced at different times to seek new homes in the west, and finally succeeded in conquering the greater part of Europe. First, a tribe, now known as Kelts, marched, to the neighbourhood of the Danube. Next came the Teutons, who, following in the wake of the Kelts, drove them from the Danube further westward into Wales, Ireland, and Scotland, and installed themselves in

(১) রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১১৩১ পৃঃ।
(২) রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৮৮৫ পৃঃ।

their place. Among these Teutons were the direct ancestors of the English.

A third band, the Slavonians, chose Russia to settle in, and thence spread over Illyira, Poland, and Bohemia.

Lastly, Greece and Italy were taken possession of by two other bands.

The other great division of the Aryan nation marched south, until it reached the region north-west of what is now known as the Punjab. Here it parted into two bands, one of which went into Persia, and the other towards the Punjab, whence it spread over a great part of India."

(1897) Hints on the Study of English by Messrs Rowe and Webb.

এখানে আমরা আসিয়াতে যেমন ভারতীয় ও পারসিক ঔপনিবেশিকদিগের উল্লেখ পাইতেছি—তেমনই ইউরোপে কেল্‌টীয়, টিউটনীয়, শ্লেভনীয়, গ্রীক্ ও ইটালীয় ঔপনিবেশিকদিগের উল্লেখ পাইতেছি। এই প্রকারে আসিয়ায় দুই ও ইউরোপে পাঁচ সমস্তে এই মূল সাত আর্য্য শাখারই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। আমরা মনুর আর্য্যসন্তান দিগের সপ্তশ্রেণীর 'সপ্ত মানুষ' বলিয়া বেদে উল্লেখের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই সপ্ত আর্য্য শাখা মনুসন্ততির সেই সপ্ত শ্রেণী বলিয়াই বোধ হয়।

জার্ম্মান্‌দিগের আদি পিতার মেন্নাস্ (Mannus) নাম যে মনু নামেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ তাহাতে আর কোন সন্দেহই হইতে পারে না। ইহা হইতে মনুর সন্ততি-গণেরদ্বারাই যে পাশ্চাত্য দেশে আর্য্যাধিকার স্থাপিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় পূর্ব্বপুরুষবাচক যে মেইন্‌স্ (manes) শব্দ আছে—তাহার সহিত মনু শব্দের স্পষ্ট যোগ আছে বলিয়াই মনে হয়। এই মেইনস শব্দটী মানব শব্দেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মনুর সন্তান বলিয়া যে বিবেচিত হইতেন ইহা দ্বারা সেই অর্থই প্রকাশিত হয়। জার্ম্মেন্ শব্দটী যেমন জাতিবাচক সংজ্ঞাশব্দ তেমনই ইহা ভ্রাতৃবাচক অভিধা শব্দও বটে। ইহা হইতে Germane শব্দটী সম্বন্ধবাচী সাধারণ বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে German শব্দের man শব্দটীর মূলে যেন মনু শব্দের সহিতই সম্বন্ধ ছিল এবং তাহা হইতেই ইহা উল্লিখিত বিভিন্নার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। German শব্দের ন্যায় Norman, Englishman, Dutch man প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের মেন্ (man) শব্দেও আদি পিতা মনুর সহিত সংস্রবের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াই মনে হয়।

আর্য্যদিগের 'পঞ্চজন' ও 'সপ্ত মানুষ' রূপে বর্ণনায় যেমন তাঁহাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের আভাস পাওয়া যায় তেমনই তাঁহাদের সম্বন্ধে 'পঞ্চক্ষিতি' ও 'পঞ্চকৃষ্টি' বর্ণনায় তাঁহাদের আদিবাসস্থানের পরিবর্ত্তনইতিহাসেরও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম তাঁহারা যে উত্তর প্রদেশে বাস করিতেন তাহাতে তাঁহারা কেবল বাস-গৃহের আবিষ্কারই করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহা 'পঞ্চক্ষিতি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপর আর্য্যগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে যখন হলকর্ষণ প্রণালীর উদ্ভাবন হইল তখন তাঁহাদের বাস-

স্থানের নাম জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাই 'পঞ্চকৃষ্টি' নামে আখ্যাত হইল।

আর্য্যদিগের 'পঞ্চক্ষিতি' ও 'পঞ্চকৃষ্টি' কোথায় ছিল এক্ষণে তাহাই আমাদিগের বিবেচ্য। এই দুই স্থান যথাক্রমে উত্তর আসিয়া ও মধ্য আসিয়াতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই আমাদিগের অনুমান হয়। বেদের একটী ঋকে এ সম্বন্ধে যে, ভৌগোলিক প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। বেদের সেই ঋক্‌টী এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—

"ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী। বাজে বাজে
হব্যাভূৎ॥" ১২
ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৬১ সূক্ত।

"ত্রিলোক ব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন॥"

এখানে পঞ্চজাত শব্দ দ্বারা যে পঞ্চজন বা পঞ্চজাতীয় আর্য্যদিগকে বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই পঞ্চজাত আর্য্যগণ যে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী ছিলেন তাহারও আভাস এখানে পাওয়া যাইতেছে।

আমরা উল্লিখিত সূক্তেরই শেষ ঋক্‌টী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে আর্য্যদিগের সরস্বতী তীরবাসের পরিষ্কার প্রমাণই পাওয়া যাইবে।

সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যোমাপস্করীঃ পয়সা মান আধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যাচ মাত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যেরণানি গন্ম॥" ১৪

"হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। তুমি আমাদিগকে হীন করিও না। অধিক জল দ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদিগের বন্ধুত্বও গৃহণীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি।"

এক্ষণে উপরিউক্ত সরস্বতী নদীটীর অবস্থান নির্ণয় করিতে পারিলেই আর্য্যদিগের আদিনিবাস যে কোথায় ছিল আমরা তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইব।

সরস্বতীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে বিশ্বকোষে যে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা-দৃষ্ট হয় আমরা তাহা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত আছে—

পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্‌বৈপথ্যা-স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চে উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুং। যোবাতত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতিস্মাহ। এষাহি বাচোদিক্ প্রজ্ঞাতা।" (শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ৭।৬)

অর্থাৎ পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেরা উত্তর দিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেইদিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (বেদ-বাণী) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এইস্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।"

ঐ উত্তর দিক্ কোথায়? সেইস্থান কাশ্মীরের উত্তরে (৩) মেরুর নিকট যে স্থান হইতে সরস্বতী বাহির হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ন্যায় পারসিকদিগের বেদ

(৩) শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার বিনায়কভট্ট লিখিয়াছেন—
"প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে।" এইরূপে তিনি কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের মতে সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান বিন্দুসর (১২০।৬৪) বর্ত্তমান নাম সরীকুল হ্রদ। এক সময়ে এই সরীকুল পর্য্যন্ত কাশ্মীরদেশ বিস্তৃত ছিল। ইহা আর্য্যজাতির বাক্ বা বৈদিকী ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম বাক্ বা ভাষা হইয়াছে।" বিশ্বকোষ।

বা আদি ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তাতেও হরকুইতি বা সরস্বতী বাগুৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"।

এস্থলে আমরা সরস্বতী যে মেরুর নিকটবর্ত্তী নদী ছিল তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি এবং এই সরস্বতীতীরে বাসকালে বেদরচনা হইতেই যে ভাষার নাম এই নদীর নামে সরস্বতী ও বেদের 'ব্রহ্ম' নাম হইতে 'ব্রাহ্মী' হইয়াছে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি।

মনুসংহিতায় আমরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়কে 'দেবনদী'রূপে উল্লিখিত দেখি এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' দেখিতে পাই এবং ইহা 'দেবনির্ম্মিত দেশ বলিয়া বিশেষিত দেখি। যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" ১৭
মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থলে যে দেবনির্ম্মিত দেশ তাহা 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া কথিত হয়।"

উদ্ধৃত বর্ণনায় নদী ও দেশের সহিত 'দেব'শব্দের যোগের দ্বারা আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত ইহাদিগের প্রথম সংস্রব হইতেই যে ইহারা এইরূপ দেবগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ এই আদি স্থান হইতে ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইলে ইহার পরম পবিত্র ও সুখময় গৌরবস্মৃতি স্মরণ করিয়া ইহাকে "দেবনির্ম্মিত দেশ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন—ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

আর্য্যদিগের সর্ব্বাদিনিবাস মেরুও এই প্রকারে 'সুরালয়' বা দেবালয় বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যথা অমরকোষে:—

"মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রীরত্নসানুঃ সুরালয়ঃ।"

আর্য্যদিগের প্রথমাধিবাসেহতু যে মেরু 'সুরালয়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই মেরুর সন্নিহিত সরস্বতী নদী ও তত্তীরবর্ত্তী ভূভাগ যে দেবরূপী আর্য্যগণের প্রথম উপনিবেশ বলিয়া 'দেবনদী' ও 'দেবদেশ' নামে আখ্যাত হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যগণ সরস্বতীর পরে বিন্দুসরোবরের বা সরীকুলহ্রদ তটে উপনিবিষ্ট হন। এই সরোবর হইতে যে সপ্তনদী নির্গত হইয়াছে তৎসমস্তের তীরে বসতি বিস্তার হইতেই আর্য্যদিগের দেশের "সপ্তসিন্ধু" নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমরা বেদে যে আর্য্যদিগের "সপ্তমানুষ" নাম প্রাপ্ত হই; এইখানে আসিয়া বিন্দুসরোবর হইতে উৎপন্ন সপ্তনদীর তীরে বাস হইতেই তাঁহারা এই নাম প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। (৪) এই স্থানই "প্রত্নৌকস্" নামেও বেদে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে আদিবাস ছাড়িয়া আর্য্যসন্তানগণ পূর্ব্বশ্রুতি লইয়া দক্ষিণমুখে সরসপ্ (পৌরাণিক বিন্দুসর ও বর্ত্তমান সরীকুল) হ্রদের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪) আমরা উপরে সরস্বতীকে যে 'সপ্তাবয়বা' ('সপ্তধাতুঃ') বলিয়া বেদে (ঋগ্বেদ ৬।৬১।১২) বর্ণিত দেখিয়াছি, 'সপ্ত' নদী সেই সরস্বতীর শাখা হওয়াও অসম্ভব নহে।

ই স্থানই পরবর্ত্তী বৈদিক ও আবস্তিক আর্য্যজাতির নিকট পরে 'প্রত্নৌকস্' বা প্রাচীন ভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ সম্বন্ধে তদীয় "বৈদিক ভারত" (Vedic India) নামক গ্রন্থে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও সরস্বতীতীরেই যে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায়। এস্থলে আমরা তদীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"আর্য্যগণ নদীর পর নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে দূর অগ্রসর হইলে একটী নদীর নিকট আসিয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। ইহার তীরদেশেই অধিষ্ঠান সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য্যদিগের নিকট যে নাম প্রিয় ও পবিত্র ছিল ইহা সেই নামই উত্তরাধিকাররূপে পরিগ্রহণ করিল। ইহা কি কারণে হইয়াছিল? তাঁহাদিগের প্রাচীন স্মৃতি ও সংস্রব হইতেই হইয়াছিল। কারণ 'সরস্বতী' প্রাচীন ইরাণীয় "হরকৈতিরই" অবিকল সংস্কৃত প্রতিরূপ। ইহা পূর্ব্ব ইরাণ-আফগানিস্তান ও কাবুলের বৃহৎ নদীরই (যাহা বর্ত্তমান হেল্‌মণ্ড) আবেস্তিক নাম। এখানেই বিচ্ছিন্ন ভারত-ইরাণীয় জাতিদিগের কোন কোন জাতি সাহস করিয়া সুলিমান পর্ব্বতশ্রেণীর প্রস্তর প্রাচীরের সম্মুখীন হওতঃ ইহার আরণ্য স্বল্পপরিসর গিরিবর্ত্ম সকলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণভাবে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অবশ্য বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে যাহা দীর্ঘকাল তাঁহাদের স্বদেশ ছিল তাঁহারা এই প্রকারে তাহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবেন। আধুনিক শেষ গবেষণার ফলেই এই স্বাভাবিক সুন্দর সমাধানের আভাস পাওয়া গিয়াছে, এবং অথর্ব্ববেদের তিনটী সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখের দ্বারা ইহা সমর্থিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে যে এরূপ উল্লেখ থাকিবে তাহা কখনও প্রত্যাশা করা যায় নাই। এইরূপ (তিনটী সরস্বতীর) উল্লেখ বহুকাল অব্যাখ্যাত থাকায় যে সমস্ত সমস্যা পণ্ডিতদিগকে প্রতিপদে বাধা প্রদান করে ইহা তাহারই অন্যতম সমস্যারূপে পরিগণিত হইয়াছিল। যে সমস্ত বিষয় (আর্য্যদিগের) স্মৃতিপথ হইতে তখনও অন্তর্হিত হয় নাই—সম্ভবতঃ তৎকালে তৎসমস্তের কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় নাই।" (৫)

বেদেও আবেস্তায় 'সরস্বতী' বা 'হরকৈতি'

(৫) After the Aryans had advanced a considerable distance eastward crossing river after river, they reached one which arrested their progress for a time. Settlements arose along its course and it inherited the name that for some reason was dear and sacred to the Aryans. For what reason? From ancient memories and association. For Sarasvati is the exact Sanskrit equivalent of the old Eranian. "Haraquaiti" the Avestan name of the great river (modern Helmond) of Eastern Eran—Afghanistan and Kabul where some of the separating Indo-Eranian tribes certainly sojourned before they summoned courage to face the stony wall of the Suleman range and thread its wild, narrow passes. Was it not natural that they should have thus perpetuated the memory of what had long been home? This beautiful and natural solution is suggested by the results of latest researches, * and confirmed from a most unexpected quarter by a curt mention in the Atharva-veda (100) of three Sarasvatis- a mention being long unexplained, has been another of the puzzles which confront scholars at every step. Probably no explanation was needed at the time of things which had not passed out of remembrance." Vedic India by A Ragozin pp 268—69.

* See chiefly Hillebrandt Vedische Mythologie Vol. I., pp 99—100.

নামের উল্লেখ দ্বারা ইহার তীরদেশই যে আর্য্যদিগের আদি উপনিবেশের স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

পারসিকগণ সর্ব্বশেষ ভারতীয় আর্য্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হন ইহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ ইহাও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যে পাশ্চাত্য আর্য্যগণ তৎপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। পারসিক ও পাশ্চাত্য আর্য্যগণ আর্য্যদিগকে প্রাগুক্ত পঞ্চ (পঞ্চজন) বা সপ্ত (সপ্তমানুষ) জাতিরই যে অন্তর্গত জাতি ছিল তাহাতে যে অল্প সন্দেহেরই কারণ বিদ্যমান আছে তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বিচ্ছেদের পর অবশিষ্ট আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করতঃ তাঁহাদিগের প্রথম ভারতীয় উপনিবেশকে তাঁহাদের জাতীয় নামানুসারে 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে আখ্যাত করেন।

এই প্রকারে আপনাদের নূতন বাসস্থানের সহিত তাঁহাদের প্রাচীন জাতীয় নাম সংগ্রথিত করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ 'আর্য্য'নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামের দ্বারা আর্য্যদিগের প্রধান ও শ্রেষ্ঠভাগই যে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা অনুমিত হয়। 'আর্য্যাবর্ত্তের' সহিত আমরা 'আর্য্য' নামের যেরূপ স্পষ্ট সংযোগ দেখিতে পাই এরূপ আর অন্য কোনও স্থানের নামের সহিতই পাই না। ইহা হইতে ভারতীয় আর্য্যদিগের মূল স্থান 'পঞ্চক্ষিতি' বা 'পঞ্চকৃষ্টি'ই যে সকল আর্য্যেরই মূল স্থান ছিল তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

যে সমস্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্কন্দনভীয়াকে (Scandinavia) আর্য্যদিগের মূল স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা স্কন্দনভীয় ভাষার দ্বারা এক Aryan বা আর্য্য নামের ব্যাখ্যাই দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না কারণ এক সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতেই ইহার মূল এরূপ স্পষ্টরূপে লক্ষিতব্য নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার যে মূলের সন্ধান করিয়াছেন তাহাও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই করিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ আর্য্যদিগের আসিয়ায় আদিনিবাস সম্বন্ধে অনাস্থাবান্ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আইজাক্ টেলার ও, তদীয় 'আর্য্য আদিনিবাস' (The origin of Aryans) নামক গ্রন্থে স্কন্দনভিয়াকে আর্য্যদিগের আদিবাসের উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। যথা—

"It is difficult to believe that a sufficiently extensive area for the growth of such a numerous people can be found in the forest clad valleys of Norway and Sweden, which moreover are unadapted for the habitation of a nomad pastoral people such as the primitive Aryans must have been." The Origin of Aryans by Isaac Taylor. pp. 46—47.

"নরওয়ে ও সুইডেনের অরণ্য পরিবৃত উপত্যকায় যে এরূপ বিপুল জনসঙ্ঘের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত ক্ষেত্র পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অধিকন্তু উক্ত উভয় দেশই পশুপালক ভ্রমণশীল আদিম আর্য্যজাতির অধিবাসের অনুপযোগী।"

আর্য্যদিগের আমরা যে 'পঞ্চজন' ও 'সপ্তমানুষ' এই দুই প্রাচীনতম শ্রেণী বিভাগের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শনও আমরা সংস্কৃত ভাষাতেই প্রাপ্ত হই। 'মানুষ' শব্দটী 'মনুষ্য' পর্য্যায়ের

ও 'পঞ্চজন' শব্দটী পুরুষ পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"মনুষ্যা মানুষা মর্ত্ত্যা মনুজা মানবানরাঃ।
স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ পুরুষাঃ পুরুষানরঃ॥"
অমরকোষ।

আর্য্যদিগের আদি শ্রেণীনাম যে মনুষ্য সাধারণের নামরূপে ভারতবর্ষে পরিণত হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে প্রাথমিক পঞ্চ বা সপ্ত আর্য্যজাতির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার এবং তাঁহাদের শাখা প্রশাখার সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হইতে সকলকে একলক্ষণান্ত দেখিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ আর্য্যসাধারণ নামেই তাঁহাদিগকে অভিহিত করতঃ তাঁহাদের সহিত আপনাদের সাজাত্যের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে আর্য্যজাতিকে মনুষ্যের প্রকৃত আদর্শ মনে করিয়াই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আর্য্যদিগের আদিম জাতীয় নামের দ্বারাই সমস্ত মনুষ্যজাতির নামকরণ করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায়ও এই আদর্শের কথা স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত দেখা যায়। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ১৯
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" ২০
মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

"কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টী দেশকে 'ব্রহ্মর্ষি দেশ' বলে। উক্ত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্তেরই সন্নিহিত।"

এই সমস্ত দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে।

'মনুষ্য'নাম যে প্রথমে আর্য্যআদর্শবাচক নাম ছিল তাহার আরও প্রমাণ এই যে পুরাকালে আমরা অনার্য্যজাতি বা অনার্য্যভাবাপন্ন আর্য্যজাতিকে 'মনুষ্য' নামে অভিহিত দেখিতে পাই না পরন্তু যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, দানব, দৈত্য প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামেই অভিহিত দেখিতে পাই।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মূল আর্য্যজাতির ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন ভারতীয় সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনই আর্য্য মূলস্থানের ঐতিহাসিক নিদর্শনও ভারতীয় সাহিত্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাক্ষ্য

(১)

সাগর সেঁচিয়া কেশবে বাসবে
সকল রত্ন লইল হরি,
তুমি পেলে শুধু ওগো ভোলানাথ
উগ্র গরল কণ্ঠ ভরি!

(২)

সত্যের যুগে এ কথাটি হায়,
না জানি কে দিল রটনা করে,
আজিও সাক্ষ্য শিশু সুধাকর
রয়েছ যখন ললাটে ধরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পাটলিপুত্র

"The excabations for which Ratan Tata has so generously provided the means and which the Archaeological Department is carrying out on his behalf have not yet had time to advance for, but they have yielded enough to show that the Royal Palace of the Mauryas was no phantasy of the chinese pilgrims"

(His Excellency Lord Hardinge's Reply to the Address of the Landholders' Association, Patna)

[গত বৎসর হইতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধানে ও কোটিপতি রতন তাতার বদান্যে পুনর্ব্বার পাটলিপুত্রে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ পাটলিপুত্রের খননকার্য্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ভারতীতে প্রকাশ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে যে সকল স্থানে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কার্য্য করিতেছেন, সেই সকল স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বিবরণ ও আলোকচিত্র প্রকাশের জন্য তিনি অনুমতি লইয়াছেন। এই সংখ্যায় পাটলিপুত্রের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে ও গত বৎসরের প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বিবরণাদি প্রদত্ত হইল। আগামী সংখ্যায় শেষোক্ত বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইবে। ভাঃ সঃ]

১। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ইতিহাস

পাটলিপুত্র কে স্থাপন করেন, তাহা সঠিক অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণে পাটলিপুত্রের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণের মতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্র উদয়াশ্ব এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা এই মতের পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে উদয়াশ্ব দ্বারা এই নগর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চান। তাঁহারা বলেন যে, অজাতশত্রু গঙ্গাতীরে পাটলি নামক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পৌত্র উদয়াশ্ব এই দুর্গ হইতে কিছু দূরে পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের মতে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় ও উদয়াশ্বের রাজত্বের শেষ ভাগে উহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। চৈনিক পরিব্রাজকগণের অন্যতম অনুবাদক বিল সাহেব বলিয়াছেন যে, মগধরাজ অজাতশত্রু পাটলিপুত্র নগরকে সুদৃঢ় করেন। অন্যতম লেখক বলিয়াছেন যে, কালাশোক রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বস্তুতঃ অনেকের মতে খৃষ্টের জন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কালাশোক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যিনিই ইহা প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, ইহা সত্য যে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রেই অবস্থান করিতেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়েই পাটলিপুত্র পৃথিবীপ্রসিদ্ধ হয়।

মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তদৃষ্টে অনেকেই পাটলিপুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন "গঙ্গা এবং অপর একটী নদীর সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্ অবস্থিত। এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় এবং ইহার চতুষ্পার্শে কাষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে তীর নিক্ষেপের জন্য ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত হইবার জন্য ও নগর রক্ষার্থ ইহার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাকার

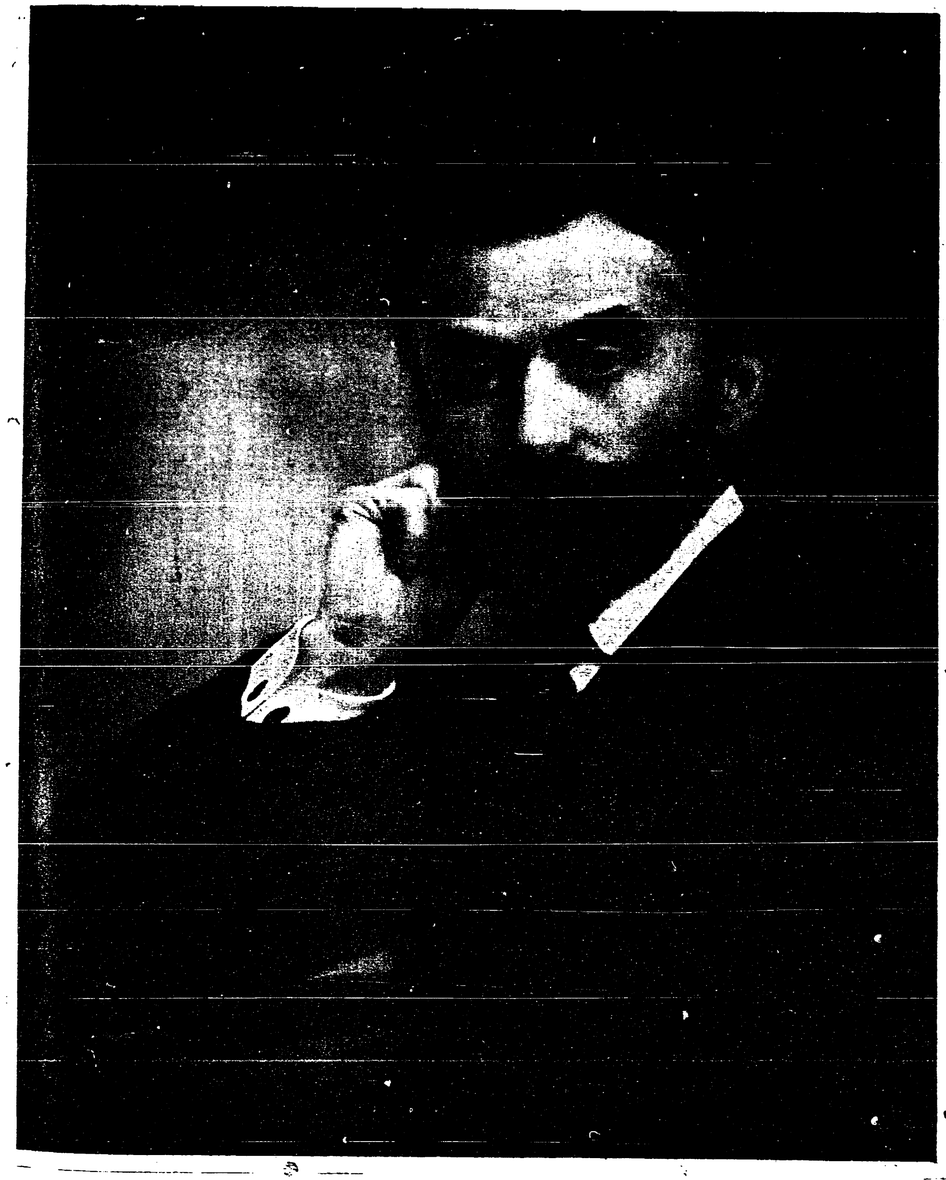

মিঃ রতন তাতা

মিঃ তাতা কর্ত্তৃক অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়কে প্রদত্ত ফটো হইতে

আছে।" (১) মেগস্থেনিস হইতে উদ্ধৃত করিয়া আরিয়ান বলিয়াছেন যে, ইরান্নোবোয়াস এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাসিয়ানদের রাজ্যে পালিমবোথ্রা নগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নগরপ্রাচীরে ৬৭০টী বুরুজ এবং ৬৪টী দ্বার আছে।"

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে পঞ্চতন্ত্রে "পাড়লিপুত্রের" উল্লেখ দেখা যায়। উইলসন বলিয়াছেন যে পাড়লিপুত্রই শুদ্ধ উচ্চারণ। পাটলিপুত্রের সন্নিকটস্থ জৈন-মন্দিরে যে, খোদিতলিপি আছে তাহাতে "পাড়লীপুরের" উল্লেখ আছে। "ক্ষেত্র-সমাস" নামক ভৌগোলিক পুস্তকে পলিভট্ট নাম দেখা যায় এবং লঙ্কাদ্বীপে প্রচলিত পুস্তকাদিতে পাটলিপুত্র নাম পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ অশোকাদানে পাটলিপুত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ—

"তৎ যথাসীন্নহীখণ্ডে আর্য্যাবর্ত্তে রশোত্তমে,
মগধভূপ্রদেশস্থত্র গঙ্গাতীরে পবিত্রিতে।
নগরং পাটলিপুত্র ভূকান্তা তিলকোত্তমং,
সুভিক্ষং কমলাবাসং সর্ব্বসম্পৎ সমুদ্ধিতম।
সাধুজন সসাকীর্ণং বিদ্বজ্জন নিষেবিতং,
সর্ব্বদা মঙ্গলোৎসাহ প্রবর্ত্তনাভি নন্দিতম্।
ধৃতিভিরণভিক্রান্তং স্ফীতং ক্ষেমং শুভশ্রিয়ং,
সত্যধর্ম্মালয়া রামমুরম্যং স্বর্গ সন্নিভম্।

অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের মগধপ্রদেশে গঙ্গাতীরে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন সাধুজন সমাকীর্ণ ও বিদ্বজ্জন সেবিত পাটলিপুত্র নামক নগর আছে।

পাটলিপুত্রের সুরম্যসৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর না হইলেও অশোকাবদানের যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতেই চৈনিক-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফা-হিয়ান বলিয়াছেন "পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী ছিল এবং রাজা অশোক এই স্থানেই রাজত্ব করিতেন। নগরস্থ রাজপ্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি রাজাদেশে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজ প্রাসাদান্তর্গত প্রাচীর, দ্বারগুলি এবং স্থপতি-কার্য্য মনুষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই।"

অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন-সিয়াং বলিতেছেন "গঙ্গার দক্ষিণে প্রায় সত্তরলি বিস্তৃত একটী পুরাতন নগর আছে। এক্ষণে ইহা জনশূন্য হইলেও অদ্যাপিও ইহার প্রাচীর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদে অনেক পুষ্পবৃক্ষ ছিল, বলিয়া পূর্ব্বে ইহা কুসুমপুর নামে অভিহিত হইত। বহুকাল পরে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পাটলিপুত্রে পরিণত হইয়াছে।"

হিউয়েনসিয়াং এই নাম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—.

"অনেকদিন পূর্ব্বে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ এইস্থানে বাস করিতেন। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করিত। একদিন ছাত্র সকল একত্র হইয়া অন্যত্র ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিল; সেই সময় তাহাদের একজন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রটী উত্তর করিল যে,"আমার যৌবন-সীমা অতিক্রান্ত হইতে চলিল; কিন্তু, এ পর্য্যন্ত আমি "ধর্ম্মরক্ষা" করিতে সমর্থ হইলাম না; এই জন্যই আমি এত বিমর্ষ।" অন্যান্য ছাত্রেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক তাহাদের সহাধ্যায়ীকে বলিল যে "এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তোমার জন্য পাত্রী অন্বেষণ করিব।" তৎক্ষণাৎ

(১) মৎসম্পাদিত "সমসাময়িক ভারত" প্রথম কল্প. দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে কন্যার পিতা ও অপর একজনকে বরের মাতা স্থির করিয়া পাটলি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের নাম জামাতা—বৃক্ষ রাখিল। পরে, তাহারা নানাপ্রকার ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া বিবাহের লগ্ন নির্দ্ধারণ করিল এবং লগ্নকালে কন্যার পিতা (?) ঐ বৃক্ষের একটি শাখা ভগ্ন করিয়া ছাত্রকে বলিলেন "এই আমার কন্যা; ইহাকে গ্রহণ কর।" ছাত্রটীও ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুষ্পশোভিত সেই শাখা গ্রহণ করিল।

"সূর্য্যাস্তকালে অন্যান্য বালকগণ গৃহপ্রত্যাগমনে উদ্যত হইলে, সেই ছাত্র গৃহগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ তাহাকে বলিল যে, তাহারা যাহা করিয়াছে সকলই পরিহাসচ্ছলে করিয়াছে। এই স্থানে থাকিলে রাত্রিতে হিংস্রজন্তুতে তাহাকে নিধন করিবে, সুতরাং গৃহে প্রত্যাগমনই বিধেয়। কিন্তু, যুবক অস্বীকার করাতে তাহারা তাহাকে একাকী রাখিয়া প্রত্যাগমন করিল।

"রাত্রিতে এক অনৈসর্গিক আলোকরশ্মি সেই বনভূমি আলোকিত করিল। কোথা হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি এবং বংশীবাদন হইতে লাগিল এবং সেই স্থান মূল্যবান কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল। অকস্মাৎ ভদ্রবেশধারী এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একটী যুবতীর হস্ত ধরিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সঙ্গে সাজসজ্জা করিয়া অনেক লোক ও বহুসংখ্যক বাদ্যকরগণ আসিতে লাগিল। পরে, বৃদ্ধ ছাত্রটীর হস্তে যুবতীর হস্ত সমর্পণ করিয়া বলিলেন "ইনিই আপনার পত্নী।" ক্রমাগত সপ্তদিবস আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হইল। সাতদিন পরে তাঁহার সহাধ্যায়ীরা তাঁহার অন্বেষণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহাধ্যায়ীরা যেন কাহার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যাগমনে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিলেন।

"পরে তিনি স্বেচ্ছায় নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত সেই উপবনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পাটলিবৃক্ষ বৃহৎ প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে; ভৃত্যবর্গ চতুর্দ্দিকে গমনাগমন করিতেছে এবং পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ তাঁহাদের সমাদরে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইতেছেন। নানাপ্রকার আহার্য্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ছাত্রের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে পরিতুষ্ট করিলেন।

পুরাতন রাজধানী কুসুমপুর পরিত্যাগ করা হইলে পর এই স্থান নূতন রাজধানীর জন্য মনোনীত করা হইল এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা স্মরণার্থ, এই নগরের নাম পাটলিপুত্র—পুর (অর্থাৎ পাটলি বৃক্ষের পুত্রের পুর) রাখা হইল।"

গার্গীসংহিতায় পাটলিপুত্রের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সে সময়ে পাটলিপুত্রস্থ রাজপ্রাসাদকে কুসুমধ্বজ বলা হইত। গুপ্ত-রাজগণের সময়েও পাটলিপুত্রের কিছু কিছু প্রাধান্য ছিল। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই হুনগণকর্ত্তৃক পাটলিপুত্রের ধ্বংসসাধন হয়। ইহার পরে প্রায় সহস্র বৎসর পরে সের সাহের সময়ে পুনর্ব্বার পাটনার প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভে পাটনায় ইংরাজদের একটী প্রধান কুঠী ছিল এবং কিংবদন্তী বিশ্বাস করিলে পাটনাতেই কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের হিন্দুপত্নী-গ্রহণ ব্যাপার ঘটে। সাহ আলমের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে পাটনার বাদসাহী ও ইংরাজী ফৌজে যুদ্ধ ঘটে। পাটলি-পুত্রের যে স্থানে খনন হইতেছে, সেই স্থানে কণিষ্কের সময় হইতে প্রচলিত মুদ্রা ও সাহ আলমের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

২। পাটলিপুত্রের অবস্থিতি

পাটলিপুত্র ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। ডি

আনভিল নামক ভৌগোলিক ইহাকে আলাহাবাদে, ফ্রাঙ্কলিন নামক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাকে ভাগলপুরে, ও উইল ফোর্ড রাজমহলে, পাটলিপুত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মেজর রেনেল সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান পাটনাকে প্রাচীন পাটলিপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মেগস্থেনিস গঙ্গা ও ইরান্নোবোয়াসের সঙ্গম-স্থলে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পাটনার যে সার্ভে হয় তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পুরাতন সোন ও গঙ্গার সংগম হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সোন অনেক দূরে সরিয়া পড়াতে এখন আর গঙ্গা ও সোনের সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র বা পাটনা অবস্থিত নহে।

রেলিং

ফরাসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জুলিয়েন স্থির করেন যে, পাটনার সন্নিকটস্থ কোন স্থানই পাটলিপুত্র। অবশেষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ওয়াডেল এই স্থানে আসিয়া অনুসন্ধানে স্থির করেন যে পুরাতন পাটলিপুত্র যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই স্থান গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রধানতঃ তিনি ফা-হিয়ান এবং হিউয়েন-সিয়াংয়ের পর্য্যটন-কাহিনী অবলম্বন করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

শুভক্ষণেই চৈনিক পরিব্রাজকগণের এ দেশে শুভাগমন হইয়াছিল নতুবা অশোকের পাটলিপুত্রের স্থান নির্দ্দেশের বিশেষ আশা ভরসা ছিল না।

৩। পাটলিপুত্রের পূর্ব্বকার খননের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(ক) ১৮৭২ সনে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বেগলার সাহেবকে প্রাচীন পাটলি-পুত্রে প্রেরণ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, কানিংহাম স্বয়ং পাটলিপুত্রে আসিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রাচীন পাটলি-পুত্রের অনেকাংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কানিংহান সাহেব চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত কয়েকটী স্থান নির্দ্দেশে সমর্থ হইয়াছিলেন।

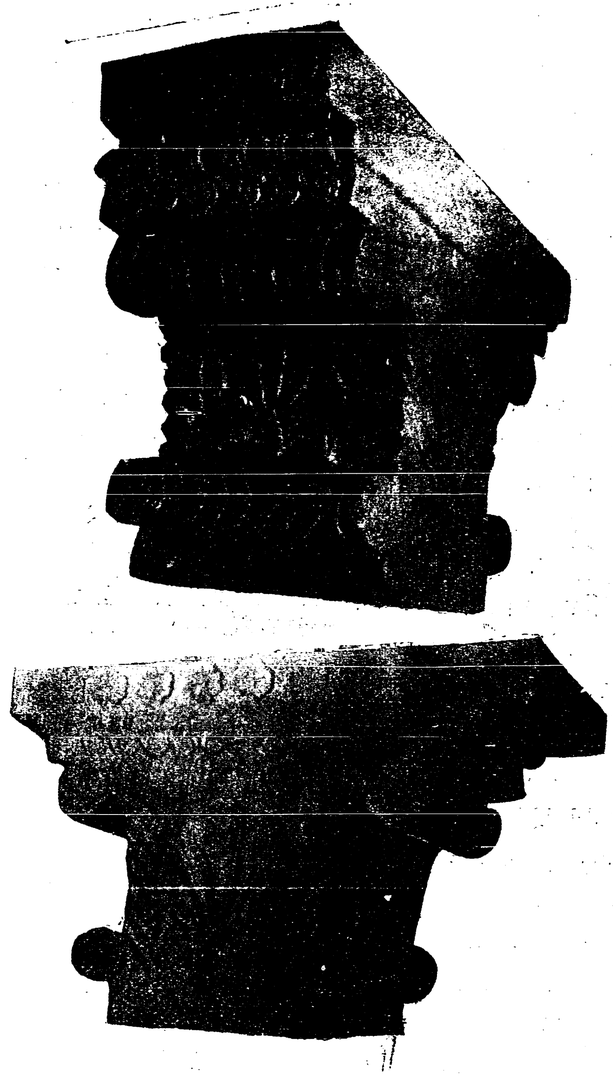

স্তম্ভের শীর্ষদেশ

(খ) ওয়াডেল সাহেব ১৮৯২ সনে পাটলি-পুত্রে আগমন করিয়া "পাঁচ-পাহাড়ী" নামক স্থানে গমন করেন। হিউয়েন-সিয়াং তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এই পাঁচ পাহাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পাঁচপাহাড়ী নামে বর্ত্ত-মানে পরিচিত স্থানই যে পর্য্যটক-উল্লিখিত পাঁচটি স্তূপ তাহাই নির্দ্ধারণ করেন। "ভিক্ষুপাহাড়" ও পাঁচ পাহাড়ীর মধ্যস্থিত প্রায় দুই মাইল স্থানে মৌর্য্যকালের খোদিত অনেক প্রস্তর দেখিয়া তিনি স্থির করেন যে, এই স্থানই প্রাচীন পাটলি-পুত্র। তিনি মেগস্থেনিস-বর্ণিত কাষ্ঠ প্রাচীরেরও নিদর্শন পান।

(গ) উক্ত ওয়াডেল পুনর্ব্বার ৭৮৯৪ সন হইতে এই কার্য্যে ব্রতী হন।

এই সময়ে তিনি দুইটি রেলিং প্রাপ্ত হন। একটী রেলিংয়ের আলোকচিত্র আমরা এই স্থানে প্রদান করিলাম। ওয়াডেল সাহেবের সহকারী মিঃ মিল্‌স্ ভূগর্ভে দ্বাদশ ফীট নিম্নে একটী সুন্দর ও বৃহৎ স্তম্ভের শীর্ষদেশ দেখিতে পান। ইহারও চিত্র আমরা এই স্থানে প্রদান করিলাম। ওয়াডেল এই উভয় দ্রব্যকেই গ্রীস দেশীয় স্থাপত্যবিদ্যার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ঘ) ওয়াডেল সাহেবের নির্দ্দেশানুসারে পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার সি, আর, উইলসন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেও কিছুদিন খনন হয় কিন্তু ইহাতে কোন ফললাভ হয় নাই।

(ঙ) বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী প্রত্নতত্ত্ববিৎ পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে কয়েক বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি দ্রব্যও তিনি আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে একটি অশোক-স্তম্ভের অংশ, একটী দেবীমূর্ত্তি এবং ১৯ ফীট নিম্নস্থ শালকাষ্ঠ ব্যতীত ১৮৯৭ সনে প্রাপ্ত বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

(চ) তৎপরে প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। কোন কোন স্থানে কূপ খনন কালে শালকাষ্ঠ বা ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইলেও স্থায়ী ভাবে কোন কার্য্য হয় নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ, ১৯১২ সনে বোম্বাই-সহরের ক্রোড়পতি মিঃ রতন তাতা কোন প্রাচীন স্থান খননের জন্য সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতিশ্রুত হন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া পাটলিপুত্র খননে স্থিরীকৃত হন। গবর্ণমেণ্ট এবং মিঃ রতন তাতার মধ্যে সর্ত্ত হইয়াছে যে, খনন কার্য্যে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহা তাতা মহাশয়ের ইচ্ছানুযায়ী হয় বোম্বাই নগরে বা পাটনায় রক্ষিত হইবে। তবে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইলে শ্রীযুক্ত তাতা মহাশয় কোন দ্রব্য পাটনাতেও রাখিতে পারেন। বর্ত্তমানে, দ্রব্যাদি বোম্বাই বা পাটনায় রক্ষিত হইলেও, অবশেষে দ্রব্যাদি গবর্ণমেণ্টেরই তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং দ্রব্যাদির সহিত মিঃ তাতার নাম সংযোজিত থাকিবে। যদি কোন দ্রব্য দুইটী পাওয়া যায়, তবে তাতা মহাশয় ইচ্ছানুসারে উহা যাঁহাকে ইচ্ছা দিতে পারিবেন।

এই সর্ত্তানুসারে দানবীর তাতা বাৎসরিক বিংশসহস্র মুদ্রাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং ১৯১৩ সনে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম সুযোগ্য কর্ম্মচারী ডাক্তার স্পুনারের অধীনে গত বৎসর পাটলিপুত্রের দুইটি স্থান খোদিত হইয়াছে।

গত বৎসরের খননে যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে শক যুগের কয়েকটি মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) মৃত্তিকা গর্ভে গুপ্তরাজগণের সমসাময়িক প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রাচীরের তলদেশে অশোকযুগের অনেকগুলি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি নিটোল স্তম্ভ দেখিবার জিনিষ। ইহার চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইতেছে। স্তম্ভের নিম্নদেশে কতকগুলি অক্ষর রহিয়াছে।

(৪) মৃত্তিকার আট ফীট নিম্নে একটী ভস্মের

স্তর দৃষ্ট হইয়াছে এবং এই স্তরের উর্দ্ধদেশেই তৃতীয় দফার লিখিত প্রস্তর স্তম্ভের অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই ভগ্ন-স্তরের উপরে গুপ্তরাজ্যের সমসাময়িক প্রাচীর দৃষ্ট হইয়াছে। এই ভস্ম-স্তর ঠিক একইরূপ সমভূমিতে অবস্থিত নহে। সমদূরত্বে ইষ্টকপ্রস্তরের ভগ্নাবশেষের সহিত এই ভস্ম মৃত্তিকা-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, কোন সময়ে এই স্থানস্থিত প্রাসাদ জলমগ্ন হয়। সেই অবস্থায় ইহার উপরে ৮।১০ ফীট গভীর মৃত্তিকার স্তর পড়ে এবং পরে ইহার উর্দ্ধদেশস্থ প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়। স্তম্ভগুলির উর্দ্ধাংশ এই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেও, নিম্নাংশস্থিত অংশগুলি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত থাকায় ভস্মীভূত হইতে পারে নাই। পরে, যে সকল কাষ্ঠখণ্ডের উপরে এই সকল স্তম্ভগুলি অবস্থিত ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, স্তম্ভগুলিও ক্রমশঃ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইতে থাকে। তাহাদের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকামধ্যে বৃত্তাকার গর্ত্ত হইতে থাকে এবং গর্ত্তগুলি উর্দ্ধস্থ ইষ্টক ও প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ দ্বারা পূর্ণ হয়। অবশ্য এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বর্ত্তমানে সঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। (২)

(৫) পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত অন্য আর একটী দর্শনীয় দ্রব্য হইতেছে কাষ্ঠের মঞ্চগুলি। স্তম্ভগুলির ঠিক দক্ষিণে ৩০ ফীট লম্বা, ৬ ফীট প্রস্থ ও ৪½ ফীট উচ্চ মঞ্চ-প্রায় কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এক একখানি কাষ্ঠখণ্ড সুবৃহৎ। আমরা ইহারও চিত্র আগামীবারে প্রদান করিব। এগুলি কি এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি এরূপ কাষ্ঠ-মঞ্চ দৃষ্ট হয় না। এরূপ মঞ্চ যে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত

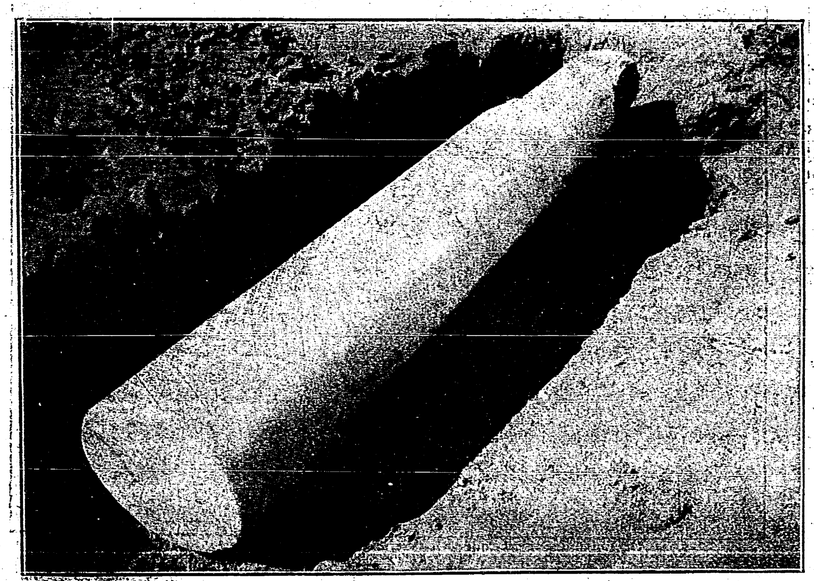

স্তম্ভ

(২) গত জুলাই মাসে আমি "ঢাকা রিভিউ" পত্রে অনুমানের বিষয় লিখি। উহার কিছুদিন পরে "ষ্টেটস-ম্যান পত্রিকায় একজন বিশেষজ্ঞ লেখক এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্প্রতি ডাঃ স্পুনারও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

শুধু যে কেবল তাহাই নির্দ্ধারিত হয় নাই তাহা নহে; ইহারা কত দিবসের তাহাও নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন। যদি তাহারা অশোক যুগের না হয়, তবে তাহাদিগকে আরও সুপ্রাচীন বলিতে হইবে, কারণ অশোকস্তম্ভের

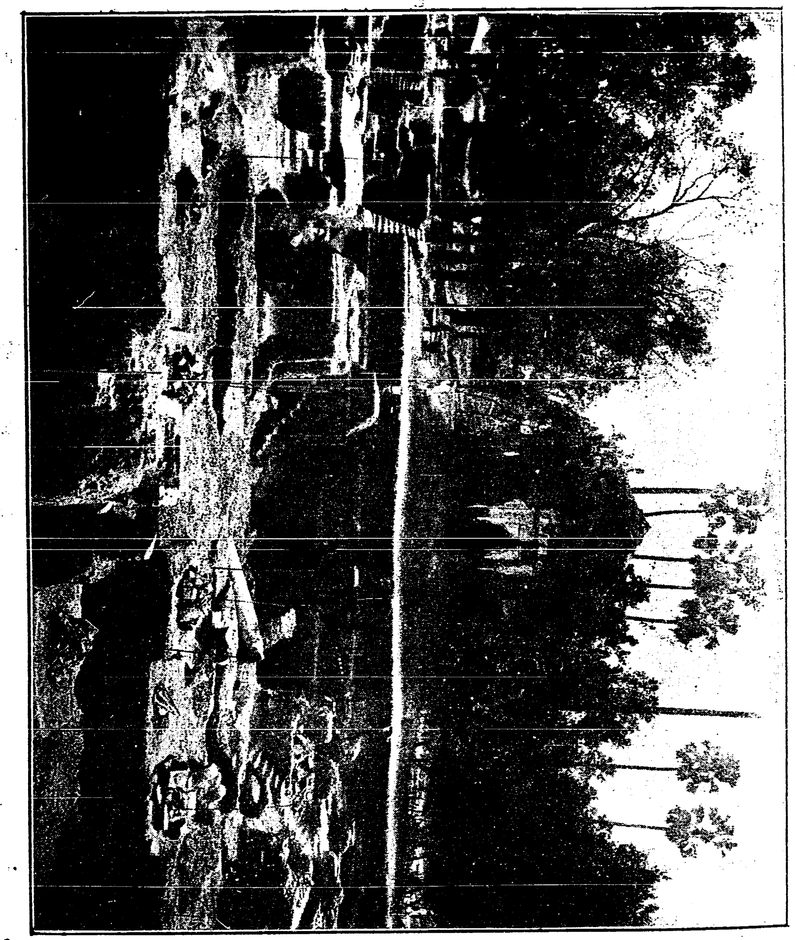

স্তম্ভগুলির ভগ্নাবশেষ

আরও পাঁচ ফীট নীচে এই সকল কাষ্ঠমঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে!

আশা করা যায়, এ বৎসরের খননে এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ।

নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল। একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুক্‌রা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদন মধ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া একটু রুটী ভাঙ্গিয়া বামহস্তে রক্ষা পূর্ব্বক অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল। পরে একটুকু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল "ভূত? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল "Rather laconic."

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষ মাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না।

যথাবিহিত সময়ে, অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন "Laconic? বরং একটি কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে "ভূত আছে?" আমি বলিলেই হইত 'না'। আমি বলিয়াছি 'ভূত? না।' 'ভূত' কথাটি বেশী বলিয়াছি, কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।"

এই বলিয়া বরদা আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবচলিত-চিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল, তখন বরদা বলিল "Seriously সারি! ভূত আছে বিশ্বাস কর না?"

সারি। না। †

বরদা। একদিন ভূত দেখলে তোমার আক্কেল হবে।

সারি। আমি একবার ভূত দেখেছিলাম। সেই জন্যই ত ভূত আছে ব'লে বিশ্বাস করি না।

---

* "এই ভূতের গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।" বঙ্কিমজীবনী (শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত)।

দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন লেখক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গল্পটির একটা 'উপ'-সংহার পর্য্যন্ত করেন নাই। এতদিন বাদে শুধু 'উপ'সংহার করাটা স্বর্গীয় কবির প্রতি অবিচার হয়, তাই যথাসাধ্য ইহার পুরাদস্তর 'সংহার'ই করিয়া দিলাম। লেখক।

† এই পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

বর। কি রকম? ভূত দেখে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান? নূতন ধরণের কথা বটে!

সারি। ব্যাপারটা শুনলে সব বুঝতে পারবে। আগে খাওয়াটা শেষ হোক্। তারপর সব বলছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই ভ্রাতা ভোজন সমাপন করিয়া বারান্দার দুখানি কঞ্চির চেয়ারে আসীন হইলেন। সুগন্ধি সিগারেট ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বরদা বলিল "বল, সারি। তোমার ভূত দেখার কথাটা শোনা যাক্।"

তখন চারিদিক রজনীর অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছিল। বারান্দার কিনারায় গোটা কতক টবে বিলাতী ফুলের গাছ সজ্জিত ছিল। মধ্যে মধ্যে বাতাস আসিয়া তাহার ডালপালাগুলি নড়াইতেছিল। তখনও চাঁদ উঠে নাই। তারাগুলি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বারান্দায় আলোক ছিল না। অন্ধকারে দুই ভ্রাতার মুখে স্থিত দুইটি চুরুটের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছিল।

সারদা বলিল "তখন তুমি বিলাতে ডাক্তারি পড়িতে গিয়াছ। আমি সেবার ধারমঠের রেলওয়ে ব্রিজ নির্ম্মাণ করিয়া বেশ কিছু টাকা হাতাইয়া ছিলাম। জানই ত, সোনার বেনে আমরা, আমাদের কাছে যে কেউ চালাকি করে ঠকিয়ে যাবেন তা হতেই পারে না। কণ্ট্রাক্টর হতে কুলি পর্য্যন্ত সক্কলে জান্‌ত যে এ বাবুর কাছে চালাকি চলিবে না। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি দু পয়সা রোজগার করতে, দান খয়রাত করতে ত আর নয়। কাজেই যাতে বেশ মোটা রকমের কিছু টাকা হাতান যায়, সর্ব্বদাই সেই মতলব করতুম। পোলটা তৈরি করে বেশ দুপয়সা করে নিয়েছিলুম।"

বরদা বলিল "সারি! তুমি যে পয়সা করবে তা আর আশ্চর্য্য কি? তোমার মাথায় যে সব ফন্দী খেলে তা বড় বড় ব্যারিষ্টারদের বুঝতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে হয়। সেই বাড়ীর মাম্‌লা মনে কর—"

সারদা বলিল "একবার কিন্তু জীবনে আমাকে ঠক্‌তে হয়েছিল। সে লোকটা আমার ওপর যায়। উদ্দেশে তাকে প্রণাম করি। সে ছাড়া আর কেউ আমাকে জব্দ করতে পারে নি।

বর। তোমাকে জব্দ? সে কি? বল, বল এই গল্পটাই আগে শুনি।

সার। ভূতের কথা আর এই গল্প, একই। শোন না। শুনলে সব বুঝতে পারবে।

বর। বল। দিয়াশলাইটা দাও, আর একটা চুরুট ধরাই।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বরদা দিয়াশলাই লইল ও চুরুট ধরাইতে মনোনিবেশ করিল। সারদা গল্প আরম্ভ করিল—

"ব্রিজের টাকাগুলো পেয়ে মনে করলুম এগুলো ব্যাঙ্কে রাখা হবে না। খাটিয়ে কিছু বাড়াতে হবে। তখন মধুপুরের কাছে একটা নূতন সহর প্রতিষ্ঠা হইতেছে। অনেক বড়লোক স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য এই মনোরম স্থানটিতে বাড়ী ঘর তৈরি করতে আরম্ভ করেছেন। আমারও খেয়াল হইল, একটা বড় বাড়ী তৈরি করে ভাড়া দেবো। বাড়ী একখানা হবে বটে কিছু সেটাকে এমন

ভাবে তৈরি করা হবে যে সাত আটখানা আলাদা আলাদা বাড়ী তা থেকে করে নেওয়া যাবে। প্রত্যেক বাড়ীর আলাদা কপাট, আলাদা সব। নিজেই ত বাড়ীটার নক্সা করে ফেল্‌লুম। সব ঠিক্ করে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।"

বর। জমী ঠিক করবার আগেই বাড়ীর নক্সা তৈরি হয়ে গেল?

সার। শোন না; সেই জন্যই ত গোল হ'ল। সেখানে গিয়ে সুবিধামত জমী আর পাই না। পাহাড়ের উপর বেশ সুন্দর খানিকটা জমী ছিল। তা সেটা সেখানকার একজন লোক আগে থাক্‌তেই কিনে রেখেছে। সে জমী কিছুতেই বেচতে রাজী নয়। আমি ভাবলুম, আমি শ্রীসারদাকৃষ্ণ সেন ইঞ্জিনিয়ার আমার সঙ্গে চালাকি! তাকে বল্‌লুম 'আচ্ছা তুমি জমী বেচ্‌তে না চাও, বিশ বছরের মত ঐ জমী আমায় লিস্ (Lease) দাও।

লোকটা তাতেও কিছুতে রাজী হতে চায় না। তখন আমার নক্সা খানি তার সামনে খুলে ধর্‌লুম। বল্লুম 'ওহে বাপু, এই এত বড় একখানি বাড়ী তৈরি হবে। বিশ বচ্ছর আমি ভোগ করব, তারপর জমীও তোমার হবে বাড়ীও। রাজী হওত বল।'

লোকটা খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে 'কাল আপনাকে জানাব।'

আমি বুঝ্‌লুম টোপ্ গিলেছে। একটু খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। গম্ভীরভাবে 'আচ্ছা' বলে চলে এলুম।

তার পরদিন রীতিমত রেজেষ্ট্রী করে লীস্ নিলুম। বাড়ী তৈরি হতে লাগ্‌ল।

বুঝ্‌তেই পাচ্ছ সারদাকৃষ্ণ সেন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী তৈরি হচ্ছে। তা আবার লীস্ নেওয়া জমীর উপর। বিশবছর বাদে তা অন্য লোকের সম্পত্তি হবে। সে বাড়ীতে নিজে থাক্‌ব না, ভাড়াটে বস্‌বে। এই হিসাবে বাড়ী তৈরি হ'তে লাগ্‌ল। যত রকম ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, যত কম পয়সা খরচ হতে পারে সেই রকমে বাড়ীখানি তৈরি করা গেল। বাড়ীর বাইরেটাতে নীল রঙ দিয়ে দেওয়া হ'ল। সামনে একটু রাস্তা। দূর থেকে দেখ্‌তে যেন ছবিখানি। যে লোকটার জমী সে ত আর আহ্লাদে বাঁচে না। দুবেলা এসে দেখে দেখে যায়। মনে মনে ভাবে বিশ বচ্ছর বাদে এ বাড়ী আমার হবে। আমি তার দিকে চেয়ে মনে মনে হাসি আর বলি 'বাবা, সারদাকৃষ্ণের বাড়ী ভোগ করবে এমন লোক এখনও দুনিয়ায় জন্মায় নি। বিশবচ্ছর ত দূরের কথা, পনের বচ্ছর বাদে এ বাড়ীর একখানা ইটও থাকবেনা।"

বরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "আচ্ছা মালমসলা দিয়ে বাড়ীখানি তৈরি করেছিলে ত?"

সার। তা করব না? আমরা ঐ কাজ করে পেকে গেলুম, আর একবেটা ঝুঁটি-ওয়ালা একটু জমি লীস্ দিয়ে ঠকিয়ে একখানা বাড়ী নেবে? বাড়ী ত তৈরি হল। চারদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসোপযোগী আটখানি বাড়ী পাশাপাশি ভাড়া দেওয়া হবে। কেউ ইচ্ছা করলে দুখানি বা তিনখানি একত্রে ভাড়া নিতে পারেন। নূতন বাড়ী স্বাস্থ্যকর স্থান

প্রভৃতি প্রলোভন যতদূর দেখাবার তা দেখান গেল। বিজ্ঞাপনের খুব ফলও হল। দু মাসের মধ্যে সব বাড়ীগুলি ভাড়া হয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত।

দু বছর এই রকম করে কেটে গেল। বাড়ীগুলি থেকে বেশ আয় হতে লাগ্‌ল। যে বেটার জমী সে কেবল টাঁকছে কতদিনে বাড়ী তার হয়। আমি মনে মনে হাস্‌ছি আর বল্‌ছি। 'তোমার আক্কেল দাঁত গজিয়ে তবে ছাড়্‌ব।'

তৃতীয় বৎসরের প্রথমে মাঝের একখানি বাড়ী ছাড়া আর সবগুলি এক Season এর জন্য ভাড়া হয়ে গেল। মাঝেরটির আর ভাড়াটে জুট্‌ছে না। এই সময় আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধর্‌ল। আমি মনে কর্‌লুম, যাই কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একবার ঐখানেই হাওয়াটা বদ্‌লে আসি। দরখাস্ত করে তিন-মাসের ছুটি নিলুম। রওনা হবার যোগাড় কচ্ছি এমন সময় আমার সরকারের এক চিঠি পেলুম যে মাঝের বাড়ীখানি সেইদিন ভাড়া হয়ে গেছে।

আমি সরকারকে টেলিগ্রাম কর্‌লুম সে যেন আমার জন্য আর একখানি বাড়ী দেখে রাখে। দুদিন বাদে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুলুম। সরকার আমার জন্য একখানা ছোট বাড়ী ঠিক্ করে রেখেছিল। সেই-খানেই ওঠা গেল।

মাঝের বাড়ীর ভাড়াটের কথা সরকারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। সে বল্লে 'মশাই বড় বিপদে পড়েছি। বাঙ্গাল এক বেটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। নানা রকম ফ্যাসাদ আরম্ভ করেছে। এটা সারিয়ে দাও, ওটা সারিয়ে দাও। বেটা যেন মেটেবুরুজের নবাব। অমন নতুন বাড়ী পছন্দ হয় না। বেটার দেশের বাড়ী হয় ত খোলার চাল, এখানে এসে আমিরী দেখাচ্ছে।'

আমি বলিলাম 'অগ্রিম এক Season এর ভাড়া নিয়েছ ত?'

সরকার বলিল 'আজ্ঞে তা না নিয়ে কি আর বেটাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিই? ছ মাসের ভাড়া আগাম নিয়েছি আর দু বচ্ছরের এগ্রিমেণ্ট।

তাই জন্যে আরও বেটার রোখ্। বলে আগাম ভাড়া নিয়েছ, বাড়ী মেরামত কর্‌বে না কেন?

আমি বুঝিলাম দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এর মধ্যেই আমার ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধিতে প্রস্তুত বাড়ী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

বলিলাম 'আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

সরকার বলিল 'আজ্ঞে, সে এখনই আপনার কাছে আস্‌বে। বলেছে বাবু আস্‌ছেন, তাঁর সঙ্গেই সব কথা ঠিক্ কর্‌ব। তুমি সরকার তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে আর কি হবে!"

আমি বলিলাম 'আচ্ছা।' সরকার চলিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু, চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে এক কোঁৎকা, আমায় দেখিয়া বলিল 'আপনিই সারদাবাবু, ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। আপনার বাড়ীটি নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আপনাকে এর একটা বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।'

আমি বুঝিলাম এ সেই বাঙ্গাল। বলিলাম 'সে কি কথা? নিশ্চয়ই কর্‌ব। আপনাদের সন্তুষ্ট না রাখ্‌লে আমার চল্‌বে কি করে? আপনাদের অনুগ্রহেই ত করে খাচ্ছি।'

বাঙ্গাল বলিল 'বিলক্ষণ! সে কি কথা! আপনি মহাশয় লোক। আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি না দেখ্‌লে আমাদের দেখবে কে?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

সে বলিল 'আমি একা।'

"একা? রান্নাবান্না কে করে?"

"নিজেই।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। বেটা বলে কি? এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে এসেছে। নিজে রেঁধে খায়! ভাবিলাম, বোধ হয় কোন রোগী শীঘ্র আসিবে। বলিলাম 'কার জন্য বাড়ী নিয়েছেন?'

"আমারই জন্য। আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়। একটু স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে আসিয়াছি।"

আমি ত অবাক্। এই ভীম শরীর। এর উপর আবার স্বাস্থ্যোন্নতি! বেটা কি রামমূর্ত্তির খেলা দেখাবে নাকি? মুখে বলিলাম 'ওঃ! তা আপনার অভিযোগ কি?'

"দেখুন, ঘরগুলির ছাদ ত সব ফুটো হয়ে গেছে। কাল রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তা শোবার ঘরখানিতে খাটিয়া টেনে টেনেই অস্থির। যেখানে খাটিয়াটি সরাই সেখানেই টপ্ টপ্ করে জল পড়ে। শেষে খাটিয়ার উপরে ছাতা খুলে সারারাত বসে কাটিয়েছি।

আমার এত হাসি পাইতেছিল যে বুঝি পেট ফাটিয়া যায়। অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলাম, 'বলেন কি? সরকারটা দেখ্‌ছি কোনও কাজের নয়। আমি আজই মিস্ত্রী পাটিয়ে সব ঠিক্ করে দোব।'

"আর দেখুন, দেওয়াল থেকে বালি চুণ সব খসে পড়্‌ছে। সে গুলোও মেরামত করে দিতে হবে। আর কপাট জানলা গুলো বন্ধ কর্‌লেও তার মাঝে এমন ফাঁক থাকে যে তা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢোকে আর রান্না ঘরে জল ঢাল্‌বার যে নর্দ্দামা আছে তাতে জল ঢাল্‌লে জল আট্‌কে থাকে, সেটাকে একটু বড় করে দিতে হবে, আর ছাতের পাইপটা দু তিন জায়গায় ছ্যাদা হয়ে গেছে—আর—"

সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালটা মাসিক পত্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের ন্যায় অবিরাম চল্‌ছে যে! বলিলাম 'সব ঠিক্ করে দোব। আমি আজই মিস্ত্রী পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা যা দরকার তাদের বল্‌বেন। তারা ঠিক করে দেবে। আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। কিছু মনে কর্‌বেন না।' এই বলিয়া লাঠিটা লইয়া জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম!

বাঙ্গালটা কি তবু ছাড়ে? সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বলিল, 'যে আজ্ঞে! আপনি মহাশয় ব্যক্তি! আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি—'

আমি বলিলাম 'আপনি কোন্ দিকে যাবেন?'

সে একটা রাস্তা দেখাইয়া বলিল 'এই দিকে।'

আমি তাহার বিপরীত একটি গলির দিকে গিয়া বলিলাম 'আচ্ছা, আসুন তাহলে প্রণাম। আমার এইদিকে একটু কাজ আছে।'

তখন বাঙ্গালটা বিদায় হয়। বাপ্। হাঁফ ছাড়িয়া তখন ঘরে আসিয়া জুতা খুলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমার নির্দ্দেশক্রমে সরকার দুজন মিস্ত্রী পাঠাইল। তাহারা কেবল ছাদ মেরামত করিয়া দিয়া আসিবে এই বলিয়া দেওয়া হইল। গোবর ও চুণ মিশাইয়া ছাদের উপর একটা কোটিং (Coating) দিবে। ছাদ খোঁড়া হইবে না। বর্ষাকালটা এই রকমে রিপু করিয়া চলুক। শীত গ্রীষ্মে কোন ভয় নাই। আর বছর বর্ষাকালে যা হয় দেখা যাইবে।

তারপর দিন বাঙ্গালটা আবার আসিয়া হাজির। বলিল, মিস্ত্রীরা কিছুই করে নাই। তাহার কথা শোনে নাই। ছাদে গোবর ঢালিয়া কি একটা কাণ্ড করিয়াছে। মেরামত প্রভৃতি কিছুই হয় নাই।

আমি তখন নিজমূর্ত্তি ধরিলাম। সমস্ত seasonএর ভাড়া অগ্রিম আদায় হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালটা করিবে কি? বলিলাম "আবার কি হ'বে? গোটা বাড়ীটা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে দিতে হবে নাকি? তুমি কোথাকার লোক? বাড়ী যখন ভাড়া করেছিলে তখন দেখে নিতে পারনি? নানা রকম ফ্যাচাঙ্ বারকরে উদ্বাস্ত করে তুলেছ।'

"আজ্ঞে, দোর জানালা বন্ধ কল্লেও কপাটের ভেতর দিয়ে ফাঁক বয়, হু হু করে হাওয়া ঢোকে।"

"তা ঢুকবেই ত! এসেছ হাওয়া বদলাতে। হাওয়া খাবে না? ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে এ বাড়ী তৈরি হয়েছে, ventilation না থাক্‌লে সে বাড়ী বাস-যোগ্যই নয়, তা জান? থাক পাড়াগেঁয়ে, এ সব বুঝ্‌বে কি?"

"আর রান্নাঘরে যে নর্দ্দামা দিয়ে জল বেরোয় না।"

"সেখানে জল ঢাল কেন? একটা মাটির গাম্‌লা কেন'। তাতে জল ঢাল। গাম্‌লা ভর্ত্তি হ'লে বাড়ীর বাইরে গামলা নিয়ে গিয়ে জলটা ফেলে দিলেই হবে।"

"আর বালি চুণ খসে পড়্‌ছে যে—"

"তোমার বায়নাক্কা ত কম নয়? দেবে ত মাসে ত্রিশটি টাকা ভাড়া। তা ইট বারকরা দেওয়াল হলে তোমার ঘুম হয় না। কি এমন লবাবপুত্তুর তুমি যে তোমার জন্যে ঘরে পেণ্ট্ করে দিতে হবে। আর কিছু হবে টবে না। মিছামিছি আর জ্বালিও না। পছন্দ না হয় অন্য বাড়ী খুঁজে নাও গে।"

"আজ্ঞে তা হলে আমি বাড়ীই বদলাব।"

"স্বচ্ছন্দে।"

"আমার টাকা তা হলে ফেরৎ দিন।"

"কিসের টাকা?"

"আমি যে ছমাসের ভাড়া আগাম দিয়েছি।"

"সে টাকা কেন দোব? আমি ত আর তোমায় উঠিয়ে দিচ্ছিনি। তোমার পোষাচ্ছে না তুমি উঠে যাচ্ছ।"

"আজ্ঞে, আপনি আইনতঃ বাড়ী মেরামত করতে বাধ্য।"

"বেশ। আদালতে নালিশ করগে যাও। এই গলির মোড়েই শ্যামাচরণ বাবু উকীল থাকে। যাও—তাঁর কাছে। দেখ, কি করতে পার।"

বাঙ্গালটা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমিও শীষ্ দিতে দিতে বাবুর্চ্চিকে ফাউল কারির অর্ডার দিলাম।

তারপর দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। শুনিলাম, বাঙ্গালটার ভারি পসার। কাহাকেও মাদুলি দিতেছে। কাহারও বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম ব্যাটা আমার কাছে জব্দ হয়ে গেছে।

চার পাঁচদিন পরে একদিন সকালবেলা চা বিস্কুট খাইতেছি এমন সময় আমার বাড়ীর ভাড়াটিয়া তিনচারজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখের ভাব উদ্বেগব্যঞ্জক। আমি তাঁহাদিগকে খাতির করিয়া বসাইলাম। তাঁহাদের মধ্যে অবিনাশ বাবু বয়সে প্রবীণ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ব্যাপার কি?'

অবিনাশ বাবু বলিলেন 'মশাই, আমাদের সবাইকে ত আপনার বাড়ীগুলি ছাড়্‌তে হ'ল।'

"কেন?"

"আজ্ঞে, এতদিন বেশ ছিলুম, কিন্তু দিন দুই তিন হ'তে বাড়িগুলিতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে।"

আমি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম 'ভূত? বলেন কি মশায়? তামাসা কচ্ছেন নাকি?'

"আজ্ঞে না। তামাসা কি? প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমার ছোট মেয়েটর হাঁপানির ব্যারাম। এখানে সারাতে এসে-ছিলুম। দুর্ব্বল শরীর। ভূত দেখে তার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে। গিরীন বাবুর পরিবার ত মাথার দিব্য দিয়ে বলেছিলেন আজই বাড়ী ছাড়্‌তে হবে। ছেলেপুলে সব ভয়ে কাঁটা।"

আমি ভাবিলাম, এ সেই বাঙ্গাল বেটার কারচুপি। বলিলাম 'কি হয়েছিল খুলে বলুন দেখি। কোথায় ভূত বেরুল?'

"আজ্ঞে কোথায় তা কি ঠিক্ আছে? কখনও আমার বাড়ীর ছাদে। কখনও গিরীন বাবুর ছাদে। কখনত কোথাও কিছু দেখা যায় না, বিকট হাসির শব্দ। কখনও মেয়েলি গলায় গান, সে ভয়ানক ব্যাপার।

"দেখুন, এ সব সেই বাঙ্গাল বেটার বদ্‌মায়েসি। নইলে ভূত কোথা থেকে আসবে? এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না; আর বাঙ্গালটা আস্‌তেই ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হ'ল। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্। আমি বাঙ্গালটাকে সিধে করে দিচ্ছি।

আপনি বলেন কি? তিনি ত ভূতের একজন বিখ্যাত ওঝা। তিনি যেদিন বাড়ীতে থাকেন সেদিন ত' কোনও উপদ্রবই হয় না। তিনি যেদিন বাড়ীতে না থাকেন সেইদিনই উপদ্রব হয়।

"তিনি আবার যান কোথায়?"

"তিনি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন। শ্মশানে মশানে যান বোধ হয়।"

আমার আর সহ্য হইল না। বলিলাম "দেখুন আপনারা সব শিক্ষিত লোক। ঐ

হুজুরুক বাঙ্গালটার কথায় ভোলেন। ভূত টুত কিছু নয়। সব ও বেটার বদমায়েসি। আমি আজই ভূত তাড়াচ্ছি। আপনারা দু একদিন চুপ্ করে থাকুন।”

স্থির হইল, আমি সেইদিন অবিনাশবাবুর বাড়ীতে গিয়া রাত্রিতে থাকিব ও স্বচক্ষে ভূতের কাণ্ড দেখিব।

সন্ধ্যার পর বাবুর্চ্চি গরম গরম খানা আনিয়া দিল। খাইয়া বেশ একটু অধিক মাত্রায় ব্র্যাণ্ডি টানিলাম। তারপর স্ফূর্ত্তির সহিত অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় দেখিয়া গেলাম, বাঙ্গালটার বাড়ীর দ্বারে বাহির হইতে তালা বন্ধ। শুনিলাম উকীল শ্যামাচরণ বাবুর মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়াশান্তির জন্য সে শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত রাত্রি হোম করিবে।

সরকারকে শ্যামাচরণ বাবুর বাটিতে পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, ‘বাঙ্গালটা যদি সেখানে না থাকে ত আমায় আসিয়া খবর দিবে। আর যদি থাকে ত সেখানে বসিয়া সারারাত তাহাকে পাহারা দিবে। কোথায় যায় সন্ধান করিবে।’

সরকার চলিয়া গেল। আমি অবিনাশ বাবুর ছাদে উঠিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গে কেহ থাকিতে স্বীকৃত হইল না। আমি একাকী একখানি চৌকির উপর বসিয়া রহিলাম।

তখন বর্ষাকাল। আকাশে চন্দ্র, তারকা কিছুই দেখিবার উপায় নাই। মেঘে সারা আকাশ ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে আমি বেশ করিয়া ওয়াটার প্রুফে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রহিলাম।

আমার বাড়ীগুলির ছাদ একই। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রাচীর তুলিয়া বাড়ী গুলিকে পৃথক্ করা হইয়াছে। আমার পিছনে এইরূপ প্রাচীর। তাহাতে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলাম। সামনে ছাদের শেষে আবার একটা ঐ রকম প্রাচীর।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। কোনও সাড়াশব্দ নাই। কেবল টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতেছিল। কিছুদূরে একটা গাছ ছিল। মাঝে মাঝে তাহার উপর দু একটা পাখী বোধ হয় ডানা নাড়িতেছিল। তাহারই ঝট্‌পট্ শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম।

এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল। কোথাও কিছু নাই। বসিয়া বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। একবার উঠিয়া বেড়াইব বলিয়া দাঁড়াইলাম।

ও-কি-ও! খুব মিষ্ট গলায় কে যেন গান গাহিতেছে শুনিতে পাইলাম। অতি করুণ বিষাদময় সুর। গানের কথা বুঝিতে পারিলাম না। কোথা হইতে গান আসিতেছে। তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কে যেন গান গাহিতেছে ও হাততালি দিয়া তাল রাখিতেছে। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখা গেল না। একবার বিদ্যুৎ চমকিল। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

খানিকক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল। আবার চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

তখন আমার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। একটু ছাদের উপর বেড়াইলাম। একবার মনে করিলাম—অবিনাশ বাবুকে ডাকি। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা হইল। তাঁহারা মনে করিবেন কি?

ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—কতকগুলি উপর্য্যুপরি শব্দ হইল। আমি যে প্রাচীরে ঠেস্ দিয়াছিলাম ঠিক তাহার পিছনেই শব্দ হইল—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্। আমি সাহসে ভর করিয়া চৌকির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কিসের শব্দ হইতেছে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। মনে হইল শুভ্রবর্ণ কি একটা পদার্থ চলিয়া বেড়াইতেছে। শৃঙ্গের উপর কি একটা উঁচু হইয়া রহিয়াছে।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম ‘কে?’

উত্তর নাই। সঙ্গে একখানা ছোরা ছিল, সেইখানা সশব্দে সেই পদার্থটার উপর নিক্ষেপ করিলাম। অমনি হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি বিকট হাস্যধ্বনি। আমার রক্ত জল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে নামিয়া পড়িলাম।

সেই হাস্যধ্বনি বাড়ীর আর আর সকলেও শুনিতে পাইয়াছিল। বোধ হইল নীচে কে যেন মূর্চ্ছা গেল। অস্ফুট গোলমাল হইতে লাগিল। আমি নামিতে যাইব এমন সময় দশদিক আলোকিত করিয়া একবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। আতঙ্কে প্রাচীরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম—প্রাচীরের উপরে উন্মুক্তকুন্তলা, বিস্রস্তবসনা এক রমণীমূর্ত্তি। সে একবার হাততালি দিয়া আবার হাসিল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

তাহার পরই বিকট বজ্রধ্বনিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম বাসায় শয়ন করিয়া আছি। পাশে সরকার ও সেই বাঙ্গাল। বাঙ্গালটা বলিল ‘বাবু! এখন কি রকম বোধ কচ্ছেন?’

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। এই ব্যাটার জন্যই ত এত কাণ্ড। কোনও উত্তর দিলাম না।

বাঙ্গাল আবার বলিল ‘বাবু আপনি ইংরাজি পড়েছেন। ভূতপ্রেত ত মানেন না। ‘ভেণ্টুলেসন’ না ‘পেণ্টুলেসন’ কর্‌তে কবাট জান্‌লা খুলে রাখেন। হাওয়া বইলেই উপদেবতার উপদ্রব হয়। যাক্, এখন সাম্‌লেছেন ত? আমাদের কাজই হচ্ছে এই হাওয়া নিয়ে। কত অপদেবতা তাড়িয়েছি তার কি সংখ্যা আছে। আপনি ভাববেন না। কিছু দক্ষিণার বন্দোবস্ত হলেই আমি ভূতটুত সব তাড়িয়ে দোবো।’

আমাকে তখন সামলাইতে হইল। ভূতের উপদ্রব হইলে সব ভাড়াটিয়া ত পলাইবে। হানা বাড়ী বলিয়া প্রচার হইলে ভবিষ্যতে আর ভাড়াটিয়াও জুটিবে না। কাজেই গায়ের রাগ গায়ে মারিয়া বলিলাম ‘ঠাকুর! আপনি মনে করিলে কি না পারেন? এ উপকারটি আপনাকে করিতেই হইবে।’

বাঙ্গাল বলিল ‘তার আর কি? আমার বাড়ীটা সারিয়ে দিন। ঐ বাড়ীতেই বসে স্বস্ত্যয়ন কর্‌ব।’

সেইদিনই বাড়ী মেরামত করাইয়া দিলাম। বিকালবেলা দাঁত বাহির করিয়া বাঙ্গালটা হাজির। বলিল ‘এবার দক্ষিণার বন্দোবস্তটা হ’লেই—’

কি করিব! উপায় নাই! বাঙ্গাল যাহা বলিল, তাহাই করিতে হইল। দুই বৎসরের ভাড়া পাইয়াছি বলিয়া বাঙ্গালকে এক রসিদ

লিখিয়া দিলাম। রাত্রিতে স্বস্ত্যয়ন ও ভূত শান্তি হইবে।

তৎপরদিন সকালে অবিনাশ বাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া হাজির। বলিলেন 'যাহোক্, খুব ভয়টা পেয়েছিলেন। হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমরাও কি আগে জান্‌তুম? তা হ'লে কি আর এত ভয় পাই?'

"কি জান্‌তেন না?"

"আপনি এখনও শোনেন নি। বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক পাগ্‌লী পরিবার আছে। সে ঐ রকম হাস্‌ত, গান গাইত। মই নিয়ে ছাদে উঠত। কেউ ভাড়াটে রাখে না বলে পরিবারের কথা প্রকাশ করেন নাই। নিজে যখন থাকতেন সাবধানে রাখ্‌তেন। বেরিয়ে গেলে পাগলী ছুটোছুটি করে বেড়াত। আজ আমাদের সবাইকে ভটাচার্য্য মহাশয় বল্লেন আর গোপন করা উচিত নয়। সারদাবাবু অমন মহাশয় লোক, উনিই ত সে দিন গিছলেন আর কি? যাহোক্ আমরা এখন নিশ্চিন্ত হলুম। আপনিও shockটা কাটিয়ে উঠেছেন ত?"

আমি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া—"

সারদাকৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি জুড়ি আসিয়া বারান্দার সম্মুখে লাগিল। একজন খানসামা কোচবাক্স হইতে নামিয়া গাড়ির লণ্ঠনের আলোকে বরদাকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া সেলাম করিয়া বলিল "জমীদার বাবুর বড় অসুখ। আপনাকে এখনই যেতে হবে।"

"চল।" বলিয়া বরদাকৃষ্ণ উঠিলেন। বলিলেন "সারি, বাকিটা বুঝে নিয়েছি।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১। হিত-গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড *

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য-কানন এক সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কল-লহরীতে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুর পাকিবার পূর্ব্বেই সে কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, পাখী অজ্ঞাত লোকে উড়িয়া পলাইয়াছে। বঙ্গ দেশ ও সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই!

আমরা কবি হিতেন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি। হিতেন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার যে জীবনী এই গ্রন্থের অবতরণিকায় সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহা হইতে গ্রন্থকারের পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব। কারণ কবির জীবনী হইতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাঠকের নিকট সুপরিস্ফুট হয়।

হিতেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশব হইতেই কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীত, এই তিন কলাবিদ্যায় তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং প্রতিভাও

* হিত-গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পুণ্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকট শিক্ষা পাইয়া সঙ্গীতে তাঁহার কণ্ঠ অপরূপ সুধা বর্ষণ করিত। তাঁহার স্বর সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ছিল। 'বিশুদ্ধ তাললয়ে ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি হিন্দী গান তাঁহার কণ্ঠে বড়ই মধুর শুনাইত। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য ফাদার লাফোঁ একবার তাঁহার কণ্ঠে হিন্দী তেরেনা গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন যেন Gregorian Chant. জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীতে নিজে সুর সংযোগ করিয়া তিনি যখন সেইগুলি গাইতেন, তখন মনে হইত, জয়দেবের গান যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের ইতিহাস-উদ্ধারেও তিনি আজীবন যত্ন করিয়াছিলেন। পুণ্য, নব্যভারত, সাহিত্য, সমীরণ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাদিতে তিনি ভারত-সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ



হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি সঙ্গীত-কথাসরিত নামে ভারত সঙ্গীতের এক সুবৃহৎ ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যেও তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইতেছিল। তিন চারিখানি নাটক, আট-দশখানি কাব্যগ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন নানাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন নামে সজ্জিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ, "শতদল" কয়েকটি কোমল কবিতার সমাবেশ। দ্বিতীয় গ্রন্থ, "ত্রিশূল।" দুই গ্রন্থে পার্থক্য গভীর। 'শতদলের' কবিতাগুলি শতদলের মতই শোভায় সৌন্দর্য্যে কোমলতায় ঢল-ঢল, আর 'ত্রিশূলের' কবিতাগুলি শ্মশান-চারী ভূতপতি ভবানীনাথের জটাজালের মতই গম্ভীর, তেজোদীপ্ত। কবির সমসাময়িক কালে সমাজ-প্রাঙ্গণে যে সকল আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহারই সংস্কার কল্পে কবি ত্রিশূল প্রকাশ করেন। কিরূপে সমাজ ও গৃহ, তপস্যা, আত্মনির্ভরতা ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, 'ত্রিশূলে' কবি তাহারই আভাস দিয়া গিয়াছেন। 'ত্রিশূল' যখন প্রকাশিত হয়, কবির বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র।

চিত্রবিদ্যায় তাঁহার শক্তি যথেষ্ট ছিল। পূর্ব্বে বঙ্গীয় মাসিক পত্রাদিতে রঙ্গীন ছবি বাহির হইত না। হিতেন্দ্রনাথের পুণ্যই প্রথম এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে। প্রথম দুই-এক সংখ্যায় পাঁচশত খণ্ড চিত্র তুলিকা দ্বারা রঙে তিনি চিত্রিত করেন; কিন্তু দেখিলেন, এ ভাবে রঙীন চিত্র প্রকাশ করা বহুকাল ও শ্রমসাপেক্ষ। তখন তিনি ক্রোমোলিথোর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ক্রোমোলিথো শিখিবার জন্য আর্ট স্কুলে প্রবেশ করিলেন। এবং বাড়ীতেও নিজে পাথর আনিয়া ক্রোমো লিথো বিষয়ক গ্রন্থাদি আনাইয়া তাহার সাহায্যে সাধনা আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরকালেই এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিলেন। এখন তিন রঙের Process Blockএর সাহায্যে নানা রঙে রঙিন ছবি প্রকাশ করা সহজ সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ক্রোমোলিথোর সাহায্যে রঙিন ছবি প্রকাশ করা যথেষ্টই শক্তি-সাপেক্ষ ছিল। হিতেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

হিতেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রীতিরও সীমা ছিল না। এক চত্বারিংশৎ মাত্র বয়সে তাঁহার জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত কাল মধ্যেই তিনি সঙ্গীত-সাহিত্য চিত্রে যে প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। সেই হিতেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশে উদ্যোগ করিয়া সম্পাদক মহাশয় প্রকৃতই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এমন বিচিত্র যাঁহার জীবন তাঁহার রচনাবলীতেও বৈচিত্র্যের ছাপ কেমন ফুটিয়াছে তাহার আলোচনা উপভোগ্য লাগিতে পারে। এক্ষণে সংক্ষেপে আমরা তাঁহার রচনা-সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলিব। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে হিতেন্দ্রনাথের ৩১০টি খণ্ড কবিতা ও সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সব রচনাগুলিই ভাবসম্পদে সমান উজ্জ্বল নহে কিন্তু অধিকাংশই সুন্দর! "ধ্যানবল," "শিবরাত্রে তপস্যা" "হরিনাম," "স্তব", প্রভৃতি গুরু বিষয়ও যেমন কবির তুলিকাসম্পাতে

লাভ করিয়াছে, তেমনি নিভৃত সুদূর "পল্লী-দৃশ্য", "পোড়ো ঘাট" "ঝাউবন" "গরিব মুটে"র উপরও তাঁহার দৃষ্টি বিমুখ হয় নাই। ললিত সরলভাবে নিরপেক্ষ কবির স্নেহরসস্পর্শে সেগুলিও অপূর্ব্ব গৌরবে গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে! 'পোড়ো ঘাট'কে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,

"কাহার স্বপন তুই দেখিছিস বসে হেথা
কার গীত মনে পড়ে তোর?
কার স্মৃতিগুলি ধীরে আকুল ব্যাকুল হৃদে
কেহ নাই, একা, শুষ্ক ঘোর!
রহিছিস কার-ভাবে ভোর!

* * *

আসেনাকো আর পান্থ আসেনাকো আর হেথা
রূপসীরা নূপুর-চরণে
খেলেনাকো হেথা আর শিশুগুলি ফুল লয়ে
মত্ত শুধু ঢেউগুলি রণে!

* * *

অলস কনক পাখা খেলে মেঘ বায়ুকোণে
হাসিয়া আকাশ দেখে খেলা।
গেয়ে যায় পাখী গান চলে চায় দিগন্তরে
হেসে খেলে কাটায় রে বেলা।
তুই শুধু একা হেথা স্বপন-আসনে বসে
অজানা মরম কথা ধরে,
রয়েছিস্ ভাঙা বুকে! টুটে গেছে আশা বুঝি,
নাহি বুঝি মায়া আর ওরে!
এবে তোর পরাণের পরে?

পোড়ো ঘাটে'র ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের উপর কবির যে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ঘাটের সমৃদ্ধি-সৌভাগ্যের ইতিহাস কি দীপ্ত করুণ রাগে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে! 'নৌকা'য় বসিয়া কবি পল্লীর যেটুকু দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহাও সুনিপুণ ফটোগ্রাফের মত তিনি সকলের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কতটুকু! তবু সমস্ত পল্লীর সাড়া এই ছন্দে সুরে কেমন ধ্বনিয়া উঠিয়াছে!

"কৃষক লাঙ্গল ধ'রে
আঁকা বাঁকা মেঠো পথে চলে চায় গ্রামে ঘরা;
ছায়াময় গাছতলে
দূর হতে উঁকি মারে, গ্রামগুলি ঘেরা-ঘোরা।

'গোয়াল-পোড়া' দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন, সেখানে 'চক্র-ঘর্ঘর' নাই, জন-কোলাহল নাই, আছে শুধু পত্রমর্ম্মর—বাঁশবনে সমীর-শব্দে কবি বাঁশরীর রব শুনিতে পান, এই সকল সুরের মধ্য দিয়া ছায়া-আলোকের মধুর সম্পাতে তাঁহার মনে হয়, "গ্রামগুলি স্বপ্নময়!" কবির মুটে বলিতেছে,—

"বহিয়া সহিয়া বহে দর দর ঘর্ম্ম।
তাহে সুস্থ সুখী আমি করে করে কর্ম্ম॥"

দুই-একটি ইঙ্গিতে অনেকখানি ফুটাইয়া তোলা প্রতিভাবান লেখকের বিশেষত্ব। কবি তাহাতে বহু স্থলেই সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল, কোথাও তিনি ছন্দে কথায় সর্ব্বত্র কারিকুরির চেষ্টা করেন নাই—হাল্‌কা তরঙ্গে ভাব-বারিধি পাঠকের হৃদয়-তটে উছলিয়া পড়ে! সে তরঙ্গে লীলা ভঙ্গ আছে, সে তরঙ্গ কুলকুল-নিনাদে বহিয়া চলিয়াছে—তাহাতে গভীর গর্জ্জন নাই! নিতান্তই সে শান্ত ধীর স্রোত! সে স্রোত কোথাও অস্পষ্টতার জঞ্জালে বাধা পায় নাই। কবির রচনায় এমন একটি অনাড়ম্বর লালিত্য আছে যে তাঁহাকে নিতান্তই ঘরের লোক বলিয়া মনে হয়। উদ্ধৃত দুই-চারিটি কবিতা-খণ্ড হইতে আমরা ভাবের সরলতা ও কোমলতার পরিচয় পাইয়াছি। এরূপ বহু কবিতা কোমলতার

উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু স্থান-সংক্ষেপ। ভাব-গাম্ভীর্য্যের দুই-চারিটি পরিচয় দিয়াই আমরা হিতেন্দ্র-কথার উপসংহার করিব। 'ভালবাসা' সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,

ভালবাসি ভালবাসি সকলেই কহে
ভালবাসেনা তেমন।
কামনা লইয়া ভাল সকলেই বাসে;
নিষ্কাম প্রেমের তরে কয়জন আসে?
ভালবাসেনা তেমন।"

জগতে সত্যের রূপ ধরিয়া কত লোক গুরুর আসনে বসিয়া গিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন,

"এ আঁধার নিয়ে আমি ছুটি
শিষ্য করিবারে;
অনুতে কেমনে রব ফুটি
ডুবিয়া অসারে?

ভণ্ডের আধিপত্য দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"ভণ্ড বাড়িছে দিন দিন;
সব হইছে বেতাল, খণ্ড খণ্ড জীবহীন।
ধ্যান চাই, যোগ চাই,
চাই তপস্যা নিষ্কাম;
কাজে কারো কিছু নাই,
মুখে লয়ে হরিনাম।"

এমন বিস্তর পরিচয় দেওয়া যায়।

এই গ্রন্থাবলীখানির একটি দোষ লক্ষ করিলাম। তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে আমরা দায়ী করিব। কবিতাগুলি তিনি বাছাই করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হইত। কারণ কয়েকটি কবিতা নিতান্তই মলিন। বহু উজ্জ্বল কবিতার পার্শ্বে সেগুলির ম্লানিমা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিয়াছে! সেগুলি বাদ দিলে—সেগুলির সংখ্যা অবশ্য অল্প—গ্রন্থাবলীখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

যাহা হউক, তথাপি তিনি হিতেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে যে আনন্দ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যের তরফ হইতে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বইখানির ছাপা-বাঁধাইও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি, কাব্যরসগ্রাহী পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

বসন্ত

বসন্ত আসিছে অই লঘু পক্ষ পরে
মুক্ত হ'ল হিমানীর তুষার শিকল,
মৌন পাখী এতদিন কলরব ভরে,
করিল অরণ্য পথ মুখর চপল।
নগ্ন, দুর্ব্বা পুষ্পহীন পর্ব্বত প্রান্তর
রাঙ্কব আস্তীর্ণ আজি প্রসূন শোভায়,
গায়ক পাখীরে খুঁজি' ব্যাকুল অন্তর,
তরুগুল্মে রুদ্ধ পথে চলা নাহি যায়!

লতার কুঞ্চিত ঘন কুন্তলের মাঝে
কোথায় বাসন্তী-ফুল মেলে না সন্ধান!
শরৎ যখন আসে উদাসীন সাজে
মুক্ত পথে তুলি ফুল যত চাহে প্রাণ!
পাটল ধূসর বর্ণ করিয়া বিদায়,
দীপ্ত শোভা গাঢ় রাগ করিয়া বরণ
শরতের গিরিমালা দাও গো আমায়,
গভীর নিশ্বাস সুখে ফুল্ল তনু মন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যা

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২০ [১২শ সংখ্যা

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৬)

সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুসমাজের সারভূত দুই প্রধান অঙ্গ। হিন্দুসমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ ও হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জা হচ্ছে পৌত্তলিকতা। সমাজ সংস্কর্ত্তাগণ কাল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে কেহ জাতিভেদ প্রথা, কেহ বা পৌত্তলিকতা এই দুই ভিত্তির উপর সাধ্যানুসারে অস্ত্রাঘাত ক'রে আসছেন। সমাজ সংস্কারের প্রতি যাঁদের একান্ত লক্ষ্য তাঁহারা জাতিভেদ উন্মূলন করতে ব্যগ্র। ধর্ম্মসংস্কার যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁরা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্। ভারত ইতিহাসে সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের পূর্ব্বাপর একান্ত চেষ্টা দেখা যায় কিন্তু ধর্ম্মবীরেরা অনেক সময় পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর দুর্গ আটে ঘাটে এমনি দৃঢ় বদ্ধ, জাতিভেদের শৃঙ্খল এমনি কঠোর যে তা ভেদ করা কঠিন ব্যাপার। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বাধা দৈবার ক্ষমতা প্রচুর, উন্নতির পথে এগোবার শক্তি নেই। এই সমাজে যা কিছু পরিবর্ত্তন, যা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় তার বারোআনা বাইরের সংস্রবে, সমাজের নিজস্ব নৈসর্গিক বলে তা সাধিত হচ্চে বোধ হয় না; সে সবই প্রায় ইংরাজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে। সে যাই হোক্, বিপক্ষ দল যতই বল প্রয়োগ করুক না কেন, হিন্দুসমাজ তার ৩৩ কোটি দেব দেবী ও অগণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে অটলভাবে রাজত্ব করছেন। ওদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর প্রভূত প্রতাপ প্রতিরোধ করতে পারে এমন বল সমাজে আছে কি না সন্দেহ। রাবণ বধের জন্যে রামের মত বীর চাই—তা কোথায়?

সমাজ-সংস্কার

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের নিশ্চেষ্টভাব দেখে কষ্ট বোধ হয়। যে পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হওয়া উচিত তার

তৃপ্তিজনক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বোম্বায়ের লোকেরা অনেকে আমাদেরই মত বিবাহাদি গৃহ-অনুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয় করে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়েন, ব্যয় সঙ্কোচের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। কিন্তু বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করা ত সামান্য ব্যাপার, আসল যে দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত সে হচ্ছে বাল্য বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ—এ এক বিষম রীতি। শুধু বোম্বায়ে কেন, বাল্য বিবাহের বিষম ফল ভারতের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ থেকে বিদায় করে যে কি স্বর্গ সুখ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই না। পুত্রের বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখা যায়। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা, তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করে দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছেড়ে সর্ব্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। বোম্বায়ে বালক বালিকার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভাল বাসতেন—তাঁর সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করে খুব ধূমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন—এই সব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। ওদেশে দশ বার বৎসরের বালক সাত আট বৎসরের বালিকা—এইরূপ দম্পতিকে অনেক সময় উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে দেখা যায়। মেয়ে পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স, বাড়িয়ে না দিলে সমাজের কল্যাণ নেই। পূর্ণ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াতে স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট, সন্ততির পক্ষেও অনর্থকর। এইরূপ বাল্য বিবাহ হইতে হিন্দু সমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। বিপন্না বারপ্রসূতি, নির্ব্বীর্য্য সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু—জাতীয় অবনতির এই সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের চৈতন্য হয় না—আশ্চর্য্য! অকালপক্ক ফল যেমন সুস্বাদু হয় না, অকালপ্রসূত সন্তানও সেইরূপ নির্বীর্য্য রুগ্ন ক্ষিণ্ণ হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়।

কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয় এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ত একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন্ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? পাঠকের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন, বিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হবার পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও য়ুরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার নর্ম্মান্, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ দেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীরপ্রকৃতি এই সকল বিষয় বিচার করে তাঁরা বলেছেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে, মেয়ের ১৬ কিম্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত নেওয়া যায় তার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এ দেশে স্ত্রী লোকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৪ বৎসর নির্দ্দেশ করেন। এই সকল পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্ত্রীধর্ম্ম প্রাপ্ত হলেই সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় তা নয়। আরো দুতিন বৎসর অতীত হলে তবে তাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ থেকে প্রমাণ হচ্চে যে আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

যেখানে স্ত্রীর যৌবনাবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করা রীতি আছে যেমন মারাঠা দেশের কোন কোন স্থানে দেখেছি, সেখানে অবশ্য বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা খণ্ডন হয় কিন্তু আমাদের দেশে বালক বালিকার বিবাহের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মত একত্র সহবাসের যে নিয়ম আছে তার চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিৎ নিয়ম আর কি হতে পারে?

প্রথিতনামা ডাক্তার চুনীলাল বসু তাঁহার নব প্রকাশিত 'শারীর স্বাস্থ্য বিধান' বিষয়ক পুস্তিকায় বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। তাঁহার বক্তব্য এইঃ—

"আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই তত্ত্বটুকু বিশিষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে আমাদের দেশে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে, তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণশক্তি, চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? পিতামাতার দেহ পূর্ণতা লাভ করিবার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়সেবা জনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ২৫ বৎসরের ন্যূনে পুরুষের দেহ পূর্ণতা লাভ করে না; ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণদেহ হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। তদুপরি সাংসারিক অসচ্ছলতা হেতু শারীরিক এই অপূর্ণতা আরো অধিক পরিমাণে আমাদিগের যুবকবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বালিকাগণের যে বয়সে বিবাহ হয় এবং যে বয়সে তাহারা জননীপদগৌরব লাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই সকল দুগ্ধপোষ্য বালিকাদিগের গর্ভ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যে কখন জীবনে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিবে এরূপ আশা করা বাতুলের কার্য্য মাত্র। আমাদের দেশে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা যত অধিক, পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মত এই যে, অপরিণত পিতামাতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এই সকল শিশুদিগের জীবনী শক্তি এত অল্প এবং সামান্য কারণেই উহারা রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও কোন রূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রম না করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমাদের বালিকাগণ অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতেছে অথবা তজ্জনিত ব্যাধি হইতে আজন্ম কষ্ট পাইতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এ দেশীয় চিকিৎসকদিগের অগোচরনাই। অথচ আমরা এমনি অল্পবুদ্ধি যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগের কন্যা ও ভগিনীগণকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালকদিগের বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত। সাধারণতঃ ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতেও এই বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিত। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে বালকের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ব্যতীত আরো অনেক সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বিবাহ হইলে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে পুত্র কন্যা জন্মিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে হয়, অর্থের প্রয়োজন হেতু জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে স্বপ্নে পরিণত হয় এবং অবস্থাবৈগুণ্যে সামান্য উপজীবিকার জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্ম-সম্মান ও মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলীকে চির-বিদায় প্রদান করিতে হয়। শুশ্রুতের মতে ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রথা আমাদের সমাজে পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের জাতি যে অর্থসামর্থ্য ও পূর্ব্বগৌরব লাভের অধিকারী হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

বালক বালিকার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ সঙ্ঘটন যদি প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত হয় তবে এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পিতামাতার এত আগ্রহ কেন? অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যার উপর এইরূপ অধিকার খাটিয়ে তাঁরা ভাল কাজ—মা বাপের উপযুক্ত কাজ করেন কি? যে বয়সে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা পরিস্ফুটিত হয়নি—নিজের মতামত দেবার ক্ষমতা জন্মে না, সে বয়সে চিরজীবনের মত তাদের উদ্বাহশৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে কি তাঁরা সুবিবেচনার কার্য্য করেন? আমি একথা বলচি নে যে, পুত্র কন্যার বিয়েতে পিতামাতার অধিকার নেই—হস্তক্ষেপ করবার আবশ্যক নেই। আমি বলি নিদেন এইটুকু বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত যে বয়সে মেয়ে পুরুষ আপনারা জেনে শুনে বিবাহ করতে পারে, বিবাহে আপনার ইচ্ছানিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। যে বয়সে তারা বিবাহের মর্ম্ম বুঝতে ও নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে অসমর্থ সে বয়সে তাদের বিবাহ ঘটিয়ে দেওয়া অন্যায়। কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাক্ না কেন তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব—ঘটী বাটীর মত ব্যবহারের জিনিষ নয়। তার স্বাধীনতাটুকু যতদূর বজায় রাখা যেতে পারে তা করা কর্ত্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে না অথবা যার প্রভাবে তা সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে না।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ত্ব বলতে চাই, তার প্রতি সমাজপতিদের দৃষ্টি রাখা

কর্ত্তব্য। প্রথম এই যে, স্ত্রী পুরুষের যোগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করা; দ্বিতীয়, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণের সামর্থ্য বুঝে দারপরিগ্রহ করা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের বিবাহপ্রণালী এই দুই মূলসূত্রের উপরেই কুঠারাঘাত করে।

এই যে বিষম কীট যা আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্রমিকই অবসাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এর উচ্ছেদের একটা উপায় না করলে আমাদের আর নিস্তার নেই। ব্যাধি যে সাঙ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আশু চিকিৎসার প্রয়োজন, সময় প্রতীক্ষা করে থাকলে চলবে না। গৃহকর্ত্তারা এ বিষয়ে মনোযোগ করুন, বিশেষতঃ আমাদের ছাত্রবৃন্দ সচেষ্ট হোন, তাঁদের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা,—তাঁরা দল বেঁধে দাঁড়ালে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির আর কাল-বিলম্ব হবে না।

বিধবা বিবাহ

বিধবা বিবাহের ন্যায়ান্যায় আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। আমার মতে সামাজিক অনুশাসনে বিধবা বিবাহ বন্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়; অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত। পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের বেলায় কি করেন? বহুদারগ্রস্ত বিলাসীর মুখে সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যেরূপ বিসঙ্গত তাঁদের উপদেশও কতকটা সেইরূপ। উপদেষ্টাগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যতই সমর্থন করুন না কেন, তাঁরা যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্নীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নববধূর পরিণয়ে একটুও ইতস্ততঃ করেন না, তখন তাঁদের কথার মূল্য কি? স্ত্রী পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে কি বিধাতানির্দ্দিষ্ট এতই প্রভেদ? বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে ব্রহ্মচারিণী আদর্শ-সতী অনেকে আছেন স্বীকার করি, তাই বলে বিধবার উপর জোর জবরদস্তী ক'রে ব্রহ্মচর্য্য চাপানো—এটা কি ঠিক? প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণে কি সুফল প্রত্যাশা করা যায়? এ থেকে আমাদের সমাজে যে ভ্রূণহত্যাদি কুফল ফলছে, হে ভণ্ডতপস্বি, তা কি তুমি দেখেও দেখবে না? একবার ভেবে দেখ বালবিধবার চিরবৈধব্য কি মমতাহীন নিষ্ঠুর বিধান!

বোম্বায়ে সাধারণ হিন্দুসমাজ যে বিধবা বিবাহের বিরোধী তা নয়। এমন অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যের অনুকরণশীল জাতিবর্গেই এই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুপ্রথা আবহমান কাল চলে আসছে—সে কি না বিধবার মস্তক-মুণ্ডন। বঙ্গবিধবাদের অনেক-গুলি কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়; এক সন্ধ্যা আহার, নির্জ্জলা উপবাস, অলঙ্কার বর্জ্জন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার উপর শিরোমুণ্ডন প্রথা নেই। বোম্বায়ে বিধবা রমণীদের এসব ত আছেই, তার উপর বেশীর ভাগ ঐ এক উৎপীড়ন। ভবিষ্যতে বিধবা স্ত্রীদের অদৃষ্টে যে সকল জ্বালা যন্ত্রণা আছে, পতিবিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তার পূর্ব্বাভাস। যাতে

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কার্য্য করা না হয়, তাদের সম্মতিপ্রকাশের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, সমাজ-সংস্কারকদের তাহা বিবেচ্য। আমি জানি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রয়োগ করবার উদ্যোগে ছিলেন, কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছিলেন বলতে পারি না।

দেবদাসী

এই প্রসঙ্গে অপ্রৌঢ়া বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে 'নায়িকা' নামে একদল বারাঙ্গনা আছে (অন্য নাম দেবদাসী), তারা দেবমন্দিরে নর্ত্তকী রূপে নিযুক্ত। তাদের বিবাহ হয় না, বেশ্যাবৃত্তিই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই কার্য্যে দীক্ষিত হবার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তাকে বলে 'সেজ।' সে অনুষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র। বরের ঠিকানায় একটা খড়্গ রাখা হয় তার উপর ফুলের মালা সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে ও বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্য্যে ও আনুষঙ্গিক অকার্য্যে তার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। বোম্বাই মফস্বল কোর্টে এইরূপ অত্যাচার-সম্পর্কীয় মকদ্দমা কখন কখন উপস্থিত হয়, আমি কারওয়ারে থাকতে এইরূপ মকদ্দমা আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। আসামীর বক্তব্য এই "এ আমাদের চিরন্তর প্রথা, মেয়েকে আমাদের কুলধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে দোষ কি?" কিন্তু দেশাচার যাই হোক্, যারা কিশোরবয়স্ক বালিকাদের মতিভ্রষ্ট ও আজীবন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে তাদের বিধিমতে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তার আর কোন সন্দেহ নেই। এই অত্যাচার নিবারণ উদ্দেশে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উঠেছে তা আমার মতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হোক্ কিম্বা প্রচলিত আইনের পরিবর্ত্তনই হোক্ যে কোন উপায়ে সুকুমারমতি বালিকাদের প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিকার হয় তাহাই প্রার্থনীয়। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক রটনা করছেন তা কি বোঝেন না?

আমি দেখতে পাই দক্ষিণে জাতিভেদের নিয়ম নিরতিশয় কঠোর, আমাদের জাতীয় একতা বন্ধনের পথে বিষম কণ্টক। এক এক জাতির ভিতরে যে কতগুলি শাখা তার অন্ত নেই। এক ব্রাহ্মণবর্ণ দেখ, স্থান ভেদে তার মধ্যে কত শাখা ভেদ, এমন কি নদীর এপার ওপার হলে পরস্পর আদান প্রদান বন্ধ। মারাঠী ব্রাহ্মণের প্রধান তিন শাখা—দেশস্থ, কোকনস্থ ও কহ্নাড়। জাত একই, কেবল মূল নিবাস আলাদা। তাদের পরস্পর পান ভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, আমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্রে যেমন। পেশওয়াদের আমলে একবার এই দলাদলি ভাঙ্গবার চেষ্টা হয়েছিল, কেন না দেখা যায় যে বালাজী বাজিরাও পেশওয়া যদিও কোকণস্থ ব্রাহ্মণ তবুও দেশস্থ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এই তিন শাখার একত্রীকরণ

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা যায় না, কেন না এই আন্তর্জাতিক বিবাহ যে প্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ তা অস্বীকার করা যায় না। সমাজসংস্কার সভা সমিতিতে এই শাখা ত্রয়ের ঐক্যবন্ধন একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বোম্বাই অঞ্চলে সেনই বা সারস্বত নামে এক জাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন। সুবিখ্যাত জষ্টিস্ তেলঙ্গ এই জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইক্ষণকার হাইকোর্ট জজ চন্দবারকরও সারস্বত ব্রাহ্মণ। ইহাদের জাতিতে আমিষ ভক্ষণ, বিশেষত মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। উচ্চকুলাভিমানী ব্রাহ্মণেরা সেনইকে আমিষাশী আচারভ্রষ্ট ব'লে অবজ্ঞা করেন, তাদের চোখে সেনই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়। আমার একটি সেনই বন্ধু কোন মফস্বল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে একবার কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন, এ অঞ্চলে আমার স্বজাতীয় কেহই নাই, এক প্রকার নির্ব্বাসন যন্ত্রণা ভোগ করছি। কখনো কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী নেমন্তণে যেতে হয়, গিয়ে দেখি তাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মহিলারা আমার স্ত্রীকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন, তাকে যেন ছোঁয়াতেও দোষ। ভোজনে আমাকে সমান পংক্তিতে বসতে দেন না, আমার স্বতন্ত্র আসন, স্বতন্ত্র বাসন হতে পরিবেশন। নেমন্তণে গিয়ে এরূপ অপমান সহ্য হয় না। তাই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি বামন বাড়ীতে আর নেমন্তণ খাওয়া নয়"। এই উদাহরণ হতেও দেশের জাতিভেদের কঠোরতা উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু বোম্বায়ে জাতিবন্ধন যতই কঠিন হোক্ না কেন, কালের স্রোতে তার বাঁধন অনেক শিথিল হয়ে আসছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে ঘটনার স্রোত বলবত্তর, তাই দেখা যায় তার ভাঙ্গন-দশা আরম্ভ হয়েছে। শৌচাশৌচ বিচার, ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর প্রীতিভোজন ইত্যাদি অনেক বিচারে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কুসংস্কার বর্জিত স্বীকার করতেই হবে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আচারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি বাহিরের ঘটনাও এই পরিবর্ত্তনের অনুকূল। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস তাঁর চিরন্তন মন্তব্যগুলি বৎসরান্তে একবার আবৃত্তি করে আমাদের পোলিটিকাল উন্নতি কতদূর সাধন করেছেন বলতে পারি না কিন্তু সেই একক্ষেত্রে নানাজাতির একসঙ্গে মেলামেশার অবশ্য একটা উপকারিতা আছে। তার ফলে হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্, অন্ত্যজ জাতি-সমস্যার প্রতি আমাদের কৃতবিদ্য যুবকদের মন পড়েছে, এ একটা শুভলক্ষণ বলতে হবে। আমরা আমাদের রাজপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্যে চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটিয়ে তুলছি কিন্তু আমাদের ভাইদের মধ্যে যে অসংখ্য লোক হিন্দুসমাজের পদদলিত ঘৃণিত ত্যজ্য পুত্র হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি না, একি সামান্য লাঞ্ছনার বিষয়? এই হীন জাতির উদ্ধারের জন্যে আর্য্যসমাজের উদ্যমশীলতা দেখে আশ্বাস হচ্ছে যে এখনো আমাদের প্রাণ আছে; এই সাধু দৃষ্টান্তে যদি সমগ্র

হিন্দুসমাজ জাগরিত হয়ে এই সকল দীনহীন পতিত সন্তানদের স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তুত হ'ন তবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা বলতে হবে আমাদের সমাজ আত্মশ্লাঘার করে আত্মঘাতী হতে চলেছেন, তাঁর অধঃপাতের আর বিলম্ব নেই। আমি যে জাতির হয়ে ওকালতি করছি তাদের স্থান হিন্দুসমাজের অধঃস্তরে—এর উপরের স্তরও নানাকারণে বিলোড়িত হচ্ছে দেখা যায়। শূদ্রেরা আপনাদের মধ্যে উচ্চতর আসন অধিকার করতে ব্যগ্র, কায়স্থকুল ক্ষত্রিয়বংশীয় ব'লে আপনাদের পরিচয় দিয়ে উপবীত ধারণে তৎপর, কেহই হীনতা-পঙ্কে পড়ে থাকতে রাজী নয়।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আমাদের সমাজে যে কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তা আমরা অনেকে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ তাঁরা একবার আপনাদের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে দেখুন, সেকাল আর একালের প্রভেদ বুঝতে পারবেন। আমার একটা সহজ দৃষ্টান্ত মনে হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি, এককালে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। তাঁরা বহুপত্নী নিয়ে কেমন দিব্য আরামে ঘর করতেন, পালায় পালায় এক এক পত্নীগৃহে গিয়ে কি সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করতেন। কুলীন মেয়েদের কি দুর্ভাগ্য! কারো কারো যোগ্য পাত্রের অভাবে চিরজীবন হয়ত আইবড় অবস্থায় কাটাতে হত, অনেকের পতি জীবিত থাকতেও কি দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হত, জীবনে একটিবারও তাদের ভাগ্যে স্বামীর মুখদর্শন ঘটত না—যেখানে সেখানে এইরূপ কুলীনকুল-কলঙ্ককাহিনী শোনা যেত। আমার বেশ মনে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয় নিয়ে কত আন্দোলন করতেন, পারিবারিক শান্তিহর এই অনর্থকর প্রথা উচ্ছেদের কত উপায় চিন্তা করতেন, বলতেন যে বহুবিবাহনিবারণী রাজবিধি প্রচলন ভিন্ন এ রোগের ঔষধ নেই। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে বিনা আইনে বহুদারব্যবসায়ী কুলীনদের অন্ন মারা গিয়েছে—বহুবিবাহ প্রথা আপনার ভারে আপনি চাপা প'ড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে।

যেমন বাঙ্গলা দেশে বোম্বায়েও তেমনি জাতিবিপ্লবের লক্ষণ অল্প-বিস্তর দেখা যাচ্ছে। উপরে আর্য্যসঙ্ঘের কথা বলেছি, জাত ভাঙ্গবার চেষ্টাই তাঁদের এক ব্রত। কিছুদিন হল তাঁরা যে সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে প্রায় ৭৮০ লোক উপস্থিত হয়েছিল এবং প্রায় ১৫০ ব্যক্তি জাতের বাধা না মেনে একত্রে পরস্পর প্রীতিভোজনে যোগ দিয়েছিলেন। আর একটা দৃষ্টান্ত বলি—সমুদ্রযাত্রা। বিলাতযাত্রা আগেকার কালে কি ভয়ানক ব্যাপার ছিল আর এখন অপেক্ষাকৃত কত সহজ হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাব সুবিখ্যাত গুজরাটী 'রিফরমার' করসনদাস মুলজীর জীবনবৃত্ত থেকে আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনে

বিলাতযাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে স্রোত কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না। সমাজের শাসনও অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছে। শিক্ষা, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রীয় অনুরোধে এই যে কত কত হিন্দুসন্তান বিলাত বেড়িয়ে দেশে ফিরে আসছেন তাঁদের জাতে ওঠবার বিহিত ব্যবস্থা করা হয় এ একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। রীত রক্ষার জন্যে কোন রকম সহজ প্রায়শ্চিত্ত নিলেই তাঁরা জাতে উঠতে পারেন, এখন কেবল প্রায়শ্চিত্ত বিধানটা একেবারে উঠে গেলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কেন না ভেবে দেখলে এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াটাই হীনতা স্বীকার। পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত—তার একটা অর্থ আছে; কিন্তু বিনাদোষে লোক দেখানো প্রায়শ্চিত্ত, য়ুরোপ প্রবাসের পাপকলঙ্ক ধুয়ে ফেলবার জন্যে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা—এতে কি আপনার কাছে আপনাকে খাটো করা হয় না? এই কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের কার্য্য?

এই বিদেশ ভ্রমণে ব্যক্তিগত যা কিছু উপকার হচ্ছে, এর ফলভাগী যে সমাজ, কে না স্বীকার করবে এবং এর সুদূর পরিণাম কি দাঁড়াবে কে বলতে পারে? বিদেশ ভ্রমণে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, আমরা য়ুরোপীয় সমাজ থেকে নূতন রীতিনীতি, নূতন সমাজতন্ত্র—সাম্য স্বাধীনতা একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আসি। অল্প লোকের মনোগত ভাব-তরঙ্গ ক্রমে দূরে দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে।

এই পূর্ব্বপশ্চিমের যোগে, নবীন প্রাচীনের সঙ্ঘর্ষে আমাদের সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। এই সঙ্ঘর্ষের ফলে সকলি যে ভাল, সকলি উন্নতি হচ্ছে তা বলা যায় না; ভালর সঙ্গে মন্দও প্রসূত হচ্ছে মানতেই হবে। আমাদের জীবন কতকটা দ্বিধাভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—ঘরে এক বাইরে এক;—নকলের যে সমস্ত কুফল, কতকটা কৃত্রিমতা এসে পড়ছে—আমাদের মধ্যে য়ুরোপ সমাজের বিলাসিতা কতকটা প্রবেশ করছে। সে যাই হোক্, মোটের উপর বলা যেতে পারে এই ভাল মন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ থেকে জাতি ভেদের দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন; একালে আমরা নূতন শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে সেই প্রাচীর ভাঙ্গবার পন্থা অন্বেষণ করছি—দেখছি ভাঙ্গা কি অসামান্য কঠিন ব্যাপার!

ধর্ম্মসংস্কার

শিক্ষিত মণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট; সমাজসংস্কারের আবশ্যকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান কিন্তু কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে সে বিষয় লইয়াই মতভেদ। কাহারো মত এই যে, জোর জবরদস্তি করিয়া জাতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেল—সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকেরা বলেন জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা আগে লোকের মনকে প্রস্তুত কর, সমাজ সংস্কার আসিতে কালবিলম্ব হইবে না—

মূলে কুঠারাঘাত কর ক্ষ আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। অন্য কথায়, তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম সংস্কারের সোপান দিয়া সমাজ সংস্কারে আরোহণ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সমাজ সংস্কারের বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তাহা ত বলা হইয়াছে, এখন ধর্ম্ম সংস্কার সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কার-বার্ত্তা বলিতে গেলে ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষদিগের জীবন-চর্চ্চা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র ধর্ম্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় যে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া এ কালের আর আর ধর্ম্মবীরের চরিত-চিত্র অল্পাধিক মাত্রায় দেওয়া যাইবে, সেই সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণীও যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

শঙ্করাচার্য্য

মারাঠাদেশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু বলিয়া পূজিত। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অদ্বৈত-বাদী পণ্ডিত ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী ছিলেন তিনি তাঁহাদের অগ্রগণ্য। তাঁহার জীবনবৃত্ত যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সন্তোষজনক বলা যায় না। আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে শঙ্করের জীবনী এত প্রকার অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত যে সত্য মিথ্যা পৃথক করা সহজ নহে। শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণ বৃত্তান্ত তাহার নমুনা স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ সংকল্প মনে মনে পোষণ করেন। কিন্তু জননীকে তাঁহার অভিলাষ জানাইলে জননী একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, কিছুতেই তাঁহার অনুমতি পান না, অথচ মাতৃআজ্ঞা না পাইলেও নয়। কথিত আছে, একদা তিনি তাঁহার গৃহ-সমীপবর্ত্তী নদীতে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময় এক কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে জননীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন "কুমীর আমার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে মা আমাকে শীঘ্র রক্ষা করুন।" জননী কি উপায়ে সন্তানকে বাঁচাইতে পারিবেন ভাবিয়া পান না। তখন শঙ্কর বলিলেন "আমার জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। যদি আমি সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি তাহা হইলে এই কুম্ভীর এখনি আমার পা ছাড়িয়া দিবে। আপনার অনুমতি পাইলেই আমার জীবন রক্ষা হয়।" মাতা অগত্যা পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। কুম্ভীরও আপন গ্রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইরূপ বিচিত্র দৈবঘটনা যোগে তাঁহার জীবন-কথা অনু-রঞ্জিত। ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা শঙ্কর-চরিত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। কেরল প্রান্তে (মালাবার) ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম। অনতিকাল মধ্যে তিনি অলোকসামান্য প্রতিভাবলে পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাশী, কাঞ্চী, কর্ণাট, কামরূপ প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সে সময়কার প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া

অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন। এই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ শঙ্কর দিগ্বিজয় বলিয়া ঘোষিত। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন এবং তত্রত্য প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শারদাপীঠে অধিরূঢ় হয়েন। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত কেহ সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন না। দেবীর গৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটি মণ্ডপ আছে।(১) "প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পূর্ব্বদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকের মণ্ডপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ পশ্চিমদ্বার এবং উদীচ্য পণ্ডিতগণ উত্তরদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক পশ্চিম ও উত্তর



শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু

(১) শঙ্করাচার্য্য—শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত।

দিগ্বর্ত্তী মণ্ডপে বিরাজমান। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেন নাই যিনি দেবীর দক্ষিণদ্বার উন্মোচন করিতে পারেন। সুতরাং দেবীর দক্ষিণদিকের দ্বার চিরকাল রুদ্ধ আছে।" শঙ্কর সেই দ্বার খুলিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন কিন্তু পরীক্ষা না দিয়া প্রবেশের অনুমতি নাই। শঙ্কর নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত—নৈয়ায়িক, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ, বৌদ্ধ, জৈন, সকলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া সমাদৃত হইলেন। কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ তখন স্বয়ং মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শঙ্করের প্রবেশ পথ মুক্ত করিয়া দিলেন।" শঙ্কর কাশ্মীর হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হিমালয়স্থিত কেদারনাথে গিয়া নির্বিকল্প সমাধি যোগে ৩২ বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ মূলক অদ্বৈতবাদ পোষণ করিয়া বেদান্তদর্শন, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা শাস্ত্রাদির ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তি তর্কের নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যদিও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ তাঁহার প্রকৃত মত ও নির্গুণ উপাসনা প্রচার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি তিনি গৌণভাবে সাকার উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। যে জড়বুদ্ধি লোকেরা নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানের অনধিকারী তিনি তাহাদের ধারণার উপযোগী সাকারবাদের সুলভ মার্গ প্রদর্শিত করিয়াছেন। এক দিকে যেমন জ্ঞানিগণ মধ্যে প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ, অন্যদিকে প্রাকৃত সাধকের মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু দেখা যায় যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার প্রতি গুরুভক্তি প্রকাশ করে। তাঁহার নাম "যগ্মতস্থাপক।"

বেদান্ত শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। মহীশূরস্থ শৃঙ্গিরি (শৃঙ্গগিরি) মঠ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শৃঙ্গগিরি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মঠের যিনি অধিস্বামী তিনি মারাঠীদের 'পোপ';—শৃঙ্গিরি মঠ হইতে তিনি তাঁহার অনুশাসন সমস্ত জারী করেন। শঙ্করাচার্য্যের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পরিগণিত মারাঠাদেশে শঙ্করাচার্য্যের মানমর্য্যাদার সীমা নাই। যখন অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন আচার্য্যদেব শৃঙ্গিরি হইতে শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যান। দক্ষিণে প্রবাস কালে আমি শঙ্করাচার্য্যের প্রভুত্বের দুই একবার পরিচয় পাইয়াছি। আমি যখন পুণায় কর্ম্ম করি, শুনিলাম যে সমাজসংস্কার কাজের অগ্রগণ্য কয়েক জন খ্যাত নামা মারাঠী যুবক কোন মিসনরি বন্ধু গৃহে চা পান করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাদের সমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। শেষে সাব্যস্ত হইল শঙ্করাচার্য্যকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মানা হয়। শঙ্করাচার্য্যের বিধান সংস্কারকদের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তিনি বিচার করিয়া কোন একপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অপরাধীগণ গুরুজীর আদেশানুসারে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত মণ্ডলির মধ্যে কিরূপ হাস্যাস্পদ হন ও নিজের

পক্ষকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেন তাহা এ পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই। বাঙ্গলাদেশে ওরূপ ঘটনা সম্ভবপর নহে, কেননা সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের মাথার উপর ওরকম কোন পোপের উপদ্রব নাই।

বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী

১৮ শতাব্দীর শেষভাগে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক উন্নতচেতা মহাপুরুষ বোম্বায়ে প্রাদুর্ভূত হয়। ইনি যেমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র সাধুপুরুষ ও আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। এ দিকে শিক্ষাবিভাগে তিনি উচ্চ পদারূঢ় কর্ম্মচারী, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির সম্মান, অথচ তাঁহার শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহার নম্র স্বভাব ও বিনয় গুণে তিনি সকলেরি চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার চেহারা বেশভূষাতে কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—তাঁহার আন্তরিক মাহাত্ম্য অনুভব



শৃঙ্গিরি মঠধারী শঙ্করাচার্য্য

করিতে পারে? এ বিষয়ে একটা কৌতূহলজনক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি তাঁহার গুণকীর্ত্তনে মোহিত হইয়া পরিচয় লাভের উদ্দেশে বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ডেস্কে ভর দিয়া কি এক দুরূহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময় সেই ব্যক্তি গিয়া উপস্থিত। লেখকটিই যে বালশাস্ত্রী তাঁহার ভাবসাবে বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কখন্ সাক্ষাৎ হইবে। তিনি তখন কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, সময় নষ্টের ভয়ে উত্তর করিলেন আর কতক ঘণ্টা বিলম্বে আসিলে অমুক সময়ে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগন্তুকের প্রস্থান ও যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ প্রবেশ। বালশাস্ত্রী সেইখানেই বসিয়া—কেবল সামনে গ্রন্থ কাগজ কলম নাই। আগন্তুক ব্যক্তি যখন জানিতে পারিলেন যে এই সামান্য বেশধারী খর্ব্বকায় ব্যক্তিই সেই বালশাস্ত্রী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। বালশাস্ত্রীর যত্নে বোম্বায়ে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। মফস্বলের নানাস্থান হইতে বিদ্যার্থী আহরণ করা—নিজ গৃহের নিকট তাহাদের বাসা ভাড়া করিয়া দেওয়া—তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদান ও সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বাবধান করা, এই সকল বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। এই সকল বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দান, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সমাজসংস্কর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন না ও সমাজ বিপ্লবকারী সেকালের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গেও যোগ দিতেন না। বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অন্তে অন্তে সমাজসংস্কার করা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তিনি বলিতেন ধর্ম্মভিত্তির উপর সমাজসংস্কার স্থাপন কর, নতুবা স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা নাই। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য। তিনি এত সাবধানে কার্য্য করিয়াও গোঁড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। জাতিতে কহ্লাড় ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহার কারণ এই যে জাতির অনুরোধে কর্ত্তব্য পালনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত, রেবরেণ্ড নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রীপাদ শেষাদ্রি অকারণে জাতিচ্যুত হন। জাতে উঠিবার আবেদন করিলে একদল গোড়া-হিন্দু তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন, এই বিবাদে হিন্দু সমাজে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাণপণে পতিতোদ্ধারের সাহায্যে তৎপর হইলেন ও নিজে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া শ্রীপাদের বহিষ্কার-কলঙ্ক মোচনে কৃতকার্য্য হয়েন। ওদেশে কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার উপর জয়লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্য বশতঃ বালশাস্ত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন—তিনি ১৭ই মে ১৮০০ অব্দে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কারের যে ইচ্ছা—সে মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমাজ সংস্কারের বিস্তর হানি জন্মে—সে ক্ষতি পূরণ করে আজ পর্য্যন্ত এমন অল্প লোকই দেখা গিয়াছে।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ

বালশাস্ত্রীর মৃত্যুর পর শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে আর এক নূতন দল উঠিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙের ভ্রাতা দাদোবা পাণ্ডুরঙ এই দলের দলপতি। বাঙ্গলার যেমন কৃষ্ণবন্দ্য বোম্বায়ে তেমনি দাদোবা পাণ্ডুরঙ। এই দুই ব্যক্তি একই ধরণের লোক। উভয়েই সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, উভয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব বিশারদ। উভয়েরই ধর্ম্মভাব প্রবল—প্রভেদ এই, কৃষ্ণবন্দ্য খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত সমুদায় বন্ধন ছেদন করিলেন। দাদোবার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন—কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক দাদোবার উৎসাহ—তাঁহার বশীকরণ শক্তি, সামাজিক অনীতি অত্যাচারের উপর জলন্ত বিদ্বেষ, এই সকল বিষয়ে তিনি কৃষ্ণবন্দ্যের সমতুল্য ছিলেন ও ইনি যেমন কলিকাতায়, তিনি তেমনি বোম্বায়ে কতিপয় শিক্ষিত পুরুষের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দাদোবা পাণ্ডুরঙ বোম্বাই নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই তাঁহার অবসর—সেই স্কুলের ১২ জন প্রধান ছাত্রকে তাঁহার কাজের উপযোগী হাতিয়ার পাইলেন ও নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অপরাপর বিদ্যালয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কুরীতির উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশে এক সভার সৃষ্টি হইল, তাহার সভ্যগণ ফ্রীমেসনদের ন্যায় গোপনে



ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাম
(বোম্বাই সমাজ-সংস্কারক)

কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই সভার নাম পরমহংস সভা।

পরমহংস সভা

বোম্বাই অঞ্চলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টা সময়ে সময়ে যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার শিরোভাগে পরমহংস সভা ধরা যাইতে পারে। ১৮৪৯ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। হংস যেমন জলীয় ভাগ ফেলিয়া দিয়া দুধ বাছিয়া লয় সেইরূপ সমাজের মন্দের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভালটা বাছিয়া গ্রহণ করা এই সভার উদ্দেশ্য; জন্মিয়াই হিন্দু সমাজের উপর বাণ বর্ষণ ইহার প্রথম উদ্যম। বাহিরের লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত বিজনস্থানে অকুতোভয়ে সম্মিলিত

হইয়া কাজ করিতে পারেন তাহার উপযোগী স্থান চাই—অনেক খুঁজিয়া সভ্যেরা একটা বাড়ী স্থির করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাহাদের দিতে প্রস্তুত কিন্তু একটি ভাড়াটে ব্রাহ্মণ তাহাতে বাস করিতেন তিনি আততায়ী-দের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া যাইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর বাসন্দা এক ফন্দী করিলেন। তিনি তালা চাবি দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন তাঁহার দেব দেবীর বিগ্রহ সকল ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত। পরমহংসগণ তাহাতে নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের বল ও সাহসের পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সেই

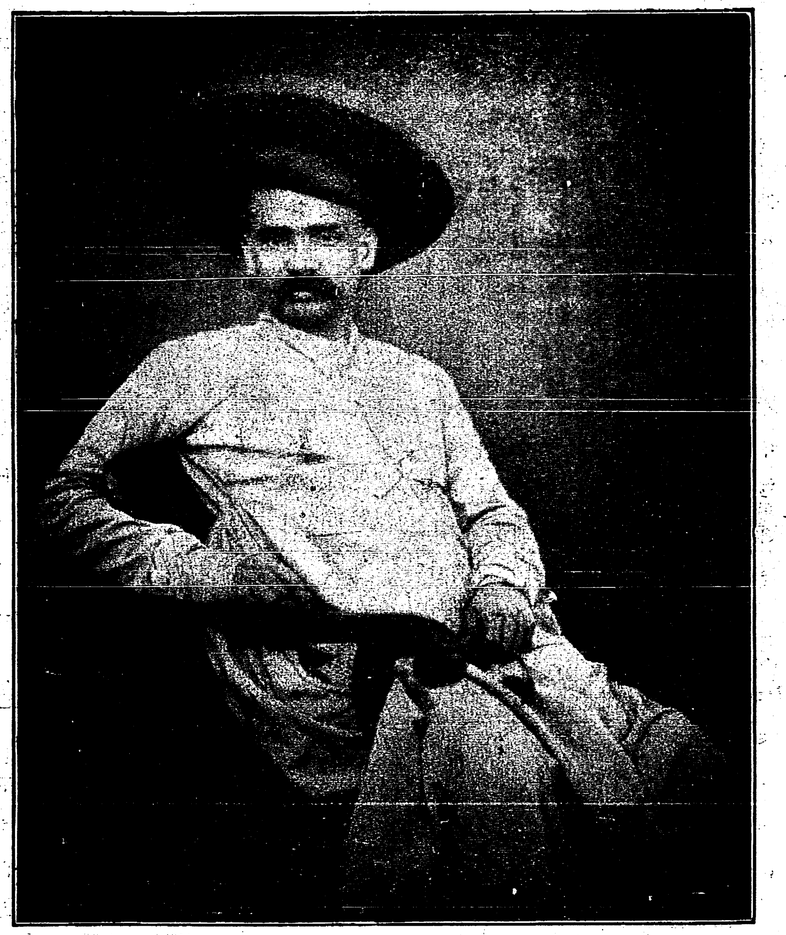

রাম বালকৃষ্ণ
(পরমহংস সভার নেতা)

লোকটির অবর্ত্তমানে তালা চাবি ভাঙ্গিয়া প্রতিমাগুলি এক কোণে সরাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর দখল করিয়া লইলেন। এখানে কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই, গিরগামের এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহে শীঘ্র উঠিয়া যান। প্রতি সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার সময় অধিবেশন হইত। ঈশ্বর প্রার্থনার পর কর্ম্মারম্ভ, এই যা ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য সামাজিক। কোন ব্যক্তি সভ্যপদে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, পরে পাঁউরুটির টুকরা মুখে করিয়া আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইত, তদনন্তর সভার রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মুসলমানের হাতে জলগ্রহণ করিবারও বিধান ছিল।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ বালকৃষ্ণ এইরূপ কতকগুলি লোকের যত্ন ও উৎসাহে ক্রমে সভ্যদল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুণা আহমদ নগর, খানদেশ, বেলগাম প্রভৃতি মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমহংস সভার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইল। সভ্য সংখ্যা কত ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য তথাপি সভার শ্রীবৃদ্ধি কালে অন্যূন ৫০০ আন্দাজ বলা যাইতে পারে।

এই সভা প্রায় বিশ বৎসর কাল জীবিত ছিল। যদিও ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে গোপনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তথাপি সময়ে সময়ে সভ্যদের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়াছে। একবার তাঁহাদের মধ্যে জন কতক যুবক কেল্লার এক রুটিওয়ালার দোকানে পাঁউরুটি কিনিয়া সেই রুটি হস্তে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে চলিয়া আসেন। তাঁহাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে দীক্ষা ও তর্ক বিতর্ক ভিন্ন আর বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হইত না। কেবল বার্ষিক প্রীতিভোজন এই সভার এক বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। সেই সময়ে মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে পরমহংসদল সমবেত হইয়া জাতি নির্ব্বিশেষে একত্রে পান ভোজন করিতেন।

কিন্তু এইরূপে অধিক দিন যায় নাই—পরমহংসমণ্ডলীর শীঘ্রই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন সহজ নহে। এক সামান্য ঘটনা হইতে এই বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি (খুব সম্ভব সভ্যদের মধ্যে একজন) সভার খাতাপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে সভার যত গুহ্য কথা—সভ্যদের নাম ধাম, তাহাদের জাতিভেদের প্রতিজ্ঞা যাহা কিছু ভিতরকার কথা সকলি বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দু সমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। যতদিন পর্য্যন্ত সভার গোপনীয় কথাসকল প্রকাশ হয় নাই ততদিন হিন্দুসমাজ সন্দেহ করিয়াও তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই। গুপ্তকথা সকল ফাঁস হইয়া সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। হিন্দু সমাজের কাছে তাহারা বমাল ধরা পড়িলেন। তাঁহারা ভয়ে একে একে সরিয়া পড়িলেন—পলাতকদের দৃষ্টান্তে যথার্থ বীরের হৃদয়ও

দমিয়া গেল। সভা ভঙ্গ চূর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইল।(২)

আর্য্যসমাজ

প্রার্থনাসমাজের সহযোগী আর্য্যসমাজের উল্লেখ না করিলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের জন্মদাতা। ইনি একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ। দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মভূমি কাঠেওয়াড়। দয়ানন্দের পিতা একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন, আপন পুত্রকেও শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু এই অন্নে তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতার অসারতা শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। মূর্ত্তিপূজার প্রতি কিরূপে তাঁহার বিরাগ জন্মিল তাহার বৃত্তান্ত তাঁর জীবনীতে যাহা আছে তাহা এইঃ—একদিন শিবরাত্রির জাগরণে তিনি মন্দিরে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তাঁর পিতা ও আর সকলে নিদ্রামগ্ন, একমাত্র তিনি জাগরিত ছিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, ইন্দুরেরা মিলিয়া ঠাকুরের উপর মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে—বাদাম মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহা কিছু ভোগের সামগ্রী ছিল তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ ভোগ চলিতেছে, ঠাকুর না আপনাকে আপনি সামলাইতে পারেন, না অন্যকে ডাকিয়া তাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন। তাঁর সহজে মনে হইল, যিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম তিনি কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর হইতে পারেন? এই ঘটনা হইতে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মিল, তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এক ভগিনীর সহসা অকালমৃত্যুতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদয় হইল। পিতার ইচ্ছা তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গার্হস্থ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন—তিনি সেই বন্ধনভয়ে গৃহত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করিলেন। অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনের পর তাঁহার সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণ উপনিষদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্তিসঙ্কুল, কেবল খাঁটি সত্য বেদ—বেদভিত্তির উপরেই হিন্দুধর্ম্মের পত্তন-করা বিধেয়। বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই—একেশ্বরবাদই বেদমন্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম—অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সেই একংব্রহ্মের নামভেদমাত্র। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বেড়াইতেন—যেখানে যাইতেন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও বেদের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতেন—তাঁহার বুদ্ধি বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মতে বেদবাক্য অভ্রান্ত সত্য কিন্তু ভাষ্যকারেরা যেরূপ বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। এই হেতু তিনি স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া 'বেদার্থ প্রকাশ' নামে বেদভাষ্য রচনা করিয়া যান, ইহাই আর্য্যসমাজের ভিত্তিভূমি। তাঁহার মতে পৌত্তলিকতা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সুতরাং তাহা পরিহার্য্য। তাঁহারি যত্নে ভারতবর্ষের

(২) ইন্দু প্রকাশ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ১৮৬৫ ২ মার্চ হইতে কতিপয় সংখ্যায় Political Rishi স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

স্থানে স্থানে বেদসত্যসমর্থনকারী আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বায়েও এই সমাজের এক শাখা আছে কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে আর্য্য সমাজের যেরূপ প্রতিপত্তি বোম্বায়ে সেরূপ কিছুই নহে। কি বোম্বাই কি বাঙ্গলা, এই দুই দেশেই, কেন জানি না, আর্য্যসমাজ হতাদৃত হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষ কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—মূল আর্য্যাবর্ত্তই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগ্দত্তা

(৫২)

মানুষ যখন জলের মধ্যে পড়িয়া ক্রমেই অতলে তলাইয়া যাইতেছে, এমন সময় কখন-কখনও একটা বিপরীত মুখের ঢেউ আসিয়া তাহার চেষ্টাহীন বীতসংজ্ঞ দেহখানিকে সবলে ধাক্কা দিয়া যেন পাতালের দিক হইতে মর্ত্ত্যের দিকে বারেক ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতির সে চেষ্টা প্রকৃত নয় একটা ক্ষণিকের খেলা মাত্র। ক্ষণপরেই আবার সেই নিমজ্জমান্ হতভাগ্য উপরের আলোকময়ী পৃথিবীর বক্ষে আশ্রয় না পাইয়া অন্ধ তামস জলতলেই আকৃষ্ট হয়।

নীচেতলার উত্তেজনাপূর্ণ বিলাপধ্বনি সেইরূপ কমলার নিশ্চল হৃদয় শোণিতে বারেকের জন্যই একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। একবারের জন্য সেই "ওরে বাবারে একি সর্ব্বনেশে কথা! ওমা একি বলে গো!" সে শুনিল। কি কথা! কে কি বলিতেছে? কি হইল! দাসী আবার আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল "কিরে তোরা বলিস কি? ওমা আমি কি করবো গো! এ যে একেবারে অভাবিনি অচিন্তিনি কাণ্ড!"

"মাইজি!" কমলা কবাটের অবলম্বন ছাড়িয়া চোক তুলিল। বিষণ্ণ আর্দ্দালি মুক্তকরে দাঁড়াইয়া কহিল "গাড়ি খাড়া রয়েছে, যেতে হবে মাজি"।

সে কিছু বলিল না নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। কেমন করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিল, কখন নীচের উঠান ঘরদ্বার পার হইল, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না, কেন যাইতেছে কোথায় চলিয়াছে তাহাও সে জানেনা, ভাবে নাই, ভাবিবার ইচ্ছাও ছিল না! কলের পুতুলের মত গাড়ির ভিতর উঠিয়া বসিল। ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাহার সমুখের আসনে বসিয়া বসিয়া চোক মুছিতেছে, বিলাপপূর্ণ স্বরে কতকি বকিতেছে, মধ্যে মধ্যে কহিতেছে "ভ্যালা মেয়ে তুমি যা হোক! এতটুকু যত্ন নেই আয়ত্তি নেই! রাঙা স্বোয়ামি, তাকে এত হেনস্তা! ওরে বাবারে! এত ভ্যাচ্ছল্যি! কিকরে ছেড়ে দিলে গো! আমরা হলে এমন পারতুম না।" কমলা শূন্যনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। পথের দুই পার্শ্বে ক্ষেত্রগুলা জলে ভরিয়া রহিয়াছে। রাস্তায় জন প্রাণী নাই, জলকাদা ঠেলিয়া ঘোড়াগুলা অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। পুনঃ পুনঃ চাবুকের

আঘাত তাহাদের কষাহত পৃষ্ঠের ব্যথা বাড়াইতেছিল। গত রাত্রের দগ্ধস্তূপ দিনের আলোয় ভীষণতর দেখাইতেছে। কোথাও গুমিয়া গুমিয়া শস্যের বস্তাসকল তখনও পুড়িতেছিল, কোথাও আবরণের নিম্নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল, ঊর্দ্ধগামী সর্পের মত ধূমগুলা শূন্যমার্গে ঘুরিতেছিল; সেই বিশাল ধ্বংস ভীষণ নরমেধ যজ্ঞকুণ্ডরূপে প্রাণের মধ্যে বিভীষিকা ও জগতের নশ্বরতার কথা একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিতেছিল। বৈশ্বানরের সেই লীলাক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া ঝঞ্ঝাবৃষ্টি মাথায় লইয়া অসংখ্য গৃহহীন ও দর্শকদল চারিদিকে কোলাহল করিতেছে, হাহাকার করিতেছে। ভাগ্য, ভগবান ও অজ্ঞাত অগ্নিসংযোগ কর্ত্তাকে অভিসম্পাত দিতেছে। ঈশ্বর নিজে যেটুকু রক্ষা করিয়াছেন তা ভিন্ন মানুষের হস্ত একখানি পাটের বস্তা বা চালের থলি সরাইয়া উপকার করে নাই। জনতা করিয়া মজা দেখিতেই তাহাদের আগমন। আগুনের মুখে কাঁচা প্রাণটা তুলিয়া দিতে কেহই রাজী হয় না। সকলেই বলে "লোক পাইলে করিতাম একা কি করিব?"

গাড়ী আসিয়া একখানা একতল বড় বাড়ীর দ্বারে থামিল। বাড়ীখানা কোন সময়ে হল্‌দে রং করা হইয়াছিল, বহু দিনের অসংস্কারে এবং বৃষ্টিজলের চিত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারের নিকট দু'তিন জন পুলিষের লোক ও সাধারণ লোকে বিষণ্ণ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহারা কমলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। বোধ হইল সকলেরই কণ্ঠ হইতে একটা সহানুভূতির নিশ্বাস একসঙ্গে বহির্গত হইয়াছিল। দ্বারের পিতলের বাঘমুখো হাতলটা ব্যাঘ্রনেত্রের মত তেজ দৃষ্টিতে যেন তাহার দিকে জলন্ত চক্ষে চাহিয়া আছে, এমনি মনে হইয়া সে হঠাৎ একবার সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তখনি মনে হইল কে যেন তাহাকে ভিতরে সেইদিক পানেই টানিতেছে। এক পা এক পা করিয়া অবশেষে সে দ্বারের চৌকাটের মধ্যে প্রবেশ করিল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই, সে স্থির কর্ণে একটা কোনরূপ শব্দ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল, কিন্তু কিছুই শোনা গেল না,—প্রেতপুরীর মত স্তব্ধ বাড়ীটা! সে ভিতরে প্রবেশ করিল। কোথা দিয়া কোথায় আসিল সে তাহা অনুভব করিতেও পারিতেছিল না; কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন গৃহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খট্টায়, ছিন্ন মলিন শয্যাতলে যন্ত্রণার্ত্ত লোকপূর্ণ রুদ্ধ বায়ুর মধ্য দিয়া সে যে অনেকটা স্থান অতিক্রম করিল, এইটুকু শুধু বুঝিতেছিল। সারা বাড়ীখানা যেন কাতরতার ও বিষাদের আশ্রয় স্থল। প্রতি পদক্ষেপে, মলিনতার সংস্পর্শ, প্রতি মুহূর্ত্তে অস্ফুট বিলাপ প্রাণের মধ্যে বিষাদপূর্ণ আতঙ্ক কম্পিত করিয়া তুলে। সম্মুখের একটা দ্বার অর্দ্ধ মুক্ত ছিল, আর্দ্দালিটা তাহা আর একটু খুলিয়া দিয়া নিজে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল,—যন্ত্রচালিত কমলা নিঃশব্দ চরণে অগ্রসর হইল। ইহা একটি অনতি প্রশস্ত হলঘর। ঘরে অনেকগুলি লোক। তাহার মধ্যে কেহ দাঁড়াইয়া কেহ কেহ চৌকিতে বসিয়াছিলেন। কমলা প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে চাহিয়া সরিয়া গেল। দুইজন সাহেব একখানা

খাটিয়ার নিকট চৌকিতে বসিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া স্থির নেত্রে শায়িত ব্যক্তির দিকে চাহিয়াছিলেন, অপর জন একটু দূরে একটা কেদারা অধিকার করিয়াছিলেন,—উভয়েই উত্থিত হইয়া টুপি খুলিয়া নত মস্তকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিলেন। কমলা কোন দিকে চাহে নাই, ধীরপদে আর্দ্দালি নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল।

মলিন বিছানায় দীনহীনের ন্যায় এই সাধারণ দাতব্য হাসপাতালের পুতিগন্ধময় অন্ধকার কক্ষমধ্যে ও কে পড়িয়া? ও কে? কমলা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শায়িতের পানে চাহিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিল। রোগীর যন্ত্রণার সীমা ছিল না, বাহ্যজ্ঞান নাই, অন্তর্জ্ঞানও বিলুপ্ত প্রায়; অবর্ণনীয় যন্ত্রণার অব্যক্ত ধ্বনি পাষাণকেও বোধ হয় বিগলিত করিতে পারে। কঠোরচিত্ত চিকিৎসক, পুলীষ কর্ম্মচারী শুশ্রূষাকারী সকলের পক্ষেই এ দৃশ্য যেন সহনাতীত।

সহসা রোগী চমকিয়া উঠিল, দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া দৃষ্টিহীন দুই নেত্র সবেগে বিস্তৃত করিতে গেল, নিদারুণ যন্ত্রণা ধ্বনি কণ্ঠভেদ করিয়া ঘরটার স্তব্ধতাকে এমনই সহসা আঘাত করিল যে, অকস্মাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত হইতে টুপিটা গৃহতলে সশব্দে পড়িয়া গেল। কমলার সমস্ত শরীরের প্রতি শিরায় একটা বরফের ধারা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বহিয়া গিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দিল। সে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িয়া খাটের পায়ে মাথা রাখিল।

রোগীর শরীরের স্পন্দন স্থির হইয়া আসিয়াছে; যন্ত্রণার অস্ফুটধ্বনিটুকুও ক্রমে থামিয়া গেল; নিশ্বাসের দ্রুত তাল সমান হইল, সহসা শব্দহীন কণ্ঠ একটা পরিষ্কার স্বর উচ্চারণ করিল "বল কমলা! আমি পাপী নই? বল আমায় ক্ষমা করেছ! উঃ ভগবান!"

ডাক্তার বাবু মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, চেয়ার সরাইয়া সিবিল সার্জ্জন একটু হটিয়া গেলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুপি কুড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলা মুখের উপর হইতে করাচ্ছাদন খুলিয়া যে ব্যক্তি তাহার সম্মুখে নিস্পন্দ নিঃসাড় পড়িয়া আছে তাহার বিভীষিকাপূর্ণ শোচনীয় মুখের দিকে চাহিল। সমস্ত পৃথিবী—এই জীবনের সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিচিত্র ঘটনা জাল,—সমস্তই তাহার মন হইতে এককালে পুরাতন চিত্রের মত নিঃশেষ মুছিয়া গিয়াছিল। কেবল মাত্র মনে ছিল এই অনাদৃত হতভাগ্য, তাহার একটি অনুরোধে নিজের এই শত আশাউদ্দীপ্ত নবীন জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার মৌন বিবর্ণ অধর কোন ভাষা কোন ধ্বনি উচ্চারণ করিল না, কিন্তু নীরব হৃদয়ের মধ্যে গভীর অনুতপ্ত-চিত্ত এমন কোন ক্ষমার কথা সেই নষ্ট বিমুক্ত প্রাণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল, যাহা অন্য কোন জাগতিক নাগুনিলেও তাহার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। এবং তাঁহার সমুদয় সংশয় উদ্বেগ দূর করিয়া ইহা তাহাকে যে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, সেই পরিত্যক্ত দগ্ধ দেহেও তাহার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল।

(৫৩.)

একটা মানুষে কত বড় বড় দুঃখের চাপের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এই মহাপরীক্ষা

যেন কমলার সারা জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। দুঃখ আসে যেমন তেমন নয়। দুঃখের মধ্যে সব চেয়ে বাছা বাছা তীব্রতম দুঃখগুলাই সে আজীবন ভোগ করিয়া আসিয়াছে। অভাব বিয়োগ অপমান সমস্তই তাহাদের পূর্ণমূর্ত্তিতে তাহাকে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সকল দুঃখের অন্ধকারেই এতটুকু একটু জোনাকির টিপটিপানি আলো থাকে, তা না থাকিলে মানুষ কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আজ এ যে কি মহাপ্রলয়ের নিরালোকশূন্যতা, ইহার বুঝি সীমাসন্ধি নাই।

যে ডাক্তার বাবুর স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করিতে শচীকান্ত প্রাণ দিল, তাঁহার গৃহে কমলার সেবাসান্ত্বনার অভাব ছিল না। গৃহিণী সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাকে মায়ের স্নেহে যেন কোলে টানিতেছিলেন, কিন্তু তাহার তাহাতে কি সুখ? কিসের সান্ত্বনা? যখন বাড়ীর দাসী আসিয়া তাহাকে বিধবার বেশে সাজাইল, তখন অন্তরে অন্তরে সে একবার হাহাকার করিয়া উঠিতে গিয়াছিল, কিন্তু হাত টানিয়া লয় নাই। আজ কাহার জন্য সে বৈধব্য গ্রহণ করিবে? যে তাহার স্বামী নয় তাহার জন্য! কিন্তু এত বড় একটা প্রচণ্ড অস্বীকার করিবার বলই আজ কোথায়? সে যে তাহাকে তাহার স্বীকার বুঝিতে দিয়াছে! তাহারি পণরক্ষা করিয়া সে যেন তাহার পরে জয়ী হইয়া গিয়াছে। যাহার প্রাণের পরে তাহার এতটুকু দাওয়া ছিল না তাহাকে শুদ্ধ এই সঙ্গে অনুমৃত করিল! আবার শুধু মৃত্যু নয় সে কি 'মৃত্যু!'

সেই আত্মসুখী, স্বার্থপরায়ণ হৃদয়ের মাঝখানে যে কত বড় একটা ত্যাগশীল তপস্বীর প্রাণ লুকান ছিল সেটাকে কেহ কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই। কমলা হুতাশনভক্ষিত দগ্ধদেহের সেই মহাঅধিকারীকে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সহসা যেন এক অমৃতময় রাম নামে সকল জড়তা কাটাইয়া তাহার দিব্য জীবন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুমৃতা হইল। ইহজন্মের মরণ নয় চিরদিনের মত।

ডাক্তারবাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, সে এখন কোথা যাইতে চায়? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সরকারের তরফ হইতে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর বিধবার যাবজ্জীবন ভরণপোষণ ভার বহিতে প্রস্তুত। এই অল্পদিনেই সে যে কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল তাহা অনন্যসাধারণ। সে সেই অর্থ লইয়া আত্মীয় গৃহে, কিম্বা যথেচ্ছ স্থানে বাস করিতে পারে। কমলাকে কথাটা দুতিনবার বলিতে হইল, তাহার মনটা এমনি শূন্য হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের কোনশব্দস্পর্শ কিছুই যেন সেখানে গিয়া পৌছায় না। শুনিয়া সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল "না।" ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন "এতো মা তোমার জোরের টাকা, সংসার বড় বিষম ঠাঁই মা, নিজের নিজস্ব কিছু থাকা বড় ভাল। চারটে কাল এখনতো কাটাতে হবে।" কথাটা সে শুনিলও না, শুনিলেও কিছুমাত্র বুঝিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার জানাইল। ডাক্তার বাবু বা তাঁহার স্ত্রী

ক্ষুব্ধ হইলেও আর বেশি কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। পাছে সে মনে করে যে ইহারা তাহাকে ভার বোধ করিতেছে। কিছু দিন গত হইলে একদিন অতর্কিত আপনা আপনিই তাহার মনে হইল, কাজটা ভাল হইতেছে না। তাহাকে লইয়া এই গৃহস্থদম্পতি বড় বিব্রত হইয়া আছে, সে তাহাদের কে যে এমন করিয়া গলীবের ঘাড়ে চড়িয়া থাকে। গৃহিণী গৃহকর্ম্মের অবসরে কাছে আসিয়া বসেন, দুএকটা দুঃখের কথা পাড়েন, মৃতের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অশ্রু প্রেরণ করেন আবার চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া যান। কমলা কেবলমাত্র অর্থহীন দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া থাকে। সে কিছুই ভাল করিয়া যেন অনুভব করিতে পারে না। একমাত্র এই বিভীষিকার ছায়া সেই শূন্য নয়নতলে নগ্ন প্রেতের মত কেবল বলিয়া বেড়ায়, যে তাহার সব গিয়াছে।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এই প্রথম তাহার মুখে এতগুলা শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিলেন এবং সেই সঙ্গে তাহাকে নিজের জন্য ভাবিতে দেখিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্তও হইলেন, তিনি কহিলেন "কেন মা, আমাদের মা হয়ে চিরদিন এই খানে থাকবে না।" কমলা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল। "থাকবেন না? বলুন কোথা যাবেন? তাই আমরা রেখে আসি।"

কোথা যাইবে? এ বিশাল বিশ্বসাম্রাজ্যে তাহার এতটুকু স্থান কোথায়? সে কোথায় যাইবে? বহুক্ষণ পরে সে মৃদু স্বরে সংশয়জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল "কাশী"।

"কাশী?" "তা বেশ তাই যাবেন। সেখানে কে আছেন মা?"

আমার দাদা মশাই?" "তাঁর নাম? বাসা জানেনতো?" কমলা এবার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "জানি।"

সেই ঘর। ঘরে কম্বলাসনে পুস্তক বেষ্টনী মধ্যে সেই গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি সে দিনও অধ্যাপনানিরত। কমলার জীবনে ষড়ঋতু বহিয়া গিয়াছে, স্থিতির পর প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পৃথিবীর বাহিরে শিবত্রিশূলস্থ কাশীধামে কি কালের প্রবেশাধিকার নাই? ডাক্তার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কমলা দ্বারের বাহিরে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

অনাদি অনন্ত, এবং অনাদি সান্ত ব্রহ্ম ও জীব চৈতন্য স্বরূপ, ও মায়ার বিষয়ে কথা হইতে ছিল। ডাক্তার একপাশে বসিয়া থাকিয়া অবসর ক্রমে কহিল "আমি আপনার পুত্র স্বর্গীয় ডেপুটি বাবুর স্ত্রীকে আনিয়াছি।" ছাত্রটি চলিয়া গেল। সার্ব্বভৌমমহাশয় চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার পুত্র! শচী! স্বর্গীয় সে? বিশ্বনাথ! তোমার হিসাবধারী চিত্রগুপ্ত কি অন্ধ হইয়া গিয়াছে! না এরা স্বর্গের অর্থ জানে না?

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে শোকপূর্ণ স্বরে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে একবার উঠিয়া দ্বারের নিকটবর্ত্তিনী কমলার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "ভিতরে এসো মা" কমলা কম্পিতচরণে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে বসিয়া পড়িল, প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে তাহার মনে হইল না। দূরন্ত পূর্ব্বস্মৃতি তরঙ্গস্ফীত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় তাহার মূর্চ্ছিত হৃদয়বেলার উপর মুহুঃ মুহুঃ আঘাত করিতেছিল। প্রলয়াবসানের পর নব সৃষ্টির উন্মেষে উল্কাপিণ্ডসকলের প্রথম বিশৃঙ্খল

বিস্রস্ত জাগরণের ন্যায় কোথা হইতে কি একটা রুদ্র তাণ্ডব জাগিয়া উঠিয়াছে। গৃহ স্তব্ধ গম্ভীর; গভীর নিস্তব্ধ গৃহে কেবল মাত্র বাতাসের অতি মৃদু বিলাপপূর্ণ নিশ্বাস মাত্র শুনা যাইতেছিল। কমলা অধোমুখে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া আছে, সার্ব্বভৌমমহাশয়ের শান্ত ললাটে গভীর চিন্তারেখা দেদীপ্যমান। ডাক্তার বাবু কি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে তিনি কহিলেন "আপনাকে আর কি বলিব, জীবনদাতা পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, জননীকে এখানে রেখে গেলাম, গৃহ আমার শ্মশান হয়ে গেছে। এ হতভাগ্যের জন্য মায়ের আজ এই অবস্থা একথা এজন্মে ভুলতে পারবো না। প্রণাম, প্রণাম করি মা, অপরাধী ছেলে তবে বিদায় নেয়।'

ডাক্তার চলিয়া গেল, শোকের ছায়া এই কটা কথায় যেন নিবিড় করিয়া দিয়া গেল, তাহার পদশব্দ অস্ফুট মর্ম্মযাতনার বুকফাটা ক্রন্দনের মত মুহূর্ত্তকাল ঘরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া রহিল।

আবার কতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, সহসা কমলা শুনিল, কি অভয় মন্ত্রই শুনিল, "কমলা কাছে এস, বড়ই দুঃখ পেয়েছ মা!" কমলার মাথাটা নিঃশব্দে সেই পা দুখানার উপর নামিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল, এমন একটি স্নেহের স্বর এখনও তাহার শুনিবার ছিল। তাহার মুখ দিয়া আকুল মর্ম্মযাতনার বিলাপধ্বনির মত বাহির হইল, "আমি খুন করে এসেছি তাকে, আমি খুন করেছি, খুনী আমি," সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি ধীরে তাহার মাথার রাশীকৃত রুক্ষ চুলের উপর হাত রাখিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "না তুমি তাকে রক্ষা করেছ! নরকের দ্বার হতে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছ একে হত্যা বলো না।"

"আপনি বল্‌চেন?" কমলা বড় আশ্বাসে সবেগে উঠিয়া বসিল। একি! সৌম্য সবল মূর্ত্তি দুর্ব্বল রুগ্ন বৃদ্ধের রূপে যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে? মুখে চোখে সেই শান্তি, সেই দীপ্তি, তথাপি কি বিষণ্ণ সে মুখ!

হ্যাঁ আমি বলচি মা, তুমি তার ভাল করেচ। সে জীবনের পরিণামে অবনতি, হয় তো দুটো জীবনেরই ক্রমিক অধঃপতন, তার শেষ যদি এই রকম ত্যাগের মধ্য দিয়াই ঘটে সে কি ভাল নয়?" কমলা আবার তাঁহার পা দুখানির উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা আমার কি হবে?"

"তোমার ভাল হবে মা আমার! এসো তুমি আমার কাছে এস। সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত পিতার দ্বারা যদি কিছু হয় দেখি।"

আমার কি ভাল হবার কিছু আছে?" একথা কমলা মুখ ফুটিয়া বলিল না কিন্তু দিনেরাত্রে এই এক কাতর প্রশ্ন তাহার মনটাকে ঘিরিয়া বাজিতে লাগিল। যাহার আশা করিবার কিছুই নাই তাহার আবার ভাল কি হইবে? তথাপি মন যেন আবার কি আশা করিতে চাহিতেছিল। তীব্র দুঃখের মধ্যেও বারেকের জন্য মন যেন বলিতে ছিল তোমার ভাল হইবে। উনি যখন বলিয়াছেন তখন ভাল হইবে।

তার উপর এতদিন পরে সে আবার একটা কাজও পাইয়াছে। সে যখন দেখিল

সার্ব্বভৌমমহাশয়ের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি ও সহাস্য মুখ তেমনি থাকিলেও সে অটুট স্বাস্থ্য আর নাই। জরা যেন অতি প্রবলবেগেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তখন সে নিজের জন্য ভীত হইল। এমনি ভাঙ্গা কপাল লইয়া সে এই জগতে আসিয়াছে যে, যে আশ্রয়টা সে অবলম্বন করিতে যায় তাহাই তাহার হস্ত স্পর্শে খসিয়া পড়ে।

মধ্যরাত্রি। জ্যোৎস্নালোকে জনমর্দ্দিত রাজপথ বিশ্বনাথের কণ্ঠভূষণ বিশ্রামশীল সুবৃহৎ অজগরের ন্যায় নিঃসাড় পড়িয়া আছে। ওদিকে অন্নপূর্ণা মাতার রজতমেখলাসন্নিভ শুভ্র বারিরাশি জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তীরস্থ মন্দির, হর্ম্ম্যমালা তদপেক্ষা সুষমাময়ী। কমলা ছাতে বসিয়াছিল। তখন চরাচর নিদ্রামগ্ন, কেবল বীতনিদ্র প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডালি সাজাইয়া বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তরে বহিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন! দূরে অদূরে, ইতস্তত কোথাও মন্দিরের উচ্চ চূড়া, কোথাও মসজিদের সুউচ্চ গম্বুজ কোথাও সমুন্নত প্রাসাদচূড়া স্ফুট জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হইতে হইতে শত পৌরাণিক ঐতিহাসিক যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। পরপারে ঘনবিন্যস্ত ধূসর বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে রাজদুর্গ রামনগর প্রকাশ পাইতেছিল।

বহুক্ষণ কমলা অগণ্য নক্ষত্রখচিত অসীমের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর প্রতিদিনকার মতই অবোধ্য দৃষ্টি নামাইয়া সম্মুখে সলিলরেখার দিকে চাহিয়া দেখিল, উন্মাদনাহীন স্থির লক্ষ্যে সে এক পথেই প্রবাহমান। সে সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মৃদু কহিল, আমার মনে অমনি একনিষ্ঠা কেন থাকতে পেলে না?" মুহূর্ত্তে সে একখার উত্তর পাইল, অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে কে উত্তর দিলেন "ক্ষুদ্র কমলা সেই এক পারাবারে মন ডুবিয়ে দাও, একনিষ্ঠ হবে, কেন হবে না।" একি দৈববাণী, কমলার দুর্ব্বল দেহমন বিস্ময়পুলকে অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া ঈষদুচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কে সে এক? বলে দাও ওগো বলে দাও, আর এসন্দেহ সহ্য হয় না, আমায় বল আমি জন্মের সকল সম্বন্ধ কেমন করে মুছে ফেলব, আমার কি হবে!"

জলেও যেমন স্থলেও তেমনি চন্দ্রচ্ছায়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সেই কম্পিত আলোকে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রে তিনি অধিকাংশকাল ছাদেই কাটান, কমলা তাহা জানিত না, অথবা মনে পড়ে নাই। তিনি কহিলেন, "মা কমল! তোমার মনের সন্দেহ আমি জানি; যদি নিষ্ঠা দান করতে পার তবে ক্ষুদ্র নশ্বর পদার্থের উপর এ ঐকান্তিকতার অপব্যয় কেন মা? যাঁহাকে পাইলে পাইবার কিছু বাকি থাকে না, যাঁহাকে একবার পাইলে আর হারাবার ভয় নাই যদি যথার্থ কিছু পাইতে চাও, কিছু দিতে পার, তবে তাঁকেই কেন চাও না, তাঁরি পায়ে দাও না মা!"

কমলা সেই হৈমজ্যোৎস্নায় তাঁহার পানে চাহিল। সেই সৌম্য শান্তমূর্ত্তি দুঃখীর দুঃখহরণ অশরণের শরণ দয়ালরূপ! যে সন্দেহে সংশয়ে তাহার বিশ্বস্তচিত্ত কঠিন শীতল হিমশিলায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল তাহা যেন

এই মুখের আদেশবাণীতে গলাইয়া দিল। সে কথা কহিল না, নীরবে দূরে সেই জ্যোৎস্না-জাল জড়িত গঙ্গাজলে চাহিয়া রহিল। ওই সুশীতল পবিত্র সলিল কাহার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে? উর্দ্ধে চাহিল সচন্দ্র তারকাদল নীলাম্বরে চিরহাস্যময়; সেই বা কাহার প্রেমে? এই দৃশ্য অদৃশ্য—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ছোট বড় জীবন সেই এক জনের পানে নির্নিমিষে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে। কে বলে তিনি নাই? তিনি আছেন—তিনি আছেন বই কি! ফুলের কলিটি যেমন উষার মৃদুবাতাসে অত্যন্ত ধীরে ফুটিয়া উঠে তেমনি করিয়া তাহার অন্ধকার হৃদয়মধ্য হইতে একটী ক্ষীণ আলোকরেখা সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। সে রুদ্ধনিশ্বাসে ডাকিল "বাবা! আমি কিছু জানি না, আমার শেখান্! কেমনকরে ডাকতে হয় ভুলে গেছি বাবা, নিষ্ঠুর পাষাণ বলে অবিচারক বলে তাঁকে ডাকা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তিনি কি সে পাপ ক্ষমা করবেন?"

"ক্ষমা করবেন না? তিনি যে ক্ষমাময়। ভুল, পাপ সব তিনি ক্ষমা করে থাকেন, ক্ষমা করাই তার ধর্ম্ম। শুধু ডাকতে হবে! ব্যাকুল হয়ে শুধু ডাকতে হবে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে ডাকতে হবে।"

"তিনি সবাইকেই ক্ষমা করেন? আমি যে পাপ করেছি, আমাকেও ক্ষমা করবেন? পরিপূর্ণ প্রাণে আমি তাকে ক্ষমা করেছি বাবা। তাতে আমি পতিতা হয়েছি কি?"

সার্ব্বভৌমমহাশয় তাঁহার উদার দৃষ্টি সেই রজতজ্যোৎস্নামণ্ডিতা সন্ন্যাসিনীর প্রতি স্থির করিলেন। "ক্ষমার মত ধর্ম্ম নাই! ক্ষমা করিয়া থাক ভালই করিয়াছ, বন্ধনভয় ঘুচিয়াছে। কমলা দুই হাতে তাঁহার পাদুখানি জড়াইয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

কমলা আর কথা কহিলনা, একনিমেষে এই সুপ্তযামিনীর মধ্যযামে আপনা ভুলিয়া সে আজ যাহা বলিবার, যাহা জানিবার সব বলিয়া, সব জানিয়া লইয়াছে। আর বলার বা শোনার কিছু বাকি নাই। এখন শুধু কঠোর তপস্যায় নিজেকে দগ্ধ করিয়া সিদ্ধি লাভ, আর তার পর মরণে শান্তির আশা। এত বড় আশা আর কিছু নাই। সে পলকহীননেত্রে ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া গড়ামূর্ত্তির মত খদ্যোতিকা ঝলমলায়মান পরপারের অন্ধকার তরুশ্রেণীর পানে চাহিয়া রহিল। গভীর হতাশার পর নূতন আশার উন্মেষে মনের মধ্যেও শত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। "যাঁকে পেলে আর কারুকে পেতে হয় না সেই তাঁকে পাবার কামনা ভিন্ন অন্য সকল কামনা তাঁরি চরণে নিবেদন করে দিলাম, হে বিশ্বনাথ তুমি গ্রহণ করো।"

(৫৪)

ত্রিপাদগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাযাত্রী সমাগম হইয়াছিল। রাজপথে কেবল মাত্র নরমুণ্ডসারি। কমলা স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ বিদ্ধ কুরঙ্গীর মত ছটফট করিয়া ফিরিয়া আসিল। ব্যাধবাণভীত হরিণের মত প্রায় সে ছুটিয়া আসিয়া দুর্গাবাড়ীর গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ধ্যানজপমন্ত্রতন্ত্র এক মুহূর্ত্তে যেন সকলি কোথা কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল।

মন্দিরে আজ মানুষ নাই কেবল মাত্র বানরের রাজত্ব, সে ঘুরিয়া আসিয়া বসিয়া

পড়িল। আকস্মিক উত্তেজনায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণে দারুণ একটা অবসাদে সর্ব্ব শরীরমন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। একবার মনে হইল সেই তরঙ্গের মাঝখান হইতে আজ আর মাথাটা না টানিয়া তুলিলেই চুকিয়া যাইত। সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল! আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল এই যে মহান্ তেজরাশি জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্য ইঁহার শক্তিও ক্ষণেকের জন্য প্রতিহত হইয়া থাকে, কিছুই বাধাহীন নয়, তবে আমি কতটুকু?"

সহসা সে শিহরিয়া শুনিল, কে যেন পশ্চাতে বলিয়া উঠিল "এ কি!"

কমলা মুখ ফিরাইল, দুর্গে! একি দৃশ্য আবার দেখাইলে? গঙ্গাতীরে তবে সে স্বপ্ন নয়; সত্যই সে তবে এখানে আসিয়াছে?

নিশ্চলপ্রায় চরণ বহুচেষ্টায় উঠাইয়া স্তম্ভিত মনীশ ঈষৎ অগ্রসর হইয়া সেই শুভ্র বসনা বিধবার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণেক পরে বিস্ময়মথিত মৃদুস্বরে কহিল "তুমি এখানে? এ বেশে কমলা!"

কমলা, উঠিয়া ছুটিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অবসন্ন শরীর মন তাহাতেও সায় দিল না। অনেকক্ষণ পরে মনীশ আবার তেমনি সন্দেহবিস্ময়ে মৃদুতর কণ্ঠে কহিল, "চিনতে পারছো না কমলা, আমি মনীশ, তোমার এ বেশ কেন?

মনীশ তাহাকে এত সহজে সম্বোধন করিতে পারিল? শচীকান্তের স্ত্রী বলিয়া কি এ আত্মীয় ভাব! সীসা গলিয়া অঙ্গে পড়িলে যেমন অসহ্য জ্বালায় দেহ জ্বলিয়া উঠে নিজের অকস্মাৎ পতিত অশ্রুবিন্দুতে তাহার কোমল গণ্ড তেমনি জ্বালা করিয়া উঠিল। সে বিন্দু দুটি দ্রষ্টার চক্ষে অদৃশ্য রহিল না, "বুঝেছি সে নাই। তাই সংবাদপত্রে ডেপুটি শচীকান্তের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। বিশ্বাস করি নাই যে সেই সে;—আমার বন্ধু চিরসুহৃদ আর নাই চলিয়া গিয়াছে। মনীশের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল!" কিন্তু তাহার শোকপূর্ণ কণ্ঠ কমলার বক্ষে অশনি প্রহার করিয়াছিল। সে বারেক বিহ্বল নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিল। কে এই কথা বলিতেছে! বন্ধু! চিরসুহৃদ। যে তাহার জীবনের সকল বাসনা কামনা ভস্ম করিয়া প্রাণটাকে এই রুদ্র মরুভূমি মাত্রে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, বন্ধুপ্রেমে একান্ত বিশ্বাসঘাতক, সে তাহার বন্ধু! সুহৃদ! অভাগিনী কমলা কাহার প্রতীক্ষায় তুই বসিয়াছিলি? আজও কাহার স্মৃতি তোর সত্য সঙ্কল্পে পদে পদে বাধা দিতেছে। সে কি এই তার প্রতি আকর্ষণহীন বন্ধুপ্রেমিক মনীশ! দেখা হইয়াছে—বুঝি ভালই হইল!" বহুক্ষণ পরে মনীশ ব্যথাকাতর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিয়া বলিল "তুমি হয়ত এখন আশ্রয়-হীনা? কোথায় কার কাছে আছ? খুড়িমা এখানে এসেছেন তাঁর কাছে যাবে কি? আমরা এই কতক্ষণ মাত্র এখানে এসে পৌঁছেচি। আমি আজ পিতৃহীন, কাকাবাবু আমার এ জগতে নাই। খুড়িমা তোমায় পেলে সুখী হবেন।" কমলা এ কথা শুনিয়া আগ্রহে মাথা তুলিল, তারপর সাশ্রুনয়নে ঘাড় নাড়িল "না।"

"খুড়িমা বড় কাতর, তাঁর কাছে যাবে না?" এবার অশ্রুধারাপরিপ্লুত বেদনা কাতর মুখ তুলিয়া, কাতর দৃষ্টিতে কি ক্ষীণস্বরে সে কহিল "সেখানে আমার স্থান নাই।"

"কেন কমলা?" মানুষের কণ্ঠে এমন যন্ত্রণাপূর্ণ স্বর আর কখনও শোনে নাই, কিন্তু তাহার মন তখন প্রতিঘাতে নিষ্ঠুর কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের ন্যায় প্রাণপণ বলে কহিয়া ফেলিল "সেখানে আপনি থাকিবেন।" মনীশকে কে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিঁধিল, এত বড় অপমানের কথা তাহার পৃষ্ঠে কেহ মারিতে পারে এ ধারণা তাহার কখন ছিল না, সে মুহূর্ত্তকাল আর্ত্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস লইবার শক্তি ফিরিয়া আসিলে ক্ষীণস্বরে কহিল "তবে আমি থাকিব না। তুমি গুরুদেবের কাছে যাইও, তুলসী ঘাটের সেই বাড়ীতে সেইখানেই খুড়িমা আছেন। আমি এখনি গিয়া বিদায় লইব, তুমি সেখানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমি কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" মনীশ একটু নড়িয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ মৃতের চেয়েও বোধ হয় অধিক বিবর্ণ। সে যে আজ কতখানি দিল কমলা হয় ত তাহা বুঝিতেও পারিল না। জগতের একমাত্র সুখ খুড়িমার কোল, শোক-জর্জ্জরিতা করুণাময়ীর সেবাভার, গুরুর সঙ্গ সে এক নিমেষে জীবন হইতে নিঙড়াইয়া ফেলিয়া তাহাকে দান করিল, নিজের জন্য রাখিল সুখহীন আশাহীন নিঃস্বত্ব শুষ্ক অংশটুকু! "তবে যাই কমলা, এ জগতে আর বোধ হয় দেখা হইবে না।"

"শুধু এ জগতেই না অনন্ত জগতের কোথাও যেন আর দেখা না হয় এই একমাত্র আশীর্ব্বাদ করুন!" মনীশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত সর্ব্বাঙ্গে—দেহে মনে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখ ক্রমেই অধিকতর অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। এই মুহূর্ত্তে তাহা যেন বিষ-জর্জ্জরিত মুখের মৃত্যুনীলিমার ন্যায় কালো দেখাইল, "কোথাও না দেখা হয়? যাই কমলা, ক্ষমা করো—মুহূর্ত্তের এ পাপ ক্ষমা করো আমার—" স্খলিত জড়িত মত্তচরণে মনীশ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন কমলা উঠিয়া মন্দিরের আড়ালে পাষাণে লুটাইয়া পড়িয়া সকাতরে ডাকিল "আমার মনে বল দাও, হে ঠাকুর! আমায় ধ্বংস করোনা। যে পথ দেখিয়েছ যেন সেই পথেই আমি থাকতে পারি।"

(৫৫)

সম্মুখে পার্শ্বে পুস্তকের রাশি, সজ্জিত সুখাসনে সমাসীন সত্য পাঠনিরত। মুক্ত জানালা মধ্য দিয়া রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য চলন্ত চিত্রের ন্যায় ক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; মহামূল্য গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত, আসনে বসনে আধারে ভিত্তিতলে প্রাচীরে গৃহের সর্ব্বত্র সৌখীনতা, সুরুচি ও ধনশালিতা ব্যক্ত হইতেছে, কিন্তু পাঠশীল ছাত্রের এ সব দিকে লক্ষ্য মাত্র নাই। গভীর মনোযোগের সহিত সে পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। পিছন হইতে একটি অতি সুন্দর তরুণ মুখ হাসির আলোয় মাখা-মাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কানের কাছে সেই হাসিভরা গোলাপী অধর দুখানা নামিয়া আসিল, কিন্তু তাহার কৌতুক মধ্যপথে বাধা প্রাপ্ত হইল, "ছিঃ গৌরি!" সত্য মুখ তুলিল। "ছিঃ কিসে?"

"পড়ার সময় বাধা দেয়?"

"ভারিতো পড়া, কত পড়বে?" "দাদা যাবার দিন কি বলে গেছেন মনে নাই? পড়লে মানুষ হবো, হলে দাদা সুখী হবেন, তুমি কি চাও না দাদা সুখী হন?" গৌরীর হাসিখুসী মিলাইয়া গেল "হই।" "তবে কেন বাধা দাও?"

"আর দেব না, তুমি দাদাকে বিয়ে করতে বলো না কেন?" সত্য এবার তাহার দিকে ফিরিল "তাঁ'কে আমি কি বলবো গৌরি, কি দুঃখে তিনি আজীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিলেন তাকি জানি নে যে বলতে যাবো? জলের দাগ তো নয় যে মুছে যাবে, সোনার খোদাই যে।" গৌরী সত্যের কেদারার হাতাটার উপর বসিল, "তাঁর জন্য আমার মধ্যে মধ্যে যেন কান্না পায়, কমলা যদি এখন আমার দিদি হতেন কত আহ্লাদ হত বলো দেখি?"

সত্যেন্দ্র গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল "তা আর বলতে গৌরি, বাবা কেবল সেই দুঃখ বুকে করেই চলে গেলেন। মৃত্যুকালেও দাদার মাথায় হাত দিয়ে বলে গেলেন তোমায় শুধু কষ্ট দিয়ে গেলাম যাদু আমার, একটুকু বিশ্রাম দিতে পারলাম না।"

সত্যর দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। সে আবার গভীর নিশ্বাস ফেলিল। "ছি তুমি এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলো না আমার ওতে বড় কষ্ট হয়—" এই সময়ে বাহিরে কে ডাকিল "সতু।"

"একি দাদা এমন সময় হঠাৎ ফিরে এলেন যে!" সত্য ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, গৌরী সলজ্জমুখে দ্বারান্তর পথে ছুটিয়া পলাইল। ভাসুরকে সে যে খুব লজ্জা করে তা নয়, পাছে তিনি এ সময় সত্যর পাঠগৃহে তাহাকে দেখিয়া মনে করেন সে তাঁহার ভাইয়ের পড়া শুনায় ব্যাঘাত ঘটায়, অতএব ভাইটিকে ইহার কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া যাই। এই একটা মস্ত ভয় ছিল।

মনীশের অকস্মাৎ প্রত্যাগমনে বিস্মিত নন্দকিশোর তাহার কুশল বার্ত্তা লইতে আসিলেন। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, খুড়িমা গুরুগৃহে কতকটা শান্তিতেই থাকিবেন বুঝিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার নৈশ বিদ্যালয়গুলি পাছে তাহার অভাব বোধ করে তা ভিন্ন সতুকে ছাড়িয়া অতটা দূরে থাকা। নন্দকিশোর ইহার ভিতরকার তথ্য জানেন না সুখী হইয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে শিবনারায়ণ তাঁহাকে ডাকিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি, তিনি মনীশকে দান করিতেছেন। সে ইহা ইচ্ছানুরূপ লোকহিতকর কার্য্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিবে। ইহাতে তাঁহার কিছু বলিবার আছে কিনা? নন্দকিশোর প্রসন্ন-চিত্তে উত্তর দিয়াছিলেন "কিছু না।" তিনিও ইতিমধ্যে তাঁহার বিপুল অর্থ, কন্যা জামাতা উভয়কে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়া উইলপত্র লিখাইয়াছেন। সত্যর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। শিবনারায়ণ কহিলেন "তাহা জানি বলিয়াই আমি তাহার অংশ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। মনীশের সন্তান সাধারণলোকেই ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া সতুর বংশের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে।"

করুণাময়ী সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া যখন কাশী চলিয়া গেলেন তখন নন্দকিশোর নিজের

স্বার্থ ভুলিয়া গৌরীকে তাঁহার সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পতিহীনা সর্ব্বত্যাগিনী সতী পুত্র পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অবিচল কণ্ঠে কহিয়া গেলেন "সতি তোরা আর আমায় জড়াতে চাসনে, তোরা সুখে ঘর কর, তা হলেই আমি সুখী হব।"

সবাই বুঝিয়াছিল সাধ্বী করুণাময়ীর হৃদয় তাঁহার মহানুভব স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যপূতঃ দেহখানা যে কদিন এ পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করে শান্তির স্থানেই আশ্রয় পাক্। সত্য বুক ফাটিয়া কাঁদিল, বাধা দিল না, সে জানিত তাহার দাদাকে লইয়া মা তাহার নিকটাপেক্ষা আরামেই থাকিবেন।

নন্দকিশোর চলিয়া গেলে মনীশ চাহিয়া দেখিল সত্য তাহার মুখের দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে। মুহূর্ত্তে তাহার কর্ণমূল হইতে ললাট অবধি লাল হইয়া উঠিল। সত্য আর একটু কাছে আসিয়া ডাকিল "দাদা!"

"সতি?" মনীশ মুখ নত করিল। "দাদা কি হয়েছে? মা, মা আছেন তো?" নত মস্তকেই মনীশ বলিল "হ্যাঁ সতি মা ভাল আছেন। উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সত্য কহিয়া উঠিল "তবে কি হয়েচে, আমায় বলবে না দাদা? নিশ্চয় কিছু একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেচে, দাদা আমায় বলবে না?"

মনীশ সহসা মুখ তুলিল "তোকে কেন বৃথা কষ্ট দেব সতু? শুধু জীবনের মধ্যে এই একটা দিন আমায় মাপ কর ভাই, দ্বিতীয় বার আর কখনও তোর দাদাকে এমন দেখতে হবে না—জানিস্।"

"দাদা, আমি কি তোমার দুঃখের সঙ্গী নই? শুধু তুমি আমায় দেবে, কিছুই কি নেবে না? আমায় লুকুবে?" মনীশ অকস্মাৎ ব্যথা-কাতর মুখখানা কম্পিত হস্তে বুকে টানিয়া লইল, ততোধিক কম্পিত স্বরে কহিল "তবে শোন",—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, গলা ঝাড়িয়া বলিল,

"আমার এ জগতের শেষ সুখ যা ছিল সব আজ তাকে দিয়ে এসেছি। যে কোলে একা আমারি স্থান ছিল—তোরও সেখানে জায়গা হয়নি সেখানে আমি আর যাবনা সতি, সেখান থেকে আমার চিরনির্ব্বাসন হয়ে গেছে।"

সত্যেন্দ্র অনেকক্ষণ কিছু বুঝিল না, তাই নির্ব্বাক্ হইয়া সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়িয়া গেল। কাকে? তিনি বৌদি, কমলা—কি সেখানে?"

"হা, সে বিধবা, অনাথা, জানি না কোথায় আছে,—বোধ হয় নিরাশ্রয়া।" "দাদা!" অকস্মাৎ নিবিড় অন্ধকারে যেন একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রের মুখ আশায়, সন্দেহে আরক্ত হইয়া উঠিল "একটা কথা বলবো দাদা, বল রাগ করবে না?" সর্পদ্রংষ্ট্রের মত মনীশ এ কথায় যেন আর্ত্তভাবে চমকিয়া উঠিল "না না সতু না না কিছু বলতে চেষ্টা করো না। সতু তুমি কি বলবে তাকি আমি বুঝি নাই। না না তাকে আমি বলে এসেছি এ জন্মে আর কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এ জন্মের সব দেনা পাওনা আজ মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। সে আশীর্ব্বাদ

চেয়ে ছিল যেন অনন্ত কালেও আর দেখা না হয়, সে আশীর্ব্বাদ কিন্তু তাকে আমি করতে পারিনি, আর একবার তার সঙ্গে দেখা হবে না একথা আমার মুখ থেকে বেরোয়নি। আমি জানি আবার আমাদের দেখা হবে, তাঁর পাদপদ্মে আবার আমরা সবাই একসঙ্গে মিলব এ আশা আমার এখনও আছে। সে পরলোকে।"

সমাপ্ত

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

চীনরমণীর প্রেমপত্র

(৫)

প্রিয়তম আমার!

নূতন বধূ এয়েছেন এখানে। এ নূতনের সঙ্গে অনেক নূতনের রঙ্গ দেখছি, বিচিত্রতায় বাড়ীখানি পূর্ণ হয়ে গেছে, কত দাসদাসী, বসন ভূষণ! এটা আমি নিশ্চয় বলছি—যদি তার গাউনগুলি পর পর সাজান যায় তাহলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাবে। সে বসন্তের ফুলের মতো শুভ্র সুন্দর কিন্তু তেমনই অকেজো। একদল সৈন্য আমাদের বাড়ীর উপর তাঁবু বেঁধে থাকলে যতটা গণ্ডগোল না হতো একটী নূতন বালিকার আগমনে তার চাইতে বেশী হচ্ছে। সে তার সঙ্গে মেজে আচ্ছাদনের বহু কম্বল, দেয়ালে টাঙ্গাবার জন্য কনফিউসিয়াস এবং মেনসিয়সের (Confuscious) (Mencious) বহুবাণী, রেশমমোড়া খাট বিছানা এই সব এনেছে।

তোমার পূজনীয়া মাতঠাকুরাণী এই সব জিনিস দেখে বাহকদের সব ডাকলেন, তার পর আমাদের বল্লেন যে তিনি 'সাং ডং' এ তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী চা খেতে যাচ্ছেন। সব জিনিস সাজারার গুছাবার ভার এখন আমার একার উপরেই। লি টি প্রজাপতির মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কথা সে খুব বল্‌ছিল কাজ কিছুই কচ্ছিল না। শয্যা এমন ভাবে করতে হয়েছিল যেন শয়তানে নিশীথে ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মা নিয়ে পালাতে না পারে। পর্দ্দা সব খুব ভাল করে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন শয়তান আক্রমণ করতে আসতেই পর্দ্দায় আট্‌কে যায়। লি-টি ভারী গম্ভীরভাবে আমাকে বোঝাচ্ছিল, যে সব আত্মা আঁধারে ঘুরে বেড়ায় সেগুলি সাধারণতঃ নূতন কিছু দেখ্‌লে তারই মাঝে আশ্রয় নিতে চায়। সে জন্য সতর্ক থাকা দরকার। সে ছাদও পরীক্ষা করেছিল—যদিই বা সে দিক থেকে কিছু আসে। লি-টি রান্না ঘরেও নূতন মূর্ত্তি স্থাপনের কথা বলেছিল, তোমার মা ছিলেন না তাই রক্ষে। বুঝতেই পাচ্ছ তোমার মা যদি নবাগতার গৃহের দেবতাকে নিজের রান্নাঘরে দেখ্‌তেন, তাঁর কি অবস্থা হোত। তোমার মা আসতেই সব মিটে গেল, তাঁর পুত্রবধুর এতটা বাচালতা তিনি মোটেই পছন্দ করলেন না। তোমার মা প্রায়ই বলেন যে লি-টির পিতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে হয়—তাঁকে বলবেন যে কন্যার বিবাহে লাখ্ লাখ্

খরচ করতে পেরেছেন আর তার চরিত্র গঠনের জন্য হাজারও কি খরচ করতে পারেন নি? মনটা বড় খারাপ—আজকের মত তবে বিদায়——

তোমারই পত্নী।

(৬)

প্রিয়তম আমার!

"অবিনীত স্বভাব, অসন্তোষ ভাব, পর-নিন্দা, দ্বেষ এবং নির্ব্বুদ্ধিতা এই পাঁচটী দুর্ব্বলতা নারীজাতির সর্ব্ব প্রধান শত্রু, প্রথমোক্ত চারিটি এক বুদ্ধিহীনতার দোষেই ঘটে থাকে। তোমার এ সম্বন্ধে মত কি? যতক্ষণ আমরা আমাদিগকে বাড়ীর বধু হিসাবে ধরে নিই ততক্ষণই অস্বস্তি বোধ করি, গৃহকর্ত্রী হিসাবে ধরলে তেমনটী নয়। লি-টি এখনও একটি ছোট্ট বালিকা—তুমি হাসছ যে? বোধ হয় ভাব্‌ছ আমার চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের ছোট—সে হলো বালিকা। তবু আমি তোমার পূজনীয়া মাতা-ঠাকুরাণীর নিকট এক বৎসর বাস করেছি এবং পাকা গৃহিণীর নিকট হ'তে বহু জ্ঞান লাভ করেছি। লি-টিও যদি অবসর সময়ে তার পিতামাতার কথা ভেবে ক্রন্দনে আর বৃথা আলস্যে সময় নষ্ট না করে কিছু দিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী হয়ে উঠবে।

আমার কাছে সে এই পুরাতন প্রাসাদের আনন্দময়ী; সদাই সে হাস্যময়ী—মধুর হাসিতে ভগবান্ সদা তৃপ্ত। গৃহের অশান্তি দূরে পালায়। লি-টি প্রায়ই তোমার মার নিকট অপমানিতা হয়। এখন তোমার মা নিয়ম করে দিয়েছেন যে লি-টি ও মা লি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কনফিউসাস (Confuscious) থেকে রোজ কিছু পাঠ নেবে।

লি-টি প্রসাধন সম্বন্ধে অতিশয় যত্ন নিয়ে থাকে। দুজন দাসী নিয়ে প্রাতঃকালে সে তার আয়নার সম্মুখে বসে। একজন জলের গামলা ধরে থাকে অপরটি প্রসাধনের দ্রব্যাদি গুছিয়ে দেয়। মুখখানি সুগন্ধি মধু দ্বারা সিক্ত করে তার উপরে চাউলের গুড়া লাগায়, ক্রমে মুখ চাউলের মতোই সাদা হয়ে যায়। তারপর গণ্ডদ্বয় তোয়ালে দিয়ে মুছে নীচের ওষ্ঠে কিছু লাল রং লাগিয়ে চুল গুলি বাঁধে। তার চুলগুলি খুব সুন্দর (কিন্তু আমার মতো এত দীর্ঘ বা ঘন নয়, আমার তো এই মনে হয়)। সে যখন তার রেশম ও সাটিনের জামা গায়ে দিয়ে বহুমূল্য অলঙ্কার-গুলি প'রে বার হয় তখন তার বেণীবদ্ধ দীর্ঘ কুন্তল রাশি হ'তে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত যেদিকেই কেন দেখি না অপূর্ব্ব সুন্দর বলে বোধ হয়। তাকে দেখে আমার হিংসে হয়—কারণ তুমি যখন এখানে ছিলে তখন আমি ত, ঐরূপ সজ্জিত হতেম। স্বামী আমার, তুমি নিকটে নাই—কার আনন্দের জন্য আর বেশ ভূষা করবো? পাউডার তোমার যাবার পর ব্যবহার হয়ই নাই—বিরহিণী নারীর কোন্ গাউন মানাবে সে খুঁজতে কতবার কাপড়ের বাক্স ঘেঁটেছি।

তোমার মা বলেন লি-টি গর্ব্বিতা এবং তিনি প্রায়ই বলেন "রমণীর সুন্দর মুখের চেয়ে ভাল অন্তঃকরণ অনেক মূল্যবান।" আমি বলি সে আমাদের আনন্দময়ী, তার উপস্থিতিতে চারদিকে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তার নারীজন্মও সার্থক হয়েছে—তোমার ভাই সি-

পে তাকে পেয়ে যথেষ্ট সুখী হয়েছে, সে তার এই সুন্দর ফুলটীকে পূজা করে। তোমার মার সঙ্গে হয়তো লি-টির একটু কথান্তর হয়েছে, লি-টি বসে দুঃখ কচ্ছে—সি-পে তার কক্ষের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেই তোমার মা একটু নয়নের আড়াল হলেন অমনই দুজনে মিলন হলো—এখন তাদের হাসি শুনতে পাচ্ছি,—অবসাদ অস্বচ্ছন্দতা সব কেটে গেছে বাঞ্ছিতের সমাগমে।

শীতকাল এসেছে এখন আর আমরা ছাদের উপর অধিকক্ষণ কাটাতে পারি না। সমস্ত দেশ যেন ধূসর কুয়াসায় আবৃত হয়ে গেছে—চাষীরা সব মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। পাহাড়ের নীচের রাস্তায় লোকচলাচল একরূপ বন্ধ—যদিও দুএকজন ছাতা বা খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে চলে।

তোমার কাছে আমি এমন সব চিঠিও লিখি। এর চেয়ে আমাদের নারী জীবনের ঘটনাই বা কি—আমাদের সংসার এই গৃহের মধ্যেই বদ্ধ—এর বেশী চাইও না কিছু—।

তোমারই পত্নী।

(৭)

প্রিয়তম আমার!

ভারী একটা মজার ঘটনা,—আমরা দোকানে গিয়ে জিনিষ কিনেছি—আমাদের পক্ষে এটা একেবারে অপূর্ব্ব—লি টির জন্যই আমরা এ আনন্দ লাভ করেছি;—লি-টিকে এজন্যে কত আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। লি-টির জন্যে সব দোকানদারেরা প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই জিনিষ নিয়ে আস্‌ত, কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট না হয়ে নগরের দোকান থেকে জিনিষ কিন্‌বে এই আবদার আরম্ভ করলে, তোমার মার অনুমতির জন্য আমরা কি অস্বস্তিতে দিন কাটিয়েছি—তারপর তোমার মা আমাদের নগরে যাবার জন্য খাটুলির ফরমাস্ করলেন—তখন কি আনন্দ আমাদের! প্রথমে তোমার মা চার বেহারার কাঁদে চড়ে চল্‌লেন, তারপর আমি দুবেহারার কাঁধে চড়ে লি-টি ও মা-লি তার পর চললে; তাদের পেছনে চাকররা সব যাচ্ছিল আমাদের মোট বয়ে আন্‌তে। আমরা যখন নগর দ্বারে পৌছিলাম তখন সকলেরই কি আনন্দ! সেদিন হাটবার, রাস্তাগুলি মৎস্য ও শাক-সব্জীর ঝুড়িতে বেজায় সঙ্কীর্ণ করে তুলেছিল। ঘোড়া গাধায় চড়ে বহুলোক যাতায়াত কচ্ছিল—আমার তো ভয়ই হলো—এর মধ্য দিয়ে আমাদের বাহকেরা রাস্তাকরে যেতে পার্ব্বে কি না! আমাদের বাহকদের 'আঃ হোঃ' শব্দে রাস্তা পেতে কোন কষ্ট হলো না। আমরা সেই লম্বা খোলা দোকানগুলি প্রাণভরে দেখে নিলুম। একটা জুতার দোকানের সম্মুখে দেখলুম একজোড়া মস্ত বুট, পার্ব্বতীয় রাজার জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। পাখার দোকানে পাখাগুলি অবিশ্রাম চল্‌ছিল। রেশমের দোকানীরা জানালা, দরোজা এমন কি রাস্তা পর্য্যন্ত রেশম দিয়ে মুড়ে ফেলেছে।

আমরা অনেক কথা খরচ করে, দর দাম করে সিল্ক ও সাটিন খরিদ করলাম, স্বর্ণালঙ্কার দেব দেবীর মূর্ত্তিও অনেক কেনা গেল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এসে—মনে হচ্ছিল, কখন চা পান করে প্রাণ জুড়াব! সেই জনপূর্ণ নগরের কোলাহলের চাইতে আমাদের এই দেয়ালঘেরা শান্তিময় জীবন—কত বিভিন্ন। আমি ভাবি এখানে আমরা কতটা

শান্তিতে বাস কচ্ছি, দুঃখ দৈন্য আমাদের পাশে থাকতে পারে বটে, কিন্তু আমাদিগকে স্পর্শ করতে পারে না। তবু ভাবি আমরা যেন বিশ্ব থেকে কতটা বঞ্চিত—এক একবার এই নূতন দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তোমারই প্রিয় ক্লান্ত পত্নী।

(৮)

প্রিয়তম আমার!

আমি একজনের জন্য বড়ই চিন্তায় পড়ে গেছি। তোমার কি আমাদের দেশের সেন পের কথা মনে পড়ে। আমার বিয়ের মাস দুই পরে যার লিং-পে-উর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল! সে দুঃখে পড়ে কাল আমার কাছে এসেছিল। তার স্বামীর বাড়ী থেকে তাকে বাপের বাড়ী রেখে গিয়েছে। তুমি বুঝতেই পার স্বামীপরিত্যক্তাকে আজীবন কি লজ্জা বহন করতে হয়। আমি জানি না কি করতে হবে, ভারী দুঃখে পড়ে গেছি। তার শ্বাশুড়ীর জন্যেই এতটা ঘটেছে—আমি সেন-পেকে বুঝাচ্ছি যে স্বামীর পিতা মাতাকে প্রত্যেক নারীরই নিজের পিতা মাতার চেয়ে বেশী সম্মান করা উচিত।

আমি ভাবছি সে তাঁকে সম্মান দেখাতে ত্রুটি করেছে—তাই এ শাস্তি ভোগ কচ্ছে। আমরা ছেলে বেলায় পড়েছি যে জ্ঞান লাভের প্রথম উপায়ই হচ্ছে সম্মান করে চলা। আমি বুঝতে পারি যে, সব সময় মুখ বুজে চুপ করে থাকাটা কষ্টকর বটে—কিন্তু শান্তিপ্রয়াসী হলে একটু সহিষ্ণুতা থাকাও যথেষ্ট প্রয়োজন। আমার এখানেই সে দু'দিন থাকবে। কাল রাত্রে সে আঁধার পানে চক্ষু মেলে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। আমি তাকে একটু বুদ্ধিমানের মতো চিন্তা করতে বল্লেম—তার স্বামী ও শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সরলভাবে সব কথা বল্‌তে বল্‌লেম; কারণ তারা উভয়েই এর যথেষ্ট সম্মানের পাত্র—স্বামীহারা পুত্রহীনা অবস্থায় যখন পরের দয়ার উপর তাকে নির্ভর করতে হবে তখন সে বুঝতে পারবে এর মূল্য। যাক ও সব কথা;—প্রিয়তম আমার, তোমার আমার মধ্যে কখনও অবিশ্বাসের ছায়া মাত্র পতিত হবে না—আমি তোমারই, এ হৃদয় প্রাণ তোমারই, তুমি আমায় ভালবাসবে আমি শুধু এই চাই—!

তোমারই পত্নী।

(৯)

প্রিয়তম আমার!

তোমার কাছে পত্র লিখতে আর সাত দিন অপেক্ষা করতে পারলুম না—কারণ কাল সন্ধ্যায় যে পত্র দিয়েছি সে শুধু দুঃখের কথাতেই পূর্ণ ছিল। কাল রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল, আজ মনটা অনেক ভাল বোধ হচ্ছে।

তোমার মা আমায় খুব বকেছেন, যদিও আমি নিজে বুঝতে পাচ্ছি এটা অনর্থক, তবু কথাগুলো আমার প্রাণে ভারী লাগে—তুমি জান তাঁর কথার উত্তর দিতে আমি অভ্যস্থ নই। লি-টিও বড় কষ্টে আছে যদিও এটা সে নিজের জন্যই ভোগ কচ্ছে—তবু এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। লি-টি তার বাপের বাড়ী থেকে যে সমস্ত চাকর চাকরাণী এনেছে তার ভেতর একজন বুড়ো ঝি সেই লি-টিকে পালন করেছিল, ভালও বাসে খুব তাকে—তবে হাতে কাজ না থাকলে মেয়ে লোকের যে দশা হয়—সে অন্দরে বসে কেবল বাজে গল্পেই সময় কাটায়। তার এই রাজ্যের

অবান্তর প্রসঙ্গ—বাজে বকা পরনিন্দা এ সব যদি দাসীদের মহালই বন্ধ থাকত তবে কথা এতদূর গড়াত না—সে আবার দিন ভ'রে যা সংগ্রহ করে লি-টির প্রসাধনের সময় তার কাছে বসে তাই ঢালে। লি-টি বালিকা ও-সব বাজে কথা শোনবার মোটেই উপযুক্ত নয়। রক্তের সঙ্গে বিষ মিশালে যেমন সমস্ত শরীরেই ব্যাপ্ত হয়—তেমনই একবার যদি এই বাজে বক্‌বার অভ্যাস মেয়েলোকের হয়ে যায় তবে পরিণাম বড় খারাপ দাঁড়ায়। চাকর চাকরাণীদের ভিতর কেবল একই আলোচনা চল্‌ছে—লি-টির বাপের বাড়ীই বা কেমন,—আর তার এ বাড়ীই বা কেমন, সেই বা কেমন এবং তার স্বামীই বা কেমন, এই সব আলোচনা শেষে এত বেড়ে উঠেছিল যে আমাদের দাসদাসীরাও তাতে যোগ দিয়ে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই একরূপ অসম্ভব করে তুলেছিল।

এটা সামান্যই বোধ হয় বটে—কিন্তু এতেই আত্মীয়তার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল করে ফেলে,—গৃহের শান্তিও নষ্ট হয়। অবশেষে একদিন আমি লিটি-র বুড়ো ঝিকে বল্লেম যে, যদি আর তার দেশে যাবার ইচ্ছা নাই থাকে—তবে সে যেন তার মুখটা একটু সংযত করে। কয়েকদিন বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল, আবার যে সেই; তাকে একদিন আমার মহলে ঢেকে নিয়ে গিয়ে বল্লুম—"তোমার অন্ন এখান থেকে উঠেছে—তুমি এখন বিদেয় হও।" লি-টি কেঁদে অস্থির কিন্তু আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—এক সংসারে থাকতে গেলে এমন ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। সে গেল বটে কিন্তু আমাদেরই দরজায় বসে আমাকে গালি দেবার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারলে না, সে আমাদের বাহিরের পথে বসে তিনটি ঘণ্টা ধরে 'লিউ' বংশের উপর নানারূপ অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগলো। সে তোমাদের বিখ্যাত পিতৃপুরুষদের কত কুৎসা! প্রিয়তম আমার, আমি জানতুম না—ইতিহাস এই বংশের বীরদের বক্ষে ধরে কত গৌরবান্বিত। আমি কত সুখী হলুম—যে এমন মহৎ বংশ হতে এসেছ তুমি। তারপর সে মিং বংশের আলোচনায় ও তাদের গুণরাশি ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হলো। লি-টির পিতৃপুরুষদের কত সুযশকাহিনী—কীর্ত্তিগাথা। ওরা বংশতালিকা সব খুজেছিল দেখছি। যাক্ ও সব বাজে কথা। তিনঘণ্টা সমানে বকার পর বুড়িটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লো। শেষে একজন চাকরের কাছে একখানা চিঠি লিখে বুড়িকে নৌকা করে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম—।

কিন্তু তোমার মার সে কি অবস্থা! তুমি দূরে আছ খুবই সুখে আছ। তিনি এ উঠান থেকে ও উঠান ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলেন, আমি ভাবলুম তিনি বোধ হয় ঝিটাকে জব্দ করতে সৈন্য আন্‌তে পাঠাবেন—তার পর যখন বুঝতে পারলেম যে মেয়েলোকটা তারই অধীনে আছে তখন একটু সংযত হলেন।

কি যে অবস্থা হয়েছিল তাঁর কেবল মরতেই বাকী ছিল—তুমি জান তোমার মার সংযমের অভ্যাস মোটেই নাই—বিশেষতঃ জিহ্বার সংযম নাই বল্‌লেই চলে। যা হোক শেষে কোন রকমে তাঁকে শয়নগৃহে নেওয়া গেল—আমরা চা ও কিছু গরম মদ নিয়ে

গেলাম এবং যাতে তিনি এই অপমানের কথা ভুলতে পারেন তারই চেষ্টা করতে লাগলেম। এতেও যখন তিনি সুস্থ হলেন না তখন আমরা পূর্ব্ব-ফটক থেকে ডাক্তার আনতে লোক পাঠালেম, ডাক্তার এসে তাঁর স্কন্ধদেশ পুড়িয়ে ভিতরকার গরমটা বের করে ফেলতে বল্লে, এতে তোমার মা বেজায় আপত্তি করাতে ওঝা তাড়াতাড়ি তার সাজ সরঞ্জাম গুটিয়ে নিজের কাঁধের পানে ভীত ভাবে চাইতে চাইতে পাহাড়ের পথে চল্‌লেন। তাপর আমি তাঁর প্রিয় পুরোহিতকে ডাকতে পাঠালেম। তিনি কিছু গোলাপী মদ্য, ধূপ ধূনো ও মোমবাতি নিয়ে এলেন, কিছুকাল মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, একটু গানও গাইলেন এর মধ্যে তোমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে লি-টিকে ডেকে আনতে বললেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেম 'এখন লি-টিকে ডেকে কোন ফল হবে না, তার মন এমনই অস্থির আছে যে, এখন সে কোন কথাই বুঝতে পারবে না।' তিনি বল্‌লেন ও একটা ছবি, শুধু রংই শাদা—ভিতরে কিছু নেই। আমি বল্‌লেম "আমাদের ওকে গড়ে নিতে হবে।" তিনি রেগে উত্তর করলেন "ও ঘুনেখেকো বাঁশ আর নোয়ান চলে না।" আমি আর কোন উত্তর করলেম না—লি-টি ও সি-পিকে "স্বর্ণ-মৎস্য-মন্দিরে" বেড়াতে পাঠিয়ে দিলুম।—যখন তারা ফিরে এল ঝড় তখন অনেকটা কেটে গেছে। এতেই আমার মন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল—যত ঝড় ঝঞ্ঝা সব আমাকেই মেটাতে হয়। তুমি মনে করোনা আমি এতে বড্ডো বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমি জানি, এর সমস্তই পরিণামে সুখের জন্য—এ দুঃখের দিকে আমি মোটেই চাইনা। প্রিয়তম আমার, তুমি আমার ভাব এর চেয়ে সুখ আর কিসে আমার?

তোমার পত্নী।

(১০)

প্রিয়তম আমার!

সেদিন সহস্রভুজার মন্দিরে মহোৎসব উপলক্ষে আমরা গিয়েছিলাম। তোমার মা ঠিক করলেন যে আমরা নৌকায় কিছুদূর গিয়ে তার পর পাল্কীতে যাব। আমরা সহর থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করলুম। কিন্তু নৌকাখানায় আমাদের সকলের ধরবার উপযোগী স্থানের অভাব ছিল—আর একটু বড় হলে ঠিক হোত। তোমার মা, তাঁর চারিজন বন্ধু—আমি লি-টি আর মা-লি ছিলাম, আমাদের সঙ্গে পাচক, চাকর ও তিনজন দাসী ছিল। আমার পক্ষে এই প্রথম নৌকা যাত্রা—দূর থেকে নৌকা দেখার চেয়ে এতে কত বেশী আনন্দ! আমরা নৌকা থেকে চারদিকের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম—বাঁশের ঝাড়ের ভিতর থেকে কুঠিরগুলি দেখা যাচ্ছিল। নদীর মাঝে কত নৌকা কত লোক জন। সেই জনাকীর্ণ জলপথে আমাদের নৌকা চলতে লাগলো, দূরে চা-র দোকানে সকলে চা খাচ্ছিল। ছাদের পাশে ছোট ছোট ছেলেরা দাঁড়িয়ে আমাদের পানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে ছিল। কোথাও বা ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রমণীরা সব কাপড় কাচছিল। এত নৌকা এখানে, আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না

যে জগতে এত নৌকা থাকতে পারে। সে কত ছোট, বড়, বোঝাই নৌকা কোন খানা পালে যাচ্ছে—কোন খানা বা দাঁড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মাছধরা নৌকা যথেষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—ক্ষুধিত আঁখি নিয়ে সম্মুখে মাঝিরা তাদের শীকার সন্ধানে বসে আছে। ক্রমে আমরা বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হলেম। বাহকেরা আমাদের অপেক্ষায় ছিল, সেখান থেকে বাঁধা রাস্তা ধরে আমরা মন্দির পথে চলতে লাগলেম।

এখানে যেন সমস্ত জগতই উপাসনা কচ্ছে—ধনী, দরিদ্র কত প্রকারের রমণী কিন্তু এখানে সব সমান, ভেদ বিবাদ কিছু নেই।

আমরা মন্দিরে প্রবেশ করে বাতি জ্বালিয়ে ধূপ ধূনো দিলাম, ভগবতী সহস্র-ভুজার দ্বারে প্রণাম করে তাঁর কাছে নব বর্ষের জন্য আমাদের সমস্ত পরিজনের মঙ্গল প্রার্থনা করলেম। আমি দয়াময়ী দেবী কোয়াণ-ইনের কাছে গিয়ে তাঁকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করলুম—তুমি জান তাঁর কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ—আরো আরো দেব দেবী প্রণাম করলুম বটে কিন্তু কোয়াণ-ইন রমণীরই দেবতা—তাঁর স্থান আমার হৃদয়ের সবটা জুড়ে আছে।

তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তুমি বিদেশে বহু দূরে আছ তিনিই আমায় রক্ষা কচ্ছেন। সূর্য্যের আগমনে যেমন আকাশ থেকে চন্দ্র তারা সব দূরে যায় তেমনিই তাঁর কাছে গেলে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়, দুঃখ দৈন্য কিছু থাকে না— কত ভালবাসি আমি তাঁকে সেটা বুঝাতে পারব না—তিনি যেন আমার কথা শুনে থাকেন—আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে অপূর্ণ থাকে না।

মন্দির ছেড়ে আসার সময় দেখলুম সেই প্রকাণ্ড আঁধার কক্ষে জগতের আলো বুদ্ধ-দেব বসে আছেন, সে মূর্ত্তি কি সুন্দর—মন আপনা হতেই ভক্তিতে নত হয়ে আসে। শান্ত স্থির নির্ব্বাক, নিস্পন্দ—ধ্যানী বুদ্ধ—চারিদিকে সহস্র আলো জ্বলছে, ধূপের ধোঁয়ায় ঘরখানা আঁধার হয়ে গেছে। আমি ভাবলুম "তিনি সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন—"।

মন্দির দ্বার থেকে 'পিঠে' কিনে আমরা মাছগুলোকে সব বিতরণ করলুম। তার পর কিছু জলযোগ করে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া গেল। তোমার মা ও তাঁর বন্ধুগণ বহু বিষয়ের আলোচনা কচ্ছিলেন চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্রের আলোচনা থেকে আধুনিক বালক বালিকা, শিক্ষাপ্রণালী, গৃহকার্য্য দাস দাসী কোন কথাই বাদ যায় নি। আধুনিক শিক্ষার কথা উঠতেই তাঁদের বক্তৃতার চোট আরও বেড়ে উঠ্‌ল, কারণ এটা তাঁদের সকলেরই চক্ষুশূল।

ক্রমে আমরা বাড়ীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেম, হঠাৎ যেন আমার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠলো—হায়, তুমি এখন আমার কাছে নাই—পথের পাশে লি-টির স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে—আমার অপেক্ষা করার কোন লোক নেই—আমার পক্ষে সব শূন্য—! এতক্ষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলুম—আবার বিষাদে হৃদয় ভরে গেল। প্রিয়তম আমার,— তোমার ভালবাসার "সেই"।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সৌধ-রহস্য

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাহিরের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গেল। বাবা চেয়ার ছাড়িয়া বাহিরের জ্যোৎস্নালোকিত ময়দানের দিকে চাহিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "কি চমৎকার! কি শান্তির রাজ্য! ভগবান্ তোমার এই পরিপূর্ণ প্রসাদসুধার অমৃতরসে যে বঞ্চিত, সে সত্য সত্যই হতভাগ্য?" টেবিলের উভয় পার্শ্বে এসথার ও আমি বসিয়া ছিলাম, বাবা আমাদের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

বাহিরের তাজা বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য আমি উঠিয়া হলের বড় দরজাটা খুলিয়া দিলাম, সাদা পালতোলা ছোট ছোট নৌকাগুলির মত খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘে আকাশ খানা ভরাইয়া ফেলিয়াছে। তরল মেঘের ঝালরের ভিতর দিয়া চাঁদ উঠিতেছিল। বিশ্ব তখন জ্যোৎস্না জলে স্নান করিয়া নির্ম্মল হাসি হাসিতেছিল। হলের সাম্‌নের দরজার উপর দাঁড়াইয়া আমি ক্রমবারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য? জানালাগুলায় আজ আর আলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেই প্রকাণ্ড টাওয়ার হইতে নীচে পর্য্যন্ত কোথাও আলো নাই—অস্পষ্ট মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকের ম্লান ছায়ায় বাড়ীখানাকে যেন একটা প্রকাণ্ড শবাধার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। জীবিত মানবের বাসস্থান বলিয়া কোন রূপেই মনে হয় না। সুপ্তরজনীর নিবিড় নীরবতা আর প্রকাণ্ড অন্ধকার বাড়ীখানা ধীরে ধীরে আমাদের উত্তেজিত মস্তিষ্কে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে বারটা ঘোষণা করিল। সহসা তাড়িতাহতের মত উঠিয়া আমার হাতটা সজোরে টানিয়া আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া এসথার বলিল, "দাদা শুন্‌চ?" আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম "কৈ—কিছু ত, না?" কম্পিত স্বরে উত্তর হইল, এদিকে দরজার কাছে এগিয়ে এস, এই বার? বুঝতে পাচ্চ না একটা মানুষ ছুটে আস্‌চে।" কথা শেষ করিয়াই সে টেবিলের পাশে নত জানু হইয়া বসিয়া পড়িল এবং অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম—মেঘ সরিয়া গিয়াছিল, নির্ম্মল চন্দ্রালোকে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত আমি চাহিয়া দেখিলাম, মরডণ্ট ছুটিয়া আসিতেছে! একটা অস্ফুট কাতর চীৎকারের সহিত আমি বলিয়া উঠিলাম "কি হয়েচে? মরডণ্ট কি হয়েচে?" সে দাঁড়াইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবরুদ্ধ স্খলিত বাক্যে উত্তর দিল "বাবা আমার বাবা?" তাহার মাথা হইতে টুপিটা কোথায় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ম্লান চন্দ্রালোকে মুখখানি কি ভয়ানক পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এমনি মনে হইতেছিল। এক রকম টানিয়াই আমি তাহাকে ঘরে আনিয়া কোমল সোফাখানার

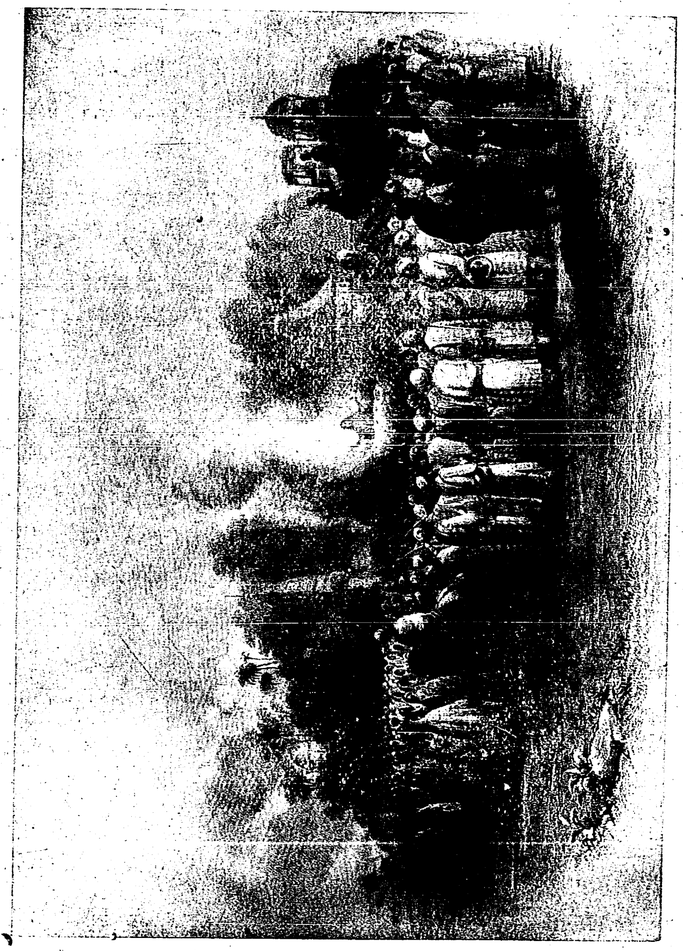

সতীর অগ্নি-সংস্কার।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

উপর শয়ন করাইয়া দিলাম। এই ঘটনায় এসথার তাহার অভিভূত অবস্থা হইতে অনেকটা যেন সজাগ হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর হইতে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া আনিয়া দিলে—আমি সেটুকু মরডণ্টকে খাওয়াইয়া দিলাম। তাহার ফলে মুখে রক্তের সঞ্চার ও অর্থহীন নেত্রে আবার যেন অনুভূতির ভাব ফিরিয়া আসিতেছিল। মরডণ্ট উঠিয়া বসিলেন এসথারের দক্ষিণ হস্তখানা তাঁহার দুই কম্পিত হস্তে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিলেন যে মনে হইল, তিনি যেন কোন নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্নকে তাড়াইয়া দিয়া বাস্তবের আশ্রয় লইতে চান। আমি কহিলাম "তোমার বাবা—তিনি কোথায়? তাঁর কি হয়েছে?" "তিনি চলে গেছেন। করপোরাল রুফাসস্মিথও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেছে। আমরা আর কখনও তাঁকে দেখ্‌তে পাবনা।" মরডণ্ট ফুকারিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। আমি বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলাম "চুপ চুপ্। "গেব্রিয়েল আর তোমাদের মা। তাঁদের কি হোল?" মরডণ্ট কহিল "গেব্রিয়েল কিছুই জানে না। অভাগিনী সে বাড়ীর শেষপ্রান্তে ঘুমুচ্চে···সকালে উঠে শুন্‌বে। ...মা আমার চিরদুঃখিনী মা—তিনি এম্‌নি একটা ঘটনার জন্যেই বহুকাল থেকে অপেক্ষা করে আছেন···মা আমার—কিছুই আশ্চর্য্য হন্ নি, তাঁর অসীম আত্মসংযম আমার শিক্ষাস্থল হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু এতদিন প্রতীক্ষা করার পর—আজকের আমি পাগল হয়ে গিছলেম।" চেয়ার টানিয়া লইয়া ললাটে হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে আমি কহিলাম—"যদি সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত কোন উপায় না থাকে আমায় সব কথা ততক্ষণ খুলে বল। কি ঘটনা ঘট্‌ল?"

কম্পিত হাত দুইখানা বক্ষে বদ্ধ করিয়া মরডণ্ট আমার পানে চাহিল "সব কথাই তোমায় বল্‌ব,—তোমার জানা আছে বোধ হয়, বাবার যুবাবয়সের কোন অন্যায় কাযের জন্য আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিশোধ প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেম। সেই অপরাধের সঙ্গে কর-পোরালেরও যোগ ছিল। কাল সকাল বেলা যখন আমি দেখলুম বাবা তাঁর আফগান যুদ্ধের সময়কার পুরোণ পোষকটা বার করে পরেচেন—তখনি আমার মনে হোল বুঝি আমাদের কল্পিত বিপদের ঘনমেঘ এইবার সত্যের আকার ধরে মাটিতে নেমে এলো। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে অবস্থানকালের অনেক কথা গল্প কচ্ছিলেন, বেশ শান্ত ভাবেই গল্প কচ্ছিলেন। রাত্রি ৯টার সময় তিনি আমাদের নিজের, নিজের ঘরে শুতে যেতে বল্লেন;—আমরা ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বাবা মাকে আর গেব্রিয়েলকে খুব স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন, আর আমার হাতখানা খুব আদর করে ধরে মিষ্টি স্বরে বল্লেন, এই প্যাকেটটা ওয়েষ্টকে দিও। আমি মিনতি করে, প্রার্থনা জানালুম যে সে রাত্তিরে আমি তাঁর কাছেই থাক্‌ব—আর যে বিপদ আস্‌বে—তার অংশ ভাগ করে নোব।" কিন্তু এমন আগ্রহের সঙ্গে কাতর স্বরে বাবা বল্লেন "মরডণ্ট আমি যে কষ্ট পাচ্চি—তার উপর অবাধ্য হয়ে তুমি আমায় আর বেশী যাতনা দিও না।"

আমি আর কিছু বলতে সাহস কল্লুম না, একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়েই বাবা দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে চলে গেলেন। যখন তাঁর মনের মধ্যে ভয়ের খেয়াল বেশী হোত গেব্রিয়েল ও আমাকে তিনি এমনি চাবি বন্ধ করে নিরাপদে রাখবার চেষ্টা করতেন। বাবা চলে গেলেন, সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, আমি সেইখানে বসে পড়লুম। তখন রাত্রি ১০টা, আমি উঠে ঘরের ভিতর পায়চারী করতে লাগলুম—যখন মাথাটা অনেকটা ঠিক হয়ে এলো—আস্তে আস্তে আলোটা মাথার কাছে এনে রাখলুম—কাপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে বাইবেল খানা নিয়ে পড়তে লাগলুম। বোধ হয় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ আমার কানে একটা জোর আওয়াজ এসে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে। আশ্চর্য্য হয়ে বিছানায় উঠে বস্‌লুম—সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। আলোটা মিট্ মিট করে জ্বলছিল—ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখলুম—প্রায় মধ্যরাত্রি! আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালুম—আলোটা নিভে গেল, বাতি জ্বালবার জন্যে দেশলাইটা হাতে করেচি হঠাৎ একটা শব্দ বেজে উঠ্‌ল—এত কাছে যে মনে হোল আমার ঘরের মধ্যেই আওয়াজ হচ্চে! আমার ঘর—তুমি জান—বাড়ীর সাম্‌নেই;—মার আর গেব্রিয়েলের ঘর একেবারে শেষ প্রান্তে। উঠে জান্‌লার কাছে গেলুম—পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে বাগানের দিকে দেখ্‌লুম, কাঁকড়ফেলা জ্যোৎস্নালোকিত পথে দাঁড়িয়ে তিনজন বিদেশী লোক বাড়ীর দিকেই চেয়ে আছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে তারা কি বল্‌ছিল—আর সেই সঙ্গে তাদের ছয়টি হাত ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তোলিত ও নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। হঠাৎ একটা মর্ম্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ চীৎকারের মত কি একটা কথা তারা বলে উঠ্‌ল—সেই ভীতিপূর্ণ চীৎকারে আমার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়ে গেল—শব্দ যেন স্তব্ধরাত্রের সমস্ত বিজনতাকে ভরিয়ে দিয়ে বায়ুমণ্ডলকেও পূর্ণ করে ফেলেছিল।

আওয়াজটা যখন মিলিয়ে এলো তখন দরজা খোলার শব্দ হোল। তার পরই জ্যোৎস্নালোকে আমি দেখতে পেলুম আমার বাবা আর করপোর‍্যাল সেখানে এলেন। তাঁদের মাথায় টুপী নেই—তাঁরা যেন যন্ত্র চালিতের মতই চল্‌ছিলেন—ঘুমিয়ে কি জেগে তাও আমি বুঝতে পাল্লুম না। বিদেশীরা তাঁদের স্পর্শ কল্লেনা—কোন কথা বল্লেনা;—বাগানের রাস্তা দিয়ে ঝোপের মধ্যদিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল—বাবা আর করপোর‍্যাল তাদের অনুসরণ করে আমার চোখের উপর থেকে চিরদিনের জন্যেই মিশিয়ে গেলেন।" মুখে হাত ঢাকিয়া মরডণ্ড অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আবার আরম্ভ করিল—

"এ সব হতে খুবই কম সময় লেগেছিল—পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগেনি।

আমি আমার শরীরের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে পাগলের মত দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলুম, হঠাৎ তালাটা খুলে গেল—আমি বারাণ্ডায় এসে পড়লুম—প্রথমেই আমি ছুটে নীচে নেমে রাস্তায় এসে পড়লুম—ঝোপের ভিতর বাইরে ছুটাছুটি কল্লুম কোথাও কোন চিহ্ন

নেই। গেটের প্রকাণ্ড দরজাটা প্রতিদিনের মতই সুদৃঢ় অর্গলে দৃঢ়বদ্ধ। যখন আমার অনুভব শক্তি স্পষ্ট হোল, মনে পড়্‌ল মার কথা;—আবার আমি পাগলের মত ছুটে চল্লেম; মায়ের দরজাতেও চাবী বন্ধ আমি তালাটা জোর করে ভেঙ্গে ফেললেম। দরজা খুল্‌তেই মা বাইরে এলেন—তখনও তাঁর বৈকালিক পোষাক খোলা হয়নি। বাইরে এসেই আমায় অঙ্গুলিসঙ্কেতে নীরব থাক্‌তে আদেশ করে মৃদুস্বরে বল্লেন, "তাঁদের ডেকে নিয়ে গ্যাছে।" আমি মন্ত্রাভিভূতের মত বলিলাম "হ্যাঁ নিয়ে গ্যাছে।" আমার মা—আমার চির বিষাদিনী মা মাটিতে বসে পড়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে—সে অবস্থাতেও প্রার্থনা কল্লেন।···ওয়েষ্ট তুমি বিশ্বাস কর্‌বে কি? মা আমার ভগবানকে নিষ্ঠুর বল্লেন না, অভিশাপ দিলেন না, সুধু তাঁর দুই চোখ ছাপিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ল। মা বল্লেন "তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—তাঁর বিচার আমরা মাথা পেতেই নেব—তোমার হতভাগ্য পিতা এ জগতে যে ভাবে কাটিয়ে গেলেন পরজগতে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক সুখে থাকবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ গেব্রিয়েল এখন ঘুমুচ্চে... আমি তাকে "দুধের" সঙ্গে "ক্লোর‍্যাল" দিয়ে ছিলুম।" আমি পুলিষে খবর দেবার কথা বলায় মা বলিলেন, "তিনি আমায় অনেকবার ধরে এই কাজটা কর্‌তেই বারণ করে গেছেন, তাঁর আদেশ চিরকালই আমি ভগবানের আদেশের ন্যায় পালন করেচি। আজ তাঁর কথাটা রাখ্‌ব বাছা আমার!" আমি বলিলাম "প্রত্যেক মুহূর্ত্তই এখন মূল্যবান—হয়ত ঐ ময়লা চামড়াওয়ালা লোক

গুলোর হাত থেকে মুক্তির আশায়—এখনও তিনি আমাদের ডাক্‌চেন—" কথাটা মনে হতেই মার দিকে না চেয়ে কোন কথা না বলে আমি আবার ছুটে রাস্তায় এসে পড়লুম—কিন্তু কি কর্‌ব কোন পথে যাব কিছুই স্থির করিতে পাল্লুম না। এস্‌থার, আমি কি কর্‌ব?"

ব্যথিত কণ্ঠস্বরে এসথার কহিল, "দাদা—সন্ন্যাসীকে—আমি দেখেচি, তোমরা কিছুই করতে পারবেনা। তবু চেষ্টা করে দেখ, সত্যিই আমরা এমন করে তাঁকে ছেড়ে দেবো না।"

* * *

বৃথা চেষ্টা। কোথাও কোন চিহ্ন নাই! ফিরিয়া আসিয়া আবার আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। এসথার তখনও সেই খানে চুপ করিয়া বসিয়াছিল কোন প্রশ্ন করিল না। যদি ঘটনাটার ভিতর দিয়া জেনারলের অদৃশ্য, রহস্যের কোন কিনারা পাওয়া যায় ভাবিয়া আমি মরডণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্যাকেট টা কোথায়? তোমার বাবা যেটা দিয়ে গেছেন?" মরডণ্ট যন্ত্রচালিতের মত পকেট হইতে প্যাকেটটা বাহির করিয়া দিল।

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিলাম ভিতরে কতকগুলি পুরাতন কাগজ আর একখানি চিঠি। আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া প্রথমেই চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। চিঠিখানায় তারিখ আছে—

৫ই অক্টোবর বেলা ৩টা

প্রিয় ওয়েষ্ট! অনেক সময় যে রহস্যমূলক ঘটনার ইঙ্গিত তোমায় দিয়াছি তোমার সাগ্রহ অনুরোধেও কেন তাহা প্রকাশ করিতে

পারি নাই সেই কথাই আজ জানাইব। আমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আমি বুঝিয়াছি যে ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত থাকাই মানবের পক্ষে মঙ্গলের কারণ, তাই মানবহিতাকাঙ্ক্ষী পরম দেবতা মানবের দৃষ্টি ও জ্ঞান এত ক্ষুদ্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে নিশ্চিত শুভ, বা অশুভ ঘটনা মানব শক্তির দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নহে সে সব ঘটনা অজ্ঞাত থাকাই মানবের পক্ষে শান্তিদায়ক,—সুধু এই জন্যই আমার আগত এবং অতীত জীবন আমি প্রকাশ করিতে চাহি নাই। যে অশান্তি আমি দিবারাত্রি সহ্য করিতেছি আমার স্নেহপাত্র সে যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি নাই।

আমার দুর্ভাগ্য জীবনের দীর্ঘ অন্ধকার রজনীরও যে অবসান আছে প্রভাত গগনের সুখতারার উদয়সূচনার ন্যায় তাহার ক্ষণিক আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অসহ্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষার বুঝি এইবার কূল মিলিবে। আমার অপরাধের পর এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কেন তাহারা আমায় বাঁচিতে দিয়াছে? আমার অদৃষ্টের উপর যাহাদের ক্ষমতার অসীম প্রভাব—তাহারা বোধ হয় ইহাই আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অশরীরি অভিশপ্ত ঘণ্টা দু-কুড়ী বৎসর ধরিয়া আমার মৃত্যুর ভেরী বাজাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে গিয়া আমি নিরাপদ। ওঃ, শান্তিঃ শান্তিঃ। জীবন ব্যাপী ধ্বংসের পর—আরামদায়িনী শান্তি!—মৃত্যুর পরপারে যাহাই থাক্—আমি এই শত সহস্র অভিশাপ-গ্রস্ত ঘণ্টার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব। এই শোচনীয় ঘটনার প্রত্যেক কথার আলোচনা অনাবশ্যক। ১৮৪১ ৫ই অক্টোবর যে ঘটনায় প্রধান লামা গোলাবসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল সেই ঘটনাগুলি ইহাতেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

পুরাতন সংবাদ পত্রের আবশ্যকীয় পৃষ্ঠা তোমায় ছিঁড়িয়া দিলাম। ইহা হইতেই মোটামুটি ব্যাপার বুঝিতে পারিবে, এবং ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার স্যার এডোয়ার্ড ইলিয়াটের একটা গল্প যাহার নামগুলা অপ্রকাশিত তাহাও দিলাম। আমার বিশ্বাস যাঁহারা পূর্ব্বদেশীয়দের জানেন না—তাঁহারা মনে করেন স্যার এডোয়ার্ডের নিজের মস্তিষ্ক হইতেই এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় ঘটনার সৃষ্টি। এই বিবর্ণ কাগজ কয়েকখানা দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে তাহা নহে। আমাদের ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের স্বীকার করিতেই হইবে যে এমন সব ক্ষমতা জগতে আছে যাহার বিষয়ে তাঁহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ।

জগতে আসিয়া জীবনে—আমি শান্তি পাইলাম না। চিরজীবনটাই নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখ জানাইতেছি না। ভগবান্ জানেন—সুস্থ দেহে অনুত্তেজিত চিত্তে একজন বৃদ্ধ লোককে হত্যা করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব কিনা? যদি সমস্ত শত্রুপক্ষ—আফগান তাঁহার পশ্চাতে একত্র হইয়া আশ্রয় না লইত তাহা হইলে—যতই আমি ক্রোধী ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় শিথিল হই তবুও কখনও করপোর‍্যাল বা আমি তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতাম না।

এখন—বিদায়—গেব্রিয়েলের ভাল স্বামী হইও। আর তোমার বোন্ যদি এই অভিশপ্ত বংশে তাহার ভাগ্য জড়িত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও মরডণ্ট ও তাঁহাকে আমি পিতার আশীর্ব্বাদ দিয়া গেলাম। আমার স্ত্রীর বাকী জীবনে অর্থাভাব ঘটিবে না—অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে যখন আমার সহিত মিলিত হইবে—আমার ইচ্ছা আমার পুত্র ও কন্যা আমার সমুদয় সম্পত্তির সমান অংশ পায়। আর ওয়েষ্ট প্রিয়তম,—বাছা আমার, যখন তুমি শুনিবে আমি চলিয়া গিয়াছি—আমার জন্য দুঃখিত হইও না। বরং আমার মুক্তির জন্য আমার অসুখী জীবনের শান্তির জন্য আনন্দ করিও।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু জন বার্থিয়ার—হিথারষ্টন।

চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া নীল ফুলস্কেপ কাগজের যে বাণ্ডিলটা ছিল—সেইটা খুলিলাম। প্রথম পৃষ্ঠার লেখাগুলি অল্পদিনের, বাকী পৃষ্ঠার কালীর রং পর্য্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা, "১৮৪১ সালের শরৎ কালে—লেফটেনাণ্ট জেনারলের কার্য্যাবলী, "টেরেণ্ডা উপত্যকায় যুদ্ধ।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জন বার্থিয়ার হিথারষ্টনের ডায়ারি

থুল উপত্যকা ১৮৪১—১লা অক্টোবর।

আজ প্রাতে তেত্রিশ সংখ্যক—বঙ্গীয় পঞ্চম সংখ্যক কুইনস্ পদাতিক সৈন্য সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইয়াছে।

উপত্যকাটার চারিদিকে যে সব সরু সরু গলি পথ গিয়াছে সে গুলা কেবল পাঠান আর আফ্রিদীতে ভর্ত্তি। এই লোকগুলি যেমন ডাকাতীতে সিদ্ধহস্ত তেমনি আবার ধর্ম্মের নামে মরিয়া।

আমার পরামর্শে যদি কাজ হইত আমি বলিতাম প্রত্যেক গলির মুখে একটা করিয়া ঐ মোটা ঠোঁট, বাঁকা নাক, রুক্ষ খোঁচা খোঁচা চুলওয়ালা মূর্ত্তিকে ফাঁসীতে লটকাইয়া দেওয়া হউক—তাহা হইলে ভয় পাইয়া তাহারা উৎপীড়ন বন্ধ করিবে। কি ভয়ঙ্কর কালো মুখের ভিতর দিয়া সাদা দাঁতের হাসি তাদের!

আজ সাম্‌নের দিক হইতে কোন সংবাদ আসিল না।

২রা অক্টোবর—

আমি অদ্যই হার্ব্বার্টকে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য লিখিব। কারণ যেরূপ দেখিতেছি—তাহাতে লড়াই বাধিলে—আর তা বাধিবেও, আমায় একেবারে সম্মুখের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইবে।

আজ একদল আহত সৈন্য সম্মুখ ভাগ হইতে আসিয়া পৌঁছিল। সংবাদ শুভ! নট "গজনী" অধিকার করিয়াছে তাহার বন্দীদের সে বোধ করি বেশ ভাল শিক্ষাই দিয়াছে। "পলকের" কোন সংবাদ নাই।

৩রা অক্টোবর—

আজ সম্মুখ হইতে মান্দ্রাজ অশ্বারোহী দলের বরক্লে বড় সুখের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। পলক গত মাসের ১৬ই তারিখে কাবুল সহরে প্রবেশ করিয়াছে। অরো সুখবর সেক্‌সপীয়র লেডী সেল ও

অন্যান্য বন্দী দিগকে উদ্ধার করিয়া শিবিরে ফিরাইয়া আনিয়াছে। এই ঘটনাতেই এবারকার অভিযান সিদ্ধ হওয়া উচিত। কার্য্যসিদ্ধ, নগর প্রবেশ। আমার বোধহয় পলক নিতান্ত ভীরুতা প্রকাশ করিবে না। দেশের মতামত না চাহিয়াই সে সহরে আগুন ধরাইয়া দিয়া সমভূমি করিয়া ময়দানে লবণ ছড়াইয়া দিবে। বিশেষতঃ রাজপ্রাসাদ আর রেসিডেন্সি এ দুটিত ধ্বংস করা চাই-ই।

ব্যারণ ম্যাকেন্‌টাস প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা যাঁরা দেশের জন্য তাঁদের মহৎ জীবন দান করিয়াছেন—তাঁদের আত্মা জানিতে পারিবে যে তাঁদের স্বদেশীয় বীরেরা তাঁদের রক্ষা করিতে না পারিলেও জীবনের মূল্য গ্রহণ করিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যশ ও অভিজ্ঞতা অপরে লাভ করিতেছে! আমি কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শক বা নির্ব্বাক্ শ্রোতা! অসহ্য,—এ অসহ্য! যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকা সৈনিক জীবনের বিড়ম্বনা! অসির দ্বারা জয়ের ও যশের পথ মুক্ত হয়। দুই একটা ছোট খাট লড়াই (যুদ্ধ তাহাকে বলা যায় না) ছাড়া আমার ভাগ্যে কিছুই ঘটিল না। ভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্ম্মমতা এ!

আজ একদল রসদদার কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই আর একদল আসিবে।

কলিকাতার ঘোড়দৌড়ে ক্লিওপেট্রায় অনেক টাকা বাজী রাখিয়াছি।

৪টা অক্টোবর—

এবার দেখিতেছি পাহাড়ীরা সত্য সত্যই একটা গোল বাধাইবে। সহজে মিটিবে না। তারাদা গিরিবর্ত্মে আফ্রিদিরা সব জোটজমায়েৎ হইতেছে। বদমাইস হতভাগা জুম্মনের বোধ হয় এ কাজ? আমি পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছিলাম ওকে একটা টেলিস্কোপ দিতে। দিলে হয় ত সে একাজ করিত না। বেটা একবার আমার হাতে পড়ে!

রসদদাররা কাল আবার আসিবে। তাহার পূর্ব্বে পাহাড়ীরা বোধ করি কোন গোল বাধাইবে না। কারণ ওরা যুদ্ধের লুটটাই বোঝে ভাল।

আমরা একটা চমৎকার মতলব বাহির করিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় যদি এটা হয় মজার জিনিষ হবে। ইলিয়টেরও মত আছে। আমরা চারিদিকে রাষ্ট্র করিব যে, আমরা রসদদারদের আগাইয়া যাচ্ছি। আমরা একটা পার্ব্বত্য রন্ধ্রমুখে গিয়া অবস্থান করিব। শুনিতেছি উহারাও নাকি ঐখান হইতেই আমাদের আক্রমণ করিবার মৎলব করিয়াছিল। আজ রাত্রেই আমরা যাত্রা করিব। দুইশত সৈন্যকে গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখা অনায়াসেই চলিতে পারিবে। আমরা দক্ষিণে যাইব শুনিয়া শত্রুপক্ষীয়েরা যখন দেখিবে খাবারের গাড়ী গুলো উত্তরমুখে চলিতেছে তখন বেশ সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া রসদ লুট করিতে যাইবে। মনে করিবে আমরা তখন বিশ মাইল দূরে রহিয়াছি। তাহার পর তাহারা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিবে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সৈন্যদের রসদ আটকান কেমন কৌতুকাবহ অভিনয়। এমন শিক্ষা তাহারা জীবনে আর পাইবে না। বাহির হইয়া পড়িবার জন্য আমারত প্রাণটা ছটফট করিতেছে।

ইলিয়ট তাহার কামানের গাড়ী দুই খানিকে ঠিক্ রসদের গাড়ীর মত সাজাইয়াছে। কারণ কামান সাজাইয়া খাবারের গাড়ী আসিলে স্বভাবতঃই লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইতে পারে। গোলন্দাজেরা ঐ গাড়ীর পশ্চাতের গাড়ীতেই থাকিবে—দরকার হইলেই কামান দাগিতে পারিবে।

আমাদের সিপাহী গুলাকে যাহা করিব না, তাহাই করিব বলিয়া জানাইয়াছি। তোমার যদি কোন সংবাদ দেশ মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে তোমার কোন বিশ্বাসী ভৃত্য বা দাসীর নিকট বিশ্বস্তভাবে চুপি চুপি প্রকাশ করিও এবং গোপন রাখিবার জন্য শপথ করাইয়া লইও ব্যস্)। রাত্রি ৮৪৫টা—।

৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা—

কি আনন্দ! কি আনন্দ! ইলিয়ট ও আমাকে লরেলের মুকুট পরাইয়া দাও। আমাদের ন্যায় দুষ্ট দমন কে?

এই মাত্র আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রক্তে পরিচ্ছদ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ হাত ধুইবার বা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনেরও সময় নাই। আজিকার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ না করিয়া আমার মন শান্ত হইবে না। ইলিয়ট ফিরিয়া আসিলে ইহা হইতেই আমরা সরকারি রিপোর্ট তৈয়ারী করিব।

যথা সময়েই আমরা অধিত্যকার রন্ধ্র মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম। রসদদারদের মধ্যে তেমন বলবান সৈনিক একজনও ছিল না। পাহাড়ীরা যদি হঠাৎ আক্রমণ করিত কি রকম দাঁড়াইত বলা যায় না। এখন কিন্তু আমরা দুই দল মিলিত হওয়ায় ওদের গ্রাহ্যযোগ্য বলিয়াই মনে করি নাই। যুবা চেম্বারলেন সৈন্য চালনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলা হইল। ঠিক্ ভোর বেলা রসদদারদের বাহির করা গেল। অনেক খাবার রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া গোলন্দাজদের গাড়ীর ভিতর ঢুকান হইল। ভোরের ক্ষীণ আলোয় আমাদের ছোট দলটিকে খুব দুর্ব্বল বলিয়াই মনে হইতেছিল।

গাড়ীর ভিতরকার ক্যাম্বিসের পর্দ্দার ছিদ্র দিয়া আমি পাহাড়ীদের বড় বড় পাগড়ীবাঁধা মাথার ছুটাছুটি লক্ষ্য করিতে ছিলাম। আমাদের তারাদা গিরিপথে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত তাহারা আক্রমণ করে নাই। রন্ধ্রপথের দুই দিকে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ; আমরা যদি প্রস্তুত হইয়া না আসিতাম আমাদের ভাগ্যে কি ঘটিত নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পর্ব্বতান্তরালে চমৎকার ভাবে আত্মগোপন করিয়া তাহারা আমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। চেম্বারলেনকে কহিলাম লোকজনের উপর নজর রাখ, হুঁসিয়ার। গাড়ীগুলা এই ভাবেই চলুক উহারা পাছু লইবে। অনুমান মিথ্যা হয় নাই! রসদদারদের সৈন্যেরা যখন অগ্রসর হইয়াছিল তাহারাও বিকট চীৎকারে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া পাহাড় হইতে পাহাড়ে বন্দুক হস্তে লাফাইয়া নামিতে আরম্ভ করিল। বিশ্রী আলখাল্লার মত পোষাক পরা, বিকট কালো মুখগুলা মিল্‌টন বর্ণিত সয়তানের অনুচরদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। যেদিকে চাও কেবল সেই পাগড়ীবাঁধা কালোমুণ্ডগুলা, তারা যেন বেড়াজালে আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল।

একটা বিকট উল্লাসব্যঞ্জক ধ্বনির সহিত তাহারা প্রথমেই শকট আক্রমণ করিল। পরক্ষণেই আমাদের রসদের গাড়ীর প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া ঘোর গর্জ্জন সহিত শত শত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবৃষ্টি হইয়া গেল। পর্ব্বত গাত্রচ্যুত পার্ব্বত্য খরগোষের ন্যায় অসংখ্য হত ও আহত শত্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অবশিষ্টেরা ভয় পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের সেনাপতির আদেশে বিপুল বিক্রমে গাড়ীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বৃথা তাহাদের আশা! তাহাদের দলপতিরা নিহত হইবামাত্র ছত্রভঙ্গ পাহাড়ী-সেনা পলাইতে আরম্ভ করিল। এই বার আমাদের পালা! আমাদের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল, নীল আকাশের বক্ষচ্যুত কালো কালো পক্ষীগুলির মত পর্ব্বত গাত্রচ্যুত পার্ব্বত্য পাখীগুলি উৎকৃষ্ট শিকারীর লক্ষ্যচ্যুত হইল না। আমাদের পদাতিক সৈন্যেরা পলাতকদের সঙ্গীনবিদ্ধ করিতেছিল। ঠিক যেন ছায়াবাজীর ছায়াচিত্রের মত মুহূর্ত্তে রঙ্গভূমির দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শত্রু এখন আমাদের করতল গত। সহজে তাহারা মুক্তি পায় আমার ইচ্ছা নহে। এমন শিক্ষা তাহাদের দিয়া দিব যাহাতে লালকোর্ত্তা দেখিলেই তাহারা সহস্র হাত দূরে থাকে। নির্ম্মম ভাবেই আমরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলাম। পলাতকের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি, পথ আমাদের অপরিচিত, এমন সময় তারাদা গিরিপথের রন্ধ্রমুখে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। রন্ধ্রের উভয় পার্শ্ব রক্ষার জন্য চেম্বারলেন ও ইলিয়টকে কতক সৈন্য সামন্তসহ দুই দিকে পাঠাইয়া অল্প সংখ্যক সৈন্য সমেত আমি রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিলাম। সাহস ও শক্তি মানবঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের সহায়। কিন্তু এই যে কেতাদুরস্ত আঁটসাঁট ছাঁটকাটওয়ালা সৈনিকের পরিচ্ছদ পর্ব্বতের উঁচু নীচু অসমতল স্থানে আরোহণে অনেক সময় বাধা দিতেছিল। (নোট—পর্ব্বতপথে খরগোষের মত উঠা নামার পক্ষে বিধর্ম্মীদের ঐ কুৎসিত আলখোল্লা গুলাই উপযোগী)। এ অবস্থায় তাহারা পলাইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্য তাহাদের প্রতিকূল। আমরা যে পথ ধরিয়া ছুটিতে ছিলাম তাহারই বাঁদিক দিয়া আর একটা সরুপথ গিয়াছে, প্রায় পঞ্চাশজন পলাতক সেই পথে প্রবেশ করিল। পথপ্রদর্শকদের নিকট শুনিয়াছি এ পথে বাহির হইবার এই আমাদেরই সম্মুখ দিয়া ছাড়া অন্য পথ নাই; পথের শেষে অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা। ইঁদুর স্বেচ্ছায় গর্ত্তে ঢুকিয়াছে নির্গমের পথ রাখে নাই। তখন দিবালোক স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল তবু সে স্থানটা অন্ধকার। সূর্য্যরশ্মি সেখানে অবাধে প্রবেশ লাভে সক্ষম ছিল না। দুই ধারে উচ্চ শৃঙ্গ, কোথাও উন্নত কোথাও অবনত। সৈন্যদিগকে বন্দুক ঠিক করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলাম। পথের শেষ দেখা গেল, আর পথ নাই শিকারীতাড়িত পলাতক কুকুরগুলা সম্মুখে প্রস্তরখণ্ড জমা করিয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ইহাদের বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ায় ফল কি? ছাড়িয়া দেওয়াও অসম্ভব। মৃত্যুই ইহাদের

উচিত প্রাপ্য। একটা প্রচলিত কথা আছে যে "ঋণের শেষ, ও শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।" খোলা তরোয়াল হাতে আমি আমার ক্ষুদ্র বাহিনীর সম্মুখ ভাগে বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইতে গেলাম, সহসা বাধা পড়িল। রঙ্গমঞ্চে এমন ঘটনা বিরল না হইলেও বাস্তবজীবনে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। পর্ব্বত গাত্রে যেখানে পলাতকেরা পাথরের স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারই নিকটে গুহা, প্রকৃতি হস্তনির্ম্মিত অতি ক্ষুদ্র আকৃতির গুহাটি দেখিলে মানববাসযোগ্য বলিয়া অনুমান হয় না। গুহামধ্য হইতে যেন যাদু মন্ত্রবলে এক অদ্ভুত দর্শন বৃদ্ধ বাহির হইয়া দাঁড়াইল, অতি বৃদ্ধ তাহার শ্মশ্রু ও কেশ শুক্লবর্ণ। জটাবদ্ধ কেশভার ভূপৃষ্ঠ চুম্বনে উদ্যত, শ্মশ্রুও জানু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে; বর্ণ মৃত্তিকার ন্যায়। মুখের এবং দেহের চর্ম্ম কঠিন অস্থির আবরণ মাত্র, দেখিলে মনে হয় জীবনীশক্তিও বুঝি সে দেহে থাকা সম্ভব নহে। কেবল সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণ চর্ম্মের অভ্যন্তরে কোটরগত দুই চক্ষু দুই খণ্ড অত্যুজ্জ্বল হীরকের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে ছিল। সেই অপূর্ব্ব অমানুষিক মূর্ত্তি গুহা হইতে বাহির হইয়া উভয় পক্ষের মধ্য স্থলে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া গম্ভীর আদেশের স্বরে কহিলেন "যাও!" কোন সম্রাট তাঁহার ক্রীতদাসকেও বোধ হয় এমন তুচ্ছ অবহেলার সহিত আদেশ করিতে পারিতেন না। আমাদের সমভাবে থাকিতে দেখিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় গম্ভীর বজ্রনাদের ন্যায় আবার কহিলেন "রক্ত পিপাসী মানবের দল এ স্থান সাধনার জন্য, ভগবানের আরাধনার জন্য; তাঁহারই সৃষ্ট তাঁহারি সন্তানদের রক্তপাতের জন্য নহে—যাও।" আদেশ-ব্যঞ্জক স্বরের সহিত দক্ষিণ হস্ত আবার আমাদের চলিয়া যাইবার জন্য পথ দেখাইয়া দিল। অন্য সময় হইলে কি হইত বলা যায় না কিন্তু এখন এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজিতপ্রায় অবস্থায়—কর্ত্তব্য স্থির করিবার অবসর কোথায়? শত্রুদলের সাহস বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহারা ঐ বুড়াকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে ছিল, আমাদের সেপাইরা ভীত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় অদৃষ্ট চক্র ভিন্ন পথে ঘুরিয়া যাইবে, সাহসী সেনাপতি আমি, একি দুর্ব্বলতা! অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম "বৃদ্ধ নির্ব্বোধ! সরিয়া দাঁড়াও নতুবা নিশ্চয় মৃত্যু।" ইংরাজ গোলন্দাজদের লইয়া প্রবল বিক্রমে অগ্রসর হইলাম। বৃদ্ধ নিবৃত্ত হইল না, অগ্রসর হইয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া যেন প্রার্থনার মত কি একটা ভাষা উচ্চারণ করিল, কিন্তু তখন সে সব লক্ষ্য করিবার সময় নাই, আমারি কোষমুক্ত তীক্ষ্ণধার তরবারি বৃদ্ধের বক্ষে বিদ্ধ হইল। আমার পশ্চাৎ হইতে একজন ইংরাজসেনা তাহার বন্দুকের বাঁট দিয়া বৃদ্ধের মস্তকে আঘাত করিল। মুহূর্ত্তে তাহার মৃতদেহ আমারই পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বত্য দস্যুরা একটা ব্যাকুল বেদনাপূর্ণ আর্ত্তস্বরে দিকবিদিক পূর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর আর কোন বাধা নাই—মুহূর্ত্তে যুদ্ধ জয় হইয়া গেল। "হ্যানিবল" বা "সীজর" আমাদের চেয়ে কি বেশী করিয়াছিল!

এ যুদ্ধে আমাদের অল্পই ক্ষতি হইয়াছে, হত তিনজন আহতের সংখ্যা পনেরো। তাদের পতাকা আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম ছোট এক টুকরা সবুজ কাপড়ে দুইছত্র কোরাণের বয়েদ্ লেখা।

আমি কঠিন তবু কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না। যুদ্ধের পর বৃদ্ধের মৃতদেহের সন্ধান লইবার কথা প্রথমেই আমার মনে পড়িল। অনেক অনুসন্ধানেও দেহ পাওয়া গেল না। সত্যকথা বলিতে কি, বৃদ্ধকে হত্যা করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না—সে আমার পথের বাধা না হইলে এ কার্য্য আমা দ্বারা কখনই ঘটিত না। তাই কেমন একটা আত্ম গ্লানি জাগিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্ত্তব্য করিয়াছি—কেন এ দুর্ব্বলতা!

আমাদের পথপ্রদর্শকেরা বলিল লোকটির নাম "গুলাবসিং—উনি একজন সন্ন্যাসী মহাত্মা ব্যক্তি, অহিংসাই ওঁর ধর্ম্ম। জীবে দয়া, জীবের কল্যাণই উঁহার প্রার্থনা। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান—আর ভগবানের সাধক পরম সিদ্ধ যোগী পুরুষ ইনি।—এ প্রদেশের সকলে তাঁকে ঈশ্বরের ন্যায় ভয় এবং ভক্তি করিত, তাই তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে শত্রুগণ অমন হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল।" তাহারা আরও বলিল, তৈমুর-লঙ্গ যখন এই পথে আসিয়াছিলেন তখন ঐ সন্ন্যাসী ঐ স্থানে অমনি ভাবেই উপাসনায় রত ছিলেন। আরও অনেক অদ্ভুত আজগুবি বর্ণনা তাহারা শুনাইল।

গুহাটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম—ওখানে দুই দিন থাকিতে হইলে আমি ত চরম শাস্তি মনে করি। উচ্চে চারিফুট, লম্বে ছয় হাত আন্দাজ;—স্যাঁতানে অন্ধকার, আসবাবের মধ্যে একখানি বহু পুরাতন জীর্ণ কাঠের তক্তাপোষ তাহার উপর কতকগুলি হরিদ্রাভ কাগজের বাণ্ডিল, হস্তাক্ষরে লেখা—কোন দুর্ব্বোধ্য ভাষা। দুইটি কাঠের বাসন এবং একখানি মৃগচর্ম্ম—আর কিছু না। যাক্—সে যেখানে গিয়াছে সেখানে গিয়া শিক্ষা করুক যে, হাজার উপবাস কঠোরতায় দেহ ক্ষয় করিলেও বিধর্ম্মীদের তরোয়ালের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা নাই।

—তবু আমি অন্তরের সহিত তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। শান্তিঃ।

ইলিয়ট আর চাম্বারলেন তারা আমাদের সঙ্গে মিলতেই পারলে না—আজকের জয়ের অংশীদার নাই—এ গৌরব—এ সম্মান আমার একারই প্রাপ্য—এর দরুণ গেজেটে অন্ততঃ নাম প্রকাশও হওয়া উচিত। পদোন্নতি—কে বলে তা হতে পারে না?—কি শুভাদৃষ্ট!

৬ই অক্টোবর বেলা ১১টা।

কাল রাত্রে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা কিছু অদ্ভুত রকমের। আমি জীবনে কখনও স্বপ্ন দেখি নাই—ঘটনাটি বাস্তবিক স্বপ্নও নহে—অপরে যদি এই ঘটনাটিই আমার কাছে প্রকাশ করিত, আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতাম না। সেই ঘণ্টার অপূর্ব্ব রুণুঝুণু শব্দ! আচ্ছা ঘটনাটা বলি। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ইলিয়ট আমার তাঁবুতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল। সে চলিয়া গেলে জমাদারকে লইয়া আমি একবার পাহারা ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য ছাউনীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম।

সবেমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম দেশী পোষাক পরা একটি লোক আমার তাঁবুর দরজার ভিতর দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল; কেবল তার উজ্জ্বল চোখের কঠোর দৃষ্টি আমার মুখের উপরে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। লোকটা হয়ত ধর্ম্মোন্মত্ত গাজী বা আফগান,—আমায় হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ভাবে আসিয়াছে। কথাটা মনে হইবামাত্র উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কি আশ্চর্য্য! উঠা ত পরের কথা, হাত পা নাড়িবার সাধ্যও আমার ছিল না;—যদি আমার বুকের উপর ছুরি নামিতে দেখি তথাপি বাধা দিবার ক্ষমতা নাই—এমনি অসহায় আমি। সাপের দৃষ্টিতে পাখী যেমন অচল ভাবে তারই পানে চাহিয়া থাকে তেমনি ভাবেই আমিও তার পানে চাহিয়া রহিলাম। আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ সতেজ—কিন্তু দেহটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় হইয়া গিয়াছে। সেই অদ্ভুত ব্যক্তির অদ্ভুত স্থির দৃষ্টি আমার উপরেই সমভাবে ন্যস্ত। অসহ্য—এ—অসহ্য। দেহ অক্ষম কিন্তু চেষ্টা করিতে কণ্ঠে স্বর বাহির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কে সে? কি চায়, কেন এসেচে?" গম্ভীর স্বরে অত্যন্ত ধীর ভাবে লোকটা উত্তর দিলে, "লেফ্‌টেনাণ্ট হিদারষ্টণ,—যে কাজ তুমি আজ করেচ, জগতে তার তুল্য মহাপাতক আর নাই, মানুষে এমন কাজ কখনও করিতে পারে না। ভগবানের প্রিয় সন্তান, প্রগাঢ় বিশ্ব-প্রেমিক, অসীম শাস্ত্রজ্ঞানী, নির্ব্বিরোধী, সংসারত্যাগী চীরধারী সন্ন্যাসী, পরমপূজ্য গুরুদেবকে বিনা অপরাধে তুমি হত্যা করিয়াছ। তোমার জীবনের সংখ্যা যত তদপেক্ষা বহুতর বৎসর তিনি এই নির্জ্জন গুহায় মহাযোগে সাধন পথে অবস্থিত ছিলেন। ভক্তি যখন তাঁকে মুক্তির দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, মোক্ষ যখন তাঁহার করতলের নিকটে, পাপিষ্ঠ সাধুহত্যাকারী তখন তুমি তাঁর মহাসাধনের বিঘ্নরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে হত্যা করেচ।

দীর্ঘ জীবন লাভ বিনা এ বিদ্যা এ জ্ঞান—ভগবৎ সাযুজ্য অসম্ভব! তাই পরমজ্ঞানী মহাত্মারা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর নিয়মিত পালনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে—যোগৈশ্বর্য্যলাভে আত্মাকে অমরাত্মায় পরিণত করিতে চাহেন। নতুবা দেহ রক্ষায় তাঁহাদের প্রয়োজনই বা কি? ঘট ভঙ্গ হইলে ঘট মধ্যস্থ আকাশ যেমন আকাশই থাকে তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলেও জ্ঞানীর আত্মা নষ্ট হয় না—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মেই যুক্ত থাকেন। কিন্তু আমরা যাহা হারালেম—এ জীবনে জীবনান্তে কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তরে—আর তাহা ফিরিয়া পাইব না। যে মহাপুরুষের রক্তে নিজের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছ তাহাতে ইহজীবনে তোমার মুক্তি নাই! মনে কর কি হিথারষ্টণ, এ অপরাধের ক্ষমা আছে? শাস্ত্রের আদেশ—ধর্ম্মদ্বেষী সাধু হত্যাকারীর তুষানলে প্রাণত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত। এ নিয়ম ধনী নির্ধন সবল দুর্ব্বল সকলকারই জন্য। রাজার সাধ্য নাই তোমায় রক্ষা করেন। তুমি দেবতার কোপে পতিত হইয়াছ। তুমি যোদ্ধা, সাধারণ মৃত্যু দণ্ড তোমার পক্ষে ঠিক নয়। তুমি হিন্দু নও—হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি অন্যায়াচরণ পাপ বলিয়া তোমার মনে হয়না—

তাই পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যোদ্ধার ঈপ্সিত মৃত্যু লাভ না করাই তোমার দণ্ড স্থির হইয়াছে। আজ হইতে যত কালই তুমি জীবিত থাক এই ঘণ্টা প্রতিনিয়ত তোমাকে তোমার শাস্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। তোমার গর্ব্বান্ধ পাপিষ্ঠ ভৃত্যটা যে সন্ন্যাসীকে আহত দেখিয়াও প্রহার করিয়াছে সেও বুঝিবে যে এ জগতে বাহুবল ও পদগৌরব ছাড়া অন্য শক্তিও আছে। ৫ই অক্টোবর—তোমাদের মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের শেষদিন জানিও—আবার তোমার শেষ দিনে দেখা হইবে।"

কঠোর তীব্র ভৎসনার দৃষ্টিপাত করিয়া মূর্ত্তি বাহিরে মিলাইয়া গেল।—সহসা আমার জড়ত্ব ঘুচিল—আশ্চর্য্য আমি কি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম! ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। যে শান্ত্রি তখনও পাহারায় জাগিয়াছিল—সে কিছুই জানে না, সে বলিল "এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার পাহারার কালে তাঁবুর মধ্যে কেহ প্রবেশ করে নাই বাহিরেও যায় নাই"। তাহার মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল সে আমার প্রকৃতিস্থতায় সন্দিহান হইয়াছে। আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। না স্বপ্ন নহে সব সত্য—আমার মাথার উপর বাতাসে ঘণ্টার শব্দ স্মরণ করাইয়া দিল সব সত্য। আমার পরিচিত ভারতবর্ষের দেবমন্দিরের পূজারীরা পূজাকালে এইরূপ ঘণ্টার শব্দ করিয়া থাকেন আমি কতদিন শুনিয়াছি। উঠিয়া তাঁবুর ভিতর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিছুই নাই কেহই নাই।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে সব ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল, কিন্তু আবার সেই রোমাঞ্চনকারী ঘণ্টা ধ্বনি!

সন্ধ্যা—

গোলন্দাজ স্মিথের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল—তাহার অবস্থাও ঠিক আমারই ন্যায়। সেও ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছে। মাথায় আগুণ জ্বলচে। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন—"।

ডায়ারির সঙ্গে আর একখানি আলাদা কাগজ আঁটা ছিল লেখা দেখিয়া মনে হয় তাহা অল্পদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। লেখাটি এই—

"সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ অতিদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের প্রত্যেক দিন প্রতিরাত্রি সেই নিষ্ঠুর ঘণ্টাধ্বনি তেমনি করিয়াই আমার বুকের উপর হাতুড়ীর ঘা মারিয়া মাথার উপর বজ্রের মত বাজিয়া আসিয়াছে। রক্তের তেজ কমিয়া গিয়াছে, শক্তি অপহৃত, দেহ জরাক্রান্ত; ভয় বাড়িয়াই চলিতেছে—ভয়—কী সে ভয়? আর সহ্য হয় না—অসহ্য—ওঃ ঈশ্বর আমার জ্ঞান আমার স্মৃতি লুপ্ত করিয়া দাও। আমার দেহমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে শব্দ মৃত্যুর ভেরীনিনাদের চেয়েও ভয়ানক তাহাও দিবানিশি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকি। বন্ধু নাই, লোকের সহিত মিশিবার সাহস নাই, কাহারও সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারি না—মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন আশা নাই। তবু আজিও আমি অহঙ্কারের সহিত বলিতে পারি আমি আত্মহত্যা করি নাই—ইচ্ছা করিলে আমার শক্তিশালী শাস্তিদাতাদের হাত আমি অনায়াসে ছড়াইয়া যাইতে পারিতাম তবু যাই নাই। আমার

বিশ্বাস—আমার উপরওয়ালা যেখানে আমায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন—তাঁহার আদেশ ব্যতীত সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার অধিকার আমার নাই। মৃত্যুকে আমি আহ্বান করেছি। শিখ যুদ্ধে সিপাহী যুদ্ধে অকুতোভয়ে তার সাম্‌নে বুক পেতে দিয়েছি সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেচে, আমার চোখের উপর বুকভরা আশা ভালবাসা নিয়ে—যুবকেরা চলে গেছে। বৃদ্ধ আমি—আমার জীবন অটুট—কেবল উপাধি আর মান্য! হায় মান্য—হায় ভাগ্য!

অনেক দুঃখের মধ্যে আমার একমাত্র সুখ—অভাগিনী স্ত্রী ক্লারা! বিবাহের পূর্ব্বে সকল কথাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছি—জানিয়া শুনিয়াও এই অভিশপ্ত হতভাগ্য সৈনিকের পত্নী হইতে স্বেচ্ছায় তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার দুঃখের ভার স্কন্ধে বহিয়া হাসি মুখে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আমার দুঃখের জীবনে যথাসাধ্য শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন। সুশীল পুত্রকন্যা দুটিও তাহাদের সমস্ত হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা দিয়া আমাকে সুখী করিয়াছে।"

ডায়ারি পাঠ শেষ হইয়া গেল। মরডণ্ট ও এসথার গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল তাহাদের দুইজনের চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। পাণ্ডুর আকাশে নক্ষত্রগুলা নিবিবার যোগাড় করিতেছিল। ক্লোক ও টুপি তুলিয়া লইয়া মরডণ্ট ও আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। এসথার নতজানু হইয়া যুক্ত করে উপাসনা করিতে লাগিল।

সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিয়াই চলিতেছিলাম—প্রত্যেক ঝোপঝাপ জঙ্গল গর্ত্ত দেখিতেছিলাম। প্রতি পদক্ষেপে আশার সহিত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছিল কি দেখিব—যদি সন্ধান মিলে—কি মিলিবে? ফুলারটনকে উঠাইয়া তাহার কুকুরটাকে সঙ্গে লইলাম—সেও স্বেচ্ছায় সঙ্গী হইল।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রায় তিন বৎসর পরে—"ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" নামক ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রের একটি সংবাদে আমায় আকৃষ্ট করিল। সংবাদ স্তম্ভে "লালহুমি, শনৎসুন ও অর্হৎ নামক তিনজন পরিব্রাজক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—যে তাঁহারা সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ডেনাক জাহাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত একজন ইংরাজ সন্ন্যাসীও আসিয়াছেন। প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্যের শিক্ষারও যথেষ্ট আছে।" সংবাদটি সম্ভবতঃ অপর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, মরডণ্ট ও আমার স্ত্রীর কাছে এ সংবাদ গোপনই রাখিয়াছিলাম। বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদককে পত্র লিখিয়া জানিলাম, সংবাদদাতার কোন খবর তিনি জানেন না। প্রাপ্ত সংবাদ ছাপা হইয়াছে এই পর্য্যন্ত।

একদিন পাগলাগারদ দেখিতে গিয়া রুফাসের সহিত আশ্চর্য্যভাবে সাক্ষাৎ হইল। সে পাগল হইয়া গিয়াছিল, কোন কথাই বলিতে পারিল না। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন,

তাহাকে পাগল দেখিয়া পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। তবে আমরা কি ভাবিয়া লইব ঐ তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত যে ইংরাজ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে গিয়াছেন তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত মেজর জেনারল হিথারষ্টন। বাবা কহিলেন, গুরু হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—কিন্তু অহিংসক ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে জীবনে মৃত্যুদণ্ড দিয়া ঐ শরীরেই পুনর্জন্ম প্রদান করিয়াছেন। এবং সম্ভবতঃ হিথারষ্টণ যে মহান্ শক্তি দেখিয়াছেন জগতের নশ্বরতাময় ভোগৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া সেই শক্তির সাধনার জন্য উঁহাদেরই আশ্রয় লইয়াছেন।" কথাটা এবার আর মরডণ্ট, গেব্রিয়েলকে লুকাইতে পারিলাম না। হায়! যদি মিসেস হিথারষ্টন শুনিয়া যাইতেন। তিনি স্বামীর চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য দৈব শক্তির সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু আমি ফদারজিল ওয়েষ্ট নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে বিজ্ঞান এখানে ভ্রান্ত। বিজ্ঞান কি? কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের মতের সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু কি? ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে অনেক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে বিজ্ঞান অন্যায়রূপে কালক্ষেপ করিয়াছেন। যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধে, বিজ্ঞান বিশ বৎসরকাল অবিশ্বাসে হাসি তামাসা করিয়া আসিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান প্রমাণ দিয়াছে, লোহার জাহাজ জলে ভাসিতে পারে না, বিজ্ঞান ইহাও প্রচার করিয়াছিল যে বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর পার হওয়া অসম্ভব! বিজ্ঞানবিদেরা যদি নিজেদের ভ্রান্ত মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া না রাখিয়া জানিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, প্রাচ্য জগতের অক্ষয় ভাণ্ডারে বুধমণ্ডলীর জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইবার কত বিচিত্র উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে! দার্শনিক শ্রেষ্ঠ এমার্সন বলিয়াছেন "ইয়োরোপ উচ্চতর ধর্ম্মভাবের জন্য চিরদিনই প্রাচ্য প্রতিভার নিকট ঋণী"। প্রাচ্য জগতে এখনও এমন সব দার্শনিক ও মহাপণ্ডিত আছেন—যাঁহাদের জ্ঞানের, শক্তির, ধর্ম্মের নিকটে দাঁড়াইবার যোগ্য হইতে আমাদের হাজার হাজার বৎসর সাধনার আবশ্যক। (সমাপ্ত)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

অভিজ্ঞান

জানি আমি, জানি আমি, কহিও না কিছু,
বিশ্বের হৃদয়-লগ্ন আমার হৃদয়!
যা' কিছু দুর্ল্লভ ব্যথা বাজে তব বুকে
সকলি পলকে আমি করি বিনিময়,
সর্ব্বস্ব প্রতিভূ দিয়া। তা' তুমি জান না!
অনন্ত হৃদয়ে মোর ঘিরেছি তোমারে
সুগোপনে সঙ্গোপনে; আনন্দ-পুলক
ফুটে যাহা তব বুকে দীর্ণ শতধারে
সহস্র রোমাঞ্চ মুখে উঠে শিহরিয়া
আমার হৃদয়পদ্ম পলে কাঁপাইয়া!
বলিও না কিছু আর! আমি অন্তর্য্যামী;
আছি দেবালয়ে তব দিবস যামিনী!
মোর পূজাবেদীমূলে তুমি চিরন্তন,
রহিয়াছ সুকুমার স্বর্ণপদ্ম সম!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।



বসন্ত-ঋতু।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

আত্মা ও মন সম্বন্ধে শারীরবিধান শাস্ত্রের মত

গীতায় একটী শ্লোক আছে :—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি যে বুদ্ধে পরতস্তু সঃ ॥ ৪২।৩।

দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিরও পরে যিনি সেই আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান যুগের শারীরবিধান বিদ্যার সাহায্যে এই শ্লোকটী সুন্দররূপে বুঝা যায়।

মানব ও অন্যান্য সকল জীবই এক একটী ক্ষুদ্র কোষরূপে জীবন আরম্ভ করে। সেই আদি কোষটী মাতৃদেহজাত একটী কোষ (cell) ও পিতৃদেহজাত একটী কোষ এই দুইটীতে মিলিয়া সংগঠিত হয়। এই আদি কোষটী জীবদেহ সংগঠন কালে বিভক্ত হইয়া দুইটীতে পরিণত হয় এবং সে দুইটী আকারে বাড়িয়া পুনরায় বিভক্ত হইয়া চারিটীতে পরিণত হয়। এইরূপে উহা সংখ্যায় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সেই সকল কোষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজাইয়া শরীরের অবয়বসমূহকে গঠন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ এবং বুদ্ধি ও মনের যন্ত্র মস্তিষ্ক নির্ম্মিত হয়।

যে আদি কোষ (embryonic cell) হইতে মানবদেহ নির্ম্মিত হয় তাহাতে মস্তিষ্ক নাই, ইন্দ্রিয়গণ নাই কাজেই উহার মন বা বুদ্ধি নাই বলিতে হইবে। অতএব মন ও বুদ্ধি আত্মা নহে। ঐ কোষের অভ্যন্তরে এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে উহা তৎপ্রভাবে নিজের মন ও বুদ্ধির যন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যে আদি কোষ হইতে মানব নির্ম্মিত হয় এবং যাহা হইতে কুকুর জন্মে তাহাদের উভয়কেই দেখিতে ঠিক একরূপ অথচ উহাদের একটী হইতে মানুষ হয় ও অপরটী হইতে কুকুর জন্মে। এই যে এক নির্দ্দেশক শক্তি যাহা ঐ ভ্রূণের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া উহার কোষগুলির বিভাগ ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজের উপযোগী হস্ত, পদ, দেহ, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় গঠন করিয়া লয় সেই দুর্জ্ঞেয় শক্তিই কি উপনিষদের "আত্মা"?

মস্তিষ্ক যে মন ও বুদ্ধির যন্ত্র শারীর-বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা ভূরি ভূরি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের (Brain) অংশবিশেষকে উৎপাটিত করিলে খুব সহৃদয় ব্যক্তিকেও দয়াহীনে পরিণত করা যায়। কিম্বা মস্তিষ্কের উপর ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা স্বভাবের যৎপরোনাস্তি পরিবর্ত্তন করা যায়।

মস্তিষ্কের কোন কোনও স্থানকে অনুভূতির স্থান (Senory) ও কোন কোন স্থানকে বুদ্ধির স্থান (Psychic) নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন মাথার পশ্চাৎদিকে অবস্থিত দৃষ্টির অনুভূতির স্থান (Visuo Sensory area) ও উহার চারি পাশে কিয়দ্দূর ধরিয়া দৃষ্টিজনিত বুদ্ধির স্থান (Visuo Psychic area)।

বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও স্পষ্টীভূত হইবে। একজন ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার ঘরে তাহার ছেলেটী প্রবেশ করিয়া তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল। সে অন্যমনস্ক কাজেই ছেলের আগমন ও তাহার কথা শুনিতে পাইল না। এখানে 'বিষয়' (শব্দ ও মূর্ত্তি) এবং চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়, উভয়ই বিদ্যমান তত্রাচ সে ব্যক্তির মনে কিছুই অনুভূত হইল না।

একটু ডাকাডাকির পরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল একটী শব্দ ও একটী মূর্ত্তি নিকটেই আছে। ইহা মনের দ্বারা অনুভূতি,—অর্থাৎ Visuo sensory এবং auditory sensory areaর কার্য্য।

তারপর তাহার একটু বেশী মনোযোগ পড়িল, তখন মনে হইল এ মূর্ত্তি ও শব্দ তাহার জানা—তাহারই পুত্রের মূর্ত্তি ও তাহারই কণ্ঠস্বর। ইহা বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ Visuo psychic এবং auditory psychic areaর কার্য্য।

অতএব বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য বুঝা গেল।

কিন্তু এই তিনেরই অন্তরালে আর এক শক্তি কার্য্য করিতেছে—যাহা ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে মনকে মনের কার্য্যে এবং বুদ্ধিকে বুদ্ধির কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেছে।*

এই শক্তি কে?

ইনিই আত্মা!

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মোগল শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক অবস্থা

(De la mazelierের ফরাসী হইতে)

মোগল-সম্রাট ও আমীর-ওম্‌রাওদিগের শাসনাধীনে ভারতের জনসাধারণ দাসত্ব দশায় উপনীত হইয়াছিল। এই পরিণামের চারিটি কারণ:—রাজাদিগের চিরপ্রচলিত অনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রণালী, সামন্ততন্ত্র, বিধর্ম্মীদিগের সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে এই যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদেশ, এই আদেশ অনুসারে মুসলমানদিগের প্রতিশোধমূলক দিগ্‌বিজয়, এবং সমস্ত ভূমি রাজসরকারের নিজস্ব—এইরূপ প্রতীতি। শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান। Bernier বলেন, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইলেও কোন সৈনিক ধান্য বা ফলাদি অপহরণ করিতে সাহস করে না; ভূমির সমস্ত ফসল সম্রাটের নিজস্ব। Tavernier অনেকবার এই কথা বলিয়াছেন যে, আমীরদিগকে যে জায়গীর

* কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ পততি প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেব যুনক্তি।

প্রদত্ত হয়, মোগল সম্রাটই তার ভূস্বামী; সম্রাট্ ইচ্ছা করিলে, জায়গীর হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন। তাহাদের মৃত্যুর পর জায়গীর আবার সরকারেই ফিরিয়া যায়।

সম্রাটই ভূমির অধিস্বামী, ভূমির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। তবে ভূমির উপস্বত্বভোগসম্বন্ধে ভেদনির্দ্দেশ করা আবশ্যক। জায়গীর ভূমির উপস্বত্ব মনসবদার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিত। কৃষক জমীর মজুর মাত্র; ইচ্ছা করিলে জায়গীরদার তাহাকে দিয়া বেগার খাটাইতে পারে, তাহার নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করিতে পারে। সম্রাটের খাস-মহলে সম্রাটই ভূমীর উপস্বত্বভোগী। ইহার কৃষকেরা রাজ সরকারের খাস কৃষী। এই জন্য বহু কাল পর্য্যন্ত অন্য কৃষি-মজুর অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা একটু ভাল ছিল। ভূমিজাত ফসলের এক তৃতীয়াংশ সরকারকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এই নিয়মে আক্‌বর খাস-মহলের কৃষকদিগকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু খাস মহলের আয়তন শীঘ্রই হ্রাস হইল। ক্রমাগত নূতন নূতন মন্‌সবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং রাজকোষের অবস্থা এরূপ খারাপ হইয়াছিল যে, রাজকর্ম্মচারিদিগকে নগদ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভূমি না দিলে চলিত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলার অবস্থায়, রাজসরকার সাক্ষাৎভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে বিরত হইয়াছিলেন, জমিদারের দ্বারা আদায় করিতেন। জমিদারের অবস্থা মনসবদার হইতে অল্পই তফাৎ ছিল।

খাস মহলের কৃষকেরা, আবার আমীরদিগের কৃষক হইল। ভূমির কর্ষণ ও উপস্বত্ব ভোগসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমীরদিগের অনুগ্রহাধীন হইল।

নগরের লোকেরাও এই গোলামী হইতে রেহাই পায় নাই। কৃষকদিগের ন্যায় কারিগরেরা বিধিমত একজন প্রভুর অধীন না হইলেও, উহারা দায়ে পড়িয়া আমীরদিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায়, এই কারিগরেরা, সম্রাট ও আমীর-ওম্‌রাও ছাড়া অন্য কোন খরিদ্দার পাইত না। ভাল করিয়া কাজ আদায় করিবার জন্য, সম্রাট ও আমীরগণ ইহাদিগকে বেতন দিয়া কাজে নিযুক্ত করিতেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমীরদিগের কারখানায় এবং অধিকাংশ কারিগরই সম্রাটের কারখানায় কাজ করিত। আইনতঃ না হউক কার্য্যতঃ উহারা একপ্রকার গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল।

এক এক সম্রাটের বিভিন্ন শাসনপ্রণালী অনুসারে প্রজাপুঞ্জের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত। প্রতিভাবান স্বেচ্ছাতন্ত্রী আক্‌বর বেশ বুঝিয়াছিলেন, প্রজাদিগের মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিস্তার করাই বিদ্রোহভাব প্রশমনের একমাত্র উপায়। প্রজাবৃন্দ দরিদ্র হইয়া পড়িলে বহুব্যয়সাধ্য রাজ-দরবারের কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব।

আইন-ই-আকবরি রাজকর্ম্মচারিদিগকে মিতচারিতা, দূরদৃষ্টি ও সাধুতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন:—

"রাজপ্রতিনিধি, কৃষিকর্ম্মের পুষ্টি বিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন, দেশের দুরবস্থা প্রশমন করিয়া প্রজাবৃন্দের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে

যত্নবান হইবেন। জলের চৌবাচ্চা, কূপ, খাল, উদ্যান, সরাই এবং অন্যান্য পুণ্য কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন কীর্ত্তি-মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া তিনি যেন ভাবী কালকে ফল প্রসূ করিয়া তুলেন।" (১)

তখনকার অবস্থাও আক্‌বরের প্রতিভার অনুকূল ছিল; বহু শতাব্দীর পর, সেই সর্ব্বপ্রথম পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান শান্তিসম্ভোগ করে।

সেই সময় দেশ উন্নতির পথে চলিয়াছিল, দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুঃখদুর্দ্দশা ও বিপ্লব-যুগের পরেই নিয়ত এইরূপই ঘটিয়া থাকে। অবশ্য, আইন্-ই আক্‌বরীতে যে বেতনের হার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিম্ন। মজুরের সমস্ত দিনের সর্ব্বোচ্চ মজুরী ছিল ৫ হইতে ৭ "দাম"। দাম—এক টাকায় সিকি অংশ; এবং টাকার মূল্য ছিল ২ ফ্রাঙ্ক ৬০ সেন্‌টিম্। কিন্তু সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মূল্যও খুব কম ছিল। ১২ দামে এক মণ শস্য পাওয়া যাইত। এক মণ চাউলের মূল্য ছিল ২০ হইতে ১১০ দাম ইত্যাদি; আর মণের ওজন ইংরাজি ২৫ পৌণ্ডের সমতুল্য।

আক্‌বরের উত্তরাধিকারিগণ আক্‌বরের ন্যায় দূরদর্শী ছিলেন না। জেহাঙ্গীর ও শাজাহান এসিয়া-সুলভ প্রকৃত স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। শাজেহান লক্ষলক্ষ হিন্দু মজুরকে বেগার খাটাইয়া তাজমহল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে কোন বেতন দিতেন না; এবং তাহারা এত কম খাইতে পাইত যে যথেষ্ট আহারাভাবে তাহাদের অধিকাংশ, পীড়ায় কিংবা দুঃখকষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহাদের স্থান অন্যেরা অধিকার করিত, আবার তাহারাও এই একই দশা প্রাপ্ত হইত। শাজেহান দুই-বার দিল্লির অধিবাসী-দিগকে জাহানাবাদে বাস স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। এই প্রত্যেকবারের যাত্রায় শতসহস্র লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

অওরংজেব হিন্দুদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন অনুমোদন করিতেন। তিনি হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজদরবারের বিলাসিতা-নিবন্ধন রাজকরের অঙ্ক ২০ কোটীতে উঠিয়াছিল অথচ সাম্রাজ্যের লোক সংখ্যা অধিক ছিল না, (ভ্রমণকারীদিগের বর্ণনা অনুসারে, প্রদেশ-গুলিতে বেশি লোকের বসতি ছিল না) এবং আকবরের পর, বেতনের হারও বর্দ্ধিত হয় নাই। তাই তত্রত্যয়ুরোপায়েরা, জনসাধারণের দুরবস্থা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মাটির কুটীরবিশিষ্ট ও খোড়ো ঘর-সমন্বিত নগর, তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট গ্রাম—এই নগর ও গ্রামগুলি তাঁহারা ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি স্থগিদ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রেরা ধনাভাবে অবসন্ন; প্রতি বৎসর শরৎকালে সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষ মহামারীতে উৎসন্ন যাইতেছে। রক্ষি-

(১) আইন-ই-আকবরী;—ভারতের বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মগুলি খিলিজি ও মোগল রাজবংশ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু চীন দেশে মোগলেরা যে সকল পূর্ত্ত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার সহিত উহার তুলনা হয় না। বহু সংখ্যক খাল ছিল; যে খালের দ্বারা কাসিমবাজারের সহিত গঙ্গার যোগ হইয়াছিল, বাণিজ্যের হিসাবে উহা সর্ব্বপ্রধান (৩৪ লীগ)।

সৈনিকেরা শুধু একবেলা প্রাতে আহার করিতে পায়; শুষ্ক ময়দার ছোট ছোট গোলাকার পিণ্ড—উহারা জল ও গুড় মাখিয়া তাহাই আহার করে। কখন কখন সায়াহ্নে একটু লবণ ও শাক-সব্‌জির সহিত ভাত রাঁধিয়া খায়। ধনাঢ্যেরা মাটির মধ্যে ধনরত্ন পুঁতিয়া রাখিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। তাহাদের সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে শাসনকর্ত্তা ও আমীরেরা তাহাদের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। সম্রাটের কারখানার বাহিরে, সমস্ত শ্রমশিল্প অবনতি-গ্রস্ত; আমীরেরা যৎসামান্য মূল্য প্রদান করে; এবং দোকানদারেরা বেশী মূল্য দাবী করিলে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বত্রই শোচনীয় অজ্ঞতা। প্রায় কেহই লেখাপড়া জানে না, গণনা করিতে পারে না, নিজ নিজ ব্যবসায় সম্বন্ধেও শিক্ষা পায় না; সর্ব্বত্রই সৈনিকদিগের উৎপীড়ন, রাজকরের আতিশয্য। যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী শাসনবিভাগের পদ মূল্য দিয়া ক্রয় করে এবং যে সকল জমিদার রাজস্বের ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয় তাহাদের বিষম অর্থ-গৃধ্নুতা। উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়া যায়; এবং তৎক্ষণাৎ আফগান ও মোগলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সৈন্যবিভাগ বা শাসনবিভাগে প্রবেশ করে, অথবা অলসভাবে কষ্টের সহিত জীবন যাপন করে, এবং তাহাদের পূর্ব্বতন স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করে। অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। Tavernier ৮ হাজার ফকির ও ১২ লক্ষ যোগীর উল্লেখ করেন। (২)

আওরংজেবের শাসনতন্ত্র যতই বিরক্তিকর হউক না কেন, তাঁহার শাসনতন্ত্রের অন্ততঃ এই একটা সুবিধা ছিল যে, তিনি উত্তর ভারতের শান্তিরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও আমীরেরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানিত ও ভয় করিত। ইহার মৃত্যুর পর অরাজকতা, গৃহ-বিবাদ ও সর্ব্ব-প্রকার অন্যায্য কর আদায় আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানে, ভারত যার-পর-নাই দারিদ্র্য দশায় উপনীত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) আধুনিক ভারতীয় লেখকগণ এইরূপ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, মোগলদিগের শাসনাধীনে লোকের অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহারা ইহাই দেখাইতে চান যে, ইংরাজের ভারত জয়ের সময় হইতেই ভারতের দারিদ্র্য সুরু হইয়াছে। আমি পরিশিষ্টে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিব।

নীহার

উষার নীহার সম আছিল সে মোর বুকে
এ হিয়া-কমল-ফুল্ল কম্পিত উল্লাস-সুখে।
ব্যাকুলিয়া যত তারে রাখিবারে গেনু ধরি,
মুকুতার মত হায় গড়ায়ে পড়িল ঝ'রি॥

শ্রীলীলা দেবী

শান্তি

আমার পয়সা কড়ির অভাব ছিল না। কিন্তু বুদ্ধির দোষে সে সবই হারাইলাম—টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সব গেল। আমি এখন একেবারে নিঃস্ব।

এখানে থাকিয়া আর ফল কি! শুধু বিড়ম্বনা বই ত নয়! একদিন নিশাশেষে বাহির হইলাম; ঠিক করিলাম, সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া দেখি, কোথাও শান্তি পাই কি না।

অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিলাম। কিন্তু শান্তি কৈ? যাহার সন্ধানে জীবনপাত করিতেছি, সে কোথায়?

তখন শীতকাল; বরফ পড়িতেছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড; পত্রহীন গাছগুলা হি হি করিয়া কাঁপিতেছিল। চারিদিকে তুষার, সমস্ত শুভ্র! আমারও শীত করিতেছিল।

তবু ভাল! দূরে আলো দেখা যাইতেছে। আলো লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম।

সম্মুখে একটা মস্ত বাড়ী। দরজার কাছে একটী ছোট ছেলে খেলা করিতেছে।

"আমি আজ এখানে থাকব, ভাই?"

বালক বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিল—বোধ হয় ভয় পাইয়াছিল। কহিল, "আমি ত জানি না; ঐ ঘরে দাদা পড়চে, তাকে জিজ্ঞেস কর।"

ঘরে ঢুকিলাম—টেবিলের উপর বাতি জ্বালাইয়া এক যুবক পাঠে নিবিষ্ট।

"মশায়——" যুবক ফিরিল।

"আজ অনুগ্রহ করে যদি আমাকে—"

"সে কথা বাবাকে বলুন গে। তিনি বারান্দায় বসে আছেন—এই দিকে" বারন্দায় গেলাম। দীর্ঘশ্মশ্রু এক বৃদ্ধ বসিয়া তামাক টানিতেছে।

"কি চান?"

"আজ রাত্তিরের মত——"

"অই ঘরে বাবা আছেন; তাঁকে বলুন, তিনিই এ বাড়ির কর্ত্তা"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, দূরে খাটের উপর এক অতি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ শয়ন করিয়া আছে; সে জীবিত কি মৃত তাহা ঠিক করিবার উপায় নাই।

"মশায়"?

অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসিল, "আজ্ঞে"?

"আমি আজ এখানে——"

"সে কথা আমাকে বলচেন কেন? বাড়ির কর্ত্তা বাবা; তাঁকে বলুন। তিনি ঐ ঘরে রয়েচেন।"

পাশের ঘরে গেলাম। শিকেয় টাঙানো একটা দোলনার উপর এক অতি বৃদ্ধ শুইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীর নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে; শরীরের চর্ম্ম লোল; নাড়া দিলে হাড় কখানা খুলিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

"মশায়, আমাকে আজ—"

বৃদ্ধ অনেক কষ্টে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পাশের ঘর দেখাইল।

পাশের ঘরে আরো বৃদ্ধ কাহাকেও দেখিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ? বৃদ্ধ কৈ? ঘরে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া এক কৃষ্ণবসনাবৃতা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী! রূপের আলোয় ঘর উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। কালো কাপড়ে তাহাকে আরো চমৎকার দেখাইতেছিল! তাহাকে যে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যে মুখ এতক্ষণ মুখর ছিল, তাহা যেন একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম—মুখে কথা ফুটিল না। আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া যুবতী কহিল,

"কি চাই তোমার?"

কি মধুর সে স্বর! স্বর্গের বীণাধ্বনিও বুঝি এত মধুর নহে! প্রাণ শান্ত হইল; বহুদিন-সঞ্চিত বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া গেল।

"ভয় পাচ্চ? তোমার কি চাই বল! আমিই সমস্ত দিই। আমার নাম মৃত্যু"।

কি চাহিব! মনের মধ্যে লক্ষ বাসনা জাগিয়া উঠিল। শেষে ভাবিলাম, যে সমস্ত দেয় তাহাকেই যদি আমি চাই, তাহা হইলেই ত আমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়! সাহস করিয়া কহিলাম,

"আমি তোমাকে চাই"।

"বেশ, নাও আমাকে"।

যুবতী সরিয়া আসিল! তাহার শীতল ওষ্ঠ আসিয়া আমার ললাটে লাগিল!

আঃ, কি শান্তি!*

শ্রীরত্নাবলী দেবী

বসন্ত-পঞ্চমী

বসন্তের বাতাসের দুরন্ত সোহাগে
লতার কুন্তলে জটা রচিবার আগে
মোহন চিকণ শোভা তুমি একবার
দেখে যাও প্রিয়তম বাসনা আমার!

আজি বন্ধু বসন্তের আসন্ন প্রভাত,
জীর্ণ পর্ণ অসহায় সহসা ঝরিয়া হায়
পাণ্ডুর করিয়া ছায় গোমুখী প্রপাত।
জানি গেল চিরতরে তবু কোন মোহভরে,
হেরি সবে রত্নাকরে চলে সাথে সাথ।

নব বসন্তের নিশি আছে কুয়াশায় মিশি
চন্দ্রালোক বাষ্পশুভ্র ছায়া সম ভাসে
ফুল্লযে মালতী লতা কে জানিত সে বারতা
গন্ধ যদি না আসিত চঞ্চল বাতাসে!

বসন্তের বনলক্ষ্মী দিয়াছে বিছায়ে
অরুণ চুনারি তার অশোকের গায়ে;
মুলয় দক্ষিণ হও, এস আজ ধীরে
লাজ বাস দোঁহাকার দিয়োনাক ছিঁড়ে!

নীল আকাশের গায়ে ফোটে শত শত
স্বর্ণতনু পুষ্পের কাহিনী,
শ্যাম বন ভূমে পিক গায় অবিরত
জগতের সাহানা রাগিনী!
আনন্দের নাহি ওর, বসন্ত ভুবনে
বাসরের আজি আয়োজন,
দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রসন্ন পবনে,
লাজ বর্ষে' বনলক্ষ্মীগণ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* পিটার ক্রিষ্টেন্ অ্যাস ব্যোর্ণসের লিখিত গল্পের অনুবাদ। ইনি নরওয়ের একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ও গল্পলেখক।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা

প্রাচীনত্বের অধিকার-সূত্রে যে নাটকটি ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের শীর্ষস্থানে সচরাচর স্থাপিত হইয়া থাকে, সেই শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকাকে আমরা এ পর্য্যন্ত এক পাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম। অন্ততঃ য়ুরোপের ইহাই সাধারণ মত যে, শূদ্রক কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শকুন্তলার পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিকা রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অন্ধসংস্কারের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। যাঁহারা ভারতীয় নাট্য ইতিহাসের ক্রমবিকাশ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিনা-বিচারে গৃহীত এই মতটি তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। যে প্রস্তাবনায় এই নাটকটি শূদ্রের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, সেই প্রস্তাবনার কথায় বড় একটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, কেননা উহার রচয়িতা-কবির মৃত্যু উহাতে বর্ণিত হইয়াছে :—"পশিলেন হুতাশনে, শত বর্ষ দশ দিন করিয়া যাপন।" এই রীতি-বিরুদ্ধতা ভাষ্যকারদিগকে পরাঙ্মুখ করা দূরে থাকুক বরং উহাতে তাঁহারা আরও আকৃষ্ট হইলেন। কেননা, এই উপলক্ষে তাঁহারা অতিসূক্ষ্ম আলোচনার পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। লালা দীক্ষিত অতি গম্ভীর ভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সূত্রধার যে শ্লোকটি পাঠ করিয়াছেন তাহাতে শূদ্রক আত্মসম্বন্ধে অতীত কালের প্রয়োগ করিয়াছেন; নিজ জন্ম-পত্রিকা দেখিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুর দিন ঠিক জানিয়াছিলেন; এবং তিনি ভাবী বংশীয় লোকদিগের নিকট তাঁহার মৃত্যু পূর্ব্বাহ্নেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। মহেশ ন্যায়রত্নের ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত যিনি য়ুরোপীদিগের আধুনিক আলোচনাদি অবগত আছেন তিনিও সম্প্রতি বঙ্গ দেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সমক্ষে এই ব্যাখ্যার পোষকতা করিয়াছেন। (Proceedings August 1887); যাহা হউক, প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে তিনি আর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজা শূদ্রকের যে অগ্নিপ্রবেশের কথা আছে তাহা একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপার সে অনুষ্ঠানের নাম, "অগ্নি সমারোপণ।" সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার সময় এই অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু এই উভয়বিধ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া, এই সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিবার অধিকার পাশ্চাত্য সমালোচকের আছে। M. Windisch যিনি মৃচ্ছকটিকার প্রাচীনত্ব মানিয়া লইয়াছেন, তিনি কিন্তু শূদ্রকের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি বাক্যগুলি একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। M. Windisch বলেন, "নাটকের বর্ণিত বিবরণ হইতেই, গ্রন্থকার সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করা হইয়াছে।"

সাহিত্যের ইতিহাসে শূদ্রকের নাম অপরিচিত হইলেও, সাহিত্যে সুপরিচিত। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শূদ্রক বহুযুগব্যাপী আখ্যানাদির নায়ক না হইলেও মধ্যবিন্দু বলা যাইতে পারে। কখন তিনি বিদিশার রাজা (কাদম্বরী), কখন শোভাবতীর রাজা



বসন্ত-ঋতু।

ম প্রেস, এলাহাবাদ।

(কথাসরিৎসাগর) কখন বর্দ্ধমানার রাজা (বেতাল-পঞ্চবিংশতি)। বহু সংগ্রহ-গ্রন্থে যে কাহিনীটীর উল্লেখ আছে (কথা সরিৎসাগর, হিতোপদেশ) সেই কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যে আসন্ন-মৃত্যু রাজা শূদ্রকের শতবর্ষ পরমায়ু স্থির রাখিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করে; "দশকুমার চরিতে" রাজা শূদ্রকের জন্মজন্মান্তরের বিবিধ অদ্ভুত কৃত্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কি দক্ষতার সহিত তিনি তাঁহার শত্রু চকোরের রাজকুমার চন্দ্রকেতুর অন্তর্ধান ঘটাইয়াছিলেন, হর্ষ চরিতে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। রাজতরঙ্গিনী, ধৈর্য্যের আদর্শ বলিয়া বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁহারও নামোল্লেখ করে। পুরাণাদিতেও তাঁহার নাম আছে; স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে, তিনি নন্দবংশের পূর্ব্বে ৩২৯০ কলি অব্দে (=খৃষ্টোত্তর ১৮৯), বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামিলা ও সোমিল এই দুই কবি একত্র মিলিয়া শূদ্রকসংক্রান্ত একটি আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ঐ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্রক নিরবচ্ছিন্ন আখ্যায়িকার বিষয় হইয়া আছেন, তাঁহার বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ নাই। পক্ষান্তরে, সর্ব্বপ্রথমে বামন-কৃত কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখ হইয়াছে। বামন, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জয়াপীড়ের রাজত্ব কালে গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। বামন নিজ গ্রন্থে, পাঠককে "শূদ্রকের রচনাবলীর" উপর বরাত দিয়াছেন। অবশ্য তিনি "মৃচ্ছকটিকা" মনে করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন, কেন না, তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃচ্ছকটিকার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বান-কবি যেখানে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড় বড় লেখকের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই হর্ষ চরিতের মুখবন্ধে শূদ্রকের নাম করেন নাই। কালিদাসও মালবিকার প্রস্তাবনায় অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাটককারের সঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শূদ্রকের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মৃচ্ছকটিকার যেরূপ রচনারীতি তাহাতে বাম ও বামন এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী কোন কালে শূদ্রককে স্থাপন করিতে কি কোন বাধা আছে? মৃচ্ছকটিকার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে সকল হেতুবাদ প্রদত্ত হইয়া থাকে, M. C. Kellner সেই সব হেতুবাদ একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন; উহার মধ্যে কতকগুলি হেতুবাদ সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত এবং অন্যগুলি সামাজিক শ্রেণীভুক্ত। একদিকে সরলতা, রচনার দুর্ব্বলতা, উপাখ্যানের প্রাচুর্য্য, কার্য্যের খণ্ডতা, কতকগুলি ভূমিকার অত্যধিক পরিপুষ্টি; অন্য দিকে, পাত্রদিগের রীতিনীতি, সমাজের অবস্থা অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অধিষ্ঠান—এই সমস্ত বিষয়, অন্যান্য নাটক হইতে ইহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে এবং নাটকের "ক্লাসিক" যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ইহার পরিচয় প্রদান করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

২। ক্ষিতীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

জিতেন্দ্রনাথের সহোদর ক্ষিতীন্দ্রনাথের নামও বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার রচিত বিবিধ বিচিত্র প্রবন্ধ মাসিক পত্রাদিতে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। ইহার সাহিত্য-সাধনাও লোক-প্রসিদ্ধ। ক্ষিতীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম গ্রন্থ, আলাপ (মূল্য পাঁচ সিকা)। আলাপে সাহিত্য, দর্শন ও সমাজ বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধ গুলি এতদিন বিবিধ মাসিক পত্রিকা-পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল; সেগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয় বাদ গ্রন্থের মুখবন্ধ" "ইউনেটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ" "রামমোহন রায়" প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর বিষয়ের প্রবন্ধ হইতে কাঠুরিয়া বিরহ প্রভৃতি কবিতা ও "হিমাচল" "নির্ঝরিণী" প্রভৃতি প্রবন্ধও এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি হইতে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সুনিপুণ যুক্তি-তর্কের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, স্বদেশ-প্রীতি ও অনুশীলনের পরিচয়ও তেমন পাইতে বিলম্ব ঘটে না। "ভারতোদ্ধার ও ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধে লেখক বঙ্গে জীবনের সাড়া পাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রীতিকে তিনি হিন্দুতার উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে পৃথক করিতে বলিয়াছেন। 'হিন্দুয়ানীর' পরিবর্ত্তে তিনি 'হিন্দুত্ব' চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তুমি আমি যে কার্য্যকে হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিব, তাহাই যে কর্ত্তব্য হইবে, তাহা নহে; মনু প্রভৃতি পুরাতন ঋষিদিগেরই আদেশ হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হইবে। ...হিন্দুত্ব ব্যতীত বঙ্গদেশের ও ভারতে মঙ্গল নাই। ...এই হিন্দুত্বের মূল কি? ইহার কেন্দ্রভূমি কি? ...মনু প্রচারিত ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুত্বের পত্তনভূমি।...যখন দেখি, পাঁচ বৎসর বয়স হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সিগারেটের ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া বীরত্ব অনুভব করে; যখন দেখি, যৌবনে পদার্পণের বহু পূর্ব্বাবধি ছাত্রগণ বাল্যের অনুপযুক্ত অসার কার্য্য সমূহে অভ্যস্ত হইয়া উঠে,; যখন দেখি, কি সম্ভ্রান্ত, কি অসম্ভ্রান্ত, অধিকাংশ যুবক বিলাতী বা দেশী মদ্যের চরণে আত্ম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন; ...তখন কি আর আমাদের জীবনের আশা ভরসার কথা বলিতে সাহস হয়।...চারিদিকে বক্তৃতা হইতেছে সংযমের মূল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার কথা কেহই বলে না।...ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাস আপনিই বিদূরিত হইবে... আপনা হইতেই মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে আসক্তি জন্মিবে।" এ কথা যে খুবই ঠিক, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্থানাভাবে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই গ্রন্থের বহু প্রবন্ধে গ্রন্থকার সুনিপুণ ইঙ্গিতে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে পথ অবলম্বন করিলে আমাদিগের মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈত থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (মূল্য বারো আনা)। এই গ্রন্থে অন্যান্য নানা বিষয়ের সহিত ব্রহ্মলোক, ধর্ম্মপথ, বিবেক ও বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, আত্মধর্ম্মের ভিত্তি, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিস্তার, উপধর্ম্ম সংকারাত্মা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায়, ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা ও স্বাধীন মত-প্রকাশের নির্ভীকতা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র (মূল্য আট আনা) এখানি রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গল্প-কথা নহে, ইহাতে গ্রন্থকার হরিশ্চন্দ্র-কথার মূল আলোচনা করিয়া বিবিধ পুরাণ-শাস্ত্রের সাহায্যে এ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; বিবিধ পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা অভিনব ও সুচিন্তিত হইয়াছে—পাণ্ডিত্যেও পরিপূর্ণ। অসাধারণ মনীষার বলে লেখক সাহিত্যে এক নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীভগবৎ কথা (মূল্য আট আনা) বালক-বালিকাগণকে ভগবানের বিষয়ে খুব সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ লিখিত। এমন গুরু বিষয় এমন সহজ কথায় বুঝাইতে পারা সাধারণ শক্তির কথা নহে—গ্রন্থকার সেই অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাই তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও সরল যুক্তি-তর্কে ভগবৎ কথা উজ্জ্বল ভাবে বিবৃত হইয়াছে। শুধু বালক-বালিকা নহে, আপামরসাধারণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন!

আঁখিজল। (মূল্য আট আনা) এখানি কাব্য-গ্রন্থ। ৫৬টি খণ্ড কবিতা ও গান এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতা গুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে গভীর, বিশাল বিপুল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

সকল গ্রন্থগুলিই ভালো কাগজে পরিষ্কার ছাপা, বাঁধাই চমৎকার এবং সকল গুলিই সাহিত্য-অনুরাগী পাঠকের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। শ্রীসঃ

৩। কর্ম্ম-কথা; চরিত-কথা।*

কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ প্রণীত দুইখানি পুস্তক আমরা উপহার পাইয়াছি; একখানি "চরিত-কথা"; অপরখানি "কর্ম্ম-কথা"। এই দুইখানি পুস্তকে গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে রামেন্দ্র বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার মন যেন একটী সুন্দর উপবন। এ উপবনে নানাবিধ ফুল ফুটে। ফুলগুলি অতি মনোরম। কিন্তু ফুলগুলি

* কর্ম্ম-কথা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা।
চরিত-কথা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

এতদিন চারিদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল। আজ ফুলগুলিকে মালায় গাঁথিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তার ফল কতকগুলি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব অধিকাংশ স্থলে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল এবং সেই তত্ত্বগুলি সহজভাবে ব্যক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর লেখনী-মুখে সেই অতি জটিল তত্ত্বও সহজ, সরস ও সুবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

"চরিত-কথায়" বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হেলম্ হোলৎজ, মোক্ষমূলর প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির বহু চরিত-কথা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর চরিত-কথায় একটা বিশেষত্ব আছে। ইহাতে উপাখ্যান নাই; বাহ্য জীবনের বাহ্য কাহিনী নাই। ইহাতে আছে, অন্তঃ-প্রকৃতির কথা, ইহাতে আছে সুনিপুণ মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ। ইহাতে কাহার চরিত্র কি ধাতুতে গড়া, কাহার চরিত্র কি বিশেষত্বের পরিচয় দেয়, তাহার বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও "বাঁকানল আর টেষ্ট টিউব হাতে দিয়া নানা জাতি কিম্ভূত কিমাকার দ্রব্যের বিশ্লেষণ" রামেন্দ্র বাবু সাধারণতঃ করিয়া থাকেন, তথাপি মানব চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি যে শিক্ষা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

"কর্ম্ম-কথায়" গ্রন্থকার কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি হইতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের একাধারে পরিচয় পাওয়া যায়।

যদিও প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এগুলি একই সূত্রে বাঁধা। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মনি জিজী বিষেৎ শতং সমাঃ" এই বাক্যকে গ্রন্থকার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলিকে দাঁড় করাইয়াছেন। কর্ম্ম-পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই, অধিকারও নাই, ইহাই গ্রন্থকারের মুখ্য বক্তব্য।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি যেমন কোন কোন সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি,—জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের বিনাশ, সেইরূপ অন্য সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের মূল। জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়া, জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিলেই—সেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে, এই বিশ্বাসে কতক মনুষ্য বহু যুগ ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। জ্ঞানের পন্থা পরিহার করিয়া দুঃখ-নাশের উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্ব জাতির মধ্যে এই বাক্য স্বীকৃত হয় নাই। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে দুঃখের ধ্বংস হয়, এই মত আবার একটা বৃহৎ সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু জ্ঞান হইতেই এই সুখ-দুঃখময় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তির সহিত দুঃখের উৎপত্তি ও সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের দুঃখভোগ

লোপ করিতে গেলে সুখের ভাগ আপনা হইতেই লোপ পাইয়া যায়, এবং সুখভাগ লোপ করিতে গেলে দুঃখের ভাগও লোপ পায়, এবং সুখ-দুঃখ লোপ করিতে গেলে সুখ-দুঃখময় জগতেরও আর অস্তিত্ব থাকে না।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের পরিবর্ত্তে, দুঃখকে দূর করিয়া তাহার স্থানে সুখের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। সুতরাং মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ হইতে মুক্তি নহে, উহা সুখ হইতেও মুক্তি; ভ্রান্তির পাশ হইতে মুক্তি, জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। ভারতবর্ষে এককালে এইরূপ মুক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল, গ্রন্থকারের "মুক্তির পথ" নামক প্রবন্ধে এই কথাই প্রকটিত হইয়াছে।

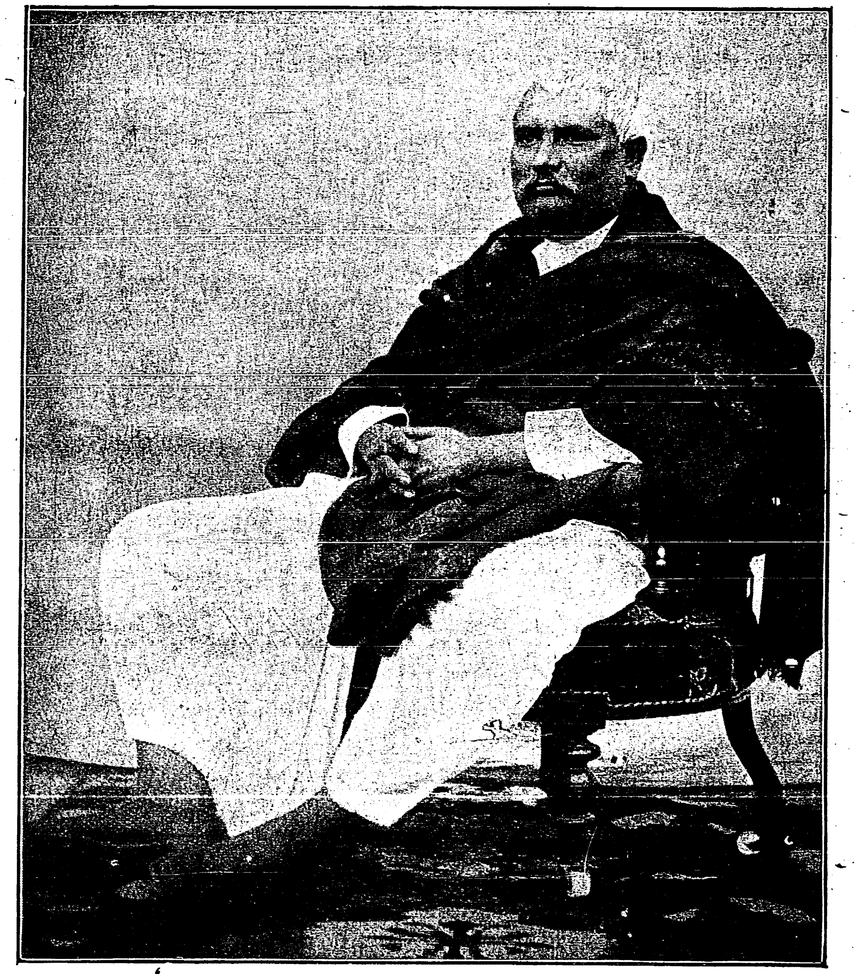

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

জীবন যাতনা-সঙ্কুল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। যে কারণেই হউক, তুমি মানব সমাজ হইতে দূরে রহিতে চাহিতেছ, কিন্তু মানব সমাজ তোমাকে চাহে। তুমি যদি মনুষ্য জাতিকে ফাঁকি দিতে চাও, সেও তোমাকে নিগ্রহ করিতে ছাড়িবে না। সমাজের ভিতর বাস করিয়া তাহার নিগ্রহ ও অত্যাচার সহ্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজ সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য নহে; এখানে স্বার্থের সহিত স্বার্থের বিরোধ। তোমার আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধ। মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া, মনুষ্যকে জীবন-হীন লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতে এক রকমের মুক্তিলাভ না ঘটিতে পারে এমন নহে; কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। অতএব আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মাচরণ কর; ফল কামনা করিও না; কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। গ্রন্থকার "বৈরাগ্য" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

সমস্ত বাহ্য জগৎটা আমারই ভিতর, আমারই এক অংশ। সমগ্র বাহ্য জগৎটা আমার অনুভূতি ও আমার অনুভূতিই সমগ্র বাহ্য জগৎ। তুমি আমার কল্পিত, তুমি আমার সৃষ্ট, তুমি আমার অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়োগে আমি তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; আমি ছাড়া আর একজন আছে মানিয়া লই। তোমাতে আমাতে এক ও অভিন্ন, অথচ তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র। মূলে বিরোধ। তুমি আমার, অথচ তুমি আমার নহ। তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন; এবং যদ্দ্বারা সেই সম্বন্ধ স্থাপন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। এই কথা "জীবন ও ধর্ম্ম" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

স্বার্থ সাধন ব্যক্তি-জীবন রক্ষার উপযোগী; পরার্থ-সাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক। যেখানে সমাজ বাধে নাই; সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, পর-তন্ত্রতার লেশ নাই। সমাজের আঁটা আঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরাধীনতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়; "স্বার্থ ও পরার্থ" প্রবন্ধে এই তথ্যের সম্যক আলোচনা হইয়াছে।

মনুষ্যত্বের বিকাশ আবশ্যক। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি আবশ্যক, সামাজিকত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক। যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম; তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। এই কথা "ধর্ম্ম প্রবৃত্তি" প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সামাজিক আচারগুলি বর্ত্তমান কালে যতই অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক হউক না কেন, এককালে হয়ত উহারা অর্থযুক্ত ও অত্যাবশ্যক ছিল। তবে একালে সে অর্থও নাই, সে প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আমরা এই সকল কৃত্রিম আচার পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমাজ হইতে এই সকল কৃত্রিম আচার উড়াইয়া দিলে, স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে,

আরাম বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের শোভা হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে এই মর্ম্ম "আচার" প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

"জীবের আভ্যন্তরীন শক্তি ক্রমাগত বহিঃস্থ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। জড় চারিদিক হইতে জীবকে আক্রমণ করিয়া জড়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; জীব জড়ের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সেই তুমুল সমরে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।"

এই সংগ্রামে যাহা জীবের জীবনের অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা মনুষ্যের সমাজ-জীবনের অনুকূল, তাহাই মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম। কিন্তু মনুষ্যের সমাজ-জীবনের অনুকূল কি, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রকৃতি মনুষ্যকে কোন সংস্কার দেয় নাই। পশু-জীবন মুখ্যতঃ সংস্কার দ্বারা চালিত; জীবন রক্ষার নিতান্ত আবশ্যক কতিপয় জৈব ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে মনুষ্য-জীবন মুখ্যতঃ প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক চালিত। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হৃদিস্থিত অন্তর্য্যামীর পরিতোষ মনুষ্যের সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রমাণ। "ধর্ম্মের প্রমাণ" প্রবন্ধে এই কথার বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

ব্যক্তি-বিশেষকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা দিতে সমাজ অত্যন্ত কাতর। ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমাজ-দ্রোহেরই প্রকার-ভেদ বলিয়া গৃহীত হয়। মনুষ্যকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে। সমাজের আদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও তাহা মানিতে হইবে। সামাজিক জীব জীবনের অধীন। প্রচলিত ধর্ম্মে তোমার আস্থা না থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দাও। না দিলে তুমি সমাজ-চ্যুত হইবে, সমাজের হস্তে তোমাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। সমাজ নিজের জীবন রাখিতে চাহে। তাহার স্বার্থ ও তোমার স্বার্থ সর্ব্বত্র এক নহে। মানুষ আপনা হইতে ছয়টা রিপুকে বশ করিতে চাহে না বা পারে না। সমাজ শক্তি রাষ্ট্র-শাসনের বা ধর্ম্ম-শাসনের মূর্ত্তি ধরিয়া রিপুকয়টার শাসনে প্রবৃত্ত হয়। মানব প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল নীতির শাসনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। এইজন্য রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন আবশ্যক। যেখানে রাজশাসন পরাভূত, সেখানেও ধর্ম্মশাসন বিমুখ হয় না। এই হিসাবে ধর্ম্মশাসনের উপযোগিতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কঠোরতা বুঝা যায়। "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রবন্ধে এই কথা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

প্রকৃতির পীড়নে মনুষ্য মাত্রই চিরদিন পীড়িত। প্রকৃতি সরল ও মনুষ্য দুর্ব্বল। দুর্ব্বল মনুষ্য বোধ হয় সমাজ-সংস্থিতির প্রারম্ভ হইতে সরলা প্রকৃতিকে নানা উপায়ে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই কথা "প্রকৃতি পূজা" প্রবন্ধে প্রকটিত হইয়াছে।

অভিব্যক্তির সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিয়া যখন সমাজবদ্ধ মনুষ্য ক্রমশঃ উচ্চতর পদবীতে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ তাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ হয়।

মনুষ্য সমাজবদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্মের অস্তিত্ব। ভূমণ্ডলে মানুষ একজন মাত্র থাকিলে তাহার

ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিত কি না, তাহা সংশয়ের স্থল। পশুর মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই। যাহা লোককে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জয় হাতে হাতে ঘটে না। ধর্ম্মের পথ কণ্টকে আকীর্ণ। কিন্তু যথা ধর্ম্ম তথা জয় হয় কি না এই বাক্য "ধর্ম্মের জয়" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

আমি আছি—ইহা আমার পক্ষে অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। আর এই যে আমার কল্পিত জগৎ, উহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক মাত্র। আমি উহাকে সৃষ্টি করিয়া আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি ও উহার সহিত আমার একটা কাল্পনিক সম্পর্ক পাতাইয়াছি। আমা ছাড়া আর কোন বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই—অহং ব্রহ্মাস্মি নাপরঃ। এই জগদ্ব্যাপার আমার কামনামাত্র, আমার ইচ্ছা মাত্র, আমার লীলা মাত্র। এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক।

জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছে, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল। ত্যাগাত্মক কর্ম্মই ধর্ম্ম; জীবের অন্যথা গতি নাই, "যজ্ঞ" নামক এই বিষয়ের প্রবন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে পরার্থ কর্ম্ম করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ডারুইন-পন্থীরা কিরূপে হিতবাদের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট আমি পরের জন্য কেন ত্যাগ স্বীকার করিব, এ কথার চরম উত্তর পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

চেরি-পুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্ব্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রং গোলাপী ঊষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছ ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছ ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রত্নভেরি!

মর্ম্মর-কঠিন-শুভ্র তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙ্গীন আলোক,
পূর্ব্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে ঊমার মুখ শিব দরশনে॥

হিমালয়। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভারতে শিক্ষাবিস্তার

(Progress of Education in India 2 vols. 1907-1912)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত অভিনন্দন-গ্রহণ-কালে ভারত-সম্রাট বলিয়াছিলেন, "সারা দেশে স্কুল-কলেজ জালের মত বিছাইয়া পড়ুক। সেই সকল স্কুল-কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইবে, তাহারা রাজভক্ত পুরুষ, ও সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ হইবে, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেই তাহারা প্রভূত উন্নতি-সাধন করিতে সক্ষম হইবে। আরও আমার ইচ্ছা হয়, জ্ঞানের আলোকে আমার ভারতীয় প্রজাবর্গের গৃহ উজ্জ্বল, পরিশ্রম মধুর হোক; তখন তাহার ফলে উচ্চ চিন্তা, আরাম ও স্বাস্থ্য তাহাদিগের আয়ত্ত হইবে। শুধু শিক্ষার দ্বারাই আমার এ অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। ভারতে শিক্ষা-বিস্তার-চিন্তাই আমার হৃদয়ে চিরদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিরাজ করিবে।" সম্রাটের অভিলাষ-অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রভূত আয়োজন করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরে (১লা এপ্রিল ১৯০৭ হইতে ৩১ মার্চ্চ ১৯১২) শিক্ষা কতখানি বিস্তার লাভ করিয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য শার্প সাহেব বিস্তর পরিশ্রমে তাহার সুবৃহৎ বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিবরণী নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। অঙ্কের প্রাচুর্য্য থাকিলেও রচনা-ভঙ্গীটি এমনই চিত্তাকর্ষক ও সুশৃঙ্খল যে সম্পূর্ণ অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এই বিবরণীখানি অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবেন। বিবরণীর মুখবন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবাদি সঙ্কলিত হইয়াছে; ইহা হইতে শিক্ষা-ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ও কার্য্য রীতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে খাস তহবিল হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ভারতে কি পরিমাণ শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, এই বিবরণী গ্রন্থে তাহারই বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণী-পাঠে জানা যায় ভারতে দশ লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক পরিমাণ প্রদেশে পঁচিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে ঐ অংশ শিক্ষা-গণ্ডীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াছে।

এই বিবরণী দুইখানির আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে, ভারতের স্কুল-সমূহে ছাত্র সংখ্যা-বৃদ্ধি। ১৯০৭ সালে ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল, ৫৩, ৮৮, ৬৩২; ১৯১২ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ৬৭,৮০, ৭২১ হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বকার তুলনায় শতকরা ১৭,৭ বাড়িয়াছে। ছাত্র-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে, ব্রহ্মদেশে (শতকরা ৩,৭ হিসাবে); তৎপরে যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রদেশ-সমূহের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে,—বোম্বাই (শতকরা ৩,৪);

মান্দ্রাজ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম (শতকরা ৩,১); বঙ্গদেশ (শতকরা ২,৯)। যুক্ত প্রদেশে অল্পই বাড়িয়াছে (শতকরা ১,৬ হিসাবে)। পূর্ব্বে শিক্ষা-ব্যাপারে যে স্থলে ৫৫৯০৩৬৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই স্থলে ব্যয় হইয়াছে, ৭৮১৯২৬০৫ টাকা। সকলেই যে এখন শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহারও সূচনা দেখা যায়। স্কুল-কলেজের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য দেশের লোকের মনও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৮০৬০ জন মাত্র। ১৯০২ হইতে ১৯০৭ সালের মধ্যে উক্ত সংখ্যা এক হাজার মাত্র বাড়িয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে (১৯০৭ হইতে ১৯১২) কলেজ সমূহের ছাত্র সংখ্যা ১৮০০১ হইতে ২৮৯৬য়ে উঠিয়াছে, অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার বাড়িয়া গিয়াছে। যুক্ত বঙ্গ ও আসামেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে। কলেজ সমূহের ছাত্রীর সংখ্যা ২৭৯; তন্মধ্যে বঙ্গে ৮১ জন ও বোম্বাইয়ে ৭৬; বাকী অন্যান্য প্রদেশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজের কলেজগুলিই—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তবে মান্দ্রাজে পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল-কলেজের সংখ্যা অধিক। বঙ্গদেশে স্কুলভে শিক্ষাদানের জন্য যে কয়টি প্রাইভেট্ কলেজ আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন, সিটি, রিপন, সেণ্ট াল ও বঙ্গবাসী কলেজই উল্লেখ-যোগ্য। বঙ্গদেশের মফঃসলস্থ প্রাইভেট কলেজগুলির অবস্থা এ গুলির তুলনায় তেমন নহে। পূর্ব্ব বঙ্গীয় প্রাইভেট কলেজ গুলির অবস্থা শোচনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার কলেজে Residential System-এর প্রচলন-কল্পে আশাপ্রদ আয়োজন চলিতেছে।

ছাত্রগণের সহবৎ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে আছে, ভারতীয় ছাত্রগণের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে কিছুকাল পূর্ব্বে ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রান্ত ধারণায় বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শার্প সাহেব বলিয়াছেন, "দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহার এখনও অন্ত হয় নাই। বঙ্গদেশে কয়েকজন শিক্ষকের দায়িত্বহীনতা ও রাজদ্রোহ-প্রচারের অপরাধের কথা ও হুগলি কলেজের জনৈক প্রোফেসরের উক্ত দোষে বিতাড়িত হওয়ার বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজসাহী কলেজ ও মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজেও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই। শার্প সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন, ছাত্রগণের সহবৎ ভাল না হইলে বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য প্রচুর লাবোরেটরির সৃষ্টি করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইবে না। শিক্ষার মূলে চরিত্র গঠন। সেই চরিত্র যাহার সুগঠিত না হইল, বৃথাই তাহার জন্য লাইব্রেরী বা লাবোরেটরির সৃষ্টি! কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ইহাতেও আমরা নিরাশ হইব না। তুলনায় মন্দ ছাত্রের সংখ্যা

নিতান্তই নগণ্য। এবং এমনও আমাদের আশা আছে, বিপথগামী ছাত্রগণ অতঃপর ভ্রান্ত ও অমঙ্গলকর ধারণা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য পথে আপনাপন দৃষ্টি রাখিতে অবহেলা করিবে না! তাহাদিগের উপরই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে—সমাজের প্রতি দায়িত্বও তাহাদিগের সামান্য নয়—এইটুকু বুঝিয়া সকল প্রকার পাপ ও অশুভ চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সাধনে তাহারা তৎপর হইবে, দেশের ও দেশের মঙ্গল-সাধনে সবলে সক্ষম হইবে, নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিখা-বৃদ্ধি শুধু সাগরতীরে বালুকার ঘর রচার মতই নিরর্থক।

এই বিবরণীখানি আর একটা সুমহান আশার আশ্বাস বহন করিয়া আনিয়াছে। বিবরণী-পাঠে জানা যায় স্কুল-কলেজ-সমূহে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যাও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ জ্ঞানে বুদ্ধিতে হিন্দুর সমতুল। তাঁহারা ঔদাস্য ও অবহেলা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। নীচ জাতীয়গণের মধ্যেও শিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছে। অসভ্য আদিম অধিবাসীগণের মধ্যেও শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সাঁওতাল, গণ্ড প্রভৃতি জাতিসমূহ মিশনরীগণের চেষ্টায় স্বীয় মাতৃভাষার সহিত অপর ভাষাদিতেও শিক্ষা-লাভ করিতেছে।

ইহার মধ্যে দুঃখের কথা এইটুকু যে শিল্প কৃষি প্রভৃতি বিষয় শিখিবার জন্য এখনও আশানুরূপ চেষ্টা দেখা যায় নাই। বিদেশীয় ভাষা শিখিয়া কোন মতে চাকুরি করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়-সন্ধানেই অধিকাংশ ছাত্র ব্যস্ত। ফলে উচ্চ উপাধি-লাভের যোগ্য শক্তি যাহার নাই, তাহারা অল্প-কিছু শিখিয়াই বাধা পাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি ক্রয় করিতেছে মাত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে উন্নতির বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০২৯৪৭ হইতে ১১০৬৯২তে এবং ছাত্র-সংখ্যা ৩৬৩০৬৬৮ হইতে ৪৫২ ৩৬৪৮তে উঠিয়াছে; শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও যথেষ্ট সুলভ।

এই বিবরণী-গ্রন্থ আগাগোড়া বিস্তর তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিলাম মাত্র। যাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের অনুরাগী, তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তারকল্পে অর্থদানে মুক্তহস্ত হইয়াছেন, দেশের সুসন্তানগণও এ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় অগ্রসর,—দেশের সর্ব্বত্র সুপবন বহিতে সুরু করিয়াছে—সকলের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষার আলোকে সমস্ত দেশ ভরিয়া উঠুক—অজ্ঞানের অন্ধকার সমূলে ধ্বংস হৌক্। উন্নতির ইহাই একমাত্র উপায়—এই পথই প্রকৃষ্ট পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

পাটলিপুত্র

(খননের বিস্তৃত বিবরণ ১৯১২—১৯১৩)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা খননের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়াছি এবং প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি যে চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা দৃষ্টে, এবং ডাক্তার ওয়াডেল, ও ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের কার্য্যাবলী কতকাংশে অনুসরণ করিয়া ডাক্তার স্পুনার গত বৎসর কার্য্যারম্ভ করেন। ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার মার্সাল পাটলিপুত্রে আগমন করেন এবং ডাক্তার স্পুনারের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমড়াহার ও বুলন্দিবাগ নামক দুইটী স্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ করিতে উপদেশ দেন। কুমড়াহারের সন্নিকটেই ডাক্তার ওয়াডেল একটী অশোকস্তম্ভের কতকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুলন্দিবাগ কুমড়াহারেরই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ডাক্তার ওয়াডেল অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শীর্ষদেশের চিত্র ১৩২০ সনের ফাল্গুনের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুমড়াহারে যে অনেকগুলি দর্শনীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রস্তর-স্তম্ভের যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞগণের মতে সেগুলি একটী বহু প্রাচীন হলেরই স্তম্ভ। ডাক্তার ওয়াডেল মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ গুলি পর্য্যটক-প্রবর হিউয়েন-সিয়াং কথিত নিলিস্তম্ভের অংশবিশেষ। কিন্তু, পরিশেষে এতগুলি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেল, যে ওয়াডেলের অনুমান যে সত্য নহে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইল। প্রথমতঃ সমান-দূরে অবস্থিত তিনটী স্থানে কয়েকখানি করিয়া প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টে ও পরে সেইরূপ দূরত্বে—১৫ ফিট অনুযায়ী স্থান খনন করিয়া বহু প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টে সহজেই অনুভূত হইল যে, ঐ সকল খণ্ডগুলি কোন একটী বৃহৎ হলের স্তম্ভসমূহের নিদর্শন—১টী কি ২টী স্তম্ভের নিদর্শন নহে। ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ তারিখে এই ঘটনা ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে ঠিক পঞ্চদশ ফীট অন্তর অন্তর খনন করিয়া ৮ শ্রেণীতে ১০টী করিয়া মোট ৮০টী স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু, ডাক্তার স্পুনার অনুমান করেন যে, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি স্তম্ভের নিদর্শন মৃত্তিকা গর্ভে রহিয়াছে। যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, হলটী সুবৃহৎ ও সুন্দর ছিল। আশা করা যায় যে, হলের সম্পূর্ণাংশ দেখিতে পাইলে প্রাচীন ভারতীয় স্থপতি বিদ্যাসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

এই হল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ডাক্তার স্পুনার নিম্নলিখিতরূপ অনুমান করেন :—

খৃষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, অশোক বর্ত্তমান কুমড়াহার নামক স্থানে প্রায় একশতটী স্তম্ভসুশোভিত একটী বৃহৎ গৃহ

নির্ম্মাণ করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই হল বা গৃহ রাজচক্রবর্ত্তীর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন ছিল অথবা তাহারই অন্তর্ভূত ছিল। এই স্তম্ভগুলির নিম্নদেশ ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চে ইহারা অন্ততঃ ২০ ফিটের কম নহে। এই সকল স্তম্ভগুলির যে কাষ্ঠমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রতিকৃতি এই স্থানে প্রদত্ত হইল। যতদূর বোধগম্য হইতেছে তাহাতে এই স্তম্ভগুলির স্থান পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। পূর্ব্বপশ্চিমে পঞ্চদশ ফিটের ব্যবধান রাখিয়া তাহাদিগকে স্থাপিত করা হইয়াছিল। পার্সিপোলিসে যে শতস্তম্ভ হলের চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কুমড়াহারের এই হলের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন যে পার্সিপোলিস ও কুমড়াহাড়ের দুইটী হলের কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে। এই স্তম্ভগুলির ঊর্দ্ধদেশে সুবৃহৎ শালকাষ্ঠের গাঁথুনি (Superstructure)



কাষ্ঠমঞ্চ

ছিল এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, এই স্তম্ভগুলির উপরে কোন প্রকার কারুকার্য্য-খচিত শীর্ষদেশ (Capital) ছিল না। যাহাতে স্তম্ভ ও উর্দ্ধস্থ কাষ্ঠগুলি স্থানচ্যুত না হয়, তজ্জন্য ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড বা অর্গল ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ গুলি খুব সম্ভব তাম্রনির্ম্মিত ছিল। শাল কাষ্ঠগুলিকে একটী অপরের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সুবৃহৎ কীলক সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্তম্ভমূল ও গৃহতল কাষ্ঠের ছিল এবং বর্ত্তমান কালের মৃত্তিকার সপ্তদশ ফিট নিম্নে অবস্থিত ছিল।

এই গৃহ যে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহাতে যে বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বহু মূর্ত্তি ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ইহা দেখিতে কিরূপ ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

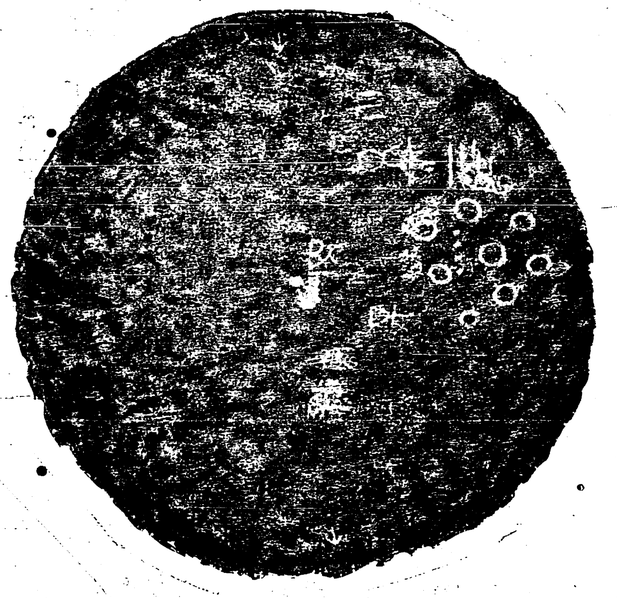

স্তম্ভের নিম্নদেশ

সম্ভবতঃ, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই স্থান ও গৃহ জলপ্লাবিত হয় এবং এই প্লাবনে গৃহতল ৮।৯ ফিট কর্দ্দম ও বালুকায় আবৃত হয়। সম্পূর্ণ কর্দ্দমা ত হইবার পূর্ব্বে একটি স্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়। সে স্তম্ভটীর চিত্র আমরা পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি এবং স্তম্ভের তলদেশের চিত্র এই স্থানে প্রদত্ত হইল। প্লাবনে অন্যান্য স্তম্ভগুলির ক্ষতি হয় নাই। তাহারা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াই ছিল। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিবার পরে হল অগ্নিদগ্ধ হয়। অগ্নিতে স্তম্ভের উপরস্থ কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া ভস্ম স্তরে পরিণত হয়। যে সকল তাম্রকীলকের সাহায্যে কাষ্ঠগুলি প্রস্তরস্তম্ভের সহিত গ্রথিত ছিল, সেই সকল কীলকগুলি অগ্নিতাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভগুলি, চূরমার হইয়া যায়। সেইজন্য স্তম্ভগুলির উর্দ্ধাংশ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, নিম্নাংশগুলি সেরূপ হয় নাই। উর্দ্ধাংশের সহিতই কাষ্ঠখণ্ডগুলি কীলক সহযোগে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার স্পুনারের মতে স্তম্ভের নিম্নাংশ মৃত্তিকা-স্তরাভ্যন্তরে থাকায় অগ্নির পরেও কয়েকটি দণ্ডায়মান ছিল এবং অন্যান্য গুলিকে উত্তোলন-

পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়।" (These projecting stumps evidently interfered with the further utilization of the site, and as this was almost immediately desired, the stmups appear to have been broken off by the next comers and the ground levelled for further use) তৎপরে, এইস্থানে গুপ্তরাজগণের সময়ে ইষ্টকের গৃহ নির্ম্মিত হয় কিন্তু এই শেষোক্ত গৃহ নির্ম্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হয় নাই।

গুপ্তরাজগণের সময়ে এই যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্তম্ভের নিম্নস্থ কাষ্ঠমঞ্চগুলি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল। এদিকে বহুদিন পূর্ব্বে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল, তাহাতে কাষ্ঠমঞ্চের নিম্নস্থ ভূমিও নরম হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যে কয়েকটি স্তম্ভ মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকার জন্য দণ্ডায়মানাবস্থায় ছিল, তাহারা অনেক পরিমাণে আশ্রয়হীন হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আরও গভীর মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সকল স্তম্ভের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকাগর্ভে বৃত্তাকার গর্ত্ত হইতে থাকে এবং উর্দ্ধস্থ প্রস্তরখণ্ড ও ভস্ম এই সকল গর্ত্তগুলি পূর্ণ করে। স্তম্ভের অধোগতির সঙ্গে গুপ্তরাজগণের সময়কার ইষ্টক-গৃহেরও অধোগতি হইতে থাকে। তৎপরে, অনেকদিন আর এস্থানে কোন গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা শালকাষ্ঠের মঞ্চগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এই মঞ্চগুলি উচ্চে ৩০´×৬´×৪½´। শাল কাষ্ঠগুলি প্রায় ৩০ ফিট দীর্ঘ। আমরা ইহার আলোকচিত্র প্রদান করিলাম। এই প্রকার সাতটী মঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, এই বৎসরের খননে আরও মঞ্চ আবিষ্কৃত হইতে পারে। আলোকচিত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে এগুলি বর্ত্তমানেও সুন্দর অবস্থায় আছে। এগুলি কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করা যায় না, তবে বোধ হয় যে, সুবৃহৎ কয়েকটি স্তম্ভ ইহাদের উপরে স্থাপিত করিবার জন্য এই মঞ্চগুলি নির্ম্মিত হয়। এগুলি কুড়ি ফিট নীচে অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এগুলি ঘাট নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ কাষ্ঠমঞ্চগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব।

যে একটী স্তম্ভের চিত্র আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রদান করিয়াছি, তাহা ১৪ ফিট ৩ ইঞ্চি। ইহার উর্দ্ধের অংশ পাওয়া যায় নাই। আমরা ইহার তলদেশের চিত্র প্রদান করিলাম। নিম্নদেশে কতকগুলি চিহ্ন আছে। পার্শি-পোলিসে প্রাপ্ত একটী স্তম্ভের নিম্নদেশেও কতকটা এইপ্রকার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনীয় দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি ত্রিরত্ন পাওয়া গিয়াছে—ইহার নিম্নদেশে ধর্ম্মচক্র রহিয়াছে। ভ, দ এবং ড উৎকীর্ণ একখানি প্রস্তরের ক্ষুদ্র খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির বক্ষস্থলের অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহা "মথুরা প্রস্তরে" নির্ম্মিত। এ মূর্ত্তিটী যে সুবৃহৎ ছিল তাহা এই ক্ষুদ্রাংশ হইতেই অনুমান করা যায়। একটি বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকও পাওয়া গিয়াছে।

আরও, কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে—সংখ্যায় ৬৯টী। ইন্দ্রমিত্রের একটী মুদ্রা ও কণিষ্কের দুইটী তাম্র মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫—৪১৩) একটী মুদ্রাও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

অষ্টাদশটী মোহর (Seal) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অষ্টাদশফীট মৃত্তিকাগর্ভে ত্রিশূল চিহ্নিত একটি মোহর প্রদর্শনীয়। গোপাল নামক একজনের একটি মোহর পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত মোহর সুঙ্গরাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল—চিহ্নদৃষ্টে তাহাই প্রতীয়মান হয়।

যে স্থানে কাষ্ঠমঞ্চ রহিয়াছে সেই মঞ্চ সন্নিকটস্থ একটী গর্ত্তে কয়েকটী অটুট মৃত্তিকা-পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এগুলি কি করিয়া এত গভীর মৃত্তিকাগর্ভে অক্ষতাবস্থায় রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। অথচ, এ সম্বন্ধে কোন অনুমানই বর্ত্তমানক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

পাটলিপুত্র খননের স্থলে উপস্থিত হইলে একটি কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, অশোকের প্রাসাদাদি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল—কেননা উহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত ছিল। আজ একজন ইংরাজও সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন "When one considers the difficulty of getting out these large columns from small pits with all our modern day appliances, it makes one wonder how the stones were brought to the place from several hundred miles away and erected over 2000 years ago." অর্থাৎ নানাবিধ যন্ত্রাদি দ্বারা এই সকল স্তম্ভগুলির সামান্য স্থান পরিবর্ত্তন করিতে আজও যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বহুদূর হইতে এই সকল স্তম্ভ যে কি প্রকারে আনীত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

১৯১৩ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রথম কার্য্যারম্ভ হয় এবং গত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৫,০০০ মনস্বী তাতার তহবিল হইতে প্রদত্ত ও বাকী ৪০০০ গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। চম্পারণে দুইটী স্তম্ভ স্থানান্তরিতাদি করিতে ১০,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে; সুতরাং সে হিসাবে অল্প-ব্যয়েই গত বৎসরের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে। সেজন্য যে সুযোগ্য ডাক্তার স্পুনার ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ ধন্যবাদার্হ, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বেদদ্যৌঃ

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের অন্যতর প্রমাণ)

'দ্যৌঃ' বেদের অতীব প্রাচীন দেবতা; এত প্রাচীন যে ইহাকে বেদের আদি দেবতাই বলা যায়। কারণ 'দ্যৌষ্পিতা' নামে বেদে ইহাঁর উল্লেখ রহিয়াছে। আর্য্যদিগের পাশ্চাত্য শাখার ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রধান প্রধান দেবতার নামে দ্যৌঃ শব্দের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আর্য্যদিগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাখার একত্র বাসের সময়ই যে দ্যৌঃ দেবতার কল্পনা হয় তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এংগ্লো সেক্সন্-দিগের Tiu, জার্ম্মেণদিগের Zio, গ্রীক্‌দিগের Zeus, এবং লাটিনদিগের Jovis, নামে আমার দ্যৌঃর পরিষ্কার রূপান্তরই লক্ষ্য করিতে পারি। লাটিনদিগের Jupiter নামটী দ্যৌষ্পিতা' বা 'দ্যৌষ্পিতর' শব্দেরই সাক্ষাৎ অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই দ্যৌঃদেবতার মূল ধারণা যে আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বেদালোচনায় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। দিব্ শব্দটীও দ্যৌঃ শব্দেরই ন্যায় আকাশবাচী। দিব্ ও দ্যৌঃ * উভয় শব্দই দ্যোতনার্থক দিব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে উজ্জ্বল আকাশেরই নাম যে দ্যৌঃ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। রমেশ বাবু এ সম্বন্ধে তদীয় "Civilisation of India" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Dyu or Dyaus is the name of the sky that shines, and is the most ancient name for the divine power among the Aryan nations. Civilisation of India, Temple Primer Series) p. 9. "দ্যু বাদ্যৌঃ দীপ্তি-শীল আকাশের নাম এবং ইহা আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে দিব্যশক্তির প্রাচীনতম নাম।

দিবাতে সূর্য্যালোক ও রাত্রিতে চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত আকাশকেই আর্য্যগণ প্রথম "দ্যৌঃ" দেবতারূপে পূজা করিতেন। যেমন দ্যৌঃ বা আকাশ দ্যুতিমান্ বলিয়া দেবতা, তেমনই চন্দ্র সূর্য্যাদিও দ্যুতিমান্ বলিয়া দেবতা। আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন যে চন্দ্রসূর্য্যাদি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহাতেই তাঁহারা আকাশরূপী 'দ্যৌকে 'দ্যৌষ্পিতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়া সমস্ত দেবতার পিতারূপে কল্পনা করিলেন।

"দ্যৌঃ দেবতার পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাধান্য কিন্তু বহুকাল স্থায়ী হয় নাই,—শীঘ্রই আমরা সেই প্রাধান্য ইন্দ্রের দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাই। আমরা নিম্নে দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে—

প্রতিষ্ঠাবা পৃথিবী জভ্র উর্ব্বী নাস্যতে মহিমাং পরিষ্টঃ। ৮
অস্যেদেব প্রররিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্তরিক্ষাৎ॥
স্বরালি দম আদ্রো বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়।৯
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৬১ সূক্ত।

"ইন্দ্র বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়া-

* "From Sanscrit div or dyu. to shine, meaning 'the bright' or the shining one," The Teaching of the Vedas by M. Phillips p 31.

ছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করিতে পারিবে না।" ৮

"ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক ও ভূলোক ও অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও অধিক। তিনি নিজ আবাসে স্বকীয় তেজে বিরাজ করেন, সকল কার্য্যে সমর্থ হয়েন। তাঁহার শ সুযোগ্য" তিনি যুদ্ধ গমনে নিপুণ এবং (মেঘরূপ শত্রু-দিগকে) যুদ্ধে আহ্বান করেন।৯

ইন্দ্রের দ্বারা দ্যৌঃ স্থানচ্যুত হওয়া সম্বন্ধে রমেশবাবু তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন "ইন্দ্র যেরূপ "দ্যু"কে পদচ্যুত করিয়াছেন সেইরূপ বরুণকেও পদচ্যুত করিয়াছেন।" ঋগ্বেদানুবাদ ৫ পৃঃ।

ইন্দ্র যে স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারা দ্যৌকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে দ্যৌঃ যে আকাশের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ছিলেন তৎস্থলে ইন্দ্র-দেবতা হইলেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইহার মধ্যে যে গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে আমাদিগকে তাহাই উদ্ধার করিতে হইবে।

রমেশবাবু তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে সেই ঐতিহাসিক সত্যের যে সন্ধান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—আমরা প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে "ইন্দ্র" বলিয়া নূতন নাম দিলেন সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আকাশের পুরাতন দেব"দ্যুর" তত গৌরব রহিল না। ইহার কারণ কতক অনুভব করা যায়৭ আর্য্যদিগের প্রথম বাসস্থান মধ্য আসিয়াতে আকাশের গৌরব অধিক। ভারতবর্ষে নদীর জল; ভূমির উর্ব্বরতা ধান্য ও খাদ্যদ্রব্য, মনুষ্যের সুখ ও জীবন সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। "দ্যু" আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশদেব, "ইন্দ্র" হিন্দুদিগের নূতন আকাশদেব, সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ৪পৃঃ।

আর্য্যগণ পরিষ্কার আকাশের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমে যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রাজ্যে উপনীত হইলেন এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশের উপযোগিতা আপনাদের জীবন ধারণের পক্ষে অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন তেমনই পরিষ্কার আকাশ-দেবতা 'দ্যৌ'র পরিবর্ত্তে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-দেবতা ইন্দ্রকে আপনাদের অভীষ্ট দেবতার পদে বরিত করিলেন। এইরূপেই 'দ্যৌ' অপেক্ষা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইন্দ্রের মাহাত্ম্য "দ্যৌ' অপেক্ষা অধিক হইলেও 'দ্যৌঃ' ইন্দ্রের পিতা বলিয়াই সম্মানিত হইতে লাগিলেন যথা—

"সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্ত্তা স্বপস্তমোভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্য্যং সুবজ্রমপচ্যুতং সদসো ন ভূম ॥৪
ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ১৭ সূক্ত।

"অতিশয়, স্তুত্য, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট স্বর্গ হইতে অনপ-চ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে যিনি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের জনয়িতা "দ্যু" আপনাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত শোভনকর্ম্মা হইয়াছিলেন।"

রমেশবাবুর অনুবাদ।

এক্ষণে দেবরূপে দ্যৌর প্রভাব খর্ব্ব হইলেও আকাশরূপে দ্যৌর প্রভাব খর্ব্ব না হইয়া বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইল। কারণ 'দ্যৌঃ' দেবতারূপে পরিদৃষ্ট না হইলেও দেবস্থানরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল; দ্যৌঃ কেবল আকাশ রহিল না—ইহা স্বর্গে পরিণত হইল।

তাহাতেই অভিধানে স্বর্গপর্য্যায় নামের মধ্যে আমরা 'দ্যৌ, (দ্যু), ও 'দিব্' শব্দ অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই কিন্তু আকাশ অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই না—যথা অমরকোষে—

"স্বরব্যয়ং স্বর্গনাক-ত্রিদিব-ত্রিদশালয়াঃ।
সুরলোকো দ্যোদিবৌদ্বে স্ত্রিয়াং ক্লীবে ত্রিবিষ্টপম্ ॥"

উল্লিখিত পর্য্যায়ের 'দ্যৌ' (দ্যু) শব্দই 'দ্যৌঃ' রূপের মূল।

পক্ষান্তরে আকাশ পর্য্যায় শব্দের মধ্যেও 'দ্যৌ' (দ্যু) ও দিব্ শব্দ প্রথমেই পরিগণিত হইয়া আকাশের সহিত যে পূর্ব্বযোগের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহার প্রমাণও অমরকোষ হইতেই পাওয়া যায় যথা—

"দ্যোদিবৌদ্বে স্ত্রিয়ামভ্রং (ক্লীং) ব্যোমপুষ্কর মম্বরম্।
নভোঽন্তরীক্ষং গগনমনন্তং সুরবর্ত্ম খম্।
বিয়দ্বিষ্ণুপদংবাতু পুংস্যাকাশবিহায়সী ॥

উপরে আকাশের পর্য্যায় যে সকল শব্দ পাওয়া গিয়াছে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তন্মধ্যে কয়েকটী শব্দই মেঘাচ্ছন্ন বা অনুজ্জ্বল অর্থ প্রকাশক। 'দ্যৌ' (দ্যু) ও 'দিব্' ও শব্দের পর সর্ব্বাগ্রে যে অভ্র (অভ্র) শব্দ আওয়া যায় তাহারই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন—কারণ 'অভ্র' শব্দটী অপ্ অব্দ পূর্ব্বক ভৃ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে—তাহাতে ইহার অর্থ 'অপঃ বিভর্ত্তি' (অপ্ জল অর্থাৎ মেঘ-বাষ্প ধারণ করে ইহা) এই হয়। পুষ্কর শব্দটী আকাশ অর্থ অপেক্ষা জল ও মেঘ অর্থেই অধিক প্রচলিত। 'নভঃ' শব্দটী 'ন' ও 'ভা' এই দুই শব্দ যোগেই উৎপন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ইহার অর্থ 'নভাতি' অর্থাৎ অনুজ্জ্বল হয়। এই অনুজ্জ্বল অর্থ গ্রহণ করিলেই 'মেঘ,' 'শ্রাবণ', 'বর্ষা প্রভৃতি ইহার নিম্নোদ্ধৃত আভিধানিক বিবিধার্থ আকাশের অনুজ্জ্বল অর্থের সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া সহজেই বোধগম্য হয়;—

"নভো ব্যোম্নি নভা মেঘে শ্রাবণেচ পতদ্গ্রাহে।
ঘ্রাণে মৃণাল সূত্রেচ বর্ষাসুচ নভাঃ স্মৃতাঃ ॥"

আকাশ নামটী পর্য্যন্তও আমরা অনুজ্জ্বল অর্থেরই প্রকাশ বলিয়া মনে করি। আকাশ শব্দটী সাধারণতঃ 'আ সমন্তাৎ কাশতে প্রকাশতে' এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু 'আ শব্দের অর্থ ঈষৎ' বা 'অসম্যক্' ও যে না হইতে পারে তাহা নহে। 'আভাস' শব্দে আমরা ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই।

উপরিউক্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম কিরূপে আর্য্যদিগের আদি নিবাসের 'দ্যৌঃ'রূপ পরিষ্কার আকাশের ধারণাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদের শেষাধিবাসের 'অভ্র' বা 'নভঃ'রূপ মেঘাচ্ছন্ন অনুজ্জ্বল আকাশের ধারণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

'দ্যৌঃ' শব্দটীকে যে আমরা স্বর্গরূপ অর্থ-গৌরব লাভ করিতে উপরে দেখিয়াছি—তাহাতে 'দ্যৌঃ' রমেশ বাবুর অনুমিত মধ্য আসিয়ার আকাশ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পরন্তু ইহা উত্তর আসিয়া বা উত্তর কুরুর আকাশ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ ভারতীয় আর্য্যগণ পুরাণাদিতে স্বর্গের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহা হইতে স্বর্গ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মনে যেরূপ সাধারণ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে—তৎসমস্তেরই উত্তর কুরুর সহিত যেরূপ সামঞ্জস্য হয়—অপর কোনও স্থানের সহিত তদ্রূপ সামঞ্জস্য

হয় না। প্রকৃতিবাদ অভিধানে উত্তর কুরুর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"ইহা দেবতাগণের প্রিয় নিবাসভূমি।"

উত্তর কুরুতে উত্তরায়ণের ছয় মাস দিন থাকায় এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি থাকায় আমাদের এক বৎসরে যে উত্তর কুরুবাসিদিগের একদিন রাত্রি (অহোরাত্র) হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। দেবতাদিগের দিনরাত্রি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আমাদের শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় তাহা উত্তর কুরুবাসিগণের দিন রাত্রির সম্পূর্ণই অনুরূপ। আমরা এস্থলে অমরকোষ হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রঃ। বর্ষেণ দৈবতঃ॥"

ইহার উপর ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র ভানুজি এইরূপ টীকা করিয়াছেন "নৃণাং মাসেন পিতৃণাময়ং লৌত্রোহ হোরাত্রঃ তত্র শুক্লপক্ষোদিনং কৃষ্ণপক্ষোরাত্রিঃ। নৃণাং বর্ষেণ দেবতানাময়ং দৈবতোঽহোরাত্রঃ তত্রোত্তরায়ণং দিনং। দক্ষিণায়নং রাত্রিঃ।

ইহার অর্থ এই "মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকের (পৈত্র) এক দিনরাত্রি হয়। তাহাতে শুক্লপক্ষ দিবাভাগ ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি ভাগ। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের (দৈবত) এক দিনরাত্রি হয়—তাহার উত্তরায়ণই দিবা ও দক্ষিণায়ণই রাত্রি।"

ধ্রুব-লোক স্বর্গের উচ্চতম লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। যে ধ্রুব-নক্ষত্রের নামে এই লোকের নাম হইয়াছে তাহা উত্তরকুরুরই সন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র। পাশ্চাত্য ভাষায় 'ধ্রুব' নক্ষত্রের যে 'Polestar' নাম পাওয়া যায় তাহাতেই ইহা যে মেরু-নক্ষত্র তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যে সমস্ত যুক্তিমূলে দেবগণ উত্তর কুরুবাসী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন—সেই সমস্ত যুক্তিমূলেই দ্যৌঃ উত্তরকুরুর উজ্জ্বল আকাশ বলিয়াও প্রমাণিত হইতেছে—কারণ বেদে দ্যৌঃ দেবগণের পিতা ও 'জনিতা' বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবগণের পিতা ও জনিতা হইতে দ্যৌঃ স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের বাসস্থান স্বর্গরূপে কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয় আর্য্যগণ উত্তরকুরু হইতে সুদূর ভারতবর্ষে আগমন করিলে পর—সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ইহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন ইহা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অপরূপ স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—তখনই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", এই স্বতঃসিদ্ধ মানসিক ভাববলে ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আদি নিবাস উত্তরকুরুবর্ষের স্বর্গরূপে কল্পনা সম্ভবপর হইয়াছিল! এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি কিরূপে এক 'দ্যৌঃ' শব্দের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যদিগের স্মরণাতীত কালের আদিবৃত্ত সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষয়রূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অপ্রস্তুত

(মার্ক টোয়েন হইতে)

আমি ও বন্ধুবর হ্যারিস তখন সুইজারলাণ্ডে। গ্রীষ্মে যাঁহারা সুইজারলাণ্ড ভ্রমণে আসেন তাঁহাদের অর্দ্ধেকই ইংরেজ—বাকীর মধ্যে বেশীর ভাগই জর্ম্মান ও আমেরিকান।—

হোটেলের টেবিলের চারিদিকে ঘিরিয়া যখন নানা প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া নানাদেশীয় লোক আহারে বসিতেন, আমি ও হ্যারিস্ তখন অনুমানে স্থির করিতে চেষ্টা করিতাম তাহাদের মধ্যে কে কোন জাতি, কাহার কি নাম,—বয়স কত ইত্যাদি। অনেক ব্যক্তির জাতি কি তাহা সময় সময় স্থির করিতে পারিলেও—নাম ঠিক করাটা বড় সহজ হইত না। একদিন আমি ও হ্যারিস্ নিম্নলিখিত রূপ আলোচনা করিতেছিলাম—

আমি। "ওঁরা দেখিতেছি আমেরিকান।"

হ্যারিস্। "তা যেন স্বীকার করা গেল। কিন্তু তাঁরা আমেরিকার কোন ষ্টেটের তা যদি বল্‌তে পার তবে ত বুঝি।"

আমি একটা ষ্টেটের নাম করিলাম—হ্যারিস্ বলিল অন্য একটা। কিছুতেই মীমাংসা হয় না। তবে একটা বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত হইলাম।—ওঁদের সঙ্গের যুবতীটী অপরূপ সুন্দরী, এবং তাহার পোষাক সুরুচির পরিচায়ক।—কিন্তু সুন্দরীর বয়স লইয়া আমাদের মধ্যে পুনরায় অনৈক্য হইল। আমি বলিলাম যুবতীর বয়স ১৬ পার হয় নাই,—হ্যারিস্ বলিল বিশেষ কম হইতেই পারে না। কিছুক্ষণ কলহের পর আমি গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, এবিষয়ে মীমাংসার একটী উপায় আছে। আমি যাই যুবতীকেই জিজ্ঞাসা করে আসি।"

হ্যারিস্ বিদ্রূপের ভান করিয়া বলিল—"অবিশ্যি; সেই ত ঠিক কথা। যাওনা—জিজ্ঞাসা করে এস। বলো, আমি আমেরিকা হতে এসেছি। তা'হলেই তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে এখন। কোন চিন্তা নেই।"

আমি বলিলাম—"আমি একটা কথার কথা বলছিলাম মাত্র; যাবই যে তা ভেবে কথাটা বলিনি। কিন্তু তুমি দেখ্‌ছি জাননা, আমি মোটে ভীরু প্রকৃতির লোক নই। ভ্রমণে বেড়িয়েছে এমন কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমার কোনও ভয় হয় না! এই যাই আমি।"

আলাপ আরম্ভ করিবার একটা সহজ উপায়ও মনে মনে স্থির করিলাম। আমি গিয়া রমণীকে বেশ ভদ্রতার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিব—তিনি আমার পরিচিতা মনে করে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি যদি ভুল করে থাকি—তবে যেন ক্ষমা করেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রমণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটীকে নমস্কার জানাইয়া—যুবতীর দিকে ফিরিয়া কথা

আরম্ভ করিব এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"আমি জান্‌তাম আমার ভুল হয়নি। জন্‌কে আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে দেখিয়ে, যে এ তুমি ছাড়া অন্য কেউ না। জন্ বলিল—বোধহয় তুমি নও। কিন্তু আমার কখনও ভুল হয় না—বিশেষতঃ তোমাকে। আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয় তুমিও আমায় চিন্‌তে পেরে আমার কাছে আস্‌বে। বোস বোস, কি আশ্চর্য্য তোমাকে যে এখানে দেখ্‌তে পাব—তা আমি ভাবতেই পারিনি।"

আমি ত অবাক্। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। যাহা হউক—আমরা তখন বেশ পরিচিতভাবে পরস্পরের হাত চাপিয়া ধরিলাম। এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি মনে মনে বড়ই অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলাম। অস্পষ্ট ভাবে মনে হইল কোথায় যেন রমণীকে দেখিয়াছি—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলাম, এবং তাঁর নামই বা কি—তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়া রমণীর সঙ্গে আলাপ সুরু করি। নতুবা অন্য প্রকার প্রসঙ্গে যদি বাহির হইয়া পড়ে—যে আমি তাঁকে চিনিতে পারি নাই শুধু চিনিবার ভান করিতেছি মাত্র তবে বড়ই লজ্জায় পড়িব। কিন্তু আমার ভাবা মাত্রই সার। যুবতী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"কি ভীষণই ছিল সেই রাত্রিটা ভাই। যেদিন আমাদের সামনের নৌকা-গুলি একটা একটা করিয়া ঢেউয়ের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল?—তোমার সে রাত্রির কথা মনে আছে ত?"—

আমি বলিলাম "মনে নাই?" যদিও এর বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

"আর মেরির কান্না? ভয় পেয়ে কি কান্নাটাই না সুরু করলে সে।"

আমি বলিলাম "হাঁ, বেশ মনে আছে।"

হায়! কোন কথাই মনে ত আসিল না। আমি যে তাঁকে চিনিতে পারি নাই প্রথমেই সে কথা খুলিয়া বলিলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। তাহা হইলে এরূপ বিপদে পড়িতাম না। কিন্তু এত কথার পর কি করিয়াই বা এখন বলি—যে, তাঁকে আমি চিনিতে পারি নাই! ফল হইল এই, আমি ক্রমেই গভীর ভাবে, এই অজ্ঞাত অভিনয়ের জালে আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিলাম। কোনও প্রকারে আলাপের স্রোত অন্যমুখী হউক এই কথাই আমি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রার্থনা করিতেছিলাম—কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট—রমণী ক্রমেই জাল প্রসারিত করিয়া ধরিতেছিলেন।

"তুমি কি শোন নি, শেষে জর্জ্জের সঙ্গেই মেরির বিয়ে হয়েছে?"

"না, তাত শুনিনি। জর্জ্জই তাঁকে বিয়ে করলে নাকি?"

"হাঁ, সেই বিয়ে করেছে। সে বলে, তাতে মেরির পিতার যত দোষ, মেরির বা তার কিছুই দোষ ছিল না। আমার মনে হয় জর্জ্জের কথাই ঠিক। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

"নিশ্চয়! জর্জ্জই ঠিক। আমি ত আগা-গোড়াই তাই বলে আস্‌ছি।"

"কই, তুমি ত এতদিন তা স্বীকার কর নি, অন্ততঃ গত গ্রীষ্মে ত তোমার অন্যরূপ মত ছিল।"

"ও, না না। তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ধারণা আগে অন্যরূপই ছিল। কিন্তু গত শীতকালে আমি আমার পূর্ব্বের ভুল বুঝতে পেরেছি।"

"যাক্। বাস্তবিক ঘটনা এমনি ঘুরে দাঁড়াল যে মেরির যে কোনও দোষ নেই তা স্পষ্ট ভাবেই বেরিয়ে পড়্‌লো। সমস্ত দোষই তার পিতার। অন্ততঃ তার পিতার ও বৃদ্ধ ডার্লির।"

"আমি বরাবরই ডার্লিকে একটী ভয়ানক জিনিস্ জেনে আস্‌ছি।" এ সম্বন্ধে একটা কিছু ত বলা চাই।

"তাই সে ছিল। ওদের সকলেই কিন্তু সেটাকে খুব স্নেহ করতো। তোমার হয় ত মনে আছে ওর ন্যাকামর কথা? যখনই একটু শীত পড়্‌ত ওটা অমনিই এসে একেবারে মেরিদের বস্‌বার ঘরে ঢুকতো।"

বেশী দূর অগ্রসর হইতে আমার রীতিমত ভয় হইতেছিল। ডার্লি তা'হলে কোন মানুষের নাম নয়। অন্য কোন প্রাণীর! হয় ত একটা কুকুর বা হাতিও হতে পারে। যাহোক সকল জন্তুরই ত লেজ আছে এই ভেবে আমি বলিলাম—

"কি লেজটাই না বেরিয়েছিল ওর!"

"একটা? তার শত শত লেজ ছিল বল!"

আমি ত অবাক। বুঝিতেই পারিলাম না এর পর কি বলা সঙ্গত হইবে তাই কেবল বলিলাম—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?"

"কি বিশ্রীই ছিল, এই নিগ্রোটার স্বভাব। এত দুর্গুণের আধার যে তার শত শত লেজ ছিল বল্‌তে হবে বই কি।"

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে ছিল! আমি কায়মনে প্রার্থনা করিতেছিলাম আমার এই বিপদ হইতে রক্ষার একটা উপায় হউক। রমণী কি তাহার মন্তব্যের উত্তরে আমার নিকট হইতে কোনও বাক্য প্রত্যাশা করিতেছেন? যদি তাই হয় তবে আমাদের রহস্য অভিনয়ের এই খানেই যবনিকা পতন। শত শত লাঙ্গুলধারী, নিগ্রোর বিষয় আলোচনা সোজা কথা নয়। নিগ্রোদের বিষয় ভালরূপ জ্ঞান না থাকিলে তাদের নিয়ে সমালোচনা করা কোনও ভদ্র লোকেরই কর্ম্ম নয়। আগপাছ্ না ভাবিয়া এ বিষয় কিছু বলিয়া ফেলিলে তার—

সৌভাগ্য ক্রমে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রমণী বলিলেন—"নিগ্রোটার থাকবার ঘরটা বেশ ভালই ছিল এক রকম। কিন্তু তার এমনি স্বভাব খারাপ ছিল যে, দিনটা একটু মেঘাচ্ছন্ন হলেই অমনি সে তার ঘর ছেড়ে একেবারে মেরিদের সামনে এসে উপস্থিত হতো। কিছুতেই তাকে আট্‌কিয়ে রাখা যেত না। কিন্তু তাঁরা সকলেই ওর এরূপ অত্যাচার সহ্য করতেন কারণ একবার ডার্লি মেরীর জীবন রক্ষা করেছিল? টমের কথা মনে আছে তোমার?"

"হাঁ বেশ মনে আছে। বেশ স্বভাবটী ছিল তার।

"সে বেশ ভাল লোকই ছিল। আর কি সুন্দর সন্তানটী তার জন্মেছিল।"

"তা তুমি বেশই বল্‌তে পার। এর চেয়ে সুন্দর শিশু আমি কখনও দেখিনি।"

"শিশুটীকে কোলে নিয়ে আদর করতে, নাচাতে, আমার এমন আমোদ বোধ হত।"

"আমিও তাকে খুব ভালবাসতাম।"

"তুমি ত তার নামকরণ করেছিলে? কি নামটা রেখেছিলে?"

আমার বোধ হইতে লাগিল যেন জমাট বরফ ক্রমেই তরল হইয়া আসিতেছে। শিশুটী ছেলে না মেয়ে তা না জানিয়া কি করিয়া বা একটা কল্পিত নাম বলি। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে এমন একটা নাম মনে পড়িল যাহা ছেলে মেয়ে উভয়ের নামেই চলিতে পারে। তাই বলিলাম।

"আমি ওর নাম রেখেছিলাম, "Frances।"

"কোনও আত্মীয়ের নাম অনুসারে বোধ হয়। আচ্ছা, যে শিশুটী মরে গেছে ওর নামও ত তুমিই রেখেছিলে। ওটীকে আমি দেখিনি। ওর কি নাম স্থির করেছিলে?"

এইরে! এখন কি বলা যায়! আমার বিদ্যায় উভয়লিঙ্গে প্রযুজ্য নামের জ্ঞান ত আর নাই! যাহা হউক, ভাবিলাম যখন শিশুটী ইহলোকে আর নাই তখন একটা কোনও নাম ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারি। বরাতজোরে যদি বাঁচিয়াই চাই। এই ভাবিয়া বলিলাম—

"আমি সে ছেলেটীর নাম রাখিয়াছিলাম থমাস হেনরি।"

রমণী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "তাইত তাই বা কি করে হয়!"

আমি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলাম। কপাল বহিয়া শীতল ঘাম পড়িতে লাগিল। কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। তবুও যদি রমণী অন্য কোনও শিশুর নাম দাবী না করেন তবেই রক্ষা! এর পর কোথায় যে আসিয়া বজ্রাঘাত পড়িবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। রমণী তখনও সেই শিশুটীর সম্বন্ধেই মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সে কথা না তুলিয়া তিনি বলিলেন—

"তুমি সে সময় সেখানে ছিলে না, না হলে তোমাকে দিয়েই আমার ছেলেরও নামকরণ করাইতাম!"

"তোমার ছেলে? সে কি? তুমি কি বিবাহিত?

"সে তের বৎসরের কথা। এই যে ছেলেটি দেখছ ও আমারই সন্তান। আমার বয়সও ত কম হয় নি! ঝড়ের কথা যে বলছিলাম সেই দিন আমার জন্মদিন ছিল; তখনই আমার বয়স উনিশ হয়েছিল।"

রমণীর বয়স কত তাও ইহাতে ঠিক বুঝা গেল না। কবে যে ঝড় হইয়াছিল তাহাই আমি জানিতাম না। একবার ভাবিলাম বলি "তুমি কিন্তু এতদিনে একটুও বদলাও নি।" কিন্তু কে জানে হয়ত বা অনেক বদ্‌লেছেন। আবার ভাবিলাম বলি, "আগের চেয়ে অনেকটা ভাল হয়েছ তুমি!" কিন্তু তাই বা নিঃসন্দেহে কি করিয়া বলা চলে। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় রমণী বলিলেন,—

"সেই সব কথা মনে হলে কতই না আনন্দ হয়। আজ সেই পুরান দিনের কথায় কত সুখ পাওয়া গেল। কেমন তোমার সে কথা আলোচনা করতে বেশ আনন্দ বোধ হচ্ছে না?"

"আজ আধঘণ্টার আলাপ প্রসঙ্গে যত আনন্দ উপভোগ করেছি সারা জীবনে এমন করিনি।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা কি? যাহা হউক ইহার পর রমণীকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইব ভাবিতেছি এমন সময় তিনি বলিলেন—কিন্তু একটা বিষয় নিয়া আমি বড়ই গোলে পড়েছি!"

"কেন কোন বিষয়?"

"সেই মৃত শিশুটীর নাম নিয়ে। কি নাম বলেছিলে তার?"

এইবার আবার এক মহা বিপদে পড়িলাম শিশুটীর নাম যে কি বলিয়াছিলাম তাহাই মনে নাই। নামটার যে আবার দরকার হইবে এ কথাত ত তখন মনে হয় নাই।—উপায়? যা হোক যা আছে অদৃষ্টে,—রমণীওত নামটা ভুলিয়া গিয়া থাকিতে পারেন, এই ভরসায় ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলাম—

"জোসেফ্ উইলিয়াম।"

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ছেলেটী আমায় সংশোধন করিয়া দিল।

"জোসেফ্ উইলিয়াম নয় হেন্‌রি থমাস" আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—

"ওঃ, ঠিক। আমি অন্য একটী ছেলের কথা ভেবে ও নামটা বলেছিলাম। অনেক ছেলেমেয়েরই নাম রেখেছি কি না, তাই কেমন একটা গোল বেধে যায়। ঠিক ঠিক ও ছেলেটীর নাম রেখেছিলাম হেন্‌রি থমপসন্।

"থমাস হেনরি।"

ছেলেটী আবার সংশোধন করিয়া দিল। পুনরায় তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম—

"থমাস হেন্‌রি; তাই থমাস হেন্‌রিই বটে। ওই নামই রেখেছিলাম তার। থমাসটা মনে আসে—এই—এই—থমাস কারলাইলের কথা ভেবে। থমাস্ কারলাইল—এই যে বিখ্যাত সাহিত্যিক। আর হেনরিটা বাথি-ই—ই—টম হেনরির নামে। ছেলের বাপ মা নামটা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।—"

"এতেই ত আমি আরও গণ্ডগোলে পড়েছি।—"

"কেন কেন?"—

"ওর বাপ মা যখনই ওর কথা বলেন তখনই সুসেন এমিলা নামে অভিহিত করে থাকেন।—"

যাঃ, এইবার আমার সমস্ত জারিজুরি ধরা পড়িয়া গেল। ইহার পর আর আমার কিছুই বলিবার রহিল না। যতই ভাবিতে লাগিলাম লজ্জায় যেন পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম। রমণী আমার যন্ত্রণা অনুভব করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সেই সুখের দিনের আলাপে কি আমোদই না পেয়েছি আজ। তুমি প্রথমেই এরূপ ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগ্‌লে যে অচিরেই বুঝ্‌লাম তুমি আমাকে চিন্‌তে পার নাই, শুধু ভান করছিলে। ভাবিলাম এর শাস্তিটা তোমাকে দিতে হচ্ছে। সে শাস্তি তুমি কড়ায় গণ্ডায় পেয়েছ। তুমি যে জর্জ্জ, টম, ডার্লি এদের চিন্‌তে পেরেছ তাতেও খুব আমোদ বোধ করেছি। কেননা ওদের নাম আমিও জন্মে শুনিনি। আর শিশুদের কল্পিত নাম গুলির কথাও আমি ভুলতে পারব না। কেউ যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্ন করে যায় তবে তোমার কাছ

থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ বের করে নিতে পারে দেখ্‌ছি। মেরি ও জর্জ্জের কথা আর ঢেউয়ে নৌকাগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কথা সত্য, বাকী সমস্ত তৈরি গল্প। মেরি আমার ছোট বোন তার পূরা নাম মেরি——কেমন এখন চিন্‌তে পারছো আমায়?"

"হ্যাঁ এখন তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। তোমার হৃদয় তের বৎসর আগে যেমন কঠিন ছিল এখনও দেখ্‌ছি তার একটুও বদ্‌লায়নি। তা হলে কি এমন ভাবে আমায় শাস্তি দিতে পারতে। তোমার স্বভাবও যেমন বদ্‌লায়নি তোমার শরীরও তেমনি আগের মতই রয়েছে। তখন যৌবনে তোমাকে যেরূপ সুন্দর ও কমনীয় দেখাত—এখনও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে আর তোমার এই সুকুমার ছেলেটীও তোমার কমনীয়তা পেয়েছে। যাক্ যদি আমাদের অদ্ভুত প্রহসনের কথা তুমি একটুও মনে রেখে থাক তবে চল এই বেলা শাস্তির নিশান উড়িয়ে দেওয়া যাক। আমি স্বীকারে করছি আমারই সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে।—"

তখন আমরা পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া হাসিমুখে বিদায় লইলাম।

রমণী আমাকে ভাল করিয়াই জব্দ করিয়াছিলেন তাই আমি এর ষোল আনা ঝাল হ্যারিসের উপরে ঝাড়িতে চলিলাম।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

বসন্ত বায়ুর প্রতি

১

বসন্তের ওগো সমীরণ —
সিন্ধু আর সিকতার নব জাগরণ,
অরণ্যে জাগালে আজি গাহিবারে গান,
মোরে মুক্তি দাও বন্ধু, সুপ্তি চাহে প্রাণ,
তটিনীর উরস শিহরে
তোমার সুগন্ধে ভরা নিশ্বাসের ভরে,
প্রতি উৎস কল স্বরে স্বাগত জানায়,
তরল কেতন দোলে পল্লবের প্রায়!

২

সমাহিত অদৃশ্য কুসুমে
স্পর্শ কর নাই তুমি স্বপ্নে কিম্বা ঘুমে,
জাগ্রত চঞ্চল করে নব জন্ম দিয়ে,——
অশ্রান্ত সুরভি ধারা দিতেছ ঢালিয়ে!
কমল করিছে আবাহন
চম্পক সুরভিধূপে ছাইল গগন,
রুদ্ধ শুধু থাক বন্ধু, হৃদয় আমার,
নিবারি সকল ব্যথা নব চেতনার!

৩

মরণের স্মরণ আধার
মর্ম্মর বেদিকা কভু জাগেনাক আর,
তোমার ও আগমনে মলয় পরশে,
সেথায় জাগেনা ফুল নূতন হরষে!
কোকিলের আকুল কাকলি—
ব্যর্থ চিরদিন যেথা নিদ্রিত সকলি,
সেই বেদিকার মত আজিকে পরাণ!
রোদন বিলাপ নাই, নাই কলগান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

অজন্তা—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধে যে ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত চিত্র-শিল্পের শেষ দীপাবলী যেখানে আজও বিচিত্র ছটা বিস্তার করিতেছে—বৌদ্ধ যুগের সেই অজন্তা গিরি-গুহার আর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রখর এই নব্য বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর—পথের ব্যবধান কালের ব্যবধান, সভ্যতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান; সুতরাং অজন্তার চিত্র-শিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়া বোঝাও প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমান্ নন্দলাল ও অসিতকুমার প্রমুখ বাঙ্গালার তরুণ শিল্পিগণ অজন্তার তীর্থমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই তীর্থ যাত্রারই ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয় ত প্রাচীন ভারতের নির্ব্বাপিতপ্রায় সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে—যে প্রদীপের শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয় নয়নের পীড়াও দেয় না।"

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। লেখকের অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সরল ভাষা মুক্ত প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে, সেই প্রবাহে আমরাও যেন আমাদিগের মনের তরীখানি ভাসাইয়া চলিয়াছি। সে তরী কোথাও আবর্ত্তে না পড়িয়া, অস্পষ্টতর জঙ্গলে বাধা না পাইয়া বজনাদী উচ্ছ্বাসের পাহাড়ে ঘা না খাইয়া দিব্য লঘু গতিতেই ছুটিয়া চলিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্য-মন্দিরের তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অজানা স্বপ্নলোকের মাধুরী-দৃশ্যে মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়! গ্রন্থকার বহু স্থানেই ভাষাকে যেন কথা কহাইয়াছেন,—গ্রন্থের বহু ছত্রে ভাবের ফুল বিচিত্র বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনার জন্যটীতে এতটুকু মুরুব্বিয়ানা বা পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই; তাহা আগাগোড়া শান্ত সংযত শ্রীতে সমুজ্জ্বল। চিত্র-শিল্পকলায় গ্রন্থকারের প্রতিভা বসন্তের ফুলের মতই সুন্দররূপে বিকশিত হইতেছে। রচনা-কার্য্যেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় গ্রন্থখানির সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে! গ্রন্থকারের ভাষা প্রকৃতই আর্টিষ্টের ভাষা, কবির ভাষা,—ভাবুকের ভাষা। সে ভাষার মধ্য দিয়া একখানি নির্ভীক, মুক্ত ও শক্তি নির্ভর চিত্তের আভাস পাইতে বিলম্ব ঘটে না। গ্রন্থকারের শক্তির বিশেষত্বের কথা ইঙ্গিতে বলিলাম গ্রন্থের মধ্যে কি আছে পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন। সংক্ষেপে আমরা এইটুকু শুধু বলিয়া দিতেছি যে এই গ্রন্থ চিত্র-সাহিত্য-বিভাগে অমূল্য সামগ্রী। ইহা একাধারে প্রাচ্য কলাচিত্রের ব্যাখ্যা-পুস্তক ও সুললিত ভ্রমণ-কাহিনী এবং ভারতের গৌরবময় অতীতের এক কীর্ত্তির ইতিহাস! উপন্যাস অপেক্ষা এ গ্রন্থ অধিক চিত্তাকর্ষক। দর্শনীয় যাহা-কিছু সে সমস্তই বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে লেখা বলিয়া মনে হয় না—মনে হয়, যেন চোখের সম্মুখে সে সমস্ত বিচিত্র বর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। গ্রন্থে অজন্ত গুহায় খোদিত উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। যাঁহার প্রাচ্য চিত্র-কলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, প্রাচ্য চিত্রকলার বিশেষত্ব নির্ণয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে উপকৃত হইবেন, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই।

পরাগ—শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশ গুপ্ত, বি, এ, প্রণীত। কলিকাতা ১৩২০। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। মাসিক-পত্রের পাঠকের নিকট সুকবি গঙ্গাচরণ বাবুর নাম অপরিচিত নহে। এই গ্রন্থে ৪১টি খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাব গম্ভীর, ভাষায় বলময়ী প্রকৃতির বেশ ছাপ পড়িয়াছে। কবির বীণায় বহু স্থলে উচ্চ সুরই ধ্বনিয়া উঠিয়াছে,

কোথাও এতটুকু চটুলতা নাই। গ্রন্থের মূল্য কত, তাহা কোথাও লিখিত দেখিলাম না।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত। ঢাকা নয়াবাজার হইতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ভাওয়াল, কাশীমপুর তালিপাবাদ, চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার * * অধিকাংশ স্থানই এখন মনুষ্য-বসতিশূন্য এবং শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বনাকীর্ণ। কিন্তু ইহার অন্তরালে বহু শতাব্দীর প্রাচীন কীর্ত্তি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। হিউয়েন সাংয়ের বর্ণিত সমতট এবং কামরূপ রাজ্যের বহু বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ এই অরণ্যানীতেই বর্ত্তমান আছে, এইরূপ অনুমিত হয়; এবং এমন কি এই প্রদেশে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌড়ের পালরাজবংশের অধঃপতনের সময় তদ্‌বংশীয় কোন কোন নৃপতি জলবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত পূর্ব্ববঙ্গের এই অংশে আগমন করিয়া কতিপয় খণ্ড-রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ এবং নগরাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এই প্রদেশের বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ যুগের এই নিদর্শন দেশের ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ, সন্দেহ নাই।" এবং এই জন্যই তিনি এই গুপ্ত রত্ন উদ্ধারকল্পে সকলকে যত্ন লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাওয়ালের প্রাচীনত্বের আলোচনান্তে পালরাজগণের বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। বিষয়টি পরিপূর্ণ ভাবে আলোচিত হয় নাই—লেখক প্রবন্ধের মত সংক্ষেপেই দুই-চারিটি মাত্র কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; তবে যেটুকু তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইলেও, ঐতিহাসিকের নিকট তাহার মূল্য সামান্য নহে। আশা করি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার ভাওয়াল প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের সম্পূর্ণকাহিনী সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত করিয়া আপনার শ্রম সার্থক ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবেন।

কমলকুমার—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

সচিত্র আরব-ইতিবৃত্ত—হাফিজল হাসান প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মহমুদল হোসেন দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থখানি সুলিখিত; লেখকের ভাষা সরল, আড়ম্বর-বর্জ্জিত, পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালোই হইয়াছে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যাকরণ-দোষ দুই-চারি স্থানে লক্ষিত হইল, গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম, সুতরাং তাহা ততটা ধর্ত্তব্য নহে। আশা করি, গ্রন্থকার সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি মোসলেম প্রদেশ-সমূহের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী ও ইতিবৃত্তাদি সঙ্কলন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

জৈনধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী সর্ব্বধর্ম্ম পরিষৎ, কাশী। কলিকাতা লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। জৈন ধর্ম্মের আলোচনা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল হইলেও লেখকের সরল ভাষার গুণে দুরূহ হয় নাই।

সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার চন্দ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরণেন্দ্রকুমার চন্দ। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। গ্রন্থখানির ভাষা সহজ। বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা পড়ায় অবহেলা করিলে চলিবে না। এই ব্যাকরণখানি প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে মন্দ হয় নাই, তবে সকল স্থলে গ্রন্থকারের কথা সুবোধ্য হয় নাই; আমরা তাঁহার বক্তব্য বুঝিতেও পারি নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এরূপ অস্পষ্টতা মার্জ্জনীয় নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিই,—"যদ্ তদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দগুলির বিভক্তির বহুবচনে যে যে রূপ হয়, সাধারণতঃ উহাদের পরে 'সকলে' এই পদটি বসাইয়া সপ্তমীর বহু বচনের রূপ করিতে হয়। যথা—আমাদের সকলে, যাহাদের বা যাদের সকলে ইত্যাদি।" "আমাদের সকলে" এরূপ পদ শুদ্ধ নহে, এবং বাঙ্গালায় চলিত আছে বলিয়াও আমরা শুনি নাই। "আমরা সকলে"

ভারতী



'অর্থনীতি', 'অর্থশাস্ত্র', 'ইংরাজের কথা', 'সমসাময়িক ভারত'
প্রণেতা
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

K. V. SEYNE & BROS.

কিম্বা "আমাদের সকলের" এইরূপ পদই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং গ্রন্থকার-প্রদত্ত এ সূত্রের অর্থ কি, তাহা বুঝিলাম না। লেখক সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। স্বাধীনভাবে বঙ্গ-ভাষার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ যে লিখিত হইতেছে না, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। অধ্যাপক ললিতকুমার এ দিকে নিপুণ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু আজও তাঁহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া মাথা ঘামাইয়া কেহ বঙ্গ ভাষায় ব্যাকরণ লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া ত শুনা যায় নাই।

Child's Simple Grammar. (Anglo-Bengali)—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ প্রণীত। মূল্য ।৶০ আনা ঢাকা। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এই শিশুপাঠ্য ইংরাজী ব্যাকরণ গ্রন্থ-খানি প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। সূত্রগুলি লেখক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। ভারত মহিলা প্রেস, ঢাকা। মূল্য এক টাকা। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসারতা কি করিয়া বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক একটি ইতিহাস এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। কি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও বিবরণী আছে। গ্রন্থকার ও তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কতখানি উদ্যোগ-সহায়তা করিয়াছিলেন, স্ব-মতানুসরণে কতখানি একনিষ্ঠ ছিলেন, তাহার কাহিনী টুকু গ্রন্থকারের সহজ সরল ভাষায় অনাড়ম্বর বর্ণনা ভঙ্গিমায় সুন্দর ফটিয়াছে। লেখকের নির্ভীকতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহীনতা প্রশংসার্হ। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

শান্তিজল। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে সম্প্রতি যে দুইজন তরুণ কবি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ভবিষ্যৎ যাঁহাদের দিব্য সমুজ্জ্বল, করুণানিধান সেই দুইজন কবির অন্যতম। শব্দে চিত্রাঙ্কণ করিবার ক্ষমতা করুণানিধানের অপূর্ব্ব। তাঁহার ছন্দ ভাবের ফুল বুকে লইয়া শান্ত মধুর প্রবাহে বহিয়া যায়; কোথাও এতটুকু জটিলতা বা বাধা রাখে না। করুণানিধানের বীণায় যেন সুরের ফুলঝুরি ঝরিয়া পড়ে। এই গ্রন্থে আঠারোটি খণ্ড কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি বসন্তের ফুলের মত সুন্দর;—বর্ণে গন্ধে পরিপূর্ণ; কবির ভাষায়—thing of beauty, পাঠকের চিত্তটিকে মাধুরী-ধারায় স্নান করাইয়া তুলে; কিন্তু একটি ত্রুটি চোখে পড়ে। বহুস্থলেই কবি আত্মহারা হইয়া সৌন্দর্য্য সমাবেশে এতখানি মুক্তহস্ত হইয়াছেন যে কবিতাগুলির সৌন্দর্য্যভার বহিবার কতটুকু শক্তি আছে তাহার বিচার করিবার অবসর পান নাই। রাশি রাশি সৌন্দর্য্য জড় করিয়া তিনি অনেকগুলি কবিতাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে কবিতার মর্ম্মগত ভাবটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে; —সেইজন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে কবিতাগুলি উপভোগ্য হইলেও পরিপূর্ণতার যে একটি দিব্য মূর্ত্তি আছে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। পরিমিত সংযমের অভাবে 'শান্তিজলে'র কয়েকটি কবিতায় এই দোষটুকু আসিয়া কয়েক স্থলে রসহানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাপি এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে কবিতাগুলি যে মধুর আনন্দদানের উপযোগী হইয়াছে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

সমসাময়িক ভারত—প্রথম কল্প। তৃতীয় খণ্ড। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিত ভূমিকা। প্রাচীন ভারতের মানচিত্র ও চিত্রাদি সহ মূল্য ১।৶০। আমরা এই গ্রন্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা কালে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। তৃতীয় খণ্ডে সুবিখ্যাত আরিয়ানের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত বিস্তৃত পাদ-টীকাদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডেও পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে। অতিরিক্ত পাদটীকায় গ্রন্থকার আলেক-জান্দার সম্বন্ধীয় বহু প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারের

মতামত প্রদান করায় গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থাবলী শেষ হইলে বঙ্গভাষার যে বিশেষ পুষ্টি সাধন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়া প্রীত হইলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁইস্ চ্যান্‌সেলার মহোদয়ের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশখানি করিয়া এই গ্রন্থাবলী ক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন। বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া বিদ্যানুরাগিতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীঃ

Orissa and Her Remains—

by Babu Monmohon Ganguli.

সে দিন গিয়াছে যে দিন উৎকল-দেশের মহাবনের অন্ধকার হইতে উড়িষ্যা শিল্পের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল একটি একটি করিয়া স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল আমাদের জন্য বাহির করিতেছেন। উৎকল স্থাপত্যের যে শিল্প রাজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাহার সন্ধানে চলিয়া তিনি শ্রমকে শ্রম, বাধাকে বাধা বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, দুঃখের বিষয় সেই শিল্প তাঁহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত আর এ দেশের কাহারও মন তেমন করিয়া যে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পাই নাই। আমাদের মধ্যে অনেকে অনেকবার উড়িষ্যা ভ্রমণে গিয়াছি এবং শ্রীমন্দির সকলের চূড়ায় নিজের নিজের কীর্ত্তি ধ্বজা উড়াইয়া দিয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে হইয়াছে এই যে, না পাইয়াছি নিজেরা কিছু, না দিয়াছি অন্যকে এমন একটা কিছু যাহা কাযে লাগে।

যেখানে শিক্ষার্থির মত নম্রভাবে যাওয়া উচিত ছিল সেখানে আমরা গিয়াছি পাণ্ডিত্যের অভিমান লইয়া স্ফীত বক্ষে এবং তাহার ফলে হইয়াছে এই যে তর্ক ও মীমাংসা-জাল দিয়া আমরা নিজেকেও ঘিরিয়াছি, পরকেও অভিভূত করিয়াছি।

সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিক ভ্রমণকারিগণের মধ্যে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যা যাত্রা-কালে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ ঝুলিটি সঙ্গে না লইয়া, সরল দৃষ্টি, সহজ জ্ঞান ও রিক্ত অঞ্জলি লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং শিল্প-লক্ষ্মীর অযাচিত দান তাঁহারই ভাগ্যে পড়িয়াছে এবং তিনি নিজে যাহা পাইয়াছেন তাহা তাঁহার এই সুবৃহৎ পুস্তকখানিতে সম্পূর্ণরূপে আমাদের দিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক এই শ্রেণীর পুস্তকের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নানা কার্য্যে বিব্রত থাকায় মনোমোহন বাবু প্রাচীন শিল্প চর্চ্চার তেমন সুযোগ পান নাই, নচেৎ আমরা তাঁহার নিকট হইতে এতদিনে আরও অনেক লাভ করিতাম নিঃসন্দেহ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আত্মসমর্পণ

(হাফেজ হইতে)

বাঁধিতে অবোধ হিয়া কোথা হতে এলো প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস,
তোমার নয়ন-ছায়ে স্বপনেরা গায়ে গায়ে
পরাণ হরিতে করে বাস।
তোমার কেশের তলে যুথিকা ফুটিয়া উঠে
আদীন প্রবালগুলি ও রাঙা অধরে লুটে
সুরার উজল তেজ শোণিতে শোণিতে ছুটে
মদালস তব মৃদুহাস॥
কে ছিটালে ফুলদল ঘেরি তব অঞ্চল
এত কেন আতরের বাস?
তোমার তোরণ তলে মলিন ধূলির মাঝে
রবি শশী শির দুটী লুকাক্ লুটাক্ লাজে
দিবস হউক ম্লান, জ্যোছনা সে ম্রিয়মান
হোক্ আজি গোলাপ হতাশ।
মিছে-আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি,
কর তনু-তনিমা প্রকাশ।
তোমার গমন পথে পাতি দেই এই হিয়া
তোমার চরণ রাগ রুমালে মুছায়ে নিয়া
তোমার কপোল কূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া
ডুবিয়া মরুক্ তব দাস,
যাহা কিছু মোর আছে তোমার পায়ের কাছে
সঁপিয়া বাঁচিবে ফেলি' শ্বাস।

শ্রীকালিদাস রায়।

শোক সংবাদ

শরৎকুমার লাহিড়ি মহাত্মা রামতনু লাহিড়ির পুত্র। গত ১লা ফাল্গুনে ৫৫ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি। ইনি কলিকাতার একজন প্রধান পুস্তক-ব্যবসায়ী ছিলেন। বাংলা দেশে ব্যবসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা বড়মানুষ হইয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দাতা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। শুনা যায়, ইনি নিজের সাধ্যমত গরীব ছাত্রদিগের সাহায্য করিতেন। তাহাদের জন্য নিজ দোকান হইতে প্রতিদিন অন্তত ৫ খানি করিয়া পুস্তক বিতরণের বন্দোবস্ত ছিল, ইহা ছাড়া মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক বৃত্তিরও বরাদ্দ ছিল। ইনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় নব্বই হাজার টাকার সম্পত্তি—যাহার বাৎসরিক সুদ তিন হাজার টাকা,—দান করিয়া দেশের স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে খুবই ধনী লোক ছিলেন তাহা নহে, পুত্র কন্যাও তাঁহার অনেকগুলি,—এ অবস্থায় এই দানে তিনি যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃতই আদর্শস্বরূপ। দেশের সকলেরই নিকট এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ে দেশবাসীর এই কৃতজ্ঞতা যে পুণ্যসান্ত্বনা দান করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুত্রগণ পিতার আদর্শ গ্রহণে ধন্য হউন এই আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা।

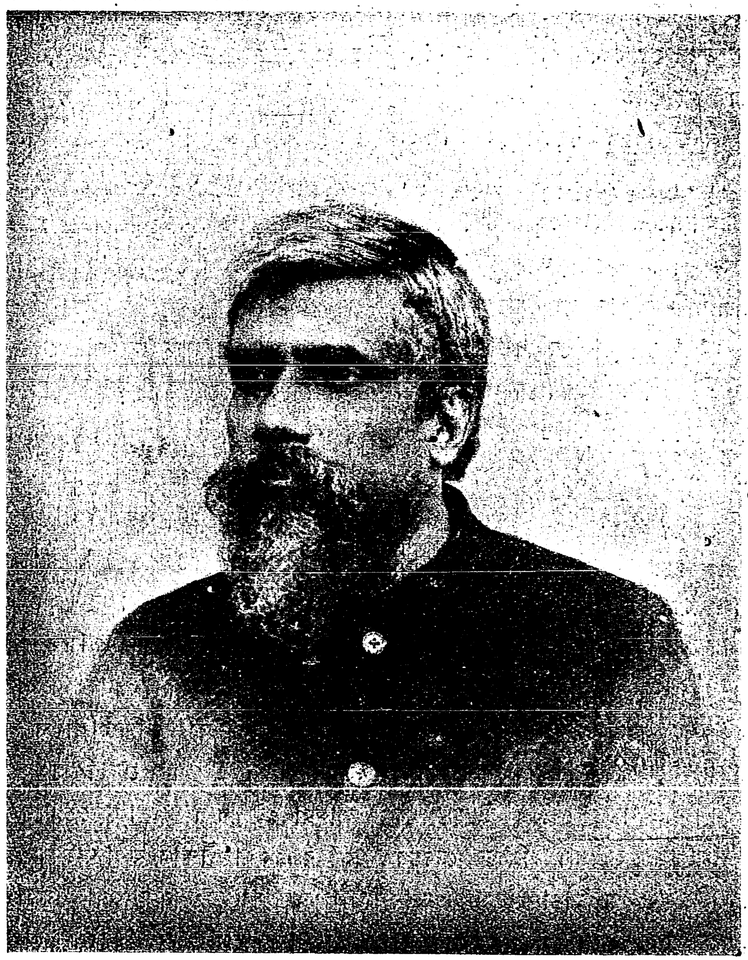

শরৎকুমার লাহিড়ী

কন্যাদায়

কুমারী স্নেহলতার আত্মাহুতিতে দেশময় একটা হাহাকার পড়িয়া গেছে। এই হাহাকার যদি সত্যকার হাহাকার হয় অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র হুজুগ না হয় তাহা হইলে ইহা হইতে শুভফল যে ফলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন একটা বেদনা এতদূর তীব্র হয় যাহাতে দেশের সমস্ত হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠে তখন সে বেদনা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না—তাহার প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী। স্নেহলতার পিতা মাতা আজ যে শোক পাইয়াছেন তাহা যদি সত্যভাবে আমাদের দেশকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা এখনই জোর করিয়া বলিতে পারি যে শোকের কারণ আর নাই—নইলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। এই শোক যেখানে সত্যভাবে গিয়া লাগিয়াছে সেখানে ফলও ফলিয়াছে—ইহার প্রমাণ আমরা সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি। বিনা পণে দুই একটী বিবাহ হইয়াছে।

কুমারী স্নেহলতার করুণ মৃত্যুঘটনা লইয়া বাংলাদেশের চারিদিকে সভা সমিতি বসিতেছে। স্থানে স্থানে অবিবাহিত যুবকগণের নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইতেছে যে বিনা পণে বিবাহ করিতে হইবে। এ সমস্ত চেষ্টার উদ্দেশ্য যে শুভ তাহা বলিতেই হইবে। কিন্তু দেশের সমস্ত অবিবাহিত যুবকের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করানো কখনো সম্ভব হইবে না এবং যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতেছেন তাঁহারা সকলেই যে কার্য্যকালে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ অনেকবার এমন দেখিয়াছি যে যেমন তাড়াতাড়ি প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে তেমনি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা ভঙ্গ করাও হইয়াছে। তাহা ছাড়া, দেশের দুর্দ্দশা দূর করা, প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করার মতো যদি এত সহজ কাজ হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? দেশের মধ্যে যতরকম দুঃখ দৈন্য আছে তাহার বিরুদ্ধে একটা করিয়া প্রতিজ্ঞা ফরম ছাপাইয়া লইলেই তো উদ্ধার হইয়া যাইতাম। প্রতিজ্ঞা করাটা তো কিছু নয়—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার বল থাকাই আসল—সেই বল কি আমরা অর্জ্জন করিয়াছি? আমরা সব জিনিষকে ফাঁকি দিয়া সহজে এড়াইয়া যাইতে চাই বলিয়া বিপদের মতো ভয়ঙ্কর জিনিষও যখন সম্মুখে আসে তখনও ফাঁকির পথ খুঁজি। কিন্তু বিপদ তো কোনো কালেই ফাঁকা নয়, কাজেই সে ফাঁকি মানে না। কিন্তু তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতেছেন তাঁহারা সকলেই না পারুন্ অন্তত কয়েক জনও তো প্রতিজ্ঞাপালন করিবেন। তাহা মন্দের ভালো বটে কিন্তু তাহার দ্বারা আমরা এই ঘোর দুর্দ্দশা হইতে যে মুক্তিলাভ করিব একথা স্বীকার করা যায় না।

কন্যাদায়ের দায় আমরা যতদিন স্বীকার করিব ততদিন এ দায় হইতে কাহারো সাধ্য

নাই আমাদের রক্ষা করে। কন্যাদায় আছে পুত্রদায় থাকিবেনা কেন? কন্যার বিবাহ দেওয়া কন্যার পিতার যেমন দায় পুত্রের বিবাহ দিবার দায়ও পুত্রের পিতার তেমনি—পুত্রের পিতাকে এই কথাটা স্বীকার করানো যায় না বলিয়াই না কন্যার পিতাকে এমন দীনভাবে পুত্রের পিতার দ্বারস্থ হইতে হয়।

কথা হইতেছে এই—পুত্রের পিতার অন্তরে পুত্রদায়ের তাগিদ নাই কেন? সে দিব্য আরামে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকে কন্যার পিতা তাহার বাড়ি আসিয়া সাধ্য সাধনা করে—সে যে এই দিব্য অধিকারটুকু পাইয়াছে সে কিসের বলে? ছেলের বাপের প্রথম সুবিধা এই যে ছেলের বিয়ের বয়স লইয়া কোনো সামাজিক শাসন নাই। মেয়ের বাপের এক্ষেত্রে হাত পা বাঁধা;—মেয়ের একটু বয়স হইলেই পাড়াময় ঢি ঢি পড়িয়া যায়, সেইজন্য মেয়ের বাপকে কন্যার বিবাহের জন্য যত শীঘ্র উদ্বিগ্ন হইতে হয় ছেলের বাপকে তেমন নয়; ছেলে সমাজে থাকিয়া যতই কুকার্য্য করুক না, সমাজ তাহা নীরবে সহ্য করিবে কিন্তু মেয়ের বেলায় যদি পাণ হইতে চুণটুকু খসে তাহা হইলে সমাজ অমনি উগ্রমূর্ত্তি—কাজেই ছেলের বাপের পোয়া বারো। ছেলে ও মেয়ের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের যে এই তারতম্য ইহারই ফলে কন্যাদায়ের সৃষ্টি। ছেলেমেয়েকে যদি সমাজে সমান আদরযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে এরূপ কন্যাদায় থাকে না।

এই সামাজিক সুবিধা ছাড়া ছেলের বাপের আর একটা বলিবার কথা আছে যে ছেলেকে সে শিক্ষা দিয়াছে, উপার্জ্জনক্ষম করিয়াছে। পুত্র সেখানে পুত্র+তাহার বিদ্যা, তাহার অর্থউপায়ের ক্ষমতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই+টুকুর বাজার দর আছেই এবং থাকিবেও। অঙ্কশাস্ত্রের বিধানে এই +এর পরে যতই অঙ্ক পড়িবে ততই তাহার মূল্য বাড়িবে। এই জন্যই দেখা যায় যে বি, এ-পাশ-করা ছেলের চেয়ে এম,এ পাশকরা ছেলের দর বেশী। তা ছাড়া জিনিষের চাহিদার মাপকাঠিতে জিনিসের দাম বাড়ে, কমে। একটা জিনিসের উপর যদি অনেক খরিদ্দার ঝোঁকে তাহা হইলে তাহার দাম বাড়িয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। সকল মেয়ের বাপ স্বভাবতই ভালো ছেলে, উপার্জ্জনক্ষম ছেলে খোঁজে, সেই জন্য এই শ্রেণীর ছেলের চাহিদা বেশী—কাজেই তাহাদের দামও অনেক। নইলে একেবারে মূর্খ ছেলে—যাহার বিদ্যাও নাই, বংশগৌরবও নাই এমন ছেলেকে এখনও প্রায় বিনা পয়সায় বা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিবাহের বাজারে ছেলের তত মূল্য নাই, যত মূল্য তাহার বিদ্যা ইত্যাদির। কারণ এই বিদ্বান ছেলেরই চাহিদা বাজারে বেশী।

আসল গোল এইখানেই—এই বাজার চাহিদা লইয়া। কেবল প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বাক্ষর দ্বারা এই বাজার চাহিদাকে ঠেকানো যাইবে কেমন করিয়া? প্রতিজ্ঞাপত্র না হয় স্বাক্ষর করিলাম কিন্তু তাই বলিয়া যে মেয়ে এবং যতগুলি মেয়ে উপস্থিত হইবে তাহাকেই তো বিবাহ করা চলিবে না। একটি বিদ্বান ছেলের জন্য শত শত উমেদার জুটিবেই। তখন

সেই উমেদারের মধ্যে কোনো একজনের কন্যাকে বাছাই করিতে হইবে এবং সে বাছাই নির্ভর করিবে এখনো যেমন হইতেছে কন্যার দর বা কদরের উপর। এখনো তো দেখা যায় সুন্দরী মেয়ের বিবাহ অপেক্ষাকৃত সস্তায় সারা যায়। এখানে মেয়ের বাপেরা প্রতিজ্ঞাপত্রের দাবীতে নগদ টাকার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপ এক্ষেত্রে টাকার পরিবর্ত্তে এমন কিছু চাহিবেন যাহার মূল্য টাকার চেয়ে বেশী বই কম নয়—এবং যে সামগ্রী সকল পিতার ভাণ্ডারে নাই। যে পিতা তাহা জোগাইতে পারিবেন তাহারই জয়—অন্যের হায় হায়—এখনও মেয়ের বাপের যে দুঃখ তখনও সেই দুঃখ—শত শত প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার কোনো লাভ হইবে না।

এই জন্য বাজারে যেমন করিয়া ছেলের দর এবং ছেলের বাপের গুমর বাড়িয়াছে তেমনি করিয়া মেয়ের কদর এবং মেয়ের বাপের গৌরব বাড়াইতে হইবে—অর্থাৎ মেয়েকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে; বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে কর্ম্মে মেয়েকে ছেলের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে—ছেলের সহিত একাসনে বসিতে পারে এমন যোগ্যতা তাহাকে দিতে হইবে—সে যেন কিছুতেই হীন হইয়া না থাকে—তাহাকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে যে কেহ যেন মনে করিতে না পারে মেয়ে এদেশের ফেল্না জিনিস। বিবাহ সভায় বরের যেমন প্রয়োজন কন্যার প্রয়োজনও তো তদপেক্ষা কম নহে—তবে আমাদের দেশে ছেলের বাপ নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া সুখে নিদ্রা যাইবেন এবং মেয়ের বাপ হতে কুকুরের মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন? ছেলের যেমন দেমাক আছে মেয়েরও তেমনি গৌরব বলিয়া একটা জিনিস আছে ইহা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি না বলিয়াই এবং তাহাদের হীন করিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই মেয়ে লইয়া আমাদের লাঞ্ছনা এত। যদি সমানে সমান করিয়া তুলিতে পারি, তবে ছেলের বাপের চেয়ে মেয়ের বাপকে কিছুতেই খাটো হইয়া থাকিতে হইবে না। যে দেশে কন্যালাভ করিবার জন্য হরধনু ভঙ্গ করিতে হইয়াছে, লক্ষ্যভেদ করিতে হইয়াছে, যুদ্ধ জয় করিতে হইয়াছে সে দেশের মেয়ে যে সস্তার সামগ্রী নহে তাহাই মেয়ের বাপকে দেখাইতে হইবে; তবেই মেয়ের বাপের দুর্দ্দশা ঘুচিবে।

বরপণ

মানুষের যখন কোন একটা অভাব হয় তখনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারেরও একটা চেষ্টা জাগে, এটা অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে আমাদের এমন জড়তা ধরে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও চক্ষু মেলিয়া চাহিতে ইচ্ছা করে না।

স্নেহলতার মৃত্যুর পর সভাসমিতিতে পুরুষেরা একদিকে আন্দোলন করিলেন বটে কিন্তু এই আন্দোলনে ফল হইল কতটুকু?—একবার অবনী আকাশ ঢাকিয়া একটা ঝড়ের মত উঠিল, তাহার পর সে ঝঞ্ঝা আবার শান্ত হইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর

শিক্ষিত-সমাজ পরিতাপে দগ্ধ হইয়াও এ পণ-প্রথা ভাঙিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কি?—সমাজে স্ত্রী-শক্তির অভাব। পিতামাতা যদি কন্যাকেও পুত্রের মত শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার চিন্তা অগ্রে রাখিয়া পরে তাহাকে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন তবেই এরূপ দুর্ব্বহ পণপ্রথার কঠোরতা শিথিল হয়।

দেখা যাইতেছে পাস-করা ছেলের জন্যই যৌতুক অভিলাষে এই পণ জোর জবরদস্তি করিয়া লওয়া হয়। বার তের অথবা চৌদ্দ বৎসরের বোধোদয়-পড়া বালিকা ত আর দর্শন বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা বিদ্যাপারদর্শী যুবকের সমকক্ষ হইতে পারে না। যে সকল কন্যা সুন্দরী তাহারা সৌন্দর্য্যের দরে বিকাইয়া যায়, কিন্তু যাহারা তেমন সুন্দর নহে, তাহারা কি গুণে পাত্রের আদরযোগ্য হইবে? কাজেই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বরপণ দিতে হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার কন্যাকে সুশিক্ষিতা করা। ইহাতেই পাত্রের নিকট তাহার আদর বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে কন্যাপক্ষীয়দিগের দিক হইতে পাত্র "অনুসন্ধান" পরিবর্ত্তে, পাত্রপক্ষই পাত্রীর সন্ধান করিবে। ইহাই হওয়া উচিত। উত্তর পশ্চিমে কোন কোন হিন্দুজাতির মধ্যে এখনও এইরূপ হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস কন্যাকে সুশিক্ষিত করিলে কালে বরপণের স্থলে মেয়েপণের দিন আসিবে। তখন উভয় পক্ষের পিতামাতাকে সমানভাবে পণ করিতে হইবে যে পুত্রকন্যা কাহারও বিবাহে পণ লইব না।

পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে এরূপ পণের কঠোরতা ছিল না, ইহা সকলেই জানেন। তখনকার কন্যাবধূরা অলঙ্কার ও যৌতুকের ভার বহিয়া লইয়া না গেলেও কেবল নিজ গুণে ও কর্ত্তব্য পালনে শ্বশুরালয়ে সকলের প্রিয় হইয়া সুখী হইতেন। তখনকার পুত্রেরা কি এখনকার মত শ্রীমান ধীমান ছিলেন না? তখনকার গুণবান পুত্রের জন্য কেবল সুলক্ষণা অর্থাৎ গুণবতী কন্যা সন্ধানের হইলেই যথেষ্ট হইত। এই পবিত্র উদ্বাহকার্য্য যে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের সোপান, এই ভাবটি বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইয়া, ইহা ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিনিময় স্বরূপ সমাজে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। যে বিষে জর্জ্জর হইয়া, বাঙ্গালা মাত্রেই কেবল কাঁদিয়া কাটিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন আজ সেই বিপদের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ একটি নিরপরাধ কোমল জীবন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; সেই ভস্মরাশিয় অণু পরমাণু প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আমাদের মর্ম্মের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বরপণপিপাসু দেবতাদের "স্নেহলতার" বলিদানে যদি পরিতৃপ্তি না হইয়া থাকে তবে কিছুতেই সমাজে সে রীতির অনুষ্ঠানে পাষাণ-প্রাণ কম্পিত হইবে না। এই দুঃসময়ে গৃহের শক্তিময়ীগণ যদি দুঃখের শান্তিস্বরূপা হইয়া একপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করেন যে মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দিব, এমন কি চিরকুমারী রাখিব সেও স্বীকার তবু পণ দিব না, তবেই স্নেহলতার আত্মহত্যা সার্থক হইবে। মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া বা চিরকুমারী রাখা আমাদের দেশে তো নূতন জিনিস নহে—সেকালে কুলীনের ঘরের অনেক মেয়ে পাত্র অভাবে তো চিরকুমারীই থাকিত। এখন যদি দরকার হয় তো তাহাদের চিরকুমারী রাখা যাইবে না কেন? মেয়েরা শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলে বিবাহ না হইলেও তাহাদের জীবনে কার্য্যের অভাব হইবে না। সুতরাং কন্যা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহার বিবাহের ভাবনায় আকুল না হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য পিতামাতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন। এই প্রতিজ্ঞাতে কেবল ব্যক্তিগত দুঃখের নিষ্কৃতি নহে—জাতিগত দুঃখ নিবারণের পথ মুক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আগামী বৎসরের ভারতী

১। আগামী বৎসরে যাঁহারা ভারতীর গ্রাহক থাকিতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ভারতীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন—যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে না চাহেন অনুগ্রহ করিয়া সে কথা ১৫ই চৈত্রের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নিষেধপত্র না পাইলে আমরা বৈশাখের ভারতী ভি, পিতে পাঠাইব।

১। আগামী বৎসরের ভারতী প্রবন্ধ-গৌরবে ও প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য যাহাতে অতুলনীয় হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। যাহাতে বাছাই-করা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবার বেশী করিয়া থাকে তাহার আয়োজন হইতেছে। ছবি যেমন চলিতেছে তেমনি চলিবে।

৩। ১৩২১ সালে তিনখানি নূতন উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইবে। তন্মধ্যে একখানি গার্হস্থ্য চিত্র—"স্রোতের ফুল"—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, প্রণীত, ও অপরখানি জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা প্রণীত—"লাইকা"—হিন্দী গাথা অবলম্বনে রচিত সুমধুর রোমান্স। আর একখানি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এল কৃত। ইহা ছাড়া শিল্প সাহিত্যের ওস্তাদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত আর্ট সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ কয়েক মাস ধরিয়া বাহির হইবে। এই প্রবন্ধে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অনেক অজানা তথ্য প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্যজীবনী ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে তাহাতে অনেক সেকালের কথা থাকিবে। এবং বিখ্যাত বিদেশী নাটক ও গল্পের অনুবাদ মধ্যে মধ্যে থাকিবে। সম্পাদিকা মহাশয়ার রচনা, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফরাসী সাহিত্যের চয়ন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বার-য়্যাট-লর গম্ভীর ও হালকা রচনা, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের প্রত্নতত্ত্ব, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির ছোট গল্প, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণের কবিতা ও অন্যান্য বিখ্যাত লেখকগণের লেখা নিয়মিত দেওয়া হইবে। গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশী সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে বিবিধ চয়ন থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ মুদ্রিত হইবে।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।